প্রথম প্রকাশ ❑ জানুয়ারী ১৯৫৯

প্রকাশক ❑ সমীরকুমার নাথ
নাথ পাবলিশিং
২৬ বি পণ্ডিতিয়া প্লেস
কলকাতা - ৭০০ ০২৯

অক্ষরবিন্যাস ❑ অনুপম ঘোষ
পারফেক্ট লেজারগ্রাফিক্স
২ চাঁপাতলা ফার্স্ট বাই লেন
কলকাতা - ৭০০ ০১২

মুদ্রক ❑ অন্নপূর্ণা এজেন্সী
৬১ সূর্য সেন স্ট্রীট
কলকাতা - ৭০০ ০০৯

সূচনা

জীবনানন্দ বিষয়ে নানা স্মৃতিকথা এবং জীবনানন্দের কবিতা বিষয়ে কিছু প্রবন্ধ ছাড়াও এই সংগ্রহে রইল তাঁর গল্প-উপন্যাসের আলোচনা।

জীবনানন্দের সৃষ্টির একটা ধারাবাহিকতার ভাব বজায় রাখার চেষ্টা করেছি এ-বইতে। জীবনানন্দের লেখা নিয়ে অনেকের ভাবনাচিন্তা গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে মিলেমিশে রইল একজায়গায়, এইটুকুই।

জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে

বুদ্ধদেব বসু

ঢাকা, গ্রীষ্মকাল, ১৯২৭। হাতে-লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হ'লো। শুঁয়োপোকার খোলশ ঝ'রে গেলো, বেরিয়ে এলো ক্ষণকালীন প্রজাপতি। কিন্তু শুধুমাত্র ক্ষণিক ব'লেই কোনো-কিছু উপেক্ষণীয় নয়; কারো হয়তো অল্প সময়েই কিছু করবার থাকে, সেটুকু ক'রে দিয়েই সে বিদায় নেয়।

'প্রগতি'র নিয়মিত লেখকদের মধ্যে রীতিমতো বিখ্যাত ছিলেন একমাত্র নজরুল ইসলাম, আর অচিন্ত্যকুমার—যাঁর 'বেদে', 'টুটা-ফুটা' সবেমাত্র বেরিয়েছে—তাঁকেও বলা যায় সদ্য-সমাগত। এই দু-জন ছাড়া অন্য সকলেই ছিলেন আসন্ন, অত্যাসন্ন, উপক্রমণিক; বৃহত্তর পাঠকসমাজের সঙ্গে তাঁদের অপরিচয়ের ব্যবধান তখনও ভেঙে যায়নি। আর এঁদের মধ্যে সম্পাদক দু-জনকে বাদ দিয়ে—যাঁদের রচনা সবচেয়ে প্রচুর পরিমাণে ছাপা হ'তো, তাঁদের নাম জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দে।

বিষ্ণু দে প্রথম লেখা পাঠিয়েছিলেন 'শ্যামল মিত্র' বা ঐ রকম কোনো ছদ্মনামে, নিপুণ ছন্দের কোনো কবিতা। তারপর স্বনামে ও বেনামে, গদ্যে ও পদ্যে, তাঁর অনেক লেখাই 'প্রগতি'র পাতা উজ্জ্বল করেছিলো। তাঁর সাহিত্যজীবনের সেটা প্রথমতম অধ্যায়; লোকে তাঁর স্বনামকেই বেনাম ব'লে ভুল করছে; অনেকেই বিশ্বাস করছে না 'বিষ্ণু দে'-র মতো সংক্ষিপ্ত ও সুশ্রাব্য নাম বাস্তব কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব।

কিছুকাল পূর্বে জীবনানন্দ দাশগুপ্ত স্বাক্ষরিত 'নীলিমা' নামে একটি কবিতা 'কল্লোলে' আমরা লক্ষ্য করেছিলাম; কবিতাটিতে এমন একটি সুর ছিলো যার জন্য লেখকের নাম ভুলতে পারিনি। 'প্রগতি' যখন বেরোলো, আমরা অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে এই লেখককে আমন্ত্রণ জানালাম, তিনিও তার উত্তর দিলেন উষ্ণ, অকৃপণ প্রাচুর্যে। কী আনন্দ আমাদের, তাঁর কবিতা যখন একটির পর একটি পৌঁছতে লাগলো, যেন অন্য এক জগতে প্রবেশ করলাম—এক সান্ধ্য, ধূসর, আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি-সূক্ষ্ম-ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ—যেখানে পতঙ্গের নিশ্বাসপতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হ'য়ে ওঠে। এই চরিত্রবান নতুন কবিকে অভিনন্দন জানিয়ে ধন্য হলাম আমরা।

'প্রগতি'র প্রথম বছরের বাঁধানো সেটটি আমার অনির্ভরযোগ্য ভাণ্ডার থেকে অনেক আগেই অন্তর্হিত হয়েছে, অন্য কোথাও তা সংগ্রহ করতেও পারলাম না। পত্রিকার সূত্রপাত থেকেই জীবনানন্দর লেখা সেখানে বেরিয়েছে এই রকম একটা ধারণা আছে আমার; কিন্তু প্রথম বছরে কোন-কোন লেখা বেরিয়েছিলো সেটা স্পষ্টভাবে মনে আনতে পারছি না। খুব সম্ভব তার মধ্যে ছিলো '১৩৩৩', 'পিপাসার গান' আর 'অনেক আকাশ'। সৌভাগ্যত, দ্বিতীয় আর অসমাপ্ত তৃতীয় বছরের সংখ্যাগুলি এখনো আমার হাতের কাছে

আছে, আর তাতে—এখন পাতা উল্টিয়ে প্রায় অবাক হ'য়ে দেখছি—প্রথম দেখা দিয়েছিলো 'সহজ', 'পরস্পর', 'জীবন', 'স্বপ্নের হাতে', 'পুরোহিত' (পরবর্তী নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'), 'কয়েকটি লাইন', 'বোধ', 'আজ', 'অবসরের গান'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সতেরোটি কবিতার মধ্যে 'পাখিরা' 'কল্লোলে', 'ক্যাম্পে', 'পরিচয়ে', 'মৃত্যুর আগে', 'কবিতা'য়, আর কোনো কোনোটি 'ধূপছায়া'য় বেরিয়েছিলো, কিন্তু অধিকাংশেরই প্রথম প্রকাশ 'প্রগতি'তে, তার উপর যখন বই ছাপা হ'লো তখন ধাত্রীর কাজও আমি করেছিলাম ; তাই ঐ গ্রন্থটিকে আমার নিজের জীবনের একটি অংশ ব'লে মনে হয় আমার। প্রসঙ্গত এখানে উল্লেখ করি যে 'আজ' নামক স্তবকবিনাস্ত দীর্ঘ কবিতাটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নেই, পরবর্তী অন্য কোনো গ্রন্থেও গৃহীত হয়নি।

'প্রগতি'তে শুধু প্রকাশ করা নয়, নতুন সাহিত্য প্রচার করার দিকেও লক্ষ্য ছিলো আমাদের। তার জন্যে মনের মধ্যেই তাগিদ ছিলো, বাইরে থেকেও উত্তেজনার অভাব ছিলো না। দেশের মধ্যে উগ্র হ'য়ে উঠেছিলো সংঘবদ্ধ, প্রতিজ্ঞাবদ্ধ, অপরিমিত, অনবরত বিরুদ্ধতা। যাঁরা যুদ্ধঘোষণা করলেন তাঁরা কেউ সাহিত্যের মহাজনি কারবারি, কেউ বা তাঁদের আশ্রিত, কেউ মহিলা, কেউ বড়ো ঘরের ছেলে, কেউ নামজাদা সম্পাদক অথবা লন্ডনে-পাশ-করা প্রোফেসর, আর কেউ বা ফরাশি জর্মান আর এক লাইন রাশিয়ান জানেন। তুলনায় আমরা, যারা নেহাৎই কলেজের ছাত্র কিংবা সবেমাত্র উত্তীর্ণ, যে-কোনোরকম সাংসারিক বিচারে আমরা কত দুর্বল তা না-বললেও চলে; কিন্তু যেহেতু সংসারের নিয়ম আর সাহিত্যের বিধান এক নয়, যেহেতু নিন্দুকের লক্ষ বথাকে কীটের অন্নে পরিণত ক'রে একটিমাত্র কবিতার পংক্তি তারার মতো জ্বলজ্বল করে তাই আমরা হেরে যাইনি, ভেঙে যাইনি, স'রে যাইনি, দাঁড়িয়ে ছিলাম শরবর্ষণের সামনে, কিছু-কিছু প্রত্যুত্তরও দিয়েছিলাম। সেই দু-বছর বা আড়াই বছর, যে-কদিন 'প্রগতি' চলেছিলো, আমি বাদানুবাদে লিপ্ত হয়েছিলাম, শুধুমাত্র সদর্থকভাবে নিজের কথাটা প্রকাশ না-ক'রে প্রতিপক্ষের জবাব দিতেও চেয়েছিলাম—সেই সব আক্রমণেরও উত্তর, যাতে আক্রোশের ফণা বিষাক্ত হ'য়ে উঠেছে, আর ইতর রসিকতার অন্তরালে দেখা যাচ্ছে পান-খাওয়া লাল-লাল দাঁত, কালচে মোটা ঠোঁট, দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের সময় দুঃশাসনের ঘূর্ণিত, লোলুপ, ব্যর্থকাম দৃষ্টি। এই রকম আক্রমণের অন্যতম প্রধান লক্ষ্য ছিলেন জীবনানন্দ, আর তাতে আমার যেমন উত্তেজনা হ'তো নিজের বিষয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপে তেমন হ'তো না ; যেহেতু তাঁর কবিতা আমি অত্যন্ত ভালোবেসেছিলুম, আর যেহেতু তিনি নিজে ছিলেন সব অর্থে সুদূর, কবিতা ছাড়া অন্য সব ক্ষেত্রে নিঃশব্দ, তাই আমার মনে হ'তো তাঁর বিষয়ে বিরুদ্ধতার প্রতিরোধ করা বিশেষভাবে আমার কর্তব্য। 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় আলোচনার মধ্যে জীবনানন্দর প্রসঙ্গ, সমসাময়িক অন্য লেখকদের তুলনায়, কিছু বেশি পৌনঃপুনিক ব'লে মনে হয় ; তার অনেকটা অংশই যে প্রতিবাদ সে-কথা ভাবতে আজ আমার খারাপ লাগে। অবশ্য আমি অচিরেই বুঝেছিলাম যে প্রতিবাদ মানেই শক্তির অপব্যয়, আর পরবর্তী দীর্ঘকাল ধ'রে সেই অপব্যয় সন্তর্পণে এড়িয়ে চলেছি, কিন্তু এখানে অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই প্রসঙ্গ উল্লেখ করতে হ'লো, তা না-হ'লে সেই সময়কার সম্পূর্ণ ছবিটি পাওয়া যাবে না। আজ নতুন ক'রে স্মরণ করা প্রয়োজন যে জীবনানন্দ, তাঁর কবিজীবনের আরম্ভ থেকে মধ্যভাগ পর্যন্ত, অসূয়াপন্ন নিন্দার দ্বারা এমনভাবে নির্যাতিত হয়েছিলেন যে তারই জন্য কোনো-এক সময়ে তাঁর জীবিকার ক্ষেত্রেও বিঘ্ন ঘটেছিলো। এ-কথাটা এখন আর অপ্রকাশ্য নেই যে 'পরিচয়ে' প্রকাশের পরে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির সম্বন্ধে 'অশ্লীলতা'র

নির্বোধ এবং দুর্বোধ্য অভিযোগ এমনভাবে রাষ্ট্র হয়েছিলো যে কলকাতার কোনো-এক কলেজের শুচিবায়ুগ্রস্ত অধ্যক্ষ তাঁকে অধ্যাপনা থেকে অপসারিত ক'রে দেন। অবশ্য প্রতিভার গতি কোনো বৈরিতার দ্বারাই রুদ্ধ হ'তে পারে না, এবং পৃথিবীর কোনো জন কীটস অথবা জীবনানন্দ কখনো নিন্দার ঘায়ে মূর্ছা যান না—শুধু নিন্দুকেরাই চিহ্নিত হ'য়ে থাকে মূঢ়তার, ক্ষুদ্রতার উদাহরণস্বরূপ। মার্কিন লেখক হেনরি মিলার একখানা বই লিখেছেন, যার নাম 'Remember to Remember'। এই নামটি উল্লেখযোগ্য, কেননা আমাদের ব্যক্তিগত আর সামাজিক দায়িত্বের বড়ো একটা অংশ হ'লো মনে রাখা। জীবনে যেখানে-যেখানে সুন্দরের স্পর্শ পেয়েছি সেটা যেমন স্মরণযোগ্য, তেমনি যেখানে কুৎসিতের পরাকাষ্ঠা দেখলাম সেটাকে যেন দুর্বলের মতো মার্জনীয় ব'লে মনে না করি। যেন মনে রাখি, মনে রাখতে ভুলে না যাই।

২

'প্রগতি'র পাতায় জীবনানন্দর কবিতা বিষয়ে যে-সব আলোচনা বেরিয়েছিলো তার কিছু-কিছু অংশ এখানে তুলে দেবার লোভ হচ্ছে। আমি স্বীকার করতে বাধ্য যে এই উদ্ধৃতিগুলির লেখক আর বর্তমান প্রবন্ধকার ঐতিহাসিক অর্থে একই ব্যক্তি ; কিন্তু এর রচনাভঙ্গি, আর লেখার মধ্যে ইংরেজি শব্দের অবিরল ব্যবহার দেখে আজ আমার কর্ণমূল আরক্ত হচ্ছে। তবু, সব দোষ সত্ত্বেও, অংশগুলি অন্য কারণে ব্যবহার্য হ'তে পারে : প্রথমত, এতে বোঝা যাবে একজন প্রথম ভক্ত পাঠকের মনে জীবনানন্দর কবিতা কী-রকম ভাবে সাড়া তুলেছিলো ; দ্বিতীয়ত, এই তিরিশ বছরে বাংলা কবিতা কত দূর অগ্রসর হয়েছে তা বোঝার পক্ষেও এগুলো কিঞ্চিৎ কাজে লাগতে পারে।

> জীবনানন্দবাবু বাঙলা কাব্যসাহিত্যে একটি অজ্ঞাতপূর্ব ধারা আবিষ্কার করেছেন বলে' আমার মনে হয়। তিনি এ-পর্যন্ত মোটেই popularity অর্জন করতে পারেননি, বরঞ্চ তাঁর রচনার প্রতি অনেকেই বোধ হয় বিমুখ;—অচিন্ত্যবাবুর মত তাঁর এরি মধ্যে অসংখ্য imitator জোটেনি। তার কারণ বোধ হয় এই যে জীবনানন্দ বাবুর কাব্যরসের যথার্থ উপলব্ধি একটু সময়সাপেক্ষ;...তাঁর কবিতা একটু ধীরে-সুস্থে পড়তে হয়, আস্তে-আস্তে বুঝতে হয়।
>
> জীবনানন্দবাবুর কবিতায় যে-সুরটি আগাগোড়া বেজেছে, তা'কে ইংরেজ সমালোচকের ভাষায় 'renascence of wonder' বলা যায়। ... তাঁর ছন্দ ও শব্দযোজনা, উপমা ইত্যাদিকে চট করে' ভালো কি মন্দ বলা যায় না—তবে "অদ্ভুত" স্বচ্ছন্দে বলা যায়। তাঁর প্রধান বিশেষত্ব আমরা এই লক্ষ্য করি যে সংস্কৃত শব্দ যতদূর সম্ভব এড়িয়ে চলে' শুধু দেশজ শব্দ ব্যবহার করে'ই তিনি কবিতা রচনা করতে চাচ্ছেন। ফলে তাঁর diction সম্পূর্ণরূপে তাঁর নিজস্ব বস্তু হয়ে পড়েছে—তা'র অনুকরণ করাও সহজ ব'লে মনে হয় না। ... [তিনি] এমন সব কথা বসাচ্ছেন যা পূর্বে কেউ কবিতায় দেখতে আশা করেনি যথা, "ফেঁড়ে", "নটকান", "শেমিজ", "থুতনি" ইত্যাদি। এর ফলে তাঁর কবিতায় যে অপূর্ব স্বাতন্ত্র্য এসেছে সে কথা আগেই বলেছি ; তাঁর নিজের ব্যবহারের জন্য তিনি একটি আলাদা ভাষা তৈরী করে' নিতে পেরেছেন, এর জন্য তিনি গৌরবের অধিকারী।

এ-কথা ঠিক যে তিনি [জীবনানন্দ] পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত আগাগোড়া রোমাণ্টিক। এক হিসেবে তাঁকে প্রেমেন্দ্র মিত্রের antithesis বলা যেতে পারে। প্রেমেন্দ্রবাবু বাস্তব জগতের সকল রূঢ়তা ও কুশ্রীতা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সজাগ, বাস্তব জীবনের নিষ্ঠুরতা তাঁকে নিরন্তর পীড়া দিচ্ছে।...জীবনানন্দবাবু এই সংসারের অস্তিত্ব আগাগোড়া অস্বীকার করেছেন, তিনি আমাদের হাত ধরে' এক অপূর্ব রহস্যালোকে নিয়ে যান ;—সে মায়াপুরী হয়তো আমরা কোনোদিন স্বপ্নে দেখে থাকবো।...[সেইজন্যেই] আমি বলেছিলাম যে তাঁর কবিতায় "renascence of wonder" ঘটেছে। * * *

[তাঁর] ছন্দ অসমছন্দ হ'লেও "বলাকা"র ছন্দের সঙ্গে এর পার্থক্য কানেই ধরা পড়ে ;—"বলাকা"র চঞ্চলতা, উদ্দাম জলস্রোতের মত তোড় এর নেই ; —এ যেন উপলাহত মন্থর স্রোতস্বিনী—থেমে-থেমে, অজস্র ড্যাশ ও কমার বাঁধে ঠেকে-ঠেকে উদাস, অলস গতিতে ব'য়ে চলেছে। এতে প্রচুর উৎসাহের তাড়া নেই, আছে একটি মধুর অবসাদের ক্লান্তি। এই সুর যেন বহুদূর থেকে আমাদের কানে ভেসে আসছে। * * *

জীবনানন্দবাবুর...বহু...কবিতায় পরমবিস্ময়কর কথা-চিত্র পাওয়া যায়, সে ছবিগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা, তাঁর কবিতার tone আগাগোড়া subdued।...দৃষ্টান্তস্বরূপ এই ক'টি লাইন নেয়া যাক—

আমার এ গান
কোনোদিন শুনিবে না তুমি এসে,—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে,—
তবুও হৃদয়ে গান আসে!
ডাকিবার ভাষা
তবুও ভুলি না আমি,—
তবু ভালোবাসা
জেগে থাকে প্রাণে!
পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান!
কোনোদিন শুনিবে না তুমি তাহা,—জানি আমি—
আজ রাত্রে আমার আহ্বান
ভেসে যাবে পথের বাতাসে
তবুও হৃদয়ে গান আসে।

এখানে যেন কথা শেষ হ'য়েও শেষ হয়নি ;—কথা ফুরিয়ে গেলেও তা'র বিষণ্ণ সুরটি পাঠকের মনকে যেন haunt করতে থাকে। একটি বা কয়েকটি লাইন পুনরাবৃত্তি করার...ফলে গোটা কবিতাটি যেন চট করে' থেমে যায় না, ভ্রমরের পাখার মত গুঞ্জন করে' ভেসে যায়।

('প্রগতি'— আশ্বিন, ১৩৩৫, সম্পাদকীয় মন্তব্য)

অনিল। * * * আজকালকার একটি কবির লেখা পড়ে' আমার আশা হচ্ছে, আর বেশি দেরি নেই, হাওয়া বদলে আসছে।

সুরেশ। কে তিনি?

অনিল। জীবনানন্দ দাশ।

সুরেশ। জীবানন্দ দাশ? কখনো নাম শুনিনি তো!

অনিল। জীবানন্দ নয়, জীবনানন্দ। নামটা অনেককেই ভুল উচ্চারণ করতে শুনি। তাঁর নাম না শোনবারই কথা! কিন্তু তিনি যে একজন খাঁটি কবি তা'র প্রমাণস্বরূপ আমি তোমাকে তাঁর একটি লাইন বলছি—'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।'...আকাশের অন্তহীন নীলিমার দিগন্ত-বিস্তৃত প্রসারের ছবিকে একটি মাত্র লাইনে আঁকা হয়েছে—একেই বলে magic line। আকাশ কথাটার পুনরাবৃত্তি করবার জন্যই ছবিটি একেবারে স্পষ্ট, সজীব হ'য়ে উঠেছে; শব্দের মূল্য-বোধের এমন পরিচয় খুব কম বাঙালী কবিই দিয়েছেন।

সুরেশ। (অনিচ্ছাসত্ত্বে) লাইনটি ভালো বটে।

অনিল। এই কবি...উভচর ভাষা অবলম্বন করে' আমাদের ধন্যবাদভাজন হয়েছেন। আজকালকার কবিদের মধ্যে তাঁর ভাষা সব চেয়ে স্বাভাবিক। সরল, নিরলঙ্কার, ঘরোয়া ভাষার একটা উৎকৃষ্ট উদাহরণ শুনবে? তুমি যদি অনুমতি করো প্রগতি থেকে জীবনানন্দর একটি কবিতার খানিকটা পড়ে' শোনাই।

সুরেশ। শুনি?

অনিল। (পড়িল)।

তুমি এই রাতের বাতাস,
বাতাসের সিন্ধু— ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।
অন্ধকার—নিঃসাড়তার
মাঝখানে
তুমি আনো প্রাণে
সমুদ্রের ভাষা
রুধিরে পিপাসা
যেতেছ জাগায়ে,
ছেঁড়া দেহে—ব্যথিত মনের ঘায়ে
ঝরিতেছ জলের মতন,
রাতের বাতাস তুমি—বাতাসের সিন্ধু— ঢেউ,
তোমার মতন কেউ
নাই আর।

এই passageটির একমাত্র weak point হচ্ছে রুধির কথাটা। তা ছাড়া, একেবারে নিখুঁত। এতে melody না থাক, music আছে—একটা ক্লান্ত উদাস সুরের meandering। থেমে-থেমে পড়তে হয়—তবে সুরটি কানে ধরা পড়বে। যেমন—'রাতের, বাতাস তুমি। বাতাসের, সিন্ধু', ঢেউ।। তোমার, মতন কেউ। নাই আর।।'

সুরেশ। তা তো বুঝলাম, কিন্তু 'ছেঁড়া দেহ'।

অনিল। ঠিকই—দেহ কথাটা এখানে সঙ্গত হয়নি।...শরীর কথাটাকে তো তিনিই [জীবনানন্দ] জাতে তুলে' দিয়েছেন। তবে দেহ কথাটাও তো কেবলমাত্র অভিধানগত নয়।

সুরেশ। দেহ সম্বন্ধে আপত্তি করবার কিছুই ছিলো না, কিন্তু ছেঁড়া!

অনিল। ছিন্ন না বললে মানে বোঝো না নাকি?

সুরেশ। ছেঁড়া শুনলেই হাসি পায়।

অনিল। অনভ্যাস। সয়ে' গেলেই এর সৌন্দর্য্য ধরা পড়বে। দ্যাখো, এতদিনে আমাদের এ-কথাটা উপলব্ধি করা উচিত যে সংস্কৃত আর বাঙলা এক ভাষা নয়, সংস্কৃতের সঙ্গে বাঙলার নাড়ির বাঁধন বহুকাল ছিঁড়ে গেছে। বাংলা এখন একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, সাবালক ভাষা—তা'র ব্যাকরণ, তা'র বিধি-বিধান, তা'র spirit সংস্কৃত থেকে আলাদা।...অথচ, আশ্চর্যের বিষয় বাঙলা কবিতা এখন পর্যন্ত সংস্কৃত কথাগুলোর প্রতিই পক্ষপাত দেখাচ্ছে, সংস্কৃত conventionগুলো এখনো কাটিয়ে উঠতে পারেনি। আমাদের কবিতায় এখনো সুন্দরীরা বাতায়ন-পাশে দাঁড়িয়ে কেশ আলুলিত ক'রে দেয়, মুকুরে মুখ দেখে, চরণ অলক্তক-রঞ্জিত করে, শুভ্র ও শীতল শয্যায় শোয়। আমাদের নায়িকাদের এখনো হস্তে লীলাকমলমলকে বালকুন্দানুবিদ্ধং ইত্যাদি, যদিও ও-সব-ফ্যাশান দেশ থেকে বহুকাল উঠে গেছে। সংস্কৃতের দুয়ারে এই কাঙালপনা করে' আর কতকাল আমরা মাতৃভাষাকে ছোট করে' রাখবো? আমাদের ভুল জীবনানন্দ দাশ বুঝতে পেরেছেন বলে' মনে হয়; ভাষাকে যথাসম্ভব খাঁটি বাঙলা করে' তোলবার চেষ্টা তাঁর মধ্যে দেখা যায়। তিনি সাহস করে লিখেছেন:

সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা—শাদা—বরফের কুচির মতন।

শুনে তোমার—শুধু তোমার কেন? অনেকেরই—হাসি পাবে, বলবে —'ঠাণ্ডা—শাদা—এ আবার কী?' কিন্তু ঐ শব্দ দুটো গদ্যে লিখতে পারি, মুখে বলতে পারি—আর কবিতাতেই লিখতে পারবো না? কেন কবিতায় জানালাকে জানালা বলবো, বিছানাকে বিছানা?...যত কথা আমাদের মুখের ভাষায় স্থান পেয়েছে...কাব্যসমাজ থেকে তাদের একঘরে ক'রে রেখে কেন আমরা আমাদের কবিতাকে এক বিপুল শব্দ-সম্ভার থেকে বঞ্চিত করবো? মৌখিক ভাষার ইডিয়মগুলো ব্যবহার করে' কবিতাকে স্বাভাবিক ও সহজ করে' তুলবো না কেন?...আমি তো বলি, ক্ষণিকার ভাষা, জীবনানন্দের কবিতার ভাষা purest বাঙলা, কারণ তা বাঙলা ছাড়া আর কিছু নয়।

('প্রগতি'—ভাদ্র, ১৩৩৬, 'বাঙলা কাব্যের ভবিষ্যৎ')

ইচ্ছে ক'রেই উদ্ধৃতি একটু দীর্ঘ করলাম, সেই সময়কার সাহিত্যিক আবহাওয়ার কিছু আভাস দেবার জন্য। আজকের দিনের পাঠক নিশ্চয়ই এ-কথা ভেবে অবাক হচ্ছেন যে কবিতায় 'ঠাণ্ডা' বা 'শাদা' কথাটার ব্যবহারের সমর্থনের জন্য এতগুলো বাক্যব্যয়ের প্রয়োজন হ'তে পারে, কিন্তু এ-কথা সত্য যে গম্ভীর ভাবের কবিতায় দেশজ ও বিদেশী শব্দের এমন স্বচ্ছন্দ, সংগত ও প্রচুর ব্যবহার জীবনানন্দর আগে অন্য কোনো বাঙালি কবি করেননি। মনে পড়ছে 'পাখিরা' কবিতা প্রথম পাঠেই আমাদের পক্ষে রোমাঞ্চকর হয়েছিলো 'স্কাইলাইটে'র জন্য, 'প্রথম ডিমে'র জন্য, 'রবারের বলের মতন' ছোটো বুকের জন্য, আর সেখানে 'লক্ষ লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে' মৃত্যু ছিলো ব'লে। ওটা যে

ঐকাহিক চমক-লাগানো ব্যাপার নয়, সপ্রাণ এবং সবীজ নূতনত্ব, এতদিনে সেটা নিঃসংশয়ে প্রমাণ হ'য়ে গেছে। এমনকি, মৌখিক ভাষায় প্রচলিত তৎসম শব্দেরও ব্যবহারজাত মালিন্য ঘুচিয়ে তাতে কাব্যের স্পন্দন তিনি এনেছিলেন; 'তোমার শরীর—তা-ই নিয়ে এসেছিলে একদিন,' এবং পংক্তিটি প'ড়ে আমি 'শরীর' কথাটাকে নতুন ক'রে আবিষ্কার করেছিলাম। তার আগে নায়িকাদের কোনো 'শরীরের অস্তিত্ব আমরা শুনিনি, শুনেছি 'দেহ', 'দেহলতা', 'তনুলতা', 'দেহবল্লরী'। এই উদাহরণ আমাদেরও রচনার সাহস বাড়িয়ে দিয়েছিলো।

৩

কবে কোথায় জীবনানন্দকে প্রথম দেখেছিলাম মনে পড়ছে না। পাঁচ মিনিট দূরে থেকেও 'কল্লোল'-আপিশে তিনি আসতেন না, কিংবা কদাচ আসতেন ; অন্তত আমি তাঁকে কখনো সেখানে দেখিনি। হ্যারিসন রোডে তাঁর বোর্ডিঙের তেতলা কিংবা চারতলায় অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ করেছিলাম মনে পড়ে, আর একবার কলেজ স্ট্রীটের ভিড়ের মধ্যে আমরা কয়েকজন তাঁকে অনুসরণ করতে-করতে বৌবাজারের মোড়ের কাছে এসে ধ'রে ফেলেছিলাম। কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় এলেন একবার, মেঘলা দিনে মাঠের পথে ঘুরলাম তাঁর সঙ্গে ; পরে, তাঁর বিবাহের অনুষ্ঠানে, ঢাকায় ব্রাহ্ম সমাজে উপস্থিত আছি অজিত, আমি, অন্যান্য বন্ধুরা। কলিকাতায় চ'লে আসার পর রমেশ মিত্র রোডের একতলা ঠাণ্ডা ঘরে তাঁর সঙ্গে ব'সে আছি, শীতকাল, বিকেল হ'য়ে এলো। হঠাৎ চেয়ার-টেবিল ন'ড়ে উঠলো, আমরা বাইরে ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম, মিনিটখানেক পরে ফিরে এসে বসলাম আবার। পরের দিন কাগজে পড়লাম উত্তর বিহারে ভূমিকম্পের খবর।

কিন্তু এই সবই ঝাপসা স্মৃতি, এদের মধ্যে কোনো ধারাবাহিকতাও নেই। আসলে, জীবনানন্দর স্বভাবে একটি দুরতিক্রম্য দূরত্ব ছিলো—যে-অতিলৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতার, তা-ই যেন মানুষটিকেও ঘিরে থাকতো সব সময়—তার ব্যবধান অতিক্রম করতে ব্যক্তিগত জীবনে আমি পারিনি, সমকালীন অন্য কোনো সাহিত্যিকও না। এই দূরত্ব তিনি শেষ পর্যন্ত অক্ষুন্ন রেখেছিলেন ; তিন বা চার বছর আগে সন্ধেবেলা লেকের দিকে তাঁকে বেড়াতে দেখতাম—আমি হয়তো পিছনে চলেছি, এগিয়ে গিয়ে কথা বললে তিনি খুশিও হতেন, অপ্রস্তুতও হতেন, আলাপ জমতো না ; তাই আবার দেখতে পেলে আমি ইচ্ছে ক'রে পেছিয়েও পড়েছি কখনো-কখনো, তাঁর নির্জনতা ব্যাহত করিনি। কখনো এলে বেশিক্ষণ বসতেন না, আর চিঠিপত্রেও তাঁর সেই রকম স্বভাব-সংকোচ। যুদ্ধের তৃতীয় বা চতুর্থ বছরে একবার পাক্ষিক সাহিত্যসভার ব্যবস্থা করেছিলুম ; তাতে, এ. আর. পি.র কর্মভার সত্ত্বেও, সুধীন্দ্রনাথ মাঝে-মাঝে আসতেন, কিন্তু জীবনানন্দ এসেছিলেন একবার মাত্র ; এসে, একটি কবিতা পড়ার জন্য বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হ'য়ে, অথবা তারই ফলে, আমাদের একটু অপ্রস্তুত ক'রে দিয়ে আকস্মিকভাবে বিদায় নিয়েছিলেন। তাঁর মুখে তাঁর নিজের কবিতাপাঠ আমি কখনো শুনিনি, যদিও শুনেছি ইদানীং তরুণদের কাছে তাঁর সংকোচ কেটে গিয়েছিলো। অথচ, সেই 'প্রগতি'র সময় থেকে তাঁর সঙ্গে আমার সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাযুজ্য ছিলো বিরামহীন; দেখাশোনায় যেটুকু হয়েছে তার চাইতে অনেক বেশি গভীর ক'রে তাঁকে পেয়েছি তাঁর রচনার মধ্যে—যার অনেকটা অংশের সঙ্গে আমার পরিচয় প্রকাশের পূর্বেই ঘ'টে গেছে। এই সম্বন্ধ পঁচিশ বছরের মধ্যে শিথিল হয়নি ; 'কবিতা' প্রকাশের অন্যতম পুরস্কার ছিলো আমার পক্ষে একসঙ্গে তিনটি-চারটি

ক'রে পাঠানো তাঁর নতুন কবিতা পড়া ; আনন্দ পেয়েছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রুফ দেখে, 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালায় 'বনলতা সেন' প্রকাশে তাঁর সম্মতি পেয়ে, তাঁর বিষয়ে লিখে, কথা ব'লে, তাঁকে আবৃত্তি ক'রে। বাংলা কবিতার যতগুলো পংক্তি বা স্তবক আমার বিবর্ধমান বিস্মরণশক্তি এখনও হারিয়ে ফেলেনি, কিংবা পরিবর্তমান রুচি বর্জন করেনি, যেগুলোকে আমি বহু বছর ধ'রে অনেকটা রক্ষাকবচের মতো মনে-মনে বহন ক'রে আসছি, তার মধ্যে জীবনানন্দর পংক্তির সংখ্যা অনেক। সেই সব কবিতা বেঁচে আছে আমার মনে, অন্য অনেক পাঠকেরও মনে—ভাবী কালেও বেঁচে থাকবে ; তবু আজ এই কথা ভেবেই দুঃখ করি যে আমাদের পক্ষে স্বল্পপরিচিত সেই মানুষটিকে আর চোখে দেখবো না।

৪

জীবনানন্দর কবিতা নিয়ে ইতিপূর্বে কিছু-কিছু আলোচনা আমি করেছি ; আজ আবার প'ড়ে আরো কিছু নতুন কথা আমার মনে হচ্ছে। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে ইন্দ্রিয়বোধের আনুগত্যে তিনি অতুলনীয়, রূপদক্ষতাই তাঁর চরিত্রলক্ষণ—আর এ-সব কথা পাঠকমহলে যথেষ্টরকম জানাজানিও হ'য়ে গেছে এতদিনে। কিন্তু তাঁর কবিতার মধ্যে দুটি ধারা দেখতে পাওয়া যায়, তারা যেন পরস্পরকে পরিপূরণ ক'রে চলেছে। একদিকে আমরা রাখতে পারি যে-সব কবিতা বিশুদ্ধ বর্ণনার, অথবা স্মৃতিভারাতুর, অনুষঙ্গময়, নস্টালজিয়ায় পরাক্রান্ত ঃ যেমন 'মৃত্যুর আগে', 'অবসরের গান', 'হাওয়ার রাত', 'ঘাস', 'বনলতা সেন', 'নগ্ন নির্জন হাত'—পাঠক আরো অনেক জুড়ে নিতে পারবেন—আমি 'নির্জন স্বাক্ষর' বা '১৩৩৩' ধরনের প্রেমের কবিতাকেও এরই অন্তর্গত করতে চাই। অন্য দিকে আছে যে-সব কবিতা মননরূপী শয়তান অথবা দেবতার পরামর্শে লেখা, যেখানে লেখক বর্ণনার দ্বারা কিছু বলতেও চেয়েছেন, যেখানে কবির আবেগ বাইরের জগতে প্রতিরূপ খুঁজে পেয়েছে, চিন্তার সঙ্গে গ্রথিত হ'য়ে আরো নিবিড়ভাবে জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখ করবো 'বোধ', 'ক্যাম্পে', আর সেই লাশ-কাটা ঘরের আশ্চর্য কবিতাটি, যার নাম দেয়া হয়েছিলো 'আট বছর আগের একদিন'। 'কয়েকটি লাইন'কে বলা যায় 'বোধে'র সঙ্গী-কবিতা—দুটিই কবির স্বগতোক্তি—প্রথমটিতে কবি নিজের শক্তির বিষয়ে সচেতন হ'য়ে ঘোষণা করছেন তাঁর নূতনত্ব ('কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী,/আমি ব'হে আনি'), ব'লে দিচ্ছেন তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য কোনখানে ('উৎসবের কথা আমি কহি নাক',/পড়ি নাক' দুর্দশার গান/শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান'); আর দ্বিতীয়টিতে জীবনের সঙ্গে কাব্যের দ্বন্দ্বে পীড়িত তিনি, তাঁর 'বোধ' আর-কিছু নয়, তাঁরই কবিপ্রতিভা, যার তাড়নায় 'সকল লোকের মাঝে ব'সে/আমার নিজের মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা'। আবার, তাঁর আবেগরঞ্জিত বেদনাময় বর্ণনার কাব্যেও বিভিন্ন বিভাগ করা যায় ঃ প্রথমত, সান্ধ্য বা নৈশ কবিতা, বা যে-কবিতায় সকল সময়কেই সন্ধ্যার মতো মনে হয়, যেখানে আলো ম্লান, ছায়া ঘন, কুয়াশার পরদা ঝুলে আছে ('মাঠের গল্প', 'হায়, চিল', 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'শঙ্খমালা'); দ্বিতীয়ত, আলো যেখানে উজ্জ্বল আর প্রবল অবয়ব নিয়ে প্রকাশ পেয়েছে ('অবসরের গান', 'ঘাস', 'শিকার', 'সিন্ধু-সারস') আর তৃতীয়ত, যে-সব কবিতায় একাধারে স্থান পেয়েছে আলো আর অন্ধকার, রৌদ্র আর রাত্রি, কান্তি আর অবগুণ্ঠন। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিকে আমি ফেলতে চাই না, কেননা বাংলার

পল্লীপ্রকৃতির এই চিত্রশালাটিতে 'হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি'কে যদিও একবার দেখা যায়, আর 'ধানের গুচ্ছের মতো সবুজ সহজ' ভোরবেলাটিকেও চিনতে পারি, তবু এর পক্ষপাত নৈশতার দিকেই, পড়তে-পড়তে আমাদের মন বারে-বারেই ছায়াচ্ছন্ন গাঢ়তায় মন্থর হ'য়ে আসে। আমি ভাবছিলাম 'হাওয়ার রাত' বা 'অন্ধকার'-এর মতো কবিতার কথা, যেখানে তারা-ভরা অন্ধকারের কথা বলতে-বলতে কবির হৃদয় 'দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে' ভ'রে যায়, যেখানে 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে' কবি হঠাৎ 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে' জেগে ওঠেন, দেখতে পান 'রক্তিম আকাশে সূর্য' আর 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী'। ভাবছিলাম 'নগ্ন নির্জন হাতে'র বিস্ময়কর গঠনের কথা—কবিতাটির আরম্ভ অন্ধকারে, তার পটভূমিকাই ফাল্গুনের অন্ধকার, অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ' আমাদের মনে এমন একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অভিঘাত রেখে যায় যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলো ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ আছে। যেমন 'হায়, চিল'-এ দুপুরবেলাতেই সন্ধ্যা নেমে আসে, তেমনি 'হাওয়ার রাত' কবিতায় অন্ধকারটাই আলোর উল্লাসে উতরোল হ'য়ে উঠলো—'মৃত্যুর আগে'র ছবিগুলোর মতো এ-সব ছবি স্বপ্রতিষ্ঠ নয়, তারা কবির ভাবনা-বেদনারই প্রতিফলন।

৫

আলোচনার আরো অনেক ক্ষেত্র আছে। দেখানো যেতে পারে, বিদ্রূপের শক্তি তাঁর হাতে কী-রকম আত্মস্থ আর গম্ভীর হয়ে উঠেছিলো 'সোনার পিত্তলমূর্তি' অথবা 'অজর অক্ষর অধ্যাপকে'র উদ্দেশে লেখা পংক্তিগুলিতে,* কিংবা কেমন ক'রে আলোছায়ার দৃশ্যমান জগৎ থেকে তিনি স্বপ্নগোচর অতিবাস্তবের মায়ালোকে প্রবেশ করেছিলেন 'বিড়াল', 'ঘোড়া', 'যেই সব শেয়ালেরা' ধরনের কবিতায়। শেলি, কীটস, পূর্ব-ইএটস আর কোথাও-কোথাও সুইনবার্নকে তিনি কেমন ক'রে ব্যবহার করেছিলেন তা তুলনার দ্বারা দেখানো যেতে পারে; সহজেই প্রমাণ করা যায় যে ইএটস-এর 'O curlew'-র তুলনায় তাঁর 'হায়, চিল' অনেক বেশি তৃপ্তিকর কবিতা, আর 'The Scholars' সঙ্গে 'সমারূঢ়ে'র সম্বন্ধ যেমন স্পষ্ট, তার স্বাতন্ত্র্যও তেমনি নির্ভুল। 'ওড টু এ নাইটেঙ্গেল'-এর কোনো-কোনো পংক্তি 'অবসরের গান'-এ কেমন নতুন শস্য হ'য়ে ফ'লে উঠেছে, তাও সহজেই

* তাঁর মধ্য পর্যায়ের কবিতায় মাঝে-মাঝে একটি সংক্ষুব্ধ বিবমিষা লক্ষ্য করা যায়—আসলে তার আরম্ভ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সময়েই, সেই সময়েই 'অন্ধকার' কবিতা লিখেছিলেন, যেখানে 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবী'তে 'কোটি-কোটি শূয়ারের আর্তনাদে'র 'উৎসব' দেখে তিনি 'অন্ধকারের অনন্ত মৃত্যু'র ভিতর মিশে যেতে চেয়েছিলেন। তারই কিছুকাল পরে 'আদিম দেবতারা' কবিতায় ঘৃণা তীক্ষ্ণ হ'য়ে উঠলো:

> অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি?
> রূপ কেন নির্জন দেবদারু-দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনে না—
> পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
> স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হ'য়ে
> ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
> আগুন বাতাস জল, আদিম দেবতারা হো' হো ক'রে হেসে উঠল :
> 'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায়?

'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'-এর অনেক কবিতাতেই এই ঘৃণা বা বিদ্রূপের আঘাত পড়েছে : তাঁর প্রৌঢ় বয়সের রচনার মধ্যে এটিকে একটি প্রধান সুর বললে ভুল হয় না।

বোধগম্য। যদি কখনো কোনো পাঠক জীবনানন্দর অসংরক্ত, অ-মানবিক জগতে শ্রান্তি বোধ করেন, তাঁকে অনুরোধ করা যায় 'ক্যাম্পে' আর 'আট বছর আগের একদিন' পুনর্বার পড়তে—জীবনানন্দর সমগ্র কাব্যের মধ্যে এই দুটি কবিতা সবচেয়ে প্রাণতপ্ত ও স্তরবহুল ; এখানে তিনি মানুষের ঘুম আর জাগরণকে একই 'সচ্ছল'ভাবে মেনে নিয়ে তৃপ্ত হননি (জাগিবার কাল আছে—দরকার আছে ঘুমাবার ;/এই সচ্ছলতা আমাদের'), নিজের কথা নিজে লঙ্ঘন ক'রে উৎসবের কথা বলেছেন, ব্যর্থতার গানও গেয়েছেন। 'ক্যাম্পে' কবিতায় মৃগয়ার গল্প অবলম্বন ক'রে 'প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ' তুলেছেন তিনি, মানবিক প্রেমের, যৌন প্রেমের, যা ব্যাপ্ত হ'য়ে আছে 'কোথাও ফড়িঙে কীটে, মানুষের বুকের ভিতরে', যার ক্ষমতার চাপে ক্ষমতাশালী মাংসাশী শিকারীদেরও হৃদয়গুলো 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় মৃত মৃগদের' মতোই পাংশু হ'য়ে প'ড়ে থাকে। আর 'মৃত্যুকে দলিত ক'রে' 'জীবনের গম্ভীর জয়' তিনি প্রচার করেছেন 'আট বছর আগের একদিন'-এ। এই কবিতাটি এতই দ্যোতনাময় যে এটিকে ভাঁজে-ভাঁজে খুলে দেখালে আলোচনার সহায়তা হ'তে পারে। এ আরম্ভ—'শোনা গেল লাসকাটা ঘরে/নিয়ে গেছে তারে।' ক্রমশ আমরা জানতে পারলাম যে কোনো-এক পুরুষ উদ্বন্ধনে আত্মহত্যা করেছে—আর এই খবরটি শুনেই কবি অনুভব করলেন—মৃত্যুকে নয়, তাঁর চারদিকে চাঁদ-ডুবে-যাওয়া অন্ধকারে জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা'কে :

> তবুও তো পেঁচা জাগে ;
> গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে।
> আরেকটি প্রভাতের ইসারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।
>
> টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
> চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
> মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে!

মনে পড়লো বাঁচার ইচ্ছার, বাঁচার চেষ্টার অন্যান্য উদাহরণ

> রক্ত ক্লেদ বসা থেকে ফের রৌদ্রে উড়ে যায় মাছি ;
> সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কত দেখিয়াছি।...
> দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরণ
> মরণের সাথে লড়িয়াছে ;—

কিন্তু এই প্রাকৃত প্রেরণা মানুষের পক্ষে তো সর্বস্ব নয় ঃ

> চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারের তুমি অশ্বত্থের কাছে
> এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা একা ;
> যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাক' দেখা
> এই জেনে।

হয়তো গাছের ডাল প্রতিবাদ করেছিলো, ভিড় ক'রে বাধা দিয়েছিলো জোনাকিরা, থুরথুরে অন্ধ পেঁচা ইঁদুর ধরার প্রস্তাব এনে জীবনের 'তুমুল গাঢ় সমাচার' জানিয়েছিলো—কিন্তু চেতনার সংকল্পে প্রকৃতি বাধা দিতে পারলো না।

এর পর অনিবার্য প্রশ্ন—কেন মরলো লোকটা? কোন দুঃখে? কিসের ব্যর্থতায়? না—কোনো দুঃখই ছিলো না ; স্ত্রী ছিলো, সন্তান ছিলো, প্রেম ছিলো, দারিদ্র্যের গ্লানিও ছিলো না। কিন্তু—

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়—সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই...

যদি এই অচিকিৎসা জীবন-ক্লান্তিতেই কবিতার শেষ হ'তো, তাহ'লে এটি এত দূর পর্যন্ত আলোচ্য হ'তো না। কিন্তু ঠিক শেষের ক-লাইনেই আবার আমরা অন্য একটি স্বর শুনলাম—যেন একটি ঢেউ স'রে যেতে-যেতে দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো—কবি ফিরিয়ে আনলেন জরাজীর্ণ প্যাঁচাটাকে, যে আত্মহত্যায় বাধা দিতে পারেনি, কিন্তু জীবিতের কানে অবিরাম জ'পে যাচ্ছে তার প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ। আর এই প্রগাঢ় পিতামহীর দৃষ্টান্তেই কবি উদ্বুদ্ধ হলেন—'আমরা দু'জনে মিলে শূন্য করে চ'লে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'—মৃত্যু পার হ'য়ে বেজে উঠলো জীবনের জয়ধ্বনি, আর—সেই সঙ্গে—নির্বোধ ও পাশবিক জীবনের প্রতি চৈতন্যের বিদ্রূপ।

৬

তাঁর উপমা, বিশেষণ ও ভাষাপ্রয়োগ নিয়ে স্বতন্ত্র প্রবন্ধ রচিত হ'তে পারে। যেহেতু তিনি মুখ্যত ইন্দ্রিয়বোধের কবি, তাই উপমা তাঁর পক্ষে একটি প্রধান অবলম্বন, তাঁর হাতে বিশেষণও অনেক সময় উপমার মতো কর্মিষ্ঠ। 'শিকার' কবিতায় বত্রিশটি পংক্তির মধ্যে পাওয়া যাবে চোদ্দটি উপমা, 'মতো' শব্দের তেরো বার ব্যবহার; 'হাওয়ার রাত'-এ 'মতো'-র সংখ্যা আট। এতে যাঁরা আপত্তি করেন তাঁদের ভেবে দেখতে বলবো, বিভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তুলনা বা সমীকরণ ছাড়া বর্ণনার কোনো উপায় আছে কিনা, যে-কোনো কবিতায় কতখানি ছবি থাকে, আর কবি যদি জ্ঞানের ভাষায় কথা বলতে যান তাহ'লে তিনি কবি থাকেন আর কতটুকু। আর দুটি কথা বিবেচ্য ঃ জীবনানন্দ একটিও উপমা প্রয়োগ না-ক'রে 'আকাশলীনা' ('সুরঞ্জনা, ঐখানে যেয়ো নাকো তুমি') বা 'সমারূঢ়' ('বরং নিজেই তুমি লেখ নাকো একটি কবিতা')-র মত অজর কবিতা লিখেছেন ;* আর তাঁর অনেক উপমাই সরল বা আক্ষরিক নয়, তা থেকে নানা স্তরে নানা ইঙ্গিত বিচ্ছুরিত হ'তে থাকে, যেমন গানের পরে অনুরণন। কাস্তের মতো চাঁদ, রবারের বলের মতো বুক, বরফের কুচির মতো স্তন—এই সব উপমার উপর আমি জোর দেবো না, কেননা এদের নির্ভর শুধু চোখে-দেখা বা হাতে-ছোঁয়া সাদৃশ্যের উপর, তাঁর আগে কেউ ব্যবহার

* উপমা ও উৎপ্রেক্ষাকে আলাদা ক'রে দেখছি এখানে, উৎপ্রেক্ষা ও চিত্রকল্পেও তফাৎ আছে। 'হাঙরের ঢেউ' বা 'তোমার হৃদয় আজ ঘাস' বড়ো অর্থে উপমা বইকি, কিন্তু ব্যাকরণগত অর্থে নয় ; আর সেই বড়ো অর্থ নিলে এ-কথাই বলতে হয় যে কবিতার ভাষাই উপমা।

করেননি ব'লেই এরা স্মরণীয়। আমি উল্লেখ করবো আরো আগেকার লেখা একটি পংক্তি—

আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি, রঙিন—

পড়ামাত্রই আমাদের মনে যে নূতনত্বের চমক লাগে সেটা অচিরেই কাটিয়ে উঠে আমরা বুঝতে পারি যে এখানে ঠিক লাল রঙের চোখটাকে বোঝানো হচ্ছে না, সন্ধ্যারাগের মদির আবেশের দিকেই এর লক্ষ্য, আর সঙ্গে-সঙ্গে মনে প'ড়ে যায় গোধূলির সঙ্গে বিবাহ-লগ্নের সংযোগ। 'মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন'—এটা হ'লো চাক্ষুষ উপমা, কিন্তু সেই আগুনই যখন সূর্যের আলোয় 'রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' হ'য়ে যায়, তখন শুধু ফ্যাকাশে চেহারাটাই আমরা চোখে দেখি না, মনের মধ্যেও নির্বাপণের বেদনা অনুভব করি। কী উপমায়, কী বিশেষণে, একটি ইন্দ্রিয়ে আঘাত দিয়ে অন্য ইন্দ্রিয় জাগিয়ে তোলেন তিনি—'ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো পান' করতে হ'লে বর্ণ, গন্ধ আর আস্বাদকে পরস্পরের মধ্যে মিশিয়ে দিতে হয় ; 'বলীয়ান রৌদ্র' বললে রোদ যেন আয়তন পেয়ে ঋজু হ'য়ে দাঁড়িয়ে ওঠে, আবার সেই রোদকেই 'কচি লেবুপাতার মতো' নরম আর সবুজ বললে তাকে দেখা যায় তখনও-শিশির-শুকিয়ে-না-যাওয়া মাটির উপর সুগন্ধি হ'য়ে শুয়ে থাকতে। এরই পাশে-পাশে 'পরদায় গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের স্বেদ' আর সন্ধ্যাবেলায় 'জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীর' চিন্তা করলে রোদ বস্তুটাকে আমরা যেন কোনো স্থাপত্যকর্মের মতো প্রদক্ষিণ ক'রে-ক'রে দেখে নিতে পারি। তেমনি, রাত্রি কখনো 'বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে', কখনো 'জ্যোৎস্নার উঠানে খড়ের চালের ছায়া'টুকুর মধ্যে স্তব্ধ ও সংহত, কখনো 'নক্ষত্রের রূপালি আগুনে' উজ্জ্বল, আর কখনো দেখি সন্ধ্যার অন্ধকার 'ছোট-ছোটো বলের মতো' পৃথিবীর মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। যে-দুটো বস্তু স্বভাবতই খুব কাছাকাছি তাদের মধ্যে উপমাসম্বন্ধ অপ্রচলিত, কিন্তু জীবনানন্দ কখনো-কখনো তাদের একত্র ক'রে দুটোকেই আরো স্পষ্ট ক'রে ফোটাতে পেরেছেন ('কাঁচা বাতাবির মতো ঘাস', 'শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা'); আবার, যে-দুটো বস্তু অপরিমেয়রূপে অ-সদৃশ, তাদেরও একসূত্রে বেঁধে দিয়েছে তাঁর বিরাট কল্পনাশক্তি, যার ফলে আমরা পেয়েছি 'চীনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস', 'পাখির নীড়ের মতো' বনলতা সেনের চোখ, আর আত্মঘাতীর জানলার ধারে 'অদ্ভুত আঁধারে উটের গ্রীবার মতো কোনো এক' প্রবল নিস্তব্ধতা। এ-সব উপমা ইন্দ্রিয়ের সীমা অতিক্রম ক'রে ভাবনার মধ্যে আন্দোলন তোলে, সাদৃশ্যের সূত্রগুলি ছড়িয়ে পড়ে অনুভূতির রহস্যালোকে। বৌবাজারের নৈশ ফুটপাতে, যেখানে কুষ্ঠরোগী 'লোল নিগ্রো' আর 'ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবকে'র ছায়াছবির উপর ইহুদি গণিকার আধো-জাগা গানের গলা ঝ'রে পড়ছে, সেখানকার বাতাস নেহাৎই প্রাকৃত অর্থে শুকনো নয়, যুদ্ধকালীন বিশৃঙ্খলার চাপে দেশের মধ্যে সমস্ত রস শুকিয়ে গিয়ে চিনেবাদামের খোলার মতো শূন্য আর ভঙ্গুর হ'য়ে উঠলো, এই রকম একটা ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। কোনো মহিলার চোখের আকার নিশ্চয়ই পাখির বাসার মতো হয় না, কিন্তু ক্লান্ত প্রাণের পক্ষে কখনো কোনো চোখ আশ্রয়ের নীড় হ'তে পারে। যে-মানুষ আপন হতে মরতে চলেছে তার জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে দিলো 'উটের গ্রীবার মতো' নিস্তব্ধতা, এই অপরিচিত ও অপ্রত্যাশিত ছবিতে আসন্ন আত্মঘাতের আবহাওয়াটা আরো থমথমে ঘনিষ্ঠ হ'য়ে উঠলো। হয়তো এখানে আরো কিছু ইঙ্গিত আছে, এই 'উট' যেহেতু মৃত্যুর দিকেই প্রলুব্ধ করছে, তাই মনে হয় উপমাটি সেই প্রাচীন কাহিনী থেকে আহৃত, যেখানে উট এসে প্রথমে শুধু ঘাড়টুকু রাখার

অনুমতি চাইলো, তারপর প্রকাণ্ড শরীর নিয়ে সমস্ত ঘর জুড়ে গৃহস্থকেই বহিষ্কৃত ক'রে দিলে। অনেক বিশেষণও এই রকম মনস্তত্ত্বঘটিত : আত্মহত্যার উদ্‌যোগের সময় অশ্বত্থের 'প্রধান আঁধার', জীবনপ্রেমিক মশক-সংঘে সমাকীর্ণ 'যূথচারী আঁধার', শিকারের পরে শিকারিদের 'নিরপরাধ' ঘুম, 'প্রগাঢ় পিতামহী প্যাঁচা'র জীবনস্পৃহার 'তুমুল, গাঢ় সমাচার'।

'সমাচার' কথাটাও লক্ষণীয়। মিশনারিরা 'গসপেল'-এর আক্ষরিক অনুবাদ করেন 'সুসমাচার'—এ-কথা মনে রাখলেই ধরা পড়ে যে শব্দটিতে এখানে 'খবরে'র চাইতে অনেক বেশি কিছু বোঝাচ্ছে। শুধু বিশেষণ নয়, বিশেষ্যপদেও, আর সাধারণ ভাবে ভাষাব্যবহারে তাঁর দুঃসাহসী আক্রমণ বারে-বারেই রত্ন ছিনিয়ে এনেছে। বিদেশী শব্দ, গেঁয়ো শব্দ, কথ্য বুলি, অপ্রচলিত শব্দ, আর যে-সব শব্দকে আশাহীনরূপে গদ্য ব'লে আমরা জেনেছি—এই সব ভাণ্ডারের উপর সহজ অধিকার তাঁর কাব্যের একটি প্রধান লক্ষণ। ছন্দব্যবহারে বৈচিত্র্য নেই, আপাতরমণীয়তাও না, কিন্তু নেই ব'লে কোনো অভাববোধও নেই আমাদের ; যা আছে, তার সম্মোহন এত ব্যাপক যে তিনি আজকের দিনেও অনায়াসে এবং অনাক্রমণীয়ভাবে 'ছিল-দেখিল' মিল দিতে পেরেছেন, যা অন্য কোনো কবির পক্ষে সম্ভবই হ'তো না। তাঁর কাব্যের পাঠক শুধু বিশেষণের প্রভাবে আবিষ্ট হবেন বার-বার, শিহরিত হবেন পুনরুক্তির আঘাতে ('এইখানে সরোজিনী শুয়ে আছে, জানি না সে শুয়ে আছে কিনা' ; 'ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে যায় সবুজ বাতাস/অথবা সবুজ বুঝি ঘাস'), মুগ্ধ হবেন যখন হঠাৎ এক-একটি অত্যন্ত চেনা আর গদ্যধর্মী কথার প্রভাবে পুরো পংক্তিটি আলোকিত হ'য়ে ওঠে।

> আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
> বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝ'রে পড়ে তার,—
> শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে!

ভব্য সমাজে অনুচ্চার্য একটি ক্রিয়াপদের জন্যই হেমন্ত ঋতুর এই ছবিটি এমন উজ্জ্বল হ'তে পারলো। তেমনি, বিকেলের আলোর স্বচ্ছ গভীরতায়, শুধু বাইরের প্রকৃতি নয়—আমাদের হৃদয় সুদ্ধ ডুবে গেলো শুধু একটা 'মাইল' শব্দ আছে ব'লে—

> অকূল সুপুরিবন স্থির জলে আলো ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ
> হয়ে আছে।

দৃশ্যটিকে 'এক মাইলে'র মধ্যে সীমিত করা হয়েছে ব'লেই এখানে অসীমের আভাস লাগলো।

উদাহরণ আর বাড়াতে চাই না, কিন্তু এটুকু না-বললে আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ হয় না যে তাঁর কাব্যে গদ্য ভাষা এমনভাবে নিবিষ্ট হয়েছিলো যে রীতিমতো বিপজ্জনক শব্দও তাঁর আদেশে বিশ্বস্ত ভৃত্যের মতো কাজ ক'রে গেছে—

> হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু ক'রে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে
>
> প্রেম ছিল, আশা ছিল, তবু সে দেখিল
> কোন ভূত?

বলা বাহুল্য, 'ভূত' বা 'ঠ্যাং'-এর মতো শব্দের ব্যবহার অন্য যে-কোনো কবির পক্ষে হাস্যকর হ'তো।

৭

তাঁর অনন্যতা বিষয়ে অনেক পাঠকই আজকের দিনে সচেতন, আর তিনি যে আমাদের 'নির্জনতম' কবি, অত্যধিক পুনরুক্তিবশত এই কথাটার ধার ক্ষ'য়ে গেলেও এর যাথার্থ্যে আমি এখনও সন্দেহ করি না। 'আমার মতন কেউ নাই আর'—তাঁর এই স্বগতোক্তি প্রায় আক্ষরিক অর্থেই সত্য। যৌবনে, যখন মানুষের মন স্বভাবতই সম্প্রসারণ খোঁজে, আর কবির মন বিশ্বজীবনে যোগ দিতে চায়, সকলের সঙ্গে মিলতে চায় আর সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিতে চায় নিজেকে, সেই নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গের ঋতুতেও তিনি বুঝেছেন যে তিনি স্বতন্ত্র, 'সকল লোকের মধ্যে আলাদা', বুঝেছেন যে তাঁর গান জীবনের 'উৎসবের' বা 'ব্যর্থতার' নয়, অর্থাৎ বিদ্রোহের, আলোড়নের নয়—তাঁর গান সমর্পণের, আত্মসমর্পণের, স্থিরতার। 'পায়ের নখ থেকে মাথার চুল পর্যন্ত' রোমান্টিক হ'য়েও, তাই তিনি ভাবের দিক থেকে রোমান্টিকের উল্টো* ; আধুনিক বাংলা কাব্যের বিচিত্র বিদ্রোহের মধ্যে তাঁকে আমরা দেখতে পাই না। বস্তুত, তাঁকে যেন বাংলা কাব্যের মধ্যে আকস্মিকরূপে উদ্ভূত ব'লে মনে হয় ; সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের ক্ষণিক প্রভাবের কথা বাদ দিলে—তিনি যে মহাভারত থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত প্রবাহিত তাঁর পূর্বজ স্বদেশীয় সাহিত্যের কোনো অংশের দ্বারা কখনো সংক্রমিত হয়েছিলেন, বা কোনো পূর্বসূরীর সঙ্গে তাঁর একাত্মবোধ জন্মেছিলো, এমন কোনো প্রত্যক্ষ পরিচয় তাঁর কাব্যে নেই বললেই চলে। এ থেকে এমন কথাও মনে হ'তে পারে যে তিনি বাংলা কাব্যের ঐতিহ্যস্রোতের মধ্যে একটি মায়াবী দ্বীপের মতো বিচ্ছিন্ন ও উজ্জ্বল ; এবং বলা যেতে পারে যে তাঁর কাব্যরীতি—'হুতোম' অথবা অবনীন্দ্রনাথের গদ্যের মতো—একেবারেই তাঁর নিজস্ব ও ব্যক্তিগত, তাঁরই মধ্যে আবদ্ধ, অন্য লেখকের পক্ষে সেই রীতির অনুকরণ, অনুশীলন বা পরিবর্ধন সম্ভব নয়। পক্ষান্তরে, এ-বিষয়েও সন্দেহ নেই যে চলতিকালের কাব্যরচনার ধারাকে তিনি গভীরভাবে স্পর্শ করেছেন, সমকালীন ও পরবর্তী কবিদের উপর তাঁর প্রভাব কোথাও-কোথাও এমন সূক্ষ্মভাবে সফল হ'য়ে উঠেছে যে বাইরে থেকে হঠাৎ দেখে চেনা যায় না। বাংলা কাব্যের ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর আসনটি ঠিক কোথায় সে-বিষয়ে এখনই মনস্থির করা সম্ভব নয়, তাঁর কোনো প্রয়োজনও নেই এই মুহূর্তে ; এই কাজের দায়িত্ব আমরা তুলে দিতে পারি আমাদের ঈর্ষাভাজন সেই সব নাবালকদের হাতে, যারা আজ প্রথমবার জীবনানন্দর স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন করছে। আপাতত, আমাদের পক্ষে, এই কথাই কৃতজ্ঞ চিত্তে স্মর্তব্য যে 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে'র 'অগ্নিপরিধির' মধ্যে দাঁড়িয়ে যিনি 'দেবদারু গাছে কিন্নরকণ্ঠ' শুনেছিলেন, তিনি এই উদ্‌ভ্রান্ত, বিশৃঙ্খল যুগে ধ্যানী কবির উদাহরণস্বরূপ।

১৯৫৫

* অর্থাৎ, একে হিশেবে তিনি বাংলা কাব্যের প্রথম খাঁটি আধুনিক।

অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত

নির্জন নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ ধূসর স্তিমিত অবসন্ন—এমনিধারা বিশেষণে সাজিয়ে এ-ই এতদিন বোঝাবার চেষ্টা হয়েছে জীবনানন্দ মিশুক নয়, ঠোঁটে আঁকা মৃদু হাসির বাইরে সে হাসতে জানে না, গা ঢেলে আড্ডা দিতে জানে না, রাস্তায় পরিচিত লোক দেখলেই পাশ কাটিয়ে সরে পড়ে। একদল লেখককে বলতে শুনেছি জীবনানন্দ জীবন থেকে পালিয়েছে, আরেকদল বন্ধুদের মুখে কথা, মানুষ থেকে যেন তৃণতরুশূন্য বালির চরের ধারে জনশূন্য নৌকো বাঁধা। অবিশ্যি সূর্যের খাড়া আলোর কাছে এসে সে দাঁড়াতে চায়নি, কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসা দূরের কথা, ডিঙ্গি মেরেও দাঁড়ায়নি গলা বাড়িয়ে। এবং খড় বাঁধবার জন্যেই তার খড় দরকার তা সে খুঁজতে যায়নি কোনো ধান কাটা মাঠে। কিন্তু তাই বলে সে মনের অজ্ঞেয় ছায়াময় প্রান্তেই বাস করে গেছে এমন নয়। এমন নয় যে সে সাংসারিক অনুপাতেই সহজ-উচ্ছল ছিল না, এমন নয় যে সে তুলতে পারত না, উচ্চ হাসির নান্দীরোল। এমন নয় যে সে ছিল না প্রবলপ্রাণ বন্ধু, সুদূর থেকে জীবনের ধ্বনি-পাঠানো সমর্থতম সুহৃদ। আসলে মনের মানুষ, মনের মতন মানুষকেই খুঁজে ফিরছি আমরা, কখনো আভাসে-ইশারায় সে আলাপী চাহনিটি ভেসে এলেই সাড়া দিই, রক্তের রাখীবন্ধন হয়ে যায়, আবার যে-মুহূর্তে ঔদাসীন্যের রোদ এসে পড়ে চোখের পাতা দুটি বুজে আসে, আবার পরিচিত সুর শুনে সুপ্তোত্থিত হবার জন্যে।

জীবনানন্দের জীবন থেকে একগুচ্ছ রঙিন মুহূর্ত আমি আহরণ করে রেখেছি। কটি অন্তরঙ্গ রত্ন কণা। সেটা তখন কল্লোলের দিন। কল্লোলের মতই দুর্বার ছিলাম যার জন্যে শান্ততম জীবনানন্দও খিল দিয়ে রাখতে পারেনি দরজায়। ঢেউ যখন স্তব্ধ মাটির উপর আছড়ে পড়ে ঢেউও কিছু নিয়ে যায় মাটির থেকে। মাটির আর্দ্রতার সঙ্গে ঢেউয়ের উত্তালতার সৌহার্দ্য হয়। মাটির কাছেই ঢেউ তার মৌনের প্রধান দীক্ষা নেয়। তার সমস্ত উত্তালতার অন্তরে থেকে যায় একটি অনাহত নীরবতা। অন্তরের গহনগোপন মহারহস্য আবিষ্কার করতে হলে মাঝে মাঝে এসে বসতে হয় সমুদ্রের তীরে কিংবা খোলা আকাশের নিচে। আমাদের জীবনে জীবনানন্দই সেই সমুদ্রতীর, সেই অনবরুদ্ধ দীপ্ত আকাশ।

এক টুকরো নীলিমার মত একটি কবিতা উড়ে এসে পড়ল কল্লোলে। লেখক শ্রী জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। ঠিকানা? এক ডাকেরও পথ নয়। মাঝখানে বৈধতার চৌকাঠকে অটুট রেখে হৃদয়ের কারবার করতে হবে কল্লোলের সে-মন্ত্র ছিল না। বিনা সই-সুপারিশে সটান হাজির হলাম তার মেসে। দরজায় ধাক্কা দেবার সঙ্গে-সঙ্গেই হৃদয়ের কপাটও খুলে গেল। শুধু খুলে গেল বললে পুরো বলা হবে না। খোলার মধ্যে আবার বন্ধ হবার সংকেত আছে। ভেঙে চুরমার হয়ে গেল। নিরবকাশ হয়ে গেল। যুদ্ধের বছর দুই ছাড়া প্রায় দুই যুগ বাঙলা দেশের মফস্বলে ঘুরেছি, কিন্তু যখনই স্মৃতিভরে মধুর মন হাঁটতে চেয়েছে গত

দিনের ছায়া-ঢালা পথে তখন জীবনানন্দকেই যেন বেশি ক্ষণের সঙ্গী বলে টের পেয়েছি। জীবনানন্দেই যেন পেয়েছি বেশি আস্থা, বেশি অমলতা। কৃত্রিম সংসার সাফল্যের ঔদ্ধত্য তো ছিলই না, ছিলও না প্রতিভা-পাণ্ডিত্যের স্থবির কাঠিন্য, বিন্দুমাত্র কবিতার কৃপণতা। যেন তাকে দেখলেই, তার কথায়, দিগন্তপ্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে ভরে যাব। দেখতে পাব শিশুর ভরাট শুভ্রতা, ছুঁতে পাব মাঠ ভরা সিক্ত ঘাসের লাবণ্য, শুনতে পাব তরল জলের আদর-ভরা শীতলতা। 'অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ' ছাড়া যাদের আর কোনো সাধ নেই তাদেরও প্রতি তৃপ্তিময় ক্ষমা। শান্তির মধ্যেও যে উত্তেজনা আছে উদ্দীপ্তি আছে, সহিষ্ণুতার মধ্যেও যে সুস্থ বিহ্বলতা তা যেন জীবনানন্দেই সুতীব্র। দেখা নেই, দেখার দরকার হয় না, দেখার অতীতরূপে সে প্রত্যক্ষ। এক পথে তার হাঁটা-চলা নেই। তবু মনে হয় পাশাপাশি চলা ছাড়া আর পথও নেই। জিগগেস করেছিলাম, কি মানো? ভেবেছিলাম হয়তো বলবে, ঈশ্বর মানি। মৃদু হেসে বললে, মানুষের নীতিবোধ মানি। বললাম, ও একই কথা। মানুষের নীতিবোধ যা ঈশ্বরও তাই। বড় কথাটাকে সন্নিহিত করবার জন্যে সংক্ষিপ্ত করা জীবনানন্দ দাশগুপ্তকে বন্ধু বলে ডাকা। তখনকার দিনে আমাদের অবস্থা, ছাতাও নেই মাথাও নেই। আর জীবনানন্দ সিটি কলেজের অধ্যাপক, রোজগার করে, দস্তুরমাফিক 'অজর অক্ষর' সুগম্ভীর হবার কথা। কিন্তু, কি আশ্চর্য, একই মন যেন জলের মত ঘুরে-ঘুরে দুজনের বুকের মধ্যে একা একা কথা কয়ে উঠেছে। জল যখন একই তখন একা-একা কথা কওয়াও একই কথা। দুজনে বেড়াতে গিয়েছি চৌরঙ্গি ছাড়িয়ে গড়ের মাঠের দিকে, মাঝে ইণ্ডোবর্মায় চা-চপ-কাটলেট খেয়ে নিয়েছি, জীবনানন্দই খাইয়েছে। এক-এক দিন বা তার পিছু নিয়ে তাকে ধরে ফেলেছি রেস্টোরেন্টে, তাকে চমকে দিয়েছি তার পাশে বসে। সুপ্তোত্থিত শিশুর মত সহাস্য মুখে আমন্ত্রণ করে নিয়েছে। রূঢ় হস্তক্ষেপ করে ভাগ বসিয়েছি তার খাবারের প্লেটে। তার হৃদয়ের ভাঁড়ারে। হস্তক্ষেপ রূঢ় কিন্তু যে-স্বাদু খাদ্য কেড়ে নিয়েছি তার নাম মমতা। অফুরন্ত মমতা। বিনিময়ে কিছু দিতে পারছি কিনা তার হিসেব করিনি। এ যেন 'আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।'

আরো কতবার টুকরো-টুকরো দিনে খুচরো-খুচরো দেখা হয়েছে তার সঙ্গে। তার স্বপ্নময়তাকে ভাঙতে গিয়ে নিজেই তার ছোঁয়াচ নিয়ে এসেছি। সাংসারিক জিজ্ঞাসার প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি তার মহাজিজ্ঞাসার মুখোমুখি। 'অন্ধকার সনাতনে ডুবে যাওয়া কিন্তু মরণের ঘুম নয়।' আরো একবার তার হৃদয়ের কাছে স্তব্ধ বোঝাপড়ায় ঘন হই যখন প্রায় দশ বছর আগে নদীনালার দেশে বরিশালে তার বাড়িতে এসে উঠি এক বেলার কটি বৃষ্টিভেজা সবুজ মুহূর্ত হাতে নিয়ে। মনে আছে আর-আরদের সঙ্গে দুটি তরুণ লেখকও সেদিন আমাদের ঘিরে বসেছিল—অরবিন্দ গুহ আর আবুল কালাম শামসুদ্দীন। একটা সভামতন হয়েছিল কোথায়। চিরদিন যে সভাসমিতিকে এড়িয়ে গেছে তাকে সেদিন নিয়ে গিয়েছিলাম দলের মধ্যে, যতদূর মনে পড়ে প্রাণখোলা প্রচুর হাসি সে সেদিন ছড়িয়ে দিয়েছিল মুঠো মুঠো। যদিও, যতদূর জানি, সিগারেট খেত না, সেদিন কিসের আনন্দে ছেলে মানুষের মত পাখির মতন ঠোঁটে টেনেছিল একটা সিগারেট। সেসব কথা অরবিন্দর ভালো মনে থাকবার কথা। আমাকে একবার বলেওছিল অরবিন্দ সে কাহিনী সে লিখবে। হয়তো লিখেছিল কিন্তু ছাপতে পারেনি।

সেদিন বরিশালের নদী, ঘাসভরা মাঠ, ঝাউগাছ, বেতবন, লাশ-কাটা ঘর, স্টিমারের জেটি, মশা মাছি পেঁচা ইঁদুর—সব মিলিয়ে জীবনানন্দকে যে অনুভব করেছিলাম সেটিই

তার মৃত্যুর পরেকার অদ্ভুত অন্ধকারে অন্তহীন নক্ষত্রের আলো ফেলে জেগে রয়েছে, থাকবে।...

জীবনই দূরে ঠেলে দেয়, মরণ কাছে নিয়ে আসে। জীবনের ছোট ছোট কুশকণ্টকের আঘাতে জীবনানন্দ বিক্ষত ছিল কিন্তু তার উর্ধ্বে একটা বড় দুঃখের সুখের জন্যেই তার বলিষ্ঠ মনের নৌযাত্রা। সেই বড় দুঃখের অপ্রমত্ত আনন্দেই ছোট দুঃখের দংশনগুলি ঘুমিয়ে ছিল। 'অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ।' সুখের অতৃপ্তির পরিবর্তে এই অমোঘ আমোদেই জীবনানন্দ বীর, চরিতার্থ।

কলেজের ছেলেরা সভা করতে চেয়েছিল, বলেছিল ছুটি চাই, বাংলার অধ্যাপককে বললে, আপনি সভাপতি। কিসের সভা? জীবনানন্দের জন্যে শোকসভা। কে জীবনানন্দ, সরাসরি বলতে পারতেন অধ্যাপক, কিন্তু ভালো শোনাতো না। তাই বললেন, আমি যে ওঁর লেখা কিছু পড়িনি। না-পড়েছেন না পড়েছেন, জীবন ও আনন্দ সম্বন্ধেই বলবেন না-হয় কিছুক্ষণ।

কিছুক্ষণ নয়, সমস্তক্ষণ। জীবনানন্দ সেই জীবন ও আনন্দের সমাচার। তার চেয়েও বড় কথা, জীবন ও আনন্দের সমাহার।

বেদনার সম্বন্ধ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

ফাল্গুনের প্রথম সপ্তাহে জীবনানন্দ দাশের জন্ম। নব ফাল্গুনের এই জাতক মৃত্যুমুখে পতিত হন দশ বছর আগে, হেমন্ত-সময়ে। আশ্চর্য, মৃত্যুতেই তিনি স্মরণীয় হলেন।

আজ দশ বছর জীবনানন্দকে দেখি নে। বেঁচে থাকলেও তাঁর সঙ্গে যে রোজই দেখা হত, তা নয়। শেষ দিকে তিনি ল্যান্সডাউন রোডে থাকতেন—বসন্তের জাতক দক্ষিণই ভালোবাসতেন। আমি মধ্য কলকাতায় গণেশচন্দ্র এভিনিউতে,—পূর্বাশা-লিমিটেডকে বঙ্গ সংস্কৃতির মধ্যমণি করবার দুরাশায়। ইতর ভাষায় বলা যায়, 'পূর্বাশা'র গণেশ উল্টোবার ব্যবস্থাপনায়। পথের দূরত্বের জন্যে দেখা হত না। তবে আমরা দু'জনেই একটা ব্যাপারে খুব কাছাকাছি ছিলাম, তা হল আর্থিক দুঃস্থতা। তাছাড়া, তখনও আমি 'পূর্বাশা'র সম্পাদক আর তিনি 'পূর্বাশা'র শ্রদ্ধাভাজন কবি।

আজ যদি নিজেকে প্রশ্ন করি : এ কি আমার শ্রদ্ধার অভাব যে জীবনানন্দের ল্যান্সডাউনের ফ্ল্যাটে আমি মাত্র একদিন গেছি? উত্তর পাব, সোচ্চার, না। আমার রজোগুণের অভাব এবং পয়সার অভাব কলকাতা-প্রবাসের ক্রনিক ব্যাধি হতে পারে, কিন্তু জ্যেষ্ঠ কবিদের প্রতি, তরুণবয়স্ক সম্পাদক যেকালে ছিলাম তখনও, মনে অশ্রদ্ধা পোষণ করি নি। আজ বার্ধক্যের কাছাকাছি এসে যদি তা করি, তাহলে বলতে হবে তা সময়ের দোষে। শ্রদ্ধাহীন, অশ্রদ্ধেয় অজ্ঞানী সময় চলেছে এখন— ১৯৫৪-৫৫ সালে। নব পর্যায় 'পূর্বাশা' দশ বছর পর প্রকাশারম্ভ করে দেখছি। ভালোই হয়েছে যে, জীবনানন্দকে শ্রদ্ধাহীনতার মারীতে মরতে হয় নি। যদিও, বাংলার বসন্তের মতো শ্রদ্ধাহীনতার রোগ জীবনানন্দকে জীবিতকালেই আক্রমণ করেছে। দেখা-শোনা যখন নিয়মিত হত না, তখন চিঠিই ছিল সান্নিধ্যলাভের উপায়। চিঠি-সংরক্ষণ ব্যাপারে অচিন্ত্য-প্রতিভা আমার নেই। রবীন্দ্রনাথের চিঠিও আমি হারিয়েছি—জীবনানন্দেরও। স্বরচিত কবিতার মতো অপরের চিঠি একদিন মাত্র আমার চোখে জীবন্ত থাকে— তারপরই মৃত। পুরনো চিঠির একটা খামে যেসব চিঠি আজ পাচ্ছি, তা 'পূর্বাশা'র প্রকাশক ও তাঁর অনুজরা রক্ষা করেছেন। বলতে গেলে, ১৯৫৪-র পর দশ বছর আমি স্বপ্নাবিষ্টই ছিলাম : আমার চারপাশের মানুষজন, বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, কিছুই আমার কাছে সত্য বলে মনে হত না। ফলে, জীবিত জীবনানন্দর চিঠিগুলো আমার চোখে মৃত, আর জীবনানন্দ হল আমরা চোখে স্বপ্ন। সার্ত্রীয় অস্তিত্ববাদের আগে রচিত জীবনানন্দের এই পংক্তি : 'মরণের হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে' আজ—কী যে জীবন-সত্য বলে মনে হয়, তা যদি ১৯৪০-এ মনে হত, যখন আমি প্রথম 'নিরুক্ত'- কবিতা পত্রিকায় জীবনানন্দের কাব্যালোচনা করি! অবশ্য সেই অপটু আলোচনাই

বরিশাল আর কলকাতার মধ্যে সেতু হল, জীবনানন্দের হার্দ্যদর্শন পেলাম প্রথম। আমার গৌরব এই : সেই প্রথম দর্শন থেকে তিনি আমার সমালোচনা চৌদ্দ বছর বরাবর কামনা করে এসেছেন।

আর শেষ দর্শন? ১৯৫৪। সে-বছরের চারটি চিঠিতে এখন তাকে দেখছি স্বপ্নের মতো। স্বপ্নের নীল আলোর মতো নীল কাগজে, নীল কালিতে যে দুটো চিঠি, তা-ই তাঁর পাঠকের জন্যে এ-রচনায় সন্নিবেশিত করছি। তাঁর ভক্ত-পাঠক কবিদের মধ্যে অনেক আছেন। তাঁরা আমার কাছে জীবনানন্দের কথা শুনতেও চান।

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা-২৬
১৭.৫.৫৪

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি ও বৈশাখের 'পূর্বাশা' পেয়েছি; অনেক ধন্যবাদ।

'পদাবলী' পড়লাম। বেশ ভালো লাগল ; খুব মৌলিক লেখা মনে হল ; আপনার আগেকার লেখার চেয়ে এ কবিতাগুলো একেবারে বিভিন্ন। আপনার পাণ্ডিত্য, মনের বিস্তৃতি ও গভীরতা এসব রচনার নানা জায়গায়ই স্পষ্ট হয়ে আছে।

পূর্বাশার জন্যে এ সঙ্গে একটি কবিতা পাঠালাম। সুযোগ পেলে পরে একদিন দেখা করতে পারব আশা করি। পূর্বাশাকে আমি ভালোবাসি। কাগজ-ছাপা এবারে বেশ ভালো হয়েছে।

আপনারা কি কবিরসাহেবকে আমার কথা বলেছিলেন? বাড়ি নিয়েও বড় মুস্কিলে আছি। তারাশঙ্করবাবুর সঙ্গে দেখা করব? এসব বিষয় নিয়ে আপনাদের সঙ্গে গিয়ে আলোচনা করতে পারি : কিংবা আপনি চিঠি লিখেও জানাতে পারেন। খুব জরুরি।

আশা করি ভালো আছেন। প্রীতি নমস্কার। ইতি—

জীবনানন্দ দাশ

প্রথম দিকের 'পদাবলী' আমার পঞ্চাশের দশকের কবিতার সঙ্কলন-গ্রন্থ। এই মৃত কবিতাগুলো দুজন মৃত কবিরই ভালো লেগেছিল : জীবনানন্দ এবং সুধীন্দ্রনাথ। যাঁরা বেঁচে আছেন, তাঁদের জন্য কবিতাগুলো নয় বলেই হয়তো 'পদাবলী'র পুনর্মুদ্রণ হয়নি। যাক্, সে কথা। 'পূর্বাশা' আবার প্রাকশিত হচ্ছে। সম্পাদকের আর প্রকাশকের মনে কি আজ ধ্বনিত হচ্ছে না : 'পূর্বাশা'কে আমি ভালোবাসি—জীবনানন্দের কণ্ঠ? পরম-পুরুষজানিত অচিন্ত্যকুমার জীবনানন্দের মৃত্যুর সকালে বলেছিলেন, 'পূর্বাশা' নাকি আমার বৌ। সে বৌ কিন্তু জীবনানন্দের সহমরণেই গিয়েছিল। সে-সতীর প্রাণ নিয়ে যদি নবপর্যায়ে পার্বতীর মতো পূর্বাশা জন্ম নিয়ে থাকে—সে আজ বনলতা সেনের কণ্ঠে বলতে পারে : জীবনানন্দকে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিলাম।

আমার চোখে এ চিঠি থেকে যে-জীবনানন্দ উঠে আসছেন, তিনি একাডেমি প্রাইজের উমেদার নন। তিনি নিঃসঙ্গও নন—বন্ধু-সন্ধানী। কিন্তু তাঁর সঙ্গে বন্ধুর পথে চলবে, তেমন বন্ধু কেউ নেই। চিঠি-পাওয়ার দিনে জীবিত জীবনানন্দের এই ছবিই আমার মনে

ভেসে উঠেছিল। আজ যদি সেই ছবি ম্লান হয়ে থাকে, মৃত জীবনানন্দকে একাডেমি প্রাইজ দিয়ে নাবালক করা হয়েছিল বলে। তবু, তাঁর সঙ্গে শেষ দেখার সূচনার শোচনীয় দিনগুলোই আমি স্মরণ করছি। মনে ভেসে উঠছে একটি মূর্তি : দৃঢ়তা-ব্যঞ্জক চাপা ঠোঁট, ঊর্ধ্বে দৃষ্টি। আর কপালে রাজদণ্ড! জীবিত অবস্থায় প্রার্থনায়ও যিনি পাঁচশ' টাকা পান নি, মৃত্যুর পর তাঁর নামে পাঁচ হাজার টাকার পুরস্কার-ঘোষণার আর বিড়ম্বনা কেন।

জীবনানন্দের সঙ্গে আমার সম্বন্ধ বেদনারই—আনন্দের নয়। সে-বছর শারদীয়া পূর্বাশায় তাঁর কবিতার আনুষঙ্গিক চিঠিই তাঁর শেষ চিঠি। মৃত্যুর পূর্বাভাস সে-চিঠিতে ছিল :

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা-২৬
৪.৯.৫৪

প্রিয়বরেষু,

আপনার চিঠি যথাসময়ে পেয়েছি। শারদীয়া 'পূর্বাশা'র জন্যে এই সঙ্গে একটি কবিতা পাঠালাম। ভালো করে প্রুফ দেখা দরকার। আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।

আশা করি ভালো আছেন। অনেকদিন থেকে আমাব শরীর বিশেষ অসুস্থ। শুভাকাঙ্ক্ষা ও প্রীতিনমস্কার জানাচ্ছি।

ইতি—
জীবনানন্দ দাশ

চিঠি পেয়ে তাঁর অনিবার্য অসুস্থতার কথাই ভেবেছি কিন্তু সেই সঙ্গে মনে পড়েছে, অসুস্থতা নিয়ে আমার চিঠির উত্তর রবীন্দ্রনাথের পর এই জীবনানন্দই দিতেন।

১৩৬১ বাংলার শারদীয়া পূর্বাশা জীবনানন্দের পত্রোক্ত কবিতা দিয়ে আরম্ভ। পূর্বাশায় তা-ই তাঁর শেষ কবিতা। আশ্বিনে সে-কবিতা ('অবিনশ্বর') বেরোয়, কার্তিক সংখ্যাতেই তাঁর মৃত্যুতে একটি 'স্মরণীয়ম্' কবিতাগুচ্ছ দিতে হয়।

'অবিনশ্বর' লৌকিক মুক্তক ছন্দে রচিত ছয়টি স্তবকের কবিতা। স্তবকগুলো উদ্দিষ্ট এক শাশ্বতী অশনায়ার প্রতি যার ক্ষুধার গ্রাস মানবমাত্রেই। প্রাচীন ভারতের ভাবের ভাণ্ডার থেকে এ-রত্নটি তুলে কাব্যোপযোগী এবং সময়োপযোগী করবার ক্ষমতা সুধীন্দ্রনাথকে ছেড়ে দিলে এক জীবনানন্দেরই ছিল। রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার এ-দুটি স্তম্ভই যখন আজ ধূলিসাৎ, তখন যে আবোল-তাবোলই কাব্য-সম্মানে অভিনন্দিত হবে তাতে আমি অন্তত বিস্মিত নই। যাক্, এ-কবিতায় আমি মৃত্যুপথযাত্রী জীবনানন্দকেই দেখেছিলাম—আনুষঙ্গিক চিঠির 'অনেকদিন থেকে আমার শরীর বিশেষ অসুস্থ' কথাটির সঙ্গে মিলিয়ে। হেমন্তের কবির 'অবিনশ্বর'-এর প্রথম দুটি স্তবক এই :

তার সাথে আজ সাত আট বছর পরে—অঘ্রানে
কলকাতার এই টিউব আলো নীয়নদীপের রাতে
দু-চার মিনিট দেখা হল... কথা বলা হল :
ঘরে ফেরার আগে কিছু সময় কাটাতে।

স্বচ্ছ ধ্রুব সহজ স্বভাব কথা
বলা হলে ভাবছি ভালো হত,
কথা আরো গভীর ভাবে চেতন হত যদি ;
শব্দ কথা ভাষা—সবই সেই নারীকে লক্ষ্য করে বলে
সফল হওয়া সহজ—তবু প্রতীক্ষা চাই মৃত্যু অবধি।

সেই মৃত্যুকন্যার সঙ্গে তো জীবনানন্দের আজীবনই মুহূর্তে মুহূর্তে দেখা হয়েছে এবং তাঁর কথাও তাই সফল। শেষ দেখার পর, ওমর খৈয়ামের ভাষায় বলছি, সে-ও নেই, জীবনানন্দও নেই।

জীবনানন্দকে চিঠিতে, কবিতায়, আকাশবাণীর কবিসভায়, মৃত্যুশয্যায় ও শবশয্যায় শেষ-দেখাগুলো দেখবার প্রতিক্রিয়ায় মনে যে আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল তার ছবি 'স্মরণীয়ম্'-এর একটি কবিতায় (পূর্বাশা—কার্তিক, ১৩৬১) ধরা আছে—আজকের চোখে সেই খোলা মন দেখতে পাচ্ছি। দ্বাদশপদী কবিতা :

তুমি ঘুমে কেঁদে ওঠো বলে আমি অপরাধে জাগি
কোনো অন্ধকার ভ্রূণে, নারীর অথবা পৃথিবীর।
সেখানে হয়তো অনুরাগী
সব আলো অপরাধে, কালোর শিবির
ক্রিমি-নীল জেনেও যেখানে।
আলোর দোকানে আলো পায় না দেখার কোনো মানে
মৃত্যুর বিমর্ষ-অমাবস্যা-অপরাধ ছেড়ে এলে।

যা-যা দেখে কেঁদে ওঠো সব শিশু-চোখে অন্ধকার
অপরাধ-চিহ্নময় খানিক অঙ্গার—
নেভানো জীবন্ত মায়ালিপি-ঝলমল লেখা জ্বেলে।

সান্ত্বনার ভঙ্গী চীনাংশুক
পুরাতন রৌদ্রে মেলা বেনিশানা নতুনের নিশানার সুখ।।

আমি শঙ্করের মায়াবাদ প্রত্যক্ষ করছিলাম। যেমি এ-কবিতায় তার আভাস আছে তেমি 'বৌ'-কবিতায় (বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত তদানীন্তন 'কবিতা' ত্রৈমাসিকে প্রকাশিত এবং 'উর্বর-উর্বশী'তে 'প্রজ্ঞাপারমিত' শিরোনামায় ব্যবহৃত)। শম্ভুনাথ হাসপাতালে সুধীন্দ্রনাথের সঙ্গে মুমূর্ষু জীবনানন্দকে শেষ দেখা দেখে যে-মন নিয়ে গণেশ এভিনিউতে ফিরেছিলাম, সে-মনেই জীবনানন্দের মৃত্যু-রাত্রির কবিতা লেখা হয়েছিল : 'একটি জাহাজ ছেড়ে গেল'। জীবনানন্দের শ্রাদ্ধবাসরে কবিতাটি পড়েছিলাম ('উত্তর-পঞ্চাশ' গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট)।

কিন্তু জীবনানন্দের শেষ চিঠির দেখা, আর মৃত্যুরাত্রির সন্ধ্যায় শেষ দেখার মাঝখানে অসুস্থ জীবনানন্দের সঙ্গে আমার আরেকটিবার দেখা হয়েছিল : 'আকাশবাণী'র পুরনো বাড়িতে 'কবিসভা'য়। তখন তিনি কায়মনে অসুস্থ। কিন্তু সভায় গিয়েছিলেন, সম্ভবত শুধু প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে দেখা হবে বলে। তিনি কবিসভায় আহূত ছিলেন। কিন্তু জানি নে, কী

কারনে তিনি অনুপস্থিত। সে সভা ছিল প্রবীণ কবি করুণানিধান-কুমুদরঞ্জন-কালিদাস রায় থেকে ত্রিশের দশকের কবিদের কবিতা পাঠের আসর। সেই কবিসভায় আমিও যোগ দিয়েছিলাম। জীবনবাবু আর কারো সঙ্গেই কথা বলছিলেন না, বার বার শুধু আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন ঃ 'প্রেমেন এলো না কেন?' প্রেমেন্দ্র মিত্রর উপর তেমন নির্ভরই জীবনানন্দ করতে চেয়েছিলেন, আমার কাছে লেখা শেষ চিঠিতে তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়ের উপর যেমি করতে চেয়েছেন। ওটা বাড়ির ঝঞ্ঝাট মেটাবার জন্যে। আমি জীবনানন্দের সেই উদ্‌ভ্রান্ত অন্যমনস্ক দৃষ্টিতে আহত হয়েও ভাবতে পারি নি যে তাঁর শেষ দিন আসন্ন। এই সাংঘাতিক অন্যমনস্কতাই তাঁর কাল হল—বাড়ির সামনেই তিনি ট্রাম চাপা পড়লেন।

অন্যমনস্ক জীবনানন্দ এম্নিতেই একটু ছিলেন। রাস্তায় বুদ্ধদেব বসু পেছন থেকে ডেকে তাঁর সাড়া পাননি—এমন ঘটনাও আছে। পাশাপাশি গণেশ এভিনিউতে হেঁটে দেখেছি, একটি কথাও বলছেন না বা হঠাৎ কী মনে হওয়াতে জোরে হেসেই উঠলেন হয়তো। হয়তো এই ভাবনাই মনে আসত তাঁর ঃ 'ক্রমেই বয়স বাড়ে—সবই ছড়িয়ে পড়ে নশ্বরতার দেশে' (অবিনশ্বর)। আর হঠাৎ হাসির ঝলকানি ছিল এ ভাবনায় ঃ 'হয়তো সত্য আলো' (অবিনশ্বর)।

'হয়তো সত্য আলো'-র মতো কিছু কথায় জীবনানন্দের এক শোক-সভায় ফাদার ফাঁলো আমাকে বলেছিলেন, জীবনানন্দ একটা বিশ্বাসে ফিরে আসছিলেন, তাই না? আমি তা মানতে রাজ হইনি। জীবনানন্দের সাহচর্যে (শেষ চৌদ্দ বছর) এসে আর যা-ই বুঝি বা না-বুঝি, এটুকু বুঝেছি যে তিনি প্রগাঢ় যুক্তিবাদী। শেষ পর্যন্ত তাঁর দার্শনিক মন 'আলো-কালো'র দ্বৈতবোধে এসে পৌঁছেছিল (অবিনশ্বর) এবং স্পষ্টতই তিনি জ্যোতির্বিদ ওমর খৈয়ামের চিন্তায় চলে গিয়েছিলেন। যেমন ঃ

কোথায় তুমি রয়েছে কোন পাশার দান হাতে
কি কাজ খুঁজে (অবিনশ্বর)

তাই মর্তের পানশালাকেই অবিনশ্বর ভেবে পিঙ্গলা অশনায়া সাকীর হাতে মৃৎপাত্র থেকে বিষ পান করে গেছেন ('তুমি....মাটিরই ক্রীড়াভূমি'—অবিনশ্বর)।

শম্ভুনাথ হাসপাতালে তিন দিন সেই অকপট নীলকণ্ঠকেই দেখতে গিয়েছিলাম। আমাদের তরফ থেকে সেবার ভার গ্রহণ করেন শ্রীমান ভূমেন গুহ প্রমুখ কয়েকজন মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র। জীবনানন্দ হাসপাতালে প্রথম দেখায় বলেছিলেন আমায় ঃ এখানে ভালো লাগছে না। একটা কমলালেবু খেতে পারব? (গান্ধীজির সঙ্গে শেষ দেখায় গান্ধীজির হাতে যে কমলালেবু দিয়েছিলাম, সেই গল্পই কি জীবনানন্দের কাছে কোনদিন করেছি? নাকি তিনি নিজের কবিতার কমলালেবুই ভাবছিলেন?)। দ্বিতীয় দিন দেখায় বলেছিলেন ঃ ডক্টর রায় এসেছিলেন। পূর্বাশা-লিমিটেডের ম্যানেজিং ডিরেক্টর ও 'পূর্বাশা'র প্রকাশক তদানীন্তন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর রায়ের প্রাইভেট সেক্রেটারি ও সজনীকান্ত দাসকে টেলিফোন করে হাসপাতালে ডক্টর রায়কে নেওয়াবার ব্যবস্থা করেন, যাতে হাসপাতালে চিকিৎসার সুব্যবস্থা হয়। সবান্ধব ভূমেনের সঙ্গে পূর্বাশার প্রকাশকও জীবনানন্দের মৃত্যুশয্যায় ছিলেন। একা, গণেশ এভিনিউর ফ্ল্যাটে, রাত্রি দশটায়, মেঝেতে

মাদুর বিছিয়ে আমার মনে হয়েছিল, মর্তের বন্দর থেকে একটি জাহাজ শান্তি-পারাবারে চলে গেল। লিখেছিলাম : 'একটি জাহাজ ছেড়ে গেল ...।'

সাহিত্যিক বিরোধিতা সত্ত্বেও সজনীকান্ত জীবনানন্দের শেষকৃত্য পর্যন্ত যে আন্তরিক সহযোগিতা দেখিয়েছেন এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্তের যে বিমূঢ় ভাব দেখেছি শেষ দু'দিন, তা আমার মনে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবে এজন্যে যে জীবনানন্দ এঁদের উপর কোনদিন নির্ভর করেন নি।

মৃত মুখ আমাকে কাঁদায়। জাগ্রতে, স্বপ্নে বা স্মৃতিতে—যেখানেই তার উপস্থিতি দেখি, খুবই প্রাঞ্জলভাবে খানিকটা প্রাণ যেন জল হয়ে চোখ দিয়ে বেরিয়ে আসে। তা থেকে আমি এই ব্যক্তিগত সত্যে এসেছি (কবি-সত্যও তাকে বলা যায়) ঃ প্রত্যেকটি মৃত্যুর সঙ্গে আমরা মৃত্যুর কাছাকাছি যাই।

এ-শতকের প্রথমার্ধে আমরা যারা সাবালক হয়েছি, তাদের যদি আজকের দিনের প্রাপ্ত-বয়স্করা মৃত ব'লে আখ্যা দেয় তাহলে আমাদের দুঃখ করবার কিছুই নেই। অনেক মৃত্যু পার হয়ে এসেছি আমরা, অনেক শেষ দেখায় প্রাণ বিনিময় করে এসেছি, স্বদেশী সন্ত্রাসবাদে, মারীতে, মন্বন্তরে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে, দাঙ্গায় তিল তিল প্রাণাশ্রু দিয়ে যদি মৃত্যুই হয়ে থাকে আমাদের তাহলে সে মৃত্যুর দিনগুলো ছিল আজকের দিনের মহানগরবাস বা জীবিতের মহানরকবাসের চাইতে ঢের রমণীয়।

শেষ দেখার দিনগুলো থেকে জীবনানন্দ আমার চেতনায় স্বপ্ন—তাঁর ছবি আমার কবিতা।

তিন দিনের পরিচয়েই আমরা ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম

অরুণ মিত্র

আজও জীবনানন্দের কথা উঠলে এক অভাব বোধের বিষাদ আমার মনকে আচ্ছন্ন করে। তাঁর অল্পকালের সখ্য আমার স্মৃতিতে আমি একান্ত যত্নে সংরক্ষিত রেখেছি। বড় বিলম্বে তার সূচনা, আর অবিলম্বে সমাপ্তি।

আক্ষরিক অর্থেই আমাদের আলাপ মাত্র তিনদিনের। কিন্তু সেই স্বল্প অবকাশেই নিঃসঙ্গ কবির স্বেচ্ছা-নির্বাসনের কুয়াশা ছিন্ন করে স্পর্শ করেছিলাম তাঁর আন্তর উজ্জ্বলতা।

তাঁর কবিতার সঙ্গেই আগে আমার পরিচয়। রবীন্দ্রোত্তর যুগে তাঁকেই মনে হত একমাত্র কবি, যাঁর নিজস্ব দীপ্তি আছে। সমসাময়িক অন্যান্য কবিরা নানা পরীক্ষানিরীক্ষায় যতই ব্যাপৃত হোন না কেন, রবীন্দ্র-বলয়েই ছিল তাঁদের অবস্থান। জীবনানন্দকে তখনও আমি চিনতাম না। শুধু তাঁর কবিতা প'ড়ে মনে হত, এই এক কবি যাঁর কাব্যভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এবং গভীর অনুভূতির প্রকাশরূপ অন্য সবার থেকে পৃথক। তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ঝরা পালক" পড়লে অবশ্য মোহিতলাল ও নজরুলের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়, তবু আরও খুঁটিয়ে দেখলে সেখানে ভবিষ্যৎ সম্ভাবনার আভাসও মেলে। পূর্বগামীদের পথ থেকে অচিরেই ভিন্নমুখী তাঁর আত্মিক পরিত্রাণ।

আমার পরিণত বয়সে ব্যক্তিগত সংবেদনের দিক থেকে রবীন্দ্রকাব্যের অত্যধিক উপনিষদ-কেন্দ্রিকতা ও অধ্যাত্মবাদ আমাকে তেমন স্পর্শ করত না। শব্দ ও বক্তব্যের ভারও অনেক সময় আমার মনকে বিক্ষিপ্ত করত। জীবনানন্দের কবিতার শিকড় মানব-হৃদয়ের গভীরে প্রোথিত ছিল। শুধু তাঁর কবিতা পড়েই তাঁর সম্বন্ধে আমার এই মনোভাব গড়ে উঠেছিল। জীবনানন্দের সঙ্গে অবশ্য আরও একটা বিষয়ে আমার মিল ছিল। তখন অর্থাৎ চল্লিশের দশকে কিছু সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী "কবিতা ভবন"কে সাহিত্যচর্চার ও সাহিত্যভাবনার একমাত্র কেন্দ্ররূপে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছিলেন। আমি সেই বৈঠক সযত্নে এড়িয়ে চলতাম। ঐ বৈঠকের সামান্য অভিজ্ঞতা থেকেই আমার মনে হয়েছিল সেখানে সাহিত্যের পুস্তক নির্ভর দিকটার ওপরই সমাগত সাহিত্যিকদের নজর রয়েছে বেশি এবং তাঁরা এ-কথা যেন ভুলেই গিয়েছেন। আসলে সমস্ত বিদ্যা ও বৈদগ্ধ্য প্রদর্শন থেকে বহু দূরে অনুভূতিপ্রবণ মনের একান্তে জন্ম নেয় সার্থক কবিতা। তাঁদের লেখালেখি থেকে আমার এই ধারণাই সমর্থন পেত। এর ওপর আবার ছিল তাঁদের সাহিত্যের পারস্পরিক মূল্যায়নে ব্যক্তিগত সম্পর্কের প্রভাব। আমি স্বভাবগত শিষ্টতায় বিদ্যের বড়াই করতে বা হৈ চৈ ক'রে নিজের মতামত জাহির করতে পরাঙ্মুখ। তাছাড়া শিল্পসাহিত্যের ব্যাপারে আমার মন কারও অভিভাবকত্ব মেনে নিতে একেবারেই নারাজ। ফলে আমি বার দুয়েক যাওয়ার পর আর ওপথ মাড়াইনি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্তের বাসভবনে তৎকালীন 'পরিচয়' পত্রিকার বৈঠক সম্বন্ধেও আমার প্রতিক্রিয়া একই রকম ছিল। সেখানেও আমি একবার গিয়ে আর যাইনি। তত্ত্ব ও পাণ্ডিত্যের বিদগ্ধ আবহাওয়ায় মাপা কথার আসবে আমার দম আটকে আসছিল। নিজেকে খুব বোকা-বোকাও লাগছিল। যতদূর জানি, জীবনানন্দ খুব কমই গিয়েছেন কবিতা ভবনের বৈঠকে এবং একবারও যাননি পরিচয়ের আসরে।

জীবনানন্দের সঙ্গে তখনও আমার পরিচয় হয়নি। শুধু জানতাম তিনি কবিতা ভবন ও পরিচয়ের আড্ডা পরিহার করেই কবিতা লিখে চলেছেন।

সেটা ছিল সম্ভববত ১৯৫২ সাল। তাঁর সঙ্গে আলাপ করার একটা সুযোগ জুটে গেল। তখন 'স্বরাজ' নামে একটা পত্রিকা কিছুদিন বেরিয়েছিল। আনন্দবাজার পত্রিকার প্রাক্তন সম্পাদক এবং আমার আত্মীয় ও গুরুজন সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার তার সম্পাদক হয়েছিলেন। একদিন লেখা সম্পর্কিত কোনো কাজে আমি ঐ পত্রিকার কার্যালয়ে গিয়েছিলাম। সত্যেন্দ্রনাথ তখন আমাকে বললেন, "আমাদের রবিবারের পাতাটা কে দেখছেন জানো?"

—"না। কে?"

—"কবি জীবনানন্দ দাশ।"

শুনে আমি খুব আগ্রহ প্রকাশ করায় সত্যেন্দ্রনাথ আমাকে সেই ঘরে নিয়ে গিয়ে আলাপ করিয়ে দিলেন। নিভৃত আপিস ঘরে স্বল্পভাষী মানুষটিকে সেদিন অনেকক্ষণ কাছে পেয়েছিলাম।

তাঁকে সহমর্মী বলে অনুভব করার জন্যেই হয়তো আমার মুখে বাক্যের জোয়ার এসে গেল। অমি কথা বলেই চলেছি, উনি নির্বাক শ্রোতা। বুঝলাম, এ-বিষয়ে একটু অমিল আছে আমাদের মধ্যে। কোনো অবস্থাতেই বাচাল হন না উনি। তবে শ্রবণে ওঁর তন্ময়তা টের পাচ্ছিলাম বেশ। ফলে আমার উৎসাহ বেড়ে যাচ্ছিল। আমি ফরাসি কবিতা, র‍্যাঁবো ইত্যাদি নিয়ে কথা বলতে বলতে এক সময় কুণ্ঠাভরে বললাম, "আপনি তো কিছুই বলছেন না। আমি একাই বকছি এবং আপনার সময় নষ্ট করছি ..."

উনি মৃদু হাসলেন, বললেন, "না। ভালো লাগছে আপনার কথা শুনতে..."

সেদিনই মনে হয়েছিল, আমাদের ভাবনা এক পর্দায় স্পন্দিত হচ্ছে।

যতদূর মনে পড়ে আর একদিনও গিয়েছিলাম ওঁর পত্রিকার ঘরে। সেদিন অবশ্য বেশিক্ষণ বসিনি, আমার অন্য কাজ ছিল এবং ওঁর কাজেরও ব্যাঘাত করতে চাইনি। আমাদের সহাস্য কুশল বিনিময়ের পর চ'লে এসেছিলাম।

এর দিন কয়েক পরেই হানা দিলাম দেশপ্রিয় পার্কের কাছে ওঁর বাড়িতে। অবশ্য পূর্বসম্মতি পেয়েছিলাম। অনেকক্ষণ গল্প হল। এবারও প্রধান বক্তার ভূমিকায় রইলাম আমি এবং উনি নিবিষ্ট শ্রোতার। আমার প্রথম কাব্যগ্রন্থটা সেদিন ওঁকে দিলাম। আসার সময় জীবনানন্দ আমাকে তাঁর "ধূসর পাণ্ডুলিপি" উপহার দিলেন এবং প্রথম পৃষ্ঠায় লিখলেন "অরুণ মিত্র প্রিয়বরেষু"।

ওঁর স্বভাবগত স্তব্ধতার মধ্যে মৃদু কথার মতো এই শব্দ কটা ঝ'রে পড়ল। অনুভব করলাম, এই 'প্রিয়' সম্বোধন লোক দেখানো নয়, অন্তর থেকে উৎসারিত এর উচ্চারণ। স্বল্প সময়েই আমাদের যে হৃদ্যতা গ'ড়ে উঠেছে, তা আরও দৃঢ়বদ্ধ হবে—সেদিন এই ছিল মনে আশা। কিন্তু এর কিছুদিন বাদেই আমাকে কর্মস্থল এলাহাবাদে চলে যেতে হল। সেখানে একদিন বেতারে শুনলাম সেই মর্মান্তিক দুঃসংবাদ।

জীবনানন্দ এবং আমি, আমরা তিনদিনের পরিচয়েই আন্তরিক নৈকট্যে এসেছিলাম। আরও অনেক কথা তাঁকে আমি বলব ভেবেছিলাম। হয়তো অনেক দুর্লভ কথা শুনতেও পেতাম একদিন। তার আগেই সেই সম্ভাবনাকে চিরতরে পিষ্ট করে চ'লে গেল মৃত্যুর চাকা।

আজও তাই জীবনানন্দের কথা উঠলে এক অভাববোধের বিষাদ আমার মনকে আচ্ছন্ন করে।

জীবনানন্দ স্মৃতি

সুবোধ রায়

আশ্চর্য! এখনো বিশ্বাস হয় না। শুধু এক মুহূর্তের অসাবধানতা....তার পর? ভাবা যায় না তারপর। বার্ধক্য নয়। ব্যর্থ অস্ত্রোপচার নয়। কোনো দুরারোগ্য রোগ-বালাই নয়। ভুগে ভুগে, ক্ষয়ে ক্ষয়ে, তিলে তিলে মৃত্যুর হাতে আত্মসমর্পণ নয়। সে সব তো স্বাভাবিক মৃত্যু। কিন্তু এ কি? অভাবিত, অবাঞ্ছিত, অস্বাভাবিক! সত্যিই ভাবা যায় না। ভাবতে গেলে গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে।

সুস্থ, সবল, জলজ্যান্ত মানুষ। এই সে দিনেও, মানে ঘটনার দিনেও কতো গল্প করে এলাম। বেতারে ঠিক তার আগের দিন 'মহাজিজ্ঞাসা' আবৃত্তি করেছেন জীবনানন্দ দাশ। আলোচনা হচ্ছিল সেই প্রসঙ্গে। কেন কি জানি, আমার মতামতের জন্য প্রতীক্ষায় ছিলেন জীবনানন্দ। তাই সরাসরি অফিস-ফেরতাই চলে গেলাম জীবনানন্দের কাছে। আলোচনা হ'ল অনেকক্ষণ। শ্রীকুমুদ মল্লিক, করুণানিধান, বনফুল, সজনী দাস, সুধীন দত্ত, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, জীবনানন্দ, প্রত্যেকের কবিতা, তাঁদের বাকশুদ্ধি, বাচনভঙ্গি সব কিছুর পুঙ্খানুপুঙ্খ আলোচনা। কারও কারও আয়ত্তাতীতে কৌতুকোদ্দীপক ত্রুটির কথাও উল্লেখ করলাম। এসব কথা একটু রসযুক্ত ক'রে বললে আর রক্ষে নেই। হেসে গড়িয়ে পড়েন কবি। এরই মধ্যে শুধু এক বার অবাক কণ্ঠের প্রশ্ন হ'লো, 'সকলের কবিতাই তো কিছু কিছু শোনালেন। খাতার পাতায় এসব তুললেন কি করে এত তাড়াতাড়ি?'

বললাম, 'ঐ তো কায়দা। শ্রুতি আর দ্রুতি, দুই-ই আমার বন্ধু। শোনা মাত্র তুফান মেইল চালিয়েছি। লিখতে পেরেছি, অবিশ্যি যতোটা সম্ভব। আর পাশে মন্তব্যও লিখে গেছি সঙ্গে সঙ্গে। আপনার আগে অরবিন্দ গুহকেও দেখিয়েছি এই লেখা।'

লঘু আলাপ-আলোচনায় আরও কাটলো কিছুক্ষণ। তারপর উঠে দাঁড়াতেই বললেন, 'আসছেন তো আবার? আমি কিন্তু অপেক্ষা করছি।'

ইনফ্লুয়েঞ্জার জের সেদিনও ছিল আমার। বললাম, 'আজ আর নয়। বড্ড ক্লান্ত। আপনি বরং একাই যান আজ।' নাছোড়বান্দা জীবনানন্দ : 'না—না, ক্লান্তি আবার কিসের? হাঁটলেই ঠিক চাঙ্গা হয়ে উঠবেন। চলুন—অপেক্ষা করছি, আসুন শীগগির।' সম্মত হলাম না তবুও। 'না' বললাম জোর করে।

তবু কষ্ট হ'ল। অস্বস্তি বোধ করছিলাম বাড়ি এসে। নাঃ, যাই। বললেন এত ক'রে কবি। সামান্য কিছু মুখে দিয়ে, পোশাক বদলাতে যেটুকু সময় লাগে। এই দশ-বারো মিনিট বাড়ি থেকে বেরিয়ে ল্যান্সডাউনে কেবল পা বাড়িয়েছি। দেখি, ফ্যাকাশে-অস্বাভাবিক চেহারা, হন্তদন্ত হ'য়ে আমারই কাছে ছুটে আসছে রঞ্জু। কবি জীবনানন্দ দাশের প্রিয়তম সন্তান—'জানেন, সর্বনাশ হয়েছে। বাবাকে এইমাত্র হাসপাতালে নিয়ে গেল।' একে সে, উৎকণ্ঠায় কালো রঞ্জুর মুখ।

'সে কি!' আমি আকাশ থেকে পড়লাম, 'এই যে খানিক আগে গল্প করে গেলাম।'

'হ্যাঁ আপনি চলে যাবার পরই—' বিমূঢ় কণ্ঠ স্তব্ধ হ'য়ে গেল রঞ্জুর। লাজুক স্বল্পভাষী অত্যন্ত বিনয়ী ছেলে। থরথর করে কাঁপছে। কি হবে?

'কে বলেছে? কার কাছে খবর পেলে? তোমার বাবাই যে জানলে কি ক'রে?'

'জলখাবার থেকে এক ভদ্রলোক এসে খবর দিয়ে গেলেন।'

আর কথা নয়। ছুটলাম রঞ্জুকে নিয়ে তখুনি 'জলখাবারে'র দিকে। ...

রাসবিহারী য়্যাভিনুর ওপর টুকরো-টুকরো ভিড় তখনো এখানে-ওখানে ছড়ানো। খবর সংগ্রহ করলাম একাধিক প্রত্যক্ষদর্শীর মুখ থেকে।

স্থির নিশ্চয় হলাম 'জলখাবারে'র স্বত্বাধিকারীর ভাই শ্রীচুনীলাল দে'র মুখে নির্ভুল, বিস্তারিত খবর পেয়ে। শুধু প্রত্যক্ষদর্শীই নন, এই শোচনীয় দুর্ঘটনার প্রথম থেকেই প্রাথমিক চিকিৎসায় তিনি সজ্ঞান, আন্তরিক সাহায্য করেছিলেন। ঘটনাটা এই রকম ঃ

'জলখাবার' 'জুয়েল হাউসে'র সামনে দিয়ে রাস্তা অতিক্রম করছিলেন জীবনানন্দ দাশ। শুধু অন্যমনস্ক নয়, কি এক গভীর চিন্তায় নিমগ্ন ছিলেন কবি। চলন্ত ডাউন বালিগঞ্জ ট্রাম স্পটিং স্টেশন থেকে তখনো প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ হাত দূরে। অবিরাম ঘণ্টা বাজানো ছাড়াও বারংবার সতর্কবাণী উচ্চারণ করেছিলো ট্রাম ড্রাইভার। যা অনিবার্য তাই ঘটলো। গাড়ি থামলো তখন, প্রচণ্ড এক ধাক্কার সঙ্গে সঙ্গেই কবির দেহ যখন ক্যাচারের ভেতর ঢুকে গেছে। ক্যাচারের কঠিন কবল থেকে অতি কষ্টে টেনে-হিঁচড়ে বার করলেন সবাই কবির রক্তাপ্লুত, অচৈতন্য দেহ। কেটে, ছিঁড়ে, থেঁতলে গেছে এখানে-সেখানে। রক্তের ছোপ মাথায়, হাতে, বুকে, ডান চোখের কোণে। চুরমার হয়ে গেছে বুকের পাঁজরা, ডান দিকের কটা আর উরুর হাড়। আঘাত হেনে যন্ত্রদানবও অক্ষত রইল না। দুমড়ে গেল ক্যাচার, তুবড়ে গেল ট্রামের সুমুখের খানিকটা অংশ। কোনো লাইট-পোস্ট কিংবা গাছের গুঁড়িতে ধাক্কা দিয়ে নয়। এক অসহায় পথচারীকে আঘাত ক'রে।...

ধরাধরি করে সবাই মিলে কবির বেহুঁস দেহ নিয়ে গেলেন রাস্তার ওপারে। তার পরে জল, বাতাস, বরফ...ধীরে ধীরে কিছুক্ষণ পর সংজ্ঞা ফিরে পেলেন কবি, 'কি হয়েছে? আমি এখানে কেন?'

'হাঁটতে হাঁটতে মাথা ঘুরে প'ড়ে গেছেন।' কে একজন বললেন।

''আপনার নাম, ঠিকানা কি?' আরেকটি প্রশ্ন।

'জীবনানন্দ দাশ। ১৮৩, ল্যান্সডাউন রোড।' খানিক এধার-ওধার তাকালেন 'আমি এখন বাড়ি যেতে পারি?'

'তা, যেতে...হাঁ, যেতে পারেন বৈকি।' বললেন কে একজন।

উঠতে গিয়েই ধড়াস ক'রে আছাড় খেয়ে পড়লেন। ছাতু হয়ে গেছে ডান পা। যেমন, তেমন জখম নয়, এবার বুঝলেন সবাই...তক্ষুনি ডাকা হ'ল ট্যাক্সি। উপচিকীর্ষু মন নিয়ে এগিয়ে এলেন ডোভার লেনের এক কর্তব্যপরায়ণ তরুণ। শ্রী বিমলেন্দু শীল, ঐ ট্রামেরই অন্যতম যাত্রী। সঙ্গে গেলেন শ্রী চুনীলাল দে এবং আরও দু'একজন। একজন পুলিশও।

রঞ্জুকে বললাম, 'আমি যাচ্ছি শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। তুমি শীগগির তোমার কাকাকে গিয়ে খবর দাও গে।'

দু'নম্বর ওয়ার্ড। অনুসন্ধান বিভাগে খোঁজ নিয়ে পৌঁছলাম যথাস্থানে। হাসপাতালে পা দিলেই অবসাদ আর নৈরাশ্যে ভরে যায় মন। বিশ্রী আবহাওয়া। সর্বত্র ছড়িয়ে আছে এক নিথর মৃত্যু বিভীষিকা। ভয়ে ভয়ে হাঁটছি। কি দেখবো—কেমন দেখবো, কে জানে?

বারান্দায় শুয়ে আছেন জীবনানন্দ দাশ। কোমর থেকে পায়ের গোড়ালি পর্যন্ত ব্যান্ডেজ। স্ফীত, বিকৃত মুখ। চেনা যায় না। ডান চোখের ওপর ঢিপি হয়ে উঠেছে মাংসপিণ্ড। অস্ফুট, আর্তকণ্ঠ। ছটফট করছেন এক অব্যক্ত যন্ত্রণায়। শিয়রে দাঁড়িয়ে গায়ে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিচ্ছেন শ্রীমতী সুচরিতা দাশ। কবির সহোদরা।

সামনে গিয়ে গায়ে হাত দিলাম আমি। তারপর সন্তর্পণে কপালে ও মাথায়। বরফের মতো ঠাণ্ডা শরীর। আমায় দেখে চোখ তুললেন। ঠোঁটের কোণে এক অস্বাভাবিক ম্লান হাসি, 'এসেছেন? কি সব হয়ে গেল...বাঁচবো তো।'

'হয়েছে কি আপনার? একটু শুধু চোট লেগেছে। কিচ্ছু ভয় নেই। ও আপনিই সেরে যাবে।' স্তোক বাক্য। যন্ত্রচালিতের মতো মুখস্থ ব'লে গেলাম।...খানিক বাদেই এলেন শ্রীমতী লাবণ্য দাশ। কবির সহধর্মিণী। শীতার্ত পাতার মতো কম্পমানা। নিঃশব্দে এগিয়ে এলেন স্বামীর কাছে। হাতে হাত রাখলেন প্রথমে। তারপর ছিন্নভিন্ন রক্ত-মাখা পাঞ্জাবিটা সরিয়ে হাত বুলোলেন বুকের ওপর। 'জ্বলে যাচ্ছে...জ্বলে যাচ্ছে...উঃ পারছিনে...সর্বাঙ্গে ব্যথা...কি? ও লাবণ্য...লাবণ্য এসেছো...দ্যাখো তো কি হলো আমার।' 'সেরে যাবে। কিচ্ছু ভেবো না।' সান্ত্বনা দিলেন লাবণ্য দাশ। এদিকে ডাক্তার, ফোন, ওষুধ, নার্স...পাগলের মতো দিশাহারা হ'য়ে ছুটোছুটি করছেন কবির ভাই শ্রী অশোকানন্দ দাশ। এক মুহূর্ত বিশ্রাম নেই তাঁর। নির্বাক দৃষ্টিতে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর স্ত্রী, শ্রীমতী নলিনী দাশ, গভীর চিন্তাকুলা।... এমন সময় এসে পড়লেন স্বনামধন্য চিকিৎসক শ্রী অমল দাশ, কবির নিকট-আত্মীয় এবং সঙ্গে আরও একজন খ্যাতনামা বিশেষজ্ঞ ডঃ এ. কে. বসু।... তা'হলে যে-সে রোগী নয়। এইবার সাড়া পড়ে গেল সারা হাসপাতালে।... ডাক্তার অমল দাশকে দেখে ধড়ে প্রাণ এলো কবির, 'কে বুবু? বুবু এসেছিস? বাঁচিয়ে দে...' শিশুর মতো অসহায় কণ্ঠ, 'বুবু বাঁচিয়ে দে ভাই!'

'নিশ্চয়ই দেব।' প্রশান্ত হাসি ডাক্তার দাশের, 'কি হয়েছে ঘাবড়াচ্ছো কেন? কিছু তো হয়নি তোমার?'

তারপর আন্তরিক যত্ন আর ব্যগ্রতা নিয়ে চললো পুঙ্খানুপুঙ্খ পরীক্ষা। কবির মেয়ে মঞ্জুশ্রীও এসেছে ইতিমধ্যে। ভয়ার্ত দৃষ্টি, হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে এক কোণে। আর কবি-পত্নী? দেয়ালে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছেন মুহ্যমান। মাথা ঘুরে পাছে পড়ে যান, সেই ভয়ে।...পরীক্ষা শেষে আড়ালে রিপোর্ট দিলেন ডাক্তার ঃ অবস্থা উদ্বেগজনক, কোনো সন্দেহ নেই।

চিন্তাকুল মন নিয়ে ফিরে এলাম বাড়ি। সারারাত একফোঁটা ঘুম এল না চোখে। পরদিন সকালেই গেলাম আবার।...ছটফটানি; অস্থিরতা তখনো কমেনি। কেবল বলছেন—বমি করব। করলেনও বমি। বার তিনবার। রক্ত বমি। তাজা লাল দলা দলা রক্ত। আবার গেলাম সন্ধ্যার দিকে। ডাক্তার ইনজেকসন করতে যাবেন, সাবধান করে দিলেন কবি। সেদিকে সম্পূর্ণ সচেতন, 'মরফিয়া দেবেন না, আমার ডায়োবেটিস।'

'ঠিক আছে...ভয় নেই।' ডাক্তার হাসলেন, 'মরফিয়া নয়, পেনিসিলিন।'

'না, না, পেনিসিলিনও নয়। লাখ লাখ পেনিসিলিন নিয়েছি কিছু দিন আগে।'

'কত দিন আগে?'

'এই বছর দুই।'

'তবে আর কি? এখন অনায়াসে দেয়া চলে।' হাসতে হাসতে সূঁচ বিঁধিয়ে দিলেন ডাক্তার।

কিছুক্ষণ পর ঘরের চার পাশটা আঙুল ঘুরিয়ে কবি দেখালেন আমাকে।...বুঝলাম ঘরের অস্বাস্থ্যকর আবহাওয়ার কথা বলছেন।

ঠিকই বলেছেন। ঘরের এক কোণে আলকাতরার মতো কালো এক ভয়ংকর মূর্তি। দুর্ধর্ষ খুনী। আর সেই ভয়প্রদ আসামীকে ঘিরে পাহারা দিচ্ছে তিনজন সশস্ত্র পুলিশ। দিবা-রাত্রি। চারপাশে আরও অনেক কেস। কবির খুব কাছে আর এক রোগীর অস্ত্রোপচার হয়েছে সেই দিন। আচমকা বিকট কণ্ঠে সে-ও চীৎকার করছে।...ঠিকই বলেছেন কবি। এমন অবস্থায় তো সুস্থ লোকেরই অসুস্থ হওয়ার কথা।...কিন্তু কোনো উপায় ছিল না। কথা তো ছিলো পরদিন সকালেই P. G. Hospital-এর কেবিনে স্থানান্তরিত করা হবে। বৃথা আশা। ঐ অবস্থায় তখন ওঁকে এক ইঞ্চি নড়ানোও বিপজ্জনক।

অক্সিজেন দেওয়া হ'ল দ্বিতীয় দিন থেকেই।...তৃতীয় দিন অবস্থা কিছুটা ভালোর দিকে।...ইতিমধ্যে ডাক্তার বিধান রায়ও স্বয়ং উপস্থিত হলেন একদিন। গুণগ্রাহী, সত্যিই প্রতিভা পূজারী। কর্মব্যস্ত মানুষ। যশের সর্বোচ্চ শিখরে ব'সেও তিনি যে সময় ক'রে আসতে পারলেন, সেজন্য কবির আত্মীয়-বন্ধু সকলেই তাঁর কাছে কৃতজ্ঞ। ডাঃ রায়ের আগমনে হাসপাতালের ব্যবস্থা আমূল পরিবর্তিত হ'ল।

চতুর্থ দিন কবিকে দেখে ভারি খুশি হ'লাম। বেশ সুস্থ, স্বাভাবিক চেহারা। বললেন, 'বুদ্ধদেব আর প্রতিভা বসু এসেছিল, এই খানিক আগে।' সঞ্জয়, সজনী দাস, দিনেশ দাস, অরুণ সরকার, নীরেন চক্রবর্তী, বিশ্ব বন্দ্যোপাধ্যায়, বীরেন চট্টোপাধ্যায়, অরবিন্দ গুহ...ধীরে ধীরে আরো কতো নাম ক'রে গেলেন। কিন্তু বেদনার্ত কবির কণ্ঠ, 'প্রেমেন তো এলো না।'

আন্দাজে বললাম, 'বোধ হয় নেই এখানে...কিন্তু সে যাক....You look alright to-day'.

'সত্যি...ঠিক তো? আচ্ছা...হাঁটতে পারবো?

'নিশ্চয়ই। পা ভাঙে আবার সেরেও যায়। এই আমাকেই দেখুন না?'

'তা বটে। আচ্ছা কবে নাগাদ পারবো হাঁটতে? পারবো তো?'

'সারার আগে পারবেন বলে মনে হয় না। সারার পরে পারার প্রশ্ন।'

হাসতে গিয়ে ব্রেক কষলেন কবি। সুস্থ অবস্থায় এ ধরনের কথা শুনলে হেসে ফেটে পড়তেন কবি। আর সে কী নিঃশব্দ, উচ্ছ্বাসিত হাসি! এ হাসি তাঁরাই চেনেন, যাঁরা জীবনানন্দ দাশকে চেনেন। একাধিক সাহিত্যিক বন্ধুদের মন্তব্য করতে শুনেছি ঃ জীবনানন্দের বন্য হাসি। আমি বলি, শুধু বন্য নয়, অনন্য।

ফিডিং কাপে মুসুম্বির রস খাওয়াচ্ছিলেন কবির অতি আদরের অক্লান্ত সেবাপরায়ণা বোন শ্রীমতী সুচরিতা। মাথার চুলগুলি বিলি ক'রে দিচ্ছিলেন শ্রীমতী লাবণ্য দাশ। হঠাৎ বলে উঠলেন কবি, 'ভারি সুন্দর জল, মানে Iced water আর মুসুম্বির রস। অপূর্ব।'... ভেতরে দাউ দাউ আগুন জ্বলছে। বুকটা খাক হয়ে যাচ্ছে পুড়ে। ঠাণ্ডা জল ত লাগবেই ভালো।...কিন্তু তখন বুঝিনি সে-কথা। বুঝলাম এক্স-রে পরীক্ষার ফলাফল জেনে। সাতখানা পাঁজরার হাড় নেই, চুরমার হয়ে গেছে বুক, রক্তক্ষরণ হচ্ছে সর্বক্ষণ। ফুসফুসও জখম হয়েছে।

একদিন বললেন আমায়, 'যাঁরা যাঁরা আসছেন, নাম, সময়, ঠিকানা সব লিখে রাখবেন। যেন ভুল না হয়। লাবণ্যকেও বলেছি। কিন্তু ও তো সবাইকে চেনে না।'

তারপর ধীরে ধীরে এলো একটা আচ্ছন্ন, মুহ্যমান ভাব। কথা বলেন আর ঘুমিয়ে পড়েন। অবস্থা দ্রুত অবনতির দিকে যাচ্ছে, বোঝা যায়।

২২শে অক্টোবর, শুক্রবার। সকাল থেকে কথা বন্ধই হ'য়ে গেলো কবির। কিছুই খাওয়ানো গেলো না। ব্লাড-ব্যাংক থেকে রক্ত আনা হয়েছিল। বৃথাই পড়ে রইলো শেষ পর্যন্ত। আলোর মতো, জলের মতো, কাচের মতো স্তব্ধ হয়ে আসছে সব। বুঝলেন কবিপত্নী। সামলাতে পারলেন না সে প্রচণ্ড আঘাত। কিছু শিহরণ, কয়েক ফোঁটা অশ্রু। মাটিতে লুটিয়ে পড়লো তাঁর বিবশ মূর্ছিত দেহ।...

জীবন-মরণের অবিরাম সংগ্রাম চলছিলো এতো দিন। শ্বাসকষ্ট, অনিদ্রা। তারপর এক সময় রুদ্ধ হলো সেই শ্বাস। চিরনিদ্রায় অভিভূত হলেন কবি! তখন এগারোটা পঁয়ত্রিশ।... প্রার্থনা, প্রতীক্ষা, এতো যে প্রত্যাশা, সব ব্যর্থ। সেই মৃত্যু-স্তব্ধতার বুক চিরে ঘোষিত হলো এক নির্মম মর্মান্তিক সত্য। কবি নেই। নেই সে নিত্য দীপ্যমান, সূর্যকরোজ্জ্বল কবিতার কবি। জীবনের ভিড়ে অনুপস্থিত আজ জীবনানন্দ। নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো এক অনন্যসাধারণ প্রতিভা! রবীন্দ্রোত্তর বাংলার এক বিশিষ্টতম কবি গায়ের রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে বিলীন হলেন কোন অন্ধ তমিস্রায় না রূপাতীত রূপলোকে...কে জানে?

শনিবার সকাল। ত্রিকোণ পার্কের পিছনে ধীরে ধীরে আসতে লাগলেন প্রথিতযশা বহু কবি, সাহিত্যিক, আত্মীয়, বন্ধু, কবির বহু অনুরাগী, ভক্ত পাঠক। ফিসফিস কণ্ঠ, নিঃশব্দ পদক্ষেপ। চারিদিকে একটা শান্ত, গম্ভীর, শোকাকুল পরিবেশ।...ছোট ছোট বিক্ষিপ্ত চক্র। অনুচ্চ কণ্ঠে আলাপ করছিলেন অচিন্ত্যকুমার, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সঞ্জয় ভট্টাচার্য—বাংলা সাহিত্যের দিকপাল সব। কাছে গিয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে আলাদা ডেকে নিলাম। বললাম সব কথা। তাঁর প্রতি কবির অসীম ভালোবাসা আর শেষ পর্যন্ত তাঁকে দেখবার আন্তরিক ইচ্ছা, আকুলতার কথা। সব শুনে নিচে গেলেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। অনুশোচনায় ম্লান কণ্ঠ, 'আসলে কি জানেন—প্রথমতঃ ভুল রিপোর্ট পেয়েছিলাম। আর দ্বিতীয়তঃ সঠিক খবর যখন পেলাম, তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে। শুনলাম আচ্ছন্ন ভাব, লোক চিনতে পারছেন না। জ্ঞান হারাচ্ছেন মাঝে মাঝে, অমন কষ্টকর করুণ অবস্থা দেখার জন্য মনকে কিছুতেই শক্ত করতে পারলাম না। আমি মোটে সহ্যই করতে পারিনে এসব।... অবিশ্যি এখন অনুতাপ হচ্ছে। খুবই কষ্ট হচ্ছে।' বাষ্পরুদ্ধ অস্ফুট কণ্ঠে বললেন প্রেমেন্দ্র মিত্র। কথা হলো অন্য প্রসঙ্গেও।

ইতিমধ্যে দোতলা থেকে এক তলায় নামানো হলো কবির মৃতদেহ। ঘিরে দাঁড়ালেন আত্মীয়, বন্ধু সবাই। শবানুগমনের জন্য সবাই প্রস্তুত। তুলতে যাবে শবাধার, এমন সময় আর্তকণ্ঠে ডুকরে উঠলেন শোকবিহ্বলা অবাঙ্মুখী কবিজায়া। মৃত স্বামীর মুখের পানে স্থির, নিবদ্ধ দৃষ্টি, 'সারা জীবন লেখা লেখা...করেই পাগল হয়ে ছিলে, প্রাণ দিলে শুধু লেখাতেই। আর আজ, তুমি চ'লে গেলে। তোমার লেখাই শুধু পড়ে রইলো।' এক স্বতঃস্ফূর্ত গাঢ় বেদনা বিদীর্ণ হলো সেই আর্ত-করুণ কণ্ঠে। সে-মর্মভেদী সুর সবার অন্তরে অনুরণিত হল অনেকক্ষণ।

এই সঙ্গে আরো একটি মহীয়সী মহিলার নামোল্লেখ না করে পারা যায় না। ইনি হচ্ছেন শ্রীমতী শান্তি ব্যানার্জি। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের নার্স। প্রথম থেকে শেষ দিন পর্যন্ত কতো যত্নে, কি ঐকান্তিক নিষ্ঠায় ইনি যে কবির সেবা-শুশ্রূষা করেছেন তা চোখে না দেখলে বিশ্বাস হয় না। কবির অনেক গুণমুগ্ধ অনুরাগী বন্ধুদের সঙ্গে শবানুগমন করেছিলেন ইনিও। মমতাময়ী অশ্রুমতী এক নারী। শ্মশানঘাটে বন্ধুবর শ্রী বিরাম

মুখোপাধ্যায় ঠিকই বলেছিলেন সেদিন, 'মূর্তিমতী সেবা। এই সুশ্রী বুদ্ধিদীপ্তা মহিলা সত্যিই এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন। প্রতিভার প্রতি এই শ্রদ্ধায় তিনি আজ আমাদেরও শ্রদ্ধার পাত্রী।'

এর পর শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গকে সান্ত্বনা দেবার একটা সামাজিক রীতি আছে। কিন্তু পা চলে না, মন সরে না। দু'দিন আর ও-মুখোও হ'তে পারলাম না। তৃতীয় দিন খবর পাঠালেন কবিপত্নী। যেতেই হবে, বিশেষ দরকার। অতএব যেতেই হলো। গিয়ে বললাম, 'সান্ত্বনা দেবার প্রশ্ন ওঠে না বৌদি। আমাকেই কে সান্ত্বনা দেয় তার ঠিক নেই। আপনি যদি আজ রিক্তা, আমিও নিঃস্ব সর্বহারা। এর বেশি আমার আর বলার কিছু নেই।' সে কথা জানেনও উনি। তারপর আরো অনেক কথা হলো। বললেন, 'আবার আসবেন সন্ধ্যা বেলায়। আরো পরামর্শ আছে। তাছাড়া রঞ্জুও আপনাকে দেখার জন্য অস্থির হয়েছে।' গেলাম এবং পরদিনও আবার। কথা প্রসঙ্গে বললেন শ্রীমতী লাবণ্য দাশ, 'পূর্বাশা যথেষ্ট করেছেন। ওঁদের কাছে আমরা সবাই ঋণী। কিন্তু আমার একটা ব্যক্তিগত নালিশ আছে এঁদের সবার বিরুদ্ধে। পূর্বাশার কেউ কিংবা অচিন্ত্য, বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র এঁরা তো কেউ এলেন না আমার কাছে। যাঁকে তাঁরা হারালেন তিনি কি তাঁদেরই শুধু? আমার কি কেউ ছিলেন না? তাঁর মৃত্যুর পর এখানেই কি হবে যবনিকাপতন? সব যোগসূত্র কি আজ থেকেই বিচ্ছিন্ন হবে তাহলে? সঞ্জয় বাবুকে আজই কি একটা খবর দিতে পারেন না?'

সেই দিন তখুনি গেলাম পূর্বাশা অফিসে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছিলেন না। অতএব শ্রী সত্য দত্ত আর অমল দত্তকে সব কথা ব'লে এলাম। আলাপে আচরণে ওঁদের সত্যিকার দরদী মনের পরিচয় পেলাম। সমব্যথী, সত্যিই শুভার্থী এঁরা।

পরদিন সকালে গেলাম শ্রী প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাছে। আলোচনা হলো বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে। প্রায় দু'ঘণ্টা। বললেন, 'অতি রহস্যময় কবি জীবনানন্দের জীবনকাহিনী। সুতরাং সঠিক, নির্ভুল চরিত্র বিশ্লেষণ আজ একান্ত দরকার। কবি জীবনানন্দকে চেনেন অনেকে। কিন্তু মানুষ জীবনানন্দের সঙ্গে পরিচয় খুব অল্প লোকের। কাজে-কাজেই এ সম্বন্ধে কিছু বলা বা লেখার দায়িত্ব তাঁদের, যাঁরাই কবির সঙ্গে মিশেছেন ঘনিষ্ঠভাবে। শুধু তাঁর বহু অনুরাগীর কৌতূহল চরিতার্থের জন্যই এর প্রয়োজন।' খুব জোর দিয়েই বললেন আর দুঃখ করলেন। 'বিভূতি বাবু সম্পর্কে বলতে গেলে কিছুই লেখা হয়নি। আর আজ কে না জানে... এক সমান্তরালবর্তী রেখায় যে দুটি ব্যক্তিকে পাশাপাশি রাখা যায়, সে বিভূতি বাবু আর জীবনানন্দ দাশ। ভিড়ে নিরুদ্দিষ্ট বহুর মধ্যে একক, সংসারে থেকেও বিচ্ছিন্ন। আশ্চর্য সাদৃশ্য এই দুই চরিত্রের।'

এ বিষয়ে প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে আমিও একমত। অনেকেই জানেন এবং কবি দিনেশ দাসের ভাষায় আমি ছিলাম কবি জীবনানন্দের নিত্যসহচর। সকাল দুপুর, সন্ধ্যা, রাত্রি আমার উপস্থিতিতে কোনো দিন তাঁর শ্রান্তি ছিল না। তাঁর বাড়িতে আমার ছিল অবাধ গতিবিধি। জীবনানন্দের মনের অলিগলি, আনাচ-কানাচ কেউ যদি ঘুরে থাকে, সে আমি। এই রহস্যময়, নির্জনতম ব্যক্তির মনের গভীরে আঁতিপাঁতি করে সত্যিকার অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে কেউ যদি কিছু খুঁজে থাকে, সে আমি।

এই বিরাট প্রতিভার অবারিত সঙ্গ ও সান্নিধ্য পেয়ে আমি সত্যিই আজ গৌরবান্বিত। তাই বলছিলাম কবি জীবনানন্দ নির্জনতম কবি যে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। কিন্তু সে-কথা কি সম্পূর্ণ সত্যি? নিঃসঙ্গ ভ্রমণ তিনি পছন্দ করতেন। কিন্তু তাও কি সত্যি? তা যদি হয়,

তাহলে আমি বলতে পারি, আমি তার ব্যতিক্রম। আমি তাঁর নিত্য সঙ্গী। তাঁর প্রাত্যহিক সান্ধ্য ভ্রমণের অপরিহার্য সাথী ছিলাম। আমার আশাপথ চেয়ে প্রতীক্ষা করতেন কবি। না গেলে ক্ষুণ্ণ হতেন। কেন? সেই কথাই বলছি।

কবির মনের গোপনতম রন্ধ্রে আমার ছিল অবাধ, অসংকোচ প্রবেশাধিকার। ধাক্কা দিতাম, দোলা দিতাম, সুড়সুড়ি দিয়ে জাগাতে পারতাম তাঁর ঘুমন্ত মনকে। বোধ হয় এই একমাত্র কারণে তিনি আমায় পছন্দ করতেন। অনেকেই জানেন না, জীবনানন্দ ছিলেন আশ্চর্যরকম রহস্যপ্রিয়। কতো কথা, কতো টুকরো ঘটনা, কতো রোমাঞ্চকর কাহিনী ভিড় করে আসছে ঠিক এই মুহূর্তে। কিন্তু অতো কথা এই স্বল্প-পরিসরে বলা তো সম্ভবপর নয়। তাই উল্লেখ করবো এখন কতকগুলি ঘটনা, যা শুনলে মানুষ-জীবনানন্দের সঙ্গে আপনাদের প্রত্যেকের পরিচয় হবে। উদ্‌ঘাটিত হবে কবির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। মানুষটিকে চিনতে এতোটুকু ভুল হবে না আপনাদের। তাহ'লে বলি শুনুন।

চুল উঠছিলো কবির। মাথার পিছন দিকটা ধীরে ধীরে কেশবিরল হ'য়ে আসছিলো। টাককে কবির ভীষণ ভয়। অতএব যুদ্ধ ঘোষণা করলেন। ভাইটেক্স, বন্ড এন্ড, মহাভৃঙ্গরাজ—টাক নিবারণের যতো কিছু পাশুপত, ব্রহ্মাস্ত্র সব নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু কিছুতেই কিছু নয়। মাইল চার-পাঁচ হাঁটার পর হঠাৎ একসময় একদিন জিজ্ঞেস করলেন, 'আমার টাকটা বোঝা যায়? দেখুন তো পিছন থেকে?'

এ প্রশ্ন নতুন নয়। কম করেও সহস্রবার বর্ষিত হয়েছে। 'না' বললে খুশি হতেন। 'হ্যাঁ' বললে চিন্তিত। বললাম, 'তা একটু বোঝা যায় বৈকি। সূর্য বন্দনা করেন তো প্রত্যেক কবিতাতে। এখন ঠ্যালা সামলান।'

'তার মানে?'

'মানে স্পষ্ট। টেকো চাঁদি ফাটিয়ে ছাড়বে আপনার জ্বলন্ত সূর্য, দুপুরে যখন রাস্তায় বেরুবেন।'

'তা হোক। সে-সব কিছু না। কথা হচ্ছে, দেখতে বড়ো বিশ্রী লাগে। সূর্যকে ভয় নেই। ভয় রাত্রিকে। কিছুদিন পর লাইটপোস্টের তলা দিয়ে তো আর হাঁটাই যাবে না। চাঁদনি রাতে দেখেছেন কোনোদিন পদ্মার ইলিশকে ডিগবাজী খেতে?' বলেই হাসি। সর্বাঙ্গ দুলিয়ে উচ্ছ্বসিত হাসি।

শুনে আমিও হাসতে হাসতে জড়িয়ে ধরলাম কবিকে, 'সাবাস, মহাকবি জীবনানন্দ দাশ!'

কবির মুখ থেকে লাগসৈ কিছু বেরুলেই আমি বলতাম, 'সাবাস, জীবনানন্দ দাশ!' মহাকবি বললেই একটু অপ্রস্তুতের হাসি হাসতেন। আমি ছাড়া ওঁকে আরো একজন মহাকবি বলে সম্বোধন করতেন। তিনি হচ্ছেন অধ্যাপক অজিত ঘোষ। কবির অন্যতম অকৃত্রিম গুণগ্রাহী। অনেক সময়ে দু'জনে একসঙ্গেও বলতাম আমরা।

শুধু কি পরিহাসপ্রিয়তা? এক অদম্য শিশুসুলভ কৌতূহলও ছিলো কবির। পাশাপাশি হেঁটে যাচ্ছি। হঠাৎ দেখি একা আমি। কবির দু'পায়ে যথারীতি শিকড় গজিয়েছে। একেবারে স্থির, নিশ্চল। ইশারায় ডাকলেন আমায়। যা ভেবেছি তাই। মোটর থেকে নামছেন এক বেঢপ, কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি। শালপ্রাংশু পর্বতপ্রমাণ এক স্থূল মাংসপিণ্ড। হাঁসফাঁস করছে শরীর। তবে কেমন দিব্যি হাসি-খুশি ভাব।

এই নিয়ে চলার পথে আলোচনা ভারী প্রিয় কবির, 'আচ্ছা, এ-তো নভেল পড়ে, সিনেমা দ্যাখে, স্ত্রীর সঙ্গে প্রেমালাপ করে?'

'নিশ্চয়ই করে। আরো অনেক সুস্থ রূপবান স্বামীর মতোই করে। আর খোঁজ নিয়ে দেখুন, ভদ্রলোকের স্ত্রী নির্ঘাত সুন্দরী এবং স্বামী বলতে অজ্ঞান।'

'বলেন কি? সত্যি'?—এই 'সত্যি' কথাটি শিশুর মতো উচ্চারণ করেন জীবনানন্দ।

পাঁচ-সাত মাইল রোজ হাঁটতাম আমরা। ল্যান্সডাউন দিয়ে রাসবিহারী য়্যাভিন্যুর কিছুটা পশ্চিমে, তারপর রসা রোড ছুঁয়ে সাদার্ন য়্যাভিনু দিয়ে সোজা গড়িয়াহাটার গোল পার্ক। চক্রাকারে প্রদক্ষিণ করতাম ঢাকুরিয়া লেক থেকে ছোটো লেক, একেবারে টালিগঞ্জের ব্রিজ পর্যন্ত। বাড়ি থেকে বেরোতাম সন্ধ্যার অন্ধকারে গা-ঢাকা দিয়ে। কেউ যেন দেখতে না পায়। থাকতে হবে ধরাছোঁয়ার বাইরে। নির্জনতা আর অন্ধকারকে প্যাঁচার মতো ভালোবাসতেন কবি। পরিচিত কাউকে দেখলেই আমাকে দিয়ে আড়াল করতেন নিজেকে। আমার ওপর কড়া নির্দেশ ছিলো—পথে-ঘাটে কারো সঙ্গে কখনো পরিচয় করিয়ে দেবেন না। যদিবা কোনো দিন অমান্য করেছি নিষেধ, রীতিমত বিব্রতবোধ করতেন। শুধু আড়াল, নির্জনতা, নিজেকে লুকিয়ে রাখা। কিছু লিখছেন জীবনানন্দ। কাছে যান। অপরাধীর মতো লুকিয়ে ফেলবেন কালো মলাটের কবিতার খাতা। আপনি গেলেও যা লাবণ্য দাশ গেলেও তাই। লাবণ্য দাশ নিজেই গল্প করেছেন। 'রাত্রে হয়তো লিখছেন। হঠাৎ যেই কাছে গেছি...ব্যস, অদৃশ্য হয়ে গেলো খাতা।'

নিঃসঙ্গ একাকীত্ব তাই ভালোবাসতেন। পড়ন্ত দুপুরে রাস্তায় বেরুতেন রাস্তা তখন জনবিরল। জ্বলন্ত সূর্য যখন মাথায় আগুন ঢালছে, এলোমেলো টো টো করে ঘুরে বেড়াচ্ছেন।

ইদানীং অসম্ভব ঝোঁক হয়েছিলো চিড়িয়াখানা দেখবার। রোজই খোঁচান আমায়, 'চলুন যাই। বারোটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত। রোজ যদি না পারেন, প্রত্যেক শনিবার—আজ যাবেন? ঠিক বারোটায় কিন্তু।—'

দর্শকদের ভয় দেখাচ্ছে এক বন্য বেবুন। বাঁদরীর উকুন বাছছে তার পতিদেবতা। দেখে ভারি খুশি কবি। তাছাড়া কতো বিচিত্রবর্ণ পাখি। আর সর্বোপরি গণ্ডা, নির্জন ছায়াবীথি আর দূরবিস্তৃত ঘন বনানীর স্নিগ্ধ শ্যামশ্রী। ধূমপানরত শিম্পাঞ্জী দেখার পর হঠাৎ বললেন, 'কই, গণ্ডার তো দেখলাম না?'

বললাম, 'ও আর নতুন কি? রোজ তো দেখছেন।

'কোথায়?'

'কেন, আয়নায়। সজনী দাস তো আপনাকে ঐ নামেই জানেন।'

হাসলেন। 'ও—সেই কথা!'

তারপর গেলাম একদিন গভর্ণমেন্ট আর্ট-স্কুল। দিন-ক্ষণ স্পষ্ট মনে আছে। এগারোই এপ্রিল, রবিবার। বেশি দিনের কথা নয়। আচার্য নন্দলাল বসুর চিত্রপ্রদর্শনী। সকাল সাতটায় কবি এলেন আমার কাছে, 'যাবেন আর্ট-স্কুলে?'

'কেন নয়? নিশ্চয়ই যাবো।' আপত্তি কোনো দিন, কিছুতেই করিনি।

'শুনুন—ট্রামে-বাসে নয় কিন্তু, হেঁটে।'

তথাস্তু। ল্যান্সডাউন দিয়ে সার্কুলার রোড। তারপর পার্কস্ট্রীট দিয়ে চৌরঙ্গি ছুঁয়ে ম্যুজিয়ম। অখণ্ড মনোযোগ দিয়ে দেখছেন শিল্পী নন্দলালের অপূর্ব শিল্প-সৃষ্টি। তারপর উত্তর দিকের দেওয়ালে টানানো ছবিগুলি দেখতে যাবেন, এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে শ্রী সঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং অমল দত্তর সঙ্গে দেখা। দীর্ঘদিন পরে দেখা বোধ হয়।

জীবনানন্দকে দেখেই বুকে টেনে নিলেন সঞ্জয় বাবু। আন্তরিক হৃদ্যতা আর গভীর প্রীতির পরিচয় সেই দৃঢ় আলিঙ্গনে।

অন্তরঙ্গতার সুরে তার পর কতো কথা! জীবনানন্দের হাতের আঙুলগুলি নিয়ে খেলা করতে লাগলেন সঞ্জয় ভট্টাচার্য। ভালো লাগলো।

আমিও করেছি কতো দিন। এ খেলা আমারও খুব প্রিয়।

ঘুরে-ঘুরে আরো অনেক ছবি অনেকক্ষণ দেখলাম। নন্দলালের আঁকা সেই বিখ্যাত পার্থসারথির সামনে দাঁড়িয়ে গেলেন কবি। উচ্চাঙ্গের শিল্পকারুর এক উজ্জ্বলতম স্বাক্ষর। বিমুগ্ধ বিস্ময়ে অনেকক্ষণ চেয়ে রইলেন কবি। শুধু বললেন, 'আশ্চর্য সুন্দর।'

তখন ধূসর সন্ধ্যা। ফেরার পথে কবির সেই এক কথা, 'ট্রাম-বাস নয়, হেঁটে কিন্তু।' সন্তর্পণে অতিক্রম করলাম চৌরঙ্গীর মসৃণ পীচের রাস্তা। তারপর ধূ-ধূ গড়ের মাঠ। তমসাচ্ছন্ন বিস্তীর্ণ শ্যামলিমা। ঘাস পেলে জীবনানন্দ আর কিছু চান না। সবুজের প্রতি এক আশ্চর্য অনুরক্তি আর আকর্ষণ। সাপের যেমন বাঁশি, হাঁসের যেমন জল, পাখির যেমন মুক্ত আকাশ। মনে পড়ে কবির অবিস্মরণীয় কবিতাকে ঃ

রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এইসব ছুঁয়ে ছেনে! সে এক বিস্ময়!

প্রতিদিন সাদার্ন য়্যাভিনু দিয়ে হাঁটতেও এর পরিচয় পেয়েছি বারবার। ঘাসপথ চাই-ই চাই। ভুলিয়ে-ভালিয়ে যদিই-বা নামালাম রাস্তায়—কখন দেখি ঠিক উঠে পড়েছেন ঘাসে। এই পরীক্ষা কতোবার, কতোভাবে করেছি। ব্যর্থ হয়েছি বারবার।

একঘেয়ে রাস্তায় রোজ হাঁটতে ভালো লাগে না। কবিকে একদিন নিয়ে গেলাম য়ুনিভার্সিটি রোয়িং ক্লাবের পাশে। ছোট্ট লেকের নিভৃত কোণে। যথাসম্ভব ভিড় এড়িয়ে, জলের খুব কাছে, মখমলের মতো নরম, সবুজ ঘাসের ওপর বসলাম দু'জনে। নারিকেল-বীথির নিবিড় ছায়া লেকের স্থির, নিস্তরঙ্গ জলে। মাথার ওপর হলদে, পূর্ণায়ত চাঁদ। নিঝুম মুহূর্ত, নিঃসীম প্রান্তর। শান্ত, নয়নাভিরাম সে এক অপূর্ব সুন্দর দৃশ্য! পরিদৃশ্যমান সেই স্বপ্নময় ছবি দেখছেন কবি। সম্মূঢ়, মোহাবিষ্ট ঃ 'এতো কাছে এমন সুন্দর জায়গা ছিল, তা তো জানতাম না। নৈঃসঙ্গ্যময় শূন্যতা। কালো জলে আলোরত অস্পষ্ট আভাস। মনে হচ্ছে, ফুরিয়ে এসেছে রাত্রির আয়ু। এক অজানা দেশের বন্দর যেন। ঐ দূরে আবছা অন্ধকারে নীল হ'য়ে আছে জাহাজ আর জেটির প্রতিচ্ছায়া। সমুদ্রতীরে ব'সে আছি প্রতীক্ষমান যাত্রী আমরা।' কবি জীবনানন্দকে সেদিনের মতো কাছে বোধ করি আর কোনো দিনই পাইনি। মুগ্ধ কবির সেই স্বপ্নবিলাসিতা আজো মুদ্রিত হ'য়ে আছে আমার স্মৃতিপটে। তারপর আরো গেছি কতোবার। তবু নিত্য নূতন। কোনো দিন পুরোনো হলো না ঐ পরিবেশ।

বড়ো ভালোবাসতেন কবি বকুল আর কৃষ্ণচূড়া ফুল। পথ চলতে দু'পাশে গাছ দেখিয়ে প্রায়ই বলতেন, 'এসব বিশ্রী গাছ। রুচি, রসবোধ কিচ্ছু নেই এদের। আমার হাতে যদি এতোটুকু ক্ষমতা থাকতো, দু'ধারে শুধু লাগিয়ে দিতাম বকুল আর কৃষ্ণচূড়া।' এর কারণও ছিলো। আমার মুখে এ গল্প শুনে বোন সুচরিতা একদিন বললেন, 'দাদার অত্যন্ত প্রিয় ফুল কৃষ্ণচূড়া। বরিশালে দাদা যে ঘরটিতে বসে লিখতেন, তার সামনেই ছিল সতেজ, সুপুষ্ট, ঘন-পল্লবিত এক কৃষ্ণচূড়া গাছ। অজস্র ফুলে-ফুলে ছেয়ে থাকতো গাছ। সিঁদুর-

রাঙা অসংখ্য ঝরা পাপড়িতে আবৃত থাকতো সবুজ ঘাস আর পিছনে দূর বিস্তৃত ঘন বনানীর শ্যাম সমারোহ! লক্ষ্য করেছি, দাদার লেখনীও হতো এই সময়ে সবচেয়ে

আমার এক সহকর্মী বন্ধু শ্রী ক্ষেতুসুধা বসু একদিন আমাকে ও জীবনানন্দকে আমন্ত্রণ করলেন বড়িশায় তাঁর নবনির্মিত বাসভবনে। যথাসময়ে উপস্থিত হলাম দুজনে। কৃষ্ণপক্ষের রাত। সেই শান্ত, নিঝুম গ্রাম্য পরিবেশে হারানো দিনের স্মৃতি খুঁজে পেলেন কবি। শীতের আমেজ কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায়। গায়ে আমাদের শুধু পাতলা পাঞ্জাবি। সুমুখে নিরন্ধ্র অন্ধকার, তবু ভ্রূক্ষেপ নেই কবির। দূরত্বকে অগ্রাহ্য ক'রে হেঁটে চলেছেন, কবি মোহিতলালের সেই নিভৃত, নির্জন বাসভবন তাঁকে দেখতেই হবে। মোহিতলালের প্রতি তাঁর অগাধ শ্রদ্ধা। একমাত্র যে দুজন কবির কবিতা প্রায়শঃ উনি উদ্ধৃত করতেন, তাঁরা হলেন রবীন্দ্রনাথ ও মোহিতলাল। যেতে যেতে থমকে দাঁড়ান মাঝে মাঝে। গাছেগাছে আলোর ঝিকিমিকি। বিদ্যুতের অক্ষরের মতো অসংখ্য জোনাকি। কতো দিন পর যেন দেখছেন। তক্ষক সাপের ডাকেও জেগে ওঠে সেই পুরোনো স্মৃতি। কান পেতে শোনেন।

হাঁটায় ক্লান্তি নেই জীবনানন্দের। যদি বলেছি কোনো দিন আর পারছিনে, দাঁড়াই একটু, অমনি কপট ভর্ৎসনার গর্জন শুনতে হয়, 'খাড়ান কিয়া' প্রশ্ন করি, 'এ আবার কোন দেশী ভাষা?' উত্তর হয়, 'বরিশালের। অরবিন্দ গুহকে জিজ্ঞেস করবেন।' দ্বিরুক্তি না ক'রে হেঁটে চলেছি। জনহীন পথ। হঠাৎ চীৎকার ক'রে উঠলেন কবি, 'ভাউয়া—ভাউয়া।' 'সে আবার কী?' 'ঐ যে তাকিয়ে আছে। ভীষণ লাফায় আর নাকি চোখ খুবলে নেয়।' 'তা ভাউয়া ভাউয়া ক'রে চ্যাচাচ্ছেন কেন? ও তো কোলাব্যাং।' 'বরিশালে ভাউয়া বলে। অরবিন্দকে জিজ্ঞেস করবেন।'

চিন্তাশীল ব্যক্তি সাধারণত বিস্মৃতিশীল হয়। কবির বিস্মৃতিশীলতার একটা করুণ, কৌতুকপ্রদ উদাহরণ দিই শুনুন। গত বছর পুজোর আগে একদিন সকালে এলেন আমাদের বাড়িতে, 'আজ তো ছুটি। দুপুরের দিকে আসবেন আজ। একটা জরুরী পরামর্শ আছে। তারপর বিকেলে বেড়াতে যাবো নিউ আজিমপুরের দিকে।' বলে চলে গেলেন বাড়ি। হঠাৎ দেখি, ফিরে এসেছেন আবার তখুনি, 'ইশ, বড্ড ভুল হয়ে গেছে। আজ তো হবে না। ওরা আগেই গেছে। আমাকে আজ মঞ্জুকে নিয়ে দিল্লী যেতে হবে।' চুপ করে শুনলাম শুধু। আর অবাক হ'য়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইলাম, তাঁর গতিপথের দিকে। ছাতা মাথায় দিয়ে আবার চলেছেন ধীরে ধীরে।

এই একই কারণে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করতে পারতেন না বহু ক্ষেত্রে। বহু পত্রপত্রিকার সম্পাদককে মুখ কাঁচুমাচু করে বলতে শুনেছি, 'আপনি কিন্তু এই মাসেই একটা কবিতা দেবেন বলেছিলেন।' বলেন আর ভুলেও যান অবলীলাক্রমে। চিঠিপত্রের উত্তর দেওয়ার সম্পর্কেও তাই। কেউ স্বরচিত বই পাঠাচ্ছেন। মতামত কিংবা প্রশংসাপত্র চাইছেন কেউ কেউ। নির্বিকার, উদাসীন কবি। বরঞ্চ আমিই পিছনে লেগে থেকে বহু চিঠির উত্তর দিইয়েছি। এই কিছু দিন আগেও তরুণ কবি শ্রী সুশীল গুপ্ত তাঁর কাব্যগ্রন্থ "রৌদ্র জ্যোৎস্না"-র সঙ্গে পাঠালেন মুক্তাক্ষরে লেখা একখানি চিঠি। কবির প্রতি সুনিবিড়, এক প্রগাঢ় শ্রদ্ধার পরিচয় সেই চিঠির প্রতিটি ছত্রে। কেউ জানে না।—সে-চিঠির উত্তরও বোধ হয় আমার তাগিদেই তিনি দিয়েছিলেন। যদিও বিলম্বিত হয়েছিল উত্তর।

অরবিন্দ গুহ-র সদ্য প্রকাশিত কবিতার বই "দক্ষিণনায়ক" পেয়েও জীবনানন্দ বসে

রইলেন চুপচাপ। অবসর মতো জিজ্ঞেস করি, 'পড়েছেন বইখানা?' সেই এক উত্তর, 'কালকে ঠিক পড়বো।' অবশেষে নিজেই একদিন বললেন, 'পড়লাম অরবিন্দের বই। ভালোই তো লিখেছে। কয়েকটি কবিতা সত্যিই striking 'চিত্রলোক', 'স্বর্গের স্বাক্ষর'। সত্যিই উজ্জ্বল স্বাক্ষর ওর কবিতার। full of Promise, he has come to stay' সে কথা সে দিনই বললাম অরবিন্দকে। হাতে স্বর্গ পেলো অরবিন্দ গুহ।

কবির প্রিয় লেখক অনেকেই ছিলেন। কিন্তু তার মধ্যে যাদের নাম প্রায়ই উল্লেখ করতেন, তাঁরা হচ্ছেন তারাশংকর, মোহিতলাল, প্রেমেন্দ্র, বুদ্ধদেব, অচিন্ত্য কুমার, প্রবোধ সান্যাল, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, সুধীন দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, সঞ্জয় ভট্টাচার্য, দিনেশ দাস, নীরেন চক্রবর্তী, অরুণ সরকার, সুভাষ মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি। 'পূর্বাশা'-র নাম তিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করতেন। আর অন্তরের সঙ্গে ভালোবাসতেন শ্রীবুদ্ধদেব বসুকে। বুদ্ধদেব সম্পর্কে একাধিকবার তাঁকে বলতে শুনেছি, 'He is a Genius. I am greatly indebted to him.' 'যদি কিছু আজ যশ, প্রতিষ্ঠা অর্জন ক'রে থাকি, সে শুধু বুদ্ধদেব আর পূর্বাশা-র জন্যে।' জীবনানন্দ সম্পর্কে যেখানে যতো অভিমত বুদ্ধদেব বসুর, সযত্নে সংগ্রহ ক'রে সাগ্রহে পড়তেন সে-সব। মাঝে মাঝে খুব জোর দিয়ে বলতেন, 'বুদ্ধদেবের কবিতা ধ্বনি, ব্যঞ্জনা আর স্বপ্নালুতায় মধুর। কিন্তু he is decidedly a better prose-writer.' এ কথা কতোবার যে শুনেছি।

আশ্চর্য! এই কথাই বুদ্ধদেবের গদ্য সাহিত্য সম্বন্ধে প্রেমেন্দ্র মিত্রও সেদিন আমায় বললেন, 'লিখি আমরাও। কিন্তু বুদ্ধদেবের মতো সাজিয়ে-গুজিয়ে নয়। সজাগ দৃষ্টি। অতি সতর্ক পদক্ষেপ।' আরো বললেন, 'জীবনানন্দের কাব্যপ্রতিভা সম্পর্কে আমরা বলেইছি শুধু, কিন্তু লিখিত স্বীকৃতি অপর্যাপ্ত ভাবে এসেছে একমাত্র বুদ্ধদেবের কাছ থেকেই।' আর সে-কথা কবির মৃত্যুর পর আরো সুস্পষ্টভাবে প্রমাণ করলেন বুদ্ধদেব বসু। জীবনানন্দ দাশের শ্রাদ্ধবাসরে দ্বিধাহীন, স্পষ্ট কণ্ঠেই তিনি ঘোষণা করলেন, 'রবীন্দ্রনাথের পর বাংলাদেশে জীবনানন্দ দাশের মতো এতো বড়ো প্রতিভাবান, প্রতিপত্তিশালী কবির আর মৃত্যু ঘটেনি।'

বলেছিলেন সেই কথাই যশস্বী কথাশিল্পী প্রবোধ সান্যালও, 'The greatest poet and philosopher of the age.' রাসবিহারী, ল্যান্সডাউনের মোড়ে 'দক্ষিণী'-র সামনে আমি, জীবনানন্দ আর অধ্যাপক অজিত ঘোষ গল্প করছিলাম বাড়ি ফেরার পথে। কথা প্রসঙ্গে বললেন অজিত ঘোষ, 'জানেন সুবোধ বাবু, কবি সম্মেলনে পরশুদিন জীবনানন্দের দু হাত ধ'রে প্রবোধ সান্যাল কি বলেছিলেন? বলেছেন, বর্তমান বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ও দার্শনিক। আর দেখুন তো, আমরা মহাকবি বললেই যতো দোষ?'

এসব প্রশংসা বিন্দুমাত্র বিচলিত করে না কবিকে। সব অর্থহীন জলের আলপনা। এতোটুকু ভাবান্তর নেই মুখে। এক আশ্চর্য নির্লিপ্ত কণ্ঠ, 'আচ্ছা, কবি সম্মেলনে আমি যখন পড়ছিলাম, ডাঃ নীহার রায় চেয়ার থেকে প'ড়ে গেলেন কি ক'রে?' সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক অন্য এক প্রশ্ন। এই বৈশিষ্ট্যেই জীবনানন্দ দাশ চিহ্নিত। উচ্চাশায় নিরাকাঙ্ক্ষ। প্রশস্তি শুনতে যেমন পরাঙ্মুখ, আত্মপ্রচারে ততোধিক ঘৃণা। আশ্চর্য মানুষ। এমন অদ্ভুত, দুর্লভ চরিত্র লাখে একটাও মেলে কিনা সন্দেহ। ওঁর বাড়িতে বসে কতো কবি সাহিত্যিককে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করতে শুনেছি। অমনি গুটিয়ে নিতেন নিজেকে। সহ্য করতে পারতেন না। হয় তখন অনন্যোপায় হয়ে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা, নয়তো আমাকে নিয়ে অন্য কোথাও গা ঢাকা দেবার জন্য উশখুশ করতেন।

হাজারবার বলেছি, 'আপনার মতো এমন ঘরকুনো, অসামাজিক লোক আমি আর দেখিনি। কতো বড়ো বড়ো কবি, সাহিত্যিক, প্রবন্ধকারের চিঠি আপনার কাছে দেখেছি। কতো অগণিত বন্ধু আপনার। অথচ কোথাও যাওয়া-আসা নেই, মেলামেশা নেই—কী যে আপনার স্বভাব!' শ্রীমতী লাবণ্য দাশেরও ঐ একই অনুযোগ, 'কতো নাম-করা লেখকরা মাথার দিব্যি দিয়ে সস্ত্রীক কতোবার নিমন্ত্রণ ক'রে গেছেন। উনি না যান নিজে, না যেতে দেন আমাকে।' ভ্রূক্ষেপ নেই, আত্মভোলা, আত্মমুগ্ধ কবির। ও-সব ব্যাপারে কোনো গুরুত্বই আরোপ করতেন না।

'লেখক-চক্রে'র একটা দুস্তর প্রভাব এবং নিজস্ব মূল্য আছে। কতো দিন বলেছি, 'একটা স্বাস্থ্যকর পরিবেশের সার্থকতা আছেই আছে। আর কিছু না-হোক আলাপে-আলোচনায় অন্তত একটা লেখার মেজাজ আসে।' কে শোনে কার কথা! কবির ঐ বহুশ্রুত ভোঁতা জবাব, 'কি দরকার।? বই তো আছে সেজন্য। কতো বই পৃথিবীতে। ভালো বই পেলে আর-কিচ্ছুর, কারুকে দরকার হয় না।'

কথাটা মিথ্যে নয়। মেতে যেতেন, সর্বক্ষণ ডুবে থাকতেন বইয়ের মধ্যে। পড়তেন বেশির ভাগ ইংরিজি বই। যেদিন, যখন, যতোবারই গেছি, বারান্দায় হাফ-ইজিচেয়ারে দেখেছি অধ্যয়নরত, একাগ্রচিত্ত জীবনানন্দকে। বাঁপাশে আরো দু'একখানা বই। জীর্ণ-বিবর্ণ একটা অক্সফোর্ড ডিক্সনারি, তিনরকম ইংরিজি দৈনিক, আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশও আছে তার মধ্যে। আর সামনে ফুট-রেস্ট হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে একটা খালি চেয়ার। আর বারান্দায় অনুপস্থিত মানেই নির্ঘাত বিছানায় শুয়ে বই পড়ছেন। আর সেই বিছানার এক প্রান্তে বসে বাপের পা টিপছে রঞ্জু। আলমারি সেই ঘরে। বাক্স-টাক্স, সব তাক-ভর্তি বই। আর স্তূপীকৃত এক-রাশ বই ও পত্র-পত্রিকা খাটের তলে ও ঝকঝকে মেঝের ওপর। ধূলি-মলিন, এলোমেলো নয়। পরিচ্ছন্ন, পরিপাটি ক'রে সাজানো। আর যার সুনিপুণ করস্পর্শে এই পরিচ্ছন্নতা প্রতিদিন বজায় থাকতো, বলা বাহুল্য, নিঃশব্দচারিণী তিনি কবির মার্জিতরুচি সহধর্মিনী। যাঁর স্বচ্ছন্দ, সুশৃঙ্খল গৃহস্থালীতে জীবনানন্দ নিঃসন্দেহে নিশ্চিন্ত নির্ভরতায় দিন কাটাতেন।

সন্ধ্যা তখন উত্তীর্ণপ্রায়। ধীরে ঘনিয়ে আসছে অন্ধকার। শঙ্কাতুরা রাত্রির গায়ে একটি নীরব বেদনার অস্পষ্ট ধূসরতা। লেকের ওপারে লিলি পুলের পশ্চিম দিকে বসেছিলাম আমি আর কবি জীবনানন্দ। নিভৃত নির্জন জায়গা। সামনে কচুবন আর কচুরিপানা আর তার পেছনে ঘুমন্ত স্মৃতিরেখার মতো রেললাইন।

কথা প্রসঙ্গে বললাম, 'যাই বলুন, আপনার ভক্ত পাঠক আজো চায় আপনার 'বনলতা সেন' 'লাশকাটা ঘর' কিংবা 'ঘাইমৃগী'র মতো কবিতা শুনতে। আপনার আজকের কবিতায় দৃষ্টি প্রসারতা আর মননের প্রগাঢ়তা যতোই বাড়ছে, ততোই হ'য়ে পড়ছে দুর্বোধ্য এবং দুরধিগম্য। এলোপাথাড়ি, দুরূহ, দুরুচ্চার্য শব্দ নির্বাচন আর প্রজ্ঞা ও মনীষিতার সংযোজন দিয়ে কিস্তিমাত করতে চাইছেন আজকের একাধিক কবি। দেখছেন তো? তাই বলছিলাম আপনি অন্তত—'

বাধা দিলেন অপ্রস্তুত, অপরাধী কণ্ঠে, 'না—না—এ আপনার ভুল ধারণা। আমি কি খুব দুরূহ শব্দ ব্যবহার করি? বুদ্ধির পরিণতির সঙ্গে আসবেই একটু গাম্ভীর্য, গভীরতা — সে কী অস্বাভাবিক? বনলতাকে চাইছেন, কিন্তু বনলতা সেন কি দুটো সম্ভব? তাছাড়া বনলতাকে ভালো লেগেছে বলেই তো ওকে দূরে রাখা উচিত। উত্তরে-যাওয়া কবিতার

অনুকরণে অন্য এক অনুরূপ সৃষ্টির আমি ঘোরতর বিরোধী। কতো তো লিখলাম, আর এর সম্ভাব্য পরিণতি সম্পর্কে আজ সংশয় জাগে...আমার বহু কবিতা প্রায় শ'তিনেক নষ্ট হয়েছে, উইয়ে কেটেছে বরিশালে। অনেক বই, বহু মূল্যবান চিঠিও উদ্ধার করতে পারিনি। মনে পড়লে কষ্ট হয় খুব।' এ-কথা কবির বোন শ্রীমতী সুচরিতা এবং স্ত্রীর মুখেও শুনেছি। —হঠাৎ এক অমর কবির বেদনার্দ্র কণ্ঠে রাত্রির বিষণ্ণতা নেমে এলো।

'আচ্ছা, এতো যে লিখেছি...একটিও কি সুপ্রীম পোএট্রি হয়নি? যা আমার মৃত্যুর পর বেঁচে থাকতে পারে?'

এ কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলাম কিছুক্ষণ। কবির মুখে তাঁর ছোটো একটি সাধ-আশার কথা এই প্রথম শুনলাম। তাহলে একেবারে নির্লোভ, নিরাকাঙ্ক্ষ নন। কিংবা কে জানে হয়তো ভুলে উচ্চারিত হয়েছে এই একটি গোপনতম বাসনা।

শুধু একটি কবিতা। কতো সীমিত সাধ। ভাবনা-চিন্তাতেও পরিমিতির উদ্যত চাবুক। এই অতি স্বাভাবিক, সামান্যতম আশা পোষণেও তবু কতো দ্বিধা।

মৃত্যু নির্মম। মৃত্যু শুধু অনপেক্ষিত নয়, অনিবার্য। আমি তো যাবোই। শুধু আমার একটি কবিতা যেন বেঁচে থাকে। মৃত্যুকে ভীষণ ভয় করিব। মৃত্যুচিন্তায় মর্ময়িত হ'য়ে ওঠে এক মর্মভেদী দীর্ঘশ্বাস। আমি চ'লে গেলেও যথারীতি সূর্য উঠবে পূর্বাকাশে। দিন-রাত্রি হবে। নীল সমুদ্র, ধূসর বনানী সবুজ ঘাস, মানুষের ভিড়, তোমার প্রেম ও পিপাসা—সব কিছুই থাকবে, যেমন আছে এমন। শুধু আমিই চলে যাবো। বড়ো দুঃখেই তাই কবি বলেছেন ঃ

আমি চলে যাবো, তবু সমুদ্রের ভাষা
রয়ে যাবে, তোমার পিপাসা
ফুরাবে না, পৃথিবীর ধুলো, মাটি, তৃণ
রহিবে তোমার তরে, রাত্রি আর দিন।
র'য়ে যাবে, র'য়ে যাবে তোমার শরীর—
আর এই পৃথিবীর মানুষের ভিড়।

মানুষ জীবনানন্দ

লাবণ্য দাশ

এক

পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিক পাশ করে আমি তখন সবেমাত্র ঢাকা ইডেন কলেজে ভর্তি হয়েছি। হস্টেলে থাকি। হঠাৎ একদিন সকালে শুনলাম জেঠামশাই বাড়িতে ডেকে পাঠিয়েছেন। পরদিন ক্লাসে অনেক পড়া, কাজেই মনে মনে একটু বিরক্তই হলাম।

আগের দিন বৃষ্টি হওয়াতে রাস্তায় কাদা জমেছে। আমি সেই কাদার ভিতর দিয়েই হেঁটে চলেছি। ফলে আমার শাড়ীর পাড় আর জুতোর রং দুয়েরই চেহারা একেবারে অন্যরকম। সেই অবস্থায় বাড়ি গিয়ে হাজির হলাম।

মাথায় লম্বা বেণী, কোমরে আঁচল শক্ত করে জড়ান। পায়ে আর শাড়ীর পাড়ে কাদা। আমার দিদি তো (বেথুন কলেজে বি. এ. পড়ে। কয়েক দিনের জন্য ঢাকায় এসেছে) আমাকে দেখে হেসেই অস্থির। আমি চটে গিয়ে বললাম, 'হাসি থামিয়ে এখন দয়া করে কিছু খেতে দিয়ে বাধিত কর।'

এমন সময় জেঠামশাই দোতলা থেকে হাঁক দিয়ে বললেন, 'মা লাবণ, কয়েকখানা লুচি নিয়ে এস তো!'

দিদি লুচির পাত্রটা আমার দিকে এগিয়ে দিয়েই হাসি চাপতে দূরে সরে গেল। আমিও সেটা নিয়ে দুম্‌দাম শব্দ করতে করতে উপরে চলে গেলাম।

জেঠামশাইকে ঝাঁজের সঙ্গে কি একটা বলতে যাব, তাকিয়ে দেখি সেখানে একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। তিনি আমার দিকে একবার তাকিয়েই তাড়াতাড়ি চোখ ফিরিয়ে নিলেন।

জেঠামশাই আমাকে বললেন, 'এই যে মা, এস আলাপ করিয়ে দি। এঁর নাম জীবনানন্দ দাশগুপ্ত। দিল্লী থেকে এসেছেন।'

আমার তখন রাগের বদলে হাসির পালা। ছোটবেলা থেকে বেশ ভালভাবেই হাসিটি আয়ত্ত করেছিলাম। হাসি সামলাতে না পেরে ভদ্রলোকের দিকে পিছন ফিরেই একটা টুলের উপরে বসে পড়লাম।

জেঠামশাই বারবারই বলতে লাগলেন, 'ওকি, পিছন ফিরে বসেছ কেন? ঠিক হয়ে বস। বাড়িতে অতিথি এলে ঠিকভাবে আপ্যায়ন না করাটা খুবই অন্যায়। ইনি তোমাকে কি ভাবছেন?'

ইনি নামক ব্যক্তিটি আমাকে যাই-ই ভাবুন না কেন, ঠিক হয়ে বসব কি—আমি তখন আমার হাসি সামলাতেই ব্যস্ত। যাই হোক, কিছুক্ষণ চেষ্টার পর আমি তাঁর দিকে ফিরে বসলাম। কিন্তু অসীম ধৈর্য ভদ্রলোকটির। যতক্ষণ পর্যন্ত আমি না ফিরলাম, তিনি চুপ করেই বসে রইলেন।

তাঁর দিকে ফেরার পরে তিনি আমাকে তিনটি প্রশ্ন করলেন। 'আপনার নাম কি? আই এ-তে কি কি সাবজেক্ট নিয়েছেন এবং কোনটি আপনার বেশী পছন্দ।'

কোনও মতে প্রশ্ন তিনটির উত্তর দিয়ে ভদ্রলোককে কিছু না বলেই উঠে নীচে দৌড় দিলাম। রান্নাঘরে ঢুকেই দিদিকে গুম গুম শব্দে কিল মারতে আরম্ভ করলাম। দিদি আমার হাত দুখানা শক্ত করে ধরে রেখে বলল, 'তোর হ'ল কি?'

আমি আরও রেগে গেলাম। 'আমার কেন হ'তে যাবে? হয়েছে তোমাদের। আজ তোমরা আরম্ভ করেছ কি? ঐ ভদ্রলোকটি কে, আর আমাকে সাত সকালে ডেকে পাঠাবারই বা কারণ কি?' দিদি তখন 'আমি কি জানি? ভদ্রলোকটির খবর তো তোরই রাখবার কথা।' বলেই অন্য ঘরে ঢুকে গেল।

কিছুক্ষণ পরে জেঠামশাই সেই ভদ্রলোকটিকে নিয়ে নিচে নেমে বাইরের দিকে চলে গেলেন। আমি তাঁদের দেখেই মুখ ফিরিয়ে বসে রইলাম।

দুপুরবেলা জেঠামশাই আমাকে তাঁর ঘরে ডেকে নিয়ে এ-কথা সে-কথার পর হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'আচ্ছা, লাবণ মা, সকালের ভদ্রলোকটিকে তোমার কেমন লাগল?' আমি পাল্টা প্রশ্ন করলাম, 'উনি এসেছিলেন কেন?' উত্তরে জেঠামশাই বললেন, 'তাহলে বলি শোন। উনি দিল্লীর রামযশ কলেজের একজন অধ্যাপক। তোমাকে দেখতে এসেছিলেন।' আমি তখন পরিষ্কার, জানিয়ে দিলাম যে বি-এ পাশ না করে বিয়ের কথা ভাববই না।

ছেলেবেলায় মাত্র তিন মাসের তফাতে বাবা, মা দুজনকেই হারিয়েছিলাম বলে আমাদের অকৃতদার জেঠামশাই (অমৃতলাল গুপ্ত) তাঁর সবটুকু স্নেহ ঢেলে দুজনের জায়গাই পূর্ণ করতে চেষ্টা করতেন। তিনি আমাকে অনেক বোঝালেন, 'তুমি যে বিয়ে করতে চাইছ না, আমি চোখ বুজলে তোমাকে কে দেখবে? তোমার দিদির বিয়ের কথা চলছে। হয়ত শিগ্‌গিরই, ঠিক হয়ে যাবে। তোমার ছোট বোনটি খুবই ছোট। তার বিয়ের কোন প্রশ্নই ওঠে না। সুতরাং তোমার জন্যই আমার এখন চিন্তা। তাছাড়া—উনি তো তোমাকে পড়াতে রাজী আছেন। তাহলে তোমার বিয়েতে আপত্তি করার কি আছে?'

সত্যিই তো, বাবা-মা নেই। দিদির বিয়েও ঠিক হচ্ছে। এখন আমার বিয়ে হয়ে গেলেই জেঠামশাই দায়মুক্ত হবেন। অতএব মত আমাকে দিতেই হবে। তবুও শেষবারের মত বললাম, 'ভদ্রলোকের মত না জেনেই—আমাকে এ কথা জিজ্ঞেস করছেন কেন?' তখন জেঠামশাই হাসতে হাসতে বললেন, 'তিনি সকালে তোমাকে দেখেই মত দিয়েছেন।'

আমার তখন অবাক হবার পালা। ছোটবেলা থেকে শুনে আসছি—কত রকমভাবে সাজিয়ে-গুছিয়ে তবে মেয়েকে বরপক্ষীয় লোকের সামনে দাঁড় করাতে হয় ; তাঁরা হাজার রকম প্রশ্ন করে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পরীক্ষা করে তবেই মতামত দেন। মেয়েদের সে এক ভীতিজনক অবস্থা। কিন্তু আমার বেলা!

সে যাই হোক, ২৬শে বৈশাখ (৯ই মে) শুক্রবার (শুক্লা চতুর্দশী তিথিতে) বিয়ের দিন ঠিক হয়ে গেল। কবির কবিত্ব শক্তির কোন রকম পরিচয় তখনও আমরা পাইনি। আমাদের কাছে তিনি অধ্যাপক হিসেবেই পরিচিত হলেন।

বিয়ে ঠিক হবার পরে কেন জানি না মা-বাবার কথা খুব বেশী করে মনে হতে লাগল। কিন্তু তাঁদের স্মৃতি আর আমার মনে কতটুকু? বড় হয়ে আমার দিদিমার মুখে শুনেই যেটুকু ধারণা।

আমার বাবা, রোহিণীকুমার গুপ্ত ছিলেন খুলনার বৈদ্যপ্রধান অঞ্চল সেনহাটির কুলীন বৈদ্য সন্তান। আর আমার মা যশোহর জেলার ইতিনা গ্রামের তারাপ্রসন্ন সেনের একমাত্র মেয়ে সরযূ গুপ্ত (সেন)।

সেন রাজাদের আমলে মহারাজ লক্ষ্মণ সেন যে আটজনকে কুলীন বলে চিহ্নিত করেন, তাঁদের মধ্যে বৈদ্য বংশের কাশ্যপ গোত্রীয় কায়ু একজন। তাঁর উপাধি ছিল গুপ্ত। কায়ু গুপ্তের ছেলে বনমালী সেনহাটিতে এসে বাস করতে আরম্ভ করেন। সেনহাটি সর্বপ্রধান কুলস্থান বলেই প্রসিদ্ধ ; আমার বাবা ৺রোহিণীকুমার গুপ্ত এই বংশেরই সন্তান। বাবার ঠাকুমায়ের এক পূর্বপুরুষ ছিলেন চন্দ্রদ্বীপের শেষ রাজার দেওয়ান। রাজার কাছ থেকে তিনি প্রচুর ভূসম্পত্তি পেয়েছিলেন। বাবার মুখে শুনেছি, বাখরগঞ্জ জেলার সুবিখ্যাত 'দুর্গা সরোবর' নামে প্রকাণ্ড দীঘিটি তিনিই তৈরী করিয়েছিলেন। এই সরোবরের কথা আজও সেখানকার প্রতিটি গ্রামের লোকের মুখে শুনতে পাওয়া যায়।

ভগবান আমার বাবা মা দু'জনকে অকৃপণ হাতে সৌন্দর্য ঢেলে দিয়েই পৃথিবীতে পাঠিয়েছিলেন। আমার মা ছিলেন নিষ্ঠাবান হিন্দু পরিবারের মেয়ে। গল্প শুনেছি—তিনি মুরগীর মাংস খাওয়া তো দূরের কথা, বাড়িতে আনতেও দিতেন না। কিন্তু তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ বুদ্ধিশালিনী এবং তাঁর স্বভাবটি ছিল কঠোর ও কোমলের অপূর্ব সমন্বয়।

আমার বাবা যেমনি ছিলেন স্ফূর্তিবাজ, তেমনি ছিল তাঁর দরাজ মন। হিন্দু সন্তান, কোন রকম কুসংস্কারের ধার দিয়েও তিনি যেতেন না।

আমার বয়েস যখন সাত বছর কয়েক মাস, সেই সময় বাবা শ্রাবণে ও মা অগ্রহায়ণে বলতে গেলে একই সময়ে দু'জনে চিরদিনের জন্য চলে গেলেন। এর পরে পরে আমরা তিনটি বোন ও একটি ভাই আমাদের বড় জেঠামশাই-এর কাছে চলে আসি।

আমি গিরিডিতে উচ্চ ইংরেজী বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে সেখানকার বোর্ডিং-এ থেকে পড়াশুনা আরম্ভ করলাম। আমার দিদি প্রমীলা গুপ্ত (কমিশনার বি দে-র মেজো ছেলে ও ৺সরোজনলিনী দত্তের ভাই—বি এন রেলওয়ের প্রাক্তন কমার্শিয়াল ট্রাফিক ম্যানেজার বসন্তকুমার দে-র স্ত্রী। তিনি কয়েক বছর হ'ল পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছেন) ব্রাহ্ম বালিকা বিদ্যালয়ে ভর্তি হন। আমাদের একমাত্র ভাই শান্তিবিন্দু গুপ্ত (মাদ্রাজে একটি বৃটিশ ফার্মের ব্রাঞ্চ ম্যানেজার) ও ছোট বোন নন্দিনী গুপ্তকে দুর্গাপুরে বার্ণ কোম্পানীর ওয়েলফেয়ার অফিসার নিশীথ ঘোষের স্ত্রী) গয়ায় মেজো জেঠামশাই বিহারীলাল গুপ্তের কাছে রাখা হ'ল।

এইভাবেই শুরু হ'ল পিতৃমাতৃহীন আমাদের চারটি ভাই-বোনের জীবনযাত্রা। ভগবানই হয়ত হাল ধরেছিলেন—তাই তীরের দেখা পেলাম।

এবারে কবির পিতৃ ও মাতৃকুলের পরিচয় দিতে হলে আমাকে অতীতে ফিরে যেতে হয়।

কবির ঠাকুরদাদা সর্বানন্দ দাশের আদিনিবাস ছিল বিক্রমপুরের গাউপাড়া গ্রামে। গ্রামটি সর্বনাশী পদ্মার করাল গ্রাসে পড়ায় তিনি বরিশালের শান্ত সুন্দর পরিবেশে এসে ঘর বাঁধলেন।

তাঁর ছিল সাত ছেলে ও চার মেয়ে। ছেলেরা হলেন— হরিচরণ, সত্যানন্দ, যোগানন্দ, অতুলানন্দ, প্রেমানন্দ, ব্রহ্মানন্দ, ও জ্ঞানানন্দ। মেয়েদের মধ্যে একজন বাইশ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিলেন। পাঞ্জাবনিবাসী ব্রজেন্দ্রনাথ সেনের সঙ্গে বড় (তাঁদের এক ছেলে হলেন H M V-এর প্রাক্তন রেকর্ড অধিকর্তা পি কে সেন) এবং কোটালীপাড়ার সুগায়ক মনমোহন চক্রবর্তীর সঙ্গে মেজো মেয়ের বিয়ে হয়। সকলের ছোট স্নেহলতা দাশ

বরিশাল সদর বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধানা শিক্ষিকা ছিলেন। তিনি আজীবন কুমারী থেকে দেশের ও দশের সেবায় আত্মোৎসর্গ করেন।

সর্বানন্দের মেজো ছেলে সত্যানন্দই কবির বাবা। সৌম্যমূর্তি সত্যানন্দ একজন শিক্ষাব্রতী ছিলেন। তাঁর জ্ঞানের পরিধি ছিল অপার—অসীম।

খ্যাতনামা মহিলা কবি কুসুমকুমারী দাশ হলেন জীবনানন্দের মা (গৈলার চন্দ্রনাথ দাশগুপ্তের বড় মেয়ে।)

বসন্তকালে ঋতুরাজের পায়ের ধ্বনি শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মলয়পবন সবুজ বনানীর শ্যামলিমাকে দিকে দিকে ছড়িয়ে দেয়। গাছের বুকে দেখা দেয় নতুন পাতা। নীলাকাশ থেকে ভেসে আসে পাখির আনন্দ লহরী। ফাল্গুন মাসের এইরকম একটি দিনেই বরিশালে জন্ম নিলেন কবি জীবনানন্দ।

বাবার ধ্যানগম্ভীর ভাব ও মায়ের অপার সহনশীলতা এই দুয়ের মিশ্রণে গঠিত হ'ল তাঁর চরিত্র। আমাদের দেশের প্রতিটি সন্তান কম কথা বলে কাজের ভিতর দিয়েই তার মনুষ্যত্বকে ফুটিয়ে তুলুক—এই ছিল মায়ের ঐকান্তিক মনোবাসনা। তাঁর এই মনোভাব মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর বিখ্যাত কবিতায়।

'আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে,
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে।'

কম কথা বলে, কাজে বড় হয়ে পৃথিবীতে তাঁর মায়ের কবিতাকে স্বীকৃতি দিয়ে গেলেন কবি জীবনানন্দ।

কবির বাল্য ও কৈশোর কেটেছে বরিশালের ব্রজমোহন বিদ্যালয়ে। জগদীশ মুখোপাধ্যায় ছিলেন ঐ প্রতিষ্ঠানের প্রধান শিক্ষক। বালকের শিক্ষানুরাগ সেই জ্ঞানী পুরুষকে মুগ্ধ করেছিল। তাই শিক্ষাব্যাপারে জীবনানন্দকে সব রকম সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছিলেন তিনি। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কবি জীবনের উন্নতির অনেকগুলি সোপানই অনায়াসে পার হয়ে যেতে পেরেছিলেন।

প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিক পাশ করার পর তিনি এসে ভর্তি হলেন ব্রজমোহন কলেজে। স্বনামধন্য দেশভক্ত অশ্বিনীকুমারের বাবার নামেই কলেজটি স্থাপন করা হয়েছে। এই কলেজ থেকে ফার্স্ট ডিভিশনে আই এ পাশ করে তিনি কলকাতায় এলেন প্রেসিডেন্সি কলেজে বি এ পড়তে।

১৯২১ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইংরেজীতে হাই সেকেন্ড ক্লাস পেয়ে এম-এ পাশ করেন। কবির মুখে শুনেছি—পরীক্ষার কিছুদিন আগে তিনি দারুণ ব্যাসিলারী ডিসেন্টি রোগে শয্যাশায়ী ছিলেন। ঐ বছর পরীক্ষা দিতে পারবেন না বলে তাঁর মাকে জানিয়েছিলেন। কিন্তু নানা অসুবিধে থাকাতে মায়ের অনুমতি পেলেন না। বাধ্য হলেন পরীক্ষা দিতে—কিন্তু প্রথম শ্রেণীর সম্মান আর পেলেন না তিনি।

এম-এ পাশ করার পরে তিনি সিটি কলেজে অধ্যাপনার কাজ নিয়ে তাঁর কর্মজীবন আরম্ভ করেন। ১৯৩০ সনে যখন তিনি দিল্লীর রামযশ কলেজে ছিলেন, সেই সময়েই আমার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। বিয়ের ব্যাপারে তাঁর যে চারিত্রবৈশিষ্ট্য ছিল, তার কিছুটা পরিচয় এখানে দিচ্ছি।

আমাকে বিয়ে করার আগে এক ধনী ভদ্রলোকের মেয়ের সঙ্গে তাঁর বিয়ের প্রস্তাব আসে। তিনি নিজেই মেয়ে দেখতে গেলেন—সঙ্গে ছিলেন তাঁর মেসোমশাই (বরিশাল বাণীপীঠ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক) রসরঞ্জন সেন।

পাত্রীপক্ষের আদর আপ্যায়নের ত্রুটি ছিল না। মেসোমশাই ত' তাঁদের ব্যবহারে মুগ্ধ। কবি কিন্তু সব সময় চুপ করেই রইলেন। এমন কি সালঙ্কারা মেয়েটিকে দেখে ও তাঁকে বিলেতে পাঠাবার প্রস্তাব শুনেও কোন কথাই বললেন না। বাড়ি ফেরার পরে মেয়েটিকে পছন্দ হয়েছে কি না সে কথা বারবার জিগ্যেস করেও কবির কাছ থেকে কোন উত্তরই পাওয়া গেল না।

পরদিন দুপুরে আর একবার যাবার অনুরোধ জানিয়ে পাত্রীপক্ষ গাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। কবি তখনও যেন চিন্তা করছেন। মেসোমশাই তাঁকে যাবার জন্য তৈরী হতে বললেন। কিন্তু তিনি বললেন, 'তুমি যাও। আমি যাব না।'

'সে কি কথা? বিয়ে করবি তুই, আর যাব আমি?' মেসোমশাই ব্যস্ত হয়ে উঠলেন।

কবি কিন্তু ধীরভাবেই উত্তর দিলেন, 'যেখানে বিয়ে করব না বলেই ঠিক করেছি, সেখানে দ্বিতীয়বার যাওয়াটাও আমি অনুচিত বলেই মনে করি।'

সেদিন মেসোমশাই-এর শত অনুরোধও তাঁকে তাঁর সংকল্প থেকে টলাতে পারেনি।

আবার এ ব্যাপারে তিনি যে কতটা উদার ছিলেন, তার পরিচয় পেয়েছি আমার বিয়ের সময়। বিয়েতে একটিমাত্র আংটি ছাড়া—বোতাম, ঘড়ি অথবা আসবাব কিছুই তাঁকে দেওয়া হয়নি। কিন্তু সেই আংটিটির জন্যই তিনি কত লজ্জিত কত কুণ্ঠিত। যেন মহা অপরাধে অপরাধী। বিয়ের পরে বরিশালে গিয়ে তাঁর বড়পিসীমাকে বলেছিলেন ; 'তোমরা যদি বলে দিতে, তাহলে আমি নিজেই একটা আংটি কিনে নিয়ে যেতাম। আমার জন্য লাবণ্যর জেঠামশাইকে শুধু শুধু কতগুলো টাকা খরচ করতে হ'ল। তাছাড়া বিয়ে করতে গেলে কিছু না কিছু পেতেই হবে—এ নিয়মই বা আছে কেন?'

কবির কথা শুনে বড়পিসীমা হাসিমুখে উত্তর দিলেন, 'সমাজের দোহাই দিচ্ছিস কেন? তোরা না নিলেই পারিস। কিন্তু আমি তো দেখি বিয়ের সময় বেশীর ভাগ ছেলে বাপ-মায়ের অতিবাধ্য হয়ে 'বাবা-মায়ের কথার উপরে আমি কি কিছু বলতে পারি'—এই কথাই বলে বসে।'

কবি তাঁর এই তেজস্বিনী পিসীমাকে ভাল করেই চিনতেন। তাই আর কথা না বাড়িয়ে সেখান থেকে সরে পড়াই শ্রেয় মনে করলেন।

ফুলশয্যার রাতে তাঁর সর্বপ্রথম কথা হ'ল—'আমি শুনেছি তুমি গাইতে পার। একটা গান শোনাবে?'

আমি আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, 'কোনটা?'

'জীবন মরণের সীমানা ছাড়ায়ে, গানটা যদি জান তবে সেটাই শোনাও।'

আমার এখনও মনে পড়ে, প্রথমবার গাইবার পরে তিনি আরও একবার গাইতে বললেন।

অনেকদিন পরে আমি একদিন হাসতে হাসতেই জিজ্ঞাসা করেছিলাম, 'আচ্ছা, তুমি প্রথম দিনেই 'জীবন মরণের সীমানা' ছাড়াতে চেয়েছিলে কেন?'

তিনিও হেসেই উত্তর দিলেন, 'এই লাইন দুটোর অর্থ বল ত?'

"আজি এ কোন্ গান নিখিল প্লাবিয়া
তোমার বীণা হতে আসিল নামিয়া।"

আমি চুপ করেই দাঁড়িয়ে রইলাম। তিনি তখন আস্তে আস্তে বললেন, 'জীবনের শুভ আরম্ভেই তো এ গান গাওয়া উচিত এবং শোনাও উচিত।'

দুই

কবিতার খাতা ছিল কবির প্রাণ। সে-সব খাতা তিনি কাউকে ছুঁতেও দিতেন না। এমন কি তাঁর টেবিলের সামনে গেলেও তটস্থ হয়ে উঠতেন। কিন্তু প্রয়োজন বোধে—আমার জন্য সেসব খাতার চরম দুর্গতিও তাঁকে হাসিমুখে সহ্য করতে দেখেছি।

আমার বিয়ের কিছুদিন পরের কথা। যে যুগে স্বাধীনতাসংগ্রামের বীজ দিকে-দিকে, দেশে-দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল, নিজেকে সেই যজ্ঞে আহুতি দেবার জন্য বিনয়, বাদল, দিনেশ, প্রীতি হাসিমুখে এগিয়ে এসেছিলেন—আমি সেই যুগেরই মেয়ে। কাজেই ইংরেজের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হইনি।

একদিন সকালে হঠাৎ আমার নামে ওয়ারেন্ট ও বেশ কয়েকজন পুলিস নিয়ে আই বি ডিপার্টমেন্টের তিনজন অফিসার আমাদের বাড়িতে এসে হাজির। কবি তখন সামনের দিকের ঘরেই ছিলেন। একজন অফিসার তাঁকে জিগ্যেস করলেন, 'লাবণ্য দাশগুপ্ত কার নাম?'

কবি উত্তর দিলেন, 'আমার স্ত্রীর নাম।'

অফিসারটি সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'তাঁর নামে ওয়ারেন্ট আছে। আপনি কয়েকজন ভদ্রলোক ডাকুন। আমরা ঘর সার্চ করব।'

কবি নিঃশব্দে তাঁর ঘর দেখিয়ে দিলেন। দুটি ঘণ্টা ধরে পুলিসের তাণ্ডব নৃত্যের ফলে তাঁর অতিপ্রিয় কবিতার খাতাগুলির যা অবস্থা হয়েছিল তা দেখে আমার মত কাব্যরসবঞ্চিত মানুষের চোখেও জল এসে গিয়েছিল।

শুধু সার্চ করেই অফিসাররা থামলেন না। জেরার জন্য আমাকেও তাঁদের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হ'ল। তাঁরা একটা নাম জানবার জন্য অনেক চেষ্টা করে শেষে হাল ছেড়ে দিলেন।

এতসব গোলমালের মধ্যেও একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি। যিনি পদস্থ অফিসার, তিনি আমার পড়ার টেবিলের উপরে বসে কবির 'ঝরাপালক' নামে কবিতার বইখানি পড়তে আরম্ভ করে দিয়েছেন—মাঝে মাঝে কবির দিকে সম্ভ্রমের দৃষ্টিতে তাকাচ্ছিলেনও। যিনি প্রশ্ন করছিলেন, তিনি আমার খাটের উপরে বসেছিলেন।

সার্চ ক'রতে ক'রতে হঠাৎ আয়র্ল্যান্ড বিপ্লবের একখানা ইতিহাস পাওয়া গেল। বইখানা দেখে আমি নিজেও অবাক হয়ে গেলাম। সেখানা তো আমার নয়-ই—এমন কি কে এনেছে তাও জানি না। বই পেয়ে খাটের উপরের জন কবির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'দেখুন, আপনার স্ত্রী রীতিমত বিপ্লববাদীদের দলে যোগ দিয়েছেন।' কথাটা শুনে কবি কিছুক্ষণ হতবাক্ হয়েই রইলেন। পরে, আস্তে আস্তে বললেন—'আমার স্ত্রীর বিপ্লবের সঙ্গে কোনই যোগাযোগ নেই।'

'মশাই, এরা ঢাকার মেয়ে। এদের কতটুকু আপনি চেনেন?' মাথা উঁচু করে গর্বভরে অফিসার উত্তর দিলেন।

এ-কথায় কবির সমস্ত মুখে একটা ম্লান আভা ছড়িয়ে পড়ল। তিনি ব্যথাভরা চোখে আমার দিকে তাকিয়ে নীরবেই দাঁড়িয়ে রইলেন। টেবিলের উপরের জনও আমার দিকেই তাকিয়েছিলেন। খাটের আরোহী তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বই কি আপনার?'

'হ্যাঁ।'

'এরপর আপনার কি আর কিছু বলার আছে?' কথাটা বলার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি এক হাতে ওয়ারেন্ট ও অন্য হাতে কলম ধরলেন।

কবি তখনও নিষ্পলক চোখে আমার দিকে তাকিয়ে। আমি এবারে গম্ভীর হয়েই উত্তর দিলাম, 'বলবার আমার এইটুকুই আছে যে ওখানা বি এ ক্লাসে ইতিহাসের রেফারেন্স বই হিসেবে ব্যবহার করা হয়। ইচ্ছে হলে বি এম কলেজে খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন।'

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বেশ রাগের সঙ্গেই অফিসারটি বললেন, 'বি এ ক্লাসের বই আপনার কাছে কেন? তাছাড়া এতরকম গল্পের বই থাকতে বিদ্রোহের ইতিহাসই বা পড়েন কেন?'

আমি তখন হেসে ফেলেছি। হাসতে হাসতেই উত্তর দিলাম, 'আই এ-তে আমার ইতিহাস আছে। তাছাড়া ফরাসী বিপ্লবের ইতিহাসও বাংলার ছেলেমেয়েকে পড়তে হয় বলেই জানি। তবে আপনি যদি সঠিক খবর জানতে চান, তাহলে অবিশ্যি ইতিহাসের অধ্যাপককেই ডেকে আনতে হয়।'

আমার কথা শুনে অফিসারটি সম্ভবত অপমানিত বোধ করলেন। তাঁর মুখে বেশ একটা থমথমে ভাব দেখা গেল। কিন্তু টেবিলের উপরের জন হো-হো শব্দে হেসে উঠলেন। হাসি থামলে বললেন, 'ওহে, আর কেন? অনেকভাবেই তো পরীক্ষা করলে। এবারে nil লিখে দিয়ে উঠে পড়।'

কবির মুখের ম্লান আভা সরে গিয়ে ততক্ষণে সেখানেও হাসি ফুটে উঠেছে।

চলে যাবার সময় পদস্থ অফিসারটি পরমাগ্রহে কবির বইখানি চেয়ে নিলেন এবং সস্নেহে আমার দিকে তাকিয়ে বলে গেলেন, 'আমাদের জন্য অনেক কষ্টই আজ আপনাকে ভোগ করতে হ'ল।'

পুলিসের হাঙ্গামার জন্য অনেকেই আমার উপর বিরক্ত হলেন। কিন্তু কবিকে দেখে সত্যিই আমি অবাক হয়ে গেলাম। বিরক্ত তো তিনি হলেনই না, বরং আমি যে দেশের কথা চিন্তা করি সেজন্য তিনি গর্বই বোধ করলেন। কারো স্বাধীনতা খর্ব করতে অথবা ইচ্ছের বিরুদ্ধে কোন কাজ করাতে আমি তাঁকে কোনদিনও দেখিনি। তিনি সব সময়েই বলতেন, 'বড় হয়ে যে যেটা উচিত বলে মনে করবে সে সেটাই করবে। কারো তাতে বাধা দেওয়া ঠিক নয়।'

এ বিষয়ে একটি মজার ঘটনা বলি।

আমি যেবারে বি এ পরীক্ষা দিলাম, সেবারে কবি সেই কলেজেই (বরিশাল—ব্রজমোহন কলেজ) ইংরেজীর অধ্যাপকের পদে ছিলেন। ইতিহাস পরীক্ষার দিন শরীর খুব খারাপ বোধ হওয়াতে আমি পরীক্ষা দেব না স্থির করে বাড়ি চলে যাচ্ছিলাম। কিন্তু একজন অধ্যাপক আমাকে বাধা দেন। এমন কি আমাকে পরীক্ষা দিতে বাধ্য করাবার জন্য কবিকে ডেকে নিয়ে এলেন। তাঁর সামনেই আমি বললাম, 'আমি পরীক্ষা দেব না, বাড়ি যাব।' তিনি আমার মুখের দিকে ব্যথিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে বললেন, 'ইচ্ছে না থাকলে পরীক্ষা দিও না। শরীর বেশী খারাপ লাগলে বাড়ি চলে যাওয়াই উচিত।' কথাটা বলেই মুহূর্ত মাত্র সেখানে অপেক্ষা না করে নিজের কাজে চলে গেলেন। কিন্তু শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক হেমচন্দ্র ঘোষ কবির উপর ভীষণ চটে গিয়ে বলেই ফেললেন, 'বাড়ি যাবার অনুমতি তুমি দিতে পার, কিন্তু আমি কিছুতেই দেব না।' তাঁরই ব্যবস্থায় আমি পরীক্ষা দিতে বাধ্য হলাম। তিনি যদি সেদিন আমার জন্য অতখানি কষ্ট স্বীকার করতে এগিয়ে না আসতেন, তাহলে হয়ত নিজের পায়ে দাঁড়াবার সুযোগ আর পেতামই না।

আমরা যে সময়ে বরিশালে ছিলাম, তখন সেখানে স্ত্রী-স্বাধীনতা তো ছিলই না বরং

পর্দাপ্রথার প্রচলনই বেশী ছিল। আমাকে কলেজে যেতে হ'ত ঘোড়ার গাড়ির দরজা বন্ধ করে। বাড়িতে কোন ভদ্রলোক এলে তাঁর সামনে যাওয়া বা কথা বলার অধিকার আমার ছিল না। কারণ, এসব ব্যাপারে সমাজে খুবই সমালোচনা হত। কিন্তু কবি উৎসাহ যুগিয়ে লেখাপড়া শেখার সুযোগ করে দিতেন বলেই আমি অনেক কাজেই এগিয়ে যেতে পেরেছি।

একবার আমাদের বাড়িতে চুরি হয়ে গেল। খবর পেয়ে তো দারোগা এসে হাজির। কিন্তু তাঁর সঙ্গে কথা বলবে কে—সেটাই হল সমস্যা। আমার শ্বশুরমশাই বুড়ো মানুষ, কাজেই তিনি এ সব কথা-বার্তায় থাকবেন না। কবি তাঁর লেখা নিয়ে ব্যস্ত। তিনি তাঁর অমূল্য সময়ের একটুখানিও নষ্ট করতে রাজী নন। তবুও আমার শাশুড়ী কবিকেই গিয়ে বললেন, 'দারোগা এসে বসে আছেন। তুই একবার যা। বাড়িতে আর কোন ছেলে নেই। তুই না গেলে কথাবার্তা বলবে কে?'

'কেন লাবণ্য কোথায়?'—লিখতে লিখতেই কবি উত্তর দিলেন।

উত্তর শুনে আমার শাশুড়ী বিস্ময়ে আঁতকেই উঠলেন। 'ওমা, সে কি কথা! বাড়ির বউ দারোগার সঙ্গে কথা বলবে? কেন, তুই কি এদেশের রীতি-নীতির খবর রাখিস না?'

'দেখছি লেখাপড়া জানা মেয়ে বিয়ে করা ঠিক হয়নি। তাদের কোন সাহায্যই তোমাদের দেশে পাবার উপায় নেই। তা বেশ তো, সে না পারলে, তুমি নিজেই যাও, আমাকে আর বিরক্ত ক'র না।'—কথাগুলো শেষ করেই তিনি আবার নিজের কাজে মন দিলেন।

শাশুড়ী তখন বাধ্য হলেন আমাকে পাঠাতে। শেষ পর্যন্ত এই ব্যাপারে খবরাখবর দেওয়া, যা কিছু অলোচনা করা সবই আমি করলাম।

আগেই বলেছি, আমি শৈশব কাটিয়েছি ছোটনাগপুরের পার্বত্য অঞ্চল গিরিডিতে। শালবনের আলো-আঁধারি ছায়াঘেরা পথে ঘুরে বেড়িয়ে বর্ষায় উচ্ছল-যৌবনা পাহাড়ী নদী উশ্রীর রূপোলী ধারায় পা ডুবিয়ে এবং ছোট ছোট পাহাড়ের উপর দৌড়ঝাঁপ করেই আমার দিন কেটেছে। বন্ধন কাকে বলে জানতাম না। তাই বরিশালে প্রতিপদে পরাধীনতার শিকল ফাঁস হয়েই আমার গলা আটকে ধরল। টানাটানি করে সে ফাঁস আলগা করতে গিয়ে চোখের জলেই ভেসেছি, কিন্তু তাকে তার জায়গা থেকে একটুও নড়াতে পারিনি।

আমার সে পরাজয়ের গ্লানি কবির চোখে ধরা পড়েছে বইকি। তিনি তখন এই কথা বলেই আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছেন—'তুমি চোখের জল ফেলো না। আমি তোমাকে কথা দিচ্ছি, যেদিন বরিশালের এই আবহাওয়ার বাইরে যেতে পারব, আমার প্রথম কর্তব্য হবে তোমাকে স্বাধীন হবার সুযোগ দেওয়া। আজ তুমি যতটা কষ্ট সহ্য করছ, ভবিষ্যতে ঠিক সেই পরিমাণেই স্বাধীনভাবে তুমি চলতে পারবে। তখন যদি কেউ বাধা দিতে আসে, বোঝাপড়া হবে আমার সঙ্গে।' তাঁর সে কথা তিনি সত্যিই রেখেছিলেন।

১৯৫৪ সনের ১২ই মার্চ আমি যখন 'চলোর্মি' ক্লাব থেকে রঙমহলে রবীন্দ্রনাথের 'ঘরে বাইরে' বইতে মেজো বউরানীর পার্ট করলাম, তখন বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল বৈকি। কেউ কেউ এ মন্তব্যও করেছিলেন, 'তুমি কি শেষে তোমার বউকে স্টেজে নামাবে নাকি?' উত্তরে কবি বলেছিলেন, 'আমি এখনও মরিনি। আমার স্ত্রী কি করবেন না করবেন সে দায়িত্ব আমার উপরে ছেড়ে দিলেই সুখী হব। আর, এ তো সামান্য একটা ক্লাব থেকে থিয়েটার। যদি তাঁর ইচ্ছে থাকে—সিনেমাতে অ্যাকটিং ক'রতে দিতেও আমার আপত্তি হবে না।'

কবির সেই বজ্রগম্ভীর স্বর শুনে আমি নিজেও সেদিন কম অবাক হইনি। তাঁর সে চেহারা চোখ বন্ধ করলে আজও আমার সামনে ভেসে ওঠে।

একটি জায়গায় শুধু তাঁর ভীষণ আপত্তি ছিল। সেটি হচ্ছে—অসুস্থ শরীরে আমার পড়াশুনো করা।

বঙ্গ বিভাগের পরে যখন কলকাতায় স্থায়ীভাবে বাস করতে আরম্ভ করলাম, তখন পড়াশুনো অথবা চাকরী—দুটোর একটা করব বলেই ঠিক করলাম। কিন্তু কোনটাতেই কবির মত পাওয়া গেল না। বাধ্য হয়ে আমাকে কিছুদিন চুপ করে ঘরে বসেই কাটাতে হ'ল। শেষে আর বসে থাকতে না পেরে আমি ডেভিড হেয়ার ট্রেনিং কলেজে বি টি পড়তে গেলাম।

কিছুদিন আগেই 'অ্যানজাইনা' রোগটি আমার শরীরের উপর দিয়ে তার প্রথম আক্রমণপর্ব চালিয়ে গিয়েছে। জের তখনও ভালভাবে কাটেনি। কাজেই, কবির বাধা ঠেলে ভর্তি হবার কাজটা খুব সহজ হয়নি। অসুখটা হবার ফলে তাঁর একটা ধারণা হয়েছিল যে, আমার পৃথিবীর মেয়াদ শেষ হয়ে এসেছে, হঠাৎই একদিন সকলকে ফাঁকি দিয়ে আমি চলে যাব। সেজন্য সর্বদাই বলতেন, 'তুমি রাস্তাঘাটে যত খুশী দৌড়ে বেড়াও—আপত্তি করব না। শুধু গলায় একটা চাকতি ঝুলিয়ে রেখো।'

আমি যখন চটে গিয়ে কারণ জিজ্ঞাসা করতাম, তিনি তখন আর একদিকে ফিরে আস্তে আস্তে বলতেন—'না, চাকতিটা থাকলে মর্গ থেকে চিনে বের ক'রতে অসুবিধে হবে না। এই আর কি।'

কথাটা শুনে আমি আর কিছুই বলতে পারতাম না—শুধু তাঁর দিকে তাকিয়েই থাকতাম। আজ কেবলই মনে হয়—আমাকে মর্গ থেকে আনবার ভয়েই তিনি তাড়াতাড়ি আমার চোখের আড়ালে চলে গেলেন।

যাই হোক—বি টি কলেজে ভর্তি তো হলাম। কোর্সটা হ'ল ন' মাসের। কিন্তু চার মাসেরও বেশী আমি দুর্বলতার জন্য বিছানাতেই শুয়ে রইলাম। সুস্থ হয়ে যেদিন কলেজে রওনা হচ্ছি—কবি গম্ভীরভাবে বললেন, 'শোন, তুমি কোথায় যাচ্ছ? যদি কলেজ যাও, তবে আমি এখুনি প্রিন্সিপালের কাছে চিঠি পাঠাব কলেজের খাতা থেকে তোমার নামটা বাদ দেবার জন্য। তিনি যদি আমার কথা না শোনেন, তবে আমি তাঁর নামে কেস করব।'

আমার তখন মনে দারুণ চিন্তা—এত ক্ষতি হল, কী ক'রে পাস ক'রব। কাজেই তাঁর কথা কানে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই রেগে গিয়ে বললাম—'বেশ তো চেষ্টা করে দেখতে পার। কিন্তু তার আগে তোমার কবিতার খাতা সামলিও। আমার নাম কাটার সঙ্গে সঙ্গে তোমার কবিতার খাতাও পুড়ে ছাই হয়ে যাবে।' কথা শেষ করেই আমি কলেজে চলে গেলাম। যতক্ষণ দেখা গেল—দেখলাম, তিনি আমার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে আছেন।

কবিকে নিয়ে মুশকিল বাধল রেজাল্ট বের হবার দিন। সেদিন কোথায় গেল তাঁর কবিতা লেখা আর কোথায়ই বা কাজকর্ম। সকাল থেকে কেবলই বারান্দায় অস্থিরভাবে ঘুরছেন আর বলছেন—'দেখ, তুমি কিন্তু বেশী কান্নাকাটি করতে পারবে না। একে তো তোমার দুর্বল শরীর, তার উপরে যদি কাঁদতে শুরু কর—তবে তোমাকে বাঁচানই যাবে না।'

আমি অবাক হয়ে জিগ্যেস করেছি—কাঁদব কেন? কি এমন কারণ ঘটল, যার জন্য আমাকে কাঁদতে হবে?

তিনি আমতা ক'রে বললেন—'এই, বলছিলাম আর কি, আজ তো রেজাল্ট বের হবে। তাছাড়া এত অসুখে ভুগে তুমি তো আর পড়াশুনা করবার সময় পাওনি—পাস করাটা কি তোমার পক্ষে সম্ভবপর?'

'এ তো আচ্ছা লোকের পাল্লায় পড়লাম। স্ত্রীর যাতে নাম হয়, লোকে তার জন্য কত কিছু করে। তোমাকে দিয়ে তো সে সব কিছু হলই না। উল্টে পরীক্ষা দেবার পর থেকেই শুরু করেছ যে আমি ফেল করবই। পাস করতে পারি—এ কথাটা ভুলেও একবার মনে করতে পার না?' বেশ ঝাঁঝের সঙ্গেই কথাগুলি কবিকে শুনিয়ে দিলাম।

আমার কথা শুনে তিনি খুব দুঃখের সঙ্গেই বললেন, 'শুধু সান্ত্বনা দেবার জন্যেই এতবড় মিথ্যে কথাটা তোমাকে বলি কি করে? যদি কলেজটাও পুরোপুরি অ্যাটেণ্ড করতে পারতে, তাহলেও না হয় পাসের কথা ভাবা যেত। সবকিছু জেনেও আমি কেমন করে ভাবব যে, তুমি পাস করবে?'

সমস্তটা দিন তিনি নিজেও কোন কাজ করলেন না, আমাকেও রেহাই দিলেন না। পাস করব না ভেবে আমি নিজে যে একটু মন খারাপ করব সে সুযোগই পেলাম না।

সেই সময়ে আমার ছোট-জা শ্রীমতী নলিনী দাশ (এখন বেথুন কলেজের প্রিন্সিপ্যাল) ডেভিড হেয়ারে অধ্যাপিকার পদে ছিলেন। বিকেলের দিকে তিনি আমার নামে একখানি চিঠি দিয়ে একটি লোককে আমাদের বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন।

তখনকার অবস্থা অবর্ণনীয়। কবি দৌড়ে এসে চিঠিখানা ছোঁ মেরে নিয়েই লোকটিকে বিদায় করে দিলেন। তারপরে—নিজেও চিঠি খুলবেন না—আমার হাতেও দেবেন না। কবির অবস্থা দেখে আমি হাসব কি কাঁদব কিছুই বুঝতে পারছি না।

অনেকক্ষণ পরে তিনি চিঠিটা একটুখানি খুলে দেখেই হাসিমুখে আমার হাতে দিলেন। আমি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। মনে হল যেন পরীক্ষাটা আগে দিইনি, এতক্ষণ ধরে কবির সামনে বসেই দিলাম।

তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারলাম চিঠিতে আর যা-ই থাক না কেন, ফেলের সংবাদ নেই। থাকলে কবিকে সামলানোই দায় হত। চিঠি পড়ার পরে আবার তাঁর উল্টো কথা শুরু হল। 'হ্যাঁ, তুমি কি যাদু জান? তা না হলে—' ইত্যাদি ইত্যাদি।

পৃথিবী থেকে চিরবিদায়ের আগে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কবি যে অদ্ভুত মনোবল, অপরিসীম ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার পরিচয় দিয়ে গিয়েছেন—তা সত্যিই অতুলনীয়। আমার দেওর (কবির খুড়তুতো ভাই) ডাক্তার অমল দাশ আমাকে কতবার বলেছে, 'বৌদি, দাদা যে কি সাংঘাতিক যন্ত্রণা নীরবে সহ্য করছেন সেটা মানুষের কল্পনাতীত।' কিন্তু এই মানুষই আমাদের ব্যথা বেদনায় কতটা ব্যাকুল হয়ে পড়তেন—আমাদের সামান্য অসুখে কতখানি বিচলিত হতেন, তারই দু-একটি ঘটনা বলছি।

তখন আমরা বরিশালে ছিলাম। আমার ছেলে সমর (খোকন) সবে দু'বছরের শিশু। একদিন আমাদের পাশের বাড়িতে তারই সমবয়েসী এক খুড়তুতো ভাই-এর সঙ্গে খেলা করবার সময় পড়ে গিয়ে তার মাথার অনেকটা জায়গাই কেটে যায়। সে বাড়ির ঝি এসে আমাকে খবরটা দিতেই আমি ছুটে সেখানে চলে গেলাম।

গিয়ে দেখি সমর বারান্দায় দাঁড়িয়ে। মাথার রক্তে তার মুখ ভেসে যাচ্ছে। ফুঁপিয়ে কান্নার সঙ্গে ছোট্ট দু'খানি হাত দিয়ে রক্ত ঠেকাতে গিয়ে সে হাঁফিয়ে উঠছে। আমি তাকে কোলে তুলে নিয়েই এক ছুটে সোজা আমাদের স্নানের ঘরে ঢুকে তার মাথাটা নীচু করে

ধরে অনবরত জল ঢালতে লাগলাম। মাথা নিচের দিকে করাতে ছেলেও তারস্বরে চীৎকার শুরু করল। হঠাৎ পিছন থেকে কবির আর্তস্বর শুনতে পেলাম, 'মরে যাবে, ছেলেটা এখুনি মরে যাবে। শিগ্‌গির ওর মাথা সোজা কর। তোমাকে এ ডাক্তারি কে শেখাল?'

আমি মাথা না তুলেই উত্তর দিলাম—আমার ডাক্তারি নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে তুমি তাড়াতাড়ি আসল ডাক্তারকে ডাকার ব্যবস্থা কর।'

আমার কথা শুনতে পেয়ে বাড়ির চাকরটি দৌড়ে গিয়ে কবির বাল্যবন্ধু ডাক্তার অমল ঘোষকে ডেকে নিয়ে এল। ইঁটের আঘাতে মাথা কেটেছে শুনে প্রথমেই তিনি ইঁটের কুঁচি আছে কিনা সেটা ভালভাবে পরীক্ষা করলেন। তারপর কবিকে বললেন, 'সেলাই করতে হবে। তুই খোকনকে কোলে নিয়ে বোস।'

ব্যাস—কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই কবি ঘর থেকে উধাও। তাঁকে কোথাও দেখতেই পাওয়া গেল না। তখন আমিই ছেলেকে কোলে নিয়ে বসলাম। ডাক্তার সেলাই করলেন। প্রায় দশ মিনিট পরে দেখলাম—কবি জানালা দিয়ে ঘরে উঁকি দিয়ে ডাক্তারকে ভয়ে ভয়ে জিগ্যেস করছেন,—'কখন সেলাই করবি?' ডাক্তারও হেসে উত্তর দিলেন, 'সূচসুতো নিয়ে তোর অপেক্ষাতেই বসে আছি। তুই এলেই সেলাই করে ফেলব।' ছেলের মাথায় ব্যান্ডেজ দেখে তবে কবি নিশ্চিন্ত মনে ঘরে ঢুকলেন। তাঁর এই দুর্বলতার জন্য অবিশ্যি তাঁকে অনেক কথাই শুনতে হল, কিন্তু ছেলের দিকে তাকিয়ে সব কিছুই তিনি হাসিমুখে মেনে নিলেন।

আমার মেয়ে মঞ্জুশ্রী যখন খুব ছোট, তখন তার একবার আমাশা হয়েছিল। কিছুতেই সারে না। এদিকে মেয়ে তো দারুণ দুর্বল হয়ে পড়ল। শেষে এমন হল যে কিছুতেই আর বিছানায় শুতে চায় না। কেবলই বলত—' কোলে শুয়ে ঘুরব।' সে কাজ আমার দ্বারা হত না। কিন্তু আমি অবাক হয়েছি কবির ধৈর্য দেখে। মেয়েকে কাঁধের উপরে শুইয়ে রাতের পর রাত তিনি ঘরের ভিতরে ঘুরে বেড়াতেন। একটু ক্লান্তি বোধ করতেও কোনদিন দেখিনি।

এসব কথা লিখতে গিয়ে আজ কেবলি মনে হচ্ছে—আমাদের সামান্য অসুখেও যাঁর এত চিন্তা ছিল, আমাদের ব্যথা বেদনায় যিনি এতটা অধীর হয়ে পড়তেন—তিনি আজ কোথায়? সত্যিই কি তিনি পৃথিবীর মায়া কাটিয়ে আমাদের একেবারেই ভুলে যেতে পেরেছেন? না-কি অন্য কোথাও জন্ম নিয়েছেন?

কিন্তু তাঁর আবার জন্মাবার কথা চিন্তা করতে যাওয়াটাও আমার পক্ষে অসহ্য। কিছুদিন আগে কবির এক ছাত্র আমাকে বলেছিলেন, 'আমরা প্ল্যানচেটের সাহায্যে স্যারের আত্মা এনেছিলাম। পৃথিবীতে ফিরে আসার ইচ্ছে তিনি প্রকাশ করেছেন।'

একথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মনটা খারাপ হয়ে গেল। আমরা সত্যিই বড় বেশী স্বার্থপর। আমাদের প্রিয়জন পরলোকে চলে গেলেও আমরা তাঁদের মন থেকে বিদায় দিতে পারি না। কল্পনার ভিতরেও যতক্ষণ পারা যায় আঁকড়ে ধরে রাখতে চেষ্টা করি। তাঁরা অন্যরূপে আবার পৃথিবীতে আসবেন—কথাটা ভাবতে গেলেই যে আমাদের সে কল্পনার পরিসমাপ্তি ঘটে, তাইতো আমরা সে চিন্তা মনেও আনতে পারি না।

তিন

কবিকে অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকতে আমি খুব কমই দেখেছি। কিন্তু যদি কখনও সামান্য একটু জ্বরও হত, তিনি অস্থির হয়ে যেতেন। শুধু তাই-ই নয়—চাইতেন যে সবাই

এসে তাঁর কাছে বসে থাকুক। সেজন্যে বিছানায় শুয়েই বলতে আরম্ভ করতেন—'ওরে, তোরা কে কোথায় আছিস—আমার কাছে আয়। আমার শরীর যেন কেমন করছে—অবস্থা মোটেই ভাল বোধ হচ্ছে না—কতক্ষণ আছি কে জানে?'

তাঁর কথা শুনে সবাই (সবাই অর্থে আমি এবং আমার ছেলে সমর) যদি ছুটে তাঁর কাছে না যেতাম, তাহলেই তাঁর রাগ হয়ে যেত।

তখন আমি শিশু বিদ্যাপীঠ নামে একটি সেকেণ্ডারী স্কুলে সবে ঢুকেছি। একদিন রাত প্রায় ৯টার সময় বাইরে থেকে বেড়িয়ে এসে ঘরে ঢুকতে যাব, এমন সময় কবিকে বলতে শুনলাম, 'হ্যাঁরে খোকন, তোর মা কি বাড়ি ফিরেছেন?'

'খোকন' আমার ছেলের ডাক নাম। সে উত্তর দিল—"না।"

তিনি তখন বলতে শুরু করলেন—"তা ফিরবে কেন? এদিকে আমি যে জ্বরে পড়ে আছি—সেটা কে দেখে—কেই বা মুখে একটু জল দেয়?" বলেই মনে হল যেন সারাদিন রোদ-খাওয়া লেপখানাকে বেশ আরামের সঙ্গেই গায়ে জড়িয়ে পাশ ফিরলেন।

কবির কথা শোনার পরে আমি আর ঘরে ঢুকলাম না। নিঃশব্দে বেরিয়ে সোজা একটা ওষুধের দোকানে গিয়ে হাজির হলাম। কারণ আমি জানি যে কবির জ্বর হলেও সেটা অতি সামান্য। অ্যানাসিন খেলেই ঠিক হয়ে যাবে। একে তো শীতকাল, তাতে আবার বেশী রাত জেগে লেখাপড়ার কাজ করেছেন—তাতেই হয়ত শরীরটা বেশী খারাপ লাগছে।

শেষ পর্যন্ত দুটো অ্যানাসিন ট্যাবলেট নিয়েই বাড়ি ফিরলাম। ট্যাবলেট ও জলের গ্লাস টেবিলে রেখে বললাম, 'ওষুধ রইল। ডাক্তার আজ বার্লি খেতে বলেছেন।'

কবি এতটার জন্য তৈরী ছিলেন না। আমি যে তাঁর কথা শুনে ফেলব সেটা তিনি ভাবতেই পারেননি। কাজেই চুপ করেই রইলেন।

আমি অন্য ঘরে বসেই শব্দ শুনে বুঝতে পারলাম যে তিনি উঠে অ্যানাসিন খাচ্ছেন। খানিক বাদে আমি খোকনকে খেতে দেবার জন্য রান্নাঘরে গেলাম। তাকে থালায় ভাত দিয়েছি, এমন সময় বারান্দা থেকে কবির স্বগতোক্তি শুনতে পেলাম।—'এখন তো মনে হচ্ছে জ্বর আর নেই। গরম ভাত একটু ডিমের ঝোল দিয়ে খেলেও খাওয়া যেতে পারে। তখন কেন যে বেশী জ্বর বলে মনে হ'ল? না—অন্যায়টা তো আমারই। একটা মানুষ সারাদিন স্কুলে কাজ করে এসে সন্ধ্যেবেলা যদি একটু বেড়াতে না যায়, তবে তার শরীর টিকবে কি ক'রে?'

আমি কিন্তু চুপ করেই রইলাম। কিছুক্ষণ আর কোনও সাড়াশব্দ পেলাম না। বোধহয় খাবার ঘরে ঢুকতে একটু ইতস্ততঃ করছিলেন। তারপরেই দেখি খোকনকে ডাকতে ডাকতে খাবার জায়গায় এসে হাজির। ছেলেকে ডিম খেতে দেখে আর নিজেকে সামলাতে পারলেন না। তাড়াতাড়ি থালা নিয়ে বসে পড়লেন। ডিম ছিল তাঁর অতি প্রিয় খাদ্য। ছেলেকে ডিম খেতে দেখলে তিনিও তখন নিতান্তই ছেলেমানুষ হয়ে যেতেন এবং তার ভাগ থেকে কিছুটা ভেঙে মুখে দিতে তিলমাত্রও দ্বিধা বোধ করতেন না। সুতরাং তখন আর কি করি—ভাত তাঁকে দিতেই হল। আর তিনিও গরম ভাত ডিমের ঝোল দিয়ে খেয়ে তবে উঠলেন।

পরীক্ষা দিতে যাবার সময় আমার ছেলে-মেয়ে অথবা আমি কেউই কোনদিন পেন্সিল কেটে নিয়েছি অথবা কলমে কালি ভরেছি বলে তো মনে পড়ে না। এসব কাজ কবি নিজেই করতেন। তাঁর কাজ ছিল নিখুঁত। চিহ্নস্বরূপ এখনও তাঁর হাতের কাটা একটি পেন্সিল আমি সযত্নে রেখে দিয়েছি। পেন্সিলটি দেখলে স্মৃতির আলোড়নে কত কথাই ভেসে

আসে। জগতে জড় পদার্থের মূল্য কতটুকু! কিন্তু যার জন্য সেই জড় পদার্থ অমূল্য সম্পদ হয়ে ওঠে— যাকে নিয়েই স্মৃতির আলোড়ন—থাকে না সেই মানুষ। ভাঙা-গড়ার কাজে বিধাতাপুরুষ মানুষের মন নিয়ে যেন ছিনিমিনি খেলছেন। যে মনে চেতনা দিয়েছেন বলেই মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ জীব— আবার সেই মনকেই ভেঙে গুঁড়ো করে দিয়ে প্রিয়জনকে টেনে নিয়ে যেতে একটুও বাধছে না! বিধাতার এ কী খেলা।

কারো উপরে রাগ করে তিনি পাঁচ মিনিটও থাকতে পারতেন না। তাঁর ব্যবহারে অন্যে কষ্ট পাবে একথা বোধহয় তিনি ভাবতেই পারতেন না। কাজেই সেরাতের সেই মন্তব্যের জন্য তার পরদিন তিনি কিছুতেই স্থির হয়ে কাজে মন দিতে পারছিলেন না। আমিও গম্ভীর হয়েই রইলাম। এমনকি সন্ধ্যেবেলা বাইরেও বের হলাম না। একখানা বই হাতে নিয়ে খোকন যেখানে বসে পড়ছিল, সেখানেই বসে রইলাম। কিন্তু বেশ বুঝতে পারছিলাম, আমি বাইরে না বেরনোতে কবি কিছুতেই সোয়াস্তি পাচ্ছিলেন না। অথচ আমাকে কিন্তু বলতে সাহসও পাচ্ছেন না। হঠাৎ শুনি ছেলেকে জিজ্ঞাসা করছেন— "খোকন, কলকাতার সব সিনেমাই আজ বন্ধ নাকি রে?"

খোকনের বয়স তখন কম—নিতান্তই ছেলেমানুষ। সে তার বাবার কথার অর্থ ধরতে না পেরেই উত্তর দিল—'না বাবা, সিনেমা তো চলছে। বন্ধ থাকবে কেন?'

কবি হেসে বললেন, 'তুই জানিস না। তোর মাকে জিজ্ঞাসা করে দেখ, আজ সব সিনেমা হলের দরজাই বন্ধ।'

তখন আর কি করি। আমিও হেসে ফেলেছি। আমার মুখে হাসি দেখে তবেই তিনি নিশ্চিন্ত মনে লেখার টেবিলের সামনে গিয়ে বসলেন।

কবি যখন লেখার কাজ নিয়ে বসতেন, সে সময় কতদিন কতভাবে যে তাঁকে বিরক্ত করেছি, সেকথা বলে শেষ করা যায় না। এজন্য কিন্তু তাঁকে রাগ করতে কোনদিনই দেখিনি।

আমার একটা খারাপ অভ্যাস ছিল যে পরীক্ষার খাতা দেখার সময় বানান সম্বন্ধে সন্দেহ হলে কষ্ট করে অভিধানের পাতা না উল্টিয়ে সোজা কবিকেই জিজ্ঞেস করতাম। স্বভাবে আমি চিরকাল কবির একেবারে উল্টো। তিনি ছিলেন ধীর, শান্ত। আর আমি ধৈর্য এবং সহিষ্ণুতার ধার দিয়েও যাই না। প্রায় সময়ই তিনি আমার অভিধানের কাজ করে দিতেন। ফলে তাঁর নিজের কাজে বাধা পড়ত। মাঝে মাঝে বলতেন, 'দেখ, তোমার যেসব শব্দ অথবা অর্থের দরকার সেগুলো একটা কাগজে লিখে আমার টেবিলে রেখে দিও। তাহলে তোমাকেও চেঁচিয়ে গলাব্যথা করতে হয় না আর আমারও সময় নষ্ট হবে না।'

মঞ্জুশ্রী ও সমরের কাছে কবি শুধু বাবাই ছিলেন না—তাদের বন্ধুও ছিলেন। তাই তাদের যত কথা যত গল্প সবই ছিল তাঁর সঙ্গে। লেখক শ্রীসুবোধ রায় আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ির খুব কাছেই থাকতেন। তিনি প্রায় রোজই আমাদের বাড়িতে এসে কবির সঙ্গে নানারকম গল্প করতেন। সে গল্পে বাবার সঙ্গী হিসেবে সমরও নিয়মিতভাবেই যোগ দিতো। খেয়ে দেয়ে তাঁরা গল্প করতে বসতেন। সুবোধবাবুও সে পাট চুকিয়েই আসতেন। কোন কোন দিন রাত প্রায় একটা বেজে যেত—তবুও তাঁদের গল্প শেষ হত না। আমি এক ঘুম দিয়ে উঠে ছেলেকে তাড়া দিয়ে শুতে পাঠাবার চেষ্টা করলে সে দু-হাতে তার বাবাকে জড়িয়ে ধরে বসে থাকত। আমি রাগ করলে সুবোধবাবু ও কবি দুজনেই হাসতেন।

তাঁদের আসরে শুধু যে মজার মজার গল্পই হত, তা নয়। সাহিত্যের আলোচনাও হত।

ছোট ছেলে হয়েও সমর মন দিয়ে সেসব কথা শুনত। এমনকি মাঝে মাঝে সাধ্যমত নানারকম প্রশ্নও করত। কবি ও সুবোধবাবু দুজনেই যতটা পারতেন, তাকে বুঝিয়ে দিতেন। ছেলে যে সেসব কথায় কি স্বাদ পেত জানি না—মন দিয়ে বসে বসে শুনত। কোন কারণে যেদিন সুবোধবাবু না আসতে পারতেন, সেদিন সমরের মন খারাপ হয়ে যেত! সে তার বাবার কোল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে কেবলি জিজ্ঞাসা করত—'বাবা, সুবোধকাকা কখন আসবেন—কখন আমাদের গল্প হবে?'

ছেলের ম্লান মুখ দেখলে কবিও কোন কাজে মন দিতে পারতেন না। সবকিছু ফেলে ছেলের সঙ্গে গল্প করতে বসতেন। বাবার রোজকার সঙ্গী হিসেবে ছেলেও ক্রমে সাহিত্যকে ভালোবাসতে শিখল।

কোথাও যেতে হলে অথবা কোন কাজ শুরু করবার আগে তিনি প্রথমেই ছেলের মতামত জিগ্যেস করতেন। 'তুই কি বলিস?' ছেলে মত দিলে তিনি খুশী হয়ে সে কাজ করতেন। আমি হাসলে বলতেন—'বুড়ো হয়ে তো এই ছেলের উপরেই নির্ভর করতে হবে। এখন থেকেই তার তালিম নিচ্ছি'—কথাটা বলেই দুহাতে ছেলেকে জড়িয়ে ধরতেন।

ছোট ছেলের সিনেমা দেখা পছন্দ করতাম না বলে আমি সমরকে বিশেষ সিনেমায় যেতে দিতাম না। তবে, তার যেদিন যেতে ইচ্ছে হত, বাবাকে দিয়েই ব্যবস্থা করিয়ে নিত। বাবা ও ছেলে বুঝুক আর নাই বুঝুক—ব্যাপারটা কিন্তু আমার নজর এড়িয়ে যেতে পারত না। কোন এক রবিবারের দুপুর হঠাৎ আমার চোখে পড়ল—সমর তার বাবার কানে কানে ফিসফিস করে কি যেন বলছে। তিনি মাথা নাড়ছেন আর আমি যে ঘরে ছিলাম, সেদিকে আড়চোখে তাকাচ্ছেন। পর মুহূর্তে সমর বেরিয়ে গেল।

কিছুক্ষণ পরে আমি যেন কিছুই জানি না—এইরকম ভাব দেখিয়ে কবিকে জিজ্ঞাসা করলাম—'খোকন কোথায়, তাকে দেখছি না যে?'

তিনি আর একদিকে তাকিয়ে উত্তর দিলেন—'যাবে আবার কোথায়, কেন, তোমার কি দরকার? চাকরকে পাঠাও না।'

তাঁর কথার ধরনে আমি হেসে বললাম, 'তাকে তো কোথাও পাঠাতে চাইছি না। শুধু জানতে চাইছি সে কোথায় গেল।'

তখন তিনিও হেসে ফেলেছেন। হাসতে হাসতেই বললেন 'বাবা, তোমাকে কি ফাঁকি দেবার যো আছে? সে যেখানেই যাক, আমাকে বলেই গেছে। তুমি আবার তাকে বকাবকি করতে যেও না।'

সন্ধ্যেবেলা দেখি কবি বারান্দায় দাঁড়িয়ে কাকে যেন ইশারায় কি বলছেন। বুঝতে পারলাম ছেলে এসেছে। যাতে আমার চোখে না পড়ে তাই এই সতর্কতা। তখন আমি ঘর থেকে বেরিয়ে খোকনকে জিগ্যেস করলাম, 'কি বই দেখলি?' ছেলে বুঝল যে আমি রাগ করিনি। তখন হাসিমুখে আমার কাছে এসে দাঁড়াল।

'আচ্ছা মা, তুমি কি করে জানলে যে আমি সিনেমা দেখেছি?'

আমি হেসে উত্তর দিলাম—'আমার মন বলেছে।'

কবি তখন ছেলের কাঁধের উপরে একখানা হাত রেখে বললেন, 'তোর মাকে ফাঁকি দিয়ে কোন কাজ করার ক্ষমতা তোর কেন, তোর বাবারও নেই।'

মঞ্জুশ্রী স্কুল ফাইনাল পরীক্ষা পর্যন্ত তমলুকে তার পিসিমা শ্রীমতী সুচরিতা দাশের কাছেই ছিল। আমাদের কাছে এসে আই এ-তে ভর্তি হল। কবির কবিত্ব-শক্তির কিছুটা

অংশ নিয়েই সে জন্মেছে, আট বছর বয়েস থেকেই সে কবিতা লিখতে শুরু করে। প্রথম প্রথম ভাল না হলেও সে হতাশ হয়নি। দশ বছর বয়েসে ভালই লিখতে শিখল। মঞ্জুর সেই সময়কার একটি কবিতা তাঁর পিসেমশাই শ্রীচিদানন্দ দাশগুপ্ত কোন একটি পত্রিকায় ছাপিয়েছিলেন। মেয়ে যত না পড়াশুনা করেছে—কবিতা লিখেছে তার চাইতে অনেক বেশী। এ বিষয়ে সে তার বাবার কাছ থেকে যথেষ্ট উৎসাহ পেত।

বহুবার কবিকে বলতে শুনেছি—'লেখ, তুই লেখ। তোর মাকে দিয়ে ত' আর এসব কাজ হবে না। তুই-ই আমার নাম রাখবি।'

মেয়েও হাসত আর বলত, 'আচ্ছা বাবা, মা কেন কবিতা লেখেন না?'

'কাব্যলক্ষ্মী তোর মাকে ভীষণ ভয় পান যে, তাই তো তিনি তোর মায়ের ধারে-কাছেও ঘেঁষেন না।' হেসে কবি উত্তর দিতেন।

মঞ্জু তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করত—'সত্যি নাকি মা?'

'সেটা আমার চাইতে তোর বাবাই ভাল জানেন।' আমি গম্ভীর হয়েই উত্তর দিতাম।

কবি এবং তাঁর মেয়ের এই মনোভাবের ছোট্ট একটি ঘটনা বলছি।

এক ছুটির দুপুরে আমি ঘুমিয়ে পড়েছি। হঠাৎ মেঘের শব্দে জেগে দেখি ভীষণ বৃষ্টি হচ্ছে—আর বাইরে যত কাপড় মেলা ছিল সব ভিজছে। বাবা ও মেয়ের দৃকপাতও নেই। তারা দুজনে কবিতার আলোচনায় গভীরভাবেই মগ্ন।

আমি মেয়েকে বললাম—'কাপড়গুলো সব ভিজে গেল, তুই একটু কষ্ট করে তুলতেও পারিস নি।'

'ওমা, কাপড়গুলো বাইরে ছিল বুঝি?' মেয়ে হাসিমুখেই উত্তর দিল।

কিন্তু কবি বেশ বিরক্তির সঙ্গেই বললেন, 'তোমার কেবল সংসার আর সংসার। তুমি কি কিছুতেই তার উপরে উঠতে পার না? কোনদিনও দেখলাম না যে তুমি কবিতার আলোচনায় মুহূর্তের জন্যও যোগ দিয়েছ।'

আমি কাপড় তুলতে তুলতেই বললাম, 'আমি কাব্যজগতের ধার ধারি না। কবিতার চাইতে সংসারকেই বেশী ভালবাসি।'

কবিবন্ধু বুদ্ধদেববাবু একদিন কবিকে বলেছিলেন—'আপনার ঘরখানি দেখলে কবিতা আপনা থেকেই আসতে চাইবে। কিন্তু এ কৃতিত্ব কার? নিশ্চয়ই আপনার না।'

তাঁর কথার কোনও উত্তর না দিয়ে কবি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

মঞ্জুকে আমি প্রায়ই বলতাম, 'বড় হয়েছিস, কিন্তু রান্নাবান্না তো কিছুই শিখলি না।'

আমার কথায় মেয়ে সত্যি সত্যিই একদিন রান্নাঘরে এল। রান্নার কোন কিছু ধরেওনি—এমন সময় কবি কোথা থেকে দৌড়ে এসে বলতে শুরু করলেন, 'পুড়ে মরবার ইচ্ছে হয়েছে নাকি? শিগ্‌গির বেরো। তোর মায়ের যেমন কাণ্ড, তোকে শেষ না করে ছাড়বে না।'

মঞ্জু রান্নাঘর থেকে বের না হওয়া পর্যন্ত কবি সেখান থেকে এক পাও নড়লেন না।

তিনি নিজে ত' স্টাইলের ধার দিয়েও যেতেন না, কিন্তু মেয়ের বেলায় কতখানি যে চিন্তা করতেন তার প্রমাণ পেয়েছি ছোট্ট একটি ঘটনায়।

মঞ্জু তখন আই এ পড়ে। কবির অমত থাকা সত্ত্বেও আমি মেয়ের বিয়ের চেষ্টা করছিলাম। অবিশ্যি মেয়েকে না জানিয়েই। একবার একটি ছেলে মঞ্জুকে দেখতে এল। ছেলেটি ভাল ঘরের এবং বেশ ভাল চাকরি করে। তবে অতি সাদাসিধে। কবিকে যখন ছেলেটির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলাম, দেখলাম ছেলের চাইতে তার বেশভূষা—বিশেষ করে কোঁচার দিকেই তাঁর ব্যগ্র দৃষ্টি। আমি ব্যাপারটা তখুনি আঁচ করে নিলাম।

কবির তো এই ভাব—ওদিকে মেয়ের কাণ্ড দেখে তো আমি হতভম্ব। সে তো আর জানে না যে তাকে দেখতে এসেছে। যেন অদ্ভুত কিছু একটা দেখছে এমন ভাবেই দেখতে লাগল ছেলেটিকে।

ছেলেটি চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই কবি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'তুমি একে যোগাড় করলে কোথা থেকে?'

'কেন, ওর দোষটা কি হল?'

'না, দোষের কিছু হয়নি। তবে এই ছেলের সঙ্গে বিয়ে হলে একে ধুতি পরানো শেখাতে শেখাতেই মেয়ের জীবন কেটে যাবে।' মেয়ের দিকে তাকিয়ে বললেন,—'কি বলিস রে?'

মেয়েও ত' তেমনি—তখুনি উত্তর দিল—'ও বাবা, এই ছেলের সঙ্গে আমার বিয়ে হবে নাকি? যেভাবে উঁচু করে কোঁচা ঝুলিয়েছে—আমি তো বাঙালী বলে বুঝতেই পারিনি—'

'ঠিকই বলেছিস। একটু সাবধানে থাকিস। এরপরে তোর মা আবার কি এনে হাজির করবেন কে জানে?'

আমি তখন বেশ রাগের সঙ্গে বলতাম—'খুব হয়েছে। আর বলতে হবে না। কিন্তু মেয়ের বাবা যখন রোহিনী গুপ্তের মেয়েকে বিয়ে করতে গিয়েছিলেন, তখন তাঁর কোঁচাটা কত লম্বা ছিল শুনি?'

কবি তাঁর ঘরে যেতে যেতে আড়চোখে আমার দিকে তাকিয়ে বলতে বলতে গেলেন ঃ

"সে যুগ হয়েছে বাসী,
সে যুগেতে আর এ যুগেতে এবে
তফাৎ অনেক বেশি।"

হায়রে! অসময়ে এবং অতর্কিতে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় তাঁর এত আদরের মঞ্জু ও সমরকে দেখতে পাবেন না—তাদের কোলে টেনে নিয়ে বুকভরা শান্তি আর মনভরা তৃপ্তি কোনদিনই অনুভব করতে পাবেন না—একথা ভেবে না জানি কত দুঃখ, কত ব্যথা নিয়েই তাঁকে যেতে হয়েছে—তার নীরব সাক্ষী রইলেন শুধু অন্তর্যামী ভগবান।

চার

শিশুকাল থেকেই কবির অন্তরঙ্গতা ছিল তাঁর মায়ের সঙ্গেই সব চাইতে বেশী। কাজেই আদর আবদার যা কিছু সবই ছিল তাঁর কাছে। কিন্তু একান্নবর্তী পরিবারের বউ হিসেবে তাঁর বেশীর ভাগ সময় কাটত রান্নাঘরের নানা কাজে। তাই কবিকে বেশ খানিকটা সময় তাঁর ঠাকুমার কাছেই থাকতে হ'ত। সেই সময় তিনি কবিকে অনেক গল্প শোনাতেন। ঠাকুমার কাছেই তিনি শুনেছেন কীর্তিনাশার কীর্তিকথা। শুনেছেন তাঁদের পূর্বপুরুষের বহু কাহিনী।

বরিশালে বগুড়া রোডে ৫/৬ বিঘা জমির উপরে কবির ঠাকুরদাদা বাড়ি করেছিলেন। সেই জমির কোথায় আনারসের রং হলুদ হয়েছে, গাছে ক'টা আম ক'টা কাঁঠাল পেকেছে, কোন্ গাছটার জাম বেশী সুস্বাদু সবই ছিল তাঁর নখদর্পণে।

গ্রীষ্মের দুপুরে ঠাকুমা যখন তাঁর অতিপ্রিয় আচারের শিশি, বোতল অথবা আমসত্ত্ব রোদে দিয়ে কবিকে পাহারা দিতে ডাকতেন, তিনি সানন্দে রাজী হয়ে যেতেন। ফলে

আচার এবং আমসত্বের পরিমাণ রোজই কিছুটা কমে যেত। এ কাজ অবিশ্যি তিনি নির্বিকার চিত্তেই ক'রে যেতেন।

ঠাকুমার একজন ভাই ছিলেন। তিনি, কবি ও কবির ছোট ভাই আশোকানন্দ একই ঘরে শুতেন। কবির মুখেই গল্প শুনেছি—শীতের রাতে সেই ভদ্রলোকের লেপের কোণে মোটা সুতো অথবা সরু দড়ি বেঁধে তার মুখটা দুভাই নিজেদের হাতের ভিতরে রেখে দিতেন। তিনি যখন আরাম ক'রে লেফখানা গায়ে জড়িয়ে ঘুমোতে আরম্ভ করতেন, তখনই দেখা যেত সেখানা তাঁর গা থেকে আস্তে আস্তে সরে যাচ্ছে। আরামে ঘুমনো আর তাঁর হ'ত না। কিন্তু কিছু বোঝারও উপায় ছিল না। কারণ দু ভাই তো লেপমুড়ি দিয়েই ঘুমুচ্ছে।

সকালে এই ঘটনা শুনে কবির মা কিন্তু ঠিকই ধরে ফেলতেন—এ কাজ কাদের। এ জন্যে কিছু স্নেহমাখা শাসনও ভোগ করতেন অপরাধীরা।

বাবার সঙ্গে কবির সম্পর্ক ছিল অতি সম্ভ্রমের। তাঁর মনের মণিকোঠাটি ভরা ছিল বাবার প্রতি অপরিসীম শ্রদ্ধায়। সে শ্রদ্ধা পরিমাপের ক্ষমতা বাইরের জগতের ছিল বলে আমার মনে হয় না। বিশেষ প্রয়োজন ছাড়া তাঁর সামনে যেতে অথবা নিজে থেকে কথা বলতে তাঁকে আমি কোনদিনই দেখিনি। একদিনের একটি ঘটনা মনে পড়ে।

বরিশালে আমাদের কাপড় কেনার জন্য একটি দোকান ঠিক করা ছিল। আমার শ্বশুরমশাই চিঠি লিখে দিলেই সেই দোকান থেকে কাপড় আনা হ'ত।

শ্বশুরবাড়ি গিয়ে প্রথম থেকেই একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি যে সংসারের প্রত্যেকটি লোকের জন্য আমার শাশুড়ী হাসিমুখে এবং অক্লান্তভাবেই তাঁর কর্তব্য করে যাচ্ছেন, কিন্তু তাঁর কি দরকার বা কোনটা নেই সে কথা ভাববার দায়িত্ব কেউই নিতেন না। অথচ ছোটবড় সকলেই তাকে যেমন শ্রদ্ধা করতেন তেমনি ভালবাসতেন।

বরিশালের বাড়িতে প্রত্যেকেরই জন্মদিন পালন করা হত। শাশুড়ীর জন্মদিনে আমি দেখলাম, তিনি অতি আনন্দের সঙ্গেই সকলকে খেতে দিচ্ছেন, সকলের সঙ্গে হাসি গল্প করছেন, কিন্তু পরে আছেন একখানি আধময়লা শাড়ি। লোকে কি মনে করবে এই লজ্জায় তিনি ধবধবে ফরসা শাড়ি কিছুতেই পরতে চাইতেন না।

আমার কিন্তু খুবই খারাপ লাগল। আমি একবার কবিকে বললাম, 'তোমরা দুই উপযুক্ত ছেলে থাকতে আজকের দিনে মায়ের একখানা ভাল শাড়ি জুটল না?'

কবি অম্লানবদনে উত্তর দিলেন, 'কাপড় কেনার ভার বাবার হাতে। আমি ওসবের মধ্যে নেই। মায়ের শাড়ির দরকার থাকলে তিনি নিজেই বাবাকে বলবেন।'

একেবারে নতুন বউ বলেই কবির এ মন্তব্য শুনেও আমাকে চুপ করেই থাকতে হ'ল।

তার পরের বারে এই দিনটিতে সকাল-বেলাই কবিকে বললাম, 'আমি কাপড় কিনব। তুমি বাবাকে বল দোকানে একখানা চিঠি দিতে।'

আমার কথা শুনে তিনি রীতিমত আঁতকে উঠলেন 'ওরে বাবা! তোমার আবদার তো কম নয়। তোমার কাপড়ের শখ মেটাবার জন্য আমি বাবাকে বলতে যাব? পৃথিবী উল্টে গেলেও এ-কাজ আমার দ্বারা হবে না। তুমি মাকে গিয়ে বল।'

আমি তখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আচ্ছা আমি নিজেই যদি বলি, তিনি কি রাগ করবেন?'

কবি তখন আমার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য উত্তর দিলেন, 'তা একবার চেষ্টা করে দেখতে পার। কিন্তু এ বাড়িতে তুমি নতুন এসেছ। সেটা কি ভাল দেখাবে?'

আমি 'দেখা যাক' বলে সেখান থেকে উঠে সোজা আমার শ্বশুরমশাই-এর ঘরে গিয়ে

হাজির হলাম। তিনি তখন বিছানায় শুয়ে একখানা বই পড়ছিলেন। আমি তাঁর পাশে গিয়ে বসে কোনরকম ভূমিকা না করেই বললাম, 'বাবা আমি কপড় কিনব। দোকানে একখানা চিঠি লিখে দিন।'

দেবতা কাকে বলে জানি না। কিন্তু তাঁকে বোধ হয় আমি দেবতার চাইতেও বড় বলে মনে করতাম। তাঁর অন্তর্দৃষ্টি ছিল অতি প্রখর। আমার কথা শুনে আস্তে আস্তে বইখানি বন্ধ করে রেখে আমার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে বললেন, 'বেশ তো, বল, ক'খানা আনতে হবে? তুমি যে ক'খানা বলবে আমি তাই-ই লিখে দেব।'

মনের আনন্দ চেপে রাখতে না পেরে আমি অনেকগুলো শাড়ির ফরমাস দিয়ে ফেললাম। কেন যে শাড়ি কিনতে চাইছি সেটা কবি না বুঝলেও তিনি ঠিকই বুঝেছিলেন।

শ্বশুরমশাই-এর চিঠি পেয়ে এক ঘণ্টার মধ্যেই দোকানের একজন কর্মচারী দশ বারোখানা ভাল শাড়ি নিয়ে আমাদের বাড়িতে এসে উপস্থিত হল। কাপড় দেখে কবির তো চোখ কপালে উঠবার যোগাড়। 'সর্বনাশ! এ তুমি কি করলে? সত্যি সত্যিই বাবার কাছে কাপড়ের কথা বলতে পারলে? তোমার তো অনেক শাড়ি আছে, আবার না কিনলেই চলছিল না? না, তুমি আমাকে বরিশালে আর থাকতেই দেবে না দেখছি।'

আমি তখন শাড়ি বাছতে ভীষণ ব্যস্ত। মাথা না তুলেই উত্তর দিলাম, 'সেই রকমই তো মনে হচ্ছে।'

আমার কথা শুনে কবি খুব বিরক্ত হয়েই সেখান থেকে চলে গেলেন। আমি সাদা একখানা ভাল ঢাকাই শাড়ি বেছে নিয়ে বাকি সব কাপড় ফেরৎ দিলাম।

বিকেলে শাশুড়ী সকলকে খেতে দিতে যাবার আগে আমি তাঁর কাপড়ের আঁচল ধরে টেনে রেখে বললাম, 'আপনি এ বেশে যেতে পারবেন না। একটু বসুন।' বলেই আমি তাঁর হাতে একখানি চিরুণী দিয়ে বললাম, 'নিন, আগে চুলটা আঁচড়ে ফেলুন তো।' চুল আঁচড়ান হয়ে গেলে আমি সেই শাড়িখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিলাম।

তিনি তো হতভম্ব। অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে থেকে বিরক্তি প্রকাশ করলেন, 'এসব তোমার কি পাগলামি? আমার কি সাজবার বয়েস আছে? তাছাড়া এ শাড়ি পরে আমি লোকের সামনে বের হব কি করে?'

'তা কি করবেন? না হয় বেশি করে ঘোমটা দিয়েই যাবেন। কিন্তু এখানা না পরলে আমি আজ আপনাকে কোন কাজই করতে দেব না।'—হাসিমুখেই আমি উত্তর দিলাম।

তিনি আমাকে খুব ভালই চিনতেন। তাই আর ঘাঁটাতে সাহস না করে শাড়িখানা শেষ পর্যন্ত বাধ্য মেয়ের মত পরেই ফেললেন। তারপর আমি প্রথমেই কবিকে ডাকলাম। তিনি এসে তাঁর মায়ের দিকে তাকিয়েই বলে ফেললেন, 'বাঃ। কুসুমকুমারীকে তো বেশ দেখাচ্ছে।'

মা চলে যেতেই তিনি আমার দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে যেন আশীর্বাদই করলেন: 'বাবাকে বলে কোন কাজ করাবার সাহস আমার কোনদিন হয়নি এবং ভবিষ্যতেও হবে না। কিন্তু তুমি পারবে। সব অবস্থায় এগিয়ে যাবার মত সাহস এবং শক্তি তোমার আছে। এই শক্তিই তোমাকে উন্নতির পথে নিয়ে যেতে পারবে।'

কিন্তু মায়ের বেলা ঠিক উল্টো ব্যাপার ঘটতে দেখেছি। অথচ তিনি ছিলেন মা অন্ত প্রাণ। প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে মায়ের স্নেহকোমল স্পর্শ না পেলে কোন কিছুই তাঁর পরিপূর্ণ হয়ে উঠত না।

আমার শাশুড়ী চিরদিন পরের দরকারটাই বড় করে দেখেছেন। নিজের কথা ভাববার সময় তাঁর কখনই হত না। কতদিন দেখেছি—তাঁর প্রায় নতুন শাড়িখানা নিঃস্ব কোন পরিবারের বউ অথবা মেয়েকে দিয়ে দিচ্ছেন। যদি কখনও বলেছি—'মা, আপনার শাড়িখানা দিয়ে দিলেন?' তিনি হাসিমুখে উত্তর দিতেন, 'এই মেয়েটিকে সাহায্য চাইতে অনেক জায়গায় যেতে হবে। কাজেই একখানা আস্ত কাপড়ের যে এর একান্ত দরকার। তা ছাড়া আমাকে দেবার জন্য তো তোমরাই আছ। কিন্তু এই মেয়েটিকে দেবার যে কেউ-ই নেই মা।'

তাঁকে যদি হাত-খরচের জন্য দশটা টাকাও দেওয়া হত, তার আট টাকাই তিনি পরের জন্য খরচ করে ফেলতেন। তাঁর যে থাকল না, এ নিয়ে কোনদিন সামান্য একটু দুঃখ প্রকাশ করতেও আমি শুনিনি।

এসব ব্যাপারে কবি তাঁর মাকে ভালই চিনতেন। মা যখন ল্যান্সডাউন রোডে আমাদের বাড়িতে ছিলেন, তখনকার সময়ের একটি ঘটনা বলছি।

গ্রীষ্মের এক দুপুরে আমি বিছানায় শুয়ে এপাশ ওপাশ করছিলাম। নিদ্রা-দেবীর, বহু আরাধনা করে সবে ঘুমটা একটু এসেছে, এমন সময় কানে গেল, 'মিলু (কবির ডাক নাম) আমাকে একটা খাম দিবি?' কথাটা বার দুই শুনলাম। বুঝলাম, মা কবির কাছে খাম চাইছেন। কিন্তু যাঁকে বলা, তাঁর কানে আদৌ ঢুকেছে বলে মনে হল না।

বেশ কিছুক্ষণ পরে কবির গলা শোনা গেল ঃ 'আমাকে অনেকগুলো চিঠি লিখতে হবে। আমি পয়সা দিচ্ছি। তোমার যে কটা দরকার কাউকে দিয়ে আনিয়ে নাও। আর কাল হলে যদি চলে, তবে আমি নিজেই এনে দিতে পারি।'

কবির কথা শুনে মা চুপ করেই রইলেন। কিন্তু আমার আর সহ্য হল না। আমি কোনও কথা না বলে সোজা কবির ঘরে ঢুকে তাঁর টেবিল থেকে তিনটে খাম তুলে নিলাম। কবি হাঁ হাঁ করে উঠলেন, 'কর কি? কর কি? সব কটা খামই আমার লাগবে।'

আমি খাম নিয়ে চলে আসতে আসতে বললাম, 'পোস্টঅফিস সামনেই। সোজা গিয়ে নিয়ে এস।'

কিন্তু মজা হল এই—মা খাম তো নিলেনই না, উল্টে আমাকে বললেন, 'তুমি আবার ওর দরকারী খাম আনতে গেলে কেন? আমি তো আর নিজের জন্য চাইছি না। যাকে দেব, তাকে কাল দিলেও চলবে।'

আমি তখন রাগ করে খাম তিনটে কবির টেবিলেই ফেলে দিয়ে এলাম, সঙ্গে সঙ্গেই তিনি বললেন, 'এতদিনেও তুমি মাকে চিনলে না? আমি তো শোনা মাত্রই বুঝেছি যে, তিনি নিজের জন্য চাইছেন না।'

কবি অবিশ্যি তার পরদিনই মাকে খাম এনে দিলেন।

এইরকম বাবা মায়ের সন্তান হয়ে পৃথিবীতে আসতে পারায় কবি চিরদিন নিজেকে সৌভাগ্যবান বলেই মনে করেছেন। ঝড়, ঝঞ্ঝা, দুর্যোগের ঘনঘটা কালো আবরণে বহুবার তাঁর জীবনকে ঢেকে ফেলেছে—ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে পথ হারিয়ে দিশেহারা তাঁকে হতে হয়েছে বৈকি। কিন্তু তাঁর মা বাবার আশীর্বাদই আলো হয়ে তাঁকে পথের সন্ধান দিয়েছে। শত বাধা অতিক্রম করে সোজা হয়ে হেঁটে যাবার শক্তি যুগিয়েছে।

কবির কথা বলতে গিয়ে আজ মনে পড়ে কবির পরলোকগতা জেঠিমার কথা। মনে পড়ে তাঁর ছোট পিসিমার কথা। কাকা ব্রহ্মানন্দ দাশের সঙ্গে কবির সম্পর্কের কথা।

আমাদের জেঠিমা অতি অল্প বয়সে সর্বানন্দ পরিবারের বউ হয়ে এসেছিলেন।

সেকালের মেয়ে তিনি। বিয়ের আগে লেখাপড়ার কোন সুযোগই তাঁর হয়নি। কিন্তু পরে নিজের চেষ্টায় বাংলা ছেড়ে ইংরেজীও তিনি ভালই শিখেছিলেন। কারণ আমি বরিশালে গিয়ে তাঁকে বহু ইংরেজী গল্পের বই পড়তে দেখেছি।

এই জেঠিমা পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার পরে কবি আমাকে বলেছেন, 'স্বামী এবং ছোট মেয়েটিকে (তিনটি মেয়ের মধ্যে) হারাবার পর তিনি যেন দ্বিধাহীনভাবেই নিজেকে সকলের মধ্যে বিলিয়ে দিলেন। যেখানে অসুস্থ অসহায় মানুষ—সেখানেই আমাদের মমতাময়ী জেঠিমা। রাত দুপুরেও যদি তিনি শুনতে পেতেন যে, পাড়ার কেউ খুবই বিপদে পড়েছে, অথবা অসুস্থ হয়ে কষ্ট পাচ্ছে; তাকে দেখবার কেউ-ই নেই, তিনি তখুনি ছুটে চলে গিয়েছেন তার কাছে। জাতের সংস্কার কোনদিনই তাঁকে এইসব অসহায় দুর্বল মানুষের কাছ থেকে দূরে রাখতে পারেনি। এই সেবাপরায়ণা মহিমময়ী নারীর সান্নিধ্যে যিনিই এসেছেন, তিনিই নিজেকে ধন্য বলে মনে করেছেন—সান্ত্বনা পেয়েছেন মৃত্যুপথযাত্রী।'

মাতৃসমা জেঠিমা সম্বন্ধে কথাগুলি বলবার সময় কবির মনের দরদ এবং গভীর শ্রদ্ধা যেন প্রতিটি অক্ষরের ভিতর দিয়েই ঝরে পড়ছিল।

কবির কাকা ব্রহ্মানন্দ দাশের কোন ছেলে না থাকায় তিনি তাঁর দাদার এই প্রথম সন্তানটিকে মনে মনে হয়ত গভীরভাবেই স্নেহ করতেন। তাই শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে কবির অন্তিম শয্যাপাশে দেখেছি তাঁর অস্থির মনের ব্যাকুলতা। মুখে তিনি কিছুই প্রকাশ করেননি। শুধু দুটি হাত পিছনে মুষ্টিবদ্ধ করে অনবরত পায়চারি করেছেন। কি এক অব্যক্ত বেদনাভরে মাথা তাঁর নুয়ে নুয়ে পড়েছে। আমি নির্বাক হয়ে সবই লক্ষ্য করেছি। তাঁর তখনকার অবস্থা দেখে আমার মনে হয়েছে—তিনি শুধু যে কবির কথাই ভাবছেন, তা নয়, তাঁর দাদা এবং মেজো বৌঠানের (কবির বাবা, মা) কথা হয়তো স্মরণে আসছে তাঁর। কবির অবর্তমানে আমাদের কি হবে—এ কথাও হয়তো তিনি ভাবছেন।

এই কাকা সম্বন্ধে কবিকে বহুবার বলতে শুনেছি, 'আমাদের কাকাকে সহজে বোঝা যাবে না। মুখে তাঁর রুক্ষ ভাষা, কিন্তু অন্তরে তাঁর ফল্গুর ধারা। তাঁর কর্তব্যবোধ অসীম—পরিবারে তাঁর দানেরও সীমা নেই। কিন্তু সবই নীরবে। কোন প্রকার অভিব্যক্তিই তাঁর নেই।'

কবির ছোট পিসিমা চিরকুমারী স্বর্গীয়া স্নেহলতা দাশ যতদিন বেঁচে ছিলেন, পরিবারের সকলকে অন্তর দিয়েই আঁকড়ে ধরেছিলেন। মায়ের পরে এই ছোট পিসিমার সঙ্গেই কবিকে মন খুলে কথা বলতে এমন কি হাসি ঠাট্টা করতেও দেখেছি। আবার মাকে হারিয়ে এই পিসিমার মধ্যেই মায়ের অস্তিত্বকে আকুল হয়ে খুঁজে বেড়াতেও দেখেছি।

ছোট পিসিমা আমাদের ল্যান্সডাউন রোডের বাড়ি থেকে পণ্ডিতিয়া প্লেসে কাকার (শ্রীব্রহ্মানন্দ দাশ) বাড়িতে যাবার সময় যে মুহূর্তে বলেছেন, 'মিলু এবারে যাই', অমনি কবি তাঁর কবিতার খাতাপত্র ফেলে রেখে পিসিমার ডান হাতখানি জড়িয়ে ধরে বলতেন, 'এখনি কি যাবে? আর দু-একটা দিন থেকে যাও না। ভাইএর বাড়ি যাবার জন্য এত ব্যস্ত হয়েছ কেন? থাক, থাক। আরো যে কদিন পার, থাক না।' তারপর ছেলেকে ডেকে বলতেন, 'খোকন, দেখ তোর ভিপীমা (আমার ছেলে ও মেয়ে পিসীমাকে এই নামেই ডাকত) চলে যাচ্ছেন।'

খোকন তখন দৌড়ে এসে পিসীমাকে দু হাতে জড়িয়ে ধরে টানতে টানতে ঘরে নিয়ে গিয়ে বলত, 'ইস্। গেলেই হল? ঠাকুরমার বদলে এখন তোমাকেই আমাদের বাড়িতে থাকতে হবে।'

ছোট পিসীমা বহুদিন রোগশয্যায় পড়েছিলেন। শেষের দিকে একটু খেয়ালীও হয়েছিলেন। কারো কথাই শুনতে চাইতেন না। কিন্তু আমি যখনি কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করেছি, 'পিসীমা, আমাকে চিনতে পারেন?' তিনি এক গাল হেসে উত্তর দিয়েছেন, 'ওমা, তুমি মিলুর বউ, তোমাকে চিনতে পারব না?' তারপর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে বলেছেন, 'কাঁচা ছেলে মিলু চলে গেল। আর আমি পড়ে রইলাম', বলতেন, আর দু চোখ বেয়ে টপ্ টপ্ করে জল পড়ত। পিসীমার মুখের এ কথা থেকেই বোঝা যায় যে কবির স্মৃতি তাঁর অবচেতন মনের অনেকখানিই অধিকার করে ছিল।

কবি ছিলেন তাঁর বড় মামা প্রিয়নাথ দাশগুপ্তের অতি প্রিয়। তিনিই তাঁকে দীঘির জলে সাঁতার কাটতে শিখিয়েছিলেন—শিখিয়েছিলেন নানা গল্পের ভিতর দিয়ে আকাশের তারার সঙ্গে পরিচিত হতে।

বড় মামা যখন নৌকা করে কোথাও যেতেন, কবিকেও সঙ্গে নিতেন। তাই ছোটবেলা থেকেই বরিশালের গ্রাম্য প্রকৃতি, নদী, খাল এবং সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখের সঙ্গে আন্তরিক পরিচয়ের সুযোগ তাঁর হয়েছিল। কবির কবিত্বে অভিষেক হয়তো সেই তখন থেকেই।

পাঁচ

আপাতদৃষ্টিতে কবি ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির। কিন্তু সেই গাম্ভীর্যের আড়ালে লুকিয়ে থাকত তাঁর কৌতুক-প্রিয়তা। উপরে গাম্ভীর্যের একটা আবরণ থাকাতে তাঁর ঠাট্টা-তামাশা লোকে চট্ করে ধরতে পারত না।

আমি যখন বরিশালে ছিলাম, তখন সেখানকার নিম্নশ্রেণীর মধ্যে খৃষ্টধর্ম বহুল পরিমাণেই প্রচারিত ছিল। বগুড়া রোডে, আমাদের বাড়ির কাছেই বেশ খানিকটা জমি নিয়ে অক্সফোর্ড মিশন নামে ক্রীশ্চানদের একটি প্রতিষ্ঠানও গড়ে উঠেছিল। প্রতি রবিবার ওখানকার গির্জায় বিশেষ ভাবে উপাসনা হত এবং সকলকে ফাদারের কাছে পাপ স্বীকার করতে হত।

আমাদের বাড়িতে একজন ক্রীশ্চান বুড়ো-ঝি ছিল। বয়েস বেশী হয়ে যাওয়াতে কাজকর্ম বিশেষ কিছু করতে পারত না। কিন্তু অনেকদিন ধরে আছে বলে আমার শ্বশুরমশাই তাকে একখানি ছোট ঘর তৈরি করিয়ে দিয়েছিলেন। সে সেখানেই থাকত। বাড়ির ছেলেমেয়েরা—বিশেষ করে কবি ছিলেন তার বড় আপন—বড় স্নেহের। সেজন্য আমার বিয়ের পরে অন্যান্যদের সঙ্গে সেও আমাকে টাকা দিয়ে আশীর্বাদ করেছিল। তার বেশীর ভাগ দাঁতই পড়ে গিয়েছিল। আর—কুঁজো হয়ে হয়ে ছাড়া সোজাভাবে হাঁটতেই পারত না।

প্রতি রবিবারে ওই বুড়ো ঝি-ও যেত ফাদারের কাছে পাপ স্বীকার করতে। বুড়ো হওয়াতে মাথাটাও তার সব সময় ঠিক থাকত না। তার একটা ধারণা হয়েছিল যে হ্যাভোক নামে একজন ফাদার তাকে ভালবাসেন। এমন কি বয়সের পার্থক্য থাকা সত্ত্বেও (ফাদার হ্যাভোক বুড়ো ঝি-এর চাইতে বয়সে অনেক ছোট ছিলেন) তাকে বিয়ে করে সংসারী হতে তাঁর কিছুমাত্র আপত্তি নেই।

এ ধারণা হবার একমাত্র কারণ এই যে মিশনের সব ফাদার ভাল বাংলা বলতে পারতেন না। ফাদার হ্যাভোকও তাঁদের মধ্যে একজন। আমরা যেমন বলি, 'ভগবান

সকলকে ভালবাসতে বলেছেন। তাই আমরা তোমাদের ভালবাসি।' ফাদার হ্যাভোকও তেমনি বলতেন, 'প্রভু যীশু বল্‌সেন (বলেছেন) সকোলকে প্রেম ক'রটে (করতে)। টাই (তাই) হামিও (আমিও) টোমাকে (তোমাকে) প্রেম করি। সুণ্ডরমালা (সুন্দরমালা—বুড়ো ঝি-এর নাম) সটি-ই (সত্যিই) হামি টোমাকে প্রেম করি।'

এসব কথা সকলের কাছে গল্প করাতে পাড়ার ছেলেবুড়ো সকলেই তাকে বুঝিয়েছিল যে ফাদার হ্যাভোক তাকে সত্যিই ভালবাসেন এবং সে যদি রাজী হয়, তিনি তাকে বিয়েও করতে পারেন। তবে বিয়ের আগে তাকে দাঁত বাঁধিয়ে নিতে হবে। ফোকলা দাঁতে তো আর বিয়ে হতে পারে না। সকলের ঠাট্টার ফলে এ ব্যাপারে তার বিশ্বাস আরও দৃঢ় হয়েছিল।

পাপ স্বীকার করে ফেরার সময় সে সকলকে গালাগালি দিতে দিতেই ফিরত। তার সে-সব ভাষা আমরা ঘরে বসেও শুনতে পেতাম। বুড়ো ঝি-এর গলা শুনলেই কবি বারান্দায় এসে দাঁড়াতেন আর গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করতেন, 'কোথায় গিয়েছিলে? পাপ স্বীকার করতে বুঝি?'

কবিকে দেখেই সে একগাল হেসে উত্তর দিত, 'হয় (হ্যাঁ)।' তিনি তখন মুখের উপরে বেশ একটু চিন্তার রেখা টেনে প্রশ্ন করতেন, 'শুনলাম, ফাদার হ্যাভোক তোমার জন্য দাঁত বাঁধাতে দিয়েছেন। তোমাকে তিনি কিছু বলেছেন কি?'

ঘর থেকে আমার শাশুড়ী চাপা গলায় বলতেন, 'মিলু, থাম্। বুড়ো মানুষটার সঙ্গে আবার লাগতে গেলি কেন?'

যেদিন তার মন ভাল থাকত, কবির কথা শুনে হাসত। কিন্তু যেদিন রেগে থাকত, সেদিন বলত,—'হ্যাবোগ্যারে (হ্যাভোককে) মরণ দহায় (দশায়) পাইছে। দেহা (দেখা) করনের লেইগ্যা (জন্য) যত চ্যাষ্টাই করি না ক্যান, হেডায় (সে) কি দেহা দেয়? না হামনে (সামনে) আহে (আসে)? ক্যাবল আড়ালে আবডালেই রয়। রও, হেডারে (তাকে) একবার পাইয়া লই। হ্যার (তার) মতিগতি (মনোভাব) ভাল কইরাই (ভাবেই) বুইঝ্যা লইমু। বিয়া করনের ফিকির দেহায়—কাজের কালে ঢনঢন। বড় ফাদাররে কইয়া দেহাইমু (দেখাব) না মজাডা?'

আমার দাদাশ্বশুর (শাশুড়ীর বাবা) গৈলার চন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত একজন রসিকপুরুষ ছিলেন। তিনি অনেক হাসির গান লিখে গিয়েছেন। তিনি যখনই আমাদের বাড়িতে আসতেন, স্নান করার পরে আমরা তাঁকে শাড়ি পরতে দিতাম। তিনিও খুশী হয়েই শাড়ি লুঙ্গির মত পরে অনেক হাসির কবিতা আওড়াতেন।

দাদামশাইকে স্নান করে আসতে দেখলেই কবি সহাস্যে এগিয়ে এসে বলতেন, 'কি হে চন্দরনাথ, শাড়ির পাইড় পছন্দ হইছে? চুল আঁচড়ানের কাকই (চিরুণী) পাইছ? তোমারে আর কি দ্যাওন যায়—কও।'

আমার শাশুড়ী হাসি সামলাবার জন্য তাড়াতাড়ি সেখান থেকে চলে যেতেন। কবির কথার উত্তরে দাদামশাই এক হাতে আমাকে আর এক হাতে কবিকে জড়িয়ে ধরে গান ধরতেন—

'বাজার হুদ্যা কিন্যা আইন্যা চাইলা
দিছি পায়,
তোমার লগে ক্যামতে পারুম হইয়া

উঠছে দায়।

আরশি দিছি, কাকই দিছি, চুল
বাঁধনের ফিতা দিছি,
ব্যালয়ারী চুড়ি দিছি, আর কি
দ্যাওন যায়?
বুড়া-বুড়া কইয়া ক্যাবল, ক্ষ্যাপাইয়া
ক্যান কর পাগল?
যহন বিয়া করছ ফ্যালবা কেমতে কইয়া
দ্যাও আমায়।'

আমার শাশুড়ী ছিলেন বরিশাল মহিলা সমিতির সম্পাদিকা। সেজন্য নানা কাজে অনেকেই তাঁর কাছে আসতেন। কবিকে আমি কোনদিনই তাঁদের সামনে বের হতে দেখিনি। কিন্তু কোন কিছুই তাঁর চোখ এড়িয়ে যেত না।

একদিন যেমনি কালো তেমনি মোটা এবং বেঁটে এক মহিলা আমার শাশুড়ীর কাছে এলেন। তিনি চলে যাবার পরেই কি একটা দরকারে আমার শাশুড়ী কবিকে ডাকলেন। তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে প্রথমেই তাঁর মাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'হরসুন্দরী চলে গিয়েছেন?'

মা অবাক হয়েই প্রশ্ন করলেন, 'তুই কার কথা বলছিস?' কবি চটপট উত্তর দিলেন, 'কেন, এই যে কিছুক্ষণ আগে তোমার কাছে আসতে দেখলাম?'

মা তখন রাগতে গিয়েও হেসে ফেললেন।

আমি ছিলাম আমার শাশুড়ীর অতি আদরের। তিনি যে আমার নিজের মা নন, একথা আমি কোনদিনই ভাবতে পারিনি। তাই তিনি আমাকে রাগ করে কিছু বললে আমিও পাল্টা জবাব দিতাম। রাতে কথা কাটাকাটি হলেও পরদিন ভোরে দেখা যেত যে আমি উঠবার আগেই আমার জন্য চা ও খাবার হাতে তিনি দরজায় দাঁড়িয়ে আছেন। প্রথম দু-একদিন কবি বিরক্ত হয়ে আমাকে থামাতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু কয়েকদিন পরে যখন দেখলেন যে রাতে যত বেশী রাগারাগি, দিনে তত বেশী আদর, তখন তিনি আমাকে আর কিছুই বলতেন না। আমি রাগলেই শুধু একবার উঁকি দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েই স্বগতোক্তি করতেন, 'আমার নিজের মা, কিন্তু আমার সঙ্গে কেন যে এই রকম রাগারাগি হয় না? ভাল মন্দ কিছু খাবার কপাল তো আর করে আসিনি। কি আর করব।' তারপরেই আবার উঁকি মেরে জিজ্ঞাসা করতেন, 'আচ্ছা, কাল তোমার জন্য নতুন কি খাবার হবে—কিছু অনুমান করতে পার কি?'

আমি 'ওমা, দেখুন তো' বলে ঝাঁঝিয়ে ওঠার সঙ্গেই তাঁকে আর ধারে কাছে কোথাও দেখতে পাওয়া যেত না। কারণ, শাশুড়ী নিজে আমার উপর রাগ করলেও যদি কখনও শুনতেন যে কবি আমাকে কিছু বলছেন, তাহলে ছেলেকে কিছুতেই ছেড়ে কথা কইতেন না।

আদর শুধু যে শাশুড়ীর কাছেই পেয়েছি তা নয়, অনেক ব্যাপারে কবি নিজেও আমাকে যথেষ্টই প্রশ্রয় দিয়েছেন। আমি যে ছেলেবেলাতেই মা বাবা দুজনের স্নেহ হারিয়েছি সে-কথা তিনি নিমেষের জন্যও ভুলতেন না।

আমার বিয়ের দশ বারোদিন পরে ঢাকায় আমার জেঠামশাই-এর কাছে যাওয়া ঠিক হল। আমি মনের আনন্দে বাক্স গুছোতে বসলাম। অল্প ক'দিনের জন্য যাচ্ছি বলে শাশুড়ী একটা ছোট বাক্সে সামান্য কিছু জামা কাপড় নিতে বললেন। কিন্তু নেবার সময় আমি

কোনটাই বাদ দিতে পারছিলাম না। অথচ বাক্সেও আঁটে না। দুবার, তিনবার চেষ্টা করার পরেও যখন কিছুতেই পারা গেল না, তখন রাগ করে বাক্সটাকে উল্টে ফেলে দিয়ে উঠে গেলাম।

কবি কাছে বসে সবই দেখছিলেন। আস্তে আস্তে আমার কাছে গিয়ে বসলেন, 'তুমি তো গোড়াতেই একটা ভুল করে বসে আছ। অল্পদিন থাকলে ঐ ছোট বাক্সে কুলিয়ে যেত। তুমি না হয় বেশীদিনই থাকলে। থাকার ইচ্ছেটা তো তোমার। সেটা অন্যের কথায় কি করে হবে?' তখন আমার মুখে হাসি ফুটল। আমি বড় একটা বাক্স নিয়ে কাপড় গুছোতে বসলাম।

কিন্তু কোথায় গেল সে সব দিন? পর্দার বুকে ছায়াছবির মতই একের পর এক মিলিয়ে গেল। যা কিছু দেবার ভগবান আমাকে তো দরাজ হাতেই দিয়েছিলেন। কিন্তু সব হারিয়ে আজ আমি রিক্ত, শূন্য হয়েই বসে আছি।

লোকে জানে, কবি ছিলেন শান্ত, নিরীহ প্রকৃতির। অর্থাৎ এক কথায় যাকে বলে ভালমানুষ। তাঁকে চালানো খুবই সোজা। কিন্তু ছাইচাপা আগুনের মত সেই নিরীহ ভাবের নীচেই চাপা থাকত তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তবে অকারণ চিৎকারে সে ব্যক্তিত্বকে প্রকাশ করাটা তিনি কোনদিনই পছন্দ করতেন না। শান্তভাবে, অল্প কথার ভিতরই ছিল তাঁর অভিব্যক্তি। তাঁর এ পরিচয় আমি বহুবার বহুভাবে পেয়েছি।

তিনি মিলের মোটা ধুতি ছাড়া পরতেন না, এবং একটু উঁচু করেই পরতেন। আমি একদিন একখানা ভাল ধুতি কিনে কবিকে বললাম,—'কী যে তুমি মোটা মোটা ধুতি হাঁটুর উপরে পরে রাস্তা দিয়ে হাঁট। লোকে হাসে না?' কথাটা বলেই ধুতিখানা তাঁর দিকে এগিয়ে দিতে যাচ্ছিলাম।

তিনি তখন কি একটা লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন। ধুতিখানা ধরেও দেখলেন না। তাঁর মুখে সামান্য একটু বিরক্তির ভাবও প্রকাশ পেল না। শুধু লেখাটা থামিয়ে কিছুক্ষণ আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, 'দেখ, তুমি যে ভাবে খুশি সাজ-পোশাক কর, তোমার সে ইচ্ছেয় আমি কোনদিনই বাধা দেব না। কিন্তু আমাকে এ বিষয়ে তোমার ইচ্ছামত চালাতে বৃথা চেষ্টা কোরো না।'

তিনি রাগলেনও না, বকাবকিও করলেন না। কিন্তু আমার মনে হল কে যেন আমার শরীরের সমস্ত শক্তি টেনে নিয়েছে। আমি কোনও মতে নিজেকে টানতে টানতে সেখান থেকে সরে এলাম।

যতদিন তিনি পৃথিবীতে ছিলেন, আমার মুখ থেকে এ রকম কথা আর কোনদিনই বের হয়নি। যেদিন তিনি চিরদিনের মতই যাত্রা করলেন, সেই ধুতিখানাই পরিয়ে দিলাম। সেখানা বছরের পর বছর আমার বাক্সেই রাখা ছিল।

তবে আমার সে অন্যায় কাজে তিনি যে মোটেই রাগ করেন নি, তার প্রমাণ পেয়েছি স্বপ্নের ভিতর দিয়ে। এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম, তিনি স্নানের ঘরে ঢুকে তাঁর ধুতির খানিকটা জায়গা ধুচ্ছেন। আমিও ঠিক সেই সময় কি কারণে সেদিকে গিয়ে তাঁকে দেখে অবাক হয়েই তাঁর দিকে তাকিয়েছি। আমাকে দেখে সলজ্জমুখে তিনি বললেন, 'দেখ তো, কি মুস্কিল! আমার মাত্র একখানাই ধুতি। তাও আবার কাদায় ভরে গেল।' তাকিয়ে দেখি তাঁকে শেষ সময়ে পরানো আমার সেই ধুতিখানাই তিনি সযত্নে ধুচ্ছেন।

ঘুমটা আমার ভেঙে গেল। স্বপ্নের কোন অর্থ আছে কি না জানি না। তবে মনে হয়, আমি যে অন্য কাউকে না দিয়ে চার পাঁচ বছর ধরে তাঁর ধুতি রেখে দিয়েছি শুধু ভেবেই

তাঁর আত্মা কষ্ট পেয়েছে। তাই স্বপ্নের ভিতর দিয়েই তিনি আমার এতকালের অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষাকে পূর্ণতা দিয়েছেন।

সংসারের কাজ নিজের হাতে করতে আমি চিরদিনই ভালবাসি। কিন্তু সেই অবস্থায় বন্ধুদের সামনে বের হলে কবি খুবই বিরক্ত হতেন। তিনি মনে করতেন যে তাতে তাঁদের সঠিক অভ্যর্থনা বা আদর আপ্যায়ন করা হয় না।

ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে একদিন সকালের দিকে বালতি করে জল নিয়ে আমি বারান্দা ধুচ্ছি, ঠিক সেই সময় সদর দরজার কড়া নড়ে উঠল। আমার শাড়ি বেশ খানিকটা ভিজে গিয়েছে—ডান হাতে ঝাঁটা। চাকরটি অন্য কাজে আটকা থাকাতে আমি সেই অবস্থাতেই দরজা খুলে দিতে গেলাম।

দরজা খুলেই কিন্তু আমাকে আড়ালে সরে যেতে হল। কারণ, ভিতরে ঢুকলেন কবিবন্ধু অচিন্ত্যকুমার ও বুদ্ধদেববাবু। ততক্ষণে কবিও বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। তিনি যে খুবই বিরক্ত হয়েছেন সেটা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছিল। অথচ বন্ধুদের সামনে আমাকে কিছু বলতেও পারছিলেন না। চাকরকে ঝাঁটা বালতি সরিয়ে নিতে বলে আমি তাড়াতাড়ি রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলাম।

তাঁরা চলে যাবার পরে কবি খুব দুঃখের সঙ্গেই আমাকে বললেন, 'তুমি যে কি কর! বন্ধুবান্ধব মহলে আমার মানসম্ভ্রম আর থাকল না। অচিন্ত্য ও বুদ্ধদেববাবু আজ তোমাকে ঠিক কি ভেবে গেলেন।'

'তা কি করব বল? আমি তো জানতাম না যে তোমার বন্ধুরা আসবেন। জানলে কি আর ঝাঁটা হাতে তাঁদের সামনে যাই। কিন্তু আমাকে কি ভাবলে তো তোমারই ডিসকোয়ালিফিকেশন'—আমি উত্তর দিলাম।

তিনি কথাটার অর্থ ধরতে না পেরে অবাক হয়েই আমার দিকে তাকিয়ে রইলেন। তখন আমি হাসতে হাসতেই বললাম, 'তোমার চিন্তার কোন কারণ নেই। বুদ্ধদেববাবু তো আমাকে বিয়ের সময়ই দেখেছেন, সুতরাং আমি যে বেশেই থাকি না কেন, তিনি আমাকে চিনবেন বলেই মনে হয়। আর অচিন্ত্যবাবুর বাড়ির মেয়েরাও সংসারের কাজ করে থাকেন। তাছাড়া—তাঁকে তো রসিক বলেই জানি। কবি-জায়ার বদলে আমাকে ঝি ভাবলে ঠিকই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতেন: 'এই রকম ঝি কোথায় পেলে?'

সেদিন তিনি এমন জব্দ হয়েছিলেন যে ভবিষ্যতে এ প্রশ্ন আর কোনদিনই তোলেন নি।

প্রখ্যাত কবি এবং সাহিত্যিক প্রেমেন্দ্র মিত্র একদিন আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন। কবি তখন বাড়ি ছিলেন না। তিনি আমার সঙ্গে কিছুক্ষণ গল্প করে আবার একদিন আসার প্রতিশ্রুতি দিয়ে চলে গেলেন।

কবি বাড়িতে আসা মাত্রই আমি তাঁকে প্রেমেনবাবুর কথা জানালাম। খবরটা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সভয়ে বলে উঠলেন, 'সর্বনাশ, আমি বাড়ি থাকতেই ঝাঁটা হাতে আমার বন্ধুদের সামনে যেতে তোমার বাধে না, আর আমার অনুপস্থিতিতে প্রেমেনবাবু এসেছিলেন, তাঁর অবস্থাটা বুঝতেই পারছি। হয়ত বঁটি হাতেই হাজির হয়েছিলে।'

এত অতর্কিতে কবির পৃথিবীর মায়া কাটাবার নোটিস জারি হবে—সে কথা প্রেমেনবাবু কল্পনাও করতে পারেন নি। প্রতিশ্রুতি রাখতে হয়তো তিনি এসেছিলেন, কিন্তু কবিকে ফুলের সাজে খাটে শোয়া অবস্থায় দেখে হয়তো নীরবেই ফিরে গিয়েছিলেন।

বাল্যস্মৃতি

অশোকানন্দ দাশ

একজন ইংরেজ কবি তাঁর আত্মজীবনীর ভূমিকায় লিখেছেন "আমরা মহৎ ব্যক্তির জীবনী পাঠ করি এই উদ্দেশ্য নিয়ে যে তাঁর বিভিন্ন বয়সের বিচিত্র ঘটনা ও কাহিনী, তাঁর কীর্তিকলাপ, অথবা তাঁর জীবনদর্শনের উপর আলোকপাত করে। কিন্তু, যখন দেখি চরিতকার বাল্যজীবনের কাহিনী লিখতে গিয়ে বিস্তারিতভাবে প্রথম জীবনের কথা—তাঁর নার্স, গভর্ণেস ইত্যাদির কথা বলছেন, যাতে অনেক অসার বস্তু পাঠ করে কথঞ্চিৎ সারবস্তুর দর্শন পাওয়া যায়, তখন আমার ধৈর্যচ্যুতি হয়।" এই স্বল্পপরিসর রচনায় জীবনানন্দ সম্বন্ধে কিছু বলতে গিয়ে তাঁর বাল্যজীবনের অবতারণা করতে আমি তাই সঙ্কোচ বোধ করছি এইজন্য যে কেউ কেউ হয়তো ভাবতে পারেন যে এসব কথা তাঁর কাব্যের রসগ্রহণ করবার পক্ষে অপ্রাসঙ্গিক। আমার কিন্তু মনে হয় তাঁর বাল্য ও কৈশোরের জীবন, সেই বয়সের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের কথা ও যাঁদের সাহায্যে অভিজ্ঞতা লাভ হয়েছিল, তাঁর কাব্যের ক্রম-পরিণতির কথা জানতে চাই, তখন যে বৃক্ষ হতে তার জন্ম, যে মাটির রসগ্রহণ করে তার বৃদ্ধি, যে বৃন্তে ভর করে সে ঊর্ধ্বমুখী হল, যে আকাশ ও বাতাসের তলে তার বিকাশ, আমাদের পক্ষে এ সমস্তই জানার প্রয়োজন হয় না কি?

দাদা আমার চেয়ে পুরো তিন বছরেরও বড় নন। শৈশবে ও কৈশোরে অনেক সময়েই আমি তাঁর সাথী ছিলাম। আমাদের শৈশব অত্যন্ত আনন্দে কেটেছে। বাবা কম বয়সে ছেলেদের স্কুলে ভর্তি করার বিরোধী ছিলেন। ছোটবেলায় আমরা মায়ের কাছে লেখাপড়া শিখেছি। সে পাঠ খুব বেশীক্ষণের জন্য নয়। খেলবার, বাগানে বেড়াবার, প্রজাপতির পেছনে দৌড়াবার, ঘুড়ি ওড়াবার, প্রচুর অবকাশ ছিল। স্নেহের শাসন হয়তো ছিল, কিন্তু আমরা কোনোদিন প্রহার লাভ করিনি। সন্তান শিক্ষায় প্রহারের স্থান নেই, প্রহার লাভ করিনি। সন্তান শিক্ষায় প্রহারের স্থান নেই, প্রহার করে সন্তানকে শাসন করতে হলে তোমার নিজেরই পরাজয় হল, এরকম একটা ধারণা বাবার ছিল। সন্তানশিক্ষা সম্বন্ধে যে সব পুস্তিকা অথবা প্রবন্ধ তিনি নানা সময়ে লিখেছেন, সর্বত্রই খুব জোরের সঙ্গে এই কথা বলেছেন। সে যুগের ব্রাহ্মদের মধ্যে অনেকেরই Puritanism ছিল কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম ও সমাজের একনিষ্ঠ সেবক হয়েও বাবার মধ্যে কোনও Puritanism দেখিনি—বরিশালের দিগন্তবিসারী মাঠের মতই তাঁর হৃদয় উদার ছিল—অনেক হাওয়া ও অনেক আলো সেখানে চলাচল করত। সুতরাং আমাদের বাল্যজীবন বিশেষ কোনও বিধিনিষেধ অথবা অতিরিক্ত অনুশাসন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত ও নিষ্পেষ্ট হয়নি। পড়া, খেলা ও দৈনিক জীবন-যাপনের মধ্যে অনেকখানি স্বাধীনতা ছিল।

অতি প্রত্যূষে আমাদের ঘুম ভেঙে যেত। মা গান করতেন—

"মোরে ডাকি লয়ে যাও মুক্ত দ্বারে

তোমার বিশ্বের সভাতে
আজি এ মঙ্গল প্রভাতে
উদয়গিরি হতে উচ্চে লহ মোরে,
তিমির লয় হল দীপ্তি সাগরে,
স্বার্থ হতে জাগো দৈন্য হতে জাগো,
সব জড়তা হতে জাগোরে সতেজ উন্নত শোভাতে।"

বাবা উপনিষদের শ্লোক আওড়াতেন। এঁরা আমাদের "অপরূপ সূর্যচেতনার প্রভাতে নিয়ে আসতেন।"

শীতের প্রভাতে রান্নাঘরের উনুনের পাশে গোল হয়ে বসে—কমলালেবু রঙের আগুনের উত্তাপে উষ্ণ হয়ে, আমরা একান্নবর্তী পরিবারের জ্যেঠতুতো খুড়তুতো ভাইবোনেরা সদ্য তৈরী হাতে গড়া, আগুনে সেঁকা রুটি গুড়ের সঙ্গে পরমানন্দে খেতাম।

পরিচারকদের সঙ্গে ব্যবহারে পিতামাতার স্নেহ ও সহানুভূতির স্পর্শ থাকতো বলে তারা সকলেই তাঁদের অনুগত হত। বরিশালের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর লোক অত্যন্ত স্বাধীনচেতা। কোনও কারণে তাকে অবজ্ঞা বা অবহেলা করা হয়েছে মনে করলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, তখন সময়ে-সময়ে অত্যন্ত হিংস্র হয়ে ওঠে। বাল্যকালে আমাদের গৃহে এরকম বিপত্তি কখনও দেখি নি। পিতামাতা পরিচারক-পরিচারিকাদের পরিবারের লোক বলেই মনে করতেন। বাল্যকালে যারা আমাদের পরিচারক ও পরিচারিকা ছিল, যারা বাগানের কাজ করত, যারা দুধ জোগাত,—যতদূর স্মরণ হয়, তারা সকলেই আমাদের উপর অত্যন্ত দরদসম্পন্ন ছিল। তাদের নিকট থেকেও আমরা অনেক শিক্ষা পেয়েছি ও অনেক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে তারা সাহায্য করেছে।

প্রথমেই মনে পড়ছে অলী মামুদকে। ঋজু, দীর্ঘ দেহ, বার্ণডশীয় দাড়ি, মুখে গভীর প্রশান্তি, স্বল্পবাক। জীবনে অনেক দুঃখ পেয়েছে অলী মামুদ, কিন্তু মন তার নুয়ে পড়েনি, দীর্ঘ উন্নত দেহের মতই ঋজু। অত্যন্ত পরিশ্রমী। কর্মে অত্যন্ত নিপুণ। সুপুরি বাগানে এক গাছের মাথার থেকে অন্য গাছের মাথায় অবলীলাক্রমে লাফিয়ে যেত অলী মামুদ, আর আমাদের মন হরণ করত। সুপুরিবাগানে কাঁচা ও পাকা সুপুরি দুই ভাগে সাজিয়ে রাখতে-রাখতে পত্নীহীন-পুত্রহীন অলী মামুদ মৃদু ভাষায় আমাদের সঙ্গে অনেক গল্প করত। দড়ির ফাঁস পায়ে গলিয়ে দিয়ে সুপুরি গাছে উঠবার কৌশল তার কাছেই প্রথম আমরা শিখেছিলাম—দুটো নারকোল একসঙ্গে বেঁধে পুকুরে সাঁতার দেবার হাতে-খড়িও হয়েছিল তার কাছে। বেতের দড়ি দিয়ে বেড়া বাঁধারও কৌশলও সে শিখিয়ে দিয়েছিল। নানা ঋতুতে নানা কাজ করত সে—শীতে কমলালেবু বিক্রী, গ্রীষ্মে আম বিক্রী, বর্ষায় গৃহনির্মাণ, শরতে আঙিনা পরিষ্কার। সে গ্রামের লোক। গ্রামের অনেক গল্প শুনেছি তার কাছ থেকে, গ্রাম্য জীবনের অনেক ছবি দিয়েছে সে। মুগ্ধ হয়ে সে সব গল্প শুনতেন দাদা, নিজের মতন করে সে সব ছবি এঁকে রাখতেন তিনি হৃদয়ে। অলী মামুদের কাছে অনেক গাছ অনেক লতার নাম শিখেছিলাম আমরা—সেসব গাছ ও লতার প্রকৃতিও। নিসর্গের সঙ্গে প্রথম পরিচয় হয়তো তারই মধ্যবর্তিতায়।

দীনতা ও সরলতার প্রতিমূর্তি ফকির। স্ফটিক জলের মত তার চোখ। তার চোখের দিকে তাকালে তার হৃদয়ের অন্তস্থল পর্যন্ত দেখা যেত। অতি নিঃস্ব। ম্যালেরিয়ায় পীড়িত, কিন্তু মুখে সর্বদাই হাসি। দূরের গ্রাম থেকে সে আসত। একখণ্ড জমি ছিল গ্রামে, কিন্তু তার থেকে বিশেষ কিছুই হত না। তখনকার দিনে দরিদ্র কৃষকের একজন আমাদের এই

ফকির। আমাদের বাগানে কাজ করত। কাজ আছে বলে তাকে ডাকা হত না, যখনই তার প্রয়োজন হয়েছে বাবা তার জন্য কাজ সৃষ্টি করতেন। অন্য কোনও কাজ নেই হয়তো, বাবা বলতেন, "বর্ষায় ঘাস বড্ড বড় হয়েছে, সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে, তুমি এই ঘাস পরিষ্কার কর।" ঘাসের উপর কাস্তে চালালে দাদা কিন্তু কাতর হতেন। এই বিষয়ে অদ্ভুত সমঝদার ছিল ফকির। যে নবীন ঘাস আবার জন্মাবে সেই কচি ঘাস-শিশুদের স্বপ্ন দেখিয়ে প্রবোধ দিত ফকির, "কিছু ভাববেন না খোকাবাবু, কয়েকদিনের মধ্যেই আবার খুব সুন্দর নরম কচি ঘাস হবে।" বাগানে কাজ করতে-করতে ফকির আমাদের অনেক গল্প বলত— শস্যের ফসলের, সেই মাটির যে মাটির কাছে সে অকৃপণ দান কোনও দিন পায় নি। দাদা বলতেন, "ফকির হইয়ে এসেছ জীবনে, যাইবে তুমি ফকির হইয়ে।" দাড়ি নেড়ে, সরল আকর্ণবিস্তৃত হাস্যে ফকির সে-কথা গ্রহণ করত।

প্রহ্লাদ কলসী করে অতি প্রত্যুষে রোজ দুধ নিয়ে আসত। বর্ষার দিনে এক হাঁটু কাদা মেখে প্রহ্লাদ দেখা দিত। তার পোক্ত শরীর। ক্বচিৎ কদাচিৎ সে অনুপস্থিত হত। যে প্রপিতামহ একদিন লাঠি হাতে শত্রুকে ধরাশায়ী করত, প্রহ্লাদের সগর্ব পদক্ষেপে বোঝা যেত, সেই প্রপিতামহেরই রক্ত আজও তার ধমনীতে প্রবাহিত। সে সার্থক চাষী। প্রপিতামহ লাঠির প্রতাপে পথিকের কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ধনরত্ন আহরণ করত। প্রহ্লাদ তার পোক্ত শরীরের মেহনৎ দিয়ে মাটির গর্ভ থেকে ছিনিয়ে নিত শস্যের সম্ভার, সোনার ধান। নবান্নের দিন বড় এক ঘটি করে দুধ-গুড়-নারকোল-মাখা সুস্বাদু চাল আমাদের দিয়ে যেত। মাঝে-মাঝে তার গ্রামে নিয়ে গিয়ে কখনও কচি ধানের চারা, কখনও শস্যের ভারে অবনত শ্যামল ধান্যক্ষেত্র অত্যন্ত গর্বের সঙ্গে আমাদের দেখাত। দাদা ইংরেজি বা বাংলা কবিতা পড়ছেন, প্রহ্লাদ একহাঁটু কাদা নিয়ে বাইরে দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়ে তাই শুনছে, দেখা যেত। পড়া শেষ হয়ে গেলে সে বলত, "খোকাবাবু, আপনি বড় সুন্দর পড়েন।" সে-সব কবিতা প্রহ্লাদের বুঝবার কথা নয়, কিন্তু বোধ ধ্বনির সৌন্দর্য তার হৃদয়কে স্পর্শ করত।

সন্ধ্যার সময়ে আমরা অনেকদিন ঘুমিয়ে পড়তাম। ঘুমের থেকে জাগিয়ে খেতে নিয়ে যেত মোতির মা, 'পরণ কথা' (রূপকথা) বলবার ঘুষ দিয়ে। রান্নাঘরে কাঁঠাল কাঠের পিঁড়ি পেতে আমরা সবাই বসে খেতাম। পিলসুজের উপর প্রদীপ ম্লান আলো বিতরণ করত। সেই আধো-আলো আধো-অন্ধকারে মোতির মা'র মুখের দিকে চেয়ে গভীর মনোযোগের সঙ্গে গল্প শুনতাম। মোতির মা গল্প করবার সময়ে হাত নাড়ত, মুখ নাড়ত, নাসিকা স্ফুরিত হত, বস্তুত সমস্ত অবয়বের সাহায্য নিয়ে সে তার বক্তব্য প্রাঞ্জল করবার চেষ্টা করত। মোতির মা চাষীর মেয়ে। সব সময়েই রূপকথা বলত না, গ্রাম্য জীবনের কাহিনীও অনেক সময়ে তার কাছে শুনেছি। মাছ ধরার গল্প, প্লাবনের গল্প ও ডাইনীর গল্পও শুনেছি বলে মনে হচ্ছে। মোতির মা'র সঙ্গে তার দুই ছেলেকেও আমরা ফাউ পেয়েছিলাম মোতিলাল ও শুকলাল। মোতির মা বলত, মোতিনাল শুকনাল মাছের দেশের লোক, মাছ না-হলে তাদের খাওয়া হত না। মাছ ধরার কৌশল ওদের কাছ থেকেই আমরা শিখেছিলাম। আমাদের বাড়ীর বাঁশবনের থেকে বেছে-বেছে তলতা বাঁশের ছিপ তৈরী করা হত। মশক-দংশন সহ্য করে, পুকুর বা ডোবার নির্জন কিনারে, ঝোপ ঝাপের মধ্যে বসে আমরা কখনও-কখনও মোতিলাল অথবা শুকলালের সঙ্গে মাছ ধরেছি। পাড়ায় আমাদের বাড়ির সকলের স্বার্থরক্ষা করবার জন্য মোতির মা অত্যন্ত তৎপরতা দেখাত—মোতির মা'র গায়ে অত্যন্ত শক্তি ছিল, কণ্ঠের জোরও প্রবল ছিল, তার সঙ্গে এঁটে ওঠা সহজ ছিল না। দাদা বলতেন, "মোতির মা যদি পুরুষ হত আর একটু লেখাপড়া

শিখত, দেশের মধ্যে নামডাক হত ওর।" বাল্যকালের স্মৃতিতে অবগাহন করে আর একটি চরিত্রের সন্ধান পাচ্ছি। সে হচ্ছে মুনিরুদ্দি। মুনিরুদ্দি রাজমিস্ত্রী। অনেক ইমারত সে তৈরী করেছে, অনেক মন্দির, মসজিদ। সে গুণী। মজুরদের, কামিনদের উপর তার কড়া নজর। ছাদ পেটাতে-পেটাতে তারা শ্রম লাঘব করবার জন্য গান করছে, কিন্তু কোনও গাফিলতি করতে দেবে না মুনিরুদ্দি। কিন্তু রাজমিস্ত্রী—এই তার একমাত্র পরিচয় নয়। মুনিরুদ্দি বড় শিকারী। বলিষ্ঠ দীর্ঘ দেহ, ইস্পাতের মত বুক। বুট পরে, কালো কোট গায় দিয়ে বন্দুক হাতে নিয়ে যখন মুনিরুদ্দি আর তার ভাই লাখুটিয়া যখন কাশীপুরের জঙ্গলের দিকে বীরদর্পে যেতো, তখন তার অন্য মূর্তি। তখন তার কাছে যাই এমন সাহস আমাদের ছিল না। দূরের থেকেই ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধায় তার দিকে তাকিয়ে থাকতাম। যখন সে রাজমিস্ত্রীর কাজ করত, অবসরের সময় যখন মন-মেজাজ ভালো থাকত তার কাছ থেকে নানা রকমের শিকারকাহিনী শোনা যেত। দাদা খুটিয়ে-খুটিয়ে তার কাছ থেকে শিকারের অনেক তথ্য সংগ্রহ করতেন।

শিকারের কিছু-কিছু কাহিনী শুনেছি আমার পিতামহীর নিকট থেকে। কাকা ছিলেন Deputy conservator of Forests। অনেক শিকার করেছেন তিনি। আমাদের বরিশালের বাড়ীর দেওয়ালে তাঁর শিকার-করা হরিণের শিঙ, বন-মহিষের শিঙ, বাঘের মাথা টাঙানো থাকত। কি রকম সাহস ও তৎপরতার সঙ্গে সেসব শিকার করেছিলেন, ঠাকুমার মুখে কিছু-কিছু শুনেছি। তবে খুব তথ্যপূর্ণ বর্ণনা তাঁর কাছে শোনা যায় নি। অন্য রকম গল্পও ঠাকুমার কাছে শুনেছি। মা রান্না করতেন, সংসারের অন্য অনেক রকম কাজে ব্যস্ত থাকতেন। ঠাকুমা রাত্রে ঘুমোবার আগে বা রোগশয্যার পাশে বসে অনেক সময়েই আমাদের গল্প শোনাতেন। কীর্তিনাশা নদীর গল্প শুনেছি তাঁর কাছে। বিক্রমপুরের মেয়ে ছিলেন ঠাকুমা। সেখানকার বৃষ্টির দিনের গল্প, পদ্মানদীর গল্প, আমাদের পূর্বপুরুষদের গল্প মুগ্ধ হয়ে শুনতাম তাঁর কাছে, রোগের কষ্ট ভুলে যেতাম। অন্য কাকারা থাকতেন বিদেশে। আমরা সব সময়েই বরিশালে থাকতাম, তাই আমরা তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। বরিশালে বগুড়া রোডে আমাদের ৫/৬ বিঘা জমির উপর বাড়ি ছিল। সেই জমির ঝোপের মধ্যে কোথায় আনারসফলের গায়ে হলুদের ছোপ এসেছে, কাঁঠালগাছে কাঁঠাল কত বড় হ'ল, কত আম হয়েছে নানান গাছে এ-সব তাঁর নখদর্পণে থাকত সব সময়েই, কখনও হিসেবে ভুল হতো না। এক বিষয়ে কিন্তু তাঁর হিসেব অত পাকা ছিল না। গ্রীষ্মকালের দুপুরবেলা ঠাকুমা আচার, আমসত্ত্ব রোদে দিতেন—আমাদের প্রহরী রাখতেন। রক্ষকরা কিন্তু ভক্ষক হতো—আচার, আমসত্ত্ব রোজই কিছুটা কমে যেত। অন্য বিষয়ে অত্যন্ত প্রখর দৃষ্টি থাকলেও, এ-বিষয়ে জেনেও নীরব থাকতেন—তাঁর সমর্থন ও প্রশ্রয় দুই-ই ছিল। আচার, আমসত্ত্বের কথা বলতে গিয়ে দাদার কৈশোর বয়সের একটা কবিতার কথা স্মরণ হচ্ছে। নিচে উদ্ধৃতি করছি ঃ

এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
পায়রাগুলো উড়ে যায় কার্নিসের দিকে এলোমেলো।
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
ছেলেদের খেলা মাঠে মুহূর্তেই সাঙ্গ হয়ে গেল।
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
ছিপ ফেলে বাথানের দিকে ঐ চলে যায় কেলো।
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—

জল ধ'রে গেলে মাসী, তারপর কাঁথাগুলো মেলো!
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
গেল গেল আমসত্ত্ব—পোড়ামুখো বৃষ্টি সব খেল!
এল—বৃষ্টি বুঝি এল—
হরির মা কতগুলো ডাঁটো আম পেল।
ইত্যাদি।

ক্রমহ্রস্বমান আচার-আমসত্ত্বের কারণ দাদা বাৎলে দিতেন। ঠাকুমার প্রশ্নের জবাবে আমি তাই পুনরাবৃত্তি করে যেতাম। ঠিক স্মরণ নেই, ভক্ষকের তালিকায় বৃষ্টি ও রোদের নামও থাকত বোধ হয়। ঠাকুমা মনে-মনে হাসতেন—আমাদের ছলনা বুঝে ফেলেছেন, এমন কথা কোনও দিন বলেন নি। বড়মামা ছিলেন Bengal Civil Service-এ। নির্ভীক, সত্যাশ্রয়ী। আমরা দু-ভাই তাঁর অত্যন্ত প্রিয় ছিলাম। আমরা যখন খুব ছোট ছিলাম—যখন সাঁতার শেখা হয় নি—বড়মামা আমাদের পিঠে নিয়ে দীঘির জলে সাঁতার কাটতেন, ভয় ভাঙ্গাবার জন্য। বড়মামা শিশুদের বন্ধু ছিলেন। তাদের সঙ্গে মিশে, তাদের একজন হ'য়ে গল্প করতে ভালোবাসতেন বড়মামা। নানা বিষয়ের পুস্তকপাঠে অনুরাগ ছিল দাদার ছোটবেলা থেকেই। তাই বড়মামা ঘণ্টার পর ঘণ্টা দাদার সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করতেন, গল্প বলতেন। মামাবাড়িতে যখন যেতাম, রাত্রিতে আঙিনার উপর মাদুর পেতে আকাশের তারার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতেন মামা। এই বিশাল সাম্রাজ্যের সঙ্গে অতি ছোটবয়সেই আমাদের প্রথম পরিচয় হয়েছিল মামার কল্যাণে। মামা যখন নৌকায় করে মফস্বল যেতেন, আমরাও কখনও কখনও তাঁর সঙ্গী হতাম। এই উপায়ে বরিশালের গ্রাম্য প্রকৃতি, অনেক নদী-নালা-খালের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল।

ছোটবেলার থেকেই দাদা নানা বিষয়ের বই পড়তে ভালোবাসতেন। তখনকার দিনে আজকালকার মত ছোটদের পড়বার বই বেশি ছিল না। রামায়ণ ও মহাভারত দাদা অনেকবার পড়েছিলেন। তাঁর মনের খোরাক জোগাবার জন্য বাবা মাঝে-মাঝে একটা Exercise Book-এ গল্প ও নানা বিষয়ের সরস রচনা প্রাঞ্জল ভাষায় লিখে রাখতেন। বাবা প্রত্যেক মাসের প্রথম সপ্তাহে একবার করে বই-এর দোকানে নিয়ে যেতেন। সে-দিনের জন্য আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করতাম। আমার চোখে এখনও ভাসছে সন্ধ্যাবেলায় বই-এর দোকানে যাবার সেই স্মৃতি। বাবা আগে-আগে চলছেন নিজের চিন্তায় বিভোর হয়ে, আমরা দু-ভাই পিছনে-পিছনে চলছি, দাদা খুব উত্তেজনার সঙ্গে কি নূতন বই দেখবেন ও কিনবেন তার জল্পনা-কল্পনা করতে করতে।

ছোটবেলা থেকেই আমাদের রক্তে—বিশেষ করে দাদার—হাঁটার নেশা ছিল। স্মরণ-প্রান্তের প্রায় শেষ সীমানায় গিয়ে মনে হচ্ছে, পঞ্চাশ বছর পূর্বে খুব ছোটবেলায় নেপালে নয়—নেপালের কাছে সুপোলে গিয়েছিলাম। রোজই সকালে ও সন্ধ্যার প্রাক্কালে সেখানকার জনবিরল উদার প্রান্তরে আমরা হেঁটেছি। মাঠে হাঁটতে-হাঁটতে, আকাশের বুকে মেঘ পাল তুলে সাঁতার কেটে যাচ্ছে দেখে, দাদা বলতেন, "জানিস, বড় হ'য়ে আমি এমন নৌকা তৈরী করব, যাতে করে তুই ঐ মেঘের মতন আকাশে বেড়াতে পারবি।" মনপবনের নৌকার যাঁরা মাঝি, তাঁরা বলতে পারবেন সে-রকম নৌকা তৈরী হয়েছে কি-না। প্রায় ছোটবেলা থেকেই বরিশালের উপকণ্ঠে শ্মশানভূমির পাশ দিয়ে আমরা দু-জনে হেঁটেছি, অবাক হ'য়ে কখনো-বা লাসকাটা ঘরের দিকে তাকিয়ে দেখেছি। কখনও আরও দূরের পাল্লা, শহর ছাড়িয়ে গ্রামের পথে। বর্ষাকালে নদীর তীরে কত সন্ধ্যায় হেঁটেছি, নদী

যখন স্ফীত হয়ে পথকে ছুঁয়ে দিচ্ছে—, অথবা শীতকালে নদীর রেখা যখন বহুদূরে সরে গেছে, নদীর মধ্যে—ধান-ক্ষেতের মধ্যে নেমে গেছি, যে-সব ধান-ক্ষেত রাত্রির নীরব মুহূর্তে অন্ধকারে স্নান করে শীর্ণা নদীর সঙ্গে কথা বলে। নদীর ওপারে দেখেছি সবুজ অন্ধকার। গিরিডিতে উশ্রী নদী পার হয়ে বালুর তটে, আমলকী বনে বহুদিন হেঁটেছি। কখনও হেঁটেছি এপারে ক্রিশ্চান হিলের দিকে। কলকাতা ময়দানে, পার্কে, অলিতে-গলিতে উষাকালে অথবা গভীর রাত্রিতে বহুদিন হেঁটেছি। পুণা শহরে হেঁটে গেছি পার্বতী মন্দিরের চূড়ায়, যারবেদায় পর্ণকুটীরের পাশ দিয়ে, মূলা-মুথা নদীর সঙ্গমে, কাঞ্চীতে, লোনা ডোলার পথে। হেঁটেছি, বোম্বাই শহরের পথে-ঘাটে, মালাবার হিলে, ওয়ালীর সমুদ্রের পাশে, ভিক্টোরিয়া টার্মিনাস থেকে বান্দ্রায়, বান্দ্রা থেকে সাণ্টাক্রুজে, সাণ্টাক্রুজ থেকে জুহুর সমুদ্রতটে। হেঁটেছি দিল্লীর সড়কে-সড়কে যেখানকার ধুলোর সঙ্গে মিশে গেছে অনেক বিলুপ্ত নগরীর ধুলো ও বালি; হেঁটেছি শাহানশা বাদশাদের কবরের পাশে-পাশে—মসজিদ ও মিনারের কাছে, লোদী গার্ডেনে, ইয়ুসুফ সরাইতে মেহরৌলীর পথে। জীবনানন্দ শেষ ঘুমের আগে পর্যন্ত রোজই হেঁটেছেন এক নেশায় আক্রান্ত হয়ে, কোনও সাথীর সঙ্গে অথবা সাথীহীন হয়েও। শুধুই কি হেঁটেছেন শহরের অলিতে-গলিতে, পার্কে-ময়দানে, মনপবনের নৌকা চড়ে অতীত যুগের কত শহর, কত গ্রাম, কত অট্টালিকা, আধুনিক জীবনের কত পটভূমিতে, কত সাগর-সৈকতে, মানুষ-মনের কত অলিতে-গলিতে হানা দিয়ে এসেছেন।

বরিশালে দাদার বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের দিনগুলি বড়ই উজ্জ্বল ছিল। এমন পিতামাতা, এমন পরিবেশ। তখনকার দিনে বরিশালের জীবনে সমাজের বিভিন্ন স্তর ছিল না—ধনী ও উচ্চপদস্থ ব্যক্তি এমনতর গণ্ডী সৃষ্টি করত না। আমাদের অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কিন্তু পিতা বরিশালের সমাজে সম্মানের উচ্চ আসনে আরূঢ় ছিলেন। মূল্যচেতনা বিশুদ্ধ ছিল। মাতা তাঁর প্রতিভাবান পুত্রের সম্বন্ধে অগাধ আশা পোষণ করতেন। সেই আশা, সেই বিশ্বাস দাদার প্রথম যৌবনে প্রেরণা জুগিয়েছে, তাঁর নিজেরও দৃঢ় বিশ্বাস লাভ করতে সাহায্য করেছে। দাদা ধর্মের অনুষ্ঠান পরবর্তী জীবনে পছন্দ করতেন না, কিন্তু ব্রাহ্ম ধর্মের সারবস্তুতে বিশ্বাসবান ছিলেন। যে-ধর্মের হাওয়াতে দাদা বড় হয়ে উঠেছিলেন, উপনিষদের সে-ধর্মের নির্দেশ হচ্ছে, অন্ধকার থেকে আলোকে যাবার সাধনা। মানুষের জীবনে পতন আছে, অন্ধকার আছে, কিন্তু তা চিরন্তন নয়, উদ্যম ও সাধনাযোগে পতনকে পশ্চাতে ফেলে ধ্রুব সত্যে, আলোকে পৌঁছতে হবে। বিশ্বচরাচরের সর্বত্র, প্রকৃতির সমস্ত উপকরণে বিশ্ববিধাতার মহিমা ও ঐশ্বর্য প্রতিফলিত হয়েছে, উপনিষদুক্ত এই ধর্মের বাণী হচ্ছে এই। বাল্যে, কৈশোরে অথবা প্রথম যৌবনে তাঁর শিক্ষা-দীক্ষা, তাঁর পরিবেশ, এমন-কি তাঁর ধর্ম তাঁকে ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল জীবনের ছবি দেখিয়েছে।

তাঁর ছাত্রজীবনের লেখা প্রায় কিছুই নেই, ইংরেজীতে লেখা কয়েকটি সনেট এবং কবিতা ছাড়া। কীট-দষ্ট সে-সব খাতার থেকে কিছু-কিছু নীচে উদ্ধৃত হ'ল :

> "With a devotion deeper than the Saints'
> I feel the throbs of morn & eve
> As children to mother's bosom cleave
> Hushed in blissful sleep, without complaints
> I cling to this earth that hourly paints
> A new panorama winding up the sleeve—"

অথবা

"Like the robin I would chirrup and outpour
The delight of a crimson dewy draught."

অথবা

"Why with blubbering eyes we painfully look
At the noose of darkness on the crown of life,
Why can't we scathelessly brook
The buffet of the ever-wheeling strife
That life hurls on us–so that we may gain
A deeper wisdom–a profounder strain.
We are built with clay—but there is a lamp
Which burns bright and steady though fed with no oil
Of earthly days & bones of common foil
Which waters cannot quench nor mists can damp
'Tis our birthright–it is the stamp
With which was pressed this mortal coil
The spirit of man which time cannot spoil
Which cannot be spanned or cabinned in a camp."

অথবা

"He spun moonbeam
He sent sun
He has filled us
With beast & fun
And fire of hearth
In his realm
There is no dearth."

ছাত্রজীবনে বলেছিলেন, "Like the Robin I would chirrup and outpour." কিন্তু যে আশা ও বিশ্বাস নিয়ে তিনি কর্মজীবনে প্রবেশ করেছিলেন—সে আশা ও বিশ্বাসকে বহুদিন টিকিয়ে রাখতে পারেন নি। নিজের ইচ্ছায়, আদর্শের প্রেরণায় বাবা শিক্ষাব্রতী হয়েছিলেন। কিন্তু, শিক্ষাব্রতী হয়েও, অত্যন্ত অসচ্ছল অবস্থায় থেকেও বাবা তাঁর নিজের কর্মক্ষেত্রে যথেষ্ট সম্মান ও খ্যাতি-লাভ করেছিলেন। কিন্তু উনিশ শতকের মূল্যজ্ঞান ও বিংশ শতাব্দীর মূল্যচেতনায় অনেক প্রভেদ। বেশী ইনকাম-ট্যাক্স না দিলে এই যুগে ও এখনকার সমাজে প্রতিপত্তি লাভ করা সহজ নয়। যে আনন্দময় পরিবেশ, যে অপেক্ষাকৃত নির্দোষ পৃথিবীর আওতায় জীবনানন্দ বড় হয়ে উঠেছিলেন কোথায় সে অনন্যতুল সমাবেশ? দেখলেন মানুষের মন নির্মল ও নিঃস্বার্থ নয়, মূল্যচেতনা বিশুদ্ধ নয়। অগভীর, একান্তভাবে স্বার্থপর, লোভী মানুষের হৃদয়। সব জিনিসকে তাঁর শিক্ষা, তাঁর ধর্ম, তাঁর ঐতিহ্যবাদী মন মহামূল্য দিয়েছে, এ-যুগের লোক শুধু তাকে মহানগরীর ধূলায় নিক্ষেপ করে ক্ষান্ত হয় না, বুটের আঘাতে বিচূর্ণ করে পরমানন্দে নৃত্য করে। নিজের মূল্যচেতনায় দৃঢ় থাকতে গিয়ে তাঁকে তাই অনেক আঘাত সহ্য করতে হয়েছে। যে-সমাজের মূল্যজ্ঞান নেই বলে তিনি মনে করতেন, সেই সমাজকেই তিনি পরে বর্জন করে চলতেন। কেউ যেচে, আগ্রহ করে তাঁর নিজের কাছে এসে আলাপ না-করলে, তিনি কারো সঙ্গেই মিশতে চাইতেন না। যাঁরা রোমান্টিক কবিদের ভাবলক্ষণ সম্বন্ধে অবহিত, তাঁরা হয়তো জানেন

যে তদানীন্তন সমাজ ও সমাজ-ব্যবস্থার উপর যখন অনাস্থা ও বিরাগ হয়, তখন অপেক্ষাকৃত অধিক কল্পনাপ্রবণ কবিমানসকে প্রকৃতির সঙ্গে নূতন এক সংশ্লেষে প্রণোদিত করে। সংসারের নিষ্ঠুর ভয়ানক রূপ যখন আকস্মিক পরিবর্তনের প্রয়োজন সূচিত করে, অথচ বারম্বার সংস্কার অসম্ভব মনে হয়, তখন সংস্কারের প্রয়োজনাতিরিক্ত প্রাকৃতিক জগতে সান্ত্বনার অন্বেষণ কবির পক্ষে স্বাভাবিক।—"প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর—সেই কোন্ আদিম জননীর নিকট যেন, নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় নিস্তব্ধ কোনও অদিতির নিকট।" বিরাট কল্পনাশক্তির অধিকারী জীবনানন্দ সংসার ও সমাজের উপর অনেকটা বিরূপ হয়ে প্রকৃতির ধ্যানে মগ্ন হলেন—যে প্রকৃতি শিশুকাল হতে চিরদিনই তাঁকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে! এই নিবিষ্ট আত্মসমাহিত কবিকে প্রকৃতি কিন্তু ছলনা করেনি, তাই রসিক কবিতা-পাঠক জীবনানন্দের 'রচনার পূর্বে অনাবিষ্কৃত বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্যের, এক মণিময় দ্বীপের সন্ধান পেয়ে মুগ্ধ হন। তিনি তাঁর ভাবাবেগ প্রকাশ করতে গিয়ে চিত্র এঁকেছেন। এখানে চিত্রই হচ্ছে তাঁর ভাবাবেগের প্রকাশ—Poetic equivalent, চিত্রকরের তুলিকা ধারণ করে এই রূপরসগন্ধময় শ্যামলা ধরণীর সমস্ত রূপ ও সমারোহ, প্রকৃতির মনোরাজ্যের সমস্ত রহস্যাকে অত্যন্ত স্বচ্ছন্দতার সঙ্গে অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছেন। অনুভবগম্য, স্পর্শলভ্য এই চিত্রের মধ্যে কোনও অস্পষ্টতা নেই। Missal-এর (মঠের প্রার্থনাপুস্তকের) উপর অঙ্কিত মূর্তির মত স্পষ্ট ও পরম সুন্দর। বাংলা কবিতায় এ-বস্তু একান্তই অভিনব—জীবনানন্দের পূর্বে কোনও বাঙ্গলী কবি এতখানি বিশ্বস্ততার সঙ্গে প্রকৃতির ভাণ্ডারের ঐশ্বর্য ও মহিমা আমাদের অনুভূতির রাজ্যে নিয়ে এসেছেন এমন কথা আমার জানা নেই। শব্দ, স্পর্শ, এমন-কি স্বাদ ও গন্ধ পর্যন্ত তাঁর চিত্রমুকুরে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। এই অপূর্ব কবিতার স্বাদ গ্রহণ করে পাঠকের 'ইমাজিনেশন' তৃপ্তি পায়।

প্রকৃতিবর্ণনায় তাঁর পূর্ববর্তী কবিদের পদ্ধতি তিনি গ্রহণ করেন নি, কোনও বস্তুই তাঁর কাব্যে উপেক্ষিত হয় নি, কিন্তু তাঁর বর্ণনায় এমন অভিনবত্ব* আছে যে, অভ্যস্ত বস্তু পাঠে যে মনে জড়তা থাকে, সে-মন নিয়ে তাঁর কাব্যের রসগ্রহণ করা সম্ভব নয়। কল্পনা-অনুরাগী সজাগ মন নিয়ে তাঁর কাব্য পাঠ না করলে সমস্ত সৌন্দর্য উপলব্ধি করা চলে না।

মনে হচ্ছে ২০/২৫ বৎসর আগে সাহিত্যের বিষয়বস্তু কি হবে বা হওয়া উচিত তাই নিয়ে আমাদের দেশে সাহিত্যিক মহলে তুমুল আন্দোলন হয়েছিল। এই আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ থেকে আরম্ভ করে তখনকার দিনের নবীন সাহিত্যিকেরাও যোগ দিয়েছিলেন। আমাদের মনে শুধু বিষয়বস্তু নিয়ে নয়, সাহিত্যে এবং বিশেষ করে কাব্যে কি শব্দ ব্যবহারযোগ্য, কি শব্দ অচল, এ-সম্বন্ধে একটা বদ্ধমূল ধারণা ছিল। রন্ধনে যা উপাদেয়, সাহিত্যে তা অচল, এমন ধরনের একটা কথা কোনও প্রবীণ সাহিত্যিক উল্লেখ করেছিলেন, মনে হচ্ছে জীবনানন্দই প্রথম কাব্যে উপেক্ষিত অনেক শব্দকে—অনাদৃত অনেক কথাকে নির্বাসনদণ্ড থেকে মুক্তি দিয়েছেন। আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে সেই সব শব্দ ও কথা তাঁর কাব্যে

*কেউ-কেউ বলেছেন "অদ্ভুত"—ক্ষমা করবেন, তাঁদের এই শব্দ নির্বাচন আমার কাছে একটু অদ্ভুত বলেই মনে হয়েছে। কারণ, "অদ্ভুত" কথাটি "সৃষ্টিছাড়া" অর্থেই বহুলভাবে প্রচলিত। যদিও আধুনিক বাংলায় "অপরূপ" অর্থেও ব্যবহার হয়ে থাকে। যথাযোগ্য ভূমিকার সাহায্যে পাঠকের মন প্রস্তুত না করে নিলে শব্দের যথার্থ অর্থ বোধগম্য না হতে পারে। সুতরাং সমালোচনার ক্ষেত্রে এ শব্দ ব্যবহার না করাই হয়তো বাঞ্ছনীয়।

অজস্র ব্যবহার করেছেন। বিষয়বস্তু নির্বাচনে পূর্ববর্তী কবিদের অনুসরণ করেন নি—বিশেষ বিশেষ বিষয়ে পক্ষপাতিত্ব দেখান নি। কাব্যের বিষয় কি হবে, এর মীমাংসা হয়তো সহজ নয়। কিন্তু ইংরেজ সমালোচকের উক্তি "any subject is possible if you can get away with it"—তার যথার্থতা প্রমাণ করেছেন জীবনানন্দ; যা নিয়েই লিখেছেন তাকে কুশলতার সঙ্গে কাব্যরূপ দিয়ে। তাঁর হাতে বাংলা কাব্য শুধুই যে শব্দ-সম্ভারে সমৃদ্ধ হয়েছে তাই নয়, বিষয়বস্তু সম্বন্ধে যে সীমারেখা নির্ধারিত হয়েছিল, সেই গণ্ডীর থেকে মুক্তি পেয়ে বাংলা কাব্য প্রান্তরের অথবা অবাধ আকাশের উদারতা অথবা বলা যেতে পারে সমুদ্রের বিশালতার অধিকারী হয়েছে। সৎ ও সার্থক কবিতা না হলে অগ্রাহ্য হবে শুধুই এই নিষেধবাণী রইল। উপরে যা বলা হল, আশা করি, পাঠককে তা নিম্নে উদ্ধৃত "কয়েকটি লাইনের" মর্ম্মমূলে পৌঁছে দেবার পক্ষে যথেষ্ট হবে ঃ

"কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি ব'হে আনি;
একদিন শুনেছ যে সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা'—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন,
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ।
সৃষ্টির সিন্ধুর বুকে আমি এক ঢেউ
আজিকার ;—শেষ মুহূর্তের
আমি এক ;—সকলের পায়ের শব্দের
সুর গেছে অন্ধকারে থেমে ;
তারপর আসিয়াছি নেমে
আমি ;
আমার পায়ের শব্দ শোনা,
নতুন এ,—আর সব হারানো পুরোনো।"

কোনো-কোনো তথাকথিত সাহিত্যিকের মনে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে বা ছিল যে জীবনানন্দ কেবলমাত্র স্বপ্ন-বিলাসী—সংগ্রামশীল মানব-জীবনের গতি ও বেগ তাঁর কাব্যে প্রতিফলিত হয়নি, ইতিহাসবেদ থাকলেও সমাজ-বেদ নেই। আমার মনে হয়, জীবনে মাত্র পূর্বজ কবিতা পাঠ এবং অনভিনিবেশ পাঠের থেকেই এ-ধারণা হয়েছে। এ-কথা অবশ্য সত্য যে, জীবনানন্দ কোনো "প্রাক্-নির্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের দানা" বহন করে কবিতা লিখতেন না ; কারণ, তিনি মনে করতেন যে ও-রকম ধারণা নিয়ে বিশুদ্ধ কবিতা লেখা সম্ভব নয়। বিশুদ্ধ কবিতার এই ধারণা ইয়োরোপীয় কবিদের মধ্যেও দেখতে পাই; যাঁরা বলেছেন, "poetry is beauty & beauty is poetry" অথবা Yeats যেমন বলেছেন, "In the poets' church there is an alter but not pulpit". জীবনানন্দের মতে "চিন্তা, ধারণা, মতবাদ, মীমাংসা কবির মনে প্রাক্-কল্পিত হয়ে কবিতার কঙ্কালকে যদি দেহ দিতে যায়, কিম্বা সেই দেহকে দিতে চায় যদি আভা তাহলে কবিতা সৃষ্টি হয় না, পদ্য লিখিত হয় মাত্র। চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কাঠামোর পিছনে শিরা-উপশিরা ও রক্তের কণিকার মত লুকিয়ে থাকে।" অন্যত্র বলেছেন, "ইতিহাস-বেদের দরকার এবং সমাজ-বেদের; কিন্তু সব কবিতাই একই ভাবে

অথবা কোনও কবিতাই উত্তমর্ণ হিসেবে নয়; কবিতার চেয়ে তার উপকরণ বড় হবে না। এই সব বেদের একান্ত মর্মজ্ঞানের ভিতর থেকে যে-কবিতাগুলো ক্রমে ক্রমে তারপর উৎসারিত হয়ে এসেছে, আমার মনে হয়, সে-সব কবিতায় বেদ যথাস্থানে আছে,—কবিতাগুলোকে গ্রাস করতে পারেনি।" যাঁরা অভিনিবেশ সহকারে "সাতটি তারার তিমির"-এর কবিতাগুলো পড়েছেন, অথবা আরো শেষের দিকের কবিতা, তাঁরা জানেন, "বেদ" যথাস্থানেই আছে, সেসব "সুন্দরীর" রক্ত-স্পন্দনের মধ্যে সৎ পাঠক নিশ্চয়ই তা অনুভব করেছেন। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যেতে পারে "সাতটি তারার তিমির"-এর কবিতাগুলি। এর অনেক কবিতা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পটভূমিকায় লেখা, সভ্যতার সংকটের দিনে লেখা কবিতা। কৃষ্টি শেষ হয়ে যাচ্ছে, পৃথিবী ধ্বসে যাচ্ছে যখন। যখন

"চোখের উপরে
রাত্রি ঝরে ;
যে দিকে তাকাই
কিছু নাই
রাত্রি ছাড়া ;"

যখন প্রতারণা, মিথ্যাকথন, লোভ রয়েছে সমস্ত কলকাতা শহরে। সর্বত্রই। "চেৎলার হাট থেকে টালার জলের কল" পর্যন্ত যখন "জাঁহাবাজ"। "ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র বৌ সকলে নারাজ।" যখন "নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয় লিবিয়ার জঙ্গলের মত।" যখন

"বহু উপদেশ দিয়ে চ'লে গেলে কনফুশিয়াস—
লবেজান হাওয়া এসে গাঁথুনির ইঁট সব ক'রে ফেলে ফাঁস।"

যখন,—"কামাতুর লোকেরা নিপট কপট হয়ে বলে "এ রকম রিপু চরিতার্থ ক'রে বেঁচে থাকা মিছে।"

কিন্তু এই লোভ হিংসা রিরংসার দিনে, কৃষ্টির অবসানের দিনেও আমরা "সাতটি তারার তিমিরে" আশ্চর্য প্রতীতির কথা শুনতে পাই। তখনও মনে হয়েছে,

"সর্ব্বদাই কোনো এক সমুদ্রের দিকে
সাগরের প্রয়াণে চ'লেছি।"

জিজ্ঞেস করেছেন,

"জীবনের শুভ অর্থ ভালো ক'রে জীবনধারণ
অনুভব ক'রে তবু তাহাদের কেউ কেউ আজ রাতে যদি
অই জীবনের সব নিঃশেষ সীমা
সমুজ্জ্বল, স্বাভাবিক হয়ে যাবে মনে ভেবে—
স্মরণীয় অঙ্কে কথা বলে,
তাহ'লে সে কবিতা কালিমা
মনে হবে আজ?"

বলেছেন,

"আজকে সমাজ
সকলের কাছ থেকে চেয়েছে কি নিরন্তর
তিমির বিদারী অনুসূর্য্যের কাজ।"

অথবা

-তবু

মধ্যবিত্তমদির জগতে

আমরা বেদনাহীন,—অন্তহীন বেদনার পথে।"

যুদ্ধকালীন মানুষকে লোভের পর্বতে উঠতে দেখে, রিরংসার গহ্বরে নামতে দেখে প্রশ্ন করেছেন,

"তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে

আমরা কি তিমিরবিলাসী ?"

নিজেই উত্তর দিয়েছেন,

"আমরা তো তিমিরবিনাশী

হতে চাই।"

আরও প্রত্যয়ের দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়িয়ে বলেছেন,

"আমরা তো তিমির-বিনাশী।"

আবার

"মনে হয় সুচেতনা, তোমার হৃদয়ে

ভুল এসে সত্যকে অনুভব করে।"

অথবা

"তবুও ভোরের বেলা বার বার ইতিহাসে সঞ্চারিত হয়ে

দেখেছে সময়, মৃত্যু, নরকের থেকে পাপীতাপীদের গালাগালি

সরায়ে মহান সিংহ আসে যায় অনুভাবনায় স্নিগ্ধ হয়ে,—"

অথবা

"তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।

মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়

শেষ হবে ;"

অথবা

"কোথাও পাখির শব্দ শুনি;

কোনো দিকে সমুদ্রের সুর ;

কোথাও ভোরের বেলা রয়ে গেছে তবে।"

"বিলীন হয় না মায়ামৃগ—নিত্য দিকদর্শন;

অনুভব ক'রে নিয়ে মানুষের ক্লান্ত ইতিহাস

যা জেনেছে—যা শেখে নি—

সেই মহাশ্মশানের গর্ভাঙ্কে ধূপের মত জ্ব'লে

জাগে না কি হে জীবন—হে সাগর—"

জ্ঞানান্বেষী মন, অনেক কিছু জেনেও, শান্তিতে স্থির হয়ে বসে থাকতে পারে না এই বিশ্বাসে, যে সব জানা শেষ হয়ে গেছে। তার কাছে কোনও স্থিরভূমি নেই। তার কানে বারংবার ধ্বনিত হচ্ছে, "আরো আছে, আছে।" নব-অভিযানের প্রয়োজন আছে। এই শুনুন,

"মানুষেরা বার বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথায় সেই অনির্ব্বচনীয়
স্বপনের সফলতা—"

"যতই শান্তিতে স্থির হ'য়ে যেতে চাই ;" আঘাত পাই, কারণ,
"কোথাও আঘাত ছাড়া—তবু ও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্য্যালোকে নেই।"

সুতরাং

"হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে ;

সেই সব অভিযান "নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ" জয় করবে।

"জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হয়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—"

আর

"সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চ'লেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;—
জয়, অস্তসূর্য্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।"

অথবা

"হে সাগর সময়ের,
হে মানুষ,—সময়ের সাগরের নিরঞ্জন-ফাঁকি
চিনে নিয়ে বিমলিন নাবিকের মতন একাকী
হ'লেও সে হত, তবু পৃথিবীর বড় রৌদ্রে—
আরো প্রিয়তর জনতায়
'নেই' এই অনুভব জয় ক'রে আনন্দে ছড়ায়ে যেতে চায়।"

"সাতটি তারার তিমির"-এর শেষ কবিতা—'সূর্য্যপ্রতিম'। আলোকের উন্মেষের প্রতিশ্রুতি—নব পৃথিবীর সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে এই কবিতায়। পৃথিবী অন্ধকার, সূর্যের উজ্জ্বল দীপ্তি আজ নেই, চাঁদের স্নিগ্ধ আলোকও নেই, শুধু তারার ক্ষীণ জ্যোতি। পথ অন্ধকারে ডুবে আছে। আমরা কি চাঁদ উঠ্‌বার জন্য অপেক্ষা করব? নব পৃথিবী আবিষ্কার বিলম্বিত হবে?

"আমরা অপেক্ষাতুর ;"

কিন্তু, তথাপি,

"চাঁদের ওঠার আগে কালো সাগরের
মাইলের পরে আরো অন্ধকার ডাইনী মাইলের
পাড়ি দেওয়া পাখিদের মত
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় জোগান দিয়ে ভেসে
এ অনন্ত প্রতিপদে তবু
চাঁদ ভুলে উড়ে যাওয়া চাই,
উড়ে যেতে চাই।"

"এসো আমরা যে যার কাছে—যে যার যুগের কাছে সব

সত্য হয়ে প্রতিভাত হয়ে উঠি।
নব পৃথিবীকে পেতে সময় চ'লেছে ?"

কেবল ইতিহাস-বেদ ও জীবন-বেদই নয়, এমন-কি বাস্তব জীবনের কোনো দৃশ্য যদি হৃদয় আলো করে আসে, তবে সেই বাস্তব জীবনদর্শনের যথার্থ প্রতিকৃতি, জীবনানন্দের মতে, বিশুদ্ধ কবিতায় আত্মপ্রকাশ করতে পারে। "সাতটি তারার তিমির"-এর 'লঘু মুহূর্ত' কবিতাটি এর উদাহরণ-স্বরূপ গ্রহণ করা যেতে পারে। জীবনানন্দের ভাণ্ডারে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত এ-রকম আরো অনেক কবিতা আছে।

কেউ-কেউ তাঁর মধ্য-পর্যায়ের কবিতার সম্বন্ধে জটিলতার অথবা অস্পষ্টতার অভিযোগ করেন। যিনি মহৎ কবি, তাঁর অভিজ্ঞতার অভিযানে তিনি আমাদের থেকে কিছুদূর অগ্রসর হয়ে থাকেন। এই অভিজ্ঞতার ব্যবধান সৎ পাঠক সজাগ মনে ও অভিনিবেশ দ্বারা যতদিন না দূর করতে পারেন, অথবা কবি আমাদের সীমিত অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে যতদিন না পুনঃপ্রবেশ করেন তাঁর কাব্য আমাদের নিকট সুস্পষ্ট হয় না। এ-কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য যে, যদিও একদা রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধেও বহু বিখ্যাত অধ্যাপক ও মাসিক পত্রের প্রবীণ সম্পাদক-গোষ্ঠী এ-রকম অস্পষ্টতার অভিযোগ তুলেছিলেন, এখন কালগত ব্যবধান যখন অতিক্রান্ত হয়েছে, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীও হয়তো সে-রকম অভিযোগ শুনলে দন্ত বিকশিত করবেন। জীবনানন্দ তাঁর "কবিতা পাঠ" প্রবন্ধে বলেছেন, "ভাল কবিতা পড়ে আমার অভিজ্ঞতার কোনো একটি উপেক্ষিত (খুব সম্ভব বিশৃঙ্খল) অংশে সম্বিত এল—গোছানো হতে লাগল সব—কবি যা দেখতে চাচ্ছে, আমি ভিন্ন ব্যক্তি বলে সবটা সম্পূর্ণ ভাবে দেখতে পাব না। কিন্তু, আমার মনশ্চক্ষে অনেকখানি দেখলাম— আমার অভিজ্ঞতার একটা অংশ সঙ্গতি সাধনের স্বস্তি লাভ করল, সার্থক সব কবিতার ভিতর দিয়ে যে সঙ্গতি সম্ভব হয় ; আনন্দ পেলাম। আমাদের কথাবার্তা ও যুক্তিতর্কের চেয়ে এ-স্বাদ অন্যরকমের ; জীবনের যে-কোনও মুহূর্তে যুক্তি-তর্ক চালাতে পারি ; কথা বলতে পারি ; কিন্তু আরো কিছু সুস্থির ও তদগত না হলে শাদামাটা কবিতা পড়েও স্বাদ গ্রহণ করা কঠিন। কবিতা আরো সৎ হলে পাঠকের কাছ থেকে সুস্থিরতা ও নিবেশের দাবী করবে না, শুধু পাঠকের অভিজ্ঞতা ও তার মূল্য সম্বন্ধে চেতনা কি রকম বুঝে দেখবে। এত সব দাবী এঁদের তৃপ্তি সাধন (ভাল পাঠকের বেলায়ও) সব, মুহূর্তেই ঠিক ভাবে সংস্থিত হয় না।"

তাঁর প্রথম পর্যায়ের চিত্ররূপময় কবিতা বহু সংখ্যক পাঠককেই মুগ্ধ করেছিল, কিন্তু, পাঠকের মুখের দিকে চেয়ে, তাঁদের ভক্তি অথবা সমর্থনের লোভে তিনি শুধু সে-সব ধ্যান অথবা ভাবনা নিয়ে রোমন্থন করেন নি। তাঁর কল্পান্বেষী মন নব নব অভিযানে ব্যাপৃত হয়েছে। তাঁর কাব্য-জীবনে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার স্থান ছিল। অনেক প্রকার অভিযান ছিল। সে-সবই হয়তো সফলতা লাভ করে নি। কিন্তু এই রকম একজন কবি যাঁর কবিতা ক্রমপরিণতি লাভ করেছে তাঁর পক্ষে কিছু-কিছু অসফল অভিযানও সম্পূর্ণ স্বাভাবিক। সর্ব দেশের মহৎ কবিদের সম্বন্ধেই এ-কথা বক্তব্য।

প্রবন্ধ দীর্ঘ হয়ে যাচ্ছে, ব্যক্তি-জীবনানন্দের সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলে শেষ করছি। তিনি ব্যঙ্গে সুনিপুণ ছিলেন। কিন্তু হৃদয় অত্যন্ত কোমল ছিল; ব্যঙ্গের দংশনে কেউ ব্যথা পাবেন, কিছুমাত্র সন্দেহ থাকলেও, শর নিক্ষেপ করতেন না। আমাকে ও মাকে বিশেষ করে শরবিদ্ধ করতেন, কারণ আমরা বুক পেতে গ্রহণ করতে পারব, অন্তর্নিহিত রস বোঝা শক্ত হবে না আমাদের পক্ষে, এমন বিশ্বাস তাঁর ছিল; আপনারা সকলেই জানেন

একদল তথাকথিত সমালোচক হিংসায় উদ্দীপ্ত হয়ে নেকড়ে বাঘের মত তাঁর পশ্চাদ্ধাবন করেছিলেন। সেই সব সমালোচক যাঁরা সৎ শুভ বুদ্ধি প্রণোদিত হয়ে লেখেন না, বরং যাঁদের বলা যেতে পারে সাহিত্যিক-ভাঁড়—যাঁদের আবেদন হচ্ছে সস্তা রসিকতা নিবেদন, যাঁদের সম্বন্ধে বলা যেতে পারে,

"বাঙ্গলাভাষার গণ্ডোপরি বিরাজ কর বিস্ফোটক
বাঙ্গলাভাষার কেউ তুমি নয় হংস, সারস কিম্বা বক।"—

তাঁরা বহুদিন ধরে তাঁর কাব্যের ও ভাষার তীব্র ও নিষ্ঠুর সমালোচনা করেছেন—নেকড়ে বাঘের দাঁতের হিংস্রতা নিয়ে। এ-সব সমালোচকের বিরুদ্ধে Byron'-র মত ব্যঙ্গ করা তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল না; কিন্তু হয়তো তিনি মনে করেছিলেন, ব্যঙ্গ করে সমালোচককে আহত করা সম্ভব কিন্তু অরসিককে রসবোদ্ধা করা সম্ভব নয়। সুতরাং উদ্দেশ্যহীন আঘাতদানের কোনও তাৎপর্য তিনি দেখতে পান নি। কোমল-হৃদয় জীবনানন্দ তাই তাঁর স্বভাবসুলভ উদারতার সঙ্গে নীরব থাকতেন। তিনি তেমন কোনও কবিতা লেখেন নি যা শুধুই বিদ্রূপাত্মক, কিন্তু "সমারূঢ়", "কবিকে দেখে এলাম" এ-সব কবিতার মধ্যে এবং অনেক কবিতার অনেক লাইনে পাঠক তাঁর বিদ্রূপের শক্তির পরিচয় পাবেন। কিন্তু এ-সব বিদ্রূপ কোন সময়েই হিংসাত্মক হয়ে ওঠে নি। তাঁর হৃদয়কে পরশ্রীকাতরতা কখনও স্পর্শ করেনি। তাই দলাদলি, ঈর্ষা বা গোষ্ঠীবদ্ধতা হতেও বহুদূরে থাকতে ভালোবাসতেন।

তিনি নির্জনতা-প্রিয়, লোকের সঙ্গে মিশতে চান না, এ-রকম একটা কথা মুখে-মুখে প্রচারিত হয়েছিল। সন্দেহ নেই, তিনি লাজুক স্বভাবের ছিলেন। কিন্তু এ-কথা সত্য নয় যে, তিনি সব সময়ে নির্জনতা-প্রিয় ছিলেন। বহু লোকের কাছ থেকে বহু আঘাত পেয়েছিলেন, অনেক জ্ঞানপাপী তাঁকে যথার্থ মূল্য দিতে নারাজ, এমন একটা ধারণাও বোধ হয় তাঁর ছিল। সুতরাং অভিপ্রায় সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত না হওয়া পর্যন্ত সকলেই তাঁর কাছে 'Suspect' হয়ে থাকত। কিন্তু তাঁর হৃদয়ের জমাট বরফ যদি কেউ একবার ভেঙ্গে দিতে পারত, সেই সুভাজনের সমাগমে তিনি আনন্দই পেতেন। সরল শিশুর মতন নিমেষেই তাকে আত্মীয় করে নিতে পারতেন। বরিশালে নির্জন পরিবেশ ছিল—প্রকৃতির অবর্ণনীয় সৌন্দর্য ছিল। কিন্তু কর্মের প্রেরণায় সেই নির্জনতা আঁকড়ে থাকতে চান নি, বুদ্ধদেববাবুকে লিখিত নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি পড়লেই বোঝা যাবে,

> "কলকাতার অলিগলি মানুষের শ্বাস রোধ করে বটে, কিন্তু কলকাতার ব্যবহারিক জীবনে একটা প্রান্তরের মত মুক্তি পাওয়া যায় ; এখন যখন জীবনে কর্মবহুলতার ঢের প্রয়োজন, কলকাতার এই স্বচ্ছন্দ পটভূমির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা চলে না আর।"

মাতা ও মাতামহের মত তিনি অত্যন্ত হাস্যরসিক ছিলেন। গ্রীষ্মের ছুটীতে তিনি যখন কলকাতা থেকে বাড়িতে আসতেন, গ্রীষ্মের অনেক মন্থর প্রহর হাসিঠাট্টায় উজ্জ্বল হত, এ-কথা এখনও স্মরণ আছে। সে-সব বৈঠকে মাতাপিতাও যোগ দিতেন। কলকাতার পার্কে, মাঠে, যেখানেই humour'র গন্ধ পেতেন দাঁড়িয়ে যেতেন। অদ্ভুত, অস্বাভাবিক সব কিছুই তাঁর রসিকতা-জ্ঞানকে সুড়সুড়ি দিত। অকুস্থান থেকে একটু দূরে গিয়ে হাওয়ার মত হাসির ঝড় বইয়ে দিতেন। একদিনকার ঘটনা বলছি। তখন কলেজে পড়ছি, Oxford mission হস্টেলে থাকি, দাদা বাইরের থেকে প্রায় দৌড়ে আমার ঘরে এসে একজন ধনী নামজাদা গম্ভীর প্রকৃতি অধ্যাপকের নাম করে বললেন যে, শীগগির দেখে যা, তিনি আমাদের

হস্টেলের সামনে দিয়ে সাইকেলে চড়ে যাচ্ছেন। সেই অধ্যাপক সাইকেলে চড়ে যাবেন, তা এতই অবিশ্বাস্য যে এই অদ্ভুত দৃশ্য দেখবার জন্য বাইরে এসে দেখি যে সার্ট গায় দিয়ে একজন ভদ্রলোক সত্যিসত্যিই যাচ্ছেন ; উপরি-উক্ত অধ্যাপকের সঙ্গে যাঁর অবয়বের অনেক সাদৃশ্য আছে। আমাদের একজন আত্মীয় খুব হাত-পা নেড়ে, দাড়ি নাড়িয়ে কথা বলতেন, জীবনানন্দ অনেক সময় মিনিটের পর মিনিট অবাক হয়ে, চোখের কোণে হাসি নিয়ে, তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকতেন—কোনও কথা তাঁর কানে প্রবেশ করত না। খুব রোগা-লম্বা লোক, সরলরেখার সংজ্ঞাকে যিনি প্রায় সপ্রমাণ করছেন ; অথবা কোনও শ্রীমতী, যাঁর আয়তন অত্যন্ত বৃদ্ধি-প্রাপ্ত হয়েছে ; অথবা সে-সব লোক, যাঁদের অবয়বে কোনও বিসদৃশতা আছে ;—পথে দেখলে দাঁড়িয়ে যেতেন। কোনও সময়ে বলতেন, "হলিউডের কি দুর্ভাগ্য, এঁদের দেখা এখনও পায় নি। এঁদের লিখিয়ে-পড়িয়ে নিলে কি উজ্জ্বল সব চিত্র পরিবেষণ করতে পারত। কোথায় লাগে তোমার Laurel আর Hardy!" ১৯৫৩ সালে পূজোর সময় আমার দিল্লীর গৃহে অনেক আত্মীয় ও বন্ধুর সমাগম হয়েছিল। সকালবেলা আমাদের ঘরের পাশের bath-room হয়তো আটকা, দাদাকে জিজ্ঞেস করেছি আমার ঘর থেকেই, "তোমার bath-room খালি আছে কি?" দাদা তক্ষুনি জবাব দিয়েছেন, "দিল্লীর মসনদ কি কখনও খালি থাকে?"

প্রবন্ধ সমাপ্ত করার পূর্বে তাঁর শেষ কয়েক বৎসরের কবিতার সম্বন্ধে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন মনে করছি। মধ্য-পর্যায়ের কবিতার সম্বন্ধে যে যেই মতই পোষণ করুন না কেন, পাঠক তাঁর নিজ নিজ রুচি ও অভিজ্ঞতার ক্ষেত্রে থেকে ;—তাঁর শেষ কয়েক বৎসরের অভিজ্ঞতাগুলির প্রকাশে কোনও অস্বচ্ছতা ছিল না, এ-কথা প্রায়ই সর্ববাদী-সম্মত। মহৎ কবি অনেক সময় নিজের সঙ্গেই দ্বন্দ্বে জড়িত থাকেন—প্রতীতির সঙ্গে অনিশ্চয়তার। তাঁর মধ্য-পর্যায়ের কোনও-কোনও কবিতার উপর এই দ্বন্দ্বের ছাপ পড়েছে, কারণ তিনি হয়তো জার্মান কবি Hermann Hesse'র মতন বিশ্বাস করতেন, "it would serve stonce as a warning and an inspiration to his fellowmen"। এই রক্তক্ষরণকারী হৃদয়-দ্বন্দ্বের পর নিজের বিশ্বাসে আরও দৃঢ় হয়ে অনেকটা শান্তি তিনি পেয়েছিলেন শেষের কয়েক বৎসর। অবিশ্যি এ-কথা স্বীকার করতে হবে যে এ-যুগের মানুষের হৃদয় নির্মল ও নিঃস্বার্থ হয়নি, হৃদয়ে স্বার্থ ও রিরংসার অবলেশও কেটে যায়নি, কৃত্রিম জীবনযাপনের মোহ থেকে মুক্ত হয়ে সরল ও অনাড়ম্বর জীবনের আদর্শও মেনে নেয়নি। বহুলোকের হৃদয়ে অন্ধকার থাকলেও অল্পসংখ্যক লোকের মধ্যে অন্তত অমৃতসূর্য দর্শন করবার তাগিদ আছে। এ-কথা অনুভব করেছেন। একদল নবীন যুবকের হৃদয়নিঃসৃত অকপট ভক্তি, শ্রদ্ধা ও প্রেমের নিদর্শন পেয়ে, নতুন করে বাঁচবার সাধ হয়েছে। এ যেন গ্রামের মেয়ের অন্ধকার রাত্রিতে প্রদীপকে আঁচলের আড়াল করে পথে চলার বাসনা। সংগ্রামের অন্তে হৃদয়ে শান্তির আবির্ভাব হয়েছিল। সুবাতাসে তরণী আবার চলমান হয়েছিল। বাল্যকালে, কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে যে আনন্দ পরিবেশে বিচরণ করেছিলেন, সেই নির্মল আনন্দের দেশের দিকে তরণী চালিত করেছিলেন; নবজীবনের নূতন জীবনবেদের সুরু হয়েছিল। অনেক পথ অতিক্রম করা বাকী ছিল, কিন্তু অস্পষ্ট ভাবে স্বদেশের তটভূমি দৃষ্টিগোচর হয়েছিল। জীবনের আশা, বিশ্বাস ও যুক্তিকে কোনও নূতন ও সফল সঙ্গতি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন। নির্ভরতার দৃঢ় ভূমিতে দাঁড়িয়ে, তাঁর শেষ-জাতক কবিতাগুলি তারই লক্ষণে সমৃদ্ধ। আজকের অনেক দিকনিরূপকদের সম্বন্ধে বিদ্রূপ করে বলে গেছেন,

"যাঁরা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আছ চোখে দেখে তারা;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।"

আর

"যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের চোখে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শান্তি অথবা সাধনা"

আজকের পৃথিবী তাদের মন্ত্র গ্রহণ করছে না,

"শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।"

অনেক কবির সম্বন্ধে এ-কথা বলা চলে যে, তিনি যদি আরো বেঁচে থাকতেন, নূতন কিছু হয়তো দান করতেন না, যা পূর্বে দিয়েছেন, তারই পুনরাবৃত্তি হত। কিন্তু জীবনানন্দ সম্বন্ধে এ-রকম কথা বলা চলে না। তাঁর কাব্য-জীবনকে নদীর বিশালতার সঙ্গে—নদীর বেগ ও গতির সঙ্গে—তুলনা করা যেতে পারে—গঙ্গা কিম্বা ব্রহ্মপুত্র কিম্বা অ্যামেজনের সঙ্গে—যে-নদীতে আপনি যদি তরণী বেয়ে চলেন, দু'পাশে দেখতে পাবেন নব নব চিত্র, দেখবেন সোনার ক্ষেত; পাবেন সাগরসঙ্গমে চলে যাবার তাগিদ।

একদা প্রশ্ন ছিল,

"যেই দিন তুমি যাবে চলে
পৃথিবী গাবে কি গান তোমার বইয়ের পাতা খুলে?"

আজকের কবি বলছেন,

"নেই সেই নাগরিক আর।
নগর-আত্মার কাছে নিবেদিত হ'য়ে
রেখে গেছে তবু এক সবুজ প্রত্যয়,
আভা যার কিছু কিছু
ছড়াবেই বহুদূর সমুদ্র-সময়।"

ছড়াবে ; কারণ, জীবনানন্দ নিজেই লিখেছেন,

"সময়ের হাত
সৌন্দর্য্যেরে করে না আঘাত
মানুষের মনে
যে সৌন্দর্য্য জন্ম লয়—শুকনো পাতার মত ঝরে নাক' বনে
ঝরে নাক' বনে।"

কাছের জীবনানন্দ

সুচরিতা দাশ

সেই এক গল্প ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষদের সম্পর্কে, যাঁরা অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের একজনকে নাকি পরীতে পেয়েছিল। জ্যোৎস্নারাতে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যেত পরীরা, ভোরের আলোয় তাঁকে পাওয়া যেত শিশির-ঝলমল সোনার ধানক্ষেতের পাশে। তাঁর বিছানায় ছড়ানো থাকতো কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি। তারপর বহু যুগ পার হয়ে গেছে। এঁদেরই উত্তরপুরুষ জীবনানন্দ।

সত্যানন্দের প্রথম পুত্র। ঠাকুরদাদা সর্বানন্দ দাশগুপ্ত। পদ্মাপারে বাড়ি। ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে গাওপাড়া গ্রামে। সে গ্রাম আজ আর নেই, কীর্তিনাশা পদ্মার সলিলে সমাধি লাভ করেছে। সর্বানন্দ কার্যোপলক্ষে এই পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বরিশালে এসেছিলেন। পরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এ ধর্ম গ্রহণের পর বৈদ্যত্বের চিহ্নস্বরূপ 'গুপ্ত' কথাটাকে অপ্রয়োজনীয় বোধ করেছিলেন তিনি ; তারপর থেকে আমাদের পরিবার 'দাশ পরিবার' নামে পরিচিত। দেশের বাড়ির সঙ্গে সম্পর্ক একরকম ঘুচেই গেল, বরিশালেই স্থায়ী বসবাস শুরু হলো। সর্বানন্দের দ্বিতীয় সন্তান সত্যানন্দ। আমাদের বাবা।

বাবার কথা মনে পড়লেই তাঁর ধ্যানগম্ভীর প্রশান্ত উদার মুখচ্ছবি চোখের সামনে ভেসে ওঠে। আমাদের ঋষিকল্প বাবা যেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মিক শিষ্য ও তাঁরই আত্মজ দাদা তাঁর জ্ঞানের গভীরতার, মননের ঔজ্জ্বল্যের, মানসিকতার স্বচ্ছতার উত্তরাধিকারী। তাঁর প্রজ্ঞার আলোকে প্রতিভাসিত দাদা তাঁর আজীবন সত্যসন্ধানের উত্তর সাধক, তাই বাবার সম্বন্ধে দাদার উক্তি তাঁর নিজের মানসিক গঠনসৌকর্য অনুধাবন করতে প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়। দাদা লিখেছেন, 'একমাত্র জ্ঞানযোগই যে বাবার অন্বিষ্ট ছিল সে-কথা সত্য নয়, কিন্তু মধ্যবয়স পেরিয়েও অনেকদিন পর্যন্ত সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান—গণিত ও জ্যোতি-বিজ্ঞান চর্চায় তাঁকে প্রগাঢ় হয়ে থাকতে দেখেছি—মানুষের জীবন ও চরাচর সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব একটা বিশুদ্ধ ধারণায় পৌঁছবার জন্যে। নিজের হিসেবে পৌঁছতে পেরেছিলেন তিনি! উচ্ছ্বাস দেখিনি কখনও তাঁর, কিন্তু জীবনে অন্তঃশীল আনন্দ স্বভাবতই ছিল—সব সময় প্রায়-কিছু গদ্য ছাড়া বাবা সাহিত্য সৃষ্টি করতে চেষ্টা করেননি, কিন্তু পাঠ করেছিলেন অনেক আলোচনার প্রসারে ও গাঢ়তায় আমাদের ভাবতে শিখিয়েছিলেন, দৃষ্টি তিনিই খুলে দিয়েছিলেন।'

বাবা যদি তাঁকে ভাবতে শিখিয়েছিলেন, যদি তাঁর অন্তর্দৃষ্টির প্রসারতা নীলিমালীন করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন, তবে তাঁর পাখীর পালকের চাইতেও নরম অনুভবের মেদুরতা, বলা যায়, মার কাছ থেকে প্রাপ্ত। বাবা যদি দিয়ে থাকেন তাঁকে সৌরতেজ, প্রাণবহ্নি, তবে মা তাঁর জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছেন স্নেহ-মমতার বনচ্ছায়া, মৃত্তিকাময়ী সান্ত্বনা। তাঁর জন্যে মা একটি নিরিবিলি পরিবেশ, শান্তমধুর আবহাওয়া রচনা করে দিতেন সর্বক্ষণ।

যাতে সেই ঘন একান্ততাকে খণ্ডিত ক'রে না দেয় আমাদের বৃহৎ পরিবারের কোলাহল, কর্মব্যস্ততার কলরব, তার দিকে মা'র সজাগ দৃষ্টি ছিল প্রতিটি মুহূর্তের। তিনি যেন ছিলেন দাদার জীবনের সেই পল্লবঘন স্নিগ্ধ ছায়াচ্ছন্ন তরুশাখা—যাতে লগ্ন হয়ে একটি কোমল-কাতর লতিকা বেড়ে ওঠে, ফুলসম্ভারে বিকশিত হয়। জীবনের শেষের দিনগুলোতে দুঃসহ যন্ত্রণায় মুহ্যমান হয়ে থেকেও তাঁর যেন চিন্তার অন্ত ছিল না আর—একই চিন্তা, দাদাকে বেষ্টন করে। তিনি ভেবেছেন আর আকুল হয়েছেন। তিনি চলে গেলে দাদার জীবনে যে মহাশূন্যতা হাহাকার করে উঠবে, সেই ফাঁক পূর্ণ হবে কি দিয়ে, যে-অনুবেদনাসিক্ত আশ্রয় ভেঙে যাবে তা আর গড়ে উঠবে কি করে!

শিশিরস্নানের নম্র কোমল প্রত্যূষ পূর্ব গগনে আবির্ভূত হতে-না-হতেই বাবার মন্ত্রমধুর কণ্ঠে ধ্বনিত হতো ঔপনিষদিক শ্লোক। সহসা সমস্ত পটভূমি প্রগাঢ়তায় থমথম করতো নিলয়স্রোতে, থরথর ক'রে কাঁপতো যেন সার্বিক প্রকৃতিচ্ছন্দ—প্রকৃতির ছোট-বড়ো সখা-সদস্য ফুল, লতা, ঘাস। বাতাসের আড়ালে যেন কে আসছেন, আসছেন বলে মনে হতো। যেন কোন সময় ব্রহ্মের আসন বিপুলতাকে সংক্ষিপ্ত করে নিয়ে একে এই এক প্রভাতবেলার সানন্দ মধুময় সীমিততায় ভাবের অধীরতায় টলটল করতে থাকতো। সে আমাদের ছেলেবেলার গল্প। সঠিক প্রতিটি রেণুকণা স্বরূপে স্মৃতির তহবিল হাতড়ে তুলে আনা কষ্টকর, বুঝি অসম্ভব। তবু সেই গভীর প্রশান্ততার মতো স্পন্দনশীল প্রভাতবেলাগুলোর তরে যেন বুকের সুখনিশ্বাসের কোল ঘেঁষে কেমন জেগে ওঠে ; মনে হয়, সেই গম্ভীর গাঢ় আনন্দের আবহাওয়ায় বুঝি দাদারই স্বচ্ছন্দতা ছিল বেশী। 'কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা।' ('ময়ূখ', হেমন্ত ১৩৬১)—কবিতার বিষয় বলতে গিয়ে বলেছেন দাদা। ইতিহাসচেতনা কি? তা নিয়ে ভাববার স্থান এ নয়, তবে এটুকু বলা যায় যে, সংক্ষিপ্ত অর্থে ধরলে তা নিখিল মানব-মানসিকতার অনাদিকাল ধরে যে নিশ্চিত একটি মাত্র আনন্দময় ধ্রুবলোকে নির্ধারিত যাত্রা, তার ধারাসরণিকে ঐ সংজ্ঞায় বিশেষিত করা যায় হয়তো ; আর ইতিহাসের শুরু যদি উপনিষদে—বেদে, যদি মানব মানসের জ্ঞানযোগ অমোঘ ধ্রুবের জন্যে, 'সত্য আলো'র জন্যে নিরুদ্বেগ উদ্বেল কালপ্রবাহের সেই সূচনাতে, তবে আমাদের ছোটবেলায় বাবার কণ্ঠনিঃসৃত উদাত্ত গম্ভীর শব্দলহরীকে কেন্দ্র করে যে উষাকাল—সম্পূর্ণ করে নিলে, বাবাকে ঘিরে ঘিরে যে শান্তি-সমাহিতির জীবন স্মৃতি—তাতে যেন দাদার আনন্দ সচ্ছলতা তাঁর পরবর্তী জীবনের মিষ্ট অভিনিবেশের শান্ত মগ্নতার অংকুরোদ্‌গমে জলবায়ুর প্রশ্রয় দিয়েছিল।

আর তাঁর পাশাপাশি মা। তাঁর প্রশ্রয় বীজের অংকুরোদ্‌গমে জলবায়ু ছাড়াও যে আরেকটি আশ্রয়ের সান্ত্বনা দরকার, তাতে। তিনি মৃত্তিকার মতো দাদার জীবন গঠনে। দাদার সম্পর্কে অনেক জনশ্রুতি প্রচলিত। তিনি জীবন থেকে পালিয়েছেন। তিনি মানুষের সখ্য সহ্য করতে পারেন না। তিনি নির্জন, তিনি নিরিবিলি। সব কোলাহল থেকে দূরে। এসব বাক্য গঠনের সত্য-সততা কতোটুকু তা আমার বিবেচ্য নয়, যদিও এসবের অনেকগুলোই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে হয়তো এতদিনে, তবু না বলে উপায় নেই, দাদা একটু সস্নেহ আশ্রয়ের জন্যে কিঞ্চিৎ অসহায় ছিলেন আজীবন। তাঁর নিজের ও তাঁর জন্যে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনগুলোকে যেন তিনি একা গুছিয়ে নিতে পারতেন না, যেন সব এলোমেলো হয়ে যেতো, হারিয়ে-হারিয়ে যেতো, অথচ তিনি অগোছালো থাকতে ভালোবাসতেন না। এই সহজ অভিভাবকত্বের আশ্রয়টুকু পুরোপুরি পেয়েছিলেন তিনি মা'র কাছ থেকে। দাদা যে ঠিক সাংসারিক মানুষ নন, তাঁর জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা খুব

যে চরিতার্থতা লাভ করেনি, ভাগ্যের প্রসন্ন দৃষ্টি যে অনেক ক্ষেত্রেই তিনি লাভ করলেন না, সে জন্যেই অন্তত তাঁর কাব্যসাধনার জন্যে একটুখানি অনুকূল পরিবেশ থাক, আর সেইখানে থাক অন্তত একটু সান্ত্বনা, সারাজীবন ধরে সেই চেষ্টাই করে গেছেন মা।

মা'র যে সহজ স্বাভাবিক কবিমানস স্বতঃস্ফূর্ত হয়েছিল, অথচ ছিল প্রায় অস্ফুট, যা কেবল মাত্র বাংলাদেশের শিশুদের অতি পরিচিত।

ছোট নদী দিনরাত বহে কুলকুল,
পরপারে আমগাছে থাকে বুলবুল—

অথবা

আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে—

এরকম দু-চারটে কবিতা, এবং বরিশালের 'ব্রহ্মবাদী' পত্রিকার কিছু কবিতার মধ্যে স্তব্ধ হয়ে গেল, বৃহৎ পরিবারের বিচিত্র অজস্র কাজকর্মের মধ্যে নিজেকে নিয়োজিত করে যার সাধনা তিনি করলেন না তারই বিকাশ, সাধনা ও সিদ্ধি দাদার মধ্যে প্রত্যক্ষ করে হয়তো তিনি নিজেকে সার্থক মনে করতেন। তাই, আমার কাছে লেখা মা'র এমন অনেক চিঠি আমি আজ উদ্ধৃত করতে পারব যার প্রতিটি পংক্তিতে দাদার জন্যে তাঁর অপরিমেয় ব্যাকুলতার প্রতিভাস ছড়িয়ে রয়েছে।

শৈশবে কঠিন পীড়ায় দাদাকে আক্রান্ত হতে হয়েছিল একবার—বাঁচবার আশা ছিল না। মা আর দাদামশায় তাঁকে নিয়ে ঘুরলেন কত স্বাস্থ্য নিবাসে, কত বিভিন্ন জলবায়ুর জনপদে—লখনউ, আগ্রা, দিল্লী। সেদিন আমাদের অবস্থা সচ্ছল ছিল না, পুরোনো চিঠিপত্র থেকে জানতে পারি মা'র এই প্রচেষ্টাকে পরিবার-পরিজন সকলেই আত্মঘাতী বলে মনে করেছিলেন। তবু বিচলিত হন নি মা। পশ্চিমে দীর্ঘ দিন কাটিয়ে সেই শিশুকে সম্পূর্ণ নিরাময় করে তিনি ফিরে এসেছিলেন।

এমনি করে বাল্য ও কৈশোর কেটেছে মায়ের মমতার আশ্বাসে-আশ্রয়ে, অন্তরালে বাবার জ্ঞানযোগী প্রগাঢ় ব্যক্তিত্বের সৌরতেজের উত্তাপে, 'ভাবতে শেখার' উন্মেষে আর বাকীটুকু ভরাট করে ছিল বই আর বই, বাগানের ভাণ্ডারে বিচিত্র রঙে-রসে মন ভরিয়ে দিয়ে অপার অজস্র ফুল আর ফুল। তার সব উপকরণ আর উপহার নিয়ে সজল শ্যামল প্রকৃতি, বরিশালের সবুজ প্রাণময়তায় আকুল বিস্ফারিত প্রকৃতি যার হয়তো বর্ণনা দেওয়া চলে না। মনটা তখন নদীর মতো টলমল করে বয়ে যাচ্ছে, তাতে কত রঙের খেলা ফুটে উঠছে, মিলিয়ে যাচ্ছে। আকাশে অনাদি অনন্ত ইন্দ্রনীল আর ধরণীর দিগন্ত ছুঁয়ে আস্তীর্ণ শ্যামলতা নয়ন মন মগ্ন করে রেখেছে, চেতনায় জ্বালিয়ে দিয়েছে সলজ্জ-শিখা ভালো-লাগার দীপ, যাই না-কেন দুচোখে ভ'রে দেখো বিস্ময়ে বিদীর্ণ হয়ে যাও, সব-কিছুকে ভালো-লাগার ভালো-বাসার আনন্দে থর-থর করে কাঁপো—এমনি মোহমেদুরতা সে দীপের আলোয়। অস্ফুট শৈশব থেকে প্রাণময় কৈশোরে ও যৌবনের দীর্ঘদিন কেটেছে বরিশালে—এমনি করে।

সেইসব মধুঝরা দিনগুলোর স্মৃতি এলোমেলো ভেসে আসে। মন তখন যেন সবকিছুতেই মুগ্ধ আর বিস্মিত হবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে আছে। ঠিক তেমনি সময়ে দাদার কণ্ঠে ঝংকৃত হতে শুনতাম নানান কবিতার পঙক্তি। সেই ললিত ধ্বনির ঝংকার, শব্দের মূর্ছনা মনকে যেন উড়িয়ে নিয়ে যেতো এক আধো বোঝা আধো না বোঝা রূপলোকে, যেন মগ্ন করে দিতো এক অনির্বচনীয় আনন্দলোকে, যে আনন্দের স্বরূপ

বুঝি না, ধরতে পারি না, কিন্তু মনে মনে ছুঁয়ে থাকি তার অবশ বিমুগ্ধতা। দাদা রোদে ইজিচেয়ারে বসে বসে কত কি লিখতেন, তখন তাঁর ছবি আঁকার নেশা ছিল, আলতো পেন্সিলের মৃদু চঞ্চলতায় অস্ফুট আলো ছায়াময় কতই না ছবি ফুটে উঠতো; কখনো আকাশে দুচোখ মেলে দিয়ে যেমন স্তব্ধ চেতনায় গাঢ় বিলুপ্তিতে ডুবে যেতেন। অবাক হয়ে দূর থেকে বা লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতাম, ভাবতাম, রোদে পিঠ পেতে ইজিচেয়ারে বসে দাদা এত কি লেখে! কখনো কলম চলে দ্রুত গতিতে, কখনো লাল ফুলের আস্তরণে মুড়ে থাকা কৃষ্ণচূড়ার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে থেকে ধ্যানস্থ হয়ে যান। কবিচিত্তে তখন মধুচ্ছন্দা ঝর্ণাধারার অমৃতময় প্রবাহ বয়ে চলেছে। তখন বুঝতাম না, আজ বুঝি, কি করেই না রূপরাজ্যের খোলা নীলিমার কোলে পথ হারিয়ে হারিয়ে ফেলতো একটি সুকুমার সৌন্দর্যমগ্ন চিত্ত, যতই সে আর অনুভবে চেতনায় বিন্যস্ত করে করে পার পায় না সেই অমেয় বিপুল সৌন্দর্যতৃষ্ণার চরিতার্থতার, ততোঃ যেন আরো বেশি করে ক্লান্ত হয়ে ওঠে।

মাঝে-মাঝে কাছে গিয়ে দেখবার চেষ্টা করতাম, দাদা কি লিখছে। দাদার লেখা তখন ছিলো খুব ছোটো ছোটো আর জড়ানো, এখনকার মতো নয়। বুঝতে পারতাম না, রাগ হতো। একদিন ব'লে উঠলাম, 'উঃ দাদা তোমার লেখা পড়াই যায় না; মনে হচ্ছে যেন এক সারি পিঁপড়ে ছেড়ে দিয়েছ খাতার ওপরে।' আর দাদার সে কি হাসি। রোদে ঝিলমিল নীলিমার মতোই সে-হাসির ঔজ্জ্বল্য।

কখনো কখনো পেন্সিলেও লিখতেন দাদা। আরো অবোধ্য হ'য়ে উঠতে তাঁর হাতের লেখা। কতো অনুযোগ করেছি, দাবি করেছি, অন্তত একটু বোঝার মতো করে লেখো। দাদা হেসে উঠতেন, উচ্চকিত গমগম করে বেজে ওঠা হাসি যেন কতোই আমাদের বিষয়, এক নির্ভর চপলতা ছোটো বোনটির সেই দাবি-দাওয়া কথাগুলো। বোঝা যেতো না মনোভাবটা তার কি-যে, সেই উচ্চগ্রামে বাঁধা হাস্যরোলের মর্ম ভেদ করে। কিন্তু তখন কে জানতো, স্নেহকাতরতা তাঁর এতোই বেশী যে, সে-সব আপিল পেশ করারও মূল্য ছিল তাঁর কাছে অনেক। নইলে আজ তো জানি, উত্তরকালে দাদার হাতের লেখা সুগঠিত হবার কাজে সে অনুযোগ, সে-দাবী কতখানি কার্যকরী হয়েছিল।

অনেক অনেক প্রভাত বেলার স্বপ্নময় বর্ণপুচ্ছের মধ্য থেকে একটি রঙ যেন কেমন আলাদা হয়ে আসছে। নিটোল হ'য়ে জ্ব'লে উঠছে সে একটি দিনের স্মৃতি, যখন বহু দিনের বর্ণসমারোহে জড়িয়ে-জড়িয়ে মিশে গিয়ে এক বিবর্ণ অথচ স্পর্শগ্রাহ্য আবহ রচনা করে রয়েছে অতীত স্বপ্নের আতুরতায়। সেদিন আকাশময় সোনালী রঙের ভিজে-ভিজে রোদ গড়িয়ে যাচ্ছে, হালকা হাওয়া দিচ্ছে রেশমের [illegible]ময় স্পর্শের মতো। ইজিচেয়ারে বসে দাদা লিখছেন, প্রগাঢ় তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে অ[illegible]নি। সামনেই কৃষ্ণচূড়া গাছে হাজার রক্তিম পুষ্পস্তবক, লাল আগুনে জ্বলছে ; গাছের তলার সজল মাটিতে অশেষ সবুজ ঘাসের তরতরে প্রাণস্পন্দনের মখমল, তার ওপর আলো-আঁধারের সচল ছায়া-ছবি, নিপুণ আলপনা। এই তো লিখছিলেন, কখন যেন আনমনা হয়ে গেছেন রৌদ্র ছায়ার সেই ছন্দোভঙ্গি দেখে, ঘাসের নিবিড়ে ঘাসফড়িঙের নৃত্যপরায়ণতায় অভিনিবিষ্ট হয়ে গিয়ে। একটা বিড়াল কখন থেকে ঘোরাঘুরি করছে, আসছে যাচ্ছে অন্ধকারের মতো নরম পায়ে, লাফালাফি করছে আলোছায়ার চঞ্চলতার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে। ঘাসের বুকে আঁচড় দিচ্ছে, মাটির বুকে, কখনো-বা ছুটে গিয়ে কৃষ্ণচূড়া গাছের গায়েই নখের জোর পরীক্ষা ক'রে নিচ্ছে। রোদের সঙ্গে, প্রকৃতির নম্র হৃদয়ের সঙ্গে এই কলহ দেখে কেমন যেন

কৌতুকবোধ করছিলেন দাদা, কিংবা ব্যথিতই হয়েছিলেন। কবিতা লিখলেন। এখন "বনলতা সেন" কাব্যগ্রন্থটিতে সেই কবিতাটি রয়েছে ;—'বিড়াল'।

এমনি ক'রে আরো অনেক কবিতাই লেখা হয়েছে, অনেক কবিতার জন্মলগ্নের কিছু-কিছু হিসেব এলোমেলো ক'রে জানা আছে হয়তো, কিন্তু কেন জানি এই একটি দিনের স্মৃতি আজো, শিশিরবিন্দুর মতো টলটল করছে মনে। তাঁর শেষ দিককার কবিতার সঙ্গে আমার সম্পর্ক অনেকটা পাঠকের মতো হয়ে উঠেছিল, বাধ্য হয়েই, কেননা কার্যোপলক্ষে তাঁর থেকে দূরে থাকতে হয়েছে। কিন্তু দূরে যেতে হলেও, সত্যি সত্যি আর দূরে যেতে দিচ্ছে কে। যখনই কলকাতায় এসেছি তাঁর কবিতা সম্পর্কে কোন্ কাগজে কি মন্তব্য করলো, কোথায় কোন কাগজে কোন লেখা বেরুল সে-সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হও, কোন বিশিষ্ট ঘটনা যদি ঘটে থাকে ইতিমধ্যে তার সালংকার উষ্ণ ব্যাখ্যান শোনো, এই বই-এর প্রচ্ছদটা কেমন হয়েছে বল্‌তো, আমার কিন্তু একেবারেই ভাল লাগেনি, আমি কি রাজকুমারী অমৃতকুমারীকে ভেবে এইসব কবিতা লিখেছিলাম নাকি! বেশ উত্তেজিত হয়ে উঠতেন যেন বলতে বলতে, সারা মুখে যেন ঈষৎ রক্তাভা ছড়িয়ে যেতো। কথার মোড় ঘোরাতে বলতে হতো, 'জানো দাদা, নানা রকম আচার এনেছি এবার তৈরী করে, কি কি চাও, কুল, আম—'। আচারের প্রসঙ্গটা সব সময়েই লোভনীয়, অশেষ তৃপ্তির। ছেলেমানুষের মতো সরল ঔৎসুক্যে ঝলমল করে উঠতেন। বলতেন, 'আমার বাড়িতে ক'দিন এসে থেকে যা না, চাকরটা যা হয়েছে, কিছু যদি ভালো রান্না জানে। ওকে খানিকটা হাতে ধরে রান্নাটা শিখিয়ে দে না, আর দেখ, এমনি জলপাইয়ের আচারটাও করে দিয়ে যাস।' ভালো রান্নার লোভ ছিল, আচারে ততোধিক। যে ছেলেরা তাঁর শেষের দিনগুলো সেবা-শুশ্রূষার কাজে আমাদের সাহায্য করার জন্যে হাসপাতালে তাঁর পাশে-পাশে রাত কাটিয়েছে, আচারের জন্যে আকুলতা তিনি তাদের কাছেও প্রকাশ করেছেন। তারা যদি বলেছে, এই এত রাতে কোথায় পাবো, ভোর হোক, কাল নিশ্চয়ই এনে দেব। তিনি তাতে চটে গেছেন, গম্ভীর মুখে বলেছেন, 'য়্যাম আই ইন ক্যালকাটা? দেন?'

বরিশালে তাঁর অবশ্য অনেকগুলি বছর কাটাতে হয়েছে, সে-সব তাঁর পুষ্পকোরকের অনাদি বিস্ময়ে, অপার ভালবাসায় আলোক দেখার দিন। তার পরে কর্মজীবনেও ঘুরে-ফিরে আবার বরিশাল। অধ্যাপনার কাজে।

ইতোমধ্যে অধ্যাপনার চাকরির তাগিদে নানাস্থানে ঘুরে বেড়াতে হয়েছে তাঁকে; বাঙলায়, বাঙলার বাইরে। গাঢ় প্রশান্ত নীলিমার সীমান্তে, রুক্ষ পাটল আকাশের নিচে। নানান্ আবহাওয়ার পরিমণ্ডলে। কিন্তু বরিশালের শ্যামলা হাওয়াতে মাটিতেই যে তাঁর সান্ত্বনা, তৃপ্তি, তাতে আর সন্দেহ কি? যখনই কোনো প্রসঙ্গে বরিশালের কথা উঠেছে, তার প্রশস্তিতে তাঁর যেন আর মুখে কথা ধরে না। শেষের দিকটাতে অবস্থা এমনিই হয়েছিল যে ভালো থাকা মানেই বরিশালে যেমন ছিলাম, তেমনি থাকা। কারুর সংসর্গে অতুল আস্বাদ আনন্দ পেয়েছি মানে বরিশালের সেই-সেই দিনগুলোতে যেমনি অনাবিল সারল্য-সার আনন্দে মগ্ন হয়ে থাকতাম সর্বক্ষণ। আসলে বরিশালের সর্বপ্রকৃতিময় ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপকরণগুলোর সঙ্গেও তাঁর যেন এক অদৃশ্য প্রচুর কাছাকাছি জানাশোনা ছিল। যেন সব ছিল আপন, অনুদ্‌ঘাটনীয় রহস্যের আলো-আঁধারিতে আপন। বরিশালে তাঁর নিজের ঘরটির রূপ চোখে লেগে আছে। ভুলবার নয়। প্রাঙ্গণে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে মখমলের মত সবুজ ঘাস। তার ওপরে কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম পাপড়ির সুচারু আল্পনা আঁকা। সূর্যের

জাফরানি আলোর রঙে লতাপাতা পাখ-পাখালির সর্বাঙ্গ মুড়ে থাকে। জানালার সামনে দু'টো গন্ধরাজ গাছ আগাগোড়া সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে, পাতা দেখা যায় না। পাতার আড়াল থেকে উঁকি দেয় নীলজবা। মাধবীগুচ্ছে রক্তরাগ। কাঁঠালিচাঁপার তীব্র মধুর গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত। একটি কবিচিত্ত ধ্যানমগ্ন হয়ে থাকে, বিচিত্র রঙের ছোঁয়ায় মনের দিকে আনন্দের উৎসব পড়ে যায়। একটি বিড়াল বা ক'টি কমলালেবুর হিম করুণ শরীর বা অসময়ে ঝরে যাওয়া ম্লান কচি নষ্ট শশা কিংবা মাঠে পথে ছড়িয়ে থাকা ঝাউপাতা, চোরকাঁটা, লাল তারার মত লাল বটফল—এমনি সব ছোটোখাটো ছবির উপকরণও মনে গাঁথা হয়ে যায়, সৌন্দর্যে ব্যঞ্জনায় অনন্য হয়ে ওঠে; হয় কাব্যের সামগ্রী।

বসন্তের বুকে গৈরিক গ্রীষ্ম কঠোর সন্ন্যাসীর দৃপ্ত পায়ে হেঁটে যেতে আসে। যদিও অগ্নিবরণ কৃষ্ণচূড়ার সমারোহ শেষ হয়নি তখনও, বাগানের সবুজ মেহেদীগাছের বেড়ার কিনারে যদিও আলো ছড়াচ্ছে তখনও একসারি ইটরঙের লিলিফুল, তবু আকাশে যেন তরল আগুন ছড়িয়ে গেছে, বাতাসে অগ্নিকণা। ইস্পাতের মত উজ্জ্বল আকাশের দিকে তাকিয়ে একটি মুগ্ধ কবিচিত্ত ছটফট করে ওঠে অস্থিরতায়। কি অপূর্ব রুদ্র এই দীপ্তি, কি ভয়াবহ তীব্র দাহ, কি আশ্চর্য দৃঢ় ঔজ্জ্বল্য। মাঝে মাঝে নিতান্ত 'নীলোৎপলপত্রকান্তিভিঃ কচিৎ প্রভিন্নাজতনরাশিসন্নিভৈঃ' মেঘমালা দূর দিগন্ত ভ'রে ফেলে চোখের চাতককে দু'দণ্ড তৃপ্তি দিয়ে যায়। তার পরেই আবার ডাক-পাখির চিৎকার, গাংচিল ও শালিকের পাখার ঝটপট, মৌমাছির গুঞ্জরণ—উদাস অলস নিরালা দুপুর। সবুজ বনশ্রী, মাথার ওপর শফেদা মেঘের সারি, বাজ পাখির চক্কর আর কান্না। মনে হচ্ছে যেন মরুভূমির সবজিবাগানের ভেতর বসে আছি, দূরে দূরে তাতার দস্যুর হুল্লোড়। আমার তুরাণী প্রিয়াকে কখন যে কোথায় হারিয়ে ফেলেছি।

আসে ধানের আর শিশিরের মাস হেমন্ত। পাতায় ফুলে ধানের গুচ্ছে আকাশের স্নেহ শিশির হয়ে লেগে থাকে। গাছে গাছে পাতারা হলুদ হয়, ধানে জাগে গেরুয়া রঙ, রোদ্দুরের রঙ নিভু-নিভু নরম হয়ে আসে। শিশিরের গন্ধ মেখে অশ্বত্থের জানালায় উঁকি দেয় পাখীরা নীড়ের সন্ধানে। স্বর্ণশস্যের সফলতায়, শিশিরের ক্লান্তিতে, শান্ত প্রকৃতির সব ঐশ্বর্যে নিভন্ত ম্লানতায় এই ঋতুটি বিশিষ্ট হয়ে থেকে যায় তাঁর মনে। সব শুভ্র স্বপ্ন, সব মুগ্ধ স্বপ্ন, স্বপ্নের মত বাস্তবতার শেষে অতুল সম্পন্নতার আতুর ধ্বংসাবশেষের সমারোহের মধ্যে যে স্পর্শকাতর মনটি ব্যথিত হতে থাকে, হেমন্তের নিভে-নিভে যাওয়া রূপের দীনতায় তা যেন বেশী করে ক্লান্ত হোত। ঋতুগুলির মধ্যে হেমন্ত সবচেয়ে রিক্ত, নিঃস্ব, অবহেলিত, যাকে তিনি 'সুররিয়ালিস্টিক' মন বলেছেন, তা বুঝি এই সব হারাবার হাহাকারে জাগতে শুরু করেছিল, তাই হেমন্তে যতটা তিনি একান্ত তেমনটা যেন আর কিছুতেই নয়।

এমনি পটভূমির আপনতার মধ্যে তাঁর নিজস্ব ঘরখানির চিত্র চোখে ভাসে। কোঠাবাড়ির সাধারণতার মধ্যে তাঁর তৃপ্তি ছিল না, তাঁর ঘরে তিনি পাকা ছাদ তৈরি করতে দেননি। তা ছিল খড়ের। তার ঘরের কিঞ্চিৎ গ্রাম্য দীনতা বা বলা যায় হার্দ্য সম্পন্নতা তিনি প্রাণের মত প্রয়োজনীয় বোধ করতেন। গৈরিক গোধূলি আসে, শান্ত সন্ধ্যা, তারা ভাসিয়ে নিবিড় নীল আশ্চর্য রাত্রি গলে গলে যায়। নানা স্থান নানা রঙে মন অসহ্য সুখে টনটন করে ওঠে। সব মিলিয়ে, সবার মধ্যে সেই ঘরখানিকে বাস্তব স্বপ্নের মত মনে হয় যেন। পরম প্রীতিকর মনে তার কুণ্ঠিত আশ্রয়। অজস্র তারায় তারায় একা একা রাত জাগতে থাকতে অপার অকূল আশ্বিনের আকাশ, জামিরের বনে মেঘের মত ভারি হাওয়া

আলুথালু হয়ে ভেঙে যায়। মন বলে 'গোধূলির মেঘে মেঘ, নক্ষত্রের মত র'ব নক্ষত্রের সাথে।'

পটভূমির পরিবর্তন হয়। অনেক বন্ধুর চড়াই-উৎরাই পার হয়ে শেষ পর্যন্ত অধ্যাপকের কাজ নিতে হয়। বেচু চ্যাটার্জী স্ট্রীটের একখানা ঘরে দু'ভাই-এর দিন কাটে। একজন অধ্যাপক, আরেকজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এস-সি, ক্লাশের ছাত্র। দাদা অধ্যাপনা করে টাকা রোজগার করেই খালাস, বাকি সময় লেখায় কাটে, আর সব দায়-দায়িত্ব মেজদার। মেজদার কাটে ষ্টোভে রান্না করায়, ছোট্ট সংসারের নানান টুকিটাকি কাজে, তার ফাঁকে ফাঁকে পড়াশুনোয়। দুই ভাইয়ের নিবিড় অন্তরঙ্গতায় দিনগুলো মধুর হয়ে ওঠে। কখনো বরিশাল থেকে মা এসে উপস্থিত হন। মার স্নেহে, সহস্থিতিতে দিনগুলো রূপ হয়ে ওঠে ; ভাঙা হাটে চাঁদের আলো ঝলমল করে। কিন্তু হঠাৎ সিটি কলেজের কাজ গেল। আকস্মিক, অপ্রত্যাশিত বিপর্যয়। হয়ত কারু কারু ভ্রূ-কুটিল কুঞ্চিত হোল, কিন্তু বাবা মা! রোষকষায়িত অরুণ নেত্রের পরিবর্তে মা'র চোখে অতল দিঘির মত অপরিসীম স্নেহ ও সান্ত্বনা, বাবা বিক্ষোভহীন শান্ত স্থির।

সেই সময়টা আমরা তাঁর থেকে দূরে ছিলাম। সে সময়ের কথা বলতে পারবো না। আবার কিছুদিন তিনি যখন বরিশালে আমরা তখন কলকাতায় বা অন্যত্র। মাঝামাঝি অনেকদিন স্থিতিহীন হয়ে ঘুরে বেড়াতে হোল বাগেরহাটে, দিল্লীতে। কতদিন কাটল কলকাতার প্রেসিডেন্সী বোর্ডিং-এ শুধু ছেলে পড়িয়ে। তারপর আবার ভ্রান্ত দুর্যোগ উদ্বেল রাতের শেষে প্রসন্ন প্রভাতের মত বরিশাল। বরিশালেই অনেক দুর্গত সময় কাটানোর পরে পুনরায় স্থিতিলাভ হোল, সেই বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের উদ্ভাসিত হবার পটপ্রসার। বরিশালের সজল সুনীল আকাশের অজস্র তারকার মত অজস্র কবিতার ফুল।

কিন্তু শান্তি আর স্থিতি সমস্ত জীবন ধরে পেতে চেয়েও পাওনা হোল না। আবার এলো সেইসব ভীষণতম হিংস্র দুর্দিন। বরিশাল ছাড়তে হোল চিরদিনের জন্যে। মহানগরীর একটা দুর্বার আকর্ষণ ছিল সত্যি, আগেও তিনি কয়েকবার কলকাতায় চলে আসবার জন্যে ঔৎসুক্য প্রকাশ করেছিলেন, তবু মনে মনে তখন এই কথাটি জানা ছিল যে, বরিশালের মাটিতে মমতাময় নিভৃত পরম আশ্রয় নীড় রয়ে গেছে। শ্রান্ত হলেই সেই নীড়ে ফিরে যাওয়া যায়। কিন্তু বাঙলা ভাগ হয়ে যাওয়ায় ছাড়তে হোল সেই শান্ত নিভৃত নীড় চিরকালের জন্যে।

মহানগরীতে এসে কত বিপর্যয় সংগ্রাম অশান্তিতে কেটেছে দিনরাত্রি। কাজ নেই, স্বস্তি নেই মনে। কিছুদিন খড়্গপুরে, বড়িশায়, তারপরে হাওড়া গার্লস কলেজে। এর মাঝে মাঝেও কি অন্য কাজের চেষ্টা হয়নি! খবরের কাগজে কাজ। তবু লিখবার মত অনুকূল পরিবেশে, মনের আকুল বিশ্রামে নিশ্চিন্ত থাকার মত দিন পাওয়া যায়নি কখনো; কিন্তু তারই মধ্যে কত আশ্চর্য কবিতার না প্রস্ফুটন ঘটেছে। কোন স্বাচ্ছন্দ্য পাওয়া যায়নি অথচ গেলে ভালো হোত, তা নিয়ে ব্যস্ত হবার মত মনই ছিল না তার, শান্তিটুকুই ছিল কাম্য। যে-সময় পাওয়া গেছে তাতে কোনরকমে মানিয়ে নিয়ে আরো কোনো অনায়াসতায় যাওয়া যায় কিনা তা নিয়ে কিঞ্চিৎ ভাবিত তবু বরং হয়েছেন। তাই যখন কোনো কবি সম্বন্ধে তিনি কাউকে বলতে শুনেছেন 'উনি এইসব হীন অভাব অভিযোগ, পণ্ডিত জনের প্রতিকূলতার জন্যে আর লিখতে পারছেন না ইদানীং।' দাদা আশ্চর্য উদারতায় হেসে উঠেছেন প্রবল প্রচুরতায়, বলেছেন, 'তাহলে ত বলো, আমাকে অনেক আগেই লেখা বন্ধ করা উচিত ছিল। কই, আমি কি তা করেছি।' আনন্দের যে অন্তঃশীলা ফল্গুধারা তাঁর

জীবনের নিভৃতির কোল ঘেঁষে নিয়ত বহতা হয়ে ছিল, তাতে ছোটোখাটো বিরূপতা উপেক্ষা করে যাওয়া বোধ করি সম্ভবপর ছিল তাঁর কাছে। ল্যান্সডাউনের বাড়ির বারান্দায় ইজিচেয়ার নিয়ে বসতেন লিখতে, সামনেই ছিল একটি পত্রবহুল নিমগাছ। তার পাতার ঝালরের ফাঁক দিয়ে আলোর জলে মুছে নেওয়া ঝকঝকে পরিচ্ছন্ন নীল আকাশ চোখে পড়ত। মুগ্ধ বিস্ময়ে, কিছু না লিখে চুপচাপ বসে থেকে, হয়তো মনে মনে অনেক চিন্তায় নিমগ্ন হয়ে থাকতে দেখেছি তাঁকে। যে কথাটা মোটেই বলার মত কিছু নয়, সেই কথাটাই যে কতবার কত নতুন পরিবেশে তিনি বলেছেন আমাকে। যেন এ কথাটার কোনো ব্যবহারিক ওজন নেই বলেই অন্য দিকে এক বিপুলবিসার অর্থ রয়ে যায় সর্বক্ষণ, পুরোনো হয় না, বেদনার ধার মরে না, অনন্ত আনন্দের ব্যথায় বিদীর্ণ হতে অস্থিরতা নেই, কেননা ক'জনই বা সে খরধার অনুভবের খোঁজ রাখে। বলতেন, 'কি সুন্দর এই গাছ আর আকাশ। জানিস, এই বাঙলা ছেড়ে কোথাও যাবো না, কোথাও যেতে পারবো না। এমন আকাশ আর গাছপালা আর কোথায় আছে বল।' এই বাংলার ত্রস্ত নীলিমার খণ্ডিত অবসরে ওই বাড়িতে অজস্র বই এর বন্ধুত্বে, মনের একান্ততায় হয়ত ভালোই থাকতেন তিনি, যদি না জনৈকা প্রতিবেশিনীর অভদ্র দৌরাত্ম্যে সর্বক্ষণ বাড়ির হাওয়া পরিবেশ পঙ্কিল হয়ে থাকত। সর্বদাই কণ্ঠস্বর উচ্চগ্রামে বেঁধে রেখে মহিলাটি বাতাসের ঈথার তরঙ্গ কে এমনি ব্যতিব্যস্ত করে রাখতেন, যে ক্রুদ্ধ তরঙ্গগুলো তার শোধ তুলত অন্যের কর্ণপটহে। বিশেষ করে দাদার মতো লোক, যিনি যে কোনো মহিলা সংসর্গেই কেমন অসহায় বোধ করতেন নিজেকে, তাঁর অবস্থা যে এই পরিবেশ বৈগুণ্যে অত্যন্ত করুণ হয়ে উঠবে তা না বললেও চলে। শেষ পর্যন্ত অবস্থা এমন সঙ্গিন হয়ে উঠল যে, লেখাই তাঁর প্রায় বন্ধ হবার মতো। এই বাড়িতে থাকা যখন দুরূহ হয়ে উঠল কেবলি বাড়ি খুঁজেছেন তিনি। যে সব ছেলেরা তাঁর কাছে লেখার দাবি নিয়ে এসেছে, তাদের কাউকে যদি তাঁর মনে হয়েছে যে, সে তাঁকে সত্যি ভালোবাসে, শ্রদ্ধা করে, অমনি তাকে বলেছেন একটা মোটামুটি সুন্দর বাড়ি খুঁজে দিতে। ছুটিতে এলে আমাকে নিয়ে কত যে বাড়ি দেখিয়েছেন, তার শেষ নেই। প্রায়শই পছন্দ হয়নি; এমন বাড়ি খুঁজতেন যেখানে আছে আকাশের অবারিত আলোর প্রবেশ, উজ্জ্বল তৃণতরঙ্গের প্রাঙ্গণ। একটু কাঁচা মাটির সান্ত্বনা থাকা চাই, যেখানে খালি পায়ে বেড়িয়ে বেড়ানো চলবে। শান্তিনিকেতনে এক টুকরো জমি রয়েছে মেজদার, সেখানে একটা 'কটেজ' বানিয়ে দিতে চেয়েছিলেন মেজদা, কিন্তু কলকাতার ধারে কাছেই থাকার জন্যে তাঁর ইচ্ছা ছিল। এবার পূজোর ছুটিতে কেবলি বলেছেন, 'আমার মধ্যে লিখবার এমন একটা প্রবল প্রবাহ এসেছে যে ভাবছি কলেজের কাজ ছেড়ে দেব, শুধু লিখব, কলকাতার কাছাকাছি কোথাও একটা জমির খোঁজ কর না।' আমি এরকম একখণ্ড জমির খোঁজ নেবার চেষ্টাও করেছিলাম, কিন্তু তার আর দরকার হোল না।

যা গেছে তার জন্যে তাঁর দুঃখ থাকলেও তা নিয়ে অক্ষমের বিলাপ করতে চাননি তিনি, চেয়েছিলেন ভবিষ্যতে নতুন করে তেমন পরিবেশ গড়ে তুলতে। যার সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বারংবার বিভিন্ন চিঠিপত্রে বলেছেন তিনি, 'বরিশালের দিনগুলির মত ভালো থাকা।' মা চলে গেছেন এর মধ্যে। তাতে দাদার জীবনে একটা অসহায় স্পর্শাতুরতার স্থান যে শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্বন্ধে তিনি উদাসীন থাকতে চাইলেও আমরা সবাই জানতাম কেমন তীক্ষ্ণ করে সে শূন্যতাটা তাঁকে বিঁধছে। তিনি হয়ত তার কিছুটা পরিপূরণ চেয়েছিলেন মেজদাকে দিয়ে, যে মেজদা তাঁর আবাল্যের সহচর, সহোদর অনুজ হয়েও

তার অন্তরতম বন্ধু। মেজদা সব সময়ে দাদার জীবনের শেষদিন পর্যন্ত যেমন তাঁর সাংসারিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনগুলোর দিকে অনেক দুর্ভাবনা থেকে তাঁকে আড়াল করে রেখেছিলেন, তেমন তাঁর অন্যান্য নানান সমস্যা সমাধানেও সবসময়ে সচেষ্ট ছিলেন। আর যে দাবিটা তিনি প্রায়শই করে থাকতেন আমার কাছে, তা আমার পক্ষে মান্য করা সম্ভবপর হয়নি। তার জন্যে অসমর্থের অনুশোচনার অন্ত নেই। বলতেন, 'কলকাতায় চলে আয় তুই, এখানে একটা চাকরি-বাকরি নিয়ে নে। বরিশালের আবহাওয়াটা ফিরে আসুক।' আপাতত তাঁর আমার কাছে লেখা একখানা চিঠি হাতের কাছে রয়েছে। চিঠিটার তারিখ লেখা রয়েছে, ২.৭.৫৪। লিখেছেন, '...তুমি কয়েকদিন এখানে ছিলে, বেশ বাড়ির atmosphere বোধ করছিলাম,—বিশেষতঃ সেই অনেক আগের বরিশালের মতন। তুমি কোনো একটা কাজ নিয়ে কলকাতায় চ'লে এলে নানাদিক দিয়ে খুব ভালো হত।' এই চিঠিটার উল্লেখের দরকার ছিল না, যদিও করতে হলে অনেকই করা যেতে পারে, কিন্তু করলাম এই জন্যে যে, সাধারণ্যে মনে হচ্ছে, একটা ধারণা ধীরে ধীরে গড়ে উঠতে সাহায্য করছে কারো কারো দাদার সম্পর্কে লেখা প্রবন্ধ বা স্মৃতিকথা যা নির্ভেজাল ভুল, যাতে এমনটা বলার চেষ্টা আছে যে দাদার সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা তেমন গাঢ় ছিল না। ছিল কি ছিল না, সে সম্বন্ধে সাধারণ পাঠকমহল যে-কোনো ধারণা পোষণ করতে পারেন, তাতে আমাদের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হবার কথা নয়, কিন্তু আমার মনে হয়, স্মৃতিকথা বা জীবনীতে যেহেতু কল্পনার চাইতে বাস্তব ঘটনার দাবিটা বেশি, তাই যা সত্য তাই বোধ করি লোকের সামনে তুলে ধরা কর্তব্য। আরেকটা কথা বলতে পারি, দাদাকে তাঁরা সবাই নিশ্চয়ই অত্যন্ত ভালোবাসেন, শ্রদ্ধা করেন তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যাঁরা তার জীবন সম্বন্ধে লিখেছেন, কিন্তু সেই ভালোবাসার আতিশয্যে তাদের বোধহয় অন্য কাউকে অহেতুক কল্পনার সাহায্যেই সবার কাছে অশ্রদ্ধার্হ করে তোলা উচিত হবে না, অথবা তাঁদের ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত হবে না সেই সব কথা লেখা যা তাঁরা পুরোপুরি সঠিক করে জানেন না। কিন্তু সে থাক্। আসলে আমি ত জানি দাদার কি অসীম স্নেহ ছিল আমাদের জন্য। দুটো দৃশ্য আজ বিশেষ করে মনে পড়ছে আমার। সেই তাঁর "শ্রেষ্ঠ কবিতা" যেদিন প্রথম বেরোল; সে একদিনের কথা। তখন আমি ছুটিতে কলকাতায়। আর কেউ তখন পর্যন্ত জানেনই না যে কয়েকটা কপি বাড়িতে এসে গেছে। দাদা প্রথম কপিটা আমাকে দিয়ে গভীর আগ্রহ ও ঔৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'প্রচ্ছদপটটা কেমন হয়েছে বল্ তো?' যেন আমার মতামতের ওপরেই প্রচ্ছদপটের ভালোমন্দ একান্তভাবে নির্ভর করছে। আর, যেদিন সেই শোচনীয়তম দুর্ঘটনাটা ঘটল, তার আগের দিনের একটি ছবি যা এখনও যেন চোখের ওপর ভাসছে। হঠাৎ হন্তদন্ত হয়ে অসম্ভব চিন্তান্বিত ভাবে দাদা এলেন মেজদার বাড়িতে। সারামুখে রক্তিম আভা ছড়িয়ে গেছে, দ্রুত নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস পড়ছে। আমার খোঁজ করেছিলেন, আমি তখন ছিলাম না, দেখা হয়নি। কাউকে আর কিছু না বলেই চলে গেলেন। পরদিন সকাল হতেই দাদার কাছে গিয়ে বললাম, 'কাল এমন হন্তদন্ত হয়ে গিয়ে আবার তখুনি ফিরে এলে কেন? কি হয়েছে? কোন কিছু খারাপ সংবাদ নাকি? তিনি বললেন, 'রাস্তায় আসতে আসতে কাদের যেন বলতে শুনলাম এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে, মনে হোল তোদের ঐ বাড়িতে। তাই দেখতে গিয়েছিলাম তোরা সবাই ভালো আছিস কি না। তোরা সবাই ঠিক আছিস দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম। কাল রেডিওতে আমার কবিতা পাঠ, তোদের কুশল না জেনে গেলে সেটা স্বস্তির সঙ্গে করা আমার পক্ষে সম্ভব হোত না।' কার কাছে কি শুনেছেন, তার ঠিক নেই, দাদা উদ্বেগাকুল হয়ে ছুটে

এসেছিলেন খবর নিতে। সেই ছবিটা মনে আছে, কিন্তু তখনও কি জানতাম এ্যাকসিডেন্টটা সেই সন্ধ্যায়ই তার জন্যেই অপেক্ষা করছে।

বাইরে থেকে যারা তাঁকে দেখেছেন, তাঁরা তাঁকে গম্ভীর, নির্জন, স্বপ্নলোকবাসী বলেছেন; বলেছেন সর্বক্ষণ একটা অদৃশ্য দূরত্বের বেষ্টনী তৈরী করে তাঁর নিজের চারিদিকে তিনি সবার থেকে আলাদা হয়ে থাকতেন। কিন্তু কত সময় দেখেছি, স্বপ্নলোক থেকে নেমে এসে হাসি পরিহাসে, কৌতুকে, গল্পে কেবলমাত্র আমাদের সঙ্গেই নয়, বাইরেরও যাঁরা তাঁর সান্নিধ্যে যেতে সঙ্কোচ করেনি তাদের সঙ্গে এক হয়ে যেতেন। এত মজার মজার কথা বলতে পারতেন যে, হেসে কুটিপাটি হয়ে যেতে হোত। যে মানুষ অত গুরুগাম্ভীর্যের কবিতা লিখতেন, তিনি যে অমন চারিদিক উচ্চকিত করে প্রকম্পিত হাসি হাসতে পারতেন, বা অন্যকেও হাসিয়ে হাসিয়ে ক্লান্ত করে দিতে পারতেন তা যেন না দেখলে বিশ্বাস করাই যায় না। কখনো কখনো বা তাস খেলার নেশা চাপত। বরিশালে কোন ছুটির সময়ে হয়ত দাদা-মেজদা দু'জনেই বাড়িতে রয়েছেন—আর আছেন দাদার কোন বন্ধু। আর যায় কোথায়! তাস খেলতে বসতে হোল, চতুর্থজনের স্থান অগত্যা আমাকেই না পূরণ করে উপায় নেই। দুপুরে খাবার পরে দাদার ঘরে তাসের আড্ডা জমত সে আড্ডা ভাঙতে রাত এগারোটা। মায়ের তাগিদের আর বিরাম থাকত না—রাত হচ্ছে, রাত হচ্ছে—কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা। দাদাকে খেলা থেকে ওঠায় সাধ্যি কার। বিপক্ষ দল হয়ত একটা 'রাবার' করেছে, তাই তাঁর একটা 'রাবার' না-করা পর্যন্ত স্বস্তি নেই। একটা হোল ত আরো একটা। আরো একটা।

পরিহাস ও কৌতুকপ্রিয়তা আমার মাতুলবংশের থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে বোধহয় লাভ করেছিলেন তিনি। আমার দাদামশায় ৺চন্দ্রনাথ দাশ খাঁটি পূর্ববঙ্গের ভাষায় বহু হাসির গান ও ছড়া রচনা করেছিলেন। দাদা এক জায়গায় তাঁর সম্বন্ধে লিখেছেন যে, 'দাদামশায়ের অনেক লেখা ঈশ্বর গুপ্ত, মধুসূদন, হেম, রঙ্গলাল ইত্যাদিকে মনে করিয়ে দিলেও তাঁর সফলতর লেখা—বিশেষ করে কয়েকটি গান—লোকগাথা লোককবিতার খানিকটা সার্থক উত্তরসাক্ষ্য হিসেবে টিকে থাকবে মনে হয়।' পরিহাসপ্রিয়তা দাদার যে শুধু আমাদের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল তা নয়, চাকরবাকরদের সঙ্গে তাঁর অন্তরঙ্গ পরিহাস তাদের হাসিয়ে মারত।

আসলে কৌতুকপ্রিয়তা তাঁর এমনই সাধারণ স্বভাব যে, অনেক বিরূপতাতেও তিনি নিছক কৌতুক উপভোগ করেছেন, আর তার ফলে উপেক্ষা করতে পেরেছেন সহজে। সাহিত্যক্ষেত্রে তাঁকে নিষ্ঠুরতা কম সইতে হয়নি, তাঁর প্রথম দিকের সাহিত্যসাধনার কালে যে সব অতিপণ্ডিত সমালোচকগণ সমালোচনার নামে, তাঁদের নিজেরই কথায় ধাঙড়ের কাজ করতে নেমেছিলেন এবং যাঁরা নিজেরাই এখন উল্টো ভূমিকায় পতিত হয়েছেন, তাঁদের সেইসব লেখার উৎসাহী পাঠকও ছিলেন তিনিই, কেননা সেসব প্রলাপে হাসির উপকরণ যথেষ্টই থেকে যেত, তেমন করে নিতে পারলে। তাই গায়ে পড়ে বাদ-প্রতিবাদের প্রয়োজন হয়নি তার। সব কিছুই প্রাণখোলা হাসির মত সহজ ছিল, অনাবিল ছিল, উপেক্ষার হাসিতেই উড়িয়ে দেওয়া চলত সব প্রতিবন্ধকতা। এই সহজ পরিহাসের স্বচ্ছতার জন্যেই রাস্তায় মোটরকারের অভদ্রতার কথা বলতে গেলে দেখা যায় ঃ

'একটি মোটরকার গাড়লের মত গেল কেশে
অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ;—'

তবু, গাড়লের মত মোটরকার ও না হোক, তারই স্বজাতি ট্রামকার অনেক কিছু

ভীষণতরো দুর্ঘটনা ঘটাতে পারে। এই 'কার' জাতিটা যে মাত্র নির্বোধ 'গাড়ল'ই নয়, তার চাইতে অনেক অনেক বেশি ক্ষমতাবান, সেইটের প্রমাণ দেবার তাগিদ ছিল হয়ত তাদের। নইলে সবকিছুই ঠিকঠাক আগের মত থাকবে শুধু একজন যাঁর আরো অনেকদিন এখানে থাকার কথা ছিল, পৃথিবীকে ভালোবাসার কথা ছিল, কথা ছিল বাংলার ত্রস্ত নীলিমার শান্তিতে মগ্ন থাকার, 'সত্য আলো'র বেদনায় দীর্ণ হবার, সেই শুধু রইল না কেন? ধানসিড়ি নদীটি তেমনি প্রাণকল্লোলে বয়ে চলবে, সবুজ প্রান্তর মরকতের মত উজ্জ্বল হবে, অর্জুন ঝাউয়ের বনে বাতাস তেমনি করেই বইবে, সোনালি রোদ ডানায় মেখে শঙ্খচিল উড়ে যাবে, গোধূলির রঙ লেগে অশ্বত্থ বটের পাতা নরম হবে, খয়েরি শালিক খেলবে বাতাবী গাছে, কিন্তু সেই একজন, সেই একটি প্রাণময় সত্তা যে এই বিচিত্র রূপরাজ্যের পথে পথে হারিয়ে হারিয়ে গেছে, 'সত্য আলো'র বিস্ময়ে বেদনায় ভেঙ্গে-ভেঙ্গে গেছে তাকেই শুধু খুঁজে নেওয়া যাবে না এদের মাঝে। এই শিশিরঝরা ধানের গন্ধে ভরা হেমন্ত রাতে— গাছের পাতারা যখন হলুদ হয়ে এসেছে, জোনাকির আলোয় দূরের মাঠ বন যখন ঝিলমিল, তখন নতুন করে সেই পুরোনো গল্পের পাণ্ডুলিপির আয়োজন চলছে আজ। সেই গল্প। আজ আর আমাদের পূর্বপুরুষরা সে গল্পের নায়ক নন্, নন্ তাঁরা জ্যোৎস্না-মোছা রাতে শিশিরে ধানের দুধে ভিজে ভিজে হাওয়ার শরীরে স্বপ্নময় পরীদের হস্তগত। আজ যিনি, তাঁকে আর খুঁজে পাওয়া যাবে না শিশির ঝলমল সোনার ধানক্ষেতের পাশে ভোরের আলোয়। পৃথিবীর ভালোবাসায় চিরতরে যতি টেনে স্বপ্নের পরীদের হাতে নিঃশেষে তুলে দিলেন নিজেকে, তাঁর শয্যায় কাঁচা লবঙ্গ এলাচ দারুচিনি থাকবে না ছড়ানো, থাকবে তাঁর কাব্যে দূরতর সায়াহ্নের সমীপবর্তী সবুজার্দ্র দ্বীপের দারুচিনি লবঙ্গ এলাচের বনের রহস্যময় ধূসর ইসারা। নিজে তিনি নিদ্রার নির্জনে চিরপ্রিয় স্বপ্নের বলয়ে নিমগ্ন হয়ে থাকবেন—হয়তো ঃ

চাহিয়াছে অন্তর যে ভাষা
যেই ইচ্ছা যেই ভালোবাসা
খুঁজিয়াছে পৃথিবীর পারে পারে গিয়া
স্বপ্নে তাহা সত্য হয়ে উঠেছে ফলিয়া।

স্মৃতিচিত্র

নলিনী দাশ

১৯৩৬-৩৭ সালের কথা। আমরা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এম এ ক্লাসের ছাত্রী। বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা' পত্রিকা তখন সদ্য প্রকাশিত হয়েছে। আমি সে পত্রিকার দুই নম্বর গ্রাহিকা—বুদ্ধদেববাবু বলতেন প্রথম 'গ্রাহিকা' যেহেতু এক নম্বর ছিলেন 'গ্রাহক'। তখন আশুতোষ বিল্ডিঙে যাদের ক্লাস হত, আমরা অবসর সময়ে কবিতা পত্রিকাকে কেন্দ্র করে মেয়েদের কমনরুমে ঘরোয়া কাব্যপাঠের আসর বসাতাম। প্রতি সংখ্যার প্রথমেই থাকত একটি রবীন্দ্রনাথের কবিতা। অন্যান্য কবিদের লেখার মধ্যে জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা থাকতই, কখনও বা একাধিক। জীবনানন্দ তখনও বিখ্যাত হননি, কিন্তু এই সময়ে তাঁর কিছু বিখ্যাত কবিতা প্রকাশিত হয়েছিল। যথা 'আট বছর আগের একদিন', 'সমারূঢ়' প্রভৃতি। আমরা সকলেই তাঁর বিশেষ অনুরাগী হয়ে পড়েছিলাম। বলা বাহুল্য আরো বহু কাব্যরসিক কবিতা পত্রিকায় জীবনানন্দকে 'আবিষ্কার' করে মুগ্ধ হন। সম্ভবত এই সময়টাকেই কবির জনপ্রিয়তা এবং খ্যাতির প্রথম সোপান বলা চলে।

একদিন আমাদের এক বান্ধবী খবর দিলেন যে জীবনানন্দের ছোট বোন সুচরিতা আমাদের সহপাঠিনী, ইতিহাসে এম. এ. পড়ছেন। তখন ইতিহাসের ক্লাস হত দ্বারভাঙ্গা বিল্ডিঙে। আমরা সদলবলে চললাম কবির বোনের সঙ্গে আলাপ করতে। নম্র, বিনয়ী, মৃদুহাসিনী, মধুর ভাষিণী মেয়েটিকে আমাদের সকলেরই খুব ভাল লেগেছিল। আমার সঙ্গে তার আজীবন-সৌহার্দ্যের ভিত্তি স্থাপিত হয়েছিল, একত্র পাস করবার পরেও যোগাযোগ রেখেছিলাম। সেই সময়ে আমার দিদির সঙ্গে যৌথভাবে 'মেয়েদের কথা' নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনা করতাম। মেয়েদের বিশেষ আগ্রহের বিষয় ছাড়াও গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ সবই থাকত সেই পত্রিকায়। 'মেয়েদের কথা'র জন্য কবিতা চেয়ে আমি জীবনানন্দকে প্রথম চিঠি লিখি, সম্ভবত ১৯৩৯ সালে। কবিতা তিনি দেননি, কারণ-স্বরূপ বলেছিলেন যে, তাঁর লেখা কিছুটা 'কুয়াশাচ্ছন্ন' হয়ে থাকছে, 'মেয়েদের কথা'র পাঠিকাদের ভাল লাগবে না। দুঃখের বিষয় তখনকার সেই চিঠিগুলি আমি রেখে দিইনি। অবশ্য তার মধ্যে কোনো গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল না।

জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আমার প্রত্যক্ষ পরিচয় হয়েছে এর বেশ কয়েক বছর পরে, ১৯৪৩ সালে তাঁর ছোট ভাই অশোকানন্দের সঙ্গে আমার বিবাহ সূত্রে। বালিগঞ্জে আমাদের বাড়ি ভাড়া করা হল। জীবনানন্দ এর পরের কয়েকটি বছর সপরিবারে আমাদের কাছেই থেকেছেন। প্রথমে বরিশাল বি. এম. কলেজ থেকে ছুটি নিয়ে এবং পরে সেখানকার অধ্যাপনার কাজে ইস্তফা দিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিলেন। বলা বাহুল্য তাও তখন আমাদের কাছেই থাকছেন। সুচরিতা সুযোগ পেলেই তমলুক থেকে তাঁর কর্মস্থল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছেন।

প্রায় সমবয়স্ক দুই ভাই-এর মধ্যে এক অভূতপূর্ব গভীর প্রীতি, সৌহার্দ্য ও সহমর্মিতার সম্বন্ধ ছিল। শৈশব থেকে প্রথম যৌবনের দিনগুলি পর্যন্ত তাঁরা বরিশালে ও কলকাতায় একসঙ্গে কাটিয়েছেন। বাইরে বেড়াতে গেলেও একসঙ্গেই গেছেন। ১৯২৫ সালে ছোট ভাই কর্মসূত্রে বাংলার বাইরে চলে যান। তার পরে দীর্ঘ আঠারো বছরের মধ্যে দেখাসাক্ষাৎ ও পত্রালাপ হয়েছে কিন্তু একসঙ্গে বাস করা বিশেষ ঘটেনি। দুই জনের চেয়েই বয়সে অনেক ছোট সুচরিতা বা 'খুকু' ছিলেন দুই দাদারই অত্যন্ত প্রিয় পাত্রী। তাকেও এমন কাছে কাছে পাওয়া অনেক বছর ঘটে ওঠেনি। কলকাতার বাসায় পারিবারিক ঠিকানার এই কয়েকটি বৎসর তাই সকলের কাছেই অত্যন্ত আনন্দের হয়েছিল। বাইরের লোকের কাছে, এমনকি আত্মীয়-স্বজনের অনেকেরই কাছেও জীবনানন্দ ছিলেন গম্ভীর, আমিশুর ও স্বল্পভাষী। অন্তরঙ্গ পারিবারিক পরিবেশে প্রিয় ভাইবোনের সঙ্গে তাঁর হাস্যপরিহাস সমুজ্জ্বল সরস কথাবার্তা আর প্রাণ-খোলা হাসি যারা শোনেনি, তাদের পক্ষে তা কল্পনা করাও কঠিন। এই কয় বৎসরের আনন্দঘন দিনগুলি চিরকাল মনে থাকবে।

জীবনানন্দ নিজে খুব ভাল ছাত্র ছিলেন। পরীক্ষার প্রয়োজনের বাইরে নানা বিষয়ে গভীর ভাবে অধ্যয়ন করতেন। জীবনের শেষ প্রহর পর্যন্ত নানা বিষয়ে পড়তেন। লিখতেন অনেক রাত অবধি। নিজের ছেলেমেয়ের লেখাপড়ায় আগ্রহ ও মনোবলের অভাব তাঁর মনে গভীর বেদনার সঞ্চার করত। মেয়ে স্কুল ফাইনাল পরীক্ষায় তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হল, ছেলে প্রথমবারে অকৃতকার্য হল। এই সব ঘটনায় মর্মাহত হয়ে দাদা আমাদের কাছে কত আক্ষেপ করেছেন। কিন্তু ছেলেমেয়েকে একটিও কটু কথা বলেননি। তিনি অত্যন্ত স্নেহশীল পিতা ছিলেন। জীবনানন্দকে আনন্দ দেওয়াও সহজ ছিল। একটু মনোযোগ, একটু বিশেষ সেবাযত্ন, এর বেশী কিছু প্রয়োজন হত না। সুচরিতা ভাল রাঁধতে পারতেন। কলকাতায় এলেই ছোটবোনের কাছে তাঁর আবদার চলত, অমুক জিনিসটা রাঁধ তো দেখি, অনেকদিন অমুক জিনিসটা খাইনি, এই সব। আমি একবার অতি সাধারণ একটি গরম জামা বুনে তাঁকে উপহার দিয়েছিলাম, পেয়ে ছেলেমানুষের মতন খুশি হয়ে উঠেছিলেন। শেষ জীবন পর্যন্ত শীতকালে সেই জামাটি পরেছিলেন।

জীবনানন্দের কবিতা আমি ছাত্রজীবন থেকে পড়েছি, এখনও পড়ি। কিন্তু আমি তাঁর কাব্য সম্বন্ধে আলোচনা করবার অধিকারী বলে মনে করি না। ছাত্রজীবনের ঘরোয়া সাহিত্য সভায় আমরা প্রধানত কাব্য পাঠ করতাম। উপভোগ আর উপলব্ধি করতাম। কোনো-কোনো কবিতা আমাদের গভীর ভাবে স্পর্শ করলেও আলোচনা যা হত সেটা অনেকটা লঘু ধরনের। কবিতা আমাদের কাছে সমালোচনার বস্তু ছিল না।

পরবর্তী জীবনে, ঘরে-বাইরে নানা কর্মজালে জড়িত থেকে যতটুকু কাব্যচর্চা করেছি, সেও কেবল নিজের ব্যক্তিগত তৃপ্তি ও আনন্দের জন্য। জীবনানন্দের কবিতা গত ৪৫ বছর ধরে অনেক পড়েছি, অভিভূত হয়েছি, কিন্তু গভীরভাবে চর্চা বা আলোচনা করার সময় বা সুযোগ পাইনি।

জীবনানন্দ আজ বিশ্ববিখ্যাত এবং জনপ্রিয়। কিন্তু তবু মনে হয় অধিকাংশ পাঠক এমনকি সমালোচকরাও তাঁকে সমগ্রভাবে বুঝে দেখবার চেষ্টা করেননি, হয়তো গভীরভাবে অধ্যয়ন-অনুধাবন করেননি। পাঠক-সাধারণের পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। আমাদের ছাত্রজীবনের সাহিত্য পাঠের মতন ওঁদের কাব্যচর্চাও পল্লবগ্রাহী। তাঁরা কাব্যের রসোপলব্ধি করেন, হয়তো-বা কিছু চিন্তা-ভাবনার দ্বারা অনুপ্রাণিত হন। অনেক সময়েই

তাঁরা "রূপসী বাংলা" এবং "বনলতা সেন" পর্বের কবিতা পর্যন্ত পাঠ করেন, পরবর্তীকালের রচনা পড়তে বা বুঝতে চেষ্টা করেন না। সমালোচকরাও অনেক সময় তাঁদের আলোচনা এইখানেই থামিয়ে দেন। অবশ্য কেউ-কেউ আরো কিছুটা অগ্রসর হয়ে তাঁকে 'তিমিরহননের' কবি আখ্যা দিয়েছেন, তাঁর 'সমাজচেতনা' ও 'ইতিহাসচেতনা'র উল্লেখ করেছেন, বলেছেন যে শেষের দিককার রচনাগুলি এক বিশেষ দিকে মোড় নিয়েছিল। কিন্তু এই সমস্ত আলোচনাই হয়েছে কিছুটা খণ্ডিত এবং বিক্ষিপ্তভাবে, কবির সমগ্র কাব্যসৃষ্টি নিয়ে বিশদ আলোচনা চোখে পড়েনি বিশেযত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ এবং তার পরবর্তীকালের নানা ঘটনা ও আলোড়নের পটভূমিকায় লেখা কবিতাগুলি সম্বন্ধে আলোচনা কমই হয়েছে। দুই বাংলার সাহিত্য-সমালোচকদের কাছে নিবেদন করছি যে জীবনানন্দ সম্বন্ধে আরো অনেক বিস্তৃত এবং গভীরতর আলোচনা সমালোচনার প্রয়োজন আছে।

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ

বাণী রায়

নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ যে দ্বীপে ক্ষণ-বিশ্রাম লাভ করে, সে দ্বীপে অবশ্যই তার পায়ের চিহ্ন পড়ে থাকে না।

যে পথ ক্ষণ-জন্মারও প্রতিটি পায়ের ছাপ ধরে রাখতে পারে না, আমি সেই পথ। আমার জীবনে অনেক দুর্লভ প্রতিভার নিকটস্থ হ'বার সৌভাগ্য হয়েছে, কিন্তু সহজপ্রাপ্তির আনন্দে মূল্যবানকেও যথোচিত মূল্য দিতে পারিনি হয়তো। আজ মনে অনুতাপ আসে ; জীবনানন্দ দাশের সঙ্গ যখন পেয়েছিলাম, কেন আরও নিবিড়তার সন্ধান করি নি; কেনই বা প্রত্যেকটি সাক্ষাতের খুঁটিনাটি সম্পর্কে একান্তচিত্ত হইনি?

অনাত্মীয়া-মহিলা হিসাবে হয়তো কম নারীই এই লজ্জাশীল ও সমাজবিমুখ কবির নিকটস্থ হ'বার সৌভাগ্য পেয়েছিলেন। আমি তাঁর সঙ্গে মিশেছিলাম পুরুষের মত করেই। তাই, কবি হয়তো আমার কাছে কদাচিৎ সহজ অন্তরঙ্গতায় ধরা দিতেন। নারী সম্পর্কে তাঁর সহজাত সম্ভ্রমবোধের সঙ্গে সুদূর সঙ্কোচ ছিল। আমার সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের দিনগুলি সংখ্যায় অধিক ছিল না, কিন্তু গভীরতায় গাঢ় ও স্থায়িত্বে দীর্ঘ ছিল। সেই অমূল্য দিনগুলির স্মৃতি শোকতন্ময় মনে একমাত্র সান্ত্বনা। আমি তাঁর জীবনের কোন ঘটনা বা incidents সম্পর্কে অবহিত হ'বার চেষ্টা করিনি, কেবল মানুষ হিসাবে তাঁকে চিনবার চেষ্টা করেছিলাম।

স্বর্গগত জীবনানন্দ দাশ আমার বন্ধু (Institute of Education for women কলেজের অধ্যক্ষা) নলিনী দাশের ভাশুর হতেন। তিনি বিবাহের পর তাঁদের রসা রোডস্থ বাসা মোহিনী ম্যান্‌সনে আমাকে ডেকেছিলেন। সেখানে জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ (১৯৪৩-৪৪ সাল আনুমানিক)।

তিনি জীবনানন্দের কনিষ্ঠ অশোকানন্দকে বিবাহ করেছেন জেনে আমি উল্লসিত ছিলাম। সমাজবিমুখ, লজ্জাশীল, প্রখ্যাত কবি কিন্তু নিজেই আমাকে দেখতে চেয়েছিলেন 'শনিবারের চিঠি'তে প্রকাশিত আমার 'লুক্রেশিয়া' গল্প পড়বার পরে। প্রথম সাক্ষাতের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি আমার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ অনুসন্ধানী দৃষ্টিতে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, "আপনি বাণী রায়?"

একটু সন্দেহাকুল মনে হ'ল ওঁকে,—"হ্যাঁ" উত্তরের পর তেমনিভাবেই প্রশ্ন করলেন, "'লুক্রেশিয়া' আপনার লেখা?"

তিনি যেন যাচাই করে সত্যাসত্য জেনে নিতে চান। তখন আমি নবীনা লেখিকা মাত্র, কবিকে দেখে আমারই সঙ্কোচ হ'বার কথা। প্রথম আলাপ কিন্তু অত্যন্ত সহজ অন্তরঙ্গতার মধ্যেই সম্পাদিত হয়েছিল।

এই পরিচয়ের প্রকৃত রূপটির মধ্যে জীবনানন্দের চরিত্র-বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। তিনি নূতন

লেখকদের রচনা পাঠ করতেন, তাদের উৎসাহ দিতেন। তাঁর নিয়মিত পড়াশোনার অভ্যাস ছিল। সাহিত্যকে তিনি ভালবাসতেন অতি আন্তরিকভাবে। 'শনিবারের চিঠি'র প্রত্যেক সংখ্যায় প্রায় তাঁকে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করা সত্ত্বেও সেই পত্রিকা তিনি পাঠ করতেন। তিনি ছিলেন প্রকৃত গুণগ্রাহী।

তারপর, ল্যান্সডাউন রোডের দ্বিতলে আবার তাঁর সঙ্গে পূর্ব আলাপের সূত্র টানা হয়। শেষ পর্যন্ত সেই ঠিকানা ছিল তাঁর। জীবনানন্দ তখনও বরিশাল কলেজে অধ্যাপনা ছাড়েননি। ছুটিতে যাতায়াত চলছে ও ছেড়ে দেবার উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। কবির মা তখন জীবিতা ছিলেন। তাঁর অতীত কবি-খ্যাতি শুনেছিলাম। কবির পারিবারিক জীবন সম্পর্কে অনুসন্ধিৎসু ছিলাম না। তবে জানি মাতাকে তিনি বিশেষ শ্রদ্ধা করতেন। ছোটভাই অশোকানন্দের প্রতি তাঁর প্রচুর স্নেহ ছিল। তাঁর পুত্র, কন্যা ও সহধর্মিনীকে বন্ধুমহলে টেনে আনার বিপক্ষে ছিল তাঁর আত্মগোপনধর্মী সত্তা। সাংসারিক তরীর হাল ধরা ছিল কবিপত্নীর হাতে। নিজের ঘরে অনেক বই নিয়ে সম্পূর্ণ সাহিত্য পরিবেশে নিঃসঙ্গ হয়ে থাকতে জীবনানন্দ ভালবাসতেন। আর ভালবাসতেন মনের মত বন্ধুদের সঙ্গে সাহিত্য আলোচনা। প্রত্যেকদিন বিকেল থেকে সন্ধ্যার পর পর্যন্ত পায়ে হেঁটে লেকের ধার পর্যন্ত ভ্রমণ তাঁর অভ্যাস ছিল। এই অভ্যাস তিনি কখনও ছাড়েননি। বিকেলের পর তাঁকে বাড়ি পাওয়া শক্ত ছিল। ১৪ই অক্টোবর লেকের পাড় থেকে ভ্রমণ সেরে ফেরার পথেই তিনি ট্রামের ধাক্কায় আহত হয়েছিলেন।

প্রকৃতির প্রতি জীবনানন্দের প্রবল আসক্তি ছিল, তাঁর কবিতার পংক্তির আড়ালে সেই প্রকৃতিকে ধরা যায়। হয়তো সেই প্রকৃতির আকর্ষণ নিত্য তাঁকে লেকের ধারে নিয়ে যেত। একলা যেতেন। বরিশালে তিনি বি. এ. পর্যন্ত পাঠ করেছিলেন। তখন মাঠেঘাটে যথেচ্ছা ভ্রমণ তাঁর অভ্যাস ছিল। ফলে, প্রকৃতির যে রূপ-রস-গন্ধসমৃদ্ধ একটি রূপ তাঁর কাব্যে দেখা দেয়, সে প্রকৃতি আর কোন বাঙালী কবির কাছে সেই ভাবে ধরা দেয়নি। একটু নিরিবিলি—শান্ত পরিবেশ এই সহজ সরল মানুষটি পছন্দ করতেন। স্বল্পভাষী ও গম্ভীর বাহ্যতঃ হ'লেও ব্যক্তি হিসাবে জীবনানন্দ সরল—অমায়িক ছিলেন। কিন্তু, তাঁর প্রখর আত্মসম্মান জ্ঞান ছিল। প্রয়োজন হ'লেও তিনি কোথাও অনুনয়ের ধার দিয়েও যেতেন না। অর্থের অভাব ঘটলেও অর্থের লোভ ছিল না। ইংরাজীতে কলিকাতা থেকে এম. এ. পাশের পর তিনি বিভিন্ন স্থানে অধ্যাপনা করেন। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে থাকাকালীন আমার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ হয়। তারপর ব্যাঙ্কের কাজ নেন। 'স্বরাজ' পত্রিকার সম্পাদনায় যুক্ত থাকেন কিছুদিন। মধ্যে বাইরে ও মফঃস্বলে কাজ করতেন ; যথা খড়্গপুর কলেজে। প্রাইভেট ছাত্র পড়াতেন, প্রবন্ধ লিখতেন। বড়িশা কলেজে কিছুদিন কাজ করেন। শেষ পর্যন্ত হাওড়া উইমেন্‌স্ কলেজে ছিলেন। তাঁর পুত্র সমরানন্দ দাশ (আই. এস. সি.-র ছাত্র), এম. এ.-র ছাত্রী কন্যা মঞ্জুশ্রী, স্ত্রী লাবণ্য দাশ শিক্ষয়িত্রী। জীবনানন্দ ১৮৯৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ছিলেন।

এ সমস্তই তো বাইরের কথা। জীবনানন্দের ভাবে বলতে পারি, স্মৃতির গহ্বর হলুদপত্রাচ্ছন্ন। বাষ্প উত্থিত স্মৃতিমূর্তির মুখ কখনও বিষণ্ণ, কখনও রঙ্গে উজ্জ্বল। সে মূর্তি চেয়েছিল একটু নিশ্চিন্ত অবকাশ কাব্যরচনার নিমিত্ত। জীবিকাটুকু উপার্জনের প্রয়াস ক্লান্ত করেছিলেন তাঁকে। যান্ত্রিক রুটিনের অঙ্গীভূত হওয়ার বিপক্ষে বিদ্রোহ ছিল তাঁর—অযোগ্যের অধীনতা ছিল অসহ্য। নিঃসঙ্গ এই বিহঙ্গ আত্মার স্বপ্ন ছিল নক্ষত্রে—নক্ষত্রে ঃ

"সেই উষ্ণ আকাশেরে চাই যে জড়াতে
গোধূলির মেঘে মেঘে, নক্ষত্রের মত র'ব নক্ষত্রের সাথে!"

(অনেক আকাশ)

অবসর, লেখার জন্য অবসর কামনা ছিল তাঁর। তিনি পছন্দ করতেন সাহিত্যিক পরিবেশ ও নির্জনতায় লেখার মেজাজ তৈরি করা ও সাহিত্য পঠন। ছাত্রের মত অধ্যয়ন তাঁর কাম্য ছিল। মনের রূপ ছিল অনুসন্ধানী ; প্রতিটি বস্তুর, বিশেষতঃ বিভিন্ন ভাষার সাহিত্যের যথার্থ রূপ ধরবার প্রয়াস ছিল তাঁর। পড়তে তিনি ভালবাসতেন। ইংরাজী সাহিত্যের কোন কোন বই তাঁকে ধার দিয়ে ছিলাম। মনে আছে দুটি নাম শুধু মমের 'থিয়েটার' উপন্যাস ও ক্রোনিনের 'দি ষ্টার লুক্‌স্ ডাউন' উপন্যাস তাঁর ভাল লেগেছিল। তিনি বিভিন্ন দেশের উপন্যাস ও কবিতার আলোচনা করতে চাইতেন। জর্মান লেখক টমাস ম্যানের রচনাকে তিনি আধুনিক উপন্যাসে শ্রেষ্ঠত্ব দিতেন। সত্যেন্দ্র দত্তের কবিতা ও এলিয়টের কবিতায় জীবনানন্দের অনুরাগ দেখেছিলাম। একটু প্রাচীন কবি, যথা মধুসূদন ইত্যাদির কবিতা তাঁর ভাল পড়া ছিল না। ইংরাজী গল্প-উপন্যাস অপেক্ষা কন্টিনেন্টাল গল্প-উপন্যাস তিনি বেশী পড়েছিলেন। সমস্ত সাহিত্য-আলোচনার মূল সুর দেখতাম নিজের মতকে তিনি আমার মতেরও ভিত্তির উপর রাখতে চাইতেন। অন্যের কাছ থেকে নিজের সত্যকেও যাচাই করে নেবার এক প্রবৃত্তি।

কতকগুলো জাগতিক বিষয়ে দৃঢ়চেতা ও অনমনীয় হলেও জীবনানন্দ অন্তরঙ্গ ও সমধর্মী বন্ধুদের কথা উপেক্ষা করতেন না। পিতা সত্যানন্দ দাশ ধর্মপরায়ণ শিক্ষক, মাতা কুসুমকুমারী দাশ কবি। সন্তানের মনে শুচিতা বোধ ছিল প্রবল, রুচি ছিল মার্জিত। কিন্তু, মনের গতি সেই প্রাচীন সমাজের মধ্যে সীমায়িত হয়ে রুচিবাগীশের কলমে কিছু কবিতা লিখে ক্ষান্ত হয়নি। মাতার উত্তরাধিকারী তিনি হয়েছিলেন কাব্যক্ষেত্রে। কিন্তু, মাতা যখন লিখেছেন,

পুত্র লিখেছেন ঃ "বিপাসার তীরে ওঠে রবি"

"গেছে বুক — মুখ পরশিয়া
রাঙা রোদ, —নারীর মতন
এ দেহ পেয়েছে যেন তাহার চুম্বন
ফসলের ক্ষেতে!"

(পিপাসার গান)

স্পর্শ-স্বাদ-গন্ধে ভরা একটি জগতে কবি প্রবেশ করেছিলেন, সেখানে নৈতিক ধর্ম-শাসন ব্যর্থ। প্রি-রাফেলাইট কবি সুইনবার্ণের সঙ্গে অনেকে তাঁকে তুলনা করেছেন। আমরা আমাদের দেশের কোন লেখককে যতক্ষণ না বিদেশী মানদণ্ডে মাপ করতে পারি, স্বস্তি পাই না। জীবনানন্দ যে তাঁর নিজের মত, এ কথা বলতে আমাদের বাধে।

প্রকৃতপক্ষে, গ্রামীণ পরিবেশ রচনায় বাংলা-সাহিত্যে জীবনানন্দের সমতুল্য ছিলেন গদ্যকার বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। 'পথের পাঁচালী'র সঙ্গে তুলনীয় জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। দৃষ্টিভঙ্গি, জীবনদর্শন কখনও পৃথক হ'লেও সাদৃশ্য প্রচুর। প্রাকৃতিক বা গ্রামীণ পটভূমির যে সমস্ত অজানা, অচেনা বস্তুপুঞ্জ ইতিপূর্বে কারুর ভাবদৃষ্টিতে ধরা পড়েনি, তাদের অন্তরঙ্গ রূপ আমরা প্রথম দেখলাম কবিতার মাধ্যমে।

"দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,

ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;"

(মৃত্যুর আগে)

জীবনানন্দের কাব্য-সমালোচনা নিবন্ধের প্রতিপাদ্য নয়। মানুষ হিসাবে তাঁকে যে ভাবে দেখেছি, সেই সূত্র ধরে অনিবার্য কাব্য-স্মরণ মাত্র। কবি মায়ের মুখে বরিশালের লৌকিক ছড়ার উজ্জ্বলতায় মুগ্ধ হয়েছিলেন শৈশবে। সে সব ছড়ায় অবশ্যই প্রাকৃত বাংলার ঘনবুনানি ছিল। তাই বোধ হয় কবি বন্য ভাষায় তাঁর স্বপ্নচারী সুদূর কবিতার মধ্যে মধ্যে অঙ্গরাগ করতেন।

"আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই—"

অথবা

"ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব ;"

(অবসরের গান)

"মোর দেহ ছেনে গেছে অলস—আঢুল
কুমারী আঙুল—"

(পিপাসার গান)

"মানুষ যেমন ক'রে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়েমানুষের কাছে"—

(ক্যাম্পে)

এই অভিনবত্ব সর্বত্রই যে রুচিকর হয়েছে, তা নয়। কবিতায় অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে বর্বর আদিমতা জানিয়েছে কথ্য ভাষার মিশ্রণ ও সিমেন্টের মত কবিতার গাঁথুনী পাকা করেছে অবলীলাক্রমে। এ ক্ষেত্রে কথার ভাষার সাহিত্য সম্পর্কে প্রমথ চৌধুরীর মতামত কিয়ৎ পরিমাণে জ্ঞাতব্য।

জীবনানন্দের কবিতায় দুর্বোধ্যতা আছে নিঃসন্দেহে। কিন্তু পৃথিবীর যে কোন ভাল কবিতা কি বহু সময়ে তাই নয়? সহজবোধ্যতাই সাহিত্যে উৎকর্ষের একমাত্র মাপকাঠি নয়। ইদানীং কবি যে সমস্ত কবিতা লিখছিলেন, তাদের মধ্যের চিন্তাধারার যোগসূত্র পাঠকের কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট নয়—কখনো সাংবাদিকের প্রথায়, কখনো দার্শনিকের তন্ময়তায় কাটা-কাটা কথা সাজিয়ে গেছেন। অবচেতন মনে তাঁর চিন্তাধারার সংযোগ অবশ্যই ছিল ; লিখিত পংক্তিগুলির অর্থ তাঁর নিজের কাছে সহজ। কিন্তু, পাঠক বিপন্ন হ'ন। তাই জীবনানন্দের কবিতার আবৃত্তি সহজ নয়। ভাল করে না বুঝে পাঠ করলে সে কবিতার অন্তর্নিহিত সঙ্গীত ও তাৎপর্য প্রতীয়মান হয় না। আবার ভালভাবে পাঠ করতে সক্ষম হ'লে বিরুদ্ধবাদীর মনও অর্থ নির্ণয়ের পর আপ্লুত হয়ে যায়। এটি পরীক্ষিত সত্য।

জীবনানন্দকে একদিন বলেছিলাম তাঁর কবিতা দুর্বোধ্য। তিনি তাঁর অভ্যস্ত রঙ্গ-ভঙ্গিমায় প্রতিবাদ জানালেন। আমি কিছু না বলে দ্বিতল থেকে তাঁর একটি নবতম প্রকাশিত কবিতা নিয়ে এসে ওঁর হাতে দিয়ে বিনীত অনুরোধ জানালাম, "দয়া করে এটি একটু বুঝিয়ে দিন না।" আমার পূর্ব থেকেই ইচ্ছা ছিল ওঁর কবিতার অংশবিশেষ ওঁর কাছ থেকে বুঝে নেব।

জীবনানন্দ লজ্জিত-অপ্রতিভ হ'লেন। নিজের কবিতা যেন গোপন বস্তু, কোন মতেই দ্বিতীয় ব্যক্তির কাছে আলোচ্য নয়। অত্যন্ত অপ্রস্তুত মুখে তিনি নাগপাশ মোচন প্রয়াসী ব্যক্তির আকুলতায় বলে উঠলেন, "আজ থাক। পরে একদিন হবে।"

সেই মুহূর্তে তাঁর আত্মার একটি বিশেষ রূপ আমার চোখে পড়ল। আত্মগোপন। তিনি যে কবি, এই শোচনীয় ঘটনা বাইরের লোকের কাছে যেন তুলে ধরার নয়। সাহিত্য-আলোচনা ও মনুষ্য চরিত্র দর্শন কাম্য হ'লেও নিজের একান্ত ব্যক্তিগত কবিতা নিয়ে কবিরূপে জনতার সম্মুখে উপস্থিত হ'বার বাসনা তাঁর ছিল না। তাই সভা ও সভার ফুলের মালা তাঁকে খুঁজে পায়নি। তিনি লাজুক প্রকৃতির ছিলেন। কখনও কোন সভায় নিয়ে যাওয়া যেত না তাঁকে। তাঁর কণ্ঠে তাঁর কবিতার আবৃত্তি অপূর্ব সুন্দর ছিল। কণ্ঠ তাঁর গম্ভীর পুরুষোচিত, যুক্ত হয়েছিল আবেগ। রেডিওতে তাঁর কাব্যপাঠ যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা জানেন কি অপরূপ মূর্ছনা ও আবেগে সেই গম্ভীর কণ্ঠস্বর স্পন্দিত হয়ে উঠত। তখন বোঝা যেত, মাত্র তখনই বোঝা যেত, জীবনানন্দ দাশ কত বড় কবি। সেনেট হলের কবি-সম্মেলনে পঠিত 'বনলতা সেনে'র শেষ লাইন দু'টি আজও কানে বাজছে :

"সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

শ্রোতার বারম্বার অনুরোধে বিশাল সেনেট হলের ব্যাপ্তি মন্থন করে গভীর আবেগধর্মী কণ্ঠ একটির পর একটি কবিতা পাঠ করে যাচ্ছিল। জীবনানন্দ যে সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় কবি, নিঃসন্দেহে সেদিন প্রমাণিত হয়েছিল।

জনপ্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহুল পঠিত রচনা। আজ তরুণ কবিদের মধ্যে শতকরা আশিজন জীবনানন্দের অননুকরণীয় ভঙ্গিতে কবিতা লিখবার চেষ্টা করছেন। তাঁর পুস্তকগুলির বহু সংস্করণ হয়েছে। যখন সাধারণ তাঁকে চিনতে সুরু করেছে, ও তাঁর সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা উৎসুক হয়ে উঠেছে, তখনি তাঁর ঘটলো অকালমৃত্যু।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরের যুগ অত স্বপ্নভারাতুর রূপকথার রাজকন্যা নয়। 'ঝরা পালক' ছিল কবির প্রথম কাব্য-পুস্তক—স্বকীয়তা প্রাপ্তির পূর্বে নকলনবীশ রচনা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' অন্য এক জগতের চিহ্ন রেখে গেল জীবনানন্দের কাব্যধারায়। প্রেমের ব্যথার মধ্যে কবি নিজেকে খুঁজে পেলেন, আর খুঁজে পেলেন পরিচিত জগতের নতুন রূপ।

"জীবনের পরে থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
কবর খুলেছে মুখ বারবার যার ইসারায়,
বীণার তারের মতো পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষার তার
তাহার আঘাত পেয়ে কেঁদে কেঁদে ছিঁড়ে শুধু যায়!
একাকী মেঘের মতো ভেসেছে ভেসেছে সে—বৈকালের আলোয়—সন্ধ্যায়।"

সমস্ত জীবনে তাঁর লেগেছে ম্লান গোধূলীর আলো, বিষণ্ণ হেমন্ত। তাঁর কবিতায় বিষাদ ও বেদনাবোধ তাঁর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিক সম্পদ। সমগ্র কাব্য আচ্ছন্ন করে বাজে :

"আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;"

(আট বছর আগের একদিন)

জীবন ও মৃত্যুর ঘন বুননের মাঝে দূরের আকাশের ক্ষণদৃশ্য কবিকে উদাস করে দিত। বিরাট পটভূমিকায়, সামগ্রিক জীবনের পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর কাব্য। অনেক দূরের দেশে, অনেক বড় অতলে ছোট কবিতা হারিয়ে যেত। বিভূতিভূষণের জীবনদর্শনের জন্মমৃত্যুর রহস্য আড়ালে এক ও অখণ্ড —

"আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,"—

(বনলতা সেন)

জীবনানন্দের প্রধান বিশেষত্ব ছিল এক ধরনের ধী-নির্ভর হিউমার।

দারুণ রোমান্টিক এই কবির লজ্জাজড়িত স্বল্পভাষণ এবং নিঃসঙ্গ স্বভাব বিভক্ত হ'ত চমৎকার হিউমারের অনুশীলন ও ইঙ্গিতে। তাঁর সঙ্গে আমার কথার যোগ ওখানেই ছিল—অল্প কথায় বুঝে নিতে পারা যেত পরস্পরের বক্তব্য ও হাস্যের সেতুবন্ধন রচিত হ'ত নিমেষমাত্রে। এই শ্রেণীর হিউমার বর্জিত লোকদের আমরা 'the other type' বলতাম। কোন অন্তরঙ্গ ব্যক্তির কথা জিজ্ঞাসায় আমি অর্থবাচক প্রশ্ন করতাম, "উনি কি—?" জীবনানন্দ তাঁর চিরঅভ্যস্থ বক্র-হাস্যে উত্তর দিতেন, "unfortunately, the other type!"—একটুক্ষণ বিস্ফারিত চক্ষে অন্যের দিকে চেয়ে উনি তার মুখে সায় খুঁজতেন, তারপর হঠাৎ অতি উচ্চস্বরে প্রাণখোলা হাসি হাসতেন। তাঁর হিউমার অন্যে ঠিকমত বুঝতে পারল কি না যাচাই করে নেওয়ার পরে তবেই তাঁর দুর্লভ উচ্চহাস্য শোনা যেত। নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ সর্বদাই নিজের পালকের পাখি খুঁজতেন নিঃসংশয়ে।

এই রঙ্গবোধে তিনি 'শনিবারের চিঠি'র 'সংবাদ-সাহিত্যে'র নিয়মিত পাঠক ছিলেন—তাঁকে গালাগালি সত্ত্বেও। একদিন আমরা 'শনিবারের চিঠি'র হিউমার নিয়ে আলোচনারত ছিলাম। সম্পাদক জীবনানন্দ দাশকে সুমধুর বিশেষণে আপ্যায়িত করতেন। অথচ জীবনানন্দের তাতে কৌতুকের অন্ত ছিল না। আমি সান্ত্বনাচ্ছলে বললাম, "বর্তমান যুগ প্রচারের যুগ। সজনীবাবু আপনার যে পাব্‌লিসিটি করছেন, সেজন্য তিনি ফী চাইতে পারেন।"

"ঠিক বলেছেন।"

"একদিন আলাপ করবেন? অত হিউমারের ভক্ত আপনি।"

"হ'বে, হ'বে।"

সেইদিন বিদায়কালে জীবনানন্দ দাশ বলে গেলেন অনাবিল আনন্দের সঙ্গে —"সজনীবাবুকে বলবেন, এমনি ভাবেই যেন আমার আরো প্রচার করেন। হা, হা, হা!" সেই হাসির প্রত্যেকটি ধ্বনি যেন বলে দিল, লুকোচুরি খেলায় সজনীকান্তের হার হয়েছে। প্রকৃত ব্যক্তি যে, তিনি চিরপলাতক। ছায়াকে বিদ্রূপের বাণবিদ্ধ করবার চেষ্টায় জীবনানন্দকে বিন্দুমাত্র আঘাতও কোন সমালোচক দিতে পারেন নি।

কদাচিৎ, কোন মুহূর্তে হয়তো জীবনানন্দের বাহ্যব্যবহারের কোন অংশে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাহ্যব্যবহারের সঙ্গে ক্ষীণ সাদৃশ্য লক্ষিত হ'ত। কিন্তু, বিভূতিভূষণ গদ্যশিল্পী—তাঁর বাহ্যব্যবহার কখনও বা অভিনেতাসুলভ ছিল রঙ্গমঞ্চে পাদপ্রদীপের উজ্জ্বলতম আলোকসম্পাতের স্থানটি অধিকারের প্রয়াস পরিলক্ষিত হ'ত। আর, জীবনানন্দ ছিলেন অন্ধকারতম কোণটুকুর প্রত্যাশী। তাই তাঁর উদাসীনতা বা নির্জন প্রকৃতি-প্রিয়তা বা সরল অনাড়ম্বর আরো অনেক হৃদয়স্পর্শী। তবু, রচনার দিক থেকে গদ্য ও কাব্য-সাহিত্যে এই দুই শিল্পীর অবদান তুলনামূলকভাবে আলোচনা করা চলে।

জীবনানন্দ সম্পর্কে সহজ কতকগুলি বিশেষণ আমরা পাই—তাঁর কবিতা চিত্রকল্প,

তিনি হেমন্তের কবি। তিনি উপমাবিলাসী। দৃশ্য-জগতকে শুধু চিত্রকল্পে অঙ্কিত করে তিনি ক্ষান্ত নন, অন্য দৃশ্য-জগতের সঙ্গে তাকে উপমায় প্রতিষ্ঠিত করে তবে যেন তাঁর বক্তব্য পরিস্ফুট হ'ত। 'মত' কথাটির বহুলব্যবহার তাঁর কাব্যে বিশেষত্ব, কখনও বা মুদ্রাদোষ। এখানেও স্বভাবগত যাচাই করার অভ্যাস দেখা যায়।

> "আশঙ্কা ইচ্ছার পিছে বিদ্যুতের মত কেঁপে ওঠে!
> বীণার তারের মত কেঁপে কেঁপে ছিঁড়ে যায় প্রাণ!
> অসংখ্য পাতার মত লুটে তারা পথে পথে ছোটে,—
> যখন ঝড়ের মত জীবনে এসেছে আহ্বান!
> অধীর ঢেউয়ের মত—অশান্ত হাওয়ার মত গান
> কোন্ দিকে ভেসে যায়!"
>
> (জীবন)

লক্ষণীয়, পংক্তিগুলি পাশাপাশি। কিন্তু, এখানে মুদ্রাদোষ মাধুর্যরচনায় ব্যাঘাত ঘটায় না। জীবনানন্দের কাব্যে এক কথা বারবার ব্যবহার আছে, শিথিল আলস্যে নয়। তিনি কখনই শিথিল কবি ছিলেন না। সঙ্গীতধর্মী তাঁর এই কবিতাগুলি বারবার এক শব্দ, এক ধ্বনি দিয়ে গানের ধুয়া সৃষ্টি করে থাকে। নূতন পথের পথিক ছিলেন কবি। রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিপরীত পথে আজ পর্যন্ত যত আধুনিক কবি চলে গিয়েছেন, তাঁদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বকীয়তাসম্পন্ন কবি ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। আঙ্গিক, ভাষা ও ভাবের আমূল পরিবর্তন সূচিত হ'ল তাঁর নিঃসঙ্গ মনের নিজধর্মে বহিঃপ্রকাশের মধ্যে। চিন্তার গতি তাঁর ছিল ভিন্ন, অসাধারণ ও বঙ্কিম। লাজুক, স্বল্পভাষী, নির্জনতার কবি কিন্তু নিজের চিন্তাধারার যথাযথ ও অবাধ বহিঃপ্রকাশে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন, সে সাহস কেবলমাত্র যুগস্রষ্টার থাকে। বিদ্রূপ, অনাদর, উপদেশ কিছুই তাঁকে নিজের পথ থেকে স্খলিত করে সহজগম্য পথে চালাতে পারে নি। তিনি নিজে যা ভাল বুঝেছিলেন, সেই পথে একনিষ্ঠ ছিলেন শেষ পর্যন্ত। তাঁর মানসিক শক্তি অনুকরণযোগ্য। সাম্প্রতিক কবিতার তিনি ছিলেন জনক। তাঁর কবিতার প্রথম যোগ্য সমালোচক বুদ্ধদেব বসু। পুনরাবৃত্তি, উপমা, পংক্তির অসামঞ্জস্য, আরও নানারূপ প্রক্রিয়া অভূতপূর্ব ভাবপ্রকাশের জন্য কবিকে ব্যবহার করতে হয়েছে। ইচ্ছাকৃত পুনরাবৃত্তি তাঁর বিশেষত্ব। কতকগুলি সংজ্ঞা কবিচিত্তের গভীরে এমন স্থায়িত্ব নিয়ে বসে ছিল যে, নানা কবিতার মধ্যে তাদের পুনঃপুনঃ প্রকাশ মনকে বিস্ময় বা অভিনবের আস্বাদে চকিত—উত্তেজিত করে তোলে না। ক্রমাগত পাই—চিল, পাখি, হরিণ, প্যাঁচা, বেতফল, ধান, শস্য, ঘ্রাণ, সমুদ্র, জল, আকাশ, মানুষী, মাংস ইত্যাদি কথার মধ্য দিয়ে কবিমেজাজের প্রকাশ। সমস্ত কবিতা যে বিষণ্ণমধুর লোকে প্রয়াণ করতে চায়, সেই লোকের পরিবেশরচনায় কথাগুচ্ছ নিঃসন্দেহে সাহায্য করলেও কবিমনের কখন-স্থাবরবৃত্তির পরিচায়ক।

নিজের জগতে নিমগ্নচিত্ত কবির মৌলিক প্রতিভার বাহন যে আঙ্গিক বা ভাষা হয়েছিল, ইংরাজি কবিতার স্বাদবঞ্চিত বাঙালীর কাছে হয়তো বা কখনও অর্থহীন প্রতিপন্ন হ'তে পারে। যথা, 'ঘ্রাণ' কথাটি কবি প্রায় সর্বদা ইংরাজি অর্থে ব্যবহার করেছেন। শব্দগঠনও বহুলপরিমাণে পাশ্চাত্য প্রভাবান্বিত। বিশদ আলোচনার ক্ষেত্র অন্যত্র।

অতিরিক্ত সমাজ-সচেতন সমালোচক জীবনানন্দের লিরিকশ্রেণীর কবিতায় বর্তমান জগৎ থেকে পলায়নী প্রবৃত্তি দেখতেন ও আধুনিক সমাজের কোন প্রতিফলন না দেখে অতৃপ্ত থাকতেন। ইদানীং-রচিত কবিতায় জীবনানন্দের মধ্যে কবিচিত্তের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক

জগতের যোগসাধনের প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। নিঃসন্দেহে তাঁর কাব্য অন্য জগতের সন্ধানে ভ্রাম্যমান হয়েছিল। মৃত্যুর পূর্বদিনে রেডিওতে পঠিত 'মহাজিজ্ঞাসা' কবিতাটির প্রশ্ন শেষ করে যেতে পারলেন না কবি।

মানুষ হিসাবে জীবনানন্দকে দেখা প্রবন্ধের প্রতিপাদ্য ছিল। তাই কাব্যের পংক্তি স্বতঃই মনে এসেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আমার প্রিয় পুস্তক, তাই বেশী উদ্ধৃতি ও-বই থেকেই। বিগত পূজাসংখ্যায় যে কবিতাগুলি ছিল, তারা পরীক্ষামূলক প্রধানতঃ

"তবুও মহাজিজ্ঞাসা ও অপার আশার কালো
অকূলসীমা আলোর মত ;—হয়তো সত্য আলো।"

(অবিনশ্বর, শারদীয়া পূর্বাশা)

সুতরাং সঠিক মতামত সহজসাধ্য নয়।

যে আবেগ পূর্বতন কাব্যের প্রাণ ছিল, ইদানীং-রচিত কাব্যে সেই আবেগ আস্তে সরে যেয়ে প্রত্যক্ষ ও বর্তমান জগতকে স্থান দিচ্ছিল। প্রেম কখন-প্রতিপাদ্য হ'লেও করুণ-গম্ভীর আত্মসমর্পণ নয়। জগতকে বাইরে রেখে মনে দ্বার দেওয়া নয়।

অথচ, জীবনানন্দের নির্জনতাপ্রিয়তার মধ্যে লক্ষণীয় ছিল এই যে শহরের প্রাণকেন্দ্রে তিনি থাকতে ভালবাসতেন। তাঁর গ্রামীন কবিতা সত্ত্বেও এই দিক থেকে মানসিক প্রবণতা নাগরিক ছিল। যেখানে সভ্যতা বা সংস্কৃতি নেই, সেখানে শুধু প্রকৃতি অথবা নির্জনতা নিয়ে তিনি থাকতে পারেন নি। অনেক লোকের মধ্যে নিঃসঙ্গতা তাঁর ধর্ম ছিল। আমার বাড়িতেও জনসমাগমহেতু তিনি আসতেন কম।

সেদিন শবযাত্রার দিন দেখলাম অসংখ্য শাদা ফুলে-ছাওয়া তাঁর শরীর,—আমার হাত শূন্য। দুটি দিন মনে পড়ল। স্মরণীয় তারা।

ওঁর বাড়ি থেকে সন্ধ্যাবেলায় জীবনানন্দ আমাকে বাড়ি পৌঁছে দিচ্ছিলেন। পথে ফুলের দোকান। শাদা বেলফুলের মালা কিনলাম। কবি বললেন, "হ্যাঁ, আমারও এই মত। টেবিলে জল দিয়ে সাজিয়ে রাখলে অনুপ্রেরণার মত একটা কিছু—", হাসতে হাসতে তিনি উপহৃত মালা পকেটে তুলে রাখলেন সযত্নে।

আরও একদিন কবির সঙ্গে ফিরবার পথে একঝাড় রজনীগন্ধা কিনলাম। বাড়িতে কলসীতে সাজালাম কবির সম্মুখে। আমার কতকগুলি অপ্রকাশিত ও সদ্য-রচিত কবিতা পুস্তকাকারে প্রকাশিত করবার কথা চলছিল—অন্য ধরনের কবিতা—বন্য প্রেমের। তিনি আগ্রহসহকারে সবগুলিই শুনলেন ও বারবার অনুরোধ করলেন সেগুলি প্রকাশিত করতে। ফুলের গন্ধ যে পরিবেশ রচনা করে, সেদিনও কবি আলোচনা করলেন নিজের পুষ্পপ্রীতি প্রদর্শন পূর্বক। জীবনানন্দ যে কত বড় ও কত আন্তরিক কবি সেদিন অনুভব করেছিলাম আমার কবিতার প্রতিক্রিয়া তার ওপরে দেখে। এখানে অপ্রাসঙ্গিক হলেও স্মরণ করছি, আমার কাব্যপুস্তক 'জুপিটার' তিনি সমালোচনার্থে স্বয়ং বুদ্ধদেব বসুর হাতে দিয়ে এসেছিলেন ও বিরুদ্ধ সমালোচনা হ'তে পারে দুশ্চিন্তায় উদ্বিগ্নতা প্রকাশ করেছিলেন। 'পূর্বাশা'য় আমার 'সপ্তসাগর' বইখানি সমালোচনা করবেন নিজে, এই ইচ্ছায় তিনি নিজে থেকে বইখানি নিয়ে গিয়েছিলেন। সময়াভাবে হয়ে ওঠে নি। উনি বাসস্থানের গোলমালে বিব্রত ছিলেন। তবু অপার কৃতজ্ঞতায় তাঁর প্রচেষ্টা স্মরণ করছি।

কবি-সম্মেলন থেকে আমরা একসঙ্গে ফিরছিলাম। পথে অনেকক্ষণ উদাস নীরবতায় আকাশ লক্ষ্য করে অবশেষে কবি সহসা বলে উঠলেন, "আপনার সেই কবিতাগুলো? ছাপা হ'লে আমাকে কিন্তু এক কপি দেবেন।"

বুঝতে পারলাম, তাঁর মনে সর্বদা কবিতার সুর বাজে। আমার যতটুকু মূল্য তাঁর কাছে, সেটুকু আমি কবিতা লিখি বলেই, সাহিত্যিক বলেই। অনেক লোকের কোলাহল-মুখরিত নগরে ইনি তো নিজের নিঃসঙ্গ কাব্যজগৎ নিয়ে তন্ময় হয়ে থাকতে পারেন। এই যে চারপাশে ট্রাম-বাস, লোকজন, কিছুই ওঁর চোখে পড়ছে না, মনেও প্রবেশ করছে না। অথচ, উনি তো কলকাতায় থাকতেই ভালবাসেন। কবিধর্ম কিন্তু নির্জন পল্লীর স্বপ্নে মগ্ন। তবে?

বুঝতে পারলাম, কবি নাগরিক জনতার মধ্যে থাকতে ভালবাসেন কারণ জনতা সময় বিশেষে চমৎকার আড়াল রচনা করতে পারে। জনতার অন্তরালে নিজেকে আবৃত করে লুকিয়ে থাকা চলে। মফঃস্বল শহরে ব্যক্তির যে আড়াল থাকে না, তিনি প্রকট হয়ে পড়েন।

সেই পুষ্পসমাকুল দিন দুইটি এইখানেই শেষ হয়ে গেল—এই শবযাত্রার বেল, রজনীগন্ধার স্তূপে! সেখানে বেশীক্ষণ থাকা সম্ভব হয় নি।

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে মনে হ'ল, জীবনানন্দ একদিন কি সতৃষ্ণভাবে বলেছিলেন, "আপনার বাড়িটায় যদি থাকতে পারতাম তবে কি ভালভাবেই না লিখতে পারতাম! লিখবার অবকাশ বা নির্জনতা পাই না। উপন্যাস লিখব ভাবছি। কত কি লিখবার আছে। আপনার ঘরটি যদি পেতাম!"

সেদিন যে উত্তর দিয়েছিলাম, মনে বিস্তৃততর হয়ে ফিরে এল ঃ যে সাহিত্যিক নিজের অক্ষমতা পারিপার্শ্বিক নির্ভর মনে করতে পারে না, তার যন্ত্রণা যেন আপনার কখনও অনুভব করতে না হয়। প্রতিভার স্বাক্ষর নিয়ে জন্মগ্রহণ করে যদি প্রেরণাবিহীন প্রতিভার অবসাদ বহন করতে হয়, তার চেয়ে মৃত্যু ভাল। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জীবনানন্দ অবসাদের পূর্বেই বিদায় নিতে পেরেছেন।

জীবনানন্দ দাশ ঃ আমার বাবা

মঞ্জুশ্রী দাশ

তখন আমরা ল্যান্সডাউন রোডে থাকতাম। এধারে দেশপ্রিয় পার্ক ওধারে রাসবিহারী এভেনিউ। বাড়িটি তিনতলা। আমরা ছিলাম একতলায়। সামনে এক টুকরো উঠোন। সেখানে একটি নিমগাছ। এই বাড়িতে খেলা করত 'চিনেবাদামের মত বিশুষ্ক বাতাস।' বাবা, হয়ত স্তব্ধ হয়ে কিছু লিখছেন, হঠাৎ একটি মোটরকার 'গাড়লের মতো গেল কেশে....।'

অথচ বরিশালে আমরা ছিলাম ছড়ানো ছিটানো প্রান্তরে। সেখানে মসৃণ ঘাসে ছিল শিশিরের স্বাদ। অনেক গাছ গাছালি পাখি পাখালির পরে এক টুকরো মাটির কাছে এসে মনে হল বাখারির বেড়া দেওয়া আঙিনায় সীমিত হলাম। 'রূপসী বাংলা' ছিল বাবার অত্যন্ত প্রিয়। বলেছিলেন—'তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও, আমি এই বাংলার পরে রয়ে যাব, দেখিব কাঁঠালপাতা, ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে দেখিব খয়েরি ডানা শালিখের...'

কোথায় গেল সেই সবজে পাতার ঝরে পড়া আর শালিখের পালকের খয়েরী আমেজ। বাবা কিন্তু খুব কম কথা বলতেন। জীবনের রূঢ় রোদ কবিতায় ছবি হয়েছে। কিন্তু চলা বলায় প্রকাশ পায়নি।

বাবা ছিলেন অত্যন্ত প্রচার বিমুখ। রবীন্দ্র পুরস্কার পেলেন। পুরস্কারের ছোটখাট জিনিষ নিঃশব্দে খাটের নিচে রাখলেন। দেখতে পেয়ে বলেছিলাম এসব কি? তিনি বলেছিলেন 'ওই....।' কোন বিজয়ীর চিহ্ন কোথাও নেই, শুধু একরাশ নিস্তব্ধতা। রেডিও বা সেনেটের কবি সম্মেলনে বাবা কবিতা বলেছেন। দেখতাম বাবার ঘরের দরজা বন্ধ। মৃদুস্বরে কবিতা পড়ছেন। মনে হত কোথাও কবিতা বলবেন। এসব মুহূর্তে কখনো সোচ্চার হননি। এসময়ে কোন রোশনাই বা আলোর ফিনকি ছিল না।

তানসেনের গুরু হরিদাস স্বামী বনেই তপস্যা করেন। রাজদরবারে যাননি। বাবার জীবনের তপস্যা ছিল কিছু লেখা কিছু পড়া। এই তপস্যার জন্যে সেই 'মৌরীর গন্ধমাখা ঘাস আর আঁকাবাঁকা সবুজ শাখা'—আমাদের বরিশালের বাড়িটি ছিল তপোবন।

শেষ বেলায় মুঠো মুঠো রূঢ় রোদ আর বিপন্ন বিস্ময়ে চলেছেন আর অনুভব করেছেন 'আমরা অঙ্গার রক্ত, শতাব্দীর অন্তহীন আগুনের ভিতরে দাঁড়িয়ে। ...' কিন্তু এই বেদনার আভাস পাইনি কখনো।

আমার ঠাকুমা ছিলেন বাবার সবচেয়ে প্রিয়জন। ঠাকুমার মৃত্যুর সময়ে দেখেছি বাবার মুখে অফুরান বেদনা। কিন্তু চোখে জল নেই। নিঃশব্দে তিনি বহন করেছিলেন। পরিচিত কোন মানুষের বিচিত্র ব্যবহার ঠোঁটের কোণে দেখেছিলাম বিবর্ণ হাসি। কিন্তু বলেননি কিছু এ বিষয়ে। জিজ্ঞেস করেও উত্তর পাইনি। বাবা সমালোচনা করতেন না।

আমাদের বাড়িতে অনেকে আসতেন। জ্ঞানী গুণী মানী। লেখক কবি অধ্যাপক।

সাধারণ অসাধারণ। বাবা কথা বলতেন হাসতেন আপ্যায়ন করতেন আন্তরিকভাবে। তিনি অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ ছিলেন। সৌজন্যবোধ ছিল অপরিসীম। কিন্তু কাউকে স্তবস্তুতি করেননি। বাবার মর্যাদাবোধ ছিল অত্যন্ত প্রখর।

তরুণেরা আসতেন, আমন্ত্রণ জানাতেন, সভা সমিতির জন্য। কিন্তু বাবা এ বিষয়ে অত্যন্ত উদাসীন ছিলেন।

বাবা ব্রাহ্ম সমাজের প্রার্থনা সভায় উপস্থিত থাকতেন। দেখেছি—সাধারণত সভা শুরু হলে প্রবেশ করতেন এবং শেষ হবার খানিকটা আগেই বেরিয়ে পড়তেন। ধর্ম বিষয়ে কোন হৈচৈ তিনি কখনই পছন্দ করতেন না। আত্মনিবেদনই বোধ হয় প্রাধান্য পেত তাঁর কাছে।

বাবা প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়েছেন। অত্যন্ত ভাল ছাত্র ছিলেন। কিন্তু তাঁর তরুণ দিনগুলি গোলাপের পাঁপড়ি ছড়ানো ছিল না। পরে মধ্যাহ্ন সূর্য যখন আকাশে জ্বলছে সেই রূঢ় রোদে পথে চলেছেন। অনেক কারণে অনেক যুদ্ধ করে বাঁচতে হয়েছে।

আমাদের বরিশালের বাড়িতে প্রত্যুষের প্রথম আভায় দাদু উপনিষদ পাঠ করতেন। ঠাকুমা উপাসনার গান গাইতেন। আমার দাদু ঠাকুমার ছিল পুণ্যের জীবন।

কোন সময়ে বাবা বলেছিলেন, আমরা যখন তরুণ তখন ইংরেজ সরকারে ভাল কাজ পাওয়া সহজ ছিল। কিন্তু যখন অধ্যাপক হলাম তখন দেশের মানুষ ইংরেজের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। আমি তো সেই ইংরেজের দাস হতে পারি না।

একদিন এক বিশেষ পরিচিত মানুষ বাবাকে অনুরোধ জানালেন, আদালতে কোন বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষী দিতে। বাবা এবিষয়ে তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। একদিন এক ভদ্রলোক বাবার একটি ভাল বই নিলেন। কিন্তু দিলেন না। বাবা নীরব রইলেন। এ সময়ে কাকামণি একটি বই পড়তে নিয়েছিলেন। আবার কদিন পরে বইটি রেখে গেলেন, যেখানে ছিল ঠিক সেখানেই। আমাদের বললেন, অশোকের দায়িত্বজ্ঞান খুব। বাবা, কাকামণি দুজনেই পিসিমণিকে অত্যন্ত স্নেহ করতেন।

মজলিসী মানুষ যখন কেউ আমাদের বাড়িতে আসতেন সেসব উপচে পড়া সময়ে বাবার চলাবলায় হাসির ঝিলিক দেখেছি। 'সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে, এই হেমন্তের রাতে। এক সাথে বেড়াল ও বেড়ালের মুখে ধরা ইঁদুর হাসাতে—এমন আশ্চর্য শক্তি ছিল ভূয়োদর্শী যুবার'। এ কবিতায় বাবার বিশেষ পরিচিত একজনের প্রতিফলন আছে।

অন্তরঙ্গ আলো-হাওয়ায় উচ্ছল সময়ে বাবা ঝরনার মত শব্দ করে হাসতেন। কখনো মজার কথা বলতেন। আমাকে নানা মানুষের মজার মজার পদবী নিয়ে গল্প করেছিলেন। কিন্তু বাবার প্রকাশভঙ্গি ছিল অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, অনেকটা জাপানী কবিতার মত।

বাবা খুব সাদাসিধে ছিলেন। অত্যন্ত সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী পরতেন। ঘরে শুধু বই আর বই। লেখার সরঞ্জাম। এক কোণে দু-একটি কাপড়—তাও বাক্সে বা আলমারিতে নয়। বাক্সে সযত্নে সাজাতেন শুধু বই। অনেক রাত পর্যন্ত পড়তেন লিখতেন। কখনো পেন্সিলে লিখতেন। জিজ্ঞেস করলে বলতেন, দেখছিস না কী রকম ইস্পাতের মতো নীলাকাশ।

বাবা আমাদের পরম বন্ধু ছিলেন। কোন সময়ে কিছুদিন আমি কাকামণি কাকিমার বাড়িতে ছিলেম? আমার বসন্ত হল। বাবা রোজ সকালে বিকালে আসতেন। আশীর্বাদের মত হাতখানি আমার মাথায় রাখতেন। আমার ছোটভাই বিছানায় বাবার পায়ের কাছে বসে গল্প করত।

একবার আমায় বললেন, 'তোর বইয়ের লিস্ট দে, কিনে দেব। ভাল করে পড়ছিস

তো? ফার্স্ট ক্লাশ পেতে হ'লে কিন্তু ভাল করে পড়তে হয়।'

একদিন ছিল ভিজে মেঘের দুপুর। নীলাঞ্জন আভায় বাবা লিখছেন। বললাম বাবা কালিদাসের মেঘদূত বড় সুন্দর না? মৃদু হেসে মেঘদূতের প্রথম কয়েকটি লাইন আবৃত্তি করলেন তিনি। কী মেঘের মত স্বর, কী সুন্দর উচ্চারণ।

বাবা ছিলেন এক তাপস। পান সিগারেট কখনো খেতে দেখিনি। সিনেমা দেখলেও হয়তো এক বছর পর। খেতে খুব ভালবাসতেন।

সন্ধ্যাবেলায় বাবা রাসবিহারী সাদার্ণ এভেনিউ দিয়ে সামান্য হেঁটে আসতেন। আমাদের বরিশালে ছিল অফুরাণ গাছগাছালি চমৎকার বাগান সবুজ মাঠ।

সেই মস্ত মাঠে ছিল সবুজ ঘাস। শিশিরের স্বাদ। সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের সন্ধ্যের মত সন্ধ্যা আমরা বরিশালে দেখেছি। সেই হারানো কথা মনে রেখে হয়ত সন্ধ্যায় সামান্য হাঁটতেন।

এমনি একদিন সন্ধ্যাবেলায় পৃথিবীর পথে চলতে গিয়ে কবি আর ঘরে ফিরলেন না। শুনলাম ট্রাম এ্যাকসিডেন্ট হয়েছে। আমরা দৌড়ে গেলাম শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে। দেখি, বাবার মলিন কাপড়ে রক্তের দাগ।

দুদিন পরে ডাক্তারের হাত ধরে বলেছিলেন, 'ডাক্তারবাবু, আমি বাঁচবো তো?'

বাবার শরীরের অনেক হাড় ভেঙে গিয়েছিল। হাসপাতালে হাজারো মানুষ আসতেন। শুভার্থী সুহৃদস্বজন। হাতে ফল, কণ্ঠে শুভেচ্ছা। হাসপাতালে সেবিকা ছিলেন। বাবাকে দেখতেন। তবুও কজন আত্মীয়, দু-তিন জন তরুণ কবি ও আমরা—সব সময় কাছে থাকতাম, পরিচর্যার জন্যে।

একদিন বাবার শিয়রে বসে আছি। আমরা দুজন ছাড়া আর কেউ ছিল না। দেখলাম বাবার চোখ সজল। যে মানুষ কখনো ভেঙে পড়েননি, আজ সময়ের নির্মম আঘাতে সে চোখ সজল। আমি সামনে এলাম। আমায় দেখতে পেয়ে বাবা নিমেষে সহজ হলেন। বললেন, অমুক পত্র পত্রিকা এনে রাখিস।

হাসপাতালে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুনতে চেয়েছিলেন। শেষদিকে ডাক্তার বিধান রায় দেখতে এলেন। ডাক্তার রায় খানিকক্ষণ বাবার মুখের দিকে নিঃশব্দে তাকিয়ে রইলেন। কোন কথা বললেন না। শুধু বাবার জন্যে অনেক সুব্যবস্থা করে গেলেন। কিন্তু জীবনকে জানবার অবিরাম ভার বাবাকে আর বইতে হল না।

সেটা ১৯৫৪-এর, ২২ অক্টোবর। রাত প্রায় সাড়ে এগার। আমার সবচেয়ে প্রিয়জনের সবচেয়ে ধূসর সময়।

বাবা সজোরে নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন। বিছানার পাশে দাঁড়িয়েছিলাম আমরা সবাই। অনেক স্বজন—ক্রমে জীবনের স্পন্দন থেমে গেল।

আমার জ্যাঠামশাই

অমিতানন্দ দাশ

আমার জ্যাঠামশাই জীবনানন্দ যখন মারা যান তখন আমার বছর ছ-সাত বয়স। বলা বাহুল্য ওনার কবি পরিচয় জেনেছি, বুঝেছি তার বহু পরে।

জ্যাঠামশাইয়ের বিষয়ে সবচেয়ে জোরালো স্মৃতি—আমি শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের বারান্দায় দাঁড়িয়ে, ওয়ার্ডের বেডে ওনার অজ্ঞান দেহ। আমার বাবাই বোধহয় অন্য আত্মীয়-বন্ধুদের নীচু গলায় বলছেন ডাক্তার আঘাতের বিষয়ে কি বলেছেন।

এর আগে পরিচিত কেউ কখনো গুরুতর এ্যাক্সিডেন্টে আহত হয়ে হাসপাতালে থেকেছেন বলে মনে নেই। অপঘাত ও মৃত্যুর সাথে ওটাই আমার প্রথম পরিচয়। সুতরাং সেই ঘটনা মনে গভীর দাগ কেটেছিল। শেষ স্মৃতি—আমাদের (আমার দাদুর, মায়ের বাবার) বাড়ির সামনের ঘরে সাদা পাঞ্জাবী গায়ে, সাদা বিছানায় শোয়ানো জ্যাঠামশাইয়ের মরদেহ।

জ্যাঠামশাইয়ের জীবদ্দশায় ওনার সাথে ঘনিষ্ঠতা হয়নি—খুব কম লোকেরই হয়েছে। উনি স্বভাবে খুব লাজুক ছিলেন, বাড়িতেও খুব কম কথার মানুষ ছিলেন। এখানে যা লিখছি তার মধ্যে অনেকটাই বাবা-মায়ের কাছে শোনা কথা। বাবা-মা, অশোকানন্দ ও নলিনী, ওনাদের সাথে এক বাড়িতে থেকেছেন বেশ কয়েক বছর। আমার বাবা-মায়ের বিয়ের পর থেকে (আমার জন্মের কয়েক মাস বাদে) বাবা দিল্লীতে বদলি হওয়া পর্যন্ত।

বরিশালের পারিবারিক বাড়ি ছেড়ে এসে জ্যাঠামশাই কলকাতার কলেজে শিক্ষকতা করতেন। বাবার ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের আবহাওয়া দপ্তরের বদলির চাকরি। বোধহয় ১৯৪২-এ কলকাতায় বদলি হয়ে আসার পর থেকে আমার বাবা কয়েক বছর ওনার সঙ্গে থাকতেন। জ্যাঠামশাই তখন বাড়ি ভাড়া নিয়েছিলেন দেশপ্রিয় পার্কের কাছে, রাসবিহারী এ্যাভিনিউয়ের কাছে পার্কের উল্টো ফুটে পেট্রল পাম্পের উত্তরের বাড়িটায়। বাড়ির ওই অংশের মধ্যে একটা গ্যারেজের উপরে নিচু শিলিং-এর ঘর ছিল, ছেলেবেলায় ওটা খুব মজার লাগত।

এক সময়ে আমার বাবা-মা ছাড়া আমার পিসি সুচরিতাও জ্যাঠামশাইয়ের সঙ্গে থেকে এম-এ. পড়তেন। জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর ছোট ভাই-বোনের ছোটবেলা থেকে সারাজীবন অন্তরঙ্গ ও প্রাণখোলা সম্পর্ক ছিল।

জীবনানন্দের বিয়ে সম্বন্ধ করে হয়েছিল, তাঁর সম্মতিতেই। এটা বলা প্রয়োজন, কারণ, ব্রাহ্মসমাজে তখনই ছেলেমেয়েদের নিজস্ব বিয়ে ঠিক করার যথেষ্ট রেওয়াজ ছিল, আমার বাবা-মাও তাই করেছিলেন। জেঠিমা খুব গুণী, এবং কম বয়সে বেশ সুন্দরী ছিলেন। তিনি পরে শিক্ষিকাও হয়েছিলেন—শেষে এ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমিস্ট্রেস। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত ওঁদের

দুজনের মধ্যে ভাল মনের মিল হয়নি—আর তার প্রতিফলন রয়েছে জীবনানন্দের কবিতার মধ্যে।

মনে আছে একবার, ১৯৫২ বা '৫৩ সালে, ছুটিতে যখন মা ও আমি দিল্লীতে বাবার কাছে রয়েছি, তখন জ্যাঠামশাই সপরিবারে বেড়াতে এসেছিলেন। আমার বয়স বছর পাঁচেক, জাঠতুতো দিদি মঞ্জুদি কলেজে পড়েন। মঞ্জুদির একটা বেশ ভারী সোনার বালা আমি খেলতে খেলতে হারিয়ে ফেলেছিলাম (পরে বাড়ি তোলপাড় করে সেটা খুঁজে পাওয়া গেছিল)। সে সময়ে জ্যাঠামশাই কিন্তু আমাকে বা মঞ্জুদিকে একটা কথাও বলেন নি—আমাকে বলার কাজটা সকলে আমার মায়ের ওপরেই ছেড়ে দিয়েছিলেন।

বলতে কি কখনো, কোনো পরিস্থিতিতেই, কাউকে কোনো কড়া বা কটু কথা বলা জ্যাঠামশাইয়ের স্বভাবে ছিল না। নিজের ছেলেমেয়েদেরও বিশেষ ধমকেছেন বা শাসন করেছেন বলে মনে হয় না।

জীবনানন্দের জীবদ্দশায় তাঁর কবি হিসাবে বেশী খ্যাতি হয় নি, অধিকাংশ কবিতাই বই হিসাবে প্রকাশিত হয়েছে তাঁর মৃত্যুর পরে। সুতরাং তিনি নিজে তাঁর লেখা থেকে বিশেষ রোজগার করতে পারেন নি। তাঁকে এক এক সময়ে বেশ কষ্ট করে সংসার চালাতে হয়েছে। ছেলেমেয়ের জন্য রোজগার দরকার, অন্য মানুষ হলে আর কটা টিউশনি করতেন সেই পরিস্থিতিতে। কিন্তু জীবনানন্দের বৈষয়িক চিন্তা ছিল কম, মনে ছিল লেখার তাগিদ। তাই তিনি অভাবের মধ্যেও কবিতা লিখে গেছেন—পারিবারিক অশান্তি অগ্রাহ্য করে।

১৯৪৬ সালে জীবনানন্দকে তাঁর বাড়িওয়ালার কিছু অত্যাচারও সহ্য করতে হয়। বেশ কয়েক মাস মনে হয় বাড়িওয়ালা ওনাকে ওই বাড়ি থেকে উঠে যাবার জন্য চাপাচাপি করে— বোধহয় উকিলের চিঠিও দেয় কোনো সময়ে। শেষ অবধি মনে হয় ভাড়া বাড়িয়ে একটা সমঝোতায় রাজি হয়। কিন্তু এই নিয়েও কবির বেশ মানসিক অশান্তি ঘটেছিল বলাই বাহুল্য। আমার বাবা তখন ওই বাড়িতেই থাকতেন, আমার মা সরকারী বৃত্তিতে ইংল্যান্ডে পড়তে গেছিলেন। দুজনের ওই সময়ের চিঠিপত্রে বাড়ির সমস্যার বিষয়ে কিছু আলোচনা আছে।

ধূসর পাণ্ডুলিপি

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

দেশ স্বাধীন হয় সাতচল্লিশ সালে। কিন্তু যে স্বাধীনতা আসছে, তা যে দেশ-বিভাগের ভিতর দিয়ে আসছে, ছেচল্লিশেই এটা সকলের জানা হয়ে গিয়েছিল। জীবনানন্দ ওই ছেচল্লিশ সালেই বরিশাল থেকে সপরিবার কলকাতায় চলে আসেন। এখানে এসে প্রথম তিনি কোথায় উঠেছিলেন, তা আমার জানা নেই। আমার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ-পরিচয় হয় ওই ছেচল্লিশেরই একেবারে শেষের দিকে। তখন তিনি দেশপ্রিয় পার্কের পশ্চিম দিকে একটা একতলা বাড়িতে থাকতেন। ল্যান্সডাউন রোড থেকে একটা ছোট্টমতন গলি পেরিয়ে সেই বাড়িতে ঢুকতে হত। প্রয়াত কবি অরুণকুমার সরকার ও অর্থনীতিবিদ অশোক মিত্র প্রায়ই সেখানে যেতেন। অরুণকুমারের সঙ্গে আমিও বারকয়েক সেই বাড়িতে গিয়েছি। ছোট্ট বাড়ি, ঘরের সামনে টানা বারান্দা। এক টুকরো উঠোনও যে ছিল, এটা মনে পড়ে। বারান্দায় মাদুর বিছিয়ে আমাদের বসতে দেওয়া হত। টিনের সুটকেশ থেকে কবিতা বার করে জীবনানন্দ একটার পর একটা পড়ে যেতেন। কবিতা শুনতেই তো যাওয়া। শুনতে-শুনতে বিকেল গড়িয়ে সন্ধে হত। কেউ একজন একটা লণ্ঠন জ্বেলে বারান্দায় এনে রেখে যেতেন। ল্যান্সডাউন রোডের পাশের সেই বাড়িতে, যদ্দূর মনে করতে পারি, ইলেকট্রিক আলো ছিল না।

জীবনানন্দ ছিলেন ষোল-আনা শুদ্ধ একজন কবি। তাঁর মানসিক গঠনের যে যৎসামান্য পরিচয় আমরা পেয়েছিলুম, তাতে মনে হত, তিনি যে কবিতা লেখেন, এটাই ছিল তাঁর একমাত্র পরিচয়। বস্তুত, কবিতা ছাড়া জাগতিক অন্য কোনও ভাবনার ধারই সম্ভবত তিনি ধারতেন না। এমন মানুষের পক্ষে অন্যবিধ কোনও কাজই বিশেষ স্বস্তিকর হবার কথা নয়। এমনকি, বরিশালে তিনি যে অধ্যাপনার কাজ করতেন, তাও হয়তো তাঁর কাছে খুব স্বস্তিকর ঠেকেনি। সেক্ষেত্রে সাংবাদিকতা নামক বৃত্তিটি যে তাঁর কাছে আরও অস্বস্তিকর হয়ে দাঁড়াবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু যিনি শুদ্ধতম কবি, তাঁকেও তো জীবনধারণ করতে হয়, সংসার প্রতিপালন করতে হয়। বাড়িভাড়া গুনতে হয়, জামাকাপড় কিনতে হয়, মুদির প্রাপ্য মেটাতে হয়। এটা তো কালিদাসের কাল নয় যে, স্রেফ কবিতা লেখার সুবাদেই 'উজ্জয়িনীর বিজন প্রান্তে কানন-ঘেরা বাড়ি', কিছু নিষ্কর জমি ও মোটা অঙ্কের মাসোহারার ব্যবস্থা হয়ে যাবে। এ-কালে, বিত্তশালী পরিবারের সন্তান না হলে, যা-হোক একটা চাকরি-বাকরি করতে হয় কবিকেও। বেঁচেবর্তে থাকার এই যে শর্ত, জীবনানন্দের মতো আদ্যন্ত কবিও এ থেকে রেহাই পাননি।

এ যখনকার কথা বলছি, জীবনানন্দের কবিখ্যাতি যে তখনই খুব বিস্তারিত, অথবা আদ্যন্ত নবীন ভাষা ও ভাবনার প্রবর্তক হিসাবে তখনই প্রশ্নাতীত তাঁর প্রতিষ্ঠা, তা নিশ্চয়ই নয়। সত্যি বলতে কী, একদিকে যেমন 'শনিবারের চিঠি' সেই ভাষা ও ভাবনাকে সম্মানে

তখনও বিদ্রূপ করে চলেছে, অন্যদিকে তেমন তাঁর সম্পর্কে আমাদের পাঠক সমাজেরও একটা মস্ত অংশেরই দ্বিধা-সংশয়ের তখনও অবসান হয়নি। তবে, জীবনানন্দের কবিপ্রতিভাকে যাঁরা নির্ভুল শনাক্ত করতে পেরেছিলেন, এই শহরে তাঁর এমন-কিছু অনুরাগীও ছিলেন বই কী। কলকাতায় এসে তাঁকে যাতে না ঘোর আর্থিক অসুবিধার মধ্যে পড়তে হয়, তার জন্য তাঁদের চেষ্টার অন্ত ছিল না। এ-ব্যাপারে সর্বাগ্রে উল্লেখ করতে হয় পূর্বাশা-সম্পাদক কবি সঞ্জয় ভট্টাচার্য ও পূর্বাশা প্রকাশন-সংস্থার কর্ণধার সত্যপ্রসন্ন দত্তের নাম। বরিশাল থেকে চলে আসবার আগেই যে জীবনানন্দ তাঁর সমস্যার কথা তাঁদের জানিয়ে রেখেছিলেন, তাতে আমার সন্দেহ নেই।

জীবনানন্দের মানসিক গঠনের কথা তাঁরা যে জানতেন না, তা তো নয়। সুতরাং, সম্ভব হলে যে তাঁরা অধ্যাপক-বৃত্তিরই ব্যবস্থা তাঁর জন্যে করে রাখতেন, খুব সহজেই সেটা বোঝা যায়। কিন্তু সেটা সম্ভব হয়নি। তার বদলে তাঁরা সাংবাদিক-বৃত্তির ব্যবস্থা করে রাখেন। ঠিক হয় যে, কলকাতায় এসে তিনি দৈনিক 'স্বরাজ' পত্রিকার রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক হিসাবে শুরু করবেন তাঁর নূতন জীবন। শুনেছি, এ-ব্যাপারে অধ্যাপক হুমায়ুন কবিরেরও কিছু হাত ছিল। থাকাই স্বাভাবিক। পত্রিকাটির সঙ্গে অধ্যাপক কবিরের পরোক্ষ যোগ-সম্পর্কের কথা সবাই জানতেন।

এই 'স্বরাজ' পত্রিকাতেই জীবনানন্দকে আমি প্রথম চাক্ষুষ করি। দেখে যে খুব আপ্লুত হয়েছিলুম, এমন বলব না। বরং একটু নিরাশ হয়েছিলুম বললেই ঠিক হয়। তার আগে তাঁর একটা ছবি পর্যন্ত দেখিনি। ফলে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবির একটা কল্পিত চেহারা আমার মনের মধ্যে তৈরি হয়ে উঠেছিল। রক্তমাংসের মানুষটির সঙ্গে সেই চেহারার যে বিন্দুমাত্র মিল নেই, এটা দেখে ভিতরে-ভিতরে একটা মস্ত বড় ধাক্কা খাই। মধ্যবয়সী আর পাঁচজন ছাপোষা বাঙালির যেমন হয়ে থাকে নেহাতই সেইরকমের চেহারা। কিন্তু চেহারা দেখে যতই দমে যাই না কেন, চোখ দুটি দেখে যে চমকে গিয়েছিলুম, তাও মনে পড়ে। অসম্ভব রকমের ঝকঝকে ধারালো চোখ। 'অন্তর্ভেদী দৃষ্টি' বলে ওই যে একটা কথা আছে, জীবনানন্দের দৃষ্টিও ছিল একেবারে সেই রকমের। মনে হত, যা-কিছুরই উপরে চোখ রাখছেন তিনি, তার একেবারে অন্তস্থল অবধি দেখে নিচ্ছেন।

কবির সঙ্গে এই যে দেখা, এটা যে একেবারেই আকস্মিক কিংবা মাত্রই একবারের, তা নয়। কথাটা এইজন্য বলছি যে, আমার বয়স তখন যদিও নেহাতই বাইশ বছর, তবু তারই মধ্যে কলকাতার সাংবাদিক-জগতে দু'চারটে আঘাটার জল আমার খাওয়া হয়ে গিয়েছিল, এবং ভাসতে-ভাসতে আমিও তখন 'স্বরাজ'-এ এসে ভিড়েছি। বস্তুত, 'স্বরাজ'-এর একেবারে উদ্যোগ-পর্ব থেকে আমিও এই পত্রিকাটির সঙ্গে যুক্ত ছিলুম। ওই সময়ে যে-কাগজে কাজ করতুম, সেটি উঠে যাওয়ার দাখিল হওয়ায় সঞ্জয়দাই আমাকে 'স্বরাজ'-এর বার্তা-বিভাগে ঢুকিয়ে দেবার ব্যবস্থা করেন। আমার বন্ধু শান্তিরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ও তাঁরই সূত্রে 'স্বরাজ'-এ এসে ঢোকে। কাগজটি তখনও ছেপে বেরুতে শুরু করেনি, তবে অচিরে যাতে বার হয়, ক্রিক রো'র আপিসে তার উদ্যোগ-আয়োজন চলছে জোর-কদমে। নিত্য একটি করে 'ডামি' ছাপা হত। সুতরাং কাগজখানা বাজারে বার হোক, আর না-ই হোক, আমাদের খাটাখাটনির কিছু কমতি ছিল না। এরই মধ্যে একদিন জীবনানন্দ আমাদের দফতরে এসে দেখা দিলেন।

সেই দিনটির কথা এখনও স্পষ্ট মনে পড়ে। 'স্বরাজ'-এর সম্পাদক সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার মশাই তাঁকে আমাদের বার্তা-বিভাগে নিয়ে এসে সকলের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে

দেন। নাম শুনেই তিনি যে আমাকে চিনতে পারবেন, তার কারণ আর কিছুই নয়, আমি যখন বি. এ. ক্লাশের ছাত্র, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পড়ে তখনই তাঁকে একটি চিঠি লিখেছিলুম আমি। তিনি তার উত্তরও দিয়েছিলেন। তা ছাড়া, বি. এ. পরীক্ষা দেবার পরে পরেই আমি ও আমার দুই বন্ধু ননী ভৌমিক ও গিরিশংকর দাশ (স্রেফ বিখ্যাত কবিদের সঙ্গে গা-ঘেঁষাঘেঁষি করে নিজেদের কবিতা ছাপিয়ে নেব বলে) ছোট্ট একটি কবিতা সংকলন প্রকাশ করি। 'শেষ ট্রেন' নামক সেই সংকলনের জন্য জীবনানন্দের কাছে কবিতা প্রার্থনা করে আমরা বিফল মনোরথ হইনি। সেই সময়ে তাঁকে বেশ কয়েকটি চিঠি লিখি। উত্তরও পেয়ে যাই। ধরে নিতে পারি যে, এইসব চিঠিপত্রের কারণেই আমার নামটা তাঁর মনে থেকে গিয়েছিল।

মনে থাকবার আরও একটা কারণ অবশ্য ছিল। জীবনানন্দ কলকাতায় এসে পৌঁছবার কিছুকাল আগে 'পূর্বাশা' পত্রিকায় (জৈষ্ঠ্য ১৩৫৩) রামেন্দ্র দেশমুখ? একটি কবিতার বইয়ের সমালোচনা বার হয়। সেটি আমারই করা। প্রসঙ্গত সেখানে জীবনানন্দের কথা এসে যায় এবং একই সঙ্গে এসে যায়—তাঁর কবিতায় যা মাঝে-মাঝেই উঁকি মারে, সেই 'আত্মঘাতী ক্লান্তির' কথাও। সেই 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' কথাটা জীবনানন্দের ভাল লাগেনি। প্রতিবাদ করে তিনি যে পত্র লেখেন, 'পূর্বাশা'র পরবর্তী সংখ্যাতেই সেটি ছাপা হয়। (এখানে বোধহয় একটা কথা বলে রাখা ভাল। 'পূর্বাশা'য় ওই সমালোচনা যখন ছাপা হয়, আমার বয়স তখন মাত্রই একুশ বছর। তার পরে তো প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেল। ইতিমধ্যে জীবনানন্দ সম্পর্কে আমার ধারণা কিছুমাত্র পালটায়নি। তখনও তাঁকে রবীন্দ্রপরবর্তী কালের প্রধান কবি বলে জানতুম, এখনও তা-ই জানি। কিন্তু 'আত্মঘাতী ক্লান্তি' কথাটা যে ভুল লিখেছিলুম, এমন আমার আজও মনে হয় না। পরন্তু ওই ক্লান্তিকে এই মহৎ কবির রচনার এক অমোঘ ও অনিবার্য চরিত্রলক্ষণ বলেই এখনও আমার মনে হয়।)

সাক্ষাৎ-পরিচয়ের পরে আমি ও শান্তিরঞ্জন তাঁকে বলি যে আমরা দুজনেই তাঁর ভক্ত পাঠক। তাতে তিনি এমনভাবে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন যে, আমরা বুঝতে পারি, কথাটা তিনি বিশ্বাস করেননি। আমাদের এমনও সন্দেহ হয় যে, আমাদের উক্তিকে তিনি নেহাতই শহুরে শুকনো ভদ্রতা বলে ধরে নিয়েছেন। নিজের কথা বলতে পারি, আমি সেদিন খুব কমই বলেছিলুম। আসলে যদি বলতুম যে, কবিতা নামক ব্যাপারটা সম্পর্কে যে ধারণা আমি আশৈশব লালন করেছি, একটিমাত্র বই পড়েই সেই ধারণা একেবারে আমূল পালটে গেছে, এবং সেই বইটির নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', তা হলেও বিন্দুমাত্র বাড়িয়ে বলা হত না। বইখানা একেবারে দৈবাৎ আমার এক বন্ধুর কাছে পেয়ে যাই। তখন আমি থার্ড ইয়ারের ছাত্র। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' সেই বয়সে আমার সর্বক্ষণের সঙ্গী হয়ে ওঠে। আমার মনের মধ্যে একটা ওলট-পালট কাণ্ড ঘটে যায়, চোখের সামনে দৃশ্যজগতেরও রূপ একেবারে পালটে যেতে থাকে। বন্ধুরা কে কী বলে, আমি বুঝতে পারি না। মিলফোর্ড সাহেব অনার্স ক্লাসে গ্রিসের ম্যাপ টাঙিয়ে পেলোপনিশিয়ান যুদ্ধের রণকৌশল বর্ণনা করেন, আমার কানে ঢোকে না। কলেজ ছুটির পরে, বাড়ি না-ফিরে ভূতগ্রস্তের মতো আমি তখনকার সেই জনবিরল আমহার্স্ট স্ট্রিটের ফুটপাথ ধরে উদ্দেশ্যহীন ঘুরে বেড়াই।

অথচ জীবনানন্দের দিকে তাকিয়ে মনে হয়, আমরা যে তাঁর কবিতার অনুরাগী, এই সামান্য কথাটাও তিনি বিশ্বাস করছেন না। ফলে আর কথা না বাড়িয়ে মুখস্থ বলতে শুরু করি তাঁর 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি, সেই যার প্রথম পঙ্‌ক্তিটি হল "আমরা হেঁটেছি যারা

নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়..."। পুরো কবিতাটি শোনানো হয় না, মাত্র দুটি স্তবক শুনেই তিনি বললেন, "থামুন, থামুন!" তারপর খানিকক্ষণ আমাদের দুই বন্ধুর দিকে তাকিয়ে থেকে একেবারে হো-হো করে হেসে ওঠেন। এই সেই আচমকা হাসি, অর্গল মুক্ত হয়ে দমকে-দমকে বেরিয়ে আসবার পূর্ব মুহূর্তেও তাঁর মুখেচোখে যার যৎসামান্য পূর্বাভাস পাওয়া যেত না, এবং জীবনানন্দের কথা ভাবতে গেলেই যে-হাসির কথা অনেকের মনে পড়বে। এর মাস কয়েক বাদেই একদিন বার্তা-বিভাগে এসে আমার হাতে একটি প্যাকেট ধরিয়ে দিয়ে পরক্ষণেই তিনি দ্রুত পায়ে তাঁর নিজের টেবিলে ফিরে যান। প্যাকেট খুলে দেখি ভিতরে একখানা বই রয়েছে। প্রথম সংস্করণের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। ভিতরের পাতায় লিখে দিয়েছেন 'শ্রীনীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী প্রীতিভাজনেষু'। তলায় তাঁর স্বাক্ষর। তার নীচে তারিখ, ৭ ফেব্রুয়ারি '৪৭।

'স্বরাজ'-এ খুব বেশিদিন ছিলেন না জীবনানন্দ। কিন্তু তাঁর স্বল্পায়ু জীবনের যে একটা ক্ষুদ্র অংশ তিনি ওখানে কাটিয়ে যান, তাও যে মোটেই সুখে কিংবা স্বস্তিত্বে কাটেনি, এটা না-বললে সত্য গোপন করা হয়। আসলে খবরের কাগজের জগতে সফল হবার জন্যে যে-একটা 'এই এখুনি করে দিচ্ছি' গোছের চটপটে ভাব ও লোক-ভোলানো স্মার্টনেসের দরকার হয়, তাঁর মতন ধীরস্থির ও চিন্তাশীল মানুষের চরিত্রে তা থাকা সম্ভব নয়, ছিলও না। ফলে দু'চার দিনের মধ্যেই রটে যায় যে, রবিবাসরীয় বিভাগের সম্পাদক হিসেবে তিনি একেবারেই অযোগ্য। সব আপিসেই কিছু-না-কিছু স্থূল প্রকৃতির মানুষ থাকে, 'স্বরাজ'-এও ছিল, সম্ভবত তারাই সেখানে ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ। জীবনানন্দের জীবনকে তারা অতিষ্ঠ করে তোলে। তাঁকে লক্ষ করে ছুঁড়তে থাকে চোখা-চোখা ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ।

জীবনানন্দ সবই বুঝতে পারতেন। সংবেদনশীল, সূক্ষ্ম অনুভূতির মানুষ বলে প্রতিকূল পরিবেশের বেদনাও নিশ্চয়, আর পাঁচজনের তুলনায়, তাঁর বুকে আরও বেশি করে বাজত। কিন্তু মুখে তিনি কিছুই বলতেন না। শুধু যে-সপ্তাহে আমার দুপুরের শিফ্‌টে ডিউটি থাকত, চারটে নাগাদ নিজের টেবিল ছেড়ে উঠে আসতেন আমার টেবিলের কাছে। বলতেন, "চলুন, বেরিয়ে পড়া যাক।" আমার তো পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করার কথা। কিন্তু তা আর করা হত না। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়েই বুঝতে পারতুম যে, তিনি আর পেরে উঠছেন না, এখানে নিঃশ্বাস নিতেই কষ্ট হচ্ছে। হাতের কাজ অন্যকে বুঝিয়ে দিয়ে তৎক্ষণাৎ উঠে পড়তুম। বলতুম, "চলুন"।

ক্রিক রো দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে ওয়েলিংটন স্কোয়ার। ভিতরের পথ দিয়ে পার্ক পেরিয়ে ওয়েলিংটন স্ট্রিট। ট্রামরাস্তা পেরিয়ে আরও খানিক হাঁটলে, বাঁ-দিকে 'পূর্বাশা' পত্রিকার অফিস। সারাটা পথ কথা বলতেন। বরিশালের কথা। বাংলার ভূপ্রকৃতি আর গাছপালার কথা। নদীর কথা। পাখির কথা। মানুষের কথা। কবিতার কথা। এতক্ষণ তো জেলখানায় বন্দি হয়ে ছিলেন, পারতপক্ষে কথা বলেননি। বুঝতে পারতুম যে, সেই না-বলা কথাগুলিই এবারে বেরিয়ে আসছে। 'পূর্বাশা' আপিসে বসে কথা বলতে-বলতে সন্ধ্যে হয়ে যেত। তারপর যখন কথা শেষ হত, তখন সঞ্জয়দাই বলতেন, "যাও নীরেন, ওঁকে বালিগঞ্জের বাসে তুলে দিয়ে এসো।"

'স্বরাজ' পত্রিকায় যারা তাঁকে নিয়ে ব্যঙ্গবিদ্রূপ করত, তাদের জানবার কথা নয় যে, জীবনানন্দ একদিন ওখানে কাজ করেছিলেন বলেই কাগজখানার নাম আজও আমরা মনে রেখেছি। নইলে কবেই ভুলে যেতুম।

তাঁকে সহকর্মী হিসাবে দেখেছি

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

তখন আমি হাওড়া গার্লস কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান হিসেবে কাজ করছিলাম। আমাদের কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন বিজয়কৃষ্ণ ভট্টাচার্য। একাধারে তিনি ছিলেন কর্মী, শিক্ষাব্রতী ও সমাজসেবক। হাওড়া শহরে ও গ্রামে তিনি অনেক স্কুল-কলেজ স্থাপন করেছিলেন। তাঁর স্থাপিত হাওড়া গার্লস কলেজ হাওড়া জেলার প্রথম মহিলা কলেজ। খুব সামান্য অবস্থা থেকে এই কলেজ বিশাল আকার লাভ করেছে। অনেক বিখ্যাত অধ্যাপক, অধ্যাপিকা এই কলেজের সঙ্গে সংযুক্ত ছিলেন। যেমন, হরিপদ ভারতী, হেরম্ব চক্রবর্তী, ডঃ নিমাই সাধন বসু, ডঃ শঙ্করীপ্রসাদ বসু, অধ্যাপিকা বিনিতা বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপিকা বাণী বসু, এবং আরো অনেকে।

একদিন অধ্যক্ষ বিজয়বাবু এসে বললেন, ইংরেজি বিভাগে একজন নতুন অধ্যাপক আসছেন। তাঁর নাম—জীবনানন্দ দাশ। শুনেই আমরা বিস্মিত হয়ে কবি জীবনানন্দের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। তখন 'নাভানা' থেকে তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সে সময়ে তিনি যথেষ্ট পরিচিত, সুখ্যাত এবং বিতর্কিতও বটে। 'শনিবারের চিঠি'তে প্রায় প্রতি সংখ্যায় তাঁকে ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করা হতো। কারণ তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু, রচনা-ভঙ্গিমা ও তাৎপর্য খুবই অদ্ভুত এবং উদ্ভট বলে মনে হয়েছিল।

যাই হোক, তিনি চাকরীতে যোগদান করলেন। ইতিপূর্বে দেশভাগ হয়েছে। স্বাধীনতা এসেছে এবং পূর্ববঙ্গ থেকে দলে দলে বাস্তুহারা সাধারণ ও শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সম্প্রদায় কলকাতায় মাথা গোঁজার ঠাই খুঁজছিলেন। জীবনানন্দও পূর্ববঙ্গের কলেজ ছেড়ে কলকাতায় এলেন—একটি মফস্বল কলেজে যোগ দিয়ে কোনপ্রকারে পায়ের তলায় মাটি খুঁজছিলেন।

সেই তিনি গার্লস কলেজে বিনা আবেদনে অধ্যাপনায় বৃত হলেন, এবং শুধু অধ্যাপক নন, একেবারেই ইংরেজি বিভাগের প্রধান হয়েই যোগদান করলেন। অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণের মানুষ চিনবার অদ্ভুত ক্ষমতা ছিল। তিনি সহজেই জীবনানন্দের প্রতিভা বুঝতে পেরেছিলেন। ইতিপূর্বে রুচি-বিরোধী কবিতা লেখার অপরাধে ব্রাহ্ম নেত্রীদের সহযোগিতায় গড়ে ওঠা সিটি কলেজের চাকরী খোয়ালেন। পরে পূর্ববঙ্গের দু'একটি কলেজে যোগ দিলেন, কিন্তু অধ্যাপক হিসেবে বিশেষ খ্যাতি লাভ করতে পারেন নি। তবে হাওড়া গার্লস কলেজের ছাত্রীদের কাছ থেকে প্রচুর শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন। তিনি ইংরেজি গদ্য-প্রবন্ধ পড়াতেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংকলিত সেই গদ্যগ্রন্থটি অতিশয় নীরস। কিন্তু ছাত্রীদের কাছে শুনেছি নীরস গদ্যও নাকি তাঁর পড়ানোর গুণে কবিতার মতো স্বাদু হয়ে উঠতো।

প্রথম দিনের কথা বলি। আমরা সকলে আগ্রহে অপেক্ষা করছিলাম। অধ্যক্ষ মহাশয়

এক নতুন অধ্যাপককে সঙ্গে নিয়ে আমাদের ঘরে এলেন এবং পরিচয় করিয়ে দিলেন। সাদা ধুতি পাঞ্জাবী পরা একজন মধ্যবয়সী বাঙালী ভদ্রলোক। একটি চক্ষু একটু ট্যারা মতো। অত্যন্ত কম কথা বলেন। মৃদু হাসি ও নমস্কার বিনিময়ের পর তাঁকে আমরা অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও অন্তরঙ্গতার সঙ্গে গ্রহণ করলাম।

বেশি কথা বলতেন না বলে বোধহয় সহজেই অন্তরঙ্গ হতে পারতেন। সকলে মিলে চা খাওয়া হতো, অধ্যাপিকা বিনিতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে রসিকতা জুড়ে দিতেন। বলতেন—কবি, আপনার কাপ থেকে একটু চা আমার ডিশে ঢেলে দিন। তিনি স-কৌতুকে চোখ তুলে বলতেন, কেন? বিনিতা বলতেন, হয়তো এমন দিন আসতে পারে যেদিন আমি সকলের কাছে গর্ব করতে পারবো, জীবনানন্দ তাঁর কাপ থেকে আমাকে চা ঢেলে দিয়েছিলেন। শুনেই তিনি অট্টহাস্য করে উঠতেন, কিন্তু সে বড় মজার হাসি। সমস্ত চোখ-মুখ হেসে উঠতো। কিন্তু কোন শব্দ ছিল না—যাকে বলে শব্দহীন অট্টহাস্য।

দর্শনের অধ্যাপক অজিত ঘোষের সঙ্গে তাঁর সাহিত্য ও দর্শন নিয়ে গভীর আলোচনা হতো। ইংরেজির অধ্যাপক দুর্গাদাস চট্টোপাধ্যায় তাঁর সঙ্গে প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইংরেজি কবিতা নিয়ে আলোচনা করতেন। আমি তখন সুরেন্দ্রনাথ কলেজের পুরো সময়ের অধ্যাপক, এখানে বেশিক্ষণ থাকতে পারি না। তাই তাঁর সঙ্গে ততোটা আলাপ জমে উঠতো না। কলকাতার যে বাসা বাড়িতে তিনি থাকতেন, সেখানে স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না। বাড়ির মহিলা মালিকের সঙ্গে প্রায়ই মনোমালিন্য হতো। কন্যা মঞ্জু তখন খুবই ছোট। স্ত্রী ছিলেন হাঁপানির রোগী। তাঁর সেবাতেই জীবনানন্দকে অনেকটা সময় দিতে হতো। একদিন বললেন যে তিনি হাওড়ায় বাড়ি পেলে বাস করবেন। কলকাতা তাঁর পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠেছে।

বললাম, পুজোর ছুটির পর স্বল্প ভাড়ায় ছোট একটা বাসা বাড়ি দেখে দেবো। কিন্তু তার আর প্রয়োজন হলো না। এর মধ্যেই হঠাৎ একদিন রেডিওতে শুনলাম—কবি জীবনানন্দ দাশ রাসবিহারীর মোড়ে ট্রামে চাপা পড়ে ভয়ঙ্কর আহত হয়েছেন। শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে তাঁকে রাখা হয়েছে। পরদিনই গেলাম হাসপাতালে। সকলের সঙ্গে 'আমদরবারে' একটি অপরিচ্ছন্ন খাটে (খাটিয়াও বলা যায়) কাত হয়ে শুয়ে আছেন। আবক্ষ সাদা চাদরে ঢাকা। আমাদের দেখে খুশি হয়ে হাতটা এগিয়ে দিলেন। খুব আস্তে আস্তে বললেন, ডাক্তার কথা বলতে দিচ্ছে না, পরে বলবো। বিনিতাকে বললেন, ভালো হয়ে হাওড়ায় অবশ্যই যাবো। কিন্তু তখন তিনি অন্যলোকে যাবার জন্য প্রস্তুত হচ্ছেন। বুকের কখানি পাঁজর ভেঙে গেছে। ফুসফুসে শ্লেষ্মা জমেছে। ডাক্তারী মতে, ডবল নিউমোনিয়া। কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র সংবাদ পেয়ে তৎক্ষণাৎ মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্রের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিধানচন্দ্রের নির্দেশেই মুমূর্ষু জীবনানন্দকে একটা ভালো কেবিনে রাখা হলো। হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যক্ষ বিজয়কৃষ্ণ তখন পুরীতে ছুটি কাটাতে গিয়েছিলেন। এই দুঃসংবাদ পেয়েই আমাদের টেলিগ্রাম করলেন, যেন অবিলম্বে কয়েক হাজার টাকা তাঁর স্ত্রীর হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়। কিন্তু তখন বড় বিলম্ব হয়ে গেছে। তৃতীয় দিন গেলাম। অক্সিজেন দেওয়া চলেছে। কোন কথা বলতে দেওয়া হচ্ছে না। বাইরে অনেক কবি ও ভক্তেরা জমায়েত হয়েছেন। অবশেষে সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হলো। জীবনানন্দ 'বনলতা সেনে'র কাছে দু'দণ্ডের শান্তি চেয়েছিলেন। হাওড়া গার্লস কলেজের ছায়াঘেরা অবকাশে সহযোগী অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের সাহচর্যে দু'দণ্ডের শান্তি

পেয়েছিলেন, পেয়েছিলেন ছাত্রীদের শ্রদ্ধা ও সম্মান, প্রবীণ অধ্যক্ষের অন্তরঙ্গতা। তাঁর শেষ জীবনের বেশ কিছুদিন হাওড়া গার্লস কলেজে কেটেছে এবং তিনি খুশি হয়েছিলেন—এই কথা যাঁরা এখন জীবনানন্দকে নিয়ে লেখালেখি করেন তাঁরা সেটি উল্লেখ করতে ভুলে যান। যে মৃত্যুচেতনা জীবনানন্দকে গোপনে গোপনে তাড়া করে ফিরছিল সে এলো যন্ত্রের বেশে। ট্রামে চাপা পড়ে জীবনানন্দ যন্ত্রের আঘাতে শেষ হয়ে গেলেন। এটাই বোধহয় আধুনিক সভ্যতার নিয়তি। সে যাইহোক, আমরা যে কিছুদিন তাঁর সান্নিধ্য লাভ করেছিলাম, এটি আমাদের স্মৃতির ভাণ্ডারে অমূল্য সঞ্চয় হয়ে রইলো।

অসীমের সৈকতে

শামসুর রাহমান

আমাদের জীবন অনেকাংশে স্মৃতিনির্ভর। নানা খুঁটিনাটি ঘটনা, টুকরো টুকরো কথা, কোনো রঙের উদ্ভাস, ছায়ার সঞ্চরণ কখনো কখনো মনে পড়ে আমাদের। কোনোরকম নোটিশ ছাড়াই স্মৃতি হানা দেয় আমাদের মনের ভিতর মহলে অর্থাৎ মাঝে-মধ্যে অকারণেই আমরা স্মৃতিভারাতুর হয়ে উঠি। হয়তো ভোরবেলা চেয়ারে হেলান দিয়ে ইয়েটস-এর কবিতায় অবগাহন করছি, এমন সময় এই কাব্যপাঠের সঙ্গে সম্পূর্ণ পারম্পর্যহীন একটি ঘটনা মনে পড়ে গেলো, আমার দৃষ্টিপথে স্পষ্ট হয়ে উঠলো এক ঝড়ের রাত্রি, নারায়ণগঞ্জ থেকে ফিরতে না পারা, আশ্রয়দাতা উপেন বাবুর বাড়িতে সেই কিশোর বয়সে লুচি তরকারী আর অমৃতের মতো পায়েস খাওয়া। স্মৃতির এমনই ধরন।

এই মুহূর্তে যখন আমি এক তাড়া শাদা কাগজ এবং হাতে বল পেন নিয়ে বসে আছি আমার লেখার টেবিলে, যখন একটি পংক্তির ছায়াও দুলছে না আমার মনের ভেতর, তখন আমার মনে পড়ছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কথা। চৌতিরিশ পঁয়তিরিশ বছর আগেকার কথা। সবেমাত্র আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী ভাষা ও সাহিত্য বিভাগে ভর্তি হয়েছি, অনেক আগে থেকেই ইংরেজীতে অনার্স পড়ার সাধ ছিলো শেক্সপীয়র, মিল্টন, শেলী, কীটস, ওয়ার্ডসওয়ার্থ, বায়রন—এই ক'টি অলোকসামান্য নাম, বলা যায়, আমাকে ইংরেজী সাহিত্যপাঠে উদ্বুদ্ধ করেছিলো। আমার পরম সৌভাগ্য, জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে অমি একজন সহপাঠী হিশেবে পেয়েছিলাম। একদিন ক্লাশরুমে প্রবেশ করার সময় জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীর হাতে একটি বই দেখলাম এবং দেখামাত্রই বইটি সম্পর্কে কৌতূহল সঞ্চারিত হয় আমার মধ্যে। ক্লাশ শেষ হওয়ার পর করিডোরে দাঁড়িয়ে আমি জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে বললাম, 'আপনার ঐ বইটা একটু দেখতে পারি?' তিনি, আমার উজ্জ্বল সহপাঠী এবং তরুণ কবি, স্মিত হেসে বইটি আমার দিকে এগিয়ে দিলেন। আমি লোভী বালকের মতো আচরণে প্রায় ছিনিয়ে নিলাম বইটি, যার সাইজ বড় এবং মলাটের রঙ খাকি। বইয়ের নাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', লেখক জীবনানন্দ দাশ। এই লেখকের নাম এর আগে কখনো শুনিনি এবং তাঁর কোনো লেখাও পড়িনি। কিন্তু বইটি স্পর্শ করা মাত্রই কেমন এক অনুভূতির জন্ম হলো আমার অন্তর্গত সত্তায়, অনেকটা প্রথম প্রেমে পড়ার মতো। আমি লজ্জার মাথা খেয়ে জিল্লুর রহমান সিদ্দিকীকে বললাম, 'বইটা আমাকে পড়তে দেবেন?' তাঁর মুখের অভিব্যক্তি দেখে বেশ বুঝতে পারলাম যে, তিনি বইটির সম্ভাব্য বিচ্ছেদে কাতর। হয়তো বইটি তিনি ধার দেবেন না, আমার মনে সংশয়ের মেঘ জড়ো হয়। কিন্তু আমার মন থেকে সংশয়ের মেঘ এক ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে তিনি বললেন, 'দিতে পারি এক শর্তে, কাল সকালেই ফিরিয়ে দিতে হবে। বইটি আমার নয়। অন্যের কাছ থেকে চেয়েচিন্তে নিয়েছি। আগামী কালই ফেরত দেওয়ার তারিখ।' বইটি

হাতে পেয়ে আমি আনন্দে আত্মহারা। বইটি তিনি না দিলেও পারতেন; কেননা তখনও আমাদের পরিচয় ঘনিষ্ঠ হয়নি। হয়তো আমার চেহারায় সেই মুহূর্তে ভিক্ষুভাব প্রবল হয়ে উঠেছিলো, যা প্রকৃতই করুণা সঞ্চারী।

বাসায় ফিরে বইটির গায়ে হাত বুলোলাম সযত্নে, ঘ্রাণ নিলাম বুক ভরে। যেন বইটির প্রাণ আছে। তারপর আস্তে সুস্থে পড়তে শুরু করলাম। এক মোহন ভূতগ্রস্ততায় সারারাত জেগে পড়লাম 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। কবিতার পংক্তিমালা আমার সঙ্গে ঘুরে ঘুরে একা কথা বলতে লাগলো, একটানা অনেকক্ষণ। আমার চেতনায় জীবনানন্দীয় ঝরণাধারা বয়ে গেলো, যা অত্যন্ত নির্জন এবং মায়াবী। রাতে এক ফোঁটা ঘুম হলো না ; আমার স্নায়ুতন্ত্রী একটি বাদ্যযন্ত্রের মতো সঙ্গীতমুখর ছিলো সারারাত। উত্তেজনাবশে সেদিন ভালো করে আহার পর্যন্ত করিনি; তবু রাত্রি জাগরণে এতটুকু ক্লান্ত হইনি। কবিতার ইন্দ্রজালে এমনই আচ্ছন্ন ছিলাম যে, কখন বিশ্ববিদ্যালয়ে যাবার সময় হয়ে এলো টের পাইনি। ঘড়ির দিকে চোখ পড়তেই চমকে উঠি। সাত তাড়াতাড়ি কিছু নাকেমুখে গুঁজে রওয়ানা হলাম ইউনিভার্সিটির দিকে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আজই ফেরত দিতে হবে, এই কড়ারেই বইটি ধার পেয়েছিলাম। যদি বইটি আরো কয়েক দিন কাছে রাখতে পারতাম, একথা বার বার মনে হচ্ছিলো পথ চলার সময়।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আমার হাতে আসার আগেই আমি কবিতা লিখতে শুরু করি ঃ আমার একটি কি দু'টি কবিতা প্রকাশিতও হয়েছে ইতিমধ্যে। জীবনানন্দ দাশের কবিতা প'ড়ে আমি নিজেকে আবিষ্কার করলাম নতুন করে আর সারাক্ষণ আমার এ কথা মনে হতে থাকলো যে, আমি যা লিখতে চাই ইনি তা আগেই অত্যন্ত স্মরণীয়ভাবে লিখে ফেলেছেন। এটা এক হিশেবে মর্মপীড়ারও কারণ। কবুল করতে দ্বিধা নেই, আমি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পাঠ করার পর থেকেই জীবনানন্দ দাশের দখলে চলে গেলাম, যার চিহ্ন আমার প্রাথমিক পর্যায়ের কবিতায় ছড়িয়ে রয়েছে ইতস্তত। তখন আমি আমার যৌবনের ঊষাকালে, তাঁর কনিষ্ঠ সহজীবীদের একজন, একলব্যের মতো দূর থেকে তাঁকে গুরু বলে স্বীকার করেছিলাম। তিনি সে কথা জানতেন না, জানার কথাও নয়। ভাবতে অবাক লাগে, আমি জীবনানন্দ দাশকে কখনো কোনো চিঠি লিখিনি, তাঁর সম্পর্কে এযাবত কোনো কবিতা কিংবা প্রবন্ধ রচনা করিনি, তাঁকে উৎসর্গ করিনি কোনো বই। হয়তো ভালো ক'রে লিখবো কোনোদিন, এই পরিকল্পনা লালন করতে করতেই সময় কেটে গেলো। কোনো একদিন তাঁর যোগ্য একটি বই লিখবো ভাবতে ভাবতেই জীবন অপরাহ্নের দিকে ঝুঁকে পড়লো। যদি বেঁচে থাকি, অদূর ভবিষ্যতে তাঁকে আমার অর্ঘ অর্পণ করতে পারবো।

জীবনানন্দ দাশের সঙ্গে আমার পত্রবিনিময় হয়নি, কিন্তু তাঁকে দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিলো। তিরিশ বছর আগে ১৯৫৩ সালে আমি শান্তিনিকেতনের সাহিত্য মেলায় শরিক হবার আমন্ত্রণ পাই। সেবার ঢাকা থেকে শান্তিনিকেতনে গিয়েছিলাম আমরা চারজন—ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন, আমার শিক্ষক অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দীন, কায়সুল হক এবং আমি। সেখানে বহু গুণীজনের সমাবেশ হয়। সেই সাহিত্যমেলায় কবিদের মধ্যে ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, অজিত দত্ত, অন্নদাশঙ্কর রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, নরেশ গুহ, সুনীল চন্দ্র সরকার, অশোক বিজয় রাহা প্রমুখ, ছিলেন না জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী এবং আরো অনেকে।

শান্তিনিকেতনে কয়েকটি আনন্দমুখর দিন কাটানোর পর কলকাতায় এলাম কবিবন্ধু নরেশ গুহর সঙ্গে। কায়সুল হক আর আমি। নরেশ গুহর ফ্ল্যাটে চার-পাঁচ দিন ছিলাম

আমরা এক উদার আতিথেয়তার মধ্যে। পাঁচ নম্বর সত্যেন দত্ত রোডের সেই ফ্ল্যাটটির স্মৃতি কখনো ম্লান হবার নয়। মেঝেতে শুয়ে, মধ্যরাত পর্যন্ত আড্ডা দিয়ে, কবিতা বিষয়ে তুমুল আলোচনা ক'রে চোখের পলকে কেটে গেলো কলকাতার দিনগুলো। একদিন সকালে নরেশ গুহকে বললাম, 'জীবনানন্দ দাশকে দেখতে চাই।' তিনি আমার কথা শুনে অত্যন্ত প্রীত হলেন। ফলে সেই সকালেই আমরা হাজির হলাম ল্যান্সডাউন রোডের সেই নিমগাছঅলা একতলা বাড়িতে, যেখানে থাকেন আধুনিক বাংলা কবিতার প্রবাদপ্রতিম পঞ্চপুরুষদের অন্যতম, বাংলা কাব্যের নির্জনতম কবি জীবনানন্দ দাশ। কড়া নাড়ার আওয়াজ শুনে দরজা খুলে দাঁড়ালেন তিনি, আমরা মুখোমুখি হলাম তাঁর, যাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'কে নিবেদন করেছিলাম একটি বিনিদ্র রাত, যাঁর কবিতাবলী বার বার তরঙ্গিত হয়ে ওঠে আমাদের চেতনায়, আধুনিক বাংলা কবিতার অন্যতম প্রধান স্থপতি যিনি। তাঁকে বড় অপ্রস্তুত আর বিব্রত মনে হলো আমাদের, অনেকটা সমুদ্রবিহঙ্গ আলবাট্রসের মতো। হেঁটে গেলেন বারান্দার দিকে প্রায় কোনো কথা না ব'লে। বারান্দায় পৌঁছে তিনি এদিকে ওদিকে দৃষ্টিপাত করলেন, আমরা চটজলদি ঝকঝকে বারান্দায় বসে পড়লাম। আমাদের এই আচরণে স্বস্তি পেলেন কবি, তিনি নিজেও হাসিমুখে বসলেন বারান্দায়। বোঝা গেলো, বসতে দেবার মতো যথেষ্ট চেয়ার কিংবা অন্য কোন আসন বাসায় নেই। যাঁর আসন আমাদের হৃদয়ে তিনি আমাদের কোনো আসন দিতে পারলেন কি পারলেন না তাতে কিছুই আসে যায় না। আমরা নিবিড় হয়ে বসলাম, আনন্দ ও ভক্তিতে ভরপুর। একটি বৃত্ত রচিত হলো, যার ব্যাস প্রায় পুরোটাই গৃহকর্তা জীবনানন্দ দাশ।

বলতে দ্বিধা নেই, জীবনানন্দ দাশকে দেখে আমি হতাশ হয়েছিলাম। দেখতে মোটেই কবির মতো নন তিনি। কালো, স্থূলকায়; চেহারা বৈশিষ্ট্যবর্জিত। শুধু চোখে ছিলো এক ধরনের মায়া। আর তাঁর হাসি ছিলো জোরালো এবং খাপছাড়া। যিনি সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কিংবা বিষ্ণু দে'র মতো কান্তিমান নন, তিনি কী করে অমন রহস্যসমৃদ্ধ, আশ্চর্য রূপসী কবিতা লিখেছেন—এমন একটি প্রশ্ন আমাকে ক্ষণিকের জন্য বিচলিত করেছিলো। কথাবার্তায় বিব্রত, প্রায় সর্বক্ষণ, অতল লাজুকতায় নিমজ্জিত, সব রকমের কোলাহল থেকে সর্বদা পলায়নপর এই অসামান্য শিল্পী মানুষটির দিকে বিস্ময়ে তাকিয়েছিলাম অনেকক্ষণ। জানি, তিনি কোনো সাহিত্যিক আন্দোলনের নায়ক ছিলেন না, ছিলেন না কোনো রাজনৈতিক দল কিংবা মতের প্রচারক, তাঁর দ্বারা সাধিত হয়নি কোনো জনহিতকর কাজ—শুধুমাত্র কাব্যক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ ছিলো তাঁর সুকৃতি। এবং এও এক আশ্চর্য ঘটনা যে, যিনি কখনো কোনো রাজনৈতিক আন্দোলনের ত্রিসীমানায় ঘেঁষেননি, তাঁর কবিতার পংক্তিমালা আমাদের প্রেরণা জুগিয়েছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে, আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে।

সেদিন ল্যান্সডাউন রোডের সেই বাসায় কথাবার্তা সামান্যই হয়েছিলো। মনে পড়ে, আমরা কবিগৃহ ছেড়ে আসার কিছু আগে জীবনানন্দ দাশ বললেন যে, বরিশালে একটা ট্রাঙ্কের ভেতর তিনি তাঁর কিছু কবিতার পাণ্ডুলিপি ফেলে এসেছেন। আমি বললাম 'এখন তো সেগুলো ধূসর পাণ্ডুলিপি হয়ে গেছে।' তিনি হো হো করে হেসে উঠলেন, যেন কোনো আদিম দেবতা উচ্ছ্বসিত হলেন কৌতুকের স্বাদে। কবিকে বিব্রত থেকে নিষ্কৃতি দেয়ার জন্য আমরা তাড়াতাড়ি চলে এলাম। সারাপথ আমার মন জুড়ে রইলো কবির মুখ—যে মুখের সঙ্গে কোথায় যেন ওলন্দাজ চিত্রকলার অমৃতপুরুষ রেমব্রান্টের

আত্মপ্রতিকৃতির মিল আছে—জীবনানন্দীয় পংক্তিমালা, একটি ঠাণ্ডা বারান্দা আর হাওয়াস্পন্দিত একটি নিমগাছ।

সেবারই জীবনানন্দ দাশকে আরো একবার দেখলাম চারুচন্দ্র কলেজ থেকে ফেরার পথে। এবং সেটাই শেষ দেখা। নরেশ গুহ তখন চারুচন্দ্র কলেজের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক। কায়সুল হক এবং আমি নরেশ গুহর সঙ্গে দেখা করার জন্য কলেজে উপস্থিত হয়েছিলাম অনেক ঘোরাঘুরির পর। নরেশ গুহ কলেজী কাজ শেষ করে আমাদের নিয়ে রওয়ানা হলেন তাঁর সত্যেন দত্ত রোডের ফ্ল্যাটের দিকে। কিছুক্ষণ হাঁটার পর নরেশ গুহ বললেন, 'ঐ যে জীবনানন্দ দাশ যাচ্ছেন।' চেয়ে দেখি রাস্তার ওপারে ভিড় উজিয়ে ছাতা মাথায় নিরিবিলি হেঁটে চলেছেন তিনি। মনে পড়লো তাঁর অবিস্মরণীয় পংক্তি—হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে। 'যাবেন নাকি রাস্তার ওপারে কবিকে শুভেচ্ছা জানানোর জন্যে?'—নরেশ গুহর প্রশ্ন। আমি জবাব দিলাম, 'কবিকে বিব্রত করে কী লাভ? দূর থেকেই দেখি।' দেখলাম, তিনি হেঁটে যাচ্ছেন একা। তিনি হাঁটছেন, যেন কলকাতার ভিড়াক্রান্ত পথে নয়, অসীমের ধু ধু সৈকতে। তাঁর পাশাপাশি নিঃশব্দে চলেছে আরেকজন—অমরতা।

কবি জীবনানন্দ দাশ প্রসঙ্গে

আবুল কালাম শামসুদ্‌দীন

বুদ্ধদেব বসু-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকায় প্রথম জীবনানন্দের কবিতা পড়েছিলাম তারপর কলকাতায় 'কবিতা'র পুরানো সংখ্যাগুলো কেনার জন্য একদিন 'কবিতা ভবনে' যাই। তখন বুদ্ধদেববাবুই প্রথম তাঁর আশ্চর্য কবিত্বশক্তির কথা বারংবার উল্লেখ করছিলেন। স্কুলে পড়ি তখন—ম্যাট্রিক দেবো। সেইকালে আমরা দুই বন্ধু তাঁর অনুকরণে কবিতা লেখার প্রয়াস করেছিলুম।

তারপর তাঁকে প্রথম দেখি যখন আমরা আই. এ. ক্লাশের ছাত্র। বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন তিনি। শ্যামরঙের স্বাস্থ্যবান মানুষ। চল্লিশোত্তর বয়স তখন। পরণে—ধুতি পাঞ্জাবী পাম্প-সু। কাঁধে পাট করে রাখা একখানা চাদর, হাতে একটি কি দুটি বই। মুখ তাঁর সর্বদা ভারী, গম্ভীর, চোখে আশ্চর্য চাঞ্চল্য এবং তীক্ষ্ণতা। লম্বা লম্বা পা ফেলে চলতেন। আমি আর আমার আরেক বন্ধু নির্মল চট্টোপাধ্যায় তাঁকে অবাক হয়ে দেখতুম ; কখনো ক্লাশের অবকাশে মাঠের ধারে শুয়ে শুয়ে পড়তুম তাঁর কবিতা। তখনও পর্যন্ত তাঁর শেষতম কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। কিছুদিন পরে 'কবিতা ভবন' থেকে 'এক পয়সায় একটি' কবিতা সিরিজে প্রকাশিত হলো তাঁর 'বনলতা সেন'। আমাদের মধ্যে সেদিন রীতিমতো সাড়া পড়ে গিয়েছিলো। নোতুন বয়সের অনভিজ্ঞ মনের কাছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যে সাড়া জাগাতে পারে নি, 'বনলতা সেন' দ্বারাই তা সম্ভব হয়েছিলো। 'বনলতা সেন' কবিতাটি আমরা যত্রতত্র মুখে মুখে আবৃত্তি করে বেড়াতুম। কলেজের এক অনুষ্ঠানেও আবৃত্তি করলুম একদিন।

একদিন বাড়িতে গেলাম তাঁর। কলেজে তাঁর প্রখর গাম্ভীর্যের জন্য কাছে এগোতো না কেউ। সবারই ধারণা ছিলো তিনি ভীষণ রাশভারী প্রকৃতির লোক। আমরাও অবকাশ পেতাম না কথা বলার। বাড়ি তাঁর একটা মেয়ে ইস্কুলের কম্পাউণ্ডের মধ্যে। খুব সম্ভবতঃ সে ইস্কুলটা তাঁর পিতারই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। বাংলো ধরনের বাড়ি— উপরে শণের চাল। বেড়া আধেক ইট আর আধেক বাঁশের। কিন্তু ভিতরে সাহিত্য-পাঠকের কাছে আশ্চর্য এক জগৎ। বই—বই আর বই। বাংলার, বাংলার বইয়ের অসংখ্য পত্রিকা। সবই সযত্নে গুছিয়ে রাখা—দেখে মনে হয় বার বার পড়া। একাধারে একটা ছোটো টেবিল। হয়তো তাঁর লেখার। অন্দরে ছিলেন তাঁর স্ত্রী এবং বালিকা কন্যা মঞ্জু দাশ। তাঁরাও কবিরই মতো স্বল্পভাষী—নির্জনতাপ্রিয়। সেইকালে, মঞ্জু দাশের বোধ হয়, বয়স দশ কী বারো। 'বঙ্গশ্রী' পত্রিকায় একটি কবিতা প্রকাশিত হয়েছিলো।

সেদিন তাঁর বাড়িতে না গেলে 'জীবনানন্দবাবু অসামাজিক মানুষ' এই ধারণা করেই চিরদিন দূরে দূরে থেকে যেতাম। সে ধারণা অচিরেই ভেঙে গেল। অমন রাশভারী চেহারার ভিতরে একটি সহজ সরল শিশুর মন খুঁজে পেয়ে আমরা চমৎকৃত হয়ে গেলুম।

আমরা তখন লেখার মক্স করছি। কবিতা-গল্প-প্রবন্ধ— কতো কী! আর মুখে 'প্রগতি-সাহিত্যে'র বাণীর খই ফুটছে। এই সময় কলেজে একদিন তাঁর সঙ্গে কথা বলছি, এমন সময় এক প্রগতিশীল ছাত্র-'কবি' হঠাৎ কথার মাঝখানেই তাঁকে প্রশ্ন করলে : আপনি জনগণের কবিতা লেখেন না কেন? তার সাহস দেখে আমরা স্তম্ভিত হয়ে গেলুম।

জীবনানন্দবাবু এমন প্রশ্নের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। কয়েকবার তার এবং আমার মুখের দিকে তাকিয়ে তিনি আস্তে প্রশ্ন করলেন : তুমি এই প্রগতিশীল সাহিত্য-আন্দোলনের মধ্যে আছো বুঝি?

সে বললে : হ্যাঁ। অবশ্যই। আমরা এই সমাজ-ব্যবস্থাকে বদলাতে চাই—কায়েম করতে চাই শোষণহীন সমাজ-ব্যবস্থা। সেখানে কবি ও সাহিত্যিকেরাও আমাদের সঙ্গে আসবেন তাঁদের বুর্জোয়া, পেটি বুর্জোয়া শ্রেণী পরিত্যাগ করে—মার্ক্সবাদ যে নতুন পথ দেখিয়েছে—

কথার মাঝখানেই জীবনানন্দবাবু হঠাৎ প্রশ্ন করলেন : তুমি কার্লমার্ক্স পড়েছো? ডস ক্যাপিটাল?

ছাত্র-'কবি'টি থতমত খেয়ে বললে : না।

জীবনানন্দবাবু একটুকাল তার দিকে তাকিয়ে থেকে হাসি গোপনের বহু চেষ্টা করেও অকস্মাৎ উচ্চহাস্যে ফেটে পড়লেন। হঠাৎ সে হাসি। এমন আচম্বিতে বেরিয়ে আসা—যে, অবাক হয়ে দেখতে হয় তাঁকে। সঙ্গে হাসা যায় না।

ছাত্রটি ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে পালিয়ে বাঁচলো।

জীবনানন্দবাবুর এই হাসিটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। আবেগকে চেপে রাখতে অভ্যস্ত ছিলেন তিনি। ভালো লাগার আবেগকেও অসংযত জীবনযাপন তো দূরের কথা —রচনাতেও ছিলেন সংযমী। হাসির আবেগকেও লুকিয়ে রাখতে চাইতেন তিনি। অনেক সময়, দেখা গেছে, যে-হাসির প্রসঙ্গ উত্তীর্ণ হয়ে গেছি অনেকক্ষণ, সেইকালে অকস্মাৎ বাঁধভাঙার মতো করে বেরিয়ে পড়েছে তাঁর হাসি। তবু এমন হাসতে তাঁকে তাঁর বন্ধুবান্ধব ছাড়া কেউ কখনো দেখেনি।

বন্ধু-সংখ্যা তাঁর প্রচুর নয়। অচিন্ত্যবাবু, প্রেমেনবাবু তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। বুদ্ধদেববাবুও শ্রদ্ধা করতেন তাঁকে খুব। 'কল্লোল' যুগের বহু লোকের সঙ্গেই তাঁর জানাচেনা ছিলো। বরিশালের মানুষ হলেও, সেখানে কার্যোপলক্ষে থাকতে হলেও ছুটি-ছাটায় কলকাতায় যেতেন। দেখা-সাক্ষাৎ হতো অনেকের সঙ্গেই। যাঁরা তাঁর সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে মিশেছেন তাঁরা তাঁর সত্যিকারের মনটিকে চিনেছেন। নয়তো বাইরে তিনি নির্জনতাপ্রয়াসী, আত্মকেন্দ্রিক, অর্থাৎ ভদ্রতাহীন ভাষায় অসামাজিক বলেই পরিচিত ছিলেন। বরিশালের মতো মফস্বল শহরে থেকেও তাঁর মনকে আমি কোনোদিন হাঁপিয়ে উঠতে দেখিনি। নিজেদের বাড়ি—তার সামনের মাঠ এবং ইংরেজী সাহিত্যের অসংখ্য কাব্য ও কবিতার বই-ই ছিলো তাঁর সবচেয়ে বড়ো সুহৃৎ।

শিক্ষকতায় তিনি সর্বজনপ্রিয় হতে পারেন নি। এ অতৃপ্তি তাঁর মনে অবশ্যই ছিলো। তাঁর কবিতা অন্যান্য অধ্যাপক মহলে উপহাসের খোরাক জুগিয়েছে, দেখেছি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরবর্তী কবিতাগুলোতে 'সুররিয়্যালিস্ট', প্রভাব যতো বেশি প্রকট হয়ে উঠতে লাগলো ততো বেশি দুর্বোধ্য হতে লাগলো তাঁর কবিতা। সেই অনুপাতে হতে লাগলো অভিযোগ।

অনেক দিন তিনি জানতে চেয়েছেন, বাস্তবিকই তোমরা কিছু বুঝতে পারো না?

সত্যি কথা বলতে কী অনেক কবিতারই রসোদ্ধার সম্ভব হতো না, কিন্তু পড়তে ভালো লাগতো খুবই। কয়েকটি কবিতা ব্যাখ্যা করেছিলেন তিনি। সে ব্যাখ্যা এবং পরে কবিতাগুলি আবার পড়ে মুগ্ধ হয়েছিলুম। কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর পরীক্ষা-নিরীক্ষার শেষ ছিলো না। আঙ্গিকে এবং উপমায় তাঁর মতো পরীক্ষা অধুনাকালের মধ্যে আর কেউই করেন নি। তিনি বলতেন, 'উপমাই কবিত্ব'। একটি কবিতাতে একটা লাইনে ছিলো—'আগুন-বাতাস-জল ব্যবহৃত, ব্যবহৃত ব্যবহৃত, ব্যবহৃত হয়ে হয়ে—ইত্যাদি।'

আনাড়ির মতো প্রশ্ন করেছিলাম, এতোগুলো 'ব্যবহৃত' কেন লিখেছেন?

বুঝিয়ে বললেন, বিষয়টার বহু ব্যবহারের একঘেয়েমিকে প্রকট করবার জন্য।

'বনলতা সেন' কবিতাটিতে একটি উপমা আছে 'পাখীর নীড়ের মতো চোখে'র। আরেকটিতে আছে—'কাল রাতের হাওয়ায় আমার মশারী মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো ফুলে উঠে স্বাতি নক্ষত্রের কাছে চলে গিয়েছিলো—প্রভৃতি।'—উপমা ও প্রতীক ব্যবহারে তিনি অসাধারণ। মাত্র 'বনলতা সেন' কবিতাটিই তার যথেষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু এগুলোও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরের কবিতা। এর আগে কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ ছিলো 'ঝরাপালক'। সুন্দর সাবলীল ছন্দোবদ্ধ কবিতা। নজরুল ও সত্যেন্দ্র দত্তের কথা মনে পড়িয়ে দেয় সে-সব কবিতা।

এর পরেই শুরু করেন গদ্য ছন্দে কবিতা। সে-ক্ষেত্রে স্বপ্রতিষ্ঠ হলেন।

আমরা প্রথম বয়সে মনে করেছি গদ্য কবিতা লেখা খুবই সহজ। যেমন ভেবেছি কার্টুন ছবি দেখে যে, সে আঁকা সহজ। সেই কারণেই বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে দেখাদেখি গদ্য কবিতা লেখার হিড়িক পড়ে গিয়েছিলো। কিন্তু পরে বুঝলাম, Basic drawing জানা না থাকলে যেমন কার্টুন দূরের কথা কোনো ছবিই আঁকা চলে না, তেমনি ছন্দে পাকা হাত না হলে গল্প কবিতা লেখাও সম্ভব নয়। গদ্য কবিতাতেও যে ছন্দ আছে, থাকে—তা নোতুন কবিযশঃলিপ্সুরা খেয়ালই করেন না।

ছন্দে পাকা হাত ছিলো বলেই গদ্য কবিতার ক্ষেত্রেও জীবনানন্দ অসাধারণ শক্তির পরিচয় দিতে পারলেন।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরের বই 'বনলতা সেন' এবং পূর্বাশা লিঃ থেকে প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী'। 'মহাপৃথিবী'তে তাঁর পরীক্ষা আরো পরিণত এবং অন্বেষা আরো গভীর। 'পূর্বাশা' সম্পাদক শ্রী সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই কালে তাঁর সম্পর্কে একটা বিস্তারিত আলোচনার সূত্রপাত করেছিলেন। এর আগে অবশ্য বুদ্ধদেব বাবু 'কবিতা' পত্রিকায় তাঁর সম্বন্ধে আলোচনা করেছিলেন—প্রেমেন্দ্র মিত্র সম্পাদিত 'নিরুক্ত' কবিতা-পত্রিকাতেও তিনি নিয়মিত লিখতেন। প্রত্যেকটি আধুনিক কাব্যমহল জীবনানন্দকে নোতুন পথের দিশারী বলে স্বীকার করে শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠেছিলো। তাঁর এর পরের বই 'সাতটি তারার তিমির'।

বরিশাল থেকে তিনি চলে গেলেন কলকাতায় দেশভাগের পরেই। বরিশালে আমরা তাঁর অত্যন্ত কাছাকাছি এসেছিলুম। তিনি আমার বরিশালের বাসায় এসেছেন অনেকদিন। আমাদের ছোটো টিনের ঘরের দোতলায় তাঁকে সাহিত্যের আড্ডাতেও পেয়েছি। একদিন সেই আড্ডায় অচিন্ত্যকুমারকে দেখে তিনি অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে উঠেছিলেন বলে মনে পড়ছে। মনে তাঁর কোনো ঘোর-প্যাঁচ বা সঙ্কীর্ণতা ছিলো না—সহজ সরল সাদাসিদে এবং নিরহঙ্কার ছিলেন তিনি। আরো ছিলেন বিনয়ী।

অনেকবার কলকাতায় এসেছি তাঁর সঙ্গে। একদিনের কথা মনে পড়ে। রেলপথের দু'ধারে কৃষ্ণচূড়া. মাদার ও পলাশের গাছগুলি লাল হয়ে ছিলো। মাটির ভাঁড়ে করে চা খেতে খেতে সেই দিকে তাকিয়ে বাংলা কবিতার আলোচনা ভুলে গিয়েছিলুম।

কলকাতায় থাকতেন ১৮৩, ল্যান্সডাউন রোডে। 'দৈনিক স্বরাজ' পত্রিকায় কাজ নিলেন কিছুদিন পরে। রবিবারের সাময়িকী সম্পাদনার কাজ। তাঁর আগ্রহে সে-কাগজে কয়েকটি গল্প লিখেছিলুম। আজকের দিনের সবচেয়ে বড়ো গল্পলেখক নরেন্দ্রনাথ মিত্রের সম্ভবতঃ 'পদক' গল্পটিও সেই কাগজে প্রকাশিত হয়েছিলো। 'স্বরাজ' বন্ধ হয়ে যাবার পরে একটা মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করেছিলাম তিনি, আমি ও নির্মল চট্টোপাধ্যায় মিলে। কিন্তু 'বিজ্ঞাপন' সংগ্রহে তিন জনই অপটু ছিলাম বলে শেষ পর্যন্ত সাহসে কুলালো না।

তবু মাঝে মাঝে দেখা হয়েছে—একসঙ্গে বেড়িয়েছি—গল্প করেছি। কিন্তু দেশভাগের অব্যবহিত পরেই কলকাতার অর্থনৈতিক জীবনে যে আলোড়ন এসে পড়েছিলো—তাতে করে বেশি দিন আর সম্পর্ক রাখা চললো না। ঢাকায় আসার পর আর তাঁর সঙ্গে দেখা হয় নি। গত বছর কলকাতায় বন্ধু নির্মল চট্টোপাধ্যায়ের কাছে শুনেছিলাম তিনি কোথায় অধ্যাপনার কাজ নিয়েছেন। প্রশ্ন করে জেনেছিলাম, আমার খবরাখবরও তিনি নিতেন নির্মলের কাছ থেকে। অতঃপর এই অপঘাত মৃত্যু।

এর মধ্যে তাঁর লেখার সঙ্গে যোগাযোগ হারাই নি। এই সেদিনও 'চতুরঙ্গে' তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতার ওপর আলোচনাটি পড়ছিলাম। সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়েছে তাঁর আশ্চর্য গদ্যের কথা। যাঁরা তাঁর গদ্য প্রবন্ধগুলি 'কবিতা', 'পূর্বাশা', 'চতুরঙ্গ' প্রভৃতি পত্রিকায়, বার্ষিকী 'বৈশাখী'—প্রভৃতিতে পড়েছেন তাঁরা অবশ্যই স্বীকার করবেন তাঁর নিজস্ব একটি গদ্যরীতি ছিলো। তা যেমন সুরেলা, তেমনি সুখপাঠ্য। বাংলা গদ্যে ও কাব্যের ক্ষেত্রে তিনি যে অসাধারণত্বের ছাপ রেখে গেলেন তা তাঁকে অবশ্যই অমর করে রাখবে।

কিন্তু তবু এ কথা স্বীকার করতেই হয় যে তাঁর খ্যাতি সাহিত্য-মহলের চৌকাঠ পেরিয়ে সাধারণ্যে পৌঁছয় নি। কারণ তিনি ছিলেন স্বল্পবাক, চলতেন ভিড় এড়িয়ে, লিখতেন না ঘন ঘন, সভায় না হতেন সভাপতি, না করতেন বক্তৃতা। সবচেয়ে বড়ো কথা না ছিলেন তথাকথিত ভাবে 'ফ্যাসীবিরোধী' বা 'প্রগতিশীল'। সেই কারণে তাঁরই জীবিতকালে তাঁর চেয়ে বহু বহু গুণে নিকৃষ্ট 'প্রগতিশীল' কবির ঢাক পিটিয়ে আমরা শ্রান্ত হয়ে গেছি—কিন্তু তাঁর প্রাপ্য সম্মান দেই নি। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা দেশের সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ঔপন্যাসিক হয়েও সাধারণনন্দিত হন নি। না হয়েছেন এ-যুগের সবচেয়ে শক্তিশালী কবি জীবনানন্দ দাশ। কিন্তু তাঁর জন্য, তাঁকে আমি জানতুম বলেই বলতে পারি, খেদ করতে দেখি নি কোনোদিন। বরঞ্চ যাদের কাছে তিনি শ্রদ্ধা পেয়েছিলেন, তাঁরা মুষ্টিমেয় হলেও, তাঁদের নিয়েই তিনি খুশি থেকেছেন। তিনি নিজেই বলতেন : খৃষ্টান পাদরীরা যেমন জনতার হাজার হাজার বর্গমাইলের দিকে তাকিয়ে বাইবেল বিতরণ করেন শ্রেষ্ঠ কাব্য সে-রকম ভাবে বিতরিত হবার জিনিস নয়।—

কথাটি অবশ্য তাঁর নিজের কবিতা সম্বন্ধেই তিনি বলেন নি। রাজনীতির জগঝম্প তাঁর কানের কাছে বাজিয়ে বাজিয়ে তাঁকে এতো বিব্রত করা হয়েছিলো যে সম্প্রতি তাঁর কবিতায় তার ছাপ এসে পড়ছিলো। কিন্তু যতোদূর জানি তা তাঁর কাব্যধারাকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। সেদিন পশ্চিমবাংলা কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তকে সম্মানিত করেছে—তাঁরো এহেন

সম্মানের প্রত্যাশা আমরা করছিলাম।* মনে পড়ে বুদ্ধদেববাবু একদা বলেছিলেন যে সাম্প্রতিক কালের কবিযশঃলিপ্সুরা জীবনানন্দের আশ্চর্য রকম অনুকরণ করেন। এতো অনুকারক আর কোনো আধুনিক কবির ভাগ্যে ঘটে নি। কথাটা অতি সত্য। সাম্প্রতিক কালের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দকে অনুকরণের প্রাবল্য খুবই বেশি। সেই কারণ যতো তাঁর দান গ্রহণ করে আমরা নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছি— ততোই তাঁকে আড়ালে রেখেছি—পাছে নিজেকে প্রতিষ্ঠায় বাধা ঘটে। আর তাঁকে অস্বীকার করেছেন সংস্কারবদ্ধ সমালোচকেরা।

তবু 'জীবনানন্দ দাশ' স্বনামখ্যাত হয়ে রইবেন। তাঁরই কথায় বলি ঃ সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি। তিনি তাদের একজন। অসাধারণ একজন।

আজ তাঁর এই কবিতাটি আমার বিশেষভাবে মনে পড়ছে ঃ

কোনোদিন নগরীর শীতের প্রথম কুয়াশায়
কোনোদিন হেমন্তের শালিখের রঙে ম্লান মাঠে
হয়তো বা চৈত্রের বাতাসে
চিন্তার সংবেগ এসে মানুষের প্রাণে হাত রাখে,
তাহাকে থামায়ে রাখে।
সে চিন্তার প্রাণ
সাম্রাজ্যের উত্থানের পতনের বিবর্ণ সন্তান
হয়েও যা কিছু শুভ্র রয়ে গেছে আজ—
সেই সোম-সুপর্ণের থেকে এই সূর্যের আকাশে—
সেই রকম জীবনের উত্তরাধিকার নিয়ে আসে।
কোথায়ও রৌদ্রের নাম—
অন্নের নারীর নাম ভালো করে বুঝে নিতে গেলে
নিয়মের নিগড়ের হাত এসে কেঁদে
মানুষকে যে আবেগে যতদিন বেঁধে
রেখে দেয়,
যতদিন আকাশকে জীবনের নীল মরুভূমি মনে হয়,
যতদিন শূন্যতায় ষোলো কলা পূর্ণ হয়ে—তবে
বন্দরে সৌধের ঊর্ধ্বে চাঁদের পরিধি মনে হবে—
ততদিন পৃথিবীর কবি আমি—অকবির অবলেশ আমি
ভয় পেয়ে দেখি—সূর্য ওঠে;
ভয় পেয়ে দেখি—অস্তগামী।
যে সমাজ নেই তবু রয়ে গেছে যেখানে কায়েমী
মরুকে নদীর মত মনে ভেবে অনুপম সাঁকো
আজীবন গড়ে তবু আমাদের প্রাণে
প্রীতি নেই—প্রেম আসে না'ক।
কোথায়ও নিয়তি-হীন নিত্য নরনারীদের খুঁজে
ইতিহাস হয়তো ক্রান্তির শব্দ শোনে ; পিছে টানে ;
অনন্ত গণনাকাল সৃষ্টি ক'রে চলে ;

কেবলই ব্যক্তির মৃত্যু গণনা-বিহীন হয়ে পড়ে থাকে জেনে নিয়ে—তবে
তাহাদের দলে ভিড়ে কিছু নেই—তবু
সেই মহাবাহিনীর মতো হতে হবে?
সংকল্পের সকল সময়
শূন্য মনে হয়।
তবুও তো ভোর আসে—হঠাৎ উৎসের মতো, আন্তরিক ভাবে,
জীবনধারণ ছেপে নয়,—তবু
জীবনের মতন প্রভাবে,
মরুর বালির চেয়ে মিল মনে হয়
বালিছুট সূর্যের বিস্ময়।
মহীয়ান কিছু এই শতাব্দীতে আছে—আরো এসে যেতে পারে ঃ
মহান সাগর নগর গ্রাম নিরুপম নদী,
যদিও কাহারো প্রাণে আজ রাতে স্বাভাবিক মানুষের মতো ঘুম নেই,
তবু এই দ্বীপ, দেশ, ভয়, অভিসন্ধানের অন্ধকারে ঘুরে
সসাগরা পৃথিবীর আজ এই মরণের কালিমাকে ক্ষমা করা যাবে ;
অনুভব করা যাবে স্মরণের পথ ধরে চলে ঃ
কাজ ক'রে ভুল হ'লে, রক্ত হ'লে মানুষের অপরাধ ম্যামথের নয়
কত শত রূপান্তর ভেঙে জয়-জয়ন্তীর সূর্য পেতে হলে।
[ঢাকাতে জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুতে শোকসভায় পঠিত]

।। ১, প্রবন্ধে উদ্ধৃত এই পংক্তিটি কোন্ কবিতা থেকে নেওয়া লেখক তা বলেন নি ; পংক্তিটি যে সঠিক উদ্ধৃতি, তা-ও লেখক স্পষ্টত স্বীকার করেন নি, দেখা যাচ্ছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই রকম একটি অংশ 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'আদিম দেবতারা' কবিতায় রয়েছে ঃ

পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত —ব্যবহৃত হয়ে
ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
আগুন বাতাস জল ঃ আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল ;
'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শুয়োরের মাংস হয়ে যায়?'

২. সঠিক উদ্ধৃতিতে পংক্তিগুলো এমনি, 'হাওয়ার রাত' কবিতায় ঃ

মশারীটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মত,
....
এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার উপরে মশারী নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁসে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মত উড়ছে সে!

৩. যে কারণেই হোক, লেখক এখানে ভুল তথ্য পরিবেশন করেছেন ; জীবনানন্দ-র 'বনলতা সেন', সুধীন্দ্রনাথের 'সংবর্ত' যে-বছর নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র-সাহিত্য সম্মেলন কর্তৃক পুরস্কৃত হয়, তার আগের বছরেই উক্ত সংস্থা কর্তৃকই পুরস্কৃত হয়েছিলো।

সম্পাদক ঃ ময়ূখ

'আমি চলে যাবো'

ইন্দ্র মিত্র

ল্যান্সডাউন রোড আর রাসবিহারী এভিন্যুর মোড়ে গিয়ে সেদিন রাত্রে শুনলাম, খানিক আগেই ওখানে ট্রাম দুর্ঘটনায় গুরুতরভাবে আহত হয়েছেন জীবনানন্দ।

দুর্ঘটনার সঙ্গে সঙ্গেই অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলেন। খানিক বাদে আবার জ্ঞান ফিরে এসেছিলো। জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'আমি কোথায়?'

উপস্থিত এক ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'আপনি মাথা ঘুরে পড়ে গিয়েছিলেন, তাই...'

'ও। তাহলে আমি এখন বাড়ি যেতে পারি?'

'হ্যাঁ।'

বাড়ি যাবার জন্যে জীবনানন্দ উঠলেন। উঠেই পড়ে গেলেন। আবার জ্ঞান হারালেন। তারপর হাসপাতাল।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল। সামনের ঘরে এক ভদ্রলোক কাকে যেন টেলিফোনে জানাচ্ছেন, 'হ্যাঁ, জীবনানন্দ দাশ, ট্রাম দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন, ভালো আছেন।'

অবস্থা খুব ভালো ব'লে মনে হলো না। শুধু মনে হলো হাসপাতালের সামনের ঘরের সেই ভদ্রলোকের টেলিফোন—ভালো আছেন।

হাসপাতাল থেকে ফিরতি পথে বারবার আমার মনে হয়েছে, যে-শহরে উনি বহুকাল ছিলেন, যে-শহরকে উনি খুব ভালোবাসতেন—সেই বরিশালে থাকলে, আর যাই হোক, ট্রাম ওঁকে স্পর্শ করতে পারতো না।

বরিশাল ব্রজমোহন কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন জীবনানন্দ। আমি সেই কলেজের ছাত্র ছিলাম। কলেজের মস্ত দালানের পাশে মস্ত মাঠ, তার পাশে প্রকাণ্ড পুকুর একটা। কলেজের ক্লাশ সেরে পুকুরের পাড় দিয়ে হেঁটে বাড়ি যাচ্ছেন, একটি বিকেলের এই ছবিটুকু আমার এখনো স্পষ্ট মনে আছে।

বগুড়া আর কলেজপাড়ার মাঝামাঝি জায়গায় ছিলো জীবনানন্দের বাড়ি। বাড়ির এলাকার মধ্যেই একটি মেয়েদের ইস্কুল। একটি টিনের দুয়ার পেরিয়ে তবে বাড়ির প্রাঙ্গণে ঢুকতে হয়। এলাকার মধ্যে খানিকটা জমি সবুজ ঘাসে আচ্ছন্ন। একটা লেবুগাছ। সাদা সাধারণ গেঞ্জি পরে একাধিক দিন জীবনানন্দকে ঐ ঘাসের ওপর পায়চারি করতে দেখেছি।

নদী ছিলো বরিশালে। আর ঘাস, ধানক্ষেত, বেতের ফল, আম-জাম-নিম-অশত্থ-বট, মেঠো পথ, লাশকাটা ঘর, শসাফুল। বরিশালের সঙ্গে যাদের আত্মীয়তা নিবিড় তাদের কাছে বলা সম্ভবত বাহুল্য যে জীবনানন্দের কবিতায় এমন অনেক জায়গা আছে যা পড়লেই মনে হয় যেন বরিশালের প্রকৃতির প্রতিচ্ছবি। বরিশালের খড়-নাড়া, নদী, পোড়োজমি, মাঠের ফাটল, হেমন্তের হলুদ তৃণ, গাছ, পাখি—সবাই, সবাই যেন

জীবনানন্দর কাছে আপনজন আত্মার রহস্য উন্মোচিত করেছিলো। যেন বলেছিলো—তোমার মতো এত শক্তিমান আর কেউ আমাদের এমন করে ভালোবাসেনি। তুমি আমাদের প্রকাশ করো।

দুর্ঘটনার কিছুদিন আগে সন্ধ্যের পর ওঁর বাড়ি গিয়েছি। দেখি শুয়ে আছেন। সাধারণত এ সময়ে উনি বেড়াতে বেরোন। বললাম, 'আজ বেরোলেন না?'

উঠে বসলেন। নিজস্ব ভঙ্গিতে একটু হাসলেন। বললেন, 'না।'

তারপর বাঁ হাত দিয়ে নিজেই কিছুক্ষণ ডান হাতে নিজের নাড়ী পরীক্ষা করলেন। বললেন, 'জ্বর হয়েছে।'

নাড়ী পরীক্ষা শেষ ক'রে কপালে হাত দিলেন।—'হ্যাঁ, জ্বর হয়েছে।'

আমি কপালে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বর অতি সামান্য। জিজ্ঞেস করলাম, 'হাতে-পায়ে কি খুব ব্যথা।

'হ্যাঁ, খুব ব্যথা। কাল রাতে ঘুমোতে পারিনি, বুঝলে?'

বললাম, 'ও কিছু না। ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। ও আজকাল সকলেরই হচ্ছে।' মনে হ'লো যেন একটু ভাবিত হলেন।

'সকলেরই হচ্ছে? তোমার হয়েছে ?'

'হ্যাঁ।'

'কী করে সারলো?'

'ও কিছু না। জ্বর-জ্বর হবার পরেই ইনফ্লুয়েঞ্জা ট্যাবলেট খেয়েছি, সেরে গেছে।'

'তাহলে আমিও কি এ ট্যাবলেট খাবো?'

'না, কিছু খেতে হবে না।'

'কিছু খেতে হবে না?'—জীবনানন্দ খাট ছেড়ে জানালার কাছে গেলেন। তাক থেকে একটা ওষুধভর্তি শিশি এনে বললেন, 'ডাক্তার আমাকে এই ওষুধ খেতে দিয়েছে।'

'কেবল জ্বর হয়েছে, এর মধ্যেই ডাক্তার দেখিয়ে ফেলেছেন?' আমি অবাক হ'য়ে বললাম, 'আজকাল কেউ এরকম জ্বর হলেই ডাক্তারের কাছে যায় না। বড়ো জোর এক শিশি এলকাসাইট্রন কিনে নিয়ে আসে।'

'ওটা খুব ভালো ওষুধ বুঝি? ও খেলেই জ্বর সেরে যায় নাকি?'

আমি তখন আমার জ্ঞান ভাণ্ডার উজাড় ক'রে জ্বর এবং ওষুধ সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলাম!

কী খেয়াল হলো কে জানে, জীবনানন্দ শিশির ছিপি খুলে ওষুধের গন্ধ শুঁকলেন। বললেন, 'দারুচিনির গন্ধ।'

তারপর পথ্যের প্রসঙ্গ। 'আজ রাতে কী খাবো?'

আমি বললাম, 'রুটি খান।'

'ঠিক।'—জীবনানন্দ ডান হাতের তর্জনী উঁচু ক'রে বললেন, 'ঠিক। ডাক্তারও আমাকে রুটি খেতে বলেছেন।'

হেসে উঠলেন। নিজস্ব হাসি। অকস্মাৎ তিনি হেসে উঠতেন প্রচণ্ড শব্দে, অকস্মাৎ তিনি হাসি থামাতেন। কখনো হাসির আগে, কখনো হাসির পরে নিচের ঠোঁট কামড়ে থাকতেন। যেন দুরন্ত হাস্যস্রোতকে ঠোঁটের ওপারে বন্দী ক'রে ফেলতেন। বাধা ভেঙে হাসি যখন বেরিয়ে আসতো, মনে হতো কী বিশাল আনন্দ ঐ হাসির মধ্যে প্রচ্ছন্ন হ'য়ে আছে!

কথায় কথায় জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ "ঝরা পালক"-এর প্রচ্ছদপট নিয়ে কথা উঠলো। জীবনানন্দ বললেন, 'ও বই তো বহুকাল আগে বেরিয়ে ছিলো। তুমি দেখেছো?'

'দেখেছি। কয়েকটি পালক ঝরে পড়ছে, এমনি একখানা ছোট ছবি ছিলো মলাটে।'

জীবনানন্দ বললেন, 'প্রথম ও-বইয়ের জন্যে একখানা ছবি এঁকে দিয়েছিলেন 'কল্লোলের' দীনেশরঞ্জন। মস্ত একটা পালক আঁকা ছিলো সেই ছবিতে।'

আমি বললাম, 'সেই ছবিটা কী হলো?'

'সে-ছবিটা আমার ভালো লাগেনি। আমি নিইনি। দীনেশরঞ্জন বোধহয় একটু ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন, কিন্তু যা আমার ভালো লাগেনি তা আমি কেমন করে নিই?'

ঠিক কথা। এই জীবনানন্দের চরিত্র। যা ভালো লাগে না, সর্বাবস্থায়ই সে-বস্তু তাঁর গ্রহণের অযোগ্য।

আরেক কথা বলেছিলাম "ধূসর পাণ্ডুলিপি" নিয়ে। বললাম, "ধূসর পাণ্ডুলিপি"তে লিখেছেন 'জীবনানন্দ দাশ প্রণীত।'

'ওর জন্যে আমাকে কিছু বলতে পারো না। ঐ বইয়ের প্রুফ আগাগোড়া বুদ্ধদেব বসুর দেখা। 'প্রণীত' আমি লিখিনি, সব বুদ্ধদেবের করা।' একটু বাদে নিজের মনেই বললেন, 'বুদ্ধদেব বসু আমার জন্য অনেক কিছুই করেছেন।'

আরেকটি সন্ধ্যার কথা মনে আছে। এক হাতে একটা ব্যাগ ঝুলিয়ে সুবোধদা ঘরে ঢুকলেন। বসলেন। ব্যাগটা দেখিয়ে জীবনানন্দ জিগ্যেস করলেন, 'ওর মধ্যে কী আছে?'

সুবোধদা বললেন, 'বিস্কুট। ক্রিম-ক্র্যাকার বিস্কুট।'

যেন আপন মনেই বললেন, 'বিস্কুট, বিস্কুট....'

হেসে উঠলেন। কোন কথায় যে কখন উনি কেন হাসেন, কে জানে।

সে সন্ধ্যাটি বোধ হয় খাদ্য-প্রসঙ্গেই অতিবাহিত হয়েছিলো। নানা আইটেমের পর উঠলো ঢেকি শাকের কথা।

জীবনানন্দ বললেন, 'কলকাতার বাজারে কি ঢেকির শাক পাওয়া যায়?'

আরেকদিন। সে-দিন ঈশ্বর নিয়ে কথা। গদ্য নয়, সাহিত্য নয়, রোগ নয়, ঈশ্বর।

আমি বললাম, 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি।'

জীবনানন্দ একেবারে উল্টো কথা বললেন, 'আমি ঈশ্বরে বিশ্বাস করি না। আমি মানুষের নীতিবোধে বিশ্বাস করি।'

তাঁর মুখে আমি শেষ কথা শুনেছি হাসপাতালে। আপিস থেকে ফিরতি পথে সরাসরি দেখতে গিয়েছি, সেদিন আস্তে আস্তে বললেন, 'কী খবর?'

একটি কথাও মুখ ফুটে বলতে পারিনি।

তারপর...

শনিবারের এক সকালে তাকালাম তাঁর ঘুমন্ত মুখের দিকে। শুয়ে আছেন নিচের ঠোঁট কামড়ে। যেন দুরন্ত হাস্যস্রোতকে ঠোঁটের ওপারে বন্দী ক'রে রেখেছেন। হয়তো খানিক আগেই সেই নিজস্ব হাসি হেসেছেন। নাকি একটু পরেই হেসে উঠবেন প্রচণ্ড শব্দে?

না। কান্না। যেদিকে তাকাও—কান্না।

শ্মশানের পথে পড়লো সেই জায়গাটা, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিলো। ট্রাম-লাইনের সেই জায়গা জুড়ে সবুজ ঘাস—যে-ঘাসের প্রতি তাঁর ভালবাসা প্রগাঢ়, প্রকাণ্ড।

আর, মৃত্যু হলো কখন, কোন তারিখ?

রাত্রি ১১টা ৩৫ মিনিট। ৫ই কার্তিক।

যে-কার্তিকের রাত্রির প্রতি গভীর মমতা তিনি নিজেই প্রাণের ভাষায় উজ্জ্বল করে রেখে গেছেন সেই কার্তিকের রাত্রির বুকেই বিদ্ধ হ'য়ে রইলো তাঁর অবিস্মরণীয় শেষ নিশ্বাস।

'ওঁরা যখন থাকবেন না, আমিও থাকব না...'

ভূমেন্দ্র গুহ

পাঁচের দশকে 'ময়ূখ'-নামে একটি দ্বিমাসিক কবিতার কাগজ বেরোত। কাগজটি যাঁদের হাতে ১৯৫২-তে প্রথম বেরোয়, তাঁদের অধিকাংশ ডাক্তারির ছাত্র ছিলেন ; এঁদের অনেকের আগ্রহ অল্প কয়েক মাসের ভিতরেই স্বাভাবিক কারণে মরে যায় ; এবং শেষ পর্যন্ত কাগজটি যাঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে, তাঁরাও কেউ সাহিত্যের লোক ছিলেন না, এবং সৌভাগ্যবশত হয়ে উঠতেও পারেন নি। ফলত যা হবার তা হয়েছিল, কাগজটি কোনো বিশেষ গুণপনার দাবিদার হয়ে উঠতেও পারে নি ; জীবনানন্দ দাশের মৃত্যুর পর জীবনানন্দ-স্মৃতি ময়ূখ নামে বিশেষ সংখ্যাটি যদি না বেরোত, তা হলে কাগজটিকে নির্বিশেষ ভুলে যেতে বাংলা কবিতা-পাঠকের কোনোই অসুবিধে হত না।

তা হলেও, এই পত্রিকাটির মধ্যস্থতায় 'ময়ূখ' কাগজ যাঁরা ঘটিয়ে তুলেছিলেন, সেই তৎকালীন একটি নব্যযুবাগোষ্ঠীর সদস্যদের সঙ্গে জীবনানন্দর সাক্ষাৎ-পরিচয় হয়েছিল ; সেই যুবাগোষ্ঠীর আমিও অন্তর্ভুক্ত ছিলুম। জীবিত জীবনানন্দর সঙ্গে এই পরিচয় দুবছরের। তিনি বাইশে অক্টোবর ১৯৫৪-তে পরলোকগত হন।

'ময়ূখ'-এর আমরা চক্রবেড়ে রোডের একটা মেয়ে-ইস্কুলের চিলেকুঠিতে ভূতে-পাওয়া ঘরে আস্তানা গেড়েছিলুম, কেননা ইস্কুল-কর্তৃপক্ষ মনে করেছিলেন যে, তাঁদের শিক্ষক-কর্মচারী সমর চক্রবর্তীর বাউণ্ডুলে বন্ধুদের যদি ওই চিলেকোঠাঘরে থাকতে অনুমতি দেওয়া হয়, তা হলে এক ঢিলে দুটো পাখি মারা যাবে : রাতের বেলা গলায় ফাঁস লাগিয়ে আত্মঘাতী মেয়েটির বাড়িময় একা-একা ঘুরে-ঘুরে নানা সুরের শোককান্না যেমন শাসিত হতে পারবে, তেমনি অনিচ্ছুক ভীতু দারোয়ান ব্যতিরেকেই বাড়িটার পরোক্ষ পাহারার কাজটাও চলতে পারবে। অপরপক্ষে, চিলেকোঠার যাঁরা বাসিন্দা হয়েছিলেন, তাঁদের স্বার্থসিদ্ধির ব্যাপারটা সহজেই অনুধাবনযোগ্য : পাশেই জগন্নাথ ওড়িয়া-ঠাকুরের হোটেল, সেখানে মেঝেতে পাত পেড়ে সামান্য খরচে ফুরনে খাওয়া যেত, এবং খাওয়া শেষে লেখক দাদাবাবুদের সম্মান-দক্ষিণা হিসেবে ফাউ একটি করে গুণ্ডি-দেওয়া পান এবং কখনো-সখনো ঝিম ধরাবার বিখ্যাত বায়বীয় পদার্থ কলকেফুলের আকারের কাপড়-জড়ানো মৃৎপাত্রে বিনামূল্যে পরিবেশিত হত।

এই আস্তানার বাসিন্দারা সকলেই বেকার বা প্রায়-বেকার। যাঁরা ছাত্র তাঁরা জানতেন, ভালো ছাত্র হয়ে ওঠার ব্যাপারটা তাঁদের ধাতের অনুকূল নয়। প্রত্যেকেই যথেষ্ট ঘরকুনো, সিনেমা দেখতে যেতেও আলস্য, 'পথের পাঁচালী' প্রথম ধাক্কায় দেখাই হল না ; 'ময়ূখ' পত্রিকাটা আছে বলেই না লেখা, এ-রকম ভাব, এবং লেখা জিনিসটাও যে কোথাও যাচ্ছে না, সে বিষয়েও বিশেষ তাপ-উত্তাপ ছিল না ; কলকাতায় তখন যে একটা নতুন কবিতা-

আন্দোলন বেশ পেকে উঠতে যাচ্ছিল, তার পক্ষে-বিপক্ষেও এই যুবকদের করণীয় কিছু ছিল না ; জীবনযাত্রাপ্রণালীতে ঔজ্জ্বল্য সংযোজিত করার প্রতিভাশালী রকম-সকম তাঁদের ধারণাতেই হয়তো ছিল না। কাগজ তো দুমাসের পরিবর্তে চার-ছ মাসে বেরোত ; এই প্রয়োজনের বিধানে এবং কলেজের ও ওড়িয়া-হোটেলের খরচ মেটাতে সবাইকেই কোনো-না-কোনো উঞ্ছবৃত্তির পরিপোষকতার জন্য সময়াতিপাত করতেই হত, তবু, তার পরেও, অপব্যয়ে ফুরোবার মতো অনেক সময় হাতে থাকত। সেই সময়টা অবশ্যই আড্ডার সময়, এবং আড্ডাটাকে যথেষ্ট আঠালোও হয়ে উঠতে হত, নইলে পাঁচ-ছয় বছর, কোনো রকম উদ্‌বেলিত উচ্চকিত জীবনযাপনে না গিয়েও তো এই সাধারণ মাপের যুবাদের গোষ্ঠীটি একরকম সুষম সমবায়ে থেকে গিয়েছিল।

ছাতের দিকে চোখ তুললেই চোখে-চোখে তাকাত সেই চিলেকোঠার ছাতের আংটা-জড়ানো কোনো একটি আত্মঘাতী মেয়ের গলার ফাঁসের পাকানো শাড়ির ভগ্নাংশটি, যেটি পুলিশ শবদেহের সঙ্গে নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল। স্নেহাকর বলত, ওটি থাকবেই, নইলে ঘরটির চরিত্রই মার খাবে ; হয়তো একদিন মেয়েটি ওই শাড়ির টুকরোটির মায়াতেই আমাদের কাছে চলে আসবে, মানুষ মায়াবদ্ধ জীব তো ; এই মায়াটুকুই তার সমাজসচেতনতা, সময়ানুবর্তিতা এবং জীবন-ও-মৃত্যু-অনুভাবনাও বটে। এই উৎকৃষ্ট মায়ার অনুধ্যান সন্ধান ও বাস্তবায়নের জন্যই তো তার নানা রকম ছোটো-বড়ো আত্মত্যাগ কষ্টসহিষ্ণুতা প্রেমে-পড়া এমন কি বেঁচে-থাকতে-চাওয়ায় রক্তাক্ত হওয়া, নির্বিশেষ মরে-যাওয়া বা আত্মহনন। আমরা স্নেহাকরের সঙ্গে একমত হতুম, কেননা তখনই স্নেহাকরের ফুসফুসে যক্ষ্মা হয়েছিল বা হব-হব করছিল। আর সে-যুগে যক্ষ্মা রোগের একটা ভয়াবহ রাজকীয়তা ছিল ঃ ডেকেছে, যেতে হবে।

আমার নিজের ডেন্ট-প্রকাশিত নীল মলাটের একখণ্ড ডিলান টমাস ছিল, স্নেহাকরকে দিয়েছিলুম। সুতরাং এর পরেই ডিলান টমাস এসে পড়তেন, যিনি জরায়ু-অন্তর্গত মাংসপিণ্ডের সঙ্গে কথা বলতে পারতেন, যিনি অকারণে মৃত্যুপরায়ণতার কথাও বলতে পারতেন। সঙ্গে-সঙ্গে অনিবার্যভাবে জীবনানন্দ এসে পড়তেন। আমরা মেডিকেল কলেজের লাশকাটা ঘরের কথা বলাবলি করতুম। স্নেহাকর লাশকাটা ঘর দেখবার বায়না ধরত ; আমি বলতে পারতুম না, চিকিৎসা-বিজ্ঞান জীবনবাহনের বিজ্ঞান যদিও, উদ্‌বোধন তার লাশকাটা ঘরে। আমরা জীবনানন্দর জীবনসংলগ্নতা বুঝে নিয়ে উৎফুল্ল হয়ে উঠতুম।

আমাদের যে তাঁর অনেকানেক কবিতা মুখস্থ করে ফেলতে হত তা নয় ; বেশ যে উত্তম শৈলীতে আবৃত্তি করতে হত, তাও নয় ; একটি-দুটি কবিতা নিয়েই সারা-রাত সারা-দিন—হয়তো সাতদিন—কাটিয়ে দেওয়া যেত। আশাবোধ যেমন নিরাশাবোধও তেমনি সমান ভাবেই জীবনমনস্ক মানুষের মস্তিষ্কপ্রণোদিত—সমাজ-সংসার-অচেতনতা নির্বিশেষ বেঁচে-থাকার এবং তার জন্য আরোপিত উদ্দীপনের শর্ত—এ-রকম ধারণা ক্রমাগত গাঢ় হয়ে উঠতে-উঠতেই জীবনানন্দর শরীর থেকে 'নির্জনতম কবি'র পোশাকটা আমরা স্বতঃ খসে পড়তে দেখলুম। সঙ্গে-সঙ্গে এই সহমত গড়ে উঠল যে আমরা আমাদের প্রবীণ কবিদের কাছে 'ময়ূখ'-এর জন্য ভিক্ষে করতে যাব না ঠিকই, কিন্তু জীবনানন্দর নিকট না গিয়ে চলবে না। 'ময়ূখ'-এর যুবারা জীবনানন্দ ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছাড়া আর কোনো অভিভাবক কবির কাছে সরাসরি লেখা চাইতে যান নি।

ল্যান্সডাউন রোডে জীবনানন্দর বাড়ির হদিশ জানা ছিল, আমাদের আস্তানাটাও প্রায়-দক্ষিণ কলকাতায়, সুতরাং সহজেই যে-কোনো ছুটির দিনের সকালে বা বিকেলেই লেখা চাইতে চলে যাওয়া চলে। কিন্তু কারোর পক্ষে একা-একা চলে যাওয়া প্রায় অসম্ভব ; আমরা সকলেই গাঁয়ের ছেলে—এবং পূর্ববঙ্গের গাঁয়ের ছেলে—আমাদের বাল্যাবধি পইপই করে বলা হয়েছে যে, ভয়সংকুল পথে-ঘাটে দল বেঁধে চলাই উচিত। সুতরাং স্নেহাকর সমর আমি এবং কদাচিৎ জগদিন্দ্র দল বেঁধে জীবনানন্দর বাড়ির সামনের রাস্তার ফুটপাথে কয়েক কিস্তিতে এ-মাথা ও-মাথা ঘোরাঘুরি করলুম, 'ময়ূখ'-এর কয়েকটি সংখ্যা হাতে নিয়ে, কিন্তু গন্তব্যে শেষ পর্যন্ত পৌঁছুনো গেল না; প্রমাণ হল, দলে ভারী হওয়ার অর্থই সম্মিলিত ভয়ে ভারী হয়ে থাকা, যা প্রায় অলঙ্ঘ্য।

এই ঘোরাঘুরির সময়ে কখনো-কখনো লক্ষ করেছি যে একজন ছোটোখাটো চেহারার মাঝারি মাপের ভদ্রমহিলা, চোখে পুরু চশমা, ব্যক্তিত্বদীপ্ত পোশাকে-আশাকে সুরুচিশোভন, বাঁ দিকে ঘাড় একটু কাৎ ক'রে হাঁটেন, সোজা এসে সাবলীল জীবনানন্দর বাড়ি ঢুকে যান, এবং জীবনানন্দও, সুস্বাস্থ্যবান, তত লম্বা নন, দৃঢ় এবং স্নেহশীল, তাঁকে ফিরবার সময় গেট পর্যন্ত পৌঁছে দেন, কখনো-বা সঙ্গে ক'রে একটু এগিয়েও দেন। আমরা ভাবতুম, মহিলাকে জীবনানন্দ বিষয়ে পাকড়াও করলে কেমন হয়।

মহিলাটি নিজেই একদিন আমাদের আবিষ্কার করলেন। বললেন, আপনারা এখানে মাঝে-মধ্যে ঘোরাঘুরি করতে থাকেন, দেখেছি, কী ব্যাপার বলুন তো!

আমরা প্রায় ঐকতানে বলে উঠেছিলুম, জীবনানন্দর সঙ্গে দেখা করব, ভাবি, কিন্তু পেরে উঠি না।

উনি বললেন, নিশ্চয়ই কোনো কবিতার কাগজ করেন?

'ময়ূখ'। আপনি হয়তো জানেন না। আমরা 'ময়ূখ'-এর সঙ্গে আছি।

'ময়ূখ' আমি দেখেছি। আপনারা দাদার কবিতা চান তো? আসুন।

যা কী ভাবে ঘটে উঠবে, আকাশ-পাতাল চিরুনি চালিয়েও নির্ধারণ করা যায় নি, তাই শেষ পর্যন্ত ঘটল। সুচরিতা দাশ, জীবনানন্দর ছোটো বোন, আমাদের সঙ্গে ক'রে নিয়ে গিয়ে জীবনানন্দর সঙ্গে আলাপ করালেন ; একেবারে ঘরের ভিতরে ঢোকা গেল না যদিও, জীবনানন্দ বাইরে এসে আমাদের সঙ্গে আলাপ করলেন ; আমরা কে কী করি জানতে চাইলেন না ; 'ময়ূখ' হাতে নিলেন ; এবং জানালেন যে এত সমীহ-সংকোচ করার তো কিছু ছিল না ; এখন হাতে লেখা নেই, লেখা হলেই কোনো এক দিন দেবেন।

আমরা নিদারুণ সংকুচিতভাবে নিবেদন করলুম, আমাদের কাগজটা যদি প'ড়ে দেখেন, পরে একদিন বলেন, কেমন লাগল।

এক ফর্মার তো কাগজ, তিনি তাড়াতাড়ি উলটে দেখে বললেন, আপনারা বুঝি অগ্রজ কবিদের কবিতা পছন্দ করেন না?

আমরা অসহায় নিরুপায়ের মতো বললুম, তা কেন, আপনার লেখার জন্য দাবি জানাতে এত দিন ঘোরাঘুরি করছি, দিদি এগিয়ে না দিলে তো আপনার কাছে পৌঁছুতেই আরও কত দিন লেগে যেত।

তিনি খুব উদারভাবে হেসেছিলেন, মনে আছে। তাঁকে তাঁর বরিশালের কলেজের ছাত্ররাও বেশ ভয়মিশ্রিত শ্রদ্ধা বা অশ্রদ্ধা করত, নানা গল্পে শুনেছি ; সেই ভয়সংঘটিত

দূরত্বটি কি তিনি এমনই উপভোগ করতেন ; অথবা ভয়টা দ্বিপাক্ষিক? কেননা, এর পরই তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর একতলার ঘরে ঢুকে গেলেন। খুব কি বেশি গোলমেলা হয়ে পড়েছিলেন?

খুব সহজেই সুচরিতা আমাদের দিদি হয়ে গেলেন।

এবং কালক্রমে আমার সঙ্গে তাঁর সম্পর্কটা খুব নিকট হয়ে উঠল।

জীবনানন্দর বাড়িতে আমি কোনোদিন চা খেয়েছি, মনে করতে পারি না। জীবনানন্দর স্ত্রীকে দেখেছি, ব্যস্ত মানুষ, দেখা হতেই সামনে থেকে সরে গেছেন ; তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দর মৃত্যুর আগে কোনো দিন কথা বলা হয়নি। মেয়ে মঞ্জুশ্রী আমার বয়সী বা আমার চাইতে সামান্য বড়ো, পরে কথঞ্চিৎ মৃদু আলাপ-পরিচয় হলেও, সে-পর্যায়ে, দেখা হলে পারস্পরিক সামান্য হাসিবিনিময়ের চেয়ে বেশি কথাবার্তা তাঁর সঙ্গেও আমার হয় নি। ছেলে রঞ্জু নিজের মনে একা ; তাঁর চলায়-ফেরায়, হঠাৎ ক'রে ঘরে ঢুকে হঠাৎ বেরিয়ে যাওয়ায়, হঠাৎ বাবার বা পিসির কাছে এসে কথা বলতে শুরু ক'রে কথা শেষ না করতে পারায় বোঝা যেত যে, তাঁর কৈশোর-যৌবন-গ্রন্থি-সমাবৃত পৃথিবীতে কোথাও একটা অচিরাচরিত গিঁট পড়ে গেছে, তাঁর মানিয়ে নিতে কষ্ট হচ্ছে।

দিদি চাইতেন না, আমি এইসব একান্ত ব্যক্তিগততায় সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ি। বলতেন, চলো, আমরা কোথাও চা খেয়ে নেব। তিনি সাহেবপাড়ার ট্রিংকা-তে চা খেতে ভালোবাসতেন।

আস্তে-আস্তে এমনি দাঁড়াল যে, বেশির ভাগ সময়ে, যখন ইস্কুল-কলেজে কোনো-না-কোনো ছুতোয় ছুটি চলত, তখন দিদির সঙ্গে আগে থেকেই যোগাযোগ ক'রে নিয়ে তাঁর সঙ্গে জীবনানন্দর কাছে যেতুম। 'খুকি'র সঙ্গে এসেছি বলে হয়তো নিজেকে তিনি একটু বেশি খুলে দিতে পারতেন, একটু বেশি আশ্বস্ত মনে হত তাঁকে, এবং তিনি সহসা এত সহজে কথা বলতে পারতেন যে সে-রকমটা অন্যান্য সময়ে কেন যে হত না, ভেবে আশ্চর্য হতে হত। স্বভাবতই এমন কথা বলতেন না, যাতে তাঁর পারিবারিক পরিপার্শ্বের ছায়া পড়ে ; দিদিকে—এবং মঞ্জুকে—যে অত্যন্তই পছন্দ করতেন, বোঝা যেত, দিদির অবিবাহিত একাকিত্ব তাঁকে একাধারে পীড়া ও শান্তি দিত, মঞ্জুর পড়াশোনার বিষয়ে অস্বস্তির আবছা আভাস কথাবার্তায় ধরা পড়ে যেত, তিনি তাঁর বিদ্যাচর্চায় সহায়ক-শিক্ষকের কথা ভাবতেন; কিন্তু জীবনসংগ্রামে সর্বাংশে বিজয়ীই বলতে হবে যে-অনুজ—অশোকানন্দ দাশ—তাঁর কথা তিনি কখনো উল্লেখ করেছেন, মনে পড়ে না। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পরে জেনেছি, অশোকানন্দও তাঁর বিশেষ পছন্দের মানুষ ছিলেন।

দিদির মধ্যবর্তিতাহীনতায় যখন স্নেহাকর আমি সমর চক্রবর্তীরা তাঁর কাছে কখনো-কখনো গিয়েছি, তখন যে-জীবনানন্দ এসে দরজায় দু-চৌকাঠে প্রসারিত হাত রেখে দাঁড়াতেন, তিনি প্রতিরোধপরায়ণ এবং অব্যবহিত পারিপার্শ্বিকের প্রতি কথঞ্চিৎ সন্দিহান। লেকে যখন বেড়াচ্ছেন, তখন হয়তো বুদ্ধদেব একই রকম বেড়াতে-বেড়াতে জীবনানন্দকে পিছন থেকে ডেকেছেন, তিনি শুনতে পেয়েছেন মনে হয় নি, দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেছেন। ততদিনে, কেন জানি না, কবিতা যাচ্ঞা করার ব্যাপারটা কেমন এক পাশে সরে গেছে।

আমরা বলতুম, আমাদের কাগজটা সম্বন্ধে কিছু বলবেন?

তিনি বলতেন, ভালোই তো। কিন্তু আপনারা প্রধানত কাকে সামনে রেখে এগোতে চান? আমাদের সময় তো নজরুল ছিলেন, সত্যেন দত্ত ছিলেন, হয়তো মোহিতলালও ছিলেন।

আমরা বলতুম, যে-কোনো কারণেই হোক, আপনার কবিতা আমাদের নিমগ্ন করে।

স্পষ্টত বোঝা যেত, তিনি একরকমভাবে আশ্বস্ত বোধ করছেন। কিঞ্চিৎ উদ্দীপ্তভাবে বলতেন, কারণটা একদিন জেনে ফেলবেন ; কিন্তু আপনারা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরের থেকে দেখবেন ; ওখানে একটু বেশি অগোছালো হয়ে পড়তে হয়েছিল। কিন্তু... 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আপনারা দেখেছেন কি? এখন আর পাওয়া যায় না।

এই প্রসঙ্গে আর কথা এগোত না। আমরা আমাদের মনের কথাটা তাড়াতাড়ি বলে ফেলতুম, আপনাকে বুদ্ধদেব ইস্তক সবাই প্রায়শই যে-ভাবে বোঝেন, আমরা সে-ভাবে বুঝতে পারি না ; মনুষ্যজীবনের ও তার ইতিহাসের দুটি প্রান্ত, আমাদের কেন যেন মনে হয়, আপনাকে ব্যস্ত করে।

এবার তাঁর অস্বস্তি প্রকাশিত হয়ে পড়ত। বলতেন, আরেক দিন আসবেন, কথা হবে। কিন্তু বড়ো অসুবিধেয় আছি, আমাকে মোটামুটি ভাড়ায় একটা বাসাবাড়ি দেখে দিন-না, এটা কিন্তু বাস্তবিক জরুরি।

আমরা বলতুম, আমরা নিজেরাই তো একটা ভুতুড়ে চিলেকোঠায় থাকি—

তিনি বিস্মিত হবার মতো গলায় বলতেন, সে কী রকম! আচ্ছা, আরেক দিন হবে। আজ হাতে একটু কাজ আছে।

তখন জীবনানন্দর সময়টা ভালো যাচ্ছিল না। সজনীকান্ত তো তাঁর নিজের মতো করে পিছনে লেগে ছিলেনই, বুদ্ধদেবও তাঁকে আর আগের মতো নিতে পারছিলেন না, কেননা তাঁকে আর 'নির্জনতম কবি' 'প্রকৃতির কবি' ইত্যাদি অভিধায় তেমন সহজে ধরাতে পারা যাচ্ছিল না ; কবিতাকে আয়ুধের মতো ব্যবহার ক'রে যাঁরা সমাজের আমূল পরিবর্তনে বদ্ধপরিকর, সেই 'প্রগতিশীলরা'ও তাঁকে পলায়নপর সমাজসংসারবিমুখ পরাজয়পরায়ণ বলে স্থিরনিশ্চয় শনাক্তকরণ সমাধা করেছিলেন, এবং পলায়নপরদের পিছনে, কে-না জানে, বীরপুরুষরা তো বটেই বালখিল্যরাও হৈ-হৈ করে তাড়া করে ফেরে। কিন্তু 'ময়ূখ'-এর অল্পশিক্ষিত বাতিল যুবাদের দীর্ঘায়ত আড্ডাগুলির ফলশ্রুতিতে এমন একটা সিদ্ধান্ত সাব্যস্ত হয়েছিল যে, জীবনানন্দ তাঁর লেখায় চিন্তায় সর্বাধিক সমাজসংসার দ্বারা যন্ত্রণাবিদ্ধ, ইতিহাসপুরুষের স্বেচ্ছাচারে উৎপীড়িত, জীবনধারণপ্রক্রিয়া নিবন্ধন ব্যতিব্যস্ত ; এবং তাঁর নিদ্রা প্রেম মৃত্যুচিন্তা জীবনসংলগ্ন থাকার সনির্বন্ধ প্রয়াসেরই নিজস্ব মুকুরপ্রক্ষিপ্ত আলোয় কালোয় মেশানো ছবি। সুতরাং স্থির করা হল যে, এই সমস্ত উপলব্ধি প্রতিবাদের আকারে লিপিবদ্ধ ক'রে 'ময়ূখ'-এ প্রকাশ করা হবে। অনেক মুসাবিদা মার্জনা-পরিমার্জনার পরে লেখাটা তৈরি হল। এবং এও ভাবা হল যে, জীবনানন্দকে একবার লেখাটার সংক্ষিপ্তসার দেখিয়ে নিলে হয়, কেননা তাঁর সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের মূল্যায়নে তাঁর অভিমতটা যদি জানা যায়, তা হলে লেখাটার সুষম অবয়ব তৈরিতে একপ্রকার সাহায্য হবে।

দল বেঁধে লেখাটা নিয়ে এর পর আমরা যে-দিন তাঁর বাড়িতে গেলুম, সে-দিন দিদিও

আমাদের সঙ্গে ছিলেন; দিদিকে বেশ উদ্দীপ্ত মনে হয়েছিল। সেদিন আমরা ঘরে ঢুকতে পেয়েছিলুম, কেউ-কেউ এমন-কি তাঁর তক্তপোশে বসতেও পেয়েছিলুম।

তিনি আমাদের কথঞ্চিৎ উত্তেজিত, যদিও বিনীত, নিবেদন শুনলেন। তারপর বেশ নিভন্ত কণ্ঠস্বরে বললেন, এ-সব ছেপে কী হবে? ওঁরা যখন থাকবেন না, আমিও থাকব না, এবং আপনারাও নির্ঘাৎ বুড়ো হয়ে পড়বেন, তখন হয়তো ব্যাপারটার এক রকমের যাথার্থ্য নির্ণীত হবে, হয়তো হবে না। এ-সব ছেপে কিছু হয় না। ছাপাবেন না। এ-রকম অসহিষ্ণুতা আমাকেও কখনো-কখনো পেয়ে বসতে চাইত!

এর পর কোনো কথা চলে না। আবহাওয়াটাও বেশ অস্বাচ্ছন্দ্যকর হয়ে পড়ল, আমরা একে-একে বেরিয়ে এলুম। শুধু দিদিই রয়ে গেলেন। স্নেহাকর সব চাইতে উদ্যোগী ছিল, তাকে বিমর্ষ দেখাতে লাগল, আমরা আমাদের আস্তানায় ফিরে সব চুপচাপ হয়ে গেলুম।

এই লেখাটাই বড়োসড়ো করে স্নেহাকর জীবনানন্দ-স্মৃতি ময়ূখ-এ পেশ করেছিল, তার ঘোষণাটা ছিল এই রকম : জীবনানন্দর 'নির্জনতম কবি' শিরোপাটা যথেষ্টই পলকা, এবং বেশ অপমানকরও বটে।...'তাঁদের সামনে থেকে এই লক্ষ্যবিন্দুটি সরিয়ে নিলে যে অপার শূন্যতার হাহাকার উঠবে, তা কি কোনো দিন পূর্ণ হবে?...'

দিদিকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর কাছে হয়তো কোনোদিন দুপুরবেলা গিয়েছি, তিনি হাতের কাজ এইমাত্র শেষ করেছেন (জীবনানন্দ দুপুরবেলা ও বেশি রাত্তিরে লিখতেন, পড়তেন), তাই বেশ নির্ভার হয়ে আছেন, কথায়-কথায় বরিশালের কথা উঠে পড়ত। বলতেন, তোমার মত অরবিন্দও আমার কাছে সময় পেলেই হুটহাট চলে আসত, এমন নিষ্পাপ ভালো-লাগছে-জানান-দেওয়া কথাবার্তা বলত যে কী বলব, তার সঙ্গে আমার খুব বনত ; এখন খুব ভালো লিখছে ; তখন ডিম ফুটছিল ; তা ছাড়া শামসুদ্দীন ছিল, যেমন ঝকঝকে হাতের লেখা তেমন সে নিজে ও তার লেখা ; বেশ ছিল ; এই সেদিনও কলকাতাতে দেখা হত। আমি যখন জানাতুম, অরবিন্দ গুহ ও আবুল কলাম শামসুদ্দীন—দুজনকেই আমি নামে চিনতুম জানতুম, বরিশালের কলেজে-পড়া আমার কাকা-মামাদের পরিচয়ের সূত্রে, তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠতেন : তোমরা এখনকার কলকাতার ছেলেরা এখন বড়ো ব্যস্তবাগীশ হয়ে উঠেছ, খালি সমালোচনা-টোচনায় মজা পাও! তার পর বলতেন, তোমার মামা-কাকা যাঁদের কথা বলছ, তাঁরা তো ওদের সঙ্গে পড়তেন?

বলতুম, তাঁরা জে. ডি. বলতে ভয়ে কাঁপতেন, তাঁদের হয়তো আপনার নিকটবর্তী হবার গুণপনা ছিল না।

কেন, কেন, আমি তো তেমন কড়াধাতের মানুষ ছিলুম না!

আমি বলতুম, তাঁরা আপনাকে তাঁদের ছকে ধরতে পারতেন না।

দিদি এ-সব কথার মধ্যে ঢুকে পড়তেন, বলতেন, দাদা, তুমি তো কারুর সঙ্গে মিশতে-টিশতে না, একা থাকতে, সবার থেকে আলাদা থাকতে, সন্ধ্যেবেলা একা হেঁটে জাহাজঘাটা ধরে কোথায়-কোথায় চলে যেতে, ফিরতে রাত হয়ে যেত, বাড়ির সবাই প্রথম-প্রথম ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত।

উনি সেই সূত্র ধরে বলে উঠতেন, তুমি বরিশালের জাহাজঘাটা দেখেছ? আলেকান্দা হয়ে হেঁটেছ কখনো? কালীবাড়ি রোড?

বগুড়া রোড?

আমি ফিকে-হয়ে আসা স্মৃতি হাতড়ে বলতুম, কালীবাড়ি রোডে আমাদের একটা বাড়ি ছিল, কাঠের, দোতলা। ছুটি-ছাটায় বেড়াতে যেতুম, একবার কী একটা সিনেমা দেখেছিলুম, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে শেষমেশ গান করতে-করতে হাত ধরাধরি করে দূরে কোথায় চলে গেল, তখন সেই দূরে বেশ বড়ো করে সূর্য উঠছে।

তিনি বলতেন, হ্যাঁ, এ-রকম জোরাজুরি করে সূর্য ওঠাবার ব্যাপারটা আজকালকার সাহিত্যে-শিল্পেও আছে বটে, যেমন ছিল তখন।

আমি বরিশালের কথা টেনে এনে বলতুম, আমি 'সর্বানন্দ ভবন'-এর পাশ দিয়ে গিয়েছি, আমাদের কমলেশকাকা বলে এক কাকা ছিলেন, তিনি যেন দূরের পিরামিড দেখাচ্ছেন, এমনি অবাক আঙুল তুলে দেখাতেন, ওইটে জে. ডি.-র বাড়ি। আমি আপনাকে দ্রুত পায়ে নদীর ধারে ঝাউগাছের সারির পাশের রাস্তা ধরে সরষেফুলের মাঠের দিকে বেড়াতে যেতে দেখেছি। কাকা বলতেন, এ-রকম হারিয়ে-যাওয়া আপনার স্বভাব, যত হাসি-ঠাট্টা-মস্করা তাই নিয়ে, আর আপনাকে তত দূরে ঠেলে দেওয়া। বঙ্গবাসী কলেজে পড়বার সময়ে হেরম্ব চক্রবর্তীর আপনার ওপর বিতৃষ্ণা প্রকাশ হয়ে পড়ত। শুনেছি, 'শনিবারের চিঠি'কে তিনিই আপনার সব হাঁড়ির খবর জোগাতেন।

তিনি কিছুক্ষণ চুপ থেকে সহসা বলে উঠতেন, তেমন বড়ো আকাশ জল মাঠ প্রান্তর শাদা হাওয়া কালো বন তুমি আর কোথায় পাবে এখানে। সে-সব জীবনের একটা বিশাল উন্মুক্ততা ছিল।

দিদি বলতেন, কাছেই তো লেক আছে, লেকে তুমি তো বেড়াতেও যাও, সঙ্গে কেউ-কেউ থাকেন অবশ্য, একা যাও না। দুধের সাধ ঘোলে মেটানো ছাড়া উপায়ই বা কী!

যাই, কিন্তু ট্রাম বাস! হরেক কিসিমের গাড়িঘোড়া। এ-সব এড়িয়ে চলা যে কী হ্যাপা! আমার দারুণ দুর্বোধ্য লাগে।

*

একদিন ঠিক হয়েছিল, দিদি, দিদির-আত্মীয়াস্থানীয়া এক বান্ধবী, জীবনানন্দ ও আমি মেট্রোতে কী-একটা বিখ্যাত ছবি দেখতে যাব, দিদিরাই জোরাজুরি করে ব্যবস্থা করেছিলেন। জীবনানন্দকে এসে গাড়িতে তুলে নেওয়া হবে, তিনি প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

দিদিরা এসে পৌঁছুবার অনেক আগেই পৌঁছে গেলুম। রঞ্জু জানাল, বাবা তো বেরিয়ে গেছেন। অনেকক্ষণ।

দিদিরা এলেন। তাঁরাও একই খবর পেলেন। এবং অত্যন্ত অস্বস্তিতে পড়লেন। এই ঘটনাসংঘটনে আমার মতো বাইরের লোকের কী যে কর্তব্য, জানতুম না, কিছু-একটা বলতে হয় বলেই বলেছিলুম, মনে হয় কাছে-পিঠে কোথাও গিয়েছেন, এখুনি এসে পড়বেন।

কিন্তু পিসিমণির উৎকণ্ঠার জবাবে রঞ্জু নির্বিকার জানিয়েছিল, বাবা তো তৈরি হয়েই বেরিয়েছেন।

অগত্যা গাড়ি চেপে জীবনানন্দ-ব্যতিরেকেই মেট্রোতে পৌঁছুতে হল, ম্যাটিনি শো, ছবি শুরু হতে আর বিশেষ দেরি নেই। মেট্রোর বাঁ-পাশের বিশাল ঝকঝকে সিগারেট-জানালার সামনে দাঁড়িয়ে জীবনানন্দ, তিনিও সমান উৎকণ্ঠিত। তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে

বললেন, তোরা এত দেরি করলি কেন বল্ তো। ছবি তো প্রায় শুরু হতে যাচ্ছে, ঘণ্টা বেজেছে। যাতে দেরি হয়ে না যায়, সেইজন্যে সেই কখন আমি হেঁটেই চলে এসেছি, আর

রবিবার সকালবেলাটা সঞ্জয় ভট্টাচার্যর গণেশ অ্যাভিন্যুর বাসাবাড়িতে সময় কাটানো একটা লোভনীয় ব্যাপার ছিল। শ্রদ্ধা জিনিসটার সঙ্গে কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভয়ের মিশেল না থাকলে যে আকর্ষণটা তেমন জোরালো হয়ে ওঠে না, রবিবারের এই সকালটা তা বেশ ভালো করে বোঝার সুযোগ করে দিত। সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে কথা বলতে শোনাটাই একটা দুর্লভ অভিজ্ঞতার জিনিস, প্রতি মুহূর্তে জানান দিতে থাকত যে, লেখাটেখার স্বনির্বাচিত দায়িত্বে শিক্ষিত হবারও নিজস্ব দায় থাকে, এবং সে দায় সামলানো অত্যন্তই গতরে-মগজে পরিশ্রমের বিনিময়ে সাধ্য। ব্যাপারটা নিতান্তই নিরুৎসাহজনক হলেও মানুষ নিজেকে কষ্ট দিয়ে একরকম নির্মল আনন্দ পায় ; এবং সেই কারণেই হয়তো রবিবারের সকালের ভিড়টা ছোটোখাটো হলেও পরবর্তী কোনো-কোনো বিখ্যাতকে তখন সেখানে নিবিষ্ট দুর্বলতায় দেখেছি।

একদিন জীবনানন্দ ছিলেন। ঘরে ঢুকেই দেখি জীবনানন্দ চেয়ারে আসীন, সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর হলুদ চাদরে ঢাকা জানালার পাশের খাটে। ঘরে রোদ এসে পড়েছে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য আবেগে উত্তপ্ত হয়ে আছেন। তিনি জীবনানন্দর কাছে জীবনানন্দর কবিতা ব্যাখা করছেন। প্রসঙ্গটা ঃ তাঁর কাব্যের সঙ্গে শেলি-কীটস-হুইটম্যান থেকে শুরু করে ইয়েটস-রিলকে-এলিয়ট পেরিয়ে ডিলান টমাস পর্যন্ত কবিদের কবিতার আত্মীয়তা।

সাত কথাতে জীবনানন্দর একটি কথা নেই। তিনি শুনতেই ভালোবাসেন, তাঁর চোখের কৌতুকাভাসিত একাগ্রতায় তা তিনি বুঝিয়ে দিতে থাকলেন। তবু একবার সামান্য উসখুস করে উঠে ক্ষীণ কণ্ঠে বললেন, একজন সচেতন কবিকে এতজন অগ্রজ বা সমসাময়িক কবি একই সঙ্গে প্রভাবান্বিত করতে পারেন?

সঞ্জয় ভট্টাচার্য দারুণ রেগে গেলেন। তাঁর পুরু চশমার আড়ালে তাঁর বড়ো চোখ দুটি আরও ধক ধক করে উঠল, মনে হল, দু চোখের শাদা বলয় দুটি এক্ষুনি ছিটকে পড়বে। প্রভাব? প্রভাবের কথা আমি বলেছি কি? আপনি ঠিক ধরেন নি, জীবনবাবু। আমি আত্মীয়তার কথা বোঝাতে চেয়েছি। আমি কি এঁদের আত্মীয়? না। অন্য অনেকেই কি এঁদের আত্মীয়? না। আপনি এঁদের বংশপরম্পরার, এঁরা আপনার উত্তরাধিকার, আমি তাই বলতে চাইছি।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য কথার ঝোঁকে ছিলেন, জীবনানন্দ অন্য কথায় গেলেন, আমি যে-জিনিসটা মনে পড়াতে এসেছিলুম...

সঞ্জয় ভট্টাচার্য অত্যন্তই অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। কী আশ্চর্য, আমি একেবারেই ভুলে গিয়েছিলুম। আমরাও যে খুব একটা সুবিধের মধ্যে আছি, তা নয়, 'পূর্বাশা'র রকম দেখেই বুঝতে পারছেন, আপনি যে...কী আশ্চর্য, কালকের মধ্যে সত্যবাবু একটা-কিছু বিহিত করবেনই।

তারপর খাট থেকে নেমে গিয়ে পাশের রান্নাঘর থেকে প্লেটে করে পায়েস নিয়ে এলেন, তাঁরই হাতে তৈরি হয়তো-বা, জীবনানন্দকে ডায়াবেটিসের কথা বলে না-না করেও

ছুঁতে হল, আমার তো প্রায় প্রতি রবিবারের রুটিন।

সঞ্জয় ভট্টাচার্য জানেন, জীবনানন্দ অল্প হলেও আমাকে চেনেন। সুতরাং তাঁকে দক্ষিণগামী বাসে তুলে দেবার দায় আমার উপর বর্তাল।

সেসব সময়ে কলকাতায় ছাতখোলা সবুজ রঙের দোতলা বাস একটি কি দুটি চলত। তেমন একটা বাস এসে পড়ল। শুধু তুলে দেওয়াই নয়, জীবনানন্দকে তাঁর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়া কর্তব্য বিবেচনা করলুম।

বাসে সেসব কালে সাধারণত বসার জায়গা পাওয়া যেত। পাশাপাশি বসে পড়তেই তিনি বললেন, তুমি কোথায় যাবে, দক্ষিণে কোথাও তোমার কাজ আছে?

আমি বললুম, আমি জগুবাবুর বাজারের কাছে নামব, ওখানেই আমাদের ভুতুড়ে আস্তানা।

উনি বিস্ময়াপ্লুত কণ্ঠে বললেন, ভুতুড়ে? কী রকম?

আমি সেই আত্মঘাতী মেয়েটির ফেলে-রেখে-যাওয়া শাড়ির ভগ্নাংশর কথা বললুম, সারা রাত তার বাড়িময় একা-একা ঘুরে-ঘুরে কেঁদে ফেরার কথা বললুম, যদিও আমরা সে-রকম কখনো শুনি নি, আমাদের বন্ধুবান্ধব—বিশেষ ক'রে স্নেহাকরের—কথা বললুম, যার ফুসফুসে যক্ষ্মা হব-হব করছে বা সত্যি-সত্যি হয়েইছে, যে তার নিজের ধনী ভাইদের ছেড়ে চলে এসেছে, কী ক'রে সেখানে আমরা সময় কাটাই, কী-সব ভেবে-প'ড়ে-ঝগড়া ক'রে-চেঁচিয়ে, সে-সব বললুম, কিন্তু ওড়িয়া-বামুনের হোটেলের কথাটা বললুম না।

তিনি বললেন, তোমরা কোথায় খাওয়া-দাওয়া কর?

নিজেরা রান্না ক'রে, ইকমিক কুকারে, অম্লান নিরীহ কণ্ঠে মিথ্যে কথাটা বললুম।

কিন্তু মেয়েটি আত্মহত্যা করল কেন, তোমরা খোঁজ করেছ? খোঁজ করলে দেখতে, লোকে যা বলবে, পুলিশে যা বলবে, পোস্টমর্টেম রিপোর্টে যা বলবে, তার থেকে কারণটা হয়তো অনেক বেশি আবছা।

আমি ঠিক মানতে পারলুম না, ও-রকম বয়সী মেয়েদের আত্মহত্যার কারণ হাত গুণে বলে দেওয়া যায়।

কথাটা মেয়েদের বা ছেলেদের নয়, কোন্ বয়সের সেটাও হয়তো নয়, মৃত্যু তো তোমার জানাশোনা নিজের জীবনের মধ্যে একমাত্র একটাই শাশ্বত ও নিরবচ্ছিন্ন ঘটনা, যা নিজে থেকে ঘটবে বা তুমি নিজে ঘটাবে। কেন ঘটাবে, তুমি জীবনকে—মোটা কথায় সদর্থক বেঁচে-থাকাকে—ভালোবাস ব'লে, রোগশোকে সুখে-দুঃখে সার্থকতা-অসার্থকতায় ক্রমাগত বেঁচে-থাকতে চাও ব'লে, এইসবে তোমার ধরাছোঁয়ার বাইরের কোনো চিড় তুমি সহ্য করতে পার না ব'লে; তোমার ভালোবাসার জিনিসটাকেই তুমি তখন ভেঙে ফ্যালো, শিশুরা প্রগাঢ়, সৎ ভাবাবেগে যা ক'রে ফ্যালে, কেন করে, না জেনেই করে।

আমি অনুতপ্তের মতো বললুম, মেয়েটিও তা হলে এ-রকম কোনো ফেরে পড়ে গিয়েছিল।

খুব সম্ভব। তুমি তো ডাক্তারি পড়, মানুষকে জন্মাতে-মরতে দ্যাখ, তোমার এ-রকম মনে হয় না? এ-সব ক্ষেত্রে মৃত্যু ঠিক জীবন-লালসার উলটো পিঠ। মৃত্যু যথেষ্ট আগ্রাসীও হতে পারে হয়তো!

উনি কেমন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন। চুপ করে গেলেন। বেশি কথা বলার লোক তো

ছিলেন না, সংকুচিত বোধ করতে লাগলেন।

আমি অন্য কথায় গেলুম। সঞ্জয় বাবু আপনার লেখার বিদেশী আত্মীয়তার কথা কী বলছিলেন। কেউ-কেউ কিন্তু 'বনলতা সেন'-এর সঙ্গে পো'র 'টু হেলেন'-এর সাদৃশ্য আবিষ্কার করেছেন। অন্যান্য কবিতায় ইয়েটস বা অন্যের—আবছাভাবে বা তেমন আবছাভাবে নয়।—

তিনি নিরুত্তাপে বললেন, তোমরা নিজেরা কীভাবে এইসব প্রসঙ্গে কথা বল বা ভাব? এই যে তুমি বললে, তুমি সঞ্জয়বাবুর আত্মীয়তার কথা বললে না, স্পষ্টতই কুম্ভিলকবৃত্তির কথা বললে। আমি এ-বিষয়ে কিছু ভাবি না। এ-প্রসঙ্গে পড়াশোনার কথাটা এসে পড়ে। তুমি পড় কেন, তোমার কোনো-কিছু পড়াটা তোমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাপুঞ্জের যে-একটা বস্তুপিণ্ড আছে, অথবা তোমার বেঁচে থাকার বৃত্তির সঙ্গে-সঙ্গে যে বস্তুপিণ্ড তৈরি হয়ে ওঠে, তাকে একরকমভাবে আহত করে, সঙ্গে-সঙ্গে তোমার অভিজ্ঞতাগুলি বিশ্লিষ্ট হয়, চরিত্র পায়, লিখতে জানলে তুমি লেখ, আঁকতে জানলে আঁক, সেই নবনির্মিত অভিজ্ঞতার কথা লেখ বা আঁক। এটা একটা ঘাত-প্রতিঘাতের ব্যাপার। তা ছাড়া যেসব সাহচর্য তোমাকে ঘিরে থাকে, তারা তোমার চারিত্র্যও কোনো-না-কোনোভাবে কাটে-ছাঁটে, তুমি যে সমাজে বাস করতে শুরু কর, তার কথ্যভাষার টানটাও তোমার জিভে এসে যায়।

দেশপ্রিয় পার্ক এসে পড়ল। আমরা দুজনেই নেমে গেলুম। আমি গোপনে ভিতরে-ভিতরে উত্তেজিত হয়ে পড়তে লাগলুম, তাড়াতাড়ি চক্রবেড়েতে পৌঁছনো দরকার। এই দুপুরবেলা সবাই যে সেখানে জড়ো হয়ে নেই, আন্দাজ করা যায়, কিন্তু স্নেহাকর ও সমর নেই, হতেই পারে না।

জীবনানন্দ লেকে বেড়াতে যেতেন বিকেলে। সঙ্গে প্রায়ই তাঁর প্রতিবেশী বন্ধু সুবোধবাবু থাকতেন। দিদি ও আমি ক্বচিৎ জুটে গেছি তাঁদের পিছনে-পিছনে। আমার আগাগোড়া কেমন মনে হত, সুবোধবাবু জীবনানন্দর নিকট-বন্ধু পরিগণিত হওয়ার জন্যে যতটা উৎসাহী ছিলেন, ততটা ছিলেন না তাঁর লেখাপড়ার চরিত্রবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হওয়ার বিষয়ে। অরবিন্দ গুহ জানিয়েছেন, আমার ধারণাটা অমূলক না হতেও পারে, কেননা তাঁর কাছে জীবনানন্দর কবিতা বুঝবার কথা অনেকবার সুবোধবাবু বলেছেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত ধৈর্য সংগ্রহ করে উঠতে পারেন নি।

যে-দিনের কথা হচ্ছে, সে-দিন বিকেলে কোনো কারণে এতই বিমর্ষ হয়ে ছিলেন তিনি যে, ব্যাপারটা বেশ চোখে পড়ার মতো হয়ে উঠেছিল। সুবোধবাবু অফিসফেরত চলে আসতেই জীবনানন্দও পাঞ্জাবি গলিয়ে তৈরি হয়ে নিলেন। দিদি আমাকে বললেন, চলো, আমরাও বেরিয়ে পড়ি।

ওঁরা পাশাপাশি এগিয়ে, আমরা একটু পেছিয়ে। দিদি বললেন, দাদার দুপুরবেলায়-পড়া কোনো-একটা লেখা তাঁকে খুব আহত করেছে। চোখে দেখলুম যখন, সঙ্গে চলে এলুম।

পিছনে যেতে-যেতে শুনলুম জীবনানন্দ বলছেন, আশ্চর্য, এমন একটা লেখাও কি লিখি নি যা পাঁচসাত বছর পরেও পড়া যেতে পারবে! কাকে যে বলছেন, বলার অনতিব্যক্ত মন্থরতায় সেটা তেমন স্পষ্ট হল না, সুবোধবাবুকে কি?

সুবোধবাবু ঝাঁপিয়ে পড়লেন, কী যে বলেন, আপনার কোন্ কবিতাটা যে সে-জাতের

নয়, তা তো আমি জানি না।

জীবনানন্দ হাত তুলে দ্রুত নেড়ে হাওয়া কাটাবার ভঙ্গিতে বললেন, না, না, ঠিক সে-কথা তো হচ্ছে না।

দিদি বললেন, দাদা ঠিক এ-ধরনের বন্ধুদের নিয়েই-বা কেন যে বেড়াতে বেরোন!

আমি বলেছিলাম, ওঁর মতো লোকেরা এ-ধরনের সঙ্গীই হয়তো সর্বদা পছন্দ করেন, তাতে ঠকে যাবার কষ্ট ঢের কম।

সে-দিন সন্ধ্যের পর জীবনানন্দ কথায়-কথায় বলেছিলেন, আমি অনেক সময় ভেবেছি আমার কবিতা সম্বন্ধে আমি নিজে কিছু লিখি। সজনীবাবুর কোনো-একটি লেখার উত্তরে লিখেও ফেলেছিলাম, 'ক্যাম্পে' কবিতাটার শ্লীলতা-অশ্লীলতার প্রসঙ্গে। পরে ভেবে দেখেছি, এসব করে কিছু হয় না, পাঠক তার নিজের অভিজ্ঞতার উদ্দীপনেই এক-এক রকমভাবে নিজে থেকে বুঝে নিতে থাকেন, সেখানে এসব লেখার কোনো মানে নেই। তাই ছাপতে দিই নি কোথাও। সঞ্জয়বাবু অবশ্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন কোনো সময়।

আমি সাগ্রহে বলেছিলুম, আমরা লেখাটা পেতে পারি না?

দিদি বলেছিলেন, লেখাটা ভূমেনকে দাও।

জীবনানন্দ সতর্কতার সঙ্গে বলেছিলেন, লেখাটা নিয়ে কী করবে?

আমি নিখাদ সরলতায় বলেছিলুম, হয়তো কোথাও কোনোদিন ছাপব না, আপনি যখন চান না, কিন্তু 'ক্যাম্পে' কবিতাটাকে আঁচ করতে আমাদের সুবিধে হবে ; লেখা হয়ে যাবার পরে লেখক তো লেখক থাকেন না, একজন সাধারণ পাঠক হয়ে ওঠেন, সে-দিক থেকে লেখাটা দারুণ একটা ব্যাপার। তার চাইতেও প্রধান, লেখাটা আমার কাছে থাকবে!

পাতলা হলুদ-হয়ে-ওঠা কাগজে তাঁর প্রথম বয়েসের জড়ানো হাতের-লেখায় আবছা হরফের সেই লেখাটা তিনি আমায় পরে একদিন দিয়েছিলেন।

কিন্তু বসতে পেলে লোকে শুতে চায়। আমিও দুঃসাহসী হয়ে উঠেছিলাম। একবার বায়না ধরলুম, আপনার পড়া কোনো কবিতার বই, যাতে পড়ার সময় মার্জিনে নানা কথা লিখেছেন-টিখেছেন, লাল নীল পেন্সিলে হয়তো কোনো-একটা লাইন আন্ডারলাইন করেছেন, কিছুই হয়তো করেন নি, শুধু আপনার নামটা মুখপত্রে সই করা আছে, এই রকম কোনো-একটা বই আমার চাই। সেই একই প্রয়োজন, আমার কাছে থাকবে!

তিনি হাঁ-না কিছুই বলেন নি, কিন্তু খুব যে রাগ করেছেন বা বাড়াবাড়ি ভেবে বিরক্ত হয়েছেন, তাও মনে হল না, বললেন, সে পরে এক সময় দেখা যাবে।

তিনি আমাকে ম্যাকমিলান-প্রকাশিত ১৯২৮ সালের ইয়েটসের 'দ্য টাওয়ার' বইটি দিয়েছিলেন।

আমি 'ক্যাম্পে'-র উপর লেখার বিষয়ে ফিরে আসি। লেখাটা নিয়ে সে-দিন রাত্রে সে কী উত্তেজনা আমাদের ডেরায়, কী অবিশ্বাস্য দুঃসহ অস্থিরতা, মনে হতে লাগল আমাদের সবার শরীরে এখুনি দুদ্দাড় জ্বর এসে পড়বে। সবাই নিদারুণ অভিযোগ করতে লাগল যে, আমি নিরেট হীনবুদ্ধির মতো কাজ করেছি, কেননা লেখাটা ছাপাব না, এ-রকম প্রতিশ্রুতি দেওয়া মোটেই ঠিক হয় নি। শেষ পর্যন্ত এ-রকম একটা রফা হল যে, ছাপা হবে, এবং জীবনানন্দর অনুমতি নিয়েই 'ময়ূখ'-এর পরবর্তী কোনো এক সংখ্যায় ছাপা হবে, তবে সেই সংখ্যাটি হবে 'ক্যাম্পে' কবিতাটির উপর একটি সেমিনার, এবং এই লেখাটি যাবে সবশেষে সামিং আপের ভঙ্গিতে।

অবশ্য সে-সেমিনার আর বেরোয় নি, লেখাটিও অনেকদিন আমার কাছে পড়ে

থেকেছে, এবং অবশেষে 'শতভিষা' কবিতা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

জীবনানন্দ উপন্যাস লিখেছেন, গল্প লিখেছেন, এবং সেই বরিশালে থাকার সময় থেকেই লিখেছেন, দিদির কাছে জানা গেছে। আমি তাঁকে বলেছিলাম, তুমি পড়েছ? কেমন লেগেছে তোমার?

দিদি বলেছিলেন, তুমি তাঁর কবিতা পড়, মুখস্থও বলতে পার নানান প্রসঙ্গের সঙ্গে মানানসই ক'রে, তুমি কেমন হতে পারে আন্দাজ করতে পার না?

আমি বলতুম, তুমি ঠিক বল নি। জীবনানন্দর গদ্য বাংলায় যে-রকম গদ্য লেখা হয়, তার থেকে মহনীয়তায় আলাদা তো হবেই, তাঁর প্রবন্ধে দ্যাখ নি? কিন্তু তাঁর কবিতার ধাঁচে লেখা হবে, তা হতেই পারে না।

আমি পড়ি নি, পড়তে দেন নি, কিন্তু এক নাগাড়ে লিখে যাবার সময় লুকিয়ে রাখা তো যায় না। দিদি বলতেন, তুমি বলো-না, আমিও বলব, দুজনে পড়ে দেখি।

আমি বলতুম, আমাকে পাত্তা দেবেন কেন তোমাদের যখন দেন নি? তবু লেখাগুলি ছাপাবার জন্য তোমাদের চাপাচাপি করা উচিত। কে বলতে পারে, এমন একটা ঘটনা ঘটে যাবে হয়তো, যাতে বাংলা গদ্য একেবারেই নতুন একটা মাত্রা পেয়ে যাবে!

তবু একদিন নানারকম ইনিয়ে-বিনিয়ে কথাটা বলেই ফেললাম। তিনি তো আকাশ থেকে পড়লেন, খুকি বলেছে বুঝি? ও ঠিকই বলেছে, কিন্তু সেসব লেখা তো আর বেঁচে নেই।

যা বলেছেন, তা যে একেবারে হাড়ে-মজ্জায় সত্যি, তা প্রমাণ করবার জন্যই যেন নিজে থেকেই চোখে হেসে আবার বলেছেন, আমি তো এককালে গানও লিখেছিলাম, জানো?

গান? আমি প্রায় আঁৎকে উঠেছিলুম। দিদিও বিস্ময়ে হতবাক। অবিশ্বাসের সুরে বলেছিলেন, তুমি নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছ, তুমি গান লিখতে পার না, তোমার হাতে বাংলা আধুনিক গান খুলতেই পারে না। হঠাৎ এসব করতেই বা গেলে কেন?

আমি খুব সাহস-টাহস সঞ্চয় করে যথেষ্ট নম্র গলায় বলেছিলুম, আপনার লেখা কেউ তবলা ঠুকে হারমনিয়ম বাজিয়ে গলা নেড়ে-নেড়ে গাইছে, বা মঞ্চে দাঁড়িয়ে দারুণ বানানো আবেগে গলা উঁচু-নিচু করে হাত নেড়ে আবৃত্তি করছে, এ ভাবতে গেলেই নির্ঘাৎ আমার শরীর খারাপ হবে।

কেন, আমার কবিতা আবৃত্তি করা যাবে না কেন? ওগুলোর কোনোটাই কি আবৃত্তিযোগ্য নয়? খুব আন্তরিকতার সঙ্গে তিনি বলে থাকবেন।

আমি আমার নবাবিষ্কৃত আত্মপ্রত্যয়ে বেশ স্থিরতা আঁচ করে বললুম, নয় কেন, আপনি নিজে আবৃত্তি করলে গ্রহণীয় হবে হয়তো, আপনি তো কবিতা-লেখার সময়টাকে ছুঁয়ে যাবেন, কমা-সেমিকোলন-কোলন-ড্যাশ-দাঁড়িগুলোকে হারিয়ে যেতে দেবেন না। পড়বার সময় কবিতাটা নতুন একটা অবয়বও পেয়ে যাবে হয়তো...

দিদির মাথায় তাঁর গান লেখার বিষয়টা ঘোরাঘুরি করছিল, তিনি বাধা দিয়ে বলেছিলেন, কিন্তু তুমি গান লিখতে গেলে কেন? তুমি উৎসবের গানের আসরেও যে খুব সহজ হতে পার, তা তো মনে হয় নি।

সুবোধবাবু আমাকে তাতাতে লাগলেন যে, গান লিখলে সিনেমায়-টিনেমায় চলতে

পারে, তাতে টাকাও বেশ আসে, টাকার তো প্রকৃতই খুব দরকার ; প্রেমেন তো কতই সিনেমার গান লিখেছে! তা, ও আমার আসবে না, নষ্ট করে ফেলেছি।

আমি সেই হালকা সুরে আবার বললুম, সিনেমার নায়িকা চাঁদের দিকে তাকিয়ে ফোঁপাতে-ফোঁপাতে আপনার লেখা গান গাইছে, সে যে কী একটা দৃশ্য হত না!

জীবনানন্দ মুখ বন্ধ রেখে সারা গা কাঁপিয়ে দারুণ হেসেছিলেন, মনে আছে। বলেছিলেন, এসব কথা গল্প করতে-করতেও কারুকে বলবে না যেন। এমন-কি সঞ্জয়বাবুকেও না।

এক পুজো গিয়ে আরেক পুজো এসে পড়ল প্রায়, জীবনানন্দর কবিতা আর জোগাড় করা হল না, বৃথাই তাঁর বাড়িতে আসছি-যাচ্ছি, দিদির সঙ্গে এখানে-সেখানে যাচ্ছি, এ-কথা সে-কথা বলছি। এবার জীবনানন্দর লেখাটা না পেলে আর চলছে না ; হেন কাগজ নেই, যেখানে তাঁর লেখা না বেরোচ্ছে। আমাদের ভুতুড়ে ডেরায় বসে জীবনানন্দ বিষয়ে নতুন-নতুন গল্প বলাবলি করে আর তাঁর কবিতা নানা রকম মনোনিবেশে পড়ে-পড়ে সময়টা কেটে গেল ; যখনি কাগজ বেরিয়েছে, ওঁর হাতে পৌঁছে দেওয়া হয়েছে ; কিন্তু কবিতা নিয়ে আর জোরাজুরি করা হয় নি।

ধনুর্ভঙ্গ পণ করে একদিন স্নেহাকর ও আমি নিঝুম দুপুরবেলায় গিয়ে তাঁর বাড়িতে হাজির হলুম। তাঁর ঘরে দুজনে ঢুকতেও পেলুম। তক্তপোশে বসতেও বললেন। লেখা চাই-ই।

আমরা নিবেদন করলুম, 'আট বছর আগের একদিন'-এর সমসাময়িক কোনো পুরোনো লেখা যদি থেকে থাকে, আমাদের সে-রকম লেখা পছন্দ।

আমাদের ভিতরে জীবনানন্দর কবিতার কোনো-কোনো সাম্প্রতিক মূল্যায়নের হঠকারিতার বিরুদ্ধে একটা প্রতিবাদ কাজ করছিল, চাপা থাকল না।

তিনি বললেন, কেন, ও-ধরনের লেখা তো অনেকের কাছেই এখন বেশ নিন্দিত, আপনাদের পছন্দ কেন?

স্নেহাকর ঝটিতি কথা লুফে নিয়ে বলেছিল, প্রকৃতপক্ষে আমাদের কেউ-কেউ মৃত্যুর কাছাকাছি বসবাস করছি এখন। মৃত্যুই আমাদের জীবনবিষয়ে বেশি মনোযোগী করে তুলছে।

আপনি হয়তো ঠিক। তিনি বলেছিলেন, কিন্তু সে-সময়কার লেখা আর কোথায় পাব, এখন কি আর ও-রকম লেখা গড়ে উঠবে, না, ওঠা উচিত? লেখাটেখা তো মুহূর্তের অভিজ্ঞতা-অনুরণন সাপেক্ষ।

আমার চাইতেও বেশি হতাশ হয়েছিল স্নেহাকর। ও কী রকম চুপসে গেল।

উনি ব্যাপারটা আঁচ করতে পারলেন। বললেন, আমার এখনকার লেখা আমার বন্ধুদেরই অনেকের পছন্দ নয়, তা কী আর করা যাবে!

আমি তাড়াতাড়ি বলেছিলুম, আপনি জানেন, আমাদের কিন্তু দারুণভাবে টানে। হয়তো তিন-চারবছর আগে পড়েছিলুম, বোধ হয় 'মাসিক বসুমতী'তে, এখনও মনে করতে পারি —

ডুবল সূর্য ; অন্ধকারের অন্তরালে হারিয়ে গেছে দেশ।

এমনতর আঁধার ভালো আজকে কঠিন রুক্ষ শতাব্দীতে।
রক্ত ব্যথা ধনিকতার উষ্ণতা এই নীরব স্নিগ্ধ অন্ধকারের শীতে
নক্ষত্রদের স্থির সমাসীন পরিষদের থেকে উপদেশ
পায় না নব ; তবুও উত্তেজনাও যেন পায় না এখন আর ;
চারদিকেতে সার্থবাহের ফ্যাক্টরি ব্যাঙ্ক মিনার জাহাজ—সব,
ইন্দ্রলোকের অপ্সরীদের ঘাটা,
গ্লাসিয়ারের যুগের মতন আঁধারে নীরব।...

উনি সহসাই থামিয়ে দিয়ে বললেন, বুঝেছি। আপনারা দিন তিনেক পরে আসুন, লেখা আমি তৈরি করে রাখব।

আমরা তাঁর বাসা থেকে বেরিয়ে এলুম। রাস্তায় পৌঁছুতেই স্নেহাকর তো ভীষণ খাপ্পা, আপনি ওই কবিতাটা না বললেই পারতেন, 'বনলতা সেন' থেকে কোনো-একটা বললেই উনি বেশি খুশি হতেন—

কিন্তু আমি তাঁর মৃত্যুর পর দিদির কাছে শুনেছিলুম যে, 'ময়ূখ'-এর ছেলেদের তাঁর একটু অন্যরকম মনে হয়েছিল বলে তিনি তাঁকে বলেছিলেন। কেন যে বলেছিলেন, তা কখনোই আমার কাছে যথেষ্ট স্পষ্ট হয় নি ; স্নেহাকর, সমর বা জগদিন্দ্রর কাছেও হয়েছিল বলে জানা যায় নি। তবে আমরা অনন্যোপায়ের মতো উপলব্ধি করেছিলুম যে, আমরা আমাদের সাধ্যের অতীতে গিয়েও ঐকান্তিকতা ও সততার সঙ্গে 'জীবনানন্দ-স্মৃতি ময়ূখ' বার করব, তাতে আমাদের বই-পত্তর হাতঘড়ি পেন উপহারে-পাওয়া আংটি বা অন্য-কিছু—হয়তো সব-কিছু বেচে দিতে হবে, পরীক্ষার ফি জমা পড়বে না, 'ময়ূখ'-এর জীবনেরও ইতি ঘটবে, তবু বার করবই, এবং তাতে স্নেহাকরের কলমে 'নির্জনতম কবি' 'প্রকৃতির কবি' ইত্যাকার শিরোপাগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে।

তিনি 'রাত্রিদিন' শীর্ষক যে-কবিতাটি দিয়েছিলেন, তা শারদীয় ১৩৬১ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছিল। দুটি আলাদা ছোটো কবিতা মিলিয়ে কবিতাটি তৈরি হয়েছিল, চাক্ষুষ করেছি ; দুটি কবিতার মাঝামাঝিতে একটি তারা-চিহ্ন কবিতাটির এইভাবে গড়ে ওঠার ইতিহাসটি বলছে।

'শারদীয় ময়ূখ' তাঁকে খুশি করেছিল, স্মরণ করতে পারি। আপনারা বেশ যত্ন করে ছাপেন, যত্ন করে সাজান-গোছান, এটা প্রশংসার, তিনি বলেছিলেন।

পুজোর পরে-পরেই সেবার রেডিয়োতে একটা কবিসম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল বলে মনে পড়ছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য নিমন্ত্রিত ছিলেন, তাঁর কাছেও ঘটনার কথাটা শুনেছি। প্রধান কবিরা—আধুনিক এবং যাঁরা 'আধুনিক' অভিধাভুক্ত নন, তাঁরা—সবাই নিমন্ত্রিত। সেইসব দিনে রেডিয়োতে টেপ করে রেখে পরে তা সম্প্রচার করার নিয়ম ছিল কিনা জানা নেই, তবে কবিসম্মেলনের দিন দুপুরবেলা তাঁর বাসায় গিয়ে পড়ে তাঁকে খুব অনিশ্চিত ও চিন্তান্বিত দেখা গিয়েছিল ; কারণটা আমার পক্ষে আঁচ করার চেষ্টা করাই বাতুলতা। আমার সাধ ছিল, দিদির ত্রিকোণ পার্কের অতিথি-বাড়িতে তাঁর সঙ্গে বসে রেডিয়োর অনুষ্ঠানটি শোনা। আমাদের ডেরায় রেডিয়ো ছিল না ; আর আজকের দিনের মতো রেডিয়ো-টেডিয়ো প্রায়-সকলেরই হাতের নাগালের মধ্যে সে-যুগে এসে পড়তে

পারে নি। ত্রিকোণে যাবার আগে ল্যান্সডাউনে একটা চক্কর মারা যেতেই পারে।

প্রেমেন-সুধীনবাবু আসবেন তো, আমাকেও তো যেতে হবে, দেখ তো ব্যাপারটা কেমন গোলমেলে হয়ে গেল, তিনি নানা রকমভাবে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে এ-রকম সব কথা বলছিলেন। বেশ অস্থির। রঞ্জু একবার দুবার উঁকি মেরে গেল, কিন্তু সে-ও সমস্যাটা ধরতে পেরেছে, তেমন বোঝা গেল না।

আমি তাড়াতাড়ি ত্রিকোণ পার্কে ছুটলুম। দিদি এলেন। বেশ তাড়াতাড়ি করেই ঘরে ঢুকলেন, এবং একটু পরেই বেরিয়ে এলেন। আমি ঘরে ঢুকি নি, বাইরে অপেক্ষা করতে থাকলুম, একান্তই পারিবারিক কোনো ব্যাপার কি-না কী করে জানব। তিনিই বেরিয়ে এসেই বললেন, চলো, একটু বাজার ঘুরে আসি।

কাছেই গড়িয়াহাট। অর্থাৎ বাজার। যা কেনা হল, তা এক জোড়া সাত নম্বর বাটার পাম্প-শু জুতো। জীবনানন্দর কাপড়ের জুতোর এক পাটির কড়ে আঙুলের কাছটা ছিঁড়ে গিয়েছিল ; পরলেই কড়ে আঙুলটি বেরিয়ে পড়ত।

জীবনানন্দ মোটামুটিভাবে আত্মস্থ হয়ে কবিসম্মেলনে গেলেন। তিনি রেডিয়োতে তাঁর কবিতা এত নিমগ্ন আত্মানুভবে পড়েছিলেন যে, সেই থেকে এই অপরিবর্তনীয় ধারণাটা আমার হয়ে গেছে, কবিতার আবৃত্তি করা একমাত্র কবির নিজেকেই মানায়, তা তিনি উত্তমভাবে নাটুকে হোন আর নাই হোন ; তিনি কবিতার জন্মে-ওঠা ব্যাপারটা শ্রোতার কাছে বাহিত করেন, কবিতাটির বেঁচে-বর্তে থাকার বেদনাটিকেও তিনি শ্রোতার অভ্যন্তরে সঞ্চারিত করে দেন ; তা আর দ্বিতীয় কোনো ব্যক্তি কখনো পারেন না। একজন শ্রোতার পক্ষে এই ব্যাপারটি সমূহ জরুরি।

এর পর জীবনানন্দর সঙ্গে আমার এবং আমার বন্ধুদের আবার দেখা হল শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে ১৫ অক্টোবর সকালে।

দিদির বোধহয় তমলুক থেকে কলকাতায় আসতে একটা রাত্রির সময় লেগেছিল, তিনি সকালে শ্রীগোপাল মল্লিক লেনে আমাকে জানাতে এলেন ; সঞ্জয় ভট্টাচার্য সকালেই ডেকে পাঠিয়ে বললেন, তোমরা বন্ধুবান্ধব মিলে সেবা-শুশ্রূষার জন্য একটা দলমতো করো ; সকালের খবর-কাগজের মারফত তার আগেই খবরটা জানা হয়ে গিয়েছিল : ট্রাম-অ্যাকসিডেন্ট—হয়তো, হয়তো—১৪ অক্টোবর সন্ধেয়। আমি পরে অরবিন্দ গুহকে জিজ্ঞেস করেছিলুম ; তিনি বলেছিলেন, প্রকাশ্য অথবা নেপথ্য—কোন্ মত? আমি বলেছিলুম, নেপথ্য। তিনি বলেছিলেন, হয়তো।

কয়েকটি ডাক্তারি-পড়া ছেলে, পাশে বসে রাতজাগা, ওষুধপত্তর খাইয়ে দেওয়া, রোগীর সুবিধেমতো তাঁর ভারী শরীরটিকে নানান ভঙ্গিতে সাজিয়ে দেওয়া, মুখ ধুইয়ে দেওয়া, কাপড়চোপ পালটে দেওয়া, বড়ো ডাক্তারবাবুদের হুকুম তামিল করা, (আর এখন জানি, তাঁদের নির্বিবেক অবহেলার চিকিৎসার সঙ্গী হওয়া) সজনীকান্তর তারাশঙ্করের কাছে সঞ্জয় ভট্টাচার্যর চিঠি বহন করে নিয়ে গিয়ে বিধান রায়কে দিয়ে চিকিৎসা পদ্ধতি অনুকূলে প্রভাবান্বিত করার প্রয়াসের সঙ্গে প্রকারান্তরে জুটে-পড়া—এ-সব ছাড়া বিশেষ কী-ই বা করার ছিল। আর-একটা কাজ ছিল, ধুম জ্বর খেয়ে এসে জ্বরের ঘোরে কত জনের সঙ্গে কত কথা যে তিনি বলতে থাকতেন—যার প্রায় কিছুই ধরবার ছোঁবার নাগালের মধ্যে পাওয়ার মতো নয়—সেইসব কথা গভীর অভিনিবেশে শুনে যাওয়া, যেন

ভয়, আমরা যে অমনোযোগী হয়ে পড়ছি, তা জেনে ফেললেই তিনি বড়ো দুঃখ পেতে থাকবেন। তাই যদি হয়ে ওঠে, তা হলে আর কী করতে এখানে বসে আছি!

এমনি করেই ২২ অক্টোবরের রাত এসে পড়ল। তিনি মারা গেলেন। বেঁচে উঠবার সাধ ছিল, কিন্তু গলায় তেমন জোর টেনে আনতে পারতেন না। দিদি বলতেন, ভাবছ কেন, এই তো আজ তুমি অনেক ভালো আছ, জ্বর নেই, ভালো হয়ে উঠবে। আর পাঁচজন শুভাকাঙ্ক্ষী আর পাঁচজন মৃত্যুপথযাত্রীকে যেমন বলেন আর-কী। তিনি বলতেন, তাই বুঝি, হবে হয়তো—

আমরা তাঁর স্বজন-পরিজনের সঙ্গে দৌড়ঝাঁপ করে তাঁর শবদেহ সেই রাত্রেই ত্রিকোণ পার্কে অশোকানন্দ-নলিনী দাশের দোতলার ফ্ল্যাটে নিয়ে এলুম। সিঁড়ির গোড়ার ঘরটিতেই দরজার দিকে মুখ করে তাঁকে পুষ্পাচ্ছাদনে সাজিয়ে শুইয়ে রাখা হল। ধর্মীয় ব্যাপার-স্যাপারগুলো আমাদের বোধগম্য হবার কথা নয়, তবে হয়েছিল যে, তাতে কোনো ভুল নেই। আমরা কাছাকাছি ঘুরঘুর করতে থাকলুম, নীচে বকুলতলায় তা-বড়ো তা-বড়ো সাহিত্যিক-অধ্যাপক-সমালোচক-চিন্তাবিদরা যেমন, তেমনি বিখ্যাত ও অনতিবিখ্যাত তরুণ লেখক-কবিরা সব এসে পড়েছেন, মাঝে-মধ্যে কেউ-কেউ উপরে উঠে এসে শ্রদ্ধা জানিয়ে যাচ্ছেন, অর্থাৎ একগুচ্ছ রজনীগন্ধা শেষশয্যার পাশের লোকদের হাতে গুঁজে দিয়ে যাচ্ছেন, এঁদের কাউকেই প্রায় চিনি না। লজ্জায় হীনতাবোধে সারা রাত্রির ধকলে রাতজাগায় নোংরা জামাকাপড়ে অস্নানে অভুক্তে এমনভাবে উন্মার্গ ও সামান্য হয়ে আছি যে, তেতলায় যাবার সিঁড়ির গোড়ায় বসে থেকে-থেকে প্রায় লুকিয়ে রইলুম বলা চলে। দিদি মাঝে-মধ্যে এসে আমাদের চা জুগিয়ে সান্ত্বনা জানিয়ে যেতে লাগলেন, যদিও তাঁরও যে চা পানের সবিশেষ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে তা বুঝতে আমাদের অসুবিধে হচ্ছিল না।

দুটো বিশেষ ঘটনা ঘটেছিল। খুব সকালে সবার চাইতে আগে এসেছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, শোওয়ার পোশাকেই মোটামুটি, পায়ে হালকা চটি, হাতে রজনীগন্ধার একটি গুচ্ছ, শবদেহের পাশে শুইয়ে দিয়ে এক মিনিট চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে কাউকে একটি কথা না বলে যেমন এসেছিলেন তেমনি ধীরপায়ে জুতোর শব্দ না তুলে চলে গেলেন। সেই গাম্ভীর্য সেই শোক আর ছোঁওয়া গেল না।

অন্য সবাই গল্প করলেন, গুলতানি করলেন, বকুলতলাকে রীতিমতো জমিয়ে তুললেন।

আর, এক সময়ে জীবনানন্দর স্ত্রী লাবণ্য দাশ আমাকে ঝুল বারান্দার কাছে ডেকে নিয়ে গেলেন। বললেন, অচিন্ত্যবাবু এসেছেন, বুদ্ধদেব এসেছেন, সজনীকান্ত এসেছেন, তা হলে তোমাদের দাদা নিশ্চয়ই বড়ো মাপের সাহিত্যিক ছিলেন; বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি অনেক-কিছু রেখে গেলেন হয়তো, আমার জন্য কী রেখে গেলেন, বলো তো!

তার পর তাঁকে শেষ দেখলাম, কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে বিকেলের নিভন্ত আলোয় চিতার লেলিহান শিখায়।

তার পরও তাঁকে দেখেছি, কিন্তু সে অন্যভাবে অন্য দেখা, অন্য প্রসঙ্গ।

শেষের ক'দিন

সমর চক্রবর্তী

প্রথমেই মনে পড়ছে কয়েক মাস আগের একটি সন্ধ্যেবেলার কথা। ভূমেন, আমি ও স্নেহাকর তাঁর বাড়িতে শরৎ-সংখ্যা 'ময়ূখে'র জন্যে কবিতা আনতে গিয়েছিলাম। কড়া নাড়াবার প্রয়োজন অবশ্য অনেকদিন আগেই শেষ হয়েছে। তিন জন তাঁর ঘরের দরজার সামনে এসে দাঁড়ালাম। তিনি তখন শুয়ে শুয়ে কি একটা বই পড়ছিলেন। আমাদের শব্দ পেয়ে বিছানায় উঠে বসে ভেতরে আসতে বল্লেন ইসারায়। কোমল স্পর্শের মত শরীরে অনুভব করলাম জিজ্ঞাসু চোখের দৃষ্টি। ঘরটা ছিল অত্যন্ত পরিচ্ছন্ন, একটু বেশিরকম ভাবেই গোছালো। যত দূর মনে পড়ে বইয়ের কোন শেল্‌ফ্ ছিল না। মেঝের উপর খবরের কাগজ পেতে তার উপর বইগুলো ছিল, অসংখ্য বই, কিন্তু এলোমেলো ভাবে নয়। ফ্যাকাশে লাল রঙের দেয়াল, তাতে কোন ছবি ছিল বলে মনে পড়ে না। পায়ের দিকে একটা ক্যালেণ্ডার, কচি ডালে কয়েকটি পাটল পাতা, দুটি পাখি মুখোমুখি বসে আছে। খাট থেকে মেঝেয় নেমে এলেন, চোখ দুটো ঈষৎ রক্তাভ, একটু বে-টাল, মৃদু কৌতুক উঁকিঝুকি দিচ্ছে মাঝে মাঝে। অনেক কথার পর আসল কথা, আর আসল কথা মানেই তো কবিতা। সব কথা মনে করতে পারছি নে, কি একটা কথায় তিনি বলেছিলেন, 'গালাগালি করলে ভয় পাওয়ার কি আছে, আমি কি কম গালাগালি খেয়েছি। ও-সবে ঘাবড়ে যেয়ো না। আর আমার জন্যে কিন্তু একটা বাড়ি দেখবে।' কণ্ঠে অন্তরঙ্গতার ললিত আলাপ। জীবিত অবস্থায় প্রকাশিত সর্বশেষ কবিতাটি সেদিনই তিনি দিয়েছিলেন।

এমন একটি দুর্ঘটনার জন্যে আমরা কেউ প্রস্তুত ছিলাম না। দুর্ঘটনার দিনই খবর পেয়েছিলাম একজন বন্ধুর কাছ থেকে। কিন্তু ততটা গুরুত্ব দেই নি। তবুও ভূমেন যখন মেডিক্যাল কলেজে পড়ে, আগে তার কাছেই গেলাম, কারণ মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে থাকলে, দেখাশোনার সুবিধে হবে। ইমারজেন্সিতে খোঁজ নিয়ে জানলাম সেখানে তাঁকে আনা হয় নি। সেদিন কি তার পরের দিন রাত্রিতে এসে ভূমেন জানাল যে, 'পূর্বাশা'-অফিস থেকে খবর এসেছে—কবি জীবনানন্দ গুরুতরভাবে আহত হয়ে শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে আছেন, আমরা যেন তাঁর সেবা শুশ্রূষার ব্যাপারে সাহায্য করি।

শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল থেকে 'ময়ূখে'র অফিস বেশ কাছেই। আমরা ঠিক করে নিলাম এখান থেকেই কে কখন সেবা করতে যাবে তা ঠিক করব। ভূমেনের ওপর ভার পড়ল ডাক্তারি-পড়া ছাত্রের যোগাড় করা। এ প্রসঙ্গে দিলীপ মজুমদারের নাম আগে উল্লেখ করতে হয়। এর আগে তাঁর কথায় কবি ও কবিতার ওপর কিঞ্চিৎ কৃত্রিম ব্যঙ্গের আভাষ পাওয়া যেত, কিন্তু আশ্চর্য ভূমেন যখন তাঁকে রাত্রি জেগে সেবা করার জন্য অনুরোধ করল, তখন তিনি সুহৃদের মত এগিয়ে এসে রাত্রির পর রাত্রি বিনিদ্র থেকে সেবা করেছেন। শেষের দিনে সুজিত ধর-ও সেবায় কম আন্তরিকতার পরিচয় দেন নি।

মনে করেছিলাম কবিকে নিশ্চয়ই অন্ততঃ কেবিনে রাখা হয়েছে, কিন্তু তা হয় নি। অবশ্য তার জন্যে কোন অনুশোচনা করা মূর্খতা। জীবিত অবস্থায় না খেয়ে মরে গেলেও, বাংলাদেশের কবিদের একমাত্র সান্ত্বনা, বোধ হয়, মরলে তাঁর চিতায় মঠ দেওয়া হবে, এই আশাটুকু। সৌভাগ্য এই, মৃত্যুর পর কবিকে তা আর দেখতে হয় না, তাঁর অনেক আশার মত শেষ আশাটিও কি নিদারুণ ভাবে ব্যর্থ! শুনেছিলাম বাংলাদেশের মুখ্যমন্ত্রী তাঁকে একবার দেখতে এসেছিলেন। তার পরেই সাদা কাপড়ের আবরণ দিয়ে যত্ন নেওয়ার একটি মিথ্যে কুয়াসার সৃষ্টি করা হয়েছিল। যদিও এর আগেই, বোধ হয়, অধিক যত্ন নেওয়ার ফলে তাঁর বুকে ঠাণ্ডা বসে গিয়েছিল, যার জন্যে মৃত্যু আরেকটি প্রাণ উপহার পেল। একই ঘরে পুলিশ কেসের রুগী আর কবি জীবনানন্দ! তারপর আবার প্রহরারত বেহারী শাস্ত্রীর খৈনী টিপতে টিপতে মৃদু স্বরে সম্মিলিত ঐকতান সঙ্গীত! বেদনায় আমরা এতই মুহ্যমান হয়ে পড়েছিলাম যে, এই সমস্ত ছোটখাট বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করবার মত মানসিক অবস্থা আমাদের ছিল না। সেই গাঢ় বেদনার উপশমের জন্যে আমরা মৃত্যুর আগেই শোকোচ্ছ্বাস লিখতে বসে গেছি। কিম্বা এমন একটি বক্তৃতার খসড়া করতে বসে গেছি যার জন্যে স্মৃতি-বাসর থেকে নিমন্ত্রিত অতিথিকে মুখ কালো করে চলে যেতে হয়। সিস্টার শান্তি দেবী ব্যর্থ হলেন তাঁকে আন্তরিক ভাবে সেবা করে। তাঁর সেবা, তাঁর অশ্রু, তাঁর বিনিদ্র রাত্রির প্রতীক্ষা, কিছুই রক্ষা করতে পারল না কবি জীবনানন্দের প্রাণ। পরে, না হয় শোকসভার শেষে আমরা দীর্ঘ বক্তৃতার উপসংহার টানতে পারব এই কথা বলে—'tis Death is dead, not he।

ভোর হয়ে এসেছে। আকাশের রঙ জীবনানন্দের পায়ের ব্যাণ্ডেজের মত কালচে লাল। নষ্ট, মৃত চাঁদকে কে যেন দিনের সমাধিক্ষেত্রে নিয়ে যাচ্ছে। শুকতারার প্রদীপ জ্বলছে কার হাতে? সারারাত অসহ্য আর্ত চীৎকারের পর অসীম ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ল এগারো নম্বর বেডের আগুনে-পোড়া লোকটি। বিছানার একপাশে দাঁড়িয়ে কবির দিকে তাকিয়ে ছিলেন দিলীপবাবু। হঠাৎ চোখের পাতা দুটো একটু কেঁপে কেঁপে উঠে খুলে গেল, এক আর্ত অসহায় দৃষ্টি। জিজ্ঞেস করলেন : 'এখন কটা বাজে?'

'ভোর পাঁচটা।'

চেখের পাতা দুটোকে বন্ধ করে আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন : 'লিখে রাখ আজকের তারিখটিকে, আজ থেকে গত এক বৎসর খুব গুরুত্বপূর্ণ সময়। এখন ভোর না সন্ধ্যে? আমি কি দেখতে পাচ্ছি জান? 'বনলতা সেন'-এর পাণ্ডুলিপির রঙ।'

আরো একদিন ; সেদিন কিছুটা ভাল ছিলেন। ডাক্তারেরা আশা করেছিলেন, আর কিছুদিন যদি এ-রকম অবস্থা থাকে তবে বেঁচে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা। সেই দিন রাত বারটা-একটার মত হবে, কবি মাঝে মাঝে চোখ মেলছিলেন, ক্লান্ত, উদাস। মাঝে মাঝে হাত টেনে নিয়ে চাপ দিচ্ছিলেন, কখনো হাতটাকে টেনে নিচ্ছেন গালের ওপর। আমাদের দিকে তাকিয়ে বল্লেন : 'আচ্ছা, আমাকে তেঁতলায় নিয়ে যেতে পার। আমি আকাশের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে কবিতা বলবো, আমার যে রেডিয়ো প্রোগ্রাম আছে।'

এর আগে দু'দিন পর পর নিদ্রাহীন রাত জেগেছে ভূমেন। সেই রাত সুজিতবাবুর। দিলীপবাবুর থাকার কথা নয় ; অথচ কখন যে আশ্চর্য এমনও হয়—দিলীপবাবু ছুটে চলে এসেছেন। মৃত্যু তার সব আয়োজন পূর্ণ করে এনেছে, এবং প্রগাঢ় শূন্যতা, এক অন্তহীন মুখর মৌনতা। আমাদের দিদি সুচরিতা দাশ—জীবনানন্দের ছোট বোন—অসহ্য বেদনার ভারে অবসন্ন, ক্লান্ত ; তাকিয়ে আছেন অনিমেষ দৃষ্টিতে যেন সব শেষের যে কথাটি ধরো-

থরো করে কেঁপে উঠবে কবির চোখে তাকে ধরে রাখবেন হৃদয়ের অন্তর্লোকে। 'এই সময় ভূমেন যদি থাকত!' বলল স্নেহাকর। কিন্তু খবর দেবে কে? এই চরম মুহূর্তের পর বেদনাটুকু বুক ভরে নিতে হবে বলে সবাই উৎকণ্ঠিত! যে যাবে তার তো এই বেদনার সান্ত্বনা না-ও থাকতে পারে। তবুও দেখা মেলে একটি বন্ধুর। সে প্রতাপ গোস্বামী—'ময়ূখে'র সুখদুঃখের সহচর। 'ময়ূখে'র যারা কাছে তারা কেউই দূর নয় তার হৃদয় থেকে। তাই ডেকে নিতে হয় নি, সে নিজেই প্রতিটি রাতে এসেছে সময় মত। কেউ যাবে না তাই প্রতাপ ছুটে গেল কলেজ ষ্ট্রীটে, ভূমেনের কাছে।

সন্ধ্যেবেলায় যাদের দেখেছি তাদের মধ্যে এখন নেই অনেকেই। শুধু একটি নিবিড় ছোট ভিড় রয়ে গেছে দরজায় ; সবাই মিলে যেন একটি উৎকণ্ঠার শিখা। এখন শুধু অন্তহীন অন্ধকার লগ্নের প্রতীক্ষায় থাকা। মনে মনে বলি, শেষহীন হোক এই অতন্দ্র জাগার ব্যথার কান্নার রাত্রি। কটা বেজেছে বুঝতে পারি না—জানি না কখন যে অন্তহীন প্রেমে কবি নেমে পড়েছেন নীরবতার প্রগাঢ়তায়। শুধু দেখলাম শুধু শুনলাম সিষ্টার শান্তি দেবীর চোখে অশ্রুর অশ্রুত ধ্বনি পবিত্র ঘণ্টার মত কেঁপে কেঁপে উঠছে। এগারটা পঁয়ত্রিশ। সবাই স্তব্ধ। কান্না চাপবার একটি ব্যর্থ প্রয়াস। দিদি কাঁদছেন। চিরদিনের মত শেষ হয়ে গেল আকাশের দিকে চেয়ে চেয়ে কবিতা বলার সাধ। পাণ্ডুলিপির রঙ মুছে গেল জীবনানন্দের চোখ থেকে। কথা বলে না কেউ। এক মহাসমুদ্রের সঙ্গমে তীর্থযাত্রীর মত সবাই প্রার্থনায় অবনত। সিঁড়িতে দ্রুত পদক্ষেপ। হাওয়ায় আকুলতার আর্তনাদের স্পন্দন। স্তব্ধতা দুলে দুলে ওঠে। আমরা তাকালাম। ভূমেন আর প্রতাপ।

সমস্ত ব্যবস্থা করে কবিকে নিয়ে যেতে অনেক রাত হয়ে গেল। মোটরের মধ্যে কবিকে শুইয়ে দেওয়া হয়েছে। 'পূর্বাশা'র সত্যপ্রসন্ন দত্ত ও 'চতুরঙ্গে'র মানিক মুখোপাধ্যায় চলে গেলেন। ড্রাইভার গাড়িতে ষ্টার্ট দিল এলগিন রোড ধরে ল্যান্সডাউনে গিয়ে গাড়ি পড়েছে। গভীর রাত্রি। মহানগরী ঘুমে অচেতন। সারি সারি দেবদারু আর কৃষ্ণচূড়া গাছ চোখ মেলে দেখছে এই মহাযাত্রা। আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মত এই রাত। মেঘের স্তূপ আকাশের বুক চেপে ধরেছে। গ্যাসের আলো মিট্‌মিট্ করে জ্বলে, সৃষ্টি করেছে এক স্বপ্নময় কুহক। বিশাল রাস্তা মৃত অজগরের মত শুয়ে আছে। গাড়ি চলেছে এর ওপর দিয়ে। নিবিড় নির্জন রাস্তা। কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ। সর্বাঙ্গে বৈধব্যের শ্বেত আভরণ। অপরিসীম ব্যথায় গাছের আড়ালে মুখ লুকিয়েছে। আকাশে অসংখ্য মৃত তারাদের মিছিল। যে নক্ষত্রেরা হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে। মৃত্যুহীন জ্যোতির্লোকে যেতে যেতে স্বর্গপথযাত্রী নক্ষত্রের মুখর ভাষা মূক সঙ্গীতের রাগিনীর মত নিবিড় নীরবতায় প্রবহমান। সময়ের ক্লেদাক্ত নরককুণ্ডে ফেলে আমরা তোমাকে হনন করেছি—বরণ করবো তোমাকে—হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে, কিম্বা ভিজে মেঘের দুপুরে ধান-সিড়ি নদীটির পাশে। শান্ততা ও নীরবতার ওড়নাঢাকা রাস্তা শেষ হয়েছে। গাড়ি এসে বাড়ির সামনে দাঁড়াল। দোতলার একটা ঘরে কবিকে শুইয়ে রেখে আমরা চলে এলাম।

পরদিন সকাল বেলায় গিয়েছি। কবির কবি-বন্ধুরা সবাই এসেছেন। 'কল্লোল'-যুগে দুর্বার প্রাণ-প্রাচুর্যে যিনি ছিলেন উচ্ছল, সুখদুঃখের দোলায় যিনি দীর্ঘদিন জীবনানন্দের সঙ্গে এক পথে হেঁটেছেন, আজকের এই শোক্‌শুভ্র শেষের দিনেও সেই বান্ধব উপস্থিত। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি গভীর নিদ্রার-কোলে সমাহিত। 'অমাবস্যা'র কবি অচিন্ত্যকুমারের অন্তরও বুঝি অন্তহীন অমাবস্যায় আচ্ছন্ন। বুদ্ধদেব, প্রেমেন্দ্র মিত্র ও

আরো অনেকে এসেছেন, আর এসেছেন সজনীকান্ত, মৃত্যুতে প্রেমের সেতুবন্ধন হয়ে গেল। জীবনানন্দের সঙ্গে সজনীকান্ত। তরুণ-কবিরা জমে আছেন সিঁড়িতে। বেদনায় এলোমেলো। সবার মুখ বেদনায় পাণ্ডুর। পরিচিত-অপরিচিত অনেকে চোখের জল চেপে রাখতে পারলেন না। একটি শোকশ্রীময়ী মেয়ে অস্থির পায়ে এ-ঘর ও-ঘর ঘুরে বেড়াচ্ছে, সমস্ত পৃথিবীর কান্না তার দুই চোখে জমা, কিন্তু গলে পড়ল না এক ফোঁটা।

উত্তরসূরীরা খাট তোলার সঙ্গে সঙ্গেই যে যার বাড়ির দিকে পা বাড়ালেন। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় চললেন আমাদের সঙ্গে শ্মশানে। চিতার ওপর অনেকে ছড়িয়ে দিল ফুলের মালা, কেউ জ্বালালে ধূপকাঠি। সুদূর বজ্‌বজ্‌ থেকে ছুটে এসেছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। জনগণের কবি শ্রদ্ধার অঞ্জলি অর্পণ করতে এসেছেন হেমন্তের কবির শেষের দিনে।

ঘরোয়া জীবনানন্দ

মিনু সরকার

কবি বলে জীবনানন্দ প্রথম স্বীকৃতি পান মা কুসুমকুমারীর কাছ থেকে। তাঁর এই প্রথম সন্তান যে একজন সামান্য বালক নয়, একজন নিমগ্ন-প্রাণ কবি, কর্মে এবং ধ্যানে, কুসুমকুমারীর এটা বুঝে নিতে সময় লাগেনি। যে রান্না ঘরে বসে কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে তিনি কবিতা রচনা করতেন সেখানে মাঝে-মাঝেই বালক জীবনানন্দ উপস্থিত হতেন, মাকে শোনাতেন তাঁর সদ্য রচিত কবিতা। আর মাও বুঝতেন। এই তাঁর সন্তান, যে এই পৃথিবীতে বাসের উপযোগী চালাক-চতুর নয়, বাস্তব বুদ্ধি যার বিশেষ কম, তাকে আগলে রাখতে হবে, ত্রাণ করতে হবে সবরকম আবিলতা থেকে। দুহাতে আগলে রাখতেন তিনি জীবনানন্দকে। জীবনানন্দের সামনের বাঁচার দিনগুলো যে খুবই প্রয়োজনীয়, খুবই মহার্ঘ বাংলা কবিতার জন্য, তা তিনি, এবং তখন পর্যন্ত তিনিই একমাত্র বুঝেছিলেন।

এ-সব কথা আমি শুনেছি সুচরিতা দাশের কাছ থেকে। সুচরিতা দাশ জীবনানন্দের বোন। ভাই-বোনের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ষোল-সতেরো বছরের, যে জীবনানন্দের কথা সুচরিতা দাশ স্পষ্ট মনে করতে পারেন তিনি একজন পরিপূর্ণ কবি, পরিণত এবং আত্মসচেতন। মাঝে মাঝে কখনো কোনো আবেগ নিবিড় মুহূর্তে তিনি সেই পরিণত এবং পরবর্তী কালের প্রতিষ্ঠিত জীবনানন্দের কথা আমাকে বলতেন।

ভাগ্যবশত জীবনানন্দের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হবার সুযোগ আমি পেয়েছিলাম। মেদিনীপুরের তমলুকে সান্ত্বনাময়ী বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা ছিলেন সুচরিতা দাশ। সেই স্কুলেরই শিক্ষিকা হিসাবে কাজে যোগ দিই ১৯৫১ সালে। সুচরিতা দাশ আমার পূর্ব পরিচিত ছিলেন। আমার দাদা ভূমেন্দ্র গুহর মাধ্যমে, তাঁর এবং তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। প্রথম দিন থেকেই সুচরিতা দাশের অকৃপণ স্নেহ আমার কপালে জুটে যায়। থাকতাম তাঁর সঙ্গে একই বাড়িতে। রাত্রে সব কাজকর্মের পর দিদির সঙ্গে অনেক গল্প হোত।

দিদির মুখেই শুনেছি জীবনানন্দের ছোটবেলার কথা। যে ঘরে তিনি থাকতেন তা বাড়ির এক পাশে, আর সেই ঘরের পাশে যা ছিল তাকে কিছুতেই সুসজ্জিত বাগান বলা চলে না। গভীর ভালবাসা ছিল জীবনানন্দের সেই বাগানের প্রতিটি গাছ লতা ঘাস মাটির জন্য। এদিকে জীবনানন্দের বাবা সত্যানন্দ ছিলেন সুচরিতার কথায় ঋষিকল্প মানুষ। প্রতিটি মানুষের প্রতিই ছিল তাঁর নিবিড় স্নেহ আর সহানুভূতি। একটি গরিব লোক প্রায়ই আসত কিছু কাজের আশায়। গরিব লোক কিছু পয়সা পাবে এই কথা ভেবেই সত্যানন্দ বাগানের বেড়ে ওঠা ঘাসলতাগুলোকে পরিষ্কার করে দিতে বলতেন। কিন্তু অত সহজে মেনে নিতে পারতেন না জীবনানন্দ। কী ভীষণ কষ্ট পেতেন তিনি সেই বড় হয়ে ওঠা ঘাসগুলোর বিনাশ দেখে।

সারাদিন এইসব গাছ-গাছালির মধ্যেই বসে থাকতেন তিনি। বড় বড় উঁচু উঁচু ঘাসের মধ্যে গভীর নিমগ্ন। দেখতেন বাদাম গাছ ঘিরে বেড়ালবাচ্চার খেলা। এই খেলা দেখা খুব প্রিয় ছিল তাঁর।

সুচরিতা অবশ্য বলেননি এই নিবিড় ঘাসের সান্নিধ্যই তাঁর পরবর্তীকালে রচিত, 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত 'ঘাস' নামের কবিতার প্রেরণা কিনা, কিংবা বাদাম গাছের তলার বেড়ালগুলোই তাঁকে ভবিষ্যতে লিখিয়েছিল একই কাব্যগ্রন্থের 'বেড়াল' নামক কবিতাটি।

জীবনানন্দের সঙ্গে তাঁর পিতার সম্পর্ক ততটা নিবিড় ছিল না, যেমন তাঁর নিবিড়তা ছিল মার সঙ্গে। রান্নাঘরে গিয়ে মার সঙ্গে কেবল কাব্য আলোচনাই হতো তাই না, নানারকম সুখাদ্য জননী তার সন্তানকে খাওয়ানোর জন্য ব্যগ্র ছিলেন এবং সন্তানটিও ছিলেন যথার্থ ভোজন রসিক।

পরবর্তী কালে, সুচরিতা বলতেন দাদার কাছে যাবার সময় কিছু খাদ্যবস্তু তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতেই হতো। বিশেষ করে আচার। নানা ধরনের নানা দ্রব্যের আচার। দাদার কাছে গেলেই দাদার প্রথম কৌতূহল ছিল 'খুকি' সঙ্গে করে কী খাদ্যদ্রব্য এনেছে সে বিষয়ে। ভাইবোনেরা জীবনানন্দকে যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা করতেন এবং তাঁর আর্থিক অনটনের সময় তাঁকে নানাভাবে সাহায্য করতেন একথা বার বার ঘুরে ফিরে বলতেন দিদি। এর কারণ যে বাজারে প্রচলিত একটা ভ্রান্ত ধারণা সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! এমন কি বিয়ের পর প্রথম যখন তমলুকে দিদির সঙ্গে দেখা করতে যাই, প্রথম দর্শনেই তিনি আমার স্বামীকে, যিনি সাহিত্য জগতের সঙ্গে যুক্ত, অনেকক্ষণ ধরে বুঝিয়েছিলেন দাদার দারিদ্র্য দূর করার জন্যে তাদের অর্থাৎ তাঁর এবং মেজদা অশোকানন্দর চেষ্টার সীমা ছিল না। বাজারের রটনা কেবল রটনামাত্রই।

জীবনানন্দ তমলুকে গিয়ে দু-একবার বোনের কাছে ছিলেন। বোনকে তিনি কতো ভালবাসতেন সে কথা একটি রচনায় লিখেছেন সুচরিতা (ময়ূখ ঃ জীবনানন্দ সংখ্যা)। ভালবাসতেন কিন্তু কখনই বোনকে বিব্রত করতে চাইতেন না। মাঝে তাঁর আর্থিক অবস্থা যখন একেবারেই ভাল নয় তখনও তিনি বোনের কাছে নিজের অবস্থার কথা প্রকাশ করেন নি। তবু সাধ্যমত দাদাকে যা দিতেন তা খুব সাগ্রহে গ্রহণ করতেন তিনি।

প্রচলিত বিবেচনায় যাকে সুন্দর বলে, জীবনানন্দ যে তা ছিলেন না আমরা তা জানি। কিন্তু একটা দুর্নিবার আকর্ষণ ছিল তাঁর সৌন্দর্যের প্রতি। বিবাহ করার জন্য তিনি একজন সুন্দরী রমণীর কথাই ভেবেছিলেন এবং সেই কথা মনে রেখেই তাঁর জন্য পাত্রী অন্বেষণ করা হয়েছিল। তিনি যাকে বিবাহ করেছিলেন, পাত্রী দেখার সময় তার সঙ্গের বিখ্যাত কবি-বন্ধুরা তার সঙ্গে সমমত হ'য়ে যাকে পছন্দ করেছিলেন, তিনি যথার্থ সুন্দরী ছিলেন।

লাবণ্য দাশ, জীবনানন্দের স্ত্রীও আমার খুব কাছের মানুষ ছিলেন। তাঁর মুখে জীবনানন্দ সম্বন্ধে অনেক অভিযোগ শুনেছি। সেই অভিযোগ লাবণ্য দাশের দৃষ্টিকোণ থেকে যে খুব অযৌক্তিক তা আমার কখনো মনে হয়নি। লাবণ্য দাশ অতি সাধারণ বাঙালী মহিলা ছিলেন, জীবনে সুখ স্বাচ্ছন্দ্য পেতে চেয়েছিলেন। আর্থিক সচ্ছলতা এবং সবার উপরে একজন স্বাভাবিক মানুষকে? চেয়েছিলেন যিনি অন্য সব স্বামীর মতো নিজের জীবন স্ত্রীকে ঘিরেই গড়ে তুলবেন। অনেকটা সময় দেবেন তার সুন্দরী স্ত্রীর জন্য। আর্থিক প্রাচুর্য জীবনানন্দের কোনদিনই ছিল না। আর তিনি যে অন্তর্মুখী ছিলেন সে বিষয়ে আর সন্দেহ কি! লাবণ্য দাশ অভিযোগ করতেন সাংসারিক কাজকর্মে তার অবহেলা বিষয়ে।

অবহেলা বা অক্ষমতা যাই বলা যাক সংসারের সব কাজ একাই লাবণ্যকে সামলাতে হত। বলে গেলেন বৃষ্টি এলে কাপড় জামাগুলো ঘরে তুলে রেখ। এসে দেখলেন বৃষ্টি ঠিকই এসেছে কিন্তু তাঁর কবি-স্বামী মশগুল রয়েছেন ছেলেমেয়ের সঙ্গে গল্প করায়।

প্রসঙ্গত লাবণ্য দাশের সম্পর্কে মামা অথবা কাকা ছিলেন প্রখ্যাত রহস্য উপন্যাস লেখক নীহাররঞ্জন গুপ্ত। আমাকে প্রায়ই বলতেন উনিও ত লেখক কিন্তু কত টাকা উপার্জন করেন, খ্যাতিও কম নয়। কিন্তু এতই দুর্ভাগা তিনি, তাঁর কবি লেখক স্বামী অর্থ তো উপার্জন করতে পারেনই নি, আর জীবদ্দশায় খ্যাতির প্রশ্ন ত ওঠেই না। সমাজে তাঁর নাম কেউ শুনেছে বলে মনে হতো না।

যাই হোক, ছেলেমেয়েরা প্রাণপ্রতিম ছিল জীবনানন্দের। লাবণ্য দাশ বলতেন ছেলেমেয়ের সামান্য অসুখ হলে সমস্ত রাত সন্তানের মাথার কাছে নির্ঘুম কাটাতেন তিনি। বাইরে যেতে হ'লে ফিরে এসে প্রথমেই প্রশ্ন করতেন তাদের সুস্থতার বিষয়ে।

মা-বাবার প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ভালবাসা, ভাই বোনদের জন্য নিবিড় স্নেহ-প্রীতি, ছেলেমেয়েদের জন্য ভালবাসা আর উৎকণ্ঠা, কিন্তু স্ত্রীর প্রতি জীবনানন্দের আচরণে কোথাও একটা নিঃশব্দ উদাসীনতা লক্ষ্য করতেন লাবণ্য। তার কারণ কি সে বিষয়ে তিনি অবশ্য আমাকে কিছু বলেননি। অন্তত নিজের ত্রুটির কথা বলেননি। কবিদের এই রকমই মনোভাব, কবিদের সঙ্গে বিবাহ হলে এই বেদনা যন্ত্রণা সহ্য করাটাই নিয়তি—এটাই তিনি বার বার বলতেন। আমার বিয়ের পর কবি হিসেবে আমার স্বামীর সামান্য পরিচিতি আছে শুনে তিনি আমাকে প্রথমেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন ভবিষ্যতের অশেষ দুর্গতি অবহেলা বঞ্চনার সম্ভাবনা বিষয়ে। তাঁর ভাষায় 'খুব সাবধানে থাকিস।'

আসলে আমি যতটুকু বুঝেছি লাবণ্য দাশ মানুষটি ছিলেন সহজ সাদাসিধে পার্থিব। কবিতা তিনি একেবারেই বুঝতেন না। কবিতা রচনা যে একটা গুরুত্বপূর্ণ কাজ এটাও তাঁর ধারণার বাইরে ছিল। যদিও কবির স্ত্রী বলে তাঁর একটা গর্ব ছিল। আমাকে প্রায়ই বলতেন 'বনলতা সেন' আসলে তিনিই। জীবনানন্দ যে তাঁকে কত ভালবাসতেন সে কথাও মাঝে মাঝে শোনাতেন। অবশ্য তখন তিনি বুঝে গেছেন জীবনানন্দ কতবড় কবি ; তার চেয়েও বেশি, দেশ জুড়ে তাঁর খ্যাতি ও সম্মান।

জীবনানন্দের পরিবারের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেলামেশার সুযোগ আমার হয়েছিল। জীবনানন্দের ভাই অশোকানন্দের রাসবিহারী অ্যাভিন্যুর বাড়িতে আমি লাবণ্য দাশকে দেখেছি। সেখানে তাঁর অসম্মাননা যেমন কখনও দেখিনি, চোখে পড়েনি সেইরকম তাঁর প্রতি বিশেষ কোন সম্মান। সব কিছুই শীতল নিস্পৃহ একটা কর্তব্য পালন। জীবনানন্দের পরিবারের লোকেরা সকলেই মিতভাষী ছিলেন, আর লাবণ্য দাশ ছিলেন প্রগলভা। তিনি কিছুতেই সহজ হতে পারতেন না সেখানে। অশোকানন্দের স্ত্রী নলিনী দাশ, যাকে আমি মেজবৌদি ব'লে ডাকতুম, যাঁর ডাকনাম ছিল মিনি, তিনিও ছিলেন ব্যক্তিত্বময়ী স্বল্পভাষী রমণী। ব্রাহ্ম সমাজের এই শীতল শোভন জীবন-যাপনের ভিতর লাবণ্য দাশকে কিছুটা বেমানান বলেই আমার মনে হোত।

জীবনানন্দের কিছু কবিতায়, বিশেষ করে উপন্যাসে বিবাহিত স্ত্রী তথা ব্যক্তি নারীর প্রতি কখনো-কখনো ব্যঙ্গ বিদ্রূপ দেখা যায়। অনেকেই তার পটভূমিতে লাবণ্য দাশকে রাখতে চান, দেখেছি। এটা কতদূর সঙ্গত বলতে পারব না। তবে এটা উল্লেখ করবো লাবণ্য দাশের সঙ্গে কথা ব'লে বুঝতে আমার অসুবিধা হয়নি যে জীবনানন্দের বিবাহিত

জীবন যেমন সুখের ছিল না, তেমনই সুখের ছিল না লাবণ্য দাশের দাম্পত্য জীবনও। জীবনানন্দের মৃত্যুর অব্যবহিত পরে তিনি কাউকে বলেছিলেন, অচিন্ত্যবাবু, প্রেমেন্দ্রবাবু, সজনীবাবুরা যখন তাঁর প্রতি শেষ শ্রদ্ধা জানাতে এসেছেন, এবং তোমাদের মতো অল্প বয়সী এত সব ছেলেপিলেরা, তখন বলতেই হবে তোমাদের দাদা বড়ো লেখক ছিলেন। বাংলা সাহিত্যের জন্য তিনি হয়তো অনেক রেখে গেলেন, কিন্তু আমার জন্য কী রেখে গেলেন, বলো তো!

ধানসিড়ি নদীর সন্ধানে

অবিভক্ত বাংলার পূর্ববঙ্গে, ফরিদপুর জেলার এক গণ্ডগ্রামে আমার জন্ম। কিন্তু বাল্যকালে ফরিদপুর থেকে কলকাতায় অনেকবার এসেছি বটে, কিন্তু ওদিকে, আরও পুবে কখনো যাওয়া হয়নি। এমনকি ঢাকা শহরও দেখিনি। আমার প্রথম ঢাকা-দর্শন পাকিস্তান আমল শেষ হবার পর, স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার প্রথম মাসে।

তারপর বাংলাদেশে যাওয়া আসা করেছি অনেকবার, কিন্তু প্রায় প্রত্যেকবারই আটকে গেছি ঢাকায়। বার দু-এক চট্টগ্রাম, কক্সবাজার ভ্রমণ করেছি যদিও কিন্তু অন্য জেলাগুলি দেখার সুযোগ ঘটেনি। ঢাকার বন্ধুরা অন্য অনেক জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে বটে, কিন্তু আড্ডার নেশায় মেতে প্রতিবারই ঘনিয়ে এসেছে ফেরার দিন।

গত বছর অপ্রত্যাশিত সুযোগ এসে গেল।

১৯৫৬ সালে বাংলাদেশের সাধারণ নির্বাচন গণতন্ত্রের দিক থেকে একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। এই নির্বাচন সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ হয় কিনা তা পর্যবেক্ষণের জন্য পৃথিবীর বহুদেশ থেকে প্রতিনিধিরা উপস্থিত হয়েছিলেন। সার্ক গোষ্ঠিভুক্ত দেশগুলি থেকেও প্রতিনিধি প্রেরণ করা হয়েছিল, তার মধ্যে ভারত থেকে দশজন, সেই ভারতীয় দলটির মধ্যে কী করে যেন দৈবাৎ আমাকে অন্তর্ভুক্ত করা হলো। এই দলে আরও দু'জন বাঙালি ছিলেন বটে, প্রখ্যাত সাংবাদিক নিখিল চক্রবর্তী এবং বিশিষ্ট সমাজতাত্ত্বিক আশিস নন্দী, দু'জনেই দিল্লি প্রবাসী, পশ্চিমবাংলা থেকে আমিই একমাত্র।

নির্বাচনের পর্যবেক্ষক, তাই সরকারি ভাবে দারুণ খাতির যত্নের ব্যবস্থা। বিমান থেকে নামার সঙ্গে সঙ্গে কূটনৈতিক বিভাগীয় ব্যক্তিরা ভি আই পি লাউঞ্জে নিয়ে গেলেন, তারপর তুললেন ঢাকার সর্বোত্তম হোটেলে। সর্বক্ষণের ব্যবহারের জন্য ড্রাইভার সমেত গাড়ি। খাওয়া-দাওয়া স্বাচ্ছন্দে'র কথা আর বর্ণনা দিয়ে কাজ নেই। কে বলবে যে এক দরিদ্র দেশে এসেছে আর এক দরিদ্র দেশের মানুষ!

ইওরোপ-আমেরিকা-জাপান থেকেও পর্যবেক্ষকরা এসেছেন, সকলকে শুধু ঢাকায় বসিয়ে রাখার কোনো মানে হয় না। তাই প্রস্তাব নেওয়া হলো যে পর্যবেক্ষকদের ভাগ ভাগ করে পাঠিয়ে দেওয়া হবে বিভিন্ন জেলায়। আমাদের আপ্যায়নের ভার যাঁরা নিয়েছেন, বাংলাদেশের সেই সব কর্তা ব্যক্তিদের অনেকের সঙ্গেই আমার আগে থেকে চেনাশুনা, তাঁরা আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, কোনো বিশেষ জেলা আমার পছন্দ কি না। তা হলে তাঁরা সেখানেই আমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবেন। প্রায় কিছু না ভেবেই আমি বললাম, বরিশাল!

তাঁরা বেশ অবাক হয়েছিলেন। অনেকেই জানতেন যে আমার জন্মস্থান ফরিদপুর,

তথা মাদারিপুরে। আগে মহকুমা ছিল এখন মাদারিপুর একটি স্বতন্ত্র জেলা। আমি তো ইচ্ছে করলেই মাদারিপুর বেছে নিয়ে সেখানে গিয়ে স্মৃতি রোমন্থনের সুযোগ পেতাম। কিন্তু সেখানে যেতে আমার ইচ্ছে করে না।

আরও তো জেলা ছিল, তবু বরিশাল আমি বেছে নিলাম কেন? বরিশালে আমার তেমন চেনাশুনো কেউ নেই। আলাদা কোনো আকর্ষণ নেই। তবে কিছুদিন আগে তপনমোহন রায়চৌধুরীর লেখা স্মৃতি-রম্যকাহিনীতে বরিশাল সম্পর্কে অনেক কিছু পড়েছিলাম, সেই জন্য কি বরিশাল নামটা প্রথমে মনে এসেছিল?

আর একটি চমৎকার ব্যাপার ঘটলো। বাংলাদেশের পক্ষ থেকে আর একজন যে পর্যবেক্ষককে আমার সঙ্গে যুক্ত করে দেওয়া হলো, সে আমার পূর্ব পরিচিত তো বটেই, আমার প্রিয় ও বিশেষ স্নেহভাজন ইমদাদুল হক মিলন। মিলন বাংলাদেশের প্রখ্যাত ঔপন্যাসিক ও ছোট গল্পকার, অল্প বয়েস থেকেই সে দারুণ জনপ্রিয়, তা ছাড়াও তার মতন পড়ুয়া আমি খুব কম দেখেছি। বাংলা সাহিত্যের যাবতীয় রচনা তার পড়া, তার স্মৃতিশক্তিও ভালো। মিলনের সঙ্গে কথা বলে আনন্দ পাওয়া যায়। আমাদের তত্ত্বাবধানের জন্য পররাষ্ট্র দফ্‌তরের এক তরুণ অফিসারকেও সঙ্গে দেওয়া হলো তার নাম আনোয়ার। বয়েস বেশ কম, প্রথম প্রথম তার ব্যবহার বেশ আড়ষ্ট মনে হয়েছিল। সে আমাকে মিষ্টার গঙ্গোপাধ্যায় বলে সম্বোধন করছিল। কোনো বাঙালির মুখে এ রকম সম্বোধন শুনলে আমার পিত্তি জ্বলে যায়। আমি ধরেই নিয়েছিলাম, এ ছেলেটি মেধাবী ছাত্র, পরীক্ষা দিয়ে চাকরি পেয়েছে। কেরিয়ার ডিপ্লোম্যাট হতে চায়, সাহিত্যের ধার ধারে না, আমি যে কিছু লিখি টিখি তা সে জানেও না। একদিন পরেই ভুল ভেঙেছিল, আনোয়ার আসলে বেশ লাজুক, রোমান্টিক, সাহিত্য প্রেমিক, নিজেও কিছু কিছু লেখে। আমি তার তুলনায় অনেক বয়স্ক লেখক বলেই সে প্রথমে স্বাভাবিক হতে পারেনি। এক সময় মৃদু গলায় জিজ্ঞেস করেছিল, আমি কি আপনাকে সুনীলদা বলে ডাকতে পারি?

নির্বাচনের দু'দিন আগে আমরা গাড়িতে যাত্রা করলাম বরিশালের দিকে। গাড়িতে বরিশাল? পুরোনো আমলের মানুষেরা একথা শুনলে বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলবেন। বরিশাল অনেক নদী ও জলাভূমি ঘেরা জেলা, ট্রেন লাইন নেই, স্থলপথে যাবার কোনো উপায়ই ছিল না বহুকাল। নৌকো বা স্টিমারই ভরসা। পরাধীন আমলে সাহেবরা খুলনা থেকে বরিশাল পর্যন্ত যাত্রীবাহী স্টিমার চালাতেন। তাঁদের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় নেমে জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বদেশী স্টিমার সার্ভিস চালু করে সর্বস্বান্ত হয়েছিলেন।

বাংলাদেশের পথ ঘাটের এখন অনেক উন্নতি হয়েছে। পশ্চিমবাংলার সঙ্গে কোনো তুলনাই চলে না। সর্বত্রই মসৃণ রাস্তা। এত নদী, সব জায়গায় এখনো ব্রিজ তৈরি হয়নি। কিন্তু গাড়ি কিংবা বড় বড় যাত্রীবাহী বাস ফেরিতে পার করে দেবার সুন্দর ব্যবস্থা। ফেরিঘাটে বেশিক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় না। মোট ন'বার ফেরিতে নদী পার হতে হয়েছে, তার মধ্যে এক জায়গাতে সময় লেগেছে পৌনে দু'ঘণ্টা।

ঢাকা থেকে এদিকে আসতে গেলে দুটি ঘাট দিয়ে পদ্মা পার হতে হয়। আরিচা ও মাওয়া। আমরা এসেছিলাম বিক্রমপুরের মধ্য দিয়ে মাওয়া ঘাটে। এই বিক্রমপুরে ইমদাদুল হক মিলনের পৈতৃক বাড়ি। সে হাত তুলে কিছুদূরে তার বাড়িটা দেখালো। আমি ঐ ভাবে আমার নিজের বাড়ি দেখাতে পারবো না। আমাদের মতন যাদের বাড়ির অস্তিত্ব এখনো ঐ অঞ্চলে আছে সেগুলি নাকি 'শত্রু-সম্পত্তি'। আমি কী করে আর একজন বাঙালির শত্রু হয়ে গেলাম, তা জানি না!

মাওয়া ঘাট থেকে যে স্টিমারে ওঠা হলো, সেটি মস্ত বড়, প্রায় জাহাজের মতন। দিগন্তবিস্তৃত পদ্মা। এখানকার ক্যান্টিনে খাওয়া হলো ইলিশ মাছের ঝোল আর ভাত। খুব যে আহামরি লাগল তা নয়। সাধারণ রান্না। আজকাল পূর্ব বাংলার রাঁধুনিরাও ঝাল দিতে ভুলে গেছে। পদ্মার ইলিশের চেয়ে এদিককার কোলাঘাটের গঙ্গার ইলিশের স্বাদ যে অনেক বেশি ভালো, তা শুনলে ওদিকে অনেকে চটে যায়। পদ্মায় অনেক বেশি ইলিশ পাওয়া যায়, কিন্তু স্বাদে এদিককার গঙ্গার ইলিশ জিতে যায়।

পদ্মা পার হবার একটু পরেই আবার একটি নদী পার হতে হলো। আড়িয়াল খাঁ। আমার ছোটবেলার নদী! 'সে কেন দেখা দিল রে, না দেখা ছিল যে ভালো!' আমার চোখ জ্বালা করে উঠেছিল। নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কী এক দুর্দান্ত, গর্জমান, অনবরত পাড়-ভাঙা নদীর ছবি থাকে স্মৃতিতে, তার বদলে এখন চুপচাপ বয়ে চলেছে নিরীহ, সাধারণ এক নদী। হয়তো আগেও এরকমই ছিল, বাল্যকালে সব কিছুই বড় বড় লাগে। ইস্কুলের মাঠটাকে মনে হয় প্রকান্ড, বাড়ির পাশের দিঘিটার ওপারও যেন ছিল রহস্যময় জঙ্গলে ঢাকা, এক একটা রাস্তাকে মনে হতো অনন্তের পথ। তা ছাড়া আড়িয়াল খাঁ-কে আমি হয়তো স্মৃতিতে ধরে রেখেছি ভরা বর্ষার সময়কার রূপে। এখন প্রবল গ্রীষ্ম, সব নদীই শীর্ণ। এবং আছে ফরাক্কা বাঁধের সমস্যা, যে-জন্য বাংলাদেশের নদীগুলিতে জল কম আসে। বাঁধ বেঁধে বেঁধে পৃথিবীর সব দেশের নদীগুলিই যৌবন হারিয়েছে। কলকাতার গঙ্গার মাঝখানে গ্রীষ্মকালে লোকে হেঁটে বেড়ায়, বেলুড়ের কাছে আমি নিজে দেখেছি।

রাস্তার ধারে ধারে গ্রাম ও শহরগুলির নাম লেখা। ফরিদপুর, মাদারিপুর পেরিয়ে গেলাম। একটা জায়গার নাম দেখে বুকটা ধক করে উঠেছিল একবার। ট্যাকের হাট! এর খুব কাছেই আমার মামাবাড়ি আমগ্রাম। ঐ মামাবাড়িতেই আমার প্রথম যৌন-উন্মেষ হয়েছিল। ঐখানে সাঁতার শিখি। যখন তখন ইজের আর গেঞ্জি খুলে নিয়ে ল্যাংটো হয়ে এক হাত উঁচু করে ধরে, আর এক হাতে সাঁতার কেটে খাল পার হয়ে গেছি। ঐখানেই প্রথম সামনা সামনি দেখি মৃত্যু, আমার দাদামশাইয়ের। এখানেই প্রথম হাতে খড়ি। ওখানেই প্রথম দুর্গাপুজোর সময় পাঁঠা বলি দেখে দৌড়ে পালিয়ে গিয়ে আমি ছাদের এক কোণে এসে বসে কেঁদে ছিলাম।

গাড়িটা একটু ঘোরালেই আমার সেই মামার বাড়ি-আমবাগান-আটচালা-পুকুর এখন কী অবস্থায় আছে দেখে আসতে পারি। না, যাবো না, কিছুতেই যাবো না।

বিকেলের মধ্যে পৌঁছে গেলাম বরিশাল।

কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বরিশাল শহরে আমাদের আগমন বার্তা রটে গেল, যদিও কারুকেই আগে থেকে খবর দেওয়া হয় নি। আত্মগোপন করে থাকা মুস্কিল। মিলন অত্যন্ত জনপ্রিয় লেখক, তাছাড়া বাংলাদেশ টেলিভিশনে তার ধারাবাহিক অনুষ্ঠান হয়, সে নিজেও অনেক অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয় সশরীরে। সুতরাং পাঠকদের কাছে তার মুখ বিশেষ পরিচিত। এবং আশ্চর্য ব্যাপার, আমাকেও কেউ কেউ দেখেই চিনতে পেরে যায়।

পর্যবেক্ষকের দায়িত্ব নিয়ে এসেছি। নিয়ম মাফিক আমরা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের এস পি, পোলিং অফিসার কয়েকজনের কাছে খোঁজ খবর নিতে গেছি। এই সব আমলারাও বাংলা সাহিত্য সম্পর্কে একেবারে অজ্ঞ নন। কেউ কেউ অবশ্য বলেন, আমি নিজে অবশ্য আপনার লেখা কিছু পড়িনি। কিন্তু আমার বউ আপনার ভক্ত, বাড়িতে আপনার বই আছে। আবার কেউ কেউ আমাদের অবাক করে দিয়ে আমার কবিতার দু'চার লাইন মুখস্ত বলে দেয়, কিংবা মিলনের কোনো উপন্যাসের কাহিনী।

সাংবাদিকদের কাছে ধরা পড়ে গিয়ে পরদিন যেতে হলো স্থানীয় প্রেস ক্লাবে। অনেকেই বাড়িতে আমন্ত্রণ জানাতে চান। তাতে কিছুতেই রাজি হই না। পূর্ব অভিজ্ঞতা থেকে জানি, এক বাড়িতে আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে আরও অনেক বাড়িতে যেতে হবে, তারপর বত্রিশ ব্যাঞ্জন খেতে খেতে প্রাণান্তকর অবস্থা হবে। বাংলাদেশের মানুষদের মতন এত অতিথিপরায়ণ মানুষ আর কোথাও দেখিনি।

বরিশাল শহরে হিন্দুদের সংখ্যা এখনো নগণ্য নয়। অশ্বিনী দত্ত এককালে ছিলেন বরিশালের মুকুটহীন রাজা। এখানকার টাউন হলটি এখনো তাঁর নামে। বরিশালের আর একজন স্বনামধন্য পুরুষ ফজলুল হক। ভারতীয় কংগ্রেস যদি এক সময় তাঁর সঙ্গে অসহযোগিতা না করতো, তা হলে বোধহয় এ উপমহাদেশের ইতিহাস অন্যরকম হতো।

এক কালের সুখ্যাত ব্রজমোহন কলেজ বা বি এম কলেজ এখনো সগৌরবে চলছে। সম্প্রতি এই কলেজটিকে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিণত করার প্রস্তাব উঠেছে।

সন্ধেবেলা হোটেলের ঘরে বসে আড্ডা দিতে দিতে মিলন বললো, সুনীলদা, এই শহরে জীবনানন্দ দাশ কোন্ বাড়িতে থাকতেন, তা খুঁজে বার করলে হয় না?

মিলন কবিতা লেখে না, শুধুই গদ্যকার, কিন্তু অন্যান্য অনেক গদ্যকারের সঙ্গে তার তফাৎ এই যে সে খুব কবিতা ভালোবাসে। অনেক সময় তার সঙ্গে আমার গল্প-উপন্যাসের বদলে কবিতা নিয়েই কথা হয়।

বরিশালে এলে জীবনানন্দ দাশের কথা মনে পড়বেই, তাঁর বাড়িটি দেখার ইচ্ছে আমারও মনে উঁকি দিয়েছিল।

> আমি এ ঘাসের বুকে শুয়ে থাকি—শালিখ নিয়েছে নিঙরায়ে
> নরম হলুদ পায়ে এই ঘাস ; এ সবুজ ঘাসের ভিতরে
> সোঁদা ধুলো শুয়ে আছে—কাচের মতন পাখা এ ঘাসের গায়ে
> ভেরেণ্ডাফুলের নীল ভোমরারা বুলাতেছে—শাদা স্তন ধরে
> করবীর ঃ কোন্ এক কিশোরী এসে ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেছে ফুল,
> তাই দুধ ঝরিতেছে করবীর ঘাসে ঘাসে ঃ নরম ব্যাকুল।

জিজ্ঞেস করলাম, সে বাড়ি খুঁজে পাওয়া যাবে কি এতদিন পর? ওঁদের কেউ তো এখানে নেই শুনেছি।

মিলন বললো, লোকাল কারুর সাহায্য নিতে হবে। শহরটা আমিও ভালো চিনি না।

পরদিন একজন সাংবাদিককে পাকড়াও করা হলো। সুবিধের মধ্যে এই যে, আমাদের সঙ্গে একটি গাড়ি আছে। পেট্রোলের চিন্তা নেই, এবং ড্রাইভার ভদ্রলোকটি গোমড়ামুখো নন। বরিশাল শহরের মধ্য দিয়ে একটি রাস্তা চলে গেছে, তার নাম বগুড়া রোড। সেই রাস্তার এক বাঁকের মুখে খুঁজে পাওয়া গেল সেই বাড়ি। আশে পাশে বড় বড় হর্ম্য উঠে গেছে, কিন্তু এ বাড়িটি ছিমছাম একতলা। গেট পেরিয়ে ছোট্ট একটি উঠোন, অনেকটা বাগানের মতন, এদিকে ওদিকে কয়েকটি ঘর, পাকা দেওয়াল, ওপরে টালির ছাউনি। বাড়িটিতে এখনো বেশ একটা শান্তশ্রী আছে। বর্তমানে এক মুসলমান পরিবার এখানে থাকেন, তাঁরা যত্ন করে আমাদের দেখালেন।

প্রায় পঞ্চাশ বছর কেটে গেছে, এ বাড়ি একই রকম থেকে যাওয়া সম্ভব নয়। কিছুটা অদল বদল ও সংস্কার হয়েছে নিশ্চিত, কিন্তু একেবারে খোল নলচে বদলে যায় নি। একদিকের একটি ঘর দেখিয়ে একজন জানালেন যে সেটি প্রায় আগের মতনই আছে। কল্পনা করা যায়, জীবনানন্দ দাশ ঐ ঘরে বসে লিখতেন।

কত দিন তুমি আর আমি এসে এইখানে বসিয়াছি ঘরের ভিতর
খড়ের চালের নিচে, অন্ধকারে ; সন্ধ্যার ধূসর সজল
মৃদু হাত খেলিতেছে হিজল জামের ডালে ...

সে বাড়িতে আমরা বেশিক্ষণ থাকি নি। একটা বাড়ি অত দেখবার কী আছে? এক ঝলক দেখলে বেশি মনে থাকে।

গেটের পাশে সে বাড়ির নাম লেখা আছে 'ধানসিড়ি'। জীবনানন্দের আগের নয়, বর্তমান মালিকেরা এই নাম দিয়েছেন। তাঁরা ঐ কবির অনুরাগী।

তখন মনে হলো, তা হলে ধানসিড়ি নদীটাও খুঁজে দেখলে হয়। ঐ নামে সত্যি কোনো নদী আছে?

বরিশালের বেশ কয়েকজন তরুণ লেখক ও সাংবাদিক জানালো যে, ঐ নদী একটি নদী অবশ্যই আছে, তারা সবাই শুনেছে।

কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার তারা কেউ জানে না নদীটা ঠিক কোথায়, কেউ দেখে নি। দেখার আগ্রহও হয় নি?

ধানসিরি নামে একটি নদী আছে আসামে। ওখানে সুবনগিরি ধানসিরি এই রকম নদীর নাম হয়, কিন্তু বানান আলাদা। জীবনানন্দ লিখেছেন ধানসিড়ি, চন্দ্রবিন্দু দেন নি।

পৃথিবীর পথে ঘুরে বহু দিন অনেক বেদনা প্রাণে স'য়ে
ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাবো ব'য়ে
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে ...

জীবনানন্দ নিশ্চিত আসামের নদীটির কথা লেখেন নি, তাঁর নদীটি একান্তই বাংলার গ্রাম্য নদী। এক নামে একাধিক নদী থাকা অস্বাভাবিক কিছু নয়। ইছামতী ও যমুনা নামে বহু জায়গায় আলাদা আলাদা নদী আছে। বৈতরণী নামে নদীও একাধিক।

বরিশাল শহরের পাশ দিয়ে বয়ে যাচ্ছে 'কীর্তনখোলা' নদী। বেশ নামটি। কিন্তু জীবনানন্দ তাঁর কোনো কবিতায় 'কীর্তনখোলা' নামটি ব্যবহার করেন নি, অথচ দূরবর্তী ধলেশ্বরীর কথা এসেছে বারবার।

'কীর্তনখোলা' নদীটির রূপ উপভোগ করা যায় না। এককালে বরিশাল শহরটি নাকি সুন্দর ছিল, নদীর ধার দিয়ে বেড়াবার রাস্তা ছিল, এখন তা বোঝার উপায় নেই। নদীর ধারে কল-কারখানা ও বড় বড় গুদামঘর নদীকে একেবারে ঢেকে দিয়েছে, নদী দেখাই যায় না প্রায়। জনসংখ্যার চাপে শহরটি শ্রী হীন।

নির্বাচনের দিনটিতে আমাদের কাজ বিভিন্ন পোলিং বুথ ঘুরে ঘুরে দেখার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলা। কোথাও কোনো কারচুপি বা জোর জবরদস্তি চললে, বা সে রকম কোনো অভিযোগ শুনলে লিখে নিতে হবে। মোটামুটি নির্বিঘ্নেই ভোট চলছে, অনেক পোলিং বুথের সামনে লম্বা লাইন, সুতরাং আমাদের করনীয় তেমন কিছু নেই। আমি ও মিলন ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাঁকে খুঁজতে লাগলাম ধানসিড়ি নদীটি।

আগেকার বরিশাল এখন অনেক ভাগ হয়ে গেছে। মহকুমাগুলি এখন ছোট ছোট জেলা। যেসব ঝালকাঠি (উচ্চারণ : ঝালোকাঠি), পটুয়াখালি এগুলোও এখন জেলা, সব মিলিয়ে এখনো বলা হয় বৃহত্তর বরিশাল। এই বৃহত্তর বরিশালই আমাদের পরিদর্শন এলাকা। আমরা গাড়ি নিয়ে ঘুরছি অনবরত। শহরের ছেলেরা কেউ ধানসিড়ি নদীর সন্ধান

দিতে পারে নি, আমরা যে-কোনো নদীতে খেয়া পার হবার সময় স্থানীয় লোকদের কাছে ধানসিড়ির খোঁজ খবর নিই। কেউই সঠিক কিছু বলতে পারে না।

ঝালকাঠির দিকে যাবার জন্য প্রায়ই আমাদের একটি নদী পার হতে হয়। এদিকের অনেক নদীর নামই বেশ সুন্দর। যেমন, একটি নদীর নাম সন্ধ্যা। কিন্তু এই নদীটির নাম মোটেই সুন্দর নয়, বরং অদ্ভুত, মানে বোঝা যায় না। ডাবখান! কেউ কেউ বললো, এটা নদী নয়, কাটা খাল, যদি তাও হয়, তা হলেই বা একটা খালের নাম ডাবখান হবে কেন? সমুদ্রের কাছাকাছি এই নদী-মাতৃক দেশে ডাব পাওয়া যায় সর্বত্র। এখানকার ডাবের আলাদা কোনো বৈশিষ্ট্য নেই, বরং এখানকার সোনালি মর্তমান কলার স্বাদ অপূর্ব! কলা নয়, যেন ক্ষির।

যাই হোক, এই ডাবখান পারাপারের সময় একজন মাঝি জোর দিয়ে বললেন, হ্যাঁ, ধানসিড়ি নদী আছে ঐ তো ওদিকে। ওদিকে পানে অনেকগুলো নদী মিলেছে।

ডাবখান নদীর ধার দিয়ে বাঁধানো সড়ক নেই, মাঝিটি যেদিকটায় হাত তুলে দেখালো, সেদিকে গাড়ি নিয়ে যাওয়া যাবে না। গাড়ি ছেড়ে দিয়ে নৌকো ভাড়া নিয়ে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু খেয়ার লঞ্চ ছাড়া শুধু যাত্রী পারাপারের জন্য খেয়ার নৌকোও আছে, সে নৌকো ভাড়া নেওয়া যাবে না। অন্য কোনো নৌকো নেই, বহু নৌকোই নির্বাচনের ডিউটি দিচ্ছে। কোনোক্রমেই কি ঐ অনেক নদীর সঙ্গম স্থানটিতে যাওয়া যাবে না? খেয়ার ঘাটে অন্যান্য লোকদের জিজ্ঞেস করলে সকলেই মাথা নেড়ে বলে, মুস্কিল, এখান থেকে যাওয়া খুব মুস্কিল। কেউ কেউ বিস্ময়ে আমাদের মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। একটা অকিঞ্চিৎকর নদী দেখার জন্য আমাদের এই ব্যাকুলতার কারণ বুঝতে পারে না। কী আছে সেখানে?

তা হলে, ধানসিড়ি নদীটি জীবনানন্দের স্বকপোল কল্পিত নয়, একটা ঐ নামের বাস্তব নদী কাছে পিঠে আছে ঠিকই। সচরাচর যাতায়াতের পথে পড়ে না। ডাবখানের তীরে আমরা বেশি সময় কাটালে আমাদের সঙ্গী আনোয়ার বিনীতভাবে আমাদের কর্তব্যের কথা মনে করিয়ে দেয়। এখনো অনেক পোলিং বুথ দেখা বাকি রয়ে গেছে। আমরা ফিরে যাই।

কিন্তু যদি মারামারি না হয়, বুথ দখল বা বোমা ছোঁড়ার ঘটনা না ঘটে, তাহলে আর দেখার কী আছে? ঘোরাঘুরির ফাঁকে ফাঁকে আমরা অন্য দ্রষ্টব্য স্থান দেখে নিই। যেমন ফজলুল হকের বসতবাড়িটি দেখা হয়ে গেল। বেশ বড়, অনেকখানি ছড়ানো বাড়ি, এখনো বেশ সমৃদ্ধ অবস্থা বোঝা যায়। সে বাড়ির একটি অংশে ফজলুল হকের ব্যবহৃত জিনিষপত্র নিয়ে একটি সংগ্রামশালা করে রাখা হয়েছে। আমি ফজলুল হককে স্বচক্ষে দেখিনি। তাঁর বিশাল ব্যক্তিত্বের মতন চেহারাটিও যে বিশাল ছিল, তা তাঁর ব্যবহৃত চটি জুতো ও জল খাবার গেলাশের আকৃতি দেখলেই বোঝা যায়।

ফজলুল হকের এক ছেলেও রাজনৈতিক নেতা, এবারের নির্বাচনে প্রার্থী। জীবনানন্দ দাশের ছেলে ও মেয়ে দু'জনেরই মৃত্যু হয়েছে, তাঁর বংশে আর কেউ নেই। ট্রামের ধাক্কায় জীবনানন্দ যখন নিহত হন, তখন কবি হিসেবে কজনই বা চিনতো তাঁকে। তাঁর বাড়িটি সংরক্ষণের কথা কেউ চিন্তা করে নি, এমনকি কলকাতাতেও কত হেঁজি পেঁজি লোকের নামে রাস্তা আছে, জীবনানন্দ দাশের নামে কোনো রাস্তার নাম রাখা হয় নি। অন্তত ট্রাম কোম্পানি তো তাঁর স্মৃতি রক্ষার কোনো ব্যবস্থা করলে পারতো।

যেন চুম্বকের টানে আমরা ডাবখানের তীরে ফিরে যাই বারবার। ঝালকাঠির দিকে কী

যেন গণ্ডগোল হচ্ছে, এই উড়োকথা শুনে আমরা নদী পেরিয়ে সেদিকে গেলাম তৃতীয় বার।

ধানসিড়ি নামে নদী আছে, এটা জেনেই আমি সন্তুষ্ট, কিন্তু মিলন নিরুদ্যম হতে রাজি নয়। তার বয়েস কম, জেদী স্বভাব, আত্মবিশ্বাসে ভরপুর, সে ধানসিড়ি আবিষ্কার করবেই। এক জায়গায় একটা ছোট দোকানে সিগারেট কেনার জন্য থেমেছি, মিলন সেখানেও জিজ্ঞেসবাদ শুরু করেছে। হঠাৎ একজন লোক বললো ধানসিড়ি যাবেন? এই পাশের সরু রাস্তাটা দিয়ে চলে যান না! মাইল দেড়েক যেতে হবে।

সে রাস্তা দিয়ে গাড়ি যাবে? হ্যাঁ, যাওয়া যাবে অনেকখানি। এরকম একটা রাস্তা রয়েছে, তা আগে কেউ আমাদের বলেনি কেন? এ লোকটি কি সত্যি কথা বলছে? বিশ্বাস অবিশ্বাসের দোলাচল নিয়ে এগোলাম সেই গ্রাম্য কাঁচা রাস্তা ধরে। শেষ পর্যন্ত রাস্তাটা এসে নামলো এক নদীর কিনারে। একটা খাটিয়ার ওপর কয়েকজন লোক বসেছিল, তাদের জিজ্ঞেস করা হলো, এটা কী নদী? তারা বললো ধানসিড়ি!

এমন কিছু আহামরি রূপ নয় সে নদীর, তবু কেন নাম শোনা মাত্র রোমাঞ্চ হলো?

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হয়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;
হয়তো বা হাঁস হব—কিশোরীর—ঘুঙুর রহিবে লাল পায়
সারাদিন কেটে যাবে কলসীর গন্ধে ভরা জলে ভেসে ভেসে ...

এককালে এই ধানসিড়ি তীরেও খেয়াঘাট ছিল, এখন ডাবখানের বুকে ফেরি লঞ্চ চলে, ওদিকে পাকা রাস্তা হয়ে গেছে, তাই এখানে বিশেষ কেউ আসে না। এক সময় এ নদীও বেশ চওড়া ছিল, এখন মজে গেছে, একদিকে চরা পড়ে যাওয়ায় সেদিকে উঁচু বাঁধ দেওয়া। তবু এখনো এই নদী নাব্য, কিছু নৌকো চলাচল করে।

নদীর ঘাটে দাঁড়ালেই কি নদীকে চেনা যায়? নদীর সঙ্গে একটা শারীরিক সম্পর্ক হওয়া দরকার। সাহেবরা সেই রকমই মনে করে। একবার জামশেদপুরের দিক থেকে সুবর্ণরেখা দেখতে গিয়েছিলাম। তখন সন্ধ্যা ঝুঁকে এসেছে নদীর ওপর, পশ্চিম আকাশের সূর্য থেকে সত্যিই অনেকগুলি সুবর্ণরেখা নেমে এসেছে জলে, আমরা প্রথাগত ভাবে মুগ্ধ চোখে তাকিয়েছি, আমাদের সঙ্গী ছিলেন কবি অ্যালেন গীন্‌সবার্গ, তিনি প্যান্ট-সার্ট খুলে ফেলে সম্পূর্ণ নগ্ন অবস্থায় নেমে গেলেন জলে। আর একবার এক জন বেলজিয়াম কবি ভ্যারনার ল্যামবায়সিকে নিয়ে কাকদ্বীপের দিকে বেড়াতে গিয়ে হারউড পয়েন্ট থেকে নৌকো ভাড়া করে গঙ্গায় ভ্রমণ করছিলাম, মাঝ গঙ্গায় ভ্যারনার হঠাৎ ঝাঁপিয়ে পড়লেন জলে। আমিও একবার, সেটা খুব সংগোপনে, মানসের জঙ্গলে মধ্যরাত্রিতে মানস নদী দেখে এমনই উতলা হয়েছিলাম, শরীর কাঁপছিল যৌন আবেগে, আর কেউ কোথ্থাও নেই, রুপোলি জ্যোৎস্নায় নদীটিকে মনে হয়েছিল নারী, সম্পূর্ণ পোশাক খুলে সাঁতার কাটার ছলে সঙ্গম করেছিলাম সেই নদীর সঙ্গে।

এখানে তা সম্ভব নয়। একটা নৌকো এসে থামতেই সেটি ভাড়া করা হলো। মাঝির নাম ফারুক, তার খালি গা, লোহা-পেটা শরীর। সঙ্গে একটা দশ-বারো বছরের বাচ্চা ছেলে। ছেলেটি ওর নিজের নয়, অনাথ। আমরা কোথায় যাবো? কোথাও যাবো না, শুধু এই নদীতে কিছুক্ষণ ঘুরবো শুনে ফারুক চোখ ছোট করে তাকিয়ে রইলো।

এ নদীর প্রস্থ, বড়জোর বাগবাজারের খালের দেড়গুণ, কোনোদিকেই ধান খেত নেই। একদিকে গ্রাম। কিছু কিছু বাড়ি ও গাছপালা। 'কাঁঠাল-ছায়া' আছে কিনা বোঝা গেল না, অন্যদিকে বাঁধের ওপর বাবলা গাছের ঝাড় লাগানো হয়েছে। ঐ বাবলা গাছগুলি ফারুক মাঝির ঘোর অপছন্দ, তার ধারণা, ওর জন্য হাওয়া গরম হয়, বারবার বলতে লাগলো যা, হাওয়া গরম, দেখেন না ঘাম হচ্ছে, এ বাতাস ভালো নয়। অনাথ ছেলেটির জন্য ফারুকের খুব মায়া, নিজের গামছাটা এগিয়ে দিয়ে তাকে ঘাম মুছে নিতে বলে।

আমরা নির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য ফারুককে জিজ্ঞেস করি, তুমি ভোট দিতে যাবে না?

সে বললো, আলবাৎ যাবো। ভোট নষ্ট করবো কেন? ভিড় কমুক, বিকেলে যাবো। সকালে গিয়ে লাইন দিলে রোজগার করবো কখন?

আবার জিজ্ঞেস করা হলো, কাকে ভোট দেবে, ফারুক মিঞা?

সে চোখ ঘুরিয়ে বললো, আপনাদের বলবো কেন? আমার প্যাটের কথা কেউ জানতে পারবে না!

তার নৌকোর ছইতে এক নেত্রীর ছবি সাঁটা আছে। সেদিকে ইঙ্গিত করতে সে হি হি করে হেসে বললো, ছবি থাকলে চক্ষে ধুলো দেওয়া যায়। প্যাটের কথা তবু প্যাটেই থাকে।

বলাই বাহুল্য, ফারুকের মুখের ভাষা একেবারে অন্য রকম। সে ভাষা আমি বুঝলেও অবিকল লিপিবদ্ধ করা আমার সাধ্যাতীত। এই নিরক্ষর মাঝিটি তার গণতান্ত্রিক অধিকার সম্পর্কে খুবই সচেতন।

কথা বন্ধ করে আমি সতৃষ্ণ নয়নে নদীর দু'দিকে চেয়ে থাকি। এক কালে হয়তো এর ধারে ধারে ধান খেত ছিল। জীবনানন্দ কি কোনোদিন সত্যিই এই নদীর বুকে নৌকোয় ঘুরেছেন? কিংবা শহরের অন্য লোকদের মুখে শুধু নামটাই শুনেছেন।

নদীগুলো খুব বদলে যায়। ধানসিড়ি এখন একটি অতি অকিঞ্চিৎকর ছোট নদী। আমি কপোতাক্ষ নদীতেও নৌকো চেপেছি, তার জল এখন কোনো মৃত পাখির চোখের মতন বিবর্ণ।

ক্রমশ ধানসিড়ি চওড়া হয়। সামনের দিকে দেখা যায় বিস্তীর্ণ জলরাশি। ফারুক জানালো যে ঐখানে সাতখানা নদী এসে মিশেছে, ওখানে গেলে ঘূর্ণিতে পড়তে হবে। সুতরাং আমরা আবার নৌকো ঘোরাতে বললাম।

এই নদীর নামটি জীবনানন্দের এমনই ভালো লেগে গিয়েছিল যে তিনি বেশ কয়েকটি কবিতায় এই ধানসিড়ির উল্লেখ করেছেন :

> এ সব কবিতা আমি যখন লিখেছি ব'সে নিজ মনে একা ;
> চালতার পাতা থেকে টুপটুপ্ জ্যোৎস্নায় ঝরেছে শিশির ;
> কুয়াশায় স্থির হয়ে ছিল ম্লান ধানসিড়ি নদীটির তীর...

ফারুক মাঝির কথাবার্তা এমনই চিত্তাকর্ষক যে এর পর আমরা নদীটিকে ভুলে গিয়ে তার দিকে সম্পূর্ণ মনোযোগ দিই। সে কবিতা কাকে বলে জানেই না। তবু সে বলে যে, যখন বাতাস থাকে না, তখনই বাবলা গাছগুলোর ভেতর থেকে গরম হাওয়া বেরিয়ে আসে...এই নদীর জল বড় গম্ভীর...ভোটের ঝগড়া ঝাঁটি শেষ না হলে বৃষ্টি ধারা নামবে না...ভোটের রেজাল্ট দেখার জন্য মেঘ চুপ করে বসে আছে...

এই ফারুককে নিয়ে কবিতা লেখা কত শক্ত!

চিঠিপত্রে জীবনানন্দ

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

বাংলা সাহিত্যে কবিপত্রের একটি স্থান ইতিমধ্যেই নির্ধারিত হয়ে যাওয়ার কথা। মধুসূদনের চিঠিপত্রে তাঁর উত্তাল যৌবনের আন্দোলন পরিস্ফুট, সঙ্গে সঙ্গে সেগুলি তাঁর কাব্যচিন্তার প্রামাণ্য দলিলও বটে। রবীন্দ্রনাথের পত্রসাহিত্য ত একজন শিল্পীর সারাজীবনের একমাত্র সৃষ্টিই হতে পারতো—এত বিশাল তার পরিধি, এত বিচিত্র চিন্তার সমাহার সেখানে। চিন্তার সমস্ত ক্ষেত্রে তাঁর যাতায়াত সেখানে, এবং চালচিত্রের মতই মানুষ রবীন্দ্রনাথের বিরাট ব্যাপ্তি তার কমনীয়তা, মাধুর্যসহ সেই চিঠিগুলির পিছনে অধিষ্ঠিত মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের রচনারীতির এক বৈশিষ্ট্য সেই সব চিঠিগুলিতে প্রকাশ পেয়েছে—নারীসুলভ খুঁটিনাটির খোঁজ, পরিহাসরস, কথোপকথনের উষ্ণ মেজাজ এবং সর্বোপরি একটা শালীন ব্রাহ্ম চেতনায় তারা সংযত। জীবনানন্দের চিঠিপত্র সে তুলনায় খুবই স্বল্পপরিমাণ এবং সংযমের বাঁধুনিতে বুঝি রবীন্দ্রনাথকেও ছাড়িয়ে যায়।

জীবনানন্দের চিঠিপত্র ইতস্তত পত্রপত্রিকায় বিক্ষিপ্ত। জানি না তিনি কত চিঠি লিখেছিলেন। তবে একথা ঠিকই সবগুলি পাওয়া যায়নি।[১] সংগ্রথিত আকারে সব কটি থাকলে তাঁর জীবন সম্পর্কে আরো অনেক কথাই হয়ত জানা যেত। ওয়ার্ডসওয়ার্থের সেই সতর্কবাণী—মৃতের আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না থাকায় তাঁর প্রতি বক্রোক্তি অসমীচীন[২] —হয়ত কেউই শুনতেন না। আমরা জীবনানন্দের জীবনের ওপর কোন আলোকসম্পাত করছি না এখানে, কবির বা যে কোন শিল্পীর শিল্পকর্মই তাঁর জীবন একথা মনে রেখে আমরা জীবনানন্দের চিঠিপত্রগুলি পত্রসাহিত্য হিসেবেই বিচার করতে চাইছি। তুলনামূলক বিচারে অবশ্যই জীবনের কথা এবং তাঁর কবিতার কথাও আসবে।

জীবনানন্দের যে কটি চিঠি পাওয়া যায় এবং আমাদের আলোচ্য প্রবন্ধের অন্তর্ভুক্ত, শ্রেণী বিভাগ করে তাদের কয়েকটি ছকে ফেলা যায়ঃ ১. ব্যক্তিগত চিঠি—যাতে প্রাপক-প্রেরক দু-পক্ষেরই চাওয়া-পাওয়ার কথা স্পষ্ট, ২. যে-চিঠিতে কবির কাব্যচিন্তা, নিজের শিল্পকর্ম ইত্যাদির কথা ফুটে উঠেছে, ৩. যে-চিঠিতে কবির মাঝামাঝি—অর্থাৎ দুই ধরনের বক্তব্যই—একত্রিত। ব্যক্তিগত চিঠিগুলির মধ্যে কতকগুলি বন্ধুস্থানীয় কারুর কাছে লেখা। কতকগুলি প্রথমে অপরিচিত, পরে আত্মীয় কারুর কাছে লেখা। এই চিঠিগুলিতে ব্যক্তিগত আলাপনে মানুষ জীবনানন্দের পরিশীলিত মনন চোখে পড়বেঃ "তোমার সঙ্গে আমার হৃদ্যতা কত গভীর তা তুমিই জান ; মাঝে মাঝে আমরা দুজনে সেটা একটু-আধটু ঘুলিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু অন্তঃশীল অমলতা ঠিকই আছে। স্বভাবতই মন তোমার দিকে আমাকে টানে—দূরে থাকলে বেশি টানে। কাছে এসে পড়লে তোমার জিজ্ঞাসা ও দৌরাত্ম্যের জের—মাঝে মাঝে সেটা রূঢ়ও বটে—সেই জের দেখে টের পাই সাংসারিক সফলতা ও গল্পকথকের মালমশলায় তুমি সত্যিই বেশ দুর্বার, আজকাল তো দস্তুরমত

সার্থক...যত দিন কেটে যাচ্ছে ততই বুঝতে পারছি হৃদয় দিয়ে সাহিত্য শিল্প তৈরি করে...[৩]।

উল্লিখিত অংশে বিশিষ্ট বিশেষণ ব্যবহারেও তিনি যে নিপুণ ছিলেন (অন্তঃশীল অমলতা) তা বোঝা যায়। তা ছাড়া কথাশিল্পীর শিল্পোকরণ তথা সাহিত্যের শিল্পায়নের মূলতত্ত্ব সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য শোনা যায়।

আর একটি চিঠিতে স্মৃতিচারণের সঙ্গে সঙ্গে আছে তাঁর অপূর্ণ ও অপূরণীয় ইচ্ছার কথা : "তোমাকে চিঠি লিখতে লিখতে আমার বরিশালের সেই সব দিনের কথা মনে পড়ছে যখন তোমাদের একটার পর একটা চিঠি হাতে আসত, উত্তর দিতাম, প্রত্যাশা করতাম। তখনকার দিনের বরিশাল আজকের চেয়ে প্রায় সব দিক দিয়েই ভালো ছিল।... সব ছেড়ে দিয়ে শুধু লিখে যেতে পারলে ভালো হত। সেটা অনেকদিন থেকেই সম্ভব হচ্ছে না।[৪]

উপরিউদ্ধৃত চিঠি দুখানিই কবির এক বন্ধু-সাহিত্যিকের কাছে লিখিত। নীচের উদ্ধৃতাংশ আত্মীয়স্থানীয় এক মহিলার প্রতি : "কলকাতায় গেলে আপনাদের library দেখবার খুব ইচ্ছা ; আমি বইয়ের খুব ভক্ত, অর্থাৎ মনের মতন বইয়ের ; তা যে শুধু সাহিত্য হবে এমন কোনো কথা নেই।...বইয়ের নেশা কাটানো মুস্কিল।...নানারকমের শারদীয় সংখ্যায় লেখা ছড়িয়ে এখন একটু বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আবার যখন লেখার দিকে টান ফিরে আসবে আপনাকে পাঠাব।...অধ্যাপনা জিনিষটা কোনো দিনই আমার তেমন ভালো লাগেনি।"[৫] ব্যক্তিগত কথার ফাঁকেও আমরা কবির মনে ভঙ্গির সঙ্গে পরিচিত হই (পুস্তকপ্রীতি, অধ্যাপনায় অনীহা) এবং কাব্যরচনায় আন্তরবেগের অপরিহার্যতা সম্পর্কে তাঁর উক্তি শুনি (লেখার দিকে টান)।

উক্ত প্রাপককেই তিনি আবার লেখেন : "কলকাতায় গিয়ে এবার নানারকম অভিজ্ঞতা লাভ হল ; সাহিত্যিক, ব্যবসায়িক ইত্যাদি নানারূপ নতুন সম্ভাবনার ইসারা পাওয়া গেল। এর আগে মাঝে মাঝে আমি ২/৪ দিনের জন্য কলকাতায় যেতাম ; কিন্তু নানাদিক দিয়ে কলকাতার সামাজিক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য ব্যাপারে যে এরকম সজীব পরিবর্তন এসেছে তা লক্ষ্য করবার সুযোগ পাই নি। বরাবরই আমার আত্মবৃত্তি ও জীবিকা নিয়ে কলকাতায় থাকবার ইচ্ছা।"[৬]

উপরের চিঠিগুলিতে আমরা একজন এমন বইপাগল লোকের দেখা পাচ্ছি যে সাহিত্যকেই জীবনের অবলম্বন করতে পারলে বেঁচে যায়। সেই পত্রলেখক কবিকে দুটি শহর আচ্ছন্ন করে রেখেছে—একটি ঔপনিবেশিক গ্রামীণ আধাশহর যার চারিদিকে জলের বিস্তার আর সবুজ শ্যামল, সেই বরিশাল, আর একটি পৃথিবীর অন্যতম বৃহৎ নগরী কলকাতা। প্রকৃত সাহিত্যপ্রেমীর কাছে আমাদের কলেজ-ছাত্রের জন্যে সূচীনির্দিষ্ট সাহিত্যালোচনা যে কি বিড়ম্বনা তারও ইংগিত রেখেছেন কবি। ঝরঝরে, নিরুচ্ছ্বাস, জীবনে পোড়-খাওয়া এক বয়স্কের রচনা বলে এগুলিকে চিনে নিতে ভুল হয় না।

দ্বিতীয় শ্রেণীর চিঠিপত্রের শীর্ষে আছে রবীন্দ্রনাথকে লিখিত জীবনানন্দের চিঠি। ঐতিহ্য ও অভিভাবকত্বের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে তিনি নিজের সাহিত্যাদর্শের আলোচনা করেছেন। সাহিত্যাদর্শ ছাড়িয়ে এখানে তিনি সৌন্দর্যদর্শনেরও ব্যাখ্যা করেছেন। Serenity-ই আদর্শ কবিতার একমাত্র লক্ষণ বলে তিনি স্বীকার করেন নি, বিভিন্ন mood-এর কবিতাও ভাল কবিতা হতে পারে তিনি বলেছেন। তাঁর কথায় : "সকল বৈচিত্র্যের মত সুরবৈচিত্র্যও আছে সৃষ্টির ভেতর।...রচনার ভেতর যদি সত্যিকার সৃষ্টির মর্যাদা থাকে তা হোল তার ভেতরকার বিশিষ্ট সুরের প্রশ্নটি হয়তো অবহেলাও করা যেতে পারে। শান্তি

বা serenity-র সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাও নিষ্ফল হয়ে যায়।"[৭] এই শ্রেণীর আর কয়েকটি চিঠিতে তাঁর কাব্যচিন্তা, বিশেষত নিজের কাব্যকৃতির সাজঘরের কথা লিপিবদ্ধ করেছেন কবি—এদের কয়েকটি প্রবন্ধাকারে তাঁর 'কবিতার কথা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছে।[৮] তাঁর ভাষায়, "...ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয় ; কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সময় লাগে। কোনো কোনো সময় কাঠামোটি, এমন কি প্রায় সম্পূর্ণ কবিতাটিও খুব তাড়াতাড়ি সৃষ্টিলোকী হয়ে ওঠে। কিন্তু তারপর—প্রথম লিখবার সময় যেমন ছিল তার চেয়ে বেশি স্পষ্টভাবে—চারদিককার প্রতিবেশচেতনা নিয়ে শুদ্ধ প্রতর্কের আবির্ভাবে কবিতাটি আরো সত্য হয়ে উঠতে চায় ঃ পুনরায় ভাবপ্রতিভার আশ্রয়ে। এরকম অঙ্গাঙ্গিযোগে কবিতাটি পরিণতি লাভ করে...আমার কাব্যপ্রেরণার উৎস নিরবধিকাল ও ধূসর প্রকৃতির চেতনার ভিতর রয়েছে বলেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সব সময়ই যে 'ধূসর' তা হয়তো নয়।"[৯] আর একটি চিঠিতে তিনি লিখেছেন, "বই পড়ে পণ্ডিত হওয়া যায় বটে কিন্তু প্রজ্ঞা শেষ পর্যন্ত শুধু মাত্র ও-রকম বিদ্যা-সাপেক্ষ নয় ; অন্য রকম জিনিষ ; প্রবীণ চেতনায়ই বিচরণ করতে চায় বেশি ; আপনি নবীন, কিন্তু আমার মনে হয় আপনার সহজবোধের সেতুসার্থকতা হয়তো বা তার খোঁজ পেয়েছে।"[১০] আমাদের অনুরেখিত শব্দটিতে কবির শব্দচয়নের বিশিষ্টতা ছাড়াও, উদ্ধৃতাংশে তাঁর দার্শনিক মনের পরিচয় পাওয়া যাবে। প্রজ্ঞা ও বিদ্যার পার্থক্য এই বইপাগল কবির সমকালের অনেকেরই ছিল না সেকথা গবেষণাসাপেক্ষে অনেকেই বুঝে নিতে পারেন। আর একটি চিঠিতে তিনি সাহিত্যের অন্যান্যক্ষেত্রে বিচরণের আকাঙ্ক্ষা থাকলেও কেন শুধু কবিতাকেই মুখ্য করেছেন সেকথা বলেছেন। তা ছাড়া কবিতা যে আধিদৈবিক জীবনের সাফল্য আনতে পারে না, তার একটা দার্শনিকের ভূমিকা রয়েছে এই আধুনিক মতবাদেরও প্রতিষ্ঠা করেছেন তিনি। তাঁর ভাষায়, "এই দারুণ সংগ্রামকঠিন সময়ে নানারকম আধিদৈবিক দায়িত্ব মিটিয়ে যেটুকু সময় থাকে তাতে সাহিত্যের কোনো একরকম অভিব্যক্তি (যেমন কবিতা) নিয়েই যতদূর সম্ভব পটভূমির প্রসার ও গভীরতা বাড়ানো যায় সেই চেষ্টাই করা যেতে পারে। কিছু পরিমাণে এই জন্যই কবিতা লিখতে উৎসাহ পেয়েছি। কিন্তু সবচেয়ে বেশি প্রেরণা পেয়ে লিখেছি এই কারণে যে আমার যুক্তিধর্মী মানস আধুনিক সময়ের সমস্ত সঙ্গ ও অহেতুকতার সংস্পর্শে এসে কবিমানসের দৃষ্টিউজ্জ্বলতায় হতে চেয়েছে (হয়তো হয়েছে) বলে।.....সমাজ যত বিশুদ্ধ, বৈজ্ঞানিক ও কল্যাণকৃৎ হোক না কেন, প্রেম, প্রকৃতি, সৃষ্টি-প্রপঞ্চ সম্পর্কে শেষ আত্মপ্রসাদ কোনো ঐকান্তিক কবি বা মনীষীর জীবনে ঘটে কি? ঘটে নি তো আমার জীবনে।"[১১]

তৃতীয় শ্রেণীর চিঠিতে ব্যক্তিগত আলাপন ছাড়াও সাহিত্যসম্পর্কিত মতবাদ, বিশেষত প্রেরকের রচনা সম্পর্কে কথাবার্তা আছে। যেমন, সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে লিখেছেন, "'পদাবলী' পড়লাম। বেশ ভালো লাগল ;...আপনার পাণ্ডিত্য, মনের বিস্তৃতি ও গভীরতা এসব রচনার নানা জায়গায়ই স্পষ্ট হয়ে আছে।...বাড়ি নিয়েও বড় মুস্কিলে আছি।"[১২] অথবা, "...শারদীয়া 'পূর্বাশা'র জন্যে এই সঙ্গে একটি কবিতা পাঠালাম। ভালো করে প্রুফ দেখা দরকার। আমাকে পাঠিয়ে দেবেন।"[১৩] অন্য আর একটি চিঠিতে কবিকে তিনি যোগ্য সমালোচকের মত নিজেই নিজের সমালোচক-সংস্কারক হতে বলছেন, "আপনার কবিতাটি ভাল লাগল ; দু একটা জায়গা বদলে দিলে ঠিক হয় ; বদলাবার ভার আপনার নিজের ওপর।"[১৪]

জীবনানন্দের নিজের কথাতেই চিঠি লেখা তাঁর কাছে প্রায় এক শিল্পকর্মের মতই ছিল, "যে সব চিঠি নেহাৎ লোকাচারের ব্যাপার তাদের উত্তর আমি যতদূর সম্ভব তাড়াতাড়ি মিটিয়ে দেই। কিন্তু যেগুলো মনস্পর্শিতার জন্য বিখ্যাত—যেমন আপনারটি—সে সবের উত্তর দিতে মাঝে মাঝে আমার খুব দেরি হয়ে যায়।"[১৫] অথবা "সংসারের মোটা লেনদেনের থেকে যে চিঠি যত দূরে সে চিঠি তত—সৎ কি অসৎ বলব না—শুদ্ধতর চৈতন্যের জিনিষ। এ সব চিঠির উত্তর দিতে অল্প-বিস্তর দেরি হবেই।"[১৬] উদ্ধৃতাংশ দুটি থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় চিঠি লেখার ব্যাপারেও তিনি কত যত্নবান ছিলেন, কবিতা সম্পর্কে লিখতে গিয়ে তিনি কত দার্শনিক প্রজ্ঞার স্তরে উঠে যেতে পারতেন। কবিতায় যেমন ভালো করে প্রুফ দেখার দরকার বোধ করতেন, বা কবিতায় শব্দবদলের ভার কবিকেই গ্রহণ করতে বলতেন, ঠিক সেই নিখুঁত-নিষ্ঠা তাঁর চিঠি লেখার প্রতিও ছিল। জীবনানন্দের চিঠি এদিক থেকে কীটসের চিঠির মতই—দুই কবিরই মনোভঙ্গি তাঁদের চিঠি থেকে বোঝা যায়।[১৭] কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর দুই কবিরই চিঠিতে পাওয়া যাবে।[১৮] কীটসের মতই জীবনানন্দ তাঁর বৈশিষ্ট্য ও প্রতিভা সম্পর্কে অবহিত ছিলেন বলে বোধ হয়।[১৯] সময়ের বিরাট ব্যবধান থাকলেও দুই কবিরই ধ্যানজ্ঞান ছিল কবিতা, এবং জীবনানন্দের চিঠি সীমিত-সংখ্যক বলে তাঁর কাব্যসম্পর্কিত বক্তব্যই সেখানে মূখ্য বলে চোখে পড়ে। রবীন্দ্রনাথের চিঠির ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্য জীবনানন্দের চিঠিতে আশা করা যায় না। জীবনানন্দের চিঠির সেই বিপুলতা নেই কারণ সেরকম সামাজিক যোগাযোগ ছিল না তাঁর। ফলত, তিনি স্বল্পায়তনে নিজেই নিজের মুখোমুখি হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন, অন্তরের থেকে উচ্চারণ করতে পেরেছেন কাব্যসম্পর্কিত প্রিয় বক্তব্যগুলিকে। জীবনানন্দের শিক্ষাদীক্ষার প্রভাব তথা ব্রাহ্ম সংস্কার তাঁর সব রচনার মতই চিঠিপত্রকেও প্রভাবিত করেছিল মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের ব্রাহ্ম সংস্কার রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ যোগাযোগকে ব্যাহত করতে পারে নি, তাঁর ঔপনিষদিক ব্যাপ্তি তাঁকে বিশ্বজনীন উদারতার দিকে নিয়ে গিয়েছিল। জীবনানন্দ নিতান্তই এযুগের মানুষ, জীবিকার সংগ্রামে লাঞ্ছিত, ব্যক্তিশিল্পীর হীরকদ্যুতি-বিচ্ছুরণই তাই তাঁর রচনাতে চোখে পড়ে। ব্যক্তির শালীনতাবোধ ক্ষুণ্ণ করার জন্যে যে প্রতিবেশ উদ্‌গ্রীব তার প্রতি বিদ্রূপ, ঘৃণা তীব্র হয়ে উঠেছে জীবনানন্দের শেষ দিকের রচনায়, তাঁর চিঠিতেও তার ছাপ আছে। দুই কবির কাব্যসম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা দুজনের পত্রাবলী সম্পর্কেও সত্য : "জীবনানন্দের কবিতায় ভাবাবেগ ও রোমান্টিকতা যে কতো সংহত তা রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাশাপাশি রেখে জীবনানন্দ পড়লেই কবিতার পাঠক উপলব্ধি করতে পারবেন।"[২০] সে যাই হোক, জীবনানন্দের চিঠিগুলির সবচেয়ে বড় মূল্য হল এই যে সেগুলিতে তাঁর কাব্যচিন্তার কথা প্রকাশ পেয়েছে, সেগুলিতেই তিনি তাঁর কবিকৃতির কিছু কিছু তথ্য পরিবেশন করেছেন। সেগুলি বাংলা শিল্পসমালোচনার ক্ষেত্রে একটি বিশিষ্ট অবদান।[২১]

জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী

আবদুল মান্নান সৈয়দ

*** পত্রাবলি ***

১

[নলিনী দাশ-কে] Barisal

কল্যাণীয়াসু, 4.7.43

নিনি,... এবার সুদীর্ঘ গ্রীষ্মের ছুটি কলকাতায় তোমাদের সঙ্গে কাটিয়ে খুবই আনন্দ লাভ করেছি। কলকাতায় গিয়ে এবার নানা রকম অভিজ্ঞতা লাভ হ'ল ; সাহিত্যিক , ব্যবসায়িক ইত্যাদি নানা রূপ নতুন সম্ভাবনার ইসারা পাওয়া গেল। এর আগে মাঝে মাঝে আমি ২/৪ দিনের জন্য কলকাতায় যেতাম ; কিন্তু নানা দিক দিয়ে কলকাতায় সামাজিক, সাহিত্যিক ও অন্যান্য ব্যাপারে যে এরকম সজীব পরিবর্তন এসেছে তা' লক্ষ্য করবার সুযোগ পাইনি। বরাবরই আমার আত্মবৃত্তি ও জীবিকা নিয়ে কলকাতায় থাকবার ইচ্ছা। এবার সে-ইচ্ছা আরো জোর পেয়েছে।

কিন্তু পথ কেটে নেবার জন্য সাধনার দরকার।

কলকাতায় তোমাদের বাড়ীতে অশোকের [১] ও তোমার যত্নে ও পরিচর্যায়, উদারতায় ও নিঃস্বার্থ ব্যবহারে খুবই খুশি হয়েছি।

....

তোমার কাছ থেকে যে বইগুলো আমি এনেছি সেজন্য খুবই কৃতজ্ঞ। পূজোর সময় ফিরিয়ে দেব। কিনবার মত বাংলা বইয়ের একটা লিষ্টি তোমাকে শীগগিরই পাঠাব। আমারও পড়বার সুযোগ হবে।

মা'র শরীর কেমন আছে? তিনি যেন আমাদের জন্য কোনো চিন্তা না করেন।

....

আমার আন্তরিক প্রীতি তোমাদের জন্য। ইতি

দাদা

২

[অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-কে]

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা-২৬
২০.৫.৪৯

ভাই অচিন্ত্য,

তোমারই জয়।

আমি ভেবেছিলাম তুমি ক্ষুণ্ণ হয়ে আছ। এখন মনে হচ্ছে তুমি তোমার ঠিক জায়গায়ই আছ। তোমাদের সঙ্গে আমার হৃদ্যতা কত গভীর তা তুমিই জান ; মাঝে মাঝে আমরা দুজনে সেটা একটু আধটু ঘুলিয়ে ফেলতে চেষ্টা করেছি, কিন্তু অন্তঃশীল অমলতা ঠিকই আছে। স্বভাবতই মন তোমার দিকে আমাকে টানে—দূরে থাকলে বেশি টানে। কাছে এসে পড়লে তোমার জিজ্ঞাসা ও দৌরাত্ম্যের জের—মাঝে মাঝে সেটা রূঢ়ও বটে—সেই জের দেখে টের পাই সাংসারিক সফলতা ও গল্পকথকের মালমসলায় তুমি সত্যিই বেশ দুর্বার, আজকাল তো দস্তুরমত সার্থক। কিন্তু আন্তরিকতা ও স্নিগ্ধতায় কারো চেয়েই কম নও। তোমার কাছে গেলে তোমাকে আমি সব সময় ঠিকভাবে গ্রহণ করতে পারি না, (সেটা আমারই দোষ),—কিন্তু দূর থেকে তোমার মন খাঁটি শাঁসের মতো এসে দেখা দেয় আমার কাছে ; বুঝতে পারি এই আশ্চর্য অচিন্ত্য ফলের এইটেই ঠিক স্বরূপ। খুব ভালো হত কাছেও যদি তোমাকে ঠিক ওরকমভাবে পেতে পারতাম। তাহলে আজকের সাহিত্যিকদের ভেতর শুধু তোমার মতো দুএকটি বন্ধুকে নিয়ে জীবনের বহিরাশ্রয়ের ভূমিতে খুব চরিতার্থতা পাওয়া যেতো।

'কল্লোলে'র যুগে এতো লোককে তুমি বুকে জড়িয়ে ধরছো, প্রাণ খুলে শিরোপা দিয়ে দিচ্ছ—দেখে মন ভ'রে ওঠে। যতো দিন কেটে যাচ্ছে ততোই বুঝতে পারছি হৃদয় দিয়ে সাহিত্যশিল্প তৈরি ক'রে—জীবনের ব্যাপারেও তেম্নি উষ্ণতার বেশ সুখস্পর্শ আঁচ দিচ্ছো পুরোনো কথা স্মরণ করতে গিয়ে। [২]

মনোলোকে যা আছে তা আছে—বাইরের পৃথিবীতেও তোমার সঙ্গে বন্ধুত্বে সিদ্ধির স্তরে পৌঁছে যেতে পারতাম যদি এক আধটা বাধা (আমারই দোষ) জিনিসটাকে কিছু কিছু খণ্ডিত করে না ফেলত।

'কল্লোলে'র সেই ঘরটায় [৩] আমি দু চার বার নয় দুশো বার তো গিয়েছি ঠিকই ; তুমি বিকেলের দিকে আসতে—আমি সকালের দিকে যেতাম। দীনেশরঞ্জনকে[৪] সব সময়েই দেখতাম, মাঝে মাঝে নৃপেন[৫] থাকতো। তুমি Presidency Boarding-এ প্রায়ই আসতে [৬] —বেড়াতে বেরুতাম তারপর চৌরঙ্গীর দিকে প্রায়ই। অনেক কথা মনে পড়ছে—অনেক অনবলীন দিন মাস মুহূর্তের।

দেড় বছর আগে তোমার সঙ্গে শেষ দেখা হয়েছিল। তারপর কলকাতায় আসছো যাচ্ছো ; কখন আসো কখন চ'লে যাও খবরই পাই না। এক আধবার আমার এখানে উঁকি

মেরে গেলে খুশি হব, কিংবা আমাকে জানালে তোমার বাড়িতে গিয়ে দেখা করে আসতে পারি। আসানসোলের ঠিকানায় তোমাকে লিখছি ; সেখানে এখনও আছ না বদলি হয়েছো জানি না।

আশা করি ভালো আছো। ভালোবাসা জানাচ্ছি। ইতি

তোমার জীবনানন্দ

৩

[অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত-কে]

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা-২৬
১৩.৬.৪৯

ভাই অচিন্ত্য,

কয়েকদিন হ'ল তোমার চিঠি পেয়ে খুশি হয়েছি। আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছিল ; অন্য নানা কাজে অকাজেও ব্যস্ত ছিলাম, কাজেই চিঠির উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল।

তোমাকে চিঠি লিখতে লিখতে আমার বরিশালের সেই সব দিনের কথা মনে পড়ছে যখন তোমাদের একটার পর একটা চিঠি হাতে আসত, উত্তর দিতাম, প্রত্যাশা করতাম। তখনকার দিনের বরিশাল আজকের চেয়ে প্রায় সব দিক দিয়েই ভালো ছিল।

আমি তোমাকে ভুল বুঝিনি ; ঠিকই আছে সব ; এর আগের চিঠিতে তোমাকে লিখেছি, তোমার চিঠিও প'ড়ে দেখেছি--সবই যথাস্থানে আছে—ভালোই আছে।

আমি বিশেষ কোনো কাজ করছি না আজকাল। লিখে, পড়িয়ে, অল্পস্বল্প রোজগারে চলে যাচ্ছে। একটা চাকরীর জন্যে দরখাস্ত করেছিলাম, reference চেয়েছিল—তার ভেতর তোমার নামও দিয়েছি ; ও-সব চাকরী হবে না। সব ছেড়ে দিয়ে শুধু লিখে যেতে পারলে ভালো হত। সেটা অনেকদিন থেকেই সম্ভব হচ্ছে না। কলকাতায় এলে দেখা সাক্ষাৎ হবে। আশা করি ভালো আছ।

ভালোবাসা জানাচ্ছি।

তোমার জীবনানন্দ

৪

[সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা ২৬
২৮.৫.৫১

প্রীতিভাজনেষু,

সুরজিৎ, তোমার দুখানা চিঠি পেয়েই আনন্দিত হয়েছি। তুমি তো অক্লান্তভাবে চিঠি লিখে যাচ্ছ, কিন্তু আমার লেখা [৭] আজো পাঠাতে পারলাম না। বুদ্ধদেব [৮] অন্নদাশংকর [৯] ও প্রেমেনের [১০] লেখা কি পেয়েছ? সুনীতিবাবু [১১] লেখা দিয়েছেন?

কলকাতায় বড় বেশি গরম, নানা ব্যাপারে আমিও আজকাল বড় ব্যতিব্যস্ত, কবিতা লেখার মত মন ও মেজাজ নেই এখন। পুরনো লেখা (কবিতা) দেখছিলাম সেদিন। এখনও কিছু ঠিক করতে পারিনি। দেখি, কি পাঠানো যায়।

জলপাইগুড়ি যেতে লিখেছ। একবার গিয়ে ঘুরে আসতে ইচ্ছা করে। সভা সমিতি ইত্যাদি সব কিছুর হাত সম্পূর্ণভাবে এড়িয়ে তোমাদের দু-এক জনের সাহায্যে হিমালয়, চা বাগান ইত্যাদি দেখে আসবার লোভ জেগেছে মনে। কোথায় থাকা যাবে? অবিশ্যি যেতে পারব কিনা বলতে পারছি না। প্রেমেন কবে যাবে? আশা করি ভালো আছ। প্রীতি ও শুভাকাঙ্ক্ষা জানাচ্ছি। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

৫

[সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]

২৪.৬.৫১

প্রীতিভাজনেষু,

সুরজিৎ, তোমার চিঠি পেয়েই খুব খুশি হয়েছি। উত্তর দিতে দেরি হয়ে গেল। মার্জ্জনা চাই।

তুমি এক চিঠিতে লিখেছিলে যে আজকালই কলকাতায় আসছ। কলকাতায় এলে কথাবার্তা হবে ভেবে আর চিঠি লিখিনি। পরে জানলাম আসতে দেরী হ'তে পারে, কিংবা না-ও আসতে পার।

জলপাইগুড়ির ঝিল, হাঁস ও শিরীষগাছের যে-সব ছবি পাঠিয়েছ—অপূর্ব বোধ হ'ল। এখুনি ঝিলের পারে ঘাসের ওপরে আকাশের মুখোমুখি নিজেকে ছড়িয়ে দিতে ইচ্ছে করছে। নদী, ঝিল, পাহাড়, বন, আকাশ-- কোনো নিরালা জায়গা থেকে এসবের নিকট সম্পর্কে আসতে ভালো লাগে আমার। ব'সে থাকতে পারা যায় যদি এদের মধ্যে, কিংবা হেঁটে বেড়াতে পারা যায় সারা দিন, তা'হলেই আমাদের সময় একটা বিশেষ দিক দিয়ে (আমার মনে হয়) সবচেয়ে ভালোভাবে কাটে।

তুমি জলপাইগুড়ি যাবার সব রকম পথ ও উপায় বাৎলে দিয়েছ ঃ সেজন্য অনেক ধন্যবাদ।

কলকাতায় নানা কাজে ও দায়িত্বে বড় ব্যস্ত ও বিব্রত আছি, শীগগির জলপাইগুড়ি যেতে পারব ব'লে মনে হয় না। গেলে আগস্টের শেষে কিংবা সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে যাব। যাবার আগে সময় মতো চিঠি লিখব তোমাকে।

এইবার তোমার কবিতা সম্বন্ধে একটা ব্যবস্থা করতে হবে। আশা করি ভালো আছ। প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

জীবনানন্দ দাশ

৬

[বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কে]

১৮৩ ল্যান্সডাউন রোড
কলকাতা ২৬
১৪.৯.৫১

প্রীতিভাজনেষু,

বীরেনবাবু, আমার কবিতাটির নাম হবে 'সুদর্শনাকে' কিংবা 'পৃথিবী, জীবন, সময়'। প্রথম নামটাই ঠিক হবে। কবিতাটির প্রুফ (শেষ প্রুফের আগে) পাঠালে খুশি হবো। চিঠি পেলেন কিনা জানাবেন দয়া করে। প্রীতি নমস্কার। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

৭

[বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়]

১৬.৯.৫১

প্রীতিভাজনেষু,

বীরেনবাবু, ভেবে দেখলাম আমার কবিতাটির নাম 'পৃথিবী, জীবন, সময়' রাখলেই ভালো হবে ; তাই করে দেবেন। যথাসময়ে প্রুফ পেলে খুশি হবো। নমস্কার। ইতি—

জীবনানন্দ দাশ

৮

[বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কে]

২৩.৯.৫১

প্রীতিভাজনেষু,

আমার কবিতাটির নাম 'মানব পৃথিবীকে', 'কাল-কল্লোল', 'পূর্ব ভূমিকা' বা 'নিরবচ্ছিন্ন' এই চারটির ভেতর যেটা আপনাদের খুশি রাখতে পারেন। নমস্কার। ইতি—

জীবনানন্দ দাশ

পুনঃ।—আমাকে দু কপি কিংবা সম্ভব হলে তিন কপি শারদীয়া গণবার্তা পাঠিয়ে দিলে সুখী হবো।—

জীবনানন্দ দাশ

৯

[সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]

২৫.১.৫২

কল্যাণীয়েষু,

সুরজিৎ, তোমার সব কখানা চিঠিই যথাসময়ে পেয়ে খুব খুশি হয়েছি। তোমার শেষ চিঠিখানা এ মাসের গোড়ার দিকে পেয়েছিলাম। অনেক দিন ধ'রে শরীর বেশ অসুস্থ ; তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরী হ'য়ে গেল তাই ; ক্ষমা চাচ্ছি।

তুমি election[১২] সম্পর্কে যে একা একা নানা জায়গায়—বিশেষতঃ বন-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছ তার বর্ণনা প'ড়ে চমৎকার লাগল। জলপাইগুড়ি ও ওদিককার অঞ্চল, পাহাড় নদী জঙ্গলে, বেশ দেখবার মত—ঘুরে বেড়াবার মত ; আমার খুব যেতে ইচ্ছে করে। জলপাইগুড়ির দিকে একবার যাব ভাবছি, কিন্তু কবে হয়ে ওঠে বলতে পারা যাচ্ছে না।

তোমাদের পত্রিকার জন্য অনেক লেখা ইতিমধ্যে পেয়েছ হয়তো। পত্রিকা কবে বেরুবে? কবিতা তো এখনও কিছু লিখে উঠতে পারিনি। [১৩] দেখি কি করা যায়।

কলকাতায় এলে তোমার সঙ্গে দেখা হবে আশা করি।

জীবনানন্দ দাশ

১০

[সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]

১৪.৫.৫২

সুরজিৎ,

...তুমি দার্জিলিং গিয়েছিলে জানতে পারলাম। কেমন লাগলো? কাদের সঙ্গে দেখা হ'লো?

আমার এখন জলপাইগুড়ি যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। যেতে পারলে অবশ্য আনন্দিত হতাম। পরে—কখনও যাবার চেষ্টা করবো। তুমি কি শীগগির কলকাতায় আসবে?

আমার বই[১৪] সম্পর্কে তুমি সব ব্যবস্থা ঠিক করলে আমি লেখা পাঠিয়ে দেব। নামও তখন জানাব।...

জীবনানন্দ দাশ

১১

[সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে] ৬.১০.৫২

সুরজিৎ,

...তুমি কি অমলেন্দুবাবুকে[১৫] "সাতটি তারার তিমির"[১৬] ও "বনলতা সেন"[১৭] পাঠিয়েছিলে? আমি তাকে লিখেছিলাম যে তুমি পাঠাবে।

তুমি আমার একটি চটি কবিতার বই ছাপাতে চাচ্ছ ; কিন্তু আমি ভেবে দেখলাম যে এখন ও-ধরনের বই ছাপিয়ে কোন লাভ নেই। ওকাজে তুমি এখন আর হাত দিও না। আমার "বনলতা সেন" দেখে আমি অত্যন্ত হতাশ হয়েছি। ...এর পরে কবিতার বই বার করলে আমি নিজে আগাগোড়া সব দেখেশুনে ঠিক করব।

জলপাইগুড়িতে flood হয়েছে কাগজে দেখছিলাম। এখন কিরকম অবস্থা? আশা করি আগের চেয়ে ভালো। পূজোর দিনগুলো হয়তো এবার তেমন আনন্দে কাটাতে পারলে না।

শান্তিনিকেতন ফিরে যাবার আগে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে পারবে হয়তো।

সেই photo [১৮] গুলোর কি হলো? ভালো আছ আশা করি।...

জীবনানন্দ দাশ

১২

[সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে] ২১.১.৫৩

সুরজিৎ,

তোমার চিঠি ও 'Santiniketan' পত্রিকা যথাসময়ে পেয়েছি। তোমার প্রবন্ধটি [১৯] আমি পড়েছি ; মতপার্থক্য আছে ; অন্য সময় আলোচনা করা যাবে।

আমার হাতে এখন কবিতা কিছুই প্রায় নেই—জলার্কে শীগগির দিতে পারব না। তুমি কলকাতায় এলে "বনলতা সেন" হাতে হাতে একখানা দিতে পারি।

প্রেমেনের সঙ্গে এখনও আমি দেখা করিনি। দেখা করবার চেষ্টা করব ; কিন্তু বিশেষ সুবিধে হবে ব'লে মনে হয় না।...তুমি কি শীগগির একবার কলকাতায় আসবে?

জীবনানন্দ দাশ

১৩

[সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]   ২৩.৪.৫৩

সুরজিৎ,

তোমাদের কলেজে তো শীগগিরই গরমের ছুটি। তুমি জলপাইগুড়ি যাবার আগে কলকাতায় হয়তো কয়েকদিন থাকবে ঃ ডক্টর বোস[২০] প্রভৃতির সঙ্গে দেখা করবার জন্যে? বোস এসেছেন কিনা ঠিক বলতে পারছি না। কলকাতায় কবে আসছ? সাক্ষাৎমতো কথাবার্তা হবে। এখানে খুব গরম পড়েছে ঃ শান্তিনিকেতনে হয়তো আরও বেশি। এক ফোঁটা বৃষ্টি নেই।...

জীবনানন্দ দাশ

১৪

[সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]   ২.৫.৫৩

সুরজিৎ,

চিঠি পেয়েছি। তুমি তাহ'লে কলকাতায় না এসেই জলপাইগুড়ি চ'লে গিয়েছ। তোমাদের কলেজ তো অনেক আগেই বন্ধ হ'য়ে গেল।

কলকাতায় খুব গরম ; তবে ক্বচিৎ বৃষ্টি পড়ছে--তখন ঠাণ্ডা পড়ে। জলপাইগুড়ির আবহাওয়া তো খুব ভালো ; বেশ ভালো লাগছে আশা করি।

'সীমান্ত'[২১] আমি দেখিনি। কি লিখেছে জানি না। কিন্তু এ সম্বন্ধে প্রতিবাদ ক'রে কি লাভ? ...বাবুর নিজের আলোচনায়ও তো ঢের ভুল।... এরও কোনো ধারণা নেই। আমার মনে হয় সঞ্জয়বাবু [২২] কিছু লিখলে ভালো হয়! ডক্টর বোস তো খুব ভালো সমালোচক ; কিন্তু তিনি কি এখন লিখবেন ; তুমি নিজে কিভাবে লিখতে চাও ; তোমার লেখাটা আমাকে দেখিও তো।

আমার কবিতা সম্বন্ধে চারদিকে এত অস্পষ্ট ধারণা যে আমি নিজে এ বিষয়ে একটি বড় প্রবন্ধ[২৩] লিখব ভাবছিলাম। কিন্তু শরীর বড় অসুস্থ ; কোনো কাজই করতে পারছি না। কোথাও অনেক দিন চেঞ্জে থাকা দরকার।

জীবনানন্দ দাশ

১৫

[সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে]   ২০.৫.৫৩

সুরজিৎ,

তোমার চিঠি কয়েক দিন হ'ল পেয়েছি। অনেক ধন্যবাদ। 'সীমান্তে'র প্রবন্ধ থেকে তুমি যা উদ্ধৃত ক'রে দিয়েছ, দেখলাম সবই। তোমার জবাবগুলোও মন্দ হয়নি। কিন্তু কী আর হবে ওসব প্রবন্ধের প্রতিবাদ ক'রে। আমার কবিতা সম্বন্ধে নানা জায়গায় নানা রকম লেখা দেখেছি, মন্তব্য শুনেছি ; প্রায় চোদ্দ আনি আমার কাছে অসার ব'লে মনে হয়েছে ; কিন্তু এ নিয়ে বিতর্কে নেমে বিশেষ কোনো ফল হবে না। আমাদের দেশে বড় সমালোচক আজকাল নেই-ই একরকম। আমার মনে হয় প্রত্যেক সৎ কবিই তার নিজের কাব্যের সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য সমালোচক ; সেই হিসেবে নিজের কাব্য বিশ্লেষণ ক'রে এদের

প্রত্যেকেরই দীর্ঘ প্রবন্ধ লেখা দরকার। শরীর মনের সুস্থতা ফিরে পেলে আমি লিখব ভাবছি।

বাড়ি নিয়ে বড্ড বিপদে আছি।২৪।...কোথাও চলে যেতে পারলে নিস্তার পেতাম, কিন্তু ঘর খুঁজে পাচ্ছি না।...

জীবনানন্দ দাশ

১৬

।সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কে। ১০.১০.৫৪

সুরজিৎ,

তোমার চিঠি ও প্রবন্ধ যথাসময়ে পেয়েছিলাম। শরীর মোটেই ভালো নয় ; নানা ব্যাপারে অত্যন্ত বিব্রত ; তোমার চিঠির উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল তাই। কিছু মনে করো না। তুমি ১৭ই অক্টোবরের পর কোনো একদিন বিকেলে আমার এখানে এলে চিঠি ও প্রবন্ধ।২৫। সম্পর্কে কথাবার্তা হতে পারে। আশা করি ভালো আছো।

পূজোর ছুটিতে হয়তো তুমি জলপাইগুড়ি চলে গেছ। আমার স্নেহ ও শুভাকাঙ্ক্ষা জানাচ্ছি। ইতি

জীবনানন্দ দাশ

*** টীকাভাষ্য ***

পত্র ১

এই পত্রখানি শ্রীযুক্তা নলিনী দাশের কাছে লেখা। জীবনানন্দের অনুজ অশোকানন্দের সঙ্গে তার বিবাহের পরে পত্রখানি লিখেছিলেন কবি।

১. কবি-অনুজ শ্রীযুক্ত অশোকানন্দ দাশ।

পত্র ২-৩

অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্ত তাঁর 'অন্তরঙ্গ জীবনানন্দ' ('ময়ূখ', জীবনানন্দ সংখ্যা ১৯৫৪) নামের স্মৃতি-রচনায় কবি-র এই চিঠিদুটি উদ্ধৃত করেছেন।

২. অচিন্ত্যকুমারের অসামান্য স্মৃতিগ্রন্থ "কল্লোল যুগ" মাসিক পত্রিকায় যখন ধারাবাহিক প্রকাশিত হচ্ছিলো তখনকার লেখা এই চিঠিটি।

৩. নজরুল ইসলাম তাঁর 'গোকুল নাগ' ("সর্বহারা") কবিতায় এই ঘরখানি সম্বন্ধে লিখেছিলেন 'প্রাণঠাসা একমুঠো ঘর'।

৪. দীনেশরঞ্জন। দীনেশরঞ্জন দাশ। 'কল্লোল' পত্রিকার সম্পাদক।

৫. নৃপেন। নৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়। লেখক, অনুবাদক।

৬. এই বোর্ডিং প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর উক্তি : 'হ্যারিসন রোডে তাঁর বোর্ডিঙের তেতলা কিংবা চারতলায়. অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে একবার আরোহণ করেছিলাম মনে পড়ে...' ('জীবনানন্দ দাশ-এর স্মরণে', "কালের পুতুল")।

পত্র ৪-৫

পঞ্চাশের দশকের কবি, ঔপন্যাসিক, সম্পাদক সুরজিৎ দাশগুপ্তকে লেখা সবগুলি চিঠি গৃহীত হয়েছে তাঁর সম্পাদিত 'জলার্ক' পত্রিকার জীবনানন্দ সংখ্যা থেকে।

৭. 'জলার্ক'র জন্যে রচনা। তখনো 'জলার্ক' বেরোয়নি।

৮. বুদ্ধদেব। বুদ্ধদেব বসু।

৯. অন্নদাশংকর। অন্নদাশংকর রায়।

১০. প্রেমেন। প্রেমেন্দ্র মিত্র

১১. সুনীতিবাবু। সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়

পত্র ৬-৮

কবির মানসিক-শৈল্পিক অস্থিরতার এক চরম প্রকাশ দ্রষ্টব্য এই চিঠিগুচ্ছের ভিতরে। একটি কবিতার নাম নিয়ে পর-পর লেখা এই তিনটি চিঠির মধ্যে কবির ঐ মানসিক-শৈল্পিক অস্থিরতার যে-প্রকাশ ঘটেছিলো, তার অবসান হয়েছিলো 'পৃথিবী, জীবন, সময়' নামে। পত্রপ্রাপক কবি বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জানিয়েছেন, শেষ অর্থাৎ ৮-সংখ্যক চিঠি পাবার আগেই কবিতাটি ছাপা হ'য়ে যায়। ছাপা হয় শারদীয় 'গণবার্তা' ১৩৫৮ সংখ্যায়। যে-কবিতা নিয়ে কবি 'সুদর্শনাকে', 'পৃথিবী, জীবন, সময়', 'মানবপৃথিবীকে', 'কাল-কল্লোল', 'পূর্বভূমিকা' ও 'নিরবচ্ছিন্ন'—এই ছ'টি নাম ভেবেছিলেন, সেটি এখানে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করছি :

পৃথিবী, জীবন, সময়

কোথায় সে যে রয়েছিলাম ;

আজকে মনে হয়
সাগর দেখে আরো বৃহৎ আলো
দেখেছিলাম,—ঠিক তা সাগর নয়।

প্রশান্ত না কৃষ্ণ বেরিং ভূমধ্যলীন ভারত মেরুসাগর তাকে বলে
সেইখানেতে ভোরের হাওয়ায় শাদা ঘোড়ার ভিড়ে
একটি ঘোড়া সূর্য হয়ে জ্বলে
নীল আকাশের এপার থেকে ওপার যাবার পথে ;
সুদর্শনা, সেই নীলিমা তোমার আকাশ ছিল ;
মনে পড়ে মাছের ঝাঁকে গহন সাগর জল,
ফেনার হাওয়ায় ফসকে শাদা পাখিগুলো দুরন্ত উজ্জ্বল
নীল কি রৌদ্র? রৌদ্র কি নীল জলের কোলাহল।

গভীর স্বনন ;—কান পেতে সেই সুর
মনে হ'ত এই পৃথিবীর অনেক পরের যেন
জাতক পৃথিবীটির মতন দূর ;—
আজকে তোমার ইচ্ছা চিন্তা শপথ আর এক রকম সুদর্শনা,
ধূলোকণা এখন আমি—কালের জলকল্লোলে জলকণা।

মনে পড়ে সেই কবেকার গভীর সাগর কী এক
নিখিল বৃক্ষ থেকে ঝরে,
অন্ধকে চোখ দান ক'রে রোদ ক্রন্দসীতে ব্যাপ্ত হ'য়ে পড়ে ;
দুপুরবেলা সূর্যালোকের থেকে নেমে অতিথিদের মতো
অসংখ্য সব শাদা পাখি সহসা ঘুম ভেঙে
দিয়েছে ব'লে মনে হ'ত ;—
সাগর আলো পাখি নীরব চারিদিকে— বৃক্ষে নির্জনতা ;
কে যেন ডেকে নিত আমায়
কে যেন ডেকে নিত তোমার কাছে,
সে যেন ডানা টিউব ট্রেন রাডার প্লেন টেলিপ্যাথির গতি
ছাড়িয়ে নীল আকাশে এসে নীল আকাশের নিজের পরিণতি।

মাঝে মাঝে পাখির মতন
শিশির ঝরার শব্দ—বিকেল ;
আলোও নিজে কেমন যেন অন্ধকারের মতো।
সময় এসে আমার কাছে একটি কথা জানতে চেয়েছিল,
তোমার কাছে একটি কথার মানে ;
আমরা দুজন দু দৃষ্টিকোণ দিতাম তাকে হেসে
একটি শরীর হতাম পরস্পরকে ভালোবেসে।

এসব অনেক আগের কথা ;—অনেক চিহ্ন চিন্তা রীতির ক্ষয়
হয়ে গেছে তারপরেতে,—মানুষকে সব বুঝে নিতে হয়।
কোথায় এখন সে সব আকাশ নক্ষত্র রোদ সত্য উজ্জ্বলতা ঃ
পাখির সাথে মহাপ্রাণের বৃক্ষে পাখির কথা!

এসো জাগো হৃদয়, তুমি বিষয় জেনেছিলে ;
গিয়েছিলে অনেক দূরে স্থির বিষয়ের দিকে ;
সে সব আলোয় গ্রহণ করো আরেক রকম
ব্যবহারের মানবপৃথিবীকে।

সুদর্শনা জীবনানন্দের অন্যতমা কাব্যনায়িকা। সুদর্শনাকে নিয়ে জীবনানন্দ অন্যূন তিনটি কবিতা লিখেছিলেন ঃ 'সুদর্শনা' ('কবিতা', আষাঢ় ১৩৫৮), 'পৃথিবী, জীবন, সময়' ('গণবার্তা', শারদীয় ১৩৫৮), 'অন্ধকারে' ('পূর্বাশা', আশ্বিন ১৩৫৮)। লক্ষণীয় তিনটি কবিতাই লেখা হয়েছিল ১৩৫৮ সালে—একই বছরে।

পত্র ৯-১৬

১২. ১৯৫২-র সাধারণ নির্বাচন।

১৩. ইতিপূর্বে এক পত্রে লিখেছেন, 'লেখার জন্য সময় ও সাধনা দরকার, গদ্যের চেয়ে কবিতায় বেশি। ['জলার্ক' পত্রিকায় এই পত্রটি প্রকাশিত হয়নি]

১৪. 'জলার্ক'-র থেকে কবির একটি চটি কবিতার বই প্রকাশের কথা হয়েছিল। পরবর্তী চিঠিতে এই পরিকল্পনা তিনি মুলতুবি রাখতে নির্দেশ দিয়েছিলেন।

১৫. ড. অমলেন্দু বসু। কবি-র ঘনিষ্ঠ বন্ধু। প্রাবন্ধিক ও সমালোচক।

১৬. "সাতটি তারার তিমির"। প্রথম প্রকাশ : ১৯৪৮।

১৭. "বনলতা সেন"। সিগনেট প্রেস সংস্করণ : ১৯৫২।

১৮. সুরজিৎ দাশগুপ্ত-কর্তৃক গৃহীত কবি-র আলোকচিত্র। এর একটি 'জলার্ক'-র জীবনানন্দ-সংখ্যার প্রচ্ছদপটে প্রকাশিত হয়েছিলো। এ সম্পর্কে জীবনানন্দ অন্য এক পত্রে লিখেছেন, 'ছবিগুলো পেয়েছি। ধন্যবাদ। ফোটো আবার তুলবে বলেছে ; এগুলো নানা কারণে মোটেই ভালো হয়নি।' ।'জলার্ক' পত্রিকায় এই পত্রটি প্রকাশিত হয়নি।।

২

মহত্তম কবি জীবনানন্দ দাশ

নীহাররঞ্জন রায়

নতুন পরিণতির সম্ভাবনামুখে কবি জীবনানন্দ দাশের শোকাবহ অকালমৃত্যুতে আমাদের যে-দুঃখ, যে-আক্ষেপ, তার সান্ত্বনা খুঁজে পাবো কোথায়?

বাংলা দেশে রবীন্দ্রোত্তর সাম্প্রতিক কাব্যের যে কাল চলছে সেখানে ব্যাপক বিশাল জীবনাভিজ্ঞতা ও গভীর মহৎ ভাবে ভাবিত ও শিক্ষিত, গম্ভীর ধ্যানে সমাহিত কাব্য খুব বেশি নেই। স্বল্প অভিজ্ঞতায় সৎভাবে শিক্ষিত, কারুসমৃদ্ধ কবিতা আছে অনেক, ব্যাপকতর অভিজ্ঞতায় বিশৃঙ্খল কবিতাও রয়েছে বহু। কিন্তু,

> 'চরিতার্থ দেহমিলনের ফলে একটি মাত্র বিদেহ স্পষ্টতার প্রকাশ যে-কবিতায় যেখানে কবিতা জ্ঞানে গভীর নয় শুধু, অথবা প্রাকৃত জীবনের ব্যাপার নিয়ে নিবিড় নয় কেবলমাত্র—এই দুই জিনিস মিলে এক হ'য়ে গেছে যেখানে এমনই আত্মিক নিবিড়তায় ও গাণিতিক শুদ্ধতায় যে সহসা মনে হয় মিলনোৎপন্ন কবিতা জ্ঞান নয় আর, জীবনও নয় যেন জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল জিনিস, কিংবা জীবনকে কোনো আলাদা জগতে নিয়ে গিয়ে নতুন ক'রে সৃষ্টি.....

তেমন কবিতা ক'টি আছে সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে? এ-প্রশ্ন জীবনানন্দ নিজেই একদিন উত্থাপন করেছিলেন। সাম্প্রতিক বাংলা কাব্য এবং বাংলা ছোট গল্প নিয়ে আমার গর্ববোধ আছে; এ-কাব্য (এবং ছোটো গল্পও) সমসাময়িক ইংরাজি ও ফরাসী কাব্যের পাশাপাশি আসন দাবি করতে পারে বলে আমার বিশ্বাস। যে স্বল্পসংখ্যক কবির কবিকর্ম নিয়ে আমার এই গর্ব, সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যের গর্ব, জীবনানন্দ তার অন্যতম, এবং সম্ভব মহত্তম।

'জীবনকে আলাদা জগতে নিয়ে নন্দন করে সৃষ্টি'র সাধনায় সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে তিনি অগ্রচারী। 'আলাদা জগৎ' কথাটিতে দূরত্বের ইঙ্গিত আছে, হয়তো বা অস্পষ্ট ধূসরতার সংকেতও। শুনেই মনে হয়, সে-জগৎ জীবনের কাছাকাছি নয় বুঝি, নির্জন নিঃসঙ্গ-তায় লালিত সে বুঝি অন্য স্বতন্ত্র এক পৃথিবী। পথক্লান্ত ধূলিবিজড়িত মন সেখানে হেমন্তের প্রান্তরে শুধু বুঝি নক্ষত্রের ফুল কুড়ায়, নিঃশব্দ স্বপ্নচারণায় শিশিরের আঙুল বুলিয়ে কেবলই বুঝি হৃদয়ের অন্বেষণকে ঘুম পাড়ায়। জীবনানন্দের প্রথম দিককার কবিতা পড়ে আমার এই ধরনের কথাই মনে হোতো। পরে আর তা' হয়নি'। 'আলাদা জগৎ' বলতে গিয়ে জীবনানন্দ নিজে বলেছেন, 'জীবনের যত কাছে কবিতা ও তার সংজ্ঞাকে নিয়ে আসতে পারা যায় তত তাকে শিল্পপ্রসাদে শুদ্ধ করা সম্ভব।'

এই শুদ্ধতার আবেগেই হয়তো, অতীত আর প্রকৃতির আত্মীয়তার প্রথম দিকে যতটুকু ব্যক্তিগত ছিল তাঁর হৃদয়ধর্ম, শেষ পর্যায়ে সেই খণ্ডিত, অসম্পূর্ণ বোধকে অতিক্রম করে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছিলেন আবহমান ইতিহাসের ব্যাপ্তিতে ও বিশালতায়। এই বিশালতায় হৃদয়ের নিগূঢ় বাস্তবকে নতুন করে তিনি আবিষ্কার করেছিলেন—সেই বিশাল

গভীরতাকে স্থান দিয়ে মাপা যায় না, কাল দিয়ে ছোঁয়া যায় না। ভূগোলের সব স্থান, ইতিহাসের সব কাল পেরিয়েও যেন হৃদয়ের কোনো সত্য থাকে—অতীত আর বর্তমানে যার ক্ষণিক আভাসই শুধু মেলে, খণ্ডিত স্থান এবং কালে যার সমগ্রতাকে কিছুতেই উন্মোচিত করে পাওয়া যায় না। সে হয়তো উন্মোচিত, উদ্ভাসিত হ'বে কোনো আগামী কালে, কোনো ভবিষ্যত-সম্ভব ইতিহাসে। কাব্যের এই পর্যায়ে যখন তিনি পৌঁছেছিলেন তখন তিনি আর নির্জন, নিঃসঙ্গ নন। তখন ইতিহাস তাঁর সঙ্গী, তিনি ইতিহাসের অঙ্গ। ইতিহাসের দিগদর্শনেই এক নতুন প্রত্যয় ও গভীর জীবন-বিশ্বাসের অধিকারী হ'য়েছিলেন তিনি।

হ'তে পারে আজ দেশে দেশে মানুষ আহত, আর্ত, অন্ধকারে আত্মসমর্পিত। কিন্তু, আগামী-সম্ভব ইতিহাস কি 'বিনিপাতে'ই নিঃশেষিত, 'অমিত শোণিত নিঃসরণের' সরণিতেই সমাপ্ত? মানবিক হৃদয় কি অতীতকে পেছনে ফেলে, বর্তমানকে অতিক্রম করে নদীর মতই যাত্রা করেনি' হৃদয়ের সাগরসঙ্গমে? সেই কালজয়ী মানবিক হৃদয়কে বিশেষ 'বনলতা সেন'-এর মধ্যে আবিষ্কার করেই জীবনানন্দ সন্তুষ্ট থাকেননি', তাকে প্রসারিত করে দিয়েছেন নির্বিশেষ মানবমানবীর মধ্যে। তাই, যাবার আগে তিনি নতুন প্রত্যয়ের অঙ্গীকার আমাদের শুনিয়ে দিয়ে গেছেন :

এ বেদ ছেড়ে ভালো জীবনবেদে—অন্য আলোর স্পন্দনে
চলে যাবার অপার সেতু আছে মানবমনে।

তাঁর সুরে লেগেছিল 'তিমির হননের গান' :

নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
হবে না কি মানুষকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে।
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।

ইতিহাসের আবহমানতায়, হাজার বছর পথ-হাঁটা অযুত হৃদয়ের পরিক্রমায় জীবনানন্দের অনুভূতিতে এমন একটা সমগ্রতার স্বাদ এসেছিল, যা ব্যক্তিতেই আবদ্ধ থাকেনি শুধু, প্রেমেই প্রীতি হয়নি কেবলমাত্র, ইতিহাসে প্রতিফলিত এবং সমাজ-সভ্যতায় সমাহিত হ'য়ে যা নতুন সার্থকতা, 'অন্য অর্থময়'তার সন্ধান করেছে।

সময়হীনতায় উত্তীর্ণ হবার সাধনা সময়েরই রূঢ় স্পর্শে হঠাৎ স্তব্ধ হ'বে, এ হয়তো প্রকৃতির নিষ্ঠুর পরিহাস। ইতিহাসের আবহমানতা এ-পরিহাসে ক্ষুণ্ণ হ'বে না ; শুধু হৃদয়সঙ্গমের তীর্থযাত্রী বাংলা সাহিত্য একটি গভীর বিশাল অথচ ভীরু সলজ্জ হৃদয়ের গভীর মমতামাখা স্পর্শ থেকে অকালে বঞ্চিত হ'লো।

জীবনানন্দের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ব্যক্তিগত পরিচয়ে কৃতার্থ হ'বার সুযোগ আমার ঘটেছিল। তাঁর গভীর মনন ও বিস্তারিত কল্পনার স্পর্শ কিছু কিছু আমি পেয়েছি ; এই মনন ও কল্পনাই তাঁকে সাংসারিক দুঃখ-দুর্গতিকে তুচ্ছ করে নিজেকে ঊর্ধ্বলোকে প্রতিষ্ঠিত রাখবার শক্তি দান করেছিল। বাংলার সাম্প্রতিক কবিকুলে তাঁর কিছু প্রতিষ্ঠালাভ ঘটেছিল, স্বল্পপরিসর পাঠকসমাজের ভালবাসাও তিনি কিছু পেয়ে গেছেন। হয়তো এইটুকুই আমাদের একমাত্র সান্ত্বনা। অকালমৃত্যুর পর তাঁর মহৎ, সুকোমল প্রতিভা যদি বিস্তৃততর [illegible]তি লাভ করে, তিনি সার্থক হ'বেন, আমরা সার্থকতর হ'বো।

জীবনানন্দ দাশের কবিতা

অজিত দত্ত

এ যুগে জীবনানন্দ দাশের কবিতার যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা দেখা দিয়েছে, সেটা নানা কারণে বিস্ময়কর। সমালোচকেরা তাঁকে 'কবির কবি' বা 'Poets' Poet' আখ্যা দিয়েছেন। সত্যই যদি তিনি 'কবির কবি', তবে সাধারণ পাঠক তাঁর কবিতাকে এত সমাদর করে কেন, এ-প্রশ্নের সদুত্তর খুঁজে পাওয়া সহজ নয়। কেননা, এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, জীবনানন্দ সহজবোধ্য কবি নন। কখনো কখনো, অর্থসংগতি ও কল্পনার স্বচ্ছতার দিক থেকে বিচার করলে তাঁর কবিতা রীতিমতো দুর্বোধ্য হয়ে ওঠে। তাঁর সৌন্দর্য কল্পনা যদিও দূরপ্রসারী, তবু তিনি অতিমাত্রায় আত্মতন্ময় বলে, তাঁর কাব্যের ধ্যানলোকে প্রবেশ করা একেবারেই সহজ নয়। এ-জাতীয় কবিরা সাধারণত সমসাময়িক কালে জনপ্রিয়তা লাভ করেন না, কোনো বিশেষ সমানধর্মী সমালোচকের দ্বারা এরা পরবর্তী কালে 'আবিষ্কৃত' হন। জীবনানন্দের সৌভাগ্যক্রমে তিনি নিজের যুগেই সমালোচক-প্রচারকের সহায়তা লাভ করে ফ্যাশানে পরিণত হ'তে পেরেছিলেন। এর ফলে জীবনানন্দের কবিকৃতির যথার্থ মূল্যায়নে বাধা ঘটেছে কি না তা বিতর্কের বিষয়।

ফ্যাশানে পরিণত হওয়ার অপরিহার্য পরিণতিরূপে জীবনানন্দের ভক্তেরা তাঁর কবিতাকে নিজ নিজ প্রবণতা ও কাব্যপ্রত্যয় অনুযায়ী খন্ড খন্ড ভাবে ব্যাখ্যা করতে চেষ্টা করেছেন, সমগ্রভাবে কবিমানস ও কবি মেজাজ অনুধাবন করে তাঁর যথার্থ অন্তর্নিহিত কবিতাকে চিনে নেবার চেষ্টা তেমনভাবে এখনো হয়েছে কিনা সন্দেহ। তাঁর "শ্রেষ্ঠ কবিতা"-র ভূমিকায় জীবনানন্দ নিজেই বলেছেন, 'কেউ বলেছেন এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনতার, কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী; সম্পূর্ণ অবচেতনার ; সুররিয়ালিষ্ট। আরো নানারকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিক ভাবে সত্য—কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।'

জীবনানন্দের কবিতায় মূল প্রেরণা সম্বন্ধে অস্পষ্ট ধারণার ফলে একটা অতি আশ্চর্য ব্যাপার ঘটেছে এই যে, সাম্প্রতিক যে-সব কবি ও কাব্যরসিকেরা নিজেদের মননশীল বা Intellectual বলে প্রচার করেন এবং রোমান্টিকতার প্রতি অনুকম্পা মিশ্রিত বিরাগ প্রকাশ করেন, তাঁরা সকলেই নিজেদেরকে জীবনানন্দের মহাভক্ত বলে পরিচয় দিতে দ্বিধা করেন না। অথচ জীবনানন্দের মূল কবি-প্রেরণা নিঃসন্দেহে রবীন্দ্রানুসারী ও পরিপূর্ণরূপে রোমান্টিক। তাঁর অতিবিখ্যাত ও অতিজনপ্রিয় 'বনলতা সেন'-এ যে বস্তুত রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতার ও সৌন্দর্য প্রেম কল্পনার অনুরণন ব্যঞ্জিত হয়েছে, এ-কথা অতি সহজেই প্রতিভাত হয়। জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে, রূপ কল্পনা তাঁর অন্তর্লোকে এমন একটি চিত্রময় জগৎ সৃষ্টি করেছিল, যা তাঁর একান্ত স্বকীয় এবং পূর্ববর্তী বা সমসাময়িক সকল

কবির মননাশ্রিত জগৎ থেকে রূপে ও প্রকৃতিতে পৃথক। জীবনানন্দের কবিতাকে প্রতীকধর্মী বলে যাঁরা কল্পনা করেন তাঁরা জোর করে তাঁর কবিতাকে নিজ প্রবণতা অনুযায়ী একটি বিশেষ সংজ্ঞায় আবদ্ধ করে সংকীর্ণ করবার প্রয়াস করেন। বস্তুত জীবনানন্দের কবিতাকে প্রতীকধর্মী না বলে রূপকধর্মী বললেই যথার্থ বর্ণনা হয়।

জীবনানন্দের মূল কবি-প্রেরণা যে রোমান্টিকতা তাঁর প্রথম প্রকাশিত কাব্য-গ্রন্থ "ধূসর পাণ্ডুলিপি"র কবিতাগুলিতে অতি স্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ঐ গ্রন্থের 'স্বপ্নের হাতে' নামক কবিতায় কবি বলেছেন :

পৃথিবীর অই অধীরতা
থেমে যায়,—আমাদের হৃদয়ের ব্যথা
দূরের ধূলোয় পথ ছেড়ে'
স্বপ্নেরে-ধ্যানেরে
কাছে ডেকে লয়।—
উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আয়ু শেষ হয়!
পৃথিবীর পুরানো সে পথ
মুছে ফেলে রেখা তার,—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ
চিরদিন রয়।

যে-স্বপ্নের জগতে নিজেকে বিলীন করবার আকাঙ্ক্ষা জীবনানন্দের কবিতায় ব্যক্ত, সে স্বপ্ন একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত ও অনেক সময় অপরের অনধিগম্য। এ কারণে মূলত রোমান্টিক হয়েও রবীন্দ্রনাথের থেকে তাঁকে এত পৃথক বলে মনে হয়।
জীবনানন্দ বলেছেন,

বলি আমি এই হৃদয়েরে
সে কেন জলের মত একা একা
ঘুরে কথা কয়।

এই—'একা একা ঘুরে কথা' বলার মধ্যে জীবনানন্দের কবিতার অতুলনীয়তা এবং দুর্বলতা উভয়ই নিহিত আছে বলে মনে করি। তাঁর স্বপ্নের জগতে তিনি নিঃসঙ্গ, তাই অনেক সময়ই তার মানসাশ্রিত চিত্রগুলি সম্পূর্ণ অভিনব ও অভাবিতপূর্ব ও কল্পনার উপযোগী একটি বিশিষ্ট শিল্পরীতি তিনি নিজেই গড়ে তুলতে সমর্থ হয়েছিলেন। তাঁর কবিতার বিরতি, ঝঙ্কার, শব্দচয়ন, উপমা, চিত্রকল্প সবই একটু আলাদা ধরনের। এই অভিনবত্বের জন্যই তাঁর 'বনলতা সেন'-এর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'স্বপ্ন' কবিতার আত্মীয়তা সহজেই প্রতীয়মান হয় না।

আগে যা বলেছি, তা থেকে কেউ মনে করবেন না যে, জীবনানন্দের কবিতা মননের স্পর্শরহিত অথবা সমসাময়িক কালের নানা বিক্ষুব্ধ চিন্তা এবং আমাদের জীবনের বহুবিধ অসম্পূর্ণতায় তাঁর কাব্য প্রেরণা আলোড়িত হয়নি। আমরা যাকে যুগ-চেতনা বলে অভিহিত করি, তা জীবনানন্দের কবিতায় বিশেষ করে তাঁর শেষের দিকের কবিতাগুলিতে খুবই প্রকট। কিন্তু যুগের অসম্পূর্ণতা, অসংগতি ও বিক্ষোভ যেখানে তার সৌন্দর্য-ধ্যানকে আঘাতে বিচলিত করেছে, সেখানেই এই কালের বাস্তব চেতনা ক্ষোভ ও ধিক্কারের সঙ্গে ধ্বনিত হয়েছে। '১৯৪৬-৪৭' নামক কবিতায় তিনি বলেছেন,

মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া ; বিশেষণ ;
এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল ;
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।
অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু
আমাদের এই শতকের
বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড়
শুধু—বেড়ে যায় শুধু ;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে
জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

'সময়ের কাছে' শীর্ষক অন্য একটি কবিতায় আমাদের অপরিপূর্ণ জীবনের বেদনা বোধহয় আরও স্পষ্ট।

মানুষেরা বার বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
নব নব ইতিহাস সৈকতে ভিড়েছে ;
তবুও কোথায় সেই অনির্বচনীয় স্বপ্নের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র
মানবিকতার ভোর?
নচিকেতা জরাথুস্ত্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
হানা দিয়ে—আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?
অন্ধকারে—ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির—হয়ে যেতে চাই ;
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।

আগে বলেছি যে, 'একা একা ঘুরে কথা বলা' বা আত্ম-কল্পনার তন্ময়তার মধ্যে জীবনানন্দের দুর্বলতার বীজ নিহিত আছে। জীবনানন্দের কল্পনা যে স্বপ্নলোকে বিচরণ করে, কবির সেই মানস জগৎ একান্তভাবে তার স্বকীয়—এবং পরিচিত কবিকল্পনা থেকে অনেকাংশে পৃথক। সে কারণে এই অনবদ্য কল্পনা যেখানে একটি সরল এবং সহজে হৃদয়ঙ্গমযোগ্য সঙ্গতিপূর্ণ শিল্পরূপ লাভ করতে না পেরেছে সেখানেই তা অস্পষ্টতা ও দুর্বোধ্যতার আবছায়ায় বিলীন হয়ে গেছে। একারণে শকুন, বনলতা সেন সোনালি ডানার চিল প্রভৃতির মতো পরিপূর্ণরূপে সার্থক ও নিটোল কবিতার সংখ্যা জীবনানন্দের অপেক্ষাকৃত অল্পই বলা চলে। অতিরিক্ত ভাব কল্পনা তন্ময়তার জন্য অনেক সময় তাঁর কবিতার ভাব ও বক্তব্যের যোগসূত্র হারিয়ে গেছে, এমন উদাহরণ জীবনানন্দের কবিতায় অপ্রচুর নয়। কিন্তু সামগ্রিক ভাবে পাঠক মনে জীবনানন্দের কবিতার সম্পূর্ণ বোধ এবং অনুভূতি গোচর না হলেও তাঁর উপমা রূপক ও চিত্রকল্পের অনবদ্য উদ্ভাসনে তাঁর কবিতার টুকরাগুলি রসিক মনকে এমন এক রসিক লোকে উত্তীর্ণ করে দিতে পারে যে তাঁর একান্ত দুরধিগম্য কবিতার পাঠও সার্থক মনে হয়।

এ কথাগুলি থেকে আশা করি আমার এ বক্তব্য পরিস্ফুট হবে যে, জীবনানন্দের কল্পনা ও ভাব তার শিল্পকে অনেক সময়ই অতিক্রম করে গেছে, তাঁর কবিতা সর্বত্র পরিপূর্ণ করে সার্থক হয়ে উঠতে পারেনি। অন্যভাবে বলা যায় যে, তার কল্পনা-তন্ময়তা ও শিল্পরূপের

পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য অনেক ক্ষেত্রেই ঘটেনি। তিনি সর্বজনবোধ্য বা সর্বজনঅধিগম্য কবি নন। তার মধ্যে রস ও তার প্রকাশের পরিপূর্ণ সুসংগতি ঘটেনি বলে, তাঁকে আমরা বড় কবি বলেও সর্বত্র সার্থক কবি রূপে বর্ণনা করতে পারি না।

জীবনানন্দ নিজের কবিতায় যতখানি সার্থকতা অর্জন করতে পেরেছিলেন, তার চেয়ে বেশি পরিমাণে নিজের প্রভাবকে বাংলা কবিতায় সঞ্চারিত করতে পেরেছিলেন। অবশ্য এ কথাও সত্য যে, তাঁর কবিতার অনুকারীর সংখ্যা যত অধিক, সে তুলনায় যথার্থরূপে তার প্রভাবকে আত্মসাৎ করতে পেরেছেন এমন সংখ্যক কবি অতি অল্প ও নগণ্য বললেই চলে। তার কারণ তার ভাব প্রকাশের যে একটি বিশেষ ভাষারীতি বা poetic manner ছিল তা অনুকরণ করা সহজ যদিও অনুকারীদের হাতে তা মুদ্রাদোষ বা mannerism-এ পরিণত হয়েছে। জীবনানন্দের কল্পনার যে বৈশিষ্ট্য তার স্বপ্নজগতের যে অদ্বিতীয়তা তার উপমা-চিত্রকল্প ও বর্ণনার যে এককত্ব তার সম্পূর্ণ অনুরূপ মানস গঠন ও প্রকাশ ক্ষমতা নিয়ে এখনো কোনো কবি আবির্ভূত হয়েছেন বলে আমাদের জানা নেই।

জীবনানন্দের কবিতার যথার্থ মূল্যায়ন হতে আরো কিছুদিন সময় লাগবে মনে করি। উচ্ছ্বাস কিছু পরিমাণে শান্ত হলে তবেই জীবনানন্দের কবিতার যথার্থ বিচার হবে।

কবি জীবনানন্দ দাশের জীবন-দর্শন

বিমলচন্দ্র ঘোষ

।। এক ।।

"আমি সেই পুরোহিত,—সেই পুরোহিত!
যে-নক্ষত্র ম'রে যায় তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে,—
সেই তারা জেগে আছে, তার দিকে ফিরে
তুমি আছো জেগে,—

* * *

"আমি চ'লে যাবো—তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধ'রে সেইদিন পৃথিবীর 'পরে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!"

[নির্জন স্বাক্ষর ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি]

অগাধ জীবন পিছনে ফেলে রেখে কবি জীবনানন্দ চলে গেলেন। যে মৃত নক্ষত্রের হিম শীতল স্পর্শ কবিসত্তাকে নিঃশেষ করে দিয়ে গেল, সেই মরা নক্ষত্রের কঙ্কাল কি বাংলা কাব্যের স্বপ্নাকাশ থেকে উল্কার মত আজো কক্ষচ্যুত হবে না? যার উদ্দেশ্যে জীবনানন্দের 'সকল গান'—সকল সুর—কাব্যশরীরের সকল স্পন্দন স্পন্দিত হোলো, সেই হৃদয়হীনা মৃগতৃষ্ণিকার বুকে কবির স্মৃতি কি বিন্দুমাত্র স্পর্শ করেছে? এই মানস-দৈন্যের সর্বনাশা চিতা কোনো কোনো বাঙালী কবির চিত্ত-শ্মশানবক্ষে কতদিনে নির্বাপিত হবে কে জানে!

আজ থেকে আঠারো উনিশ বছর আগে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ; জীবনানন্দের বয়স তখন ছত্রিশ-সাঁইত্রিশ, তারও কত বছর আগে তিনি 'নির্জন স্বাক্ষর' লিখেছিলেন তার সন তারিখ আমার জানা নেই। জীবনানন্দের নামের সঙ্গে তাঁর জীবন-দর্শনের কি নিদারুণ বৈপরীত্য! কি করুণ অসঙ্গতি ! মানব-জীবনের চরম ও পরম লক্ষ্য হ'ল শান্তি ও আনন্দলাভ! প্রাচীন ভারতও একথার সাক্ষ্য দেয় ঃ

"আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন জাতানি জীবন্তি।
আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্বিজিজ্ঞাসস্য তব্রহ্মঃ।।"

সর্বাপেক্ষা বিস্ময়ের বিষয় এই যে, কবি জীবনানন্দের জীবনচেতনায় শান্তিও ছিল না, আনন্দও ছিল না। সর্বদা তিনি মরা নক্ষত্রের বরফঢাকা শীতলতার মধ্যে ডুবে থাকতেই ভালবাসতেন। একথা সত্য যে বর্তমান ভারতের কোটি কোটি সাধারণ মানুষের জীবনেও

শান্তি নেই। "কোনো মতে কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ রেখে দেয় বাঁচাইয়া"—তবু কেউ মরতে চায় না, মরা নক্ষত্রের হিমস্পর্শ আবরণে নিজেদের কষ্টক্লিষ্ট প্রাণ ঢেকে রাখতে চায় না। মানুষের বিক্ষোভ, বিদ্রোহ, সংগ্রাম—সব কিছুরই প্রকাশ মুক্তির জন্য, আনন্দের জন্য। মানুষের সামনে যদি ভবিষ্যতের আশা, আকাঙ্খা, স্বপ্ন না থাকে তবে মানুষ কিসের আশায় বাঁচবে? মানসীকে উদ্দেশ করে কবি বলছেন ঃ

"উৎসবের কথা আমি কহিনাক, পড়িনাক, দুর্দশার গান
যে-কবির প্রাণ
উৎসাহে উঠেছে শুধু ভ'রে,
সেই কবি—সে- ও যাবে স'রে ;
যে-কবি পেয়েছে শুধু যন্ত্রণার বিষ শুধু জেনেছে বিষাদ,
মাটি আর রক্তের কর্কশ স্বাদ,
যে বুঝেছে,—প্রলাপের ঘোরে
যে বকেছে,—সে-ও যাবে স'রে ;
একে-একে সবি ডুবে যাবে ;—"

[কয়েকটি লাইন ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি]

কী নির্মম স্বীকারোক্তি! নৈরাশ্য যেন কবির অস্থি-মজ্জার সঙ্গে মিশে ছিল। কবিতাটির পংক্তি সাজানোর মধ্যেও পাশ্চাত্য ক্ষয়িষ্ণু কবিদের প্রভাব লক্ষণীয়।

কবি জীবনানন্দ ঔপনিষদিক রহস্যময়তায় বলেছেন, "কোনো এক মানুষীর তরে, যেই প্রেম জ্বালায়েছি পুরোহিত হয়ে তার বুকের উপরে!" কে সে? কি তার পরিচয়? যার 'বুকের উপরে' তান্ত্রিক শবসাধকের মত কবি পুরোহিত হয়ে প্রেম জ্বালিয়েছিলেন?—কোন এক মানুষীর জন্য? সে কি এই পৃথিবীর মানুষ? না—সে বেদান্তের ব্রহ্ম? যাকে উদ্দেশ করে কবি আবার বলছেন ঃ

"যে আকাশ জ্বলিতেছে, তার মত মনের আবেগে
জেগে আছ,—
জানিয়াছ তুমি এক নিশ্চয়তা,—হয়েছ নিশ্চয়!

কবি সেই অনুদ্দিষ্ট "তুমি"কে শেষ পর্যন্ত জানিয়েছেন ঃ "হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন,—পথের পাতার মত তুমিও তখন, আমার বুকের পরে শুয়ে রবে?" ইরানের আদিকবি বাবা তাহিরের কবিতায়ও ঠিক এই ধরনের জ্বালা, এই ধরনের বেদনার সাদৃশ্য পাওয়া যায় ঃ

"I burn like yonder taper
My heart consumes in flame
I weep I melt in torment
Account this to thy shame
By night and day the same."—Baba Tahir.

প্রায় হাজার বছর আগের এই বেদনাবোধেরও একটা স্পষ্ট অর্থ আছে, হাজার বছর পরে রবীন্দ্রনাথের বেদনাবোধ আরো স্বচ্ছ ঃ

"জ্বেলেছো কি মোরে প্রদীপ তোমার
করিবারে পূজা কোন্ দেবতার?
রহস্য-ঘেরা অসীম আঁধার

মহামন্দির তলে?
নাহি জানি তাই কার লাগি প্রাণ
মরিছে দহিয়া নিশি দিন মান
যেন সচেতন বহ্নি সমান
নাড়ীতে নাড়ীতে জ্বলে?" [অন্তর্যামী : চিত্রা]

মানুষের জীবনে বাসনার শেষ নেই,—তাই যুগে যুগে এই নিদারুণ অতৃপ্তির জ্বালা বুকে নিয়ে অভিমানী কবিরা নানা ছন্দে, নানা ভাব-ব্যঞ্জনায় ঈশ্বরের কাছে নানা ভাবে প্রার্থনা জানিয়েছেন। জীবন দেবতার মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ বলেছেন আরো স্পষ্ট, আরো বলিষ্ঠ স্বীকৃতির ছন্দে :

"গলায়ে গলায়ে বাসনার সোনা
প্রতিদিন আমি করেছি রচনা
তোমার ক্ষণিক খেলার লাগিয়া মুরতি নিত্য নব।।" [চিত্রা]

বাবা তাহির, জালালুদ্দীন রুমি, ভক্ত কবির, দাদু, রবীন্দ্রনাথ—সকলেই আধ্যাত্মিক ও 'মিষ্টিক' কবিতা সৃষ্টির জন্য জগদ্বিখ্যাত—কিন্তু প্রত্যেকেই আশাবাদী। মানবজীবনের জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে পালিয়ে যাবার জন্য এই মহান জীবন-প্রেমিকরা কদাচ নিজেদের অমূল্য কবিসত্তাকে হিমশীতল মৃত্যুর আবরণে ঢেকে রেখে অব্যাহতি পাবার পাগলামী প্রকাশ করেন নি। দুঃখের বিষয় মানব-সভ্যতার এই গৌরবময় যন্ত্রযুগে জন্মগ্রহণ করেও জীবনানন্দ ক্রমাগত মৃত্যু কামনা করে গেছেন তাঁর অগণিত বিষণ্ণমন্থর কাব্যের মাধ্যমে। এ এক প্রকার অদ্ভুত মানসিক ব্যাধি। 'মরা নক্ষত্রে'র সঙ্গে যেন তাঁর নাড়ীর যোগ ছিল। অঘ্রাণ মাসের হৈমন্তী কুয়াশায় জীবনানন্দের কবিমনের আকাশ যেন সর্বদা শিশির ঝরাতো। কবি "শিশিরের সুর" শুনে বিহ্বল হয়ে পড়তেন। পাঠক লক্ষ্য করে দেখবেন তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যে শিশিরের কী অজস্রতা! আর সেই শিশির ঢাকা রহস্যালোকে মৃত্যুর যদি কোনো রস থাকে তবে জীবনানন্দ পাগলের মত সেই দুর্জ্ঞেয় রসাস্বাদনে তন্ময় হয়ে পড়তেন। সাক্ষাৎ মৃত্যু আর মৃত অতীতকে বার বার নানা সূত্রে স্মরণ করতে তিনি ভালবাসতেন। যেমন :

(১) "—মৃত সে পৃথিবী এক আজ রাতে ছেড়ে দিল যারে!"
[কার্তিক মাঠের চাঁদ : ধূঃ পাঃ]

(২) "পৃথিবীতে আজ আর যা হবার নয়,
একদিন হয়েছে যা,—তারপর হাতছাড়া হ'য়ে
হারায়ে ফুরায়ে গেছে, আজো তুমি তার স্বাদ ল'য়ে
আর একবার তবু দাঁড়ায়েছ এসে!"
[কার্তিক মাঠের চাঁদ : ধূঃ পাঃ]

(৩) "যেখানে গাছের শাখা নড়ে
শীত রাতে—মরার হাতের শাদা হাড়ের মতন।—
যেইখানে বন
আদিম রাত্রির ঘ্রাণ
বুকে লয়ে অন্ধকারে গাহিতেছে গান।" [সহজ : ধূঃ পাঃ]

(৪) "চেয়ে দেখি, দুটো হাত, ক'খানা আঙুল
একবার চুপে তুলে ধরি ;

চোখ দু'টো চুণ-চুণ, মুখ খড়ি-খড়ি!
থুত্‌নিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—
সব বাসি,—সব বাসি,—একেবারে মেকি!" [পরস্পর ঃ ধূঃ পাঃ]

(৫) "চোখে কালোশিরার অসুখ
কানে যেই বধিরতা আছে
সেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয় ফলিয়াছে
—সেই সব।"

[বোধ ঃ ধূঃ পাঃ]

(৬) "বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে
পরে সব ঐ মৃত মৃগদের মত।
প্রেমের সাহস সাধ স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে
ব্যথা পাই, ঘৃণা-মৃত্যু পাই ;
পাই না কি?" [ক্যাম্পে ঃ ধূঃ পাঃ]

(৭) "যেন কোন বৈতরণী অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে, চেয়ে দেখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে
সেই সব হূন।" [শকুন ঃ ধূঃ পাঃ]

(৮) "অথবা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর? জানিনা কি আহা,
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ,—একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল সোনা ছিল যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায়, যেন কোন মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।"

[মৃত্যুর আগে ঃ ধূঃ পাঃ]

(৯) "উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,
মানুষেরো আয়ু শেষ হয়!
পৃথিবীর পুরোনো যে পথ মুছে ফেলে রেখা তার,—
কিন্তু এই স্বপ্নের জগত চিরদিন রয়!
সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব,—
নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয়!"

৯, সংখ্যক অংশটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র শেষ কবিতার শেষাংশ। এইখানেই কবির দার্শনিক চিন্তার শেষ সিদ্ধান্ত পাওয়া গেল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে অনেকগুলি বিস্ময়কর কবিতা আছে, যেগুলি বাংলাকাব্যের ক্ষেত্রে জীবনানন্দের নিজস্ব দান কিন্তু সমগ্রতার দিক থেকে বিচার করলে দেখা যায়, কবি যেন এক সীমাহীন রহস্যময়তার ও অস্পষ্টতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে শেষ পর্যন্ত মহাবিস্মরণীর মধ্যে পরমাগতি লাভ করতে চেয়েছেন। এই মৃত্যুধর্মী ধূসর আত্মকেন্দ্রিকতার হাত থেকে কবি জীবনানন্দ জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মুক্তি পাননি।

পরবর্তী কালের রচিত একটি কবিতার মধ্যে জীবনানন্দ যেন মনে হয় বাস্তব জগতের প্রতিঘাতে হঠাৎ ক্ষণকাল সচেতন হয়ে পড়েছিলেন এবং সেই অসতর্ক সচেতনতার মধ্যে নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করেছিলেন ঃ

"কে যেন উঠিল হেঁচে,—হামিদের মরকুটে কানা ঘোড়া বুঝি
সারাদিন গাড়ী টানা হ'ল ঢের—ছুটি পেয়ে জোৎস্নায়
নিজ মনে খেয়ে যায় ঘাস ঃ
যেন কোন ব্যথা নাই পৃথিবীতে—আমি কেন তবে মৃত্যু খুঁজি?
'কেন মৃত্যু খোঁজ তুমি?' চাপা ঠোঁটে বলে দূর কৌতুকী আকাশ!"

এই সময় থেকেই কবি জীবনানন্দ ছন্দোবিন্যাস, ভাববিন্যাস, শব্দচয়ন, প্রতীক ও ব্যঞ্জনা ইত্যাদির দিক দিয়ে ক্রমাগতই জটিল থেকে জটিলতর হয়ে পড়ছিলেন, এর একমাত্র কারণ মানবসমাজের ওপর কবির নিদারুণ বীতরাগ ও হতশ্রদ্ধা। লাস কাটা ঘরের অর্থাৎ মর্গের 'রক্ত ফেনা মাখা মড়কের ইদুর', 'গলিত স্থবির ব্যাং', 'থুরথুরে অন্ধ পেঁচা', 'অন্ধকার সঙ্ঘারামের মশা', 'রক্ত ক্লেদ বসার ওপর উড়ন্ত মাছি', "কবি নয় অজর অক্ষর অধ্যাপক, দাঁত নেই চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি' "মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি,' "থ্যাঁতা ইঁদুরের মত রক্ত মাখা ঠোঁট"— ইত্যাদির বীভৎস তাড়নায় কবির মন পীড়িত ও ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছিল। সুস্থ মানসিকতার অভাবে এতবড় একজন কবি নিজেকে নিজেই সর্বস্বান্ত করেছিলেন। আর তাঁর সর্বনাশ করেছিল একালে পণ্ডিতম্মন্য ভক্তের অত্যুৎকট প্রশংসা, আধুনিক বাংলাকাব্যে যাঁরা আঙ্গিক সর্বস্বতা, অভিনবত্ববিলাস, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম, দুর্বোধ্যতা আর অবচেতনিক উন্মত্ততার পরিচয় পেলে উচ্ছ্বসিত উল্লাসে হৈ হৈ করে বেড়ান।

মনে হয় মৃত্যুর কয়েক মাস আগে জীবনানন্দের কাব্য-চেতনা বৌদ্ধ মহাপরিনির্বাণ ও বৈদান্তিক 'জ্ঞাতুমিচ্ছা'র দার্শনিক প্রেরণায় মৃত্যুর মধ্যেও সান্ত্বনা খুঁজেছিলেন গতানুগতিক দুর্বোধ্যতার অসুস্থ হৃদয়াবেগে ঃ

"শূন্য তবু অন্তহীন শূন্যময়তার রূপ বুঝি ;
ইতিহাস অবিরল শূন্যের গ্রাস ঃ
যদি না মানব এসে তিনফুট জাগতিক কাহিনীতে নীলাভ আকাশ
বিছিয়ে অসীম ক'রে রেখে দিয়ে যায় ঃ
অপ্রেমের থেকে প্রেম গ্লানি থেকে আলোকের মহাজিজ্ঞাসায়"

[মহাজিজ্ঞাসা ঃ শারদীয় আনন্দবাজার পত্রিকা ১৩৬১]

আবার এই একই বৎসরে একই সময়ে অপর একটি শারদীয় সংখ্যায় কবি তাঁর অপ্রেম আর প্রেমকেও ধ্বংসের পটভূমি দিয়ে আচ্ছাদিত করে তার মধ্যে অনাচ্ছাদিত প্রেমিককে ডাক দিয়েছেন ঃ

"সময় অনেক চিহ্ন লক্ষ্য ভেঙে ফেলে; ছুটেছে দুরন্ত অশ্বক্ষুর;
একে একে সকলকে নষ্ট করে দেবে, সময়ের হাতে সবই বিচ্ছিন্ন ভঙ্গুর
হয়ে যায় জেনেছি অনেকদিন আমি। তবুও সময় তার সকল ধ্বংসের পটভূমি
দিয়ে আচ্ছাদিত ক'রে অপ্রেম প্রেমকে তবু ও দেখেছো
অনাচ্ছাদিত হে প্রেমিক তুমি।"

[প্রেমিক ঃ শারদীয় বন্দেমাতরম্ ১৩৬১]

এরপর আর কোন সন্দেহই থাকে না যে কবি মৃত্যুকেই মনে-প্রাণে একমাত্র সত্য বলে জেনেছিলেন বলে, শেষ পর্যন্ত সনাতন ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া আর কোন পথ খুঁজে পাননি ; প্রথম যৌবনের দিশাহারা নক্ষত্র-বিলাসী জ্যোতির্বিদ প্রৌঢ় বয়সে ব্রহ্মবিদ হতে চেয়েছিলেন।

।। দুই ।।

গত ২২শে অক্টোবর শুক্রবার রাত্রি সাড়ে এগারোটার পর শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে জীবনানন্দের জীবন-দীপ নির্বাপিত হয়েছে। এ মৃত্যুতে বাংলার কবি-সমাজ বিচলিত হয়েছে। অল্প কয়েকদিন আগে দেশপ্রিয় পার্কের সংলগ্ন রাসবিহারী এভেনিউতে চলন্ত ট্রামের ধাক্কায় তিনি গুরুতররূপে আহত হন। শেষ পর্যন্ত এই আঘাতই তাঁর মৃত্যুর কারণ হয়। মাত্র পঞ্চান্ন বৎসর বয়সে তিনি তাঁর শোক-সন্তপ্ত পত্নী, একটিমাত্র কন্যা ও গুণগ্রাহী বন্ধুদের কাছ থেকে চিরবিদায় নিলেন। কবির এই অপঘাত মৃত্যুতে আমরা আত্মীয় বিচ্ছেদের বেদনা অনুভব করছি।

আধুনিক বাংলাকাব্যের ক্ষেত্রে যে কয়জন কবি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছেন, জীবনানন্দ ছিলেন তাঁদেরই অন্যতম। শুধু অন্যতম বললেই যথেষ্ট বলা হয় না, জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য ছিল সর্বাপেক্ষা বিস্ময়কর। আঙ্গিক ও জীবন-দর্শনের জটিলতার জন্য জীবনানন্দের কাব্যধারা ছিল সুস্থতম আধুনিক জীবন-বিজ্ঞানের বিরোধী। তথাপি তাঁর কিছু কিছু কবিতা কাব্যরসপিপাসু মনকে বিস্মিত ও মুগ্ধ করে। মানুষের স্বাভাবিক বোধশক্তির অতীত স্তরে সম্পূর্ণ অপরিচিত এক রহস্যময়তার মায়াজাল সৃষ্টিতে জীবনানন্দের অধিকাংশ রচনাই আমাদের কাছে দুর্বোধ্য মনে হয়। এই মারাত্মক দুর্বোধ্যতার প্রভাব সমসাময়িক বহু তরুণ কবির মধ্যেও সংক্রামিত হয়েছে। প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর ইউরোপের থেকে আমদানি এই দুর্বোধ্যতা ও প্রজ্ঞাসর্বস্বতার প্রভাব বাংলাদেশে জীবনানন্দের মত বহু শক্তিশালী কবিই অতিক্রম করতে পারেন নি।

এই নির্জনতা প্রিয়, নির্বিরোধী ও স্বল্পবাক কবি বাংলার নিজস্ব প্রকৃতি ও মাটির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগ রেখেও তাঁর কাব্যের মূল সুরটিকে স্বাভাবিক ও সুস্থ জীবন-ঝঙ্কারে ঝঙ্কৃত করে তুলতে পারেন নি। অথচ কী অসামান্য শক্তি নিয়েই না তিনি জন্মেছিলেন! সংবেদনশীল মনের রঙ দিয়ে সুগভীর সহানুভূতির সঙ্গে যেখানেই তিনি পল্লীপ্রকৃতি ও কৃষক জীবনের বেদনা মিশ্রিত কৃষিভূমির ছবি আঁকতে গেছেন, সেখানেই তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন। দুঃখের বিষয় সেই একই কবিতার গতি ও পরিণতির মধ্যে যেখানেই তিনি তাঁর অসুস্থ মানসিকতার অনর্গল উচ্ছ্বাসে সাধারণ মানুষের কাছে চির দুর্বোধ্য জীবন-দর্শনের অবতারণা করতে চেয়েছেন, সেখানেই তিনি আমাদের আতঙ্কিত করেছেন। এই অদ্ভুত মানসদ্বন্দ্ব তাঁর অধিকাংশ কবিতার মধ্যেই প্রতিফলিত। জীবনানন্দের জীবনদর্শন একাকীত্বের তমসাচ্ছন্ন নৈরাশ্যে অন্তর্মুখীন। যে অন্তরের দ্বার, জানালা, গবাক্ষ, বাতায়ন মনুষ্যময়ী পৃথিবীকে এড়িয়ে চলার অত্যদ্ভুত অহংকারে অবরুদ্ধ।

যে তরঙ্গায়িত ও দীর্ঘ বিলম্বিত ছন্দোবিন্যাসের মন্থরতায় জীবনানন্দ কাব্য রচনা করতেন, একমাত্র সেই ছন্দ ছাড়া অন্য কোন ছন্দে জীবনানন্দের বিষণ্ন গভীর চিন্তাধারাকে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না ; বক্তব্য ও আঙ্গিকের এমন ওতঃপ্রোত মিল আধুনিক আর কোন কবির মধ্যে দেখিনি। জীবনানন্দকে অনুকরণ করা সম্ভবও নয়, উচিতও নয়। কারণ জীবনানন্দের যে মন ও বুদ্ধি কাব্য রচনা করতো, সে মন ও বুদ্ধি আধুনিক জীবন-সংগ্রামের পরিবেশে জন্মাতে পারে না। অতীতের কাব্য জগতেও জন্মানো সম্ভব ছিল না। এ মন ও বুদ্ধি প্রথম ইউরোপীয় উত্তরসামরিক সংস্কৃতিবিকারের ভয়াবহ উন্মত্ততার মধ্যে জন্মেছিল।

জীবনানন্দের কবি-প্রতিভা মাঝে মাঝে অসামান্য অনুভূতির মশারি টাঙিয়ে স্বপ্নাসীন

ব্যক্তি সত্তার অদ্বিতীয় ভাবপ্রবণতাকে "মৌশুমী সমুদ্রের পেটের মতো, কখনো বিছানা ছিঁড়ে নক্ষত্রের দিকে'—উড়িয়ে নিয়ে যেতে চেয়েছে। এই রোমাঞ্চকর কাব্যানুভূতি বাংলা কাব্যের ইতিহাসে বিরল। কবি বলছেন ঃ

"জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মতো জ্বল জ্বল করছিল বিশাল আকাশ।
কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল
যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত
আকাশ সঙ্গে করে এনেছে ;
যে রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি,
কাল তারা অতিদূর আকাশের সীমানার কুয়াশায় কুয়াশায় দীর্ঘ
বর্শা হাতে করে
কাতারে কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন—
মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশের জন্য?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?
আড়ষ্ট অভিভূত হয়ে গেছি আমি,
কাল রাতের প্রবল নীল অত্যাচার আমাকে ছিঁড়ে ফেলেছে যেন,
আকাশের বিরামহীন বিস্তৃত ডানার ভিতর
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল।
আর উত্তুঙ্গ বাতাস এসেছে আকাশের বুক থেকে নেমে
আমার জানালার ভিতর দিয়ে শাঁই শাঁই করে
সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো!"

[হাওয়ার রাত]

হায় জীবনানন্দ, তুমি যে কী অসাধারণ কাব্য-প্রতিভা নিয়ে জন্মেছিলে সে কথা হয়তো তুমি নিজেও জানতে না, আর কোনদিন তোমার কোনো শুভানুধ্যায়ী তোমাকে মনে করিয়েও দেননি। তাই তোমার কলম থেকে "হাওয়ার রাত" আর "বনলতা সেনের" মত কবিতা আর বেরুলো না! তুমি চলে গেলে এক সুদুর্জ্ঞেয় রিক্ততার বোঝা বুকে নিয়ে মৃত্যুর হিমশীতল অন্ধকারে।

এই অদ্ভুত আত্মবিলাসী খেয়ালী কবির খেয়ালের অন্ত ছিল না। রোমাঞ্চকর কল্পলোকের মায়ারাজ্যে হয়তো একটা বিড়াল বা একটা চিলের সঙ্গে ঘুরে ঘুরে সময়াতিপাত করলেন। যে বিড়াল কৃষ্ণচূড়ার গায়ে নখ আঁচড়ে সূর্যের পিছনে পিছনে চলে ঃ

"সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে ফিরে কেবলি আমার দেখা হয় ঃ

* *

"হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;— [বেড়াল]

জীবনানন্দের 'চিল' "বেতের ফলের মতো ম্লান চোখে", "পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের

মতো" "ভিজে মেঘের দুপুরে ধানসিঁড়ি নদীর তীরে তীরে কাঁদে।" এই জাতীয় অসুস্থ-সুন্দর চিত্তবৈকল্যের পাশাপাশি "বনলতা সেনের" মত পরমাশ্চর্য লিরিকও রচনা করেছেন। এই একটি মাত্র কবিতার জন্য কবির নাম স্মরণীয় হয়ে থাকবে ঃ

"হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু'দণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।"

'বনলতা' কবির রোমান্টিক স্বপ্নচারিণী মানসসুন্দরী নয়,—সে আমাদেরই মত রক্ত মাংসের মানবী। কেমন তাকে দেখতে? কেমন তার মাথার কেশ? কোন অবস্থায় কবি তার দেখা পেলেন?

"চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে, বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'

তারপর পরম তৃপ্ত রোমাঞ্চিত কবি তাঁর কাব্যসঙ্গিনীকে কাছে পেয়ে, সব দুঃখ, সব জ্বালা, সব স্মৃতি হারিয়ে ফেলেন স্বপ্নময় অন্ধকারের রূপকথার মায়া রাজ্যে ঃ

"পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী ফুরায় এ জীবনের সব লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।"

কবির এই রোমান্টিক ইচ্ছাপূরণের অভিসার পথে পাঠকের মনও উধাও হয়ে ছুটে চলে হাজার হাজার বছরের পৃথিবীর ঐতিহাসিক পথ দিয়ে ;—যে পথে কবি তাঁর বহু বিচিত্র রোমাঞ্চকর সৌন্দর্য-স্বপ্নের অন্ধকারে দেখা পান তাঁর মানসীর। যে মানসী বৌদ্ধযুগ ভাস্কর্যের কারুশিল্পে অপরূপা, যে মানসী বিদিশার রাত্রি দিয়ে গড়া। সমস্ত ইতিহাস পরিক্রমার শেষে ক্লান্ত শ্রান্ত কবিকে যে মানসী দু'দণ্ড শান্তিদান করে—যার নাম 'নাটোরের বনলতা সেন'।

।। তিন ।।

বরিশালের 'সর্বানন্দ ভবনে' অবস্থান কালে কবি জীবনানন্দ সাধারণ মানুষের চেয়ে পরিত্যক্ত প্রাচীন ধ্বংসস্তূপ, ঘনপল্লবিত বৃক্ষলতা ও নৈশনীল আকাশের অগণিত নির্বাক নিঃশব্দ নক্ষত্রপুঞ্জের সঙ্গে মেলামেশা করতে ভালবাসতেন। শুধু বরিশালে নয়, কলকাতায় এলেও সেই একই অবস্থা। গত কয়েক বৎসর থেকে তিনি কলকাতাতেই স্থায়ীভাবে বাস করছিলেন, দেখা হ'লে যখন জিজ্ঞাসা করতাম, "মানুষের সঙ্গে মেশেন না কেন"? তা'র একটি মাত্র উত্তর শোনা যেত, 'ভালো লাগে না।' মানুষের সঙ্গ তাঁর অসহ্য লাগতো। সাহিত্যিক আলাপ আলোচনার মধ্যে অন্যেরা যদি হাজার কথা বলতেন, জীবনানন্দের মুখ

থেকে বেরুতো দু'একটি নিস্পৃহ মন্তব্য। নিজের মধ্যে ডুবে থাকাই ছিল এই নিঃসঙ্গ-প্রিয় কবির স্বধর্ম, তাই রবীন্দ্রনাথের পর অদ্বিতীয় কাব্য-প্রতিভার অধিকারী হয়েও জীবনানন্দ একাকীত্বের নির্মম অহংকারে এই প্রাণবন্ত প্রগতিশীল যুগবিভূতির গৌরব টিকা ললাটে ধারণ করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেন নি।

একদিন দেশপ্রিয় পার্কের ধারে সন্ধ্যার সময় কবির সঙ্গে কথা বলছি। এমন সময় পার্কের ভিতরে একটি শিশু আর্তস্বরে চীৎকার সুরু করে দিল। শিশুটি দাসীর কোল থেকে হঠাৎ পড়ে গিয়েছিল, খুবই আঘাত পেয়েছিল সন্দেহ নেই। কিন্তু সেই ক্রন্দন শুনে জীবনানন্দ বিরক্তির সঙ্গে বলে উঠলেন, "অসহ্য, শহরে দুদণ্ডও শান্তি নেই!" শুনে বলেছিলাম, "কিন্তু গ্রামেও শিশু আছে, আর পড়ে গেলে এমনি ভাবে কাঁদে।" সে কথার তিনি কোন উত্তর দিলেন না।

আজ সুদীর্ঘকাল পরে আকস্মিক অপঘাতে মৃত কবির জীবন ও কাব্যধারা সম্বন্ধে যত ভাবছি ততই দেশপ্রিয় পার্কের ধারের সেদিনের সেই ঘটনাটির কথা মনে পড়ছে। 'কবিতাই কবি মানসের দর্পণ'—একথা যদি সত্যি হয় তবে জীবনানন্দের কবিতা তাঁর মানববিদ্বেষী চরিত্রেরই প্রতিচ্ছবি বলে মেনে নিতেই হবে!

ঊর্ণনাভ যেমন আত্মলালার সূক্ষ্ম তন্তুজাল বিস্তার করে তার মধ্যে বসে থাকতে ভালবাসে, জীবনানন্দও তেমনি যেন তাঁর তৃতীয় নেত্র ও ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে এক অমানবীয় মনোময় রহস্যলোক সৃষ্টি করে তার মধ্যে বসে থাকতে ভালবাসতেন। বহিরঙ্গ প্রকৃতির পঞ্চতান্মাত্রিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের পর এক অস্বাভাবিক অন্তরঙ্গতায় তিনি আপন কাব্যসৃষ্টির মধ্যে মশগুল হয়ে যেতেন। এই অদ্ভুত প্রকৃতির কবি সারা জীবন ধরে সেইসব গ্রন্থ সুগভীর নিষ্ঠার সঙ্গে পড়াশোনা করতেন, যেগুলির মধ্যে মানুষের সমাজ, দর্শন, রাজনীতি ও অর্থনীতির অত্যাধুনিক সমস্যাবলীর নাম গন্ধও থাকতো না। সামাজিক চেতনা ও জাগতিক অভিজ্ঞতার অভাবে যে মহৎ কাব্যসৃষ্টি করা যায় না, একথা তিনি বিশ্বাস করতেন না। মার্কসবাদী কবি ও সাহিত্যিকদের সঙ্গ তাই তিনি সন্তর্পণে এড়িয়ে চলতেন। এই আত্মঘাতী মানসিক অবস্থা ও রোমান্টিক ভাবাদর্শের ফলে জীবনানন্দের কাব্যধারা ক্রমাগত বিষণ্ণ থেকে বিষণ্ণতর হয়ে উঠেছিল।

'কোন এক মানুষ' আর 'কোন এক মানুষী'র খোঁজে আর তাঁর হৈমন্তী কুয়াসাচ্ছন্ন মনের হারিয়ে যাওয়া ঠিকানার অনুসন্ধানে তিনি তাঁর সমস্ত জ্ঞান, বুদ্ধি, সর্বপ্রকার অনুভূতি খরচ কোরে ভূতাবিষ্টের মত শূন্য পরিক্রমা করেছেন। সে মানুষ ও মানুষীকে চেনা রঙ দিয়ে আঁকা যায় না; জানা ভাষা দিয়ে প্রকাশ করা যায় না, পরিচিত ছন্দ দিয়ে কাব্যরূপে সৃষ্টি করা যায় না। সমস্ত বর্তমান কবির কাছে "ব্যথিত অতীত"। মরা নক্ষত্রের বুকের শীত কবির নিরবয়ব আত্মার গায়ে শিহরণ জাগায়। অঘ্রাণের পিঙ্গলা রাত্রে শান্তিহীন শিশিরের জলে কবি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' রচনা করেন। এইখানেই জীবনানন্দ-কাব্যের ট্রাজেডী। 'মেঠো চাঁদ' আর 'মেঠো তারার আলোয়' 'শিশিরের সুর' শুনতে শুনতে একমাত্র সেই পাখী কবির কাব্যে প্রেরণা জাগায়—যার নাম পেঁচা! কবি-মনের পোড়ো জমিতে জীবনের স্পন্দন নেই,—আছে শুধু 'শুকনো ডাঁটা', 'চড়ুয়ের ভাঙা বাসা', 'ঠাণ্ডা কড় কড়ে পাখীর ডিমের খেলা', 'মাকড়ের ছেঁড়া জাল,—শুকনো মাকড়সা'—আর ছুটোছুটি করে "ইঁদুর পেঁচারা"। কী ভীতিপ্রদ কল্পনা! কী মর্মান্তিক কাব্যানুভূতি। পাঠকের রসপিপাসু মনকে বিষণ্ণ করে তোলা ছাড়া জীবনানন্দের সমগ্র জীবন-দর্শনের আর কোন দায়িত্ব নেই।

এই নৈরাজ্যধর্মী নির্বেদ, এই অর্থহীন নিসর্গ পরিক্রমার ভাবগম্ভীর অবসাদ, এই প্রাকৃতিক গূঢ়েষণার সর্বনাশা আত্মপ্রবঞ্চনা পৃথিবীর বহু শক্তিশালী কবিকেই বিস্মৃতির অতল অন্ধকারে নিমজ্জিত করেছে। মাঝে মাঝে বাউল আর রামপ্রসাদী ঢঙে শ্মশানের সাম্যবাদ কবির মনকে সমদর্শী করে তোলার চেষ্টা করেছে,—

"আমাদের পাড়াগাঁয়ে সেই সব ভাঁড়—
যুবরাজ রাজাদের হাড়ে আজ তাহাদের হাড়
মিশে গেছে অন্ধকারে অনেক মাটির নীচে পৃথিবীর তলে।"

কিন্তু এ কল্পনা এই পর্যন্ত, তারপর কবি-মনকে এক পদও অগ্রসর হতে দেয়নি, তাই শুনি এ কাব্যের শেষ অভিলাষ,—

"এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেক দিন জেগে থেকে
ঘুমাবার সাধ ভালবেসে!"

জীবিত অবস্থায় মৃত্যুকে তিনি অর্ধচেতন কবির চোখ দিয়ে দেখতেই ভালবাসতেন কারণ মানুষ তাঁর কাছে অসহ্য ছিল, সমাজ তাঁর কাছে দুর্বিসহ ছিল। সংসারী মানুষ হিসাবে তিনি কেমন ছিলেন জানতে পারিনি। বিস্ময়কর কবি প্রতিভার অধীশ্বর হয়ে তিনি জন্মেছিলেন রবীন্দ্রযুগের তৃতীয় পর্বে। আধুনিক বাংলা কাব্যের ইতিহাসে তিনি ছিলেন স্বয়ম্ভু। এই সচ্চরিত্র, সাধু ও নির্বিবাদী কবির অপমৃত্যু আমাদের মনে দুঃসহ বেদনার সৃষ্টি করেছে। এক একবার মনে হয় সারাজীবন কেবল মৃত্যুকে ভালবেসেছিলেন বলেই কি মৃত্যু তাঁকে অসময়ে ডেকে নিল? কবির স্মৃতি আজ কবির ভাষাতেই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে :

"চোখের তারার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির,—
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর।"

জীবনানন্দ দাশ

জগদীশ ভট্টাচার্য

১

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যজগতে নতুন কবিভাষার আবিষ্কর্তা হলেন জীবনানন্দ দাশ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর জীবনের পাঁচভাগের চারভাগ পথ পেরিয়ে 'পূরবী' কাব্যে তাঁর ঐশী অসন্তোষকে ভাষা দিয়ে বলেছেন ঃ

বহুদিন মনে ছিল আশা
অন্তরের ধ্যানখানি
লভিবে সম্পূর্ণ বাণী ;
ধন নয়, মান নয়, আপনার ভাষা
করেছিনু আশা।

যে-ভাষায় কবির অন্তরের ধ্যানখানি সম্পূর্ণ বাণীমূর্তি লাভ করে সেই ভাষাই কবির নিজের ভাষা। সারা জীবন কবিকে সেই ভাষার সন্ধান করতে হয়। বহুদিনের বহুযুগের সাধনায় তাকে আয়ত্ত করতে হয়।

বস্তুত, কবিশিল্পীর শিল্পবাহন হল ভাষা। কাজেই কবির প্রথম কর্তব্য পালন করতে হবে ভাষার প্রতি। প্রথমে ভাষার বিশুদ্ধিরক্ষা, তারপর ভাষার প্রকাশক্ষমতা বৃদ্ধি-করা এবং নতুন নতুন ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করাই প্রাথমিক কবিকৃত্য। কথাটা বিশেষ জোর দিয়ে বলেছেন বিংশ শতাব্দীতে নতুন ইংরেজি কবিভাষার জনয়িতা টি. এস. এলিয়ট। 'কবিতার সামাজিক কৃত্য' [The Social Function of Poetry] প্রবন্ধে তিনি বলেছেন,

> 'We may say that the duty of the poet, as poet, is only indirectly to his people ; his direct duty is to his *language*, first to preserve, and second to extend and improve. In expressing what other people feel he is also changing the feeling by making it more conscious ; he is making people more aware of what they feel already, and therefore teaching them something about themselves'.

এলিয়ট তাঁর এই বক্তব্যকে বিশদীভূত করে আবার বলেছেন,

> 'And this is what I mean by the social function of poetry in its largest sense : that it does, in proportion to its excellence and vigour, affect the speech and the sensibility of the whole nation'.

কথাটি শুধু সুন্দরই নয়, সত্যও বটে। নতুন কবিভাষার যিনি স্রষ্টা তিনি ভাষার প্রকাশক্ষমতা বাড়িয়ে জাতির অনুভূতিকেও নতুন নতুন দিগন্তে প্রসারিত করে দেন।

রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যে কবিভাষার নতুন রূপ ও বর্ণ সৃষ্টি করে জীবনানন্দ দাশ আমাদের অনুভূতির জগৎকে নব নব আস্বাদনের ক্ষেত্রে সম্প্রসারিত করে দিয়েছেন। এখানেই তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিকৃত্য, এখানেই তাঁর কাব্যসাধনার পরমা সিদ্ধি।

২

জীবনানন্দ দাশ বরিশালের সন্তান। বরিশাল শহরে তাঁর জন্ম। বরিশাল শহরেই তাঁর বাল্য কৈশোর ও প্রথম-যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। পূর্বপুরুষের আদিনিবাস ছিল ঢাকা বিক্রমপুরে। পিতামহ সর্বানন্দ কর্মব্যপদেশে বিক্রমপুর ছেড়ে এসে বসতি স্থাপন করেন বরিশালে। পরে ব্রাহ্মধর্মে দীক্ষিত হন। এই বৈদ্য-পরিবারের কৌলিক উপাধি ছিল দাশগুপ্ত। জাতিভেদহীন ব্রাহ্মসমাজে এসে সর্বানন্দ হলেন দাশগুপ্তের বদলে শুধুমাত্র দাশ। সেই থেকে বরিশালের সর্বানন্দভবনের এই বিশিষ্ট পরিবারটি 'দাশ পরিবার' নামে বিখ্যাত হল। সর্বানন্দের দ্বিতীয় সন্তান সত্যানন্দ। তাঁরই প্রথম পুত্র কবি জীবনানন্দ। জীবনানন্দের শিক্ষাব্রতী পিতা ছিলেন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আত্মিক শিষ্য। মাতামহ ছিলেন কবি। মাতা কুসুমকুমারীও। তাঁর

> ছোটনদী দিনরাত বহে কুলকুল
> পরপারে আমগাছে থাকে বুলবুল—

অথবা

> আমাদের দেশে হবে সেই ছেলে কবে
> কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে ;

—প্রভৃতি মাতৃরচিত কবিতা ছিল শিশু জীবনানন্দের অস্ফুট কণ্ঠের প্রথম কলকাকলি। কবির অনুজা শ্রীমতী সুচরিতা দাশ লিখছেন,

> 'বাবা যদি দিয়ে থাকেন তাঁকে সৌরতেজ—প্রাণবহ্নি, মা তাঁর জন্যে সঞ্চয় করে রেখেছেন স্নেহমমতার বনচ্ছায়া, মৃত্তিকাময়ী সান্ত্বনা।'

কবিধাত্রী বরিশালের প্রকৃতিও জীবনানন্দের কবিমানসকে বিস্ময়রাগে রঞ্জিত করেছে।

> 'আকাশে অনাদি অনন্ত ইন্দ্রনীল আর ধরণীর দিগন্ত ছুঁয়ে আস্তীর্ণ শ্যামলতা নয়ন-মন মগ্ন করে রেখেছে, চেতনায় জ্বালিয়ে দিয়েছে সলজ্জ-শিখা ভালো-লাগার দীপ, যাই-না-কেন দুচোখ ভরে দেখো, বিস্ময়ে বিদীর্ণ হয়ে যাও, সবকিছুকে ভালো-লাগা ভালোবাসার আনন্দে থরথর করে কাঁপো—এমনি মোহমেদুরতা সে দীপের আলোয়। অস্ফুট শৈশব থেকে প্রাণময় কৈশোর ও যৌবনের দীর্ঘদিন কেটেছে বরিশালে—এমনি করে।' [শ্রীমতী সুচরিতা দাশ]

সর্বানন্দভবনের পূর্বপুরুষ সম্পর্কে একটি কিংবদন্তি আছে। রূপকথার মতোই তা রোমাঞ্চকর। শ্রীমতী সুচরিতা লিখছেন,

> 'সেই এক গল্প ছিল। আমাদের পূর্বপুরুষের সম্পর্কে, যাঁরা অপূর্ব সৌন্দর্যের অধিকারী ছিলেন। তাঁদের একজনকে নাকি পরীতে পেয়েছিল। জ্যোৎস্নারাতে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে তাঁকে উড়িয়ে নিয়ে যেত পরীরা, ভোরের আলোয় তাঁকে পাওয়া যেত শিশিরঝলমল সোনার ধানক্ষেতের পাশে। তাঁর বিছানায় ছড়ানো থাকতো কাঁচা লবঙ্গ, এলাচ, দারুচিনি। তারপর বহুযুগ পার হয়ে গেছে। এঁদেরই উত্তরপুরুষ জীবনানন্দ।

এই আশ্চর্য কিংবদন্তিটি জীবনানন্দের কবিমানস সম্পর্কে একটি নিগূঢ় সংকেত বহন

করছে। জীবনানন্দও পরীতে পাওয়া কবি। সৌন্দর্যতনু প্রেমের পরীরা তাঁকে জ্যোৎস্নারাতে ধানক্ষেতের উপর দিয়ে উড়িয়ে নিয়ে যেত এক অতীন্দ্রিয় রহস্যালোকে। অবোধপূর্ব সেই রহস্যজগতের উপলব্ধির কথাই তিনি বলেছেন তাঁর মরমিয়া আলো-আঁধারি ভাষায়।

জীবনানন্দের কবিজীবন সম্পর্কে আরো কয়েকটি অপরিহার্য ইঙ্গিত পাওয়া যাবে 'ময়ূখ'-এর জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যায় [শীত-গ্রীষ্ম ১৩৬১], কবির অনুজ অশোকানন্দ ও সুচরিতা-রচিত স্মৃতিকথায়। সর্বানন্দভবনের কাব্যিক পরিবেশ সম্পর্কে সুচরিতা লিখছেন ঃ

> 'প্রাঙ্গণে কৃষ্ণচূড়া গাছের নিচে মখমলের মত সবুজ ঘাস। তার উপরে কৃষ্ণচূড়ার রক্তিম পাপড়ির সুচারু আল্পনা আঁকা। সূর্যের জাফরানি আলোর রঙে লতাপাতা পাখপাখালির সর্বাঙ্গ মুড়ে থাকে। জানালার সামনে দুটো গন্ধরাজ গাছ আগাগোড়া সাদা ফুলে ছেয়ে গেছে, পাতা দেখা যায় না। পাতার আড়াল থেকে উঁকি দেয় নীলজবা। মাধবীগুচ্ছে রক্তরাগ। কাঁঠালিচাঁপার তীব্র মধুর গন্ধে বাতাস ভারাক্রান্ত।'

অশোকানন্দ বয়সে কবির তিনবছরের ছোট—তাঁর বাল্য কৈশোর ও যৌবনের নিত্য-সঙ্গী ও অন্তরঙ্গ বন্ধু। শিশুকবির সুকুমার স্পর্শকাতর মনটির পরিচয়বাহী কয়েকটি কাহিনী তিনিও তাঁর স্মৃতিকথায় লিপিবদ্ধ করেছেন। সর্বানন্দভবনের বাগানে কাজ করত এক ফকির। দীনতা ও সরলতার প্রতিমূর্তি ছিল সে। স্ফটিক-জলের মতো ছিল তার দুটি চোখ। যখন ফকিরের অন্য কোনো কাজ থাকত না তখন কবিপিতা সত্যানন্দ বলতেন, 'বর্ষায় ঘাস বড্ড বড়ো হয়েছে, সাপ লুকিয়ে থাকতে পারে, তুমি এই ঘাস পরিষ্কার কর।' ঘাসের ওপর কাস্তে চালালে শিশু-কবি কিন্তু অত্যন্ত কাতর হতেন। যে নবীন ঘাস জন্মাবে সেই কচি ঘাসশিশুদের স্বপ্ন দেখিয়ে ফকির কবিকে প্রবোধ দিয়ে বলত, 'কিছু ভাববেন না খোকাবাবু, কয়েক দিনের মধ্যেই আবার খুব সুন্দর নরম কচি ঘাস হবে।'

এই কাহিনীটি পড়ার পর স্বভাবতই জীবনানন্দের 'ঘাস' কবিতাটির কথা মনে পড়বে ঃ

> কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
> পৃথিবী ভরে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
> কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—
> হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
> আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
> গেলাসে-গেলাসে পান করি,
> এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
> ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
> ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
> শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

বলাই বাহুল্য, অশোকানন্দের কাহিনীতে যে চেতনার উন্মেষ তারই পরিশীলিত কাব্যরূপ হল এই কবিতাটি। এই সূক্ষ্ম সুকুমার প্রকৃতিপ্রেম কবিপ্রকৃতির একটি অনন্যপরতন্ত্র বৈশিষ্ট্য।

পরিচিত পরিবেশ থেকে সমাহৃত অভিজ্ঞতার উপকরণ কীভাবে জীবনানন্দের

কবিকল্পনাকে উদ্দীপিত করেছে তার আরেকটি উদাহরণ পাওয়া যাবে শ্রীমতী সুচরিতার আরেকটি গল্প থেকে ঃ

> 'সেদিন আকাশময় সোনালি রঙের ভিজে ভিজে রোদ গড়িয়ে যাচ্ছে, হালকা হাওয়া দিচ্ছে রেশমের রোমাঞ্চময় স্পর্শের মতো। ইজিচেয়ারে বসে দাদা লিখছেন। প্রগাঢ় তন্ময়তায় আচ্ছন্ন হয়ে আছেন তিনি। সামনেই কৃষ্ণচূড়া গাছের হাজার রক্তিম পুষ্পস্তবক, লাল আগুনে জ্বলছে ; গাছের তলার সজল মাটিতে অশেষ সবুজ ঘাসের তর্‌তরে প্রাণস্পন্দনের মখমল, তার ওপর আলো আঁধারের সচল ছায়াছবির নিপুণ আল্পনা। এই তো লিখছিলেন, কখন যেন আনমনা হয়ে গেছেন রৌদ্রছায়ার সেই ছন্দোভঙ্গি দেখে ঘাসের নিবিড়ে ঘাসফড়িংয়ের নৃত্যপরায়ণতায় অভিনিবিষ্ট হয়ে গিয়ে। একটা বিড়াল কখন থেকে ঘোরাঘুরি করছে, আসছে-যাচ্ছে অন্ধকারের মতো নরম পায়ে লাফালাফি করছে, আলোছায়ার চঞ্চলতার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে দিয়ে। ঘাসের বুকে আঁচড় দিচ্ছে, মাটির বুকে, কখনো বা কৃষ্ণচূড়া গাছের গায়েই নখের জোর পরীক্ষা করে নিচ্ছে। রোদের সঙ্গে, প্রকৃতির নম্র হৃদয়ের সঙ্গে এই কলহ দেখে কেমন যেন কৌতুক বোধ করছিলেন দাদা, কিংবা ব্যথিতই হয়েছিলেন। কবিতা লিখলেন।'

সেই কবিতারই নাম 'বিড়াল'। কবিতাটির আরম্ভ শ্রীমতী দাশ-বর্ণিত প্রাকৃত বিড়ালটিকেই নিয়ে। গাছের ছায়ায়, রোদের ভিতরে, বাদামী পাতার ভিড়ে, সারাদিন ওই বিড়ালটির সঙ্গে বারবার কবির দেখা হচ্ছে। কোথাও কয়েক টুকরো মাছের কাঁটার সফলতার পর নিজের হৃদয়কে নিয়ে মৌমাছির মতো নিমগ্ন হয়ে আছে। বাক্যটির বক্তব্য অসাধারণ কিছু নয়। কিন্তু বলার ভঙ্গিটি বিশুদ্ধ জীবনানন্দীয়। বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ীর একাত্ম নিমগ্নতা থেকেই কবি এই বাগ্‌ভঙ্গির অধিকারী হয়েছেন। কিন্তু শেষ চার পংক্তিতে জীবনানন্দের কবিকৃতি ও কলাকৃতির রাখীবন্ধন হয়েছে। কবি বলছেন ঃ

> হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফরান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
> শাদা থাবা বুলিয়ে-বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
> তারপর অন্ধকারকে ছোটো-ছোটো বলের মতো থাবা দিয়ে লুফে আনলো সে,
> সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিলো।

এখানে প্রাকৃত বিড়ালটি আর বিড়াল নেই, সে কবির একটি বিশেষ অভিজ্ঞতার প্রতীক হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত জগৎ মিলিয়ে গেছে কবির সেই উপলব্ধির জগতে। রচিত হয়েছে একটি স্বতন্ত্র জগৎ। সেই জগতে বিড়ালটি বিশুদ্ধ বিড়াল হয়েও একটি বিশুদ্ধ প্রতীক। আর সেই প্রতীক কবির একটি বিশেষ উপলব্ধির বাহন হয়ে এমন একটি ভাবময় সত্তায় রূপান্তরিত হয়েছে যার আনুরূপ্য বিশ্বভুবনে কোথাও নেই, আছে কেবল কবিপ্রজাপতির অলৌকিক মায়ার জগতে। প্রকৃতিকে নিয়ে জীবনানন্দের এই দ্বিতীয় বিশ্বরচনাই তাঁর প্রতিভার অভিনব শিল্পকৃতি।

৩

জীবনানন্দ ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র, ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৮ ফেব্রুয়ারি তাঁর জন্ম। আঠারো বছর বয়স পর্যন্ত বরিশাল স্কুলে আর কলেজে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত পড়ে কলকাতায় আসেন প্রেসিডেন্সি কলেজে সাম্মানিক ইংরেজি সাহিত্যের

ছাত্র হয়ে। ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করে কলকাতায় সিটি কলেজে কর্মজীবন শুরু করেন। কিছুদিন পরে কলেজ থেকে তাঁর চাকরি যায়। তারপর কিছুদিন দিল্লিতে এক কলেজে কাজ করে জীবনানন্দ আবার ফিরে গিয়েছিলেন বরিশালে। সেখানকার ব্রজমোহন কলেজে অধ্যাপক হয়ে দেশবিভাগের পূর্ব পর্যন্ত সেখানে ছিলেন। দেশবিভাগের পরে তিনি চলে আসেন কলকাতায়। জীবনের বাকি দিনগুলি মুখ্যত কলকাতাতেই অতিবাহিত হয়। ১৯৫৪ সালে দৈবদুর্ঘটনায় মাত্র পঞ্চান্ন বছর বয়সে যখন তাঁর মৃত্যু ঘটে, তখন তিনি ছিলেন হাওড়া গার্লস কলেজের অধ্যাপক।

জীবনানন্দ দাশ সম্পর্কে তাঁর সহযাত্রী কবি বুদ্ধদেব বসু লিখেছেন,

> 'প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব করেন না এমন কোনো কবি নেই ; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি। আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায় : তিনি জীবনানন্দ দাশ।'
>
> [কালের পুতুল, প্রথম সংস্করণ, পৃ. ৪৭]

বুদ্ধদেব জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র আলোচনা-প্রসঙ্গেই এই মন্তব্য করেছিলেন। বরিশালের জীবনানন্দ সম্পর্কে এই মন্তব্য অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। কিন্তু কলকাতার জীবনানন্দ সম্পর্কে সর্বাংশে সত্য নয়। আসলে মহানগরীর জীবন ও মনন জীবনানন্দের কবিকল্পনাকে নবরূপ দান করেছিল। তাই তাঁর কাব্যসাধনাকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করা যায়। এক, বরিশালের প্রকৃতি-প্রভাবিত প্রথম যুগ ; দুই, কলকাতার নাগরিকতা-প্রভাবিত দ্বিতীয় যুগ। প্রথম যুগের কাব্যগ্রন্থ হল 'ঝরা পালক' (প্রকাশ ১৩৩৪/১৯২৭), 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (প্রকাশ ১৩৪৩/১৯৩৬), 'রূপসী বাংলা' (রচনাকাল ১৩৪৩-৪৪), 'বনলতা সেন' (রচনাকাল ১৩৩২-১৩৪৬), এবং 'মহাপৃথিবী' (রচনাকাল ১৩৩৬-৪৮)। দ্বিতীয় যুগের ফসল সংকলিত হয়েছে 'সাতটি তারার তিমির' (রচনাকাল ১৩৩৫-৫০), এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা' (রচনাকাল ১৯৩৪-১৯৫০) ও পরবর্তী রচনাবলীতে। কলকাতাপ্রবাস জীবনানন্দের প্রকৃতিনিষ্ঠ কাব্যসাধনা থেকে তাঁকে সরিয়ে এনেছে। সমকালীন যুগজীবনের স্খলন-পতন-ত্রুটি সম্পর্কে তিনি অধিকতর সচেতন হয়েছেন। কাব্যকে তিনি বলেছেন, 'কবিমনের সততাপ্রসূত অভিজ্ঞতা ও কল্পনাপ্রতিভার সন্তান।' নাগরিক জীবনের অভিজ্ঞতার ফলে তাঁর কবিভাষারও পরিবর্তন হয়েছে। তাঁর প্রথম যুগের কবিভাষা ছিল হৃদয়াবেগপ্রধান, দ্বিতীয় যুগের কবিভাষা মননাবেগপ্রধান। প্রথম যুগের কবিভাষায় ছিল বিষণ্নচিত্তের বিস্ময়াবেগ, দ্বিতীয় যুগের কবিভাষায় দেখা দিয়েছে বিক্ষুব্ধ চিত্তের শ্লেষবক্রোক্তি।

৪

জীবনানন্দের কাব্য ও কবিমানসের বিশ্লেষণে বুদ্ধদেবের উক্তিটিকে পুনর্বিচার করে দেখা প্রয়োজন। বুদ্ধদেব বলেছেন, জীবনানন্দ সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়ে গ্রহণ ও প্রকাশ করেছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যে এই বিশেষ অর্থে জীবনানন্দই একমাত্র প্রকৃতির কবি। আমরা বলেছি, জীবনানন্দের প্রথম ভাগের কবিতা সম্পর্কে উক্তিটি অক্ষরে-অক্ষরে সত্য। কিন্তু বুদ্ধদেবের উক্তি এবং আমাদের স্বীকৃতির ফলে জীবনানন্দের কবিমানস ও কবিধর্ম সম্পর্কে ভ্রান্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়াই স্বাভাবিক। জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি,—এই অর্থে যে প্রকৃতিই তাঁর সমস্ত উপলব্ধির রূপক।

আসলে কিন্তু জীবনানন্দ প্রেমের কবি। প্রেমের কবি না বলে বরং প্রেমের মিস্টিক বললেই তাঁর কবিসত্তাকে সম্যক্‌ভাবে বুঝতে পারা যাবে। তাঁর সমস্ত চেতনার মর্মমূলে রয়েছে এক হারানো প্রেমের স্বপ্ন ও স্মৃতি। কবির এই প্রেমচেতনা কোনো ব্যক্তিপ্রেমের 'বিশ্লেষধিয়ার্তি'র উৎসমূল থেকে উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে, অথবা তা কবিমানসের 'জননান্তরসৌহৃদানি'র সংস্কারমাত্রও হতে পারে। কবিমানসের এই বিপ্রলম্ভ-প্রেমচেতনাই কবিকে বিশ্বমুখী করেছে। সংস্কৃত কবি বলেছেন, মিলনের চেয়ে বিরহই বরং ভালো, কেননা, মিলনে প্রিয়াই বিশ্বকে আড়াল করে একেশ্বরী হয়ে বিরাজমান থাকেন—কিন্তু বিরহে ত্রিভুবন তন্ময় হয়ে যায়। 'সঙ্গে সৈব তথৈকা, ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং বিরহে।' জীবনানন্দের ত্রিভুবনও তাঁর প্রেমচেতনায় তন্ময়ীভূত হয়েছিল।

আমরা বলেছি, জীবনানন্দ পরীতে-পাওয়া কবি। কথাটা এই অর্থে সত্য যে, জীবনানন্দের প্রেমচেতনা এক অতীন্দ্রিয় ভাবাবেশে উদ্ভাসিত হয়েছে। তাঁর এই ভাবাবেশ বুদ্ধিগ্রাহ্য নয়। 'যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ',—নয়নমনের সেই অনধিগম্য লোকে রয়েছে তাঁর চিরপলাতকা মানসসুন্দরী। ভাষার অতীত তীর থেকে কবি তার মরমী চেতনাকে ভাষার তীরে পৌঁছে দেবার ক্লান্তিহীন চেষ্টা করেছেন সারাজীবন। এই দুঃসাধ্য চেষ্টায় তিনি যতটা সফল হয়েছেন ততটাই কবি হিসেবে তাঁর সফলতা। তাঁর কবিজীবনের এই অনন্যপরতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের কথা মনে রাখলেই তাঁর ব্যর্থতা ও সার্থকতার যথার্থ বিচার সম্ভব হবে।

ইন্দ্রিয়বোধাতীত এক রহস্যময় প্রেমাবেশের ভিতর দিয়ে কেটেছে তাঁর সারা জীবন। এই প্রেমের আবেশেই কবি তাঁর পলাতকা প্রিয়াকে দেখেছেন আকাশভুবনের অপরূপ রূপের জগতে। এই অর্থেই জীবনানন্দ প্রেমের কবি, এই অর্থেই তিনি প্রকৃতির কবি।

কবির প্রথম কাব্যসংকলনের নাম 'ঝরা পালক'। তার 'কবি' শীর্ষক কবিতাটিতে রয়েছে কবিরই আত্মকথা। কবি বলেছেন ঃ

আমি নিদালির আঁখি,—নেশাখোর চোখের স্বপন!
নিরালায় সুর সাধি,—বাঁধি মোর মানসীর বেণী,
মানুষ দেখে নি মোরে কোনোদিন, আমারে চেনে নি!

... ...

শুক্লা একাদশী-রাতে বিধবার বিছানায় যেই জ্যোৎস্না ভাসে
তারি বুকে চুপে-চুপে কবি আসে,—সুর তার আসে!

... ...

জানে না তো কি যে চায়,—কবে হায় কি গেছে হারায়ে!
চোখ বুজে খোঁজে একা,—হাতড়ায় আঙুল বাড়ায়ে

... ...

তারি লাগি মুখ তোলে কোন্ মৃতা,—হিম চিতা জ্বেলে দেয় শিখা,
তার মাঝে যায় দহি' বিরহীর ছায়া-পুত্তলিকা।

বিরহীর ছায়া-পুত্তলিকা কবিমানসের নিত্যসঙ্গী। কিন্তু শুধু ছায়া-পুত্তলিকাই নয়, একটি স্বপ্নকামনাও রয়েছে তার অনুষঙ্গ হিসাবে। 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কবিতায় বলেছেন ঃ

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল,—
ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার,—রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল,

চুল যার শাঙনের মেঘ,—আর আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙীন,
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে, স্বপ্নে—কতদিন।

বলাই বাহুল্য, এই রাজার দুলাল কবিরই কল্পনাসত্তা। ঘুমপথে, স্বপ্নে বহুদিন যাকে কবি দেখেছেন সেই পলাতকা প্রিয়া মেঘের ঘোমটা তুলে প্রেত-চাঁদে কবিকে দেখা দেয়। তাই কবি ভালোবাসেন অস্ত-চাঁদকে। প্রকৃতির প্রতি তাঁর আকর্ষণের হেতু 'অস্তচাঁদে' কবিতায় বিধৃত হয়েছে :

ভালোবাসিয়াছি আমি অস্তচাঁদ,—ক্লান্ত শেষপ্রহরের শশী!
—অঘোর ঘুমের ঘোরে ঢলে যবে কালোনদী,—ঢেউয়ের কলসী,
নিঝ্‌ঝুম বিছানার 'পরে
মেঘবৌ'র খোঁপাখসা জ্যোৎস্নাফুল চুপে চুপে ঝরে,—
চেয়ে থাকি চোখ তুলে,—যেন মোর পলাতকা প্রিয়া
মেঘের ঘোমটা তুলে প্রেত-চাঁদ সচকিতে উঠে শিহরিয়া।
সে যেন দেখেছে মোরে জন্মে-জন্মে ফিরে ফিরে ফিরে
মাঠে ঘাটে একা একা,—বুনোহাঁস—জোনাকির ভিড়ে।
দুশ্চর দেউলে কোন্—কোন্ যক্ষ-প্রাসাদের তটে,
দূর উর—ব্যাবিলোন্—মিশরের মরুভূ-সংকটে,
কোথা পিরামিড-তলে,—ঈসিসের বেদিকার মূলে,
কেউটের মত নীলা যেইখানে ফণা তুলে উঠিয়াছে ফুলে,
কোন্ মন-ভুলানিয়া পথ-চাওয়া দুলালীর সনে
আমারে দেখেছে জ্যোৎস্না,—চার চোখে—অলসনয়নে।

'ঝরা পালক'-এর এই দীর্ঘ তিনটি উদ্ধৃতি থেকে কবির মন আর কবির স্বপ্নলোকের সঙ্গে পাঠকের যে পরিচয় ঘটে, কবির সমগ্র জীবনের কাব্যসাধনায় সেই পরিচয়ই স্পষ্টতর ও নিবিড়তর হয়ে দেখা দেবে। 'ঝরা পালক'-এর কবি তাঁর নিজস্ব প্রকাশভঙ্গিকে খুঁজে পান নি ; তখনো তাঁর কবিভাষা পূর্বসুরি আর সমকালীন সহযাত্রীদের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু 'ঝরা পালক' নামের মধ্যেই তাঁর স্পর্শকাতর সুকুমার কবিমানসের বৈশিষ্ট্যটি ধরা পড়েছে। কবি বলেছেন :

আমি কবি,—সেই কবি,—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি' হেরি ঝরা পালকের ছবি!

শুধু ঝরা পালকের ছবিই নয়, এই কবিতার শেষ স্তবকে আছে—'পড়ে আছে হেথা ছিন্ন নীবার, পাখীর নষ্ট নীড়।' এই পাখি—নীড়হারা পাখি জীবনানন্দের কাব্যলোকে একটি বিশেষ প্রতীকদ্যোতকতা লাভ করেছে। মনে হয় ধীরে ধীরে এই পাখি যেন তাঁর আত্মার দোসর হয়ে উঠেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অনেক আকাশ' কবিতায় দেখি পাখির রূপক একাধিকবার ব্যবহৃত :

সে এসে পাখির মতো স্থির হয়ে বাঁধে নাই নীড়,—
তাহার পাখায় শুধু লেগে আছে তীর—অস্থিরতা!

কিংবা

সবাই এসেছে পথে,—আসে নাই তবু সেই পাখি।—
নদীর কিনারে দূরে ডানা মেলে উড়েছে একাকী,

ছায়ার উপরে তার নিজের পাখার ছায়া ফেলে
সাজায়েছে স্বপ্নের 'পরে তার হৃদয়ের ফাঁকি।

শেষ পংক্তিতে পাখির জগৎ আর মানুষের জগতের ব্যবধান ক্ষীণ হয়ে এসেছে। এই প্রসঙ্গে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পাখিরা' এবং 'মহাপৃথিবী'র 'হায় চিল', 'সিন্ধুসারস' এবং 'বুনো হাঁস'-এর কথা বিশেষ ভাবে মনে পড়বে।

বসন্তের রাতে কবির চোখে ঘুম নেই, কোন্‌দিক থেকে যেন সমুদ্রের স্বর ভেসে আসে, তখন কবির মনে হয়,

আকাশ পাখিরা কথা কয় পরস্পর।
তারপর চলে যায় কোথায় আকাশে?
তাদের ডানার ঘ্রাণ চারিদিকে ভাসে।

চারিদিকে ছড়িয়ে-পড়া পাখির ডানার ঘ্রাণ কবির কাছে সুগভীর অর্থবহ। কবি তলিয়ে যান জীবনবোধের অতলে। বলেন,

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ,
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান,
আর সেই নীড়,
এই স্বাদ—গভীর—গভীর!

পাখির জগতে ডুব দিয়ে জীবনের এই গভীর স্বাদ বাংলা কাব্যে জীবনানন্দের রচনাতেই বিশেষ ভাবে ধরা পড়েছে। ইংরেজি কাব্যের রোমান্টিক যুগে স্কাইলার্ক আর নাইটিঙ্গেলকে নিয়ে যে-সব আশ্চর্য কবিতা লেখা হয়েছে জীবনানন্দের কবিতাগুলি তাদেরই সমপর্যায়ের। শেলির যেমন স্কাইলার্ক, জীবনানন্দের তেমনি সিন্ধুসারস। 'মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতি দূর তরঙ্গের জানালায়' সিন্ধুসারসের সহযাত্রী কবি দেখেছেন,

নাচিতেছে টারান্‌টেলা—রহস্যের ;...
চেয়ে দেখি বরফের মতো সাদা ডানা দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।

সিন্ধুসারস শুধু আনন্দেরই বার্তাবহ। কেননা সে স্বপ্ন দেখতে জানে না। সেই স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে গেলে জীবনের মর্মমূলে যে বেদনার জন্ম হয় তার সন্ধান সে রাখে না :

স্বপ্ন তুমি দ্যাখোনি তো—পৃথিবীর সব পথ সব সিন্ধু ছেড়ে দিয়ে একা
বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
রূপসীর সাথে এক ; সন্ধ্যার নদীর ঢেউয়ে আসন্ন গল্পের মতো রেখা
প্রাণে তার—ম্লান চুল, চোখ তার হিজল বনের মতো কালো ;
একবার স্বপ্নে তারে দেখে ফেলে পৃথিবীর সব স্পষ্ট আলো নিভে গেছে ;
... ...
তুমি সেই নিস্তব্ধতা চেনোনাকো, অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে
জানোনাকো আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে ;
সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে;
... ... ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রাণ দিনের মতন।

প্রেম আর সৌন্দর্য সম্পর্কে মানুষের স্বপ্নভঙ্গের এই বেদনাই জীবনানন্দকে কবি করেছে। সিন্ধুসারসকে লক্ষ্য করে কবি তাঁর সেই মর্মলোকের বেদনাকেই ভাষা দিয়েছেন। 'বুনো হাঁস' কবিতায় বলেছেন, জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে বুনো হাঁস উড়ে যায়। রাত্রির কিনারা দিয়ে তাদের ক্ষিপ্র ডানা নিঃসীম শূন্যে ভাসিয়ে দিয়ে তারা যায়। তারপর নক্ষত্রের বিশাল আকাশে দু-একটা কল্পনার হাঁস কবিচেতনায় নিমগ্ন হয়ে থাকে। কবি বলেন ঃ

মনে পড়ে কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ;
উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব ; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

কবির হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতরে পাখির ডাক যে পলাতকা প্রেমের স্মৃতিকে জাগিয়ে দেয় তারই অনবদ্য কাব্যরূপ হল 'হায় চিল' কবিতাটি। আট পংক্তির এই ছোট্ট কবিতাটির মধ্যে জীবনানন্দের কবিকল্পনার মূলকেন্দ্রটি ধরা পড়েছে—

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে!
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে,
পৃথিবীর রাঙা-রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে!

শ্রীমতী দীপ্তি ত্রিপাঠী তাঁর গ্রন্থে এই কবিতাটির সঙ্গে ইয়েটসের 'He Reproves the Curlew' কবিতার সাদৃশ্য দেখিয়েছেন। জীবনানন্দের কবিতাটি নিশ্চয়ই ইয়েটসের দ্বারা অনুপ্রাণিত। কিন্তু জীবনানন্দের অনুপ্রেরণা তাঁর স্বকীয় অনুভূতিতে জারিত হয়ে একেবারে তাঁর নিজেরই মৌলিক রচনা হয়ে উঠেছে।

৫

'ঝরা পালক' জীবনানন্দের কাব্যসাধনার ইতিহাসে প্রস্তুতি-পর্ব। কবি স্বমহিমায় প্রকাশিত হলেন তাঁর দ্বিতীয় কাব্যসংকলন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে। এই অদ্ভুত নামকরণের যথার্থ তাৎপর্য আবিষ্কার করা কঠিন। কবির প্রসিদ্ধতম কবিতা 'বনলতা সেন'-এর শেষ স্তবকে তার একটি ইঙ্গিত খুঁজে পাওয়া যেতে পারে—

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;

শেষের বাক্যটির অন্বয় এবং বাচ্যার্থ দুরূহ। আসলে ওই শেষ দুটি পংক্তি 'বনলতা সেন' কবিতার দুর্বল গ্রন্থি। কিন্তু ওর মধ্যেই যে বাচ্যাতিরিক্ত অর্থান্তরের অভিব্যঞ্জনা আছে তাতেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নামকরণের আভাস রয়েছে। পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে জোনাকির ঝিলমিল রঙে পাণ্ডুলিপির গল্প শুরু হয়। আমরা জানি বরিশালের আশ্চর্য প্রাকৃতিক পরিবেশে জীবনানন্দের মন গড়ে উঠেছে। নিসর্গসৌন্দর্য তাঁর কাব্যে নতুন সৌন্দর্যও পেয়েছে। কিন্তু জীবনানন্দের কাব্যলোক এক অস্পষ্ট-ধূসর স্বপ্নের মায়া দিয়ে

গড়া। রূপময় বিশ্বের সব রং নিভে যাবার পর তাঁর স্বপ্নমদির রসলোকের দ্বার অর্গলমুক্ত হয়। শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দ প্রেমচেতনা প্রকৃতিচেতনা ও ইতিহাসচেতনার কবি। কিন্তু তাঁর প্রকৃতিচেতনা ও ইতিহাসচেতনার মর্মমূলে রয়েছে তাঁর প্রেমচেতনা।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি মুখ্যত প্রেমের কবি। কাব্যের একটি কবিতার নাম 'নির্জন স্বাক্ষর'। এ স্বাক্ষর প্রেমিকের। কবি বলেছেন :

রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে-আকাশে।
জীবনের রং তবু ফলানো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে!—সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থল,
চেনে নাই তারে ওই সমুদ্রের জল ;
রাতে-রাতে হেঁটে-হেঁটে নক্ষত্রের সনে
তারে আমি পাই নাই ; কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে-জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে—
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।

'সে এক বিস্ময়, পৃথিবীতে নাই তাহা'। কবির চোখে এই অপার্থিব বিস্ময়েরই নাম প্রেম। 'পৃথিবীতে নাই তাহা'—একথার অর্থ হল রূপময় বিশ্বে তাকে পাওয়া যায় না, তাকে পেতে হয় প্রাণময় বিশ্বে। তাই তা অপার্থিব। অথচ এই অপার্থিব প্রেমের জন্যই পৃথিবীর জীবন অর্থময়। 'প্রেম' কবিতায় কবি বলেছেন :

জীবন হয়েছে এক প্রার্থনার গানের মতন
তুমি আছ ব'লে প্রেম,—গানের ছন্দের মতো মন
আলো আর অন্ধকারে দুলে ওঠে তুমি আছ ব'লে!

এই স্বীকৃতি থেকেই প্রমাণিত হচ্ছে যে, জীবনানন্দের কবিমানসে প্রেমই মুখ্য প্রেরণা। আমরা বলেছি, তাঁর সমস্ত চেতনার মর্মমূলে রয়েছে এক হারানো প্রেমের স্বপ্ন ও স্মৃতি। বলেছি, কবির এই চেতনা কোনো ব্যক্তি-প্রেমের বিশ্লেষধিয়ার্তির উৎসমূল থেকে উৎসারিত হয়ে থাকতে পারে, অথবা তা কবিমানসের জননান্তরসৌহৃদানির সংস্কারমাত্রও হতে পারে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রেমের কবিতাগুলি পড়ে কিন্তু পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, এগুলি কবির ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতারই সন্তান। '১৩৩৩' কবিতাটি আমাদের অনুমানকে অনিবার্য সিদ্ধান্তের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কবিতাটিকে একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন। প্রারম্ভেই কবি বলেছেন,—

তোমার শরীর—
তাই নিয়ে এসেছিলে একবার ;—তারপর,—মানুষের ভিড়
রাত্রি আর দিন
তোমারে নিয়েছে ডেকে কোন্ দিকে জানি নি তা,—হয়েছে মলিন
চক্ষু এই ;—ছিঁড়ে গেছি,—ফেঁড়ে গেছি,—পৃথিবীর পথে হেঁটে-হেঁটে
কত দিন রাত্রি গেছে কেটে।

তারপরে দ্বিতীয় স্তবকের আরম্ভে বলা হয়েছে,

আমারে চাও না তুমি আজ আর,—জানি ;
তোমার শরীর ছানি
মিটায় পিপাসা
কে সে আজ! তোমার রক্তের ভালোবাসা
দিয়েছ কাহারে!
কে বা সেই!

এই একান্ত ব্যক্তিগত বেদনাগর্ভ জিজ্ঞাসাই সাধারণীকৃত হয়েছে 'প্রেম' কবিতায় ঃ

একদিন—একরাত করেছি প্রেমের সাথে খেলা!
একরাত—একদিন করেছি মৃত্যুরে অবহেলা।
একদিন—একরাত ;—তারপর প্রেম গেছে চ'লে,—
সবাই চলিয়া যায়,—সকলেরে যেতে হয় ব'লে
তাহারও ফুরাল রাত!

এই নশ্বর মর্ত্যজীবনে সবই নশ্বর, প্রেমও নশ্বর, তাই প্রেমকেও চলে যেতে হয়। এই অনিবার্য জীবনসত্যকে কবি মেনে নিয়েছেন। কিন্তু কবির বেদনাবিদ্ধ মন নিজের যন্ত্রণাকে ভাষা দেবার জন্যে একটি রূপকের আশ্রয় নিয়েছে। শিকারের রূপক। 'ক্যাম্পে' কবিতাটি তারই কাব্যরূপ। হরিণশিকার এর বিষয়ালম্বন। বসন্তের রাতে চারিপাশে বনের বিস্ময়। চৈত্রের বাতাস যেন জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ। এই মায়ামদির অরণ্যপরিবেশে এক ঘাইহরিণী সারারাত ডাকছে পুরুষ হরিণকে। একে একে হরিণেরা গভীর বনের পথ ছেড়ে সেই ডাকে ছুটে আসছে, আর শিকারীর অব্যর্থ গুলিতে দিচ্ছে নিজেদের প্রাণ। কবি বলছেন ঃ

কাল মৃগী আসিবে ফিরিয়া ;
সকালে—আলোয় তাকে দেখা যাবে—
পাশে তার মৃত সব প্রেমিকেরা পড়ে আছে।

কিন্তু ক্যাম্পের এই শিকারকাহিনী অনিবার্যভাবেই কবির বুকের দুঃসহ যন্ত্রণার রক্তাক্ত ক্ষতস্থানকে স্পর্শ করেছে। খাবার ডিশে হরিণের মাংসের ঘ্রাণ নিয়ে বিষণ্ণ চেতনায় কবি বলেছেন ঃ

কেন এই মৃগদের কথা ভেবে ব্যথা পেতে হবে
তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকে নি কি কেউ এসে জ্যোৎস্নায়—দখিনা বাতাসে
অই ঘাইহরিণীর মতো?
আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
... ...
তোমারে কি-চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম এই মৃত মৃগদের মতো
যখন ধুলায় রক্তে মিশে গেছে

এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে?

এই কবিতায় কবি যে যন্ত্রণাকে ভাষা দিয়েছেন তার সঙ্গে আমাদের আর দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ ঘটে নি। জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের ইতিহাস আমাদের জানা নেই। কিন্তু যন্ত্রণা যত বড়োই হোক, বিষকে অমৃতে রূপান্তরিত করার শক্তিই কবিত্বশক্তি। এই অর্থে সার্থক কবিমাত্রেই নীলকণ্ঠ। প্রেমে দুঃখ আছে, কিন্তু প্রেমই জীবনের নিয়ন্ত্রী শক্তি। তাই কবি বলছেন :

ওগো প্রেম,—বাতাসের মতো যেই দিকে যাও চ'লে,
আমারে উড়ায়ে লও আগুনের মতন তখন!
আমি শেষ হব শুধু, ওগো প্রেম, তুমি শেষ হ'লে!
তুমি যদি বেঁচে থাকো,—জেগে রবো আমি এই পৃথিবীর 'পর,—
যদিও বুকের 'পরে রবে মৃত্যু,—মৃত্যুর কবর!

কবির প্রেমচেতনার সঙ্গে মৃত্যুচেতনা কেন ওতপ্রোত হয়ে আছে উপরের উদ্ধৃতি থেকে তার হেতু খুঁজে পাওয়া যাবে। প্রিয়ার কাছে 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর কবির জিজ্ঞাসা ছিল :

হেমন্তের ঝড়ে আমি ঝরিব যখন,
পথের পাতার মতো তুমিও তখন
আমার বুকের 'পরে শুয়ে রবে? অনেক ঘুমের ঘোরে ভরিবে কি মন
সেদিন তোমার?

বিরহী চিত্তের এই জিজ্ঞাসার মধ্যেই কবির চেতনা নিঃশেষ হয়ে যায় নি। নিজের অকুণ্ঠ অনুরক্তির প্রতিশ্রুতিও সেখানে রয়েছে। তাই 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর ধ্রুবপদ হল :

তুমি তা জানো না কিছু—না জানিলে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে ;

এই প্রতিদানপ্রত্যাশাহীন প্রেমচেতনাতেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিচিত্ত আবিষ্ট হয়ে আছে। তাই তিনি আত্মজিজ্ঞাসার ভঙ্গিতে তাঁর প্রেমের সত্যকেই ভাষা দিয়ে বলেছেন,

একবার ভালোবেসে কেন আমি ভালোবাসি সেই ভালোবাসা!

এই ভালোবাসাকে ভালোবাসাই জীবনানন্দের সকল কাব্য-কবিতার অঙ্গিরস। ব্যর্থপ্রেম তাঁর ব্যথিত চিত্তে বিশ্বাসের আলো নিভিয়ে দেয় নি। বরং তা তাঁর কবিদৃষ্টির মণিদীপ হয়ে বিশ্বভুবনকে এক অপরূপ গোধূলিধূসর সৌন্দর্যে বিভূষিত করেছে।

৬

জীবনানন্দ প্রকৃতিলালিত কবি। রবীন্দ্রনাথের 'ছিন্নপত্র'-র ঐতিহ্যে বাংলার দুজন মহৎ শিল্পীর জন্ম হয়েছে। একজন 'পথের পাঁচালী'র বিভূতিভূষণ, আরেকজন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি-মহাপৃথিবী'র জীবনানন্দ।

আমরা বলেছি, জীবনানন্দের কাব্যকবিতার অঙ্গিরস হল প্রেমের রসরূপ। তাঁর প্রকৃতিকবিতাও এই প্রেমের রসে জারিত। চোখে প্রেমের মায়াঞ্জন পরেই সৌন্দর্যমুগ্ধ কবি বাংলার প্রকৃতিকে দেখেছেন। সে দেখার মধ্যে এমন একটা কোমল মধুর স্পর্শ আছে যে, অতি তুচ্ছ নগণ্য বস্তুও অসামান্য মহিমায় মণ্ডিত হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দের প্রকৃতিবিষয়ক কবিতাগুলি পড়লে বুঝতে পারা যায় জীবনকে তিনি কত গভীর ভাবে

ভালোবাসতেন। জীবনানন্দ মানুষকে ভালোবেসেই পেয়েছিলেন প্রকৃতিকে। প্রকৃতির বুকেই তাঁর প্রেমের—তাঁর প্রেমজ বেদনার মুক্তি। তাই নিঃসীম আকাশের নীলিমায় জীবনের সব ধূসরতা লীন হয়ে তাঁর চেতনাকে 'আকাশের—আকাশে আকাশে' সম্প্রসারিত করে দেয়। এই প্রসঙ্গে 'ঝরা পালক'-এর 'নীলিমা' কবিতাটি মনে পড়বে। বিশেষ করে ওই কবিতার শেষ স্তবক 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অবসরের গান' কবিতার নিম্নধৃত পংক্তিত্রয়েও একই কথা কবি বলেছেন ঃ

> শহর—বন্দর—বস্তি—কারখানা দেশলাইয়ে জ্বেলে
> আসিয়াছি নেমে এই ক্ষেতে ;
> শরীরের অবসাদ—হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।

সত্যই প্রকৃতি জীবনানন্দের ক্লান্ত ব্যথিত চিত্তকে শুশ্রূষার গান শুনিয়েছে।

প্রকৃতির সঙ্গে কবির এক নিবিড় একাত্মতা গড়ে উঠেছিল। এক রহস্যময় হৃদয়-সম্পর্ক। 'মাঠের গল্প' তাই তাঁর কাছে নিজেরই জীবনের গল্প হয়ে উঠেছে। মেঠো চাঁদ তাঁর দিকে তাকিয়ে যে ভাষায় কথা বলে তা অন্তরঙ্গ আত্মীয়েরই ভাষা। বরং মানুষকে ভালোবেসে কবি যা পান নি, প্রকৃতির মধ্যে তাই পেয়েছেন। তাই তাঁর দৃষ্টিতে 'ভোরের নরম রং শিশুর গালের মত লাল।' তাই 'শিশিরের শব্দে গান গায় অন্ধকার।' 'আবেগ জানায় রাতের বাতাস।' তাই কার্তিকের ক্ষেতে ভোরের রোদ ধানের উপর মাথা পেতে অলস গেঁয়োর মতো শুয়ে থাকে। পৃথিবী যাকে চায় নি, মানুষ যাকে ভয় করেছে, তার জন্যই জেগে আছে সুদূর আকাশের নক্ষত্রটি। প্রণয়িনীর মতোই চেয়ে আছে কবির চোখের দিকে।—

> সেই দূর প্রণয়িনী আমাদের পৃথিবীর নয়!
> তার দৃষ্টি-তাড়নায় আমারে সে করেছে ব্যাহত,—
> ঘুমন্ত বাঘের বুকে বিষের বাণের মত বিষম সে ক্ষত!

তাই প্রকৃতি জীবনানন্দের দ্বিতীয় প্রিয়া। নানারূপে তিনি সেই প্রিয়াকে দেখেছেন। কার্তিকের শস্যভারনত মাঠের দিকে চেয়ে তিনি দেখেছেন আসন্নপ্রসবা সেই সুন্দরীর প্রাকৃত রূপটিকে। প্রাকৃত ভাষাতেই কবি তাকে প্রাণবন্ত করে তুলেছেন ঃ

> পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।

> আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
> বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝরে পড়ে তার—
> শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে,
> আজো তবু ফুরায় নি বৎসরের নতুন বয়স,
> মাঠে-মাঠে ঝরে পড়ে কাঁচা রোদ,—ভাঁড়ারের রস।

প্রকৃতিকে নিয়ে এমন প্রেমানুভূতির কথা বাংলা কাব্যে আমরা কদাচিৎ পেয়েছি। বাংলার মাঠে-প্রান্তরে—পাড়াগাঁর গায়ে 'রূপশালি ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ' আর কোনো কবি পেয়েছেন বলেও আমাদের জানা নেই।

এখানেই জীবনানন্দের প্রকৃতিপ্রেমের বৈশিষ্ট্য। বাংলার পাড়াগাঁয়ের প্রাকৃত মেয়েটিই তাঁর প্রণয়িনী। তাকে ভালোবেসেই প্রেমিক-কবি বলেছেন, আমি দেখেছি, আমি পেয়েছি, আমার আর কিছু দেখার নেই, আর কিছু পাবার নেই।

স্বভাবতই এখানে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দের তুলনার কথা মনে পড়বে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গীতাঞ্জলিতে বলেছেন, 'যাবার দিনে এই কথাটি বলে যেন যাই,—যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই।' জীবনানন্দেরও এই একই কথা,—যা দেখেছি যা পেয়েছি তুলনা তার নাই। অথচ দুজনের মধ্যে কত তফাত। রবীন্দ্রনাথ 'এই জ্যোতিঃসমুদ্র-মাঝে যে শতদল পদ্ম রাজে' তারই মধু পান করেছেন। বিশ্বরূপের খেলাঘরে অপরূপকে দেখেছেন। এখানে তাঁর দৃষ্টি উপনিষদের ঋষির দৃষ্টি। জীবনানন্দ ভালোবেসেছেন অনিত্য অশাশ্বত এই মর্ত্যমায়াকে। তাঁর দৃষ্টি প্রাকৃত-প্রেমিকের দৃষ্টি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সমালোচনায় বুদ্ধদেব বলেছিলেন, আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবচেয়ে বেশি 'শারীরিক'। কথাটা এই অর্থে সত্য যে, জীবনানন্দ পৃথিবীর মধ্যে মৃত্যুশাসিত প্রকৃতির প্রাণের লীলাকে প্রেমের দৃষ্টিতে দেখেছেন। এমন মধুক্ষরা প্রেম অন্য কোনো কবির মধ্যে নেই। এদিক দিয়ে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র শ্রেষ্ঠ কবিতা। কখনো কখনো মনে হয় এই কবিতাটিই বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দের স্মরণীয় কবিতা। প্রলম্বিত পয়ারের মিত্রাক্ষর ষট্‌কবন্ধের আটটি স্তবকে কবিতাটি সম্পূর্ণ। কবিতাটির নাম দেওয়া যেতে পারে জীবনানন্দের মর্ত্যলীলাষ্টক। আমরা এখানে এই অবিস্মরণীয় কবিতাটির তিনটি স্তবক পাঠককে উপহার দিচ্ছি ঃ

আমরা বেসেছি যারা অন্ধকারে দীর্ঘ শীত-রাত্রিটিরে ভালো,
খড়ের চালের 'পরে শুনিয়াছি মুগ্ধরাতে ডানার সঞ্চার ঃ
পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ ; অন্ধকারে আবার সে কোথায় হারালো!
বুঝেছি শীতের রাত অপরূপ, মাঠে-মাঠে ডানা ভাসাবার
গভীর আহ্লাদে ভরা ; অশথের ডালে-ডালে ডাকিয়াছে বক ;
আমরা বুঝেছি যারা জীবনের এই সব নিভৃত কুহক ;

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত,
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে,
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরে ফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস ;

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু-বেলা
নির্জন মাছের চোখে ; পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে ;

জীবনের এইসব নিভৃত কুহক যারা দেখেছে,—বুঝেছে—মৃত্যুর আগে তাদের আর কি দেখবার বাকি আছে! মর্ত্যলোকে প্রাণের জগতে জীবনের লীলাকে কত নিবিড় ভাবে ভালোবাসলে বলা যায়, 'ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মত রোমে মাখিয়াছে খুদ'—কিংবা 'চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দুবেলা নির্জন মাছের চোখে'! কবির প্রেমের দৃষ্টিতে পৃথিবীর ধূলিমাটি—তার তুচ্ছাতিতুচ্ছ প্রাণের লীলা—এমন মধুর রূপে

আর কখনো ধরা পড়ে নি। রূপের জগতে প্রাণের ঝরনাধারায় কবি যে জীবনের মাধুর্য আহরণ করেছেন তারও বুঝি কোনো তুলনা নেই।

৭

প্রকৃতি, বিশেষ ভাবে বাংলার প্রকৃতি, অপরূপ রূপ পেয়েছে জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' সনেটগুচ্ছে। 'রূপসী বাংলা' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় কবির মৃত্যুর পরে। কবিতাগুলি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের শেষদিকের ফসল। গ্রন্থে আছে সবশুদ্ধ ষাটটি কবিতা ; একটি অষ্টক ছাড়া বাকি সবগুলিই চতুর্দশপদী। তার মধ্যে প্রথম ছেচল্লিশটি ৮+৮+৬=২২ অক্ষরের চরণ দিয়ে গড়া। অবশিষ্ট তেরটি ৮+৮+৪+৬=২৬ অক্ষরের। মিলবিন্যাসে সনেটগুলি ইতালীয় ক্লাসিকাল সনেটের পর্যায়ভুক্ত। অষ্টকবন্ধে দুটি মিল ঃ কচচক ঃ কচচক। আর ষট্‌কবন্ধেও দুটি মিল ঃ ত প ত প ত প। কিন্তু ইতালীয় পেত্রার্কান সনেটের মুখ্য বৈশিষ্ট্য—অষ্টক ও ষট্‌কবন্ধের মধ্যে আবর্তনসন্ধিতে ভাবের ভারসাম্য রক্ষা করা। এদিকে জীবনানন্দ সচেতন ছিলেন বলে মনে হয় না। ইতালীয় সনেটের অনুকরণে ইংলন্ডে মহাকবি মিলটনও এই ধরনের বহু সনেট রচনা করেছেন। আবর্তনসন্ধিতে ভাবের ভারসাম্য রক্ষিত না হওয়ায় সেগুলিকেও উৎকৃষ্ট পেত্রার্কান সনেট বলা হয় না। জীবনানন্দের সনেটেও ভাবের আবর্তনসন্ধি অনুপস্থিত। বাংলার সনেট-সাহিত্যে মোহিতলালের হাতে সনেট-কলাকৃতির যে দৃঢ়পিনদ্ধ রূপ ফুটে উঠেছে জীবনানন্দের হাতে তাও সম্ভব হয় নি। 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুলির অঙ্গসন্ধি শিথিল, বাণীবিন্যাস ভাস্কর্যধর্মী নয়, চিত্রধর্মী।

কিন্তু কবিতাগুলি বাংলার পল্লীবধূর তুলসীমঞ্চে সাঁঝের প্রদীপের মতো স্নিগ্ধ, কমনীয়, পবিত্র। বাঙালী কবি বাংলাদেশকে, দেশের প্রকৃতিকে, দেশের ঐতিহ্য ও সংস্কৃতিকে প্রাণভরে ভালোবেসেছেন। প্রসাদগুণান্বিত সহজবোধ্য ভাষায় জন্মভূমির প্রতি তাঁর জন্মজন্মান্তরের প্রেমের কথা বলেছেন। টীকাভাষ্যে কোনো দূতীয়ালির প্রয়োজন নেই। পড়ার সঙ্গে-সঙ্গে চিত্ত প্রসন্ন হয়ে উঠে ঃ

এক, তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে
রয়ে যাব,

দুই, বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ
খুঁজিতে যাই না আর ঃ

তিন, আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে ;

... ...

যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে,
যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি প'রে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে—আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা ;
যেইখানে সবচেয়ে বেশি রূপ—সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্ণতা ;

চার, আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে ঃ
আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে ;
পৃথিবীর কোনো পথ এ-কন্যারে দেখেনিকো—দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত,

জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে
পৃথিবীর কোনো পথে :

কবির এই উদ্বেল হৃদয়াবেগ থেকেই এক ঝোঁকে এই কবিতাগুলির জন্ম হয়েছিল। পৃথিবীর কোনো পথে রূপসীর চুলের বিন্যাসে এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে না, তাই বাংলার প্রতি কবির এত গভীর ভালোবাসা! এ ভালোবাসা জন্ম-জন্মান্তরের। শুধু তাই নয়, বাংলার প্রকৃতি বাঙালী জীবনের পরম আনন্দ ও পরম বেদনার সঙ্গে কীভাবে জড়িয়ে আছে, প্রতীকের সাহায্যে কবি কখনো সেকথা বলেছেন। মনসামঙ্গলের বেহুলার জীবন কবিমানসে সেই প্রতীকটি সৃষ্টি করেছে। কবি বলছেন :

বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
সোনালি ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
শ্যামার নরম গান শুনেছিলো,—একদিন অমরায় গিয়ে
ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়।

ছিন্ন খঞ্জনার মতো ইন্দ্রের সভায় বেহুলার নাচ, আর তার পায়ের ঘুঙুরের মতো বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুলের কান্না উৎকৃষ্ট কবি-কল্পনার সৃষ্টি। বাংলার এই ভালোবাসা যে পেয়েছে স্বর্গসুখ তার কাছে তুচ্ছ তো হবেই। কিন্তু তবু একদিন এই পরম প্রেমকে ছেড়ে মানুষকে চলে যেতে হবে। জীবনে মৃত্যুর ডাক কখন আসবে কেউ জানে না :

কখন মরণ আসে কে বা জানে—কালীদহে কখন যে ঝড়
কমলের নাল ভাঙে—ছিঁড়ে ফেলে গাংচিল শালিখের প্রাণ,
জানি নাকো ;—তবু যেন মরি আমি এই মাঠ-ঘাটের ভিতর,
কৃষ্ণা যমুনার নয়—যেন এই গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণ
লেগে থাকে চোখে মুখে—রূপসী বাংলা যেন বুকের উপর
জেগে থাকে ; তারি নিচে শুয়ে থাকি যেন আমি অর্ধনারীশ্বর।

শেষের রূপকল্পটি অভূতপূর্ব। কৃষ্ণা যমুনার নয়, গাঙুড়ের ঢেউয়ের আঘ্রাণই কবি পেতে চেয়েছেন। পরকীয়া আর স্বকীয়া প্রেমের প্রতীক হিসাবেই এই দুটি নদীর নাম পাশাপাশি বসে এক নতুন ব্যঞ্জনা লাভ করেছে। তারপরেই, বুকের ওপর রূপসী বাংলা আর তার নিচে কবির মৃত্যুত্তীর্ণ সত্তার অর্ধনারীশ্বর মূর্তিটির কল্পনা অন্ধকারে বিদ্যুদ্বিকাশের মতো হঠাৎ-আলোর-ঝলকানিতে রসিকচিত্তকে বিস্ময়াবিষ্ট করে তোলে।

মৃত্যুর পরে কী হবে সেকথাও কবিকল্পনায় রূপ পেয়েছে। একদিন অন্ধকারে নক্ষত্রের নিচে যখন তিনি মৃত্যুর ঘুমে শুয়ে থাকবেন তখনও এই ভালোবাসা বেঁচে থাকবে। নবজন্মের জাগ্রত চেতনায় দেখতে পাবেন তাঁর শ্মশানচিতা মধুকুপী ঘাসে ভরে আছে। এই ভালোবাসা তাঁকে বারবার ডেকে আনবে বাংলার ধানসিড়ি নদীটির তীরে :

হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে ;
হয়তো ভোরের কাক হ'য়ে এই কার্তিকের নবান্নের দেশে
কুয়াশার বুকে ভেসে একদিন আসিব এ কাঁঠাল-ছায়ায় ;

কবি বলছেন, যে-রূপ নিয়েই তিনি আসুন না কেন, যার রূপ তাঁকে জন্মে জন্মে কাঁদিয়েছে সেই গোরোচনা গোরী, সেই শঙ্খমালা-চন্দ্রমালার খোঁজেই তিনি ফিরে আসবেন বাংলার বুকে। কেননা তারা যে নানা রূপ নিয়ে বাংলার বুকেই বারবার জন্মগ্রহণ করে—

এ-বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তাঁরে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো—বিশালাক্ষী দিয়েছিলো বর,
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।

কবি বলছেন, তাঁর সমস্ত কবিতা তাদের কথা মনে করেই লেখা। একদিন সেইসব সুন্দরীরা বেঁচে ছিল, আজ তারা নেই। কিন্তু তাঁর বিষণ্ণ স্বপ্নে মৃত্যুর ঘুম ভেঙে তারা আবার জীবনের বুকে ফিরে আসে—

এ কবিতা লেখা
তাহাদের ম্লান চুল মনে ক'রে ; তাহাদের কড়ির মতন
ধূসর হাতের রূপ মনে ক'রে ; তাহাদের হৃদয়ের তরে।
সে কত শতাব্দী আগে তাহাদের করুণ শঙ্খের মতো স্তন
তাদের হলুদ শাড়ি—ক্ষীর দেহ—তাহাদের অপরূপ মন
চ'লে গেছে পৃথিবীর সব চেয়ে শান্ত হিম সান্ত্বনার ঘরে ;
আমার বিষণ্ণ স্বপ্নে থেকে থেকে তাহাদের ঘুম ভেঙে পড়ে।

'রূপসী বাংলা'র কবি সেই অপরূপ সুন্দরীদের স্বপ্নেই মশগুল হয়ে আছেন। তাই তাঁর একমাত্র প্রার্থনা ঃ

আমার সোনার খাঁচা খুলে দাও, আমি যে বনের হীরামন ঃ

এই সনেটগুচ্ছে জীবনানন্দ 'বনের হীরামন' হয়ে বাংলার নিসর্গ-প্রকৃতি, বাংলার রূপকথা, আর প্রাচীন কবিকল্পনার উপাদান দিয়ে এক অপূর্ব-সুন্দর স্বপ্নলোক রচনা করেছেন। সেই স্বপ্নলোকের স্রষ্টা জীবনানন্দকে চিনতে পাঠকের ভুল হবার কথা নয়। কিন্তু 'প্রথম বারে যেমন লেখা হয়েছিল ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত', 'সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত' এই সনেটগুচ্ছে কলাকৃতির দৃঢ়পিনদ্ধ রূপটি ফুটে ওঠে নি। কিন্তু যে আবেগে কবি বলছেন, 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাই না আর', সেই আবেগ বিসংবাদী হলেও বাংলার প্রকৃতি আর লোকায়ত সংস্কৃতির প্রতি কবির আন্তরিক অনুরাগ রূপসী বাংলাকে অপরূপ সৌন্দর্যে মণ্ডিত করেছে।

৮

'বনলতা সেন'-এই জীবনানন্দ দাশ মাধ্যন্দিন দীপ্তিতে ভাস্বর হয়ে উঠলেন। বনের হীরামন নয়, অকূল সমুদ্রে সন্তরণক্লান্ত প্রাণই তাঁর কবিচিত্তের সার্থক উপমান হয়ে উঠল ঃ

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন।

তাছাড়া 'বনলতা সেন'-এ প্রমাণিত হল যে, জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা'র কবি হয়েও 'মহাপৃথিবী'র কবি। তাই 'বনলতা সেন' আর 'মহাপৃথিবী'তে—জীবনানন্দ দাশ তাঁর কবিকল্পনার তুঙ্গশিখরে আরোহণ করেছেন।

কোনো একটি কবিতা দিয়ে জীবনানন্দ দাশের সমগ্র কবিসত্তাটিকে যদি চিনতে হয় তাহলে সে কবিতার নাম 'বনলতা সেন'। তিনটি স্তবক দিয়ে গড়া এই কবিতার মধ্যে কবির স্বপ্নবৃত্তটি পূর্ণ হয়েছে। কবি বলছেন ঃ

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি , আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;

আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

অতীতচারিতা রোমান্টিক কবিমানসের ধর্ম। কিন্তু এখানে শুধু অতীতচারিতাই নয়, পৃথিবীর পথে হাজার বছর ধরে ইতিহাস-পরিক্রমায় খন্ডদেশকাল পেরিয়ে কবি মহাকালের মহাপৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছেন। নিখিল ইতিহাসে কবির সেই মহাজীবনবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়ে আছে একটি প্রেমের স্বপ্ন, একটি প্রেমের আকর্ষণ। সেই প্রেমেরই স্বপ্নবিগ্রহ নাটোরের বনলতা সেন। জীবনের সফেন সমুদ্রে ক্লান্ত প্রাণের কাছে বনলতা সেন বহন করে এনেছে দ্বীপের ভরসা—সবুজ ঘাসের দেশের আশ্রয়।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য, অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ;

বনলতা সেনের পাখির নীড়ের মতো চোখে পরম আশ্রয়, পরম আশ্বাসভরা যে প্রেমের সাক্ষাৎ কবি পেয়েছেন তার মধ্যেই রয়েছে কবিজীবনের পরম প্রাপ্তি। তারই স্বীকৃতি দিয়ে কবিতাটি সমাপ্ত হয়েছে—

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
...   .
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

৯

বনলতা সেন কিন্তু কোন বিশেষ নারী নয়। সে নিখিল নারীসত্তার নামরূপমাত্র। কবি নানা নামে সেই একই রহস্যময়ী নারীসত্তাকে বার বার ডেকেছেন। 'চোখে যার শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার' সেই শঙ্খমালা, 'পৃথিবীর ভালো পরিচিত রোদের মতন যার শরীর' সেই সুদর্শনা, 'পৃথিবীর বয়সিনী এক মেয়ের মতন যে' সেই সুরঞ্জনা, 'বিকেলের নক্ষত্রের কাছে যে এক দূরতর দ্বীপ' সেই সুচেতনা,—নানা নামে সেই একই প্রেমময়ী নারীকে কবি সম্বোধন করেছেন।

'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় কবি এমন এক নারীর কথা বলেছেন যে-নারী কবিকে চিরদিন ভালোবেসেছে, অথচ তার মুখ কবি কোনোদিন দেখেন নি। কবির ইতিহাসচেতনা যে তাঁর প্রেমচেতনারই সহোদর এই কবিতায় তারই প্রমাণ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। কবির হৃদয়ে এক বিলুপ্ত নগরীর স্মৃতি ভেসে ওঠে। সে নগরী ভারত-সমুদ্রের তীরে, কিংবা ভূমধ্যসাগরের কিনারে, অথবা টায়ার সিন্ধুর পারে ছিল। অনেক কমলা রঙের রোদ ছিল, অনেক কাকাতুয়া পায়রা ছিল, মেহগিনির ছায়াঘন পল্লব ছিল অনেক। সেই অপরূপ-সুন্দর বিলুপ্ত নগরীর মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদে ছিল কবির বিলুপ্ত হৃদয়, তাঁর মৃত চোখ, আর তাঁর বিলীন স্বপ্ন-আকাঙ্ক্ষা। আর ছিল সেই নারী যে কবিকে চিরদিন ভালোবেসেছে। কবি বলছেন :

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,

অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি,
রামধনু রঙের কাচের জানালা,
ময়ূরের পেখমের মতো রঙিন পর্দায় পর্দায়
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়।

ইতিহাসচেতনায় নিমগ্ন হয়ে কবি সৌন্দর্য, মাদকতা ও প্রেমের তিনটি প্রতীক আবিষ্কার করেছেন,— ১. 'পর্দায়, গালিচার রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' ; ২. 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ', আর ৩. 'নগ্ন নির্জন হাত'। এই তিনটি প্রতীক জীবনানন্দের সামগ্রিক জীবনচেতনারই তিনটি দিকের সংকেত বহন করছে।

সৌন্দর্যের সঙ্গে প্রেমের হরগৌরী সম্পর্ক। এবং একথা তো শিল্পিমাত্রেরই মর্মকথা যে, প্রেমের দৃষ্টিতেই বিশ্বভুবন সুন্দর হয়ে ওঠে। কিন্তু সৌন্দর্যের সঙ্গে মাদকতার মিশ্রণে যে অপূর্ব বস্তু গড়ে ওঠে তারই পরিচয় পাওয়া যাবে জীবনানন্দের 'হাওয়ার রাত' কবিতায়। গভীর হাওয়ার রাতে কবির মশারিটা কখনো ফুলে উঠেছে 'মৌসুমী সমুদ্রের পেটের মতো', কখনো তাঁর মনে হয়েছে মাথার ওপরে মশারি আর নেই, 'স্বাতী নক্ষত্রের কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে।'

এই হাওয়ার রাতে আকাশের অসীম নক্ষত্রের দিকে তাকিয়ে কবির মনে হয়েছে, 'অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখের মতো ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা।' বিশাল আকাশ জ্বলজ্বল করছিল 'জ্যোৎস্নারাতে বেবিলনের রানীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শালের মতো'। তাঁর জানালা দিয়ে শাঁই শাঁই করে আকাশের বুক থেকে নেমে এসেছিল উত্তুঙ্গ বাতাস 'সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো।

এই প্রমত্ত হাওয়ার রাতে কবির হৃদয় ভরে উঠেছিল 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়'। সেই মত্ততাকে ভাষা দিয়ে তিনি বলছেন,

হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব
রোমশ উচ্ছ্বাসে।

'বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণ' এবং 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো' অন্ধকারের 'চঞ্চল' 'বিরাট' 'সজীব' 'রোমশ' উচ্ছ্বাস বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দের কবিকল্পনাতেই সম্ভব হয়েছে।

এই মাদক প্রমত্ততা জীবনানন্দের বলীয়ান জীবনরস-রসিকতারই পরিচায়ক। জীবনরসিক কবি শুধু নিজের ভোগের কথাই চিন্তা করেন নি, মানুষের ভোগে নিজেকে উৎসর্গ করতেও চেয়েছেন। এই আত্মোৎসর্জনস্পৃহা 'বনলতা সেন' গ্রন্থের 'কমলালেবু' কবিতায় আশ্চর্য কাব্যরূপ পেয়েছে :

একবার যখন দেহ থেকে বার হয়ে যাব
আবার কি ফিরে আসব না আমি পৃথিবীতে?

আবার যেন ফিরে আসি
কোনো এক শীতের রাতে
একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে
কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে।

কোনো এক পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে কমলালেবুর 'করুণ মাংস' হয়ে নিজেকে নিবেদন করার কল্পনা সেবাময় মানবপ্রেমের পীযূষধারায় অভিসিঞ্চিত।

১০

'মহাপৃথিবী'র সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কবিতা হল 'আট বছর আগের একদিন'। এই কবিতায় যে 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়ের' কথা কবি বলেছেন সে বিস্ময়চেতনার মূলে না পৌঁছতে পারলে জীবনানন্দ দাশের কবিমানসের অতলান্ত গভীরতায় পৌঁছনো যাবে না। এই প্রসঙ্গে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের 'মৃত্যুর আগে' কবিতার উপান্ত স্তবকটির কথা মনে পড়বে। কবি বলছেন,

পথ ঘাট মাঠের ভিতর
আরো-এক আলো আছে ; দেহে তার বিকেলবেলার ধূসরতা ;
চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হ'য়ে আছে স্থির ;
পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর ;

সেই 'আরো এক আলো'র সন্ধানী কবিমানসকে বোঝবার জন্যে কবির নিজেরই একটি উক্তি এখানে উদ্ধৃত করা প্রয়োজন। 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে কবি বলেছেন ঃ

'সৃষ্টির ভিতর মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন মানবীর সাক্ষাৎ লাভ করা যায়—কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে কোথায় যেন ছিল এবং ভঙ্গুর হয়ে নয়, সংহত হয়ে, আরো অনেকদিন পর্যন্ত হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত, কোথাও যেন রয়ে যাবে এই সবের অনুরূপ উদ্‌গীরণের ভিতরে এসে হৃদয়ে অনুভূতির জন্ম হয়, নীহারিকা যেমন নক্ষত্রের আকার ধারণ করতে থাকে তেমনি বস্তুসঙ্গতির প্রসব হতে থাকে যেন হৃদয়ের ভিতর ; এবং সেই প্রতিফলিত অনুচ্চারিত দেশ ধীরে ধীরে উচ্চারণ করে ওঠে যেন, সুরের জন্ম হয় ; এই বস্তু ও সুরের পরিণয় শুধু নয়, কোনো মানুষের কল্পনা-মনীষার ভিতর এদের একাত্মতা ঘটে—কাব্য জন্মলাভ করে'।

এই বস্তুসংগতি, মানুষের কল্পনামনীষার ভিতরে বস্তু ও সুরের একাত্মতা থেকেই আরো এক জীবনবোধের আরো এক আলোর জন্ম হয়। এই জীবনবোধের কথাই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় বলা হয়েছে। এই প্রসঙ্গে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'বোধ' কবিতাটি মনে পড়বে। কবি বলছেন,

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চলে আসি,

বলি আমি এই হৃদয়েরে ঃ
সে কেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়।
অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?

'বোধ' কবিতায় কবি 'ধেয়ানের ভাষা' খুঁজে পান নি, কিন্তু মহাপৃথিবীতে 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়ে'র যে-কথা তিনি বলেছেন তারই পূর্বরূপ আভাসিত হয়েছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'বোধে'। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় বিষয়বস্তু একটি মৃত মানুষের কাহিনী। আত্মহত্যাকারী একটি মানুষের কথা। কবি বলেছেন ঃ

কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হলো তার সাধ ;

কিন্তু কেন এই মৃত্যুকামনা?—

বধূ শুয়েছিলো পাশে—শিশুটিও ছিল ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল
কোন্ ভূত? ...
... কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখে নি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে ;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;

তাহলে কেন এই আত্মখণ্ডন? কবি তারই উত্তরে বলেছেন,

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে আরো এক বিপন্ন বিস্ময় যে আমাদের অনুক্ষণ ক্লান্ত করছে—এই জীবনবোধ জীবনানন্দ গভীর বেদনার সঙ্গে বহন করেছেন। তাই 'মৃত্যুর আগে' কবিতার অন্তিম স্তবকে কবি বলছেন,

সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো—সোনা ছিলো যাহা
নিরুত্তর শান্তি পায় ; যেন কোন্ মায়াবীর প্রয়োজনে লাগে।

কবির এই মৃত্যুচেতনা তাঁর জীবনচেতনারই সহোদর। বরং জীবনচেতনার চেয়ে মৃত্যুচেতনাই কবিকে মহত্তর জীবনোপলব্ধিতে নিয়ে যায়। স্থানকালের পরিধিতে সীমাবদ্ধ জীবনে কবিকে অনুভব করতে হয়েছে যে, 'খন্ড-বিখন্ডিত এই পৃথিবীর মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়'। সেই 'নিরালোক' অন্ধকারে কবির মনে হয় এখন মরণ ভালো। কেননা 'শরীরে লাগিয়া রবে এই সব ঘাস' আর 'অনন্ত নক্ষত্র রবে চিরকাল যেন কাছাকাছি।'

মৃত্যুতে এই মহাপৃথিবীর চেতনা, এই চিরকালীন অস্তিত্বের সম্ভাবনা বাধাহীন হবে বলেই কবির কাছে মৃত্যু সমাপ্তি নয়, মুক্তি। খন্ডবিখন্ডিত স্থানকালের গন্ডি থেকে অখন্ড অনন্ত জীবনে মুক্তি। এই বিশ্বাসেই 'মহাপৃথিবী'র 'স্বপ্ন' কবিতায় কবি বলছেন,

তবু এই পৃথিবীর সব আলো একদিন নিভে গেলে পরে,
পৃথিবীর সব গল্প একদিন ফুরাবে যখন,
মানুষ রবে না আর, রবে শুধু মানুষের স্বপ্ন তখন ঃ
সেই মুখ আর আমি রবো সেই স্বপ্নের ভিতরে!

১১

আমরা বলেছি, 'মহাপৃথিবী'তে জীবনানন্দের কবিজীবনের একটি যুগান্ত হল। নবযুগারম্ভের শুরু 'সাতটি তারার তিমির'-এ। গ্রন্থখানির প্রকাশ ১৩৫৫ বাংলার অগ্রহায়ণে, অর্থাৎ ১৯৪৮ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বরে। এই কালসীমার মধ্যে কবি বিশ শতকের দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, বাংলার পঞ্চাশের মন্বন্তর, ভারতাত্মার 'করেঙ্গে ইয়ে মরেঙ্গে'-সংকল্প, ছেচল্লিশ সালের সাম্প্রদায়িক বিষোদ্গীরণ, ভারতবিভাগ ও স্বাধীনতাপ্রাপ্তির সাক্ষী হয়েছেন। এই খন্ডকালের উপপ্লবে কবির মহাপৃথিবী ও মহাকাশ যেন হঠাৎ বিপর্যস্ত হয়ে গেল। 'আকাশ নিজের স্থানে নেই মনে হল।' এই বিপর্যস্ত 'সৃষ্টির তীরে' দাঁড়িয়ে বিস্মিত কবি প্রত্যক্ষ করলেন ঃ

হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে ;
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে ;
সচ্ছল কঙ্কাল হ'য়ে গেছে তারপর ;

...   .

প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে ;

...   .

কুইস্‌লিং বানালো কি নিজ নাম—হিটলার সাত কানাকড়ি
দিয়ে তাহা কিনে নিয়ে হ'য়ে গেল লাল ;
মানুষেরই হাতে তবু মানুষ হতেছে নাজেহাল ;

মানুষের ইতিহাসের এই বীভৎস অমানুষিকতাকে রূপ দিতে গিয়ে কবি বললেন,

কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন ঃ
তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে।

এই পঙ্কিল সময়স্রোতে নিমজ্জমান মহানগরীকে কবির মনে হল প্রাগৈতিহাসিক আদিম জঙ্গলের মতো।—

হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল ;
অথবা সে-হাইড্রান্ট হয়তো বা গিয়েছিলো ফেঁসে।

এখন দুপুর রাত নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে
অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ;
...   .
নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।   [রাত্রি]

এই জঙ্গলে ঘোরাফেরা করে ধূর্ত শেয়ালেরা। মানুষের রূপ নিয়ে তারা মানুষেরই আশেপাশে শিকারেরলোভে ঘুরে বেড়ায় ঃ

যেই সব শেয়ালেরা জন্ম-জন্ম শিকারের তরে,
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে,—বার হয়,—চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় প'ড়ে আছে ;—উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি
সেই সব হৃদ্‌যন্ত্র মানবের মৃত আত্মায় ;
তাহলে তাদের মনে যেন এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিতো ;—সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে। [যেই সব শেয়ালেরা]

এই ধূর্ত শেয়ালদের সর্বনাশা শিকারের কথা ভেবে কবিও আর ইতিহাসের অনাসক্ত ভাষ্যকারমাত্র হয়ে থাকতে পারেন নি, তাঁরও স্নায়ুর ভিতরে উত্তেজনার সঞ্চার হয়েছে। কেননা পশুবৃত্ত মানুষের লোভে আর লালসায় জীবনের সমস্ত পবিত্রতা যে কলুষিত হতে বসেছে ঃ

আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন
বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হ'য়ে গেছে জেনে
সপ্রতিভ রূপসীর মতো বিচক্ষণ,
যে-কোনো রাজার কাজে উৎসাহিত নাগরের তরে ;
যে-কোনো ত্বরান্বিত উৎসাহের তরে ;
পৃথিবীর বারগৃহ ধরে তারা উঠে যেতে চায়।

মানুষের এই সর্বনাশ মানুষের কবিকে বিচলিত করেছে। তাই সভ্যতার এই প্রলয়ান্ধকারে জীবনানন্দ তিমিরহননের গান কণ্ঠে নিয়েছেন। আত্মসমালোচনার ভাষায় বলেছেন,

সূর্যালোক নেই—তবু—
সূর্যালোক মনোরম মনে হলে হাসি।
স্বতই বিমর্ষ হয়ে ভদ্রসাধারণ
চেয়ে দ্যাখে তবু সেই বিষাদের চেয়ে
আরো বেশি কালো-কালো ছায়া
লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাশার হিসেব ডিঙিয়ে
নর্দমার থেকে শূন্য ওভারব্রিজে উঠে
নর্দমায় নেমে—

ফুটপাথ থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাথে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নায় ঘুমাতে বা ম'রে যেতে জানে।
এরা সব এই পথে ;
ওরা সব ওই পথে—তবু
মধ্যবিত্ত-মদির জগতে
আমরা বেদনাহীন—অন্তহীন বেদনার পথে।

কিন্তু এই নিরুত্তাপ আত্মজিজ্ঞাসাতেই কবির মানবিক জীবনবোধ পরিসমাপ্ত হয় নি। 'সাতটি তারার তিমির'-এর তলে সভ্যতার অস্তকুণ্ডে বসে তিনি তিমিরবিনাশনের সংকল্পই ঘোষণা করেছেন ঃ

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই।
আমরা তো তিমিরবিনাশী।

১২

কবিজীবনের এই অধ্যায়ে পৌছে স্বভাবতই জীবনানন্দের কাব্যরসিক-সমাজের মনে প্রশ্ন জাগবে ঃ এ যুগে স্বপ্নদ্রষ্টা কবি কি পথভ্রষ্ট হলেন? স্বধর্মভ্রষ্ট? বাংলা কাব্যসমালোচনায় একটি কথা বারবার ব্যবহৃত হয়েছে ঃ জীবনানন্দ বাংলা সাহিত্যের নির্জনতম কবি। মানুষ-জীবনানন্দ-সম্বন্ধে এ উক্তি কতদূর সত্য ছিল আমার জানা নেই। কিন্তু জীবনানন্দের কাব্য সম্পর্কে এ উক্তি একেবারেই সত্য নয়। প্রকৃতি সম্বন্ধে অত বড় মুখর কবি রবীন্দ্রনাথের পরে আর নেই। তাছাড়া যিনি মহাপৃথিবীর মহাকালের সঙ্গী, মানুষের আবহমান ইতিহাসের অনাদ্যন্ত প্রবাহের সঙ্গে যাঁর সুবিশাল ও সুনিবিড় একাত্মতা, তাঁকে নিঃসঙ্গ ও নির্জন কবি বলা যুক্তিসম্মত নয়। তবে জীবনানন্দের কবিজীবনের প্রথমার্ধে সমকালীন সমাজচেতনা ঐকান্তিক হয়ে ওঠে নি বলে তাঁকে সঙ্গিহীন একাকী মনে হওয়া অস্বাভাবিক নাও হতে পারে। কিন্তু এ বিচারও সর্বাংশে সত্য নয়। কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক'-এ সমকালীন জীবন বিচিত্ররূপে প্রকাশিত হয়েছে। এমন কি, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র গোধূলিমদির স্বপ্নাবেশের মধ্যেও 'শকুন' কবিতাটি রচিত হয়েছে। 'এশিয়ার আকাশে আকাশে' 'এশিয়ার খেত-মাঠ-প্রান্তরের 'পরে' লুব্ধদৃষ্টি শকুনেরা যে লুণ্ঠনজীবী সাম্রাজ্যবাদীদের প্রতীক, এই আশ্চর্য সুন্দর প্রতীকী কবিতার শেষপংক্তিতে তা স্পষ্টোচ্চারিত। কবি বলছেন, 'কখন গভীর নীলে, মিশে গেছে সেই সব হূন'। হূন শব্দটি শকুনের ধ্বনিসামঞ্জস্যেই শুধু ব্যবহৃত হয় নি, ভাবধ্বনিতে ও কবিকল্পনায় হূন ও শকুনের সাযুজ্য ঘটেছে। 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে কবিকল্পনা বিশেষভাবে সম্প্রসারিত হয়েছিল ইতিহাসের অতীতকালে। কিন্তু সেখানেও 'কমলালেবু'র মতো কবিতার সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কবি মৃত্যুর পরে পরিচিত মুমূর্ষুর বিছানার কিনারে কমলালেবুর 'করুণ মাংস' হয়ে পুনরায় জন্মগ্রহণ করতে চেয়েছেন। এই শুশ্রূষাপরায়ণ করুণাময় মানবপ্রীতি যাঁর চেতনায় অনুবিদ্ধ হয়ে আছে তাঁকে কি নিঃসঙ্গ ও নির্জন কবি বলা সমীচীন হবে?

তবু সহযাত্রী সতীর্থগণের মনে এই ধারণা সৃষ্টির মূলে রয়েছে জীবনানন্দের নিজস্ব কবিস্বভাব। 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' শীর্ষক প্রবন্ধে জীবনানন্দ বলেছিলেন, 'বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার শববাহনের কাজ চলেছে এঁদের কবিতায়।' উক্ত প্রবন্ধেরই

শেষাংশে কবির ভাষা আরো কঠোর হয়ে উঠেছে। তিনি বলেছেন, 'আমাদের দেশে আজকাল অনেক কবির কবিতাই প্রচারপত্রিকায় পর্যবসিত হয়েছে।' কিন্তু সত্যকার কবিকর্ম সমাজমানসের বিবৃতি বা অশিববিনাশী উচ্চঘোষণা মাত্রই নয়। জীবনানন্দ কাব্যকে 'কবিমনের সততাপ্রসূত অভিজ্ঞতা' ও 'কল্পনাপ্রতিভার সন্তান' বলেছেন। অর্থাৎ জীবনের অভিজ্ঞতার সঙ্গে কল্পনাপ্রতিভার সঙ্গমেই কবিতার জন্ম হয়। এই তত্ত্বকেই ভাষা দিয়ে আলোচ্য প্রবন্ধে জীবনানন্দ পুনরায় বলেছেন, 'প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়,—এমন একটা অপরূপ সঙ্গতি পায় যা তাঁর কবিতায়ই সম্ভব— অন্য কারু কবিতায় নয়।'

১৩৫২ সালে 'উত্তর-রৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে কবি স্বীকার করেছেন যে, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাস-চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।' তবে তাঁর নিজস্ব স্বভাব হল 'সময়-ও-সীমাপ্রসৃতি'র দিকে। তিনি অকপটেই বলেছেন, 'সময়-ও-সীমাপ্রসৃতির ভিতর সাহিত্যের পটভূমি বিমুক্ত দেখতে আমি ভালোবাসি।'

১৩৫৩ সালে 'কবিতা প্রসঙ্গ'-এ নিজের কবিস্বভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্যকে আরো বিশদীভূত করেছেন, 'মহা-বিশ্বলোকের ইশারা থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো ; ....আজ পর্যন্ত যে সব কবিতা আমি লিখেছি সে সবে আবহমান মানবসমাজকে প্রকৃতি ও সময়ের শোভা-ভূমিকায় এক অনাদি "তৃতীয়" বিশেষত্ব হিসেবে স্বীকার করে, কেবলমাত্র তারি ভিতর থেকে উৎস নিরুক্তি খুঁজে পাই নি। নাট্যকবির পক্ষে এটা পাওয়া প্রয়োজন। প্রাতিভাসিক কবিতা-জগতের একাগ্রতা ভেঙে ফেলে তাকে নাট্যপ্রাণ বিশুদ্ধতা দেয় সেই কবি। কিন্তু তবুও তিন জগতেই বিচরণ করে সে মানবসমাজকেই চিনে নেবার ও দেবার মুখ্যতম প্রয়োজনে আন্তরিক হয়ে উঠে। লিরিক কবিও ত্রিভুবনচারী, কিন্তু তার বেলায় প্রকৃতি, সমাজ, সময়-অনুধ্যান কেউ কাউকে প্রায় নির্বিশেষে ছাড়িয়ে মুখ্য হয়ে ওঠে না ; অন্তত মানবসমাজের ঘনঘটায় প্রকৃতি ও সময়ভাবনা দুর্নিরীক্ষ হয়ে মিলিয়ে যাবার মতো নয়। কাজেই উপন্যাস ও নাটকের মতো মানুষ-মনকে সমূলে আক্রান্ত না করেও, কবিতা মানসের আমূল বিপর্যয় ঘটিয়ে দিতে পারে—তাকে নির্মলতর করে তুলবার জন্য কথা ও ইঙ্গিতের দুর্লভ স্বল্পতার ভিতর দিয়ে।'

এই উক্তি যে কথার কথা মাত্র নয়, জীবনানন্দের সমকালীন কবিতাই তার প্রমাণ। 'বনলতা সেন'-এর 'মিতভাষণ' কবিতায় তিনি বলেছেন,

> মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে ;
> বড়ো-বড়ো নগরীর বুকভরা ব্যথা ;
> ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সংকল্প স্বপ্নের
> উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
> তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো ঃ
> এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।

এই বিশ্বাসে সুপ্রতিষ্ঠিত বলেই সভ্যতার নিষ্প্রদীপ অন্ধকারে 'সাতটি তারার তিমির'-এ দাঁড়িয়ে কবি বলেছেন, 'তবুও নক্ষত্র নদী সূর্য নারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।'

১৩

জীবনানন্দ দাশের সর্বশেষ কাব্যসংকলনের নাম 'বেলা অবেলা কালবেলা'। গ্রন্থখানি কবির মৃত্যুর পরে প্রকাশিত। রচনাকাল ১৯৩৪-১৯৫০। 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য' নিবন্ধে কবি বলেছিলেন, 'কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাস-চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।' এই 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান' 'বেলা অবেলা ও কালবেলা'য় একটি বিশেষ রূপ পরিগ্রহ করেছে। এবং এই প্রসঙ্গে একথা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, কবি টি. এস. এলিয়টের কালচেতনা জীবনানন্দের কবিমানসে অল্পবিস্তর প্রভাব বিস্তার করেছে।

অবশ্য ইংরেজি ভাষার কবিদের মধ্যে ইয়েটসের সঙ্গেই জীবনানন্দের কবিমানসের স্বাজাত্য সবচেয়ে বেশী। জীবনানন্দের যেমন 'বনহংস', ইয়েটসের তেমনি 'wild swans'। পাখির প্রতীক উভয় কবিকেই নানাভাবে অনুপ্রাণিত করেছে। শুধু তাই নয়, কবি হিসাবে জীবনানন্দ ইয়েটসের আত্মার আত্মীয়। উভয়েই হারানো সৌন্দর্য আর হারানো প্রেমের কবি। সে-সৌন্দর্য সে-প্রেম একদিন পৃথিবীতে ছিল, কিন্তু আজ আর নেই। তাই বর্তমানের কাল সীমা পেরিয়ে বিস্মৃতপ্রায় অতীতে চলে গেছে কবিতুলনা। কালসমুদ্রের তীরে বসে এই অতীতচারী কল্পনাভিসার উভয় কবিমানসেরই স্বভাব-ধর্ম বলে ইয়েটসের প্রতীক আর রূপকল্পগুলি জীবনানন্দের কাব্যালোকেও একান্ত সত্য। জীবনানন্দের একাধিক কবিতায় অন্ধকার যেন 'আলোর রহস্যময়ী সহোদরা।' অতীন্দ্রিয় চেতনার সেই আলো-আঁধারি লীলার মায়ালোকে স্বপ্নাবিষ্ট হয়েই কবি লিখেছেন তাঁর অবিস্মরণীয় কবিতা 'নগ্ন নির্জন হাত'। একটি বিলুপ্তনগরীর জাতিস্মর-স্মৃতি আর জন্মান্তর-সৌহার্দ্যই কবিতাটির বিষয়ালম্বন। বিস্মৃত সৌন্দর্য আর হারানো প্রেমের স্মৃতিচারণই এই কবিতার মর্মকথা। ইয়েটসেরও একটি কবিতা আছে—'He remembers forgotten beauty!' এই কবিতায় প্রেমিক তার প্রেয়সীকে বলছে,

> When my arms wrap you round I press
> My heart upon the loveliness
> That has long faded from the world ;

এই কবিতায় কবি তাঁর বক্তব্য প্রথম-পুরুষের বাচনিকে বলেছেন। জীবনানন্দের বক্তব্য উত্তম-পুরুষের কণ্ঠে উচ্চারিত। কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই উভয় কবির অন্বিষ্ট 'loveliness that has long faded from the world.।'

উত্তরজীবনে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় পৌঁছে জীবনানন্দ এই অতীতচারী স্বপ্নানুধ্যানকে নিত্যবর্তমানে প্রসৃত অখণ্ডনীয় জীবনসত্যে রূপান্তরিত করেছেন। এবং এখানেই তাঁর কালচেতনা এলিয়টীয় কালচেতনার সমধর্মী হয়ে উঠেছে। এলিয়ট বলেন ঃ

> Time present and time past
> Are both perhaps present in time future,
> And time future contained in time past.
> If all time is eternally present
> All time is unredeemable.

এই দৃষ্টিতে অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ—সব কালই নিত্য-বর্তমান। তাই কবি চলতি কালকে অতীতের সঙ্গে অনবচ্ছিন্ন প্রবাহে এক করে দেখেছেন। এই অনুভূতিতেই সমগ্র সভ্যতার প্রেক্ষাপটে বর্তমান কালটি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। এলিয়টের এই অখণ্ড কালচেতনা

সমকালীন যুগমানসের মর্মলোকে পৌঁছবার একটি নতুন সংকেত, কবির ভাষায়, একটি নতুন চাবি ঃ

> We think of the key, each in his prison
> Thinking of the key,

এলিয়ট নিজের 'চাবি' দিয়ে দুই মহাযুদ্ধের অন্তঃকালীন যুগজীবনের ঢাকনাটি খুলে দিয়েছিলেন। নিঃশেষে অবারিত এই কালরহস্যের অবিস্মরণীয় কাব্য হল 'ওয়েইস্ট-ল্যান্ড'।

উত্তরজীবনে জীবনানন্দও এক অখণ্ড কালচেতনার মধ্যে তাঁর হৃদয়-বিষাদের উত্তরণমন্ত্র খুঁজে পেয়েছেন। তাই তিনি বলেন, 'নিরবধি কাল নীলাকাশ হয়ে মিশে গেছে আমার শরীরে।' বলেন, 'ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে একটি রাত্রি আজ পৃথিবীর তীরে' উপনীত হয়েছে। এই অখণ্ড কালচেতনা আর ইতিহাসচেতনায় অচলপ্রতিষ্ঠ হয়ে কবি খুঁজে পেয়েছেন 'যে-পৃথিবী শুভ হতে গিয়ে হেরে গেছে সেই ব্যর্থতার মানে।' কেননা,

> শহরে নদীতে মেঘে মানুষের মনে
> মানবের ইতিহাসে সে অনেক সে অনেক কাল
> শেষ করে অনুভব করা যেতে পারে কোনো কাল
> শেষ হয় নি কো তবু ;

কালচেতনা সম্পর্কে কবির এই সারস্বত প্রতীতি অনিবার্যভাবেই এলিয়টের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। অনেক অনেক কাল শেষ করেও কোনো কাল শেষ হয় নি, এই বিশ্বাসই চলমান জীবনের অবক্ষয়ের মধ্যে কবিকে মানবের শুভ ভবিষ্যৎ সম্পর্কে নিঃসংশয় করেছে। কুণ্ঠাহীন অস্খলিত কণ্ঠেই তিনি বলেছেন ঃ

> এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায়—
>   চলা যায় সময়ের পথে,
> তত বেশি উত্তরণ সত্য হয়, জানি ; তবু কালের
>   বিষণ্ণলোকী আলো
> অধিক নির্মল হলে নটীর প্রেমের চেয়ে ভালো
> সফল মানব প্রেমে উৎসারিত হয় যদি, তবে
> নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে।
> আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।

'আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে'—এই বলিষ্ঠ বিশ্বাসই এই নাস্তিক যুগের কাছে জীবনানন্দের অন্তিম অঙ্গীকার। নিরবচ্ছিন্ন কালপ্রবাহে অনাদি অন্ধকার থেকে তমোঘ্ন আলোকে উত্তরণই মানব-ইতিহাসের চিরন্তন সত্য।

কিন্তু সেই কালপ্রবাহ 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় শুভে-অশুভে, সুন্দরে-কুৎসিতে নানা রূপ পরিগ্রহ করে। কবি বুঝেছেন, সভ্যতার বর্তমান যুগটি 'অমেয় সুসসময়' নয়, আসলে এটি 'কালবেলা'। 'জনতাগভীর তিথি আজ।' 'কোনো ব্যতিক্রম নেই মানুষবিশেষে।' এই কালবেলায় 'সময়ের তীরে' একটি সামরিক শিবিরে পৌঁছে কবি দেখলেন,

> সেখানে মাতাল সেনানায়কেরা
> মদকে নারীর মতো ব্যবহার করছে,
> নারীকে জলের মতো ;

... ...

শুধু বাতাস উড়ে আসছে ঃ
স্খলিত নিহত মনুষ্যত্বের শেষ সীমানাকে
সময়সেতুলোকে বিলীন ক'রে দেবার জন্যে,
উচ্ছ্রিত শববাহকের মূর্তিতে।

এই কালবেলায় মানুষের সমস্ত শুভপ্রয়াসও পর্যুদস্ত। কবির দৃষ্টিতে 'যতিহীন' কালের এই খণ্ডিত বিপর্যয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে ঃ

কোথায় সমাজ, অর্থনীতি?—স্বর্গগামী সিঁড়ি
ভেঙে গিয়ে পায়ের নিচে রক্তনদীর মতো—
মানব ক্রমপরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী
হয়ে কি আজ চারিদিকে গণনাহীন ধূসর দেয়ালে
ছড়িয়ে আছে যে-যার দ্বৈপসাগর দখল ক'রে!
পুরাণপুরুষ, গণমানুষ, নারীপুরুষ, মানবতা, অসংখ্য বিপ্লব
অর্থবিহীন হয়ে গেলে,—তবু আরেক নবীনতর ভোরে
সার্থকতা পাওয়া যাবে ভেবে মানুষ সঞ্চারিত হয়ে
পথে-পথে সবের শুভ নিকেতনের সমাজ বানিয়ে
তবুও কেবল দ্বীপ বানালো যে-যার নিজের অবক্ষয়ের জলে।

কিন্তু এই অবক্ষয়ের মধ্যেও কবি মানুষের ওপর বিশ্বাস হারান নি। 'সময়ের তীরে' দাঁড়িয়ে তাই তাঁর মনে·প্রশ্ন জেগেছে ঃ

কোনো রাষ্ট্র কি নেই আজ আর
কোনো নগরী নেই
সৃষ্টির মরালীকে যা বহন ক'রে চলেছে মধু বাতাসে
নক্ষত্রে—লোক থেকে সূর্যলোকান্তরে!

এই সূর্যলোকান্তরে সৃষ্টির মরালীকে মধু বাতাসে বহন ক'রে নিয়ে যাওয়ার দুর্মর স্বপ্ন কবির মন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত লুপ্ত হয় নি। তাই তাঁর প্রত্যাশা ঃ

নবীন নবীন জনজাতকের কল্লোলের ফেনশীর্ষে ভেসে
আর একবার এসে এখানে দাঁড়াব।
যা হয়েছে—যা হতেছে—এখন যা শুভ্র সূর্য হবে
সে বিরাট অগ্নিশিল্প কবে এসে আমাদের ক্রোড়ে ক'রে লবে।

এই বিরাট অগ্নিশিল্প সম্পর্কে কবির শুধু প্রত্যাশাই নয়, গভীর প্রতীতিও আছে। তাই তিনি বলেন,

আশা-নিরাশার থেকে মানুষের সংগ্রামের জন্মজন্মান্তর—
প্রিয়দের প্রাণে তবু অবিনাশ, তমোনাশ আভা নিয়ে এসে
স্বাভাবিক মনে হয় ঃ উর ময়-লণ্ডনের আলো ক্রেমলিনে
না থেমে অভিজ্ঞভাবে চ'লে যায় প্রিয়তর দেশে।

সেখানে সকল অজ্ঞান একদিন জ্ঞানের আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠবে, সকল লোভের চেয়ে সৎ হবে 'সব মানুষের তরে সব মানুষের ভালোবাসা।' কেননা, এই ভালোবাসা এই প্রেমেরই অন্য নাম আলো। এই বিশ্বাসেই কবি বলেন,

প্রেম

ক্রমায়ত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।

এই অর্থে জীবনানন্দের প্রেম 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় এসে নূতন ব্যঞ্জনা পেয়েছে। অবশ্য কবির প্রেমচেতনায় চিরন্তনী নারীর অস্তিত্ব কোনোদিনই লুপ্ত হয় নি। বরং বরাবরের মতো তাঁর প্রেমময় বিশ্বে নারীই নদী, নদীই নারী। 'অনেক নদীর জল' কবিতায় নারী ও নদীর অপৃথক্‌সত্তা পুনরায় দেখা দিয়েছে—

যে-সূর্য অয়নে নেই কোনো দিন,
—মনে তাকে দেখা যেতো যদি--
যে-নারী দেখে নি কেউ—ছ'সাতটি তারার তিমিরে
হৃদয়ে এসেছে সেই নদী।

বস্তুত 'সাতটি তারার তিমির'-এ জীবনানন্দের কাব্যরসিকসমাজের মনে হতে পারে, বুঝি-বা কবি স্বপ্নভ্রষ্ট হয়েছেন। কিন্তু 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় পৌঁছে সে সংশয় তিরোহিত হয়। কবির ইতিহাসচেতনা তাঁর মনে অবিশ্বাস এনে দেয় নি। তাই দেখি, 'বেলা অবেলা কালবেলা'র উপসংহারে তিনি বলছেন,

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্নার ধ্বনি।

এই জলঝর্না কবিচেতনায় নিত্যপ্রবহমান। তাই নিসর্গলোকে নদীর মতো তাঁর প্রাণলোকে নারীর অস্তিত্বও নিত্যবর্তমান। বরং মর্ত্য থেকে বিদায় নেবার পূর্বে কবিচেতনায় প্রেম আলোরই সহোদরা হয়ে উঠেছে। যে অর্থে প্রেম আলোর সমার্থক সে অর্থেই কবি তাঁর অন্তিম যাত্রার প্রাক্‌কালে প্রেমের জয়ধ্বনি করে গেছেন। 'বেলা অবেলা কালবেলা'র উৎসর্গ কবিতাটির নাম 'মাঘসংক্রান্তির রাতে'। জীবনানন্দের কবিমানসের অন্তিম আত্মোন্মীলনে এই স্বল্পাক্ষর কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। কবি বলেছেন ঃ

অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,
আর তার প্রতিবিম্ব হয় যদি মানব-হৃদয়,
তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে
জ্বলে ওঠে সময়ের আকাশের পৃথিবীর মনে ;
... ...
মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
মুখে যা বলো নি, নারি, মনে যা ভেবেছো তার প্রতি
লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
দেহ হবে মন হবে—তুমি হবে যে-সবের জ্যোতি!

মহাপ্রলয়ের দিনে মহাবিশ্ব যখন তমিস্রার মতো হয়ে যাবে তখনো জ্যোতির্ময় প্রেমের উৎস-স্বরূপিণী নারীর অস্তিত্ব বিলুপ্ত হবে না। সৃষ্টিরহস্যের এই 'সারাৎসার' জীবনানন্দের অন্তিম চেতনায় ধরা দিয়েছে। তাই তিনি বলেছেন,

আকাশের সব নক্ষত্রের মৃত্যু হলে
তারপর একটি নারীর মৃত্যু হয় ঃ
অনুভব করে আমি অনুভব করেছি সময়।

এই মৃত্যুহীন নারীসত্তাকে জীবনানন্দ তাঁর কাব্যালোকে আজীবন বিচিত্ররূপে ধ্যান করেছেন। রূপময় বিশ্বে তারই ইন্দ্রধনু-লীলা আলোকে-অন্ধকারে, প্রাণময় বিশ্বে তারই নাম প্রেম-মিলনে-বিরহে।

১৪

জীবনানন্দের কবিভাষা ও কাব্যশিল্প সম্পর্কে এবার ইঙ্গিতে দু-একটি কথা বলে এই আলোচনার উপসংহার রচনা করব। আমরা বলেছি, রবীন্দ্রনাথের পরে বাংলা কাব্যজগতে নতুন কবিভাষার আবিষ্কর্তা হলেন জীবনানন্দ দাশ। তিনি আমাদের ভাষার প্রকাশক্ষমতা বাড়িয়ে আমাদের সূক্ষ্ম সুকুমার অনুভূতিকে নতুন নতুন দিগন্তে প্রসারিত করেছেন।

ভাষাসৃষ্টির ক্ষেত্রে জীবনানন্দের কবিদৃষ্টির স্বাতন্ত্র্যই প্রথমে লক্ষ করবার মতো। এই বিশ্বভুবনকে—এই নিসর্গলোকের রূপ-রং-শব্দ-গন্ধকে তিনি নিজের ইন্দ্রিয় ও মন দিয়ে নিজের মতো করে অনুভব করেছেন। তার ফলে আমাদের এই চিরপরিচিত জগৎ প্রথমে কবির একান্ত নিজস্ব একটি মনোজগতে রূপান্তরিত হয়ে, তাঁর কলাকৃতিতে সম্পূর্ণ নতুন রূপ নিয়ে, আমাদের কাছে ফিরে এসেছে। বাংলার সৌন্দর্যালংকৃত কবিভাষার সৃষ্টিতে ভারতচন্দ্রের পরে মধুসূদনের কৃতিত্ব অসাধারণ। তারপর রবীন্দ্রনাথের হাতে সে ভাষা রূপের জগৎ ও সুরের জগতে নব-নব বর্ণবৈভব ও ধ্বনিমাধুর্যে ষড়ৈশ্বর্যময়ী হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব এই যে, রবীন্দ্রনাথের বাণীবিশ্বের অধিবাসী হয়েও তিনি আরেকটি বাণীবিশ্ব রচনা করে যেতে পেরেছেন।

ভাষার দিক দিয়ে জীবনানন্দ প্রাকৃত বাংলার প্রাকৃত ভাষার কবি। ছন্দের দিক দিয়ে দীর্ঘ-বিলম্বিত মহাপয়ারই তাঁর কবিতার মুখ্য বাহন। শব্দের সঙ্গে শব্দ যোজনা করে নতুন অর্থ ও অর্থান্তরের অগম পারে পৌঁছবার অক্লান্ত প্রয়াসের ফলেই এই বিলম্বিত-পয়ার কবির নিত্য-সঙ্গী হয়েছে। অলংকারের দিক দিয়ে জীবনানন্দ সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করেছেন উপমাকে। লুপ্তোপমা তাঁর রহস্যময় ধূসর জগতে পৌঁছবার একটি প্রধান চাবি। অপূর্ব অদ্ভুত উপমান সৃষ্টিতে তাঁর কলাকৃতি ক্লান্তিহীন ছিল। উপমায় উপমানের সাধারণ ধর্মকে সজ্ঞানে লুকিয়ে রেখে তিনি ভাষার অর্থদ্যোতনাকে অনির্বচনীয়তার পথে অনুক্ষণ এগিয়ে দিয়েছেন। কবির বনলতা সেনের চোখ পাখির নীড়ের মতো। কোন্ সাধারণ ধর্মে পাখির নীড় চোখের উপমান হল সে-কথা কবি উহ্য রেখেছেন বলেই ভাষা অপরিসীম ব্যঞ্জনায় ভাবময় সুরময় হয়ে উঠেছে।

ভাষাশিল্পে জীবনানন্দ রাসায়নিক শিল্পী। হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যেমন বিদ্যুৎস্পর্শে জলে রূপান্তরিত হয়, তেমনি কবি শব্দের পর শব্দ বসিয়ে তাঁর অপূর্ববস্তুনির্মাণক্ষমা প্রজ্ঞার বিদ্যুৎস্পর্শ দিয়ে নব নব অর্থদ্যোতনা সৃষ্টি করেছেন। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক ঃ—

দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল কুয়াশার ;

এখানে নরম, নদী, নারী, ফুল, কুয়াশা—এই পাঁচটি শব্দ তাদের নিজস্ব অর্থসত্তা হারিয়ে, রাসায়নিক মিশ্রণে একীভূত হয়ে, এমন একটি অর্থময়তা সৃষ্টি করেছে যা ব্যবহৃত শব্দের একটিতেও নেই। শব্দের সঙ্গে শব্দের এই যৌগিক মিশ্রণ ঘটিয়ে জীবনানন্দ যে নতুন কবিভাষার জন্ম দিয়েছেন তা আমাদের উপলব্ধির জগৎকে চারুতায় ও সূক্ষ্মতায় নতুন নতুন দিগন্তে সম্প্রসারিত করেছে।

জীবনানন্দ দাশ

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

"আমার আকাশ কোথা চলে গেছে
আমারি সীমানা ছাড়ায়ে—
অপার নীলের তরঙ্গ তুলে
কাল-কালান্ত হারায়ে।।"

জীবনানন্দ বাংলা কাব্যে অনন্য—এই একটি ছাড়া কী আর বলা যায় তার সম্পর্কে? পর্যাপ্ত না হোক, তাঁর কবিতা নিয়ে কিছু কিছু আলোচনা পণ্ডিত আর বিদগ্ধ জনেরা করেছেন। যতদূর জানি ব্যক্তিগতভাবে কবি এই সব আলোচনার কোনোটিকেই নিজের কাব্যের প্রামাণ্য ভাষ্য বলে মেনে নেন্‌নি। জীবনানন্দ 'নির্জন' বা 'নির্জনতম' কবি, তাঁর লেখা 'সিম্বলিক্‌' কিংবা 'সুর্‌রিয়্যালিস্ট্'—এ সব নিয়ে যতই মতভেদ থাক্ কবির নিজের বক্তব্য এই: এরা 'প্রায় সবই আংশিক ভাবে সত্য কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো অধ্যায় সম্পর্কে—সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেব নয়।" অতএব "কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ— দুই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকের উপলব্ধিতে এত তারতম্য।" [শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকা]

তাহলে জীবনানন্দের কাব্য-ব্যাখ্যায় সমালোচকের যত সংকটই ঘটুক, পাঠকের ভূমিকা নিরাপদ। রবীন্দ্রনাথের 'ফাল্গুনী'তে নিজের রচনা সম্পর্কে কবিশেখর যে-কথা বলেছিলেন, সেইটেই একটু বদলে বলা চলে: 'কবিতা বোঝবার জন্যে নয়, বাজবার জন্যে।' কথাটা নিয়ে তর্কের ঝড় উঠতে পারে। কিন্তু পাঠক হিসেবে আমার মনে হয়, এই উক্তিটি আধুনিক বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ সম্পর্কে যতটা প্রযোজ্য, এমন আর কারো সম্বন্ধেই নয়।

সাহিত্যে জীবনানন্দের আসন কোথায়—এ বিচার বর্তমানে সহজ নয়। যে-কোনো সমকালীনেরই মূল্যবিচার জটিল ব্যাপার, 'সাতটি তারার তিমির' বা 'মহাপৃথিবীর' কবির ক্ষেত্রে তা জটিলতম। দীর্ঘদিন ধরে তা বিতর্কের বিষয় হয়ে থাকবে। কবির ইচ্ছে ছিল একদা নিজ কাব্যের কুঞ্চিকা তিনি পাঠকের হাতে তুলে দেবেন; কিন্তু তাঁর আকস্মিক শোচনীয় মৃত্যু সেই সুযোগ থেকে বাংলা দেশকে বঞ্চিত করল। আপাতত আমরা যারা পাঠক, তারা তাঁর কাব্য সম্পর্কে একটি কথাই বলতে পারি। তিনি অনন্য।

লক্ষ্য করবার মতো রবীন্দ্রোত্তর কালের বাংলা কাব্যে তাঁর মতো কেউই প্রভাব বিস্তার করতে পারেন নি। এমন কি, যাঁরা সাম্যবাদী কবি, তীক্ষ্ণ স্পষ্টতায় যাঁরা কাব্যকে সর্বদা সজাগ করে রাখতে চান, তাঁদের ওপরেও জীবনানন্দের 'ইমেজিজম্‌' আর দূরান্বয়ী বাগ্‌ভঙ্গির ছায়া পড়েছে। অন্যদিকে তাঁর প্রত্যক্ষ তথা পরোক্ষ শিষ্যও অনেক রয়েছেন। তথাপি জীবনানন্দ একান্ত ভাবে একক। তিনি অনুকৃত হয়েছেন, কিন্তু অনুসৃত হতে পারেন

নি। তাঁর যে-হৃদয় 'হাওয়ার রাতে' 'নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে', যাকে মনে হল 'একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চললো একটা দুরন্ত শকুনের মতো'—সে-হৃদয়ের অনুসরণ সহজ নয়। কারো পক্ষেই তা সম্ভব বলে মনে হয় না।

বহিরঙ্গের দিক থেকে জীবনানন্দের একটা নিজস্ব আঙ্গিক আছে। সে আঙ্গিক অসামান্য মৌলিক। এ-কথা বললে অন্যায় হয় না, তাঁর কাব্য-বিচারের [এবং আস্বাদনেরও] প্রচেষ্টা অনেক সময় এই বাইরের কাঠামোতে এসেই থমকে গেছে। তাঁর খ্যাতি-অখ্যাতি অনেকখানিই নিরূপিত হয়েছে এই বহিরঙ্গের ওপরে। জীবনানন্দের আঙ্গিককে আয়ত্ত করা তাঁর কাব্য প্রবেশের প্রথম পাঠ।

সেই পাঠের পরে আসে তাঁর মন আর মননকে বোঝার পালা। এ কাজ আরো কঠিন। তার কারণ, বাঙলা সাহিত্যে জীবনানন্দের কবিতা সবচেয়ে আত্মগত। বিহারীলাল চক্রবর্তীর প্রাথমিক প্রয়াসের পরে জীবনানন্দের মধ্যে এই ধারার প্রধানতম প্রকাশ।

'লিরিক' কবিতামাত্রেই স্বগতোক্তি। তবু সাবধানী কবি মঞ্চের অভিনেতার ভূমিকা গ্রহণ করেন ; তাঁর শিল্পিসত্তাকে দ্বিধাবিভক্ত করে রাখতে হয়, তন্ময় চিত্তে অভিনয় করবার সময়েও তিনি তাঁর দর্শকদের ভুলতে পারেন না। কোন্ দৃশ্যে কোথায় হাততালি পাওয়া যাবে, অভিনেতা এ সম্বন্ধে যেমন অবহিত থাকেন, তেমনি কবিও জানেন, কোন্ কৌশলে তাঁর পাঠকের আবেগকে তিনি সহজেই আলোড়িত করতে পারেন ; ভাষায়, ব্যঞ্জনায়, চিত্র-কল্পনায় কোথায় তাঁর ঐন্দ্রজালিক কৃতি, সে-সম্পর্কেও তিনি সচেতন।

কিন্তু যিনি নিজের মধ্যেই সম্পূর্ণ, যাঁর কবিতা একান্তভাবে নিজের জন্যেই, তাঁর সঙ্গে ভাবসাযুজ্য স্বভাবতই আয়াসলভ্য। বোধের চাইতে সহমর্মিতার আশ্রয়ই সেখানে নির্ভরযোগ্য। জীবনানন্দের কবিতাকে আস্বাদন করতে গেলে [সবটা করা সম্ভব কিনা জানি না] এই সহমর্মিতাই একমাত্র পথ। বাঙলা সাহিত্যে তিনি সবচেয়ে ব্যক্তিগত কবি। সুতরাং সমালোচকের মিতিবিদ্যা যতই উদ্‌ভ্রান্ত হোক, অন্তত পাঠক অন্তর-যোজনার উপায়নে জীবনানন্দের কাছে অনেকখানি অগ্রসর হতে পারেন। যে-কোনো কবিকেই সমালোচকের চেয়ে পাঠকের ওপর বেশি নির্ভর করতে হয়—জীবনানন্দ সম্বন্ধে সেটা সর্বাধিক সত্য।

জীবনানন্দ প্রকৃতির কবি। এই প্রকৃতি বস্তুত মহাপার্থিব। এর এক দিকে :

নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে ;
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে।

এখানে অকৃত্রিম বাংলা দেশের অন্তরঙ্গ গন্ধ-স্পর্শ, আমাদের সহজ পরিচিতির নম্র নিবিড় নৈকট্য। আবার অন্যত্র :

হাজার বছর খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর-ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : এশিরিয়—
দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।

বাংলাদেশের পাড়াগাঁর গা থেকে যেমন তিনি পান "রূপশালী-ধানভানা রূপসীর শরীরে ঘ্রাণ," অন্যদিকে 'বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন, উরের আরশি থেকে ফেঁসে তার মানস-নবিকের যাত্রা চলে 'বৈশালির থেকে বায়ু—গেৎসিমানি-আলেকজান্দ্রিয়ার মোমের আলোকগুলো' পর্যন্ত।

জীবনানন্দের এই প্রকৃতি-চারণার সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য এই যে, তাঁর ভৌগোলিক এবং ঐতিহাসিক জগতে কোথাও কোনো কালের যতিচিহ্ন নেই। হাজার হাজার বছরের পুরোনো অতীত আর এই মুহূর্তের অন্তরঙ্গ বর্তমান একটি অখণ্ড সময়ের বৃত্তে ধরা পড়েছে। তাই তাঁর কল্পনার স্বচ্ছন্দচর্যা সীমানাহীন সময়ের মধ্যে প্রসারিত।

এই কালহীন কালের প্রতীক হিসেবে তিনি নিয়েছেন প্রান্তরকে—প্রধানত হেমন্তের প্রান্তরকে। কার্তিকের মৃদু-কুয়াশামাখা জ্যোৎস্না ভরা মাঠ তাঁর এই দূরাস্তীর্ণ কল্পনাকে চঞ্চল করে তুলেছে সবচেয়ে বেশি। 'সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের' একটি মানুষকে নিয়েছে লাসকাটা ঘরে ; যখন 'হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে', তখন অপেক্ষাতুর হৃদয় ভেবেছে, 'হে নাবিক, হে নাবিক, জীবন অপরিমেয় বাকী।' কার্তিকের জ্যোৎস্নায় কয়েকটি মাঠে-চরা ঘোড়া কবির মনকে আশ্চর্যভাবে সঞ্চারিত করেছে সময়হীন সময়ের প্রান্তরে ঃ

মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায়
কার্তিকে জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
প্রস্তর যুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।

'এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে জীবনানন্দের মানসিক মুক্তি। রবীন্দ্রনাথকে যদি বর্ষা আর নদীর কবি বলা যায়, তাহলে জীবনানন্দ হেমন্ত মার প্রান্তরের কবি। মৃদু ধূমল জ্যোৎস্না—দিকচিহ্নহীন মাঠ এক অপূর্ব জাগর-স্বপ্ন সৃষ্টি করে তাঁর মনে—এক বিচিত্র সুর-রিয়ালিজমের মধ্যে তাঁর কল্পনাকে মগ্ন করে।

এই কল্পনার অনুষঙ্গী 'বাঁশপাতা—মরা ঘাস—আকাশের তারা।' 'কার্তিক কি অঘ্রাণের রাত্রির দুপুরে' 'হলুদ পাতার ভিড়ে বসে' মেঠো চাঁদ আর মেঠো তারাদের সাথে' প্রহর জাগে পাখি। ইঁদুর আর পেঁচারা এই হেমন্তের জ্যোৎস্নাতেই তাদের শিকার খুঁজে বেড়ায়।

জীবনানন্দ রোম্যান্টিক কবি। এই রোম্যান্টিক মন হৈমন্তী চন্দ্রালোকের রহস্যে মিস্টিকের মতো সমাহিত। আর সে-রহস্যকে জানবার চাইতেও আস্বাদ করবার আনন্দ তাঁর নিবিড়তর। নির্জন নৈঃশব্দ্যের মধ্যে তাঁর অতর্ক অপ্রশ্ন আত্মলীনতা। হেমন্তের রাত্রে যখন বুনো হাঁস পাখা মেলে দেয়—'জলা মাঠ ছেড়ে দিয়ে চাঁদের আহ্বানে,' তখন কবিরও সেই স্মৃতির জ্যোৎস্নায় সানন্দ অভিসার ঃ

মনে পড়ে কবেকার পাড়া গাঁর অরুণিমা সন্ন্যালের মুখ ;
উড়ুক উড়ুক তা'রা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক
কল্পনার হাঁস সব ; পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রঙ মুছে গেল পর
উড়ুক উড়ুক তা'রা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

এই হেমন্ত জ্যোৎস্নাতেই বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা' শব্দমালার আবির্ভাব। যে-'বনলতা সেন' জীবনে একবার, মাত্র একবারের জন্যেই চকিত-প্রেক্ষণে অন্তরকে উদ্ভাসিত করে, এ সেই ক্ষণচারিণী মনোলালিতা ঃ

চোখে তার

যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার ;
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার ;
এ পৃথিবী একবার পায় তারে—পায়নাকো আর।

প্রধানত জীবনানন্দের সুর বিষণ্নতার আমেজ-মাখানো—রোম্যান্টিক অনুভাবনার মৃদুস্বাদী বেদনায় সিক্ত। নগ্ন-নিষ্ঠুর কর্মক্ষুব্ধ সংসার থেকে তাঁর স্বভাবতই অপসরণ। এক গভীরতর, নিবিড়তর সমাধান জীবনের কোথাও আছে—সমস্ত জিজ্ঞাসা যেখানে তিমির-স্তব্ধ ; যেখানে কোনো এক বোধ—কোনো এক স্বাদ আছে বা 'অগাধ অগাধ'। সেই অগাধ স্বাদের সাধনাই জীবনানন্দের কবিতার মর্মতত্ত্ব।

যেই কুঁজ—গলগন্ড মাংস ফলিয়াছে
নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে,
যে সব হৃদয়ে ফলিয়াছে
—সেই সব

দুঃসহ পরাভূত বিকৃতির মধ্যে কবি এই অগাধ গভীর স্বাদের সঞ্জীবন সন্ধান করেছেন। এই স্বাদ তাঁকে প্রকৃতিই দিতে পেরেছে কিছু পরিমাণে। মেঠো পথ, ধানসিড়ি, হেমন্তের ধান, 'রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মত লাল', 'আইবুড়ো পাড়া গাঁর মেয়েদের নাচ'— এই আদিম প্রাকৃতিক সারল্যে কবি যেন জীবনের জটিলতার গ্রন্থিমোচন করতে পেরেছেন ঃ

রোধ—অবরোধ-ক্লেশ—কোলাহল শুনিবার নাহিক সময়,
জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোন্‌খানে—
কোথায় নতুন ক'রে বেবিলন ভেঙে গুঁড়ো হয় ;
আমার চোখের পাশে আনিও না সৈন্যদের মশালের
আগুনের রঙ।

তার চাইতে ভালো উদ্যমহীন, উৎসাহহীন আত্মলুপ্তি। হেমন্তের ক্ষেতে, চৈতালি আলোয় কিংবা 'পেঁচার পাখার মতো অন্ধকারে' নিজের সমস্ত জাগরসত্তা নিঃশেষিত হোক ঃ

গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে।
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিব অনেক দিন—
জেগে থেকে ঘুমোবার সাধ ভালোবেসে।

তবুও সে-সাধ সহজে মেটার নয়। সেই অগাধ-গভীর স্বাদের সাধনা কী নির্মমভাবেই বিঘ্নিত! দক্ষিণের হাওয়ায়, 'জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ'-মাখা চৈত্র-রাত্রিতে, হরিণ-হরিণীর মিলন-মুহূর্তে দেখা দেয় শিকারীর বন্দুক। খাবার ডিশে মৃত হরিণের মাংসের ঘ্রাণ। জীবনের এই সিম্বলিক ট্র্যাজেডী তাই তাঁকে বার বার ডেকেছে সেই ধানকাটা মাঠে—যেখানে একটি মানুষ নিবিড় নিদ্রিত শান্তিতে একান্ত ঃ

শান্তি তবু ঃ গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।

এই ক্লান্তি আর বেদনার পীড়নেই কবি খুঁজেছেন 'মস্ত বড়ো ময়দান—দেবদারু পামের নিবিড় মাথা—মাইলের পরে মাইল।' তিনি হৃদয়ে অনুভব করেছেন সেই দুপুরের বিশ্রান্ত বাতাসকে—যা 'খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান

গায়—গান গায়।' আশ্চর্য মৌলিক চিত্র-রচনায়, ভাষায় কোমল কারুশিল্পে জীবনানন্দ এক ঐন্দ্রজালিক বিরামলোক লাভ করেছেন তাঁর কাব্যে। আমাদের ঘাত-জর্জর দৈনন্দিনতায়, আমাদের রক্তঝরা প্রহর-পরিক্রমায়, আমাদের অশান্ত মনের উগ্রতায় আর অবদমনে তাঁর কাব্য এক মাধুর্যস্নিগ্ধ মরূদ্যান, কোনো রাত্রির হ্রদে শীতল অবগাহন। বিরাট পৃথিবী চলেছে অনন্তকালের নিরবধি পথ দিয়ে, কত সুসা-নিনেভ-গ্রীক হিন্দু-ফিনিশীয় সভ্যতার সমাধি' স্তূপ পার হয়ে, কত বিম্বিসার-আটিলার কীর্তি-অকীর্তির স্মৃতির ধূসর পাণ্ডুলিপি বহন করে'। কী ক্লান্ত, কী সুদুঃসহ এই পথচলা! তাঁর চেয়ে সব কিছুর ওপর চিরবিরামের যতিপতন ঘটুক—আসুক অন্ধকার—যেখানে ভূগোলের রেখাজটিলতা নিঃশেষলুপ্ত—যেখানে কালের কল্লোল সীমাহীন সময়ের তমসা-সমুদ্রে নিলীন।

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময় গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি হে হিম-হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন।

'ধানসিড়ি নদীর কিনারে' চিরনিদ্রার পৌষের রাত্রিই তবে আসন্ন হোক। আসুক তা হলে চিরকালের স্বপ্ননিবিড়তার সেই সঙ্গিনী :

'সব পাখী ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

এ যেন ডি-এইচ্ লরেন্সের সেই প্রেম-মৃত্যু-মুক্তি :

"In the darkness we all are gone, we are gone with the trees
And the restless river ;–we are lost and gone with all these."

পৃথিবী থেকে যখন দেহসত্তর বিদায় নেবার সময় আসবে, এই 'পরণ-কথার দেশ'—জলসিড়ি নদীর কলধ্বনিতে ভরা—লক্ষ্মী-প্যাঁচার ডাকে মুখরিত-সন্ধ্যা 'রূপসী বাংলার' বিশালক্ষ্মীর মন্দিরের ঘণ্টা শুনতে শুনতে কবির দুচোখ গভীর তৃপ্তিতে আচ্ছন্ন হয়ে আসবে। সময়হীন, ভূগোলহীন মহাপৃথিবীর কবি বাংলার পল্লীকুটিরের একটি ছোট বাতায়ন থেকেই তাঁর দৃষ্টি অসীমতার মধ্যে ব্যাপ্ত করে দিয়েছেন—বাংলার শ্যামল মুকুরে তাঁর মহাবিশ্ব বিম্বিত হয়েছে। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা' আমাদের মনে এক অপরূপ 'nostalgic' প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে—তার চিত্রে, ধ্বনিতে, ঘ্রাণে এবং অনুভবে আমরা এক অপ্রাপ্য মাতৃভূমির বুকে যেন ঘন নিবিড় মমতার গভীর শান্তি লাভ করি। জীবনানন্দ কল্লোলোত্তর কালের একমাত্র কবি, যিনি বাংলা ও বাঙালীর প্রতি ভালোবাসার অকুণ্ঠ সুস্নিগ্ধ স্বাক্ষর রেখে যেতে পেরেছেন। তাই তাঁর অন্তিম প্রার্থনার সঙ্গে আমরাও একস্বর হয়ে উঠি :

যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে—দূর কুয়াশায়
চ'লে যাব, সেদিন মরণ এসে অন্ধকারে আমার শরীর
ভিক্ষা ক'রে লয়ে যাবে ;—সেদিন দু'দণ্ড এই বাংলার তীর—
এই নীল বাংলার তীরে শুয়ে একা একা কি ভাবিব, হায় ;—
সেদিন র'বেনা কোনো ক্ষোভ মনে—এই সোঁদা ঘাসের ধুলায়
জীবন যে কাটিয়াছে বাংলায়—চারিদিকে বাঙালীর ভিড়
বহুদিন কীর্তন ভাষান গান— রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর
নরম নিবিড় ছন্দে যারা আজো শ্রাবণের জীবন গোঙায়,

আমারে দিয়েছে তৃপ্তি। ....

বেহুলার লহনার মধুর জগতে

তাদের পায়ের ধূলো-মাখা পথে বিকায়ে দিয়েছি আমি মন

বাঙালী নারীর কাছে—চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধান মাখা চুল,

হাতে তার শাড়িটির কস্তা পাড় ;—ডাঁসা আম কামরাঙা কুল।

জীবনানন্দের কাব্যে উত্তর-পর্বে আর একটি সঞ্চারী সুর এসেছিল। যে-কোনো শ্রেষ্ঠ রোম্যাণ্টিক্ কবির মতোই এই রক্তকলঙ্কিত কাল—যুদ্ধ আর মৃত্যুর প্রেতলীলা—তাঁকে জীবনের প্রেমে চকিত করে তুলেছিল। আত্মবৃত্ত কবি সহসা এক মহাপৃথিবীর মহত্তম প্রার্থনায় উঠেছিলেন উদ্দীপ্ত হয়ে। তাঁর সুরে এসেছিল 'তিমিরহননের গান'—এসেছিল 'সূর্যতামসী'। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ জীবনানন্দের কবিতায় এক মহৎ সূর্যের বাণী এনে দিয়েছিল। 'হেমন্তের প্রান্তরের তারার আলোক' থেকে নিজের 'তিমির-বিলাসী সত্তা'কে তিনি 'তিমির-বিনাশী' শক্তিতে চেয়েছিলেন প্রাণিত করতে। এই নবলব্ধ চৈতন্য তাঁকে উত্তীর্ণ করেছিল এক সুবিপুল বোধির মধ্যে। ইতিহাসের গতি আজো শেষ হয়নি, বহু মানুষ বহু মত, বহু প্রজ্ঞা, বহু ধর্মনায়ক আর রাষ্ট্রনায়কের অনুগমন করে সে ইতিহাস চলেছে কাল-কালান্ত ধরে। সে হয়তো অনেক পেয়েছে, তবু কি সব পাওয়া হয়েছে তার? কোথাও কি দেখা দিয়েছে 'অনির্বচনীয় স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর'? কবি তার উত্তর পান নি, তবু সমস্ত দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষের অবসানে, মানুষের সমস্ত পরীক্ষা আর পরিক্রমা শেষ হয়ে গেলে, এক নিবিড় পরিচয়ে, কোনো এক সর্বপ্লাবী আনন্দের মধ্যে তার জীবন কি অবলীন হয়ে যাবে না? সেই প্রত্যাশিত আগামী-সম্ভবের অভিমুখে জীবনানন্দের এই বন্দনা মন্ত্রোচ্চারের মতোই অনুপম :

নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন

অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাস ভুবনে নবীন

হবে না কি মানুষকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে।

সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে

চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি মানুষের বিষয় হৃদয়,

জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।

জীবনানন্দের কবিতায় বিবিধ উল্লেখ-ভঙ্গি

হরপ্রসাদ মিত্র

জলপিপি চ'লে গেলে বিকেলের নদী কান পেতে
নিজের জলের সুর শোনে ;
জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুদীন সম্প্রসারণে—
ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে?
চৈত্য, ক্রুশ, নাইন্‌টি থ্রি ও সোভিয়েট শ্রুতি প্রতিশ্রুতি
যুগান্তর ইতিহাস অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরে প্রাণ
চিনে-চিনে হয়তো বা নচিকেতা প্রচেতার চেয়ে অনিমেষে
প্রথম ও অন্তিম মানুষের প্রিয় প্রতিমান
হ'য়ে যায় স্বাভাবিক জনমানবের সূর্যালোকে।"

'ভারবি' সংস্থা থেকে প্রকাশিত 'জীবনানন্দের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯১৬, নভেম্বর) প্রথম সংস্করণ থেকে 'সাতটি তারার তিমির' বইয়ের 'নাবিক' কবিতার চতুর্থ অর্থাৎ শেষ স্তবকের শেষ দশটি লাইন ওপরে ছেপে দেওয়া হলো—যাতে ঐ অংশের প্রথম পাঁচ আর শেষের দুই লাইনের সঙ্গে মধ্যবর্তী তিন ছত্রের অর্থাৎ ছয়-সাত-আট লাইনের পার্থক্য সূচিহ্নিত করা যায়। ঐ তিন লাইনের মধ্যে আবার প্রথম ও দ্বিতীয় লাইনে 'চৈত্য', 'ক্রুশ', 'নাইন্‌টি থ্রি', 'সোভিয়েট শ্রুতি প্রতিশ্রুতি',—'নচিকেতা' ও 'প্রচেতা',—মোট এই ছটি অ্যালিউশন অর্থাৎ উল্লেখ বিদ্যমান।

কেবলমাত্র এই রকমই নয়, জীবনানন্দ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় আরো অনেক রকম উল্লেখ দেখিয়ে গেছেন। ওপরের প্রথম অনুচ্ছেদে যে ছ'টির উল্লেখ করা হলো তার মধ্যে 'চৈত্য' (অর্থাৎ বৌদ্ধ মঠ বা স্মৃতিস্তম্ভ বা পথের পাশে অবস্থিত পূজনীয় কোনো বৃক্ষ), 'ক্রুশ' (অর্থাৎ খ্রিষ্ট-কে হত্যার জন্যে ব্যবহৃত গণিতের যোগ-চিহ্নের আকারে কাঠের টুকরো), 'সোভিয়েট শ্রুতি প্রতিশ্রুতি' (অর্থাৎ সোভিয়েট রাশিয়ার সম্পর্কে প্রচলিত কাহিনী এবং সোভিয়েট-রাশিয়ার পক্ষে প্রদত্ত অঙ্গীকার),—'নচিকেতা' (কঠোপনিষৎ-এ কথিত ঋষি বাজশ্রবার পুত্র), 'প্রচেতা' (প্রকৃষ্ট চেতনা যাঁর অর্থাৎ শুদ্ধ চিত্ত ; বরুণ-দেবতার নামও বটে, কিন্তু এখানে সে-অর্থ সংগত নয়), এই পাঁচটির মানে বোঝা যায় সহজেই, কিন্তু সাধারণ পাঠকের কাছে 'নাইন্‌টি থ্রি'-র ইঙ্গিত কিঞ্চিৎ কঠিন বা অস্পষ্ট। এই প্রয়োগটির লক্ষ্য ঐতিহাসিক অথবা রাজনৈতিক হতে পারে। সে-প্রসঙ্গ পরে দেখা যাবে। এখানে অতঃপর অন্য কাব্যাংশ থেকে তাঁর অন্যান্য কয়েকটি উল্লেখ দেখা যাক্‌।

তাঁর 'মহাপৃথিবী'র 'সিন্ধুসারস', 'হাজার বছর শুধু খেলা করে,' 'হাওয়ার রাত,' 'নগ্ন নির্জন হাত,' 'আট বছর আগের একদিন'—এবং বিশেষভাবে 'চার্বাক প্রভৃতি—' কবিতায়

নানা প্রসঙ্গের বিভিন্ন অ্যালিউশন অর্থাৎ উল্লেখের মধ্যে 'মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে' ('আট বছর আগের একদিন')—'বলে গেল বায়ুলোকে নাগার্জুন, কৌটিল্য, কপিল, চার্বাক প্রভৃতি নিরীশ্বর' ('চার্বাক প্রভৃতি—'),—'স্টালিন, নেহেরু, ব্লক অথবা রায়ের বোঝা' ('অনুপম ত্রিবেদী'),—'যে-রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় মরে যেতে দেখেছি' ('হাওয়ার রাত') ইত্যাদি তাঁর পাঠকের কাছে সুপরিচিত। একথাও আমাদের অপরিচিত নয় যে, নাগার্জুন ছিলেন মহাযান বৌদ্ধমতের অন্যতম দার্শনিক ; চাণক্যের নামান্তর হলো কৌটিল্য এবং অর্থশাস্ত্র-প্রণেতা হিসাবে তাঁর প্রসিদ্ধি সুবিদিত ; কপিল ছিলেন সাংখ্য দর্শনের প্রবক্তা ; চার্বাক নাস্তিক্যবাদের ঋষি। অনুরূপভাবেই একালের পৃথিবীর ইতিহাসে জোসেফ স্টালিন, (১৮৭৯-১৯৫৩), জওহরলাল নেহেরু, (১৮৮৯-১৮৬৪),—'অনুপম ত্রিবেদী' কবিতায় উচ্চারিত "তান্ত্রিক উপাসনা মিস্টিক ইহুদী কাবালা / ঈশার শবোত্থান—বোধিদ্রুমের জন্ম মরণের থেকে শুরু ক'রে/হেগেল ও মার্কস" অংশের 'কাবালা' বা 'কাবা' বলতে বোঝায় মক্কা-র প্রধান তীর্থ রূপে গণ্য মসজিদ বিশেষ,—'ঈশার শবোত্থান' বলতে বোঝায় সমাধি থেকে খ্রিস্টের পুনরুত্থান,—হেগেল ও মার্কস্ সুপরিচিত দুই দার্শনিক। 'ব্লক' কে বা কি, তা হঠাৎ মনে পড়ে না বটে, তবে একটু খুঁজলেই জানা যায়। ঐ কবিতাতেই 'যদিও প্লেটোর থেকে রবি ফ্রয়েড নিজ-নিজ চিন্তার বিষয় পরিশেষ করে দিয়ে' উক্তির প্লেটো খ্রিষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকের প্রাচীন গ্রীক দার্শনিক,—'রবি' কি রবীন্দ্রনাথ?—এবং ফ্রয়েড হলেন সিগমুণ্ড ফ্রয়েড (১৮৫৬-১৯৩৯)। তবে ঐ কবিতার 'রায়ের বোঝা'-তে কোন্ সূচিত ?— মানবেন্দ্র রায় বুঝি-বা! 'ব্লক' মনে হয় Marc Bloch, যিনি Feudal Society সম্বন্ধে লিখে গেছেন মূল জার্মান ভাষায়। 'নাইনটি থ্রি' মনে হয় শিকাগো-তে অনুষ্ঠিত ১৮৯৩-এর প্রসিদ্ধ পার্লির্য়ামেন্ট অফ রিলিজিন্স্—যেখানে ১১ই সেপ্টেম্বর স্বামী বিবেকানন্দের ঐতিহাসিক বক্তৃতা হয়েছিল।

টি. এস. এলিয়ট (১৮৮৮-১৯১৬) তাঁর 'দি ইয়ুজ অফ পোয়েট্রি অ্যান্ড দি ইয়ুজ অফ ক্রিটিসিজ্ম্' প্রবন্ধের ভূমিকায় লেখেন যে, জনগণের মুখের ভাষা থেকেই কবিতার ভাষা তার প্রাণশক্তি পেয়ে থাকে এবং জনচেতনার শীর্ষতম বিন্দুর প্রতিনিধিত্ব ক'রে, সর্বাধিক শক্তির ও সূক্ষ্মতম সংবেদনের বাচক হয়ে ওঠে, জীবনানন্দের কবিতার ক্ষেত্রে এই উক্তির সত্যতা বিচারের সুযোগ পাওয়া যায়, কারণ, তিনি যেমন অনেক ক্ষেত্রেই সোজাসুজি মুখের ভাষা ব্যবহার করেন, তেমনি অভিনব সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যের অলঙ্কার ব্যবহারেও নিরঙ্কুশ। সাধুরীতির ক্রিয়াপদের সঙ্গে চলিত রীতির ক্রিয়াপদ মিশে যায় তাঁর বাক্শিল্পে। তারই পাশাপাশি কাব্যিক ক্রিয়াপদও স্বচ্ছন্দে বসে যেতে পারে। ইহলোক থেকে পরলোকের মধ্যবর্তী পুরাণকথার বৈতরণী নদীটি দেখা যায় ভৌগোলিক 'লেগুন' এবং ইতিহাসের 'হূন' নামক তস্কর-জাতির উল্লেখ স্বরূপ—

এই সব ত্যক্ত পাখি কয়েক মুহূর্ত শুধু ; আবার করিছে আরোহণ
আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে—পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে ;
একবার পৃথিবীর শোভা দেখে, বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন

বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দ্যাখে তাই ; একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায়—কোন্ এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চলে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে ;

যেন কোন্ বৈতরণী অথবা এ-জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন
কেঁদে ওঠে...চেয়ে দ্যাখে কখন গভীর নীলে মিশে গেছে সেই সব হুন।

—'শকুন' : ধূসর পাণ্ডুলিপি

ব্যাপক অর্থে জীবনানন্দের কবিতার ভাষা-প্রকৃতির নানা লক্ষণের মধ্যে যেগুলি এই উদ্ধৃতিতে উপস্থিত, এই ধরনের প্রয়োগ তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেও যেমন, 'বনলতা সেন' ও পরবর্তী অন্যান্য কাব্যগ্রন্থেও তেমনি দেখা যায়। ইতিহাস, ভূগোল, পুরাণ, মিথ,—বিজ্ঞানের কোনো-কোনো প্রসঙ্গ এসে পড়ে সাবলীল প্রাচুর্যে। আলো আর অন্ধকারের রূপক ব্যবহৃত হয় বারবার। সময়ের স্বরূপ সম্বন্ধে তাঁর ভাব-ভাবনার পৌনঃপুনিকতায় তাঁর অনেক কবিতাই পরিপ্লাবিত। মৃত্যু প্রায়শই তাঁর জীবন বোধের অনিবার্য সঞ্চারী বা সহযোগী বা অঙ্গাঙ্গী। তাঁর কবিতার অ্যালিউশন-বৈচিত্র্যের আলোচনায় স্তন, যোনি, ঘুরানো সিঁড়ির পথ, 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাস.'—'অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু',—লাসকটা ঘরে থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে টেবিলের ওপর চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা আত্মঘাতী পুরুষের শব—এবং এই রকম আরো নানা উল্লেখ গভীরভাবে প্রাসঙ্গিক। মৃত্যুভাবনা তাঁর দুর্মর সঙ্গী। 'সাবলীল' নামে একটি কবিতায় মানুষের নিয়তি সম্বন্ধে তাঁর মন্তব্য হলো—

আকাশে সূর্যের আলো থাকুক না—তবু—
দণ্ডাজ্ঞার ছায়া আছে চিরদিন মাথার উপরে।
আমরা দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই।
মহাপুরুষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে।

বোম্বায়ের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে মানবজীবনের 'তামাশা' দেখে তাঁর মনে এই আশা জাগে যে, ঐ তামাশার সুর পরিচ্ছন্ন হয়ে এমন একদিন জন্ম নেবে, যখন বিভিন্ন মানুষ মিলে মিশে পরস্পরের 'প্রিয়প্রতিষ্ঠ মানব' হয়ে উঠবে। জুহুর সমুদ্রতীরে এক ভোরবেলায় 'অগণন ঘোড়া ও ঘেসেড়াদের ভিড়ে' তাঁর মনে হয়—

এদের স্বজন, বোন, বাপ-মা ও ভাই, ট্যাঁক, ধর্ম মারছে ;
তবুও উচ্চস্বরে হেসে ওঠে অফুরন্ত রৌদ্রের তিমিরে।

'রৌদ্রের তিমির' একরকম প্যারাডক্স্ বা কূটাভাসের নমুনা অবশ্যই। বাপ-মা ভাই-বোন প্রভৃতির সঙ্গে যাদের ট্যাঁকও শূন্য হয়ে গেছে এবং ধর্মও নিশ্চিহ্ন হয়েছে তারা যতই ফূর্তিতে বা কর্মব্যস্ততায় মেতে থাকুক, তারা সত্যিই টিকে আছে গভীর দুঃখের অন্ধকারে—'রৌদ্রের তিমিরে'! মানবজীবনের এই যন্ত্রণার কথাই কখনো-কখনো ব্যক্ত হয়েছে আরেক ভঙ্গিতে—তাঁর 'সুবিনয় মুস্তফী' কবিতায়—যাতে সুবিনয় মুস্তফীর ভূয়োদর্শিতার গুণে একসাথে বেড়াল ও বেড়ালের মুখে-ধরা ইঁদুর উভয়েই বেশ সহাস! খাদ্য-খাদক দুই পক্ষই জীবনসুরাসক্তির ফলে মর্তলোক ছেড়ে কোথাও যায় না,—বৈকুণ্ঠেও নয়, নরকেও নয়,—'মাটির দরে' কেবল আরো কিছুদিন মর্তলোকেই বেঁচে থাকবার সুযোগ প্রত্যাশী। এই বিশেষ কথাটি রবীন্দ্রনাথ যেভাবে বলতেন,—যেমন 'নিশি দিশি রুদ্ধ ঘরে স্তিমিত দীপের ধূমাঙ্কিত কালি,'—জীবনানন্দ সেভাবে বলেন না। অন্যত্র তিনি মশা, মাছি, পেঁচার রূপক ব্যবহার করেন, যেমন 'মহাপৃথিবী'র' আট বছর আগের একদিন কবিতায়—

তবুও তো পেঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের
স্রোত ভালোবাসে।

রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো
দেখিয়াছি।

সমকালের পৃথিবী থেকে এবং চিরকালের মানবজীবনরসের স্মৃতি থেকেও জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় কিছু সুবোধ্য এবং কিছু অস্পষ্ট অ্যালিউশন ব্যবহার করে গেছেন। ইন্দ্রিয় সংবেদনের নানা ইমেজ বা চিত্রকল্প এবং তাঁর চেতন-অবচেতন মনের নানা অনুষঙ্গ নিহিত আছে তাঁর কবিতার ভাষায়। এইসব নিদর্শনের অনেক ক্ষেত্রেই তাঁর allusion প্রয়োগের বিশেষত্ব আগ্রহী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

নির্জনতম কবি

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

দুই মহাযুদ্ধের মাঝখানে দুটি দশক জুড়ে ও দেশের মানুষ কী দেখেছে? পৃথিবীর দুই গোলার্ধে দু'পা রেখে বিরাট এক ভূখণ্ডের শৃঙ্খলমুক্ত মানুষ উঠে দাঁড়ায়। তার ট্রাক্টরের চাকায় মাঠের বুকে নেচে নেচে ওঠে ফসলের সোনালী স্বপ্ন। তার এক হাতে সুখ, অন্য হাতে শান্তি। ঘরে ঘরে দেয় প্রাচুর্য। মূল্যবান বস্তুবর্ণ সজ্জায় জীবনকে সাজায়। দুনিয়া জোড়া দুঃশাসনের হাতে তুলে দেয় সে মৃত্যুর শমন। আর আকাশে মাথা তুলে বন্ধনজর্জরিত সমস্ত মানুষকে ডেকে বলে, ওঠো, জাগো। জয়ের আশ্বাস নিয়ে দেশে দেশে শৃঙ্খলিত মানুষ জেগে ওঠে। আসমুদ্রহিমাচলে জ্বলে ওঠে সংগ্রামের আগুন। জাতীয় মুক্তি এক বিশাল অর্থ পায়—জনতা দাবি করে সমৃদ্ধ জীবন। দুরন্ত প্রতিজ্ঞায় পেশী ফুলে ওঠে, হাতের চাড় লেগে শৃঙ্খলে ঝংকার ওঠে। আত্মসমর্পণকারী ভীরু নায়কদের পায়ের নিচে মাড়িয়ে তারা অবিচল লক্ষ্যে এগিয়ে যায়। ক্রূর মৃত্যুর সঙ্গে যুঝতে হয় জীবনকে, নিরেট অন্ধকারকে সবলে সরাতে হয়। খণ্ডযুদ্ধে পরাজয় যে বেদনা আনে, সামগ্রিক যুদ্ধে জয়ের আনন্দ আবার সে বেদনা মুছে দেয়। জয়-পরাজয়, আনন্দ-বেদনার জটিল বিন্যাসে জনতার এই যাত্রাপথ কবির সামনে তুলে ধরে এক জমকালো মহিমান্বিত দৃশ্যপট— আজকের মানুষ যা সগর্বে, আর ভবিষ্যতের মানুষ যা সবিস্ময়ে দেখবে।

ইতিহাসের এই একই যুগপর্বে কী দেখান 'বনলতা সেনে'র কবি জীবনানন্দ দাশ?

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে,
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় তারস্বরে জানিয়ে দেন সময়ের গণ্ডি দিয়ে বাঁধা নন তিনি। তাঁর কাছে 'হাসার বছর শুধু খেলা করে'। সময়কে হাজার বছরের একেকটা গ্রন্থি দিয়ে যিনি মাপেন, দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী দু'টি শীর্ণ দশক মহাসমুদ্রে বুদ্বুদের মতো তাঁর কাছে মিলিয়ে যাবে তাতে আশ্চর্য কী?

হাজার বছরে বাঁধা সময়, নক্ষত্রে বাঁধা দূরত্ব দিয়ে যে জগৎ তিনি রচনা করেন, সেখানে তাঁর গতিবিধি অবাধ। অতীত থেকে বর্তমান, বর্তমান থেকে অতীতে নিয়ত অবলীলাক্রমে তাঁর যাওয়া-আসা। 'বনলতা সেন'-এর কবি সমস্ত শৃঙ্খল ভেঙেছেন কল্পনার জগতে। স্বাধীনতার ত্রিবর্ণ পতাকা পথে পথে লাঠির ঘায়ে লুটিয়ে পড়লেও, দেশের যৌবন ফাঁসীতে ঝুললেও, কল্পনার জগতে কবি মুক্ত, কবি স্বাধীন। সম্ভবের সঙ্গে

তিনি মিলিয়ে দেন অসম্ভবকে, কার্যকারণের সম্বন্ধ ঘুচিয়ে দিয়ে ঘন করে তিনি বিছিয়ে দেন রহস্যের জাল।

সময় দাঁড়ায় না ; তাই নিরন্তর তাড়নার মুখে সম্মুখগতিকে ছোট ছোট আবর্তে বেঁধে ঘুরে ঘুরে একই সুরে 'বনলতা সেন'এর কবি কথা বলেন। সময়হীনতার শাদা কাপড় দিয়ে সময়ের আপাদমস্তক তিনি ঢেকে দেন। কালের কাছ থেকে হরণ করে নেন গতি। 'সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন; থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।'

নিরালম্ব শূন্যতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখাবার জন্যেই জীবনানন্দের আকাশে নক্ষত্রেরা ভিড় করে। 'যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে।' 'আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতর পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল' ('হাওয়ার রাত')। বিচ্ছিন্নতাকে বাড়িয়ে তোলবার জন্যেই এই নিষ্ঠুর নির্লিপ্ত ব্যাপ্তি।

জীবনানন্দের কবিতায় দেশ কাল সংখ্যা বা নামের ব্যবহার কোনো কিছু নির্দিষ্ট করে বলার জন্যে নয়। বিমূর্ত ভাবের তারা প্রতীক। অলৌকিক জগৎ দেখা দেয় ভৌগোলিক নামে। নিরাকার প্রেমের প্রতিমা হয়ে দেখা দেয় নাটোরের বনলতা সেন, পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যাল, বিলুপ্ত ধূসর কোনো পৃথিবীর শেফালিকা বোস।

তুমুলভাবে আন্দোলিত জল যতটা যাথার্থ্যের সঙ্গে তার সন্নিহিত গাছপালাকে প্রতিবিম্বিত করে, ঠিক ততটা যাথার্থ্যের সঙ্গেই 'বনলতা সেন'এর কবি জীবনকে প্রতিফলিত করেন। বস্তুকে তিনি একটি একটি করে বেছে নিয়ে ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলে দেন শূন্যতার অতল গহ্বরে। প্রত্যেকের মুখে তিনি এঁটে দেন কুয়াশার একই মুখোশ।

> আর কিছু দেখেছি কি ঃ একরাশ তারা-আর-মনুমেণ্ট ভরা কলকাতা?
> চোখ নিচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে—বাতাসে অনেক ধুলো খড় ;
> চোখ বুজে এক পাশে সরে যাই—গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ পাতা
> উড়ে গেছে ; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি—রাতের ভিতর
> কেন যেন ; আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।
>
> 'পথ হাঁটা'।

> আলেয়ার মতো ঐ ধানগুলো নড়ে শূন্যে কি রকম অবাধ আকাশ
> হয়ে যায় ; সময়ও অপার—তাকে প্রেম আশা চেতনার কণা
> ধ'রে আছে ব'লে সে-ও সনাতন ;—কিন্তু এই ব্যর্থ ধারণা
> সরিয়ে মেয়েটি তার আঁচলের চোরকাঁটা বেছে
> প্রান্তর নক্ষত্র নদী আকাশের থেকে সরে গেছে
> সেই স্পষ্ট নির্লিপ্তিতে— তাই-ই ঠিক ;
>
> 'অঘ্রাণ প্রান্তরে'।

যমের দক্ষিণ দুয়ারের দিকে কবি ফিরিয়ে দেন আমাদের মুখ। ভয়ে কাঠ হয়ে মৃত্যুর হিমশীতল অন্ধকারকে আমরা দেখি। সেখানে সমস্ত স্রোত রুদ্ধ, সমস্ত কর্মের অবসান, সমস্ত আপদের শান্তি।

> শান্তি তবু ; গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
> আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।
>
> 'ধান কাটা হয়ে গেছে'।

পদে পদে জীবনের পথ রোধ করে দাঁড়ায় এক অনতিক্রম্য নিয়তি। পৃথিবীর সমস্ত আলো ফুৎকারে নিভিয়ে দিয়ে, সমস্ত রং মুছে দিয়ে সামনে মেলে ধরে এক প্রতিশ্রুত জগৎ—সেখানে 'শাশত রাত্রির বুকে কেবলি অনন্ত সূর্যোদয়' ('সুচেতনা')।

কল্পনার হাঁস সব—পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং মুছে গেলে পর
উড়ুক উড়ুক তারা হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর।

'বুনো হাঁস'।

স্বপ্নের ধ্বনিরা এসে বলে যায় ঃ স্থবিরতা সব চেয়ে ভালো।

'স্বপ্নের ধ্বনিরা'।

মৃত্যু যেন রঙীন আশায় প্রলুব্ধ করে মন্ত্রমুগ্ধের মতো জীবনকে টেনে নিয়ে যায় বধ্যভূমির দিকে। অপরূপ সৌন্দর্যে ভরা জীবনের এই লীলাভূমি রক্তাক্ত হয়। কিন্তু সে রক্তপাত আততায়ীকে ধিক্কার দেয় না, দেবতার সামনে বলিদানের মতো তা পবিত্র বলে মনে হয়। প্রিয়জনের ব্যাকুল বাহুপাশ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলেও অবধারিত এই মৃত্যুর হাতে নিজেকে সঁপে দেবার মধ্যে থাকে ক্লীবের সান্ত্বনা।

সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে বাঁচিয়ে নক্ষত্রহীন,
মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরী বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে সুন্দর
বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিল।
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামল...
একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বলল আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হয়ে এল।...
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিঃস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

'শিকার'।

হয়তো গুলির শব্দ আবার
আমাদের স্তব্ধতা
আমাদের শান্তি
আজকের জীবনের এই টুকরো টুকরো মৃত্যু আর থাকত না,
থাকত না আজকের জীবনের টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার;
আমি যদি বনহংস হতাম,
বনহংসী হতে যদি তুমি।

'আমি যদি হতাম'।

সুতরাং প্রকৃতির নির্জন বানপ্রস্থে 'ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে' থেকে মৃত্যুর জন্যে নত মস্তকে অপেক্ষা করো। ফুলের পাপড়িতে, পাখির ডানায়, মেঘের গায়ে বিচিত্র রং দেখ, সমস্ত রং নিংড়ে নিয়ে কুয়াশার ধূসরতা দিয়ে সব কিছু লেপে দাও। কান পেতে শোনো নদীর কল্লোল, পাখির গান, পাতার মর্মর—তারপর সমস্ত শব্দের কণ্ঠ রোধ করো। চরাচর জুড়ে বাজুক শুধু 'শববাহকদের গুমোট নিস্তব্ধতা' আর দিগ্‌দিগন্তে চৌকি দিয়ে ফিরুক 'নিষ্ক্রিয় অন্ধকারের বিভীষিকা'।

পৃথিবী থেকে পলায়নের বাহন হয় 'চিল'। পাখার ঝাপটায় এক বিষণ্ণ শূন্যতাকে সে বার বার জাগিয়ে তোলে। 'হরিণ' রচনা করে দূরাপসারী ব্যবধান—হাত বাড়িয়ে কিছুতেই

যার নাগাল পাওয়া যায় না। খণ্ড খণ্ড পরিবর্তমান স্রোত বুকে নিয়ে 'নদী' হয় এক অখণ্ড অপরিবর্তনের মূর্ত প্রতীক।

'বনলতা সেন'-এর কবি আমাদের নিয়ে যান এমন এক জগতে, যেখানে হিংস্র শ্বাপদসঙ্কুল অন্ধকার অরণ্যে আমরা একা, প্রকৃতি এক ভয়ঙ্কর চক্রান্ত দিয়ে আমাদের ঘিরে রাখে। মানুষের কুটিল শত্রু আমাদের একা একা বিচ্ছিন্ন ক'রে মারে। জীবনানন্দের হাতে পড়ে রবিন্সন ক্রুসোকে নির্জন দ্বীপের নির্বাসনে নিয়তির হাতের নিরুপায় শিকার হতে হয়।

মাঝে মাঝে বিবেকবুদ্ধিহীন অন্ধ ইন্দ্রিয়ের দ্বারে চক্ষুষ্মান্ চেতনার করাঘাত শোনা যায়।

অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোয় মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
বুঝতে পেরেছি আবার ;
ভয় পেয়েছি,
পেয়েছি অসীম দুর্নিবার বেদনা ;
দেখেছি রক্তিম আকাশে সূর্য জেগে উঠে—
মানুষিক সৈনিক সেজে পৃথিবার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্য আমাকে
নির্দেশ দিয়েছে।

'অন্ধকার'।

কবি সে নির্দেশ অগ্রাহ্য করেন। মানুষের প্রতি তাঁর নিদারুণ বিদ্বেষে, পৃথিবীর প্রতি তাঁর উদ্ধত অবজ্ঞায় কবি তাঁর জবানবন্দী এই বলে শেষ করেন ঃ

আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভ'রে গিয়েছে
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত পৃথিবী যেন কোটি কোটি শূয়োরের আর্তনাদে উৎসব
শুরু করেছে!
যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত শত শূকরের চীৎকার সেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর ;
এই সব ভয়াবহ আরতি!
গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি, হে হিম-হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন?

'অন্ধকার'।

দুই যুদ্ধের মধ্যবর্তী দুটি দশক সম্পর্কে জীবনানন্দ একেবারে উদাসীন নন। মাথা উঁচু করে মানুষের মতো বাঁচবার জন্যে যারা উদ্যত, তাদের তিনি হাত চেপে ধরেন। মিছিলকে তিনি ছত্রভঙ্গ করেন নির্জনতার নিঃসঙ্গ বিচ্ছিন্নতা দিয়ে। তাঁর কল্পনার স্বাধীনতা মানুষের হাতের শৃঙ্খলকে চিরস্থায়ী করে।

'বনলতা সেন'-এর কবি কুশলী শিল্পী। তাঁর লক্ষ্য অব্যর্থ। সুদক্ষ সেনাপতির মতো তিনি শব্দের অস্ত্রসজ্জিত বাহিনীকে পরিচালিত করেন। প্রতিরোধ যেখানে দুর্বল,

অপ্রস্তুত, অসংগঠিত সেখানেই তিনি সজোরে আঘাত করেন। মনোযোগ অন্য দিকে বিক্ষিপ্ত করে পাঠককে পরাস্ত করেন। পাঠকের দৃষ্টি আর্কষণ করেন চোখে ধুলো দেবার জন্যে।

প্রাচীনকালের গৌড়ীয় শুঁড়িখানায় থাকত এক রকমের চিহ্ন, সেই চিহ্ন দেখে ভেতরে ঢুকতেন পানরসিকেরা। জীবনানন্দের কবিতার দুর্বোধ্য সংকেত অনেকটা সেই চিহ্নের মতো। ভেতরে ঢুকলে নেশাগ্রস্ত হওয়া যায়। তখন বেলের খোলায় পৃথিবীকে মনে হয় তালগোলপাকানো এক অসম্বদ্ধ প্রলাপ, প্রেম যেন হারানো অতীতের ছায়াচ্ছন্ন স্মৃতি, আক্রান্ত মানুষের শেষ আশ্রয় প্রকৃতির নির্জন গুহা।

কবিতার বাইরেও যদি আমরা জীবনানন্দকে অনুসরণ করি, সেখানে তাঁর আত্মপক্ষ সমর্থনের যুক্তি মিলবে। বছর পনেরো আগে 'কবিতার কথা' প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন ঃ[১]

'কবিতা সকলের জন্য নয়, এবং যে পর্যন্ত জনসাধারণের হৃদয় নতুন দিগ্বলয় অধিকার না করবে যে পর্যন্ত কয়েকটি তৃতীয় শ্রেণীর 'কবি'র স্থূল উদ্বোধন ছাড়া বাজারে ও বন্দরে—এবং মানবসমাজে ও সভ্যতার সমগ্রতার ভিতর কোনো প্রথম শ্রেণীর কাব্যের প্রবেশের পথ থাকবে না; এমন কি তা বিলাস, কল্পনাবিলাস পর্যন্ত বলে আখ্যাত হয় এবং হবে এই সব স্থূল উদ্‌গাতাদের কাছে...কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে ভিড়ের হৃদয় পরিবর্তিত হওয়া দরকার ; কিন্তু সেই পরিবর্তন হবে কি কোনোদিন? যাতে তিন হাজার বছর আগের জনসাধারণ কিংবা আজকের এই বিলোল ভিড়ের মতো জনসাধারণ থাকবে না আর? যাতে এলিজাবেথের সময়ের ইংলণ্ডে কিংবা ধরা যাক ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে বাংলাদেশে যে সব শ্রেষ্ঠ কাব্য রচিত হয়েছে গণ-পাঠক সে সবের গভীর বোদ্ধা হয়ে দাঁড়াবে? ভাবতে গেলেও হাসি পায়।'

'উপমাই কবিত্ব'—এই স্বকীয় তত্ত্বের অনুসরণ করে গণ-পাঠকদের কথা মনে রেখে তিনি বলেন, 'তথাকথিত সভ্যতা কোনো এক দারুণ হস্তীজননীর মতো যেন বুদ্ধিস্খলিত দাঁতাল সন্তানদের প্রসবে প্রসবে-পৃথিবীর ফুটপাথ ও ময়দান ভ'রে ফেলেছে।'

কবি তারপর নিজের কর্তব্যের কথা তোলেন ঃ 'কিন্তু সভ্যতার মেদ ও ইন্দ্রলুপ্তির যদি পুনর্যৌবন না ঘটে, যিনি তৃতীয় শ্রেণীর কবি নন, অতএব স্বখাতসলিলে ধাতস্থ আমাদের দেশের সাহিত্যকর্মীদের সহানুভূতি যাঁর জন্য একটুও নেই তিনি কি করবেন? তিনি প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর চলে যাবেন—সহরে বন্দরে ঘুরবেন—জনতার স্রোতের ভিতর ফিরবেন—নিরালম্ব অসঙ্গতিকে যেখানে কল্পনামনীষার প্রতিক্রিয়া নিয়ে আঘাত করা দরকার নতুন করে সৃষ্টি করবার জন্যে সেই চেষ্টা করবেন ; আবার চলে যাবেন, হয়তো উন্মুখ পঙ্গুদের সঙ্গে করে নিয়ে, প্রকৃতির সান্ত্বনার ভিতর ;—সেই কোন্ আদিম জননীর নিকটে যেন, নির্জন রৌদ্রে ও গাঢ় নীলিমায় নিস্তব্ধ কোনো অদিতির নিকট।'

প্রায় এক-কুড়ি বছর আগে পুস্তক-সমালোচনা প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, 'বাংলাদেশের পাঠকসাধারণের মধ্যে জীবনানন্দ যদি অজ্ঞাতই থাকেন সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, তবে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের পর তিনি গুণীসমাজে স্বীকৃত ও সম্মানিত হবেন এ আশা জোর করেই করা যায়'।

দেরিতে হলেও তাঁর সে আশা ফলবতী হয়েছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নয়, আটাশ থেকে চোদ্দ বছর আগের লেখা জীবনানন্দের কবিতা সংকলন 'বনলতা সেন' নবকলেবর লাভ

১. 'কবিতার কথা'। কবিতা। বৈশাখ ১৯৪৬।

করে এবার নিখিল বঙ্গ রবীন্দ্র সাহিত্য সম্মেলনে ১৩৫৯-এর শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থ হিসেবে নির্বাচিত হয়েছে।

জীবনানন্দ দাশ তাঁর প্রবন্ধে তিরস্কার করে বলেছিলেন : 'বিদেশে বুর্জোয়া শ্রেণীদের ভিতরেও এমন অজস্র খাঁটি রসবোদ্ধা আছে যার হীন ভগ্নাংশও আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজে নেই ; এ দেশে রসবোধ যে হৃদয়হীনভাবে বিরল কবির কোনো কোনো শিথিল মুহূর্তের নিকট এর তিক্ততাও কম নয়।'

নাম ডাকার দেড়-দশক পরে হলেও এ দেশের 'খাঁটি রসবোদ্ধা' সেই 'হীন ভগ্নাংশ' যে শেষ পর্যন্ত পেছনের বেঞ্চি থেকে উঠে দাঁড়িয়ে 'প্রেজেন্ট সার' বলতে পেরেছেন তার জন্য আশা করা যায় 'বনলতা সেন'এর কবি তাঁদের ধন্যবাদ দেবেন।

কিন্তু 'খাঁটি রসবোদ্ধা'দের এই স্বীকৃতি ও সম্মানকে কি আমরা জীবনবিদ্বেষ ও শূন্য-সাধনার গুরুদক্ষিণা বলেই মনে করব?

জীবনানন্দ সম্পর্কে

বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(এক)

কবি জীবনানন্দ দাশ বিংশ শতাব্দীর এবং আমাদেরও আত্মার সহোদর। এই শতাব্দীর স্বপ্ন এবং যন্ত্রণা যেন তাঁর রক্তের মধ্য দিয়ে কবির চেতনা, অবচেতনা এবং সুচেতনায় সর্বতোভাবে প্রবাহিত। আজকের দিনের মানবসমাজ বড় বেশী শিশু, সময়ের প্রহারে বড় বেশী অসহায় আর ক্লান্ত ; তার জন্য কোথাও কোন করুণা বা ক্ষমা নেই যা আমাদের প্রথম প্রেম বা জননীর মুখ মনে করিয়ে দিতে পারে। আরেকটু স্পষ্ট ক'রে এই শতাব্দীর চরম লাঞ্ছনাকে যদি ব্যাখ্যা করা যায়, তাহ'লে হয়তো এমন ভয়ঙ্কর কথাও আমাদের ব'লতে হবে যে, সময় আমাদের মৃত্তিকা-জননীকে ব্যবহারের বৃদ্ধা ক'রেছে এবং আমাদের জন্য অবাঞ্ছিত সন্তানের বংশপরিচয়টুকুই রেখে দিয়েছে ; তার বেশী কোন কল্যাণ কামনাই আমাদের জন্য তার নেই। সময়ের এই ভয়াবহ নরক সৃষ্টির মধ্যে আমরা তথাপি জননীর কোমল মুখ স্বপ্নে দেখি এবং যে প্রথম-প্রেম আদিম যুগ থেকে তাম্র যুগ, হয়তো তারো পরের লৌহযুগ পর্যন্ত মানুষের জীবন-অনুভবে গঙ্গোত্রীর মত করুণার সৃষ্টি ক'রতো, তার কথা রূপকথার চেয়ে বেশী, আমাদের জীবনেও কাহিনী হবে ব'লে, ঘুমের মধ্যে কুসুম চয়ন করি। কবি জীবনানন্দ আজকের মাটির এবং আজকের মানুষের এই অন্ধ ট্রাজিডি তাঁর অবচেতনায় এবং চেতনায় অনুভব ক'রেছিলেন। সুচেতনার রাজ্য তাঁর অপরিচিত বা অজ্ঞেয় না হ'লেও, এই ট্রাজিডি থেকে মানব-জীবনের জন্য কোন স্বর্গীয় নির্গমন পথ তিনি আবিষ্কার করেন নি। এর কারণ, তেমন কোন পথই বিংশ শতাব্দীর পৃথিবী বা মানুষের জন্য আজ আর খোলা নেই।

মানুষকে সহোদর ভেবে এবং মানবীকে আদিম সহোদরার মত রক্তের মধ্যে অনুভব ক'রে জীবনানন্দ তাই এই ট্রাজিডির যন্ত্রণায় উন্মাদের মত মানবেতিহাসের এক আলো-অন্ধকার থেকে অন্য আলো-অন্ধকারের রাজ্যে, পথে এবং বিপথে বিচরণ করেছেন। কোথাও নিয়তির নিষ্ঠুর মারের প্রতিষেধক আছে, সেই মৃতসঞ্জীবনীর সন্ধানে, জীবনের অনেক বিনিদ্র রজনী কাটিয়েছেন তিনি। ইতিহাসের সমস্ত পটভূমি বারবার তাঁকে এ নিষ্ঠুর সত্য জানিয়ে দিয়েছে যে বিংশ শতাব্দীর মানুষের জন্য অতীতের সমস্ত পাণ্ডুলিপিই ধূসর এবং এ যুগের প্রেমিক মানুষ যদিও বা এক মুহূর্ত মুখোমুখি ব'সে থাকার জন্য জীবনের বনলতা সেনের সন্ধান পায়, কিন্তু শত শত শূকরীর প্রসব বেদনায় আর্ত বিংশ শতাব্দীতে ঐ বনলতা সেন একবার এক মুহূর্তের জন্যই আমাদের পিপাসার জল দেয়। তাঁর অভিজ্ঞতার উত্তর থেকে আজ বাংলাদেশের অনেক তরুণ কবিই এ সত্য জানেন, মানব সমাজের আহত প্রেমচেতনাকে আরোগ্য দান করার মত কোন বিশল্যকরণী কোথাও এই বিংশ শতাব্দীতে নেই। আর, ভাল ক'রে 'বনলতা সেন'পাঠ করার পরেও, এই সত্য জানা

হওয়ার ফলে, জীবনানন্দের পর এ যুগের কোন কবির কবিতাই অনুরূপ বিষ-মন্থনের তীব্র যন্ত্রণায় আলোকিত এবং আলোড়িত হয় না। আলোকের কথা আসে নিরপরাধ প্রেম থেকে। জীবনানন্দের সমস্ত যন্ত্রণারই আদি উৎস প্রেম ; সেই অসহায় বিংশ শতাব্দীর মানব শিশুর প্রেম, যে মাটিকে এবং নদীকে আঁকড়ে ধ'রে বাঁচতে চায়, অন্য সমস্ত মানুষের ললাটে অবাঞ্ছিত সন্তানের চিহ্ন দেখে যে সহোদরের জন্মের দুর্ভাগ্যে আর্তনাদ করে এবং নিজের জন্মের জন্যেও যাঁর যন্ত্রণা অপরিসীম। জীবনানন্দকে এই নরক আবিষ্কারের দুর্ভাগ্য নিজের চেতনায় বহন করতে হয়েছে। কিন্তু কবির প্রেম যন্ত্রণার দ্বারা বারবার আহত এবং রক্তাক্ত হ'লেও আমাদের চেতনায় তার মানবিক কাজ থেকে যায়। পরিশেষে আমাদের আরো মনে হয়, জীবন-অনুভবের এই সব যন্ত্রণা কবির প্রেম-চৈতন্যকে পরিশুদ্ধ ক'রেছে। একই অনুভবের যন্ত্রণা আমাদের কবিজীবনে দ্বিতীয় পাঠের মত ; অথচ আমাদের কবিতাতেও তা অনিবার্য ছিল।

(দুই)

যদি কোনদিন এই ভয়ঙ্কর অপ্রেম-যুগের অবসান হয়ে অন্য নতুন-জীবনের অনুভব মানুষের চেতনায় স্পষ্ট হয় ; যদি ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে কোন অপর আদিম-যুগ আবার ফিরে আসে যখন মানুষের জন্য মাটির বুকে অফুরন্ত স্তনধারা এবং নদীর শরীরে আত্মসমর্পণের নিষ্কলঙ্ক নিরপরাধ যৌন আহ্বান পৃথিবীর সকল মানুষ তার ভূমিষ্ঠকাল থেকে রক্তের মধ্যে অনুভব করবে; সেদিন আমরা জীবনানন্দের কবি-আসনটি অন্য কোন কবির জন্য এই দেশেও রচনা ক'রবো। তার পূর্বে, অন্ততঃ বিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয় পাদে, যখন কবিকে অমৃতের পুত্র এবং কবিতাকে মন্ত্র করার মত কোন সুচেতন মুহূর্তই মানবসমাজের মধ্যে স্থির নেই, তখন, আমাদের বিপন্ন মুহূর্তগুলিকে যে সহোদর কবি নিজে রক্তাক্ত হয়েও কবিচেতনায় বহন করে গেলেন এবং মানবসভ্যতার এই বিষণ্ণ অপ্রেমের মধ্যেও যিনি শিশুমানুষের নিরপরাধ প্রেম-চেতনাকে কবিতার বিষয় ক'রে গেলেন, তাঁর আসন আমাদের নিজেদের বুকের মধ্যে।

হেমন্তের কবি জীবনানন্দ দাশ

নরেশ গুহ

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' ছাপা হ'লো মে মাসে, অক্টোবরে জীবনানন্দ চ'লে গেলেন। তাঁর কবিতা গোড়া থেকেই অভিনব ছিলো, এবং বিস্ময়করভাবে স্মৃতিমন্থনকারী। আমাদের মতো যাঁদের বয়স আজ তিরিশ ছুঁয়েছে,. কি ছোঁবে, তাঁদের মনে গত দশ বারো বছর ধ'রে সব চাইতে বেশি গুঞ্জরণ ক'রে ফিরেছে তাঁরই লেখা নানা পঙ্‌ক্তি, উপমা আর অপ্রত্যাশিতভাবে বিবাহিত সব কথা। শুধু যে মজা পেয়েছি তা নয়। মজাও পেয়েছি, আবার নিক্তিনিরপেক্ষ হৃদয়াবেগ প্রকাশ করেতে গিয়ে কতো সময় অবাক হ'য়ে দেখেছি জীবনানন্দেরই কোনো-না-কোনো লাইন বেরিয়ে এসেছে মুখ থেকে। আধুনিক কাব্যের দরজায় এক দুর্ভেদ্য জটিলতার আতঙ্ক মেশানো আশা নিয়ে দাঁড়াতেই আমরা অভ্যস্ত। সে-জটিলতার ভয়ভাবনাকে একেবারে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেন জীবনানন্দ—যাঁর দশ বারো বছর আগে পর্যন্ত লেখা কবিতার আমরা প্রেমে পড়েছিলাম। সরল, অথচ তরল নয় ; ভাবালুতার লেশমাত্র নেই কোথাও—যে-কারণে বহুল অনুকৃতি সত্ত্বেও জীবনানন্দে প্রীত কান-মনের সংখ্যা বস্তুতই কম। সেই আমরাও অনেকে থমকে গিয়েছিলাম তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতায় এসে। থমকে হয়তো তিনিও গিয়েছিলেন। দুর্বোধ্যতার অভিযোগ করলে তাঁর চোখে-মুখে সেই বিখ্যাত জীবনানন্দীয় কৌতুকের চাপা হাসি দেখা দিতো —যে-হাসি কোনোদিন ভোলবার নয়। দুর্বোধ্য লাগতো, কিন্তু হাল ছাড়তুম না। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আর 'বনলতা সেন'—'এক পয়সায় একটি' সিরিজের আদি সংস্করণে বাদামি রঙের ছোট্ট, চটি বইটি—দিয়ে যিনি কিনে নিয়েছিলেন আমাদের—তিনি আমাদেরও জলাঞ্জলি দিয়ে, পরেকার অন্য কোনো প্রচেতা পাঠকের জন্য বচনাতীত রকমের গভীরতর কাব্য রচনা করছেন ব'লে স্বীকার করতে ইচ্ছে করতো না। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'য় তাই একসঙ্গে এতগুলি রচনার সংকলন পেয়ে উৎফুল্ল হয়েছিলাম। আশা করেছিলাম যে পূর্বাপর কবিতার মধ্যে নিজেকে নিবিষ্ট করতে পারলে তাঁর শেষ লেখার সঙ্গে আগেকার লেখার কিছু পারম্পর্য নিশ্চয়ই খুঁজে পাওয়া যাবে। আমার সে-আশা নিষ্ফল হয়নি। শেষ পর্বের অন্তত কিছু কবিতার মধ্যে নিজেকে আমি প্রবেশ করাতে পেরেছি। তাঁর শেষতম কবিতাবলীর পাণ্ডুলিপিটিও সম্প্রতি আমার দেখবার সুযোগ হয়েছে—যে-সব কবিতাকে সংশোধন—তাঁর ভাষায় 'পরিশোধন'—করবার সময় আর তিনি পাননি। যদিও এ-সব রচনা আমাকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' আর 'বনলতা সেন'-এর মতো একই ভাবে আচ্ছন্ন করে না,—তাহ'লেও বলতে পারি যে কান-মনকে অভ্যেস করিয়ে নিতে পারলে এ-কবিতাগুলিও আগের মতোই স্বচ্ছ ব'লে ঠেকবে। এবং বার-বার সে-সব কবিতা পাঠ করার পর আমার বিশ্বাস হয়েছে যে কাব্যের একটি মহত্তর পর্ব বিবর্তিত

হ'য়ে উঠতে-উঠতে অসময়ে থেমে গেলো, জীবনানন্দ চ'লে গেলেন। অন্তপর্বের রচনাবলী যদিও অনেকের কাছেই এখনো

> গগ্যাঁর ছবির মতো—তবু [-ও] গগ্যাঁর চেয়ে গুরু হাত থেকে
> বেরিয়ে সে নাকচোখে ক্বচিৎ ফুটেছে টায়ে টায়ে—

তাহ'লেও, মনে হয়, অদিপর্বের নিবিড় নির্জন নিসর্গনিকেতনে বহুকাল কাটানোর পর, মানবভাগ্যের এই তৃতীয় অঙ্কে দিনের আলোর সমাজসংসারে যদি তিনি প্রবেশ না করতেন, এ-যুগের বেদনার, তৃষ্ণার, জিজ্ঞাসার অন্ধকারে তাঁকে যদি পথ হাৎড়াতে না দেখতাম, তাহ'লেই বরং নিরাশ হতাম আমরা। অভিযোগ থেকেই যেতো।

এ-যুগের পক্ষে অভাবনীয় এক সৎ-কবির জীবন তিনি যাপন ক'রে গেলেন। আমাদের জ্যেষ্ঠ কবিদের মধ্যে অনেকেই প্রাবন্ধিকও। গল্পে উপন্যাসেও তাঁদের কারো-কারো প্রতিভা সমান উৎসাহী। জীবনানন্দ শুধুই কবিতা লিখেছেন, কবিতা ছাড়া আর কিছুই লেখেননি।* তাঁর যে-দু-চারটি প্রবন্ধ সাময়িকপত্রের পাতায় প্রক্ষিপ্ত হ'য়ে আছে সে-ও একরকম কবিতাই তাঁর কবিতারই মতো বিশেষ একধরনের গদ্যে লেখা। এবং কবিতা লিখতে ব'সে উদ্দামতম কবিত্ব ক'রে যেতেও তিনি দ্বিধামাত্র করেননি। তাঁর গদ্য-কবিতার কথা মনে রেখেই এ-কথা বলছি। আসিতেছে, কাটায়েছে, ডাকিবার, কয়, করিবে,—এ-ধরনের ক্রিয়াপদশব্দের অনর্গল ব্যবহার তাঁর কবিতার দোষ না হ'য়ে বৈশিষ্ট্য এবং আকর্ষণ হ'য়েই দেখা দিয়েছিলো।

তাছাড়া এ-যুগের আধুনিক নগরবৃত্তিকে আমরা সবাই যেমন একরকম মেনে নিয়েছি, তা না ক'রে তিনি তাকে বহুকাল আমলই দেননি। একদিকে যখন ছাপা হচ্ছে খাঁটি নগরজীবন নিয়ে লেখা সমর সেনের চতুর তুখোড় সব কবিতা, জীবনানন্দ তখন লিখছেন ঃ "ঘাস", "হাওয়ার রাত", "বুনো হাঁস", "শঙ্খমালা"। বরিশালে জন্ম, বরিশালেই জীবনের প্রথন অংশ কাটিয়েছেন। কলকাতার আকর্ষণ একেবারে যে ছিলো না তা নয়। শেষ দিকে বরং এই জনরোলে-দেয়ালে-ইস্পাতে হাঁপ-ধরানো, এবং তাঁর পক্ষে সম্পূর্ণ ভিন্ন জগতের কলকাতাকেই তিনি আশ্রয় করেছিলেন। কিন্তু এ-আকর্ষণ সেই রকমের যা দুই বিরুদ্ধের মধ্যেই শুধু সম্ভব।

নিতান্ত শেষ ক'বছরের ছাড়া তাঁর প্রায় সব কবিতাতেই তীক্ষ্ণ এবং প্রগাঢ় প্রত্যক্ষতা নিয়ে গ্রাম-বাংলা উপস্থিত,—বরিশালের, কখনো আসাম-অরণ্যের আরশিতে যে-পল্লীপরিবেশকে তিনি তাঁর মতো ক'রে চিনেছিলেন। বাল্যে বরিশালের লাশকাটা ঘরটা তাঁর কাছে যে-অদম্য এক কৌতূহলের বিষয় ছিলো, অন্ধকারে একা-একা মাঠে পায়চারি করতেন আর যারা দেখতেন, ফরেস্টর কাকার সঙ্গে তিনি যে কিছুকাল আসামের অরণ্যে বাস করেছেন কিংবা তাঁদের বাড়িতে যে ঘরের দেয়ালে-দেয়ালে অসংখ্য শিকারের ট্রফি —বাঘের চামড়া, হরিণের শিঙের ধূসর পাণ্ডুলিপি—ঝোলানো ছিলো, এ-সব কথা জানাটা কবিতার উপভোগ বাড়ায় না বটে, কিন্তু শিল্পীমনের বিশেষ প্রবণতার কিছুটা রহস্য উন্মোচন করতে পারে হয়তো। নেহাৎ তালিকা করলেও দেখা যাবে, বাংলাদেশের গাছপালা, ফল, পাখি, জীবজন্তুর এত নাম আর কোনো কবির রচনাতে ব্যবহৃত হয়েছে

* এ-প্রবন্ধ যখন লেখা হয় তখন পর্যন্ত তাঁর অত্যাশ্চর্য গল্প-উপন্যাসগুলি প্রকাশিত হয়নি। পড়লে দেখা যাবে যে সেগুলিও কাব্যের লক্ষণাক্রান্ত।

কিনা সন্দেহ। নিবিড় বটের নিচে লাল ফল প'ড়ে থাকে জীবনানন্দের কবিতায়। হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি খেলা করে, হলুদ পাতার ভিড়ে ব'সে শিশিরে পালক ঘসে পাখি, সোনার বলের মতো সূর্য আর রুপোর ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ পিপুলের গাছে ব'সে একা পেঁচা দেখে ; জলপাই অরণ্যের পারে পাহাড়ের মেধাবী নীলিমা জেগে থাকে ; জোনাকিতে ভ'রে যায় অন্ধকারে আকন্দধুন্দুল। এ-সব 'তুমুল গাঢ় সমাচার' আমরা ইতিপূর্বে আর কারো কবিতাতেই পাইনি। অনেক শিরীষের ডাল, অশত্থের চূড়া, সুন্দরীর অর্জুনের বন, বাবলার গলির অন্ধকার, শাল পামের নিবিড় মাথা, উঁচু-উঁচু হরিতকি গাছ, আম নিম জাম ঝাউ পিয়াল পিয়াশাল আমলকি পিপুল দেবদারু—ভিড় ক'রে আছে। তলায়—ফণিমনসার কাঁটা, জামিরের বন, শর কাশ হোগলা আর মধুকূপী ঘাস। কান পাতলেই তাঁর কবিতায় অন্তহীন এক অরণ্যের মর্মর শুনতে পাই যেন, ঝর-ঝর ক'রে গায়ে মাথায় রাশি-রাশি হলুদ হেমন্তের পাতা ঝ'রে পড়ে। আর এই জীবনানন্দীয় আরণ্যপ্রকৃতি অসংখ্য প্রাণী পাখি কীটপতঙ্গের আসা যাওয়ায় সতত চঞ্চল, প্রাণের নিছক উল্লাসে, অপচয়ে, আলস্যে স্পন্দিত হচ্ছে : থুরথুরে অন্ধ পেঁচা, একা পায়রা, অবিচল-শালিখ, সোনালি চিল, কাকাতুয়া, মাছরাঙা, জলপিপি কিংবা দুরন্ত শকুন। সন্ধ্যার আঁধারে ঘুমের-ঘ্রাণ-পাওয়া হাঁস—পুকুরপাড়ে ; স্ফটিক-পাখনা-মেলা বোলতা—নীলিমায় ; শাদা বক—নীল হাওয়ার সমুদ্রে। শিকারীর গুলির আঘাত এড়িয়ে জ্যোৎস্নায় বুনো হাঁস উড়ে যায়। আরো আছে। পদ্য-সাজানো অলংকার হিশেবে নয়, অবয়ব হ'য়ে কবিতায় মিশে। কেননা কাঁচপোকা গঙ্গাফড়িং চড়ুই দোয়েল ঝিঁঝির কথা যাই হোক, মাছি আর নীল মশা, পাটকিলে ডানার চিল, ভাঙা ডিম, মাকড়ের ছেঁড়া জাল, পুরোনো পেঁচার ঘ্রাণ অথবা রাতচর ডাঁশ দিয়ে কবিতার যাকে বলে 'শোভাবর্ধন'—সেটা করার কথা কল্পনা করা যায় না। হয়তো 'সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি' (বিশ্বাস ক'রে পড়া গ্রন্থ থেকে এসেছে?) অথবা 'চিতার উজ্জ্বল চামড়ার শাল' সৌখিন কল্পনাকে সুড়সুড়ি দেবে ; 'নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছায়ার আসা-যাওয়াটাও মনে হ'তে পারে বনেদি রোমান্স ঘেঁষা। কিন্তু শেয়াল? গাধা? নেউল, বিড়াল, মহীনের ঘোড়া আর ঘাইহরিণী? সামুদ্রিক কাঁকড়া, গলিত স্থবির ব্যাং আর বাটা মাছ? এরা সব নিজের নিয়মের প্রয়োজনেই জীবনানন্দের কাব্যে প্রবেশ করেছে। পাসপোর্ট আছে।

শুধু উল্লেখ নয়, জীবনানন্দীয় উপমার ঐশ্বর্যও জীবজন্তু গাছপালার জগৎ থেকে সংগ্রহ করা। রঙে সূক্ষ্মের তারতম্যের কথা বলতে গেলেই বাংলা ভাষার লেখকের অসহায় অবস্থা। অথচ জীবনানন্দের বীক্ষণী দৃষ্টিতে তার চমকপ্রদ সমাধান ধরা পড়েছে। তাঁর কবিতায় আকাশ কখনো 'ময়ূরের সবুজ নীল ডানার' রঙে, কখনো তা কোমল নীল 'ঘাস ফড়িঙের দেহের মতো'। লালই বা কত রকমের : 'নদীর জল মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল', চোখের লাল হিজলকাঠের রক্তিম চিতায় (উপভোগ করতে হ'লে কাঁচা হিজলকাঠের ছাল ছাড়িয়ে দেখতে হয়।)। রোদ্দুরের অন্য রং রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো ; কখনো তা হ'য়ে ওঠে কচিলেবুর পাতার মতো নরম সবুজ। পেয়ারা আর নোনা গাছের সবুজ আবার টিয়ার পালকের মতো। প্রেমিক চিলপুরুষের শিশিরভেজা চোখের মতো ঝলমল করে নক্ষত্র : দেখার দৃষ্টি চাই, সৌখিন কল্পনার কর্ম নয়। আতার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তির মতো ধবল চিতল হরিণীর ছায়া অথবা বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ দেখাবার মতো দৃষ্টি কখনো শহরে জন্মায় না।

আশ্চর্য হ'য়ে আবিষ্কার করলাম—গাছ ঝোপঝাড় মাঠ প্রান্তরের এই বিশাল রাজ্যে

ফুল নেই—ক্বচিৎ মোরগফুল, মচকাফুল, দু-একটা শসাফুল আর শাদা মরা শেফালির বিরল উল্লেখ ছাড়া। ফল আছে, তাও সামান্য : তরমুজ-মদ আর লুপ্ত নাসপাতির গন্ধের কথা আছে এক কবিতায় ; লোকসানি বাজারের বাক্সের আতাফলও পাওয়া গেলো। বাকি থাকে শুধু বেতফল ('তোমার চোখের মতো ম্লান বেতফল'), আবিষ্ট পুকুরের সিঙাড়ার ফল (পানিফল বললে আরো চেনা লাগবে), আর দু-একটা নষ্ট শাদা শসা। অথচ বারবার ঘুরে-ঘুরে যে-জিনিশের কথা জীবনানন্দের কবিতায় আসে তা ফল নয়, ফসল : গোধুম, যব, ধান। ধানের গল্প বলতে তাঁর ক্লান্তি নেই। এই সব অফুরন্ত শস্য হেমন্তের নিজের ভাঁড়ার থেকে এসেছে।

জীবনানন্দের কবিতা পড়তে-পড়তে অজান্তে কখন আমরা সেই রূপসী হেমন্তের প্রেমে প'ড়ে যাই। ভেবে অবাক লাগে—কৃষির সোনার কৌটোতে আমাদের প্রাণের ভ্রমরটি যদিও ভ'রে রাখা আছে তাহ'লেও ফলন্ত ধানের ঋতু হেমন্তের গাথা বাংলা কবিতায় একরকম ব্যতিক্রম বললেই চলে। শুধু কি দৃশ্যের? গন্ধের, শস্যের, আলস্য-পূর্ণতা-বিষাদের করুণতামাখা লাবণ্যময়ী ঋতু হেমন্ত। বাংলার কাব্য বর্ষার স্তুতিতে, বসন্তের বন্দনায় মুখর। এবং সে-দুটি বিখ্যাত ঋতুই—বিখ্যাত আরো অনেক কিছুর মতো—জীবনানন্দের কবিতায় অনুপস্থিত। হেমন্তের গভীর গম্ভীর রূপ কীটস-এরও প্রাণ ভুলিয়েছিলো। শেষ পর্বে জীবনানন্দের কাব্যে যখন জন্মান্তর ঘটছে, হেমন্ত তখনো তাঁর উপকরণ হ'য়ে ছিলো, তার ব্যবহার যদিও তখন ভিন্ন। হেমন্ত প্রথমত শস্যের, তৃপ্তির, বিরতির ঋতু :

> হেমন্তের ধান ওঠে ফ'লে—
> দুই পা ছড়ায়ে বোসো এইখানে পৃথিবীর কোলে।

গর্ভবতী জননীর মতো সে :

> আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
> বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝ'রে পড়ে তার
> শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে ;

মৃত্যুর শূন্যতা নিয়ে মৃতের শিয়রে সে দাঁড়িয়ে থাকে ; সভ্যতার সংকটের কথা ভাবতে গিয়েও মনে হয় হেমন্তই তার প্রতীক। আবার শেষ দিককার কবিতায় তা প্রতীক হ'য়ে উঠেছে সভ্যতার সব ঐশ্বর্যের, সমৃদ্ধির, সম্পদের :

> হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে ;

কোথাও বা সৃষ্টির অন্ধকার রহস্যের সঙ্গে বিজড়িত করেছেন তাকে :

> আজকে মানুষ আমি তবুও তো—সৃষ্টির হৃদয়ে
> হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল ;

হেমন্ত আসলে একই কালে জীবন ও মৃত্যু, সভ্যতা ও সংকট, পূর্ণতা ও বিনষ্টির একাত্ম প্রতীক। জীবনানন্দের এই হেমন্ত-দৃষ্টি থেকেই অনুমান করা যায়, অব্যবহিত সংসারের ঋণ রক্ত সফলতা গ্লানি আস্পর্ধা আর পাপ তাঁকে সাময়িকভাবে ব্যাকুল উদভ্রান্ত এবং অস্থির ক'রে তুললেও, নিস্তেজ নিরাশ্রিতের অনবলম্ব হতাশা শেষ পর্যন্ত কখনোই তাঁর নাগাল পাবে না। তার আংশিক প্রমাণ 'শ্রেষ্ঠ কবিতার' শেষ দিকের পাতায় উপস্থিত।

তবে একটা কথা ঠিক। মানুষের কিমাকার সমাজের অনভ্যস্ত নাগরিক পরিবেশে জীবনানন্দ স্পষ্টতই অপ্রতিভ বোধ করেছিলেন। অথচ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আসন্ন তিমিরে

মারী মন্বন্তরের শৃগাল গৃধিনী এবং হায়েনারা ততদিনে বাংলাদেশে ইতস্তত বিচরণ ক'রে বেড়াচ্ছে। পৃথিবীতে ঘনিয়ে এসেছে বিকেলের ছায়া। 'অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস কেবলি শিথিল হ'য়ে যায়।'

> এ-যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো
> চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের ; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
> রাত্রির মায়ের মতো ঃ

যে-অন্ধকার এসে 'মানুষের বিহ্বল দেহের সব দোষ' প্রক্ষালিত ক'রে দেবে। নেই, নেই। হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে।

> অথবা সামান্য লোক হেঁটে যেতে চেয়েছিল স্বভাবিক ভাবে পথ দিয়ে
> কি ক'রে তাহলে তারা এরকম ফিচেল পাতালে
> হৃদয়ের জন পরিজন নিয়ে হারিয়ে গিয়েছে!

দুর্যোগের এমন নিকটে থেকে আর তাকে উপেক্ষা করবার মতো সাধ্য এমন কি জীবনানন্দেরও ছিলো না। এবং তাঁর মতো জীবনবিহ্বল কবির গলাতেও এই প্রথম তির্যক ব্যঙ্গের সুর লাগলো, প্রকট হ'য়ে উঠলো সেই বিসদৃশের দিকে আড়চোখে তাকানো জীবনানন্দীয় কৌতুক-প্রবণতা, নিঃশব্দ অট্টহাসির মতো যা আমাদের চমকিয়ে দেয়। এ-কালের কবিতায় কাক চিল ধবল চিতল হরিণীর জায়গা নিয়েছে সোমেন পালিত, সুবিনয় মুস্তফী, অনুপম ত্রিবেদী ; বেন্টিক স্ট্রিটের ইহুদী রমণী, থামে ঠেস দিয়ে লোল নিগ্রো, আধো আইবুড়ো ভিখিরি আর শাঁকচুন্নির মতো ভিখারিনী ('একদিন হাঁস ছিলো হয়তো বা, এখন হয়েছে হাঁস হাঁস!'); ফেঁসে-যাওয়া হাইড্র্যান্ট থেকে কুষ্ঠরোগী জল চেটে নেয় এখানে, বাতাস হ'য়ে ওঠে বিশুষ্ক চিনেবাদামের মতো, মানুষ না মাছিদের গুঞ্জরণময় হ'য়ে যায় বিকেল ; স্থির পেট্রল ঝেড়ে মোটরকারগুলো গাড়লের মতো কেশে রাত্রিতে মিশে যায়। আর দিকে-দিকে দেখা যায় লক্ষ্যহীন অর্বাচীনের উত্তাল ব্যস্ততা শুধু, যেন

> কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে—মনে হয়,
> জলের মতন দামে।

সকলেই তাই ঊর্ধ্বশ্বাস, যদিও 'অনির্বচনীয় হুণ্ডি' একজন দুজনের হাতেই শুধু জমা রয়েছে আজকের পৃথিবীতে।

> বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
> কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়।

বুঝতে পারি জীবনানন্দ এতকাল পরে অচেনা দেশ শহরে এসেছেন, এসেছেন তাঁরই নিজস্ব মনপ্রাণ নিয়ে। কিম্ভূত প্রসঙ্গে কৌতুকপ্রিয় তিনি পূর্বেও ছিলেন,—লাশকাটা ঘরের অন্ধ পেঁচাটিকে মনে পড়বে ;—সে-কৌতুক তখন তাঁর নিজেকেও লেগেছে, সেধে গায় মেখেছেন তিনি, যেন প্রাণের রঙ্গ মেনেই কৌতুক করছেন। তার মধ্যে বিদ্রূপের জ্বালা ছিলো না। সে ছিলো অন্য এক পৃথিবীর কথা, যে-জগতে ফিরতে হ'লে এ-যুগের জীবনানন্দকে সতেরো বছর আগেকার লেখা শোধন ক'রে সাধ মেটাতে হ'তো। এখন যখন যুগান্তের কিমাকার মানুষগুলোর কথা ভেবে তিনি লেখেন

মাঝে মাঝে পুরুষার্থ উত্তেজিত হ'লে
(এ রকম উত্তেজিত হয় ;)
উপস্থাপয়িতার মতন
আমাদের চায়ের সময়
এসে প'ড়ে আমাদের স্থির হ'তে বলে।

কিংবা বলেন

তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

তখন দেখি কণ্ঠে তাঁর করুণার আবেশ মাত্র নেই, নেই বন্ধুতা, নেই একবিন্দু কান্না। দেখি শুধু ক্রোধ, শুনি বিদ্রূপ আর ভর্ৎসনা।

পরে তিনি আরো গভীরতর জিজ্ঞাসার তিমিরে নেমে পড়েছিলেন, সপ্রশ্ন তাকিয়েছিলেন সমাজের সভ্যতার অন্তিম লক্ষ্যের দিকে ; তাঁকে বিচলিত করেছিলো অনন্ত ক্ষতি ক্ষয় মৃত্যুতে বলয়িত, তথাপি অক্লান্ত, যে-প্রাণরঙ্গ তার আচ্ছন্ন ওঙ্কারধ্বনি। যা ছিলো চিত্ররূপময় ঐশ্বর্যের গরবিনী ভাষা, শাঁখা-পরা শূন্য হাতের মতো এ-যুগে তা নিরলংকার হ'য়ে এসেছে, উপমার মণিমাণিক্য নিয়ে খেলা করার মন আর নেই ঃ

পথ চিনে এ-ধুলোয় নিজের জন্মের চিহ্ন চেনাতে এলাম ;
কাকে তবু?
পৃথিবীকে? আকাশকে? আকাশে যে সূর্য জ্বলে তাকে?
ধুলোর কণিকা অনুপরমাণু ছায়া বৃষ্টি জলকণিকাকে?
নগর বন্দর রাষ্ট্র জ্ঞান অজ্ঞানের পৃথিবীকে?

কেন আলো? মাছিদের ওড়াউড়ি?

হে নাবিক, হে নাবিক, কোথায় তোমার যাত্রা সূর্যকে লক্ষ্য ক'রে শুধু?
বেবিলন, নিনেভে, মিশর, চীন উরের আরশি থেকে ফেঁসে
অন্য এক সমুদ্রের দিকে তুমি চ'লে যাও-দুপুর বেলায় ;

দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসার মীমাংসা আমরা কবির কাছে কখনোই প্রত্যাশা করি না। তবে চিরকাল যে-সব প্রশ্নচিহ্ন সপ্তর্ষির মতো মানুষের প্রাণে প্রলম্বিত রয়েছে, তা আর এক পৃথিবীর আর এক পরিবেশের কবিচিত্তেও স্পন্দন জাগাবে—সেটা স্বাভাবিক। মানুষের জন্ম মৃত্যু কর্মফল, জীবনের ধ্রুব লক্ষ্য, আর সভ্যতার পরম উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র ক'রে সেই সব অনাদ্যন্ত প্রশ্ন আবর্তিত হয়। ইয়েটস তাঁর শেষ কবিতায় বলেছেন ঃ

Cast a cold eye
On life, on death.
Horseman, pass by!

প্রায় একই সুর দেখছি জীবনানন্দের শেষ লেখায়। তিনি যেন সৃষ্টির নাড়ির উপরে হাত রেখে বুঝতে পারছেন

অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ

প্রাণের সার্থকতা রয়েছে হয়তো বা অনন্ত দ্বন্দ্বের হাত ধ'রে চিরকাল এগিয়ে চলার মধ্যে। ভুলের বিনুনি থেকে হৃদয়কে খুলে-খুলে বিশ্বের সৃষ্টিকাণ্ডের সঙ্গে পা মিলিয়ে চ'লে যেতে হবে—যতকাল প্রাণ টিকে আছে পৃথিবীতে, রাঙা রৌদ্রে স্ফটিক পাখনা মেলে যতকাল বোলতার ভিড় উড়ে যাবে :

'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়—
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয় জয়।

আর এই চলতে-চলতে দশজনের মিলিত সংসারকে নিরাময় ক'রে নিতে পারাবে হৃদয়ের সেই অমোঘ গুণ, যার সাধনা পৃথিবীর মহাপুরুষেরা চিরকাল ক'রে গেছেন :

দীনতা : অন্তিম গুণ, অন্তহীন নক্ষত্রের আলো

হেমন্তের দৃষ্টিভরা চেনা কবির কণ্ঠস্বরটি আবার শুনতে পাই যেন। ক্রোধ নয়, বিদ্রূপ নয়, উদাসীনতাও নয় ; প্রেম প্রীতি করুণায় স্নিগ্ধ হ'য়ে তাঁর শিল্পচৈতন্য মহত্তর সৃষ্টির জন্য তৈরি হয়েছিল।

জীবনানন্দ দাশ

নরেশ গুহ

[জন্ম : ১৭ ফেব্রুয়ারি ১৮৯৯ ; কলকাতায় ট্র্যাম দুর্ঘটনায় আঘাতপ্রাপ্তি : ১৪ অক্টোবর, ১৯৫৪ ; মৃত্যু, শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতাল, কলকাতা : ২২ অক্টোবর, ১৯৫৪।]

কখনো দুপুরে, কখনো রাত্রির গভীরতায়, তাছাড়া বিকেলের দিকে, নিয়মিতভাবে একাকী বেড়ানোর অভ্যাস ছিলো। শহরের পাকচক্রের মানুষী ভিড়, হৈ-হট্টগোল বিলি কেটে, হাঁটুর নিচে ধুতিটাকে একটু গুটিয়ে তুলে ধ'রে, আড়চোখে তাকাতে-তাকাতে চ'লে যেতেন। খুব কম লোকে চিনতে পারতো ইনিই জীবনানন্দ দাশ। দেখা হ'লে একটু লাজুক চাপা হাসি হাসতেন, বা অন্যমনস্ক কথা বলতেন দুচার মিনিট, রাসবিহারী এভিনিউ-ল্যান্সডাউনের মোড়ে দাঁড়িয়ে।

১৪ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যা। আমরা কেউ সেদিন মোড়ের কাছাকাছি ছিলুম না। পরদিন একটি কি দুটি বাংলা কাগজে খবরটা ছাপা হ'লো, অনেকেরই চোখে পড়েনি। কোনো-কোনো সংবাদপত্রে আরো পরে। কোথাও বা একেবারেই না।

মোড়ের কাছাকাছি রাস্তা পেরিয়ে সন্ধ্যার পর বাড়ি ফিরছিলেন, বুঝতে পারেননি পশ্চিম থেকে ট্র্যামটা অমন দ্রুত বেগে ছুটে এসে ধাক্কা দেবে। রাস্তার লোকজনেরাই ট্যাক্সি ক'রে তাঁকে অচৈতন্য অবস্থায় শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালে পৌঁছে দেন। এবং বাড়ির দরজা থেকে একশো গজ দূরে ঘটনাটা ঘটলেও তাঁর বাড়িতে এ-খবর পৌঁছয় তার অনেক পরে, হাসপাতাল থেকে। বুকের অনেকগুলো পাঁজর, কণ্ঠার হাড়, এবং কোমরের নিচে একখানা পা চূর্ণ হয়েছিলো।

সবই করা হয়েছিলো, তখনকার চিকিৎসাবিদ্যার আয়ত্তে যা করা যেতো। কিন্তু ইতিমধ্যে তাঁর আহত ফুসফুসে নিউমোনিয়া দেখা দেয়, যেটা আরোগ্য না-করা পর্যন্ত চূর্ণ অস্থি পুনরায় সংস্থাপন করা সম্ভব ছিলো না। এই নিউমোনিয়া শেষ পর্যন্ত আরোগ্য করা যায়নি।

তাঁর যাঁরা সমসাময়িক কবি এবং সাহিত্যিক বন্ধু, কলকাতার যাঁরা তরুণ লেখক, এবং তাঁর কবিতার ভক্ত পাঠক, তাঁরা প্রায় প্রত্যেকেই উদ্বিগ্ন মন নিয়ে হাসপাতালে তাঁকে দেখতে গিয়েছিলেন। ডাক্তারি-পড়া তরুণ ছাত্ররা সারারাত্রি শয্যার পাশে উপস্থিত থাকতেন। সারাদিনই দেখা যেতো ব্যাকুল চোখমুখ ছোটোখাটো একটি দল হাসপাতালের বারান্দায় নীরবে দাঁড়িয়ে আছেন।

২২ অক্টোবর রাত সাড়ে এগারোটায় মৃত্যু হ'লো। পরদিন সকালে রাসবিহারী এভিনিউ দিয়ে নীরবে তাঁর দেহ কেওড়াতলা শ্মাশানঘাটে নিয়ে গেলাম আমরা। তাঁকে যাঁরা জানতেন, ভালোবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন, তাঁরা এসেছিলেন। নাতিদীর্ঘ একটি শোকযাত্রীর দল।

ফুটপাতে দাঁড়িয়ে নিচু গলায় জানতে চাইলেন কেউ একজন—'কে গেলেন?' পেরিয়ে যেতে-যেতে উত্তর শুনলাম—'জীবনানন্দ। জীবনানন্দ দাশ।' 'কী করতেন?' 'কবি ছিলেন।' বলতে-বলতে তাঁরা লাফিয়ে আপিসের বাসে উঠে পড়লেন।

*

তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর পরে তখন দেশ তাঁকে স্বীকার করলো। শুধু কলকাতা শহরে নয়, যাকে আমরা মফস্বল বলি, যে-কোনো সজীব আন্দোলনের ঢেউ যেখানে গিয়ে পৌঁছতে-পৌঁছতে একযুগ অন্তত কেটে যায়, সেইসব ছোট শহর, আধা-শহর, পল্লীগ্রাম, এমনকি প্রবাসী বাংলাসমাজেও তাঁর স্মরণসভার অসংখ্য অনুষ্ঠান হয়েছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রথম সংস্করণ শেষ হ'তে অন্তত পনেরো বছর লেগেছিলো, 'বনলতা সেন'-এর দু' বছর লাগলো না। দেখে একদিকে যেমন আনন্দ হয়, অন্যদিকে তেমনি এই ভেবে বিষণ্ণ বোধ করি যে, বেঁচে থাকতে তাঁকে কত বড়ো অনাদরই সহ্য করতে হয়েছে। প্রতিভার প্রতি এই একনিষ্ঠ প্রাথমিক বৈরিতা হয়তো শুধু বাংলাদেশেরই চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু সে-কথা ভেবে আত্মদোষের লাঘবও কিছু হয় না। কবি জীবনানন্দ দাশের প্রতি পিশুনদের আক্রমণ অস্বাভাবিক তীব্র হ'য়ে উঠেছিলো, তার কারণ আমাদের অনভ্যস্ত আলংকারিক ভাষায়, অনভ্যস্ত ছন্দ প্রকরণে এমন প্রবল কাব্যস্রোত তিনি বইয়ে দিলেন যে, বধির হ'য়ে তাকে উপেক্ষা করাও অসম্ভব ছিলো। অক্ষমকে আমরা উপেক্ষা করতে পারি ; আর যিনি শক্তিমান তাঁকে প্রথমে অশ্রদ্ধা করি, অবিশ্বাস করি, নিন্দা করি, তার পর সমাদরে গ্রহণ করতে বাধ্য হই। মৃত্যুর শোক চিরকাল থাকে না, এবং অসম্ভব ক্ষতির সঙ্গে-সঙ্গে মৃত্যু আমাদের কিছু পূরণও করে। জীবনানন্দের আকস্মিক শোচনীয় মৃতুর পরে তাঁর কাব্যের এবং সাধারণভাবে আধুনিক বাংলাকাব্যের প্রতি বৃহৎ বাঙালি পাঠকসমাজের অনীহা যদি কিছুটা পরিমাণেও দূর হ'য়ে থাকে—মৃত্যুর শীতল হাত থেকে সেই দানাটুকুই আমরা কৃতজ্ঞচিত্তে গ্রহণ করবো।

যৌবনে পা দিয়েই আমরা যারা আধুনিক কাব্যের নিষিদ্ধ ফল আস্বাদ করেছিলাম, হিতৈষীর হিতোপদেশে কর্ণপাত করার প্রবৃত্তি হয়নি যাঁদের, তারা সেই নিষিদ্ধ ফলের মধ্যে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাবলীর প্রতি একটু বিশেষ পক্ষপাত দেখাতে শিখেছিলাম। আজ যখন ভেবে দেখি 'কেন', তখন একসঙ্গে এত কথা ভিড় ক'রে আসে, এই কাব্যের মায়া-আরশিটিকে এতদিক থেকে আলো ফেলে ঘুরিয়ে-ঘুরিয়ে দেখতে ইচ্ছে করে যে, সে-কথা সংক্ষেপে বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। যে-ক্লান্তি এবং বিষাদকে বলা হয় আধুনিক মনের উপলব্ধিগত প্রচণ্ড সত্য, আমরা কি সেই উপলব্ধিরই স্বাদ পেয়েছিলাম জীবনানন্দে? সে কথা হয়তো মিথ্যে নয়।

> আসিয়াছি নেমে এই ক্ষেতে ;
> শরীরের অবসাদ—হৃদয়ের জ্বর ভুলে যেতে।
>
> শীতল চাঁদের মত শিশিরের ভিজা পথ ধ'রে
> আমরা চলিতে চাই, তার পর যেতে চাই ম'রে
> দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পুড়ে' মাছির মতন ;
> অগাধ ধানের রসে আমাদের মন
> আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি—পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন।
>
> —"অবসরের গান"

এই সব কবিতার মধ্যে অনুস্যূত হ'য়ে আছে যে-মনস্বী বিষণ্ণতা তার মধ্যে আমরা আমাদের হৃদয়ের প্রতিধ্বনি মেশাতে পেরেছিলাম। কিন্তু বিষাদ হ'লেও তার চরিত্র এমন নয় যার থেকে জীবনের প্রতি বিতৃষ্ণার জন্ম নিতে পারে। ফলত জীবনানন্দীয় কাব্যকলা জীবনকে বর্জন করতে শেখায় না ; সবগুলি ইন্দ্রিয়কে তা আরো তীক্ষ্ণ ক'রে, সজাগ ক'রে তোলে, পরমাশ্চর্য প্রাণলীলার প্রতি প্রগাঢ় মুগ্ধতায় হৃদয়মন ভ'রে দেয়। আধুনিক মনের এই লক্ষণ। জটিল জীবনাঙ্কের শেষ ফল অক্ষয় আনন্দের প্রতীতি--সে-কথা নিঃসন্দিগ্ধ নিরুদ্বেগ চিত্তে অমনি কেউ বললেই তা নিয়ে আর আমাদের মন কিছুতে ভ'রতে চায় না। অসংখ্য ঋণ রক্ত সফলতা ক্ষতি আর মৃত্যু ছড়ানো সৃষ্টিলোকের চেতনা আমাদের মনের মধ্যে কাজ করছে। অথচ এই অসম্ভব ক্ষতিতে ভরা বিশ্বের পটে অন্ধকার রহস্যের মতো, যেন কোনো অলৌকিক আঙ্কিক নিয়মে, অন্ধ অবোধ আনন্দিত প্রাণের আবর্তনও চলেছে, হেমন্তের ফসলকাটা মাঠ যার কথা নিরন্তর স্মরণ করিয়ে দেয়। সভ্যতার জটিলতাকে যখন আমল দেননি জীবনানন্দ, যখন তিনি ছিলেন নির্জন নিসর্গলীলার কবি, হেমন্তের মাঠ ঘাট বন জঙ্গল কীট পতঙ্গ পোখপাখালির কথায় যখন তাঁর কবিতা ভরা ছিলো, তখনো সেই নিসর্গনিকেতনকে তিনি নিরবচ্ছিন্ন শান্তির ও স্বস্তির দেবালয় ব'লে তার নান্দীপাঠ করেননি। মৃত্যুর জমিতে দাঁড়িয়ে, তবু যারা হৃদয় ভ'রে জীবনের সুধাপান করতে লজ্জা পায় না ('জীবন কি নিরক্ত সম্রাট এক সুধাখোর'), শেকস্‌পীরীয় অর্থে সেই অপরাজেয় ভাঁড়ের কণ্ঠস্বর শুনি জীবনানন্দের কাব্যে—

> ফলন্ত মাঠের 'পরে আমরা খুঁজি না আজ মরণের স্থান,
> প্রেম আর পিপাসার গান
> আমরা গাহিয়া যাই পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন!
> ফসল—ধানের ফলে যাহাদের মন
> ভ'রে উঠে উপেক্ষা করিয়া গেছে সাম্রাজ্যেরে, অবহেলা করে গেছে পৃথিবীর
> সব সিংহাসন—

শেক্‌সপীরীয় ফল্‌স্টাফ কিংবা 'হ্যামলেটে'র খনকযুগলের মানসিক চরিত্র যাঁদের স্পর্শ করে না, জীবনানন্দে 'রূপ আর কামনা'র গান তাঁদের কাছে অপরিব্যক্ত, অনতিব্যক্ত থেকে যাবে ব'লে আশঙ্কা করি। "কমলালেবু"র মতো কবিতার স্বাদ তাঁরা কিছুতেই উপভোগ করতে পারবেন না, বুঝবেন না কোন প্রাণের উল্লাসে লেখা যায়--

> আমারো ইচ্ছে করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মত
> গেলাসে গেলাসে পান করি,
> এই ঘাসের শরীর ছানি,—চোখে চোখ ঘষি,
> ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
> ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
> শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।
>
> —"ঘাস"

তারপর ভিন্ন আর এক অধ্যায়ের উন্মোচন হ'লো জীবনানন্দের কাব্যে, 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ইত্যাদি গ্রন্থে যার নিদর্শন আছে। ব্যাধিগ্রস্ত সভ্যতার রঙ্গভূমি যে-শহরকে এতকাল এড়িয়ে চলেছিলেন, তার তীব্র আর্তনাদকে আর ভুলে থাকতে পারলেন

না। তাঁর এই মধ্যপর্বের কবিতাবলী ব্যঙ্গে বিদ্রূপে ক্ষয়ক্ষতি মলিনতার বেদনায় মথিত হয়েছে।

> মনে হয় এর চেয়ে অন্ধকারে ডুবে যাওয়া ভালো
> এইখানে
> পৃথিবীর এই ক্লান্ত এ অশান্ত কিনারার দেশে
> এখানে আশ্চর্য সব মানুষ রয়েছে।
> তাদের সম্রাট নেই, সেনাপতি নেই :
> তাদের হৃদয়ে কোনো সভাপতি নেই ;
>
> চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধভিড়—অলীক প্রয়াণ।
> মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর ;
> যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ;
> মানুষের লালসার শেষ নেই :
> উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতু ক্ষণ
> অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
> অপরের সুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয়সাধ
> নেই।....
>
> —"এই সব দিন রাত্রি"

এই উন্মথিত বেদনার বিষ পরিপাক ক'রে তার পর এসেছিলো উত্তীর্ণ-আনন্দের, প্রত্যয়ের জয়গান—

> 'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
> চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;
> জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।—

তাঁর কাব্যে সাবলীল, উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠতে-উঠতে আকস্মিক ভাবে সময় শেষ হ'য়ে গেলো।

কবিদের মধ্যে তাঁরাই অসামান্য যাঁদের রচনায় জীবনের প্রগাঢ়তম আনন্দবেদনার রূপ উন্মোচিত হয় ; ইন্দ্রিয় দিয়ে যা উপভোগ করবার, হৃদয় দিয়ে যা উপলব্ধি করবার, এবং প্রাণের গভীরে যা বোধ করবার বিষয় তাকে যাঁরা অভাবিতপূর্ব গতিময় ভাষার স্পন্দনে আমাদের জন্য স্মরণীয়ভাবে তর্জমা ক'রে দেন, যা আমরা আর ভুলতে পারি না, যে-তর্জমার জগতে প্রবেশ করলে নিজেকে এবং বিশ্বপৃথিবীকে নূতন ক'রে আবিষ্কার করি আমরা—অসামান্য কবি তাঁরাই। দশ বছর আগেকার মতো আজ আর বিদ্রূপের গ্লানি জীবনানন্দের নাম স্পর্শ করছে না বটে, কিন্তু এখনো যে তিনি "বনলতা সেন" ইত্যাদি কয়েকটি কবিতা নিয়েই অধিকাংশ পাঠকের কাছে সমধিক পরিচিত তার অনেক অনেক কারণের মধ্যে বিশেষ ক'রে একটির কথা বলা প্রয়োজন। বাঙালি পাঠক আজ পর্যন্ত সেইসব ধরনের কবিতা নিয়েই অভ্যস্ত যার মধ্যে ভাবের কোনো প্রবাহ বা গতি নেই, কোনো এক জায়গা থেকে শুরু ক'রে আর কোনো প্রাপ্তিতে যা পৌঁছে দেয় না, যার প্রথম

পঙ্‌ক্তি কিংবা প্রথম স্তবকেই প্রকাশ সে-কবিতায় কবির মূল অভিপ্রায়টি কী, এবং পরবর্তী পঙ্‌ক্তিগুলিতে উপমা দৃষ্টান্ত ব্যাখ্যা ইত্যাদি উপস্থিত ক'রে সেই কথাটিকেই বিশদ করবার চেষ্টা। কিন্তু আধুনিক কাব্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন হাতে নিলে দেখা যাবে কাব্যের গঠন সেখানে একেবারে স্বতন্ত্র। তার শুরু আছে, মধ্য আছে, পৌঁছনো আছে। বিশেষত জীবনানন্দের কোনো কবিতা কী কথা বলতে চায়—এক লাইনে তার কোনো সারসংক্ষেপ হবার নয়। এসব কবিতা হচ্ছে ভাষার বোনা কোনো উপলব্ধির প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা। শব্দের ধ্বনি এবং ব্যঞ্জনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হ'য়ে পাঠককে সেই অভিজ্ঞতাটি নিজের মধ্যে পুনরায় গ'ড়ে তুলতে হয়। অবশ্য এই অভ্যাস দুদিনে আয়ত্ত হবার নয়। রবীন্দ্রনাথের শেষপর্বের কবিতাবলীতেও কি বাঙালী পাঠক আজ পর্যন্ত স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করতে পেরেছেন? রবীন্দ্রনাথেরও যাঁরা পরবর্তী, যথার্থভাবে দেশ তাঁদের গ্রহণ করবার আগে আমরা তাই আরো কিছুদিন সহজেই অপেক্ষা করতে পারি।

আমাদের কবি

অশোক মিত্র

ভয়চকিত মফস্বলের মানুষ, কলকোলাহলমুখর নগরজীবনের সঙ্গে তাঁর কোনোদিন অন্বয় ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না। দুই মহাযুদ্ধের মধ্যবর্তী বাংলাদেশের সে মফস্বলশান্তি আর ফেরবার নয়। দেশভাগের কথা ছেড়ে দিলেও, আধো-শহর আধো-গ্রাম যে-রূপবতী বরিশাল, তা হারিয়ে গেছে কোথায়। সেই নারকেল-গুপুরির সারি, শুরকি-ছাওয়া শড়কের পাশে খাল, খালের ওপারে নিবিড় হয়ে ঘিরে আসা পল্লীশ্রী ; খোড়ো ঘর, ঘাস, ধান, শিরীষ, আম, জাম, নিম, জামরুল। কোঠাবাড়ির পিছনে স্তব্ধতা, টলমল পুকুর, হাঁস, মাছ, শামুক, গুগলি। গুপুরির দীর্ঘ ইশারা বেয়ে সন্ধ্যা ; পেঁচা, ডাহুক আর ঝিঁঝি, বিশাল আকাশ জুড়ে অনন্ত নক্ষত্র। অপেক্ষাকৃত ঘনতর বসতি ছাড়িয়ে গেলেই হয়তো ধানসিড়ি নদীর ঢল, শর-হোগলার বন, তারই পাশে বিচ্ছিন্ন খড়ের বোঝা বুকে নিয়ে প্রান্তরের নীরবতা। আরো একটু এগিয়ে গেলে এমনকি পলাশবনের ভিড়েই হারিয়ে যাওয়া যাবে বোধহয় ঃ কে জানে, হীরা-ঝরা চোখ নিয়ে দু'একটা হরিণই খেলা ক'রে বেড়াচ্ছে।

এই পরিবেশে জীবনানন্দ নিজের মনে কবিতা লিখে গিয়েছিলেন বিশ-তিরিশের বছরগুলো ভ'রে। শান্তির কবিতা, শ্রান্তির কবিতা ঃ গোরু, ঘোড়া, হরিণ, ঘাস, কীট-পতঙ্গ, পাখিপাখালির পরিমণ্ডলে যে-শান্তি, সেই একবুক শান্তির কবিতা। 'হাঁসের নীড়ের থেকে খড় পাখির নীড়ের থেকে খড় ছড়াতেছে ; মনিয়ার ঘরে রাত শীত আর শিশিরের জল' এরকম অখণ্ড উপলব্ধির কবিতা। উদ্ভিদ্‌জীবনের, প্রাণীজীবনের, গৃহস্থজীবনের অনায়াস নিয়মকলায় যে কোমল পরিপূর্ণতা ব্যাপ্ত, তার কবিতা। অথচ জীবনের আরো গভীরে যে-কান্না, প্রেম অর্থ কীর্তি সচ্ছলতা সব-কিছুর পরেও যে বিপন্ন বিস্ময়ের আলোড়ন, সেই বিক্ষোভের কাব্যও।

সত্যিই আমাদের পৃথিবীর ছিলেন না কোনোদিন। মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির, সভ্যতার সঙ্গে শান্তির যে-সংঘর্ষে ক্রমেই হ'টে যাচ্ছে প্রকৃতি, ফুরিয়ে যাচ্ছে পৃথিবীর শৈশবস্বস্তি, সেই দ্বন্দ্বে বুনোহাঁস-হরিণ-শঙ্খচিলের মতো তিনিও অহরহ নিহত হচ্ছিলেন। যে-পৃথিবী 'প্রদাহ প্রবহমাণ যন্ত্রণা', তার ভয়াবহ আরতি এড়িয়ে 'অন্ধকারের সারাৎসারে' মিশে যাওয়ার ক্ষুব্ধ আকৃতিতে, অতএব কোনো অনৃততা ছিল না। জড় ও উদ্ভিদ্‌জগৎ নিয়ে প্রগাঢ় সংবেদনশীল কাব্য অবশ্য পৃথিবীর সাহিত্যে আজ পর্যন্ত অজস্র রচিত হয়েছে, কিন্তু জীবনানন্দ অনন্যতা ছুঁয়ে গেছেন এই কারণে যে তাঁর কাব্য নিছক সংবেদনার নয়, পরম অন্তর্বেদনার। 'কোনো নিবিড় ঘাসমাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার' থেকে নেমে জন্মলাভ করবার যে-আনন্দ, একটি কচি ঘাসের চেতনার সঙ্গে একীভূত হয়ে যেতে না-পারলে সেই অনুভূতির ঐরূপ শাণিত প্রকাশ অসম্ভব ব'লে মনে হয়। বিষয়কে নিজের কবিসত্তা থেকে জীবনানন্দ কখনো আলাদা ক'রে দেখেননি ; বিষয়কে আশ্রয় ক'রে একটি সম্পূর্ণ চেতনা

কল্পনা করেছেন, সেই চেতনাকে সম্মানের সঙ্গে পরিচর্যা করেছেন, সবশেষে মানবিক অনুভূমিকাতে সে চেতনার আন্তরিকতম প্রতিবিম্ব ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করেছেন। ('যেই সব শেয়ালেরা' কবিতাটি তাঁর কল্পনার এই অদ্ভুত প্রক্রিয়ার পরাকাষ্ঠার নিদর্শন হয়ে থাকবে)।

জীবন, পৃথিবী, প্রকৃতি, সব মিলিয়ে সব জড়িয়ে সব-কিছু অতিক্রম ক'রে যে-শান্তি, যে-শ্রান্তি : এ-সমস্ত বোধবিষাদের প্রসঙ্গ নিয়ে জীবনানন্দ বাংলা দেশের মফস্বলে কাব্যরচনা ক'রে গিয়েছিলেন। অনুভবের গভীরতার দিক থেকে বিচার করলে বাংলা সাহিত্যে তাঁর কাব্যের কোনো তুলনাই নেই। অথচ এ-স্বীকৃতি পাবার জন্য তাঁকে দীর্ঘ দিন ধ'রে কৃচ্ছ্রসাধনার সঙ্গে অপেক্ষা ক'রে থাকতে হয়েছে। 'প্রগতি' 'কল্লোলে'র উদ্দাম অধ্যায়ে জীবনানন্দের দিকে তাকাবার মতো অবসর কারো ছিল না। অনেক ব্যক্তিত্বশালী বিচিত্র পুরুষেরা তখন অঙ্গন মুখর ক'রেছিলেন : বরিশালের নির্জন আকাশ নিয়ে হিজিবিজি কল্পনাকাকলি তাই একপাশে চুপচাপ প'ড়ে থেকেছে। আরো বছর-দশেক বাদে 'কবিতা' পত্রিকাকে কেন্দ্র ক'রে যে আধুনিক কাব্য-আন্দোলন শুরু হ'লো, তারও প্রধান স্রোত থেকে তিনি বাদ প'ড়ে গেলেন। কারণটি স্পষ্ট। এ-কথা বললে এখন বোধহয় আর কোনো দ্বিরুক্তি হবে না যে নিতান্তই বিদেশী সাহিত্যের পরিমণ্ডল থেকে বাংলা কাব্যের সেই অধ্যায়ের মূল প্রেরণা এসেছিল। 'মননশীল' কাব্যরচনার ধুয়োতে হাওয়া তখন ভারি। তত্ত্ব এবং ভঙ্গি, দুয়েতেই চাতুর্য তথা পাণ্ডিত্যের রাজযোটক না-ঘটলে সে রচনা সার্থক নয়, এ-রকম একটা তুখোড় কানাঘুষোর কাল গেছে সেটা। আবেগপ্রধান, বিশুদ্ধ প্রেরণাধর্মী কবিতার প্রয়োজন ফুরিয়েছে, সহজ ক'রে সহজ কথাটা বলবার মতো বালখিল্যতা আর নয়—ইত্যাকার নানা অভিমত সেই দশকের কাব্য-সমালোচনাকে আচ্ছন্ন ক'রে ছিল। এরূপ দৃঢ়চক্র প্রতিকূলতার মধ্যে জীবনানন্দের কাব্যের কোনো ব্যাপক সমাদর হওয়া সম্ভব ছিল না। 'মাঝে-মাঝে ভালো উপমা দিয়ে থাকেন, কিন্তু ওসব ক'রে আর কী হবে।' বাঁকা ঠোঁটে এ-ধরনের অক্ষম উক্তি ক'রেই অনেক বিদগ্ধ সমালোচক নিজেদের কর্তব্য সুচারুসম্পন্ন ব'লে ভেবে নিয়েছিলেন। বালিশে মাথা রেখে যাঁদের ঘুমোবার, তাঁরা ঘুমিয়েই ছিলেন : একমাত্র সম্মানীয় ব্যতিক্রম বুদ্ধদেব বসু।

এই উন্নাসিক কাব্যদর্শনের অসারতা প্রমাণ হ'তে-হ'তে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রায় শেষ হয়ে এল। শুভবোধ যেহেতু কালজয়ী, সেই 'মননধর্মী-পর্বের খুব অল্পসংখ্যক কবিতাই সময়ের উচ্চাবচতা ডিঙিয়ে এখন পর্যন্ত বেঁচে আছে। অন্য পক্ষে, প্রতীক্ষার খিন্ন গোধূলিলগ্নে, তাঁর প্রাপ্যের সামান্য কিছু অংশ জীবনানন্দ পেতে লাগলেন চল্লিশের দশকের উপান্তে। যে-তরুণতরের দল প্রায় দশ-বারো বছর ধ'রেই তাঁর কাব্যের সঙ্গে সংগোপনে অভিসারব্রতী ছিল, সমকালীন প্রয়াসের নিষ্প্রাণ বিশুষ্কতায় ব্যাহত-বিক্ষত তারা, পূর্বসূরীদের বিচারকে পাশে ফেলে রেখে জীবনানন্দকেই শ্রেষ্ঠ ব'লে বরণ ক'রে নিলো তারা। জীবনানন্দ-চেতনা তাই বলতে গেলে মাত্র বিগত কয়েক বছরের ফল। কবিতার দেশ নাকি বাংলা, কিন্তু প্রায় কুড়ি বছর ধ'রে কবিপ্রতিভার প্রতি যে-অসম্মান জীবনানন্দের ক্ষেত্রে প্রদর্শিত হয়েছে, আমাদের সাংস্কৃতিক ধারার ইতিহাসে তা কলঙ্কের এক চরম চিহ্ন হ'য়ে থাকবে।

২

আঘাতের বেদনা আমাদের কাছে এতটা দুর্বিষহ লাগছে এই কারণেই : বরাবরই

অনুভব ক'রে এসেছি জীবনানন্দে একমাত্র আমাদেরই অখণ্ড অধিকার। আমরা এখন যারা তিরিশের এদিকে ওদিকে, জীবনানন্দ-বিভোর কৈশোর কেটেছে আমাদের সকলের। বৈয়াকরণেরা বিমুখ : তাঁকে আমরাই তো আবিষ্কার করেছিলাম আমাদের উপভোগের নিবিড়তা দিয়ে। সেই আবিষ্কারের বিস্ময়ের কোনো তুলনা নেই : যেন সব-ক'টি ইন্দ্রিয়ের যৌথ মধ্যবর্তিতায় নতুন একটি ভূমণ্ডলের সঙ্গে পরিচয় ঘ'টে গেলো। আমাদেরই পৃথিবী, প্রত্যহের স্পর্শ স্বাদ গন্ধের প্রত্যেকটি বিভঙ্গই উপস্থিত, অথচ নতুন ক'রে তাকে চিনতে শিখলাম। চেতনাতে কোনো মোহিনী মায়ার জাদু এসে লাগলো, স্নায়ুতে শিরায় তন্ত্রীতে আমূল কোনো বিপ্লব। অভ্যস্ত পরিচিত রূপ বদলে গেলো, রূপকথা হয়ে ফিরে এলো ; গন্ধে এলো শিহরিত বিভাস ; স্পর্শে পৃথক এক রোমহর্ষ। জীবনকে, মৃত্যুকে, কান্নাকে, কাব্যকে হৃদয়ের সঙ্গে জড়িয়ে নিতে শিখলাম : ঘাস আর শিশিরের জলের সঙ্গে দ্রবীভূত হ'য়ে মিশে গেলাম : কীটপতঙ্গ পশুপাখির হৃদয়রেখার গহনে আমরাও স্বতঃসিদ্ধতা হ'য়ে প্রবেশ ক'রে গেলাম যেন। চালের ধূসর গন্ধ-মাখা তরঙ্গ দু'বেলা যে নির্জন মাছের চোখে রূপ হয়ে ঝ'রে যায় তা আর আমাদের কাছে কষ্টকল্পিত তত্ত্ব হ'য়ে রইলো না, বিশ্বাসেরও আরো অনেক গভীরে, সেই অনুভব আমাদের চেতনায় রূপান্তরিত হ'লো। কৈশোরের সিঁড়িতে সদ্য-পা-দেয়া আমরা, জীবনানন্দের কাব্যে এক বিস্তীর্ণ সাম্রাজ্য আবিষ্কার ক'রে উল্লসিত, চকিত, অভিভূত হয়ে গেলাম। সে এক অদ্ভুত মমতা-মাখানো অধিকারবোধ, আজ পর্যন্ত তা অব্যাহত, সে-সাম্রাজ্য আমরাই প্রথম আবিষ্কার করেছিলাম, সে-সাম্রাজ্য সুতরাং আমাদের। শোকের এই নিদারুণ মুহূর্তে দাঁড়িয়েও এখনো সেই গর্ব।

৩

কিন্তু গর্ব ক'রেই বা কী হবে, আমাদের সম্পূর্ণ দায়িত্বের কতটুকুই বা আমরা পালন করেছি। তাঁর কাব্য নিয়ে মাতামাতি করেছি প্রচুর, অথচ ব্যক্তিহিসেবে তাঁকে প্রায় ভুলেই থেকেছি। বিগত সাত-আট বছর নানা কৃচ্ছ্রতার মধ্যে তাঁর কলকাতায় কেটেছে। বিভিন্ন অভিজাত সাহিত্যিকগোষ্ঠী কোনোদিনই তাঁকে গ্রহণ করেনি : লোকমঞ্চ থেকে দূরে, জীবনানন্দ চুপি-চুপি পালিয়ে বেড়াতেন কলকাতায়। তরুণতরদের মধ্যে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা অজস্র হওয়া সত্ত্বেও কাউকেই তাঁর কাছে তেমন যাওয়া-আসা করতে দেখা যেতো না। অথচ, স্বভাবগত প্রাথমিক জড়তাটি কাটিয়ে উঠলে, লোকসমাগমে জীবনানন্দ আনন্দ পেতেন, ভরসা পেতেন। এই হতভাগ্য দেশে, কবিকর্মের সঙ্গে আর্থিক সচ্ছলতার যেখানে নিশ্চিত আড়াআড়ি, অনুরাগী পাঠকদের মুগ্ধতাবোধের প্রত্যক্ষ, আন্তরিক জবানবন্দিও কবির তৃপ্তির পক্ষে অনেকখানি। অতটুকু অর্ঘ্যও তাঁকে দেয়া হয়নি।

আমাদের কয়েকজনের সঙ্গে গত চার-পাঁচ বছরের তাঁর একটি অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা-সম্বন্ধ গ'ড়ে উঠছিলো। চতুর পৃথিবীর কলরোলের ক্লান্তিকে পিছনে ফেলে রেখে নিমগাছের আশ্চর্য ছায়া-আঁকা উঠোনসম্পন্ন তাঁর বাড়িতে মাঝে-মাঝে গিয়ে হাজির হয়েছি। বারান্দার মেঝেতে হাঁটু মুড়ে বসতাম, নিমগাছের ডালের ফাঁক দিয়ে হয়তো জ্যোৎস্না এসে পড়তো—কী-এক জাদুবলে পৃথিবীর সমস্ত শব্দ ডুবে যেতো—অনেক সরল প্রাণখোলা গল্প হ'তো তাঁর সঙ্গে। পর্যাপ্ত খুশির একটা আমেজ ছড়িয়ে পড়তো চারদিকে। কোনো কথার প্রসঙ্গে রহস্যের ইঙ্গিত দিয়ে হঠাৎ প্রাণবন্ত হেসে উঠতেন তিনি, কৌতুকে চোখ দুটি নৃত্য ক'রে উঠতো। যতবারই গেছি কৃতজ্ঞ অন্তরে ফিরে এসেছি :

প্রত্যেকবারই মনে হয়েছে, যেন পৃথিবীর নিষ্পাপ বিস্ময়ের শৈশব থেকে আনন্দ আহরণ ক'রে এলাম।

অথচ, করুণ আক্ষেপ হয় এখন, খুব বেশিদিনও যাইনি। বহুবিধ নাগরিক উত্তেজনায় ব্যস্ত আমরা, কবিদর্শন তো এর মধ্যে বিরলতম ব্যাপার ঃ বিবেকের কাছে আজীবন এখন জবাবদিহি দিয়ে যেতে হবে। তাছাড়া আরো মনে হয়, তাঁর জাগতিক সুখসংবিধানের জন্য আমাদের কিছু দায়িত্ব নিশ্চয়ই ছিল, কিন্তু সে-দায়িত্ব মেটাবারও তেমন কোনো তন্নিষ্ঠ চেষ্টা আমরা করিনি।

'সূর্যের আলোয় তার রং কুঙ্কুমের মতো নেই আর ; হয়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো' এ-রকম একটি উপমাও যিনি কল্পনা করতে পেরেছেন, তাঁর আসন মহত্তম কবির পর্যায়ে ঃ আন্তরিকতার উৎসাহে এ ধরনের কথা বহুবার চেঁচিয়ে ব'লে বেড়িয়েছি। এই মতের সপক্ষে অনেককিছু বলবার ছিল, আছে—হয়তো মনে-মনে ভাবাও ছিল সে-সব কথা—কিন্তু আমাদের উৎসাহ, স্বীকার করতেই হয়, আজ পর্যন্ত তেমন সুষ্ঠু দানা বাঁধেনি। আমাদের আন্দোলনে অধিকতর ঋজুতা আর দার্ঢ্য থাকলে হয়তো বা মৃত্যুর আগে জীবনানন্দকে তাঁর প্রাপ্য সম্মানের একটি বৃহৎ অংশই কৃতজ্ঞ নম্রতার সঙ্গে সাজিয়ে নিবেদন করতে পারতাম।

জীবিকানির্বাহের তাড়নায় প্রবাসে প'ড়ে থাকবো। দু'বছর-তিন বছর বাদে অল্প কয়েকদিনের জন্য কলকাতায় আসবো, দেশপ্রিয় পার্কের কোণে বাস থেকে নামবো, ট্রাম-লাইনের দিকে চোখ পড়ামাত্র ছলাৎ ক'রে উঠবে হৃদয় ; আকাশে ঝিকিমিকি শরতের রোদ্দুর, নিজের বিবেকের কাছে আরেকবার মাথা হেঁট হবে।

জীবনানন্দ দাশ

দীপংকর দাশগুপ্ত

মাটি পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,
না এলেই ভালো হ'তো অনুভব ক'রে ;
এসে যে গভীরতর লাভ হ'লো সে-সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ;
দেখেছি যা হ'লো হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।

সুচেতনা। জীবনানন্দ দাশ ।।

প্রতিভার চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়ে প্রাপ্য খ্যাতির শিখরে অধিষ্ঠিত থাকতে থাকতেই যিনি জীবনকে পিছনে ফেলে চ'লে যান তিনি একদা-প্রতিভাধর কবির ঈর্ষাভাজন। যাঁর প্রতিভা নিঃশেষিত—অর্থাৎ যাঁর কাছ থেকে আর কিছুই পাবার আশা নেই, পরবর্তী জীবনে তিনি বেঁচে থাকেন শুধু মানুষ হিসেবেই, তখন তিনি কবি, সাহিত্যিক কি শিল্পী নন। এর লোকশ্রুত উদাহরণ ইংরেজ কবি ওঅর্ডস্বার্থ।

কিন্তু জীবনানন্দ এর ব্যতিক্রম। আমরা তাঁকে ঠিক তখনই হারালাম, সাতটি তারার তিমির-এর পর যখন তাঁর কাব্য অন্য পটভূমির সন্ধান পেয়েছে, যখন তিনি ক্লেদাক্ত বিকারগ্রস্ত জীবনকে অতিক্রম করবার অপারসেতু মানবমনে খুঁজে পেয়েছেন। এর চেয়ে আক্ষেপের আর কী থাকতে পারে?

তিরিশের যুগে রবীন্দ্রাশ্রিত কাব্যমণ্ডলে কিছুটা হাওয়াবদল হয়েছিলো—যাকে আমরা বিশেষ এক অর্থে আধুনিক কাব্যধারার সূত্রপাত বলতে পারি। এর জন্য যে-কজন কবির কাছে বাঙলাকবিতা ঋণী জীবনানন্দ তাঁদের মধ্যে বিশিষ্ট। অগ্রজ কবিদের মধ্যে সম্ভবত তিনিই একমাত্র যিনি সর্বত্রপাবী রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষপ্রভাব বর্জিত। শুধু তাই নয়, রবীন্দ্রনাথ অদ্যাবধি বাঙলা সাহিত্যের সিদ্ধিদাতা গণেশ, তৎসত্ত্বেও জীবনানন্দর বাক্যকলা তরুণ-কবিদের এমনভাবে প্রভাবান্বিত করেছে যে সেটা বিস্ময়ের।

প্রথম দিকে তাঁর অনুরাগীর সংখ্যা ছিলো স্বল্প, এর কারণ নিঃসন্দেহেই তাঁর ব্যবহৃত উপমা, প্রতীকিতা এবং বাগভঙ্গির অভিনবত্ব, যার সূক্ষ্ম সৌন্দর্য এবং তাৎপর্য তৎকালীন সাধারণ পাঠকের কাছে অস্পষ্ট ছিলো। ফলত স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের অভিনন্দন লাভ করা সত্ত্বেও, তাঁকে বিরূপ সমালোচনার সম্মুখীন হ'তে হয়েছে। আর আজ বোধহয় আধুনিক কবিদের মধ্যে তাঁর কবিতাই সর্বাধিক পঠিত। তবু একটা সন্দেহ মনে থেকেই যায় যে জীবনানন্দ যে-পরিমাণে অনুকৃত হয়েছেন, হয়তো সে পরিমাণে অনুধাবিত হন নি। তাই যদি না হতো, জীবনানন্দকে নিয়ে পূর্ণাঙ্গ আলোচনা এতদিনে নিশ্চয়ই চোখে পড়তো। একমাত্র বুদ্ধদেব বসু ছাড়া জীবনানন্দর কবিতা নিয়ে আন্তরিক আলোচনা আর কেউ

করেছেন ব'লে জানা নেই। এটা দুঃখের কথা। অন্তত বাঙলাদেশের অধ্যাপকদের তো বৈদগ্ধের খ্যাতি আছে।

যৎসামান্য আলোচনা ইতস্তত যা চোখে পড়েছে তাতেও দেখি বিভিন্ন সমালোচক তাঁকে বিভিন্ন নামে চিহ্নিত ক'রে সমালোচনার দায়মুক্ত হয়েছেন, তাতে এই লাভ হয়েছে যে জীবনানন্দর মনোবিভঙ্গ সাধারণ পাঠকের কাছে সুস্পষ্ট হওয়া দূরে থাক, তাঁর কাব্য আরো কুয়াশায় আচ্ছন্ন হয়েছে। কবিকে কোনো বিশেষ নামে আখ্যাত করলে তাঁর কাব্যের রসগ্রহণে বাধা জন্মায়, এমনকি বিভ্রান্তিরও সৃষ্টি হ'তে পারে। এ-সম্পর্কে জীবনানন্দ নিজেই সচেতন ছিলেন। তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতার ভূমিকায় লিখেছেন ঃ 'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম আখ্যা দেওয়া হয়েছে ; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার ; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী ; সম্পূর্ণ অবচেতনার ; সুররিয়ালিস্ট।... প্রায় সবই সত্য—কোনো কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।' বস্তুত মহৎ কবিকৃতির লক্ষণই এই ; বিচিত্র অভিজ্ঞতা চেতনা আর ধ্যানধারণার সাজুয্য এবং ফলশ্রুতিই মহৎ কাব্যের দেহ ও আত্মস্বরূপ।

তিনি আরও বলেছেন ঃ 'কবিতা ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তিমনের ব্যাপার ; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ-তারতম্যের ; সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হ'তে হয়।' শেষোক্ত উদ্ধৃতির শেষ পঙক্তিটি সম্পর্কে সমালোচকদের অবহিত হ'তে অনুরোধ করি।

মানুষ জীবনানন্দকে আমরা হারিয়েছি কিন্তু কবি জীবনানন্দ চিরকালীন—তিনি বেঁচে রইলেন তাঁর কবিতার মধ্যে। প্রথম প্রকাশ থেকেই শতভিষা তাঁর অকৃপণ স্নেহলাভে ধন্য হয়েছিলো, এই স্নেহ শতভিষার অমূল্য পাথেয় হ'য়ে রইলো।

জীবনানন্দের চার-অধ্যায়

অশ্রুকুমার সিকদার

জীবনানন্দের কবিতার সালতারিখের ব্যাপারটা খুব গোলমেলে। তাঁর বইয়ে রচনাকাল দেওয়া নেই। কালগত ক্রমান্বয় বজায় রেখে কবিতা বইতে সাজানো নেই, আবার রচনার ক্রম অনুযায়ী বইগুলোও প্রকাশিত হয়নি তাঁর। একই সময়ের কবিতা নানা বইয়ে ছড়িয়ে আছে। যেমন ১৯৩৬-এ প্রকাশিত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র রচনাকাল ১৯২৬-১৯৩০, ১৯৪৪-এ প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী'র রচনাকাল ১৯২৯-১৯৪২, আবার ১৯৪৮-এ প্রকাশিত 'সাতটি তারার তিমির'-এর রচনাকাল পাচ্ছি ১৯২৮-১৯৪৪। চল্লিশের দশকে লেখা কিছু কবিতা আছে 'মহাপৃথিবী'তে, কিছু 'সাতটি তারার তিমিরে', আবার কিছু মৃত্যুর পরে প্রকাশিত 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য়। অন্য ব্যাপারেও নানা অব্যবস্থিততার পরিচয় মেলে। নতুন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে আদি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র সমকালীন কিছু 'ধূসরতর' কবিতা সংযুক্ত করা হয়েছে। নাভানা সংস্করণ শ্রেষ্ঠ কবিতা প্রকাশকালে কবির জীবদ্দশায়, এবং পরেও, কিছু গ্রন্থাকারে অপ্রকাশিত কবিতা গৃহীত হয়েছিল। 'বনলতা সেন' কবিতাভবন-সংস্করণের বারোটি কবিতার সব কয়টি ১৯৪৪-এ প্রকাশিত 'মহাপৃথিবী'-র অন্তর্গত হয়েছিলো। কবির জীবদ্দশায় যখন সিগনেট-কর্তৃক 'বনলতা সেন' আলাদা বই হিসেবে বেরোল ১৯৫২ সালে, তখন সেই বারোটি কবিতার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে আরো আঠারোটি অন্য কবিতা যোগ করা হয়েছিল। তাই 'মহাপৃথিবী'-র যখন নতুন সিগনেট সংস্করণ বেরোল তখন সিগনেট-সংস্করণ 'বনলতা সেন'-এর অন্তর্গত আদি 'মহাপৃথিবী'-র বারোটি কবিতা বর্জিত হলো এবং বইটির পূর্ববৎ আকার দেবার জন্যে শূন্যস্থান পূরণে গৃহীত হলো উনিশটি তৎকালে লেখা কবিতা। আজো বিভিন্ন সময়ে লেখা তাঁর অনেক কবিতা ছড়িয়ে আছে গ্রন্থিত হবার অপেক্ষায়। এই সব অসংলগ্নতা, যদিও মনে হয় জীবনানন্দের পক্ষে চারিত্রিক এবং অনিবার্য, তবু তাঁর কবিতার পরম্পরা ধরার পক্ষে অসুবিধার সৃষ্টি করে। সেই পরম্পরাসূত্র ঠিকমতো না মেলায় তাঁর কবিতার 'বিপুলজটিল' অভিজ্ঞতা কী ভাবে স্তর থেকে স্তরান্তরে সন্ন্যস্ত হলো, কী ভাবে উন্মেষিত হলো তাঁর জগচ্চিত্র তা বুঝে নিতে সময় নেয়।

এই অসুবিধা অতিক্রম করার উপায় হচ্ছে বাইরে থেকে সনতারিখের হদিস না খুঁজে উল্টো দিক থেকে এগোনো, অর্থাৎ কবিতার ভিতরের দিক থেকে তাকানো। যতোক্ষণ পর্যন্ত কোনো তন্নিষ্ঠ গবেষক 'মাংস কৃমি' খুঁটে সেই কালানুক্রমিকতার পুরো চেহারাটা স্পষ্ট করে না দিচ্ছেন, ততোদিন ভিতরের দিকে তাকানোই ভালো। আমি অবশ্য সমসাময়িক উল্লেখের সূত্র ধরে আভ্যন্তরীণ প্রমাণ যোগাড় করার কথা ঠিক বলছি না। আমি বলছি জগচ্চিত্রে ক্রম-উন্মেখ বুঝে নিয়ে তার থেকে তারিখের ইশারা খুঁজে নেবার কথা। এই প্রসঙ্গে উদ্ধৃত করি নাভানা প্রকাশিত 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা'-য় কবির

ভূমিকা। তিনি লিখেছিলেন 'আমার কবিতাকে বা এ-কাব্যের কবিকে নির্জন বা নির্জনতম অ্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে ; কেউ বলেছেন, এ-কবিতা প্রধানত প্রকৃতির বা প্রধানত ইতিহাস ও সমাজ-চেতনার, অন্য মতে নিশ্চেতনার ; কারো মীমাংসায় এ-কাব্য একান্তই প্রতীকী ; সম্পূর্ণ অবচেতনার ; সুররিয়ালিস্ট। আরো নানা রকম আখ্যা চোখে পড়েছে। প্রায় সবই আংশিকভাবে সত্য—কোনো-কোনো কবিতা বা কাব্যের কোনো-কোনো অধ্যায় সম্বন্ধে খাটে ; সমগ্র কাব্যের ব্যাখ্যা হিসেবে নয়।' এই উক্তি থেকে বোঝা যায় তাঁর রচনাবলীকে জীবনানন্দ একটি কাব্য হিসেবে বিবেচনা করতেই অভ্যস্ত ছিলেন! সমগ্র রচনাবলীর এক-একটি কালগত পর্যায় যেন এক-একটি অংশ বা অধ্যায়। আমরা যদি কবিতার ভিতরের দিকে মনোযোগ দিয়ে ভাবনা, কল্পনা, প্রকরণের সূত্র ধরে এগিয়ে সেই অধ্যায়গুলো শনাক্ত করতে পারি, তাহলে প্রত্যেকটি কবিতার সঠিক তারিখ নির্ণয় করতে পারবো না বটে, কিন্তু বিশেষ কবিতাটি কাব্যের কোন্ অধ্যায়ের কোন্ গুচ্ছের অন্তর্গত তা চিনে নিতে পারবো। মনে হয় তাতে মোটামুটি একটা সময়ও বুঝে নেওয়া যাবে। অন্তত বহিরঙ্গ কালের সঙ্গে যদি সেই শনাক্তকরণ মিলে নাও যায়, কবির অন্তরঙ্গ কালের সঙ্গে তা খাপ খেয়ে যাবে। জীবনানন্দকাব্যের সেই অধ্যায় নির্ণয়ের কাজে প্রথমেই বাদ দিচ্ছি 'ঝরাপালক' বইকে। সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুল প্রভাবিত ঐ কাব্যের রচনাকাল পরিধি সুপরিচিত, তাছাড়া জীবনানন্দের 'স্বতন্ত্র সারবত্তা'-র উন্মেষ ঐ কাব্যে শুরুও হয়নি।

'এই পৃথিবীতে এক স্থান আছে'

স্থানচিত্রের অনুপুঙ্খ রচনায় জীবনানন্দের মতো কুশলী বিরল। খুঁটিনাটির নিখুঁত সমাবেশে তিনি দৃশ্যচিত্রকে মূর্ত তথা শরীরী করে তুলতে পারেন, এক লহমায় আঁকা একটি রেখায় দিতে পারেন অবিস্মরণীয় অবয়বত্ব। জীবনানন্দের কাব্যের প্রথম অধ্যায়ের কবিতাগুলো এই ব্যাপারে, অর্থাৎ বস্তুজগৎকে বিশ্বাস্য করে তোলায়, বড় পরিপাটি। ভূবিশ্বের যে খণ্ডে আকস্মিক ভাবে তাঁর জন্ম, সেই ভূখণ্ডের তদ্‌গত বর্ণনায় তিনি সেই দেশকে চিনিয়েছেন ; তার অস্তিত্বে তিনি আমাদের গভীরভাবে আস্থাবান করে তুলেছেন। যেমন রিয়ালিস্ট করেন—রিয়ালিস্টের কাজই হলো যে বস্তুজগতে আমরা বসবাস করি তাকেই আরো বিশ্বাস্য করে তোলা। বস্তুবাদীর বর্ণনা পড়ে আমরা বলি, 'এই তো আমাদের চিরচেনা চরাচর!' অবশ্য এই অধ্যায়ের জীবনানন্দকে রিয়ালিস্ট না বলে ন্যাচারালিস্ট বলাই বরং ভালো—এবং দুই অর্থে। সাহিত্যসমালোচনায় যাদের ন্যাচারালিস্ট বলা হয় তাদের মতো তাঁর দৃষ্টিও অনুপুঙ্খের দিকে, সামগ্রিকতার দিকে নয় খাঁটি রিয়ালিস্টদের মতো। দ্বিতীয়ত তিনি ন্যাচারালিস্ট, প্রকৃতিপ্রেমী বলে।

'রূপসী বাংলা'-র প্রায় সব রচনাই এই জাতের। এখানে 'নরম ধানের গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ, হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা, সরপুঁটিদের ঘ্রাণ, মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোওয়া ভিজে হাত...।' এক স্পর্শগন্ধময় চিত্রল জগৎকে আমরা প্রত্যক্ষ করি। ঝরে পড়া পাতা এবং সবুজ ঘাসের মধ্যে 'সিঁদুরের মতো রাঙা লিচু' এই কবির চোখ এড়ায় না, এবং তিনি দেখেন—

> অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
> চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নিচে বসে আছে
> ভোরের দোয়েল পাখি...।

শ্যাওলা-সবুজ দামপানায়-ঢাকা বাংলার পুকুরকেন্দ্রিক গ্রামজীবনের ছবি এই সব। বিরল শব্দরেখায় আঁকা কিন্তু ইমেজের কী বহুলতা, কী উজ্জ্বলতা! ছায়াচ্ছন্নতা এবং উদ্ভিজ্জ গন্ধ চিনে নিতে ভুল হয় না, অনুপুঙ্খ দিয়ে দৃশ্যকে সাকার ও শরীরী করে তোলায় এতই তিনি দক্ষ।

১. যখন পুকুরে হাঁস সোঁদা জলে শিশিরের গন্ধ শুধু পায়,
শামুক গুগলিগুলো পড়ে আছে শ্যাওলার মলিন সবুজে...।

২. দীঘির জলের গন্ধে রূপালি চিতল তার রূপসীর পিছু
জামের গভীর পাতা-মাখা শান্ত নীল জলে খেলিছে গোপনে...।

আর, এই সব সশরীরী ছবি—'কাঁচা কাঠ জ্বলে ওঠে—নীল ধোঁয়া নরম মলিন বাতাসে ভাসিয়া যায় কুয়াশার করুণ নদীর মতো ক্ষীণ...', শান্ত মনে পূর্বস্মৃতি মন্থন করে পাওয়া নয়। এই সনেটকল্প রচনাগুলি মধুসূদনের চতুর্দশপদীর মতো প্রবাসে বঙ্গের সঙ্গীত নয়। কারণ বাংলার 'এই পথ ছেড়ে দিয়ে এ-জীবন কোনোখানে গেল নাকো' এবং 'কোনোদিন রূপহীন প্রবাসের পথে বাংলার মুখ ভুলে খাঁচার ভিতর নষ্ট শুকের মতন কাটাই নি দিন মাস...।' এই সব ছবি—'আঙিনা ভরিয়া আছে সোনালী খড়ের ঘন স্তূপে—সবই যেন সদ্যোজাত, বাংলার মুখ দেখে তৎক্ষণাৎ সেই আদলে আঁকা।'

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-রও অনেক কবিতা এই অধ্যায়ের মধ্যে পড়ে, কারণ সেখানেও 'চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান' (অবসরের গান)। হেমন্তের প্রত্যক্ষ কী ম্লান ছবি তিনি আঁকেন 'হেমন্ত বিয়ায়ে গেছে শেষ ঝরা মেয়ে তার সাদা মরা শেফালীর বিছানার পর', 'বরফের মত চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা'। প্রকৃতিবাদী এই কবির অনুপুঙ্খের প্রতি কী নিবিষ্ট নজর।

চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে,—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা,—কড়্ কড়্।
শসাফুল,—দু একটা নষ্ট শাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল—শুকনো মকড়্সা
লতায়-পাতায়—
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায়...। (পঁচিশ বছর পরে)

রবীন্দ্রনাথ যে কবিতাকে 'চিত্ররূপময়' বলেছিলেন, সেই 'মৃত্যুর আগে' কবি তাতে বহিরঙ্গ পৃথিবীরই স্বপ্নাচ্ছন্নতা ধরা পড়েছে। এখানে 'যে সবুজ বাতাস'-এর কথা আছে তাও বস্তুতন্ত্র থেকে খুব কিছু বিচ্যুতি মনে হবে না, যদি ইমপ্রেশনিস্টদের ছবিতে রঙ্ ব্যবহারের কথা মনে রাখি। একই কারণে 'শিকার' কবিতায় দেখি 'আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল', 'পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ', ভোর আকাশের শেষ তারাটি 'পাড়াগাঁর বাসরঘরে সব চেয়ে গোধূলি মদির মেয়েটির মতো', আর আগুনের রঙ্ মোরগফুলের মতো লাল।

নতুন সংস্করণ 'মহাপৃথিবী' এবং 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র এই বাস্তবিক ছবিটাও কি ঐ অধ্যায় থেকে তুলে আনা?

গোরুর গাড়িটি কার খড়ের সুসমাচার বুকে।
লাল বটফলে থ্যাঁতা মেঠোপথে জারুল ছায়ার নিচে নদীর সুমুখে

কতক্ষণ থেমে আছে ; চেয়ে দ্যাখো নদীতে পড়েছে তার ছায়া ;
নিঃশব্দ মেঘের পাশে সমস্ত বিকেল ধরে সে-ও যেন মেঘ এক, আহা,
শান্ত জলে জুড়োচ্ছে...। (জর্ণাল ঃ ১৩৪৬)

কিংবা সিগনেট সংস্করণ 'বনলতা সেন'-র এই ছবি—

সেই ব্যাপ্ত প্রান্তরে দুজন ; চারিদিকে ঝাউ আম নিম নাগেশ্বরে
হেমন্ত আসিয়া গেছে;—চিলের সোনালি ডানা হয়েছে খয়েরি ;
ঘুঘুর পালক যেন ঝরে গেছে—শালিকের নেই আর দেরি
হলুদ কঠিন ঠ্যাং উঁচু করে ঘুমোবে সে শিশিরের জলে,
হলুদরঙের শাড়ি, চোরকাঁটা বিঁধে আছে, এলোমেলো অঘ্রাণের খড়
চারিদিকে শূন্য থেকে ভেসে এসে ছুঁয়ে ছেনে যেতেছে শরীর ;
চুলের উপর তার কুয়াশা রেখেছে হাত, ঝরিছে শিশির ;—(দুজন)

আর একটা লক্ষ্য করার ব্যাপার আছে। এই সব দৃশ্য হয় শুধুই দৃশ্য, নতুবা, উপমায় সাদৃশ্য আনে। হয় প্রত্যক্ষ ছবি, নয় দৃশ্যে দৃশ্যে যোগ করে 'মতো' 'মতন' এই সব সাদৃশ্যবাচক অব্যয়। উপমার এই অনর্গল ব্যবহার প্রমাণ করে ন্যায়শৃঙ্খল ভেঙে যায় নি এখনো, যেমন জগতে তেমনি কার্যকারণসূত্রেও তিনি আস্থাশীল।

আর জগতের যে কোণাটিকে বেছে নিয়ে তিনি সেই আস্থা প্রকাশ করেছেন, সেই ভূখণ্ডকে সাকার করার জন্যেই বোধহয় তাঁর প্রথম অধ্যায়ের কবিতায় দেশজ শব্দের এমন ব্রীড়াহীন দ্বিধামুক্ত ব্যবহার। মন্ত্রবর্জিত ব্রাত্য এই সব শব্দকে অন্য কবিরা যখন আঙুলের ডগা দিয়েও ছুঁয়ে দেখলেন না তখন জীবনানন্দ সাদরে সেই সব গ্রাম্য অপজাত ইতর শব্দকে ডেকে নিলেন। সেই সব, বুদ্ধদেব বসু যাদের বলেছেন 'ভদ্রসমাজে অনুচ্চার্য', বা কোনোরকমে-উচ্চার্য শব্দ। আর সেই জন্যেই হয়তো জীবনানন্দের হাতে বাংলাদেশ যেমন শরীরী হলো, তেমনটি আর কারো কবিতায় হলো না। এই সব উল্লেখে গ্রামবাংলা জ্যান্ত হয়ে উঠেছে—লাল শাক, নারকেল নাড়ু, কচি তালশাঁস, শসালতা, সজিনার ফুল, ফেনসাভাত, ধুন্দুললতা, মুথাঘাস, ডাঁসা আম, ভেরেণ্ডা ও কামরাঙা ফুল, বাব্‌লা, বৈঁচি, হোগলা, কাশ। আর এই সব দেশজ শব্দ যা জীবনানন্দের অনর্গল—ফোঁপরা, ছেঁড়াফাড়া, সোহাগ, ব্যাং, ন্যাড়া, নিঙড়ানো, ফেঁসে যাওয়া, ধলা, ছিরি, ফিক করে হাসা, বিয়োবার, কুঁড়েমি, আইবুড়, রগড়। পরিচিত জগতের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠভাবে পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যেই তিনি নিশ্চয় এই সব নিত্যব্যবহৃত শব্দ ব্যবহার করেছিলেন।

কিন্তু এই বর্ণাঢ্য বস্তুজাগতিক বর্ণনায় আস্থা ঈষৎ টলে যায় যখন মাঝে মাঝেই মিলতে থাকে অন্য ধরনের কিছু শব্দ, কিছু বাক্যাংশ। সেই শব্দ বা বাক্যাংশ স্থিতাবস্থার বাইরে থেকে আসা। হঠাৎ হঠাৎ পেয়ে যাই 'বেদনার গন্ধ', 'আকাঙ্ক্ষার রক্ত অপরাধ-এর কথা, 'আকাঙ্খার উদঘাটন', 'উদ্ভাসিত স্বর' এবং 'গাঢ় বিষণ্নতা'র কথা। তাই জীবনানন্দের কবিতা সম্বন্ধে অমিয় চক্রবর্তীর কথা ('প্রসন্ন বেদনায় কোমল উজ্জ্বল') হয়তো পুরো মেনে নেওয়া যায় না। কেননা শ্যামল বাংলা নিসর্গের কথায় বারবার এসে যায় 'রুক্ষ প্রশ্ন', 'রূঢ় কথা', 'রূঢ় মনুমেন্ট' এবং 'রূঢ় কোলাহল'-এর কথা। কোমল-প্রসন্ন বেদনার মধ্যে এই রূঢ়তা-রুক্ষতার ঘা পেয়ে খুঁজলে, একটা অপ্রত্যাশিত সংবাদ পেয়ে যাই আমরা। সেই সংবাদ হলো রূপসী বাংলার স্বর্গোদ্যানে শয়তান প্রবেশ করেছে। শুধু এই নয় যে, শ্যামলসুন্দর বঙ্গ-প্রকৃতির এই চেহারা থাকবে না, তার চেয়েও বড়, অস্তিত্বের অনিবার্য

পরিণাম একটা স্থায়ী অনিত্যতার ভাবনা আচ্ছন্ন করে রাখে। তাই শ্মশান, শবদেহ, চিতার অনুষঙ্গ আসে অবিরল।

১. যেইখানে কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দনচিতায় চড়ে...।

২. রূপসীরা আজ আর আসে নাকো, পাট শুধু পচে অবিরল,
সেইখানে কলমীর দামে বেঁধে প্রেতিনীর মতন কেবল
কাঁদিবে সে সারারাত,—দেখিবে কখন কারা এসে আমকাঠে
সাজায়ে রেখেছে চিতা...।

৩. হৃদয়ে প্রেমের দিন কখন যে শেষ হয়—চিতা শুধু পড়ে থাকে তার...

৪. কবে যেন তারে আমি দেখিয়াছি—কবে যেন রাখিয়াছে হাতে
তার হাত—কবে যেন তারপর শ্মশানচিতায় তার হাড়
ঝরে গেছে, কবে যেন...।

মৃত্যুর এই অনিবারণীয়তার কথা পাচ্ছি 'বনলতা সেন' সংকলনেও। সেদিন 'খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষীয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—গান গায়—গান গায়/এই দুপুরের বাতাস', যখন 'একটা ধবল চিতল হরিণের ছায়া/আতার ধূসর ক্ষীরে গড়া মূর্তির মতো/নদীর জলে/সমস্ত বিকেল ধরে/স্থির।' তখন,

মাঝে মাঝে অনেক দূর থেকে শ্মশানের চন্দন কাঠের চিতার গন্ধ,
আগুনে ঘিয়ের ঘ্রাণ...। (আমাকে তুমি)

'শঙ্খমালা'-র 'স্তন তার/করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আৰ্দ্র' কিন্তু 'কড়ির মতন শাদা মুখ তার,/দুইখানি হাত তার হিম ;/চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম/চিতা জ্বলে ; দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়/সে আগুনে হায়।'

যদিও প্রথম অধ্যায়েই জীবনানন্দ একবার জিজ্ঞাসা করেছিলেন 'মৃত্যুরে কে মনে রাখে?' কিন্তু দেখা যাচ্ছে মৃত্যুচৈতন্য সব সময় জাগরূক, কারণ 'শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ'। বাস্তবিকের অনুপুঙ্খ বর্ণনায় তিনি যে সুখী হতে পারছেন না, তাঁর ইন্দ্রিয়োপলব্ধির আড়াল থেকে জেগে উঠছে এক ইন্দ্রিয়াতীত উপলব্ধি, এক তৃতীয় চক্ষু—তারই আভাস আছে এই সব বর্ণনায়। তৃতীয় চক্ষুর অস্বাভাবিক দ্যুতি দিয়েই তিনি দেখেন, 'অনেক কুকুর আজ পথেঘাটে নড়াচড়া করে/তবুও আঁধারে ঢের মৃত কুকুরের মুখ—মৃত বিড়ালের ছায়া ভাসে।' তাহলে এক অধ্যায় শেষ হয়ে এলো।

'পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি
বদলায়ে ফেলে দিয়ে তবুও পৃথিবী'

'মনে হয়/কারা যেন বড় বড় কপাট খুলছে,/বন্ধ করে ফেলছে আবার ;/কোনো দূর—নীরব—আকাশরেখার সীমানায়' (শ্রাবণরাত)। সেই সব বড় বড় কপাট খুলে-খুলে, ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ জগতের পর্দা সরিয়ে-সরিয়ে 'দুই স্তর অন্ধকারের ভিতর ধূসর মেঘের মতো' জীবনানন্দ প্রবেশ করলেন অন্য জগতে, বাস্তবের পিছনে বাস্তবের চেয়ে বেশি অতিবাস্তব জগতে।

কারা এসে বলে গেল : 'নেই
গাছ নেই—রোদ নেই—মেঘ নেই—তারা নেই—আকাশ তোমার
তরে নয়! (নদীরা)

তাই দুই চোখে দেখা বস্তুপৃথিবী নয়, গাছ নয়, রোদ নয়, মেঘতারা নয় ; তৃতীয় নেত্র দিয়ে দেখা সুররিয়াল জগৎ এলো জীবনানন্দ-কাব্যের দ্বিতীয় অধ্যায়ে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তেই অন্তশ্চক্ষুর অধিকারী কবি আত্মপরিচয় দিয়েছেন, 'কেউ যাহা জানে নাই—/কোন এক বাণী—/আমি বহে আনি,/একদিন শুনেছ যে-সুর—/ফুরায়েছে—পুরানো তা—কোনো এক নতুন কিছুর আছে প্রয়োজন,/তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন/আর নাই কেউ' (কয়েকটি লাইন)। কিন্তু নতুন কিছুর চাহিদা পূরণের জন্যেই শুধু তিনি এসেছেন একথা মানা যায় না ; এই পরাদৃষ্টির উন্মেষ ভিতর থেকেই হয়েছে অনিবার্য অন্তর্গত তাড়নায়, কোনো বাইরের দাবীতে নয়। কবির নিজেরই স্বীকৃতি আছে অন্য কবিতায়—

> আমারে দিয়েছ তুমি হৃদয়ের যে এক ক্ষমতা
> ওগো শক্তি,—তার বেগে পৃথিবীর পিপাসার ভার
> বাধা পায়, জেনে লয় নক্ষত্রের মতন স্বচ্ছতা!
> আমারে করেছ তুমি অসহিষ্ণু—ব্যর্থ—চমৎকার!
> জীবনের পার থেকে যে দেখেছে মৃত্যুর ওপার,
> কবর খুলেছে মুখ বারবার যার ইশারায়,...। (অনেক আকাশ)

বিখ্যাত 'বোধ' কবিতায় সেই চৈতন্যের কথা বলেছেন যার প্রভাবে চেনাজগৎ অচেনা হয়ে যায়—অ্যাবসার্ড হয়ে যায়—জগৎসংসারের সঙ্গে পরিচয়সূত্রগুলো খসে খসে যায়।

> আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
> স্বপ্ন নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে!
> স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
> হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
> আমি তারে পারি না এড়াতে,
> সে আমার হাত রাখে হাতে,
> সব কাজ তুচ্ছ মনে হয়,—পণ্ড মনে হয়,
> সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
> শূন্য মনে হয়
> শূন্য মনে হয়।

সেই তৃতীয় চক্ষুর সম্বন্ধবন্ধনগুলো খুলে যায়, পীড়িত হতে হয় বিচ্ছিন্নতাবোধে—'সকল লোকের মাঝে বসে/আমার নিজের মুদ্রাদোষে/আমি একা হতেছি আলাদা?' বিচ্ছিন্ন ; কেন না সাধারণ মানুষ যখন জগতের স্থূলবাস্তব চেহারা দেখে তখন কবির পরাবাস্তব দৃষ্টিতে জগৎ হারিয়ে ফেলে তার স্থূলতা। 'বোধ' কবিতার নায়ক অন্য সব মানুষের মতো বালটিতে জল টেনেছে, কাস্তে হাতে মাঠে গিয়েছে, 'মেছোদের মতো আমি কত নদীঘাটে/ঘুরিয়াছি'—তবুও সে আলাদা ;—ঐ বোধের জন্যেই আলাদা, ঐ বোধের জন্যেই 'অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?/কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ/পাবে নাকি? পাবে না আহ্লাদ/মানুষের মুখ দেখে কোনোদিন!/মানুষীর মুখ দেখে কোনোদিন!/শিশুদের মুখ দেখে কোনোদিন!'

একজন অস্তিবাদী মনে করেন জগৎ যে অ্যাবসার্ড তার প্রমাণ আত্মহত্যায় ; জগতের অ্যাবসার্ড চেহারা যখন স্পষ্ট হয়ে যায় তখন একমাত্র আত্মহত্যাতেই নিস্তার। জীবনানন্দের

কাছে অনিত্যতা এবং নশ্বরতাই সব চেয়ে বড় প্রমাণ যে জগৎ অ্যাবসার্ড। যে জগতের অনুপুঙ্খ সমাবেশে তাঁর জন্তুর মতো ইন্দ্রিয়গুলো সজাগ ছিল, এক অপূর্বশ্রুত বোধের তীব্রতায় সেই জগতের চেহারা অপরিচিত হয়ে গেল। সমস্ত আপতিক দৃশ্যের মধ্যে তিনি অনিবার্য নশ্বরতাকে প্রতি মুহূর্তে অনুভব করেন। 'বরফের কুচির মতন/সেই জল-মেয়েদের স্তন!/মুখ বুক ভিজে,/ফেনার শেমিজে/শরীর পিছল!' কিন্তু সেই বোধের তৃতীয় নেত্র দিয়ে তাকানো মাত্র 'চেয়ে দেখি,—দুটো হাত, ক'খানা আঙুল/একবার চুপে তুলে ধরি ;/চোখ দুটো চুণ চুণ,—মুখ খড়ি-খড়ি !/থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—/সব বাসি,—সব বাসি,—একেবারে মেকি' (পরস্পর)। অথবা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অন্তর্গত 'জীবন' কবিতার কথাই ধরা যাক। নাম 'জীবন', কিন্তু সবই তো মৃত্যুর প্রসঙ্গ। কিন্তু এই অধ্যায়ে এই তো স্বাভাবিক— কারণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি দিয়ে তিনি আপতিককে এখন ভেদ করেছেন, দেখেছেন জীবনের মধ্যে মৃত্যুকে।

> যে-পাতা সবুজ ছিল—তবুও হলুদ হতে হয়—,
> শীতের হাড়ের হাত আজো তারে যায় নাই ছুঁয়ে ;—
> যে-মুখ যুবার ছিল,—তবু যার হয়ে যায় ক্ষয়,
> হেমন্ত রাতের আগে ঝরে যায়, পড়ে যায় নুয়ে,...। (জীবন)

চারিদিকে প্রেতের আনাগোনা—'আকাঙ্ক্ষার ভূত লয়ে খেলা', 'ভূত হয়ে করি ঘোরাঘুরি', 'আমরাও চরি-ফিরি কবরের ভূতের মতন', 'বাসিপাতা ভূতের মতন উড়ে আসে'। মৃত্যুর অনুষঙ্গ আসে বারবার—'আমাদের রক্তের ভিতর/বরফের মতো শীত', 'কাশের রোগীর মতো পৃথিবীর শ্বাস', 'মড়ার চোখের রঙে সকল পৃথিবী থাকে ভরে'। চোখ এমন অ-সুস্থ, অস্বভাবী—'অসুস্থ চোখের পরে অনিদ্রার মতন অসুখ ;/তাই আমি প্রিয়তম ;—প্রিয়া বলে জড়ায়েছি বুক...' (জীবন)। হাড়ে হাড়ে মজ্জায়-মজ্জায় প্রত্যেক মিনিটে মৃত্যু উপস্থিত—'শুধু পীড়া,—শুধু পীড়া!—মুকুলে-মুকুলে/শুধু কীট' (পিপাসার গান), 'চারিদিকে বিচ্ছেদের ঘ্রাণ লেগে রয়/পৃথিবীতে' (পাখি), 'শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের' (হাজার বছর শুধু খেলা করে)। মানুষেরই পক্ষে মাত্র সেই অ-সুস্থ দৃষ্টি সম্ভব যাতে বাস্তবের আড়ালে পরাবাস্তবকে দেখা যায় ; মানুষেরই মধ্যে সেই 'বোধ', সেই 'বিপন্ন বিস্ময়' উদ্ভাসিত হতে পারে যার ফলে জগৎচরাচরকে মনে হয় নিতান্ত অ্যাবসার্ড। এই অভিজ্ঞতা দেবতাদের নেই, কীটপতঙ্গেরও নেই।

> শুনেছে কে ইহাদের মুখে কোনো অন্ধকার কথা?
> সকল সংকল্প চিন্তা রক্ত আনে ব্যথা আনে—মানুষের জীবনের
> এই বীভৎসতা
>
> ইহাদের ছোঁয় নাকো ;—
> ব্যুবনিক প্লেগের মতন
> সকল আচ্ছন্ন শান্ত স্নিগ্ধভাবে নষ্ট করে ফেলিতেছে মানুষের মন!
> (এই নিদ্রা)

সব মানুষের মনে হয়তো সম্ভাবনা থাকে, তবু সব মানুষের মনে এই 'বোধ' জন্মায় না, জন্মায় 'আটবছর আগের একদিন'-এর নায়কের মতো মানুষের মনে। যার 'বধূ শুয়ে ছিল পাশে—শিশুটিও ছিল :/ প্রেম ছিল, আশা ছিল', অথচ যে জ্যোৎস্নায় ভূত দেখার মতো চমকে ওঠে, সেই রকম মানুষের মনেই দেখা দেয় এই অ্যাবসার্ড বোধ। এই নায়ক—

নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,...
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবন কোনো দিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই
লাশকাটা ঘরে।
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।

মারাত্মক এই বিচ্ছিন্ন 'তাই' অব্যয়ের ব্যবহার। কোনো কারণ নেই, 'তাই' কার্য ঘটেছে। এই 'তাই' ব্যবহারে যেন কার্যকারণপরম্পরাকে ভেঙে দেওয়া হল ; লজিকের মতো, জ্যামিতির মতো সিদ্ধান্ত সাজানো হয়েছে, কিন্তু এ-লজিক তো লজিক উল্টে-দেবার লজিক। ভেঙে গেল ন্যায়শৃঙ্খল, পারম্পর্য-সূত্রের বন্ধন। একটি অব্যয়ের আশ্চর্য ব্যবহারে, জীবনানন্দ খুলে দিলেন স্থূলপৃথিবীর জোড়গুলোকে।

এই পরাবাস্তবদৃষ্টির এক বেদনাভারাতুর নিদর্শন সিগনেট সংস্করণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে সংযোজিত 'মেয়ে' কবিতায় আছে। কবি দেখেন 'আমার প্রথম মেয়ে' মৃত মেয়েকে। তখন 'হাতখানা ধরে তার : ধোঁয়া শুধু/কাপড়ের মতো শাদা মুখখানি কেন!'

বলিল সে : 'আমারে চেয়েছ তাই ছোট বোনটিরে—
তোমার সে ছোট-ছোট মেয়েটিরে এসেছি ঘাসের নিচে রেখে
সেখানে ছিলাম আমি'—অন্ধকারে এতদিন
ঘুমাইতেছিলাম আমি'—ভয় পেয়ে থেমে গেল মেয়ে,
বলিলাম : 'আবার ঘুমাও গিয়ে
ছোট বোনটিরে তুমি দিয়ে যাও ডেকে।'

এই কথায় 'ব্যথা পেল সেই প্রাণ'; যেই সেই মৃত মেয়ে ধোঁয়া হয়ে মিলিয়ে গেল, কবি দেখলেন তাঁর ছোট মেয়ে হামাগুড়ি দিচ্ছে—'আর কেউ নেই'। দুঃস্বপ্ন থেকে তিনি ফিরে এলেন পরিচিত চতুষ্পার্শ্বে, পরাবাস্তব থেকে বাস্তবে। এই উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে আক্রান্ত হওয়ায় এসে যায় অন্য কোনো অতিবাস্তব, যেন স্বপ্ন বা দুঃস্বপ্নের উৎস থেকে, যেন কাফ্‌কার জগৎ থেকে উঠে আসে এইসব অপার্থিব ছবি।

১ হেমন্তের সন্ধ্যায় জাফ্‌রান-রঙের সূর্যের নরম শরীরে
শাদা থাবা বুলিয়ে বুলিয়ে খেলা করতে দেখলাম তাকে ;
তারপর অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে আনল সে,
সমস্ত পৃথিবীর ভিতর ছড়িয়ে দিল। (বেড়াল)

২ মহীনের ঘোড়াগুলি ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,
প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন,—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে।...
চায়ের পেয়ালা কটা বেড়ালছানার মতো
ঘুমে ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হয়ে নড়ে গেল ও পাশের পাইস রেস্তরাঁতে ;
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেলে গোল আস্তাবলে সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে ;
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে। (ঘোড়া)

সরোজিনী চলে যায় 'সপ্তক' কবিতায় 'সিঁড়ি ছাড়া—পাখিদের মতো পাখা বিনা' এবং চলে গিয়েও সে থেকে যায় 'লুপ্ত বেড়ালের মতো ; শূন্য চাতুরির মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে'—লিউস ক্যারলের বিখ্যাত চেশায়ার বিড়ালের মতো।

ইন্দ্রিয়মদিতার আচ্ছন্ন দিনে যাঁর ইচ্ছে হয়েছিল, 'এই ঘাসের শরীর ছানি', ইচ্ছে হয়েছিল 'ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই', অতীন্দ্রিয় দৃষ্টি খুলে গেলে তাঁর চোখে ধরা পড়ে 'বাতাসের ওপারে বাতাস', -/আকাশের ওপারে আকাশ' (আকাশলীনা), আর তখন তিনি উপলব্ধি করেন, 'সুরঞ্জনা,/তোমার হৃদয় আজ ঘাস'। দ্বিতীয় অধ্যায়ে দৃষ্টি তাঁর স্বতন্ত্র, জগতের চেহারাও পৃথক ;—এই দৃষ্টি পুরোনো অনুপুঙ্খময় জগতের চেহারাকে অলীক করে দিয়েছে।

এতদিন বসে পুরনো বীজগণিতের শেষ পাতা শেষ না করতেই
সমস্ত মিথ্যা প্রমাণিত হয়ে গেল ;
কোন্ এক গভীরে নতুন বীজগণিত যেন
পরিহাসের চোখ নিয়ে অপেক্ষা করছে :
আবার মিথ্যা প্রমাণিত হবে বলে? (আজকের এক মুহূর্ত)

গভীর নতুন এক বীজগণিত দিয়ে জীবনানন্দ দ্বিতীয় অধ্যায়ের পৃথিবীকে বুঝতে চেয়েছিলেন। আর বুঝে, প্রগাঢ় ভাবে বিচলিত হয়েছিলেন তিনি।

'অট্টহাসির ভিতর একটা বিরাট তিমির মৃতদেহ'

যাকে তৃতীয় নেত্র বলেছি তার দৃষ্টিপাত রঞ্জনরশ্মির মতো বহিরাবরণ উন্মোচিত করে দেয়। চেনা জগতের ছবির ভিতরে ফুটে ওঠে অচেনা আর এক দ্বিতীয় ভুবনের চেহারা। যাকে মনে হয়েছিল সুশ্রী কমনীয়, প্রসন্ন কোমল, তার মধ্যে রুক্ষতা রূঢ়তার চিহ্ন ফুটে ওঠে—লাবণ্যের আড়ালে হাড় ধরা পড়ে যায়। যাকে সত্য মনে হয়েছিল সে আসলে, মেকি প্রমাণ হয়ে যায়। অন্তর্ভেদী নজরে যখন বাস্তবের ভিতরে পরাবাস্তবের মানচিত্র ধরা পড়ে তখন সত্য আর প্রতীয়মানের মধ্যে ব্যবধান জানাজানি হয়ে যায়। প্রতীয়মানের পর্দাকে সরিয়ে দিতেই যে বিশ্বসংসারকে আপাত দৃষ্টিতে মনে হয়েছিল দৃঢ় এবং স্থিতিশীল তার চেহারা অন্য রকম হয়ে গেল—'দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;/গ্রামপতনের শব্দ হয় ;/মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,/দেয়ালে তাদের ছায়া তবু/ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,/বিহ্বলতা বলে মনে হয়' (পৃথিবীলোক)।

চারিদিকে নবীন যদুর বংশ ধ্বংসে
কেবলই পড়িতে আছে ; সঙ্গীতের নতুনত্ব সংক্রামক ধুয়া
নষ্ট করে দিয়ে যায় ;—
স্মৃতির ভিতর থেকে জন্ম লয়, এই সব গভীর অসূয়া। (আমিষাশী তরবার)

ক্ষুরধার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিতে ধরা পড়ে যাচ্ছে মূল্যবোধের বিরুদ্ধে অবক্ষয়ের ষড়যন্ত্র, সভ্যতাবিনাশের চক্রান্ত। এক-একবার মনে হচ্ছে মানুষের উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বভাবের মধ্যেই নিহিত আছে রক্তপাতের কারণ—'মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময় ;/সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী' (শ্যামলী)। 'অদ্ভুত আঁধার এক' পৃথিবীতে ইদানীং নেমে এসেছে ; শঠতা, অন্যায়, দ্বেষ,—বিশেষ করে দ্বেষই যেন আজ চালিকাশক্তি। 'আমরা খারিজ হয়ে দোটানার অন্ধকারে তবুও তো চক্ষু স্থির রেখে/গণিকাকে দেখায়েছি ফাঁদ ;/প্রেমিকাকে শেখায়েছি ফাঁকির কৌশল' (সূর্যপ্রতিম)। 'দলিলে না মরে' তবু মানুষ

ভিতরে-ভিতরে আজ মৃত ; ইতিহাসে না মরে তবু জাতি ও সভ্যতা ভিতরে-ভিতরে বিনষ্ট।

আপাত-স্থিতাবস্থার আড়ালে এই ভাঙন দেখে, প্রতীয়মানের পিছনে সত্যের এই মারাত্মক চেহারা দেখে দুই রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছে কবির। প্রথম প্রতিক্রিয়া, ব্যঙ্গের, পরিহাসের, অট্টহাসির। সত্য প্রতীয়মানের ভেদে দেখে তিনি হেসে উঠেছেন। জীবনানন্দকে যাঁরা চিনতেন তাঁরা সবাই লিখেছেন কী এক অদম্য কৌতুকবোধে স্থানকাল বিবেচনা না করে তিনি অনেক সময় হাসিতে ফেটে পড়তেন। যে বিসঙ্গতিবোধ তাঁকে কৌতুকবিহ্বল করতো ব্যক্তিগত জীবনে, সেই পরিহাসবোধেরই তিনি আশ্রয় নিয়েছেন কবিতায় যখনই সত্য ও আপতিকের বিসঙ্গতি ধরা পড়ে গেছে তাঁর তৃতীয় নেত্রের আলোকসম্পাতে। এই অসঙ্গতি যে সময় থেকে তাঁর কবিতায় ধরা পড়ে যাচ্ছে, সেই সময়ের কবিতায় তাঁর ব্যবহৃত বিশেষণ-বিশেষ্যের মধ্যে এক বৈপরীত্যধর্ম দেখা যায়। বিশেষ্য-বিশেষণ যেন পরস্পরকে নাকচ করছে ; একটি যদি বলে আপতিকের কথা, অন্যটি যেন বলে গূঢ় পরিস্থিতির কথা। দুই বিপরীতের সংঘাতের সময় যেন কবির প্রচ্ছন্ন হাসিটিও ধরা পড়ে যায়। কয়েকটা উদাহরণ দিলেই বোঝা যাবে বিশেষ্য-বিশেষণের পাশাপাশি অবস্থানের মধ্য দিয়ে জীবনের বিসঙ্গতি কী ভাবে তিনি রূপায়িত করেছেন—'মসলিন যুবারা', 'বিমর্ষ প্রসব', 'ভূতকে নিরস্ত করে প্রশান্ত সরিষা', 'কামানের স্থবির গর্জন', 'দিনের বিশ্রুত আলো', 'অমায়িক কুটুম্বিনী', 'নিটোল সারস', নির্মল ভিটামিন', 'সচ্ছল কঙ্কাল', 'ফিচেল বাতাস', 'সপ্রতিভ আঘাত' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই পরিহাসবোধের প্রথম ইশারা পাওয়া গেল 'অবসরের গান' কবিতায়। সেখানে 'পাড়াগাঁ-র এই সব ভাঁড়'-দের সঙ্গে আমাদের দেখা হল, শোনা গেল যোদ্ধা জয়ী সম্রাট ও সেই সব ভাঁড়ের 'খুলির অট্টহাসি'। তারপর প্রায়ই দেখছি আকাশও 'কৌতুকী', 'নক্ষত্র চুপে হেসে' যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে এক অদম্য কৌতুকবোধ তাঁর মধ্যে সংক্রামিত হয়েছিল। সংসারে, অস্তিত্বের গভীরে সব জায়গায় তাঁর চোখে ধরা পড়ছিল হাস্যকর সব পরিস্থিতি।

> ১ একটি বিপ্লবী তার সোনা রুপো ভালোবেসেছিলো ;
> একটি বণিক আত্মহত্যা করেছিল পরবর্তী জীবনের লোভে ;
> একটি প্রেমিক তার মহিলাকে ভালোবেসেছিলো ;
> তবুও মহিলা প্রীত হয়েছিল দশজন মূর্খের বিক্ষোভে। (ও. কে.)
>
> ২ ...জড়ায়েছে ঘিয়ের রঙের মতো শাড়ি
> ভালো করে দেখে নিলে মনে হয় অতীব চতুর দক্ষিণরাঢ়ী
> দিব্য মহিলা এক,...
> জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক মিলে আমাদের দুদিকের কান
> টানে বলে বেঁচে থাকি—ত্রিবেদীকে বেশী জোরে দিয়েছিল টান।
> (অনুপম ত্রিবেদী)

কখনো এই পরিহাস গ্রোটেসক 'সুবিনয় মুস্তফী'-র মতো—'সুবিনয় মুস্তফীর কথা মনে পড়ে এই হেমন্তের রাতে।/এক সাথে বেরাল ও বেরালের-মুখে-ধরা-ইঁদুর হাসাতে/এমন আশ্চর্য শক্তি ছিলো ভূয়োদর্শী যুবার।' আবার কখনো সেই ব্যঙ্গ ভয়ংকরভাবে বীভৎস, যেমন যেখানে তিনি 'সমারূঢ়' কবিতায় 'আরূঢ় ভনিতা' সমালোচকের 'অক্ষম পিচুটি'-কে আক্রমণ করেছেন। 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির' বইতে অজস্রবার

পরিহাসবাচক শব্দ পাই আমরা। প্রথম উদাহরণগুলো 'মহাপৃথিবী' থেকে—' হো হো করে হেসে উঠল', 'চারিদিককার অট্টহাসি', 'পরিহাসের চোখ', 'রক্তচ্ছটা রঞ্জিত ভাঁড়', 'বৈহাসিক', 'জীবনকে টিটকারি', 'উচ্চস্বরে হেসে ওঠে', 'বেদম হেসে খিল ধরে যেত', 'হেসে খুন হতো', 'কৌতুকে', 'শকুনি মামার সাথে হেসে', 'সেই থেকে হাসায়', 'বিদূষক', 'পৃথিবীর প্রথম তামাসা'। 'সাতটি তারার তিমির' থেকে দিচ্ছি পরের নিদর্শনগুলো—'নৃমুণ্ডের হেঁয়ালি', 'লঘু হাস্য', 'লোল হাস্য', 'তামাসার প্রগলভতা', 'পরিহাসে', লোল নিগ্রো হাসে', আবহমানের 'ভাঁড়', 'চোখ ঠার', 'হেঁয়ালি', 'সোনালি হেঁয়ালি', 'ফিচেল', 'ঠোনা দিয়ে', 'নির্দোষ আমোদ' ইত্যাদি।

এই পরিহাসকে কবিতায় শরীরী করার জন্যে আর একটা কৌশলের আশ্রয় নিয়েছেন জীবনানন্দ। সেই কৌশল প্রবাদ-প্রবচনের ঈষৎ বিকৃত ব্যবহার। কয়েকটা নিদর্শন দিলেই ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে যাবে। যেমন, 'কেননা যুগের গালে কালি আর চুণ' (সমিতিতে), 'বাতাসে ধর্মের কল নড়ে ওঠে—নড়ে চলে ধীরে' (মনোসরণি)। আরো কয়েকটা উদাহরণ—'ভারে কাটে—তথাপিও ধারে কাটে বলে' (উন্মেষ), 'অব্যয় শিল্পীরা সব ঃ মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে' (জুহু), 'সূর্যের চেয়েও বেশি বালির উত্তাপে' (লোকসামান্য), 'পরের ক্ষেতের ধানে মই দিয়ে উঁচু করে নক্ষত্রে লাগানো/সুকঠিন নয় আজ' (সৌরকরোজ্জ্বল), রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়/চেয়েছে ভাবের ঘরে চুরি বিনে জ্ঞান ও প্রণয়?' (বিভিন্ন কোরাস), 'আদার ব্যাপারী হয়ে এই সব জাহাজের কথা/না ভেবে মানুষ কাজ করে যায় শুধু ভয়াবহ ভাবে অনায়াসে' (মহিলা)। তাছাড়া প্রথম অধ্যায়ে জীবনানন্দ খাঁটি দিশি শব্দ ব্যবহার করেছিলেন অনুপুঙ্খের সমাবেশে বস্তুবিশ্বকে বিশ্বাস্য করে তোলার জন্য। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি ব্যবহার করেন শহুরে অপশব্দ, স্ল্যাং। এবার অভিপ্রায় অন্য। সত্য ও প্রতীয়মানের প্রভেদ জেনে তাঁর ব্যঙ্গ প্রখর মনের বিতৃষ্ণাকেই সাকার করে তোলার জন্যে এই সব অপশব্দের ব্যবহার—মরখুটে, পিঁচড়ে ওঠে, শুনেছি টায় টায়, খচ্চর, মিহিন কামিজ, টেঁসে যায়, ভারিক্কে, ও. কে., হুররে, গাড়ল। এবং এই রকম আরো।

বিশ্বসংসারের চেহারা দেখে ব্যঙ্গপরিহাসের এই নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া এক সময় রূপান্তরিত হয় ইতিবাচক প্রতিক্রিয়ায়—ঘৃণায় ; জাগতিক বীভৎসতা দেখে মর্মান্তিক ঘৃণায়। হাস্যকর বিসঙ্গতিবোধ থেকে জন্মায় অপ্রতিরোধ্যভাবে এই মারাত্মক ঘৃণা।

> প্রেমিকেরা সারা দিন কাটায়েছে গণিকার বারে ঃ
> সভাকবি দিয়ে গেছে বাক্‌বিভূতিকে গালাগাল...
> তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে। (সৃষ্টির তীরে)

আর একটা অংশ তুলে দিচ্ছি—

> পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?
> স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
> ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
> আগুন বাতাস জল ঃ আদিম দেবতারা হো হো করে হেসে উঠল ঃ
> 'ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়োরের মাংস হয়ে যায়?'
> হো হো করে হেসে উঠলাম আমি!—
> চারিদিককার অট্টহাসির ভিতর একটি বিরাট তিমির মৃতদেহ নিয়ে
> অন্ধকার সমুদ্র স্ফীত হয়ে উঠল যেন ;

পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মতো,...।

(আদিম দেবতারা)

পরিহাস পরিণত হলো, বুদ্ধদেব বসু যেমন বলেছেন, সেই 'সংক্ষুব্ধ বিবমিষা'-য়। 'হো হো করে হাসি' যেন মাঝপথে থেমে গেল বীভৎসতায়—'শূয়োরের মাংস আর 'তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধে' জেগে উঠলো বমনের ইচ্ছা।

লক্ষ করলে দেখা যাবে এই সব বীভৎসতার ইমেজের সঙ্গে প্রায় সব সময় জড়িয়ে আছে জীবজন্তুর অনুষঙ্গ যারা বেশির ভাগই শোভন-সুন্দর নয় ; এমন সব প্রাণী যাদের সংসর্গ মানুষ এড়িয়ে চলে। রাতের ট্রামলাইনকে মনে হয় 'কয়েকটি আদিম সর্পিণী সহোদরার মতো'। একটা বীভৎসতার জুগুপ্সিত ছবির মধ্যে এসে যায় নানা ধরনের কতো জৈবিক সমাবেশ!

বিশুষ্ক—ধূসর—
ক্রমে ক্রমে মৃত্তিকার কৃমিদের স্তর
যেন তারা ;—অপ্সরা—উর্বশী
তোমার আকৃষ্ট মেঘে ছিল নাকি বসি?
ডাইনীর মাংসের মতন
আজ তার জঙ্ঘা আর স্তন ;
বাদুড়ের খাদ্যের মতন
একদিন হয়ে যাবে ;
যে সব মাছিরা কালো মাংস খায়—তারে ছিঁড়ে খাবে। (মনোবীজ)

অনর্গল এসে যায় কালো বিড়াল, বানরবানরী, ব্যাং, ইঁদুর, ফড়িং, শেয়াল, শকুন, বেবুন, পেঁচা, ছাগল, হাঙর, এই সব প্রাণীর প্রসঙ্গ। সমুদ্রতীরে রোদ পোহানো শ্বেতাঙ্গ দম্পতিকে দেখে মনে হয় 'সামুদ্রিক কাঁকড়ার মতো'। তিনজন আধ-আইবুড়ো ভিখারী যখন একজন শাঁখচুন্নিকে নিয়ে 'গোল হয়ে বসে গেল তিন মগ চায়ে' তখন—'তাহারা গণনা করে গেল এই পৃথিবীর ন্যায় অন্যায় ;/চুলের এঁটেলি মেরে গুণে গেল অন্যায় ন্যায়...' (লঘু মুহূর্ত)। জগৎ কবির কাছে যখন জীর্ণ প্রাসাদ তখন 'অনেক ফাটল নোনা আরসোলা কৃকলাস দেয়ালের পর / ফ্রেমের ভিতরে ছবি খেয়ে ফেলে অনুরাধাপুর—ইলোরার'... (অবরোধ)। জুগুপ্সা জাগায় স্পর্শ-অশুচি এই সব প্রাণী। এই সব প্রাণীর ইমেজ আবার অবয়ব দেয় ঘৃণ্যবীভৎস চরাচরকে। সব চেয়ে বেশি ক্লেদপঙ্কে লিপ্ত শূয়োর, সংখ্যায় না হোক, অন্তত বিস্ফোরক ব্যবহারে। যেমন—

১ হায়, সোনালী বাঘ-প্রেত,
তোমাদের জন্য শূয়ারের মাংস
শূয়ারের মাংস শুধু ;
মৃত্যু তোমাদের ফেলে দিয়েছে
অন্ধকারে অচল অভ্যাসের ভিতর। (হঠাৎ-মৃত)

২ যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত শত শূকরের চিৎকার যেখানে,
শত শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর ;

এই সব ভয়াবহ আরতি (অন্ধকার)

জীবনানন্দ কাব্যের তৃতীয় অধ্যায়ে সংসার বাস্তবিক ভয়াবহ। এখানে 'মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম', 'সব ক্লথ বাথরুমে ফেলে' ক্লেদাক্ত মলিন, সূর্যাস্তও এই মৃত মুমূর্ষু পৃথিবীতে 'বেহেড আত্মার মতো'। প্রেমহীন চরাচরে 'চীনে বাদামের মতো' বিশুষ্ক বাতাস, নগরীর রাত্রি শ্বাপদসঙ্কুল লিবিয়ার জঙ্গলের মতো। জীবনানন্দের এই বিবমিষার সঙ্গে মনে হয় যেন সুইফ্‌টের 'disgust obsession' এর সাদৃশ্য আছে। মিডলটন মারে সুইফ্‌টের রচনায় যে 'excremental vission' দেখেছিলেন, সেই বীভৎস-ক্লেদময়তার ছবি যেন এখানেও মেলে। আর জগতের প্রতি বিরূপ বিতৃষ্ণায় এখানেও সেই 'peculiar emotional intensity' আছে, যা সুইফ্‌টের রচনায় লীভিস্ লক্ষ করেছিলেন।

এই ঘৃণাই জগতে প্রেমহীনতার সঙ্গে আছে অন্নহীনতা, দারিদ্র্য। ভিখারীকে দেখি, 'ধূসর বাতাস খেয়ে একগাল—রাস্তার পাশে/ধূসর বাতাস দিয়ে করে নিল মুখ আচমন।' অন্যত্র পাচ্ছি—'অন্ন নেই। হৃদয়হীনভাবে আজ/মৈত্রেয়ী ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুর।/রক্তের সমুদ্র চারিদিকে :/কলকাতা থেকে দূর/গ্রীসের অলিভ-বন/অন্ধকার' (দীপ্তি)। এই বীভৎসতার মানচিত্র দেখে দেখে এক দুরপনেয় হতাশা এই দ্রষ্টাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। যে সময়ে সামাজিক-অর্থনৈতিক বৈষম্যের কথা কবিতায় ব্যবহৃত হয়ে-হয়ে ক্লিশে হয়ে গেছে, সেই সময়ে বসে সম্পূর্ণ ক্লিশে-মুক্ত ভাষায় সেই বৈষম্যের অসহায়তা আঁকলেন জীবনানন্দ—'নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব—অথবা যা নিলেমের নয়/সে-সব জিনিস/বহুকে বঞ্চিত করে দুজন কি একজন কিনে নিতে পারে।/পৃথিবীতে সুদ খাটে : সকলের জন্য নয়।/ অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দুজনের হাতে।/ পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকেদের দাবি এসে সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।' আর এই বৈষম্যের শিকার যারা সেই ইয়াসিন হানিফ মকবুল করিম আজিজ গগন বিপিন শশী—'পাথুরেঘাটার, মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রীটের, এনটালির'—তারা দুর্ভিক্ষ দাঙ্গায় বিপর্যস্ত হয়। 'জীবনের ইতর শ্রেণীর/মানুষ তো এরা সব; ছেঁড়া জুতো পায়ে /বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে...' (১৯৪৬-৪৭)। 'এই সব দিনরাত্রি' নামক কবিতায় প্রেমহীন অন্নহীন মানুষের এই তমিস্রাগাঢ় নিয়তির রূপায়ণ পাই। মানুষের সত্তার অন্ধকার এবং মানুষের সামাজিক পরিস্থিতির অন্ধকার যুগপৎ শরীরী হয়েছে এই রচনায়।

জানে না কোথায় গেলে জল তেল খাদ্য পাওয়া যাবে ;
অথবা কোথায় মুক্ত পরিচ্ছন্ন বাতাসের সিন্ধুতীর আছে।...
যাদের আস্তানা ঘর তল্পিতল্পা নেই
হাসপাতালের বেড হয়তো তাদের তরে নয়।...
এ রকম ভাবে চলে দিন যদি রাত হয়, রাত যদি হয়ে যায় দিন,
পদচিহ্নময় পথ হয় যদি দিকচিহ্নহীন,
কেবলি পাথুরেঘাটা নিমতলা চিৎপুর—
খালের এপার-ওপার রাজাবাজারের অস্পষ্ট নির্দেশে
হাঘরে হাভাতেদের তবে
অনেক বেডের প্রয়োজন ;
বিশ্রামের প্রয়োজন আছে ;

বিচিত্র মৃত্যুর আগে শান্তির কিছুটা প্রয়োজন।

এই তবে পরিণাম! 'প্রমত্ত কালো গণিকার উল্লোল সঙ্গীতে' সবই কি নরক শ্মশান হবে, শ্রাবণধারার মতো ক্লেদরক্ত চিরটাকাল কি নির্গলিতভাবে বর্ষিত হবে? এই অন্ধকার, বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়, 'মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর', যুদ্ধ এবং রাষ্ট্রবিপ্লব, অপরিসীম লালসা, 'অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া'র প্রিয়তম সাধ—এই কি অসংবরণীয় নিয়তি! সত্তার এই অসুখের কি কোনো চিকিৎসা নেই, শুশ্রূষা নেই, নিরাময় নেই? 'শুভ রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ'। সে রাষ্ট্র কি চিরকাল দূরেই থাকে, অথবা সেই রাষ্ট্র একদিন ভবিষ্যতে কাছে আসবে এই জেনে কবি কি রাত্রির চিত্র-পরম্পরাই শুধু এঁকে যাবেন? স্বচক্ষে দেখা ভয়ঙ্কর জাগতিক চেহরায় শেষ পর্যন্ত শিউরে উঠেছিলেন জীবনানন্দ। চতুর্দিকের অন্ধকার থেকে উত্তরণের জন্যে তিনি আকুল হয়ে উঠেছিলেন।

> সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
> ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকাই ;
> লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
> চাই। (ইতিহাসযান)

এই চাওয়া, এই আকুলতাই জীবনানন্দকাব্যের চতুর্থ অধ্যায়।

'পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা / সত্য; তবু শেষ সত্য নয়।'

'আমার এই জীবনের ভোরবেলা থেকে—/সে সব ভূখণ্ড ছিল চিরদিন কণ্ঠস্থ আমার ;/একদিন অবশেষে টের পাওয়া গেল/আমাদের দুজনার মতো দাঁড়াবার/তিল ধারণের স্থান তাহাদের বুকে/আমাদের পরিচিত পৃথিবীতে নেই' (ভাষিত)। কবিজীবনের ভোরবেলার বস্তুবিশ্ব 'কণ্ঠস্থ' ছিল, তারপর 'পরিচিত' পৃথিবী প্রথমে অপরিচিত মাত্র, পরে নিদারুণ বীভৎস হয়ে গেল। দিব্যদর্শিতার রঞ্জনরশ্মিতে ধরা পড়ে গেল পৃথিবীর এই যে গভীর গভীরতর অসুখ, এর কি কোনো সংশোধন নেই—এই জিজ্ঞাসা শেষ অধ্যায়ের কবিতায় জীবনানন্দ বারবার করেছেন। 'এ রকম কেন হয়ে গেল তবে সব/বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে।/একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে/আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে (ভাষিত)?' একবার শোণিত-মেশানো নদীর স্রোতের দিকে তাকিয়ে তিনি সংশয়াপন্ন—

> নিসর্গের কাছ থেকে স্বচ্ছ জল পেয়ে তবু নদী মানুষের
> মূঢ় রক্তে ভরে যায় ; সময় সন্দিগ্ধ হয়ে প্রশ্ন করে, 'নদী
> নির্ঝরের থেকে নেমে এসেছো কি? মানুষের হৃদয়ের থেকে?'
> (এইখানে সূর্যের)

অন্য সময় আবার স্বচ্ছ উজ্জ্বল জলস্রোতের দিকে তাকিয়ে অনাস্থা-সংশয়কে উত্তীর্ণ হয়ে তিনি আস্থায় বিশ্বাসে আপ্লুত হয়ে যান।

> নিজের নুড়ির পরে সারা দিন নদী
> সূর্যের—সুরের বীথি,—তবু
> নিমেষে উপল নেই—জলও কোন্ অতীতে মরেছে ;
> তবুও নবীন নুড়ি—নতুন উজ্জ্বল জল নিয়ে আসে নদী...। (জনান্তিকে)

যদিও এক সময় সোফোক্লিসের মতো মনে হয়েছিল 'মাটির পৃথিবীর টানে মানবজন্মের ঘরে কখন এসেছি,/না এলেই ভালো হত অনুভব করে', কিন্তু শিশির-শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল

ভোরে পরে মনে হয়েছে এক গভীরতর লাভ হল। যদিও 'দেখেছি যা হল হবে মানুষের যা হবার নয়' তবুও প্রগাঢ় প্রত্যয় জন্মায় 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়' (সুচেতনা)।

কাব্যের চতুর্থ অধ্যায়ে জীবনানন্দ তিমিরবিনাশী, তিনি তিমিরহননে উৎসুক। অন্ধকারকে ভেদ করতে চান, অবিশ্বাসকে অতিক্রম করতে চান; বীভৎসতা ও জুগুপ্সার ক্লেদপঙ্ক মুছে অমলিন স্নিগ্ধতার সন্ধানী তিনি আজ। 'নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে' তিনি চলেছেন,

> সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
> চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষণ্ণ হৃদয় ;—
> জয়, অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়। (সময়ের কাছে)

পূর্বপরিকল্পনার খশড়া কেউ করেন না, তবু নিজের অজ্ঞাতসারে, একটা পূর্ণবৃত্ত বড় কবি রচনা করেন। তাই তৃতীয় থেকে চতুর্থ অধ্যায় জীবনানন্দের পক্ষে অনিবার্য ছিল, কারণ অপ্রধান কবির নিয়তি জীবনানন্দের নিয়তি নয়। তবে অনেক সময় প্রাক্তন অন্ধকার থেকে এই উত্তীর্ণ হওয়ার আস্থাকে জীবনানন্দ বিশ্বাস্য করে তুলতে পারেন নি। অনেক সময় বিশ্বাসের জন্য কবির আকুলতা যতো প্রবল মনে হয়, ততো নিবিড়ভাবে সেই আলোকে কবিতায় তিনি সব সময় অপ্রতিরোধ্য পরিণাম হিশেবে দেখাতে পারেন না। মাঝে-মাঝে অমোঘতার অভাব পীড়িত করে আমাদের। যেমন '১৯৪৬-৪৭' কবিতার তমিস্রার অসামান্য বর্ণনার শেষে বীতশোক স্নিগ্ধতার কথা, আস্থাবাচক সিদ্ধান্ত অনেকটা আরোপিত মনে হয়। হয়তো খানিকটা বেশি সময় পেলে শেষ অধ্যায়ের আলোকে তিনি তৃতীয় অধ্যায়ের বীভৎসতার ভিত্তির উপর আরো অমোঘ এবং অনিবার্যভাবে স্থাপিত করতে পারতেন।

কিন্তু সে যাই হোক, কিসের অভাবে সব নির্দেশ ভুল হয়ে গেল? কী ফিরে এলে তবে আবার সব বিশুদ্ধ হতে পারে? জীবনানন্দ ইতিহাসের গতি সম্বন্ধে সময়কালের রাজনীতি ও সমাজনীতির বিষয়ে খুবই ওয়াকিবহাল ছিলেন। প্রাথমিক ঋতুতে তিনি নির্জন কবি হলেও, তৃতীয়-চতুর্থ অধ্যায়ের জীবনানন্দ সম্বন্ধে নির্জনতার আখ্যা খুবই ভুল। কিন্তু সব জেনেও বিশুদ্ধতার ঔষধ কোনো রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মতবাদে তিনি খোঁজেন নি। তিনি জানতেন যে ইচ্ছাশক্তিতে নিরাময় হয় 'সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,/আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়' (সুরঞ্জনা)। কবির চোখ দিয়ে তিনি বিপন্ন জগৎকে দেখেছেন, কবির ধরনেই তিনি ত্রাণের পথ খুঁজেছেন। খুঁজেছেন, প্রেমে। গাঢ় আত্মবিশ্বাসে শেষ পর্যন্ত তিনি উচ্চারণ করেছেন—'প্রেম/ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি' (অনেক নদীর জল)। প্রেমের অভাবেই সব কিছু অন্ধ হাহাকারময় এই কথা কাব্যের চতুর্থ অধ্যায়ে বারবার মেলে। প্রেম নেই বলে সব ব্যর্থ, মানুষে-মানুষে দুরতিক্রম্য বিচ্ছিন্নতা—'মানুষের প্রাণে কোনো উজ্জ্বলতা নেই,/শক্তি আছে, শান্তি নেই, প্রতিভা রয়েছে ব্যবহার নেই, প্রেম নেই, রক্তাক্ততা অবিরল...' (মহাত্মা গান্ধী)

> জনতার হৃদয়ের ভীতি
> মেধা নয়—সেবা চায়;—তাই ভেঙে ধ্বসে গেল অমোঘ সমিতি ;—
> অদীক্ষায় উচ্চারণে রয় কি হাঁসের ডিম মৃত্তিকায় খাড়া?...
> ...এই সব ঘাস, হরিতকী, সূর্য মনে হয় যেন প্লিওসিন

হাড়গোড়ে পড়ে আছে নিরুত্তেজ মানুষের প্রেমের অভাবে।

(১৩৩৬-৩৮ স্মরণে)

পৃথিবীর ভরাট বাজারভরা লোকসান, লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষগন্ধ ঠেলে 'আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই—প্রেমে।' শুধু কর্মিষ্ঠতা কিছু নয়, শুধু জ্ঞান বন্ধ্যা, 'জ্ঞান চায় প্রেম'। প্রেম বিনা ভাষা 'নিরাশ্রয় শব্দের কংকাল', আর বিজ্ঞান শুধু সংকলিত জিনিসের ভিড়। কেননা, 'রেললাইনের মতো পাতা জ্ঞানবিজ্ঞানের অন্তহীন কার্যকারিতায়/সুখ আছে, সৃষ্টি নেই। অনেক প্রবাদ আছে প্রেম নেই' (এইখানে সূর্যের)। যেখানে প্রেম নেই, সেখানে প্রতিভা কৌশল মাত্র। জীবনানন্দ অনুভব করেছিলেন প্রেমহীনতা আর অস্তিত্বহীন শূন্যতা সমার্থক।

এই বিমূর্ত প্রেম প্রতিমা নিয়েছে, যেমন নেয়, নারীর মধ্যে। শূন্যের মধ্যে সে-ই জ্যোতিই পদ্মের মতো আত্মস্থ সুষমায় বিরাজমান।

> আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যের মতো অপার অন্ধকারে মাইলের পর মাইল।...
> সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, নারি,
> অবাক হলাম না।
> হতবাক হবার কী আছে?
> তুমি যে মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
> স্বর্গীয় শিখার মতো...। (সময়ের তীরে)

প্রেমের প্রতিমা এই নারী পবিত্র শিখার মতো শুধু আলো দেয় তাই নয়, অস্তিত্বের বীভৎসতাকেও সহনীয় করে তোলে। 'মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালবেসে বুঝেছি, নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে' (তোমাকে)। জ্যোতির উৎস নারীকে তাই, অন্ধকার পটভূমিতে দাঁড়িয়ে কবি পবিত্র প্রার্থনার সুরে, আবাহন করে বলেন 'হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে/তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে (মকরসংক্রান্তির রাতে)।

শেষে কোনো নির্বিশেষ নারীও নয়। আলো এসে সংহত হল এক জায়গায় —নির্বিশেষ নারী থেকে গুটিয়ে এনে বিশেষ। 'তবুও নারীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষায় জল, সূর্য মানে আলো :/এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো'। নারীত্বের সারবত্তা এই 'তুমি'তেই কবির পরম বিশ্বাস, প্রগাঢ় আস্থা।

> তোমার বুকের পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল ;
> তোমার বুকের পরে আমদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস ;
> তোমার বুকের পরে আমাদের পৃথিবীর রাত ;
> নদীর সাপিনী, লতা, বিলীন বিশ্বাস। (তোমাকে)

যে নারকীয় বীভৎসতার মানচিত্র জীবনানন্দ এঁকেছেন তৃতীয় অধ্যায়ে, তা কবির মনে জাগিয়েছিল অদম্য বিবমিষা। তার থেকে তিনি উদ্ধার চেয়েছেন আলোয়, পবিত্র নির্মল জলধারায়—আর সেই আলোর দ্যুতি আর জলের শুশ্রূষা যার মধ্যে সাকার সেই নারীর মধ্যে।

> ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি রাশি দুঃখের খনি
> ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
> শত জলঝর্ণার ধ্বনি। (হে হৃদয়)

নারীর মধ্যে সেই ঝর্ণার ধ্বনি আর মালিন্যমুক্ত পবিত্রতা। দুর্ঘটনা ঘটার সময় পর্যন্ত, সেই আলো ও পবিত্রতার অসমাপ্ত অধ্যায় রচনায় তিনি ব্যস্ত ছিলেন।

জীবনানন্দ ঃ উত্তরাধিকার

আমাদের এই সময়ের প্রধান একজন কবি, বিনয় মজুমদার, তাঁর একটি কবিতায় লিখেছিলেন একবার ঃ

ধূসর জীবনানন্দ, তোমার প্রথম বিস্ফোরণে
কতিপয় চিল শুধু বলেছিল 'এই জন্মদিন'।
এবং গণনাতীত পারাবত মেঘের স্বরূপ
দর্শনে বিফল বলে, ভেবেছিল, অক্ষমের গান।
সংশয়ে সন্দেহে দুলে একই রূপ বিভিন্ন আলোকে
দেখে দেখে জিজ্ঞাসায় জীর্ণ হয়ে তুমি অবশেষে
একদিন সচেতন হরীতকী ফলের মতন
ঝরে গেলে অকস্মাৎ, রক্তাপ্লুত ট্রাম থেমে গেল।

পঁচিশ বছর আগে একদিন থেমে গিয়েছিল এই 'রক্তাপ্লুত ট্রাম'। যে-কবির একদিন মনে হতো যে 'এই দেহের ব্যাঘাতে /হৃদয়ে বেদনা জমে', সরে গেল সেদিন তাঁর সেই ব্যাঘাত। যিনি চেয়েছিলেন 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে' যেতে, তাঁর সেই ইচ্ছে যেন চরিতার্থ হলো সেদিন।

কিন্তু কবির সত্তায় মিশে যাওয়া এই অন্ধকার নিয়ে জীবনানন্দের মৃত্যুদিনই হয়ে ওঠে তাঁর দ্বিতীয় জন্মদিন। কেননা তাঁর মৃত্যুর পর পঁচিশ বছর জুড়ে বাংলা কবিতার দিকে তাকালে দেখতে পাই, কীভাবে এক অপ্রখর অথচ অনিবার্য নিয়ন্ত্রণ নিয়ে তিনি জেগে ওঠেন আমাদের পটভূমিতে। 'কতিপয় চিল শুধু বলেছিল, এই জন্মদিন'ঃ বিনয়ের এই আক্ষেপ আজ দূর হবার কথা। বিনয় আর তাঁর সহযাত্রী কবিরা জীবনানন্দকে কেবলই আবিষ্কার করে নেন তাঁদের নিজের নিজের ধরনে, নিজের নিজের গরজে। 'অনন্ত নক্ষত্রবীথি, তুমি অন্ধকারে' হয়ে উঠতে পারে শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাবইয়ের নাম, 'অনন্ত জ্যোৎস্নার মাঝে বশবর্তী ভূতের মতন' মহীনের ঘোড়াগুলিও নেমে আসিতে পারে তাঁর কবিতায়, জীবনানন্দ থেকে। কিংবা তাঁর 'কাল সারারাত অতিশয় স্বপ্নে স্বপ্নে বিদ্যুচ্চমকে জাগিয়ে রেখেছিল আমায় পুরোনো চাঁদ' বা 'সারারাত অকুণ্ঠ নতুন মৌসুমির মধ্যে ডুবে গিয়েছিলাম আমি' এই ধরনের লাইনগুলি, তার শব্দে আর ছন্দস্পন্দে, পাঠককে মনে করিয়ে দিতে পারে জীবনানন্দ, বিশেষত তাঁর 'হাওয়ার রাত', যেখানে আমরা শুনেছি ঃ

গভীর হাওয়ার রাত ছিল কাল—অসংখ্য নক্ষত্রের রাত,
মশারিটা ফুলে উঠেছে কখনো মৌসুমি সমুদ্রের পেটের মতো

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নয়, আধুনিক পাঠক তাঁর জীবন খুঁজে পান. জীবনানন্দেরই

রচনায়—'কবিতা' পত্রিকার শেষ পর্যায়ে প্রত্যক্ষ তুলনা দিয়ে এ-কথা বলতে শুরু করলেন নিরুপম চট্টোপাধ্যায় বা জ্যোতির্ময় দত্তের মতো সেদিনকার তরুণেরা।'চিনেবাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাস' বা 'হাইড্রান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠরোগী চেটে নেয় জল' বা 'এক মোটর কার গাড়লের মতো গেল কেশে' ঃ এ-ধরনের ছোটো এক-একটি উচ্চারণ কীভাবে রবীন্দ্রনাথের কবিতার অনেক দীর্ঘ বর্ণনার তুলনায় অনেক সহজেই তুলে আনে শহরের আত্মা, এঁরা তা দেখালেন সেদিন। এই অনায়াস সংহতি যে জীবনানন্দের কবিতার এক বড়ো আকর্ষণ, পরবর্তী অনেক কবির আলোচনাতেও দেখি সেই ইঙ্গিত। 'কবিতা-পরিচয়' নামের স্বল্পজীবী পত্রিকার কয়েকটি সংখ্যায় জীবনানন্দের কবিতা নিয়ে পর পর কথা বলছিলেন অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, বিনয় মজুমদার বা আলোক সরকারের মতো কবিরা। বিনয় সে-আলোচনায় আমাদের মনে করিয়ে দেন যে সৌন্দর্যতত্ত্বের একটা বড়ো সূত্রই হলো এলিমিনেশন—বর্জন—যার ফলে কবিতার রহস্যময়তা বাড়ে, পাঠকও হয়ে ওঠেন সৃষ্টিশীল। 'ঘোড়া' কবিতাটির কথা বলতে গিয়ে আলোক লেখেন ঃ 'বক্তব্যকে ঘোষণার মতো করে বলবার প্রয়োজন নেই, আমাদের কেবল কয়েকটি ছবির মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে, এবং যেমন কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের সামনে আলোকিত উন্মোচন ঘটায়, ঠিক সেই রকমই কবিতাটি তার সকল সত্য নিয়ে আমাদের সামনে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাসিত হয়েছে।' এর সঙ্গে যদি জুড়ে নিই 'কৃত্তিবাস'-এর কবিদের বিষয়ে অলোকরঞ্জনের এই মন্তব্য যে এঁরা চেয়েছিলেন এক 'মহতী অনিশ্চিতি'কে তুলে আনতে তাঁদের কবিতায় তাহলে আমরা বুঝতে পারব, কেন অন্য অগ্রজদের তুলনায় জীবনানন্দ অনেক বেশি টেনে নিয়েছিলেন এই তরুণদের।

প্রথম আবির্ভাবের সময়ে, স্বভাবতই, জীবনানন্দের এই পরিচয় স্পষ্ট ছিল না পাঠকের কাছে। 'অক্ষমের গান' বলে একে উপেক্ষা করা সহজ ছিল সেদিন, প্রত্যাশিত ছিল 'শনিবারের চিঠি'র বিদ্রূপ। এটা ঠিক যে সেই অস্পষ্ট মুহূর্তেও বুদ্ধদেব বসু তাঁর কবিতাকে পৌঁছে দিতে চেষ্টা করছিলেন পাঠকের সামনে, তাঁর আস্বাদন দিয়ে। এজন্য আজ কৃতজ্ঞ বোধ করি আমরা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে এও সত্যি যে বুদ্ধদেবও সেদিন পৌঁছননি জীবনানন্দের কবিতার অন্তঃসারের দিকে। আপাতশিথিল ছন্দ দিয়ে কীভাবে তিনি তৈরি করেন 'সূক্ষ্ম সংগীতের জাল', নটকান থুতনি বা শেমিজের মতো আটপৌরে শব্দাবলিতে কীভাবে এনে দেন এক তাজা স্বাদ, আর ছবি তৈরি করার অজস্রতায় কীভাবে তিনি আবিষ্ট করে ধরেন আমাদের, এইটেই দেখান বুদ্ধদেব। অথবা হয়তো বলেন ঃ জীবনানন্দ নির্জনতার, প্রকৃতির, নস্টালজিয়ার কবি। তাঁর কবিতায় বুদ্ধদেব দেখেন 'স্বপ্নের হাতে আত্মসমর্পণের আকৃতি।'

এর সবই সত্যি, কিন্তু এর মধ্য দিয়ে আমরা ছুঁতে পারি না জীবনানন্দের কবিতার সেই পরিচয়, যাকে তিনি নিজে বলেছিলেন 'সুড়ঙ্গলালিত সম্পর্ক'। কবিতা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে জীবনানন্দ বারে বারেই কেন ঘুরিয়ে আনেন আভা অন্তঃসার বা প্রতিভার মতো শব্দাবলি, কেন তিনি বলেন ভাবনাপ্রতিভা ভাবপ্রতিভা বা কল্পনাপ্রতিভার মতো সমস্তপদ, তা স্পষ্ট হয় না বুদ্ধদেবের আস্বাদন থেকে। পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়েও নতুন এক জলের কল্পনা করতে চেয়েছিলেন এই কবি, সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে দেখেছিলেন এক নতুন দীপ। এইভাবে তিনি দেখেন জল নয়, তার জলত্ব। দীপ নয়, তার দীপতা। অর্থাৎ, বস্তু নয়, এক বস্তুসংগতি। এইখান থেকেই তাঁর কবিতার শুরু।

কিন্তু তার মানে কি তবে এই যে বস্তুপৃথিবী থেকে কেবলই আমাদের দূরে সরিয়ে

নিচ্ছেন এই কবি? বক্তব্যের, ভাবের, ঘোষণা করে বলবার জগৎটা সরে যাচ্ছে বলে নতুন কবিদের আগ্রহ তাঁর প্রতি। কিন্তু সে-আগ্রহ কি বস্তুজগৎ থেকেও বিচ্ছিন্ন করে দিচ্ছে আমাদের? জীবনানন্দের কবিতা কি শেষ পর্যন্ত সেই বিচ্ছিন্নতার কথাই বলে?

জীবনকে এড়িয়ে গিয়ে নয়, এ নয় কেবল অধোজাগতিক চেতনার পথ ; কেবল অবক্ষয়জাত ক্লান্তির মধ্যেই আহ্বান করে না জীবনানন্দের কবিতা। এই কবি বুঝেছিলেন 'সমস্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ আজকের সাথে মিশে গিয়ে বর্তমানকে স্পষ্টতর ভাবে গঠন করে।' নিজেকে তাই অল্প একটু দূরে সরিয়ে নিয়ে যেন বহু দেশ আর বহুকালের সুড়ঙ্গ পথে ধরতে চান তিনি আমাদের সমসাময়িক পৃথিবী, কেননা ঠিক ওই দূরত্বের মধ্যেই

আমাদের বহিরাশ্রয়িতা
মানবস্বভাব স্পর্শে আরো ঋত—অন্তর্দীপ্ত হয়।

আধুনিক কবিতার প্রথম পর্বে যখন প্রখর হয়ে উঠেছিল জ্ঞান আর বুদ্ধির চর্চা, জীবনানন্দ তখন আমাদের নিয়ে যান ইন্দ্রিয়ময় সমস্ত শরীর নিয়ে বেঁচে থাকার এক তীব্র জটিল বাস্তব অভিজ্ঞতায়। আর এরই জন্য, শৈলেশ্বর ঘোষের মতো প্রতিবাদী ক্ষুধার্ত কবিরাও একমাত্র জীবনানন্দেরই মধ্যে—তাঁর নিষ্ঠুর আত্ম-আবিষ্কারের মধ্যে—খুঁজে পান সমমর্মিতা। অবশ্য জীবনানন্দের কবিতাও জানে যে জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই', কিন্তু সে-জ্ঞান কোন্ জ্ঞান? আমাদের এই জিনিসের ভিড় শুধ্—বেড়ে যায় শুধু ; /তবুও কোথাও তাঁর প্রাণ নেই বলে জ্ঞান নেই।' জ্ঞান আর প্রাণের এই সামঞ্জস্য করতে চান জীবনানন্দ। মানুষের ভাষা যে তার অনুভূতিদেশ থেকে আলো না পেলে 'নিছক ক্রিয়া, বিশেষণ, এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল' ভাষাকে সেই কঙ্কাল থেকে উদ্ধার করেন বলেই তিনি তাঁর পরবর্তী কবিদের কাছে এত অমোঘ, এত প্রিয়। এটা হয়তো ঠিক যে জীবনানন্দের বিচ্ছিন্নতা আর রহস্যময়তা যতটা বেশি দৃষ্টি পায় সাম্প্রতিক কবিতায়, ততটা লক্ষ্যে আসে না তাঁর ইতিহাসের বা পরিপার্শ্বের বোধ কিংবা তাঁর এই ভবিষ্যধারণা যে 'শ্লেষও মহান কবিতা হয়ে উঠতে পারেনি—আসছে দশপনেরো বছরে আমাদের দেশে আধুনিক কবিতা এসব পরিণতির দিকে মোড় ঘোরাবে কিনা ভাবছি।' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি যে একদিন 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন, নরকের দাহ নিয়ে ক্রমে উঠে এসেছিলেন তাঁর দেবদারুর জগতে, সেই ইতিহাস আর বিবর্তন হয়তো আজও আমাদের ব্যবহারে আসেনি ততটা, আমাদের এই শতকের/ বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধ্', কিন্তু তবু আমরা তাঁরই ভাষায় ভরসা করে থাকি এই যে

মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো—আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতদূর অগ্রসর হয়ে গেল জেনে নিতে আসে।

জীবনানন্দ

শক্তি চট্টোপাধ্যায়

আমার মনে হয় সবচেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়েছেন আমাদের বয়সী কবিরা জীবনানন্দের দ্বারা। প্রভাবিত হয়েছেন, আবার প্রভাব কাটিয়েও উঠেছেন, তাঁর মতো লেখা তো সম্ভব নয়। কোথাও না কোথাও তিনি থেকে গেছেন। আমার নিজের কথাই বলি—আমার পদ্যের মধ্যে অনেক সময়, জীবনানন্দ রয়ে গেছেন। যেমন সুনীল আমরা 'অনন্ত নক্ষত্র বীথি' কবিতাটি পড়ে বলেছিল যে এর মধ্যে জীবনানন্দের প্রভাব খুব বেশি রয়েছে। এই প্রভাবটা লেখার ভঙ্গিগত দিক থেকে। বিষয়ের দিক থেকে নয়। আমি খুবই সচেতন ভাবে ভঙ্গিতে জীবনানন্দকে নিয়েছি। আবার রবীন্দ্রনাথকেও নিয়েছি। 'ধর্মে আছ জিরাফেও আছ'-তে রবীন্দ্রনাথের মতো ভাষায় লেখবার চেষ্ট করেছি। এর একটা কারণ ছিল। তখন অনেকেই বলত আধুনিক কবিতা সাধারণের জন্য নয়, ওই কবিতা যাঁরা লেখেন বা বিশেষ গোষ্ঠীর পাঠকদের জন্যই লেখা হচ্ছে। তখন বিষয়ের দিক থেকে নয় রবীন্দ্রনাথের ধরনের ছন্দ বা ভাষায় একটু সরল করে নেওয়ার কথা চিন্তা করেই লিখেছিলাম। রবীন্দ্রনাথ থেকে সরে আসতেই হবে।

আসলে কূট ওই সারল্যের মধ্যে কোথাও রইল, সেটিকে তোমারই ভাঙতে হবে। যখন সেইভাবে সফল হলাম তখন ভাবলাম আর দরকার নেই। ততদিনে আমাদের কবিতার পাঠক তৈরি হয়ে গেছে। কবির থেকে কবিতার পাঠকেরা মাত্র এক ডিগ্রি কম সেটা হচ্ছে তাঁরা লেখেন না। আর একজন লেখে। কবিতার পাঠকও প্রকৃতপক্ষে কবিতার লেখক।

সুধীন বাবুর কাজ ছিল ভাস্করের কাজ—একেবারে কবিতা লিখতে বসে যেন ছেনী-বাটালি নিয়ে বসতেন। কম কথায় কাজ করেছেন বাঁধুনি শক্ত করে। কবিত্ব ছিল, কিন্তু excess ছিল না। সংযমের মধ্যে রাখতে পারতেন। জীবনানন্দ পারতেন না। তাঁর কবিত্বের excess যার জন্য জীবনানন্দের সনেট খুব উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠেনি। একটু পেছনে নজরুলের মধ্যে এত পরিমাণ excess যে এখন আর তাঁর কবিতা পড়া যায় না। রবীন্দ্রনাথেও কবিত্বের ছড়াছড়ি—যে কারণে ওঁকে এতদিকে যেতে হয়েছে—কিছুতেই নিজেকে থামাতে পারেননি।

আমার মধ্যেও excess রয়েছে। একে কবিতাও বলা যায় আবার চাপা উত্তেজনা, যে কোন ব্যাপারে প্রতিহত হবার স্বভাব এমন বলা যায়। সেনসিটিভনেসটা বেশী বলা যায়।

জীবনানন্দ দাশের কাব্যাদর্শ

অলোক রায়

অডেন যখন কবিতাকে বলেন 'মেমোরেবল স্পীচ', জীবনানন্দ তার প্রতিবাদ করেন। তাঁর মতে অডেন কবিতার পরিপ্রেক্ষিত ও পটভূমি অতিরিক্ত রকম প্রসারিত করে দেখেছেন। জীবনানন্দ অডেনকে সংশোধন করে বলেন, 'অবিস্মরণীয় বাণী ছাড়া কবিতার অন্য কোনো সংজ্ঞা আমি সম্প্রতি খুঁজে পাচ্ছি না।' স্মরণীয় উক্তি মাত্রই কবিতা নয়, কারণ বাকচাতুর্যও কখনো স্মরণীয় হয়ে ওঠে। সুতরাং 'উক্তি' নয় 'বাণী', 'স্মরণীয়' নয় 'অবিস্মরণীয়'। জীবনানন্দের এই ধারণা সত্য কি মিথ্যা সে সম্বন্ধে কোনো মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন, কিন্তু জীবনানন্দের কাব্যাদর্শ স্পষ্টই বুঝতে পারি, যখন শুনি তাঁর মতে সুধীন্দ্রনাথের 'উটপাখি' কিংবা সমর সেনের 'নাগরিক' কবিতা যথাক্রমে 'স্মরণীয়তার বাণী' ও 'স্মরণযোগ্য বাক্যসমষ্টি' ছাড়া আর কিছু নয়, অর্থাৎ জীবন-সমালোচক এখানে হয়তো নিরেট সাংবাদিকতার দেয়াল টপকে যেতে পেরেছেন, কিন্তু প্রজ্ঞাদৃষ্টি দিয়ে ভাবপ্রতিভাকে শুদ্ধ করে নিয়ে তেমন কোনো জীবনদর্শন সৃষ্টি করতে পারেন নি, যাকে কবিতা বলতে পারা যায়। 'উটপাখি' কিংবা 'নাগরিক' রচনা দুটি জীবনানন্দের এই মাপকাঠিতে কবিতা হয়ে ওঠেনি।

সন্দেহ হয়, জীবনানন্দ এখানে কবিতা-বিচারে বহু প্রচলিত রোমাণ্টিক মাপকাঠিই ব্যবহার করেছেন, রোমাণ্টিকদের মতোই তিনি 'সম্যক কল্পনা আভা'র উপর একটু বেশী গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কবিতার মধ্যে তিনি খোঁজেন 'কল্পনার আলো ও আবেগ'। ফলে তিনি কবির 'চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা' স্বীকার করেও প্রায় রবীন্দ্রনাথের মতোই কিছুটা সোচ্চার কণ্ঠে বলে ওঠেন, 'কবিতা মুখ্যত লোকশিক্ষা নয় কিংবা লোকশিক্ষাকে রসে মণ্ডিত করে পরিবেশন—না, তাও নয় ; কবির সেরকম কোনো উদ্দেশ্য নেই।' এবং কাব্যের ভিতরে জীবনের সমস্যা-উদঘাটন যদি বা থাকে, তবে সে 'উদঘাটন দার্শনিকের মতো নয় ; যা উদঘাটিত হল তা যে কোন জঠরের থেকেই হোক আসবে সৌন্দর্যের রূপে, আমার কল্পনাকে তৃপ্তি দেবে।' জীবন এবং কাব্যের সম্পর্ক নিয়ে জীবনানন্দ অনেক ভেবেছেন জীবনের সঙ্গে কাব্যের যোগ তিনি অবশ্যই স্বীকার করেন, কিন্তু তাঁর কাছে 'কবিতা ও জীবন এক জিনিসেরই দুই রকম উৎসারণ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে ; কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা ইম্যাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না ; কিন্তু কবিতা সৃষ্টি করে কবির বিবেক সান্ত্বনা পায়, তার কল্পনা-মণীষা শান্তি বোধ করে, পাঠকের ইম্যাজিনেশন তৃপ্তি পায়।' বলা বাহুল্য, এই কল্পনা-প্রতিভা বা কল্পনা-মণীষা অধিকাংশ লেখকের মধ্যে নেই, ফলে কবিতার নামে পদ্যই লেখা হয় বেশি। অন্যদিকে যাঁরা কবি, তাঁদের রচনা অধিকাংশ পাঠকই গ্রহণ করতে পারে

না, সম্ভবত কোনোদিনই পারবে না, কবিতায় 'সাময়িকতা ও সময়হীনতার গভীর ব্যবহার যেন মুষ্টিমেয় দীক্ষিতের জন্য শুধু—সকলের জন্য নয়—অনেকের জন্য নয়।'

সকলকে বাদ দিয়ে, অনেককে বাদ দিয়ে কবিতা লেখা কি সম্ভব? হয়তো আধুনিক কবিতার এইটাই সবচেয়ে বড়ো সমস্যা। জীবনানন্দ জানেন, 'বিদেশের আধুনিকেরা এখন সকলেই প্রায় সচেষ্টায় বা অচেষ্টায় লোকায়ত; আমরাও তাদেরই মতন।' কিন্তু 'লোকায়ত' শব্দের তাৎপর্য নিয়ে বিপদ ঘটে। জীবনানন্দ 'শুদ্ধ কবিতা'য় বিশ্বাস করেন। —কেউ কেউ বলবেন কালের মুকুর হিসেবে সাহিত্যকে মেনে নিলে এই বিচ্ছিন্ন যুগে শুদ্ধ কবিতার কোন মানে হয় না।' জীবনানন্দ তার উত্তরে বলেন, 'কিন্তু সাহিত্যকে যদি যুগের দর্পণ হিসেবেই শুধু স্বীকার করে নেওয়া যায়, একটা ক্ষয়িষ্ণু যুগের নির্মম দর্পণ হয়েও সাংবাদিকী ও প্রচারধর্মী রচনার সঙ্গে কবিতার পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত জিনিসগুলোর ভিতর অভিজ্ঞতাবিশোধিত ভাবনা-প্রতিভার মুক্তি শুদ্ধি ও সংহতি কিছুই নেই, কবিতায় তা আছে।'

তাহলে 'কল্পনা-প্রতিভার' সঙ্গে যুক্ত হচ্ছে 'ভাবনা-প্রতিভা।' এই ভাবনা-প্রতিভারই কবিতাকে সর্বজনীনতা দেয়। ব্যক্তির অনুভূতি ও অভিজ্ঞতা শেষ পর্যন্ত আর ব্যক্তিগত থাকে না। জীবনানন্দ স্বীকার করেন, 'কবির আনীত অভিজ্ঞতা কতখানি সার্বিক, কতখানি তার নিজের, এবং নিজের অভিজ্ঞতাকে কতদূর অপরের করে তুলতে পারা যায়—সকলকে না হোক, অনেককেই পরিদীক্ষিত করতে পারা যায় নিজের মূল্যজ্ঞানের চেতনায়—এ দায়িত্ব কবির।' সুতরাং সকলের জন্য না হলেও অনেকের জন্য কবিতা লেখা। কিন্তু তাই বলে লোকায়ত নয়, কারণ 'নগরে বাজারে লোক সমাজে সাধারণ স্পষ্ট কথায়—কথায় মাত্র—এ দায়িত্ব পূর্ণ করতে গেলে তাকে ব্যাহত হতে হবে। কারণ সে সাংবাদিক নয়, অর্থরাজনীতিকও নয়। কিন্তু তার কথা আলাপের পর্যায়ে উঠে, ভাষায় তরঙ্গায়িত হয়ে অসাধারণ হয়ে উঠলেও স্পষ্টতা হারিয়ে ফেলবার নির্দেশ নেই তার—না সমাজ না সময় না নিজের সংহত ভাবনা-প্রতিভার কাছ থেকে; কিংবা তার ব্যক্তিস্বরূপের কাছ থেকে—যা আজকের জিনিস নয় শুধু, মানুষকে মানুষের নিঃশেষে বুঝবার ও বোঝাবার নিরবচ্ছিন্ন চেষ্টার ভিতর থেকে যার জন্ম। কবির ভাবনা-প্রতিভার অবশ্যই স্তরভেদ আছে. সুধীন্দ্রনাথ বা সমর সেনের কবিতায় জীবনানন্দ 'জীবনদর্শন' খুঁজে পাননি। তাহলে জীবনদর্শন বলতে আমরা যা বুঝি তা জীবনানন্দের 'ভাবনা-প্রতিভা' নয়, এমনকি দৃষ্টিভঙ্গী বা বক্তব্যও নয় ; সম্ভবত অনুভূতির সত্যতার উপরই জীবনানন্দ বেশি জোর দিয়ে থাকেন।

এই জন্যই জীবনানন্দ কবিতা রচনার পদ্ধতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে বলেন, তখনই কবিতা লেখা হয়, 'যখনই 'ভারাক্রান্ত' হই, সমস্ত ভাবটা বিভিন্ন আঙ্গিকের পোষাকে ততটা ভেবে নিতে পারি না, যতটা অনুভব করি—একই এবং বিভিন্ন সময়।' কবিরা ভারাক্রান্ত হয়ে কবিতা লেখেন—প্লেটোর সময় থেকে এই মত চলে আসছে। এই থেকেই আসে অন্তঃপ্রেরণার প্রশ্ন ; জীবনানন্দ প্রেরণায় বিশ্বাস করেন, এবং এই প্রেরণার সঙ্গে রোমান্টিক কল্পনা-প্রতিভার ঘনিষ্ঠ যোগ। একটি বাদ দিয়ে অন্যটির কোনো মূল্য নেই, কিন্তু দুয়ের মিলন ঘটে কদাচিৎ, যখন ঘটে তখন সৃষ্টি হয় কবিতা। জীবনানন্দ বলেন, 'নিছক বুদ্ধির জোরে কবিতা লেখা সম্ভব নয়—আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন এবং সে সবের সম্মিলিত সম্বন্ধ—শৃঙ্খলের থেকেই প্রেরণার জন্ম হয়।' কথাগুলো নূতন নয়, রোমান্টিক কবিরা নানাভাবে ব্যাখ্যা করেছেন কবিতায় কল্পনা ও প্রেরণার ভূমিকা। কিন্তু

জীবনানন্দের কবিতা পড়লে, একমাত্র তখনই আধুনিক কবির রচনায় পুরনো কথার নূতন তাৎপর্যটি ধরা পড়ে। যেমন, 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতাটি ঃ

> "হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো ঃ
> চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ ;
> বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর ছায়ারা ইতস্তত
> বিচূর্ণ থামের মতো ; এশিরিয়—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
> শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ;
> 'মনে আছে?' শুধালো সে—শুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন'।"*

এই কবিতাটির সঙ্গে 'বনলতা সেন' কবিতার সাদৃশ্য ও পার্থক্য চোখে না পড়ে যায় না। দুটি কবিতাতেই জীবনানন্দের 'ইতিহাসচেতনার' প্রকাশ ঘটেছে। এবং জীবনানন্দের মতে, 'অন্তঃপ্রেরণাও সব নয়। সংস্কারমুক্ত তর্কের ইঙ্গিত শুনতে হবে; এ জিনিস ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হতে হবে।' আপাতদৃষ্টিতে অন্তঃপ্রেরণার সঙ্গে ইতিহাসচেতনার যোগ ধরা পড়ে না। আসলে কল্পনা-প্রতিভা এবং ভাবনা-প্রতিভার যে সম্মিলনের কথা আগে বলা হয়েছে, এখানে সেই প্রসঙ্গটি মনে করা দরকার। কবির প্রজ্ঞাদৃষ্টি তথা জীবনদর্শনের সঙ্গে এই ইতিহাসচেতনাকে মিলিয়ে নিতে হবে।

কবি তাই অন্তঃপ্রেরণাকে আশ্রয় করলেও আকস্মিকতাকে প্রশ্রয় দেন না। কবিতা রচনার পিছনে রয়েছে একদিকে যেমন কল্পনা-প্রতিভার অনুশীলন, তেমনি অন্যদিকে শুদ্ধ প্রতর্কের ব্যবহার। জীবনানন্দের কবিতায় পাণ্ডুলিপি দেখলে কবির 'ঐকান্তিক কবিতা' রচনার প্রয়াস প্রত্যক্ষ করা যায়। তাই তো তিনি বলেন, 'এই সব কারণেই—আমার পক্ষে অন্তত—ভালো কবিতা লেখা অল্প কয়েক মুহূর্তের ব্যাপার নয় ; কবিতাটিকে প্রকৃতিস্থ করে তুলতে সময় লাগে।' অনুভূতির প্রত্যক্ষতা কাম্য সন্দেহ নেই, কিন্তু অনুভূতির সভ্যতাকে প্রমাণ করাও চাই। আর তখনই অনুভূতির থেকে কিছুটা দূরে সরে আসতে হয়।

কিন্তু সমস্যা দেখা দেয় 'ইতিহাসচেতনা' শব্দটি নিয়ে। ইতিহাস তো শুধু অতীতের ইতিবৃত্ত নয়, সালতামামী বা নামাবলী কীর্তনও ইতিহাসচেতনা নয়। যা ঘটে, যা ঘটেছে তার কার্যকারণসূত্র আবিষ্কার সহজ নয়। ইতিহাসের দ্বন্দ্বমুখর গতিপ্রবাহের স্বরূপটি আবিষ্কার করতে হবে। প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিরোধ—তারও ইতিহাস আছে। কিন্তু অপ্রাপ্তির বেদনা প্রায়শই স্বগতোক্তিতে পরিণত, হাজার বছর ধরে পথ হেঁটেও লক্ষ্যে উপনীত হওয়া যায় না। আশাবাদ মনে হয় আরোপিত, ঘটনা থেকে যায় তথ্যমাত্র, সাংবাদিকতা ও কবিতার ভেদ স্পষ্ট হয় না। জীবনানন্দ কি একেই ইতিহাসচেতনা বলেছেন ঃ

> "নগরীর—পৃথিবীর মানুষের চোখ থেকে ঘুম
> তবুও কেবলি ভেঙ্গে যায়
> স্প্লিণ্টারের অনন্ত নক্ষত্রে।
> পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ ;
> পূর্বদিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা ;

---

* উদ্ধৃত কবিতাটি 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (ভারবি সংস্করণ)-এর অন্তর্গত। সিগনেট বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রকাশিত জীবনানন্দ কাব্যগ্রন্থে অন্য পাঠ আছে। সম্পাদক।

আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা ;
ইয়াঙ্কীর লেন-দেন ডলারে প্রত্যয় ;
এই সব মৃত হাত তবে
নব নব ইতিহাস-উন্মেষের না কি ?—
ভেবে কারু রক্তে স্থির প্রীতি নেই—নেই :—
অগণন তাপী সাধারণ প্রাচী অবাচর উদীচীর মতন একাকী
আজ নেই—কোথাও মিৎসা নেই—জেনে
তবু রাত্রিকরোজ্জ্বল সমুদ্রের পাখি।" (রাত্রির কোরাস)

'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে এই ধরনের একাধিক কবিতা আছে যেখানে রাত্রির অন্ধকার এবং সূর্যের আলোক বিশ্ব-ইতিহাসের নানা ঘটনার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে কিন্তু ইতিহাসচেতনার প্রকাশ ঘটেনি। 'অতি অবিশ্বাস' বা 'বিশ্বাসের বেশি সাচ্ছল্য'—কোনোটাই কাম্য নয়. জীবনানন্দ তা জানতেন। তাই কি মধ্যপন্থা অবলম্বনে তাঁর এত আগ্রহ? বিশ্বাস অবিশ্বাসের সামাজিক পটভূমি বিশ্লেষণে তিনি এতই সাবধানী যে বিপ্লবের অনিবার্যতা মেনে নিয়েও বিপ্লবের দান ও কবিতার প্রেরণা সম্বন্ধে সন্দিহান।

তবে ইতিহাসচেতনা বলতে জীবনানন্দ সম্ভবত সময়চেতনা বুঝেছেন। তা না হলে তাঁর কবিতা ব্যাখ্যা করা কঠিন হয়ে ওঠে। জীবনানন্দ তাঁর কাব্যাদর্শ খুব স্পষ্ট করেই জানান, 'কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার কবিতার অস্থি-র ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান। কাল বা সময় বৈনাশিক ; কিন্তু সে সেই সমস্ত কুয়াশাগুলো কেটে কেটে চলেছে যা পরিপ্রেক্ষিতের ব্যাপ্তি বাড়াবার পক্ষে অন্তরায়ের মতো।' কিন্তু সমাজকে এক একজন কবি এক একভাবে বোঝেন, পাউণ্ডের ক্যাণ্টোজ জীবনানন্দের কাছে কবিতা হিসাবে আপত্তিকর মনে হয়েছে কিন্তু আমরা জানি ক্যাণ্টোজ-এ কবির সমাজ-চেতনা অস্পষ্ট নয়। আসলে সমাজের চিত্র নয়, ইতিহাসের বিবরণ নয়, জীবনানন্দ সমাজ ইতিহাসের পরিবর্তমান রূপটিকে ধরতে চান ; কিন্তু জীবনানন্দ তাকে সাময়িক দৃষ্টি নিয়ে দেখতে রাজী নন, তিনি সময়ব্রহ্মের শুদ্ধস্বরূপ আবিষ্কার করতে চান বলেই সমসাময়িক কালকে অতীত ও আনন্ত্যের দিকে থেকে বিচ্ছিন্ন না করে ঈষৎ নিরাসক্ত দৃষ্টিতে দেখেন। আধুনিকতা সম্বন্ধে জীবনানন্দের ধারণা তাই অনেকটাই রবীন্দ্রনুসারী। জীবনানন্দের লক্ষ্য, সব সময়ের জন্যেই আধুনিক হওয়া। তিনি মনে করেন, 'আমাদের দেশের পুরনো কবিদের একটা বড় কাব্যাংশে, শেক্সপীয়রের নাটক ও সনেটে, ডানের ও রবীন্দ্রনাথের ঢের কবিতায় আধুনিকত্ব ক্ষুণ্ণ হবার কোনো কারণ ঘটবে বলে আজকের দৃষ্টি নিয়ে অন্তত আমি বুঝতে পারছি না।' বলা বাহুল্য এইসব কথার মধ্যে জীবনানন্দের বিশিষ্ট 'সময় চেতনা'ই প্রকাশ পেয়েছে ; এর সঙ্গে এলিঅট বা পাউণ্ড, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দে-কে মেলাতে পারব না। রবীন্দ্রনাথের মতোই জীবনানন্দও 'বচনাতীতের আস্বাদ'কে কবিতা ও আধুনিকতার সমার্থক বিবেচনা করেন।

কিন্তু কখনো সরেও আসতে হয়েছে রবীন্দ্রনাথ থেকে, জীবনানন্দ তা জানেন, কারণ রবীন্দ্রনাথের 'প্রকৃত কাব্যালোকে সমাজ ও ইতিহাসচেতনা একটা নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে।' তাহলে সময়চেতনার সঙ্গেই আধুনিকতার সত্যকার যোগ, সময়চেতনার পরিবর্তন ঘটলে কবির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটে, 'কাজেই এ সব কবিতার (আধুনিক কবিতার) জীবনদর্শন রবীন্দ্র-কাব্যের জীবনদেবতাবোধের চেয়ে অন্য জিনিস। রবীন্দ্রকাব্যের অর্থগৌরবের থেকে এসব আধুনিক কবিতার নিহিত অর্থ পৃথক হওয়ার

দরুণ প্রকাশের ভঙ্গিও স্বভাবতই অন্যরকম হয়েছে।' জীবনানন্দ অবশ্য এই পরিবর্তন বা পার্থক্য সব সময় কাম্য মনে করেননি।

সময়চেতনা রবীন্দ্র-কাব্যেও আছে। তবে জীবনানন্দের মতো সময়চেতনাকেই কাব্যের মূল সুর বলে ঘোষণা করেননি রবীন্দ্রনাথ। জীবনানন্দ তাঁর ইতিহাস চেতনার সঙ্গে সময়চেতনাকে মিলিয়ে নিয়েছেন, তাই তাঁর কাছে 'মহাবিশ্ব লোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো, কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোন মানে নেই আমার কাছে। তবে সময়চেতনার নূতন মূল্য আবিষ্কার হতে পারে।' এই 'সময়ের কাছে' কবির আত্মজিজ্ঞাসা ও আত্মনিবেদন নিয়ে জীবনানন্দের কাব্যজগৎ গড়ে উঠেছে। 'ঝরা পালক' 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে যে ক্ষয়-ধ্বংস মৃত্যু-চিন্তা, 'রূপসী বাংলা'য় যে চিরন্তন বাংলার মুখ, 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে তাকেই কবি দেখেন, 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয় এর মধ্যে সময়চেতনাই জীবনানন্দের কাব্যে নূতন অর্থ পরিস্ফুট করেছে। 'সাতটি তারার তিমির' তাই বিশেষ অর্থেই তিমির হননের গান হয়ে ওঠে। কবির নিজস্ব ইতিহাস ব্যাখ্যা 'সময়ের কাছে' এসে ঃ

> "মানুষেরা বার-বার পৃথিবীর আয়ুতে জন্মেছে ;
> নব-নব ইতিহাস-সৈকতে ভিড়েছে ;
> তবুও কোথাও সেই অনির্বচনীয়
> স্বপনের সফলতা—নবীনতা—শুভ্র মানবিকতার ভোর?
> নচিকেতা জরাথুস্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিনের মনের পৃথিবী
> হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?
> অন্ধকারে ইতিহাস পুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
> যতই শান্তিতে স্থির হ'য়ে যেতে চাই ;
> কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।"

ইতিহাস পুরুষের এই সপ্রতিভ আঘাত না শুনে না দেখে উপায় নেই। কিন্তু এই আঘাত যে দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে সৃষ্টির নব নব পর্যায়ে নিত্য রূপান্তরিত হচ্ছে কবি তাকে শুধু স্বাগত জানাননি, তারই মধ্যে মানবমুক্তির ভবিষ্যৎ সম্ভাবনাকে প্রত্যক্ষ করেছেন ঃ

> "হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
> কেবলি গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে ;
> নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলনসূর্যে মানবিক রণ
> ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন?
> নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে মানুষের চেতনার দিন
> অমিয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাসভুবনে নবীন
> হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির ষাট বসন্তের তরে!
> সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
> চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয় ;
> জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।"

এইভাবেই জীবনানন্দ সময়-প্রসৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে

মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে আস্থা লাভ করতে চেষ্টা করেছেন। এবং এই প্রত্যয় বা আস্থা মহৎ কবিতার লক্ষণ বলে মনে করতেন জীবনানন্দ। একদিকে 'ঋণ, রক্ত, লোকসান, ইতর, খাতক', অন্যদিকে একাকী নাবিক 'ঋণ শোধ করে দিতে গিয়ে এই 'অনন্ত রৌদ্রের অন্ধকার'-এ পথ অনুসন্ধান ক'রে। এই নিয়েই জীবনানন্দের কাব্যের জগৎ।

মেলাতে চেষ্টা করেছেন তিনি, অনেকের মতে তিনি মেলাতে সক্ষম হয়েছেন। কিন্তু জীবনানন্দের কাব্যে বিরুদ্ধ সুরের সমাবেশই আমার বেশি চোখে পড়ে। 'দু-দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ' স্পষ্ট দেখতে পাই, কিন্তু 'পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর / আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায় / অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্য সাগর' আমি শুনতে পাই না। তাই শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দের ইতিহাসচেতনা মনে হয় সংকীর্ণ ও আরোপিত। তাঁর সময়চেতনা অনাদি অনন্ত অবিনাশ-এর অনুপ্রাসে আশান্বিত করেও কোনো 'মহৎ জীবনদর্শন' সৃষ্টিতে অপারগ।

জীবনানন্দ দাশ ঃ একটি ভূমিকা

আবদুল হাফিজ

যেহেতু জীবনানন্দ দাশ সমসাময়িক কবি ও আধুনিক, যাঁর ভেতরে সমকাল অন্তঃশীলা নদীর মতো লীন হয়ে আছে, অথচ বিশ্বজনীনতা, রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে যাঁর কাব্যে প্রাচীন ও প্রদীপ্ত, যাঁর কাব্যে স্বদেশ ও বিদেশ অর্থাৎ ভারতীয়, সমগ্র ইউরোপীয় ভূখণ্ড, ব্রিটন দ্বীপ এমনকি মার্কিন মহাদেশীয় হাওয়া ও আবহাওয়া সচেতনভাবে জড়িয়ে আছে, যে-কবি কাব্যের কলা বা শিল্প সম্বন্ধে আধুনিকতমদের মধ্যে আশ্চর্য সাবধানী এক অভিজ্ঞতা রেখে গিয়েছেন, তাঁর আলোচনা এসব কারণে ও অন্যবিধ কারণেও খুবই জটিল।

আধুনিক কবিতার দুর্বোধ্যতার জন্যে পাঠকেরা বিরক্তিকর সিদ্ধান্তে পৌঁছে গেছেন। অথচ জিজ্ঞাসু ও সচেতন অনুশীলন নেই বলে এবং যেহেতু আধুনিক কবিরা প্রাচীন এবং চলতি ছন্দে অর্থাৎ পয়ার ও মাত্রাবৃত্ত ও অক্ষরবৃত্তের পথ ছেড়ে মিশ্র ছন্দে লেখেন, এবং আরও যেহেতু এসব কবিরা সাধু ভাষা কিংবা চলতি ভাষায় নয়, বরং এক আড়ালের ভাষায়, কাকলি কূজনের ভাষায় অথবা কোনো-এক প্রেমিক যুগলের ঘনিষ্ঠ ভাষায় কথা বলেন, সেজন্য আধুনিক কবিতা দুর্বোধ্যতা ছাড়া আর কিছুই নয় বলে মনে হয়।

সাহিত্যের ইতিহাসে মাঝে মাঝে আন্দোলন ও মতবাদ আলোড়নের ঝড় তোলে আর কবিতা যদি এ ধরনের আন্দোলনজাত ও মতবাদগত হয়, তাহলে অ-পড়ুয়া পাঠকের করুণ অস্বস্তি আসবে ; এবং তার বিবর্ণ চিন্তাধারা আর একবার আহত হতে বাধ্য। আধুনিক কবি কবিতায় form নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে ভালোবাসেন বলে এবং বিষয় নির্বাচনের ব্যাপারে স্বকীয়তার পক্ষপাতী বলে রাজনীতি থেকে যৌনবোধ তাঁদের কবিতায় উপস্থিত থাকে এবং যেহেতু পুরনো জংধরা নীতিবোধ আমাদের আছে, আমরা তাই বারংবার কামানের গুলির শব্দে অস্থির হই।

জীবনানন্দের কবিতায় আধুনিকতার সমস্ত দিক পরিস্ফুট। যেমন ঃ

(ক) তাঁর জীবন-দর্শনে,

(খ) তাঁর বিশুদ্ধ চেতনার কবিতায়,

(গ) প্রকৃতির রূপায়নে,

(ঘ) তাঁর ইতিহাসচেতনা ও ঐতিহ্যবাদে,

(ঙ) এবং তাঁর প্রতীক কবিতায়।

অবশ্য এ ভাবে তাঁকে ভাগ করা যায় না। কেননা তাঁকে ঘিরে আছে এক অখণ্ড অবিভাজ্য পরিমণ্ডল। তাঁর জীবন-দর্শন, প্রতীক, ইতিহাস-চেতনা ও ঐতিহ্যবাদ কেন্দ্রীভূত হয়ে আছে তাঁর কবিতায়—শুধু কাজ করবার সুবিধে হবে বলে এভাবে ভাগ করা হোল। জীবনানন্দের কাব্য সাধনায় তাঁর জীবনাদর্শ মৌলিক উপাদান হিসাবে দেখা যায়নি, তবুও

নানা কবিতায় তাঁর জীবনদর্শন বিভিন্নভাবে ছড়িয়ে আছে। কোথাও স্পষ্ট, কোথাও আবছায়া। এসব বিভিন্ন কবিতা বা অংশ থেকে একটি সম্পূর্ণ দর্শনে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

মনে হয় তাঁর মধ্যে ভাববাদী দর্শনের প্রভাব আবছা হলেও আছে এবং ফল্গুধারার মতো তাঁর কবিতার অন্তঃসার। যতটুকু জানা যায় জীবনানন্দের ব্যক্তিগত জীবনের চারদিকেও বৈরাগ্যের এক প্রতিভা সর্বদা বিরাজ করতো। কিন্তু তিনি কীটসের মতো তীক্ষ্ণ ইন্দ্রিয়বিলাসী এবং তার এ বিলাস তাঁর কবিতায় প্রকট হয়ে আছে। শব্দ-রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ তাঁর কবিতার অবয়বে আভাবিজড়িত হয়ে আছে। তাহলে আবার মনে হতে পারে, বৈরাগ্যের সাথে এ ভোগ তৃষ্ণাটি থাকে কি করে? বলা যায় যে তিনি ভারতীয় বেদান্ত দর্শন কিংবা তান্ত্রিক মতে আস্থাশীল নন, অথবা এলিয়টের মতো ধর্মের দুর্গম দুর্গে তিনি আশ্রয় নেননি বরং তিনি সমস্ত ইন্দ্রিয়কে প্রস্তুতির অবস্থায় রাখতেন, কোনো মুহূর্ত যেন বাদ না পড়ে। দিন-রাতের মুহূর্তগুলো বিচিত্র বর্ণ-গন্ধ-স্বাদ বিজড়িত শাড়ির মোড়কে দেখা দিয়েছে তাঁর কাব্যে। মহাকাল যেন তার পুষ্পবাসর। তাঁর ভোগের মধ্যে ছিল প্রচণ্ড বেগ, তার প্রকাশও আবেগময়। তবু এ ভোগের মধ্যে এক সুনীতি ও সুমিতি তাঁকে সর্বক্ষণ আঁকড়ে থেকেছে। এতে উচ্ছলতা নেই, আছে পরিমিতির পবিত্রতা । বলা যায় তাঁর আদর্শের জন্মভূমি ভাববাদ কিন্তু তাঁর মর্ত্যপ্রীতি অসীম কামনায় বিহ্বল। তাঁর সৌন্দর্য সাধনার মধ্যে তাঁর আদর্শের চরম বিকাশ। এ সাধনা প্রায় ধর্ম হিসেবে দেখা দিয়েছে।

অনেকে বলেন, তিনি নির্জনতম কবি, তাঁর কবিতায় যেন যুগ ও জীবন সম্পর্কে এক শীতল অচেতনতা আছে। অথচ প্রগতি ও জীবনের প্রতি এক দুনির্বার ভালোবাসা আছে বলেই এই যন্ত্রযুগের দৈন্যকে তিনি বর্শাতীক্ষ্ণ কবিতায় আঘাত করেছেন এবং আরো বর্তমান ক্লেদ-ভরা সামাজিক অচলায়তন থেকে জীবনের মুক্তিতে তাঁর গভীর আস্থা আছে বলেই তাঁর কবিতায় অশ্রুর লবণাক্ত স্বাদ বারবার অনুভব করি। আর এই একটি ক্ষেত্রে এলিয়টের বিশ্বাসের অংশীদার না হলেও এলিয়টের এ যুগ সম্বন্ধে যে অশ্রুসিক্ত অভিজ্ঞতা তার সন্ধান পাই, সন্ধান পাই যে এক নিবিড় ট্রাজেডি জীবনানন্দের কাব্যে প্রতিমার রূপ পেয়েছে। তাঁর জীবনাদর্শ আলোচনা প্রসঙ্গে একথা বলা যায় ধর্ম নয়, কোনো বিশেষ মতবাদ নয়, রোমান্টিকতা-রঞ্জিত এক মানবিকতাই তাঁর প্রার্থনা। তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছে গোধূলিলগ্নে কোনো-এক শুভ্র মানবিকতার ভোরের উদ্দেশে। কবির 'স্বপ্নের হাতে' ও 'বোধ' কবিতায় তাঁর আদর্শের পরিচয় রয়েছে—

> পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
> হৃদয়ে বেদনা জমে, স্বপনের হাতে
> আমি তাই
> আমারে তুলিয়া দিতে চাই

অথবা

> সব ছেড়ে আমাদের মন
> ধরা দিতো যদি এই স্বপনের হাতে!
> পৃথিবীর রাত আর দিনের আঘাতে
> বেদনা পেতো না তবে কেউ আর—

অন্যত্র সকলকে ডাক দিয়েছেন তাঁর বিশ্বাসের অংশীদার হবার জন্য,

> তোমরা চলিয়া এসো—

তোমরা চলিয়া এসো সব!

ভুলে যাও পৃথিবীর এই ব্যথা—ব্যাঘাত—বাস্তব!

এগুলোতে তার দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির নিশ্চিত প্রমাণ না পেলেও আভাস পাই। জীবনানন্দের কতকগুলো কবিতায় বিশুদ্ধ চেতনাই প্রধান অর্থাৎ এগুলোতে ইতিহাস-চেতনা বা প্রতীক নেই। এদের মধ্যে 'বোধ', 'স্বপ্নের হাতে', 'অবসরের গান', 'ঘাস' ও 'মৃত্যুর আগে' কবিতাগুলো বিশিষ্টতার দাবী করতে পারে। 'অবসরের গানে' অলসতার মাধুর্য, 'ঘাস' কবিতায় প্রাণচেতনার সাথে একাত্মতাবোধ, 'বোধ' কবিতায় বিচিত্র মুহূর্ত ও বিভিন্ন পার্থিব বস্তু সম্পর্কে ক্ষণিক চেতনা, 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় মানবজীবনের সাধ সম্বন্ধে কবি আবেগকে প্রকাশ করেছেন।

'বোধ' কবিতায় তিনি বস্তুভারপীড়িত বিশ্বের হাত থেকে মুক্তি কামনা করেন,

একদিন

এই সব সাধ

জানিয়াছি একদিন—অবাধ—অগাধ ;

চ'লে গেছি ইহাদের ছেড়ে ;

ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে,

অবহেলা করে দেখিয়াছি মেয়েমানুষেরে ;

অন্যত্র তিনি জীবনের প্রতি গভীর ভালোবাসা প্রকাশ করেছেন ঃ

সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা-একা কথা কয়!

অবসাদ নাই তার? নাই তার শান্তির সময়?

কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ

পাবে নাকি ?

ইংরেজ কবি টেনিসন তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'Lotus Cater' এ ইংরেজী স্বরবর্ণের অপরূপ ব্যবহার করে আলস্য ও ঘুমের আবেশ এনেছিলেন। জীবনানন্দ 'অবসরের গান' কবিতায় বাংলা বর্ণের সার্থক ব্যবহার করে ঐ ফল উৎপন্ন করতে পেরেছিলেন।—

হাতে হাত ধ'রে-ধ'রে গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে

কার্তিকের মিঠে রোদে আমাদের মুখ যাবে পুড়ে ;

এখানে একটি নাচের দৃশ্য ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। দুটি পংক্তিতে 'র' বর্ণ এমন এক অনুপ্রাসে পরিণত হয়েছে যার উদাহরণ অন্যত্র বেশী নেই। বাংলা স্বরবর্ণের দীর্ঘীকরণ এখানে আশ্চর্য ফসল দিয়েছে। 'র' তরল ধ্বনি যেহেতু সেহেতু দীর্ঘস্থায়ী এক কম্পন সৃষ্টি করেছে। ১৩ বার 'এ' এবং 'ত' বর্ণটি ৫ বার ব্যবহৃত হয়েছে। জীবনানন্দে ধ্বনি সচেতনতার জন্মভূমি তাঁর উর্বর হৃদয়ের পলিমাটি। Pope বলেছিলেন 'The Sound must seem an echo to the sense', তার যাথার্থ্য রয়েছে এখানে।

'ঘাস' কবিতায় বিশ্বময় যে-প্রাণ বিস্তৃত কবিপ্রাণ তার সাথে মিলনের জন্য আগ্রহী,

এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখে ঘষি,

ঘাসের পাখনায় আমার পালক

ঘাসের ভিতরে ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো-এক নিবিড় ঘাস-মাতার

শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

মনে হয় স্বল্প পরিসরে রবীন্দ্রনাথ ও ওয়ার্ডসওয়ার্থের মর্তের সঙ্গে একাত্মতার ব্যাকুলতাটি কখনো এতো আকুল হয়ে দেখা দেয়নি।

রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পর আধুনিকদের মধ্যে এত বড় প্রকৃতিসচেতন কবি আর নেই। কবির কাব্যগ্রন্থ "রূপসী বাংলা"ই কবির প্রকৃতি-চেতনার বড় প্রমাণ। 'মৃত্যুর আগে' ও 'অবসরের গান'-এ প্রকৃতি-চেতনা প্রধান হয়ে দেখা দিয়েছে,

আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ-সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ;

অথবা

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নিচে চড়ুয়ের ডিম যেন নীল হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বারবার তীরটিরে মাখে।

'অবসরের গানে' তিনি গাঁয়ের কথা স্মরণ করেছেন ঃ

চোখের সকল ক্ষুধা মিটে যায় এইখানে, এখানে হতেছে স্নিগ্ধ কান,
পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি-ধানভানা রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।

বাংলাদেশের প্রকৃতি ধরা পড়েছে তাঁর কবিতায়। তাঁর কবিতায় প্রকৃতি কখনো পটভূমি, কখনো নায়িকা।

জীবনানন্দের কবিতার ক্ষেত্রে কালচেতনার প্রয়োগ খুব বেশী দিনের নয়। বোদলেয়ার, এলিয়ট ও পাউণ্ডের সাথে যোগাযোগের ফলে এর উৎপত্তি। 'ব্যক্তি-আমি'র আয়ু খুব বেশী নয়। কিন্তু মানবীয় অস্তিত্ব তো একদিনের ব্যাপার নয়। কাল ব্যক্তির জীবনে স্বল্প কিন্তু মানবীয় সমষ্টি জীবনের ধারা অবিচ্ছিন্ন। কাল সেখানে পরাস্ত। তাই কবি বলেন,

মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায় : অতীতের থেকে আজকের মানুষের কাছে
প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।

কবি আরও বলেন ঃ

না হ'লে এ ছাড়া
কোথাও অন্য কোনো প্রীতি নেই।

জীবনানন্দ দাশ অতীতের দীর্ঘ কুয়াশাময় সড়কে আপন অস্তিত্বকে সম্প্রসারিত করেছেন আর স্নাত হয়েছেন আশীর্বাদে। মানব সংস্কৃতির অবিচ্ছিন্ন ধারার প্রতি তাঁর গভীর শ্রদ্ধা ছিলো। তিনি এলিয়টের মতো পৌরাণিকতাকে আধুনিকতার পাশে রেখে কবিতার আবেদনকে অযথা ভারাক্রান্ত করেননি। শুধু আপন অস্তিত্বকে অতীতের মানুষ-মানুষীদের অস্তিত্বের সাথে মিশিয়ে দিয়েছেন, আবার কখনো কোনো সুদূর স্থানে নিজেকে নিয়ে গিয়েছেন—প্রত্যক্ষকে প্রচ্ছন্নের সাথে, নিকটকে দূরের সাথে, বর্তমানকে অতীতের কাছে লীন করে দিতে চেয়েছেন। আর সৃষ্টি করেছেন পলিমাটি-ভরা এক উজ্জ্বল সংযোগভূমি। এর সাথে অন্য কোন দার্শনিকতা নেই বলে আমরা তাঁর কাছে আরো ঋণী।

'পথ হাঁটা' কবিতাটি ক্লান্ত, সে-ক্লান্তির কোনো সীমা নেই। সেই একঘেয়ে ঘুম আর শান্তি, সেই নিবিড় নির্জনতা বহু পথ অতিক্রম করে বহু অস্তিত্বকে ক্লান্ত করে বেবিলন পার হয়ে কলকাতা এসেছে একবার। কবি জানেন তাঁরই মতো আরো কোনো মানুষ 'কি এক ইশারা' সামনে রেখে কর্মব্যস্ত দিন শেষ হলে, রাত গভীরতর হলে, নির্জনতার স্বাদের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠতো।

বেবিলনে একা-একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর

কেন যেন ; আজো আমি জানি নাকো হাজার-হাজার ব্যস্ত বছরের পর।

'বনলতা সেন' বর্তমান ও অতীতের সমস্ত প্রিয়তমাদের মুখ। আবার ইতিহাস-চেতনা এর কেন্দ্রভূমিতে বিরাজ করেছে বলে এর মাধুর্য আরো গভীর। এতে ব্যবহৃত নামগুলো কবির ঐতিহ্যবাদী মানসিকতার উজ্জ্বল স্বাক্ষর বহন করেছে—তবে এ সত্ত্বেও নামগুলোর ব্যবহার আকস্মিক। পৃথিবীতে কতো প্রেমিক এসেছে আর ভালোবেসেছে, সিংহল সমুদ্রে, বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে অথবা বিদর্ভ নগরে। কবিতাটি সাময়িকতা কাটিয়ে বিশ্বজনীনতার অমৃত স্পর্শ লাভ করেছে।

সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন ;

থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

বনলতা সেনরা মরে যায়, হারিয়ে যায়, ঝরে যায় তবু তার স্মৃতি থাকে--তাই নিয়ে জোনাকি-উজ্জ্বল সন্ধ্যার অন্ধকারে আলাপ জমে ওঠে হৃদয়ের তানপুরায়।

'সুরঞ্জনা' কবিতাটিতে সুরঞ্জনাও প্রেমেরই প্রতীক। সুরঞ্জনা পৃথিবীর বয়সিনী কোনো-এক মেয়ের মতন। এক প্রেমিকের প্রেমিকাকে পৃথিবী হারিয়েছে আবার অন্যকে পেয়েছে—তাই নদী—প্রেমের নদী মহাকালের পথে প্রবাহিত হচ্ছে। অশোক ধর্ম প্রচারের জন্য মহেন্দ্রকে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো-এক মানবীর প্রাণকে যে কখনো পেলো না, তার অন্য কিছু হবে কি করে? কবি তাই বলেন :

...তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে

সেই ইচ্ছা সংঘ নয়, শক্তি নয়, কর্মীদের

সুধীদের বিবর্ণতা নয়,

আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

কর্মীর কর্মাবেগ ও সুধীজনের বৈদগ্ধ্যকেও ভালোবাসার বৃষ্টিতে স্নাত হতে হয়, না হলে আলোর সন্ধান কখনো পাওয়া যায় না। সুচেতনা তাই দেহ দিয়ে ভালোবেসেও ভোরের কল্লোল হয়ে রইলো। 'সবিতা' ও 'সুচেতনা' কবিতা দুটিতে সবিতা ও সুচেতনাও গভীর প্রেমের প্রতীক। তবে কবি বর্তমান কালের প্রেমের সমালোচনা করে তার সঙ্গে অতীতকালের প্রেমের তুলনা করেছেন :

এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে ;

কি এক অপব্যয়ী ক্লান্ত আগুন!

এ কবিতায় কবি ঐতিহাসিক প্রেমিকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন। বিরক্তির হিমকণা স্পষ্টভাবে অনুভব করা যায় এ কবিতায় 'সুচেতনা'তে,

আজকে অনেক রূঢ় রৌদ্র ঘুরে প্রাণ

পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো

ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু

দেখেছি আমার হাতে হয়তো নিহত

ভাই বোন বন্ধু পরিজন প'ড়ে আছে ;

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন।

কবি এখানে প্রাক্তন প্রেয়সীকে আহ্বান করে বর্তমান যুগের অসুস্থ প্রেমের কথা জানিয়েছেন। ব্যথা-ম্লান কবিহৃদয়ের পরিচয় আছে এতে। কবি বলিষ্ঠ আশাও প্রকাশ করেছেন, কেননা এ অসুখ তো চিরকাল থাকবে না :

সুচেতনা, এই পথে আলো জ্বেলে—এ পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ :

'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতায় বনলতা সেন প্রেমের প্রতীক হিসেবে আর একবার দেখা দিয়েছে। অবশ্য এর প্রতিবেশ সৃষ্টি করেছে প্রাচীন মিশর ও মেসোপটেমিয়ার স্থলখণ্ড—ইউফ্রেটিস আর টাইগ্রীসের প্রাচীনতম অববাহিকা। 'হাওয়ায় বাত' কবিতাটিতে কবির ইতিহাস-চেতনা একটি প্রগাঢ় অভিব্যক্তি লাভ করেছে। মানবজাতি ক্রমাবর্তনের পথে এগিয়ে চলেছে—কবি তাই অতীতের মধ্যেও বেঁচে আছেন। ধারাটি অলক্ষ্যে বয়ে চলে বটে, কিন্তু তার সাথে কবি-জীবনও অচ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। তাই,

যে-নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার-হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে
তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে ক'রে এনেছে।

লাখো লাখো জীবিত মানুষ একদিন আজকের পরিচিত আকাশ দেখেছিল কিন্তু কবির অনুরাগী বিশ্বাসী চোখ অবশ্য সেসব মৃত আকাশকেও খুঁজে পেয়েছে। জীবনানন্দ দাশই প্রথম কবি যিনি 'ইতিহাস' কথাটার বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য গ্রহণ করতে পেরেছিলেন। এ কবিতায় তাই 'ইতিহাস-চেতনা' কখনো 'প্রবল নীল অত্যাচার', কখনো 'বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধ', অথবা 'মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জন', কখনো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব কোমল উচ্ছ্বাস বা 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততা'। এ কবিতাতেও অতীতকালের রূপসীদের কবি স্মরণ করেছেন,

যে-রূপসীদের আমি এশিরিয়ায়, মিশরে, বিদিশায় ম'রে যেতে দেখেছি
কাল তারা অতি দূর আকাশের সীমানার কুয়াশায়-কুয়াশায়
দীর্ঘ বর্শা হাতে ক'রে
কাতারে-কাতারে দাঁড়িয়ে গেছে যেন।

কবির অর্ধেকেরও বেশী কবিতা প্রতীকধর্মী। প্রতীকবাদ সাহিত্যের ইতিহাসে একটি আন্দোলন। এ আন্দোলন কতখানি সুস্থতা নিয়ে এসেছে তা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে তর্ক চলেছে। যদিও আজ প্রতীকবাদী সাহিত্যের পরিমাণ কম নয় তবু প্রতীকবাদকে আজও অনেকেই স্বীকার করতে পারেনি। প্রতীকবাদ কখনো কখনো অবৈজ্ঞানিক 'গভীরতর অসুখ' হিসেবে দেখা দিতে পারে। প্রতীকবাদ যদি বিলাসী হয়ে ওঠে, তাহলে তাকে অসুস্থ অবস্থাই বলা যেতে পারে। এ জন্যেই ফরাসী প্রতীকী কবি মালার্মে, মার্কিন কবি এজরা পাউণ্ড ও রুশ কবি আলেকজাণ্ডার ব্লক আজও বৃহত্তম জনতার কাছে পৌছাতে পারেননি। তবুও উপযুক্ত প্রতিভার হাতে প্রতীক সার্থক হয় ও প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে। ইয়েটস ও এলিয়ট তার স্বাক্ষর।

জীবনানন্দ দাশের প্রতীকগুলোর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, সেগুলো প্রগাঢ়ভাবে ব্যক্তিগত, আর তা নানা স্থানে নানা অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ একটি ভাব বা ভাবনা বা আবেগের জন্য কবি অনেকগুলো প্রতীক ব্যবহার করেছেন। সেজন্যে কবির প্রতীকগুলোর সঠিক অর্থ উদ্ধার সম্ভব হয় না। উদাহরণ স্বরূপ জলসিঁড়ি বা ধানসিঁড়ি প্রতীক দু'টি স্মৃতির প্রতীক। কবি যেন সচেতন ভাবেই একই বস্তুর জন্য বিভিন্ন প্রতীক ব্যবহার করেছেন। অরুণিমা সান্যাল, বনলতা সেন, সবিতা—এরা সবাই প্রিয়তমাদের প্রতীক অথচ একটি স্থির প্রতীক ব্যবহার করলেই ভালো হতো মনে হয়। কিন্তু র‍্যাঁবোর

মতো জীবনানন্দ-প্রতিভাও সর্বদা কি এক ঘর্মসিক্ত জ্বরে ভুগতো। তিনি যেখানে নারীকে প্রতীক করেছেন, সেগুলো সবই প্রেমের। আর সেজন্যই সেগুলো স্নিগ্ধতা এনেছে কবিতায়। কিন্তু যেখানে জন্তু-জানোয়ার বা পাখিকে প্রতীক হিসেবে নিয়েছেন তখন সেগুলো বিশেষ অর্থ বহন করে।

যেমন 'হায় চিল' কবিতায় 'চিল' কল্পনার প্রতীক। পাখি হিসেবে 'চিল' প্রিয় এবং সুন্দর না হলেও কবি খুঁজে পেয়েছিলেন যে 'চিল' আকাশের নীলিমার কাছে না-হোক তার কাছাকাছি যেতে পারে এবং বহু দূরস্থিত যে-কোনো শিকারকে সে দেখতে পায়। কল্পনারও পাখা আছে আর অনায়াসে তা হৃদয়ের অন্ধকার গুহায় যেতে-আসতে পারে। 'বিড়াল' কবিতায় 'বিড়াল' এবং 'পেঁচা' কবিতায় 'পেঁচা' সময়ের প্রতীক। এখানে বিড়াল ও পেঁচার রহস্যময় আচরণের সাথে আমাদের ঘনিষ্ঠতা আছে বলেই জানি মহাকালও কম রহস্যময়ী নয়।

পেঁচা প্রতীক হিসেবে দেখা গেছে তাঁর বিভিন্ন কবিতায়। কবির অধিকাংশ প্রতীকগুলো তাঁর আবিষ্কার কিন্তু কতকগুলো প্রতীক বহু ব্যবহৃত এবং এগুলোর অধিকাংশ ইংরেজী সাহিত্য থেকে নেয়া হয়েছে। যেমন 'শিকার' কবিতায় 'হরিণ' শুভ্র মানবিকতার প্রতীক (ব্লেকের sheep-এর সাথে তুলনীয়), 'নগ্ন নির্জন হাত' কবিতায় 'হাত' বিশেষ করে 'নগ্ন হাত' প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত। পাখির প্রতীকও পুরানো, ইয়েটস তাঁর কবিতায় পাখিকে বহুবার ব্যবহার করেছেন প্রতীক হিসেবে। কবির 'সিন্ধু-সারস' কবিতায় 'সারস' ও 'বুনোহাঁস' কল্পনার প্রতীক, শেলীর skylark-কে স্মরণ থাকলে 'সিন্ধু-সারস'কে চিনতে কষ্ট হয় না। 'হাঁস'ও তো নতুন নয়। 'শকুন' কবিতায় 'শকুন' যুদ্ধ ও ধ্বংসের প্রতীক— এর সাথে অমঙ্গল, দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সম্পর্কের কথাটাও আমাদের অজানা নয়। 'ব্যাং'কে কবি গলিত পূতিগন্ধময় জীবনের প্রতীক করেছেন, 'as ugly as toad' এই অর্থে প্রতীকটি ইংরেজী থেকে নেয়া। অতিবাস্তববাদের প্রভাব জীবনানন্দের উপর খুব বেশী নয়। কবির গুটিকয়েক কবিতায় সুররিয়ালিজম স্পষ্টভাবে দেখা দিয়েছে। সুররিয়ালিজমের জনক হলেন আঁদ্রে ব্রেতোঁ। এ আন্দোলনের (বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের গোড়া থেকে যে-আন্দোলনের সূত্রপাত) আর-এক বিপ্লবী পূর্বসূরী দাদা (Dada)। সুররিয়ালিজমের উৎসভূমি ফ্রয়েডের মনস্তাত্ত্বিক আলোচনা। দাদা কিন্তু অবচেতন মনের ক্রিয়াবলীকে নৈরাজ্যবাদীদের মত ব্যাখ্যা করেছে। দাদা সর্ববিধ মানবিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছে জেহাদ—সাহিত্য, সমাজ, শিল্প, নীতি বা দর্শন কোনো কিছুই তার আক্রমণ থেকে বাদ পড়লো না। তার মনে হয়েছিলো জীবন যেন মায়াজাল, কুহেলিকা, রহস্যময় আর বিরক্তিকর। দাদা আত্মহত্যা ছাড়া বাঁচবার কোনো পথ খুঁজে পেলো না। এই উন্মত্ত হতাশাই তখনকার জীবনদর্শন। কিন্তু এই বিপ্লবী নৈরাজ্যবাদ যে একটি নৃশংস অত্যাচার তা দাদার অনুসারীরা বুঝতে পারলেন এবং শেষ পর্যন্ত দাদাবাদী আন্দোলন থেকে বেরিয়ে এলেন। এরা যে নতুন সনদ (১৯২৪—প্যারীতে) ঘোষণা করলেন (আঁদ্রে ব্রেতোঁ তাঁর Manifesto du Surreadlism প্রকাশ করেন) তাই সুররিয়ালিজম নামে পরিচিত। Psychic Automation বা স্বয়ংক্রিয় অবচেতন মনের ক্রিয়াকে (actions performed unconsciously) বাংলায় বাস্তববাদের বাস্তববাদ বা অতিবাস্তববাদ বলে অভিহিত করা হয়।

সুররিয়ালিজম এক নব ধর্ম যেন। এ নতুন মতবাদ শিল্পের জগতে একটি বিপ্লব। এ বিপ্লব শেখালো বিশ্বাসীর কাছে সব সম্ভব। এঁরা ঘোষণা করলেন তর্কশাস্ত্র মিথ্যে এবং

যাকে আমরা Intelligence বলি তাও মিথ্যে। কবিতা হলো অবচেতন মনের অবিরাম ক্রিয়ার ফল, A perpetual flow of irrational thoughts in the form of images. এসব কবিরা দাবী করলেন যে তাঁরা আমাদেরকে আমাদের মনের সুপ্ত ও লুপ্ত দিকের নগ্ন চিত্র উপহার দিলেন। লিখিত শব্দের মাধ্যমে আমাদের মনের hidden nakedness' কবিতায় একটা দৃষ্টিগ্রাহ্য অনুবাদে (visual reproduction) সার্থক হলো। কাজেই এসব কবিরা কখনও শুধু image বা fantasy নির্মাণ করে চললেন অথবা মনের ফিল্মে যতকিছু ছায়াপাত ঘটালো তার একটা গাণিতিক হিসেব দাখিল করে ক্ষান্ত হলেন। কবিতার প্রকারভেদে এদের আস্থা নেই। কিন্তু মনের অবচেতনের বিষয়বস্তুই কি কবিতার বিষয়বস্তু না একটি নির্বাচন, পর্যবেক্ষণ ও যোগ-বিয়োগের প্রয়োজন হবে? সমস্ত সুররিয়ালিস্ট শিল্পীকেই এই দুটি প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয়েছে। ব্যক্তি মাত্রই নিজ মনের অবচেতনের ভাব জানাতে পারেন। কারণ এখানে একই ব্যক্তি subject এবং object, আর তা ছাড়াও মানবীয় অস্তিত্ব কি শুধুই অবচেতন মনের সমষ্টি? আমাদের সদা জাগ্রত মন (চেতন মন) যদি সর্বদা প্রস্তুতির পথে থাকে তাহলে অবচেতন মনের কিছু-কিছু প্রধান ও তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা লিপিবদ্ধ করলেও করতে পারে। কিন্তু ফ্রয়েডীয় মনস্তত্ত্বে তো যে-কোনো সাধারণ ও তাৎপর্যবিহীন ঘটনা মানব-জীবনে অবহেলার ব্যাপার হতে পারে না। এখানেই সুররিয়ালিজমের ভিতরে একটা দ্বন্দ্ব বর্তমান।

জীবনানন্দ দাশের 'সৃষ্টির তীরে' কবিতাটিতে সুররিয়ালিজম স্পষ্ট ভাবে প্রকাশিত হয়েছে ঃ

> বিকেলের থেকে আলো ক্রমেই নিস্তেজ হ'যে নিভে যায়—তবু
> ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে ঃ
> হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে ;
> সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে ঃ
> সচ্ছল কঙ্কাল হ'য়ে গেছে তারপর,
> বিলোচন গিয়েছিলো বিবাহ ব্যাপারে ;
> প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে,
> সভাকবি দিয়ে গেছে বাকবিভূতিকে গালাগাল।
> সমস্ত আচ্ছন্ন সুর একটি ওঙ্কার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়।

উদ্ধৃতিটিতে মোট সাতটি চিন্তাকে স্থান দেয়া হয়েছে। এদের মধ্যে পারস্পরিক সম্বন্ধ নেই। কবির অবচেতন মনের পর্দায় এগুলো যে-মুহূর্তে ভেসে উঠেছিল, কবি তখন সেগুলোকে লিপিবদ্ধ করেছেন। পরে সেগুলোকে লিখিত শব্দের মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। অর্থাৎ কবি কোনো-এক বিকেলে যখন সূর্যের আলো ক্রমাগত নিস্তেজ হয়ে আসে—সে সময় নিজের মনের আরশিতে যা দেখলেন—তাই লিখে রাখলেন। ঐ সময়ের মধ্যেই ঢের স্মরণীয় কাজ শেষ হয়ে গেছে। কবি কবিতাতে একে-একে তা লিপিবদ্ধ করলেন। তবে অবচেতন মনের নদীতে ঢেউয়ের পর ঢেউ এসেছে—চিন্তার ঢেউ, ভুলে-যাওয়া অতীত ঘটনার ঢেউ, কোনো বইতে পড়া বিশেষ চরিত্র বা বাক্যের, শোনা কোনো কাহিনীর, দেখা কোনো দৃশ্যের—তাই কবিতাটি শেষ হয়েও হয়নি। দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন নেই। অবচেতন মনের stream of thoughts-এর সূক্ষ্ম হিসেব সম্ভবপর নয়--তাই মালার্মের মতো দাঁড়ি-কমার ব্যবহার কবির দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থন করতে পারে। কিন্তু উপরোক্ত পংক্তিগুলির মধ্যে কয়েকটি ছাড়া অন্যগুলোর অর্থ উদ্ধার অসম্ভব বলে মনে হয়। দ্বিতীয় ও তৃতীয়

পংক্তির কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না—এর সম্ভাব্য ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, কবি বইয়ে পড়া কোনো বিশেষ, ঘটনার একটি ছিন্ন অংশ এখানে লিপিবদ্ধ করেছেন অথবা এগুলি স্নায়ুতন্ত্রের কেন্দ্রে মুদ্রিত ঘটনাবলী জটিল আকারে প্রকাশিত। চতুর্থ ও পঞ্চম পংক্তিতে বিয়ের ঘটনা এবং গণিকালয়ে প্রেমিক-পুরুষদের যাওয়ার কথা এবং ষষ্ঠ পংক্তিতে ভারতীয় পৌরাণিক কাহিনী, নাটক কিংবা রামায়ণ-মহাভারতের কোনো ঘটনার উল্লেখ আছে। সপ্তম পংক্তিটি কবির অবচেতন মনের কোনো ভাব বহন করে না—এবং এরকম রসিক ও কাব্যিক পংক্তির সংখ্যা খুব বেশী নেই। এই পংক্তির সাথে উপরের পংক্তিগুলোর কোনো সম্পর্ক নেই। অথচ এই পংক্তিটিই কবিমনের প্রচণ্ড ভাবাবেগকে বহন করছে।

'সমস্ত আচ্ছন্ন সুর' কথাটির অর্থ হোল কবি সারা জীবনব্যাপী যা শুনেছেন যা জেনেছেন—কিন্তু মনে নেই—মনে না থাকবারই কথা—কারো মনে থাকে না—কিন্তু বিশেষ একটি নির্জন মুহূর্তে প্রত্যেক মানুষের কাছে গোটা অতীত কুয়াশাময় হলেও দেখা দেয়, আর ঐ আচ্ছন্ন সুর ক্রমাগত হৃদয়কে টেনে নিয়ে যায় বিস্মৃতির দেশে। তখন গ্রীষ্মের দুপুরে মৌমাছির সুর গুঞ্জনের মতো মনে হয়, বিশেষ মৌমাছির সুর তখন আকৃষ্ট করে না। সব মিশিয়ে ঐ যে 'আচ্ছন্ন সুর' (drowsy and confusing melodies) তাই সত্য হয়ে ওঠে। পংক্তিটির দ্বিতীয় পদসমষ্টি 'একটি ওঙ্কার তুলে বিস্মৃতির দিকে উড়ে যায়'-এর মধ্যেও গভীর সত্যবাণী নিহিত, কেননা ওঙ্কার মানে 'ওম' ধ্বনি আর এই ধ্বনিটির অর্থও যেন রহস্যময়—আমাদের জীবনের অভিজ্ঞতাও প্রমাণ করে যে আমরা যখন অতীতকে স্মরণ করি তখনই ঐ 'আচ্ছন্ন সুর' আমাদেরকে পেয়ে বসে। এ প্রসঙ্গে কবির 'আমাকে তুমি' কবিতায়—

> এক একটা দুপুরে এক একটা পরিপূর্ণ জীবন
> অতিবাহিত হয়ে যায় যেন।

এই কবিতাটি সম্পর্কে কবির চেতন-অচেতন মনের দ্বন্দ্বের তর্ক না তুলেও একথা বলা যায়—কবির মৌলিক বক্তব্যটি সত্য। সুররিয়ালিজমকে কবিতার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করতে গিয়ে জীবনানন্দ দাশ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন—শুধু 'দুর্বোধ্য' বলে এগুলিকে অভিহিত করা যায় কি?

অন্যরকম বাস্তব

শৈলেশ্বর ঘোষ

জীবনের উপরিতলে বয়ে চলে একটা স্রোত। তাকে বুঝতে, চিনতে অসুবিধা হয় না। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের উপর দিয়েই তা বয়ে যায়। আমাদের জীবনই তার পথরেখা। সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক উত্থান পতনের মধ্যে দিয়েই এই স্রোতের তীব্রতা বা মসৃণতা অনুভব করা যায়। এক একটা সময়ে কত ঘটনাই ঘটে যায়। আমরাই তা ঘটাই। আবার এইসব ঘটনা, ঘটনার উথাল পাথলি মানুষের মনের গভীরে, চেতনা স্তরে সৃষ্টি করে অন্য একটা স্রোত। উপরি তলের ঘটনা প্রবাহের হুবহু ছাপ তাতে প্রত্যক্ষভাবে পাওয়া যায় না। উপরিতলের ঘটনা প্রবাহ যেমন ভিতরের স্রোতকে প্রভাবিত করে তেমনি ভিতরে প্রবাহিত অদৃশ্য এক স্রোতের ধাক্কায় বাহিরের ঘটনাবলী পরিবর্তিত হয়ে যায়। ভিতরের স্রোতকে অন্তঃসলিলা নদীর মত অনভূত হয়। অস্তিত্বের অস্থিমজ্জায় এই স্রোত কাজ করে চলে। মানুষের ইতিহাসের উপর এই স্রোত তীব্রভাবে আছড়ে পড়ে কখনও। কখনও, কারণ—বাহিরের শক্তিগুলি জীবনকে অক্টোপাশের মত ধরে রাখে—মানুষ, অসহায় মানুষ জীবনের প্রকৃত সত্য, যা তারা অন্তরে অনুভব করে, প্রকাশ করতে পারে না সব সময়। বহির্বাস্তব এবং অন্তর্বাস্তব—দুই প্রায় বিপরীতমুখী শক্তি। এই দুই শক্তির টানাপোড়েনে মানুষের যন্ত্রণাই কেবল বাড়তে থাকে। মানুষ চায় বিপরীতমুখী এই দুই শক্তিকে একমুখীন করতে—যা সম্ভব হলে জীবন কিছু পরিমাণে ইতিবাচক হয়ে উঠতে পারে। সে মনে করে এই কাজে তাকে সাহায্য করবে সামাজিক রাজনৈতিক ধর্মীয় আদর্শ। কিন্তু যে আলো মানুষ জ্বেলে নেয়, নিজেরই নিশ্বাস বায়ুতে তা নিভে যায়। যে পথ তার কাছে সত্য বলে মনে হয়েছিল, যাকে স্পষ্ট করে তোলার কাজে সে নিজের বিশ্বাস প্রয়োগ করেছিল, সে পথ আবার অন্ধকারে হারিয়ে যায়। সত্য সম্পর্কে তার ধারণা হয় বটে, কিন্তু সত্যকে বাস্তব করার আগেই তা লুকিয়ে পড়ে। মানুষের মনের জগতে যা ঘটে চলে তার খোঁজ তো স্পষ্ট পাওয়া যায় না, কিন্তু সেখানে যে ভয়ংকরের নৃত্য হয় তাতেই সৃষ্টি হয় তার নিজস্ব বাস্তব। সেখানে তার আশা আকাঙ্ক্ষা প্রেম ভালবাসা স্বপ্ন কল্পনা ব্যর্থতা চরিতার্থতা দুঃখ যন্ত্রণা সব কিছুরই রং মিশে থাকে। মানুষের সচেতন প্রক্রিয়ার মধ্যে তার অন্তর্বাস্তবের কিছু প্রকাশ আমরা পাই বটে, তবে তা নিতান্তই ছিটেফোঁটা। বিশ্বাস এবং অন্তর্বাস্তবের মধ্যে ফাঁক ক্রমশঃ বেড়ে চলে, আর তখনই সৃষ্টি হয় এক চেতনা, অন্য এক বোধ। এই বোধের আলোয় ব্যক্তি দেখতে পায় নিজের সত্য। বাহিঃশক্তি জন্ম দেয় প্রতিষ্ঠানের, অন্তঃশক্তি তার বিরোধিতা করে। প্রতিষ্ঠান সত্যকে বিনাশ করে। মিথ্যাকে সত্যের মুখোস পরিয়ে মানুষের সামনে উপস্থিত করে। এই যুদ্ধের ফলে অবদমিত মানুষ অবদমনের ত্রাস থেকে মুক্তির আকাশের একটা আভাস পায় কখনও কখনও।

মুক্তি আকাঙ্ক্ষায় ছটফট করে ওঠে মানুষ—তারা বুঝতে পারে স্বাধীনতা এবং মুক্তি, যা তাদের জীবনের আসল পাওনা, তা এখনও মরীচিকা মাত্র। তারা বুঝে ফেলে তাদের বিশ্বাসের প্রতি পৃথিবীতে প্রতিমুহূর্তে বিশ্বাসঘাতকতা হচ্ছে। সন্দেহ, অবিশ্বাস, ক্রোধ—জীবনের নিয়ন্তা হতে চায়। মানুষ জেনে নেয়, তাদের জীবনের বিরুদ্ধে গোপন ষড়যন্ত্র চলে। তাদের ভালবাসা পদপিষ্ট হয়, তাদের স্বপ্ন নিয়ে ছিনিমিনি চলে, তাদের হৃদয় থেকে কল্পনার নির্বাসন হয়। মানুষের হৃদয়ের সম্পদকে মিথ্যাশক্তি গোরিলারা মুখোস এঁটে দখল করে নেয়। অন্ধকারে বয়ে চলে এক ক্ষীণ নদী, আমাদেরই অস্তিত্বের আনাচে কানাচে— সত্যের স্রোত সেখানেই বয়—সেই স্রোতেই অবগাহন করে নেন কবি। একা এক অস্তিত্ব—বোধের আকার হয়ে, নিজের সঙ্গে কথা শুরু করে, তারপর আমাদের আহ্বান করে। জীবনের ঘোর অন্ধকারে সেই এক শুভ্রমূর্তি। অন্ধকার যত গভীর, সে তত উজ্জ্বল। আর আমরা? অন্তরের শূন্যতার মধ্যে তুলে নিই তার শব্দ, তার স্বর ; আমরা বুঝি মৃত্যু-তুল্য শূন্যের মধ্যে কেবল কবির কণ্ঠস্বরেই জীবন সত্যের আভাস আছে।

জীবনানন্দ দাশের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পাঠের কালে মনে হয়, কবি কেন এমন সব কথা বলছেন, যার সমর্থন তাঁর সমসাময়িক কালের অন্য কবিদের মধ্যে সেভাবে পাই না। মানুষের অন্তর্জীবনের চেতনা, তার ইতিহাস, জীবনানন্দে যেভাবে পেলাম আমরা, বুঝতে অসুবিধা হ'ল না যে এ আমাদেরই জীবনের সত্য। আর সে সময়ের অন্য কবিগণ, যারা সময়ের নৌকায় পাল তুলে দিয়ে সুবাতাসের ধাক্কায় তরতর করে এগোচ্ছেন বলে মনে হয়েছিল অনেকের? অবসাদ, দুঃখ ক্ষোভ, বিচ্ছিন্নতার বেদনা—ভালবাসায় জীবনের সাথে যুক্ত হওয়ার এবং আনন্দে সত্য হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষা—এসব তো জীবনানন্দের মত তাদের মধ্যেও ছিল। তবু আজ, সময় যত এগোচ্ছে, জীবনানন্দকেই সত্য বলে মনে হচ্ছে। অন্যেরা অস্পষ্ট হয়ে যাচ্ছেন। জীবনানন্দ নদীতে নেমে বুঝেছিলেন স্রোতের বেগ এবং তার গতিমুখ, ঘূর্ণন—অন্যেরা বোধ হচ্ছে একটু নিরাপদ দূরত্ব থেকে দেখেছেন, বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নেবার চেষ্টা করেছেন। জীবনানন্দের শব্দে এখনও জীবনের গল্প পাই আমরা। জীবনানন্দের সময়ের প্রকৃত ইতিহাস তাঁরই কবিতা। সময়ের অন্তর্বাস্তবের মধ্যে তিনি ঢুকে পড়েছিলেন। তাঁর হাত ধরে সেই জগতে আমরাও যেতে পারি আজ।

মানুষই একমাত্র প্রাণী যে সভ্যতা তৈরি করেছে। কিন্তু আজ আমরা কি জানি না যে এই সভ্যতার একটা বড় অংশই ভুল, ভয়ংকর— জীবন বিরোধী। মানুষ হিসাবে জন্মে যা পাওয়ার কথা ছিল আমাদের তা আমরা পাইনি। অপরদিকে আমাদের হৃদয়ের স্বাভাবিক সম্পদটুকুও কেড়ে নিয়েছে এই সভ্যতা। কেড়ে নিয়েছে আমাদের স্বাভাবিক ভালবাসার শক্তি, আমাদের মনুষ্যত্বের স্বাভাবিক বোধ। হিংসা এবং ঘৃণার মধ্যে ঠেলে দিয়েছে আমাদের। ভালবাসাহীন, আত্মসর্বস্ব লোভী এবং ভণ্ডরাই আজ মানুষ বলে গণ্য। মনুষ্যত্বের মানদণ্ড ঠিক করে দেবার ক্ষমতা আজ তাদেরই হাতে, যাদের একমাত্র সুখ হ'ল অপরের মুখ ম্লান করে দেয়া।

এইবার কুয়াশায় যাত্রা সকলের

মনের ভিতরের জগৎ অস্পষ্ট, আচ্ছন্ন—যেন কুয়াশা ঘেরা এক পৃথিবী। গহন এক অঞ্চল। কোন কোন কবির এই অঞ্চলেই ঘোরাফেরা। জীবনানন্দ এমনই এক কবি। আজও, এতদিন পরেও অনেক পাঠকের কাছে তিনি তত সুবোধ্য নন। জীবনানন্দের মত

কবিরা যে জগৎ থেকে শব্দ তুলে আনেন, যে চেতনায় শব্দের সাথে শব্দকে গাঁথেন, যার ফলে এক সম্পূর্ণ অপরিচিত অস্তিত্বের বোধের সৃষ্টি হয়—তাকে মিথ্যা জীবনে অভ্যস্ত পাঠক ধরতে পারেন না সহজে, ফলে বিভ্রান্ত হ'ন। নিঃসন্দেহে জটিলতম এক বোধ কাজ করে কবিতার মূলে—আর সেই বোধের সঙ্গে পরিচয় হলে, কবির চেতনাকে ধরতে আর খুব অসুবিধা হয় না। তিনিই বলেছেন, শ্রেষ্ঠ কবিতা সকলের হাতে তুলে দেবার জিনিস নয়। একই সময়ে একটি সমাজে সকল মানুষের চেতনাস্তর এক থাকে না। বহুস্তরে তা বিভক্ত থাকে। ফলে শ্রেষ্ঠ কবিতা বলে তিনি যা বলতে চান, অর্থাৎ সর্বোচ্চস্তরের কবিতা, তা সমাজের অল্প মানুষই প্রথমে ধরতে পারবেন। তাঁর কবিতার ক্ষেত্রেও এটাই ঘটেছে।

জীবন অভিজ্ঞতাগুলি মনের গভীরে এমন সব মাত্রা তৈরি করে যা ব্যক্তি মানুষকে তাড়না করে—মানুষ অবরোধের গণ্ডি পার হতে চায়। কিন্তু মুক্তির রাস্তা মানুষের তৈরি এই সভ্যতা বন্ধ করে রেখেছে। সভ্যতা চায়—তুমি হৃদয়হীন হও, তুমি সমাজ শক্তির ভুলকেই সত্য বলে মেনে নাও। চার পাশের নীচতা লোভ ক্রূরতাকে জীবনের স্বাভাবিক অবস্থা বলে স্বীকার কর—জীবনের এই রাস্তাটাই যদি কেউ বেছে নেয় তবে সে সুখ পাবে, নিরাপত্তা পাবে, চাই কি সমাজ তাকে অমরতাও দিতে পারে। কিন্তু নিজের চেতনায় যে জেগে উঠেছে সে জানে এই হৃদয়হীন সভ্যতার সাথে তার সংঘর্ষ অনিবার্য। জীবনের সত্যকে আর অস্বীকার করতে পারে না সে। কবির কবিতায় তখন সরাসরি জীবনের কথাই চলে আসে—অন্তর্বাস্তবে সত্য যে জীবন, তার কথা। বোধের আলোয় উদ্ভাসিত যে পৃথিবী তার কথা। কবি জানেন তিনি যে চেতনা লাভ করেছেন তা অমানবীয় এই সভ্যতাকে ভাঙ্গতে চায়।

কবি অন্ধকার জগতে ভ্রমণের শুরুতেই বলেছেন—'আলো অন্ধকারে যাই'—বহির্জীবনের অভিজ্ঞতার প্রতিক্রিয়া আর অন্তর্জীবনের সুপ্ত চেতনার ঘাত প্রতিঘাতে তৈরি এই আলো আঁধারি জগৎ। এই ঘাত-প্রতিঘাতেই কবির হৃদয়ে জন্ম হয় এক বোধের। এমন এক বোধ যা বহির্বাস্তবের স্বপ্ন শান্তি ভালবাসাকে নস্যাৎ করে হৃদয়ের মাঝে জন্ম নেয়। একবার এই বোধের জন্ম হলে, তাকে আর এড়ানো যায় না। কবি অনুভব করেন তিনি এই পৃথিবীর মানুষ হয়েও তাদের থেকে আলাদা হয়ে গেছেন। বর্হিবাস্তবের উদ্দাম সংঘর্ষ গতি কোন অর্থ বহন করে না আর। অস্তিত্বের মৌল প্রয়োজনের কাছে এগুলিকে অসার বলেই কবি উপলব্ধি করেন। প্রতিষ্ঠানসেবী রোবটের (চেতনাশূন্য) হাতে পড়ে পৃথিবীর শুভ-সৌন্দর্য বিকৃত। মানুষের যা কিছু সৃষ্টি, এই লোভীদের দাঁতে তা দষ্ট। যে মূল্যবোধগুলি জীবনকে ধরে রেখেছিল, কবি বুঝতে পারেন সেগুলি অপ্রাসঙ্গিক অর্থহীন হয়ে গেছে। ফলে সব চিন্তা 'প্রার্থনার সকল সময় শূন্য মনে হয়।' মধ্যবিত্ত জীবন পরিমণ্ডলেই তো কবিরও চলাফেরা, চারদিকে ভণ্ডামীর চেহারাটা তাই তারই সৎ চেতনায় আগে ধরা পড়ে। তিনি সেই রেডার, যে বহু বহু দূরের শব্দ সংকেত অনেক আগেই ধরে নেয়। আবার যিনি কোন বিশ্বাস থেকে কবিতা লেখেন বা বিশ্বাসকেই কবিতা করে তুলতে চান তার এই শূন্যতার সমস্যা থাকে না। তার ক্ষেত্রে অবশ্য সেই বিশ্বাসে অর্থ হারিয়ে ফেলা মাত্র, তার কবিতাও অর্থ হারাবে। জীবনানন্দ কোন পূর্ব-বিশ্বাস না নিয়েই নেমে গেছেন মনের গহন অঞ্চলে, অস্তিত্বের জটিল অন্ধকারের মধ্যে। এখানেই তাঁর জয় বলে আমি মনে করি। তিনি অস্তিত্বের অবস্থা আলো-অন্ধকারে অবলোকন করেছেন, অনুভব করেছেন, 'সহজ লোকের মত কে চলিতে পারে! তাদের মতন ভাষা কথা কে বলিতে পারে আর?' একদিন পৃথিবীতে সহজ মানুষ ছিল। ছিল,

যেদিন মানুষ নিজ নিজ প্রকৃতির পথে মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারতো। সভ্যতার অনুশাসনে মানুষ যতদিন নিজের সহজ স্বভাবকে দমন করতে শুরু করেনি। আজ আর কেউই সহজ নয়। জটিল মানব সত্তা আজ সন্দেহ আর অবিশ্বাসের চোখে তাকিয়ে আছে জীবনের দিকে। মানুষের চিন্তাভাবনা অস্তিত্বের জটিল অন্ধকারে আচ্ছন্ন। জীবনের ভিতরে একটা সুড়ঙ্গ দেখা দিয়েছে মানুষের সামনে আজ। জীবন সম্পর্কে ধারণা পাল্টে যাচ্ছে মানুষের। এখানেই কবির একটা বড় অসুবিধা। তিনি জানেন, মানুষ অন্তর্জীবনের মুক্তির মধ্য দিয়ে আবার পৌঁছাতে পারে অন্য এক জীবনে। সুস্থতর জীবনে। সেটাই হবে তার পূর্ণতার পথের যাত্রা। সৃষ্টির সঙ্গে তার যোগসূত্র আবার স্থাপিত হতে পারে এভাবেই সচেতন মানুষের প্রচেষ্টা এই দিকেই হবে আজ। কবি জীবনানন্দ দাশের অভিযাত্রাও এই দিকেই।

'সকল লোকের মত বীজ বুনে আর স্বাদ কই!'—সকল লোকের জীবনধারার সঙ্গে কবির চেতনার বিচ্ছেদ ঘটে গেল। উৎসাহে আলোর দিকে চেয়ে বেঁচে থাকার দিনও শেষ হ'ল। কেন শেষ হল? এক বোধ কাজ করে মাথার ভিতরে। এই বোধ-চেতনা মানুষের সাথে লেগে থাকে ছায়ার মত। 'আমি থামি, সেও থেমে যায়।' অস্তিত্বের গভীরে জন্ম হতে থাকে অন্য এক সত্তার। পৃথিবীর সঙ্গে সে সম্পর্কিত হতে চায়। কিন্তু জীবনের অসার পচা জায়গাগুলির দুর্গন্ধ সে পেতে থাকে। মানুষের লোভ, নীচতা, ভণ্ডামীর দিকেই দুই চোখ আটকে যায় কবির। ফুলের সৌন্দর্য, নারীর স্তন, আকাশের নীল কবির হৃদয়ের ক্ষতে প্রলেপ দিতে পারে না আর। বিপন্ন বোধ করেন কবি। জীবনের মধ্যে থেকেও সহজভাবে আর জীবনকে গ্রহণ করতে পারছেন না। আধুনিক কবিতায় আমরা দেখতে পাচ্ছি কবি তার সমগ্র অস্তিত্ব মেলে ধরার চেষ্টা করছেন। নিজের অস্তিত্বই তার বিষয়। জীবনের বিচ্ছিন্ন টুকরো, বিচ্ছিন্ন অনুভূতিগুলির প্রতি তাঁর আর তত বিশ্বাস রইল না। নিজের বোধের আলোয় নিজের সমগ্র অস্তিত্বকে তিনি দেখতে চাইছেন।

বিচ্ছিন্ন কবি নিজেকে প্রশ্ন করলেন, 'আমার নিজের মুদ্রাদোষে আমি একা হতেছি আলাদা'—লক্ষ্য করতে হয়, 'আমি একা হতেছি আলাদা' বাক্যাংশটুকু। কবির চেতনাই, আলাদা করে দিল তাকে, চেতনাই তার মুদ্রাদোষ। পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে কি দেখলেন এবার তিনি? 'সন্তানের জন্ম দিতে দিতে কেটে যায় মানুষের অনেক সময় কিংবা আজও যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে'— সন্তানের জন্ম দেবে, জন্ম দেবে বলে। বেশির ভাগ মানুষের জীবন পদ্ধতি এটাই। প্রকৃতির সন্তান মানুষ যৌনতা দিয়েই যুক্ত হয়ে থাকতে চায় জীবনে। অস্তিত্বের সঙ্কটগুলি তার চেতনার দুয়ারে হানা দিলেও, তাকে স্বীকার করতে ভয় পায়। পাছে নিরুপদ্রব জীবনের ঘুমটা ভেঙে যায়। অন্য প্রাণীর বেলায় এই অসুবিধা দেখা দেয় না—তারা খায় সহবাস করে,—ঘুমায় এবং মরে। মানুষের ক্ষেত্রে অসুবিধা দেখা দেয়, কারণ—চেতনা তাকে জাগিয়ে তুলতে চায়। জেগে না উঠে মানুষের উপায়ও নাই। 'আমাকে কেন জাগাতে চাও'—এই আর্তনাদ মানুষের জেগে ওঠার যন্ত্রণার, জেগে উঠতে সে চায় না—কিন্তু জেগে উঠতে হয়।

সন্তানের জন্ম দিয়ে, তাকে বীজক্ষেতের উপযোগী করে তুলতে যাদের সময় কেটে যায়, যারা নিজের প্রকৃত একাকীত্ব উপলব্ধির সময় পায় না বা একাকীত্বের অনুভব ভয়ের বলে জন্মদান পদ্ধতিকে সত্য বলে জানে অথবা, অসত্য আশ্রয় করে সত্যকে বিনাশ করার প্রক্রিয়ার মধ্যে লিপ্ত হতে থাকে, কবির হৃদয় আর মাথা আর তাদের মত নয়। চেতনায় তিনি চৈতন্য হয়েছেন, বোধে বুদ্ধ।

আমাদের কবি বলেছেন চাষার লাঙল হাতে তুলে দেখেছেন তিনি, বালতিতে জল টেনেছেন, কাস্তে হাতে মাঠে গেছেন—বাতাসের মতন অবাধে রয়েছে তাঁর জীবন। সব সাধকেই তিনি জেনেছেন কিন্তু তাদের ছেড়ে চলে গেছেন। ভালবেসেছেন মেয়েমানুষকে, অবহেলা করেছেন, ঘৃণা করেছেন —মেয়েমানুষও তাঁকে ভালবেসেছে, অবহেলা, ঘৃণা করেছে, উপেক্ষা করেছে। (জীবন নাটকে আমাদের তৃষ্ণা মেটায় যারা, তারা মেয়ে মানুষ - তাদের সাথেই আমাদের জীবনের খেলাধুলা)

এইসব অভিজ্ঞতার স্টেটমেন্ট দিয়ে বলা হচ্ছে, জীবনের মূলস্রোতধারাটির সঙ্গে সম্পর্ক শিথিল হয়ে আসছে। মূলস্রোত বলে যাকে আমরা বুঝি অন্ধকার জমাট হচ্ছে তার মধ্যে। কবি শ্বাস নিতে পারছেন না সেখানে। 'অর্থ নয় কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—আরো এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতর খেলা করে—আমাদের ক্লান্ত করে—ক্লান্ত করে'। অর্থ কীর্তি সচ্ছলতা—যাদের পেছনে বেশিরভাগ ছুটে চলে, কবির কাছে তা অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে—এক বিপন্ন বিস্ময় সমস্ত অস্তিত্বকে গ্রাস করে। যে ভালবাসা একদিন সাধনা ছিল, আজ তাকে মনে হ'ল ধুলা আর কাদা। ভালবাসার জন্যই তো জীবনে এত হুটোপুটি মানুষের। তবে কি ভালবাসার জন্য মানুষের সাধনা শেষ হয়ে গেল? না, তা হয় না। ভালবাসার নতুন মাত্রার জন্য কবির সাধনা। ফলে আমাদের সাধনাও তাই। না হলে মানুষের বেঁচে থাকার অর্থ থাকে না আর। যা একদিন ধুলা আর কাদা হিসাবে উপেক্ষিত হয় তাই আবার আবিষ্কৃত হবে ভিন্নরূপে, ভিন্ন মাত্রায়। জীবনের সঙ্গে নতুন যোগসূত্র স্থাপিত হবে।

মানুষের জীবনপথেই পাতা আছে ফাঁদ—কীর্তির ফাঁদ, সচ্ছলতার ফাঁদ, কামনার ফাঁদ, প্রতিষ্ঠার ফাঁদ—লোভের দুই পা আটকে যায় সেখানে। জীবন পরিণত হয় পানাপুকুরে। বিষাক্ত হয়ে ওঠে জীবনের কেন্দ্রস্থল। দুচারটি আত্মা এই বিষাক্ত পরিবেশকে আগেই চিনে ফ্যালে, বেরিয়ে আসতে চায় ভুল জীবনের জেলখানা থেকে। তখনই অন্য এক চেতনা জন্ম নিতে থাকে তার মধ্যে। জীবনের অন্য অঞ্চলের দিকে মুখ ফেরাতে হয়। যে অঞ্চল অর্ধস্পষ্ট কুয়াশাচ্ছন্ন। আসলে সে অঞ্চল এতদিন অপরিচিত ছিল বলেই তার স্পষ্টতা বুঝতে কষ্ট হয়। যে জীবন থেকে কবি বিচ্ছিন্ন হলেন সেখানে হৃদয়ের সারটুকু মেলে দেবার পরিবেশ পেলেন না। মানুষের উচ্চারিত শব্দকে বিশ্বাস করা গেল না। ভোগের সুখকেই শান্তির সারাংশ বলে গণ্য হয় সেখানে। মানুষের অনুভূতি নিয়ন্ত্রিত হয়। সমস্ত বিশ্বাস ভঙ্গের পর থাকে কেবল যৌন একাগ্রতা। আবার যৌনতাও অচরিতার্থ থাকে। ভালবাসাহীন যৌনযন্ত্রে মানুষের আত্মা পিষ্ট হয়। ঈশ্বরের জায়গা দখল করে ক্ষমতাবান ছোট মানুষেরা। জীবনকে এলোমেলো করে দিতে থাকে তারা—মানুষের নিজের ভিতরে যে সত্যের জন্ম হয় তাকে উপলব্ধি করার সুযোগ হয় না মানুষের। কবির সচেতন সত্তা বলে ওঠে, 'আমি সব দেবতারে ছেড়ে আমার প্রাণের কাছে চলে আসি।' মানুষের মুখ দেখে, মানুষের মুখ দেখে, শিশুদের মুখ দেখে আহ্লাদ হয় না আর।

জীবনানন্দ প্রশ্ন করেন, 'পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ চায় না সে?' চায় না। মানুষের মুখ মানুষীর মুখ, শিশুদের মুখই সে দেখবে। মানুষকে ছেড়ে যেতে পারেন না কবি। তার যাবতীয় যন্ত্রণা তো তার নিজের জন্য নয়, সকল মানুষের জন্য। সকল মানুষের স্বাধীনতা এবং মুক্তিই তার মুক্তি এবং স্বাধীনতা। তাই 'যেই কুঁজ—গলগণ্ড মাংসে ফলিয়াছে নষ্ট শসা—পচা চালকুমড়ার ছাঁচে, যে সব হৃদয় ফলিয়াছে —সেই সব'ই কবি দেখবে, তাদের মধ্যেই তাকে থাকতে হবে। চেতনাহীন দৃষ্টিহীন অসুস্থ জীবনের

মধ্যেই তাকে থাকতে হচ্ছে---বাঁচার তীব্র যন্ত্রণা নিতে হবে তাকে—তবু পৃথিবীর পথ ছেড়ে যাবার কথা কবি ভাবেন না। গলগণ্ড মাংসে যে সব হৃদয় ফলিয়াছে তাদের খাদ্য তো কবির হৃদয়। এটা জেনেও তিনি, আকাশের নক্ষত্রের পথ নিতে পারেন না। বিচ্ছিন্নতার বোধ নিয়েই থেকে যেতে হবে, জীবনের মধ্যে। 'আমরা দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই।' জীবননাট্য, তাতে যদি আমি আর অংশ গ্রহণ করতে নাও পারি, চেতনা যদি আমাকে দূরে সরিয়ে দেয় তবু জীবননাট্যের বহিরঙ্গ শোভাময়।

বোধের জগৎ মেলে ধরলেন জীবনানন্দ। চেতনার তরবারি দিয়ে আঘাত করলেন অস্তিত্বের অসার অংশকে। নিজের সময়ের অসৎ চেতনাকে আক্রমণ করলেন। আমাদের বুঝে নিতে কষ্ট হ'ল না আধুনিক কালের কবির যাত্রাপথ এরকমই। জীবনানন্দের বোধ আমাদের সামনে ভবিষ্যতের এই পথের আভাস দিয়ে যায়। জীবনের সম্পর্কগুলির অগ্নিপরীক্ষা নিতে হবে, ভালবাসার নতুন মাত্রা খুঁজে বের করতে হবে।

আমার বুকের প্রেম (ঐ) মৃত মৃগদের মত

'এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি'---বনের কাছেই তিনি ক্যাম্প ফেলেছেন, বনের ভিতরে নয়। সারারাত দক্ষিণা বাতাসে চৈত্রচাঁদ ভেসে বেড়ায় আকাশের পটে---আর কবি, নির্ঘুম কবি ঘাই হরিণীর ডাক শুনতে থাকেন, বিছানায় শুয়ে শুয়ে। পৃথিবীর কোন জায়গায় আমাদের আদিম পরিবেশ—অরণ্য, এখনও রয়ে গেছে কিংবা রক্তের সংস্কারে আছে, যা আজও আমরা ভুলে যেতে পারিনি। সেই সব অনেক বন আলো অন্ধকারের আবছায়া নিয়ে আমাদেরই হৃদয়ের রহস্যময় অঞ্চলের মত। ভালবাসা আর কামনার চির সৌন্দর্যময় খেলাস্থল সেটা। কিন্তু ভালবাসা আর কামনার সৌন্দর্যময় জগতে যদি মৃত্যু ওৎ পেতে বসে না থাকে তবে তো প্রকৃতির রূপের পূর্ণতা আসে না। অরণ্যের সেই রহস্যময় পরিবেশে আছে ঘাইমৃগী, আছে পুরুষ হরিণ আর আছে সৌন্দর্য সাধক মৃত্যুর প্রতীক চিতা। যার পিঠের পেশী আন্দোলিত হলে বনের বাতাসও ভয়াতুর হয়ে পড়ে। যে বাতাসে ভয় আছে সেই বাতাসেই ভেসে আসে প্রেমের আহ্বান, কামনার পূর্ণতার আহ্বান। পুরুষ হরিণকে ঘাই হরিণী ডেকে নিয়ে আসছে নিজের কাছে—জীবনের এই অপরূপ মুহূর্তে ঘাই হরিণীর সুখের রূপ দেখে চিতাও বিস্মিত। মৃত্যুও ভালবাসাকেই শ্রদ্ধা করে, কোন মুহূর্তে। ক্ষুধা ভুলে যায় চিতা। কবির সঙ্গে আমরাও দেখি এ দৃশ্য। আমাদের রক্তে এখনও অরণ্যের স্মৃতি আছে, শরীর এখনও কামনার রোমহর্ষ অনুভব করে —আনন্দের সমুদ্রে হৃদয় লুটোপুটি খেতে চায় আজও। সহজ সারল্যকে যদি ভয় না পাই।

মাথার উপর অরণ্যের চৈত্রচাঁদ, সে এই নাটকের পরিবেশ রচয়িতা এবং নাটকের দর্শক। এক অঞ্চলে ঘাইমৃগী অন্য অঞ্চলে পুরুষেরা, তৃতীয় অঞ্চলে চিতার চঞ্চলতা। কামনার আহ্বানে জেগে উঠছে অরণ্য। চিতা এগিয়ে চলেছে স্ত্রী পুরুষের মিলন স্থলের দিকে। স্ত্রী আর পুরুষ যেখানে পরস্পরের হৃদয়ের নির্যাস পান করার জন্য অস্থির হয়ে উঠেছে। বনের কাছেই চতুর্থ অস্তিত্ব, কবি। সেখানেই তিনি ক্যাম্প ফেলেছেন। এখনও পর্যন্ত তিনি দর্শক ও শ্রোতা। প্রকৃতি এখানে ডেকে নিল পঞ্চম পক্ষ---শিকারিকে। কাপড় পরার প্রয়োজন বোধ করার অনেক আগেই আমরা বুঝে গিয়েছিলাম, নীরব অস্ত্র বুকে বিদ্ধ হলেই কথা বলে। সে কথা শুনতে আজও ভাল লাগে বলে আজও আমরা শিকারি---সরলতা আর ভালবাসার হত্যাকারী। চৈত্রের রুক্ষ মাটি রক্তে ভিজে ওঠে— রক্ত

না পেলে অরণ্য সুস্থ থাকে না। ভালবাসা আর কামনার ডাক ছাড়া অরণ্য আর একটি ডাকই শুনতে শিখেছে, তা হ'ল মৃত্যুর ডাক। তাই অরণ্যের কাছেই ক্যাম্প 'ফেলিয়াছি'।

'কোথাও অনেক বনে' 'যেইখানে জ্যোৎস্না আর নাই' ফলতঃ অন্ধকার সেখানে, হৃদয়ের সজীব অন্ধকার—কামনার ডাকে রক্ত চঞ্চল। ঘাই মৃগীর ডাকে পুরুষ হরিণের বুকে প্রেমের আলোড়ন শুরু হয়েছে, তারা 'আসিতেছে'—বাঘেদের কথা ভুলে গেছে তারা, ভয় আর নাই হৃদয়ে তাদের—সেখানে কেবলই প্রেম-স্বপ্ন স্ফুট হয়ে উঠছে– 'হরিণেরা আসিতেছে'—মানুষ যেমন করে ঘ্রাণ পেয়ে আসে তার নোনা মেয়ে মানুষের কাছে। 'নোনা মেয়ে মানুষ'—শব্দ বন্ধে সৃষ্টি হ'ল অন্ধকারের যৌন উল্লাস-কামনার শিহরণ—চৈত্র চাঁদের আলো—কাছেই কোথাও মৃত্যুর অনিবার্য উপস্থিতি। জীবনের আলো অন্ধকারে ঘাইমৃগী, পুরুষ হরিণ, চিতা এবং শিকারি—কামনার একই অস্তিত্বের আলাদা আলাদা প্রতীক মাত্র।

মিলন মুহূর্ত এসে গেলে শোনা গেল গুলির শব্দ—অস্ত্রের ভাষা কবি শুনলেন। বন্দুকের শব্দ শুনে শুনে অবসাদ জমে ওঠে। পরের দৃশ্য ঃ ঘাইমৃগী পড়ে আছে, পাশে তার মৃত প্রেমিকেরা তাদের মাংস খাবারের ডিশে উঠে এল। ভালবাসার আহ্বান, মিলনের আনন্দ—স্বভাবের মুক্তির আকাঙ্ক্ষা নির্মমভাবে ধ্বংস হয়ে গেল। মানুষই হয়ে এল মৃত্যুর দূত হয়ে। ভালবাসাকে হত্যা করেই উৎসব হবে তার।

'মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস লয়ে আমরাও পড়ে থাকি'। পড়ে থাকি কেননা আমাদের ভালবাসা নিহত হয়—ভালবাসাহীন অস্তিত্ব বহন করাই নিয়তি হয়ে যায় আমাদের। অথচ আমাদের পাবার ছিল ভালবাসা, বলার ছিল ভালবাসা। ভালবাসার ডাক যখন শুনতে পেলাম তখনই ঘটে গেল নির্মম হত্যাকান্ড। শিকারির গুলি এসে হত্যা করে গেল আমাদের হৃদয়। পরিণামে হৃদয়হীন আমরা।

শিকারীরা মৃগদের হত্যা করে, তাদের সুস্বাদু মাংসে ভোজ সেরে বিছানায় শুয়ে শুয়ে কথা ভেবে চলেছে—কি কথা? ভালবাসার কথা—যেহেতু তাদের হৃদয় 'শুকাতেছে'। 'বসন্তের জ্যোৎস্নায় ওই মৃগদের মত আমরা সবাই।' সৃষ্টির মধ্যে এক অমোঘ আমোদ কাজ করে চলে, মানুষের অভিজ্ঞতাই মানুষকে একথা বলে।

মায়াবীর নদীর পারের দেশ

এখানে নাহিকো কাজ—উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিকো ভাবনা
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা,
অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।

... ...

এখানে সৌন্দর্য এসে ধরিবে না হাত আর
রাখিবে না চোখ আর নয়নের পর
ভালবাসা আসিবে না
জীবন্ত কৃমির কাজ এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার ভিতর।

হৃদয়ে জেগে ওঠে অন্য এক পৃথিবী। তীব্র স্রোতের মধ্যেই কখনও জেগে ওঠে নদীমোহানায় এক দ্বীপ। হয়ত আবার তা হারিয়ে যায়। এক পৃথিবী কবির হৃদয়ে জেগে উঠেছে, যেখানে উৎসাহ উদ্যমের ব্যথা নাই, রাজ্যজয় সাম্রাজ্যের দামামা নাই—হিংসা নাই, এমনকি সৌন্দর্যের আহ্বানে সাড়া দেবার প্রয়োজন হবে না সেখানে—সেই পৃথিবীকে

মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়। কিন্তু এ তো শুধুই কল্পনা নয়—আমাদের বোধ বলে, এমন এক পৃথিবীর অস্তিত্ব আছে আমাদের অন্তরে, তাকে বাস্তব করার কথা ভাবে মানুষ। 'অনেক মাটির নীচে যেই মদ ঢাকা ছিল তুলে নেবো তার শীতলতা'—কল্পনায় নয় আমাদের চেতনাতেই আছে এই পৃথিবী—যাকে আমরা হারিয়েছি—স্পষ্টত এমন পৃথিবী ছিল না কোনদিন কিন্তু হৃদয়ের গভীরে তার অস্তিত্বের সত্য আমরা উপলব্ধি করতে পারি। এই হ'ল আমাদের প্রকৃত বাস্তব—স্বপ্নে আমরা সেখানেই বাস করি। আমরা তো গেয়ে যেতে চাই কেবল প্রেম আর পিপাসার গান—প্রেম আর পিপাসাকে সত্য বলে জেনে যেতে চাই। কিন্তু যে পৃথিবী আমাদের প্রতিদিনের খাদ্য দেয়, আশ্রয় দেয়—সে আজও চায় না আমাদের হৃদয়ে থাকুক স্বপ্ন, থাকুক কল্পনা। আমাদের মাথায় জীবন্ত কৃমি কাজ করুক—এই চায় সে। মাথার উত্তেজনা যেন না ফুরায় সেদিকে সদা সতর্ক আমাদের পৃথিবী।

ভোগ এখানে সুখ, সুখই শান্তি—জ্ঞান এখানে ত্যাজ্য। এই পৃথিবীরই আনাচে কানাচে কোন কোন মানুষের হৃদয়ে জন্ম নেয় অন্য এক বাস্তব। যে বাস্তব আমাদের স্বপ্ন। অস্তিত্বের যতটুকু অংশে চেতনার আলো পড়ে সেই অংশে বিকশিত হয় এই অন্য পৃথিবী। পাড়াগাঁর সেই সব ভাঁড়...মদ নিয়ে বসে কবিতার শেষ পাতা পড়বে—সাম্রাজ্যকে সে উপেক্ষা করেছে, অবহেলা করেছে পৃথিবীর সব সিংহাসন—তার খুলির অট্টহাসিই শেষ পর্যন্ত জিতে যাবে।

'জানিতে চাই না আর সম্রাট সেজেছে ভাঁড় কোনখানে, কোথায় নতুন করে বেবিলন গুড়ো হয়'—জানতে চাই না কিন্তু বারবার আমাদের তা জানতে হয়। জানার এই যন্ত্রণায় হৃদয় ক্ষতবিক্ষত হয়। এটাও আমাদের জেনে নিতে হয় যে মাথার ভিতরে জীবন্ত কৃমি কাজ করে বলেই পৃথিবীতে এত সংঘর্ষ, যন্ত্রণা—রক্তপাত। মৃত্যুর বেলাভূমি আমাদের পৃথিবী। এখানে পালঙ্কে শুয়ে, জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালবেসে কাটবে না অনেক অনেক দিন, আমরা জানি। তবু হৃদয়ের স্বপ্ন তো মরে না। সেই স্বপ্নে কখনও পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়।

জীবনানন্দ নিজেই বলেছেন তাঁর কবিতা নিয়ে সমালোচকদের প্রচুর সমস্যা হয়েছিল। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলিকে অনেকের কাছে নিশ্চেতনার কবিতা বলে মনে হয়েছে। অতীব রহস্যময় বলে মনে হয়েছে। আমার মনে হয় তাঁর এইসব কবিতা তীব্র চেতনার। রহস্য ঘনীভূত হয়েছে প্রয়োগ পদ্ধতির কারণে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের কবিতাতেই তাঁর চেতনার জগৎ আমাদের অভিজ্ঞতার সীমা অতিক্রম করে চলে গেছে। তার সৃষ্ট জগতে আলো-আঁধারি আছে। আছে, কারণ আমাদের মন, হৃদয়, বোধ—এরই আলো আঁধারির উৎস। মনে রাখতে হয় যে অচেতন যদি জানতে হয় তাও জানা যায় সচেতনা দিয়েই। এই পর্যায়ে কবির যে চেতনা জগতের পরিচয় আমরা পাই পরবর্তী পর্যায়ে তাকেই আরও ছড়িয়ে দিয়েছেন তিনি। একই শব্দ, বাক্যবন্ধ বা চিত্রকে বারবার ব্যবহার করেছেন—এই পুনরুক্তি দোষের নয়, কারণ বোধের যে জগৎ তাঁর সামনে উদ্ঘাটিত তা থেকে সরে যাবার উপায় তাঁর নেই।

সৎ চেতনার জয় হয়নি আজও। আমাদের জীবন পরিবেশ আজ আরও তিক্ত, রক্তাক্ত। তবু স্বাধীনতার দিকে মুক্তির দিকে মানুষের যাত্রা থেমে যায় নি। বরং তাতে আজ আরও কিছু মাত্রা যুক্ত হয়েছে। অস্তিত্বের অন্ধকার অংশের মানচিত্রটা জানাও খুব জরুরী হয়ে পড়েছে মানুষের কাছে। জীবনানন্দের যাত্রা শুরু হয়েছিল এই পথেই। অস্তিত্বের

অন্ধকার অংশের উপরই তিনি বোধের আলো ফেলেছেন। নিজের জ্ঞান আর অভিজ্ঞতাই তাঁর সম্বল। কোন রাজনৈতিক, ধর্মীয় বা দার্শনিক বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে তিনি মানব অস্তিত্বের গুহাকন্দরে নামেন নি। আজ, এই বিশ শতকের গোধূলি বেলায় পৃথিবী যখন দ্রুত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে, মানুষের ইতিহাসের দ্রুত উত্থান পতন হয়ে চলেছে—তখনও তাঁর কবিতা সত্যধারণ করে আছে এই জন্যই। প্রাতিষ্ঠানিক জীবনবোধ, মধ্যবিত্ত ভণ্ডামীকে রেয়াৎ করেন নি তিনি। চেয়েছেন চেতনার প্রকৃত আলোকে মানুষকে জাগিয়ে তুলতে। আমি মনে করি আধুনিক বাংলা কবিতার উৎসভূমিই হ'ল জীবনানন্দ দাশের চেতনা জগৎ।

সকলেই কবি নয়

বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য

জীবনানন্দ মানতেন সকলে নয় কেউ কেউ কবি কেননা 'তাঁদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার স্বতন্ত্র সারবত্তা রয়েছে'। এই বাক্যেরও গূঢ় অর্থ অনির্দিষ্ট ও অবয়বহীন। একান্তই আবেগ, যুক্তি, অভিজ্ঞতা ও সর্বোপরি রসবোধের কাছে পরীক্ষার্থী। সভ্যতার উষাকাল থেকেই কবিতার জন্ম আর জন্মের পর মানুষের মতন কবিতারও মৃত্যু অনিবার্য। মানুষের মত কবিতাও মরণশীল। নির্মম ইতিহাসের দাপটে অতীতের অজস্র কবিতা কালান্তর ঘটাতে পারেনি। চলমান সময়ের বিশুষ্ক মরুভূমির দাবদাহে তাদের বিলোপ ঘটে চলেছে। তবুও মরূদ্যান জুড়ে থেকে গেছে কিছু কবিতা। যেখানে মানুষের সুন্দর-অসুন্দরের অনুভব, জীবন-মৃত্যুর মহারহস্যে স্থির হয়ে আজও জীবিত আছে। প্রাত্যহিক জীবনের ম্লান স্পর্শ, খণ্ডিত সমাজ ও চেতনার নানা ধ্যান, যুক্তি যাদের মৃত্যুর শীতল স্পর্শ থেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মানুষের বা মনুষ্যগোষ্ঠীর কোনো অশুভ অভিযান যাকে ধ্বংস করতে অক্ষম। ব্যাকরণবিদ, অক্ষম সমালোচকের সংকীর্ণ শাসন পরোয়া করে না সেই কবিতা। রাজসভা বা প্রাতিষ্ঠানিক স্বীকৃতি কবির কাছে অপ্রার্থনীয়। মানুষের জীবনযাত্রার মহাদুর্যোগের সমুদ্রের মধ্যে সূর্যকরোজ্জ্বল দ্বীপে যিনি প্রতিষ্ঠিত। সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি।

জীবনানন্দ কবিতায় কোনো দৈব 'প্রেরণায়' অবিশ্বাসী। কিন্তু নিছক বুদ্ধির জোরে কোনো কবিতা লেখা সম্ভব নয় তাও উপলব্ধি করেন। আরো অনেক কিছুর প্রয়োজন। জ্ঞান ও অন্তর্জ্ঞান, সংকেত, অবচেতনা কল্পনার ভূমিকাকে তিনি মানেন কিন্তু চলতি অর্থে নয়। একে তিনি বলেছেন কল্পনা-আভা। কোনো পরম চৈতন্যের (ঈশ্বরের!) উপস্থিতি তাঁর কাছে কখনই প্রশ্রয় পায়নি। এক অমীমাংসিত রহস্যময়তার আড়ালেই তাকে রেখে দিয়েছিলেন সারাজীবন।

তাঁর কবিতা আলোচনায় কল্পনা-প্রতিভা বা ভাব-প্রতিভার উল্লেখ বারবার এসেছে। 'কবিতার অস্থিতে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কাল জ্ঞান'। মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময় চেতনা তাঁর কাব্যে একটি সংগতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো।

শিক্ষা, লোকশিক্ষা, চিন্তার ব্যায়াম বা মতবাদের প্রাচুর্য থেকে কবিতার তাৎক্ষণিক সাফল্য তাঁর মন টানেনি। গণপাঠক কবিতার বোদ্ধা হবে এটা তাঁর মতে কষ্টকর। যদিও মনোলোকে সমাজ সংসারের সমস্যা থেকে তিনি মুখ ফেরাননি। বিশ্বাস ক'রছেন 'কবিতা সমাজ জাতি বা মানুষের সমস্যাখচিত', অনুভব করেছেন কাব্যের 'ইন্টিগ্রিটি'-র প্রয়োজন আছে। কিন্তু ভঙ্গুর ও প্রচারবিষয়ী কবিতায় জীবনানন্দের অনীহা। নিছক ইতিহাসের ঘটনাপঞ্জি, রাজনীতি বা দার্শনিক সিদ্ধান্তই কবিতা নয়। চিন্তা, ধারণা, মতবাদ 'প্রাক্‌কল্পিত

হয়ে কবিতা হয় না'। কোনো কিছুকে 'চরম' মনে করে সুস্থিরতা লাভ করার মধ্যে কোনো আত্মতৃপ্তি নেই।

সময় ও প্রকৃতির পটভূমিকায় জীবনের সম্ভাবনাকে বিচার করে মানুষের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে পথ খোঁজাই তাঁর কাছে কবিতা। যদিও বিজ্ঞান বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের চেতনাপ্রবাহে অনিবার্য উপাদান তবুও তা সত্যের একমাত্র উৎস ও পরিণতি নয়। তাঁর মতে 'বিজ্ঞানের পদ্ধতি ছাড়া সত্য ও দিব্যতা লাভ সম্ভব কবিতায়'। সার্থক কবিতায় যে 'সুলিপি' প্রবর্তিত হয় যাকে কেউ কেউ বলেছেন 'মায়াবল' তাঁর মতে সেটি কবিতার 'চরিত্রবল'।

চিন্তার আভার ব্যবহারে আলো ও আবেগে কবিতা মোমের মতন জ্বলে ওঠে। চিন্তা, বিজ্ঞান, মতবাদের কঙ্কালই কবিতা নয়। তার ওপর কল্পনার আলো ও আবেগ তাকে দেহদান করে। সেই দেহেই রয়েছে কবিতার সবল মাধুর্য।

সৎ ও মহৎ কবিতা যেমন কোনো বিজ্ঞান-প্রামাণ্য পথে রচিত হয় না কবিতার তেমনই কোনো 'এঞ্জিনিয়ারিং'ও নেই। 'আরো অনেক রকম সত্য আছে যা আমরা পুরোপুরি গণিতের (বিজ্ঞানের) উপায়ে লাভ করি না'। কবিতায় ধর্মের মত কোনো 'ঈশ্বরঘন' আশ্রয় নেই। কবিতা আলো দান করে, পথও দেখায়, সবের চেয়ে বেশি দেয় সান্ত্বনা ও সিদ্ধি। 'মানুষকে বীতকাম ও অশোক মুক্তি'র পথ দেখায়। অনিবার্যভাবেই নিছক শিল্পের জন্য শিল্পের কল্পনাবিলাস তাঁর নয়। বেদনা ও আনন্দের মধ্য দিয়ে চলেছেন উন্নততর সংগতির সৌন্দর্যে।

রবীন্দ্রনাথকে সার্বভৌম কবি হিসেবে স্বীকৃতি জানিয়েও রবীন্দ্র পরিক্রমা থেকে জীবনানন্দ সরে এসেছেন। বামপন্থীদের বিশ্বাসের 'সূর্যজ্বালায়' তিনি আলোকিত হতে পারেননি। তাঁদের প্রচারিত বিশ্বাসের স্বাচ্ছল্যও তাঁর মন টানেনি, যাঁরা এক নির্দিষ্ট বলয়ের বাইরে সমস্ত সাহিত্যকেই দুর্বোধ্য মানব-বিদ্বেষী বলে মনে করেছেন। অতি অবিশ্বাসী কৃশ লেখককুলও তাঁর শ্রদ্ধা পাননি, যাঁরা রবীন্দ্রনাথকে ছাড়িয়ে নতুন ভাবনার ও বিশ্বাসের দৈন্যে আক্রান্ত। আধুনিক কথাটিও তাঁর কাছে আপেক্ষিক। সময়কালের বিচারেই আধুনিকতা গ্রাহ্য নয়। তাঁর মতে মহাভারতেও আধুনিকের প্রাসঙ্গিকতা আছে।

কবি ও সাহিত্যের শিক্ষক হিসেবে জীবনানন্দ কবিতা ও কাব্যতত্ত্বের বহু সংজ্ঞায় ওয়াকিবহাল ছিলেন। এ্যারিস্টটল, সেক্সপীয়র, দান্তে, কালিদাস, রোমান্টিকদের ইশ্‌তাহার, বাস্তবতা, পরাবাস্তবতা ইত্যাদি বহুমুখী ধারণাগুলি তাঁর কল্পনায় ভাবনায় আশ্রয় খুঁজেছে। অডেনের কবিতার সংজ্ঞায় 'মেমোরেবল্ স্পীচ'কে তাঁর মনে হয়েছে অসম্পূর্ণ। স্মরণীয় রচনাকে তিনি স্মরণীয় 'বাণী' বলতেও কুণ্ঠিত ছিলেন। ম্যাথু আর্নল্ড, কোলরিজ ও এলিয়টের কাব্যতত্ত্বের অনুশীলনেও তাঁর মনোযোগ ছিল। এলিয়টের কবিতার তত্ত্ব তাঁকে আগ্রহী করলেও তাঁর কবিতা ঠিক তেমনভাবে নয়। এলিয়টকে তাঁর মনে হয়েছে কালোত্তীর্ণ নন। স্বদেশে প্রমথ চৌধুরীর কাব্য বিচারের ব্যর্থতা তাঁকে আহত করেছিল।

ইয়েটসের আকর্ষণ যেমন তাঁর ওপরে অনস্বীকার্য তেমনি রিলকেরও। তবে কামিংসের চাতুর্য তাঁর মন টানেনি, যেমন টেনেছে এজরা পাউণ্ডের মনন-দীপ্তি। আরাগঁ বা এ্যলুয়েরের মত পরাবাস্তববাদীদের লেখা সম্পর্কে তাঁর মনোভাবের কোনো উল্লেখ নেই, যদিও শিল্প ও সাহিত্যে পরাবাস্তববাদ সম্পর্কে তিনি নিশ্চিত ভাবে সতর্ক ছিলেন। হাক্সলিকে তিনি ভবিষ্যৎ দ্রষ্টা মনে করেননি, যেমনভাবে ঔপন্যাসিক টমাস মানকে এ

বিপন্ন যুগের চিন্তানায়ক হিসেবে মেনে নিয়েছেন। এঁরা জীবনানন্দের ভাবনা-প্রতিমায় মিশে গেছেন। বুদ্ধদেব বসুতে যেমন বোদলেয়ারের উষ্ণ নিঃশ্বাস শোনা যায় বা এলিয়টের প্রুতফকে আমরা প্রায় ভাষান্তর-এ দেখি বিষ্ণু দের সুরেশে, জীবনানন্দ তাঁর ব্যতিক্রম। তিনি বহু ভাবনাকে গ্রহণ বর্জন করেও নিজের স্বভাব স্বকীয়তায় নির্দিষ্ট ও উজ্জ্বল থাকেন। তাঁর কবিতায় দেশি বা বিদেশি অগ্রজের প্রত্যক্ষ ছায়াপাত ঘটে না। না ইয়েটসেরও নয়।

জীবনানন্দের অনেক আগেই পাশ্চাত্যের সাহিত্য দর্শনের হাওয়া আমাদের এদেশের নিঃশ্বাস প্রশ্বাসে অনেক আগেই ভেসে এসেছে। রামমোহন, বঙ্কিমের পথ ধরেই পাশ্চাত্য দর্শন, সাহিত্য, কাব্যতত্ত্ব, এদেশের মননের মাটি স্পর্শ করে। এসবই নবজাগরণের সোনার ফসল। বাঙালির ভাবনা হয়ে ওঠে আন্তর্জাতিক। ওয়াল্টার স্কটের উপন্যাসই ছিল বঙ্কিমের প্রথম সিঁড়ি। মাইকেল তো মিল্টনকেই মনে করতেন 'স্বর্গীয়'। রবীন্দ্রনাথ স্বচ্ছন্দে বিচরণ করেছেন ওয়ার্ডসওয়ার্থ, শেলী, কীটস, জন ডান, ব্রাউনিং-এর জগতে।

দুই বিশ্বযুদ্ধের রক্তাক্ত তোপধ্বনিতে অনেক প্রাচীন চিন্তার বেড়া ভেঙে পড়ে যায়। মানবিকতার নবমূল্যায়নের আলো অন্ধকারে পৃথিবী হয়ে ওঠে প্রশ্নমনস্ক। বিংশ শতাব্দীর চিন্তাকে বিশেষ করে আলোড়িত, আন্দোলিত করেন মার্কস, ফ্রয়েড, আইনস্টাইন প্রমুখেরা।

এই সংকটে বিদেশে ফোটা অচেনা ফুলগুলি দেশ ও ভাষার প্রতিবন্ধকতা ভেঙে রবীন্দ্র পরবর্তী ভাবনায় গন্ধ বিলোতে থাকে। মালার্মে, র‍্যাঁবো, বোদলেয়ার, সুইনবার্ন, পল ভার্লেন, রিলকে, এলিয়ট, অডেন, ডীলান টমাস, এজরা পাউণ্ড, ইয়েটস্‌দের সঙ্গেই আত্মীয়তা অনুভব করতে পারলেন রবীন্দ্র পরবর্তী কবিরা। সুধীন দত্ত, বিষ্ণু দে, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসুরা এই কবিতার স্রোতের জটিল গতিকে নিজস্ব বলে চিনতে পেরেছিলেন বলে সেখানেই ডুব দেন নির্বিচারে মণি মুক্তোর সন্ধানে। জীবনানন্দও সহজাত প্রবণতায় বিদেশি কবিতায় খুঁজে বেড়িয়েছেন তাঁর প্রার্থিত 'আভা'। তিনি অনুভব করেছিলেন 'ইংরেজি ও ফরাসি কবিতার মর্ম হাড়ের ভেতর বোধ করবার শক্তি'। কারণ তিনিও জানতেন কাব্যভাবনার নিরঙ্কুশ স্বকীয়তাই সাফল্যের অনিবার্য শর্ত নয়। কোনো সফল কবি (এমনকি সেক্সপীয়র, রবীন্দ্রনাথও) তা দাবি করতে পারেন না। দুনিয়ায় ভৌগোলিক দূরত্ব যখন কমেছে বিজ্ঞানের দৌলতে, কবিরা যখন আরো ঘনিষ্ঠ, তখন চিন্তাভাবনার ঘাত-প্রতিঘাতে 'কম্পন' পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্তে অনুভূত হবেই। বিজ্ঞানের, অর্থনীতির সূত্র বা সমাজ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও এটি সত্য। কিন্তু নিছক প্রভাবিত বা অনুপ্রাণিত কবিতাই যে কবিতা নয়, ব্যক্তি জীবনানন্দ অন্তত সে বিষয়ে সতর্ক ছিলেন।

জীবনানন্দের ব্যক্তিচিন্তায় ও কাব্যভাবনায় যতটুকু তথ্য পাওয়া যায়, তাতে স্বভাবতই তিনি বিদেশি দর্শন ও কাব্যসাহিত্যের প্রভাব অস্বীকার করেননি। 'কোয়ান্টাম থিয়োরি, সময় দেশের আপেক্ষিকতা, দেশকালের সীমা প্রসৃতি, বিচূর্ণ পরমাণুর আশ্চর্য উত্তেজ, গণতান্ত্রিক সুনিয়ম ও সুকৃতির ওপর সৎ সমাজের প্রতিষ্ঠা এই বৈজ্ঞানিক প্রবর্তনার পক্ষেই মানুষের হৃদয় পরিবর্তনের সম্ভাব্যতা' তাঁর চেতনায় স্থান পেয়েছে। মার্কসবাদ, কিয়ের্কেগার্ড প্রতিষ্ঠিত অস্তিত্ববাদ, বৌদ্ধধর্ম, জরথ্রুষ্ট, ফ্রয়েড, পাভলভ, হ্যাভলক এলিস, গান্ধী প্রমুখের সম্পর্কে এবং চিন্তা, দর্শন সম্পর্কেও ওয়াকিবহাল ও ভাবিত ছিলেন তিনি। কবিতার বস্তুবাদকে মেনে নিয়ে তিনি নিজে 'সৎ' ও 'মহৎ' কবিতা লেখার প্রচেষ্টায় স্থিত

হলেন।

মানুষের মনে দীপ্তি আছে
তাই রোজ নক্ষত্র ও সূর্য মধুর
এরকম কথা যেন শোনা যেত কোনো একদিন
আজ সেই বক্তা ঢের দূর,

রবীন্দ্রনাথের দীর্ঘ কাব্যজীবনের শুভ্র-সমুজ্জ্বল অট্টালিকায় জীবনানন্দ অন্য যে কোনো উত্তরসূরীর মতনই প্রবেশ করেছিলেন। রবীন্দ্রকাব্যের জীবনবেদ (তিনি আমার প্রাণের আরাম, মনের আনন্দ, আত্মার শান্তি) ও কারুকলাকে বিনয়াবনতচিত্তে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেখানে কোনোদিন বাসা বাঁধা সম্ভব নয় বুঝে। যদিও 'সার্বভৌম' কবি হিসেবে রবীন্দ্রকাব্যের সাফল্যের উচ্চতা সম্বন্ধে তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না। তথাকথিত রবীন্দ্র-বিরোধীদের অর্বাচীন আস্ফালনেও তিনি ভিড় করেননি। রবীন্দ্রনাথ কি বুর্জোয়া? এই যুক্তিও তিনি অবহেলা করেছেন। অক্ষম রবীন্দ্রভক্ত ও রবীন্দ্রবিরোধী কোনো শিবিরই তাঁর মন টানেনি। মহৎ পূর্বসূরীর সাফল্য তাঁকে বিচলিত ও হীন করেনি। তাঁর কাব্য-কুশলতা ও দার্শনিক ব্যাপ্তি জীবনানন্দের শ্রদ্ধা ও মনোযোগ কেড়েছিল।

কিন্তু বিশ্বচরাচরে রবীন্দ্রভাবনার ঔপনিষদিক শান্তি ও সৌন্দর্যমণ্ডিত ব্রহ্মজ্ঞান থেকে জীবনানন্দ ছিলেন বহুদূরে, জটিল পৃথিবীর দুর্বোধ্য নাস্তিকতায় আক্রান্ত। যদিও রবীন্দ্রনাথ তাঁর দীর্ঘ সময়ব্যাপী কাব্য রচনায় কত সরল জটিল পরিক্রমায় অজানা বিচিত্ররহস্য ক্রমে ক্রমে উদ্‌ঘাটিত করেছেন, প্রেম প্রকৃতি ঈশ্বর মৃত্যুচেতনারও রূপান্তর ঘটেছে, প্রকাশ-ভঙ্গিরও পালাবদল ঘটেছে—সব স্রোত মিলে শেষপ্রান্তে দাঁড়িয়ে আছেন আনন্দবাদী রবীন্দ্রনাথ। যাঁর কাছে সুখের বিপরীতে দুঃখ কিন্তু আনন্দের কোনো বিপরীত শব্দ নেই। আনন্দই absolute তাঁর কাছে।

রবীন্দ্রনাথের কাব্য উপলব্ধির কেন্দ্রবিন্দু :

> 'আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে
> তবুও শান্তি, তবু অনন্ত, তবু আনন্দ জাগে।।'

আর জীবনানন্দের অনুভব বিপরীতে একই পৃথিবীর অন্য সীমান্তে :

> 'জানো না কি অনেক যুগ চলে গেছে? মরে গেছে অনেক নৃপতি?
> অনেক সোনার ধান ঝরে গেছে জানো না কি? অনেক গহন ক্ষতি
> আমাদের ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে—হারায়েছি আনন্দের গতি ;
> ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
> হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান?'

তিনি নিজেই স্বীকার করেছেন রবীন্দ্রনাথের বিস্তৃত বর্ণাঢ্য বিচরণভূমিতে তিনি সচেতনভাবে নিজের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছিলেন। আত্মবিশ্বাসের অভাব ও বিনয়ে লিখেছিলেন, 'দুর্বল বিদ্রোহের অভিমানে আমি আমার পূর্ববর্তী বড় কবিকে ডিঙিয়ে গেলাম অকাব্যের জঞ্জালের ভিতর'। রবীন্দ্রকাব্যে বহুমুখী ধারা উপধারা, তাঁর স্রোতের বেগ ও গভীরতা, উচ্ছল জলরাশি, জলকণার রঙ তিনি অবলোকন করেছিলেন। বলাকা, মহুয়া, পুনশ্চ, শেষ সপ্তক তাঁর চিন্তাকে নিশ্চয়ই আলোড়িত, জর্জরিত করেছিল। সেক্সপীয়র যেমন মানুষের রহস্যময় জীবনের মহিমা ও পতনকে, স্থান কালকে ছাড়িয়ে কবি-নাট্যকার হিসেবে সাফল্যের শীর্ষ চূড়ায় অধিষ্ঠিত, তিনি মানতেন রবীন্দ্রনাথও তাই। নিতান্ত সৌন্দর্যবিলাসী কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথকে চিহ্নিত করার মূঢ়তা তথা বাচালতা

থেকে সরে এসে, রবীন্দ্রনাথকে মানুষ ও মানুষের সমাজভাবনার দায়ভার মুক্ত কবি বলতেও তাঁর মন চায়নি। মানুষের ভবিতব্যের মহান ভাবনায় রবীন্দ্রনাথ ভাবিত ছিলেন বলেই জীবনানন্দের ধারণা। যদিও তাঁর শেষপর্যায়ের রবীন্দ্রনাথ নিয়ে শেষ মনোভাব ছিল 'তাঁর প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ ও ইতিহাসচেতনা একটা নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে।'

প্রাচীন বাংলার যত কাব্য বিশেষত মঙ্গলকাব্যের গল্প গাথা, বৈষ্ণব পদাবলীর গীতিধর্মিতা, ঈশ্বর গুপ্তের তির্যক ব্যঙ্গোক্তি, মাইকেলের মহাকাব্যিক বিস্তার পেরিয়ে রবীন্দ্রনাথই যে সাগর মোহনায় বিস্ময়ের দিগন্ত সৃষ্টি করেছিলেন, বোধহয় কবি হিসাবে জীবনানন্দ সেই সুদূর প্রান্তের বিস্ময়লোকে পৌঁছতে সক্ষম হয়েছিলেন।

তবুও যতীন্দ্রনাথ, সত্যেন দত্ত, নজরুল ও মোহিতলালের মন ও মননের প্রতি কোনো আন্তরিক শ্রদ্ধা ছাড়াই জীবনানন্দ তাঁদের তৈরি কারিগরি বিদ্যাই হাতে তুলে নিয়েছিলেন কেন? সমকালের প্রভাব যে কোনো কবির ওপর বর্তাবে। যে উপাদানগুলি নিয়ে তাকে ইমারত শুরু করতে হয় তার গুণাগুণ কবির ইচ্ছা নিরপেক্ষ। তাকেই অবলম্বন করা সব যুগের কবিরই দায়ভার। কাব্য ইতিহাসের পরম্পরায় এই দায়বদ্ধতা যেন সমাজ বিজ্ঞানের নিয়মের মতনই অকাট্য ও অমোঘ। জসিমুদ্দিনের—

'ঐ যে গাঁটি যাচ্ছে দেখা আইরি ক্ষেতের ধারে'

বা মোহিতলালের —

'মিটেনা পিপাসা আর ধরণীর তিক্ত হলাহলে
নেহারিলে উর্দ্ধাকাশে জ্যোতিষ্কের জ্যোতি অনিমিখ',

কিংবা সত্যেন দত্তের —

'কার তরে এই শয্যা দাসী রচিস আনন্দে,
হাতির দাঁতের পালংকে মোর দে রে আগুন দে।'

অথবা নজরুল ইসলামের একদিকে—

'কারার ঐ লৌহ-কপাট
ভেঙে ফেল, কর রে লোপাট/রক্ত জমাট/শিকল-পূজার পাষাণ বেদী'র রণধ্বনি অপর দিকে প্রেমের অভিসারে 'গভীর রাতে জাগি খুঁজি তোমারে'ই (গানে দরবারি কানাড়ার মূর্ছনা) এই সবই ছিল জীবনানন্দের প্রাথমিক সম্বল।

সত্যেন দত্তের ছন্দের চাতুরিকে মেনে নিয়েও তিনি যে রবীন্দ্রনাথের ছন্দবোধকে ছাড়াতে পারেননি তিনি জানতেন। যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদের অগভীরতা, নজরুলের বিদ্রোহের মাত্রা বা মোহিতলালের দেহজ আকুতি তাঁর মন টানেনি। কিন্তু রবীন্দ্র-দার্শনিকতা, ঐতিহ্য, ভঙ্গিমা, ছবি শব্দ ধ্বনি সবকিছুর থেকেই তিনি সরে আসতে চেয়েছিলেন অন্যতর জীবন বীক্ষা ও কাব্য অনুভূতির তাড়নায়।

পারিবারিক জীবনের ছন্দ ও পরিবেশের দায়ভার কবির ওপর খানিকটা বর্তায়। বাবা সত্যানন্দ দাশ, মা কুসুমকুমারী দাশ ও 'হেডমাস্টারমশাই জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়-এর প্রভাব ছিল তাঁর ওপর। 'যদি মনোলোকে কিছু সার্থক হয়ে থাকে তা হয়েছে এঁদেরই প্রকাণ্ড দানের ফলে।' প্রত্যুষে বাবার মন্ত্রপাঠ তাঁকে ভক্তিতে অবনত করেনি, হৃদয়কে প্রসারিত করেছে, যিনি সত্যসন্ধানী মানুষ ছিলেন, তাঁরই উত্তরাধিকারে জীবনানন্দ পেয়েছিলেন জীবন জিজ্ঞাসা। কল্যাণময়ী মায়ের কবিতা রচনার মননশীলতা (যাঁর রচনা

— 'আমাদের দেশে কবে সেই ছেলে হবে / কথায় না বড় হয়ে কাজে বড় হবে') তাঁকে আকৃষ্ট করত। মাস্টারমশাই তাঁকে নিয়ে এসেছিলেন জ্ঞান ভাণ্ডারের দরজায়। শিক্ষকতাই ছিল জীবনানন্দের মূল পেশা। বেশ কয়েক বছর অবশ্য ছেদও পড়েছিল। বরিশাল থেকে কলকাতায় আসা তাঁর জীবনে বেশ বড় ঘটনা বা প্রায় দুর্ঘটনা। দাম্পত্য জীবন ছিল তাঁর সরল ও সামাজিক। কলেজ কর্তৃপক্ষ বা প্রতিবেশীর অসহযোগিতা তাঁকে অস্থির করে তুললেও নির্বিবাদী, আত্মমুখী, জীবনানন্দ ঝঞ্ঝা ঝড় থেকে নিজেকে নির্জনতায় সরিয়ে নিতে পারতেন। কোনো গোষ্ঠী, শিবির, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সংগঠন তাঁকে টানতে পারেনি। সত্যিই তিনি 'নির্জনতম' কবি।

রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনার বলয় থেকে উদ্ধার পাবার চেষ্টা সত্ত্বেও—নিয়তির মতন রবীন্দ্রনাথই আকাশ ভরে আছেন। 'আমাদের সূর্য দেখা সূর্যালোকে প্রত্যূষে প্রদোষে।' (বিষ্ণু দে)। বাঙালীর কবিতাভাবনায় শুধু নয়, জীবনচর্চার প্রতি স্তরেই তাঁর উজ্জ্বল উপস্থিতি। তাঁর প্রতিভা স্বতঃসিদ্ধ ও সর্বজনগ্রাহ্য, তবুও তার থেকে উদ্ধার পাবার আশংকায় রবীন্দ্র-প্রতিবাদী সাহিত্যের একটি ধারা তাঁর জীবদ্দশাতেই গড়ে উঠেছিল কল্লোল, কালি-কলম, প্রগতি, কবিতা, পূর্বাশা প্রভৃতির মঞ্চ ঘিরে। রবীন্দ্রনাথের 'আনন্দলোক' থেকে তাঁরা সরে আসতে চাইছিলেন মজুর কৃষকের জীবনে প্রবেশ করতে, অতীন্দ্রিয় সৌন্দর্যলোক থেকে নেমে পাপের অতল পাতালে, রোমান্টিক প্রেম থেকে দেহজ প্রেমে। আন্তরিকতার সঙ্গে স্ব-বিরোধিতাও ছিল, ছিল আত্ম প্রবঞ্চনা। তাই একসঙ্গে এসে জড় হয়েছিল ন্যুট হামসুন থেকে গোর্কি, ডি. এইচ. লরেন্স থেকে ডস্টয়ভস্কি, এলিয়ট, এজরা পাউণ্ড, বোদলেয়ার, মালার্মে, রিলকে, ভার্লেন। যুদ্ধক্লান্ত দুনিয়ার অবিশ্বাস, ক্ষয়বোধ, নাস্তিকতা, আশা-নিরাশা সবকিছু মিলেমিশে যাচ্ছিল। এর মধ্যে কথাসাহিত্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সাফল্য বিতর্কের অতীত। তারাশংকর, বিভূতিভূষণও নিজেদের স্থান করে নিয়েছিলেন। কবিতায় সুধীন দত্ত শুনিয়েছিলেন যুক্তিবাদী কাব্যিক প্রজ্ঞা।—'আমারে নিঃশেষে পিষে মিশে যাবে নিশ্চিহ্ন নাস্তিতে একদিন স্বরচিত এ পৃথিবী মম।' বুদ্ধদেব বসু শুনিয়েছিলেন, 'যে প্রণয় বিবসন, বিশুদ্ধ, জান্তব মৃত্যু নেই তার'। অমিয় চক্রবর্তী বিশ্বাস করেছিলেন দুনিয়াজোড়া নৈরাজ্যের মধ্যে বিশৃঙ্খলার মধ্যে শৃঙ্খলা 'মেলাবেন তিনি মেলাবেন।'

যুদ্ধের পটভূমিতে প্রগতিশীল লেখক সংঘ ও ফ্যাসিবাদ বিরোধী লেখক-শিল্পী সংঘের ভূমিকা এযুগের সাহিত্যের বিবর্তনে নতুন দিগন্ত এনেছিল। শিল্পীর স্বাধীনতা ও রাজনৈতিক মুক্তি পরস্পর হাত মিলিয়েছিল।

এই সমস্ত ঘাত প্রতিঘাতের মাঝখানে জীবনানন্দ দাশ যেন থেকেও ছিলেন না। তাঁর দায়বদ্ধতা যেন নিজের কাছেই। চল্লিশের দশকের বিপুল ঘটনাবলির অন্তর্নিহিত স্রোতের সারাংশ সম্পর্কে ওয়াকিবহাল হয়েও তিনি আত্মমুখী। তিনি অনুভব করছিলেন যুদ্ধ মানবিকতার মৌল কাঠামোকে বিধ্বস্ত করছে। রণাঙ্গনে পরিখার মধ্যে ঈশ্বর মৃত। ফ্যাসিবাদ সভ্যতাকেই গ্রাস করতে উদ্যত। অন্যদিকে সোভিয়েত বাহিনীর অসীম সাহসিকতা ইতিহাসের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করছে। হিরোশিমায় পরমাণুর চরম ট্রাজেডি। তিনি খুঁজে চলেছেন এই অভিঘাত থেকে অন্য কোনো আশ্রয়। মহত্তর কোনো সমাজ।

রবীন্দ্রনাথও মূলত কবি, কিন্তু যুদ্ধের এই সংকটে তিনি বিশ্বলোকের সংকটের, যন্ত্রণার অভিব্যক্তি দেখিয়েছিলেন, ন্যায় ও অন্যায়কে চিহ্নিত করেছিলেন। গান্ধীবাদের কোনো কোনো কর্মসূচী বা বিপ্লববাদীদের বোমা বন্দুক গুলির আওয়াজ তিনি সহজ মনে গ্রহণ

করতে না পারলেও সময়ের ডাককে উপেক্ষা করেননি। জীবনানন্দের সমকালীনরাও, বিশেষত বাম শিবিরের, দায়বদ্ধতার কথা বলেছিলেন। সমস্ত শিল্প সাহিত্যের মঞ্চ তখন যুদ্ধ-বিরোধিতায়, স্বাধীনতার আকাঙ্খায় উদ্বেল। যেমন বিষ্ণু দের কলমে এসেছিল ঃ

'জনসমুদ্রে নেমেছে জোয়ার
হৃদয়ে আমার চরা ?
অঙ্গে কাহারও রাখিনা অঙ্গীকার'

সমর সেন লিখেছিলেন দার্শনিক সিদ্ধান্তের কাব্যিক বয়ান ঃ

'সমাজধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে
চেতনার ছাপ সমাজধারাকে নয়।'

এ যুগের হৃদস্পন্দন সুকান্ত ভট্টাচার্যের অনাবিল আবেগময় কবিতায় ঃ

'এত বিদ্রোহ কখনো দেখেনি কেউ
দিকে দিকে ওঠে অবাধ্যতার ঢেউ'।

তবু জীবনানন্দ একাকী, নিজের মধ্যেই পথ খুঁজেছেন। কোনো মঞ্চে, কোনো শিবিরে, কোনো মিছিলে পা দেননি।

দেশের মাটিতেও স্বাধীনতার সংগ্রাম যখন উত্তাল, দুর্বার প্রতিবাদ, বিদ্রোহে বাংলাদেশ যখন অগ্নিগর্ভ, রাজনীতি আর সৃষ্টিশীলতারও তখন অগ্নিপরীক্ষা। কালাপানি, রাজবন্দী, ফাঁসি, মজুর কৃষকের লড়াই, কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি, মুসলিম লিগ, গান্ধীজি, নেতাজি, নেহেরু, দুর্ভিক্ষ দাঙ্গা দেশভাগ, শেষ পর্যন্ত খণ্ডিত স্বাধীনতা— স্বদেশ ও বিশ্বের এই ভাঙাগড়ার ঝঞ্ঝাঝড় থেকে জীবনানন্দের চেতনা প্রবাহ সত্যিই বিস্ময়কর অন্তর্মুখী। ভাবনার স্বকীয়তায়, ক্ষণভঙ্গুর সাময়িকতাকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের রহস্য সন্ধানে তিনি 'শাশ্বত মীমাংসা'র পথ খুঁজে চললেন, যেখানে কোনোদিন মানুষের পদচিহ্ন পড়েনি।

পাণ্ডুলিপির পাঠ ও অপ্রকাশিত জীবনানন্দ

আফসার আমেদ

এখনো পর্যন্ত জীবনানন্দ দাশের অপ্রকাশিত গল্প, উপন্যাস ও কবিতা আটটি খণ্ডে 'প্রতিক্ষণ' প্রকাশন সংস্থা প্রকাশ করেছে। আরো চারটি খণ্ড প্রকাশ হবার মতো অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি আছে ; যা 'প্রতিক্ষণ'-রই প্রকাশের একমাত্র অধিকার। এই আটটি খণ্ড প্রকাশের কাজে সাহিত্যিক দেবেশ রায়-এর সহযোগী হিসেবে আমার অংশগ্রহণ প্রায় প্রথম থেকেই আছে। এই আটটি খণ্ডের পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিপির কাজ প্রায় তিন-চতুর্থাংশ আমি করেছি। দেবেশ রায় 'জীবনানন্দ সমগ্র'র সম্পাদক, তিনিও পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিপি করেছেন। এবং সাময়িকভাবে অশোকা সিকদার ও অনিশ্চয় চক্রবর্তী অনুলিপি করেছেন। '১৯১৬ থেকে ১৯৩৮ এই নয় বছরের মধ্যে আটটি খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। ৭টি উপন্যাস বেরিয়েছে। জলপাইহাটি, মাল্যবান, কারুবাসনা, জীবনপ্রণালী, বাসমতীর উপাখ্যান, প্রেতিনীর রূপকথা এবং বিভা। আর কোনো অপ্রকাশিত উপন্যাস নেই। 'জাতীয় গ্রন্থাগার'-এ সংরক্ষিত জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপির মধ্যে অবশ্যই। এ পর্যন্ত 'জীবনানন্দ সমগ্র'-এ ৩৮টি গল্প প্রকাশিত হয়েছে। আরো ৫০টি গল্প আছে যা অপ্রকাশিত। সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপি থেকে মাত্র ১৩টি কবিতা বেরিয়েছে, অপ্রকাশিত কবিতার সংখ্যা অনেক।

'জীবনানন্দ সমগ্র'-এর সম্পাদক দেবেশ রায় প্রথম খণ্ডের সম্পাদকীয়তে বলেছেন "জীবনানন্দ দাশ-এর প্রকাশিত-অপ্রকাশিত রচনার সম্ভাব্য পুনর্বিন্যাস অনিবার্যতই জটিল। কারণ, তিনি নিজেই যেন সেগুলোকে প্রকাশিত ও অপ্রকাশিত এই দুই ভাগে রেখে গেছেন। তাঁর অপ্রকাশিত ভাগ, আয়তনে, প্রকাশিত ভাগকে তুচ্ছ করে দেয়। মৃত্যুর অনেক পরে প্রকাশিত একটি-দুটি উপন্যাস বা গল্প এই ইঙ্গিত দিয়েছিল মাত্র যে তিনি কবিতাই লেখেননি কেবল। এখন তাঁর যত্নরক্ষিত অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির ভাণ্ডারের দিকে মাত্র চোখ বুলিয়েই বোঝা যায় তাঁর যে-কটি কবিতার সঙ্গে আমরা পরিচিত তা কেবল মগ্নশৈলের চূড়াটুকু আর গল্প উপন্যাস রচনা তাঁর কাছে কবিতা লেখার ব্রত থেকে ক্ষণিক অবকাশযাপনে দুটো একটা লিখে ফেলবার মত আকস্মিক কিছু ছিল না, এ নিশ্চয়ই ছিল তাঁর সৃষ্টিকর্মের অপরিহার্য প্রয়োজন, নইলে এত মেহনতে এত লেখা, লেখা যায় না।"

জীবনানন্দের অপ্রকাশিত রচনার গুরুত্ব যেন প্রকাশিত জীবনানন্দের রচনার চেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। সম্পাদক 'জীবনানন্দ সমগ্র'কে লেখকের অপ্রকাশিত রচনার ভেতর দিয়ে 'নতুন সমগ্রতা' ব্যাখ্যা করেছেন। প্রকাশিত জীবনানন্দে আমরা কবিকেই পেয়েছি। অপ্রকাশিত জীবনানন্দে ঔপন্যাসিক ও গল্পকার জীবনানন্দকে আমরা তীব্রভাবে পাই। এটা নিশ্চয়ই এক বিস্ময়কর ঘটনা। এরকম ঘটনা বাংলা সাহিত্যে আগে ঘটেনি। যিনি অপ্রকাশিত রচনা বাদ দিয়েই আমাদের সাহিত্যের প্রধান একজন প্রতিষ্ঠিত কবি হয়েছেন। এ ঘটনা বিরল। অপ্রকাশিত রচনার সময়কাল তিরিশের দশকের গোড়ায় ও

চল্লিশের দশকের শেষের দিকে। সবচেয়ে অবাক হতে হয়, সেই সময়ের সাহিত্যধারার মধ্যে জীবনানন্দের রচনা ভিন্নতর মাত্রায় ও অন্বেষণে পৃথক। এমনকি গদ্যে বিষয় নির্বাচনে এবং প্রকরণে জীবনানন্দের লেখাগুলি এখনের লেখা মনে হয়। প্রশ্নাতীত আধুনিকতা। যে আধুনিকতা সেই সময়কার সাহিত্যে পাওয়া যায় নি। প্রধানত ব্যক্তি ও বিচ্ছিন্নতাকে এমনভাবে আশ্রয় করে লেখা হয়েছে। প্রথাসিদ্ধ লেখার বাইরে একেবারে। লেখাগুলি যে সময়ে লেখা, সেই সময়ে যদি প্রকাশ হত তাহলে অধুনা বাংলা সাহিত্যের অন্যরকম রূপান্তর হয়তো আমরা দেখতে পেতাম। কেননা সাহিত্যের ইতিহাসের ধারার মধ্যেই এক আত্তীকরণ ঘটে, যাকে অস্বীকার করা যায় না।

আমরা যদি কবি জীবনানন্দকে দেখি, তাহলে দেখতে পাব, রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিদের মধ্যে প্রধানতম একজন কবি। তার প্রধান কারণ অন্যতর ভাবনা ও ব্যঞ্জনার আশ্রয় ছিল তাঁর। বাংলা কবিতায় তাঁর চেয়ে বেশি কেউই প্রভাব ফেলতে পারেন নি। তাঁর গল্প উপন্যাসের ভেতরও একই গুণ থাকা সত্ত্বেও গল্পকার ঔপন্যাসিক জীবনানন্দ তেমনভাবে আলোচিত ও পঠিত হচ্ছে না, তার একটা কারণ, কবি জীবনানন্দের আচ্ছন্নতা আমাদের মনের মধ্যে বদ্ধমূল হয়ে আছে। এটা কবি জীবনানন্দের গুণেরই পরিচয়। কবিতায় যে নান্দনিক বিশেষত্ব, গল্প উপন্যাসেও সমান নান্দনিক বিশেষত্ব লক্ষ করবার মত। দুটি পৃথক আঙ্গিক হ'লেও জীবনানন্দেরই সমান্তরাল পরিক্রমা। কবিতায় যে ব্যক্তিমানুষের উপলব্ধি, মৃত্যু, প্রেম, একাকিত্ব ও বিচ্ছিন্নতা, গল্প উপন্যাসেও ঐ একই বিষয় এবং অনুসন্ধান। কখনো কখনো মনে হয় কবি জীবনানন্দকে জানতে গেলে গল্পকার-ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের আশ্রয় নিতে হবে। কবিতার মধ্যে যে রহস্যময়তা, গল্প উপন্যাসে তা অনেক খোলাখুলি, কবিতায় যে আত্মজিজ্ঞাসা, গল্প উপন্যাসে তার আভাসে ইঙ্গিতে উত্তর খুঁজে নেয়া যায়।

বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক, সতীনাথ এবং জগদীশ গুপ্ত বাংলা সাহিত্যের এক একটা শাখা, এই শাখাগুলিতে প্রত্যেকেই তাঁদের নান্দনিক বিশেষত্বে বিশিষ্ট হয়ে আছেন। কেউ কারুর মত নয়। তেমনি জীবনানন্দ এঁদের মতই গল্পকার ও উপন্যাসিকের মর্যাদা পাবেন। যদি এই জীবনানন্দ প্রকাশিত থাকতেন তাহলে এঁদের নামের পাশে তাঁর নামটিও জানতাম। যেহেতু জীবনানন্দ তাঁর সময়ে অপ্রকাশিত থেকে গেছেন, সেহেতু আমরা একটু গোলমালে পড়েছি। কিন্তু অপ্রকাশিত জীবনানন্দকে আমাদের উড়িয়ে দেবার উপায় একেবারেই নেই। ৪০ ও ৫০ বছর আগের লেখা এখন প্রকাশ হচ্ছে, অধুনা সমসাময়িকতার আপাত এক চাপ থাকে নিশ্চয়ই জীবনানন্দের রচনা পাঠের ভেতর। কেননা আমরা প্রতি বছর 'প্রতিক্ষণ' শারদীয় সংখ্যায় উপন্যাস অথবা দু তিনটি গল্প দেখতে পাই। এখনকার লেখকদের পাশাপাশি তাঁর লেখার প্রকাশের এক সমসাময়িকতা কাজ করে। আর তাঁর বিষয় ও ভাষা এবং আঙ্গিক এমনই আধুনিক যে আমাদের অনেক সময় মনে হয় এই সময়ের লেখা।

অপ্রকাশিত গল্পকার-উপন্যাসিক জীবনানন্দ তাঁর সময়ে রচনাকালের মধ্যে লেখাগুলি প্রকাশ করতে পারেন নি। তাঁর লেখার বিশিষ্টতা নিশ্চয় বাধা ছিল। অথচ সেই বৈশিষ্ট্য সমসাময়িক প্রধান রচনাকারদের পাশাপাশি আসন দাবি করে। তাঁর এই বিশিষ্টতার ভেতরই তখন প্রকাশ না হবার ব্যাপার ছিল। তিনিও বুঝি তা বুঝতেন। একই রকম রুলটানা খাতায় অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির পাঁজা সাজিয়ে তিনি তুলে রাখতেন সুটকেশের ভেতর। তিনি জানতেন, কোনো এক সময়ে হয়তো ছাপা হতেও পারে। একটা লেখা লিখে

তৎক্ষণাৎ ছাপার যে চাপ লেখককে যে মনোযোগ ও যত্ন আদায় করিয়ে নেয়, জীবনানন্দের ঐসব অপ্রকাশিত লেখার পাণ্ডুলিপি কোনো এক সময়ে বেরতে পারে এমন অনিশ্চয়তার ভেতরে থেকেও সমান মনোযোগ ও যত্ন ছিল জীবনানন্দের। তাঁর পাণ্ডুলিপির ভেতর থেকেই এটা জানা যাবে।

যাট বাষট্টি পৃষ্ঠার রুলটানা ছোট স্টেশনারি খাতায় এক পৃষ্ঠায় লিখতেন। যেভাবে প্রেসকপি হয়। খোলা পাতায় না লিখে খাতায় লিখেছেন, তার কারণ তুলে রাখার জন্য। তাছাড়া একই লেখা বার বার পরিমার্জন করার ব্যাপারটা পাণ্ডুলিপি দেখেই বোঝা যাবে। বাক্যের মধ্যে অন্য শব্দ ও বাক্যাংশ তিনি বসাতেন। বাক্যাংশ বা শব্দের নীচে কলমের লাইন টানতেন, এবং ওপরে বিকল্প বাক্যাংশ বা শব্দ লিখে রাখতেন। আগেরটা কখনো কেটে দিতেন না। দেখে মনে হবে তিনি সেই বিকল্প শব্দ বা বাক্যাংশের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিতে পারছেন না। কিংবা এমনও হতে পারে, যিনি কোনো এক সময়ে ছাপবেন, তাঁর দায়িত্ব বিকল্প শব্দ বা বাক্যাংশ বেছে নেয়া বা বেছে না নেয়ার। অথচ বিকল্প বাকাংশ ও শব্দটি বেশি ভাল এবং আরো তীক্ষ্ণ তীব্র। সম্পাদক দেবেশ রায় বিকল্প শব্দ বা বাক্যাংশ বেছে নিয়েছেন। শুধু একটি বিকল্প শব্দ ও বাক্যাংশই নয়, সেই শব্দ ও বাক্যাংশের বিকল্পেরও বিকল্প শব্দ ও বাক্যাংশ তিনি দিয়েছেন।

জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি থেকে অনুলিপি করার কাজ আমি দীর্ঘদিন ধরে করছি। প্রায় আট বছর। নিজের আর পাঁচটা কাজের ফাঁকে ফাঁকেই করতে হয়। কখনো কখনো সমস্ত কাজ ফেলে অনুলিপির কাজ করতে হয়ে থাকে দিনের পর দিন। তখন 'প্রতিক্ষণ' পূজো সংখ্যার জন্য অথবা 'জীবনানন্দ সমগ্র' প্রকাশের তাড়ায়। আমার কাছে এই কাজ নিঃসন্দেহে বিরল এক অভিজ্ঞতা। একজন লেখককে জানার ব্যাপারে পাণ্ডুলিপির পাঠ একটা অন্য জিনিস। খুদে খুদে টানা ও জড়ানো হস্তাক্ষর। প্রথম দিকে হস্তাক্ষরের সঙ্গে পরিচিত হতে হয়েছে। কপি করা খুব মুশকিল হত। যে সব শব্দ বুঝতে পারতাম না, সম্পাদক উদ্ধার করে দিতেন। জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি দেখাই এক উত্তেজনার ব্যাপার, প্রতিটি শব্দ অনুলিপি করার ভেতর প্রতিমুহূর্তের উত্তেজনা নিয়ে কাজটা করতে হচ্ছে। কেন না জীবনানন্দের বাক্য প্রথাসিদ্ধ নয়। অথচ জড়ানো হস্তাক্ষরের ভেতর দিয়ে তাঁর লেখা শব্দটি বের করতে হবে, যদিও আগের বাক্যাংশ যে প্রথাসিদ্ধ শব্দটাকে বাধ্য করে, সে বাক্য তিনি লেখেন না বলে আতান্তরে পড়তে হয়। অনেক সময় সমাসবদ্ধ শব্দ ব্যবহারের ঝোঁক দারুণ মুশকিলে ফেলে থাকে। একটা অস্পষ্ট শব্দ উদ্ধার করার জন্য অনেক সময় অনেকটা সময় দিতে হয়। অনেক সময় নেশার মত হয় ব্যাপারটা। কেন না জীবনানন্দের সেই বাক্যের মজাটুকু না জেনে থাকা কষ্টকর হয়। যেমন একবার একটি বাক্যে 'জুতাবুরুশ' শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। অথচ বাক্যের চাহিদাতে যে শব্দ স্বপ্নেও ছিল না, আবার জড়ানো হাতের লেখা, ষাট বছর আগের কালি কাগজ ও হস্তাক্ষর, তারও ওপর শব্দটি সমাসবদ্ধ ছিল। সেই শব্দটা উদ্ধার করা মানে কোনো দ্বীপ আবিষ্কার করার মত ব্যাপার হয়েছিল। শব্দ উদ্ধার নিয়ে এমন ঘটনা অবিরত ঘটেই চলে।

ঝরণা কলমে নীল কালিতে লেখা। মাঝে মাঝে পেনসিলও ব্যবহার করেছেন। ওপরের মার্জিনে নানা শব্দ লিখে রাখতেন, বুঝতাম রচনার পরিকল্পনা তাতে থাকতো। তা তিনিই বুঝতেন। অনেক সময় তা ইংরিজিতে লিখে রাখতেন। কোনো লেখার মাঝখানে এক আধ পৃষ্ঠার লেখা ঢোকাতে গেলে পরের পৃষ্ঠায় লিখতেন। যেখানে ঢোকাতেন সেখানে × চিহ্ন দিতেন। এবং পরের পৃষ্ঠায় যেটা লিখতেন তার শুরুতে × চিহ্ন দিয়ে

দিতেন। ছোটখাটো অংশ ঢোকাতে গেলে ঐ পৃষ্ঠার ডান দিকে লিখে রাখতেন ঐভাবে। অনেক সময় অনেকটা অংশের বিকল্প অংশ লিখতেন ঐভাবে। জায়গা কম থাকার জন্য লেখা আরো জড়ানো হত। অনেক সময় স্পষ্ট নির্দেশ না থাকায় মেলানো দুরূহ হয়ে উঠতো। এ থেকে বোঝা যেত একটা লেখা নিয়ে তিনি বার বার বসতেন এবং পরিমার্জন ও সংশোধন, সংযোজন করতেন। অনেক সময় পৃষ্ঠা জুড়ে লম্বালম্বি পেন্সিলের দাগ থাকতো, পৃষ্ঠার লেখা কেটে দেবার মত। লেখার আগে পেন্সিলের ঐ দাগ ছিল হয়তো। অথবা পেন্সিলে কেটেও পুরোপুরি কাটতে চাননি। তখন গল্পের গতি ও ঘটনার পারম্পর্য বিচার করে ঐ পৃষ্ঠাকে বাদ দিতে হত অথবা নিতে হত।

তাছাড়া জীবনানন্দের গল্প ও উপন্যাসের ঘটনার পারম্পর্য প্রথাসিদ্ধ রীতিতে একেবারেই ছিল না। গল্পের পরের ঘটনা কোন জায়গায় তিনি নিয়ে যাবেন এবং শেষ কী হবে এটা একেবারেই আগে কখনো ধরা পড়তো না। জীবনানন্দের লেখার এটা একটা প্রধান বৈশিষ্ট্য। সেই হেতু তাঁর পাণ্ডুলিপি অনুলিপি করার অন্য একটা সমস্যা ছিলই। এবং গল্প শেষ করতেন প্রচলিত রীতি না মেনে। এখানেও একটা সমস্যা দাঁড়ায়। খাতার অন্য কোনোখানে গল্পটা শেষ করেছেন কিনা দেখতে হয়। এরকমটা যদিও হয়নি। পরের গল্প শুরু হওয়া দিয়ে আমরা শেষটা বুঝে নিই। আমাদেরও এক এক সময় প্রশ্ন থাকে, গল্পটা হয়তো শেষ করলেন না।

দ্বিতীয়ত আর একটি বিভ্রান্তির কারণ ঘটে একই গল্প পুনর্বার টুকছি কিনা। আমরা তখন প্রকাশিত গল্পের প্রথম লাইনগুলির সঙ্গে নতুন টুকতে বসা গল্পের প্রথম লাইন মিলিয়ে নিই। বিভ্রান্তি হবার একটাই কারণ, তিনি সাধারণত একই রকম নারী পুরুষ পুনর্ব্যবহার করেন তাঁর গল্পে। চেনা বিষয় ও চেনা লাগে পাত্র পাত্রীদের তাই। এমন কি গল্পের প্রথম লাইনেও কেমন চেনা গন্ধ থাকে। এটা সম্পূর্ণ লেখকের নিজস্ব লেখনবৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। এ ব্যাপারটাকে চেনা খুব দরকার হয়। জীবনানন্দ সম্পর্কে এটা একটা অভিযোগও থাকতে পারে। আমার তা মনে হয়নি। এক একটা গল্প এক এক রকমের। পাত্র পাত্রীর প্রেম ও অপ্রেমের সমস্যা, স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ব্যবধান ও আকাঙ্ক্ষার বৈপরীত্য বার বার তিনি আনলেও অন্যতর এক গল্পের দিকে নিয়ে যান তিনি।

দু-একটি ছাড়া গল্প উপন্যাসের নাম তিনি দিয়ে যান নি। না দিয়ে যাবার প্রবণতাই বেশি। যেমন 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'বিভা' উপন্যাসটির নাম তিনি দিয়ে গেছেন। আবার 'আর্টের অত্যাচার' ও 'বিস্ময়' গল্পের নাম তিনি দিয়ে গেছেন। সম্পাদক দেবেশ রায় লেখকের সেই গল্পের লাইন থেকেই গল্পের ও উপন্যাসের নাম গ্রহণ করেছেন। এতে জীবনানন্দের নিজস্বতার গন্ধ পাওয়া যাবে গল্পের নামগুলিতে। যেমন 'আকাঙ্ক্ষা-কামনার বিলাস,' 'কারুবাসনা,' 'প্রেতিনীর রূপকথা', 'কুয়াশার ভিতর মৃত্যুর সময়,' 'মেয়েমানুষের ঘ্রাণে', 'শুধু সাধ, শুধু রক্ত, শুধু ভালবাসা,' 'ক্ষণিকের মুক্তি দেয় ভরিয়া' ইত্যাদি।

সমস্ত গল্প উপন্যাসগুলি চলিত ভাষায় লেখা। শুধু 'সঙ্গ, নিঃসঙ্গ' গল্পটি সাধু ভাষায় লেখা। তার গদ্য অসাধারণ। কোনো এক পৃষ্ঠার একটা লাইন তুলে নিলে তাঁরই মনে হবে। এমন নিজস্বতার গদ্য বাংলা সাহিত্যে কম লেখা হয়েছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে নিজস্বতার ব্যাপারটা যদিও যথেষ্ট আছে, তবুও বলব জীবনানন্দের গদ্য আরো একটু অন্য মাত্রা দাবি করে। কেননা তাঁর গদ্য যেন ছাল বাকল, পোশাক নয়।

জীবনানন্দের এই সব পাণ্ডুলিপি দেখার সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ছুঁতে পারতাম।

আঙুল বুলিয়ে পড়তে পারতাম। প্রথম দিকে যখন খটোমটো লাগতো তখন জাতীয় গ্রন্থাগারের কর্মীরাও সহযোগিতা করতেন। যত্নে সেগুলো রাখতেন। খাতার বাণ্ডিল এনে নামিয়ে দিতেন টেবিলে। তা থেকে বেছে নিয়ে কপি করতাম। একটা অভিযানের আনন্দ যেন পেতাম। বছর পাঁচেক আগে সমস্ত পাণ্ডুলিপির মাইক্রোফিল্ম হয়ে গেল। এই প্রক্রিয়ার জন্য বেশ কয়েক মাস আবার অনুলিপির কাজে ব্যাঘাত ঘটে। কয়েক মাস পরে আবার অনুলিপির কাজ করতে পাই। এবার আর মূল পাণ্ডুলিপি থেকে নয়। এটা একটা আফশোস বটে। রিডারে মাইক্রোফিল্ম এঁটে অনুলিপির কাজ করতে হল এবার থেকে। লেন্স আর আলোর কারসাজিতে জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠা দ্বিগুণেরও বেশি বড় হয়ে আয়না থেকে প্রতিফলিত হয়ে একটা ধাতব চত্বরে পড়তো, তা দেখে দেখে কপি করা। যন্ত্র মাঝে মাঝেই গোলমাল করতো। রিডারযন্ত্রটির ল্যাম্পটি ছিল বেয়াড়া এক বস্তু। জার্মানির যন্ত্র। মেরামতির দায়িত্বে ছিল কোন এক সংস্থা। কয়েকটি মাত্র রিডারযন্ত্র ছিল। সেই সব যন্ত্রের আলো সমান উজ্জ্বল ছিল না। ভাগ্যে কম আলোর রিডার জুটলে একপাতা কপি করতে সারাদিন লেগে যেত। চোখের বারোটা তো বাজতোই। দ্বিতীয়ত মাইক্রোফিল্মের রিলে পৃষ্ঠার ছবির মান সবগুলি সমান হত না। ক্যামেরায় তোলা অনেক পৃষ্ঠার মান ছিল সাংঘাতিক রকম খারাপ। যেখানে যেখানে জীবনানন্দের লেখা অস্পষ্ট, পেনসিলে লিখেছেন, সে সব পৃষ্ঠা নিয়ে নাজেহাল হবার শেষ থাকে না। কখনো আলোর মান কম হওয়ায় ঘরের আলো নিভিয়ে কপি করতে হয়েছে। কখনো মাইক্রোফিল্মের মান খারাপ থাকায় ঘরের আলো নিভিয়ে কাজ করতে হয়েছে। 'দুষ্প্রাপ্য' বিভাগের কর্মীরা সাধ্যমত সহযোগিতা করেছেন। আবার বার বার রিডারযন্ত্রের বাল্ব নষ্ট হয়ে যাবার জন্য তাঁর-ই নতুন কড়া নিয়ম তৈরি করেছেন। দশ মিনিট কাজ করার পর দশ মিনিট রিডারযন্ত্র বন্ধ রাখতে হবে। অনুলিপির কাজ আরো ধীর ও মন্থর হয়ে ওঠে। পাণ্ডুলিপি রিডারযন্ত্রে চলে গিয়ে নাজেহালের শেষ রাখছে না। গবেষকরা তথ্যগত প্রয়োজনে রিডারযন্ত্রে বড় জোর আধ ঘণ্টা কি এক ঘণ্টা দেখে যান। তাঁদের কাছে এই ব্যবস্থাটা ঠিকই আছে। পাবলিকেশনের জন্য জীবনানন্দের এই বিপুল অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপির ক্ষেত্রে অনেক বেশি দণ্ড মনে হয়। যদিও এটা একটা আইনগত ব্যবস্থা, তা মেনে নেয়াই বোধহয় ঠিক।

পাণ্ডুলিপির খাতাগুলো এক একটা বাণ্ডিলে আবদ্ধ ছিল। কোন বাণ্ডিলে কী আছে, তার একটা হিসেব আমাদের কাছে ছিল। মাইক্রোফিল্ম হবার পর সেগুলো পুরনো হিসেবের মধ্যে আর থাকে না। রিলের নম্বরের এক একটা গুচ্ছ এসে যায়। একটা রিল মানে পৃষ্ঠার সমুদ্র। এক একটা রিলে তিরিশ চল্লিশটা গল্প এঁটে যায়। আগের দিনে খানিকটা টোকা গল্পটা তার ভেতর থেকেই খুঁজে নিতে হয়। টোকার আগে থাকে প্রস্তুতি। যান্ত্রিকতার সঙ্গে এক ধরনের আপোশ করতেই হয়। যেহেতু যন্ত্র কিনা!

জীবনানন্দ দাশ তাঁর গল্প ও উপন্যাসে গ্রাম ও শহরের পটভূমিকে সমানরকমভাবে এনেছেন। সময়ও ধরা পড়েছে তাঁর গল্প উপন্যাসে। সেখানে গান্ধীজি রবীন্দ্রনাথ সুভাষচন্দ্র সমসাময়িকভাবে ধরা পড়েছেন। কংগ্রেসের প্রসঙ্গ এসেছে। এসেছে কলকাতার মেসের বেকার যুবক ও বিত্তবান ব্যবসায়ী। এসেছে 'মোটর' চড়া ব্যবসায়ী। এসেছে ব্রাহ্মসমাজ, মিশনারি গির্জা, কুষ্ঠ এবং দুরারোগ্য যক্ষ্মা, কলেরা বসন্ত ম্যালেরিয়াও বাদ যায় নি। এ সমস্ত দিয়ে জীবনানন্দের সময়কে চিনে নেয়া যায়। গ্রাম ও শহর এই দুইয়ের ভেতর থেকে তিনি নিয়েছেন তাঁর সময়কে। শহরের ইট কাঠ পাথর এসেছে। গ্রামের নদী ও নিসর্গ এসেছে। তারই ভেতর নরনারীর সম্পর্কের অন্য গন্ধ তিনি এনেছেন, যা তাঁরই একান্ত এক রচনা, যা তাঁকে বিশিষ্ট করে রাখবে নিঃসন্দেহে।

জীবনানন্দ দাশ : কবিতার কথা

সুব্রত রুদ্র

সাহিত্যের ইতিহাসে কবি স্বয়ং কাব্যতত্ত্ব তথা কবিতা-বিষয়ক আলোচনায় তাঁর শ্রম ও সময় নিয়োজিত করেছেন - এমন উদাহরণ খুব বেশী নেই। রোমান্টিক যুগে ইংরেজি সাহিত্যে ব্যাপক ভাবে লিখেছেন এ-বিষয়ে কোলরিজ, স্বল্প পরিমাণে শেলী, ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে কীট্স। পরবর্তী কালে লিখেছেন ম্যাথু আর্নল্ড—যদিও কবি হিসেবে তাঁর তেমন প্রসিদ্ধি ছিল না ; এবং বিংশ শতকে টি. এস. এলিয়ট।

আমাদের দেশে কাব্যতত্ত্ব না লিখুন, কবিজীবনী লিখেছেন ঈশ্বর গুপ্ত। এর পরে 'বাঙ্গলা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' শীর্ষক আলোচনা লেখেন কবি রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায়। তারপর বেশ কিছুদিন কবিরা এ বিষয়ে প্রায় নীরব। কিন্তু তাঁদের সব নীরবতার ক্ষতিপূরণ করেছেন স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ।

বিষয়টি অত্যন্ত জটিল, এবং নিজস্ব শিল্পের মাধ্যম সম্পর্কে কিছু বলা যে কোনো শিল্পীর পক্ষে সঙ্গত কারণেই কঠিন। কবির পক্ষে তো বটেই।

রবীন্দ্রোত্তর যুগে ব্যাপকভাবে কাব্যতত্ত্ব নিয়ে যে কবি, খ্যাতি ও অখ্যাতি দুই লাভ করেছিলেন, তিনি মোহিতলাল মজুমদার। পরবর্তীকালে লিখেছেন বুদ্ধদেব বসু, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত এবং অল্পপরিমাণে হলেও বিষ্ণু দে। এই স্মরণীয় কবিদের মিছিলে অবশ্যই যাঁকে, এ-প্রসঙ্গে বিশিষ্ট বলে চেনা যায়, তাঁর নাম জীবনানন্দ।

যদিও পেশায় অধ্যাপক, তবু কবিতা-অনুরাগী বাঙালী মানসে, রোমান্টিক চেতনার অভিনব প্রতিভূ হিসেবে তিনি এমনই অচ্ছেদ্য যে, তাঁকে কাব্য-সমালোচকের ভূমিকায় ভাবা কঠিন। কিন্তু সেই কঠিন কাজেই তিনি ব্রতী হয়েছিলেন বাংলা ১৩৪৫ সাল থেকে ১৩৬০ পর্যন্ত। মনে রাখতে হবে তাঁর লেখার শুরু হওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ জীবিত এবং সৃষ্টিশীল হিসেবে সক্রিয়। সে সময় আকাশপ্রদীপ, সানাই, রোগশয্যায়—ইত্যাদি কবিতাগুলি লিখিত।

ভনিতা না করেই বলা যাক, এই আলোচনার প্রেরণা হলো তাঁর অর্থাৎ জীবনানন্দের বই, 'কবিতার কথা'—যার প্রথম প্রবন্ধের (কবিতার কথা) প্রথম লাইনের অংশ বিশেষ—'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি...'—বাংলা কবিতা-আলোচনার ক্ষেত্রে প্রবাদবাক্যের মর্যাদা লাভ করেছে।

পনেরটি প্রবন্ধে লিখিত এ-বইতে কবিতার স্বরূপ, কবিতাপাঠ, রুচি-বিচার, রবীন্দ্রনাথ, বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে।

একথা গোড়াতেই স্বীকার করা ভালো জীবনানন্দ যে ভঙ্গীতে কবিতা সম্পর্কে আলোচনা করেছেন, তা অ্যাকাডেমিক নয়, এবং হয়তো তত্ত্ব-প্রধানও নয়—কিন্তু সাধারণ প্রবন্ধ-পাঠকের পরিচিত ধারণার উপযোগীও নয়। কবির প্রণালী সম্পর্কে বলতে গিয়ে

তিনি মন্তব্য করেছেন—কবির চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ কবিতার মধ্যে লুকিয়ে থাকে সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা উপশিরা ও রক্তের কণিকার মত। নিবিষ্ট পাঠক তাকে উপলব্ধি করতে পারে। কবিতার মধ্যে যে আনন্দ নিহিত থাকে তা কি রকম? কবির ভাষায় ঃ 'জীবনের সমস্যা ঘোলা জলের মুষিকাঞ্জলির ভিতর শালিকের মত স্নান না করে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের সাদা রৌদ্রের মত—সৌন্দর্য ও নিরাকরণের মত।'

কবি জীবনানন্দের সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা উদ্ধৃত বাগ্‌ভঙ্গিমায় অবশ্যই অবাক হবেন না—কিন্তু প্রবন্ধকার বা সমালোচক হিসেবে 'আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের সাদা রৌদ্র' ইত্যাদি শব্দ-সমবায়ের ব্যবহার পাঠক হিসেবে কোনো উপলব্ধি জাগ্রত করে না—এখানে পাঠক সঙ্গত কারণেই প্রশ্ন করতে পারেন, 'আসন্ন নদী' বলতে সমালোচক কি বলতে চেয়েছেন? মনে রাখতে হবে কবিতার ভাষা এবং প্রবন্ধের ভাষা এক নয়। এবং আমাদের বিনীত ধারণায়, এক হওয়া উচিত নয়।

তবে সব প্রবন্ধে এই রহস্যময় তথা কাব্যিক ভাষার অনুরণন নেই। বরং লেখক তাঁর ধারণাকে প্রখরতর গদ্যে প্রতিফলিত করতে চেয়েছেন। এই প্রতিফলনের পরিচয় পাওয়া যায় 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' 'উত্তররৈবিক বাংলা কবিতা' 'দেশ কাল ও কবিতা'—প্রভৃতি প্রবন্ধে। অবশ্য একথাও মনে রাখা প্রয়োজন, আজ থেকে চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশ বছর আগে, বাংলা গদ্যে নির্মোহ চেতনার আয়োজন ছিল কিছুটা সংশয়ী—অন্ততঃ আজকের মত স্বচ্ছন্দ-স্পষ্ট-দ্বিধাহীন ছিল না।

সেই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে জীবনানন্দের গদ্য রচনা, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বুদ্ধদেব বসুর প্রখর বিশিষ্টতা হয়তো দাবী করতে পারে না—তবু, মানদণ্ডে তাঁর রচনা অবশ্যই উল্লেখযোগ্য। একথা বলার কারণ, জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে ইদানীং যত মোহ ও মুগ্ধতা কেটে যাচ্ছে—তাঁর গদ্য সম্পর্কে অতিরিক্ত উৎসাহ লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

সাহিত্যের ইতিহাস-বিচারে এই প্রবণতা কতখানি সার্থক, তা অবশ্যই বিতর্কসাপেক্ষ। কিন্তু বাংলা কবিতার স্বরূপ সম্পর্কে যিনি অবহিত হতে চান—তিনি কবি অকবি যাই হোন না কেন—'কবিতার কথা' তাঁর পক্ষে অবশ্যপাঠ্য। আজ থেকে তিরিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে যিনি 'সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা' 'দেশ কাল ও কবিতা' 'কবিতা পাঠ' ইত্যাদি বিষয়ে ভেবেছেন আন্তরিক ভাবে—তাঁর আলোচনার ভাষায় কবিসুলভ নেপথ্যচারিতার আভাস থাকলেও, তা সময়ের প্রেক্ষাপটের পরিবর্তন হিসেবে, আমাদের বিশেষ মনোযোগের দাবী রাখে।

অটুট নিরভিসন্ধি, স্নায়ুর আঁধারে জীবনানন্দের কবিতা

রণজিৎ দাশ

১.

আমরা যারা কবিতা লিখি, তারা জানি যে সেই কবিই শ্রেষ্ঠ, যাঁর কবিতা, পড়তে শুরু করলে, মনের ভিতর একটা অগাধ রসায়ন শুরু হয়, নিজেদের সৃজন কল্পনা ভিতরে ভিতরে অদ্ভুত ডালপালা মেলতে শুরু করে। যেন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে কোনো রহস্যময় বাতাস বয়ে যায়। আমরা জানি, সেই কবিই শ্রেষ্ঠ। জীবনানন্দ এইরকমই একজন শ্রেষ্ঠ কবি।

২.

আমার বরাবরের বিস্ময় ঃ জীবনানন্দের কাব্যভাষা। বিস্ময় এই যে, কীভাবে জীবনানন্দ সৃষ্টি করলেন এই মায়াবী ভাষাজগত? আমি প্রায়ই জীবনানন্দ-পূর্ববর্তীদের লেখা পড়তে গিয়ে মনে মনে খুঁজি এই ভাষাভঙ্গীর কোনো প্রাক-ইশারা, কোনো পূর্বছায়া। কোথাও পাই না। কেবল সেদিন, অবন ঠাকুরের 'আলোর ফুলকি' পড়তে গিয়ে একটা জায়গায় চোখ আটকে গেল ঃ

"...হুতুম সবাইকে থামিয়ে গম্ভীর সুরে আঁধারের স্তুতি আওড়ালেন, 'নিঝুম রাত' দুপুর রাত, নিশুতি রাত। কেষ্ট পক্ষের কষ্টি পাথর কালো আকাশের কালো রাত। বর্ষাকালের কাজলমাখা পিছল রাত। নিখুঁত রাত। কালোর পরে একটি খুঁত তারার টিপ। ভয়ংকরী নিশীথিনী, বিরূপা ঘোর, ছায়ার মায়া, থাকুন, তিনি রাখুন। নিশাচর নিশাচরী রক্তপাত করি, আচম্বিতে নিঝুম রাতে, দুপুর রাতে। নষ্ট চন্দ্র, ভ্রষ্ট তারা, ভিতর-বার অন্ধকার রাত সারারাত। নিঝুম দুপুর, নিখুঁত দুপুর, অফুর রাত।..."

—এই অংশটি প'ড়ে, কেন জানি, মনে হল জীবনানন্দের কথা, মনে হল, এমন বেপরোয়া নিশিপাগল ভাষায় অন্ধকারের উদ্বোধন—প্যাঁচার গম্ভীর কণ্ঠে—এর মেজাজের সঙ্গে কোথায় যেন জীবনানন্দের একটা প্রচ্ছন্ন সুদূর মিল।

৩.

"এখানে বনের কাছে ক্যাম্প আমি ফেলিয়াছি;
সারারাত দখিনা বাতাসে
আকাশের চাঁদের আলোয়
এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনি—
কাহারে সে ডাকে!"

['ক্যাম্পে' ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি]

'ঘাইহরিণী'!—একটি তুমুল শব্দ, জীবনানন্দের মৌলিক ম্যাজিকে, বাংলা কবিতায় এক নতুন রহস্যের ঘাই তুলল। প্রায়, কবির আবির্ভাবই ঘোষণা করল যেন। একটি শব্দের জন্যে, তৎক্ষণাৎ, অশ্লীলতার অভিযোগ উঠল জীবনানন্দের বিরুদ্ধে।

কী অর্থ এই 'ঘাইহরিণী' শব্দটির? দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখছেন, "হরিণীকে ঘাই করে পুরুষহরিণদের নিয়তিমুখে টেনে আনার" কথা, জানাচ্ছেন, "...'ঘাই' অসমীয়া শব্দ, অপর পাখি বা প্রাণীকে ফাঁদে ফেলে আকর্ষণ করে আনার জন্যে শিকারী সজাতীয়ের ঘাই পাতে, ঘাইয়ের ডাক শুনে অপর বনরীয়া তাকে খুঁজতে এসে ফাঁদে পড়ে..."। (জীবনানন্দ দাশের কবিতাসংগ্রহ' ; ভূমিকা ঃ পৃঃ ৫৭-৫৮)। পাশাপাশি, জীবনানন্দের জীবনীকার ক্লিন্টন বি. সীলি তাঁর 'A Poet Apart' গ্রন্থে লিখছেন, "Contexually, 'ghai' seems to suggest estrous, such connotation of sexual excitement making the poem rather controversial. The word's denotation continues to be imperfectly understood to this day. ...There seems to be no doubt that sexuality constitutes this decoy's lure. Like a doe in heat to stags, Jibanananda's poetry has proved irresistibly alluring to readers." [পৃঃ ১০১]।

এই উদ্ধৃতিতে, জীবনানন্দের কবিতার আবেদন সম্পর্কে সীলি-র মন্তব্যটি, এক কথায়, ধুরন্ধর! অর্থ যা-ই হোক, 'ঘাইহরিণী' শব্দটির প্রয়োগমহিমায় কেঁপে উঠল বাংলা কবিতার শুচিবায়ুগ্রস্ত অন্ধকার।

'ক্যাম্পে' কবিতাতেই রয়েছে, "এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি/জীবনের বিস্ময়ের রাতে/কোনো এক বসন্তের রাতে?"—হঠাৎ মনে হয়, কেমন যেন একটু ব্যক্তিগত উচ্চারণের প্রচ্ছন্ন আভাস এই পঙক্তিগুলিতে, যেন গোপন কোনো প্রেমাস্পদার উদ্দেশ্যেই তাঁর এই প্রচ্ছন্ন জিজ্ঞাসা। সত্যিই কি ছিল তেমন কোনো নারী, তাঁর জীবনে? জীবনের একটি, অন্তত একটিমাত্র বিস্ময়ের রাতে, জীবনানন্দ কি সেই নারীর সঙ্গে গোপনে উপভোগ করেছিলেন প্রেমের এক নিভৃত বসন্ত-উৎসব?—এক লহমার জন্যে, তীব্র কৌতূহলে, এসব কথা মনে হয়। তাঁর সমগ্র কাব্যে দূরত্ব, বিচ্ছেদ এবং বিষাদের সুর। তাই অন্তত একটি রাত্রির হৃদয়-চরিতার্থতার স্বপ্নে সেই স্বপ্নের কেন্দ্রীয় টেনশনে, তাঁর জীবন এবং কাব্য পাঠক-মনে একাকার হয়ে যায়।

১৯৩২ সালের জানুয়ারিতে, 'পরিচয়' কাগজের তৃতীয় সংখ্যায়, 'ক্যাম্পে' কবিতাটি ছাপা হয়েছিল। কবিতাটি ছাপতে রাজি ছিলেন না সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নেহাত বিষ্ণু দে নিজে জীবনানন্দের কাছ থেকে চেয়ে এনেছিলেন বলেই শেষপর্যন্ত কবিতাটি ছাপা হয়, এই তথ্য-ও সীলি জানাচ্ছেন।

এভাবেই, একটু মধুর irony-সহ, 'পরিচয়'-এর পাতায়, জীবনানন্দের ক্যাম্প-এর প্রথম পত্তন হল, যা পরবর্তীকালে বাংলা কবিতাকে শাসন করবে, কোনোরকম দখলদারি বিনা, সেই জঙ্গলের কোণে নিঃসঙ্গ, রহস্যময় তাঁবুটি হয়ে থেকেই।

৪.

যদি বলি, আধুনিক বাংলা কবিতা সাবালক হল ১৯৩৬ সালে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নামে একটি কবিতা বই প্রকাশের দ্বারা, তাহলে খুব অত্যুক্তি হয় না।

'তুমি তা জান না কিছু, না জানিলে—
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে!'

—বইটির প্রথম কবিতা, 'নির্জন স্বাক্ষর'-এ, এই আশ্চর্য উচ্চারণ দিয়ে জ্যা-মুক্ত হল বাংলা কবিতার এক নতুন সাইকোলজিক্যাল অ্যারো অব টাইম। 'মাঠের গল্প' ('মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে/আমার মুখের দিকে—ডাইনে আর বাঁয়ে/ পোড়োজমি—খড়—নাড়া—মাঠের ফাটল / শিশিরের জল!'), 'কয়েকটি লাইন' ('কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী— / আমি বহে আনি ; / একদিন শুনেছ যে সুর— / ফুরায়েছে—পুরনো তা—নতুন কিছুর / আছে প্রয়োজন, / তাই আমি আসিয়াছি, আমার মতন / আর নাই কেউ!... ব্যথা যারা সয়ে গেছে রাত্রিদিন / তাহাদের আর্ত ডান হাত / ঘুম ভেঙে জানাবে নিষেধ ; / সব ক্লেশ আনন্দের ভেদ / ভুল মনে হবে ; / সৃষ্টির বুকের পরে ব্যথা লেগে রবে / শয়তানের সুন্দর কপালে / পাপের ছাপের মতো সেইদিনও!—'), 'অনেক আকাশ' ('গানের সুরের মতো বিকালের দিকের বাতাসে / পৃথিবীর পথ ছেড়ে—সন্ধ্যার মেঘের রঙ খুঁজে / হৃদয় ভাসিয়া যায়—সেখানে সে কারে ভালোবাসে!—'), এবং 'পরস্পর' ('মনে পড়ে গেল এক রূপকথা ঢের আগেকার.') নামক কবিতাগুলি হ'য়ে, সেই অ্যারো অব টাইম তার প্রথম পূর্ণঝলক দেখালো 'বোধ' কবিতাটিতে (এই কবিতাটি, আদ্যোপান্ত, এখনো, আমাদের মাথার ভিতরে কাজ করে, সুতরাং উদ্ধৃতি নিষ্প্রয়োজন)।

নতুন যুগসন্ধির এবং নগর সভ্যতার সংকট, স্ববিরোধ, নৈরাশ্য, উন্মাদনা, অবচেতন, এবং বিপন্ন মনীষার জটিল-জটিলতর কথা ও সুর ফুটে উঠতে লাগলো তাঁর কাব্যে।

এই জায়মান কাব্য, তৎকালীন প্রাচীনপন্থীদের বহু বিদ্রূপাঘাত উপেক্ষা ক'রে মার্ক্সপন্থী প্রগতি সাহিত্যের বিশাল চাপ এবং সমালোচনা সহ্য ক'রে, সেইসব চাপ-এর সঙ্গে টানাপোড়েনে এবং বোঝাপড়ায়, কালক্রমে হয়ে উঠল এক পরাক্রান্ত কাব্য চেতনাজগত—যাকে তরুণ প্রজন্ম অভিভূতচিত্তে স্বীকার করে নিল তাদের শ্রেষ্ঠ উত্তরাধিকার হিসেবে।

৫.

রূপকথার ভাষাভঙ্গীর সঙ্গে জীবনানন্দের আবছা মেজাজ-সাযুজ্যের কথা আগে বলেছি। বস্তুত, মিথ এবং রূপকথার উপকরণ তাঁর অনেক লেখাতেই রয়েছে। নানা ভাব এবং অনুভূতির আড়ালে, আধুনিক মনস্তত্ত্বের প্রচ্ছন্ন মুদ্রায়, যেন এক রূপকথাই বলতেন তিনি। প্রেতিনীর রূপকথা। মিথ-প্রবণ মন ছিল তাঁর। ইতিহাসের উপাদানগুলিকে পর্যন্ত তিনি কবিতায় মিথ-এর সৌন্দর্য দিয়েছেন। এই প্রবণতা যেন অনুঘটকের কাজ করেছে তাঁর বহু চেতনাস্তরের জটিল সংমিশ্রণে, ফলে, অনেক ক্ষেত্রেই, তাঁর কবিতা, খোদ আধুনিকতার পোড়ো জমির ওপর দাঁড়িয়েও, পেয়েছে এমন এক mythopoetic মাত্রা—যার রহস্য এবং আবেদন অদম্য। এই মাত্রা সম্ভব হয়েছে কেবল তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বা কবিতার বিষয়গুণে নয়, তাঁর ভাষার ম্যাজিক-এর জন্যেও। ভাষার এক অলৌকিক জাদুকর ছিলেন তিনি। এখনো, বিমূঢ় বিস্ময়ে দেখতে হয় তাঁর বাকমুদ্রা এবং কয়েনেজ-এর গভীর বিচিত্র শোভা। প্রসঙ্গত, মনে পড়ে যে, ভার্জিনিয়া উলফ শেক্সপীয়ারের ভাষার জাদু সম্পর্কে বহুদিন অপার বিস্ময়ে ভাবনা-চিন্তা ক'রে, কী করে শেক্সপীয়ার "come his words"—এই রহস্যের থই না পেয়ে, শেষে হাল ছেড়ে দিয়ে তাঁর ডাইরিতে লিখেছিলেন ঃ "Indeed, I could say that Shakespeare surpasses literature altogether, if I knew what it meant."। এতটা পরম মাত্রায় না হলেও, এ জাতীয় বিস্ময় জীবনানন্দ সম্বন্ধে-ও জাগে (বাহুল্য হলেও, সতর্কতাবশত এখানে বলে রাখি যে,

এর দ্বারা শেক্সপীয়ারের সঙ্গে জীবনানন্দের কোনো তুলনা টানছি না আমি, কারণ তা হাস্যকর)।

৬.

আমার এক অগ্রজ কবিবন্ধু, ঘুরে ফিরে জীবনানন্দ পড়তে ভয় পান। জীবনানন্দের কবিতা, এখনো, ভীষণ সংক্রামক, মাথা ও মন সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেয়—বলেন তিনি।

ঠিক কথাই বলেন। দীর্ঘকাল ধরে বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের সর্বগ্রাসী প্রভাবের পরে-ও, সেই ধারার সোনার ফসল হিসেবে পরবর্তী তিন প্রধান কবি বিনয়, শক্তি এবং উৎপলকে পাওয়ার পরেও, জীবনানন্দের ভান্ডার এখনো অনিঃশেষ। ঠিকই যে, বাংলা কবিতা, এতদিনে, জীবনানন্দের ভাববলয় এবং কাব্যদর্শন থেকে বেরিয়ে এসেছে, সময়ের চরিত্রবদলের জন্যেই ঘটেছে তা, এই ভয়ংকর ইলেকট্রনিক মাস-কালচারের যুগে, একজন কবির মনের রোম্যান্টিক বিষাদটুকু পর্যন্ত বাতিল এবং অবান্তর হয়ে গেছে, ঠিকই। তবু, এই সময়ের প্রতিকূলতার ভিতরেও, মূল কাব্যপ্রেরণার জন্যে জীবনানন্দ যে এখনো একটি মহাবিদ্যুৎকেন্দ্র, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। তাছাড়া, জীবনানন্দের এমন অনেক কবিতা রয়েছে, যাঁদের মনোবীজ এবং রূপরহস্য এখনো সঠিক অনুধাবনের অপেক্ষায়।

৭.

জীবনানন্দ সম্পর্কে কিছু লিখতে গেলে, তাঁর যে দুটি বই-এর নামোল্লেখ না করলেই নয়, এবং যে নামোল্লেখ করতে হয় খাপছাড়াভাবে, তাঁর অন্যান্য কাব্য ও গদ্য থেকে সরে এসে, হঠাৎ ক'রে, বোকার মতন, এবং কোনোক্রমে নামোল্লেখ করেই চুপ করে যেতে হয়, (অন্তত আমার মতো অক্ষম লেখককে চুপ করে যেতে হয়), ডুবে যেতে হয় সেই দুটি গ্রন্থের সৌন্দর্যের নিঃসীম স্তব্ধতায়, সেই বই দুটির নাম : 'কবিতার কথা' এবং 'রূপসী বাংলা'। 'কবিতার কথা' বাংলাভাষায় রচিত শ্রেষ্ঠ কাব্য-আলোচনা-গ্রন্থ, এই গ্রন্থের তুল্য উৎকৃষ্ট এবং পরিশুদ্ধ গদ্য বাংলা সাহিত্যে বিশেষ নেই, এই বইটি বাংলা কবিতার নির্জনতম অভিভাবক। আর 'রূপসী বাংলা'? যদি কোনোদিন সমগ্র বঙ্গভূমি হঠাৎ কোনো কারণে ভূপৃষ্ঠ থেকে বিলুপ্ত হয়ে যায়, তাহলে এই ধ্যানমগ্ন বইটি থেকেই পুনরুত্থিত হবে সেই বাংলা—তার অবিকল রূপ, রস, গন্ধ, বর্ণ, হাসি, অশ্রু, সুর এবং অন্তরাত্মা-সহ।

৮.

"POETRY IS A GAME IN WHICH THE LOSER TAKES ALL."—একটি বিদেশী সিনেমায়, এই উক্তিটি পেয়েছিলাম। তৎক্ষণাৎ অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহে, বিদ্যুৎচমকের মতো, মনে পড়েছিল জীবনানন্দের কথা। এই উক্তির সবচেয়ে ভাস্বর দৃষ্টান্ত জীবনানন্দ ছাড়া আর কে! মনে হয়েছিল, এই উক্তিটির আপাত-স্মার্টনেস-এর পিছনে যেন লুকিয়ে আছে শিল্পীজীবনের এক অন্তিম গেরিলাসত্য—তার জুয়াড়ি-সন্ত্রাস। উক্তিটির মধ্যে যেন লুকিয়ে আছে একটি মরণোত্তর অট্টহাসি। ইতিহাসের ভিতর, কচিৎ, দু'একজন লেখকের জীবন নিখাদভাবে এই 'ব্যর্থতা'-র দ্বারা গঠিত এবং নিষ্পন্ন হয়। এক দুর্লভ, বিশুদ্ধ ব্যর্থতা। যে ব্যর্থতার কথা ওয়ালটার বেঞ্জামিন বলেছিলেন, কাফকা-প্রসঙ্গে : "To do justice to the figure of kafka in its purity and peculiar beauty one must never lose sight of one thing : it is the purity and beauty of a failure. ...One is tempted to say : once he was certain of eventual failure, everything worked out for him en route as in a dream."

এই মন্তব্যটি, জীবনানন্দ সম্পর্কে-ও, একইভাবে প্রযোজ্য। কী এই ব্যর্থতার স্বরূপ?

সামাজিক মাপকাঠির মোটা দাগের ব্যর্থতা— যেমন অনিশ্চিত জীবিকা, অনটন, অসম্মান, অসুখী সংসার—এগুলি তো নয়। এই ব্যর্থতার উৎস নীতিবোধ বা মানবিকতাও নয়। এই ব্যর্থতা, বস্তুত, একটি ট্র্যাজিক মন এবং তার সূক্ষ্মতম সৌন্দর্যচেতনার দুঃসহ, নিষ্কম্প প্রকাশ। এই ব্যর্থতা,. এক সংকল্প। জীবনে সফল হতে গেলে, এমনকি খুব সৎ এবং নৈতিকভবে সফল হতে গেলেও, একধরনের মিহি সাধু শয়তানি-র দরকার হয়। এমনই, বাস্তবতার অহং-ফাঁদ। এই ফাঁদকে অস্বীকার করার 'ব্যর্থতা'ই সেই মহৎ নিরভিসন্ধি, যা, সমগ্র বাংলা কাব্য-অভিজ্ঞতার ভিতর, কেঁপে উঠেছিল একমাত্র জীবনানন্দের স্নায়ুর আঁধারে।

মেরুসমুদ্রের মতো

সাম্প্রতিক কবিতা 'ক্রমশ দুর্বোধ্য হয়ে উঠছে'—এই পুরনো অভিযোগটি যাঁরা আমার কাছে তোলেন, তাঁদের সঙ্গে আমি কোনও তর্কে যাই না কখনও। বদলে, একটি লুকোনো কৌতুক করি, যেটা বাইরে থেকে ধরা যায় না। আমি ভালমানুষের মতো মুখ করে বলি, হ্যাঁ তা তো খানিকটা বটেই...তা হলে, আপনার কার কার লেখা বুঝতে কষ্ট হয় না, সহজ লাগে? তালিকাটা শুরু হয় এই ভাবে : রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দ, সমর সেন...এইবার আমি খেলাটা ধরে নিই। জীবনানন্দ? মানে, জীবনানন্দও!—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই জীবনানন্দের তো বনলতা সেন, রূপসী বাংলা,...এগুলো তো খুবই সুন্দর।

—আর অন্যগুলো?—আমি বলি।

—মানে?

—সাতটি তারার তিমির, বেলা অবেলা কালবেলা? বা ধরুন, 'সেইসব শেয়ালেরা'। কেমন লাগে সেই লেখা? অথবা 'মহিলা' কবিতাটি? বা, ইতিহাসযান?...পড়েছেন, কি এগুলো? উত্তর আসে, হ্যাঁ পড়েছি তো বটেই, কাব্যগ্রন্থের দুটো ভলিউম তো আছে আমার। সবটা আসলে, সব সময় মনে পড়ে না, কবি কী বলতে চেয়েছেন...আমি যোগ করি : তা ছাড়া সব কবিতা তো চট করে ধরাও যায় না।...

তিনি বলেন, ঠিকই তো! কবিতা কি আর একবার পড়েই...।

আমরা দুজনেই যেন বেশ একমত হই। কথাপ্রসঙ্গ ধীরে ধীরে অন্যদিকে ঘুরে য়ায়। তর্কও লাগে না। মজাটা অবশ্য আমি একাই পাই।

পুরোটা কিন্তু মজাও নয়। এইজন্য যে, আমি নিজেও জীবনানন্দের অনেক কবিতা, আজও, পুরোপুরি বুঝতে পারি না। লিখতে যখন হচ্ছে, তখন প্রথমেই এটা স্বীকার করা ভাল। অন্য কাউকে যখন জিজ্ঞেস করি, তখন এটাও লক্ষ্য থাকে যে, হতেও তো পারে, এই লোকটাই আমাকে নতুন কিছু জানিয়ে দিল হঠাৎ জীবনানন্দ বিষয়ে? নিজের ধরতে না-পারা কোনও কোনও লাইনও ফিরে আসে হঠাৎ। যেমন, তুষারধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদানে। কী রে বাবা। এর মানে কী। পুরো কবিতা নয় তা-ও। একটা লাইন। কিন্তু এ তো হল বেলা অবেলা কালবেলার কবিতা। খটকা লাগতেই পারে! বলতে তবু কিন্তু কিন্তু লাগছে, ওঁর প্রথম দিকের কবিতাতেও আমার এমন বাধা ঘটেছে আগে-আগে। একেবারে বনলতা সেন বই থেকেই বলি। তাতে সবিতা নামের কবিতায় রয়েছে :

> এখন অপর আলো পৃথিবীতে জ্বলে :
> কী এক অপব্যয়ী অক্লান্ত আগুন।

তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতে
কবেকার সমুদ্রের নুন ;

নারীর এলো করে রাখা চুলের সঙ্গে সমুদ্রের উপমা, এ পর্যন্ত বোঝা যায়। অন্যরাও এমন উপমা দিয়েছেন। সেই চুলের ভিতরে কালো ঢেউয়ের কথাও না হয় বোঝা গেল, কিন্তু তার মধ্যে সমুদ্রের নুন আসবে কোথা থেকে? নিশ্চয়ই কবিতার লাইনকে অত আক্ষরিকভাবে দেখতে হয় না, নিশ্চয়ই এই উপমা আসলে নারীকে প্রকৃতিতে মিলিয়ে দেখা...এ সবই মেনে নিই, একরকম করে বুঝিয়ে দিই নিজেকে, কিন্তু ব্যাপারটা এখানেই থেমে থাকে না। জীবন চলে, অভিজ্ঞতাও চলে। এই লাইনটি প্রথম পড়বার অনেক বছর পর হঠাৎ মনে হয় একদিন—প্রবল আশ্লেষে কিংবা, আশ্লেষের পর, প্রেমিকের মুখ ডুবে গেছে তার নারীর খোলা চুলের সমুদ্র জলে, সেই সময় তার মুখে যে-ঘামের নোনতা লাগে, চুলের গোড়ায় জমা ঘাম, কিংবা ঠোঁটে যে-লবণাক্ত খরখরে ত্বকস্পর্শ ঘটে, তাতে এক ঝলকে, ওই শ্বাসরুদ্ধ অথবা ক্লান্তশ্বাস অবস্থাতেই তার মনে হতে পারে, এ যেন গভীরতম কোনও সমুদ্রের নুন। কবেকার সাগরতলের ঝাপটা যেন তার মুখে এসে লাগল! আবার, এই লবণ এক প্রাচীনতাও, প্রাচীন সৃষ্টি, রক্ত, ঘাম, বীজবিন্দুর মতোই যেন তারও সেই স্বাদচিহ্ন সমুদ্রের লবণ বহন করে চলেছে। অবশ্য কেউ বাধা দিয়ে বলতে পারে এ-লেখার শিরোনাম তো 'সবিতা'। এ-কবিতাও তো, জীবনানন্দের আরও অনেক কবিতার মতোই, সভ্যতা, সময় এবং মানুষের অপরিমেয় গন্তব্য পরিণামের প্রসঙ্গ ছুঁয়ে দিচ্ছে থেকে থেকেই। তা হলে, হঠাৎ মধ্যের দুটো লাইনে অতসব এরোটিক জিনিসপত্র খুঁজে পাওয়ার কি দরকার আছে—সে কি 'তুমি' আছে বলেই?—ইত্যাদি। অপরপক্ষে আমিও গোঁড়ে তর্ক তুলে বলতে পারি, কেন জীবনানন্দই তো বলেছেন, 'এখনো নারীর মানে তুমি!' তবু তর্ক তুলতে আমার মন সায় দেয় না। আমি চুপ করেই থাকি।

শুনতে আশ্চর্য লাগলেও সত্যি যে, বনলতা সেন কবিতাটির মধ্যেই এমন কথা রয়েছে যা সম্পূর্ণ করে বুঝতে পারি না আমি। সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন। বেশ, সব পাখি ঘরে আসে, বুঝলাম, কিন্তু সব নদী? নদী ঘরে আসবে কী করে?—একজন বলল, 'এটা তো প্রতীক। নারীর প্রতীক।' হবে হয়তো। তবু নারী তো একজন রয়েইছে এ কবিতায়—বনলতা সেন। আবারও প্রতীক? হবে হয়তো। আমার মাথায় ঘোরে এই ছবিটা শুধু : রোগা একটি জলধারা। পাশে পাশে গাছ। সেইসব গাছে পাখি ফিরছে ঝাঁকে ঝাঁকে। আলো অল্প হয়ে এসেছে। আসলে আমার বাড়ির কাছের নদীটার কথাই এসেছে বোধহয়। বিকেল-সন্ধ্যায়, ওই নদীরই পাশ দিয়ে যাতায়াত করি তখন। এই নদী ঘরে আসবে? বন্যা নিশ্চয়ই নয়, অতটা ছেলেমানুষ নই। তা হলে কি সমুদ্রে মিলবে! সমুদ্র বললেই সব দরজা খুলে গিয়ে দিগন্ত। আর জলরাশি। ঘর শব্দে একটা ধারণা তো আসে। তার সঙ্গে তো মিলছে না দিগন্ত-খোলা ছবিটা। কে জানে, নদীর ক্ষেত্রে ঘর হয়তো সমুদ্রই, সবাই তো তাই বলে। প্রশ্নটা অমীমাংসিত রয়ে গেল। এর বহুকাল পরে একটা সিনেমা দেখলাম। অন্য দেশের ছবি। তাতে রয়েছে একটা দৃশ্য ; যেখানে রোগা একটা জলধারা ধীরে ধীরে একটা অল্প-মুখ গুহার মধ্যে চলে যাচ্ছে। আজ

কেমন মনে হয়, আমাদের বাড়ির কাছের সেই যে নদী, সেও কি কোথাও বহুদূর কোনও গুহামুখে অদৃশ্য হয়ে গেছে? অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে নিয়তই!

আবার যদি কবিতাটিতে ফিরে আসি তবে দেখব যে সব পাখি ঘরে আসে বললে পাখিগুলোকে আমরা কাছাকাছি দেখতে পাই, আমাদের সীমার মধ্যেই। সন্ধে হয়ে আসছে, পাখিরা ফিরছে গাছে গাছে। এটা বেশ জানা একটা দৃশ্য। কাছেরও! কিন্তু নদী? নদী তো সবসময় চলেছে আর চলেছে। জলের পাশে দাঁড়াও যদি জল তো চলে যাচ্ছে সর্বদাই, তোমাকে ছেড়ে যাচ্ছে। অনেক অনেক দূর কোথাও যাচ্ছে নিশ্চয়ই। তা হলে? ওই সব গুহাদৃশ্য ইত্যাদি সরিয়ে রেখেও এটা অন্তত বলা যায় যে, একই সঙ্গে খুব নিকটকে আর খুব দূরত্বকে দেখতে পেল মন। সব পাখি এখানে ঘরে ফিরছে, আর নদী ঘরে ফিরছে সেই ও-ই-খানে...মন দুটো দিকই একমুহূর্তে স্পর্শ করে এল। শান্ত হয়ে এল বহুদূরব্যাপী জগৎচরাচর। এই বইয়েরই পরবর্তী লেখায়,

তোমার মুখের রেখা আজও
মৃত কত পৌত্তলিক খৃষ্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন
কত কাছে—তবু কত দূর।

এ হল বনলতা সেন বইয়ের কবিতা। এই বইয়ের 'শ্যামলী তোমার মুখ সে কালের শক্তির মতন' অথবা 'সুরঞ্জনা আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো'—থেকে শুরু হয়ে আরও অনেক পথ পেরিয়ে 'সাতটি তারা...' এবং 'বেলা অবেলা'র নানা শ্লেষ-কাঠিন্য ছুঁতে সরাতে পেতে পেতে শেষে হঠাৎ এক জায়গায় দেখা গেল : 'তার ভালোবাসা পেয়ে ভয়াবহভাবে সৎ হয়ে আছি—ভাবি।' কার ভালোবাসা? 'সকাল-সন্ধ্যেবেলা আমি সেই নারীকে দেখেছি / জেনেছি অনেক দিন...।' তারপর? 'তারপর ঢের দিন পৃথিবীর সেই শাদা সাধারণ কথা / ছোটো বড়ো জিনিসের বিস্মরণে ক্রমে ভুলে গেছি।' আমাদের কার না হয় এমন! হয়েছে! কতবার, কতবার 'বেড়াতে বেড়াতে কারু দাবি / অমল ঋণের মতো গ্রহণ করেছি আমি নিতে ভুলে গিয়ে...।' এবং শেষে 'ভয়াবহভাবে সৎ হয়ে আছি—ভাবি।' ভয়াবহভাবে? সৎ? একটা হতে পারে, এই দাবি, এই প্রেম, নিতে ভুলে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই কোনও।

হয়তো সামাজিক ভাবে বাধাযুক্ত কোনও সম্পর্ক! নিতে ভুলে যেতে হবে। কিন্তু অমল ঋণের মতো গ্রহণ করব সারাজীবন। স্বীকার করছি না, কিন্তু মানছি ভিতরে ভিতরে। আবার হতে পারে, স্বেচ্ছাকৃত হালকা অবহেলা। কারণ পৃথিবীতে এ তো খুব সাধারণ ব্যাপার! সত্যি যেন তা-ই! শুধু—'সময়ের সুবাতাস মুখ ছুঁয়ে গেলে'—আজকে তার কথা 'ভুরু কোঁচকায়ে ভেবে নিতে হয়।' তাকে যে মনে নেই তত, সে কথা মনে পড়ছে আজ, আর ঠিক সেই অপরাধ বোধে আমি সৎ। আবার এও কি হতে পারে না, যে—আজ যার মধ্যে আছি, যেখানে আছি, যা সম্পূর্ণ সরিয়ে তার কাছে যেতে পারছি না, সেই বন্দিত্বে আমি সৎ? অথবা সৎ সেই বন্ধনটির কাছেই? ভয়াবহভাবে?—তার ভালোবাসা পেয়েও? এরা দুজন হতে পারে কি? এই নারীরা? তার বেশি হতে পারে? অথবা যারা বার বার জীবনে এসেছে তারা সকলে মিলে একজন হয়ে যেতে পারে? যা-ই হয়ে থাকুক, এখানে, ওই পাখি আসা আর নদী ফেরার মতো, বিদ্যুৎ দুদিকে ছুটে গেল। অবশ্য এসব লেখার এইরকমই মানে হতে পারে কি না জানি না, তবে এরকমও মনে হয় আমার। যেমন, 'ঘাস' নামে জীবনানন্দের শেষের দিকে একটা লেখা আছে। না, আগে যে বলেছেন ঘাসের

ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাবার কথা অথবা হরিৎ মদ গেলাসে গেলাস পান করবার কথা অথবা আরও পরে 'সুরঞ্জনা তোমার হৃদয় আজ ঘাস...' এ সেই ব্যাপারই নয়। এ হল ঃ

সেই থেকে হাসায় এ পৃথিবীকে ঘাস
ছমাস গাধাকে আর মনীষীকে মিহি ছয়মাস।

এখন, কথা হচ্ছে, এই মিহি ছয়মাসটা কী? গাধা যে ঘাস পেয়ে খুশি হয়ে হাসছে তা বোঝা যায়, এবং সে হাসি স্বাভাবিকভাবেই তারস্বর। কিন্তু মনীষী? মনীষীদের বিষয়ে জীবনানন্দের ভাবনা ছিল অনেক। সে কথা তাঁর লেখায় নানাভাবে পাওয়া যায়। একটা সশ্রদ্ধ করুণাও ছিল বোধহয় কখনও কখনও কেন না, মাঝে মাঝেই দেখি, মনীষীর 'নিস্তেজ প্রতীতি'। আর একটা লেখায় এক নিরুপায় মনীষীকে দেখা যায়, যে ঃ 'মোম নিয়ে বসে আছে রাত্রির ভিতরে।' এমন কি, তার ঃ 'মাথার একটি চুলও (হয়ে আছে) লোহার পিণ্ডের মতো ভারী।'

অত ভারী হয়েছে কেন? না, 'মনপবনের চাপ খেয়ে।' 'মিহি' শব্দটির মধ্যে একটা কৌতুক, এমন কি শ্লেষই রয়েছে বলে মনে হয়। মনীষী শব্দটি বলামাত্র তাঁরা যেন আমাদের সাধারণ স্তর থেকে অনেকটাই উপরে উঠে যান। আমাদেরও জীবন থেকেও। তাঁদের স্থান যেন তখন ছবিতে, মঞ্চে বা গ্রন্থাগারে। তবু সেখানে তিনিও তো একাকী। গাধা বা নির্বোধ শুধু নয়। অনেক সামান্য সাধারণ, যত সহজে হেসে উঠতে পারে—দূর পরিণামের কথা না ভেবে মনীষী তা পারেন না যেন। তাঁর হাসি, তাই যেন মাপা, চেপে রাখা, আটকানো ; ফলত, মিহি। অপরপক্ষে মস্ত সময়ের পটে, বা মৃত্যুর সামনে রেখে যদি দেখি, (এ কবিতা শুরুও হয়েছে যেহেতু মৃত্যু দিয়েই—'মরণ তাহার দেহ কোঁচকায়ে ফেলে গেল নদীটির তীরে') তা হলে, এই জীবনকেই একটা 'ছমাস মাত্র' বলা যায়। জ্ঞানী মনীষী দেখছেন, এর সূক্ষ্ম দিকটা দেখছেন আজীবন। মিহি দিকটা? প্রথম দিকে যদিও বলেছিলেন, এই পথে ক্রমমুক্তি হবে, এবং সেটা অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ তবু, পরের দিকে, এই 'আমাদের' সঙ্গে 'মনীষীর' যে ব্যবধান তা কিন্তু বারবারই জীবনানন্দের নানা কবিতায় দেখা দিয়েছে। 'আমরা দণ্ডিত হয়ে জীবনের শোভা দেখে যাই / মহাপুরুষের উক্তি চারিদিকে কোলাহল করে।' তবু মনীষীর প্রতি শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দের এক নিরুপায় ও বাধাময়, এবং শ্লেষ মিশ্রিত ভালবাসাই ছিল : তার পরিচয়, ভয়ানক একটি কবিতায় পাওয়া যায়, যে-লেখার কথা এখুনিই একবার বললাম। এবার সম্পূর্ণ তাঁকে উদ্ধৃত করি ঃ

'যেখানে মনীষী তার মোম নিয়ে বসে আছে রাত্রির ভিতরে
মাথার একটি চুলও হয়ে আছে লোহার পিণ্ডের মতো ভারী
মন পবনের চাপ খেয়ে
সকল পাহাড় নদী ডিঙিয়ে এখন তাড়াতাড়ি
সেইখানে চলে এসো—কাচের গেলাসে তার—
জলের ভিতরে
যখনই সে দিতে যাবে নির্জন চুমুক—
যেন তার সব চিন্তা—সব ক্লান্তি—চিন্তার প্রয়াস।
হঠাৎ দেখতে পায় প্রমত্ত কুকুরদের মুখ।

আমরা শুনেছি তার কাঁধে এই পৃথিবীর ভার
সর্বদাই তার মনে জন্ম নিতে চায়
নতুন সমাজ চিন্তা কবিতা প্রসাদ
সম্মুখিন বিষয়ের মাঝখানে গিয়ে সে দাঁড়ায়।
সর্বদাই অসমাপ্ত কর্তব্যের স্তূপে
তবুও অমূল্য ঃ জল! যদিও জলের মতো দর!
চলে এসো মনীষীকে গেলাসের ভিতরে দেখাই
মত্ত কুকুরের মতো আমাদের দাঁতের রগড়।

এই লেখা শেষ পর্যন্ত, এক অসামান্য এবং ভয়াবহ আত্মশ্লেষ। এই রক্তক্ষয় এবং ব্যক্তিস্বার্থদীন সভ্যতায়, যে কোনও কবি যে কোনও শিল্পী, যে কোনও চিন্তানায়কের প্রতি প্রযুক্ত এই কবিতা আজও সত্য হয়ে আছে। যদিও এই কবিতা আজও সত্য হয়ে আছে। যদিও জীবনানন্দ ভেবেছেন সারাজীবন ধরেই যে, একদিন অন্য কিছু সত্য হয়ে যাবে। ভেবেছেন, এই পথে আলো জ্বলবে...ক্রমমুক্তি হবে পৃথিবীর। এ কথা অবশ্য আমি আরও একবার বলব যে জীবনানন্দের এ সব লেখা আমার কাছে আসে, সেটাই ঠিকমতো আসা কিনা আমি জানি না। আমি কবিতাকে আমার অভিজ্ঞতার সঙ্গে মিলিয়ে দেখি। আমার জানা জিনিসকে, বিষয়কে, ছবিকে খুঁজে পাই। এবং অজানা জিনিসকেও। আর একটা মোম-জ্বালা কবিতা নেওয়া যাক। প্রাথমিকভাবে শান্ত কবিতা। তার স্থির প্রেমিকের নিকট। একজন মোম জ্বালিয়ে রয়েছে একাকী। টেবিলে। চারপাশে বই। বইগুলি শান্ত, আরাধনাশীল। প্রথম লাইন ঃ বেঁচে থেকে কোনো লাভ নেই আমি বলি না তা। এইরকম একটা সাদা স্টেটমেন্ট থেকে শুরু হয়ে নানা আঁকাবাঁকা ধাপ পেরিয়ে এই কবিতা পৌঁছচ্ছে এই তিনটি লাইনে ঃ

কোনো গ্লাসিয়ার হিমস্তব্ধ কর্মোর‍্যান্ট পাল
বুঝিবে আমার কথা ; জীবনের বিদ্যুৎ কম্পাস
অবসানে
তুষার-ধূসর ঘুম খাবে তারা মেরুসমুদ্রের মতো
অনন্ত ব্যাদানে।

মেরুসমুদ্র? সে তো কখনও দেখিনি। আর দেখবও না জীবনে। তা হলে উপায়? তা ছাড়া তুষার-ধূসর ঘুম খাবে তারা...। এই তারা আসলে কারা? গ্লাসিয়ার-হিম মানে ধরতে পারছি। কিন্তু 'স্তব্ধ কর্মোর‍্যান্ট পাল'! এক প্রতিবেশী দেখালেন বই খুলে একটা পাখির ছবি। সমুদ্রের পাখি। ফিশার বার্ড। লম্বা হয় ৩৬ ইঞ্চি। লার্জ কর্মোর‍্যান্ট। এরা হচ্ছে ঃ ব্ল্যাক বার্ড, উইথ স্নেকি নেক। এও কি সেই 'মালাবার ফেনার সন্তান'-এর কেউ? এই কবিতার প্রথমদিকে পাখির কথা রয়েছে—পেয়েছি ধবল শব্দ-বাতাস তাড়িত পাখিদের। জীবনানন্দের সেই পুরোনো পাখি? এখানে এসে কর্মোর‍্যান্ট? (আমাদের দেশি পানকৌড়ি হবে না নিশ্চয়ই?) এদের ওড়া বা শিকার যাত্রা বিষয়ে এখানে লিখছে ঃ দ্য ফ্লাইট ইজ স্টেডি অ্যান্ড পারপাসফুল, জার্নিস অফন্ বিয়িং টেকন মেনি মাইল্‌স ওভার দ্য সি—সো

নিয়ার টু দা ওয়েভ্স দ্যাট দ্য স্ট্রেট উইংস সিম টু বি ব্রাশিং দেম! মাইলের পর মাইল দীর্ঘ ডানা সমুদ্রে ঝাপট দিয়ে সমুদ্র স্পর্শ করে যাচ্ছে। জীবনানন্দের উপযুক্ত পাখি, সন্দেহ নেই। কালো দীর্ঘ ডানাকেই পাল মনে হচ্ছে না তো? নাকি পাখিদের দল? এখানে আরও লিখছে উড়তে উড়তে ওইসব পাখি কোনও কোনও নদীমুখ ধরে সময়ে সময়ে জঙ্গল জনপদের মধ্যেও চলে আসে অনেকখানি। আসে খাদ্যের সন্ধানে। এবার কি তারা উড়তে উড়তে মেরুসমুদ্রে ঢুকে পড়েছে? তা হলে এবার তারা কী খাবে? উড়তে উড়তে, মেরুসমুদ্রের মধ্যে ওই ওড়ার মুভমেন্টটাই যেন স্তব্ধ, ফ্রিজড্ হয়ে গেছে...নয়, কোনও খাদ্য নয়...ঘুম, তুষার-ধূসর ঘুম। খাবে মেরুসমুদ্রের মতো অনন্ত ব্যাদানে। এক মুহূর্তে মেরুপ্রদেশ একটা হাঁ মুখ হয়ে যায়। অতিকায় কোনো শায়িত প্রাণীর হাঁ। যার খুলে রাখা তলার চোয়ালটা হল মাইল মাইলব্যাপী তুষার প্রান্তর। তার ধূসর সাদা জিহ্বা। অনড়। আর উপরের চোয়ালটা হাঁ মুখের উপরটি? সেটা দেখা যায় না। আকাশ পর্যন্ত উঁচু। আকাশে মিলিয়ে আছে। পৃথিবীর প্রান্তে শায়িত সেই মহাকায় মুখগহ্বর...জীবনের বিদ্যুৎকম্পাস অবসানে, প্রাণিজগৎ, ডানা ঝাপটে সে দিকে চলেছে...

জীবনানন্দের কবিতাও তার সহস্র সঙ্কেত নিয়ে মেরুসমুদ্রের মতো স্তব্ধ হয়ে আছে আমার কাছে। দিনে দিনে, একটু একটু করে পাঠোদ্ধার ঘটে তার। খানিকটা অভিজ্ঞতায় খানিকটা কল্পনায় তার মর্মোদ্ধার হয়, যদিও সেটাই নিশ্চিত একমাত্র মর্ম নয়। সে-ই নয় আদি ও একতম মানে। কেন না জীবনানন্দের কবিতা নানা দিকে তরঙ্গ পাঠাতে পাঠাতে এগোয়। এক একটা শব্দ বা ছবি অনেক দূর নিয়ে যায়। জীবনানন্দের পরবর্তী যুগের এক কবি তাঁর কবিতার বইয়ের ভূমিকায় লিখেছিলেন ঃ 'আমি কবিতায় সত্যি কথা লিখতে গিয়ে দেখেছি কবিতার সত্য ক্রমশ বদলে যায়।' জীবনানন্দের কবিতা এই প্রতি মুহূর্তে বদলে যাওয়া সত্য ও স্থির সত্যকে দু দিকে দু হাত বাড়িয়ে ছুঁয়ে দেয়। যেমন ছুঁয়ে দেয় দুরকম সময়কেও। বর্তমান ও আবহমান। আজ আমরা সকলেই জানি আবহমান সবসময় তাঁর সঙ্গে সঙ্গে থাকত। কিন্তু তিনি দাঁড়িয়ে থাকতেন বর্তমানে। প্রায়ই যাওয়া-আসা করতেন। এবং এটা করতেন শব্দকে তার প্রচলিত অর্থ থেকে বেশ খানিকটা দূরে নিয়ে গিয়ে। শব্দকে, এমনকি মাঝে মাঝে ঘুম পাড়িয়ে রেখেও যেতেন। 'অরব'। অরব-এর দিকে নিয়ে যেতেন। যার জন্য তাঁর লেখা বুঝতে দেরি হয়। নিজের মনে বলতে বলতে, আবৃত্তি করতে করতে হঠাৎ আলো জ্বলে ওঠে।

অন্য পক্ষে, অবচেতনা, নিশ্চেতনা, অধিচেতনা এই সব শব্দ প্রাথমিকভাবে আমার কাছে পাথর। যে পাথর সরিয়ে পেতে হয় জল বা পথরেখা। বা, ছবি। এবং এই পথরেখা বা ছবিপথে পৌঁছতে হয়, ধ্বনির মধ্যে দিয়ে। নইলে আপনমনে একা একা আবৃত্তি হয় কী জন্যে? ধ্বনির জন্য। যেমন, একটা লাইন, মহিলা কবিতায় ঃ এইখানে শূন্যে অনুধাবনীয় পাহাড় উঠেছে। আপনমনে লাইনটি বারবার বলতে বলতে অদ্ভুত অনুভব হল। আঠারো মাত্রার লাইন, অক্ষরবৃত্তে। আটমাত্রার প্রথম পর্বটি সম্পূর্ণ হচ্ছে 'অনুধাবনীয়'-এর 'অনু' পর্যন্ত পৌঁছে। এইখানে শূন্যে অনু...এইখানে শূন্যে অনু...হঠাৎ মনে হয়, শূন্যে শূন্যে যেন অনুপুঞ্জ ধাবন করছে। ছুটে যাচ্ছে। আর তৈরি হচ্ছে, উঠে যাচ্ছে পাহাড়ও। মূল কথাটা থেকে সরে এসে, ধ্বনি, কেবল ধ্বনিই যেন, আবারও, চকিতে বিশ্বলোকের ইশারা দিয়ে

গেল। এ কথা জীবনানন্দ অবশ্য তাঁর 'কবিতার কথা' বইতে বলেওছেন একটু। না-ও যদি বলতেন তবু তা সত্যি হত। সত্যি হয়। যুগের সঞ্চিত পণ্য রয়ে যায় আমাদের কাছে। যুগে যুগে ধুলো ওড়ে, ঢাকনা খোলে, মণিমুক্তো পাওয়া যায়।

স্বাধীন সব মণিমুক্তো। অন্তত আমার কাছে স্বাধীন। আমি অন্য কাউকে কখনও জোর করব না এইভাবে দেখতে। সে তার মতো দেখুক। স্বপ্নে যেমন মানুষ অনেক দূর স্বাধীন। স্বপ্নের যেমন দ্বিতীয় দর্শক থাকে না, আমি ছাড়া। স্বপ্নচালিত কবিতার অবশ্য দ্বিতীয় দর্শক থাকে। পাঠক। কবিকে তবু পাঠকের কথা ভাবতে হয়। পাঠককে ভাবতে হয় না। সে স্বপ্নের মতো স্বাধীন। জীবনানন্দ আমাকে হাতে ধরে, জঙ্গল পেরিয়ে নদী পেরিয়ে মাঠে নিয়ে আসেন। তারপর আমি ছুটতে ছুটতে মিলিয়ে যাই দিগন্তে। পিছনে তাকিয়ে দেখি, তখন লেখক কোথাও নেই। লেখক মুছে গেছেন। সেই দিগন্ত তখন আমার। আমি তখন আর-একজন। যে তখন দেখতে পায় দু দিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ। অথবা নীচে হতাহত সৈন্যদের ভিড় পেরিয়ে, যে বুঝতে পারে আন্তঃনাক্ষত্রিক শূন্যতার মতো অপার অন্ধকার। আর সে শুনতে পায় নিরীহ ক্লান্ত আর মর্মান্বেষীদের গান। আর সে বুঝতে পারে কী করে বীজের থেকে অরণ্য জন্ম নেয়। আর সে সময়ের পার দেখতে পায়। আর রাত্রির নির্জনতম মুহূর্তে তার সামনে তখন ধীরে ধীরে নেমে আসছে ইতিহাসযান।

এই ইতিহাসযানের ধারণার সামনে দাঁড়াবার, এর পাশে নিজের জীবন-অভিজ্ঞতাকে রাখবার এবং সমগ্র জাতিধারাকে তার সঙ্গে মিলিয়ে নেবার সুযোগ, ও, অন্যপক্ষে, স্মৃতি ও সমাজসত্তার পাশাপাশি নানারকম কল্পছবির মধ্যে দিয়ে ভ্রমণ করে আসবার স্বাধীনতা আমাদের সামনে এনে দিলেন দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, বহুযত্নে জীবনানন্দের এখনও পর্যন্ত পাওয়া প্রায় সমস্ত কবিতাকে একটি গ্রন্থায়তনের মধ্যে ধরে। কেবল মূল কবিতাই নয়, নানারকম পাঠান্তর/পাঠভেদ, আর খসড়াও আছে এখানে। আছে প্রকাশকাল আর প্রকাশপত্রগুলির পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ। আছে নিশ্চিত বিন্যস্ত রচনাকাল। সমস্তই সাজানো আছে এখানে। এমনকি কোন খাতায় কী কী কবিতা লেখা হয়েছিল, সে হিসেবও নম্বরসহ দেওয়া আছে এখানে। আলাদা আলাদা করে জীবনানন্দের সকল বই-ই তো আছে। তবু আমি বিশেষভাবে এই সংগ্রহটি আমার নিজের কাছে রাখব। রাখব এইজন্য যে, এই বইটি না থাকলে কি আমি জানতে পারতাম, বনলতা সেন, হ্যাঁ, আমাদের চিরখ্যাত বনলতা সেনের প্রথম অবস্থা কেমন ছিল?—না, হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে—এই বিশ্রুত লাইনটি ছিল না সেখানে। বরং প্রথম দুটি লাইন ছিল : শেষ হল জীবনের সব লেনদেন/বনলতা সেন। এবং শেষ কয়েকটি লাইন ছিল এইরকম :

কত যে ঘুমিয়ে রব বস্তির পাশে
কত যে চমকে জেগে উঠব বাতাসে
হিজল জামের বনে থেমেছে স্টেশনে বুঝি রাত্রি নিশুথির বনলতা সেন।

আশ্চর্য হলেও, সত্যি। এই ছিল বনলতা সেন কবিতার খসড়া। অথবা, তাঁর আর এক

নামকরা লেখা 'সমারূঢ়' ঃ বরং নিজেই তুমি লেখ নাকো একটি কবিতা...। এই কবিতার প্রথম লাইন ছিল আগে—তারপর তারা তাদের জীবনের সমস্ত শূন্যতা—বিষয় শূন্যতার কথা ভুলে যায়। এ ছিল, প্রায় কুড়িটি ভাঙাচোরা লাইনের একটি ঢিলেঢালা গদ্য-কবিতা। সেই 'সমারূঢ়' শেষ হয় আঁটোসাঁটো, দশ লাইনের একটি মিলবদ্ধ সমমাত্রিক আসন্ন-সনেটে পৌঁছে। এই বই ছাড়া তা কোথায় পেতাম? ছত্রে ছত্রে কোথায় কী বদল হয়েছে কোন কবিতায়, কোন শব্দ, এমনকি পত্রিকায় কী নামে বেরিয়েছে, নাম বদল করে, কী নাম পেয়েছে বইতে, কবিতা ধরে ধরে তা চিহ্নিত করেছেন দেবীপ্রসাদ। জীবনানন্দের লেখার এই অবিরাম বদল, আর কাটাকুটি আর পাঠান্তর দেখতে দেখতে, একটু আগে উদ্ধৃত একটি বাক্য, একটু অন্যরকমভাবে আবারও মনে পড়ে যায় ঃ কবিতায় সত্য কথা লিখতে গিয়ে যেন দেখতে পাচ্ছেন কবি, সত্য ক্রমশ বদলে যাচ্ছে। আর ঝাপসা সত্যকে সরিয়ে রূপান্তরে রূপান্তরে ফুটে উঠছে অধিকতর সত্য। যে-কাব্যগ্রন্থের ভূমিকায় উপরোদ্ধৃত বাক্যটি ছিল তার নাম ঃ আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি। আমি কীরকমভাবে বেঁচে আছি, এ কথা কখনওই স্পষ্ট করে, বা প্রত্যক্ষভাবে বলেননি জীবনানন্দ তাঁর কবিতায়। দেবীপ্রসাদ বলেছেন সেটা। এই সংগ্রহে রয়েছে, জীবনানন্দের জীবন-কবিতা-পারিপার্শ্বিক এবং সমকালীন পৃথিবীর কথা মিলিয়ে লেখা সুদীর্ঘ ভূমিকা। তাকে মূল্যবান বললে কম বলা হয়। রয়েছে, জীবনানন্দের জীবন সংবাদের পাশাপাশি তাঁর লেখা কিছু চিঠিও। বড় নিষ্ঠুর জীবন ছিল তাঁর। বাইরের দিকে শুকনো। এমনকি, কখনও লাঞ্ছনারও। দারিদ্র্যেরও। চার পাঁচশো টাকার জন্য আকুল চিঠি লিখেছেন সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে ঃ 'দয়া করে ব্যবস্থা করুন।' বলছেন ঃ 'লেখা দিয়ে সব টাকা শোধ করে দেব। না হয় ক্যাশে।'—কেন না, চাকরি আর বাসস্থান দুই-ই ছিল অনিশ্চিত। শুধু নিশ্চিত ছিল লেখা। কেননা আবহমান তাঁর সঙ্গে থাকত। যদিও অবহমানই একদিন তাঁর পা টেনে নেয় ট্রামের লাইনে, তবু তার আগে তাঁকে দিয়ে লিখিয়ে নেয় সেই সব কবিতা, যা, মেরুসমুদ্রের মতো, বাইরে কঠিন, ভিতরে অতল, তুষার-ধূসর কখনও বা, আজও যার সকল রহস্য উদ্ধার করা যায়নি।



জীবনানন্দ দাশ ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি

বুদ্ধদেব বসু

বিদ্যালয়ে ইংরেজি কাব্যের পাঠ নিতে গিয়ে যখন শোনা যায় যে ওঅর্ডস্বার্থ প্রকৃতির কবি তখন সহজবুদ্ধিতে সংশয় লাগে। প্রকৃতির কবি কোন কবি নন? প্রকৃতির লীলাবৈচিত্র্য অন্তত কখনো-কখনো সাড়া না তোলে এমন মন যখন সাধারণের মধ্যেও বিরল, তখন কবিনামের যোগ্য যে-কোনো ব্যক্তির সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়বৃত্তিকে তীব্রভাবেই তা নাড়া দেবে, তাতে সন্দেহ কী। শেক্সপীয়র কি প্রকৃতির কবিও নন? শেলি? কীটস? যদি বলা হয় যে ওঅর্ডস্বার্থ জড়প্রকৃতির মধ্যে এক জীবন্ত ও সর্বব্যাপী সত্তা খুঁজে পেয়েছিলেন, সে-কথা মানবো, কিন্তু সকল কবির কাছেই তো প্রকৃতি জীবন্ত, এবং এ-উপলব্ধি শেলির মতো তীব্র অন্য কোন কবিতে তা জানি না। যদি বলা হয়, ওঅর্ডস্বার্থের প্রকৃতিপ্রেম ছিলো তাঁর পক্ষে ধর্মের শামিল, সে-কথা অস্বীকার করবো না ; কিন্তু সেই ধর্মের সারতত্ত্ব অ্যাজ ইউ লাইক ইট-এর নির্বাসিত ডিউক খুব সংক্ষেপেই কি বলেননি—হয়তো কিঞ্চিৎ তাচ্ছিল্যের সুরে—যখন তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন 'tongues in trees, books in the running brooks, sermons in stones, and good in everything ?' এর বেশি ওঅর্ডস্বার্থ কী বলেছেন?

তবে এটা সত্য যে প্রকৃতি ছাড়া অন্য কোনো বিষয়ে ওঅর্ডস্বার্থ কবিতা লেখেননি, বা লিখলেও সফল হননি। সেইজন্যে ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি প্রকৃতির কবি লেবেল-আঁটা। কবিদের গায়ে লেবেল আঁটা থাকলে ডক্টরেটডিগ্রিকামীদের সহায়তা হয়, কিন্তু রসোপলব্ধিতে ব্যাঘাত ঘটতে পারে। প্রকৃতিবিষয়ক কবিতার সমস্তটা ক্ষেত্র যেন ওঅর্ডস্বার্থেরই দখলে, এই রকম একটি ধারণা যদি আমাদের মনে জন্মায়, এবং তার ফলে পরবর্তী যুগের যে-সব কবিতে প্রকৃতি সম্বন্ধে নতুনরকমের অনুভূতি ধরা পড়ে তাঁদের কাব্য সম্বন্ধে যথেষ্ট মনোযোগী কি শ্রদ্ধাবান হ'তে যদি আমরা ভুলে যাই, সেজন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের সংকীর্ণ শিক্ষাই দায়ী। প্রকৃতি সম্বন্ধে ওঅর্ডস্বার্থের মনোভঙ্গি তো একমাত্র নয়, এবং ভিন্ন মনোভঙ্গি আমাদের অনেকের পক্ষেই অধিকতর গ্রাহ্য হ'তে পারে।

আমাদের কবিদের-মধ্যে অবশ্য রবীন্দ্রনাথই প্রকৃতির কবি হিশেবে প্রধান। এ-কথা বললেও ভুল হয় না যে তাঁর কাব্যের প্রধান বিষয়ই প্রকৃতি। যত কবিতা ও গান তিনি লিখেছেন, তার বেশির ভাগই তো সোজাসুজি ঋতু-সংক্রান্ত। তাছাড়া, তাঁর 'জীবনদেবতা'র উপলব্ধিও মুখ্যত প্রকৃতির ভিতর দিয়ে ; তাঁর মধ্যযুগের কবিতাবলিতে এ-বিষয়ে নিঃসংশয় সাক্ষ্য পাওয়া যাবে।

এক হিশেবে সকল কবিই প্রকৃতির কবি, এ-কথা পূর্বে বলেছি। কিন্তু সকল কবিকেই ঐ আখ্যা দেয়া যায় না; কারণ সকলের পক্ষেই প্রকৃতি একমাত্র কিংবা প্রধান বিষয় নয়। অনেক কবির পক্ষে প্রকৃতি মানবজীবনের নানা অভিজ্ঞতার পটভূমিকা ; অনেকের পক্ষে

ইন্দ্রিয়ের বিলাস, আবার কারো-কারো পক্ষে আমাদের মনের অবস্থার প্রতিরূপমাত্র। প্রকৃতিকে নিবিড়ভাবে অনুভব না করেন এমন কোনো কবি নেই ; কিন্তু সমগ্র জীবনকে প্রকৃতির ভিতর দিয়েই গ্রহণ ও প্রকাশ করেন এমন কবির সংখ্যা অল্প। তাঁরাই বিশেষভাবে প্রকৃতির কবি।

আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে এই বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায় ঃ তিনি জীবনানন্দ দাশ। তাঁর নবপ্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প'ড়ে এই কথাই আমার মনে হ'লো। অবশ্য এই বইয়ের কবিতাগুলি আমার পক্ষে নতুন নয়। এদের রচনার কাল আজ থেকে এগারো ও সাত বছরের মধ্যে ; সেই সময়ে এরা অধুনালুপ্ত কয়েকটি মাসিকপত্রে আত্মপ্রকাশ করে, এবং তখন থেকেই এদের সঙ্গে আমার পরিচয়। জীবনানন্দর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' ১৩৪৪ সালে বেরিয়েছিলো, তার রচনাকাল আরো কিছু আগে হবে বোধ করি। সে-বইখানা তখনও কারো বিশেষ নজরে পড়েনি, এখন তো একেবারেই বিস্মৃত। মোহিতলালের 'স্বপন-পসারী'র মতো, 'ঝরা পালকে'ও সত্যেন্দ্র দত্তের প্রভাব ছিলো স্পষ্ট। যে-মৌতাতের ঝোঁকে মোহিতলাল লিখতে পেরেছিলেন—

> উটপাখি তার ডিমজোড়া কি লুকিয়েছে ঐ বুকে

সেটা জীবনানন্দও এড়াতে পারেননি তখন। 'ঝরা পালকে' স্মরণীয় বিশেষ-কিছু হয়তো ছিলো না, কিন্তু তার কয়েকটি লাইন আজও দেখছি ভুলতে পারিনি ঃ

> ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল—
> ডালিমফুলের মতো ঠোঁট যার, পাকা আপেলের মতো লাল যার গাল,
> চুল যার শাঙনের মেঘ, আর আঁখি যার গোধূলির মতো গোলাপি, রঙিন,
> তারে আমি দেখিয়াছি প্রতি রাত্রে—স্বপ্নে—কতদিন।

সত্যেন্দ্র দত্তীয় ঝংকার থেকে এ অনেক দূর ; অতি পুরোনো কল্পনা এখানে যেন একটি অপূর্ব রূপ পেয়েছে। তার কারণ ছন্দের নবত্ব ধ্বনির বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি লাইনে সম্পূর্ণ একটি ছবি পেলুম ; এ-ছবির রচনায় যে-কলাকৌশল ব্যবহৃত হয়েছে, তা এই কবিরই নিজস্ব সৃষ্টি। বস্তুত, এখানে জীবনানন্দর মৌলিক সৃষ্টিপ্রেরণারই পরিচয় পাওয়া যায় ; পড়তে-পড়তে মনে হয় একজন নতুন কবির বুঝি দেখা পেলুম।

এই সৃষ্টিপ্রেরণা রুদ্ধ হ'য়ে থাকলো না ; অল্প সময়ের মধ্যে দেখা গেলো তার প্রকাশবৈচিত্র্য। সে-সময়ে জীবনানন্দ যে-সব কবিতা বিভিন্ন মাসিকপত্রে প্রকাশ করেন তা প'ড়ে আমি মুগ্ধ হয়েছিলুম ; এবং এখন সেগুলোই একত্র দেখতে পাচ্ছি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে। ভালো কবিতার কেমন একটি আদিম অপূর্বতা আছে ঃ মনে হয় এ যেন সদ্যোজাত অথচ চিরন্তন ; এইমাত্র এই মুহূর্তে এর জন্ম হ'লো, এবং চিরকালের মধ্যে এর মতো আর-কিছু হবে না। এই কবিতাগুলোয় ছিলো সেই সুরের অনন্যতা ও অখণ্ডতা ; প্রতিটি রচনার ভিতর দিয়ে এমন একটা স্বর বুকে এসে লাগলো, যে-রকম আর কখনো শুনিনি। একেবারে নতুন সেই স্বর, আর এমন অদ্ভুত যে চমকে উঠতে হয়।

বছর দশেক পরে সেই কবিতাগুলোই আবার প'ড়ে সেইরকমই ভালো লাগলো। ইতিমধ্যে জীবনানন্দর কাব্যপ্রেরণা ঝিমিয়ে পড়েনি, তার প্রমাণ তিনি সম্প্রতি সাময়িক পত্রের পৃষ্ঠায় দিয়েছেন। তাঁর কল্পনা নব-নব রূপের সন্ধানী, তাঁর রচনাভঙ্গি গভীরতর পরিণতির দিকে উন্মুখ। কিন্তু এতদিনেও আমাদের সাহিত্যের 'বাজারে' তাঁর খ্যাতির রোল ওঠেনি। আমাদের সুধীসমাজও তাঁর কাব্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ব'লে মনে হয় না।

আধুনিক বাংলা কাব্য সম্বন্ধে কোনো আলোচনাতেই জীবনানন্দর উপযুক্ত উল্লেখ এ-পর্যন্ত দেখেছি ব'লে মনে পড়ে না। জীবনানন্দর ব্যক্তিত্ব লোকচক্ষু থেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন, এ ছাড়া এই অন্যায়ের আর-কোনো কারণ আছে কিনা জানি না। কবিতা ছাড়া আর-কিছু তিনি লেখেন না, কোনো সাহিত্যিক গোষ্ঠীভুক্ত হ'য়ে দেশে-বিদেশে আত্মরটনার আয়োজন তিনি কখনোই করেননি। আমার বিশ্বাস, তাঁর প্রকৃত অনুরাগী পাঠকের সংখ্যা এখনও যৎসামান্য। তবে এটাও দেখছি যে সাম্প্রতিক তরুণ কবিদের উপর তাঁর প্রভাব বেশ স্পষ্ট।

২

বাংলাদেশের পাঠকসাধারণের মধ্যে জীবনানন্দ যদি অজ্ঞাতই থাকেন সেটা আশ্চর্যের বিষয় নয়, তবে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের পর তিনি গুণীসমাজে স্বীকৃত ও সম্মানিত হবেন এ-আশা জোর ক'রেই করা যায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প'ড়ে প্রথমেই মনে হয় যে এই লেখকের আছে এমন একটি ভঙ্গি যা বিশেষভাবে তাঁর নিজস্ব। কোথাও-কোথাও সেটা হয়তো মুদ্রাদোষে অবনত হয়েছে (যদিও সেটা খুব কম ক্ষেত্রে), এবং তা নিয়ে ব্যঙ্গ করাও সহজ। কিন্তু যদি আমরা সত্যি কবিত্বশক্তিকে শ্রদ্ধা করি, যদি কবিতা আমাদের পক্ষে বাচালতার বিষয় না-হ'য়ে গভীর অনুশীলনের বিষয় হয়, তবে এ-কথা আমাদের মানতেই হবে যে এই কবি এমন একটি সুরের সম্মোহন সৃষ্টি করেছেন যা ভোলা যায় না, যা ভুল হয় না, যা হানা দেয়।

জীবনানন্দ প্রকৃত কবি ও প্রকৃতির কবি। ঠিক প্রেমের কবিতা বলতে যা বোঝায় এই গ্রন্থে তা একটিও নেই. 'নির্জন স্বাক্ষর', '১৩৩৩', 'সহজ', 'কয়েকটি লাইন', এ-সমস্ত কবিতায় প্রেমের পাত্রী অপেক্ষা পারিপার্শ্বিক প্রকৃতিই অনেক বড়ো ও জীবন্ত হ'য়ে উঠেছে কবির কল্পনায়। এটা উল্লেখযোগ্য যে জীবনানন্দর রচনায় রবীন্দ্রনাথের প্রভাব স্পষ্টত পড়েনি। উনিশ শতকের ইংরেজি কাব্যস্রোতে প্রচুর পান করেছেন তিনি ; 'জীবন', 'প্রেম', এই দীর্ঘ কবিতা দুটিতে শেলি ও কীটস উভয়েরই প্রভাব স্পষ্ট। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে, শেলির চাইতে বরং কীটসের প্রভাব বেশি, আর সেই সঙ্গে সুইনবর্ন ও প্রির‍্যাফেলাইটদের। আর সবচেয়ে যেটা বড়ো কথা, সমস্ত প্রভাব ছাপিয়ে উঠছে তাঁর নিজস্ব দৃষ্টি ও সৃষ্টিশক্তি। যে-দৃষ্টিতে অতি সাধারণ অপরূপ হ'য়ে ওঠে, তুচ্ছকে ঘিরে গ'ড়ে ওঠে মহিমামণ্ডল, সেই দৃষ্টি জীবনানন্দর। অতি ক্ষুদ্র উপাদান নিয়ে অতি সূক্ষ্ম সংগীতের জাল তিনি এমনভাবে বুনে গেছেন যে বিশ্লেষণে তা ধরা দিতে চায় না।

বলি আমি এই হৃদয়েরে
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!

ছন্দের বাঁকাচোরা গতিতে, সূক্ষ্ম ধ্বনিতে ও বিরতিতে, পুনরুক্তিতে ও প্রতিধ্বনিতে, মনে হয়, যেন এই কবিতাগুলি আঁকাবাঁকা জলের মতোই ঘুরে-ঘুরে একা-একা কথা বলছে। এদের আবহতে আছে একটি সুদূরতা ও নির্জনতা ; আমাদের পরিচিত পরিবেশ ছাড়িয়ে, এই আকাশ আর পৃথিবী ছাড়িয়ে অন্য কোনো আকাশে, অন্য কোনো জগতে এক সম্পূর্ণ রূপকথা তিনি রচনা করেছেন। জীবন ক্ষয়শীল ও পরিবর্তনশীল, মৃত্যুতে সব-কিছুরই সমাপ্তি, এই আদিম বেদনা জীবনানন্দর কাব্যের ভিত্তি।

পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
হৃদয়ে বেদনা জমে ;—স্বপনের হাতে
আমি তাই

আমারে তুলিয়া দিতে চাই!...
পৃথিবীর দিন আর রাতের আঘাতে
বেদনা পেত না তবে কেউ আর,...
থাকিত না হৃদয়ের জরা,...
সবাই স্বপ্নের হাতে দিত যদি ধরা!...

তরুণ ইএটসকে মনে পড়ে : আর এ-কথা অনেক কবিরই মনের কথা, সন্দেহ নেই। স্বপ্নের হাতে ধরা দিতে চান যে-সব কবি, তাঁদের প্রত্যেকেরই 'স্বপ্ন' একটি বিশেষ রূপকথার মূর্তি গ্রহণ করে। প্রকৃতির নির্জন ও প্রচ্ছন্ন রূপের মধ্যে জীবনানন্দ তাঁর রূপকথা সৃষ্টি করেছেন।

তারপর,—একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে,
পাতায়, শুকনো ডাটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে দিকে চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে, পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা কড়কড়!
শসাফুল, দু'একটা নষ্ট শাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল, শুকনো মাকড়্সা
লতায় পাতায় ;
ফুটফুটে জ্যোৎস্নারাতে পথ চেনা যায় ;
দেখা যায় কয়েকটা তারা
হিম আকাশের গায়ে, ইঁদুর-পেঁচারা
ঘুরে যায় মাঠে মাঠে, খুদ খেয়ে ওদের পিপাসা আজো মেটে,
পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে!

('মাঠের গল্প')

আকাশের মেঠো পথে থেমে ভেসে চলে চাঁদ ;
অবসর আছে তার, অবোধের মতন আহ্লাদ
আমাদের শেষ হবে যখন সে চ'লে যাবে পশ্চিমের পানে,
এটুকু সময় তাই কেটে যাক রূপ আর কামনার গানে।

* * * *

এখানে নাহিক' কাজ, উৎসাহের ব্যথা নাই, উদ্যমের নাহিক ভাবনা।
এখানে ফুরায়ে গেছে মাথার অনেক উত্তেজনা।
অলস মাছির শব্দে ভ'রে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়,
পৃথিবীরে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে হয়।
সকল পড়ন্ত রৌদ্র চারিদিকে ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে
গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,
এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবাসে।

('অবসরের গান')

কহিল সে,—উত্তর সাগরে
আর নাই কেউ!—
জ্যোৎস্না আর সাগরের ঢেউ
উঁচুনীচু পাথরের 'পরে।
হাতে হাত ধ'রে
সেইখানে ; কখন জেগেছে তারা—তারপর ঘুমাল কখন।
ফেনার মতন তারা ঠাণ্ডা—শাদা—
আর তারা ঢেউয়ের মতন
জড়ায়ে-জড়ায়ে যায় সাগরের জলে!
ঢেউয়ের মতন তারা ঢলে!
সেই জল-মেয়েদের স্তন
ঠাণ্ডা,—শাদা—বরফের কুচির মতন!
তাহাদের চোখ মুখ ভিজে,—
ফেনার শেমিজে
তাহাদের শরীর পিছল,
কাচের গুঁড়ির মতো শিশিরের জল
চাঁদের বুকের থেকে ঝরে
উত্তর সাগরে।

('পরস্পর')

এই সব রচনায় আধো আলোর লীলা, আধো ঘুমের মোহ ; এই আবছায়ায়, এই অলসতায় কবির মুক্তি।

জীবনানন্দর কাব্যে দেখা যায় যে চিত্ররচনার অজস্রতা, তার বিশেষত্বও উল্লেখযোগ্য। যত উপমায়, যত ইঙ্গিতে তিনি কল্পনাকে প্রকাশ করেন সেগুলি ভাবাত্মক নয়, রূপাত্মক ; চিন্তাপ্রসূত নয়, অনুভূতিপ্রসূত। আমাদের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ সবচেয়ে কম 'আধ্যাত্মিক', সবেচেয়ে বেশি 'শারীরিক'; তাঁর রচনা সবচেয়ে কম বুদ্ধিগত, সবচেয়ে বেশি ইন্দ্রিয়নির্ভর। তাঁর এই বিশেষত্বই কীটস ও প্রির‍্যাফেলাইটদের কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর একটি কবিতাকে রবীন্দ্রনাথ একবার বলেছিলেন 'চিত্ররূপময়'; জীবনানন্দর সমগ্র কাব্য সম্বন্ধেই এই আখ্যা প্রয়োজ্য। ছবি আঁকতে তাঁর নিপুণতা অসাধারণ। তার উপর ছবিগুলো শুধু দৃশ্যের নয়, গন্ধের ও স্পর্শেরও বটে, বিশেষভাবে গন্ধের ও স্পর্শের। তাঁর যে-কবিতাটি প'ড়ে রবীন্দ্রনাথ ঐ মন্তব্য করেছিলেন, তা থেকে কয়েকটি ছবি উদ্ধার করছি :

দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রানের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হ'য়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে ;—পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ ল'য়ে গেছে তারে ;

মিনারের মতো মেঘ সোনালি চিলেরে তার জানালায় ডাকে,
বেতের লতার নীচে চড়ায়ের ডিম যেন শক্ত হ'য়ে আছে,
নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার-বার তীরটিরে মাখে,
খড়ের চালের ছায়া গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠানে পড়িয়াছে।
বাতাসে ঝিঁঝির গন্ধ—বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাসে ;
নীলাভ নোনার বুকে ঘন রস গাঢ় আকাঙ্ক্ষায় নেমে আসে ;

('মৃত্যুর আগে')

এই স্তবক দুটি বিশ্লেষণ করলে জীবনানন্দর সমস্ত কবিত্বলক্ষণ বোঝা যাবে। বৃষ্টি, স্পর্শ ও গন্ধের বিচিত্র ভোজ ব'সে গেছে। দ্বিতীয়, তৃতীয়, সপ্তম ও শেষ পংক্তির অপ্রকট সলজ্জ সহজ অনুপ্রাস লক্ষ্য করুন, গাঢ় রাতে জ্যোৎস্নার উঠোনে খড়ের চালের স্পষ্ট কালো ছায়ার সামনে চুপ ক'রে দাঁড়ান—অনুভব করুন ঘুমের ঘ্রাণ, ঝিঁঝির গন্ধ, নরম জলের গন্ধ, চালের ধূসর গন্ধ, তরঙ্গের রূপ, প্রান্তরের সবুজ বাতাস।

কোনো শব্দের উল্লেখ নেই—প্রকৃতি এখানে শান্ত, সান্দ্র, স্বপ্নাচ্ছন্ন শব্দহীন।

জীবনানন্দর এই ছবিগুলি সম্পূর্ণরূপে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ; স্পর্শ আর গন্ধ তো আছেই, রসনার স্বাদও একেবারে বাদ পড়েনি। এ তো সত্যি কথা যে আমাদের সমস্ত অনুভূতি শরীরের ভিতর দিয়েই মনে এসে পৌঁছয়, অথচ কবিতায় এই ইন্দ্রিয়স্বাদের অবিমিশ্র প্রকাশ অনেকেই করেন না বা করতে পারেন না, উপরন্তু যদি কেউ করেন, সমালোচকেরা তাঁকে সন্দেহের চোখে দেখে থাকেন। কীটস যে 'sensuous' মাত্র, 'sensual' নন, সেটা প্রমাণ করতে অধ্যাপকেরা গলদ্‌ঘর্ম। এই ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার জন্যেই রসেটি সুইনবর্নের লাঞ্ছনা। আমাদের কবিদের মধ্যে ইন্দ্রেয়ের অনুভূতি সম্বন্ধে জীবনানন্দর চেতনা সূক্ষ্ম ও তীক্ষ্ণ ; তাঁর রচনায় তত্ত্ব নেই, চিন্তাশীলতা নেই, উপদেশ নেই ; তা স্বতঃস্ফূর্ত, বিশুদ্ধ ও সহজ, ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ ও জীবন্ত অভিজ্ঞতার সৃষ্টি ; তা নিছক কবিতা ছাড়া আর-কিছুই নয়।

৩

পরিশেষে কলাকৌশলের দিক থেকে দু-একটা কথা বলতে ইচ্ছা করি। জীবনানন্দর কান অত্যন্ত সজাগ। ছন্দকে ইচ্ছেমতো বেঁকিয়ে-চুরিয়ে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে তিনি নিয়ে গেছেন; যেখানে বাধা পেয়েছে, সেখানে বাধাটাই কবির অভিপ্রেত। একই ছন্দের ছাঁচ বিভিন্ন কবির হাতে বিভিন্ন সুরে বাজে, এই পুরোনো কথার একটি নতুন দৃষ্টান্ত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'। এ-বইয়ের সবগুলো কবিতাই পয়ারজাতীয় ছন্দে—অধিকাংশ অসমমাত্রার, আইনত যাকে বলতে হবে 'বলাকা'র ছন্দ। অর্থাৎ চেহারাটা 'বলাকা'র ছন্দের, কিন্তু ধ্বনি একেবারেই ভিন্ন। 'বলাকা'র তীব্রতা ও বেগ নেই এখানে ; এ-ছন্দ মন্থর, যেন ইচ্ছে ক'রে ভাঙা-ভাঙা, অসমান ও পরিকল্পনা করা ; এ-ছন্দ থেমে-থেমে ঘুরে-ঘুরে চলে ; ঘুমে-ভরা সুর, স্বপ্নে-ভরা, শিশির-কোমল, যেন ঘুমের মধ্যে গান এসে কানে লাগে, তারপর সমস্ত রাত হানা দেয়। কলাকৌশলের অভাব নেই এই কবিতাগুলিতে, সেগুলোর প্রধান গুণ এই যে তারা প্রচ্ছন্ন। মিলে, মধ্য-মিলে অনুপ্রাসে, পুনরুক্তিতে ধ্বনির সূক্ষ্মতা ও বৈচিত্র্য প্রতি পংক্তিতে বেজে উঠেছে ; সে যেন অপার্থিব ও পলাতক, স্বপ্নের সুড়ঙ্গে অলস ভাবনায় তার যাওয়া-আসা।

বোম্বায়ের সাগরের জাহাজ কখন
বন্দরের অন্ধকারে ভিড় করে, দেখে তাই, একবার স্নিগ্ধ মালাবারে
উড়ে যায়, কোন এক মিনারের বিমর্ষ কিনার ঘিরে অনেক শকুন
পৃথিবীর পাখিদের ভুলে গিয়ে চ'লে যায় যেন কোন মৃত্যুর ওপারে।

('শকুন')

ধ্বনির দিক থেকে এর চেয়ে ভালো রচনা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে নেই। এই ধ্বনি উচ্চ নয়, তীব্র নয়, কিন্তু গভীর ও প্রতিধ্বনিময়। নামশব্দ ও বিদেশী শব্দের ব্যবহারে এতখানি কৃতিত্ব আর-কোনো আধুনিক বাঙালি কবির দেখিনি। জীবনানন্দ নামশব্দ ব্যবহার করেন মিল্টনের মতো জমকালো ধ্বনি সৃষ্টি করার জন্য নয়, প্রির‍্যাফেলাইটদের মতো ছবি ফোটাতে। রবীন্দ্রনাথের কাব্যে উজ্জয়িনী মালবিকা প্রভৃতি পুরাযুগের নাম যে-উদ্দেশ্য সাধন করে, ঠিক সেই উদ্দেশ্যই জীবনানন্দ সাধন করেছেন বম্বাই, বনলতা সেন প্রভৃতি আধুনিক নামশব্দ দিয়ে।

সাগরের অই পারে—আরো দূর পারে
কোনো এক মেরুর পাহাড়ে
এই সব পাখি ছিল;
ব্লিজার্ডের তাড়া খেয়ে দলে-দলে সমুদ্রের 'পর
নেমেছিল তারা তারপর, —
মানুষ যেমন মৃত্যুর অজ্ঞানে নেমে পড়ে।

বাদামি—সোনালি—শাদা ফুটফুট ডানার ভিতরে
রবারের বলের মতন ছোট বুকে
তাদের জীবন ছিল,—
যেমন রয়েছে মৃত্যু লক্ষ-লক্ষ মাইল ধ'রে সমুদ্রের মুখে
তেমন অতল সত্য হ'য়ে!

('পাখিরা')

ইংরেজি শব্দগুলোকে বাংলার প্রাকৃত ছন্দের সঙ্গে এমনভাবে মেশানো হয়েছে যে আশ্চর্য বলতে হয়। একটু খোঁচ নেই। এটাও লক্ষণীয় যে জীবনানন্দর পয়ারে যুক্তবর্ণ কম। যুক্তবর্ণের অভাবে পয়ারের শিথিল ও মেরুদণ্ডহীন হ'য়ে পড়বার আশঙ্কা থাকে ; কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে একটি পংক্তিও নেই যা এলিয়ে পড়েছে। বরং, যুক্তবর্ণের স্বল্পতাই কবি এমনভাবে ব্যবহার করেছেন যাতে পয়ারে লেগেছে নতুন সুর।

এই আলোচনা আমি দীর্ঘ করলুম, কেননা জীবনানন্দ দাশকে আমি আধুনিক যুগের একজন প্রধান কবি ব'লে মনে করি, এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তাঁর প্রথম পরিণত গ্রন্থ। আমাদের দেশে সাহিত্য-সমালোচনার আদর্শ এখনও অত্যন্ত শিথিল ; প্রতিভা হয় অবজ্ঞাত, তৃতীয় শ্রেণীর কবি অভিনন্দিত হয় অ-সাহিত্যিক কারণে ; আমাদের মূল্যজ্ঞানহীন মূঢ়তাকে মাঝে-মাঝে প্রবলভাবেই নাড়া দেয়া দরকার। আমাদের মাতৃভাষার সাহিত্যকে যাঁরা শ্রদ্ধা ক'রে ভালোবাসেন (আশা করি তেমন লোকের সংখ্যা দিন-দিনই বাড়ছে), তাঁরা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' নিজের গরজেই পড়বেন, কারণ এ-বইয়ের পাতা খুললে তাঁরা এমন একজনের পরিচয় পাবেন যিনি প্রকৃতই কবি, এবং প্রকৃত অর্থে নতুন।

জীবনানন্দ দাশ ঃ বনলতা সেন

বুদ্ধদেব বসু

আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র। বাংলা কাব্যের প্রধান ঐতিহ্য থেকে তিনি বিচ্ছিন্ন, এবং গেলো দশ বছর যে-সব আন্দোলনের ভাঙা-গড়া আমাদের কাব্যজগতে চলেছে, তাতেও কোনো অংশ তিনি গ্রহণ করেননি। তিনি কবিতা লেখেন, এবং কবিতা ছাড়া আর-কিছু লেখেন না ; তার উপর তিনি স্বভাবলাজুক ও মফস্বলবাসী ; এই সব কারণে আমাদের সাহিত্যিক রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপ থেকে তিনি সম্প্রতি যেন খানিকটা দূরে স'রে গিয়েছেন। আধুনিক বাংলা কাব্যের অনেক আলোচনা আমার চোখে পড়েছে যাতে জীবনানন্দ দাশের উল্লেখমাত্র নেই। অথচ তাঁকে বাদ দিয়ে ১৯৩০-পরবর্তী বাংলা কাব্যের কোনো সম্পূর্ণ আলোচনা হ'তেই পারে না ; কেননা এই সময়কার তিনি একজন প্রধান কবিকর্মী, আমাদের পরিপূর্ণ অভিনিবেশ তাঁর প্রাপ্য।

কবিজীবনের একেবারে প্রথম অধ্যায়ে জীবনানন্দর রচনা ছিলো সত্যেন্দ্র দত্ত-নজরুল ইসলামের আমেজ-লাগা, কিন্তু বছর সাতেক আগে তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যখন প্রকাশিত হ'লো তখনই আমরা নিঃসংশয়ে জানলুম তাঁর অনন্যতা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে আমরা যে-কবিকে পেলুম তিনি সুদূর, স্বপ্নাবিষ্ট ; তাঁর মনোলোক যেন একটি ধূসর কোমল পরিমণ্ডল, যেখানে যাকে বাস্তব বলি তার আভাস মাত্র নেই, কিন্তু সত্য বলে যাকে অনুভব করি তার রঙিন ছায়া পড়েছে। সেই তাঁর নিজস্ব জগৎ—একান্তই তাঁর—দূর থেকে যাকে মনে হয় সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অলংকরণে অত্যন্ত বেশি আচ্ছন্ন, স্বপ্নের আত্মচালনায় অত্যন্ত বেশি মসৃণ—কিন্তু যার ভিতরে একবার প্রবেশ করলে সহজেই নিশ্বাস নেয়া যায়, সহজেই বিশ্বাস করা যায়। রূপকথার জগতের মতোই এ-কবির জগৎ আমাদের আত্মসাৎ ক'রে নেয়, সেখান থেকে বেরোবার পথ খুঁজে পাওয়া যায় না। জীবনানন্দর কবিতার যেটি সবচেয়ে বড়ো বৈশিষ্ট্য ব'লে আমার মনে হয় সেটি—একটি সুর, আর-কিছু না। তার বর্ণনা কেমন ক'রে করবো?

> সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়।

তাঁর কবিতা নিয়ে বসলেই তাঁর এই লাইনটি আমার মনে পড়ে। একটি সুর—জলের মতো, হাওয়ার মতো ঘুরে-ঘুরে অনেক দূর থেকে কানে এসে লাগছে। মন বাধ্য হয় কান পেতে শুনতে, নিজের অজান্তেই আমরা পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ করি। কবিত্ব কি এই সুর ছাড়া আর-কিছু?

জীবনানন্দর কবিতার সুর একবার কানে লাগলে তাকে যে ভোলা শক্ত তার প্রমাণ এই যে সাধারণ পাঠকসমাজে তাঁর খ্যাতি যে-অনুপাতে কম, সে-অনুপাতে তাঁর অনুকারকের সংখ্যা আশ্চর্যরকম বেশি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এমন একটি স্বাদ, এমন

একটি সৌরভ আমরা পেয়েছিলাম যা তার আগে বাংলা সাহিত্যে আমাদের জানা ছিলো না। তা যেন অনেক দূরদেশের, তা যেন আকস্মিক, ঘরোয়া কথার সঙ্গে আকাশবিহারী কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে-পদে অপ্রত্যাশিত। ঠিক এইসব লক্ষণ 'বনলতা সেনে'ও দেখতে পাচ্ছি। যদিও চার আনা দামের চটি বই, এবং এগারোটি মাত্র কবিতা এতে আছে, তবু এটি আমাদের বিশেষভাবে আলোচ্য। এই এগারোটি কবিতাই জীবনানন্দীয় প্রতিভায় দীপ্যমান। 'বনলতা সেন' কিংবা 'হায়, চিল'-এর মতো নিখুঁত গীতিকবিতা সাম্প্রতিক বাংলা কাব্যে অল্পই আছে। 'হাওয়ার রাত', 'নগ্ন নির্জন হাত' ও 'শিকার' এই তিনটি কবিতা সুস্পষ্ট আশ্চর্য স্বপ্নের মতো আমাদের সমস্ত মন অধিকার করে—তার জন্য ভাবতে হয় না, চেষ্টা করতে হয় না বরং তার সম্মোহন কাটিয়ে ওঠার জন্যেই চেষ্টা করতে হয়। ছোট্ট 'ঘাস' কবিতাটিতে যেন সমুদ্রের ঢেউ ছিটকে এসে পড়েছে—তার পিছনে দিগন্তব্যাপী অসীম জলরাশির যে-ইতিহাস তাকে সে ভোলেনি। 'বিড়াল' কবিতাটি অদ্ভুতরসে ভরপুর ; বিস্ময়করকে চরমে টেনে নিলে কী দাঁড়ায় এটি তারই উদাহরণ। রুচিভেদে এ-কবিতা কারো-কারো হয়তো ভালো লাগবে না, কিন্তু একে উপেক্ষা করা অসম্ভব।

জীবনানন্দ সম্বন্ধে এই কথাটাই বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে তিনি আজকের দিনেও কবিত্ব করতে ভয় পান না। তাঁর এই নির্লজ্জ ও নির্জলা কবিত্বকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি। এটি আমাদের সাহিত্যের একটি সম্পদ। তাঁর কবিত্বের বিশেষ একটি প্রকৃতি আছে, তার সঙ্গে প্রত্যেক পাঠককে প্রত্যক্ষ পরিচয় করতে আমন্ত্রণ করি। তাঁর সঙ্গে বন্ধুতা করা কঠিন নয়। পাঠকের কাছে তাঁর একটি মাত্র দাবি : সেটি এই যে তিনি চোখ খোলা রাখবেন। কেননা জীবনানন্দর জগৎ প্রায় সম্পূর্ণরূপে চোখে দেখার জগৎ। তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল—এটুকু বললেই জীবনানন্দর কবিতার জাত চিনিয়ে দেয়া সম্ভব হ'তে পারে। বর্ণনাকে পাঠকের মনে পৌঁছিয়ে দেবার বাহন তাঁর উপমা। উপমার এমন ছড়াছড়ি আজকালকার কোনো কবিতেই দেখা যায় না। তাঁর উপমা উজ্জ্বল জটিল ও দূরগন্ধবহ। এক-একটি উপমাই এক-একটি ছোটো কবিতা হ'তে পারতো। তিনি যে-জাতের কবি তাতে উপমাবিলাসী না-হ'য়ে তাঁর উপায় নেই, অর্থাৎ উপমা তাঁর কাব্যের কারুকার্য মাত্র নয়, উপমাতেই তাঁর কাব্য। মনে পড়ে বহুকাল পূর্বে জীবনানন্দ একবার কোনো-এক পত্রিকায় লিখেছিলেন, 'উপমাই কবিত্ব।' কথাটা তখন থেকে আমার মনে গেঁথে আছে। উপমাই কবিত্ব—এ-কথাটাকে, কিছু অসম্পূর্ণতা সত্ত্বেও, মেনে নেয়া অসম্ভব হয় না। অবশ্য উপমা কথাটাকে এখানে খুব ব্যাপক অর্থে গ্রহণ করতে হয়—ভাষায় কবির যেটা নিজস্ব ব্যঞ্জনা—কোনো অভিনব বিশেষণ, কিংবা কোনো পুরোনো বিশেষণের স্বকীয় ব্যবহার, এমনকি কোনো বিশেষ্যপদের প্রতীকী প্রয়োগ—এ সমস্তই কি মূলত উপমা নয়? এই অর্থ স্বীকার ক'রে নিলে বলা যায় যে উপমা পরীক্ষা করলেই একজন কবির বৈশিষ্ট্য ধরা পড়বে। জীবনানন্দ যখন বলেন—

বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন—

তখনই বুঝতে পারি তাঁর মন কী-ভাবে কাজ করছে। নাটোরের বনলতা সেনের যে-চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ—এ সমস্তই যে কোনো সর্বদেশকালব্যাপী ভাবের চিত্রকল্প তা অনুভব করলেই আমরা কবিতাটির মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারবো। আবার যখন পড়ি—

এক-একবার মনে হচ্ছিল আমার—আধো ঘুমের ভিতর হয়তো—
মাথার ওপর মশারি নেই আমার,
স্বাতী তারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে—
তখন কবির নিছক কল্পনাশক্তি আমাদের মুগ্ধ করে। কিন্তু এই মদির কল্পনা থেকে ফুটে ওঠে দৃঢ় রেখার উজ্জ্বল রঙের ছবির মিছিল—'নগ্ন নির্জন হাত' পুরো কবিতাটিই তা-ই। শুধু শেষ ক-টি লাইন উদ্ধৃত করি :

পর্দায়, গালিচায় রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ,
রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ!
তোমার নগ্ন নির্জন হাত ;
তোমার নগ্ন নির্জন হাত।

সমস্ত কবিতাটি একসঙ্গে না-পড়লে শেষ পংক্তিটির (কিংবা ছবিটির) আশ্চর্য আলোড়ন অনুভব করা যাবে না, কিন্তু 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদে' দৃষ্টি ও স্পর্শের যে-বিবাহ ঘটেছে তার আনন্দে আমাদের মন অনেকক্ষণ পর্যন্ত আন্দোলিত হ'তে থাকে। 'নগ্ন নির্জন হাত' চিত্রটি যেন একটি still life, শুধু ঐ হাতখানা তাকে মানবিক ব্যাকুলতায় স্পন্দিত ক'রে তুলেছে। আবার কখনো দেখি এক-একটি চিত্ররূপ থেকেই আবেগের আঘাত উৎসারিত :

হৃদয় ভ'রে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,
মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের
চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়!

পর-পর চারটি বিশেষণ—কিন্তু চারটিই সার্থক।

জীবনানন্দর সমগ্র রচনায় একটি বিষণ্ণ গাম্ভীর্য পরিব্যাপ্ত। তাতে বৈচিত্র্য নেই, না বিষয়ের, না কলাকৌশলের। তাঁর সমস্ত কবিতাই কোনো-না-কোনো অর্থে প্রকৃতির কবিতা ; পয়ার ছাড়া অন্য-কোনো ছন্দও এ-পর্যন্ত তাঁকে ব্যবহার করতে দেখিনি। অবশ্য গদ্য-কবিতা তিনি অনেক লিখেছেন—এবং গদ্য-কবিতায় তাঁর কৃতিত্ব আমি অসামান্য ব'লে মনে করি। পয়ারেও তাঁর স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট—কিন্তু সেটা অনুভব করবার, বিশ্লেষণ করবার নয়। কেননা সে-বৈশিষ্ট্যের নির্ভর আঙ্গিক অভিনবত্ব নয়, তাঁর নির্জন বিষণ্ণ কবিপ্রাণেরই ক্ষরণ বলা যায় সেটাকে। আবার বলি, তিনি আমাদের নির্জনতম কবি। আধুনিক বাংলা কাব্যের নানা ঘাত-প্রতিঘাত তাঁকে যে স্পর্শমাত্র করেনি, এটাকে নিন্দে ক'রে বলা যায় যে তিনি আত্মকেন্দ্রিক, প্রশংসা ক'রে বলা যায় যে তিনি আত্মনিষ্ঠ, চরিত্রবান। আমাদের অভ্যস্ত, পরিচিত সাংসারিক জীবনের মধ্যে সেই-যে একজন চিরকালের কবিকে মাঝে-মাঝে আমরা দেখতে পাই, যার দেশ নেই, জাতি নেই, গোত্র নেই, মানুষের সমস্ত সুখদুঃখ, সভ্যতার সমস্ত উত্থানপতন পার হ'য়ে যার সুর আজকের মতো কোনো-এক বসন্তপ্রভাতে হঠাৎ আমাদের মনে এসে আঘাত করে, আর মুহূর্তে উচ্চনিনাদী প্রকাণ্ড বর্তমান সমগ্র অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে বিলীন হ'য়ে যায়—সেই নামহারা ক্ষণস্থায়ীকে কিছু সময়ের জন্য যেন কাছে পেলুম 'বনলতা সেন' বইটিতে।

১৯৪৩

কবি জীবনানন্দ

সঞ্জয় ভট্টাচার্য

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলো 'কল্লোল'-এরই সময়কার—বিশের দশকের শেষাশেষির। ওই দশকটাই প্রথম মহাযুদ্ধোত্তর যুগ। এবং অবিশ্বাসেরও যুগ। য়ুরোপের বিশ্বাসহারা জীবনের প'ড়ো জমিতে তখন টি. এস. এলিঅট বিশ্বাসের বীজ বুনতে চেয়েছিলেন। অবিশ্বাসের হাওয়া আমাদের জীবনেও এসে লেগেছে তখন। রাষ্ট্রের উপর সমাজের অবিশ্বাস, প্রেমের উপর ব্যক্তি-জীবনের অবিশ্বাস। রবীন্দ্রনাথের কাব্য-সত্যের উপর কল্লোলীয় কবিদের অবিশ্বাস। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র জীবনানন্দ দাশ বাস্তব জীবনে বিশ্বাস হারিয়ে স্বপ্নের সত্যে বিশ্বাস স্থাপন করতে চেয়েছেন তখন। জীবনানন্দকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরবর্তী পর্যায়ে দেখতে গেলে, তাঁরই এ-কথায় পাঠককে বিশ্বাসী হতে হবে : 'বিশ্বাস বা তার অভাবের পরিমিত প্রসার ও গভীরতা নিয়ে কবির কাজ।' ('কবিতার কথা'—পৃঃ ৮২)।

বিশের দশকে রবীন্দ্রনাথের উপর কল্লোলীয় কবিদের বিশ্বাস না থাকলেও, সাধারণ কবিতা-পাঠক তখনও রবীন্দ্রনাথের উপর বিশ্বাস হারান নি (এখনও কি হারিয়েছেন?) স্বভাবতই তাঁরা তখন কল্লোলীয় কবিদের ওপর বিশ্বাস স্থাপন করতে পারেন নি। ফলত কল্লোলীয় কবিদের সিদ্ধি তাঁদের নিজেদের বৃত্তেই প্রসিদ্ধি লাভ করেছে, তার বাইরে যদি বা তা কিছু কিছু তরুণ কবি বা পাঠকের মধ্যে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ভাগ্যও অন্যরকম হয় নি। এবং ত্রিশের দশকের শুরুতেই যখন কল্লোলীয় কবিদের কেউ-কেউ সরকারের রোষদৃষ্টিতে কোণঠাসা হলেন এবং সুধীন্দ্রনাথ দত্ত সম্পাদিত 'পরিচয়' ত্রৈমাসিক বাংলা কবিতায় নূতন হাওয়া আনল, তখন জীবনানন্দের নাম প্রায় সম্পূর্ণ বিস্মৃত। হয়তো সে-সময়েই তিনি একটা বিশ্বাসের মূর্তি গড়তে চেয়েছেন তাঁর নির্জন বাসে এবং শান্তি লাভ করেছেন। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত (সুতরাং তাঁর ইচ্ছায় নয়) 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলো পড়লে মনে হয় 'বনলতা সেন'-এর দু-দণ্ড শান্তি'র বীজ 'রূপসী বাংলা'তেই ছিল, স্বপ্ন-বিশ্বাসের 'পরিমিত প্রসার ও গভীরতা' দিয়ে যে-বাংলা তৈরি।

রবীন্দ্রনাথের উপর জীবনানন্দ দাশের বিশ্বাসের অভাব প্রসারে পরিমিত। কিন্তু তা গভীর হতে পেরেছে বলেই জীবনানন্দের স্বপ্ন রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নের চাইতে গভীরতর।

> মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
> এমনই হিজল—বট—তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ
> দেখেছিলো ; বেহুলাও একদিন গাঙুড়ের জলে ভেলা নিয়ে—
> কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না যখন মরিয়া গেছে নদীর চড়ায়—
> সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য অশ্বত্থ বট দেখেছিলো, হায়,
> শ্যামার নরম গান শুনেছিলো,—একদিন অমরায় গিয়ে

ছিন্ন খঞ্জনার মতো যখন সে নেচেছিলো ইন্দ্রের সভায়
বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল ঘুঙুরের মতো তার কেঁদেছিলো পায়!

('রূপসী বাংলা')

রবীন্দ্রনাথের স্বপ্ন-প্রসারিত মন স্বর্গ থেকে বাংলার মাটিতে অবতরণ করেছে মাত্র, জীবনানন্দের স্বপ্ন-গভীর চোখ করুণ-কোমল বাংলাকে মঙ্গল-কাব্যের বাংলায় মিশিয়ে স্বর্গে নিয়ে গেছে। এই গভীরতা দান করেছে জীবনানন্দকে রিল্‌কে-সদৃশ নিরবচ্ছিন্ন সময়-চেতনা। 'পিরামিড'-এর ইতিহাস-চেতনার বীজ এখানে এক বিশেষ সময়-চেতনায় অঙ্কুরিত—যা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে অনুপস্থিত। সেখানে সময় সগুণ—এখানে নির্গুণ। 'রবীন্দ্রনাথের অনপনেয় ছায়ায়' জীবনানন্দের স্বাবলম্বনের এ এক উজ্জ্বল বিবর্তন।

'সন্ধ্যারাগে ঝিলিমিলি ঝিলম'-এর তীরের সন্ধ্যা একদা রবীন্দ্রনাথের ভাবনাপ্রতিভা এমন বিশাল করে তুলেছিল যে সমস্ত সৃষ্টি স্বপ্নে কথা কয়ে উঠেছে, যার ফলশ্রুতি একটি জীবন-দর্শন। কিন্তু বাংলার একটি পরিচিত সন্ধ্যাকে জীবনানন্দ কী স্বপ্নঘন করে তুলেছেন 'কেশবতী'-মিথের সহায়তায় ঃ

আকাশে সাতটি তারা যখন উঠেছে ফুটে আমি এই ঘাসে
ব'সে থাকি...আসিয়াছে শান্ত অনুগত
বাংলার নীল সন্ধ্যা—কেশবতী কন্যা যেন এসেছে আকাশে
আমার চোখের 'পরে আমার মুখের 'পরে চুল তার ভাসে ;
পৃথিবীর কোনো পথ এ কন্যারে দেখেনিকো—দেখি নাই অত
অজস্র চুলের চুমা হিজলে কাঁঠালে জামে ঝরে অবিরত
জানি নাই এত স্নিগ্ধ গন্ধ ঝরে রূপসীর চুলের বিন্যাসে...

('রূপসী বাংলা')

সন্ধ্যাকে 'কেশবতী'র প্রতীকে নিয়ে যে একটি চিত্রকল্পে কবি ছড়িয়ে দিচ্ছেন, তা আসঙ্গ দৃশ্য। গভীর মনস্তত্ত্বের (Depth Psychology) ছাত্র এখানে বলবেন, কবির মনের অন্ধকার প্রদেশে আদিম মানব-গোষ্ঠীর ভাবধারার একটি চিহ্ন রয়ে গেছে। চুলকে আদিম-মানবগোষ্ঠী উর্বরতার প্রতীক হিসেবে গ্রহণ করত। তাই যদি হয়, সেই উর্বরতার (চুলের) ছোঁওয়া লেগেছে যেমি কবির দেহে, তেমি প্রকৃতিতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বোদলেয়ার এবং বুদ্ধদেব বসু চুলকে কাম-চরিতার্থতার উপকরণ হিসেবে গ্রহণ করেছেন। বাংলা কবিতায় আদিম প্রতীক কী ভাবে বিবর্তিত হচ্ছে তা দেখা কাব্য-সমালোচকের কর্তব্য নয় —গভীর মনস্তত্ত্বের ছাত্রেরই বিষয়। প্রতীকের দার্শনিকরা বলেন ঃ মিথ কল্পনায় একটা বিশ্বাসের ছোঁওয়া থাকে। সে বিশ্বাস কবি ধ্বনিত করেছেন ঃ প্রকৃতির এই গন্ধের ভেতরই বাংলার প্রাণ। নরনারীর প্রেমেও তাঁর বিশ্বাস ফিরে এসেছে—যে-বিশ্বাস তিনি 'ধূসর গোধূলি'র পর্যায়ে হারিয়ে ফেলেছিলেন। ফলত শান্তি লাভ করেছে তাঁর জীবন। এই শান্তির স্বাদ নিয়েই 'বনলতা সেন'-এর অধ্যায়ে প্রবেশ করছেন কবি।

ত্রিশের দশকের শেষভাগে 'বনলতা সেন' অধ্যায় শুরু করেন জীবনানন্দ দাশ। বুদ্ধদেব বসুই তাঁর প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত করলেন 'কবিতা'-ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশিত করে। 'কবিতা'র নিয়মিত লেখক হতে পারলেন তখন জীবনানন্দ, 'কবিতা'য়ই 'বনলতা সেন' কবিতাটি প্রকাশিত হয় । এবং জীবনানন্দের ষোলটি কবিতা নিয়ে 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের পুস্তিকা বেরোয় 'বনলতা সেন' নামে বুদ্ধদেব বসুর 'কবিতা ভবন' থেকেই।

'বনলতা সেন' কবিতাটির আকর্ষণ তরুণ পাঠক ও কবির চিত্তে এতো ব্যাপক হয়েছিল, যাতে কবি নিজে বিস্মিত হয়ে পড়েছিলেন। তিনি 'দুর্বোধ্য কবি' হিসেবে চিহ্নিত হলেন বটে, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ও বিষ্ণু দের মতো, কিন্তু তাঁর 'বনলতা সেন' কবিতাটি সম্পর্কে সে অভিযোগ কারো ছিল না। কার মনে কী ভাবে কবিতাটি তৃপ্তি এনেছে তা আমার জানবার কথা নয়। আমার উপলব্ধিই আমি যথাস্থানে নিবেদন করতে পারি।

'বনলতা সেন'-গ্রন্থটির যৎসামান্য ইতিহাস আছে। তা বিবৃত করা বোধ হয় অসঙ্গত হবে না। কারণ তার সঙ্গে কবি নিজে জড়িত। 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের 'বনলতা সেন' কবির ইচ্ছাতেই 'মহাপৃথিবী'র কবিতার সঙ্গে সংযোজিত হয়। 'মহাপৃথিবীর' প্রকাশন-সংস্থার সঙ্গে আমি যুক্ত ছিলাম। 'মহাপৃথিবী'র সংস্করণ শেষ হয়ে গেলে সিগনেট প্রেস তা থেকে 'প্রেমের কবিতা' বেছে নিয়ে 'বনলতা সেন' নামে যে গ্রন্থটি প্রকাশ করেন, তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতায় তা থেকেই কবিতা সংকলিত হয়েছে। তাঁর 'ভিখিরী' কবিতার প্রথম পংক্তি : 'একটি পয়সা আমি পেয়ে গেছি আহিরীটোলায়' পড়ে তখন আমার মনে হয়েছিল, 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের 'বনলতা সেন'-এ তিনি অস্বস্তি বোধ করেছেন।

'চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ'-কে ধান-কাটা মাঠের কবরে চিরশান্তিতে কবরস্থ করে জীবনানন্দ স্বপ্ন-প্রতিভাকে সঙ্গে নিয়ে আবার নগর-জীবনে এলেন। 'বনলতা সেন'-এর শুরু এখানে। শান্তিতে এবং স্বপ্নে। রাত্রির ঘুমন্ত কলকাতার পথে হাঁটছেন—অনুভব করছেন তার শান্তি, ট্রাম-বাস বাড়ি-ঘর দোকানপাট শান্ত চুপ হয়ে ঘুমের জগতে চলে যাচ্ছে। 'এদের গভীর শান্তি হৃদয়ে' অনুভব করে কবির শান্ত স্বচ্ছ মনে যার ছায়া পড়ল, বাস্তবের ধুলোবালি এড়িয়ে চোখে যে স্বপ্ন এলো, তাই 'পথ হাঁটা'-কবিতা। কবিতা কবি-মনের ঘটনা বৈ তো নয়! 'পথ হাঁটা' শেষার্ধে সেই ঘটনা :

> তখন অনেক রাত—তখন অনেক তারা মনুমেন্ট মিনারের মাথা
> নির্জনে ঘিরেছে এসে ; মনে হয় কোনদিন এর চেয়ে সহজ সম্ভব
> আর কিছু দেখেছি কি : একরাশ তারা-আর মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা?
> চোখ নিচে নেমে যায়—চুরুট নীরবে জ্বলে—বাতাসে অনেক ধুলো খড় ;
> চোখ বুজে একপাশে স'রে যাই—গাছ থেকে অনেক বাদামী জীর্ণ পাতা
> উড়ে গেছে ; বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর
> কেন যেন ; আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।
>
> (পথ হাঁটা—'বনলতা সেন')

শুধুমাত্র ইতিহাস-চেতনায় 'একরাশ তারা -আর-মনুমেন্ট-ভরা কলকাতা' কবির মনে বেবিলনের মিনারের একটা অনুরূপ ছবিমাত্র এনে দিতে পারত—যে-ছবি ইয়েট্‌স-এর মনে এনেছে :

> Alexandria's was a beacon tower, and Babylon's
> An image of the moving heavens...

কিন্তু 'বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি'—মনে বেবিলনের বর্তমানতার এমন অনুভব অখণ্ড, নিরবচ্ছিন্ন সময়-চেতনা ছাড়া সম্ভবপর নয়। কবিতা-ব্যাখ্যায় জার্মান-কবি রিল্‌কে সময়-সম্পর্কে তাঁর এই ধারণা ব্যক্ত করেছিলেন :

We, of this earth and this today, are not for a moment hedged in by the world of time, nor bound within it : we are incessantly flowing over and over to these who preceded us and to those who apparently come after us.

সময়ের সদা বর্তমানতার কথাই বলেছেন রিল্‌কে যা প্ল্যাটোরও ধারণা ছিল। আইনস্টাইনের 'Time-Space Continuum'-গণিতের ফলশ্রুতি সম্ভবত তা-ই : আমাদের প্রত্যেক মুহূর্তে সমগ্র সময় উপস্থিত থাকে। জেমস্ জীন্‌সের 'The Mysterious Universe' আইনস্টাইনের এই নতুন সময় সম্পর্কে বলেছে :

It may be that time, from its beginning to the end of eternity, is spread before us in the picture, but we are in contact with only one moment...

এসব কিছু জড়িয়ে জীবনানন্দের সময়-চেতনা ছিল এমন :

> সবই আছে সব সময়ের ভিতরে প্রতিফলিত হয়ে—আজ কাল সব
> সময়েরই একটা একই রঙ রয়েছে নানা রঙের ভিতর বিম্বিত হয়ে—সব
> সময়কে একই সময়গ্রন্থির ভিতর নিবিষ্ট করে রেখে—
>
> ('কবিতার কথা'—পৃঃ ৮৬)

'Time-Space Continuum'-এর ধারণা থেকেই হয়তো 'সময়গ্রন্থি' শব্দটির উদ্ভব। তাই 'কবিতার কথা'র অন্যত্র (পৃঃ ৪০) তিনি বলেছেন :

> মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো।

মহাবিশ্বলোকে কোথাও হাজার হাজার বছর আগেকার বেবিলনও সজীবভাবে বিম্বিত হচ্ছে—মহাবিশ্বলোক থেকে উৎসারিত অবিচ্ছিন্ন সময়ে বেবিলন এখনও বিম্বিত বর্তমান। সেই বর্তমানকে অনুভব করেই জীবনানন্দ বলতে পারছেন : 'বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি' যেন এই জীবনেরই স্মৃতি তা। কলকাতার হাঁটার সঙ্গে বেবিলনের হাঁটার সঙ্গতি-সাধন করছে Time-Space Continuum-উদ্ভূত সময়-চেতনা, জাতিস্মরতার মতো কোনো রহস্য নয়। কেন এই হাঁটা—তার একটা উত্তর রবীন্দ্রনাথের 'বলাকা' কবিতায় হয়তো আছে, কিন্তু জীবনানন্দ জানেন না কেন তাঁর প্রাণ ভ্রাম্যমাণ, কেন এই হাঁটা। প্রাণের যাত্রা চলেছে ধূসর অতীত থেকে এই জ্ঞানমাত্র তাঁর জীবনের সমর্থন পাচ্ছে।

এই হাঁটার কথা দিয়েই তাঁর বিখ্যাত কবিতা 'বনলতা সেন'-এর শুরু। 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে' কবিতাটিকে আমি মহৎকবিতা বলে মনে করি, কেননা, জীবনকে জ্ঞানময়তায় আপ্লুত করে নতুনভাবে সৃষ্টি করেছেন তিনি। মহৎ কবিতা একটা অজানা গাছের মতো—একটা ডাল কেটে এনে তার উপলব্ধি অসম্ভব। সবটা গাছের উপলব্ধিতেও ধূসরতা থেকে যায়। এই ধূসরতার জন্যেই হয়তো তাকে বার বার দেখতে ইচ্ছে করে। বার বারই উপলব্ধিকে নূতন অর্থময়তার নিয়ে যায়।

বনলতা সেন

হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকার মালয়-সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দু-দণ্ড শান্তি দিয়েছিলো নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,

মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য, অতিদূর সমুদ্রের 'পর
হাল ভেঙে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি দ্বীপের ভিতর
তেমনই দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রং নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ জীবনের সব লেনদেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

মহাসময়ের সঙ্গে যে মহাজীবনের অনুভব জীবনানন্দ মনে বহন করেছেন, তারই পরিপ্রেক্ষিতে বর্তমান জীবনকে দেখেছেন তিনি এ-কবিতায়। আমার নিকট সমগ্র কবিতাটির এই একটা উপলব্ধিই উপস্থিত হয়েছে।

বর্তমানের সময়গ্রন্থিতে সব সময় নিবিষ্ট করে যেন্নি কবি আছেন—তেন্নি আছেন 'নাটোরের বনলতা সেন'। এ সময়গ্রন্থিতে যেন্নি অন্ধকার অতীত আছে তেন্নি অন্ধকার ভবিষ্যৎ—আর দু-দণ্ডের শান্তির বর্তমান। বর্তমান যে দুটি জীবনের মিলন-প্রেম-শান্তির ঝিলমিল আয়োজন করছে—তা অতীত থেকে বিচ্ছিন্ন নয়, তাই 'নাটোরের বনলতা সেন' মিলনের মুহূর্তেই বলতে পারছেন ঃ 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' কবি যে ঐতিহাসিক অতীতের জীবনবোধ মনে বহন করছেন, তারই চিহ্ন নাটোরের বনলতা সেনের মুখে দেখতে পাচ্ছেন। তাই 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা, মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। প্রেম-মিলনে অতীত সৌন্দর্যের অনুভব বলে যদি এ রূপ-বর্ণনাকে মনে করি ; তাহলে ইয়েট্‌সে আমরা সেই অনুভব দেখতে পাব ঃ

When my arms wrap you round I press
My heart upon the loveliness
That long has faded from the world.

কিন্তু 'faded' হবার কথা জীবনানন্দ দাশের আসে না—যে-মনে অতীত বর্তমান হয়ে বিরাজিত।

'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক' 'যে নাবিক হাল ভেঙে হারায়েছে দিশা' 'চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন'—সবই বর্তমানের জীবন জড়িয়ে। ক্লান্ত-পথিক প্রাণ, দিশাহারা নাবিক প্রাণ ঘর বলতে যা বোঝায় তার আশ্রয় চায়। চায় নারীর প্রেম, প্রেমের সন্তান—জীবনের আশ্রয়, সে আশ্রয় দেখতে পেয়েছেন কবি বনলতা সেনের 'পাখির নীড়ের মতো চোখে' রবীন্দ্রনাথের উজ্জয়িনী 'স্বপ্নে' (কল্পনা) তাঁর 'মালবিকা' যেন্নি কবির হাতে 'কুলায়প্রত্যাশী সন্ধ্যার পাখির মতো' আশ্রয় চেয়েছে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের উপমার ভাষা যতো সহজ, জীবনানন্দের 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' ভাষাটি তেমন সহজ ভাষা নয়—যাকে 'সংজ্ঞার ভাষা' বলা যায়। 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' ধরনের রূপককেই হয়তো পাউণ্ড-এলিঅট কবিতার সারাৎসার বলেছেন। পাখির নীড়ের সঙ্গে কবির মন কোন্ চিত্রে যুক্ত তা না জানলে এ রূপকের অর্থ বোঝা যাবে না। জীবনানন্দের মনে 'পাখির নীড়' যে কী, তা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পাখিরা' কবিতায় ধরা আছে ঃ

অনেক লবণ ঘেঁটে সমুদ্রের পাওয়া গেছে এ মাটির ঘ্রাণ
ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান
আর সেই নীড়
এই স্বাদ গভীর—গভীর

এই স্বাদের ছবিতেই বনলতা সেনের চোখে 'পাখির নীড়' দেখছেন কবি—বনলতা সেনকে যখন পেয়েছেন 'সবুজ ঘাসের দেশের মতো' দিশাহারা, হালভাঙা সমুদ্র-নাবিকের চোখে। 'দারুচিনি দ্বীপ'-এর ব্যবহার এসেছে কবির মনে 'মশলাদরাজ এই মাটিটার ঝাঁঝ' (সেদিন এ ধরণীর—'ঝরা পালক') তাঁর স্মৃতিতে আছে বলে, যে-মাটি শুধু 'দূর্বাধান'ই আনে নি—'মানবের তরে সে যে এনেছে মানবী।' সেই চিরন্তন মানবের জন্যে চিরন্তন মানবী এই বনলতা সেন। চির সময়ে। চিরন্তন মানবের জন্যে যে চিরন্তন মানবী তার জন্যেই প্রাচীন ভারত-ইতিহাসের বৃত্তান্তকালের জ্ঞানের সহায়তা নেওয়া। বর্তমানের জীবন-অভিজ্ঞতার সঙ্গে সে জ্ঞানের মিশ্রণেই নাটোরের বনলতা সেন সর্বকালের সর্বভারতীয় মানবী বনলতা সেন। রবীন্দ্রনাথের 'মালবিকা' (স্বপ্ন—'কল্পনা') যদি 'বনলতা সেন'-এর উপর অনপনেয় ছায়া ফেলেও থাকে, তবু 'বনলতা সেন' জীবনানন্দের স্বাবলম্বনের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ছায়া এটুকু মাত্র, 'মালবিকা' বাস্তব-ঘেঁষা স্বপ্ন, 'বনলতা সেন'ও তা-ই।

শেষ অনুচ্ছেদে ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য বিষয়গুলোকে একাত্মক ভেবেছেন জীবনানন্দ, বোদলেয়ারের মতোই অনুভূতি প্রতিভায়। তাই শিশিরের শব্দের মতো সন্ধ্যার আসা তাই 'রৌদ্রের গন্ধ'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেই এ-ধরনের ব্যবহারের শুরু। 'জোনাকির রঙ' বা জৈব আলো-কে কবি অপার্থিব মনে করছেন এবং সেই সঙ্গে জীব-বিজ্ঞানের একটি তথ্যও তাঁর মনে সক্রিয় ঃ দৈহিক মিলনের প্রয়োজনেই যে জোনাকির এই আলো। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র জোনাকির চাইতে সে বেশি কাজ করছে। এখানে সে যে-গল্পের পাণ্ডুলিপি তৈরী করে তুলবে তা হল একটা অপার্থিব সময়-বৃত্তে নর-নারীর দৈহিক মিলনের বৃত্তান্ত, 'এ জীবনের সব লেন-দেন' যাতে সমাপ্ত। পাখির স্থিরতায় ('সব পাখি ঘরে আসে'), নদীর স্থিরতায় ('সব নদী'), জীবনের স্থিরতায় ('ফুরায় এ জীবনের সব লেন-দেন')। সন্ধ্যার জীবন যেন মৃত্যুরই জীবন। দুই-ই সমান অন্ধকার, সমান নির্জন। সেই অন্ধকারে শেষ পর্যন্ত বনলতা সেনকে দেখছেন কবি। যেমন অন্ধকারে দেখা শুরু, তেমন অন্ধকারে দেখা শেষ। মৃত্যুর মতোই এই জীবন বা জীবনের মতোই মৃত্যু। রিল্‌কের মিস্টিক দৃষ্টিভঙ্গী। পরবর্তী কবিতা 'আমাকে তুমি'-তে এ কথাটা স্পষ্টতর ঃ

মরণের পরপারে বড়ো অন্ধকার
এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো

যে-জীবন পৃথিবীর হয়েও পৃথিবীর নয়—তারই সর্বনাম 'তুমি' এবং নাম-রূপ বনলতা সেন।

'বনলতা সেন' কবিতা পাঠ করে সম্প্রতি আমার মনে যা প্রতিক্রিয়া হচ্ছে তাই লিপিবদ্ধ করলাম। আমার উপলব্ধি এ রকম। তাই যে কবিতাটির সৎ উপলব্ধি তা আমি বলছি নে। আমার উপলব্ধিবশেই আমি একে মহৎ কবিতা বলি। মহৎ কবিতা সম্পর্কে অন্য পাঠকের অন্য রকম বোধ থাকতে পারে। তাতে আমার বিচলিত হবার কারণ নেই। এমনকি, মহৎ কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের যে ধারণা ছিল তার কোনো সূত্রের সঙ্গে আমার উপলব্ধির সংঘর্ষ হলেও—আমি আমার উপলব্ধিবশে কবিতাটি মহৎই বলব।

আমার এই নিবন্ধ-পাঠকদের জন্যে মহৎ কবিতা সম্পর্কে জীবনানন্দ দাশের ধারণা পেশ করছি :

> মহৎ কবিতা জ্ঞানে গভীর নয় শুধু, অথবা প্রাকৃত জীবনের ব্যাপার নিয়ে নিবিড় নয় কেবল মাত্র, কিন্তু এই দুই জিনিস মিলে এক হয়ে গেছে সেখানে এমনই আত্মিক নিবিড়তায় ও গাণিতিক শুদ্ধতায় যে সহসা মনে হতে পারে যে মিলনোৎপন্ন কবিতা জ্ঞান নয় আর, জীবনও নয় যেন, জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল জিনিস।

('কবিতার কথা'—পৃঃ ৯৭)

'জীবন নয় যেন, জীবনের সঙ্গে সমান্তরাল জিনিস' হওয়াতেই 'বনলতা সেন' জনপ্রিয়। বর্তমান জীবনের সমুদ্র সফেনে 'দুদণ্ডের শান্তি' কে না চায়? কে না চায় 'বনলতা সেন'-এর আশ্রয়, যার ভেতর কবি ইতিহাসের জ্ঞানময়তা এবং প্রাকৃতিক জীবনের নিবিড় শান্তি মিশিয়ে দিয়েছেন? কিন্তু আমার উপলব্ধিতে 'বনলতা সেন' চিরমানবীর রহস্যে অন্ধকার।

বস্তুত 'বনলতা সেন' গ্রন্থের প্রথম দিককার কবিতাগুলোতে জীবনানন্দ দাশকে অন্ধকারের নির্জন কবি হিসেবেই আবিষ্কার করা সহজ। তাঁর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পৃথিবীর বাস্তব দেয়াল ছেড়ে এখানে ধূসরতর। তাই অন্ধকার। তাই স্পষ্টতর। আরো উজ্জ্বল কবিতা। জ্ঞানের আলোতে উজ্জ্বল। জীবনানন্দের কবিস্বভাবই অন্ধকার। তাই তিনি বলতে পারেন : 'গভীর ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত' (অন্ধকার—'বনলতা সেন')। এবং সে ঘুম 'গভীর অন্ধকারের ঘুম' (অন্ধকার—ঐ)। সে ঘুম থেকে স্বপ্নে জেগে ওঠাও বাস্তব জীবনের মতো প্রবহমান যন্ত্রণা (অন্ধকার—ঐ)। তাই তিনি ইতিহাসের জ্ঞানময়তায় জাগতে চেয়েছেন। জাগতে চেয়েছেন প্রাকৃতিক জীবনের নিবিড়তাবোধে ('আমাকে তুমি'), যখন 'পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ বলে মনে হয়'। বিকৃত হলেও সেই জীবনের গতি আছে এবং পরিপূর্ণতা আছে, তারপর তা স্থির। ফলে মৃত্যুর বিষণ্ণতা আসে। এই জীবনের 'আলো, প্রেম, নির্জনতা' মরণের পরপারের গভীর অন্ধকার হয়ে যায়। অন্ধকারের আর আলোর দ্বৈত-বোধ বিনষ্ট হয় যে জ্ঞানময়তায়, মহাবিশ্বলোক থেকে উৎসারিত যে সময়-চেতনায় 'প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে' যাওয়া যায় ('তুমি') তা হয়তো তার অন্ধকার আত্মারই প্রক্রিয়া। 'তুমি'-তে বিশ্বাস হারিয়ে (তোমাকে—'শ্রেষ্ঠ কবিতা')। এই আত্মাকে 'অনুভূতি ও সংস্কারের উৎসারিত জিনিস' ভেবে নিলেও তাকে ধর্মের অন্তর্গত মনে করব না, (জীবনানন্দের মৃত্যুর পর ফাদার ফাঁলো তাঁকে ধর্মের অন্তর্গত কবি বলে আবিষ্কার করতে চেয়েছিলেন একটি স্মৃতি-সভায়) কেননা, জীবনানন্দ বলে গেছেন :

> আমার মনে হয় বিশুদ্ধ ধর্মকে প্রয়োজন মতো আরো নিয়ন্ত্রিত ও শুদ্ধ করে দিলে তাকে কবিতার সঙ্গে প্রায় একটা বিপজ্জনক একাত্মতায় দাঁড় করানো যেতে পারে।

('কবিতার কথা'—পৃঃ ৯১)

সে ক্ষেত্রেও ধর্মকেই শুদ্ধ হতে হবে, সৎ কবিতাকে নয়।

'বনলতা সেন' কবিতাটিতে কবির দু-ধারা চেতনা এসে মিশেছে : সময়চেতনা এবং প্রকৃতি-চেতনা। বর্তমানের সময়গ্রন্থিতে ইতিহাসের একটা বৃত্তান্তসময় মিশিয়ে কবিতাটি শুরু হয়েছে, শেষ হয়েছে কবির প্রকৃতি-চেতনায়। নাটোরের বনলতা সেনকে খ্রীষ্টপূর্ব

পাঁচশ' বছরের ইতিহাসে রঞ্জিত করে দেখলেও, তাকে মানবী বলে গ্রহণ করতে মুশকিল হয় না। কিন্তু প্রকৃতির যে উদাসীন, সহজ শক্তিকে 'তুমি'-সম্বোধনে কবি মানব-হৃদয়ের প্রেম-নিবেদন করেছেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র অধ্যায়ে এবং একদিন যে ধরা দিয়ে একরাত্রি যতোটা দেওয়া যায় দিয়েছে এবং কবি বলেছেন, সে উদাসীন থাকলেও কবির সমস্ত গানই তাকে লক্ষ্য করে ('নির্জন স্বাক্ষর' ও 'সহজ')—সে শক্তির প্রতীক বা 'তুমি' এই সর্বনামের প্রকৃষ্ট নাম হিসেবে যদি 'বনলতা'কে ধরা যায়—তাহলে পাখির নীড়ের মতো চোখের মানে খুব সহজ হয়ে যায়—বনের একটি লতা যাতে পাখি নীড় বেঁধেছে যা দেখতে চোখের মতো। কিন্তু মুশকিল এই বনলতা সেন প্রতীক বনলতা হয়ে অমানবী হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু তাতে কী? 'বনলতা সেন'-পর্যায়ে জীবনানন্দ মানবীকে অমানবী করতে দ্বিধা করেন নি ('অন্ধকার') এবং 'তুমি'কে অধিকতর মানবী করতে চেয়েছেন মানবীয় চিন্তার ক্ষমতা অর্পণ করে। যেকালে 'বনলতা সেন' 'সে' সর্বনামে ভূষিতা হয়ে অন্ধকারে কবির মুখোমুখি, তখনই 'তুমি'-কে আকাশ-পাতাল খুঁজে চলেছেন কবি। তাতে কী বুঝব? 'বনলতা সেন' একটি নিঃস্বার্থ জিনিস ; কবি বলেছেন তাঁর 'কবিতার কথা'য়—শ্রেষ্ঠ কবিতাকে 'নিঃস্বার্থ জিনিস' হতে হয়। আর 'তুমি'? তার সঙ্গে যে কবির স্বার্থ জড়িত। কবিতাটি পাঠ করলেই তা বোঝা যায় ঃ

তুমি

নক্ষত্রের চলাফেরা ইশারায় চারিদিকে উজ্জ্বল আকাশ
বাতাসে নীলাভ হয়ে আসে যেন প্রান্তরের ঘাস ;
কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে—গঙ্গাফড়িং সে-ও ঘুমে ;
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছো তুমি।

'মাটির অনেক নিচে চলে গেছো ? কিংবা দূর আকাশের পারে
তুমি আজ? কোন্ কথা ভাবছ আঁধারে?
ওই যে ওখানে পায়রা একা ডাকে জামিরের বনে ঃ
মনে হয় তুমি যেন ওই পাখি—তুমি ছাড়া সময়ের এ উদ্ভাবনে

আমার এমন কাছে—আশ্বিনের এতোবড়ো অকূল আকাশে—
আর কাকে পাব এই সহজ, গভীর অনায়াসে—'
বলতেই নিখিলের অন্ধকার দরকারে পাখি গেল উড়ে
প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে—প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

'মহাবিশ্বলোকের ইশারায় উৎসারিত সময়-চেতনা' দিয়ে কবিতাটি শুরু। আশ্বিনের রাত্রির আকাশের মতো প্রান্তরের ঘাস তাই নীলাভ হতে পেরেছে। 'নক্ষত্রের চলাফেরার ইশারায়'-ই এই সময়-চেতনা। ঘাসের পতঙ্গরা ঘুমিয়ে পড়লেও—উদ্ভিদজগৎ জেগে আছে যেখানে প্রাকৃতিক শক্তি 'তুমি'-কে ব্যাপ্ত দেখছেন কবি।

যে-শক্তি গাছের শিকড়ে সক্রিয়—সে-ই নক্ষত্রের চলাফেরার পেছনে। ঈশোপনিষদের প্রথম পংক্তির ('ঈশাবাস্যমিদং সর্বং যৎকিঞ্চিতৎ জগত্যাং জগৎ') ভাবনায় স্থিত থেকে কবি প্রণিপাত করছেন মাত্র। তারপর মানবীর মতো তাকে ভাবাতে চেয়েছেন মাটির ভেতরকার ও নক্ষত্রের পেছনকার অন্ধকারে বসিয়ে। জামিরের বনে তখন একটা নিঃসঙ্গ পাখি ডেকে উঠলে, কবি ভেবে নিচ্ছেন ওই পাখিতেই তাকে কাছে পাওয়া গেল।

বিজ্ঞানের পথে নয়, ধর্মের পথে নয়—এম্নি অনায়াস, সহজ পথেই কবি আদ্যাশক্তির সঙ্গ পেতে চান। কিন্তু 'সময়ের এ উদ্ভাবন' এখনকার বিজ্ঞানেরই সমান্তরাল—এবং আদ্যাশক্তিকে আত্মীয়তায় পেতে চাওয়া ধর্মেরই সমান্তরাল। রবীন্দ্রনাথের পর আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশই বিশ্বরহস্যে প্রবেশ করতে চেয়েছেন কবিতার পথে। বিশ্বরহস্যে বা 'নিখিলের অন্ধকার দরকারে' জীবনের প্রেম অপ্রেমের কোনো স্পর্শ নেই। পায়রাকে বিশ্বরহস্যের সংবাদবাহী প্রাকৃতিক শক্তি ভাবলে তা-ই মনে করা যায়।

কিন্তু এই প্রাকৃতিক শক্তি বা কবির 'তুমি'-ই কবিকে দেখিয়েছিল, 'বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহে, জীবনের ফেনা' (আমাকে তুমি—'বনলতা সেন') এবং দেখিয়েছিল ঃ

> শাদা-শাদা ছিট কালো পায়রার ওড়াউড়ি জ্যোৎস্নায়—ছায়ায়,
> রাত্রি ;
> নক্ষত্র ও নক্ষত্রের
> অতীত নিস্তব্ধতা। ('আমাকে তুমি')

এই মায়াবিনীর ইশারাতেই কবির 'পৃথিবীকে মায়াবীর নদীর পারের দেশ ব'লে মনে' হয়েছে এবং কবি ভেবেছেন ঃ

> মরণের পরপারে বড়ো অন্ধকার
> এই সব আলো প্রেম ও নির্জনতার মতো।

'নক্ষত্রের অতীত নিস্তব্ধতা'কে বা 'মরণের পরপারের' নিস্তব্ধতাকে পৃথিবীর 'নির্জনতা' দিয়ে, সেই অন্ধকারকে পৃথিবীর আলো দিয়ে এবং সেখানকার জীবনকে পৃথিবীর আলো দিয়ে (যদিও সে পৃথিবী কবির মনের পৃথিবী) সাজিয়েছিলেন কবি তাঁর 'তুমি'-রই ইশারায়। কিন্তু 'তুমি' বলে কবি যাকে মনে করলেন সে-ই কিনা জানিয়ে গেল, 'নিখিলের অন্ধকার দরকারে' জীবনের প্রেম-অপ্রেমের কোনো দরকার নেই।

অতএব 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবি যে 'তুমি'-কে বলেছিলেন ঃ

> তুমি জল, তুমি ঢেউ...
> ...তোমারে কে ভালোবাসে ; তোমারে কি কেউ
> বুকে ক'রে রাখে... ('সহজ')

তাকেই স্মরণ করেছেন এ-পর্যায়ে (তোমাকে—'শ্রেষ্ঠ কবিতা') ঃ

> একদিন মনে হতো জলের মতন তুমি।
> সকাল বেলায় রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা—
> অথবা দুপুর বেলার—বিকেলের আসন্ন আলোয়—
> চেয়ে আছে—চ'লে যায়—জলের প্রতিভা।

শুধু 'জলের প্রতিভা' নয়, তাকে 'সময়গ্রন্থি' বলেও মনে করেছেন (এবং প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে যেমন আছে, 'জলপ্রভা'র মতো 'কালী'কে দেখে পরাশর 'জাতরাগ' হলেন, তেম্নি কবি তার প্রেমাসক্তও হয়েছেন) ঃ

> তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর অমোঘ সকাল ;
> তোমার বুকের 'পরে আমাদের বিকেলের রক্তিল বিন্যাস ;
> তোমার বুকের 'পরে আমাদের পৃথিবীর রাত ঃ
> নদীর সাপিনীর, লতা, বিলীন বিশ্বাস। (তোমাকে—'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

'নদীর সাপিনী'কে ঢেউই ভাবা যায়, 'লতা'কে 'বনলতা' ভাবলে 'নদীর সাপিনী'কে ক্লিওপাত্রাও ভাবা যায় কিন্তু 'কুলকুণ্ডলিনী' নয়। কেননা, জীবনানন্দ 'দিব্য অন্তঃকরণ' অনুভব করলেও ওটা যে তান্ত্রিক পরিভাষা নয় তা 'কবিতার কথা'য় বলে গেছেন। তা যা-ই হোক, এ-কথা পরিষ্কার যে 'বনলতা সেন' পর্যায়ে এসে কবি 'তুমি'-তে বিশ্বাস হারিয়েছেন।

জীবন-বোধে হল না, 'নিখিলের অন্ধকার দরকার' বুঝতে তাই অন্ধকারেই ডুবতে হল কবিকে, ডুবতে হল মৃত্যুবোধে (অন্ধকার—'বনলতা সেন')। তা-ই হয়তো কবির শিবলোক। জীবনে বিশ্বাস হারালে মৃত্যুকেই দেখতে হয়—রিল্‌কে যাকে জীবনের ওপিঠ বলতেন।

মৃত্যুর পর আবার জীবনে ফিরে আসবার যে পরিকল্পনা করেছিলেন জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা'র পর্যায়ে তা এমন ঃ

আবার আসিব ফিরে ধানসিড়িটির তীরে—এই বাংলায়
হয়তো মানুষ নয়—হয়তো বা শঙ্খচিল শালিখের বেশে...

'বনলতা সেন'-পর্যায়ের 'অন্ধকারে' সেই ধানসিড়ি নদীর তীরেই তিনি ঘুমিয়েছেন, জীবনে ফিরে না আসার ইচ্ছা নিয়ে ঃ

গভীর অন্ধকারের ঘুম থেকে নদীর চ্ছলচ্ছল শব্দে জেগে উঠলাম আবার ;
তাকিয়ে দেখলাম পাণ্ডুর চাঁদ বৈতরণীর থেকে তার অর্ধেক ছায়া
গুটিয়ে নিয়েছে যেন
কীর্তিনাশার দিকে।
ধানসিড়ি নদীর কিনারে আমি শুয়েছিলাম—পউষের রাতে—
কোনোদিন আর জাগবো না জেনে
কোনোদিন জাগবো না আমি—কোনদিন জাগবো না আর—

কিন্তু জাগলেও মৃত্যুর অনুভবেই তিনি চাঁদকে বলছেন ঃ

হে নীল কস্তুরী আভার চাঁদ,
তুমি দিনের আলো নও, উদ্যম নও, স্বপ্ন নও,
হৃদয়ে যে মৃত্যুর শান্তি ও স্থিরতা রয়েছে
রয়েছে যে অগাধ ঘুম
যে আস্বাদ নষ্ট করবার মতো শেলতীব্রতা তোমার নেই,...
আমি অনেক দিন—অনেক অনেক দিন
অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে
বুঝতে পেরেছি আবার
ভয় পেয়েছি... ('অন্ধকার')

জীবনে বিশ্বাস হারিয়ে জীবনের প্রতি ঘৃণার আক্রোশে তিনি বলছেন ঃ 'সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শূয়োরের আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে।' ফলে 'হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে' মৃত্যুবোধ থেকে এই বিশ্বচিত্র ও জীবনচিত্র আঁকছেন ঃ

যেখানে স্পন্দন, সংঘর্ষ, গতি, যেখানে উদ্যম, চিন্তা, কাজ,
সেখানেই সূর্য, পৃথিবী, বৃহস্পতি, কালপুরুষ, অনন্ত আকাশগ্রন্থি,
শত-শত শূকরের চীৎকার সেখানে,
শত-শত শূকরীর প্রসববেদনার আড়ম্বর
এই সব ভয়াবহ আরতি। ('অন্ধকার')

এই বিশ্বজীবনের অনুভব তাঁর—মৃত্যু-অনুভবে যা কিছুই নেই। অন্ধকারে জীবন নেই, মৃত্যুই আছে। তাই 'অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে' চেয়েছেন, জন্মহীন আত্মাকে নিয়ে—

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত ;
কেন আমাকে জাগাতে চাও?

অন্ধকারের রহস্য রয়েই গেল, আত্মাও ইয়েট্‌স্‌-এর মতো বোধে অন্ধকার। তবে বিশ্ববোধ সম্পর্কে তিনি তাঁর বক্তব্য স্পষ্ট করেছেন এ-কবিতায়। যেকালে রবীন্দ্রনাথ ঈশোপনিষদের মহদুক্তিতে বিশ্বাস স্থাপন করে মৃত্যুর এক বছর আগেও বলতে পেরেছেন ঃ

করো করো অপাবৃত হে সূর্য আলোক আবরণ,
তোমার অন্তরতম পরম জ্যোতির মধ্যে দেখি'
আপন আত্মার স্বরূপ... ('জন্মদিনে')

তখন জীবনানন্দ 'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্তমৃত্যুর মতো মিশে থেকে' উপলব্ধি করছেন তাঁর আত্মা 'গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে' লালিত।

'নিখিলের অন্ধকার দরকার'-এর বা বিশ্বরহস্যের প্রয়োজন তাহলে জীবনানন্দ মৃত্যুস্বাদে এই বুঝেছেন যে সৃষ্টির বা জীবনের মৃত্যু ছাড়া তার কোনো মানে নেই। রবীন্দ্রনাথ বুঝেছিলেন তাঁর শেষ জন্মদিনে ঃ

বিশ্বধরণীর এই বিপুল কুলায়
সন্ধ্যা—তারি নীরব নির্দেশে
নিখিল গতির বেগ ধায় তারি পানে।...
দ্বার খোলে সন্ধ্যা নিঃসঙ্গিনী
সম্মুখে নীরন্ধ্র অন্ধকার।
সকল আলোর অন্তরালে
বিস্মৃতির দূতী
খুলে নেয় এ মর্ত্যের ঋণকরা সাজসজ্জা যত
প্রক্ষিপ্ত যা কিছু তার নিত্যতার মাঝে
ছিন্ন জীর্ণ মলিন করিয়া দেয় নবজন্ম নগ্ন ভূমিকারে।
জীবনের প্রান্তভাগে
অন্তিম রহস্য পথে দেয় মুক্ত করি'
সৃষ্টির নূতন রহস্যেরে। ('জন্মদিনে')

'নিখিলের অন্ধকারে দরকার' সৃষ্টিকে অন্ধকার অবগাহন-স্নানে নির্মল করে নূতন ভূমিকায় তৈরী করবার জন্যে। কিন্তু এই মহদুপলব্ধির পরও জন্ম-মৃত্যুর অন্তর্গত রহস্য রহস্যই রয়ে গেল।

অন্ধকারের অভিজ্ঞতা নিয়ে জীবনানন্দ, 'অন্ধকার' কবিতায় নয়, কিন্তু সে-সময়কারই 'আবহমান' কবিতায় জন্ম-মৃত্যুর কারণ সম্পর্কে কিছু উক্তি করেছেন :

...ডান হাত অন্ধকারে ফেলে
নক্ষত্র ও প্রামাণিক ; পরলোক রেখেছে সে জ্বেলে
অনৃত সে আমাদের মৃত্যুকে ছাড়া। (আবহমান—'শ্রেষ্ঠ কবিতা')

এবং

...আমাদেরও জীবনের লিপ্ত অভিধানে
বর্জাইস অক্ষরে লেখা আছে অন্ধকার দলিলের মানে।
সৃষ্টির ভিতরে তবু কিছুই সুদীর্ঘতম নয়—এই জ্ঞানে
লোকসানী বাজারের বাক্সের আতাফল মারীগুটিকার মতো পেকে
নিজের বীজের তরে জোর করে সূর্যকে নিয়ে আসে ডেকে।
(আবহমান—ঐ)

নিখিলের অন্ধকারের দরকারেই জীবনের মৃত্যু, জীবনের আবহমানতার রক্ষার জন্যেই জন্ম। সৃষ্টির পথ বা সৃষ্টিরহস্য সম্পর্কে জীবনানন্দ যদি 'সিনিক' হয়ে থাকেন, রবীন্দ্রনাথ তাঁর শেষ কণ্ঠে পুরোপুরি 'স্কেপটিক' :

তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি'
বিচিত্র ছলনাজালে
হে ছলনাময়ী।
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে। (১৫ সংখ্যক—'শেষ লেখা')

সৃষ্টিশক্তিকে এমন ধিক্কৃত করেন নি জীবনানন্দ, জীবনকে করলেও। সৃষ্টিকে বুঝতে জীবনানন্দ ভিষকের ভূমিকা নিয়েছেন :

সৃষ্টির নাড়ীর 'পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়
অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ।
(আবহমান—ঐ)

'অন্ধকারে' মৃত্যুবোধে থেকে জন্মের দিকে তাকিয়ে তিনি এ উপলব্ধিতেই এসেছিলেন। তাই মৃত্যু থেকে জন্মে আসতে চান নি। বলেছেন :

হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য, হে মাঘ নিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি,
হে হিম হাওয়া
আমাকে জাগাতে চাও কেন? (অন্ধকার—'বনলতা সেন')

কিন্তু তিনি জেগেছেন। হয়তো 'সময়গ্রন্থি'ই তাঁকে জাগিয়েছে। হয়তো 'দেশকাল সন্ততি'। 'বনলতা সেন' আর নেই, 'ভোরের কল্লোল' দেখছেন কবি 'সুরঞ্জনা'তে এবং তাকে 'তুমি' বলতে পারছেন। বর্তমান নগর-সভ্যতার 'সুরঞ্জনা'কে তিনি গ্রীক হিন্দু ফিনিশীয়দের প্রাচীন নগর-সভ্যতাতে রঞ্জিত দেখতে পাচ্ছেন। সমুদ্র যেমন একই নীল, ঝিনুকের গায়ে যেমন একই রকম আলপনা তেম্নি একই রকম নর-নারীর আকর্ষণ।

তারপর কবি বনলতা সেনের স্মৃতিতেই জাগছেন যেন ঃ অশোকের সময়ে তিনি সিংহল সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন মহেন্দ্রের সাথে বৌদ্ধ সংঘ-শক্তি কর্ম-ধর্ম বোঝাতে নয়, তার চাইতেও বেশি আলো দিতে চেয়েছিলেন কিন্তু কাউকে বোঝাতে পারেন নি। বোঝাতে পারেন নি ঃ

মানুষ কাউকে চায়—তার সেই নিহত উজ্জ্বল
ঈশ্বরের পরিবর্তে অন্য কোনো সাধনার ফল। ('সুরঞ্জনা')

মানুষ চায় 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।'—অশোকের ধর্মের চাইতে এর আলো বেশি মনে হয়েছিল কবির। বনলতা সেনের কাছে তিনি পান নি সে আলো। তাই 'সুরঞ্জনা'কে বানিয়ে দেখছেন ঃ

যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
আজকের নব সভ্যতার দিকে ফিরে আসে ;
তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
দেহ দিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।

'সুরঞ্জনা'র অতীত দেহধর্ম থেকে তাকে মুক্ত করে হৃদয়ে-ধর্মে প্রতিষ্ঠিত করছেন কবি।

'অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিক'দেরই সঙ্গী হয়ে পরবর্তী কবিতায় ('সবিতা') কবি এখনকার 'সবিতা'কে ইওরোপের রেনেসাঁসের 'দুধের মতন শাদা নারী'র কথা শুনিয়ে অবশেষে বলছেন, এখন পৃথিবীতে 'অপর আলো'। ফলত

তোমার নিবিড় কালো চুলের ভিতরে
কবেকার সমুদ্রের নুন ;
তোমার মুখের রেখা আজো
কতো মৃত পৌত্তলিক খ্রীস্টান সিন্ধুর
অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন
কতো কাছে—তবু কতো দূর। ('সবিতা')

'ভোরের কল্লোল' সব সূর্যে জাগল কিন্তু সেই আলো কোথায়?—'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়!' ইতিহাস-চেতনায় কবি তা পাচ্ছেন না। তাই কবি এবার 'সুচেতনা'র কাছে আসছেন—আসছেন 'বনলতা সেন'-এর 'হাল ভাঙা' নাবিকের 'দারুচিনি দ্বীপে'।

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে
নির্জনতা আছে।...
কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে
তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়। ('সুচেতনা')

কবি-দৃষ্টি এখানে যেমি ভবিষ্যতে, যেমি অতীতে তেমি বর্তমানে। কলকাতা হয়তো একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে—অতীত নগর-সভ্যতার উত্তম নগরের মতো তিলে-তিলে গড়ে উঠবে, কিন্তু সেখানে কবি তাঁর হৃদয় স্থাপন করছেন না। এখনকারই পশ্চিম দিগন্তের নক্ষত্রে তাকিয়ে দেখছেন অনেক কালের প্রকৃতির নির্জনতাকে—দারুচিনি-বন। সেই দারুচিনি-বন ধারণ করে আছে যে দ্বীপ (হয়তো মরিসাস)—সেই নির্জনতা ধারণ করে আছে যে মানবী বা সে নির্জনতা-ই 'সুচেতনা'—তার কাছেই কবি হৃদয় স্থাপন করছেন। কেন? তিনি জানছেন ঃ

এই পৃথিবীর রণ-রক্ত সফলতা
সত্য তবু শেষ সত্য নয়। ('সুচেতনা')

মানুষের জীবনের বিফলতা (রণ, রক্তপাত) এবং সফলতা অতীতেও ছিল, এখনো আছে, এবং তাকে সত্য হতে গেলে, ভবিষ্যতেও তাকে থাকতে হবে। কিন্তু তাকে শেষ সত্য বলে মানতে পারছেন না আশাবাদী কবি।

আজকের মানুষের নাড়ীস্পন্দন অনুভব করে কবি বলছেন ঃ

পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;
মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে। ('সুচেতনা')

মানুষ মানুষকে ভালোবাসে কিন্তু তাকে হত্যাও করে—'অনেক রূঢ় রৌদ্রে ঘুরে' মানুষের প্রাণে এই জ্বর দেখা যাচ্ছে। আজকের পৃথিবীতে প্রাণের মূল্য নেই, আছে নিষ্প্রাণ স্বর্ণের মূল্য। 'রক্তক্লান্ত কাজে'র দ্বারা সেই স্বর্ণ-শব উৎসারিত হচ্ছে—'আমাদের বন্দরের রোদে'-ও এসে উপনীত হচ্ছে। বুদ্ধ-কনফুশিয়সের সরল জীবনের শিক্ষায় আমরা চুপ থাকলেও সেই 'রক্তক্লান্ত কাজে'র আহ্বান আসে। অন্নে আর সুখ নেই ('ভিখিরী' কবিতায় কবি বলেছেন,—'ভিখিরী'তেও এই 'গভীর অসুখ' সংক্রামিত)। পয়সা শিকারে 'ভিখিরীর যেমন জনতার প্রয়োজন, স্বর্ণ-শিকারেও পৃথিবীর জনতার প্রয়োজন। এই রকমই ভুল। ভুল, কেননা এই নিরানব্বুই-এর ধাক্কায় তৃপ্তি কোথায়। বুদ্ধ-কনফুশিয়সের নির্জনতার পথই রোগমুক্তির পথ দেখাবে। তাই কবি বলছেন ঃ

সুচেতনা, এই পথেই আলো জ্বেলে—এ-পথেই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে ;
সে অনেক শতাব্দীর মনীষীর কাজ ;
এ-বাতাস কি পরম সূর্যকরোজ্জ্বল ;
প্রায় ততদূর ভালো মানব-সমাজ
আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
গড়ে দেবো, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম-প্রভাতে। ('সুচেতনা')

চল্লিশের দশকে বিপ্লব-বিশ্বাসী কবিদের হট্টগোলে নির্জনতার সাধক জীবনানন্দ ভবিষ্যতের সুস্থ মানব-সমাজের পথেই চলেছেন কবিতার ভিন্ন আলো জ্বেলে। 'যা হয়ে গেছে যা হতে পারে সে-সবের ভিতরে খতিয়ে আজকের বিশেষ উপলব্ধির পথ পরিষ্কার' রেখেছেন তখন জীবনানন্দ এ-কবিতায়। 'অন্তিম প্রভাত' বলে কিছু আছে—যারপর প্রভাতের আর দরকার হবে না? মানুষের অন্তিম সফলতার পক্ষে নন কবি, তাই এ কবিতার শেষ বাক্য ঃ

দেখেছি যা হলো হবে মানুষের যা হবার নয়—
শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়। ('সুচেতনা')

'মানব জন্মের ঘরে' বা পৃথিবীতে এসে তিনি সুখী নন কিন্তু

এসে যে গভীরতর লাভ হলো সে সব বুঝেছি
শিশির শরীর ছুঁয়ে সমুজ্জ্বল ভোরে ('সুচেতনা')

এই প্রাকৃতিক শান্তি ও নির্জনতাই তাঁর 'সুচেতনা'—তাঁর 'বিশেষ উপলব্ধি'।

চল্লিশের দশকের প্রথম ভাগে 'বনলতা সেন' কবিতাপুস্তিকা প্রকাশিত হয় এবং তাকে আত্মস্থ করে দশকের মাঝামাঝি 'মহাপৃথিবী' আত্মপ্রকাশ করে 'পূর্বাশা'-প্রকাশালয় থেকে। চল্লিশের দশকের শুরুতেই, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের দ্বিতীয় বৎসরে, কবিতাকে অস্বীকার করে বাংলা কবিতায় যে-ধরনের সমাজ-চেতনা সোচ্চার হয়ে উঠেছিল, তাতে মৃত্যুপথযাত্রী রবীন্দ্রনাথই শুধু নন, প্রেমেন্দ্র মিত্র প্রমুখ কয়েকজন রবীন্দ্রোত্তর কবিও অস্বস্তি বোধ করছিলেন। 'পূর্বাশা'-সংস্থা তখন বাংলা কবিতার স্বার্থরক্ষার্থেই জীবনানন্দ দাশের কবি-প্রতিভার শরণ নিয়েছিলেন। তখনকার বাংলা কবিতার আবহাওয়াটা জীবনানন্দের ভাষায় এ রকম ঃ

> আমাদের দেশে যেসব নতুন কবিরা দিব্যানুভূতিকে ঘৃণা করেন এবং স্থূল ও চিক্কণ সুর মিশিয়ে কবিতা লেখেন—পদ্যে বা গদ্য ছন্দে—তাঁদের কবিতা প্রধানত শ্লেষাত্মক এবং বর্তমান কালের সমগ্র পৃথিবীর সমাজ-ব্যবস্থার অন্যায় ও অত্যাচারের মুখোশ বার করে ফেলবার জন্যে প্রযুক্ত।...এঁরা সাহিত্যে কল্পনা প্রতিভার দাবি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষা করে অকাতরভাবে মননজীবী এবং কবিতায় বিশুদ্ধ রসের কোনোরকম অবতারণার বিরোধী। আধুনিক বাংলা কবিতায় এই সব কবিই গদ্যপ্রায় পদ্য ছন্দ অথবা গদ্য ছন্দ অবলম্বন করে চলেছেন—এবং বর্তমান সমাজ ও সভ্যতার শববাহনের কাজ চলেছে এঁদের কবিতায়।...
>
> ('কবিতার কথা'—পৃঃ ২২)

'পূর্বাশা'-সংস্থার মনে হয়েছিল, এঁদের চৈতন্য-সম্পাদনের জন্যেই জীবনানন্দ দাশের 'সুচেতনা' কবিতা ('বনলতা সেন')।

'মহাপৃথিবী' মানে এ-পৃথিবীর পাশাপাশিই কবির পৃথিবী—জীবনানন্দ দাশের পৃথিবী যা মহাবিশ্বজগৎ থেকে উৎসারিত সময়ের সঙ্গে জড়িত। 'নাটোরের বনলতা সেন'-এর অস্তিত্ব এখানে মিশরের 'মমির ঘ্রাণে'। 'দেশ কাল সন্ততি'র (Time-Space Continuum) ধারণায়, 'মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়-চেতনা'য় অসঙ্গতি এতে কিছু নেই। এখানে বনলতা সেনের 'জোনাকি'র গল্প শেষ—'জোনাকি'র স্থান নিয়েছে হাজার বছর, খেলা করবার জন্যে। কথা বলছে ইতিহাস—'স্মৃতি' ;

হাজার বছর শুধু খেলা করে

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো।
চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ ;
বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর ছায়ারা ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো ঃ এশিরিয়—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।

শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ;
'মনে আছে?' শুধালো সে—শুধালাম আমি শুধু 'বনলতা সেন'।

('মহাপৃথিবী')

বাংলা দেশের হাজার বছর যদি চর্যাপদের 'সহজ সুন্দরী'কে 'নাটোরের বনলতা সেন' করে তুলতে পারে তাহলে হাজার বছর খেলা করে হাজার-হাজার বছর দূরে সভ্যতার প্রথম স্তরে মিশরের পিরামিড যুগে তাকে নিয়ে যেতে পারে। মমি করে রাখতে পারে মিশরীয় ধারণায় ঃ আবার জীবনে ফিরে আসবে আশায়। 'মমির ঘ্রাণ' স্মৃতির ঘ্রাণ ছাড়া আর কী—মৃতকে যা জীবনে ফিরিয়ে আনতে পারে, মৃত-প্রেমকেও। হাজার হাজার বছরের অতীত ইতিহাসের খেলা (হয়তো প্রেমেরই খেলা) কবিকে নিয়ে গেছে মিশরের সভ্যতায়। তাদের 'মৃতপুরী' পিরামিড এলাকা কল্পনায় ভেসে উঠেছে তার। সেই মৃতপুরী ডেকে এনেছে তার মনে বনলতা সেনের মৃত্যু—জীবনে বা প্রেমে। মিশরীয় ধারণায় বা স্মৃতির তাড়নায় তিনি তাকে বাঁচিয়ে তুলছেন ঃ 'মনে আছে?' শুধাল সে—শুধালাম আমি শুধু 'বনলতা সেন'। ইতিহাস-চেতনার সহায়তায় কবি এ-কবিতায় জীবন-সন্ধান করেছেন এবং জীবন তাঁকে এই পরিচ্ছন্ন চেতনা দিয়েছে যে বনলতা সেন সমস্ত সময়ে জীবিত। কবিতাকে সত্যি আধুনিক হতে হলে এ-পদ্ধতিই অনুসরণ করতে হয়।

তেমি সমস্ত সময়ে মৃত তাঁর 'শব' কবিতার 'মৃণালিনী ঘোষাল'। প্রকৃতি-চেতনার সহায়তায় কবি এখানে 'পৃথিবীর একপাশে একাকী নদীর গাঢ় রূপ'-কে 'বিকেলের লাল মেঘে' এবং 'হলুদ-হলুদ' জ্যোৎস্না'য় তাকিয়ে থাকতে দেখে এমন এক বর্ণের সন্ধান পেয়েছেন, যা তাঁর মনে মৃত্যুবোধের সঙ্গে জড়িত। এবং এই বর্ণ যেমন হঠাৎ আজকের নয়, অতীতেও তার অস্তিত্ব ছিল, ভবিষ্যতেও তেম্নি প্রতিফলিত হবে। ছিল এবং থাকবে এম্নি নদীতে। নদীর চিরন্তনতার প্রমাণ হিসেবেই যেন আকাশপটে কবি একটি চিত্রকল্প ফুটিয়ে তুলেছেন ঃ

... নক্ষত্রের রাতের আঁধারে
বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে
পৃথিবীর অন্য নদী ; (শব—'মহাপৃথিবী')

এবং নক্ষত্রও কবির 'পরলোক'-বোধের সঙ্গে জড়িত (আবহমান—'শ্রেষ্ঠ কবিতা')। হয়তো বাস্তবক্ষেত্রে পরলোকগতা মৃণালিনী ঘোষালের শবের প্রয়োজন হল তাই কবির মৃত্যুবর্ণ প্রতিফলিত একাকী নদীটির 'নারী মাথা'র জন্যে। নক্ষত্রনদীর সঙ্গে রূপসাম্যে এ-নদীও তখন চিরন্তন পরলোক এবং নদীর শরিক হয়ে মৃতা মৃণালিনীও চিরন্তন;

এইখানে মৃণালিনী ঘোষালের শব
ভাসিতেছে চিরদিন ঃ নীল লাল রূপালি নীরব। (শব—ঐ)

'ঝরা পালক'-এর 'পিরামিড' কবিতায় কবি 'পিরামিড'-কে 'যুগ-যুগান্তে'র মৃত্যুর ভেতরও প্রেমের প্রহরী হিসেবে দেখতে চেয়েছেন। 'মহাপৃথিবী'তে পিরামিডের সংস্পর্শে এনে প্রেমের স্মৃতিকে চিরন্তন করতে চেয়েছেন—কিন্তু 'ঝরা পালক'-এর কালে 'পিরামিডে'র বিপরীতে মানব-হৃদয়ে স্মৃতির ক্ষণিকতা নিয়ে বেদনা-বোধ তাঁর ছিল। বনলতা সেনেও 'দু-দণ্ডের শান্তি' ক্ষণিকতার আভাসই আনে। কিন্তু 'মহাপৃথিবী'তে পিরামিডের এলাকায় বনলতা সেনের সঙ্গে 'শরীরে মমির ঘ্রাণ' নিয়ে দাঁড়িয়েছেন তখন

আর ক্ষণিকতার প্রশ্ন নেই। তেম্নি বেদনাবোধেরও ক্ষণিকতার প্রশ্ন নেই—তা দেখতে পাই তাঁর 'মহাপৃথিবী'র 'হায় চিল' কবিতায়।

'রূপসী বাংলা'য় কবি এই ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিলেন, মৃত্যুর পর আবার যদি জীবনে ফিরে আসেন 'ধানসিড়ি' নদীর তীরে 'শঙ্খচিল'-এর বেশে। 'মহাপৃথিবী'তে চিলের কান্না শুনছেন কবি সেই 'ধানসিড়ি নদীটির'ই পাশে। চিলের ডাকই কান্নার মতো। নদীর পাশে উড়ছে চিল—ডাকছে। সাধারণের মনে এর অর্থ যা-ই হোক জীবনানন্দ দাশের মনে এ-ডাকের অর্থ অসাধারণ। চিলের কান্নার সুরটিই তিনি মনে তুলে নিচ্ছেন।

হায় চিল

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে-উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে
তোমার কান্নার সুরে বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে ;
পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে ;
আবার তাহারে কেন ডেকে আনো? কে হায় হৃদয় খুঁড়ে
বেদনা জাগাতে ভালোবাসে।
হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর উড়ে-উড়ে কেঁদোনাকো ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

মৃত্যুর পর 'শঙ্খচিল' হয়ে ফিরে না এলেও চিলের কান্নার সুরের সঙ্গে তাঁর হৃদয়ের বিরহ-বেদনার সুর মিশিয়ে দিয়েছেন কবি। চিল তাঁর 'নব মেঘদূত'। চতুর্থ পংক্তির 'সে' রূপসী বাংলাই হোক আর মৃণালিনী ঘোষালই হোক এই কান্নার সঙ্গে যুক্ত তার 'বেতের ফলের মতো' মৃত ম্লান চোখ। চিলের কান্না সেই কোন্ দূর অতীতে শুরু 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের' মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গে যেন—তাদের মতোই রূপসী 'সে', কবির নিকট অতীতের সঙ্গে যার মৃত্যু জড়িত। তার মৃত্যু-ব্যথা হৃদয়ে প্রোথিত ছিল, চিলের কান্নায় তা বহুদূর অতীতের মৃত্যু-ব্যথার সঙ্গে মিশে জেগে উঠল। চিলের আবহমান কান্নার সুরে কবি-হৃদয়ের বেদনা-বোধ মিশে তা চিরন্তন হয়ে গেল। তার জন্যে যে বস্তুসঙ্গতি দরকার ছিল তা 'সে', 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ' (মৃত্যু বোঝাতে), 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যা'।

কান্নার সুরের সঙ্গে কবিতার সুরের মিলন-সাধন করেছেন তিনি 'রিফ্রেন' দিয়ে ঃ প্রথম দুই পংক্তি আর শেষ দুই পংক্তি এক। তাছাড়া দুঃখ-বোধক শব্দ 'হায়' দিয়েই কবিতার শুরু।

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে, সম্প্রতি কেউ-কেউ, জীবনানন্দের শব্দ-ব্যবহারে ত্রুটি বা অমনোযোগ দেখতে পেয়েছেন। তথাকথিত ত্রুটির উদাহরণ 'হায় চিল' কবিতাতেই খানিকটা আছে। যেমন, সর্বনামের আধুনিক ও প্রাচীন প্রয়োগ ঃ 'তার' ও 'তাহারে' (তাকে) ('কথ্য' ও 'সাধু' প্রয়োগ বলতে আমি অনিচ্ছুক)। 'সে' যখন কবির নিকট-অতীত, তখন 'তার'—এই আধুনিক প্রয়োগ করেছেন কবি। কিন্তু চিল যখন তাকে বহুদূরের প্রাচীন রাজকন্যাদের সঙ্গে ডেকে আনছে, তখন 'তাকে'—এই আধুনিক রূপ আসছে না, প্রাচীনরূপ 'তাহারে' গিয়ে দাঁড়াচ্ছে। ছন্দের অনুরোধে একটি ধ্বনি বাড়াবার জন্যে 'তাহারে'-প্রয়োগ মোটেই নয় ঃ 'আবার তাহারে কেন ডেকে আনো'—বাক্যের ছন্দধ্বনি রেখে দুটি ধ্বনি অক্লেশে কমাতে পারতেন কবি, 'তাকে'—এই প্রয়োগ উপযুক্ত

মনে করলে। তিনি লিখতে পারতেন 'ফের তাকে কেন ডেকে আনো।' তাতে যেম্নি প্রাচীনতা ক্ষুণ্ণ হত তেম্নি আবেগও। কবি তা চাননি, মনে হয়। হাজার বছরের ক্লান্তি ও প্রাচীনতা বোঝাতে তেম্নি 'বনলতা সেন'-এ 'হাঁটিতেছি' ক্রিয়াপদের মন্থর ভঙ্গী ও প্রাচীনতা বেছে নিয়েছেন কবি। বাক্যের উদ্দেশ্য বিচার না করে বাক্যের অন্তর্গত কোন শব্দেরই বিচার হতে পারে না কবিতায়। তাছাড়া জীবনানন্দ যদি হোরেসের কাব্যরীতি অনুসরণ করে থাকেন, তাহলে তিনি নিশ্চয়ই মনে করেছেন, পদ্যে অব্যবহৃত প্রাচীন শব্দের ব্যবহার নূতন শব্দ-উদ্ভাবন করারই সামিল। এবং এ-সূত্রে এ-কথাও বিবেচ্য, যে অবিচ্ছিন্ন সময়-চেতনা মনে বহন করতেন জীবনানন্দ, তা মনে রেখে সমালোচকেরও উচিত তাঁর শব্দ-ব্যবহার বিচার করা।

চিলের কান্নার সঙ্গে নিজের বেদনা-বোধ জড়িত করে কবি বুঝতে পেরেছেন অতীতের ক্ষতি, ব্যথা আমাদের এই বর্তমানেও আছে, সুতরাং ভবিষ্যতেও থাকবে। আমরা যদি 'বেদনার সন্তান' হয়ে থাকি—আমাদের সন্তানরা হবে 'বেদনার সন্তানের সন্তান'। অবিচ্ছিন্ন বেদনা চলবে মানব-জীবনে—অবিচ্ছিন্ন সময়েরই মতো। চিলের প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় স্থাপন করে এবং সেই বেদনার উদ্গিরণ যে কান্না তার সুরের ভেতর এসে কবির হৃদয়ে যে অনুভূতির জন্ম হয়েছে তারই দান 'হায় চিল' কবিতা। কবি-স্বভাবের ইঙ্গিতেই তিনি চিলের সঙ্গে আত্মীয়তা করতে পারেন কিন্তু শুধু তার সহায়তায় 'হায় চিল' কবিতা হত না। অনুভূতি যে বস্তুসঙ্গতির প্রসব ঘটিয়েছে হৃদয়ে—বেদনার যে সন্তান তৈরী হয়েছে তাকে বেদনার সঙ্গে একাত্ম করেছে জীবনানন্দের কবি-মনীষা—সেই একটি বস্তুই 'হায় চিল'।

বেদনার বিষকে নষ্ট করবার সুযোগ পেয়েছেন কবি 'সিন্ধু-সারস'-এর আনন্দিত নৃত্যের ভেতর এসে মালাবার উপকূলে। 'দু-দণ্ড শান্তি'র মতো এ-ও 'দু-এক মুহূর্ত শুধু'। প্রেমেন্দ্র মিত্র আকাশ-পিপাসা দিয়েই 'সিন্ধুসারস'কে বুঝেছেন ('সম্রাট')। কিন্তু জীবনানন্দের 'সিন্ধুসারস' পৃথিবীর বেদনার জীবন ছেড়ে সমুদ্রের উৎসব-আনন্দে নেমে গেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র শকুনের মতোই 'পৃথিবীর পাখিদের ভুলে' চলে গেছে 'মহাপৃথিবী'র 'সিন্ধুসারস' কিন্তু 'মৃত্যুর ওপারে' নয়—একটা নতুন পৃথিবীর জীবন তৈরী করে। কবির পৃথিবীও এম্নি এক পৃথিবী। কিন্তু মানুষ-জীবনের ক্লান্তি, চেষ্টা, স্বপ্ন, চিন্তা, স্মৃতি, ব্যথা ভুলে কয় মুহূর্ত বা সে-পৃথিবীতে যেতে পারেন কবি? তাই—

দু-এক মুহূর্ত শুধু রৌদ্রের সিন্ধুর কোলে তুমি আর আমি
হে সিন্ধুসারস
মালাবার পাহাড়ের কোল ছেড়ে অতিদূর তরঙ্গের জানালায় নামি
নাচিতেছ টারানটেলা—রহস্যের ; আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি
চেয়ে দেখি বরফের মতো শাদা ডানা দুটি আকাশের গায়
ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীরে আনন্দ জানায়।
মুছে যায় পাহাড়ের শিঙে-শিঙে গৃধিনীর অন্ধকার গান,
আবার ফুরায় রাত্রি, হতাশ্বাস; আবার তোমার গান করিছে নির্মাণ
নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে...

(সিন্ধুসারস—'মহাপৃথিবী')

বিষাক্ত মাকড়শার কামড়ের বিষ দূর করবার জন্যে যে নাচ হত ইটালিতে—তা-ই 'টারানটেলা'। নাচে বিষক্ষয়—এ এক রহস্যময় ব্যাপার। পৃথিবীর জীবনের বিষক্ষয় করছে যেন সিন্ধুসারস সমুদ্রে নৃত্যভঙ্গীতে। সে নিরাময়—আনন্দিত। শকুনপত্নী গৃধিনীর মৃত্যুগীতি যেন আর নেই—নবজীবনের আনন্দে। পুরোনো ক্লান্ত পৃথিবীর ভেতরই সৃষ্টি করছে এক নতুন পৃথিবী সিন্ধুসারসের হর্ষধ্বনি। সিন্ধুসারসের এই পৃথিবীতে—এই আনন্দে নিবিষ্ট হয়ে দু-এক মুহূর্তমাত্র ছিলেন কবি। তারপরই মানুষের অন্ধকার চিন্তায়, অন্য অনুভবে ফিরে আসছেন—চিলের কান্নায় যে অনুভব হয়েছিল তা ফিরে আসছে মনে :

> জানো কি অনেক যুগ চলে গেছে? মরে গেছে অনেক নৃপতি?
> অনেক সোনার ধান ঝরে গেছে জানো নাকি? অনেক গহন ক্ষতি
> আমাদের ক্লান্ত করে দিয়ে গেছে—হারিয়েছি আনন্দের গতি ; (ঐ)

ইতিহাস-চেতনায় মানুষের জীবনের দিকে তাকালে আনন্দের বিপরীতবোধই মনে জন্ম নেয়। তাই :

> ইচ্ছা, চিন্তা, স্বপ্ন, ব্যথা, ভবিষ্যৎ, বর্তমান—এই বর্তমান
> হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের—বেদনার আমরা সন্তান। (ঐ)

শেলী তাঁর Skylark-এ বলেছিলেন, বেদনার সন্তান না হলে তোমার আনন্দের কাছে আসতে হয়তো পারতাম না। জীবনানন্দও সেই অনুভবেই সিন্ধুসারসের সঙ্গী হয়েছেন দু-এক মুহূর্তের জন্যে এবং বেদনার বিবরণ দিয়ে যাচ্ছেন :

অতীতের সব সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে গেছে—প্রাকৃতিক সৌন্দর্য—তাই 'সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন মেঘের দুপুরে, আহা, ধানসিড়ি নদীটির পাশে।' কেননা, 'সেখানে আকাশে কেউ নেই, আর, নেই আর পৃথিবীর ঘাসে।' মানুষের সৌন্দর্য—'কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী' 'রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে' 'মাছির মতো ঝরে'। 'সৌন্দর্য রাখিছে হাত ক্ষুধার বিবরে।' এই ক্ষয়ই চলেছে পৃথিবীতে। মানুষের সব গভীর ইচ্ছা, চেষ্টা বিকল হয়ে যাচ্ছে। মানুষের আনন্দ কী করে ব্যাহত হবে না? মানুষের এই ব্যথার ইতিহাস তো সিন্ধুসারস চেনে না, জানে না। নিজের ইতিহাসও তারা জানে না। কবে তাদের পূর্বপুরুষ 'বিষণ্ন পৃথিবী' ছেড়ে 'নীল সমুদ্রের নীড়ে' এসেছিল। শাদা ডানার উল্লাসে তারা রৌদ্রে উড্ডীন :

> কলরব করে উড়ে যায়
> শত স্নিগ্ধ সূর্য ওরা শাশ্বত সূর্যের তীব্রতায়। (ঐ)

'সিন্ধুসারস'-এর আনন্দ ও সৌন্দর্যের সঙ্গে কবির ক্ষণিক পরিচয় ও আত্মীয়তাবোধ কবিকে শেষ পর্যন্ত এই বোধে নিয়ে যাচ্ছে যে এই আনন্দ ও সৌন্দর্য শাশ্বত। কিন্তু এই আনন্দ ও সৌন্দর্যের উদ্‌গিরণের ভেতর এসে কবির মনে যে অনুভূতির জন্ম হয়েছে তা পৃথিবীর সৌন্দর্যের নশ্বরতার ছবিই প্রসব করেছে। কিন্তু নষ্ট সৌন্দর্যকে ফিরে পাবার আকাঙ্ক্ষাও সঙ্গে-সঙ্গে জন্ম নিয়েছে। ব্যথার বিষ বা বিষের ব্যথা খানিকটা নষ্ট হয়েছে বৈকি। 'সিন্ধুসারস'কে তিনি বলছেন :

> জানি পাখি, শাদা পাখি; মালাবার ফেনার সন্তান,
> তুমি পিছে চাহোনাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই,

বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি ; পৃথিবীর পাখিদের মতো নেই শীত রাতে
ব্যথা আর কুয়াশার ঘর। (ঐ)

এবং 'শতস্নিগ্ধ সূর্যে'র মতো এই শাদাপাখির সৌন্দর্য ও আনন্দের স্মৃতি নিয়ে অতঃপর অতীতে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'মৃত্যুর আগে'র দিনগুলোতে তাকিয়েছেন। কোনো সুখস্মৃতি কি জীবনে ছিল না? কোনো আনন্দ? কোনো আকাঙ্ক্ষা? যা হয়তো কুড়ি বছর আগে দেখেছিলেন তা-ই দেখছেন আবার ঃ

আমরা দেখেছি যারা বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত
এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে,
আমরা রেখেছি যারা ভালোবেসে ধানের গুচ্ছের 'পরে হাত
সন্ধ্যার কাকের মতো আকাঙ্ক্ষায় আমরা ফিরেছি যারা ঘরে ;
শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ
আমরা পেয়েছি যারা ঘুরেফিরে ইহাদের চিহ্ন বারোমাস।
(মৃত্যুর আগে—'ধূসর পাণ্ডুলিপি')

এবং 'কুড়ি বছর পরে' ('মহাপৃথিবী') সেই ভালোবাসার জীবনকে—ভালোবাসার মুখকে দেখবার আকাঙ্ক্ষা জাগছে কবির মনে ঃ

আবার বছর কুড়ি পরে তার সাথে দেখা হয় যদি!
আবার বছর কুড়ি পরে—
হয়তো ধানের ছড়ার পাশে
কার্তিকের মাসে—
তখন সন্ধ্যার কাক ঘরে ফেরে— (কুড়ি বছর পরে—'মহাপৃথিবী')

সেই কল্পনায় তাঁর ব্যথার প্রতীক 'চিল' আর ওড়ে না—ব্যথা বুঁজে যায় ঘুমে চোখের পাতার মতো ঃ

চোখের পাতার মতো নেমে চুপি কোথায় চিলের ডানা থামে—
সোনালি সোনালি চিল—শিশির শিকার করে নিয়ে গেছে তারে—
কুড়ি বছরের পরে সেই কুয়াশায় পাই যদি হঠাৎ তোমারে!
(কুড়ি বছর পরে—'মহাপৃথিবী')

আবার তাই তাঁর সবুজ 'ঘাস'-এর ভালোবাসা পাবার আকাঙ্ক্ষা জাগছে মনে ঃ

আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে-গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে। (ঘাস—'মহাপৃথিবী)

এবং 'হাওয়ার রাতে' কবির হৃদয় 'জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়' ভরে যায় নিশ্চয়ই 'সিন্ধুসারস'-এর জীবন-স্পর্শে। 'বনলতা সেন'-এর অধ্যায়ে 'তুমি'-র ইঙ্গিতে তিনি

দেখেছিলেন 'বাতাসের বুকে স্পৃহা, উৎসাহ, জীবনের ফেনা।' 'মহাপৃথিবী'র 'হাওয়ার রাতে' তিনি আর দর্শকমাত্র নন—'গভীর' 'বিস্তীর্ণ' হাওয়ার স্পর্শ শরীরে নিয়ে 'আধো ঘুমের ভিতর' স্বপ্ন জাগিয়ে তুলছেন নক্ষত্রলোকের। তাঁর মনে হচ্ছে :

মাথার উপর মশারি নেই আমার
স্বাতিতারার কোল ঘেঁষে নীল হাওয়ার সমুদ্রে শাদা বকের মতো উড়ছে সে।
(হাওয়ার রাত—'মহাপৃথিবী')

স্বপ্নে মৃতরা জীবনে চলে আসে—যে নক্ষত্রলোককে মৃত পরলোক ভাবতেন কবি (আবহমান—'শ্রেষ্ঠ কবিতা') সে নক্ষত্রলোক জীবিত হয়ে উঠল। দেশ-কাল-সন্ততির ধারণায় নক্ষত্রলোকে তো পৃথিবীর মৃত অতীত এখনো জীবিত। তাই কবি বলছেন :

পৃথিবীর সমস্ত ধূসর প্রিয় মৃতদের মুখও সেই নক্ষত্রেরই ভিতর
দেখেছি আমি; (হাওয়ার রাত—'মহাপৃথিবী')

দেখেছেন বেবিলন, এশিরিয়া, মিশর, বিদিশার রূপসীদের—দেখেছেন ইতিহাস-চেতনারই সহায়তায়। যেমন ইয়েটস্ হৃদয়ে অনুভব করতেন, 'the loveliness that long has faded from the world' তেমনি জীবনানন্দের হৃদয়েও রূপসীদের অনুভব। কিন্তু জীবনানন্দের অনুভূতির চেহারা আলাদা—কারণ অতীত রূপসীরা মৃত্যু থেকে 'অতিদূর আকাশের সীমানায়' জীবনে এসে দাঁড়িয়েছে। কেন, জানেন না কবি :

মৃত্যুকে দলিত করবার জন্যে?
জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?
প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?
আড়ষ্ট—অভিভূত হয়ে গেছি আমি। (হাওয়ার রাত—'মহাপৃথিবী')

হাওয়ার দুর্দান্ত মত্ত জীবনের অনুভূতিতে অতীত ইতিহাসের মানব-জীবনের দুর্দান্ত মত্ত অনুভূতি মিশে গেছে কবির মনে। হাওয়ার চেতনা আর ইতিহাসের চেতনা তাঁর হৃদয়ে যে-অনুভূতির জন্ম দিয়েছে তা সিন্ধুসারসের এবং শকুনেরই জীবন-অনুভূতি :

আমার হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল
নীল হাওয়ার সমুদ্রে। (হাওয়ার রাত— ঐ)

এ-পর্যায়ে 'সিন্ধুসারসে'র অভিজ্ঞতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-পর্যায়ের 'শকুনে'র অভিজ্ঞতা আত্মস্থ করবার যেমনি সহায়তা করেছে এই হাওয়ার রাত্রি : নক্ষত্র-ঝলমল অন্ধকার রাত্রি আর উত্তুঙ্গ হাওয়া : তাই 'নীল হাওয়ার সমুদ্রে' তাঁর হৃদয় :

একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায়-তারায় উড়িয়ে নিয়ে চললো
একটা দুরন্ত শকুনের মতো। (হাওয়ার রাত— ঐ)

মৃত্যুর ওপারেই গেল বোধ হয় 'শকুনের মতো', কারণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'শকুন' 'গভীর নীলে মিশে' গিয়ে 'চলে যায় যেন কোন্ মৃত্যুর ওপারে'। মৃত্যুর ওপারে কোথায়? যেখানে মৃত ইতিহাসের রূপসীরা জীবন নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে—'অতিদূর আকাশের সীমানায়'। Space-Time-এর সীমানায়।

'সিন্ধুসারস'-এর অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করবার জন্যে জীবনানন্দের আগ্রহ নিশ্চয়ই ইয়েট্‌স্-এর কবিতা-পাঠের ফল। নব্য-রোমান্টিক ইয়েট্‌স্ তাঁর কাব্য-জীবনের প্রথম পর্যায়েই বলছিলেন ঃ

I would that we were, my beloved,
White birds on the foam of the Sea

'শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান' ('সিন্ধুসারস') যেম্নি সন্ধান করেছেন জীবনানন্দ, তেম্নি ইয়েট্‌স্-এর এই ইচ্ছাও মনে পোষণ করে ব্যক্ত করেছিলেন, 'আমি যদি হতাম' কবিতায়। 'এক পয়সায় একটি' সিরিজের 'বনলতা সেন' পুস্তিকায় কবিতাটি ছিল ঃ

আমি যদি হতাম বনহংস
বনহংসী হতে যদি তুমি!

কিন্তু তা সমুদ্রে নয়, 'কোনো এক দিগন্তের জলসিড়ি নদীর ধারে—ধান ক্ষেতের কাছে'। 'মহাপৃথিবী'তে যে 'বুনো হাঁস' ঠাঁই পেয়েছে তা 'হাওয়ার রাতে'র হাওয়ার মতোই 'নক্ষত্রের বিশাল আকাশে' 'সাঁইসাঁই' শব্দে ছুটছে। এবং কবির মনে 'দু-একটা কল্পনার হাঁস' দিয়ে যাচ্ছে। তাঁর বনহংসী 'কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যাল'। কবির মনে পড়ছে তার মুখ এবং হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার ভিতর এ রকম কয়েকটি মুখ উড়িয়ে দিচ্ছেন—'পৃথিবীর সব ধ্বনি সব রং' মুছে দিয়ে। পৃথিবীকে অস্বীকার করেই 'মহাপৃথিবী'র কবিতা হয়েছে 'বুনো হাঁস'। কিন্তু 'বনহংস বনহংসী' ছিল পৃথিবীরই। পৃথিবীকে অস্বীকার মানে বাস্তবতাকে অস্বীকার। 'অরুণিমা সান্যাল' একটি মেয়ের বাস্তব নাম। তাই তাকে দিয়ে কবির দরকার নেই—কল্পনায় তাকে বুনোহাঁস বানিয়ে কবি হৃদয়ে স্থান দিয়েছেন। হৃদয়ের আলোতে, কল্পনার আলোতে, তাকে উড়িয়ে দিয়েছেন। এই আলো অপার্থিব। এই অপার্থিব আলোতেই কবি জীবনানন্দ দাশের বিচরণ। এই অপার্থিব আলোতেই তিনি তৈরী করতে চেয়েছেন তাঁর 'মহাপৃথিবী'।

জীবনানন্দ দাশের 'মহাপৃথিবী'

হিমানী বন্দ্যোপাধ্যায়

আমরা মধ্যম পথে বিকেলের ছায়ায় র'য়েছি ;
একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে ;
আরেকটি পৃথিবীর দাবী
স্থির ক'রে নিতে হ'লে লাগে

সকালের আকাশের মতন বয়স ;
সে সকাল কখনো আসে না ঘোর, স্বধর্ম্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।

(বিভিন্ন কোরাস/মহাপৃথিবী/১৩৫১)

কোনো কবির কাব্যের বিবর্তন ও পরিবর্তন বুঝতে হ'লে আমাদের প্রথম—ও শেষ—কর্তব্য হবে তাঁর চিত্রকল্প প্রয়োগের রীতি লক্ষ করা। বক্তব্য, অনুভূতির তীব্রতা বা মহত্ত্ব, এমনকি নানা চিন্তাসূত্রের (থিমের) ব্যবহারও তেমন বিশেষভাবে কবিতার চরিত্র চিহ্নিত করতে পারে না, চিত্রকল্প যেমন পারে। কবির সচেতন ও অবচেতন মন, বা কাব্যকলার বিশিষ্টতার অনেকটাই ধরা পড়ে চিত্রকল্পের পরীক্ষায়। সেদিক থেকে দেখতে গেলে চিত্রকল্পই কবিতার প্রাণ—কেননা জগতের সামান্য সত্যগুলি ব্যক্তিগত ও বিশেষিত হ'য়ে ওঠে চিত্রকল্পেরই মাধ্যমে। কবিতা যেহেতু দর্শনের মতো সামান্য সত্য বা নির্বিশেষ গুণের উপর নির্ভরশীল নয়, বরং বিশেষভাবেই দেহনির্ভর, সেইজন্য চিত্রকল্প ছাড়া কবির আত্মপ্রকাশের মাধ্যম আর প্রায় নেই। নূতন-নূতন চিত্রকল্প সৃষ্টি করা, বা ছবি বানাবার ক্ষমতা, একই সঙ্গে কবির অভিপ্রায় বা মনোভাব প্রকাশ করে ও পাঠকের ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ ও স্পর্শাতুর ক'রে তোলে। তাছাড়া কোনো কবির জীবনদর্শন উপলব্ধি করার জন্যও চিত্রকল্পের পরীক্ষা অপরিহার্য, কেননা রূপকল্প বা প্রতীক নির্মাণের ইচ্ছা বা উৎকর্ষ মানুষের দার্শনিকতা বা অন্তর্দৃষ্টির প্রমাণ। ভিন্ন-ভিন্ন বস্তুর মধ্যে যে-মিল আপাতদৃষ্টিতে প্রতিভাত নয়, তাকে মননের দ্বারা বুদ্ধিগ্রাহ্য ক'রে কল্পনার দ্বারা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য অবস্থায় পরিবেষণ করাই হচ্ছে প্রতিভাবানের কাজ। বিশেষভাবে আধুনিক কবিদের ক্ষেত্রে এই বীক্ষণ অত্যন্ত জরুরি, কেননা তাঁরা পূর্বনির্ধারিত কোনো আঙ্গিক বা কাব্যভাষার সাহায্য ছাড়া নিজেরাই মৌল প্রশ্নগুলির মুখোমুখি হ'তে চান। 'চিত্ররূপময়' বা তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল'—* এই ব'লে যখন জীবনানন্দর কবিতাকে বর্ণনা করা হয়, তখন একটি সাধারণ সত্যই উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু তাঁর

* 'চিত্ররূপময়'—এই মন্তব্যটি রবীন্দ্রনাথের। দ্বিতীয় মন্তব্যটি বুদ্ধদেব বসুর। দ্রঃ বুদ্ধদেব বসু/জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন'/কালের পুতুল (১৩৬৫)/পৃঃ ৩৬

কবিতার চিত্ররূপময়তা কোনো স্থাণু বা স্থাবর ব্যাপার নয়, পরিবর্তনশীল। প্রথমেই এ-কথাটা এখানে উল্লেখ করা ভালো যে তাঁর চিত্রকল্প রচনার পদ্ধতি ভিন্ন-ভিন্ন কাব্যগ্রন্থে ভিন্ন-ভিন্ন জাতীয়—অথচ একটি অন্তর্লীন সূত্রও হয়তো-বা খুঁজে-পাওয়া সম্ভব। এখানে কেবল তাঁর 'মহাপৃথিবী' (১৩৫১) কাব্যগ্রন্থের চিত্রকল্পগুলি লক্ষ ক'রে দেখা হবে।

এই বইটিকেই বিশেষভাবে বেছে নেবার কারণ 'মহাপৃথিবী' জীবনানন্দর কাব্যে এক নূতন চেতনার উন্মেষ ও বিকাশ সূচিত করে। কেননা জীবনানন্দর কবিতাকে মোটামুটি যে-দুটি ধরনে ভাগ করা যায়, এখানে তার দুই-ই বর্তমান : 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে (১৯৩৬) যে ধরনের চিত্রকল্প ব্যবহৃত হয়েছে, এই বইতে যেমন তারও প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, তেমনি লক্ষ করা যায় চিত্রকল্প রচনার এক নূতন পদ্ধতি—যার ফলে কবিতার বক্তব্য ও সুর দুই-ই পরিবর্তিত হ'য়ে যায়। এই দুই ধরণ বলতে আমি কী বোঝাচ্ছি তা বিশদ ও পরিষ্কার করার আগে এখানে দুটি উদাহরণ দিতে চাই, যেখানে কারো মধ্যস্থতা ছাড়াই সুরগত ব্যবধানটি পাঠকের কানে ধরা পড়বে।

ক। রাতের নক্ষত্র, তুমি বল দেখি কোন্ পথে যাব?

'তোমারি নিজের ঘরে চলে যাও'—বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে—
'অথবা ঘাসের পরে শুয়ে থাক আমার মুখের রূপ ঠায় ভালোবেসে ;
অথবা তাকায়ে দেখ গোরুর গাড়ীটি ধীরে চ'লে যায় অন্ধকারে
সোনালি খড়ের বোঝা বুকে ;
পিছে তার সাপের খোলস, নালা, খল্‌খল্ অন্ধকার—শান্তি তার
র'য়েছে সমুখে ;
চ'লে যায় চুপে চুপে সোনালি খড়ের বোঝা বুকে ;—
যদিও ম'রেছে ঢের গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, যক্ষ,—তবু তার মৃত্যু নাই মুখে।'
(নিরালোক)

খ। নটে গাছ মুড়ে গেছে ব'লে মনে হয়
আমাদের বক্তব্য ফুরুলে।

আবার সবুজ হয়ে জুয়ায়ে গিয়েছে
আমাদের সন্তানের—সন্তানের সন্তানের প্রয়োজনমত।
এ রকম চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
সহসা খিঁচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত

অন্য কোনো জ্যামিতিক রেখা হতে পারে ;
অন্য কোনো দার্শনিক মত-বিপ্লব ;
জেনে তবু মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গম এড়ায়ে
স্থির হয়ে রবে নাকি সন্ততিরা, সন্ততির সন্ততিরা সব?

যদি তারা টেঁসে যায় করাল কালের স্রোতে ধরা প'ড়ে গিয়ে,
যদি এই অন্ধকার প্রাসাদের ভগ্ন অবশেষে
শেয়াল পেঁচার দিকে চেয়ে কেঁদে যায়,—

তখন স্বপ্নই সত্য ; গিয়েছে বস্তুর থেকে ফেঁসে

জীবনের বাস্তবতা সে সময়।

(বিভিন্ন কোরাস)

প্রথম দৃষ্টান্তটিতে বিশেষভাবে চোখে পড়ে কোমল, ধূসর পরিমণ্ডলে'র জীবনানন্দকে—যার আবেদন সাধারণত আমাদের ইন্দ্রিয়ের কাছে এবং যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে বিলম্বিত দোলা-দেয়া সুর। দ্বিতীয় দৃষ্টান্তটিতে যে-পরিবর্তন প্রতিফলিত, তা হচ্ছে, ইন্দ্রিয়ের দ্বারে আঘাত না-ক'রে জীবনানন্দ আমাদের বুদ্ধি বা চিন্তাশক্তিকে ঘা দিতে চাচ্ছেন। অতএব এই দ্বিতীয় উদাহরণটিতে নক্ষত্র, রাত্রি, ঘাস, হাসি, মুখের রূপ, গোরুর গাড়ি, সাপের খোলশ, নালা, সোনালি খড় ইত্যাদির মতো দৃশ্যমান—প্রাকৃতিক ও শারীরিক—চিত্রকল্প আদৌ নেই—চিত্রকল্পর চরিত্র অনেক সামান্য ও নির্বস্তুক হ'য়ে উঠেছে ; এখানে সমস্ত চাপ এসে পড়েছে ভাষার উপর—বিশেষণ এবং ক্রিয়াপদের ব্যবহার, চক্রাকার কালের সঙ্গে খচ্চরের তুলনা, বস্তু থেকে বাস্তবতার ফেঁসে-যাওয়া ইত্যাদি তথ্য এখানে আমাদের চিন্তাকে আহত ও উত্তেজিত ক'রে তোলে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিটির মধ্যে কিছু নেই যা আতপ্ত, ব্যক্তিগত, দৃশ্যমান ও ইন্দ্রিয়ভোগ্য। কতকগুলো নির্বস্তুক চেতনার সঙ্গে আমাদের পরিচয় না-থাকলে এই কবিতার কোনো শারীরিক ও তাৎক্ষণিক আবেদন হবে না। আমার মনে হয় যে এখানে জীবনানন্দ তাঁর তীব্রভাবে ব্যক্তিগত করুণরঙিন জগৎটি ধীরে-ধীরে ত্যাগ ক'রে এমন একটি ভিন্ন জগতে প্রবিষ্ট হচ্ছেন যা কোনো অংশে কম বিষণ্ণ নয়, অথচ যার বিষাদের কারণগুলি শুধু জীবনানন্দর ব্যক্তিগত চেতনা থেকে উত্থিত হচ্ছে না, বরং সমস্ত ইতিহাসে বা সময়ের স্বভাবে ছড়িয়ে আছে। প্রথম পর্যায়ের জীবনানন্দ অনেক বেশি আপাত-রোমান্টিক, আর দ্বিতীয় পর্যায়ের জীবনানন্দ যদিও অত্যন্ত রোমান্টিক তবু তাঁর ব্যক্তিসত্তা দূরবিস্তৃত। 'কে হায়, হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে! হায় চিল, সোনালি ডানার চিল', ব'লে যে-ধরনের বেদনার কথা তিনি উচ্চারণ করেছিলেন, তা থেকে তিনি উত্তীর্ণ হয়েছেন আরো-গভীর আরো-তীব্র হতাশায় যেখানে চিলের সোনালি ডানা বা ভিজে মেঘের দুপুরের সান্ত্বনাও নেই। নিজের অবস্থা সম্বন্ধে তাই তিনি নিজেই বলেছেন ঃ

পৃথিবীর সেই সব মধ্যস্থতা
আমার ও সৌন্দর্য্যের শরীরের সাথে
মমির মতনও আজ কোনোদিকে নেই আর ;
সেই সব শীর্ণ দীর্ঘ মোমবাতি ফুরায়েছে
আছে শুধু চিন্তার আভার ব্যবহার। (মনোবীজ)

এই চিন্তার আভায় জীবনানন্দর চোখের সামনে এমন একটি জগৎ ফুটে উঠেছে যার ভয়াবহ অথচ তীব্র আকর্ষণে ধানসিঁড়ি নদী, নির্জন খড়ের মাঠ ও মেঠো চাঁদ ছেড়ে জীবনানন্দ 'ক্লান্ত ইতিহাসে'র লীলা দেখতে এসেছেন যা 'শাণিত সাপের মত অন্ধকারে নিজেকে করেছে প্রায় গ্রাস' (পরিচায়ক)। ইতিহাস বা কালস্রোত সম্বন্ধে গভীর ও ব্যক্তিগতভাবে উপলব্ধি করেছেন জীবনানন্দ ঃ যেমন ক'রে বাংলার গ্রাম, প্রকৃতি ও পুরাণ তাঁকে একসময় আত্মপ্রকাশের ভাষা জোগাতো, তেমনি এখন তিনি তাঁর চিত্রকল্প সংগ্রহ করছেন ইতিহাস ও কালের বিধ্বংসী ও সভ্যতাগ্রাসী স্বভাব থেকে। আরো অনেক শান্ত

গম্ভীর কৃচ্ছ্র কিন্তু হতাশ হয়েছেন তিনি। যে-উন্মাদনার বশে একসময় তিনি চীৎকার ক'রে বলেছিলেন

> স্থূল হাতে ব্যবহৃত হয়ে—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে
> ব্যবহৃত—ব্যবহৃত—
> আগুন বাতাস জল : আদিম দেবতারা হো হো ক'রে হেসে উঠল :
> "ব্যবহৃত—ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায়"
>
> (আদিম দেবতারা)

সেই আত্মবিস্মৃত উন্মাদনা আর তাঁকে আক্রান্ত করে না। অনেক ভয়াবহ শেষ সত্য তিনি স্থিরভাবে মেনে নিতে পারেন। এমনকি যে-আকাশ এত কাল পর্যন্ত তাঁর কাছে মুক্তি, উল্লাস ও পবিত্রতার প্রতীক ছিলো তাও এখন আর সন্দেহের অতীত নয়। 'নীলিমাকে যতদূর শান্ত নির্ম্মল মনে হয়। হয়তো বা সে করম নেই তার মহানুভবতা' (পরিচায়ক)। জীবনানন্দ এখন ভীষণ সন্দিগ্ধ ও অবিশ্বাসী ; অথবা যে-বিশ্বাস তাঁকে সঞ্জীবিত রাখে এবং এই ধ্বংসলীলাকে কাব্যে রূপান্তরিত করার প্রেরণা দেয়, তা হচ্ছে এই আশা যে হয়তো কোনো-এক দূর ও অনাগত জগতে ইতিহাসশুদ্ধির অনুষ্ঠান ঘটবে। কাল যেহেতু নিত্যবহমান তার স্রোত ও পরিবর্তনশীলতাই একদিন মনীষা ও পবিত্রতাকে প্রতিষ্ঠিত করবে। কিন্তু আপাতত চারদিকে 'নরকের আগুনের মত রক্তপাত' (পরিচায়ক)।

জীবনানন্দর লেখার প্রথম দিক থেকেই মৃত্যুচেতনা লক্ষণীয়। তিনি কখনোই মৃত্যু বা অবক্ষয় থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেননি। কখনো কখনো মনে হয় মৃত্যু সম্বন্ধে তাঁর একটি বিকৃত প্রেম রয়েছে, কেননা তাঁর কাব্যের প্রায় সমস্ত প্রেমিকারাই মৃত, বা প্রকৃতিতে বিলীন, বা জীবনানন্দ তাদের সময়ের হাতে তুলে দিয়ে একা ব'সে স্বপ্ন বুনছেন : 'আবার বছর কুড়ি বাদে তার সাথে দেখা হয় যদি'। শোকগাথার জগৎ থেকে একটি মৃত নারীর মূর্তি তিনি নির্মাণ করেছেন—

> কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
> দুইখানা হাত তার হিম,
> চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
> চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
> সে আগুনে হায়... (শঙ্খমালা)

এবং তাঁর নায়িকারা সবাই এই শঙ্খমালার মতো 'বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ' নিয়ে 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মত' 'চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে'।

ব্যক্তিগতভাবেও জীবনানন্দ মৃত্যুকামী বা মৃত্যুপ্রেমী। 'আট বছর আগের একদিন', 'শীতরাত্র', 'স্থবির-যৌবন,' 'আজকের এক মুহূর্ত'—এই প্রত্যেকটি কবিতা মৃত্যুর উৎকাঙ্ক্ষায় টান হ'য়ে আছে। 'আমার হৃদয়ের ভিতর/সেই সুপক্ব রাত্রির গন্ধ পাই আমি' (আজকের এক মুহূর্ত)। প্রাকৃতিক পৃথিবীতেও জীবনানন্দ পাকা, পচা দৈহিক অবক্ষয়ের প্রক্রিয়া লক্ষ করেন। শীত, হিম, কুয়াশা, বন্ধ্যা হিম চাঁদ, পাকা হলুদ পচা পাতা, শীর্ণ ডাল পালা ইত্যাদির পৌনঃপুনিক ব্যবহারেও এক ধরনের মৃত্যুচেতনার আভাস আছে। এবং 'নিয়ত শিয়রে মৃত্যুর হাত জাগে' এই জ্ঞানই হয়তো তাঁর নিসর্গ-আস্বাদের ক্ষমতা আরো গাঢ় ক'রে দেয়।

এই মৃত্যু-বা ক্ষয়-চেতনা আমি কিছুটা বিস্তৃতভাবে আলোচনা করছি, কেননা আমার মনে হয় যে এই মানসিকতাই ক্রমশ ইতিহাস ও অস্তিত্ব সম্বন্ধে গভীর নিরাশায় উদ্বেল হয়েছে। ব্যক্তিগত বা প্রাকৃতিক পৃথিবীতে করাল কালের যে-অমোঘ নিয়ন্ত্রণ জীবনানন্দ লক্ষ করেছিলেন, তাকেই আরো বিপুলভাবে তাঁর চোখে পড়েছে ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে, সভ্যতার উত্থান-পতনের তরঙ্গভঙ্গে। ফলে জীবনানন্দর আগেকার কবিতায় যে-পলায়নী-বৃত্তি রয়েছে, পরের কবিতায় তা অন্তর্হিত ও অদৃশ্য, কেননা তিনি তখন আর ব্যক্তিগত সুখদুঃখ নিয়ে তেমন বিচলিত নন। কেননা তাঁর মনে হয়

লোষ্ট্র, আমি, জীব আর নক্ষত্রের অনাদি বিবর্ণ বিবরণ

বিদূষক বামনের মত হেসে একবার চায় শুধু হৃদয় জুড়াতে।
ফুরফুরে আগুনের থান তবু কাঁচিছাটা জামার মতন মুক্তহাতে
তাহার নগ্নতা ঘিরে জ্ব'লে যায়—সে কোথাও পারে না দাঁড়াতে।

(পরিচায়ক)

তাঁর জাগ্রত, সন্ধানী ক্ষয়চেতনা একই সঙ্গে তাঁকে আরো হতাশ অথচ প্রবীণ ও জ্ঞানী করেছে। এই অনিবার্য ধ্বংস ও অসংহতির নাটকের তিনি বিমুগ্ধ দর্শক—কখনো তিক্ত, কখনো বিমূঢ়, কিন্তু সব সময়েই মোহাবিষ্ট। 'লোষ্ট্র, আমি, জীব আর নক্ষত্র' এই অসংলগ্ন উপাদানগুলিকে একই কালসূত্রে গ্রথিত করেছে ব'লে তিনি সমদৃষ্টিতে দেখেছেন। এখন আর তাঁর পলায়নের প্রয়োজন নেই। 'কোনোদিন জাগবো না আমি—কোনোদিন আর'—এই উৎকাঙ্ক্ষা আর তাঁর কবিতায় ধ্বনিত হবে না।

'মহাপৃথিবী'র 'ফুটপাথে' কবিতা থেকেই তাঁর কবিতায় একটি নূতন সুর শোনা যেতে থাকে। তার অব্যবহিত পূর্ববর্তী কয়েকটি প্রধান কবিতা হলো : 'বনলতা সেন', 'কুড়ি বছর পরে', 'নিরালোক', 'সিন্ধুসারস', 'ঘাস', 'হাওয়ার রাত', 'শ্রাবণ রাত', 'আমি যদি হতাম', 'হায়, চিল', 'বুনো হাঁস', 'শঙ্খমালা', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'শিকার', 'শব', 'হরিণেরা', 'স্বপ্ন', 'বিড়াল', 'আট বছর আগের একদিন', 'শীতরাত', 'আদিম দেবতারা', 'স্থবির-যৌবন' ও 'আজকের এক মুহূর্ত'। এই কবিতাগুলির অধিকাংশই 'বনলতা সেন' (সিগনেট প্রেস সংস্করণ, ১৯৫২) নামক কাব্যগ্রন্থে বা 'জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা' (১৯৫৪) সংকলনটিতে পুনঃ প্রকাশিত হয়েছে। প্রায় সব কটি কবিতাই অত্যন্ত জনপ্রিয় ও জীবনানন্দর 'জনপ্রিয় মূর্তি' তৈরি করতে সাহায্য করে। প্রমাণ করে—অন্য অনেক ইঙ্গিত সত্ত্বেও—যে তিনি বাংলার গ্রামজীবনের ও ইন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্পের কবি। আর ওই 'ফুটপাথে'র পরের কবিতা হচ্ছে : 'প্রার্থনা', 'ইহাদেরি কানে', 'সূর্য্যসাগরের তীরে', 'মনোবীজ', 'পরিচায়ক', 'বিভিন্ন কোরাস', 'প্রেম-অপ্রেমের কবিতা'। জীবনানন্দর জীবদ্দশাতেই তার পরে বেরিয়েছিল 'সাতটি তারার তিমির' (১৩৫৫)।

'ফুটপাথে'র পূর্ববর্তী কবিতাগুলির নায়ক স্বয়ং জীবনানন্দ। তাঁরই নানা মানসিক ও আত্মিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াই এই কবিতাগুলিতে প্রতিফলিত : প্রেম, মৃত্যু, প্রকৃতি—জীবনানন্দর চিন্তাকে দখল ক'রে আছে চিন্তার এই সূত্রগুলিই। এই কবিতাগুলির চিত্রকল্প প্রধানত সংগ্রহ করা হয়েছে প্রাকৃতিক বা নৈসর্গিক জীবন ও দ্বিতীয়ত 'দৈহিক অনুভূতি'র প্রগাঢ় জগৎ থেকে। জীবনানন্দ যে বিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে, ভিড় নোংরা ও ব্যস্ততায় ভরা একটি শহরে বাস করেন, তা এই কবিতাগুলি থেকে বোঝবার কোনো উপায় নেই। বিচিত্র ও বিক্ষুব্ধ নাগরিক জীবনযাত্রা তাঁর চিন্তা বা অনুভূতিকে মূর্ত

করার বিশেষ কোনো উপাদান এখনো জোগায়নি। তাই তাঁর কবিতা পড়ে মনে হয় যে তিনি কোনো-এক চিরগোধূলির জগতে বাস করেন, তাঁর কবিতার ঋতু হেমন্ত, এবং সেই হৈমন্তী গোধূলিতে প্রেম ও মৃত্যু, সময় ও দেহ, ইতিহাস ও রূপকথা মিলে-মিশে একাকার হ'য়ে গেছে। দৃষ্টান্ত হিশেবে 'সিন্ধুসারস' কবিতাটিকে লক্ষ করা যাক। যদি ইংরেজি কবিতার কথা অপ্রাসঙ্গিক না হয় তবে বলা চলে যে শেলির 'স্কাইলার্ক' বা কীটসের 'নাইটিঙ্গেল ওড'-এর সঙ্গেও এই কবিতাটির তুলনা চলে। কবি নিজে ক্লান্ত ও বেদনার্ত ; কিন্তু পাখিটি যেহেতু চিন্তার ও স্মৃতির জগতে বাস করে না, তাই সে সমস্ত ক্ষয় ও দুঃখবোধের উর্ধ্বে। এই পাখিটি নিশ্চিন্ত আনন্দময় দৈহিক সত্তার প্রতীক ; কিন্তু কবি নিজে পৃথিবীর যাবতীয় ক্ষয়ক্ষতির দ্বারা আক্রান্ত। পাখির ক্রীড়াস্থল সমুদ্র, যা একই সঙ্গে জীবন ও অমানবিক কালস্রোতের ভাঙা-গড়ার ওঠা-পড়ার প্রতীক। আবার আরেক দিক থেকে 'সিন্ধুসারস' কবির ছেলেবেলারও প্রতীক ('আমারি শৈশব আজ আমারেই আনন্দ জানায়')—সেই ছেলেবেলা, যখন তাঁর কোনো সুখচিন্তাই দুঃখের দ্বারা স্পৃষ্ট ছিলো না। কবিতাটির টানাপোড়েন গ'ড়ে উঠেছে দুটি জগতের প্রতিতুলনায় ;—পাখি ও মানুষ, সমুদ্র ও পৃথিবী, সিন্ধুসারসের উল্লাস ও কবির ক্লান্তি—এদের সমান্তর ও প্রতিতুলিত উপস্থাপনাই কবিতাটির মধ্যে আন্দোলন জাগিয়ে দেয়। কিন্তু যে-বেদনা বা ক্লান্তির কথা জীবনানন্দ বারবার উল্লেখ করেছেন এবং যা তাঁর ঈর্ষাতুর অভিনন্দনের কারণ, তা একটি 'সিন্ধুসারস'কে উদ্দেশ করে উচ্চারিত ও অভিব্যক্ত হয়েছে ব'লেই আমাদের কাছে অত্যন্ত গীতময় ঠেকে। ক্লান্তির সঙ্গে মলিনতা বা বেদনার যে-তীব্রতার অনুষঙ্গ আমরা সাধারণত মেনে নিই, এই ধরনের ক্লান্তি বা বেদনাতে তা নেই ; সব কিছু মেনে নেবার পরেও এখানে তা রমণীয় এবং কবি অল্প একটু বেদনাবিলাসী। সেটা স্পষ্ট ধরা পড়ে তাঁর বক্তব্যে নয়, তাঁর চিত্রকল্প নির্বাচনে—যেমন এই পঙক্তিগুলোতে :

> ...অথবা রক্তের পথে পৃথিবীর ধূলির ভিতরে
> হে সিন্ধুসারস,
> জান নাক', আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মত ঝরে ;
> সৌন্দর্য্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে ;
> গভীর নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের,—ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন
> হেমন্তের কুয়াশায় ফুরাতেছে অল্পপ্রায় দিনের মতন।
>
> (সিন্ধুসারস)

ধর্ষিত সৌন্দর্য বা অতীতের জন্য কবির যে-ক্ষোভ তা 'মুখশ্রী মাছির মত ঝরে' বলাতে কিছুটা তীব্রতা ও 'উদ্ভট রহস্যময়তা' প্রকাশ ক'রে কাঞ্চী বিদিশার নামের রোমান্সে হারিয়ে গিয়েছে। যে-সৌন্দর্য নিত্য ধ্বংস হচ্ছে তা আমাদের কাছ থেকে দূরে চ'লে গিয়ে, দোলা-লাগা, ঐতিহাসিক, রহস্যময় ও অর্ধালোকিত দুটি নামে আশ্রয় নিয়েছে। মানুষের 'ইচ্ছা বা চেষ্টা' সম্পর্কেও বলা যায় যে তাকে নীল নামক রোমান্টিক ও বিধুর রঙে ছুপিয়ে নিয়ে জীবনানন্দ প্রাত্যহিকতা থেকে সরিয়ে দিয়েছেন। 'ইন্দ্রধনু ধরিবার ক্লান্ত আয়োজন' এই বাক্যাংশের মধ্যে মানুষের অসম্ভবকে পাবার আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত শীতল রূপকল্পের পোষক পথে এসেছে। এবং শোকের ও ক্ষোভের সমস্ত তীব্রতার উপর টানা রয়েছে 'হেমন্তের কুয়াশার চাদর', যার উল্লেখমাত্রই আমরা বর্তমান কবিতা ছেড়ে চ'লে, যাই বাংলার গ্রামে, প্রকৃতিতে ও জীবনানন্দর বিশেষ 'ল্যান্ডস্কেপ'-এ। কবিতাটির প্রায় সমস্ত চিত্রকল্পের

আবেদন আমাদের দৃষ্টিশক্তির কাছে—কাজেই যদিও 'ক্ষতি আমাদের ক্লান্ত ক'রে দিয়ে গেছে' তবু তা গহন ব'লে আমাদের পক্ষে পুরোপুরি হতাশ হয়ে পড়া সম্ভব নয়। কেননা 'গহন' কথাটির অনুষঙ্গ রহস্যময়। 'অনেক যুগ' যখন সোনার ধানের মতো ঝ'রে যায় তখনও আমাদের মন একটি ছবিতেই নিবদ্ধ থাকে—ইতিহাসের গতিময়তায় নয়। সাধারণ শব্দ বা প্রাত্যহিক নিসর্গ থেকে জীবনানন্দ যে কতটা অর্থ, শারীরিকভাবে স্পর্শ করার ক্ষমতা ও অভিজ্ঞতার নির্যাস নিংড়ে নিতে পারতেন, তার উদাহরণ 'ঘাস' কবিতাটি। ছোটো বলে কবিতাটিকে এখানে সম্পূর্ণ তুলে দিচ্ছি :

কচি লেবুপাতার মত নরম সবুজ আলোয় পৃথিবী ভ'রে
গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবীর মত সবুজ ঘাস,—তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মত
গেলাসে গেলাসে পান করি
এই ঘাসের শরীর ছানি,—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড়
ঘাস-মাতার শরীরের সুস্বাদু অন্ধকার থেকে নেমে।

(ঘাস)

এই ছোট্ট কবিতাটিতে জীবনানন্দর প্রথম পর্যায়ের চিত্রকল্প চরম উৎকর্ষের সঙ্গে ব্যবহৃত হয়েছে। যে বোবা জন্তুর মতো আকাঙ্ক্ষা তাঁকে চঞ্চল করেছে তা আমাদের কাছেও পৌঁছেছে—ইন্দ্রিয়নির্ভর চিত্রকল্প নির্মাণে তাঁর দখল এতদূর। প্রতিটি চিত্রকল্প দিয়ে আমাদের শারীরিক আকাঙ্ক্ষা, প্রকৃতিতে নিঃশেষে ও নিবিড়ভাবে মিশে যাবার উৎকাঙ্ক্ষা ও দৃশ্য স্পর্শ ও ঘ্রাণের ইন্দ্রিয়দের সজাগ ক'রে দিয়েছেন তিনি। আমাদেরও চিন্তার জগৎ ছেড়ে সম্পূর্ণ দৈহিক আস্বাদের জগতে প্রবিষ্ট হবার ইচ্ছে জেগে ওঠে। সাধারণভাবে এই ধরনের কবিতায় জীবনানন্দ এমন কতগুলি চিত্রকল্প রচনা করেন যা অত্যন্ত সজীব ও স্পর্শসহ। খুব একটা পুঙ্খানুপুঙ্খ উদাহরণ না-দিয়েও আমি কিছু চিত্রকল্পের কথা বলছি যা এক ডাকে জীবনানন্দর ব'লে চেনা যায়। যেমন : একটি নারী, মৃত বা জীবিত—যার চুল খুব লম্বা, মুখ আধো আলোয় আধো অন্ধকারে রহস্যময়ী —সেই নারী যুগপৎ ইতিহাসে ও সমসাময়িক পৃথিবীতে বাস করে ; আর আছে দীর্ঘ পথ, উত্তাল সমুদ্র, মাঠ, খেত, সোনার ধান, জ্যোৎস্নার হরিণেরা, ধানসিঁড়ি নদী, চোরকাঁটাভরা মাঠ, সোনালি ডানার চিল, বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ, চিতাবাঘ, ডিমের মতো চাঁদ, ধূসর প্যাঁচা, আকাশ রৌদ্র পাখি ও তার প্রবালপঞ্জরের মতো ডানা, বাবলা, অশথ, শিশির, কুয়াশা, হিম ইত্যাদি। সব কটি চিত্রকল্পই হয় আদি-রূপাত্মক, নয়তো আমাদের ইন্দ্রিয়কে অত্যন্ত প্রবলভাবে সক্রিয় ক'রে তোলে। কখনো-কখনো কিছু মিশ্র চিত্ররূপও ব্যবহার করেন জীবনানন্দ, যার ফলে বার-বার আক্রান্ত হ'য়ে আমাদের এক ধরনের ইন্দ্রিয়-বিপর্যয় ঘটে। যেমন :

হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে,
দিগন্ত-প্লাবিত বলীয়ান রৌদ্রের আঘ্রাণে,

মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মত অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব
রোমশ উচ্ছ্বাসে,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়!

(হাওয়ার রাত)

এইসব ক্ষেত্রে নিজেদের যদি আমরা শুধু নিশ্চিন্ত প্রতিক্রিয়ার হাতে ছেড়ে দিই, তাহ'লেই একটি স্থির অর্থে পৌঁছতে পারি।

আরো লক্ষণীয় ঃ এই কবিতাগুলিতে জায়গার ও বহুবিধ তৈজসপত্রের নামের ব্যবহার। সিংহল, শ্রাবস্তী, বিদিশা, মালয়, এশিরীয়, মিশর, বঙ্গোপসাগর, বেরিন তরঙ্গ, পারস্যগালিচা, কাশ্মীরি শাল, বেরিন তরঙ্গের নিটোল মুক্তা প্রবাল—এই সব নাম ঘুরে-ঘুরেই আসে। এই নামগুলি ব্যবহার করাতেই কবিতাগুলি ইতিহাসের ও অতীতের রহস্যের ভারে ইন্দ্রিয়ঘন হয়ে ওঠে—ফলে তারা শুধু বিশেষ কোনো অর্থ বর্জিত চিহ্ন মাত্রই থাকে না—তাদের অনুষঙ্গের দ্বারা অর্থপূর্ণ ও অর্থদ্যোত হ'য়ে ওঠে। ইতিহাস ও অতীত জীবনানন্দর কাছে এখনো রহস্যময়—

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী,
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা...
কক্ষ ও কক্ষান্তর থেকে আরো দূর কক্ষ ও কক্ষান্তরের
ক্ষণিক আভাস,—
আয়ুহীন স্তব্ধতা ও বিস্ময়!

(নগ্ন নির্জ্জন হাত)

'মহাপৃথিবী'র দ্বিতীয় পর্যায়ের কবিতায় রয়েছে ইতিহাসে ও নাগরিক জীবন। সিংহল সমুদ্র বা মালয় সাগর পরিক্রমা নয়—জীবনানন্দ হাঁটছেন 'কলকাতার ফুটপাথ থেকে ফুটপাথে' ঃ তাঁর নিজস্ব নৈসর্গিক জীবন অনেক দূরে কোথায় হারিয়ে গিয়েছে ঃ

কোন্ দূর সবুজ ঘাসের দেশ নদী জোনাকীর কথা মনে পড়ে আমার,—
তারা কোথায়?
তারা কি হারিয়ে গেছে?
পায়ের তলে লিক্‌লিকে ট্রামের লাইন,—মাথার ওপরে অসংখ্য জটিল তারের জাল
শাসন করছে আমাকে।
গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ছে কেমন যেন ঠাণ্ডা বাতাস...

(ফুটপাথে)

ঠাণ্ডায় কেঁপে-কেঁপে উঠে 'আদিম সর্পিনীর সহোদরা'র মতো ট্রামলাইন ধ'রে হাঁটতে-হাঁটতে প্রকৃতির সাযুজ্যে সুন্দর একটি জীবনের কথা ভাবছেন জীবনানন্দ। তাঁর কোনো-এক সময়ের জগৎ, নক্ষত্র, হলুদ পেঁপের পাতা, পাখি, আমলকী শাখা, নীল শিশির প্যাঁচার সুর ও মৃত সবুজ সুন্দর কোমল একটি দেয়ালি পোকার মতো পৃথিবী—এই সব কিছুর কথাই তিনি ভাবছেন, কিন্তু তাঁর সব সযত্ন ভাবনাই অবশেষে নঞর্থক, কেননা 'সৃষ্টিকে গহন কুয়াশা ব'লে বুঝতে পেরে' তাঁর চোখ নিবিড় হ'য়ে উঠবে না।' তাঁর এখনকার 'প্রার্থনা' এই নিজস্ব ধূসর/রঙিন জগতে ফিরে যাওয়া নয়। তিনি বলেন ঃ 'আমাদের প্রভু বীক্ষণ দাও.../আমাদের প্রভু বিরতি দিও না; লাখো লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে/মনোবীজ দাও...' শুধু নিজে বা প্রাকৃতিক পৃথিবী নয়, এবার তাঁর কবিতার বিষয়বস্তু

সমস্ত সভ্যতা : 'পিরামিড যারা গড়েছিল একদিন— আর যারা ভাঙে—গড়ে—'। 'ঘাস' বা 'বুনোহাঁস' কবিতার সঙ্গে তুলনা করলে 'প্রার্থনা'র চিত্রকল্পের বিরলতা চোখে পড়ে : পিরামিড, মশাল, আকাশ, দেশলাই, ডিনামাইট, পর্বত।

'ইহাদেরি কানে' কবিতাটিতে একটি তিক্ত ব্যঙ্গ আছে, যার মূল সুর নাগরিক। চিত্রকল্প এখানেও সামান্যরূপাত্মক, যেমন সুন্দরীদের কথা উল্লেখ করা হয়েছে সাধারণ অর্থে, বিশেষীকরণের কোনো চেষ্টাই নেই, যুবকেরাও অবয়বহীন, আর নক্ষত্রদের উল্লেখ এখানে খুব-একটা অর্থদ্যোতক নয়। আস্ত কবিতাটি দাঁড়িয়ে আছে একটি তুলনার উপর : সুন্দরীদের বলা হয়েছে 'এইসব বধির নিশ্চল/সোনার পিত্তল মূর্ত্তি'।

'সূর্য্যসাগর তীরে', 'মনোবীজ', 'পরিচায়ক', 'বিভিন্ন কোরাস', 'প্রেম অপ্রেমের কবিতা', প্রত্যেকটিতেই জীবন, ইতিহাস বা শুদ্ধির সম্বন্ধে জীবনানন্দ সন্দিগ্ধ, অবিশ্বাসী। স্বাভাবিক সবকিছু আজ ক্রমশ নাগালের বা উপলব্ধির বাইরে চ'লে যাচ্ছে। 'মনোবীজ' কবিতাটিতে প্রথমেই বোঝানো হয়েছে নিসর্গের ও মানবপৃথিবীর দূরত্ব। এই জামিরের বন রচনা করতে কোনো মানুষের হাত লাগেনি, আর বেশির ভাগ মানুষের ভাগ্যই এই যে :

> তাহারা মৃত্যুর পর জামীরের বনে জ্যোৎস্না পাবে নাক' খুঁজে ;
> বধির ইস্পাত-খড়্গ তাহাদের কোলে তুলে নেবে। (মনোবীজ)

পৃথিবীর সঙ্গে স্বাভাবিক সম্পর্ক আর সম্ভব নয়। যদিও—

> সেই মুখ এখনও দিনের আলো কোলে নিয়ে করিতেছে খেলা— (খেলা)

তবুও জীবনে তো নয়ই এমনকি মৃত্যুতেও তাকে পাওয়া যাবে না। কবি ও পৃথিবীর সৌন্দর্যের মধ্যে এক ব্যবধান সৃষ্টি হয়েছে, অতএব একমাত্র চিন্তা বা জ্ঞানেই তাঁকে আশ্রয় নিতে হয় ; তাই—

> হৃদয় প্রবেশ করে প্যাগোডার ছায়ার ভিতরে
> অনেক ধূসর বই নিয়ে। (মনোবীজ)

এবং জ্ঞান সম্বন্ধেও তিনি সন্দিহান, কেননা তাঁর মনে হয়—

> একদিন সমুদ্রের কালো আলোড়নে
> উপনিষদেরও শাদা পাতাগুলো ক্রমে ডুবে যাবে... (মনোবীজ)

রাজহাঁস, বুনোহাঁস—বা সাধারণ হাঁসই—ইতিপূর্বে ও জীবনানন্দর কবিতার বিষয় হয়েছে—'আমি যদি হতাম' কবিতায় উদ্দাম আনন্দময় বন্য জীবনের প্রতীক হিশেবেও ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু 'পরিচায়ক' কবিতায় জীবনকে এমন এক হংসীর সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে যা পরম পবিত্রতার প্রতীক। এই জীবনহংসী কৃপণের ঘরে সোনার ডিম রেখে যায়। এই সোনার ডিম—জীবনের সব বিচিত্র সম্ভাবনার রূপকল্প। কিন্তু শেষ পর্যন্ত 'পরিচিত বিস্ময়ে' মন দৃঢ় হ'লে গৃহস্থ আর এই হংসীকে চায় না—তাকে নির্বাসিত করা হয় ছবির বইয়ে, রূপকথার জগতে। কিন্তু মানুষ জীবনের বিস্ময় বা শুদ্ধতাকে গ্রহণ করতে পারে না ব'লেই যে তা মিথ্যে হ'য়ে যায়, তা নয়। তাই—

> দুপুরে সূর্যের পানে বজ্রের মতন কলরব
> কণ্ঠে তুলে ভেসে যায় অমেয় জলের অভিযানে। (পরিচায়ক)

জীবনানন্দ যদিও এই হংসীর প্রতীকের সঙ্গে পরিচিত তবু তিনিও তাঁর 'প্রিয় অলোকসামান্য সুর' থেকে স'রে এসে 'প্রান্তরের অন্ধকারে' দাঁড়িয়েছেন। সেই অন্ধকার মাঠে, অন্ধকার অনিশ্চিত এক আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে, তিনি এক অদ্ভুত নিস্তব্ধতার মুখোমুখি হ'য়েছেন 'হৃদয়কে ক্রমেই নীরব হতে বলে'। কোন-এক অসম্ভব সৌন্দর্যের আকাঙ্ক্ষায় তাঁর মন অস্থির হয়েছে—'যেন কোনো ইন্দ্রধনু পেয়ে গেলে খুসি হ'ত মন'। কিন্তু তিনি অবশ্যই জানেন যে এই দুর্যোগের 'মহৎ আঁধারে' সেই সৌন্দর্য তাঁর কাছ থেকে অনেক দূরে—এমনকি প্রভাতেও গোধূলির মতো অন্ধকারের সূচনা—সেই ভয়াবহ প্রভাতের রক্তচ্ছটা পরিত্রাণের বদলে এক ভাঁড়কে ব'য়ে নিয়ে আসে। সমস্ত যুগ, শতাব্দী বা ইতিহাস তাঁর চোখে আজ এক 'ভাস্বর আগুনে' প্রজ্বলিত : 'সময়ের ইসারায় অগণন ছায়া-সৈনিকেরা/আগুনের দেয়ালকে প্রতিষ্ঠিত করে', আর 'দেয়ালের পরে যদি বানর, শেয়াল, শনি, শকুনের ছায়ার জীবন/জীবনকে টিটকারি দিয়ে যায়' তবু কবির এক নিষ্ঠুর বিশ্বাস যে এই ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই হয়তো চিত্তশুদ্ধি ঘটবে—'গর্ভাঙ্কে ও অঙ্কে কান কেটে কেটে নাটকের হয় তবু শ্রুতি-বিশোধন'।

এই একই জীবনদর্শন প্রতিফলিত হয়েছে 'বিভিন্ন কোরাস' ও 'প্রেম অপ্রেমের কবিতা'য়। আপ্রাণ চেষ্টা ক'রে কবি কোনোমতে জীবনের উপর তিলমাত্র বিশ্বাস রেখেছেন, তবে তাঁর দৃষ্টি ভবিষ্যতের দিকে নিবদ্ধ নয়, অনিশ্চিত অন্ধকার হৃদয়হীন বর্তমানই তাঁর সমস্ত চেতনা অধিকার ক'রে রয়েছে।

এখন আমাদের লক্ষ করতে হবে কীভাবে বা কোন ধরনের চিত্রকল্পের মাধ্যমে তাঁর মানসিক পরিবর্তন ও ভয়াবহ বিশ্ববীক্ষণ জীবনানন্দ আমাদের বোধগম্য করেছেন। প্রথমত, এই কবিতাগুলিতে তুলনামূলকভাবে ছবির অভাব ও চিন্তার আধিক্য লক্ষণীয়। প্রথম পর্যায়ের কবিতাগুলিতে জীবনানন্দর মনের গতি প্রতিটি ধাপে একটি ক'রে ছবির মাধ্যমে আমাদের কাছে স্পষ্ট হ'তো। চিত্রকল্পহীন পরপর পাঁচ-ছটি পঙক্তি সেই সব কবিতায় অচিন্তনীয়। কিন্তু 'মনোবীজ' কবিতাটিতে সাধারণত চিত্রকল্পের উপস্থিতি সত্ত্বেও এমন এক-একটি অংশ আছে যেখানে কেবলমাত্র ধারণাগ্রাহ্য (কনসেপটুয়াল) ভাষার বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে, এই পর্যায়ের অন্য কবিতাগুলির ক্ষেত্রেও এ-কথা প্রযোজ্য। প্রথম দিকের কবিতার সঙ্গে আরো-একটি তফাৎ : এখন আর কবিতাগুলি আমাদের ইন্দ্রিয়ের সর্বাঙ্গীণ সাড়া দাবি করে না, এবং কখনো-কখনো চিত্রকল্পের উপস্থিতি সত্ত্বেও জীবনানন্দর বক্তব্য বা চিন্তাসূত্র অনুধাবন করার চেষ্টায় বিরতি দিয়ে শুধু চিত্রকল্প উপভোগ করার অবকাশ আমাদের থাকে না। এখানে জরুরি হবে বলা যে, কোনো কবিতার পক্ষে বক্তব্যসর্বস্ব হওয়া অবশ্যই গৌরবের কথা নয়। তবে বক্তব্য বলতে আমি এটা বলতে চাচ্ছি না যে জীবনানন্দ তাঁর কোনো-এক প্রিয় দার্শনিক তত্ত্ব আমাদের বোঝাবেন ব'লে কবিতার ছলে বক্তৃতা করছেন। বরং মনে হয় যে জীবন সম্বন্ধে তাঁর এমন-কোনো গভীর উপলব্ধি হয়েছে যে সব সময় স্বচ্ছ চিত্রকল্পের মাধ্যমে তা তিনি উপস্থাপিত করতে পারছেন না। তাঁর লেখায় এক ধরনের জটিলতা বা অস্বচ্ছতা এসেছে যা এই শেষ দিকের কবিতাগুলি নিয়ে আমাদের বিস্তর ভাবায়, কখনো সুস্পষ্টভাবে মনস্থির করতে দেয় না। শেষের এই কটি কবিতায় তাঁর প্রজ্বলিত হৃদয়ের বোধ আগ্নেয়গিরি-উৎসারিত লাভার মতো সবকিছু ছাপিয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। এক ভয়াবহ কালক্রম ও ঐতিহাসিক বিপর্যয় সহসা প্রত্যক্ষ ক'রে তিনি যেন কোনো যথাযোগ্য ও পরিশীলিত ভাষা একটানা ব্যবহার করতে পারছেন না।

নতুন ব্যবহার করা, বা আগেকার লেখায় স্বল্প ব্যবহৃত, চিত্রকল্পের একটি ছোটো তালিকা দিয়ে আমি তাঁর নতুন কবিতার পুরোনো চিত্রকল্পের প্রয়োগপদ্ধতি পরীক্ষা করতে চাই। প্রথম দলভুক্ত চিত্রকল্পের মোটামুটি তালিকা এই ঃ অ্যামিবা, পিরামিড, ডিনামাইট, দেশলাই, ট্র্যামলাইন, পরিব্যস্ত বন্দর, জাহাজ, মাস্তুল, প্যাগোডা, শাণিত নির্জন নদী, বিকলাঙ্গ নদী, সমুদ্রের কালো আলোড়ন, উপনিষদের শাদা পাতা, নীলিমা, সূর্য, আকাশ, রৌদ্র, নারী, অন্ধকার, জল, আগুন, শাণিত সাপের মতো ক্রান্ত ইতিহাস, দোভাষী, হাতের আয়ুর রেখা, মানুষমনীষী, ছায়া-সৈনিক, ভিড়, জনতা, নগরীর পিতা বা পিতামহ, সন্তান, চক্রাকারে ঘূর্ণ্যমান কাল, খচ্চর, জ্যামিতিক রেখা, মূর্খ রূপসী, অন্ধকার ভগ্নপ্রাসাদ, সময়ের কীট, জীবনের বিষ, মাটি, ধূলিকণা, জীবাণু, কাস্তে, কৃষক, প্লেন, সৈকত, বেড়ালের বিকশিত হাসি—ইত্যাদি। তালিকা আরো বাড়ানো যায়, কিন্তু আমাদের বক্তব্য উপস্থাপিত করার পক্ষে এটুকুই যথেষ্ট। তবে এই তালিকার শব্দশ্রেণী সম্বন্ধে কিছু প্রাসঙ্গিক মন্তব্য প্রয়োজন। এক, সাধারণ বিশেষ্য শব্দের ব্যবহার—নীলিমা, অ্যামিবা, সূর্য, আকাশ, আগুন, জল, সৈকত, অন্ধকার, মানুষমনীষী, ছায়া-সৈনিক, রৌদ্র, প্রেম, নারী, সন্তান ইত্যাদি। প্রথম দিককার কবিতা হ'লে এই বিশেষ্যগুলিকে তিনি নানা বিশেষণে ভূষিত ক'রে ব্যক্তিগত দেখার ধরণটি বা 'মুড'টি আমাদের কাছে তুলে ধরতেন। কিন্তু এখানে তিনি বেশ-কিছু শব্দের ইন্দ্রিয়ঘনত্ব কমিয়ে তার অভিধাটি ফুটিয়ে তুলতেই বেশি উৎসুক। তাঁর বক্তব্য বা উপলব্ধি যত জটিল হয়েছে, উপস্থাপনার বাহুল্যও তিনি ততই কমাতে চেয়েছেন। এই শব্দগুলি এমন যে তারা কখনোই তাদের হ্রস্বতম ব্যঞ্জনার ক্ষমতা হারায় না অথচ মনকেও বিক্ষিপ্ত হ'তে দেয় না। সেদিক থেকে দেখতে গেলে শব্দগুলি প্রায়ই আদিরূপাত্মক হ'য়ে ওঠে এবং জীবনানন্দর ব্যক্তিগত আবেগ দ্বারা রঞ্জিত না হ'য়েও আমাদের গোষ্ঠীগত অবচেতনায় গিয়ে অমোঘভাবে আঘাত করে। তাছাড়াও এ-সব শব্দের প্রয়োগ ও উপস্থাপনার রীতির মধ্যে পৃথিবী বা ইতিহাসকে একসঙ্গে দেখবার একটা চেষ্টা চোখে পড়ে। পৃথিবীর রূপ বা মানুষের অবস্থাকে ভেঙে-ভেঙে না-দেখে সম্পূর্ণ ক'রে দেখতে গেলে, অখণ্ডভাবে দেখতে গেলে পুরাণরচনার ক্ষমতার চেয়ে চেতনাসৃষ্টির ক্ষমতার উপরেই বেশি জোর দিতে হয়। রাষ্ট্রভাষা, দোভাষী বা আলোচনার টেবিলের চিত্রকল্পের ব্যবহার জীবনানন্দর নাগরিক চেতনাকে প্রকাশ করে। তাঁর কবিতায় এ-সব শব্দের উপস্থিতি তুলনায় আগের চেয়ে বেশি।

যে-সব পুরোনো চিত্রকল্পকে তিনি নতুনভাবে ব্যবহার করেছেন তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি চোখে পড়ে ঃ হংসী, পুরোনো প্রাসাদ, রাত্রি, অন্ধকার ও ভাঁড়। হংসী বা রাজহাঁস উন্নীত হয়েছে প্রজ্ঞা ও পবিত্রতার প্রতীকে, আর এক সময়ের রঙিন রহস্যময় প্রাসাদ আজ অন্ধকার ও ভগ্ন—ইতিহাসের ভুক্তাবশিষ্ট। যে-নদী এত রোমান্টিকভাবে শর, কাশ, হোগলায় আচ্ছন্ন ছিলো, বা ছিলো হলুদ, নরম ও কুয়াশাচ্ছন্ন—তা এখন কখনো শাণিত নির্জন, কখনো বা বিকলাঙ্গ। আর একটি ভাঁড়ের ছবি জীবনানন্দর তো খুবই প্রিয়। তিনি আগেও অনেক কবিতায়—যেমন 'অবসরের গান'-এ (ধূসর পাণ্ডুলিপি)—এই ভাঁড়কে করেছেন কবির প্রতীক। সে-সব ক্ষেত্রে এই ভাঁড়ের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হিশেবে যা প্রধানত চোখে পড়েছে, তা হচ্ছে তার সব কিছুকে হেসে মেনে নেবার ক্ষমতা বা তার কল্পনাশক্তি—গল্পবলার পদ্ধতি। 'পরিচায়ক'-এও ভাঁড়ের উল্লেখ রয়েছে ঃ 'বিদূষক বামনের মত হেসে একবার চায় শুধু হৃদয় জুড়াতে' বা 'উঠে আসে প্রভাতের গোধূলির রক্তচ্ছটা রঞ্জিত ভাঁড়'। এই ভাঁড় তার গ্রাম্য জীবন ছাড়িয়ে বহু দূরে চলে এসেছে, পরে

তাকেই দেখা যাবে 'পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর 'পরে অভিভূত ব'সে থাকতে। গ্রামের লোকের অবসর বিষণ্ণ বা মধুর গানে-গাথায় ভ'রে দেয়া আর তার কাজ নয়। সে এখন রাজসভার বিদূষকের মতো—তার কাজ হচ্ছে সৃষ্টির গম্ভীর ও শোকাবহ মূঢ়তা নিয়ে বিদ্রূপ করা। কখনো-কখনো সেই ভাঁড় নিজেই একটি মূর্তিমান বিদ্রূপ—ইতিহাসে কোথাও আর উদ্দেশ্য বা তাৎপর্য বা গাম্ভীর্য নেই আর—তার বদলে মূর্খ কান্ডজ্ঞানশূন্য এক বিদূষক তার প্রতীক হয়েছে।

প্রসঙ্গত ঘোড়ার চিত্রকল্প নিয়েও কিছু আলোচনা করা উচিত। 'পরিচায়ক'-এ জীবনানন্দ লিখেছেন ঃ

মর্‌খুটে ঘোড়া ঐ ঘাস খায়,—ঘাড়ে তার ঘায়ের উপরে
ঝিনঝিনে ডাঁশগুলো শিশিরের মত শব্দ করে।
এই স্থান হ্রদ, আর বরফের মত শাদা ঘোড়াদের তরে

ছিল তবু একদিন?

আর এই বইয়েরই অন্য কবিতা 'নিরালোক'-এ ঘোড়ার চিত্রকল্প এইরকম ঃ

কে যেন উঠিল হেঁচে,—হামিদের মর্‌খুটে কানা ঘোড়া বুঝি!
সারাদিন গাড়ী টানা হ'ল ঢের,—ছুটি পেয়ে জ্যোৎস্নায় নিজ মনে
খেয়ে যায় ঘাস।

'স্থবির-যৌবন' কবিতায় ঃ

তাহার ধূসর ঘোড়া চরিতেছে নদীর কিনারে
কোনো-এক বিকেলের জাফরান দেশে।

'আজকের এক মুহূর্ত' কবিতায় ঃ

যে ঘোড়ায় চ'ড়ে আমরা অতীত ঋষিদের সঙ্গে আকাশে নক্ষত্রে উড়ে যাব
সেই সব শাদা শাদা ঘোড়ার ভিড়
যেন কোন জ্যোৎস্নার নদীকে ঘিরে
নিস্তব্ধ হয়ে অপেক্ষা ক'রছে কোথাও...

'নিরালোক' ও 'আজকের এক মুহূর্ত' কবিতায় ঘোড়াদের সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে 'পরিচায়ক'-এর ঘোড়া যেন তারই যোগফল এবং তার চেয়েও বেশি। 'হামিদের মর্‌খুটে 'কানা ঘোড়া'র মতো এই 'মরখুটে কানা ঘোড়া'ও বাস্তবের বাসিন্দা। ঘায়ের ঝিনঝিনে ডাঁশরা প্রাণীটিকে আরো সজীব ক'রে তুলেছে। অথচ সেই ক্লান্ত বুড়ো ঘোড়ার প্রতি-তুলনায় রয়েছে বরফের মতো শাদা ঘোড়া যারা অতীতের ও কল্পলোকের বাসিন্দা—ও অবাস্তব। 'আজকের এক মুহূর্ত'তে যদিও সেই ঘোড়াদের চোখে দেখা যাচ্ছে না, তবু তাদের অস্তিত্ব সম্বন্ধে জীবনানন্দর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে সেই সব ঘোড়া শুধু চোখের আড়াল হ'য়ে কোনো জ্যোৎস্নার মধ্যে অপেক্ষা ক'রে নেই—তারা এমনকি কল্পনারও অতীত। যে-শাদা ঘোড়া আগের বর্ণনায় কেবল ছিলো চিত্ররূপ, এখানে তা নিঃসন্দেহে বেগ, শক্তি, এবং—শাদা ব'লেই?—পবিত্রতার প্রতীক।

'মহাপৃথিবী'র মধ্যে এমন-কিছু চিত্রকল্প আছে যা অর্থের বারুদে ঠাশাই ব'লে হঠাৎ খুব জোরে আঘাত করে। বাকি কবিতার গীতময়তার মধ্যে একটি অতর্কিত স্বেচ্ছাকৃত

কবিতাটির অভিঘাত তীব্রতর করে। যেমন তিনি যখন বলেন :

> 'পৃথিবীর সমস্ত রূপ অমেয় তিমির মৃতদেহের দুর্গন্ধের মত'

বা

> 'ব্যবহৃত হয়ে শূয়ারের মাংস হয়ে যায়?'—

তখন আমরা সত্যিই একটা মস্ত নাড়া খাই। রূপ, বা সৌন্দর্য, সম্বন্ধে আমরা সাধারণত স্নিগ্ধভাবেই ভাবতে অভ্যস্ত ; সেখানে চিত্রকল্পের আড়ালে তার সঙ্গে এ-রকম বিবমিষা, ঘৃণ্য, ন্যক্কার জড়িয়ে গেলে, পাঠকের কাছে কেবল বর্ণনার আবেদনই পৌঁছোয় না, তার সঙ্গে অনুভূত হয় চিন্তার ও আলোড়িত অভিজ্ঞতার চাপ। এই কাব্যকৌশলটি পরের দিকের কবিতায় অনবরত ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন :

> এ-রকম চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
> সহসা খিঁচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত
> অন্য কোনো জ্যামিতির রেখা হতে পারে... (বিভিন্ন কোরাস)

কিংবা

> অল্পায়ু হিমের দিন ততোধিক মিহিন কামিজে
> কাটাতেছে যেন অগণন গিরেবাজ। (বিভিন্ন কোরাস)

অর্থের আধিক্য বা অদ্ভুত চিত্রকল্প অনেক সময়ে জীবনানন্দর শেষ দিকের কবিতায় একধরনের অস্পষ্টতা সৃষ্টি ক'রে যায়। যেহেতু শব্দগুলি প্রায়ই প্রতীক নয় এবং কবিতাগুলি মাত্রই রূপক নয়, এবং যেহেতু তাদের অভিপ্রায় হচ্ছে চেতনার উন্মোচন, তাই মাঝে-মাঝে কিছু চিত্রকল্প আমাদের ভাবায়, বা কখনো কবিতার স্বচ্ছতা একটু কমিয়ে দেয়। যেমন :

> ১। আমরা সকলে তবু সময়ের একান্ত সৈকতে
> নিজেদের অপরের সবায়ের জনমতামতে
> অনেক ডোডোর ভিড়ে ডোডোদের মত
> নেই—তবু র'য়ে গেছি স্বভাব বশত। (বিভিন্ন কোরাস)
>
> ২। বেড়ালের বিকশিত হাসির মতন রাঙা গোধূলির মেঘে...
> (প্রেম অপ্রেমের কবিতা)

এই দুটি চিত্রকল্পের ডোডো পাখি বা বেড়ালের হাসির ব্যবহার আমার কাছে অর্থদ্যোত নয়। 'ডোডো হচ্ছে একধরনের অধুনালুপ্ত প্রাগৈতিহাসিক পাখি যারা সম্ভবত দলে ভিড় ক'রে থাকতে ভালোবাসতো'—কিন্তু এখানে কবি তাদের উল্লেখ ক'রে ঠিক কী বোঝাতে চাচ্ছেন তা আমার কাছে স্পষ্ট নয়। আর বেড়ালটি হচ্ছে লুইস ক্যারলের চেশায়ার বেড়াল, যার সন্দেহজনকভাবে অতর্কিতে মিলিয়ে যাবার ক্ষমতা আছে ; বেড়ালটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে সে মিলিয়ে যাবার পরেও তার হাসিটুকু অনেকক্ষণ থেকে যায়। 'সাতটি তারার তিমির'-এর (১৩৫৫) 'সপ্তক' কবিতাতেও তার উল্লেখ আছে :

> জাফরান-আলোকের বিশুষ্কতা সন্ধ্যার আকাশে আছে লেগে :
> লুপ্ত বেড়ালের মত; শূন্য চাতুরীর মূঢ় হাসি নিয়ে জেগে।

এই বেড়ালই সেই বেড়াল কিনা যার সঙ্গে জীবনানন্দর ঘুরে-ফিরে প্রায়ই দেখা

হয়—সেটাও ভেবে দেখবার কথা। কিন্তু এই কবিতায় তার উপস্থিতি আমার কাছে খুব জরুরি নয়।

জীবনানন্দর চিত্রকল্পের আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে, যদি তাঁর কবিতায় বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহার আমরা লক্ষ না করি। কেবলমাত্র বিশেষণ ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারের ফলে তিনি তাঁর লেখায় এক ধরনের ঘনত্ব ও আবহাওয়া সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। প্রথম দিকের লেখার কিছু বিশেষ ব্যবহার যা আমার চোখে পড়েছে, তা উদ্ধৃত করছি : 'গভীর হাওয়ার রাত', 'নীলাভতম ইচ্ছা চেষ্টা মানুষের,' 'বেতের ফলের মত ম্লান চোখ,' 'শহরের বিপুল কিনারে,' 'বন্দরের নদী,' 'ধূসর পেঁচার মত ডানা,' 'নির্জ্জন পেঁচার মত,' 'দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা,' 'গম্বুজের বেদনাময় রেখা'... অগুনতি দৃষ্টান্ত থেকে মাত্র এই কটি বিশেষণের ব্যবহারই উদ্ধৃত করছি। পরের দিকের কবিতার আবহাওয়া যে অন্যরকম, একটা যে মস্ত মানসিক পরিবর্তন ঘটে গেছে, তা ধরা পড়ে বিশেষণ ও ক্রিয়ার প্রয়োগ লক্ষ করলে। যেমন, বিশেষণের ব্যবহার : 'ডাইনীর মাংসের মতন আজ তার জঙ্ঘা আর স্তন,' 'সৌন্দর্য্যের ভূতের মতন,' 'তক্ষিত সৌন্দর্য্য সব পৃথিবীর,' 'অনেক মেধাবী মুখ,' 'যা কিছু নিভৃত-ধূসর-মেধাবী,' 'পাথরের প্রাচীন ইচ্ছা,' 'অশিষ্ট মুকুর,' 'অমেয় জলের অভিযান,' 'ফুরফুরে আগুনের থান তবু কাঁচিছাঁটা জামার মতন মুক্ত হাতে' ইত্যাদি ক্রিয়াপদের ব্যবহারগুলোও—এলোমেলোভাবে হ'লেও—কয়েকটি তুলে দিচ্ছি : 'যদি তারা টেঁসে যায়/করাল কালের স্রোতে ধরা পড়ে গিয়ে,' 'গিয়েছে বস্তুর থেকে ফেঁসে,' 'সহসা খিঁচড়ে উঠে' ইত্যাদি।

পরের দিককার কবিতায় বক্তব্যের উপস্থিতির কথা বার-বার বলতে গিয়ে আমার মনে হয়েছে যে আমি জীবনানন্দ সম্বন্ধে ঠিক যা মনে হচ্ছে তা প্রকাশ করতে পারিনি। কবিতায় একটি বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি বা জীবনদর্শন আছে বললেই কিন্তু সেই লেখাকে বক্তৃতার সমতুল্য ব'লে মনে করার কোনো কারণ নেই। কেননা কবিতার কাজই হচ্ছে বুদ্ধিগ্রাহ্য জ্ঞানকে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধিতে পরিবর্তিত করা। জীবনানন্দ কখনোই কবির সেই মান থেকে দূরে স'রে আসেননি। বরং কবিতাগুলি যখন লেখা হচ্ছিলো, যুদ্ধকালীন সেই ভাঙন ও অস্থিরতার সময়ে, তিনি তাঁর তথাকথিত নির্জনতা থেকে জগতের ভগ্নস্তূপের দিকে তাকিয়েছেন ; এবং তাঁর চেতনা কাল ও ইতিহাসে ব্যাপ্ত হয়েছে, সাধারণ অর্থে মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ তাঁকে ভাবায়—এবং হয়তো সেই জন্যেই তাঁর চিত্রকল্পের শারীরিক আবেদন কিঞ্চিৎ হ্রাস পেয়ে গেছে। কিন্তু বর্ণনার খুঁটিনাটি ও অনুপুঙ্খ কমিয়ে স্পর্শসহ ও বস্তুময় আবহাওয়া সৃষ্টি করার একটি পদ্ধতি তিনি তাঁর প্রথমাবস্থা থেকে বজায় রেখেছেন। বিশেষণের গাঢ়, আশ্চর্য ও অতর্কিত ব্যবহার ও ক্রিয়াপদের লক্ষ্যভেদী, যথাযোগ্য ও চমকপ্রদ প্রয়োগে। তাঁর কবিতায় ধারণাগ্রাহ্য শব্দের ক্রমপ্রবেশ আমি আগেও উল্লেখ করেছি, কিন্তু এমন কিছু-কিছু ধারণা আছে যা সহজেই অনুভূতিগ্রাহ্য। সময় ও ইতিহাস—যেমন মানুষের বয়োপ্রাপ্তি, মরণশীলতা, নৈসর্গিক পরিবর্তন বা পচন ও ঘটনার উত্থান-পতন—বেশ স্পষ্টই অনুভব করা যায়।*

*এই রচনায় জীবনানন্দর কবিতার উদ্ধৃতিগুলো 'মহাপৃথিবী' বইতে যেভাবে ছাপা আছে সেভাবেই দেয়া হয়েছে। জীবনানন্দর জীবদ্দশায় আর-কোনো সংস্করণ হ'লে তিনি নিশ্চয়ই বানানের মধ্যে সংগতি আনতেন ও যথাযোগ্য মুদ্রণশোধন করতেন—কিন্তু যেহেতু বইটির আর-কোনো সংস্করণই হয়নি, সেই জন্যই হুবহু উদ্ধার করা ছাড়া আর-কিছু করা অসংগত হ'তো।

সাতটি তারার তিমির

অশোক মিত্র

আমরা, দশ বছর আগে যারা কৈশোরের বিস্ময়ভূমিতে ছিলুম, আধুনিক বাংলা কবিতার পাঠ শুরু করি প্রধানত 'কবিতা' পত্রিকার মধ্যবর্তিতায়। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করে বাংলা কবিতায় নতুন নিক্বণ দিতে তখন যে-নবসূরিরা অগ্রসর হয়েছিলেন, আমাদের কিশোরকল্পনাকে মুগ্ধ করেছিলেন তাঁরা প্রায় সবাই, কিন্তু অভিভূত করেছিলেন সম্ভবত মাত্র দু-জন ঃ জীবনানন্দ দাশ এবং সমর সেন। শেষোক্তজন আমাদের মনোহরণ করেছিলেন বোধ হয় তাঁর নির্দয়তা দিয়ে ঃ অপর পক্ষে জীবনানন্দর নিজস্বতা ছিলো এক আদিম অদ্ভুত হার্দ্যতা।

ভুলতে পারবো না, 'মৃত্যুর আগে' বা 'বনলতা সেন' প্রথম পড়ার অনুভূতি। ভুলতে পারবো না অশ্বত্থের উপদেশ, কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের মুখ। আজও হৃদয়ে শিহরণ তোলে ঘাইহরিণীর ডাক, মাঠের ফাটল, শিশিরের জল, কার্তিকের চাঁদ, শঙ্খমালা, হিজল বন, মালাবার পাহাড়ের কিনার, বসন্তের রাত্রির আকাশে পাখিদের কথা পরস্পর, ধানসিঁড়ি নদীর পাশে সোনালী-ডানা চিলের উতল-করা কান্না, লাসকাটা ঘরে চিৎ-হয়ে শুয়ে-থাকা পুরুষের রক্তের ক্রীড়মান বিপন্ন বিস্ময়, সন্ধ্যার নক্ষত্রের কাছে শান্তির রেখানুসন্ধান ঃ জীবনানন্দীয় পৃথিবীর সঞ্চিত অভিজ্ঞান আমাদের শিরায় ইশারায় সঞ্চরমান। অথচ তাঁর কৃতকর্মে ছন্দের কারুকলা নেই, শাণিত প্রকাশের প্রাকরণিক চাতুর্য নেই, আপাতদৃষ্টিতে মনে হয় মৃদু-নিস্তেজ শব্দরাজিকে শুধু পরস্পর স্থাপন করে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু মনোনিবেশ ঘটানো মাত্র আপাত-অবহেলায় বিন্যস্ত এই শব্দরাজির অভিভাবেই বিস্মিত হতে হয়। দেখা যায় ধূসরিমার ব্যঞ্জনা, সরলতার বিস্তারেই হৃদয়ের অনুলিখন।

সেই যে জীবনানন্দ তাঁর জাদু দিয়ে আমাদের আচ্ছন্ন করলেন, তার ঘোর কখনোই কাটলো না। জীবনানন্দীয় আবহসত্তাকে আত্মসাৎ করা অসম্ভব, কিন্তু তাঁর ব্যবহৃত প্রতীক, উপমা, উৎপ্রেক্ষা, এমন কি মাঝে মাঝে বাক্যাংশ পর্যন্ত পরবর্তীদের কাব্যোদ্যমে লক্ষণীয় ঃ এক দিকে থেকে রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কাব্যের প্রতিষ্ঠাবান পুরুষদের মধ্যে তাঁর এবং সমর সেনের প্রভাবই বোধ হয় ব্যাপ্ততম।

'সাতটি তারার তিমির' জীবনানন্দর সর্বাধুনিক কাব্যগ্রন্থ। দশ বছর আগেকার প্রগাঢ় বিহ্বল অনুভূতির স্মৃতিচারণে এখনো আমি অস্থির হয়ে উঠি, এবং স্বভাবতই তাঁর কবিতা পরিশুদ্ধ মুগ্ধতা নিয়েই পাঠ করা আমার প্রয়াস। সুতরাং তাঁর এই নতুন কাব্যগ্রন্থের চরিত্রলক্ষণাদি সম্বন্ধে যদি নিজের কয়েকটি উদ্বিগ্ন জিজ্ঞাসাকে ব্যক্ত করি, সে-উৎকণ্ঠার সংস্থান আমার আন্তরিকতাতেই।

জীবনানন্দর কাব্য, মনে হচ্ছে, কোনো নবতর আত্মাকে আহ্বানপ্রবৃত্ত। বিগত পাঁচ-ছ'

বছর ধরে বিভিন্ন সাময়িকপত্রে তাঁর যে-সব কবিতা প্রকাশিত হয়ে আসছে, তাদের অনুধাবনেই অবশ্য ধরা পড়ছিল যে পায়ের নিচের ঘাস স'রে যাচ্ছে। 'বনলতা সেন' এবং তার পূর্বে ও পরেও কিছুদিন পর্যন্ত তাঁর কাব্যে পর্যাপ্ত অর্থনির্মলতা ছিলো। সে-প্রসাদ ইদানীং লুপ্যমান ; তাঁর কাব্যগঠনে আজকাল প্রায়ই এক বিপজ্জনক দুরূহতা লক্ষ্য করি। 'সাতটি তারার তিমিরে'র অনেক কবিতারই অন্তর্ব্যঞ্জনার সঙ্গে, কিছুটা আত্মকরুণা নিয়েই বলছি, বার-বার নিজেকে সমন্বিত করার চেষ্টা করলাম, কিন্তু পরিশ্রম প্রতিবারই পণ্ডশ্রম। প্রতীকে, শব্দযোজনায়, বাক্যপ্রয়োগে বহুলতই নিজের পুনরুচ্চারণ এখানে তিনি করেছেন, এবং এই পুনরুক্তিতে কোনো অর্থের ব্যাপ্তি নিশ্চয়ই তাঁর অভিপ্রেত, কিন্তু সে-অর্থ, দুঃখের বিষয়, কোনো আপাতদার্শনিক সন্ধাভাষার অবচ্ছন্ন। ফলত, যা ছিলো তাঁর মোহিনী কুয়াশা, এখানে তা অস্বস্তিকর ধূম্রজালের মতো মনে হয়। পংক্তির অব্যবধান সত্ত্বেও চিন্তা বহুবিচ্ছিন্ন, এমন কি কোথাও কোথাও বাক্যরচনাও দুর্বল। কী বলতে চাইলে, চিত্তের কোন্ বিভঙ্গের প্রতি বর্তমানে তাঁর পক্ষপাত, কোন প্রতীকিতার অনুজ্ঞা এখন তাঁর মান্য, এই সব প্রশ্ন অন্ধ অক্ষেপে মাথা খুঁড়ে মরে।

কিঞ্চিৎ বিশ্লেষণপন্থী হবার চেষ্টা করছি ঃ জীবনানন্দ আদি অনুভূতির কবি, হৃদয়বেদনার ধূসর পদপাতেই তাঁর কাব্যের স্পন্দন। কখনো বিস্মিত শিশুর দৃষ্টি নিয়ে কখনো ক্লান্ত পথিকের নিঃসঙ্গতা নিয়ে তিনি জীবনকে দেখে এসেছেন, দেখেছেন প্রকৃতি, পৃথিবী, জীবজগত, মানবজীবন। তাঁর ভাষণে ছিলো এক নিষ্পাপ স্পষ্টতা, এক সহজ নির্ভঙ্গিমা, এবং এই শেষোক্ত গুণ তাঁর কাব্যের প্রভাবক্রিয়ার মৌল হেতু। কিন্তু 'সাতটি তারার তিমিরে' বিশুদ্ধ হৃদয়োচ্চারণ স্তব্ধপ্রায়। পক্ষান্তরে, জীবনানন্দ মননমুখাপেক্ষী হয়েছেন, কোনো আত্মদর্শনের জটিলতায় জড়িয়েছেন। এই দর্শনাশ্রয়ের ফলেই, মনে হয়, তাঁর ভাষণে বক্রতা এবং সেই সঙ্গে প্রসাদের অভাব এসেছে। আবেগের সঙ্গে মননের প্রকৃত সমন্বয় ঘটাতে পারলে কথাই ছিলো না, কিন্তু স্পষ্টতই সে-সঙ্গমকাহিনী এখানে শোকান্তিকা। অনেক ক্ষেত্রেই এই গ্রন্থের কবিতা রূপ নিয়েছে নিছক দার্শনিকতায় এবং সে-দর্শনও অবোধ্য। বুদ্ধদেব বসুর মতে জীবনানন্দর আত্মস্খলনের কারণ তাঁর সাম্প্রতিক তাৎকাল্যপ্রবণতা। আমার তো মনে হয় এই প্রাসঙ্গিক উপাখ্যান প্রধান তথ্যের মধ্যেই বিধৃত ঃ মননমুখিতার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী জড়িত তাঁর আদ্যতনিক অতিচেতনা।

কিন্তু সৌভাগ্যত, 'সাতটি তারার তিমিরে' স্মরণীয় কবিতার সংখ্যাও তুচ্ছ নয়। প্রাক্-পরিবর্তন পর্যায়ের যে-ক'টি কবিতা গ্রন্থটির অন্তর্ভুক্ত, তার অধিকাংশই উৎকৃষ্ট। বিশেষ ক'রে প্রথম কবিতা 'আকাশলীনা' একটি সম্পূর্ণ স্বচ্ছগীতল জীবনানন্দীয় মূর্ছনা।

> সুরঞ্জনা, অইখানে যেও নাক' তুমি
> ব'লো নাক' কথা অই যুবকের সাথে ;
> ফিরে এসো সুরঞ্জনা ঃ
> নক্ষত্রের রূপালি আগুন ভরা রাতে ;
> ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;
> ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;
> দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
> যুবকের সাথে তুমি যেও নাক' আর।...

জীবনানন্দর উপমাপ্রয়োগ প্রথম থেকেই বিস্ময়কর : সে প্রতিভা এখানেও কোথাও

কোথাও চমক দিচ্ছে। তা ছাড়া, অপার্থিব আবহসৃজনে তাঁর যে-নৈপুণ্য সর্ববিদিত, তার আভাসও অনুপস্থিত নয়। উদাহরণত উপমা ও প্রকল্পনার সহবাসে একটি সামান্য অনুভূতির যে-নিগূঢ় ভাস্কর্য নিচের পংক্তি ক'টিতে সংসাধিত, তা সম্ভবত অসামান্য :

যেই সব শেয়ালেরা জন্ম জন্ম শিকারের তরে
দিনের বিশ্রুত আলো নিভে গেলে পাহাড়ের বনের ভিতরে
নীরবে প্রবেশ করে,—বার হয়,—চেয়ে দেখে বরফের রাশি
জ্যোৎস্নায় প'ড়ে আছে ;—উঠিতে পারিত যদি সহসা প্রকাশি
সেই সব হৃদ্‌যন্ত্র মানবের মতো আত্মায় :
তা হলে তাদের মনে যেই এক বিদীর্ণ বিস্ময়
জন্ম নিত;—সহসা তোমাকে দেখে জীবনের পারে
আমারও নিরভিসন্ধি কেঁপে ওঠে স্নায়ুর আঁধারে।

'যেই সব শেয়ালেরা'।

'রিস্টওয়াচ' একটি ক্ষুদ্র চিন্তাসূত্রের চরম পর্যায়ের অভিব্যক্তি, মধ্যরাত্রে অন্ধকার মশারির পাশে শব্দ-ক'রে-যাওয়া ঘড়ির মতোই এর উচ্চারণ। 'সমারূঢ়'তে সমালোচকের চরিত্রণ স্মরণীয়, এবং সম্ভবত জীবনানন্দর এই একটিমাত্র কবিতাই বিদ্রূপাত্মক :

বরং নিজেই তুমি লেখ নাক' একটি কবিতা
বলিলাম ম্লান হেসে ;—ছায়াপিণ্ড দিল না উত্তর ;
বুঝিলাম সে তো কবি নয়,—সে যে আরূঢ় ভণিতা ;
পাণ্ডুলিপি, ভাষ্য, টীকা, কালি আর কলমের পর
ব'সে আছে সিংহাসনে,—কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক ;—দাঁত নেই—চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি;...

প্রথাগত পার্থিব উপাদানের সঙ্গে কিছু লঘুতা এবং কিছু রূপকথার অভিনব মিশ্রণ ঘটেছে 'রাত্রি' এবং 'লঘু মুহূর্ত' কবিতাদুটিতে। 'ভিখিরীকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্রবৌ সকলে নারাজ'—'লঘু মুহূর্তে' কয়েক ভিখিরীর এই সান্ধ্যপ্রতীতি প্রায় ভূয়োদর্শনের পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। 'হাঁস' কবিতার সহজ উন্মেষও উল্লেখ্য।

'জুহু'তে প্রত্যেকটি পংক্তির গঠন এমন সমৃদ্ধ, বাক্যযোজনা এমন সুন্দর, আবহলোক এরূপ উজ্জ্বল যে প্রেমকে যৌবনের কামাখ্যায় ফেলে রেখে পশ্চিম সমুদ্রতীরে সূর্যের নিকট সোমেন পালিতের স্তব্ধতাভিক্ষার কাহিনী গভীর কাব্যরূপ নিয়েছে। অনুরূপ কবিতা আরো অধিক সংখ্যায় থাকলে হয়তো বক্তব্যের সুদূরতা সম্বন্ধে আমার আক্ষেপকে পুরোপুরিই বিসর্জন দিতে পারতুম ; কিন্তু দুঃখের বিষয় 'উন্মেষ', 'ভাষিত', 'দীপ্তি', 'জনান্তিকে', 'নাবিকী'—ইত্যাদির প্রারম্ভসুর যদিও স্পষ্ট, পরিণতির দিকে অগ্রসর হ'তে-হ'তে এরা প্রসাদগুণ এবং ছন্দস্পন্দন যুগপৎ হারিয়ে ফেলেছে।

জীবনানন্দ একমাত্র পয়ার ছন্দেই লিখে থাকেন ('মহাপৃথিবী'তে কচিৎ কয়েকটি কবিতায় তিনমাত্রার প্রয়োগ লক্ষ্য করেছি), কিন্তু আলোচ্য গ্রন্থে বেশ কয়েক জায়গায় পয়ারের গঠনে শিথিলতা চোখে পড়লো। বিশেষ ক'রে যুগধ্বনির ব্যবহারে জীবনানন্দ অত্যন্তই স্বেচ্ছাচারী, ফল সর্বত্র ভালো হয় না ; এবং তা ছাড়াও কোনো-কোনো পংক্তিতে রীতিমতোই হোঁচট খেতে হয় :

অনেক ঘুরেছি আমি, তারপর এখানে বাদামী মলয়ালী (পৃ ৪)
যে সব যুবারা সিংহীগর্ভে জন্মে পেয়েছিল কৌটিল্যের সংযম (পৃ ১১)
না জেনে কৃষক চোত বোশেখের সন্ধ্যার বিলম্বনে প'ড়ে (পৃ ২৯)
যুগান্তের ইতিহাস, অর্থ দিয়ে কূলহীন সেই মহাসাগরের প্রাণ (পৃ ৩০)
স্বর্গত না হোক,—তবু মানুষের চরিত্র সংহত হয় না কি? (পৃ ৬৫)
মিশে গেলো পরস্পরের কায়ক্লেশে (পৃ ৪০)

আশঙ্কা করি, এর কোনো-কোনোটি নিঃসংশয়েই ছন্দ-পতন—না কি ছাপার ভুল?

উপসংহারে এ-কথা না ব'লে পারছি না যে বইয়ের অপরূপ নামের আক্ষরিক অর্থ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টায় প্রচ্ছদটি সাতটি সুবৃহৎ নক্ষত্রে খচিত, আর তাদের ঘিরে এক তীক্ষ্ণ নীলিমা বিরাজমান। *কিন্তু জীবনানন্দর নীলিমাও তো তত উজ্জ্বল নয়।

* 'সাতটি তারার তিমির'। জীবনানন্দ দাশ। গুপ্ত রহমান অ্যাণ্ড গুপ্ত। রচনাকাল ১৩৩৫-১৩৫০। প্রথম সংস্করণ অগ্রহায়ণ ১৩৫৫, ডিমাই ১৬-পাতা ণ ৮+৮০। মূল্য ২।।০ টাকা উৎসর্গ হুমায়ুন কবির বন্ধুবরেষু। এই বইয়ে চল্লিশটি কবিতা সংকলিত হয়।

সাতটি তারার তিমির

আলোক সরকার

জীবনানন্দব 'সাতটি তারার তিমির'-এ সংকলিত কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল বাংলা ১৩৩৫ থেকে ১৩৫০ অর্থাৎ ইংরেজি ১৯২৮ থেকে ১৯৪৩-র মধ্যবর্তী সময়ে। সমসময়ে বচিত একেবাবে ভিন্ন মেজাজের কবিতাগুলি এই গ্রন্থে স্থান পায়নি, যা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' 'মহাপৃথিবী' আর 'বনলতা সেন'এর প্রথম সংস্করণে পাওয়া যাবে। 'বনলতা সেন'এর সিগনেট সংস্করণের মতো নয়, যা এলোমেলো বিভিন্ন মেজাজের একটা পাঁচমিশুলী কবিতা সংকলন। 'সাতটি তারার তিমির'র কবিতা নির্বাচনের পিছনে, বুঝতে অসুবিধে হয় না, একটা সচেতন অভিনিবেশ কাজ করেছে ; কবিতাগুলির পটভূমিগত যেমন আত্মীয়তা আছে, সেইরকম একটু কান পাতলেই তাদের ভিতরের গোপন ঐকতান শুনতে পাওয়া যাবে। বিবিধ স্বতন্ত্র মনোভাব সেখানে একটি স্থির শীতল অগ্নিকেই লক্ষ্য করেছে—সেই আগুন অনন্ত প্রবহমান সময় এবং তার আঁধার তাৎপর্যহীনতা। অনন্ত শূন্যতার মাঝখানে সাতটি তারার অস্তিত্বের আর্ত প্রয়াস যেমন অনন্ত শূন্যতা আবহমান সময়ের তিমির বার্তাকে আরো প্রগাঢ় অর্থহীনতায় তাৎপর্যহীনতায় গ্রহণ করে সেইরকমই মহাবিশ্বের অণুপরিমাণ প্রাণের, প্রাণগুলির বাসনা-বেদনার উল্লোল। আবহমানের প্রাণ—মানুষ আর তাদের নিযতিনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক স্বভাবজ কাজকর্ম সময়ের দহনহীন জ্বলনকেই চিহ্নিত কবছে। আরো উচ্চকিত করছে। আরো নিবিড় আরো দীপ্যমান। দুটি জোনাকি জ্বলে উঠলে তিমির যামিনী আরো বেশি ফেনিল হয়ে ওঠে না? আরো বেশি বাঙ্ময় তমঃ স্রোতস্বিনী। 'সাতটি তারার তিমির'-র মূল আবর্তন আবহমানের প্রাণধর্ম প্রাণপ্রয়াসের স্তব্ধতাকে কেন্দ্র করেছে, তার মৌল পটভূমি সময় এবং তার তাৎপর্যহীন প্রবহমানতা।

জীবনানন্দ দাশের 'সাতটি তারার তিমিরে'র কবিতাগুলি প্রত্যক্ষত তিনটি স্বতন্ত্র মনোভাবকে আশ্রয় করেছে। 'সাতটি তারার তিমির'-এ কিছু কবিতা আছে যাকে বলা যেতে পাবে আবহমান সময়-চেতনার কবিতা। যে চেতনায় একীভূত অতীত বর্তমান ভবিষ্যতের ভিতরে মানুষের সকল প্রয়াস উৎকাঙক্ষা, তার পরিণামও এক অনড় অনতিক্রম স্থিরতা, সেখানে যেমন কোনো অগ্রগমন নেই সেইরকম পশ্চাদ্‌প্রস্থান, যাকে আদিমও বলা যাবে না, অধুনাও। আবহমান নিরুদ্ধ সময়, আবহমান মানুষ, তাৎপর্যহীন আবর্তন, কেবল একটি কেন্দ্র, আর অর্থহীন প্রবহমানতা। 'সাতটি তারার তিমিরে' আর এক চরিত্রের কবিতা আছে যা ব্যঙ্গপ্রবণ। সেই ব্যঙ্গের সঙ্গে কখনো মিলেছে কৌতুক, যে কৌতুক যে ব্যঙ্গপ্রবণতা আর এক ধরনের তাৎপর্যহীন অর্থহীনতাকে কেন্দ্র করেছে, ঘোষণা করেছে তথাকথিত আধুনিকতা, শিক্ষা প্রগতির উপর, তথাকথিত মানব-বির্বতনের উপর কঠিন রক্তিম যন্ত্রণাবিদ্ধ অনাস্থা। এই ধরনের কবিতাগুলিকে বলা যেতে পারে তমোবর্ণ কবিতা, যে তমসা শানিত ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ-কৌতুকের বিদ্যুতে বারবার ক্ষতবিক্ষত।

'সাতটি তারার তিমিরে' আর এক ধরনের কবিতা সন্নিবিষ্ট হয়েছে যা পূর্ববর্তী দুটি প্রতিন্যাসকেই প্রতিবাদ করতে চেয়েছে ; বলা ভালো অতিক্রম করতে চেয়েছে। সেই চাওয়া কতোটা নিবিড় বিশ্বাস-সঞ্জাত তাতে সন্দেহ আছে, কিন্তু তার আন্তরিকতায় সন্দেহ নেই। তবু, আমরা তাকে এখনো কোনো উজ্জীবনী বিভাসের কবিতা বলতে পারব না, 'বেলা অবেলা কালবেলা'-র অনেক কবিতার প্রসঙ্গেই যা সহজে পারব।

আবহমান সময়চেতনার কবিতাগুলিকে বুঝে নেবার জন্য 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য', 'একটি কবিতা', 'ঘোড়া' ইত্যাদি কবিতার কথা মনে পড়বে। 'ঘোড়া' নামের কবিতাটির মতোই 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য'-ও এক অখণ্ড সময়ের উজ্জীবন, অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের একীভূত অতন্দ্র এবং স্থাবর মেঘনিবিড়তা—কবিতাটির ভিতরে প্রবেশ করা যাক ঃ

গোধূলি সন্ধির নৃত্য

দরদালানের ভিড়—পৃথিবীর শেষে
যেইখানে প'ড়ে আছে—শব্দহীন—ভাঙা—
সেইখানে উঁচু-উঁচু হরীতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল—রাঙা—

চুপে-চুপে ডুবে যায়—জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দ্যাখে ; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রুপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরীতকী শাখাদের নিচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস ;
নৃমুণ্ডের আবছায়া—নিস্তব্ধতা—
বাদামী পাতার ঘ্রাণ—মধুকূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো ঃ
পুরুষ তাদের ঃ কৃতকর্ম নবীন ;
খোঁপার ভিতরে চুলে ঃ নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হুঙকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই ;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী ; দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই ; এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে
ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে—বরুণে
ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরীতকী বনে—জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আব বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হ'যে গেছে সব ; বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক—কর্কট—তুলা—মীন।

'গোধূলিসন্ধির নৃত্য' কবিতাটির দুটি অংশ আছে : প্রথম তিনটি স্তবক নিয়ে প্রথম অংশ, বাকি স্তবকগুলির সমন্বয়ে দ্বিতীয় অংশ। প্রথম স্তবকে শাশ্বত তাৎপর্যহীন আদিমতার মূক সংবেদনী প্রতিচ্ছায়া ('হীরের স্ফুলিঙ্গ')। একটি উচ্চরোল সভ্যতা পরিত্যক্ত হয়েছে, নিঃশেষিত হয়েছে একটি সমৃদ্ধ কাল ; আপাতভাবে সেই সভ্যতা, সেই সময় তার অস্তিত্ব ঘোষণা করছে না কোথাও। শব্দহীন জীর্ণ সেই পরিবেশে নিয়মতান্ত্রিক হেমন্তের সূর্য তার সমগ্রতা নিয়ে ক্রমঅবলুপ্ত হচ্ছে গোধূলির বিনম্র জ্যোৎস্নার ভিতর। হেমন্তের বিকেলের সূর্য অর্থাৎ ধূসর নিস্তেজ অনভিলাষী উদাসীন, শব্দহীন ভাঙা দরদালানের ভিড় অর্থাৎ অবজ্ঞাত বিস্মৃত একদা উচ্চকিত প্রাচীনতা। এর অতিরিক্ত আর কিছুই নেই। কেবল সেই প্রাজ্ঞ অনন্তকালীন পেঁচা, তার পর্যবেক্ষণের কোথাও শেষ নেই, নির্নিমেষ উদাসীন পর্যবেক্ষণ-সমারোহ যে অর্থে তার কাছে অর্থবহ, সেই অর্থেই অবসান। বারবার শূন্যতার মাঝখানে সোনার বলের মতো সূর্য আর রূপার ডিবের মতো চাঁদের বিখ্যাত অর্থাৎ অতিপরিচিত অতিপ্রত্যাশিত মুখ দেখা তারপর আবার দেখা। আবহমান নিয়মানুবর্ত আবর্তন, আবহমান নিরুদ্ধ সময়। তবু যে হরীতকী গাছের পিছনে হেমন্তের সূর্য অস্তমিত হয় তার শাখার নিচে 'হীরের স্ফুলিঙ্গ' আর 'স্ফটিকের মতো সাদা জলের উল্লাস'—সংবেদনী উচ্ছ্বসিত প্রাণোল্লাস, মৃত্যুত্তীর্ণ, হিরের স্ফুলিঙ্গের মতো ঠাণ্ডা অথচ অনিবার্য জীবন, থাকা, নিশ্চয়তা, অতীত, আদিমতা, কোনো প্রসঙ্গেই অতিক্রান্ত নয়, অতিক্রান্ত হবার নয়, তা আবহমান এবং অবধারিত বিকীর্ণতা।

কবিতাটির দ্বিতীয় অংশের পটভূমি বর্তমান সময়, যুদ্ধকালীন সময়। বর্তমান সময় অথবা বলা যেতে পারে চিরকালীন বর্তমান, তার কোলাহল উৎকাঙক্ষা রক্তিমতা ইত্যাদির তাৎক্ষণিক মৃত্যুনিশ্চিত দেওয়ালী। একদিকে বিলাস-ব্যসনে উল্লোসিত হঙকঙ অন্যদিকে যুদ্ধরত চীন এবং জাপান—কামানের গর্জনে বিচূর্ণ হচ্ছে সাংহাই। বাণিজ্যকর্মে যতই মেতে উঠুক হঙকঙ, যুদ্ধে যতই বিদীর্ণ হোক সাংহাই, মানুষ তার আদিম রক্তের শাসনকে কখনই উত্তীর্ণ হতে পারে না, উত্তীর্ণ হতে চায় না। কামনার শিখা হাতে নারী ঈশ্বরীর মতো শাসন করবে মানুষকে। সেই নারী তাদের খোঁপার ভিতরে চুলে, সব অঙ্গরাগের অন্তরালে নরক, অর্থাৎ আদিমতা তার কুটিল কামনা রতিউন্মুখতার তাণ্ডব নিয়ে এখনো যেন নবজাত মেঘ। কামনাবিভোর আদিমতার কাছে অতীত এবং আগামীর কোনো তরতম নেই, অতীত এবং বর্তমান সেখানে সমকণ্ঠ। পায়ের নিচে যতই সমকালীন হঙকঙের তৃণ, বর্তমান তার তথাকথিত আধুনিক সম্ভার নিয়ে যত উচ্চকিত, শাশ্বত সর্বকালীন নারী তার শরীরের ফেনিল পাশবতা নিয়ে আজও অপরিবর্তন। এবং তারই অন্তরালে প্রবাহিত হচ্ছে সেই আবহমান, তাৎপর্যহীন জ্যোতির্ময় স্থিরতা।

আমাদের মনে পড়তে পারে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'প্রাগৈতিহাসিক' নামের গল্পটির কথা, অথবা তারাশংকরের 'বেদিনী'। 'বেদিনী' সর্বকালীন কামনাবিভোল রমণী, যার কাছে প্রেম সখ্যতা কৃতজ্ঞতার কোনো মূল্য নেই—কামনার পরিপ্রেক্ষিতে শুভ-অশুভ ন্যায়-অন্যায়ের সব প্রশ্নই অবান্তর। 'বেদিনী' আদিম রমণী। তার কাছে স্থান কাল পাত্রের প্রশ্ন অবান্তর, 'বেদিনী' স্থির স্থবির শাশ্বত কামনাবিহ্বলতা। যেরকম ভিখু, ভিখু আর পাঁচী—সময় সেখানে থেমে আছে, তার আদিও নেই, অন্তও, যে রকম কোলাহলউন্মোল আধুনিক নগর হঙকঙ সাংহাই-এর রক্তের নিঃশব্দ দোলায় কাজ করে যাচ্ছে প্রাচীনতা, শব্দহীন ভাঙা দরদালানের ভিড়।

সভ্যতার নারকীয় উল্লাসের ভেতরে আদিমতা কদাচিৎ যদিওবা ম্লান হয়, তার উপলব্ধির অনিবার্যতা অনতিক্রমনীয়—'সেখানে গোপন জল ম্লান হয়ে হীরে হয় ফের, পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই'। পাতাদের উৎসরণ (উৎসারণ?) অর্থাৎ অপসারণে, উৎক্ষেপে, চলে যাওয়ায়, ঝরে-যাওয়ায় কোনো শব্দ নেই ; নিঃশব্দ সেই প্রস্থান, বস্তুত তা কোনো প্রস্থানই নয়, গোপন প্রবাহ, অন্তরালচারী প্রবাহ, তার ম্লানতার ভেতরেও হিরের জ্যোতির্ময়তা। আর তারই ভেতর ধ্বনিত হচ্ছে আপাতবর্তমান কামানের গর্জনের সব কোলাহলের উর্ধ্বে সেই শাশ্বত আদিম লালসামুখর নারী যারা 'চোখ আর চুলের সংকেতে মেধাবিনী'। 'চোখ আর চুলের সংকেত' অর্থাৎ অভ্রান্ত যৌন আহ্বান আজও অনতিক্রম—সেই আহ্বানের কাছে যুদ্ধ বাণিজ্য ইত্যাদির কলকোলাহল তুচ্ছ। মানুষ-শাশ্বত আদিম মানুষ 'প্রগাঢ় চুম্বনের' ডাক তাদের কাছে অপ্রতিরোধ্য, সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে সব কিছু বিস্মৃত হয়ে অথবা বিস্মৃত হতে বাধ্য হয়ে, যৌনতার আদিমতার নির্মম আকর্ষণে, সব সভ্যতার নগ্নতায় আপাতউজ্জ্বলতাকে পরিত্যাগ করে ('যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন') হারিয়ে যায় 'হরীতকী বনে—জ্যোৎস্নায়' অর্থাৎ আদিমতায়। 'বিনুনিতে'—নারীর যৌন-আকর্ষণে অনুচ্চার কামনাবিবশ নরক—তাদের 'পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক-কর্কট-তুলা-মীন'—অনতিক্রম নিয়তি, আদিমতা, যৌনতা, শাশ্বত সময়।

'সাতটি তারার তিমিরে'র 'একটি কবিতা' নামের কবিতাটিও মূলত অতীত-অভিসারী দৈন্যের কবিতা :

একটি কবিতা

পৃথিবী প্রবীণ আরো হ'য়ে যায় মিরুজিন নদীটির তীরে ;
বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে।
ও-প্রাসাদে কারা থাকে? কেউ নেই—সোনালি আগুন চুপে জলের শরীরে
নড়িতেছে—জ্বলিতেছে—মায়াবীর মতো জাদুবলে।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়—দহেনাকো কিছু।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায় দহেনাকো কিছু।
নিমীল আগুনে ওই আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মতো।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়—
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত

সন্ধ্যার নদীর জলে এক ভিড় হাঁস অই—একা ;
এখানে পেল না কিছু ; করুণ পাখায়
তাই তারা চ'লে যায় শাদা, নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হ'লো মুখ দেখা।

২

রাত্রিব সংকেতে নদী যতদূর ভেসে যায়—আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে
আমারো নৌকার বাতি জ্বলে ;
মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে ;
সব কেরোসিন-অগ্নি ম'রে গেছে ; জলের ভিতরে আভা দ'হে যায়
মায়াবীর মতো জাদুবলে।
পৃথিবীর সৈনিকেরা ঘুমায়েছে বিম্বিসার রাজার ইঙ্গিতে
ঢের দূর ভূমিকার পর ;
সত্য সারাৎসার মূর্তি সোনার বৃষের 'পরে ছুটে সারাদিন
হ'য়ে গেছে এখন পাথর ;
যে-সব যুবারা সিংহীগর্ভে জ'ন্মে পেয়েছিলো কৌটিল্যের সংযম
তারাও মরেছে—আপামর।
যেন সব নিশিডাকে চ'লে গেছে নগরীকে শূন্য ক'রে দিয়ে—
সব ক্লাথ বাথরুমে ফেলে ;
গভীর নিসর্গ সাড়া দিয়ে শ্রুতি বিস্মৃতির নিস্তব্ধতা ভেঙে দিতো তবু
একটি মানুষ কাছে পেলে ;
যে-মুকুর পারদের ব্যবহার জানে শুধু, যেই দীপ প্যারাফিন,
বাটা মাছ ভাজে যেই তেলে,
সম্রাটের সৈনিকেরা যে-সব লাবণি, লবণরাশি খাবে জেগে উঠে,
অমায়িক কুটুম্বিনী জানে ;
তবুও মানুষ তার বিছানায় মাঝরাতে নৃমুণ্ডের হেঁয়ালিকে
আঘাত করিবে কোন্‌খানে?
হয়তো নিসর্গ এসে একদিন ব'লে দেবে কোনো এক সম্রাজ্ঞীকে
জলের ভিতরে এই অগ্নির মানে।

অবশ্যই 'গোধূলিসন্ধির নৃত্য'-র অতীতের সঙ্গে তার কিছুটা তফাত আছে। 'একটি কবিতা'র অতীত অপাপবিদ্ধ। তা সকল সভ্যতার পূর্ববর্তী অথবা সভ্যতার ব্যবহারিক আগুন যেহেতু স্মৃতি যেহেতু সুদূর সেখানে আর জ্বলে না। মানুষের রক্তের গোপনে সেই অতীত নিয়ত জাগরণ, সে আমাদের সকল কার্যের গভীরে আভা রাখে, নিঃশব্দ নির্নিমেষ তার সঞ্চারণ, সেখানে উত্তাপ নেই, আছে একলক্ষ্য জাগ্রত উপস্থিতি। 'মিরুজিন নদী' সেই প্রাচীনতার প্রতীক, 'বিবর্ণ প্রাসাদ' অতীত সভ্যতার অপসৃত ঔজ্জ্বল্য। সময়ের থেকে আমরা যতই দূরে স'রে যাই, সময়ের তাৎক্ষণিক কোলাহল ততই স্তিমিত হয়, অবশিষ্ট থাকে কেবল একটি দ্যুতি, এক জ্যোতির্ময় উপলব্ধি ; সেই উপলব্ধিও ক্রমশ বাস্তব চেতনা

থেকে অবলুপ্ত, কেবল তার অলক্ষ্য সংরাগ আমাদের রক্তের নিভৃতে নিরবচ্ছিন্ন স্রোতধ্বনির মতো বেজে চলে। মানুষের সমগ্র অস্তিত্ব সেই স্রোতধ্বনির অচেতন অন্বেষণ অথবা সেই স্রোতধ্বনি আধো অপরিচয়ের বেশে মাঝে-মাঝে উপস্থিত হয় মানুষের নিকটে। প্রত্যক্ষ পরিচয়ের অভাবে সেই স্রোতধ্বনি ('নৃমুণ্ডের হেঁয়ালি') কখনো বিস্ময় আনে, কখনো আতঙ্ক, তবু তারই অভিসারে আমরা অলক্ষ্য উন্মুখর। সেই স্রোতধ্বনি, সেই 'নিমীল আগুন' যার দাহ নেই অর্থাৎ সুস্পষ্ট কোনো শরীরী উপস্থিতি নেই, যা কেবল এক সমগ্র উপলব্ধি সেখানে হৃদয় মৃত সারসের মতো, অপরিচয়ের অন্ধকারে ('নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত') সন্ধ্যার নদীর জলে একা হংসশ্রেণীর মতো করুণ পাখায় শাদা নিঃসহায় উড়ে যেতে যেতে সহসা 'মূল সারস' অর্থাৎ সেই নিমীল আগুনের যথার্থ তাৎপর্যের, কেন্দ্র অথবা ভিত্তিভূমি, অবগাঢ় পটভূমির সঙ্গে পরিচিত হলো।

কবিতাটিকে দুটি অংশে ভাগ করা হয়েছে। প্রথম অংশে আধো অচেতন বোধের জাগরণ, দ্বিতীয় অংশে তার যাত্রাকাহিনী। অন্তর্লীন অনির্দেশ প্রবণতায়, 'রাত্রির সংকেতে নদী যতদূর ভেসে যায়' অর্থাৎ প্রবাহিত অন্ধকারের নদী যেমন তার শিকড়ের অভিমুখী, সেইরকম 'আমারো নৌকার বাতি জ্বলে', আমিও অনুরূপ যাত্রী, 'অভিজ্ঞান' স্মৃতিচিহ্ন হাতে নিয়ে আমিও অতীতের শিকড়ের নিবিড় কেন্দ্রের অভিলাষী। 'নিবিষ্ট করতলে' সেখানে 'লোকশ্রুত আমলকী' অর্থাৎ পরমবোধ উপলব্ধ, সর্বজ্ঞান। সেখানে আর কিছু নেই, 'কেরোসিনের আগুন নেই, পৃথিবীর সৈনিকেরা নেই, পৃথিবীর নবরূপায়ণের দ্বান্দ্বিক পরিশ্রম নেই, সব নগরী শূন্য, নগরীর সকল কলুষ (সব ক্বাথ বাথরুমে ফেলে) অবলুপ্ত। সেই পরম চৈতন্য, সেই 'গভীর নিসর্গ' তবু কোনো এক মানুষের কাছে, অর্থাৎ মানুষেরই কাছে তার ঘনিষ্ঠ সংবাদ উচ্চারণ করতে চায়। সেই 'গভীর নিসর্গ' কেবল সত্যের স্থির প্রতিবিম্বই দেখায়, সেই মুকুর কেবল পারদের ব্যবহার জানে, অর্থাৎ সেই মুকুর অনাবেগী নিশ্চয়তায় কেবল তার নির্দিষ্ট কর্তব্য পালন করে। প্যারাফিন, মোম তার দীপান্বিত করার নিজস্ব ধর্মেই আবদ্ধ। মানুষের কাছে বারবার এসে উপস্থিত হয় এই অতীত, এই উৎস, এই শিকড় তার অশরীরী, অলৌকিক, দুর্বোধ্য নৃমুণ্ডের হেঁয়ালির রহস্য নিয়ে। অনতিক্রম অতীত তার অদৃশ্য কণ্ঠ অনিবার্য আন্দোলিত করে বর্তমানের, নগরীর সব আপাতরক্তিম প্রযত্নের ভিতর। হয়তো কোনোদিন গভীর নিসর্গ, সেই পরম চৈতন্য 'কোনো এক সম্রাজ্ঞীকে' অর্থাৎ কোনো বিশেষ ভাগ্যবান ব্যক্তির কাছে অনতিক্রম ক্ষমতার কাছে জলের ভিতরে এই আগুনের অর্থ বলে দেবে, উন্মোচিত করবে অবচেতন অচেতনের অন্ধকার, সভ্যতার নিবিড়তম অন্তরাল, অতীতের , উৎসের, শিকড়ের হিরণ্ময় একাকী।

'ঘোড়া' নামের কবিতাটিও পূর্ববর্তী দুটি কবিতার সমধর্মী অনুধ্যাননায় নিবিড়। যেমন 'উন্মেষ' নামের কবিতাটি। বলা যেতে পারে 'ঘোড়া' সামগ্রিক সময়চেতনার কবিতা—অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ সেখানে একীভূত। সেখানে নিওলিথ-স্তব্ধতা অনায়াস গ্রাস করে যান্ত্রিক আবর্তমান বর্তমানকে। প্রস্তরযুগের ঘোড়া এবং সমসময়ের কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে চরণশীল মহীনের ঘোড়া সেখানে একাকার—কোনো তফাত নেই অতীত আর বর্তমান ঃ

আমরা যাইনি ম'রে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয় ঃ
মহীনের ঘোড়াগুলো ঘাস খায় কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে,

প্রস্তরযুগের সব ঘোড়া যেন—এখনও ঘাসের লোভে চরে
পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর' পরে।
আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায় ;
বিষণ্ন খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে ;
চায়ের পেয়ালা কটা বেড়ালছানার মতো—ঘুমে—ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস্-রেস্তরাঁতে ;
প্যারাফিন-লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে
সময়ের প্রশান্তির ফুঁয়ে ;
এই সব ঘোড়াদের নিওলিথ-স্তব্ধতার জ্যোৎস্নাকে ছুঁয়ে।

'কবিতাটি নিঃসন্দেহে একটি থিমেটিক কবিতা। এর থিম বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে একটা মোটামুটি ধারণা সহজেই করা যেতে পারে, কিন্তু অনেক পঙক্তির বাক্য বিন্যাস, অনেক চিত্রের তাৎপর্য, অনেক বিশেষণের যাথার্থ্য অথবা গোপন নির্দেশ বিষয়ে সংশয় থেকে যায়। বিশেষ ক'রে লক্ষণীয়, বক্তব্য এখানে সরাসরি ঘোষণার মতো উচ্চারিত হয় নি—যা জীবনানন্দর পরবর্তীকালের অনেক কবিতায় হয়েছে—বক্তব্য এখানে কয়েকটি চিত্রের মধ্যবর্তিতাতেই প্রধানত নির্দেশিত। সেই চিত্রগুলি কতিপয় সংবেদনী ইঙ্গিতসঘন আবহাওয়া, তা এক অমোঘ সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় ঘটায় কিন্তু নিজেরা উদাসীন নির্লিপ্ত থাকে। চিত্রকল্প বলতে যা বোঝায় এরা ঠিক তা নয়, এদের জন্য আলাদা বিশ্লেষণ প্রয়োজন, কিন্তু তার আগে কবিতাটির বিষয়বস্তু প্রসঙ্গে আমার ধারণা উপস্থিত করা যাক ঃ

'ঘোড়া' সময়-চেতনার কবিতা। এই সময় এক অখণ্ড প্রবহমানতা, দুর্বোধ্য এবং তাৎপর্যহীন। সেই প্রবহমানতায় অতীত-বর্তমান একাকার ; জীবিত মানুষ তার বর্তমানের ক্লান্তিকর জাগরণের ভিতরেও অতীতকে উপস্থিত সত্যের মতোই বারবার অনুভব করে, অনুভব করে তার নিজের অর্থহীনতা, কেবল উদরান্নের তাগিদ আর অদ্ভুত যুক্তিহীন আবর্তিত পৃথিবী। 'ঘোড়া' অবশ্যই প্রতীকী ব্যবহার, তা সকল প্রাকৃতিক-নিয়ম-রুদ্ধ প্রাণীরই প্রতিনিধিত্ব করছে। আমাদের দৃশ্য বা vision-এর ভিতর মহীনের বাস্তব ঘোড়াগুলো। প্রস্তরযুগের আদিম ঘোড়াগুলোর ছায়ারূপ নিয়ে আসে, তারা আমাদের সচেতন করে সেই অখণ্ড সময় বিষয়ে যা শাশ্বত, অতীত-বর্তমান যেখানে সমার্থক, যা উদ্দেশ্যহীন নিত্যবহমান এবং পরিবর্তন-বিমুখ। এবং উভয়তই, উদরান্নের তাগিদই বেঁচে থাকার একমাত্র প্রেরণা। এক অপরিসীম ক্লান্তি যেখানে আছে শুধু জীবনযাপন আর জৈবিক প্রয়োজন, আছে আস্তবলের ঘ্রাণ অর্থাৎ ঘোড়াদের উপস্থিতি, আর খড় কাটার শব্দ অর্থাৎ খাদ্য। এই খড় কাটার শব্দও বিষণ্ন, তাৎপর্যহীনতায় ক্লান্তিকর, যেহেতু তা শুধু অর্থহীন বেঁচে থাকা এবং অর্থহীন জৈবিক সত্যকেই স্পষ্ট করে। ঘুমে বিবশ বেড়ালছানার মতো চায়ের পেয়ালা কটাকে ঘিরে ঘেয়ো কুকুরের, সামর্থ্যহীন কুকুরেরও অলস পরাক্রম—একদিকে খাদ্যের প্রয়োজন এবং সমস্ত পরিশ্রমের অর্থহীনতা। কিন্তু সকলের উপর সেই অখণ্ড সময়, শাশ্বত প্রবহমানতা, যেখানে অতীত-বর্তমান সব একাকার তার প্রশান্তির ফুঁয়ে আস্তাবলের আলো নেবে, বর্তমানের সব পরিশ্রম অতীত অনন্ত সময়ের ভিতর শান্ত হয়। প্রস্তরযুগের আদিম ঘোড়াগুলোর স্তব্ধতা অর্থাৎ প্রাচীনতম স্তব্ধতার

জ্যোৎস্নার ইঙ্গিতে ঘোড়া, সকল প্রাণী অসীম সময়ের ভিতর, অতীতের ভিতর নিজেদের হারিয়ে ফেলে।

এই মোটামুটি সংক্ষিপ্তসারের পরেও কতকগুলি প্রাথমিক সংশয় থেকে যায়। প্রথম সংশয়, শুরুর লাইনের 'তবু' শব্দটিকে নিয়ে। 'আমরা যাইনি ম'রে আজো—তবু কেবলি দৃশ্যের জন্ম হয়' এর সহজ মানে এই দাঁড়ায় যে মৃত অবস্থাতেই দৃশ্যগুলির জন্ম সম্ভব ছিল কিংবা জীবিত অবস্থায় দৃশ্যগুলির জন্ম বস্তুত অসম্ভব। আসলে 'তবু' শব্দটির ভিতর এই কবিতার অন্যতম চাবি লুকিয়ে রয়েছে। 'আমরা যাইনি ম'রে আজো' অর্থাৎ আমরা এখনো জীবিত আছি তবু বারবার দৃশ্যগুলির জন্ম হচ্ছে। কোন্ দৃশ্যের? যে-দৃশ্য বাস্তব মহীনের ঘোড়াগুলোকে প্রস্তরযুগের ঘোড়াগুলোর সঙ্গে একাকার করে, বর্তমানকে বিলীন করে অতীতের মধ্যে, যে-দৃশ্য অতীত এবং বর্তমান এক অখন্ড প্রবহমানতার ভিতর অঙ্গাঙ্গি হয়। বর্তমানের ভিতর অতীতের এই প্রত্যাবর্তন স্বাভাবিক নয়, বর্তমান তার নিজের কোলাহলের ভিতরই নিমগ্ন থাকতে চায়, কিন্তু অতীতের এই প্রত্যাবর্তনের রীতিকে, শাশ্বত উপস্থিতিকে অমান্য করা অসম্ভব। 'আমরা যাইনি ম'রে আজো', আমরা এখনো বেঁচে আছি, বর্তমানের কোলাহলের ভিতর আছি তবু অতীত তার অনতিক্রমণীয় উপস্থিতি বিষয়ে আমাদের সচেতন করে। আমরা এটাও বুঝতে পারি, রক্তের স্বভাবে আমরা অতীতের সঙ্গে নিবিড় অন্বিত, বাস্তব মহীনের ঘোড়াগুলোর কার্তিকের ম্লান জ্যোৎস্নার প্রান্তরে জৈবিক প্রয়োজন মেটানোর যেমন তাগিদ, ঠিক সেই রকমই ছিল প্রস্তর যুগের আদিম ঘোড়াগুলোর। সেই একই ভাবে বেঁচে থাকা এবং উদরান্নের প্রয়োজন মেটানো, যা ছিল আদিমকালের তা এখনো অব্যাহত।

খাদ্যের লোভে অতীত এবং বর্তমান, সকল কালের ঘোড়াগুলো চ'রে বেড়াচ্ছে 'পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে'। 'কিমাকার ডাইনামো' অর্থাৎ অদ্ভুত, তাৎপর্যহীন গতিশীলতা, যার কোনো লক্ষ্য অথবা উদ্দেশ্য থাকলেও তা একান্তই অবোধ্য। ডাইনামো অর্থাৎ সেই যন্ত্র যা শক্তির উৎপাদক, পৃথিবীর গতিশীলতার ভিতর সেইরকম কোনো যন্ত্র কাজ করছে কিন্তু তা কিমাকার, অদ্ভুত, তা পৃথিবীকে আবর্তিত করে, কোন্ উদ্দেশ্যে করে তা বোঝা যায় না। দুর্বোধ্য, তাৎপর্যহীন গতিশীল পৃথিবী, সময় আর তারই উপরে ততোধিক দুর্বোধ্য অনাদি-অনন্তকাল ধ'রে সকল প্রাণী খাদ্যান্বেষণ—দৃশ্যগুলি বারবার আমাদের কাছে এই অর্থহীন, দ্যুতিহীন, ক্লান্তিকর সংবাদ বহন ক'রে আনে।

রবীন্দ্রনাথের কিছু কবিতায় যে-ধরনের সময়-চেতনার পরিচয় পাওয়া যায় জীবনানন্দর সময়-চেতনা সঙ্গে তার মৌল পার্থক্য আছে। 'হে অতীত, তুমি ভুবনে ভুবনে/কাজ করে যাও গোপনে গোপনে' কিংবা সোনার তরী-র 'পুরস্কার' অথবা কল্পনা-র 'বসন্ত' যেখানে পৃথিবীকে প্রকৃতিকে বিগত লক্ষ যুগের সংগীতমাখা ব'লে অনুভূত হয়েছিল, অনুভূত হয়েছিল বর্তমানের মানুষের সঙ্গে অতীতের মানুষগুলির আবেগের অভিন্নতা, সেখানে এক সদর্থক দৃষ্টি ছিল, কিন্তু জীবনানন্দ অতীত এবং বর্তমানের এই অভিন্নতাকে এক ক্লান্তিকর পুনরাবৃত্তি হিসেবেই দেখেছেন এবং যদিও কবিতার শেষাংশে তিনি সময়ের এই অখন্ড প্রবহমানতাকে এক নিবিড় প্রশান্ত স্তব্ধতা বলে অনুভব করেছেন, উৎসর্গীকৃত রিক্ত ধ্যানময়তা হিসেবে জেনেছেন কিন্তু সেখানে রবীন্দ্রনাথের অনুরূপ কোনো বস্তুময় পরিতৃপ্তি নেই, স্বপ্ন নেই, সম্ভাবনা নেই, কেবল অরব বিলীনতা আছে।

কবিতাটি দুটি অংশে বিভক্ত। প্রথম চার পঙক্তি অর্থাৎ 'পৃথিবীর কিমাকার ডাইনামোর পরে' পর্যন্ত একটি স্তবক, পরের অংশ দ্বিতীয় স্তবক।

দ্বিতীয় স্তবক কোনো দৃশ্য বা vision নয়, সেখানে বাস্তব জগৎ, দৃশ্যমান চিত্রগুলিরই উপস্থাপনা। সেই চিত্র একান্তভাবেই একটি আস্তাবল এবং তার পরিপার্শ্বের। সেখানে খড় কাটার কল আছে, পাইস-রেস্তরাঁ আছে, যা আস্তাবলের আশেপাশে থাকাই স্বাভাবিক। প্রথম স্তবকে যে মহীনের ঘোড়াগুলোকে কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে ঘাস খেতে দেখা গিয়েছিল তারা এখানে নেই, তারা vision-বা অপ্রাকৃত ছায়া দৃশ্য। ভাবা যেতে পারে, ছায়া দৃশ্যজাত এই মহীনের ঘোড়াগুলোর অনুষঙ্গেই আস্তাবল এবং তার পরিপার্শ্বের ছবি মনে এসেছে, তারাও কোথাও নেই, স্মৃতির সূত্রেই তাদের আবির্ভাব। কিংবা এটাও ভাবা সম্ভব যে মহীনের ঘোড়াগুলোকে, কোনো দৃশ্য বা vision-এ নয়, বস্তুত দেখা গিয়েছিল কার্তিকের জ্যোৎস্নায়, তাদের দেখে মনে হয়েছিল যেন কোনো আদ্যিকালের জীব, এখনো ঘাসের লোভে চ'রে বেড়াচ্ছে, আর তাদেরই অনুষঙ্গে মনে পড়ল স্মৃতিসঞ্চিত আস্তাবল এবং তার পরিপার্শ্ব। আমার কাছে অবশ্য প্রথম ভাবনাটাই গ্রহণীয় মনে হয়। যাই হোক, আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসছে 'এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়'। 'এক ভিড়'-এর অর্থ কী? এক ঝলক হাওয়া? দমকা হাওয়া? নাকি অবিশ্রাম হাওয়া? এক ঝলক অথবা দমকা হাওয়ার কথা ভাবলে সহসা এই আস্তাবলের উপস্থিতি টের পাওয়া গেছে—এইরকম মনে করা যেতে পারে। অবিশ্রাম হাওয়া ধ'রে নিলে এই আস্তাবলের উপস্থিতি সব সময়ের, একে বিস্মৃত হবার কোনো উপায় নেই, এ-রকম ভাবতে হবে। 'এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়' ইংরেজী crowded night (চিন্তা-বিক্ষিপ্ত রাত্রি)-এর বঙ্গানুবাদ হওয়াও বিচিত্র নয়। যাই হোক, চিন্তা-বিক্ষিপ্ত রাত্রিতে অথবা সহসা এক-ঝলক হাওয়ায় আস্তাবলের ঘ্রাণ অর্থাৎ ঘোড়াদের উপস্থিতি অনুভূত হচ্ছে এবং একই সঙ্গে শোনা যাচ্ছে বিষণ্ণ খড়ের পৌনঃপুনিক ক্লান্তিময় ঝ'রে পড়ার শব্দ। ঘোড়া আছে এবং খড় কাটা আছে, আছে বেঁচে থাকা এবং বেঁচে থাকার প্রয়োজনের খাদ্য। খড়ের বিশেষণ 'বিষণ্ণ' কেন? 'খড় অর্থাৎ খাদ্যের নিজে বিষণ্ণ হবার কোনো কারণ নেই। মনে হয়, 'বিষণ্ণ খড়ের শব্দ' আসলে 'খড়ের বিষণ্ণ শব্দ'। খাদ্যের এই যে আয়োজন, প্রত্যহের এই যে জৈবিক প্রয়োজন যা সুদূর অতীত থেকে আজও অব্যাহত যা আমাদের বেঁচে থাকার সহায়তা করে অথচ বেঁচে থাকার কোনো তাৎপর্যই আনতে পারে না, তা করুণ বিষণ্ণতা ছাড়া আর কী।

চায়ের পেয়ালাগুলোকে মনে হচ্ছে কটা বেড়ালছানার মতো। অনুমান করা যায় এখন রাত্রিবেলায় পাইস-রেস্তরাঁর কাপগুলোকে বাইরে নামিয়ে রাখা হয়েছে, দূর থেকে তাদের মনে হচ্ছে নিদ্রাতুর বেড়ালছানার মতো—আর তাদের ঘিরেই ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট অধিকার। 'অস্পষ্ট,' সমস্ত চিত্রটিকে দূর থেকে দেখা হচ্ছে ব'লেই অস্পষ্ট, ব্যাপারটা আপাত-অর্থে তাই হলেও 'অস্পষ্ট' বিশেষণটি একেবারেই নিরামিষভাবে হয়তো ব্যবহার করা হয় নি। 'অস্পষ্ট' আসলে অলস, তা একদিকে যেমন অসুস্থ কুকুরগুলোর সামর্থ্যহীনতা প্রমাণ করছে, অন্যদিকে কুকুরগুলো অলসভাবে খাদ্যান্বেষণ করছে, যে-রকম অলসভাবে কার্তিকের জ্যোৎস্নার প্রান্তরে মহীনের ঘোড়াগুলোর খাদ্যান্বেষণ—এই রকম ইঙ্গিতও বিশেষ ক'রে মনে পড়ে। এবং আহার-অন্বেষণে কাপগুলোর ন'ড়ে ওঠা, তা-ও 'হিম' অর্থাৎ ক্লান্তিময়, প্রতিবাদহীন। যে অর্থে খড় কাটার শব্দ বিষণ্ণ, ঠিক সেই অর্থেই, মনে হয়, কাপগুলোর হিম হ'য়ে ন'ড়ে ওঠা।

নবম লাইনের সবচেয়ে বড়ো সমস্যা 'গোল আস্তাবলে' শব্দ দুটিকে নিয়ে। আস্তাবলের বিশেষণ 'গোল' কেন? আস্তাবলের আকার যে কখনোই গোল হয় না, এটা আমরা সবাই জানি। গোল বিশেষণটি ব্যবহার ক'রে কবি কি আমাদের বৃত্তাকারে পৃথিবীর

কথাই স্মরণ করাতে চাইছেন? মনে হয়, তা-ই। ঘোড়া যেখানে সকল প্রাকৃতিক-নিয়ম-রুদ্ধ প্রাণীরই প্রতিনিধিত্ব করছে, আস্তাবল সেখানে সমগ্র পৃথিবীর। শাশ্বত সময়, যার কাছে অতীত বর্তমান সমার্থক, যা এক জাগ্রত নিত্যতা, তারই প্রশান্তির স্পর্শে পৃথিবীর সব আলো নেভে, ('প্যারাফিন-লণ্ঠন'কে এ-ক্ষেত্রে চাঁদ ভাবাই যুক্তিযুক্ত ; প্যারাফিন-লণ্ঠনের ক্ষীণজ্যোতি হলুদ আলো ম্রিয়মাণ চাঁদের আলোর কথাই স্মরণ করায়) বর্তমান বিলীন হয়ে যায় অতীতের ভিতর। 'এইসব ঘোড়া'দের অর্থাৎ দৃশ্যজাত মহীনের ঘোড়াগুলো যা প্রস্তরযুগের ঘোড়াদের সমার্থক, যেখানে বর্তমান এবং অতীত একাকার, তাদেরই আদিম স্তব্ধতার স্পর্শে বর্তমান হারিয়ে যায় অতীতের ভিতর।

অন্য একটি কবিতায় জীবনানন্দ হামিদের মরকুটে কানা ঘোড়াদের কথা বলেছেন ঃ

> কে যেন উঠিল হেঁচে হামিদের মরকুটে কানা ঘোড়া বুঝি
> সারাদিন গাড়িটানা হ'লো ঢের, ছুটি পেয়ে এবার জ্যোৎস্নায়
> নিজ মনে খেয়ে যায় ঘাস
> যেন কোন ব্যথা নেই পৃথিবীতে। ('মহাপৃথিবী')

কিন্তু এরা মহীনের ঘোড়াগুলোর মতো একেবারেই নয়। তারা 'আট বছর আগের একদিন'-এর ফড়িং-দোয়ালের মতো, বোধ-বিবর্জিত জীবন-যাপনই তাদের পরিতৃপ্তি। মহীনের ঘোড়াদের কাছেও খাদ্যান্বেষণই প্রধান কথা, জীবনযাপনই একমাত্র, কিন্তু সেখানে এক অরব ক্লান্তি, বিষাদ—হামিদের মরকুটে ঘোড়া অথবা 'আট বছর আগের একদিন'-এর দোয়েল ফড়িঙেরা যার সঙ্গে একেবারেই পরিচিত নয়।

'ঘোড়া' কবিতাটি বক্তব্যপ্রধান এবং বক্তব্য এখানে কয়েকটি চিত্রের মধ্যবর্তিতাতেই প্রধানত নির্দেশিত। লক্ষ করলে দেখা যাবে এই কবিতায় মতো শব্দের ব্যবহার মাত্র একবারই হয়েছে, উপমা যা বস্তুর সাদৃশ্যে অপর বস্তুর কল্পনা করে, এখানে তার অবকাশ নেই। কেবল কয়েকটি নিরপেক্ষ ছবি—নিজেরা উদাসীন এবং নির্লিপ্ত—তারা, কোনো অপর বস্তুর নয়, এক অমোঘ সত্যকে আমাদের সামনে উপস্থিত করছে। বক্তব্যকে ঘোষণার মতো ক'রে বলবার প্রয়োজন নেই, আমাদের কেবল কয়েকটি ছবির মুখোমুখি দাঁড় করানো হয়েছে এবং যেমন কোনো-কোনো প্রাকৃতিক দৃশ্য আমাদের সামনে আলোকিত উন্মোচন ঘটায়, ঠিক সেইরকমই কবিতাটি তার সকল সত্য নিয়ে আমাদের সামনে স্বতঃস্ফূর্ত উদ্ভাসিত হয়েছে।

> কোথাও নদীর পারে সময়ের বুকে
> দাঁড়ায়ে রয়েছে আজো সাবেককালের এক স্তিমিত প্রাসাদ

'উন্মেষ' নামের কবিতাটির উদ্ধৃত লাইন দু'টি আমাদের অনিবার্য মনে করাবে 'একটি কবিতা'র মিরুজিন নদীর বুকে ছায়া-ফেলা বিবর্ণ প্রাসাদটির কথা। যে প্রাসাদ থেকে যাত্রা করে নিবিড় রমণী তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে অনেক মলিন যুগ অনেক রক্তাক্ত যুগ পার হয়ে আজকের এই বর্তমানে এসে পুনর্বার পরিচিত হয় সেই আবহমানের ভাঁড়ের সঙ্গে যে যথারীতি গাধার পিঠে চড়ে উপস্থিত। মানুষের প্রয়াস যতই সূর্যকরোজ্জ্বল হ'ক ('জ্ঞানময় প্রেমিক') আবহমান তার প্রাপ্তি নির্বোধ কৌতুকবহ অন্তঃসারহীন পরিস্থিতি—যেমন অতীতে তেমনিই বর্তমানে। আর সেই নিষ্ফল চলমানতা—তারও কোনো বিরাম নেই। অতীত যেমন তার সার্থকতার প্রশ্নে ব্যর্থ, সেইরকম বর্তমান, সেইরকম আবহমান।

তমোবর্ণ কবিতাগুলিও বস্তুত আবহমান সময়চেতনার কবিতার সমধর্মী—তারাও সেই নিস্তল হিম আবহমানের উচ্চারণ করে যার পটভূমিতে মানুষের সব প্রয়াস উৎকাঙ্ক্ষা কোলাহল উৎকণ্ঠ জীবনযাপন অর্থহীন তাৎপর্যহীন—সে তাৎপর্যহীনতা এতটা বধির এবং নিশ্চিত তার পরিপ্রেক্ষিতে সব কর্মকোলাহল, জীবনপ্রয়াসই শেষপর্যন্ত হাস্যকর, করুণ সজল কৌতুকের বেশি আর কিছু নয়। আমরা 'রাত্রি' নামের কবিতাটির কথা স্মরণ করছি। আধুনিক নগর-সভ্যতার প্রতি তীব্র তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ তিরস্কারের ভিতরে আঁধার উচ্চারিত হয়েছে সেই আবহমান সেই আদিমতা যা মানুষের রক্তের অনতিক্রম শাসন, দেশকালের প্রশ্ন সেখানে অবান্তর, অবান্তর সভ্যতা এবং তার তথাকথিত অলোকিত পোশাক :

> নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
> লিবিয়ার জঙ্গলের মত।
> তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব. অতিবৈতনিক
> বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

'সাতটি তারার তিমির' বস্তুত সময়চেতনার কাব্য, আদিম সময়, শাশ্বত আদিমতার অনতিক্রম অস্তিত্ব ঘোষণা। তমোবর্ণ কবিতাগুলিতে নিষ্ঠুর নির্মম সেই আধিপত্যকে আপাতকৌতুকে গ্রহণ করার ভেতরে ভেতরে বেজে উঠেছে তীব্র দাহ, অসহায় আর্তি।

'জুহু' কবিতার প্রায় প্রৌঢ় সোমেন পালিতের জীবনের সব কর্মকোলাহলকে তর্কবিতর্ককে ভুলে জুহুর সমুদ্রতীরে শান্তিপ্রয়াসের অন্তরালে অনিবার্য বেজে উঠেছে জীবন তার সর্বস্বতা, রক্তের প্রতিটি উচ্চারণ নিয়ে। শান্তিক্ষেত্রের দুই চার ধনু দূরেই এয়ারোড্রামের কলরব, সেই সুরজাল বৃষ মেষ বৃশ্চিকের মতো অর্থাৎ নিয়তির মতো অভ্রান্ত। যে নিয়তি তাকে দিয়ে লিখিয়ে নিয়েছিল ভূমিকা, বরাহরূপী মালিককে অবতার হিসেবে গ্রহণ করতে শিখিয়েছিল। নিয়তি অর্থাৎ জীবনধর্ম। যেমন এখনো তার পক্ষে বিস্মৃতি হওয়া কঠিন কে. এম. মুন্সী অথবা নরীম্যানের আদেশ—অর্থাৎ বাস্তব জীবন-তরঙ্গ। যদিও সোমেন পালিত এই অন্তঃসারহীন জীবনকে, ('হাতীর হাওয়ায় লুপ্ত কয়েতের মতো অর্থাৎ গজভুক্ত কপিত্থবৎ) অবজ্ঞায় বিস্মৃত হতে চেয়েছিল, তবু জীবন তার আবহমান আধিপত্য নিয়ে অনতিক্রম, আর তার চাইতেও সত্য এটাই জীবনের প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষার ('মেঘ না চাইতে এই জল ভালোবাসে'), সহজ প্রাপ্তি। জীবন অর্থাৎ পঞ্চ ইন্দ্রিয়, ষড়রিপুর আদিম উন্মাদনা, অনতিক্রম শাসন। বাস্তব জীবনের তাৎপর্যহীনতাকে সোমেন পালিত যতই অতিক্রম করতে চান, যতই আকাঙ্ক্ষা করুন সাগরের লঘু চোখ কাঁকড়ার মত উদাসীন চৈতন্যহীন, নির্বোধ জীবনযাপনের অন্ধ আনন্দ, জীবন তার দাবি কণামাত্র পরিত্যাগ করবে না। তাকে টেনে নিয়ে যাবে কর্মক্ষেত্রে—আদিম অন্তহীন জীবনযাপনের প্রবহমানতায়। সর্বদ্রষ্টা, সর্বজ্ঞ, অনন্তকালের সহযাত্রী পেঁচা অন্ধ চোখে এই নির্দেশই উচ্চারণ করবে।

সাতটি তারার তিমিরের তৃতীয় চরিত্রের কবিতাগুলি, যাকে এখনো আমরা কোনো উজ্জীবনী বিভাসের কবিতা বলতে পারব না, একভাবে বা অন্যভাবে পূর্ববর্তী দুটি ধারার কবিতাগুলিরই ধারাবাহিক পরিণতি। সর্বব্যাপ্ত সম্ভাবনাহীনতা, আদিমতার দৃঢ়মূল আধিপত্য, আবহমান অন্ধতা রিরংসা, লোভ, মূল্যহীনতা তার কাছে তো আর অকুণ্ঠ আত্মসমর্পণ সম্ভব নয়, অন্তত তাকে উত্তীর্ণ হবার একটা আকুলতা, একটা অন্তিম আকুতি তো থাকবেই। একটা স্বপ্ন, একটা উজ্জীবন :

নব পৃথিবীকে পেতে সময় চ'লেছে?
হে অবাচী, হে উদীচী, কোথায় পাখির শব্দ শুনি ;
কোথাও সূর্যের ভোর র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়। (সূর্যপ্রতিম)

লক্ষ্য করার, যে সূর্যের ভোরের আগমনের জন্য অপেক্ষা তার উদয় আর পূর্বগগনকে কেন্দ্র করছে না ; অবাচী অথবা উদীচী, উত্তর অথবা দক্ষিণে এবার প্রথম পাখির কলধ্বনি শ্রুত হবে। অর্থাৎ আমূল পরিবর্তন—পরিবর্তন পরিবেশ এবং স্বভাবের—'অনন্তের অফুরন্ত রৌদ্রের তিমির' চিরায়মান জাগ্রত মৃত্যুবাসরকে উপেক্ষা ক'রে, উপেক্ষা ক'রে 'অনন্ত প্রতিপদ' অর্থাৎ চন্দ্রহীনতা, তিমিরতা, এমনকি বিস্মৃত হয়ে চন্দ্রনির্ভর আলোক-সম্ভাবনাকে এবার 'অন্ধকার ডাইনী মাইলের' আশ্বাসহীন ক্রূর পথে অভিযাত্রা। এবং একই সঙ্গে এটাও মনে আছে যে ঃ

নিখিল ও নীড় জনমানবের সমস্ত নিয়মে
সজন নির্জন হয়ে থেকে
ভয় প্রেম জ্ঞান ভুল আমাদের মানবতা রোল
উত্তরপ্রবেশ করে আরো বড় চেতনার লোকে ;
অনন্ত সূর্যের অস্ত শেষ করে দিয়ে
বীতশোক হে অশোক সঙ্গী ইতিহাস,
এ ভোর নবীন বলে মেনে নিতে হয় ;
এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব আগুনে আলোয় জ্যোতির্ময়। (উত্তরপ্রবেশ)

তবু এ-আশ্বাস, এ-প্রতিজ্ঞা তেমন করে কি নিবিড় হতে পেরেছে, দৃঢ় প্রতিষ্ঠ?

তিমিরহননে তবু অগ্রসর হয়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হতে চাই।
আমরা তো তিমির-বিনাশী (তিমিরহননের গান)

তিমির-বিলাস নয়, 'সাতটি তারার তিমির' প্রধানত তিমির-অবহগাহনের কবিতা, আবহমান তিমির, আবহমান আদিমতা, অনন্ত অখণ্ড সময়, অনন্ত আদিমতা, 'অনন্তের অফুরন্ত রৌদ্রের তিমির'।

তৃতীয় বিজ্ঞানদর্শনের আলোকে 'সাতটি তারার তিমির'

আনন্দ ঘোষ হাজরা

রবীন্দ্রনাথ সজ্ঞানে বিজ্ঞানবিষয়ক গ্রন্থ পড়েছিলেন এবং লিখেওছিলেন। কবিতাতেও তাঁর বিজ্ঞানমনস্কতা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত। আমি প্রসঙ্গান্তরে অন্যত্র এ বিষয়ে আমার সাধ্যমতো আলোচনা করার চেষ্টা করেছি। কিন্তু জীবনানন্দ বিজ্ঞান বিষয়ক পড়াশুনা কী রকম করেছিলেন আমি জানি না। তবু, 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থটিতে তাঁর দর্শনভাবনা যেন সচেতনভাবে তৃতীয় বিজ্ঞান ভাবনাকে ছুঁয়ে গেছে বলে মনে হয়। আমার বর্তমান নিবন্ধটিতে আমি সেই দিকটায় পাঠক সাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা করছি। এটাও করছি আমার বিদ্যাবুদ্ধি ও সাধ্যের সীমার কথা মনে রেখেই। একটা প্রশ্ন উঠতেই পারে এ প্রসঙ্গে। যদি ধরে নেওয়া যায় জীবনানন্দ বিজ্ঞান বিষয়ে, সমসাময়িক বিজ্ঞান বিষয়ে, বেশি পড়াশুনা বা ভাবনাচিন্তা করেছিলেন কিনা সন্দেহ, তাহলে জোর করে এরকম প্রসঙ্গের অবতারণা করার কোনো সার্থকতা আছে কি? এর উত্তরে আমার একটি কথা বলার আছে। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়/তৃতীয় দশক থেকেই পাশ্চাত্য বিজ্ঞানভাবনায় প্রচুর পরিবর্তন ঘটে যাচ্ছে, অনেক নতুন নতুন আবিষ্কারের ফলে। রবীন্দ্রনাথও এই আলোড়নের মধ্যেই পড়েছিলেন সজ্ঞানে। জীবনানন্দের মতো প্রতিভা ও মনীষার কাছে এই আলোড়ন একেবারেই কোনো রেখাপাত করবে না এ হতেই পারে না। বিষ্ণু দে-ও এ ধরনের দর্শনভাবনায় ভাবিত ছিলেন। তার অন্য একটা কারণও থাকতে পারে। বর্তমান তৃতীয় বিজ্ঞান দর্শন, যার শুরু প্রায় বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকেই, প্রাচ্যদর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। সুতরাং প্রাচ্য দেশের যে-কোনো মহৎ কবিপ্রতিভাই ঐ দর্শনকে সহজেই গ্রহণ করবেন। জীবনানন্দও ব্যতিক্রম হতে পারেন না। কিন্তু মূল আলোচনায় প্রবেশ করার আগে আরো দু-চারটি কথা এ প্রসঙ্গে বলে নেওয়া প্রয়োজন বোধহয়।

২.

আলেকজাণ্ডার পোপ 'প্রোপোজড় এপিট্যাফ ফর আইজাক নিউটন' নামে একটি কবিতা লিখেছিলেন। নিউটন ১৭২৭ সালে মারা যান। ঐ কবিতাটির মধ্যে নিম্নোক্ত দুটি লাইন আছে—

> 'Nature and Nature's laws lay hid in night
> God said let Newton be ! and all was right'.

বস্তুতপক্ষে নিউটনীয় যান্ত্রিক বিজ্ঞান তিনশ বছর ধরে মানবসভ্যতাকে এতদূরে নিয়ে এসেছে। এই যান্ত্রিক বিজ্ঞান কতকগুলি সাধারণ নিয়মের মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল। প্রকৃতিকে ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণের মাধ্যমে দেখতে শিখিয়েছে এই বিজ্ঞান। অনিবার্যভাবে কার্যকারণতত্ত্বের শৃঙ্খলায় বাঁধতে চেয়েছে প্রকৃতিকে। সামগ্রিকভাবে দর্শনের মধ্যেও এই প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছে। এরই ফলে যান্ত্রিক সভ্যতার

অগ্রগতি, শিল্পবিপ্লব। এক কথায় নিউটনীয় যান্ত্রিক বিজ্ঞান ও তজ্জনিত দর্শন বর্তমান সভ্যতার নিয়ামক। কিন্তু তিনশ বছর ধরে সভ্যতাকে নিয়ন্ত্রণ করলেও, পাশ্চাত্যের দর্শন চিন্তায় এরকম নির্দেশাত্মক ও কার্যকারণতত্ত্বের সরল যুক্তি দিয়ে বিশ্বকে বোঝবার ক্ষমতা সম্বন্ধে পাশ্চাত্যেরই দু-একজন দার্শনিক সে সময় প্রশ্ন তুলেছিলেন। নিউটনীয় এই দৃষ্টিভঙ্গিতে সময় ছিল প্রত্যাবর্তনমূলক। পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ যেহেতু কক্ষপথে ঘুরে ঘুরে বারবার এক জায়গায় আসছে, সেহেতু সময়েরও প্রত্যাবর্তন হতে পারে। বিশ্বের সম্প্রসারণশীলতার সে সময় কোনো প্রমাণ ছিল না। তাপগতিবিজ্ঞানের শক্তি সম্পর্কিত দ্বিতীয় সূত্র তখনও আবির্ভূত হয়নি। জড় ও জীবনে তখন পার্থক্য ছিল অসীম। সুতরাং প্রকৃতিকে, প্রকৃতির জড়বস্তুকে টুকরো করে ভেঙে দেখার কোনো বাধা ছিল না। যেন, জড়-জগতের ওপর অন্ধ আধিপত্যের জন্যই মানুষের জন্ম। যেন মানুষ, প্রকৃতি ও ঈশ্বরের মাঝখানে অবস্থিত একটি নির্বিকল্প সত্তা। সুতরাং প্রকৃতিকে বশে আনার চেষ্টাই যেন মানুষের কাজ। বিজ্ঞানকেও সেজন্য ক্ষমতার প্রতীকরূপে দেখা শুরু হয়েছিল। নিউটনীয় বিজ্ঞানের চরম প্রয়োগগত লক্ষ্যের পরিচয় পাওয়া যাবে সম্ভবত 'ডুরেনমাটের' 'দি ফিজিসিস্ট্স্' নামক নাটকটিতে। নাটকটি ১৯৬৪ সালে নিউইয়র্ক থেকে প্রকাশিত। এতে তিনজন পদার্থবিদের কথা আছে যাঁরা প্রকৃতির মূল নিয়মগুলিকে বুঝে ফেলে সেগুলির ওপর নিয়ন্ত্রণ আনতে সক্ষম এরকম কোনো আবিষ্কার করে ফেলতে চলেছেন এবং মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য একটা পাগলা-গারদে আশ্রয় নিচ্ছেন। কারণ তাঁরা সফল হলে তাঁদের আবিষ্কার রাজনৈতিক নেতাদের করতলগত হবে এবং সেই রাজনীতিবিদরা তখন নিজেদের ক্ষমতাকে অপব্যবহার করতে সক্ষম হবেন। শেষ পর্যন্ত হলও তাই। ঐ পাগলাগারদেরই একজন কর্তাব্যক্তি তাঁদের আবিষ্কারকে লুকিয়ে চুরি করে বুঝে ফেললেন এবং বিশ্বকে অধিকার করে ফেললেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এ ধরনের সাধারণ নিয়মের সন্ধান কি সত্যিই পাওয়া যাবে নিউটনীয় পদ্ধতিতে? অস্বীকার করার উপায় নেই, এই যান্ত্রিক বিজ্ঞান আমাদের যথেষ্ট উপকার করলেও, ক্রমে আমাদের এনে ফেলেছে যন্ত্রসভ্যতার একটা চরমসীমায়। 'যান্ত্রিক বিজ্ঞানদর্শনের উপকারিতা অপকারিতা' বা 'বিজ্ঞান আশীর্বাদ না অভিশাপ' এ ধরনের স্কুলপাঠ্য রচনা লেখার জন্য এ প্রবন্ধের অবতারণা নয়। যান্ত্রিক বিজ্ঞানের দু-একটি মূল্যবোধ, যা পরবর্তীকালে অনিবার্যভাবে একেবারে পাল্টে গেছে, এরকম দু-একটি মূল্যবোধের পরিবর্তনের কথা আমি বলতে চাইছি এবং 'সাতটি তারার তিমির'-এ পরিবর্তিত দর্শন কী করম ছায়া ফেলেছে তারই একটু আভাস দেবার চেষ্টা করব। এর জন্য যতটুকু ভূমিকার আবশ্যক হবে আমি সেটুকুই বলব।

পাশ্চাত্যদেশে 'ডিডেরো'ই বোধহয় প্রথম বৈজ্ঞানিক তথা দার্শনিক যিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতেই যান্ত্রিক বিজ্ঞানের সীমাকে সকলের দৃষ্টিগোচর করবার চেষ্টা করেছিলেন। যান্ত্রিক বিজ্ঞান তখনও জড় থেকে জীবনের উদ্ভবকে ব্যাখ্যা করতে পারছিল না। 'ডিডেরো'ই প্রথমে জড় থেকে জীবনের সম্ভাবনাকে স্বীকার করেছিলেন এবং সেই দিকে বিজ্ঞানীদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে উইলিয়াম ব্লেকও কবিতাতে লিখলেন—''May God us keep / From single vision and Newton's sleep.''। সুতরাং তখন থেকেই যান্ত্রিক বিজ্ঞানদর্শনের ওপর ভিত্তি করেই ঐ বিজ্ঞানদর্শনকে অতিক্রম করে অন্য বিজ্ঞানদর্শনে পৌঁছনোর একটা প্রবণতা অবশ্যই ছিল। এই প্রবণতার ফলেই বিংশ-শতাব্দীর যুগান্তকারী আবিষ্কারগুলি পাওয়া যাচ্ছে যা

আমাদের বিশ্ববোধ আমূল পাল্টে দিয়েছে। আমরা এখন আর সময়ের প্রত্যাবর্তনশীলতাকে মানি না। আমরা জানি, সময় তীরের মতো একমুখী, গতিশীল। আমরা দ্বৈতবাদকে ক্রমশ অস্বীকার করতে পারছি, জড় থেকে জীবনের সম্ভাবনাকে মোটামুটি বিজ্ঞানসম্মতভাবে প্রতিষ্ঠিত করার ফলে। বিশ্বের সম্প্রসারণশীলতা আবিষ্কৃত হওয়ার জন্য আমরা গতিবাদকে তীব্রভাবে অনুভব করতে পারছি। তাপগতিবিজ্ঞানের দ্বিতীয় সূত্র আবিষ্কারের ফলে আমরা শক্তির চলনশীলতা সম্পর্কে এবং এনট্রপি বা শৃঙ্খলাহীনতা সম্পর্কে বুঝতে শিখেছি। আমাদের জীবন বা যে কোনো প্রকার জীবন, এমনকী গাছপালাও অথবা যেগুলিকে জড়বস্তু বলি সেগুলিও যে চলমান সম্প্রসারিত মহাশক্তির শৃঙ্খলায় পৌঁছনোর চেষ্টার সাময়িক ব্যত্যয় মাত্র, এটাও বুঝতে পারছি। এর নামই এনট্রপি। ব্যাপারটিকে আর একটু সহজ করে বলার চেষ্টা করা যেতে পারে। এনার্জি বা শক্তি উচ্চমাত্রা থেকে নিম্নমাত্রার দিকে ক্রমাগত প্রবাহিত হয়ে যাচ্ছে। একইভাবে শক্তিমাত্রার সমতা আনয়নের চেষ্টা চলছে অনবরত সৃষ্টির আদিমুহূর্ত থেকেই শক্তি মাত্রার সমতা আনয়নের চেষ্টাই হচ্ছে শৃঙ্খলা। পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে শক্তিমাত্রার সমতা রক্ষাই হচ্ছে প্রকৃতির লক্ষ্য। উচ্চমাত্রায় শক্তি নিজে থেকে কখনই স্থির থাকবে না। যদি থাকে তবে সেটা বিশৃঙ্খলা। কিন্তু মানবদেহ, মানবশরীর, গাছপালা—সবকিছুই পারিপার্শ্বিকের নিম্নমাত্রার মধ্যেই অবস্থান করে। পারিপার্শ্বিকের তুলনায় উচ্চতর মাত্রার শক্তিবলয় এই জীবদেহ কী করে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে সমতা রেখে অবস্থান করে? কেন এই শৃঙ্খলাহীনতা? সমগ্র মহাবিশ্বের সম্প্রসারণশীলতার কথা ভাবলে, জীবদেহের উচ্চমাত্রার এই সংহত শক্তি, এই বিশৃঙ্খল মুহূর্ত, যার অপর নাম সৃষ্টি, সব সময়েই পরিপার্শ্বের নিম্নমাত্রার দিকে ধাবিত। এই জন্যই জীবদেহের অবক্ষয়। সমতা ও শৃঙ্খলাতে এসে গেলেই আমরা বলি 'মৃত্যু'। জীবদেহের এই সাময়িক বিশৃঙ্খলাই জীবন। একেই বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় এনট্রপি। যদিও এনট্রপি শব্দটির দ্যোতনা আরো অনেক বেশি তবু আমাদের বুঝবার সুবিধার্থে এটুকু জানলেই যথেষ্ট হবে।

বর্তমান বিজ্ঞানে কার্যকারণতত্ত্বের সীমা দেখা যাচ্ছে। সৃষ্টির মুহূর্ত থেকেই, অর্থাৎ বিগ্-ব্যাংগের সময় থেকেই যদি সবকিছু সৃষ্টি হয়ে থাকে, তবে বিগ্-ব্যাংগের ঠিক পূর্বমুহূর্তে কী ছিল? তখন তো কোনো 'স্পেস্' ছিল না। তাহলে ঐ বিশাল সংহত মহাশক্তি, যা বিস্ফোরিত হয়ে তীব্র গতিতে এখনো সম্প্রসারিত হচ্ছে, তা কোথায় ছিল? বিস্ফোরণ কে ঘটাল? ঘটলই বা কী করে? বিজ্ঞান এ প্রশ্নের উত্তর পায়নি। আবার, সম্প্রসারিত মহাবিশ্ব ক্রমশ সংকুচিত হয়ে পূর্বাবস্থায় ফিরে আসবে কিনা, তাও বুঝে নেবার বিষয়। সুতরাং আমাদের মূল প্রশ্নের কোনো উত্তর এই দুহাজার বছরে পেলাম না। ম্যাক্স্ প্ল্যাঙ্ক বলছেন—'Whence come I and whither go I ? That is the great unfathomable question.'। এই প্রশ্নের সম্মুখীন বর্তমান বিজ্ঞান। খুব সুখের বিষয় আমাদের প্রাচ্য দর্শনেরও মূল প্রশ্ন এটাই। সুতরাং পাশ্চাত্য বিজ্ঞানদর্শন ও প্রাচ্যদর্শন দুটোই আজ এক জায়গায় চলে আসছে। দুটো দর্শন কীভাবে একজায়গায় এসে পৌঁছচ্ছে এটা এ প্রবন্ধের আলোচ্য নয়। তাই এ প্রসঙ্গটিকে আর টেনে নিয়ে যাবার চেষ্টা করব না, অধিকারও নেই আমার কারণ আমি একজন ক্ষুদ্র পদ্যকার মাত্র। বর্তমান বিজ্ঞানে আরো একটা জিনিস লক্ষণীয়। 'থিয়োরী অব্ অনসারটেইন্টি' বা অনিশ্চিতের থিয়োরীতে বস্তুর বিশেষ স্বরূপটি কী তা আমরা বুঝতে পারছি না। সূক্ষ্মতম অবস্থায় কোনো বস্তু ঢেউ না পারটিক্‌ল তা সঠিক জানা যায় না। অর্থাৎ বস্তু আসলে কী তাও আমরা এখনও জানতে পারিনি।

যান্ত্রিক সভ্যতার এত অগ্রগতি সত্ত্বেও আমাদের কাছে মূল প্রশ্নগুলি থেকেই গেল এবং আমরা জ্ঞানতত্ত্বের প্রাথমিক পর্যায়েই এখনও অবস্থান করছি বলে মনে হচ্ছে।

৩.

এবার, যে কটি পরিবর্তিত বোধ নিয়ে আমার বক্তব্য, সেই পরিবর্তিত বোধ কয়েকটিকে দু-একটি কথায় বলার চেষ্টা করা যেতে পারে।

(ক) সময়ের ধারণা (খ) গতিবিজ্ঞানের ধারণা (গ) মহাশক্তি প্রবাহের ধারণা (ঘ) বিবর্তনের ধারণা।

(ক) সময় প্রত্যাবর্তিত হয় না। কিন্তু সময় অনন্ত না কি সময় সীমিত এ ভাবনা এখনও চলছে।

(খ) গতিবিজ্ঞানের ধারণায় এনট্রপি বা বিশৃঙ্খলার তত্ত্ব ও সেই তত্ত্ব থেকে জীবন ও মৃত্যুর ধারণা পুরনো ভাবনাকে বদলে দিয়েছে।

(গ) মহাশক্তির প্রবাহ সময়ের প্রবাহের সঙ্গে একমুখী ও সমতা আনার জন্য সর্বদাই সচেষ্ট।

(ঘ) ডারউইন-ওয়ালেসের তত্ত্ব ও স্ট্যান্‌লে মিলারের পরীক্ষা বিবর্তনবাদকে প্রতিষ্ঠা যেমন করেছে, তেমনি এই পৃথিবীতেই জড় থেকে জীবনের বির্বতন যে সম্ভব সেটাও প্রমাণ করতে পেরেছে।

> [এই প্রবন্ধে বিবর্তনবাদ ও স্ট্যানলে মিলারের পরীক্ষা সম্পর্কে বিশদভাবে বলার চেষ্টা করিনি, আয়তনের কথা চিন্তা করে। বিবর্তনবাদ মোটামুটি বহুজনই জানেন আজকাল, সুতরাং বিশদীকৃত করার প্রয়োজন নেই বোধহয়]

আমরা এই চারটি বোধের ওপর আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব। এই চারটি ধারণা জীবনান্দের 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে কী রকম ছায়াপাত করেছে (কবির জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে যেভাবেই হোক) তা দেখার চেষ্টা করব।

৪.

প্রসঙ্গত এটাও উল্লেখ করা প্রয়োজন যে নিউটনীয় যান্ত্রিক বিজ্ঞানদর্শনের প্রভাবও জীবনানন্দের কবিতার শব্দবন্ধে অনেকসময় খুবই প্রত্যক্ষ। 'সাতটি তারার তিমির'-এ এরকম শব্দ ব্যবহার প্রচুর ; যেমন—'ডাইনামো' 'এরোপ্লেন' 'এয়ারোড্রাম' 'লেন্‌স্‌' 'ওভারব্রিজ' 'ফস্‌ফোরেসেন্‌স্‌' 'স্প্লিন্টার' 'মাইন' 'ম্যাগনেটিক মাইন' ইত্যাদি। কিন্তু এসব বাহ্যিক। কাব্যগ্রন্থটির অন্তরঙ্গে উপরোক্ত চারটি বোধের চমৎকার প্রকাশ। 'রিস্টওয়াচ' কবিতাটিতে পৃথিবীর সমস্ত জিনিসেরই, জীবনেরও, ক্ষণস্থায়িত্ব ও বিশৃঙ্খলার কথা আছে।

'জলপাই পল্লবের তলে ঝরা বিন্দু-বিন্দু
শিশিরের রাশি
দূর সমুদ্রের শব্দ
শাদা চাদরের মতো—জনহীন—বাতাসের ধ্বনি
দু-এক মুহূর্ত আরো ইহাদের গড়িবে জীবনী।
স্তিমিত—স্তিমিত আরো করে দিয়ে ধীরে
ইহারা উঠিবে জেগে অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে।'

যাদের জীবনী দু-এক মুহূর্তের জন্য গড়া হবে, কবিতায় তারা হচ্ছে 'মেঘ', যা সাময়িক ঘনবদ্ধতা ছাড়া আর কিছুই নয়। কিন্তু দু-এক মুহূর্ত পরে আবার তারা জেগে উঠবে এবং যেখানে জেগে উঠবে সেখানটা হচ্ছে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমির।' 'এনট্রপি'র ধারণা না তাকলে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমির' ঠিক হৃদয়ঙ্গম কার যাবে না বোধহয়। এই রৌদ্র বা মহাশক্তি অফুরন্ত কিন্তু মহাশক্তির সমতা বোধহয় কখনই আসে না। আবার সংহত হয়ে 'মেঘ' হতে হয় এবং পুনরায় 'মেঘ' হয়ে জেগে ওঠা মানেই আবার সাময়িক হলেও তিমিরে নিক্ষিপ্ত হওয়া। শক্তি সমতাই যে অন্ধকারের শেষ পর্যায়, অফুরন্ত রৌদ্রের স্থান এবং সাময়িক জীবন যে অন্ধকার, অনন্ত তিমির,তার স্পষ্ট প্রকাশ আছে সপ্তক কবিতায় ঃ

'অনেক হয়েছে শোয়া ;—তারপর একদিন
চলে গেছে কোন দূর মেঘে।
অন্ধকার শেষ হলে যেই স্তর জেগে ওঠে—
আলোর আবেগে ঃ
সরোজিনী চলে গেল অতদূর? সিঁড়ি ছাড়া—
পাখিদের মতো পাখা বিনা?'

'একটি কবিতা নামক কবিতাতেও এই প্রবহমান মহাশক্তির কথা—

'সে আগুন জ্ব'লে যায়
সে আগুন জ্ব'লে যায়
সে আগুন জ্ব'লে যায় দহে নাকো কিছু'।

এই মহাশক্তি প্রবাহের আগুনের মধ্যে আমার জীবন এমনকী রাজহাঁসের জীবনও ভাসমান—

'নিমীল আগুনে ওই আমার হৃদয়
মৃত এক সারসের মতো।
পৃথিবীর রাজহাঁস নয়—
নিবিড় নক্ষত্র থেকে যেন সমাগত—

হতে পারে, আমার মধ্যে যে কণা, ওই রাজহাঁসের মধ্যে যে কণিকা, সব কিছুই সৃষ্টির আদিকালে অন্য এক নক্ষত্রের নিবিড়তায় বর্তমান ছিল। সুতরাং আমরা কেউই পৃথিবীর নই হয়তো বা। সবাই, সব কিছু ওই নিবিড় নক্ষত্র থেকে সমাগত। তবু, এই এনট্রপি, পৃথিবীতে এই মুহূর্তের আগমনও কাম্য, বরণীয়, কারণ এখানেই আমরা লোকশ্রুত আমলকি পেয়ে যাই, পেয়ে যাই অভিজ্ঞান—মায়াবীর মতো যাদুবলেই তা আমাদের করতলগত হয়, কারণ, কার্যকারণতত্ত্ব বলতে তো আর কিছু নেই। যা ঘটে সব কিছুই রহস্যজনক ; এই শক্তিপ্রবাহেরও কোনো ব্যাখ্যা নেই। সব কিছুই রহস্যময়। আইনস্টাইন বলেছেন—'The most beautiful experience we can have is the mysterious.' আমাদের জীবন তাই রহস্যময় খেলা।

'...জীবনের অভ্যুদয়
মধ্যসমুদ্রের 'পরে অনুকূল বাতাসের প্ররোচনাময়
কোনো এক ক্রীড়া—ক্রীড়া ;—'

জীবন শুধু মধ্যসমুদ্রের 'পরে সাময়িক ক্রীড়া।

বিশৃঙ্খলাজনিত হলেও অমাদের পক্ষে তা অনুকূল বাতাস। আর জীবনের অভিভাবিকা হচ্ছে 'নীলিমা', আমাদের প্রিয় অভিভাবিকা। অর্থাৎ প্রকৃতির ওপর আর কর্তৃত্ব নয়, প্রকৃতিকে ভেঙে ভেঙে বিশ্লেষণ করা নয় ; প্রকৃতি, বিশ্বপরিবেশ, নীলিমা, আমাদের বিবর্তনের কারণ, আমাদের জননী, অভিভাবিকা, অর্থাৎ আমরা প্রকৃতির অঙ্গীভূত। বিবর্তনবাদের বোধ জীবনানন্দের ওপর প্রভাব ফেলেছিল কি? সেজন্যই কি এরকম দার্শনিকতা জন্ম নিল জীবনানন্দের মনে? এবং 'অভিভাবিকা' নামের এই কবিতাটি এমন এক মৃত্যুচিন্তায় শেষ হয়, যে মৃত্যু শরীরী মৃত্যু নয় ; বস্তুত শরীরী মৃত্যুর পরে অন্য এক উজ্জ্বলতা যেন—'বেরিলমণির মতো তরঙ্গের উজ্জ্বল আঘাতে মৃত্যু।' বিবর্তনবাদের এই মানসিকতা, প্রকৃতিকে অভিভাবিকা এমনকী ধাত্রী বা জননী হিসাবে কল্পনার এই মানসিকতা 'মনোসরণি' কবিতার শেষাংশেও প্রতিফলিত। বরং বিবর্তনবাদ এখানে সরাসরি উপস্থিত।

'পৃথিবীকে ধাত্রীবিদ্যা শিখায়েছে যারা বহুদিন
সেই সব আদি অ্যামিবারা আজ
পরিহাসে হয়েছে বিলীন।
সূর্যসাগর তীরে তবুও জননী বলে সন্ততিরা চিনে নেবে কারো।'

প্রায়শই বিবর্তন বা অভিব্যক্তিবাদের দার্শনিকতা 'সাতটি তারার তিমির'-এর কবিতাগুলিতে প্রতিফলিত হয়েছে। যেমন আরো একটি উদাহরণ 'রাত্রি' নামক কবিতাটির শেষাংশ ঃ

তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।'

'আনুপূর্ব' এবং 'অতিবৈতনিক' শব্দদুটি এত সুপ্রযুক্ত যে আমরা অন্য কোনো শব্দ ব্যবহারের কথা ভাবতেই পারি না আর। আনুপূর্ব, অর্থাৎ যথাক্রমিক। মানুষ, অন্যান্য প্রাণী বা জন্তুর থেকে ক্রম পরিণতি প্রাপ্ত হয়ে এখন মানুষ এবং মানুষ প্রকৃতির কাছে বা সভ্যতার কাছে যা পেয়ে গেছে ইতিমধ্যে তা তার পাওনা থেকে অনেক বেশি। অতিবৈতনিক মানুষ থামতে শিখবে কবে?

নিউটনীয় যান্ত্রিক দর্শনের দ্বিতীয় বিজ্ঞান বিশ্বরহস্যের অতীব সহজসূত্র সহজভাষা খুঁজে নিতে গিয়ে হয়রান। শেষ পর্যন্ত সহজ সমাধান কিছুই পাচ্ছি না—

'অতীব সহজভাষা খুঁজে নিতে গিয়ে
হৃদয়ঙ্গম করে সব আড়ষ্ট, কঠিন দেবতারা
অপরূপ মদ খেয়ে মুখ মুছে নিয়ে,
পুনরায় তুলে নেয় অপূর্ব গেলাস,'

কিন্তু আবার অপূর্ব গেলাসের মদে চুমুক দিয়েও বিশ্বরহস্যের, জীবনের সহজ সমাধান কিছু পাচ্ছি না এবং এজন্যই—'যখনই চুমুক দিই হয়ে থাকি চর্মচক্ষু স্থির।' 'খেতে-প্রন্তরে' কবিতাতেও একই চিন্তা কাজ করে যাচ্ছে।

'জীবাণুর থেকে আজ কৃষক, মানুষ
জেগেছে কি হেতুহীন সম্প্রসারণে
ভ্রান্তিবিলাসে নীল আচ্ছন্ন সাগরে?'

এই হেতুহীন বিবর্তন, এই হেতুহীন বিশ্বের সম্প্রসারণশীলতা, তার উদ্দেশ্যহীনতা নিয়েও আমাদের 'ভ্রান্তিবিলাসে' আচ্ছন্ন করে রাখবে। মূল প্রশ্নের কোনো উত্তর পাওয়া যাবে না জেনেও আমরা চেষ্টা করে যাব। আমাদের ধনুকের ছিলা টান হয়ে থাকবে। বারো হাজার বছর ধরে চেষ্টা করে মানুষ কী জানতে পেরেছে? ভ্রান্তিবিলাসে আছন্ন আমরা সৃষ্টিরহস্যের কিছুই জানতে পারিনি। এক জীবন থেকে আরেক জীবনে যাচ্ছি। এক মরণ থেকে আরেক মরণে যাচ্ছি। অনন্ত তিমিরে আমরা তিমিরবিনাশী তিমিরশিকারী হতে চাচ্ছি। কিন্তু তবুও কোনো উত্তর নেই।

'আমাদের অভিজ্ঞতা, জ্ঞান, নারী, হেমন্তের হলুদ ফসল
ইতস্তত চলে যায় যে যাহার স্বর্গের সন্ধানে
কারু মুখে তবুও দ্বিরুক্তি নেই—পথ নেই বলে
যথাস্থান থেকে খ'সে তবুও সকলি যথাস্থানে রয়ে যায়।'

যান্ত্রিক বিজ্ঞানের কোনো সাধারণ নিয়ম নয়। সেসব সাধারণ নিয়ম আজ 'আবিষ্ট'। 'শতাব্দীর শেষ হলে এরকম আবিষ্ট নিয়ম নেমে আসে।' কিন্তু কেন এমন হল? আমাদের নির্দেশের কি কোনো ভুল হয়েছিল? জ্ঞানতপস্বীরা—সপ্তর্ষিরা—সাতটি তারাদল—আমাদের যে নির্দেশ দিয়েছিলেন তা কি শুধু তিমিরেই আমাদের ঠেলে দেবার জন্য পুনরায়? পথ কেন ভুল হয়?

'এ রকম কেন হয়ে গেল শেষে সব
বুদ্ধের মৃত্যুর পরে কল্কি এসে দাঁড়াবার আগে।
একবার নির্দেশের ভুল হয়ে গেলে
আবার বিশুদ্ধ হতে কতদিন লাগে?'

এনট্রপির বা জীবনের শৃঙ্খলাহীনতার বোধ খুব স্পষ্ট ভাষায় জীবনানন্দ ব্যক্ত করেছেন 'জীবনের অবিরাম বিশৃঙ্খলা স্থির করে নিতে গিয়ে তবু' ;—। এই তবু শব্দটির পরেই আসে চিরন্তন আশাবাদ। 'সময়ের অনিবার উদ্ভাবনা'র কথা। সময়ের প্রবহমানতার কথা। কিন্তু তার আগেই, আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানদর্শন পাল্টে গিয়েছে বলেই, সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে মৃত্যু ও জীবনের বোধ, জীবন ও মরণের ধারণা 'ট্রান্‌সেন্‌ডেনটাল্‌' হয়ে গেছে বলেই, প্রবাহিত সময়ের দিকেই আমরা চেয়ে আছি—'অন্ধকারে জীবিত ও মৃতের হৃদয়/বিস্মিতের মতো চেয়ে আছে ;/এ কোন সিন্ধুর সুর ;/মরণের—জীবনের?'

'সময়ের সাগরের নিরঞ্জন ফাঁকি' থেকে, এনট্রপি থেকে, শৃঙ্খলাহীনতা থেকে, সময়প্রবাহ ধরেই কেবল যাত্রা করতে হবে নাবিকের মতো, কারণ সময়স্রোত উজ্জ্বল। খুব স্পষ্ট ভাষায় যান্ত্রিক বিজ্ঞানের সার্থকতা সম্বন্ধে প্রশ্ন তুলে নতুন বিজ্ঞানভাবনার বোধ জীবনানন্দের কবিতায় নতুন বিস্ময়ের জন্ম দিচ্ছে, অন্তত 'সাতটি তারার তিমির', কাব্যগ্রন্থটিতে—

'চারিদিকে অগণন মেশিন ও মেশিনের দেবতার কাছে
নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে নিতে গিয়ে তবু
মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল।'.

এই যান্ত্রিক বিজ্ঞানভাবনার পরিসমাপ্তি ঘোষণা করছেন তিনি—'কেবল আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয় ;'।

৫.

বর্তমান বিজ্ঞানদর্শন বলছে বস্তুর স্বরূপ বোঝা যায় না কখনোই খণ্ড করে দেখতে গেলে ; পূর্ণকে, সমগ্রকে না জানতে পারলে কখনোই অংশবিশেষের প্রকৃতরূপ বোঝা যায় না। পারটিক্‌ল্‌ ফিজিক্‌সের বীক্ষণাগারে বস্তুর স্বরূপ নির্ণয় করতে গিয়ে জিওফ্রি চিউ প্রমুখ বৈজ্ঞানিকদের এখন 'বুট্‌-স্ট্র্যাপ' থিয়োরী খাড়া করতে হয়। বলতে হয়, বোঝা গেল না অংশবিশেষকে কারণ আমরা সমগ্রকে জানি না। পুরনো বিজ্ঞানদর্শন এখন আর নেই। জীবনানন্দ বলছেন 'পুরনো সময় সুর ঢের কেটে গেল ;' বলছেন 'এখন তৃতীয় অঙ্ক অতএব ; আগুনে আলোকে জ্যোতির্ময়। বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় বিজ্ঞানদর্শন দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বলছেন কি? অসম্ভব নয়।

৬.

বর্তমান বিজ্ঞানদর্শনের সময় সম্বন্ধে চিন্তা, সময়ের গতির একমুখিনতার বোধ, জীবনানন্দের এই কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য মনে করা যেতে পারে। নাবিক কবিতার—'উজ্জ্বল সময় ঘড়ি—নাবিক—অনন্ত নীর অগ্রসর হয়'। কিন্তু তবুও তাঁর কবিসত্তায় মাঝে মাঝে বহমানতার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়, যদিও বলেন সময় উজ্জ্বল এবং যদিও তিনি প্রচণ্ডরকম আশাবাদী। মনে হয় তিনি অন্ধকার সমুদ্রে তিমির মতন ভেসে যাচ্ছেন ; মনে হয় 'আবহমানের ভাঁড় গাধার পিঠে চেপে আসে।' এরকম মানসিকতার জন্ম হতেই পারে কবির মনে কারণ সময়ের এই বহমানতা আপাতদৃষ্টিতে আমাদের জ্ঞানতত্ত্বের মূল প্রশ্নটির উত্তরে এখনও কোনো নতুন মাত্রা যুক্ত করতে পারিনি। সময়ের একমুখিনতা, গতিশীলতা সম্বন্ধে সন্দেহ মাঝে মাঝে কবিকে বিচলিত করে তোলে। মনে হয় কখনও কখনও গতির মধ্যে ছেদ ঘটে যায়।

'সময় উচ্ছিন্ন হয়ে কেটে গেলে আমাদের পুরোনো গ্রহের
জীবনস্পন্দন তার রূপ নিতে দেরি করে ফেলে—'

হয়তো আমরা কবির সঙ্গে একমত হব না অনেকেই। কেন সময়ের ধারাবাহিকতা কেটে যাবে? তাল কেটে যায় কি? যেতে পারে। কিন্তু বিবর্তন অবশ্যই এক অনশ্বর ধারাবাহিকতা। সময়ের তাল বা ছন্দ কেটে গেলেও বিবর্তন জীবনস্পন্দনকে ঠিক সেইভাবেই রূপায়িত করে নেয় আবার। কখনও কখনও সময়ের গতিশীলতাকেই কবি সন্দেহ করেন। কিংবা হয়তো মনে হয় সময় 'ফাইনাইট' বা সীমিত। এই সীমিত সময়ের কাছে সাক্ষ্য দিতেই যেন আমাদের আগমন পৃথিবীতে। 'সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয়/কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।' সময় কি তাহলে স্থির বিচারক মাত্র? সময় সম্পর্কে এ ধরনের নানা চিন্তা জীবনানন্দের কবিতার অন্যতম আলোচ্য বিষয় হতে পারে পৃথকভাবে। সাধারণত তিনি সময়কে সাগরের সঙ্গে তুলনা করেছেন, যা তরঙ্গ -উদ্বেল ; এবং সাগরকে তো আমরা সীমাহীন অনন্ত বলেই জানি। জীবনানন্দের মনে মাঝে মাঝে সন্দেহের উদ্রেক হলেও ইতিহাসচেতনাকে তিনি পাখির প্রতীকে ব্যক্ত করেছেন, সময়ের গতিকেও পাখি অথবা নক্ষত্রের প্রতীকে ব্যক্ত করেছেন। আর, পাখি এবং নক্ষত্র মানেই তো গতি। (জনান্তিকে, লোকসামান্য, মকরসংক্রান্তির রাতে, সূর্যপ্রতিম ইত্যাদি কবিতার উল্লেখ করা যেতে পারে এ প্রসঙ্গে।) 'সূর্যপ্রতিম' কবিতাটি পড়তে পড়তে তো আমার এরকম একটা অনুভূতি হয় : আমরা এনট্রপির বন্ধনে বিপন্ন, কারণ এই বন্ধনের মধ্যে আমরা ঘুরি কিছুই জানতে না পেরে। অথচ শক্তির প্রচণ্ড চাপে বিচ্ছুরিত

হবার তীব্র ইচ্ছায় নিষ্পেষিত হয়ে শৃঙ্খলার স্রোতে মিশে যাওয়া, মৃত্যুতে মিশে যাওয়া। বর্তমান অবস্থান তাহলে হেতুহীন করুণামাত্র। এরকম বোধ আমাকে গ্রাস করে নেয় 'সাতটি তারার তিমির' পড়তে পড়তে। পাখি, সময়ের গতি, শক্তি, বহমানতার চিন্তা—এবং সবকিছুই হেতুহীন—এই চিন্তাই যখন আমাকে গ্রাস করে তখন জীবনানন্দই জানিয়েছেন, আমরা সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে চলেছি—

> ''আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
> চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধুরীতি, মানুষের-বিষয়-হৃদয়
> জয় অস্তসূর্য, জয় অলখ অরুণোদয়, জয়।'

'সাতটি তারার তিমির'-এর মধ্যে সূর্য, নক্ষত্র, সময়ের উজ্জ্বলতা এবং গতি, আমাদের সামনে অনন্ত আলোর, অনন্ত সম্ভাবনার, অনন্ত বিস্ময়ের দরজা উন্মুক্ত করে দিচ্ছে। এ ধরনের বিস্ময়, এ ধরনের উজ্জ্বলতা মানুষকে চিরদিন উজ্জ্বল অগ্রগতির পথে নিয়ে যাবে, বাঁচিয়ে রাখবে আমাদের বিস্ময়বোধকে, কবিতাকে।

বেলা-অবেলা-কালবেলা ঃ নিবিড় পাঠের সূত্র-সন্ধান

তপোধীর ভট্টাচার্য

'মহাবিশ্ব লোকের ঈশারার থেকে উৎসারিত সময় চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতি সাধক অপরিহার্য সত্যের মতো ; কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে।'

জীবনানন্দের এই বহু-পরিচিত বক্তব্য আজও অম্লান ভাবে প্রাসঙ্গিক নয় শুধু, তাঁর কবিতার পাঠকৃতিকে বিনির্মাণ করার জন্যে আবশ্যিক দিক্‌নির্দেশক। জীবনানন্দের কবিতার নিবিষ্ট পাঠকও সাধারণভাবে তাঁর আদিপর্বের রচনার প্রতি বেশি মনস্ক ; 'সাতটি তারার তিমির'এর প্রতি যদি বা কেউ কেউ আকৃষ্ট হয়েছেন, 'বেলা অবেলা কালবেলা' সম্পর্কে এক ধরনের অনীহা ফুটে ওঠে। এরজন্যে অনেকটা দায়ী কয়েকজন বিখ্যাত সমালোচকের একদেশদর্শিতা ; বিশেষত বুদ্ধদেব বসুর বিভ্রান্তিকর উক্তি। একসময় পরিবর্তনশীল কাব্যভাষার সঙ্গে অপরিচিত বাঙালি পাঠকের মেল-বন্ধন ঘটানোর জন্যে তিনি জীবনানন্দের কবিতাকে 'উপলাহত মন্থর স্রোতস্বিনী'র সঙ্গে তুলনা করেছিলেন। জীবনানন্দের কবিতায় লক্ষ করেছিলেন 'মধুর অবসাদের ক্লান্তি' এবং তাঁর চিত্ররূপময় কবিতার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে লিখেছিলেন 'ছবিগুলো সব মৃদু রঙে আঁকা, তাঁর কবিতার tone আগাগোড়া subdued ; এই toneটি একান্তরূপে তাঁর নিজস্ব এবং তা এমনি melancholy, অপরিসীম অবসাদে আচ্ছন্ন যে বাঙালীর হৃদয়কে তা স্পর্শ না করেই পারে না।' এই বক্তব্যের মধ্যে যে যুক্তি শৃঙ্খলা রয়েছে, সেই অনুযায়ী বাঙালী কবিদের কাজ শুধু বিচ্ছিন্নতা-জনিত অবসাদের আবহ তৈরি করা এবং বাঙালি পাঠকও যেন এছাড়া অন্য কিছুর জন্যে উপযুক্ত নয়। সুতরাং সময়ের গভীরতর মাত্রা আবিষ্কারে সংবেদনশীল জীবনানন্দ যখন মনোযোগী হলেন, বুদ্ধদেব আর তাঁর নির্জনতম কবিকে খুঁজে পেলেন না। এমনকি বুদ্ধদেব আক্ষেপ করে লিখলেন যে জীবনানন্দ রাজনীতি-সংক্রমিত, উদ্‌ভ্রান্ত ও ধর্মচ্যুত হয়ে পড়েছেন। তাঁর প্রাক্তন রচনায় দীপ্যমান নির্জনতার বিশিষ্টতা শেষ পর্বের কবিতায় খুঁজে পাননি। এমনকি এই বক্রোক্তিও করেছেন—'পাছে কেউ বলে তিনি এস্কেপিস্ট কুখ্যাত আইভরি টাওঅরের নির্লজ্জ অধিবাসী, সেই জন্য ইতিহাসের চেতনাকে তাঁর সাম্প্রতিক রচনার বিষয়ীভূত করে তিনি এইটেই প্রমাণ করবার প্রাণান্তকর চেষ্টা করছেন যে তিনি পেছিয়ে পড়েন নি। করুণ দৃশ্য এবং শোচনীয়।... দুর্বোধ বলে আপত্তি নয় ; নিঃসুর বলে আপত্তি, নিঃস্বাদ বলে আপত্তি'। এই মন্তব্যকে বিনির্মাণ করে স্পষ্ট বুঝতে পারি যে বুদ্ধদেব পরিণত জীবনানন্দকে কিছুমাত্র বুঝতে পারেন নি। আসলে, বুঝতে চান নি। ইতিহাস-চেতনা সম্পর্কে বুদ্ধদেবের আপত্তি তাঁর বিশ্ববীক্ষার স্বরূপকে চিনিয়ে দেয়। জীবনানন্দের বহু পরিচিত-স্বীকারোক্তি থেকে আমরা

জেনেছি যে 'কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান'। একথা যদি মেনে নিই যে কবিতা পড়ে মূল্যচেতনা বাড়বার কথা, তাহলে নিছক মধুর অবসাদের ক্লান্তি যোগান দিয়ে যাওয়া কোনো ইতিহাস-সচেতন কবির পক্ষে অসম্ভব। কথাটা হল এই যে বুদ্ধদেব ও জীবনানন্দ প্রকৃতপক্ষে দুটি বিপরীত মেরুর ভাববিশ্বের অধিবাসী। তাই তাঁদের নান্দনিক ও সামাজিক অবস্থান ভিন্ন। অতএব 'বেলা অবেলা কালবেলা'কে, বুদ্ধদেব-প্রভাব-মুক্ত হয়ে, বিনির্মিত পাঠের সাহার্য্যে পাঠক বুঝে নেবেন—এইটে প্রত্যাশিত।

কবির মৃত্যুর পরে, ১৩৩৮ বঙ্গাব্দে বৈশাখ মাসে এই সংকলনটি প্রকাশিত হয়। এর ভূমিকায় অশোকানন্দ দাশ লিখেছেন 'গ্রন্থাকারে প্রকাশ করার জন্যে কবি নিজেই কবিতাগুলি বাছাই করেছিলেন'। এবং 'কবিতা গ্রন্থের নামটি কবি কর্তৃক মনোনীত'। এই নামের মধ্যেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে সময়-অনুশীলনের প্রতি তাঁর দায়বদ্ধতা। যেহেতু মৃত্যু এসে জীবনানন্দকে ছিনিয়ে নিয়ে গেছে, আর কোনদিকে কিভাবে তার কবি-স্বভাবের বিবর্তন হতে পারত কিংবা 'নবপ্রস্থানের দিকে হৃদয় চলেছে' থেকে আর কি সংকেত গ্রহণ করতে পারি আমরা—এ-নিয়েও বিতর্কের প্রয়োজন নেই কোনো। তবে এইটুকু নিশ্চয় বলা যায় যে বুদ্ধদেবের কথা মতো পরবর্তী প্রজন্মের পাঠকেরা 'জীবনানন্দের স্বাদুতাময় আলো-অন্ধকারে অবগাহন' করেন নি কেবল, কবির পাঠকৃতির যাথার্থ বিনির্মাণের মধ্য দিয়ে তাঁর শিল্প স্বভাবের বিবর্তনের পথরেখাটি, সমাপ্তি বিন্দু থেকে, চিনে নিতে চাইছেন।

।। দুই ।।

জীবনানন্দের এই নামকরণের মধ্যে সময় স্বভাবে নিহিত বহুমাত্রিক জটিলতার ইঙ্গিত পাই। সময়ের যে বেলাভূমিতে কবি এবং পাঠক দাঁড়িয়ে রয়েছেন, ক্ষয়ের সংক্রমণের ফলে এই 'বেলা' আসলে অবেলা অর্থাৎ যা কাঙ্ক্ষিত সেইটে রয়ে য়ায় অনর্জিত এবং যা অবাঞ্ছিত সেইটে শেকলের মতো পাকে পাকে জড়িয়ে নেয় মানব সত্তাকে। সুতরাং সময়ের এই বেলাভূমি আসলে নেতি ও নৈরাজ্য দিয়ে আচ্ছন্ন এক কালবেলা মাত্র। কিন্তু কবিকৃতিতে নিহিত পরাভাবা স্বরন্যাসের বিশিষ্টতা দিয়ে পাঠককে জানিয়ে দেয় যে কালবেলাকে মেনে নেওয়ার কথা বলছেন না কবি; তিনি আসলে উত্তরণের প্রেরণায় পৌছাতে চাইছেন। এই কবিতা সংকলনের মৌল অবলম্বন সময় ও সমাজ এবং সময়-সমাজের দ্বিবাচনিকতায় বিধৃত মানব সত্তা যা কিনা ব্যক্তি-আমি ও সমষ্টি-আমির মধ্যে সংযোগের নতুন ধরনের সেতু আবিষ্কার করে নিতে চায়। কবি যেহেতু শব্দ-শিল্পী, শব্দ বিন্যাসের অভিনবত্ব দিয়ে তিনি তাঁর নতুন প্রতিবেদন উপস্থাপিত করেন। এই জন্যে তাঁকে পেরিয়ে যেতে হয় খণ্ডকালের মাত্রা, এবং খুঁজে নিতে হয় 'আরো স্থির দিক্‌নির্ণয়ের মতো চৈতন্য'কে। কারণ গভীর সংবেদনশীলতা নিয়ে তিনি জেনেছেন, অভ্যাসের পৌনঃপুনিকতায় জীর্ণ সমকালীন কবিতার আকরণ সত্যভ্রম পুনরুৎপাদন করে শুধু। ফলে ঐ প্রতিবেদন কবিতার উদ্দিষ্ট সত্যকে প্রকাশ করে না, আচ্ছন্ন করার কৃৎ কৌশল উদ্ভাবন করে যায়। সুতরাং জীবনানন্দকে এমন এক পাঠকৃতি গড়ে নিতে হল, যার সূচনা 'মহাপৃথিবী'র পর্বে, বিকাশ 'সাতটি তারার তিমিরে' এবং 'সম্প্রসারণ 'বেলা অবেলা কালবেলায়'। পরিণতি বলছি না একে, বলছি সম্প্রসারণ, কারণ জীবনানন্দের পাঠকৃতি কী কী ভাবে বিকশিত হতে পারত এইটে অনুমান-নির্ভর। এই পর্বের কবিতায় জীবনানন্দ যেন আবিষ্কার করলেন নতুন করে যে, সত্তার গভীরতর তাৎপর্য অনুভূতিতে ব্যক্ত করার

জন্যে যতই উন্মুখ হওয়া যাক না কেন, আত্মমুখী যাত্রায় কোনো শেষ রেখা নেই। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে সমসাময়িকতার অন্তঃসার শূন্যতাকে যত বেশি বুঝতে পারছিলেন কবি, এর নির্মোককে সত্য বলে ধরে নেয়ার দায় থেকে মুক্তি চাইছিলেন তত। ইতিহাস-চেতনার পুনরাবিষ্কার করে তিনি বিচ্ছিন্নতা পীড়িত ও ক্ষয়ক্রান্ত মিথ্যা বাস্তব থেকে উত্তীর্ণ হতে চাইছিলেন। এই জন্যে 'বেলা অবেলা কালবেলা'র পাঠকৃতিতে ইতিহাস, আলো ও অন্ধকার নিছক শব্দ মাত্র হয়ে থাকে নি, আদিকল্পের গভীরতা ও ব্যাপ্তি নিয়ে বার বার ফিরে ফিরে আসে। সমাজে ও ইতিহাসে যখন ক্রমাগত ভাঙচুর চলতে থাকে, জীবনানন্দের মতো সংবেদনশীল কবির পক্ষে অস্থির সেই ক্রান্তিকালে পুরোনো মূল্যবোধের সঙ্গতি সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন করা ছাড়া অন্য উপায় নেই আর। আবার তিনি যেহেতু তিমির-বিলাসী কবি নয়, তিমির বিনাশী এক অগ্রপথিক-উত্তরণের ভাব ব্যঞ্জনা তাঁর কবিকৃতির মৌল উপাদান। বাচনিক বিন্যাস ও প্রতিবেদনকে আবেগ ও মননের সমন্বয়ে তিনি উপলব্ধি করেছেন ; তাই শব্দ-প্রয়োগে প্রখর নিজস্বতা যেন কবির অস্থির প্রশ্নময় মন ও নতুন মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নের সূচক। অতএব এই সংকলনে আপাত দৃষ্টিতে যাকে উচ্চকিত কণ্ঠস্বর বলে মনে হয়, সেইটে আসলে ইতিহাসবোধ লালিত পুনর্নির্মিত বাস্তবতার অভিব্যক্তি। জীবন যখন নেতির ছায়ায় অবিশ্বাস্য, সে সময় অতিপ্রকট বাস্তবকে প্রত্যাখ্যান করে গভীরতর পরাবাস্তবতার সন্ধান করতে হয়েছে তাঁকে। শব্দের নিজস্ব সারবত্তা আবিষ্কার করার জন্যে যেতে হয়েছে প্রথাবহির্ভূত পথে। অভ্যস্ত শব্দ-সম্পর্কের আলস্য ভেঙে দিয়ে বিবরণ ও পরাসন্দর্ভের মধ্যে সেতু তৈরি করে জীবনানন্দ বাংলা কবিতার দিগন্তকে অনেকটা প্রসারিত করে দিয়েছেন। কবির বক্তব্য এ বিষয়ে কী, সে দিকে এবার দৃষ্টিপাত করা যেতে পারে : 'কবিতা ও জীবন একই জিনিসের দুই রকম উৎসারণ ; জীবন বলতে আমরা সচরাচর যা বুঝি তার ভিতর বাস্তব নামে আমরা সাধারণত যা জানি তা রয়েছে, কিন্তু এই অসংলগ্ন অব্যবস্থিত জীবনের দিকে তাকিয়ে কবির কল্পনা-প্রতিভা কিংবা মানুষের ইমাজিনেশন সম্পূর্ণভাবে তৃপ্ত হয় না।... সাধারণত বাস্তব বলতে আমরা যা বুঝি তার সম্পূর্ণ পুণর্গঠন তবুও কাব্যের ভিতর থাকে না, আমরা এক নতুন প্রদেশে প্রবেশ করেছি।' (কবিতার কথা, ৭)

জীবনানন্দ যাকে নতুন প্রদেশ বলছেন অর্থাৎ কল্পনা-নির্মিত বাস্তব, তার নিছক প্রতিলিপি মাত্র নয় কবিতার পাঠকৃতি। বহু প্রজন্মের জীবনবোধ দিয়ে গড়া বাচনিক ঐতিহ্য যে-সমস্ত আদিকল্পের উৎস, সমকালীন জীবনের বিভিন্ন অনুপুঙ্খ তো তাদের ছায়ায় লালিত হচ্ছে। তাই কবি তাঁর পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান ও ইতিহাস চেতনা দিয়ে আদিকল্পের নতুন বিন্যাস ঘটাচ্ছেন বয়নে। বস্তুত জীবনানন্দের কবিতায় ব্যবহৃত আদিকল্প কখনো কখনো যেন মরা নদীর সেই শুকনো খাত, বহুদিন আগে জলধারা বয়ে-যাওয়ায় স্মৃতিচিহ্ন তাতে নুড়ি ও পাথরে রয়ে গেছে ; নতুন কাব্যবীজের ধারক ও পোষক হয়ে আবার সেখানে জলস্রোতের সংকেত জেগে ওঠে। সেই সূত্রে পাঠকও কবিতা নির্মিতিতে উদ্ভাসনের গোপনকেন্দ্র আবিষ্কার করেন এবং লক্ষ করেন যে পরিচিত বাস্তবতার আধার কবি-প্রতিভার স্পর্শে চরিত্রগতভাবে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। আপাত-দৃষ্টিতে সাধারণ ও অতি পরিচিত শব্দও নির্দিষ্ট অর্থের গণ্ডি পেরিয়ে আদি কল্পের ভূমিকা গ্রহণ করে তখন। পাঠক বুঝতে পারেন, 'জীবনের সঙ্গে গোপনীয় সুড়ঙ্গ লালিত সম্পূর্ণ সম্বন্ধ' তাঁর কাছে উন্মোচিত হচ্ছে। 'বেলা অবেলা কালবেলা'র প্রায় প্রতিটি কবিতায় ইতিহাস-চেতনা এবং ইতিহাসের অন্তর্বর্তী আলো ও অন্ধকারের দ্বৈততা পাঠকৃতির নতুন বিন্যাসকে সম্ভবপর

করে তুলেছে। এই বিন্যাসের প্রধান অনুঘটক হিসেবে কাজ করেছে কবির সামাজিক দায়বদ্ধতা।

চলমান ইতিহাসের মহাসন্দর্ভকে সীমায়িত মানুষ অনুভব করতে পারে শুধু সময় চেতনার নিরিখে। এই সন্দর্ভও তো কোনো বিমূর্ত ও একমাত্রিক আকরণ নয়। একটি নির্দিষ্ট ভাবাদর্শগত অবস্থানে থেকে কোনো কবি বা শিল্পী বা চিন্তাবিদ যখন এর প্রবাহে অন্তর্ঘাত করেন, আসলে কেবলমাত্র তখন এর প্রকৃত তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ঔপনিবেশিক সমাজে এর আদলটি ইচ্ছাকৃতভাবে ঝাপসা করে দেওয়া হয় বলে ইতিহাসের উল্টোমেরুতে কোনো এক কল্পিত অবস্থানে স্বেচ্ছাবাদী কবি-লেখকরা মধুর অবসাদের ক্লান্তি সন্ধান করেন শুধু। এখানেই জীবনানন্দের অনন্যতা যে তিনি ইতিহাসের মহাসন্দর্ভ আর তাঁর পাঠকৃতির নিহিত প্রতিবেদন কোনো দ্বিবাচনিক সম্পর্কে যুক্ত হতে পারে কিনা এই জিজ্ঞাসাকে তিনি নিজস্ব সৃজন-ধর্মী অনুশীলনের বিষয় করে তুলছিলেন। তাঁর উপলব্ধিতে ধরা পড়েছিল যে মানবসত্তার ইতিহাস-নিয়ন্ত্রিত তাৎপর্য শুধুমাত্র বিচ্ছিন্ন এককের বিবেচনা দিয়ে বোঝা যায় না। কারণ তিনি জানতেন, 'mcaning is a communal possibility'! সামূহিক সম্ভাবনার উচ্চারণ 'বেলা অবেলা কালবেলা'র পাঠকৃতিকে বিশিষ্টতা দিয়েছে ; অন্যভাবে বলা যায়, কবির সামাজিক সত্তার প্রত্যয়দৃঢ় কণ্ঠস্বর আমরা এতে শুনতে পাই। যেমন,

> 'সমস্ত ক্লান্ত হতাহত গৃহবলিভূকদের রক্তে
> মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন
> সেই রাত্রির নক্ষত্র আলোকিত নিবিড় বাতাসের মত
> সেই দিনের—আলোর অন্তহীন এঞ্জিন-চঞ্চল—ডানার মতন
> সেই উজ্জ্বল পাখিনীর পাখির সমস্ত পিপাসাকে যে
> অগ্নির মত প্রদীপ্ত দেখে অন্তিম শরীরিনী মোমের মতন।'
> —(আমাকে একটি কথা দাও)

বস্তুত প্রাগুক্ত উদ্ধৃতিতে প্রায় গোটা কবিতার অবয়বটা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। কবিতার ভাষা যে সংকেতের ভাষা এবং কবিতার পাঠ মানে পাঠোদ্ধার—এই সত্য প্রকট হয়ে উঠেছে এখানে।

সীমাবদ্ধ জীবনের ক্লান্তি ও নৈরাশ্যকে প্রাথমিকতা দেয় যে আধুনিকতাবাদী বিশ্ববীক্ষা, ইতিহাস—পটভূমি তাদের দ্বারা কলঙ্কিত হয়ে থাকে। সমস্ত খণ্ডিত রাতের সমন্বয়ে গড়ে ওঠে যে রাত্রির আদিকল্প, জীবনানন্দের কবিতায় সেইটে বার বার দেখা দেয়। পূর্ববর্তী পর্যায়ে যেমন ঘাস, শিশির, আকাশ, তারা ইত্যাদি, আদিকল্পের দ্যোতনায় পুনরাবৃত্ত হয়েছিল, এই পর্বেও অন্ধকার, আলো, রাত্রি নক্ষত্র এবং তাদের প্রতি শব্দ কবিতার প্রধান টানা ও পোড়েন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সংকলনের প্রথম কবিতা 'মাঘ সংক্রান্তির রাতে' শুরু হয়েছে এভাবে : 'হে পাবক, অনন্ত নক্ষত্র বীথি তুমি অন্ধকারে/তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে।' বস্তুত এই কবিতাটি বিভিন্ন আদিকল্পের অন্তর্বয়নে'র সাহায্যে গড়ে উঠেছে। তাই আমরা লক্ষ করি 'অমাময়ী নিশি' 'জ্যোতিসৃষ্টি' 'আঁধার অরব রাতে' 'অন্ধকার শক্তি আমি' ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়ে যেন কবির সম্ভাব্য আকল্পের দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছে। এই প্রবণতা আলোচ্য কবিতা-সংকলনের সাধারণ গোত্র লক্ষণ বলা যেতে পারে। এই প্রসঙ্গে লক্ষণীয় হয়ে ওঠে 'নারী'র উল্লেখ। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জীবনানন্দের কবিতায় নারী বস্তুত নারী-প্রতিমা অর্থাৎ নারীর অবস্থান আদর্শায়িত।

উপন্যাসে, গল্পে জীবনানন্দের নারী একমাত্রিক, প্রকৃতপক্ষে এতটা জুগুপ্সায়িত যে কবিতার নারী-প্রতিমাকে দূরতর নক্ষত্র বলেই মনে হয়। এর রহস্য সম্ভবত এই যে কবিতায় নারী জীবনানন্দের মহাসময় ও ইতিহাসের মহাসন্দর্ভের সঙ্গে সম্পর্কিত কিন্তু গদ্যে নারী খণ্ডকালের বিচূর্ণিত বাস্তবতার প্রতিনিধি। এই মন্তব্যের প্রেক্ষিতে 'তোমাকে' কবিতার কিছু পঙ্‌ক্তি উদ্ধৃত করা যায় ঃ

'রৌদ্রবরণ দেখেছিলাম কঠিন সময়-পরিক্রমার পথে—
নারীর, তবু ভেবে বহিঃ প্রকৃতির।
...   ...
আশ্বিনের এই শীত স্বাভাবিক ভোরের বেলা হলে
বলে ঃ 'আমি রোদ কি ধূলো পাখি না সেই নারী?'
তবুও তোমায় জেনেছি, নারি, ইতিহাসের
শেষে এসে ; মানব প্রতিভার
রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকারে
মানবকে নয়, নারি, শুধু তোমাকে ভালবেসে
বুঝেছি নিখিল বিষ কি রকম মধুর হতে পারে।'

প্রাগুক্ত মন্তব্যের কথা মনে রেখে তা হলে বলা যায়, অবক্ষয়-দীর্ণ অন্ধকারের বলয় থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে কবি যে ইতিহাস চেতনাকে তাঁর অবলম্বন করতে চান, নারী-প্রতিমা যেন তারই অন্যতম অভিব্যক্তি। খণ্ডকালের অভিজ্ঞতা যে বিষের দহন নিয়ে আসে, সেইটে থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্যে ইতিহাসের মহাসন্দর্ভে পৌঁছানোর সারথি হয়ে ওঠে আলোক-প্রতিমা নারী। একথা যদি মনে রাখি, তাহলে নারী ও এক আদিকল্প এবং গতি ও উত্তরণের প্রতীক। 'অনেক নদীর জল' কবিতায় পাই ঃ

যে নারী দেখেনি কেউ—
ছ' সাতটি তারার তিমিরে
হৃদয়ে এসেছে সেই নদী।

প্রেম
ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি।'

তার মানে লিঙ্গ-বিভাজিত সমাজের অন্তেবাসী নারী পাঠকৃতিতে আর নিষ্পেষিত নয়। সভ্যতার আবরণের আড়ালে পুঞ্জীভূত অন্ধকারকে পেরিয়ে যাওয়ার জন্যে আলোর ইশারা নিয়ে আসে প্রতিমায়িত নারী।

।। তিন ।।

'শতাব্দী' কবিতায় জীবনানন্দ একটি গভীর তাৎপর্যবহ বার্তা নিয়ে এসেছেন যেন ঃ

'ইতিহাসের সমস্ত রাত মিশে গিয়ে / একটি রাত্রি আজ পৃথিবীর তীরে / কথা ভাবায়, ভ্রান্তি ভাঙে, ক্রমেই বীতশোক / করে দিতে পারে বুঝি মানব ভাবনাকে /...আজকে আলো গভীরতর হবে কি অন্ধকারে'

এই নিবন্ধের শুরুতে লিখেছিলাম, আলো ও অন্ধকারের দ্বৈততা-জনিত টানা-পোড়েনকে জীবনানন্দ কবিতার পাঠকৃতিতে বার বার ব্যবহার করেছেন। পাশাপাশি—আমরা লক্ষ করছি—'রাত্রি' আদিকল্পের আশ্চর্য প্রয়োগ। একটু আগে

উল্লিখিত 'অনেক নদীর জল' কবিতায় পেয়েছি : 'কল্যাণ কল্যাণ, এই রাত্রির গভীরতার মানে।' এই সংকেতকে মনে রাখি যদি, তা হলে 'শতাব্দী' কবিতার পূর্বোদ্ধৃত পঙ্ক্তি বুঝতে অসুবিধে হয় না। জীবনানন্দের সূক্ষ্ম অনুভূতির চমৎকার প্রকাশ ঘটেছে 'রাত' ও 'রাত্রি'র বিপ্রতীপ ব্যবহারে। তদ্ভব 'রাত' শব্দের আট পৌরে ভঙ্গিতে বুঝতে পারি, এইটে আপাত-সময়ের দ্যোতক অর্থাৎ 'রাত্রি' আদিকল্পটির তৎসম রূপ অন্তর্বর্তী প্রকৃত-সময়ের দ্যোতনাকে চিনিয়ে দেয়। এ ধরনের প্রয়োগ লক্ষ করি 'সূর্য নক্ষত্র নারী' কবিতায় : 'কোথাও জলকে ঘিরে পৃথিবীর অফুরাণ জল/রয়ে গেছে /...আকাশের সপ্রতিভ নক্ষত্রকে চিনে উদীচীর / কোনো জল কী করে অপর জল চিনে নেবে অন্য নির্ঝরের?' এখানে প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রথম-প্রযুক্ত 'জল' শব্দের দ্যোতনা সীমায়িত অস্তিত্ব বাচক এবং শেষোক্ত 'জল' শব্দটি পরমতার ইঙ্গিতবহ। 'অন্ধকার' শব্দকে যে জীবনানন্দ আদিকল্প হিসেবে বেছে নিলেন আলাদা ভাবে এই তথ্য নিশ্চয়ই গুরুত্বপূর্ণ ; এছাড়া এর প্রয়োগের পৌনঃপুনিকতা পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ না করে পারে না। 'শতাব্দী' কবিতার প্রথম এবং শেষ পঙ্ক্তিতে রয়েছে এই 'অন্ধকার'; সমাপ্তি বিন্দু থেকে লক্ষ করলে, এতে মনে হয় যেন কবির বীক্ষণ বৃত্তটি বিভিন্ন অনুষঙ্গের মধ্য দিয়ে সম্প্রসারিত হয়ে সম্পূর্ণতা পাচ্ছে। ভারতীয় মার্গ সঙ্গীতে যেমন সুরের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিস্তার সমে এসে পূর্ণতা পায়, জীবনানন্দের পাঠকৃতির আদিকল্পও নিজস্ব, পরিক্রমাটি সম্পূর্ণ করে নেয়ার পথে 'নীড় গঠনের সমবায়ের শান্তি সহিষ্ণুতার' আহ্বানকে নান্দনিক বৈধতা দেয়। প্রাগুক্ত 'সূর্য নক্ষত্র নারী' কবিতার দীর্ঘায়ত পাঠকৃতি যদি লক্ষ করি দেখব তাতে 'অন্ধকার'—আদিকল্পের বহুল ব্যবহার ঘটেছে। কখনো লিখছেন : 'মানুষ অপরিজ্ঞাত সে—অমায়', কখনও বা লিখছেন : 'অন্ধকার অনন্ত', 'সৃজনের অন্ধকার', 'ব্রহ্মাণ্ডের অন্ধকার', 'ধ্বংস মত্ত অন্ধকার', 'অন্ধকার ভাল ভেবে' ইত্যাদি।

এই পুনরুক্তির প্রবণতা সাধারণ ক্ষেত্রে অস্বস্তিদায়ক হয়ত, কিন্তু জীবনানন্দের শব্দময় জগতে একে কিছুমাত্র অস্বাভাবিক বলা যায় না। বরং জীবনানন্দের চেতনালোকের সূক্ষ্ম সংবিদ এতে ব্যক্ত হয়েছে। এই কবিতার নাম করণে (সূর্য নক্ষত্র নারী) যে আদিকল্পের সমবায়ী অস্তিত্বের ইঙ্গিত রয়েছে, পাঠকৃতিতে ঘটেছে তার বহুস্তরান্বিত বিস্তার। আর, এতে কবির সময়-চেতনা ও ইতিহাস-বোধের প্রতি দায়বদ্ধতা স্পষ্টভাবে বিবৃত হয়েছে। যেমন কবি জানাচ্ছেন, তিনি 'অন্য সব প্রেমিকের মত / বিরাট পৃথিবী আর সুবিশাল সময়কে সেবা করে আত্মস্থ' হতে চান। তিনি আরো লক্ষ করেন, 'পিছনের পটভূমিকায় সময়ের / শেষ নাগ ছিল, নেই!' এর স্পষ্ট তাৎপর্য এই যে মহানাগ বাসুকির মতো ঐতিহ্য কবির জগৎকে ধারণ করেছিল দীর্ঘদিন, কিন্তু আধুনিকতাবাদী বিশ্ববীক্ষায় ঐতিহ্যের আশ্রয় নিরাকৃত হয়ে গেছে। এই ভাবনার সূত্র ধরে কবি জানাল : 'অল্পায়ু রঙিন রৌদ্রে মানবের ইতিহাসকে না জানে কোথায় চলেছি!' ইতিহাস-চেতনার অভাবেই মানুষের গন্তব্যহীন যাত্রা নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছে এখন। এই কবিতার পাঠকৃতিতে আরো লক্ষ করি 'ঐশীকাল ভেঙে ফেলে দিয়ে / নতুন সময় গড়ে নিজেকে না গড়ে' যাওয়ার কথা। অর্থাৎ মহাসময়ের চিরায়তনকে অস্বীকার করে আধুনিককাল যে খণ্ডিত আবহ গড়ে তুলতে চায়, তাতে শেষ পর্যন্ত কারো প্রতিষ্ঠা হয় না। কবি যখন লেখেন—'অপার কালের স্রোত না পেলে কী করে তবু, নারি,/তুচ্ছ, খণ্ড, অল্প সময়ের স্বত্ব কাটায়ে অঋণী তোমাকে কাছে পাবে'—সে সময় একটু আগে প্রস্তাবিত ব্যাখ্যা সমর্থিত হয়। জীবনানন্দের দৃষ্টিতে নারী

প্রতিমা প্রকৃত সময়ের সঙ্গে যেমন অন্বিত হয়ে যায়, তেমনি আপাত-সময়ের তুচ্ছতা থেকে উত্তরণের প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত হয়ে ওঠে। আমরা এও বুঝতে পারি, আজকের উত্তরণশীল চেতনা কেন জীবনানন্দের কাছে ঋণী। এই ভাবনারই সম্প্রসারণ ঘটেছে নিম্নোধৃত পঙ্‌ক্তিতে ঃ

'যে দেশে নক্ষত্র নেই—কোথাও সময় নেই আর—
আমারো হৃদয়ে নেই বিভা।'

।। চার ।।

প্রকৃতপক্ষে আমরা লক্ষ করি যে জীবনানন্দ বাংলা কবিতার জন্য বিকল্প বয়নের প্রস্তাবনা করছেন যার মর্মমুলে রয়েছে নান্দনিক ও সামাজিক ভাবাদর্শগত দৃঢ় অবস্থান গ্রহণের আকুতি। দেখি যে কবি বস্তু সম্বন্ধে যুক্ত করছেন অনুভূতির চকিত স্পর্শ, সূক্ষ্মতর ব্যঞ্জনা নতুন কোনো আলোর ঈশারা আর গভীরতর আয়তন পেয়ে যাচ্ছে বাক্‌ব্যবহার। ফলে বাচনিক অভ্যাসের শৃঙ্খল ভেঙে যায়, বাস্তবের মধ্যে ফুটে ওঠে পরাবাস্তবের আদল এবং উপস্থিতকে ছাপিয়ে যায় অনুপস্থিতের ব্যঞ্জনা। যেমন ঃ

'এইখানে শূন্যে অনুধাবনীয় পাহাড় উঠেছে,
ভোরের ভিতর থেকে অন্য এক পৃথিবীর মত।'
(মহিলা)

কিংবা

'আজকে যখন সান্ত্বনা কম, নিরাশা ঢের, চেতনা কালজয়ী
হতে গিয়ে প্রতি পলেই আঘাত পেয়ে অমেয় কথা ভাবে—
....
ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু—
নর নারীর ভিড়
নব নবীন প্রাক্ সাধনার ; নিজের মনের সলে পৃথিবীতে
ক্রেমলিনে লণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন অমল পৃথিবীর।'
(প্রয়াণ পটভূমি)

জীবনানন্দের কালজ্ঞান ও ইতিহাস বোধ যেমন এখানে স্পষ্ট, তেমনি উত্তরণের পাঠকৃতি নির্মাণের তাগিদও খুব স্পষ্ট। সর্বব্যাপ্ত এক রাজনৈতিক অবচেতনার অমোঘ উপস্থিতির কথা ফ্রেডরিক জেমসন আমাদের জানিয়েছেন ; এখানে তার সৃজনশীল অভিব্যক্তি লক্ষ করি। মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা যে ক্রমাগত এগিয়ে যাওয়ার দিকে, এ বিষয়ে জীবনানন্দের বিশ্বাস কোন গভীরতর মাত্রাকে ছুঁয়েছে এখানে তার প্রমাণ পাই। সমকালীন প্রতীচ্য সাহিত্য সম্পর্কে কবি নিবিড় ভাবে অবহিত ছিলেন ; কিন্তু তাঁর আস্থা ছিল সমন্বয় ও সংশ্লেষণে। আপাত-কালের রম্যতা তাঁকে পথভ্রষ্ট করেনি ; তিনি ঐতিহ্যের সদর্থক পুনর্নির্মাণ করে গিয়েছিলেন।

এর বহু প্রমাণ ছড়িয়ে রয়েছে 'বেলা অবেলা কালবেলা'র বিভিন্ন কবিতায়। লক্ষণীয় যে কোনো ক্ষেত্রেই জীবনানন্দ প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার আবহকে অস্বীকার করেন নি। তাই তাঁর কবিতার ভাষায় আশ্চর্য সব বিপ্রতীপতার সহাবস্থান ঘটে গেছে। যেমন ঃ

'ধূমাবতী, মাতঙ্গী, কমলা, দশমহাবিদ্যা নিজেদের মুখ
দেখায়ে সমাপ্ত হলে সে তার নিজের ক্লান্ত পায়ের সংকেতে

পৃথিবীকে জীবনের মত পরিসর দিতে গিয়ে
যাদের প্রেমের তরে ছিল আড়ি পেতে'

কিংবা— (মহিলা)

'মনে হয় নগরীর শিয়রের অনিরুদ্ধ উষা সূর্য চাঁদ
কালের চাকায় সব আর্যপ্রয়োগের মত ঘোরে।'

(প্রিয়দের প্রাণে)

জীবন সম্পর্কে প্রগাঢ় সচেতনতা ছিল বলেই আপাতকালের অভিব্যাক্তিতে আচ্ছন্ন না থেকে তিনি প্রকৃত কালের সংকেত খুঁজে পেয়েছেন প্রত্নকথা ও ঐতিহ্যের বিভিন্ন আয়তনে। এই জন্যে তাঁর ভাষাও আদিকল্পাশ্রয়ী, কিন্তু আশ্চর্য সূক্ষ্ম কল্পনা-প্রতিভার শক্তিতে তিনি লোকায়ত বাক্‌স্পন্দনে নিজের আকল্পকে পুনর্বিন্যস্ত করে নিয়েছেন। মনে হয়, জীবনানন্দ 'মানব প্রতিভার রূঢ়তা ও নিষ্ফলতার অধম অন্ধকার' থেকে মুক্তি চাইছেন ; ক্রম পরিণতির পথে যে-মানুষ সংখ্যাহীন রক্তাক্ত ভূমি পেরিয়ে এসেছে, তাকে কবি 'অসার আলোর ব্যসন' ও মিথ্যা আত্মপ্রতারণা ছাড়িয়ে সত্যিকারের আলোয় প্রতিষ্ঠিত করতে চাইছেন। এইটে অভ্যস্ত বাক্ প্রকরণে সম্ভব নয় বলে লোকায়ত কথন ভঙ্গির নির্যাস তিনি আহরণ করে নিচ্ছেন। সমসাময়িক অভিজ্ঞতার সঙ্গে ঐতিহ্যের মেলবন্ধন ঘটাতে চাইছেন বলে তাঁকে আদিকল্প ও প্রত্নকথার উপকরণকে পুনর্নির্মাণ করে নিতে হচ্ছে। এই প্রসঙ্গে জীবনানন্দেরই একটি গুরুত্বপূর্ণ উচ্চারণ স্মরণ করা যেতে পারে : 'জীবন লোকায়ত হচ্ছে, মানুষের জীবনের সমস্যা মানুষকেই স্থির করতে হবে, কোনো অগম্য পাহাড় চূড়ার ও পারের আকাশকে দিয়ে কিছু হবে না : সে উপলব্ধির বিষণ্নতা ক্রমে আত্মনির্ভরের উজ্জ্বলতায় গিয়ে দাঁড়াচ্ছে।' ('কি হিসেবে শাশ্বত', কবিতার কথা ৪৮)

এই যে বিষণ্ণতা থেকে আত্ম-নির্ভরতায় উত্তীর্ণ হওয়ার কথা জানাচ্ছেন জীবনানন্দ, তার সামগ্রিক অভিব্যক্তি অর্থাৎ ভাবগত ও ভাষাগত নবপ্রস্থান আসলে সংকীর্ণ আধুনিকতাবাদী পরিধি থেকে উত্তরণের বার্তা নিয়ে এসেছে। এই বার্তার প্রেরণায় 'বেলা-অবেলা কালবেলা'তে গদ্য ও পদ্যের দ্বান্দ্বিকতা নতুন আয়তন পায়নি শুধু, বাহির ও ভেতর বা ব্যক্তি ও সমাজ কিংবা সাম্প্রতিক ও চিরকালের দ্বান্দ্বিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার সত্যকে নতুন উচ্চতায় নিয়ে গেছে। জীবনানন্দের সমকালীন বাংলা কবিতা যখন বৌদ্ধিকতা ও আত্মরতির উপাসনা করে ক্রমশ সাধারণ পাঠক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে, সে সময় কবি যে প্রচলিত প্রকরণ থেকে পুরোপুরি সরে দাঁড়িয়ে সৃষ্টিশীল উদ্যমের নতুন ভাষ্য তৈরি করে পাঠকের সঙ্গে সংযোগের সম্ভাবনাকে পরখ করে নিতে চাইলেন, এর মূল্য কিছু কম নয়। বস্তু-স্বরূপের বহুমাত্রিকতাকে অনুভব করতে পেরেছেন বলেই তাঁর পাঠকৃতিতে সামগ্রিকতার বোধ জগৎ ও জীবনের বিভিন্ন মাত্রাকে স্পর্শ করে থাকে। এর অনেক উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। বস্তুত উদাহরণ দেয়াও যথেষ্ট নয় ; কবিতার সমৃদ্ধ ভাষাকে বিনির্মাণ করার জন্যে শব্দানুষঙ্গের অন্তর্নিহিত দ্বিবাচনিকতাকে লক্ষ করা প্রয়োজন। ইতিহাস-লব্ধ অভিজ্ঞতা যত নেতিবাচক হোক না কেন, কবি তো অপ্রতিহত গতিতে বিশ্বাসী। তিনি জানেন গভীরতর অনুভবে এবং সেজন্যে তাঁর আত্মিক উদ্ভাসন কবিতার সূক্ষ্ম স্বরন্যাসে ব্যক্ত হয় :

'প্রাণাকাশে বচনাতীত রাত্রি আসে', এই তাঁর অস্খলিত প্রত্যয়। আর, এখানেই তিনি

উত্তর প্রজন্মের কাছে প্রেরণার উৎস। যত না কেন নেতি ও নৈরাজ্য দ্বারা মথিত হোক জীবন, তাঁর চোখে পড়ে পুনরুত্থান আর নবপ্রস্থানের সম্ভাবনা : 'এরপর আমাদের অন্তর্দীপ্ত হবার সময়'। কবির জগৎ মানুষের অপরাজেয় সত্তাকে কি ভাবে প্রাধান্য দেয় 'বেলা অবেলা কালবেলা'র পাঠকৃতি তার চমৎকার স্মারক। যেমন :

'তবু ও শ্মশান থেকে দেখেছি চকিত রৌদ্রে কেমন
জেগেছে শালিধান
ইতিহাস-ধূলো-বিষ উৎসারিত করে নব নবতর
মানুষের প্রাণ
প্রতিটি মৃত্যুর স্তর ভেদ করে একতিল বেশি
চেতনার আভা নিয়ে তবু
খাঁচার পাখির কাছে কী নীলাভ আকাশ
নির্দেশী'
(অন্ধকার থেকে)

উদ্ধৃতির শেষ পঙ্‌ক্তিতে খাঁচার পাখি ও নীলাভ আকাশের মধ্যে যে বিপ্রতীপতার দ্যোতনা তৈরি হয়, উদ্ধৃতির প্রথম পঙ্‌ক্তিতে শ্মশান ও শালিধান কিংবা পরবর্তী পঙ্‌ক্তিতে প্রাণ ও মৃত্যুর বৈপরীত্য বয়নের এক বিশিষ্ট ধরনের দিকে পাঠকের মনোযোগকে কেন্দ্রীভূত করে। বদ্ধতা থেকে মুক্তির দিকে যাওয়ার কথাই লিখেছেন জীবনানন্দ। কিন্তু এই পথে সহযাত্রী যদি হতে হয় পাঠককে, নিজের পাঠাভ্যাসের বৃত্তকে আগে ভেঙে দিতে হবে। যতক্ষণ এইটে না হচ্ছে কবির কল্পনা-প্রতিভার স্বরূপ পুরোপুরি উদ্ঘাটিত হতে পারে না।

।। পাঁচ ।।

এই বইতে শব্দ যতটুকু প্রকাশ করে, তার চেয়ে অনেক বেশি রয়ে যায় অনুভবের নিঃশব্দে আয়তনে। কবিতার উপকরণে যে দ্বন্দ্ব আভাসিত হয়, সেইটে এই জগতের পরস্পর-বিরোধী অনুপুঙ্খের আশ্রয়। সমালোচকেরা যাকে বলেন 'extra-semantic load,' সেই বচনাতীত অভিব্যক্তি জীবনানন্দের বিভিন্ন পাঠকৃতিতে উপলব্ধির সূক্ষ্মতর স্তর-বিন্যাসের নিদর্শন হিসেবে বার বার ফুটে উঠেছে। এই সংকলনে শব্দ কখনো অন্তর্নাট্যের অনুষঙ্গ, কখনো প্রকল্পনার সূত্রধার, কখনো বা অভিজ্ঞতার কুশীলব। বিনির্মিত পাঠের মধ্য দিয়ে পাঠকও বিরামবিহীন এক অন্তর্নাট্যের শরিক হয়ে পড়েন। খণ্ড কাল থেকে মহাসময়ের দিকে পাড়ি দেয়ার জন্যে কবি ইতিহাস-চেতনাকেই তাঁর মাধ্যম করেন, ইতিমধ্যে একথা দেখেছি। এই ইতিহাসবোধ আসলে কবির উত্তরণ পিপাসু অস্তিবাদী প্রত্যয়ের অন্য নাম। জীবনানন্দের মতে, মানুষের মৃত্যু হলেও বেঁচে থাকে যে মানব, তার সমাজের শেষ পরিণতি গ্লানি নয় এবং 'মানব ক্ষয়িত হয় না জাতির ব্যক্তির ক্ষয়ে।' (যতদিন পৃথিবীতে), এই চমৎকার আস্তিক্যবাদী উচ্চারণ ক্ষয় ক্লিষ্ট আধুনিকতাবাদের পরিধিকে পেরিয়ে যায়। কবি যেন স্বপ্ন ও বিশ্বাসকেই পুনর্নির্মাণ করেন। এদিক দিয়ে বলা যায়, গভীরতর সংবেদনার ক্ষেত্রে কবি 'রূপসী বাংলা' ও 'বনলতা সেন' পর্বের ভাব-নির্যাসের সঙ্গে সঙ্গতি শেষ পর্যন্ত রক্ষা করে চলেছেন। যে কবি একদা লিখেছিলেন— 'মরণের হাত ধরে স্বপ্ন ছাড়া কে বাঁচিতে পারে', তাঁর পক্ষেই জীবনের প্রতি গভীর মমতায় নিম্নোক্ত উচ্চারণ করা সম্ভব :

'পথ থেকে পথান্তরে সময়ের কিনারার থেকে সময়ের
দূরতব অন্তঃস্থলে সত্য আছে, আলো আছে, তবুও
সত্যের আবিষ্কারে।'

(মহাত্মা গান্ধী)

জীবনানন্দেব পাঠকৃতি বিনির্মাণ করে আমরা বুঝতে পারি, তিনি নির্বিকার 'সভ্যতার মেদ' ও ইন্দ্রলুপ্তিকে মেনে নিতে পারেননি ; সমস্ত অসামঞ্জস্যও মুখোশের সাড়ম্বর আয়োজনেব বিরুদ্ধে দ্বিধাহীন প্রতিবাদ শাণিত করে তুলেছেন। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় ব্যক্তি যখন আত্মবিলোপেব ভয়ে সন্ত্রস্ত, মৃত্যুর সৈকতে স্বপ্ন নিছক কল্পনা, মন্থর কালের স্রোতে সর্বনাশ স্তূপীকৃত আর জগৎ বিধানে কেন্দ্র নেই কোথাও—সে সময় জীবনানন্দ কবিতাকে শুধুমাত্র অন্ধকারের ভাষ্য হিসেবে উপস্থাপিত করেন নি, উত্তরণের সংকেতও খুঁজে গেছেন। লক্ষ করেছেন ঃ 'সময়ের অমেয় আঁধারে / জ্যোতির তারণ কণা আসে।' এই উচ্চারণে আরো একবার প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠেন কবি উত্তর-প্রজন্মের কাছে। এই জীবনানন্দকে যদি বুঝতে চাই, 'বেলা অবেলা কালবেলা'র পাঠকৃতিকে নিবিড় অধ্যয়নের মধ্য দিয়ে আত্মস্থ করা প্রয়োজন। কবিতাকে জীবনসম্পৃক্ত শিল্প বলে যদি সত্যিই জানি, তাহলে রোমান্টিক কাব্যচর্চা-জনিত অভ্যাসের ছায়ায় কবি এবং তাঁর রচনাকে কেন বিমূর্তায়িত করে তুলব? বস্তুত সাধারণভাবে কবি এক ধরনের জীবনাতিযায়ী অবস্থানে আদর্শায়িত হয়ে যান বলে জীবনানন্দের শেষ পর্বের কবিতা ঐ প্রথাসিদ্ধ পাঠককে অস্বীকার করে। দৈনন্দিন বাস্তবের অতি পরিচিত ও অতিব্যবহৃত অবযব থেকে জীবনানন্দ যে সংকেতের পরম্পরা গড়তে চেয়েছেন, এই ধারণার যথার্থতা পরখ করে নেয়ার উপায় প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর পাঠকৃতিতেই। জীবনানন্দ আপাত বিবরণময় প্রতিবেদন উপস্থাপনাব মধ্য দিয়ে যে বিকল্প বয়নকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছেন, এইটে মনে রেখে শব্দান্তর্বর্তী নৈঃশব্দ্যকে লক্ষ করতে হবে। অর্থাৎ জীবনানন্দের কবিতার পাঠ পরাসন্দর্ভের উপলব্ধি ছাড়া অসম্পূর্ণ। তাই, কবি যে 'কত শত রূপান্তর ভেঙে জয়জয়ন্তীর সূর্য' পাওয়ার কথা বলেছেন, এর নিহিতার্থ পাঠকৃতির আকরণেই প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আগেই বলেছি, এই সংকলনের চিন্তাবীজ সংহত ও প্রসারিত হয়েছে প্রগাঢ় সময়-চেতনা ও ইতিহাস-বোধের দ্বিবাচনিক সম্পর্কে। এই মাত্র যে আকরণের কথা বলা হল, তাকে যুক্তি গ্রাহ্য করে তোলে কবির সংকেতঋদ্ধ প্রতিবেদন। যেমন ঃ

(১) 'আজ এই শতাব্দীতে সকলেরই জীবনের হেমন্ত সৈকতে
বালির উপরে ভেসে আমাদের চিন্তাকাজ সংকল্পের তরঙ্গ কঙ্কাল
দ্বীপ সমুদ্রের মতো অস্পষ্ট বিলাপ করে তোমাকে আমাকে
অন্তহীন দ্বীপহীনতার দিকে অন্ধকারে ডাকে' (হেমন্ত রাতে)

(২) 'যে আলো অর্ঘ্য ইতিহাসে আছে, তবুও উৎসাহ
নিবেশ যেই জনমানসের অনির্বচনীয় নিঃসঙ্কোচ
এখনও আসেনি তাকে বর্তমান অতীতের দিকচক্রবালে বারবার
নেভাতে জ্বালাতে গিয়ে মনে হয় আজকের চেয়ে আরো দূর
অনাগত উত্তরণ লোক ছাড়া মানুষের তরে
সেই প্রীতি, স্বর্গ নেই, গতি আছে—তবু
গতির ব্যসন থেকে প্রগতি অনেক স্থিরতর' (ইতিহাস যান)

(৩) 'অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের
ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত নাকি? তবু, অজাগন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মত প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
স্বর্গে 'সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে' (পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে)

।। ছয় ।।

বলা বাহুল্য এধরনের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। পাঠকের দায়িত্ব শুধু এই পাঠকৃতির বিনির্মাণ করে জীবনানন্দের পরাপাঠের সমগ্রতায় পৌঁছানো। কবিতায় বিনোদনের আবহ দীর্ঘকাল ধরে এত সূক্ষ্মভাবে ব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে যে জীবনানন্দ যখন তাঁর কবিতাকে চিত্তদ্রাবী বিনোদনের নাগপাশ থেকে মুক্ত করে বিকল্পনন্দন প্রসূত বিকল্প বয়নের আদল তৈরি করেন, স্বাদহীনতা কিংবা দুর্বোধ্যতার অভিযোগ তুলে আধুনিকতাবাদীরা ঐ পাঠকৃতির স্বরূপকে উপেক্ষা করতে চান। কবি কেন 'মানুষের ক্লান্ত অন্তহীন / ইতিহাস আকৃতির প্রবণতা' কিংবা 'বড় সময়ের সাগরের কূলে' ফিরে আসার কথা বলেছেন, কেনই বা দেখিয়েছেন 'মানব ইতিহাসের আর্ধেক নিয়ন্ত্রিত পথে / আমরা বিজোড়' বা আধোচেনা কোনো এক পুরানো পৃথিবী'র মিলিয়ে যাওয়া আর 'মনে চোখে প্রচারিত নতুন পৃথিবীর' না-আসার কথা বলেছেন—এইটে নিশ্চয় তলিয়ে দেখতে হবে। শতাব্দীর রাক্ষসী-বেলায় দাঁড়িয়েও তো তিনি 'মানুষের স্বাভাবিক / দাবীর আশ্চর্য বিশুদ্ধতা ; যুগের নিকটে ঋণ, মন বিনিময়' এবং 'সকলের সুস্থতার—হৃদয়ের কিরণের দাবী'র কথা বলেছেন। শুধুমাত্র এই 'দাবী'র তাৎপর্যই তো উত্তরণ কামী বর্তমান কবি-প্রজন্মের কাছে বিশেষ তাৎপর্যবহ বলে গণ্য হতে পারে। অবক্ষয়বাদের নৈরাজ্যপন্থী হিংস্রতা সত্ত্বেও জীবনানন্দ 'এই 'মানব স্বভাব স্পর্শে আরো ঋত—অন্তর্দীপ্ত' হওয়ার কথা বলেছেন, বিনোদনের আপাত রম্যতা তার কাছে নিশ্চয় তুচ্ছ। একসময় কবিতা রাজসভায় সমবেত আধিপত্যবাদী গোষ্ঠীর চিত্তবিনোদন করত ; এই একই যুক্তিশৃঙ্খলা ধনতান্ত্রিক জগতেও প্রবল দাপটে সক্রিয় থাকে। যেমন জীবনানন্দের সময়েও ছিল এবং বিশশতকের শেষ প্রান্তে বিজ্ঞাপনধন্য প্রতিষ্ঠান-কবলিত কালপর্বেও রয়েছে। জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য এই যে তিনি 'গণনাহীন ব্যক্তিগত গ্লানি' আর 'রাষ্ট্রসমাজ অতীত অনাগতের কাছে তমসুকে বাঁধা' অবস্থাজনিত 'চারিদিক থেকে ঘিরে কেবলি বিচিত্র ভয় ক্লান্তি অবসাদ'কে যথাপ্রাপ্ত অবস্থাবলে মেনে নেননি। তিনি জানেন যে 'সময় কোথাও/ পৃথিবীর মানুষের প্রয়োজন জেনে বিরচিত নয়'; এও জানেন যে ইতিহাসের এই পর্বে 'স্বর্ণ প্রাধান্যের সূত্রপাত' হলেও এইটে শেষ কথা হতে পারে না। দ্বন্দ্বময় ইতিহাসের মধ্য থেকে কেউ না কেউ 'বিরাট অগ্নিশিল্প'কে সম্ভবপর করে তুলবে। ধনতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থায় মানুষ আক্রান্ত : 'জ্বলন্ত তিমির গুলো-আমাদের রেণু সূর্য শিখা'; 'মানুষের দাম যদি জল হয় / বহমান ইতিহাস মরু কণিকার / পিপাসা মেটাতে', জীবনানন্দ নিশ্চিত যে 'চারিদিকে জীবনের শুভ্র অর্থ রয়ে গেছে তবু'।

জীবনানন্দের দ্বন্দ্বময় চেতনা সীমিত সময় ও সনাতন সময় গ্রন্থিকে যুগপৎ অনুভব করেছে। তাঁর বিশ্ববীক্ষা একমাত্রিক নয় বলেই ইতিহাস-সঞ্চারিত মানব-যাত্রায় কোনো শীর্ষবিন্দু যে সহজে অর্জিতব্য নয়, এই সত্যবদ্ধ উচ্চারণও তিনি কবিতার ভাষায় করে গেছেন।

ঃ 'এই পৃথিবীর মুখ যত বেশি চেনা যায়—চলা যায় সময়ের পথে, / ততবেশি উত্তরণ সত্য নয়।' তবু কবি এই নিঃসংশয় উচ্চাবণে দ্বিধাবোধ করেন না কোনো 'নব নদী নব নীড় নগরী নীলিমা সৃষ্টি হবে / আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।' এই প্রত্যয়দীপ্ত উচ্চারণ অবক্ষয়বাদের বলয় পেরিয়ে-যাওয়া উত্তরণশীল সৃষ্টি চেতনারও ঈঙ্গিত। 'বেলা অবেলা কালবেলা'র পাঠকৃতিতে যে আপাত-কাঠিন্য কিছু কিছু আলোচকের অস্বস্তির কারণ, সেইটে অর্ধমনস্ক পাঠের জন্যেই হয়ে থাকে। একটু আগে যে বিনোদন ভাবনায় প্রভাবিত পাঠাভ্যাসের কথা বলেছি, তার প্রভাব দুর্মর বলে এই সংকলনের কবিতাগুলি তাদের প্রাপ্য মনোযোগ পায়নি। অথচ জীবনানন্দ স্পষ্ট ভাষায় লিখেছিলেন ঃ 'আমার লক্ষ ছিল মানুষের সাধারণ হৃদয়ের কথা।' বস্তুত 'ঝরা পালক' থেকে ক্রম-উত্তরণের পথে জীবনানন্দ 'বেলা অবেলা কালবেলা'র পর্যায়ে পৌছেছিলেন। 'রূপসী বাঙলা' বা 'বনলতা সেন' যেমন জগৎ ও জীবনের সঙ্গে কবির দ্বন্দ্বময় সম্পর্কের একটি বিশেষ পর্যায়ের ফসল, তেমনি আলোচ্য সংকলনের কবিতাগুলিও তাঁর নিত্য-নবায়মান সময় বোধের অভিব্যক্তি।

।। সাত ।।

জীবনানন্দ জানেন, বিশ্বাসও একমাত্রিক নয়। অর্জনীয় শীর্ষবিন্দুও ঝাপ্‌সা হয়ে যায়, চলতে-চলছে হারিয়ে যায় পথ। তাই 'মানুষের নিরন্তর প্রয়াণের মানে, / হয়তো-বা অন্ধকার সময়ের থেকে / বিশৃঙ্খল সমাজের পানে / চলে যাওয়া—গোলক ধাঁধার / 'ভুলের ভিতর থেকে আরো বেশি ভুলে' (যতদিন পৃথিবীতে)। তবু, কবির গভীর সংবেদনায় ধরা পড়ে ঃ 'চারিদিকে কলরোল করে পরিভাবা'। খন্ডকালের সংশয় পেরিয়ে যাওয়ার জন্যে ঐ পরিভাষার সাহায্যে জীবনানন্দ তাঁর বিকল্প প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। বিবৃতির বহিরঙ্গ অবয়বকে ছাপিয়ে যায় পরাসন্দর্ভের দ্যুতি, নান্দনিক ও সামাজিক ভাবাদর্শের সমন্বয়প্রবণ এক নতুন ভারকেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হয় তাতে ঃ 'আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলে এই অনিমেষ আলোর বলয় / মানবীয় সময়কে হৃদয়ে সফলকাম সত্য হতে বলে/ জেগে রবে'। আর লাশ-কাটা-ঘরে শুয়ে ঘুম নয়, এখন জেগে থাকার পালা। 'নিষ্পেষিত মনুষ্যতার / আঁধারের থেকে আনে কী করে যে মহানীলাকাশ'—সেই প্রক্রিয়াকে অনুধাবন করে সৃষ্টির উৎস করে তোলা। কারণ, অনিশ্চয়তা আর উদ্বেগ থেকে নিশ্চয়তা আর উত্তরণের প্রতিশ্রুতি নিয়ে এসেছে কবির ইতিহাসবোধ ঃ

> 'ইতিহাস খুললেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
> ভেদ করে শোনা যায় শুশ্রুষার মতো শত-শত
> শত জলঝর্ণার ধ্বনি।'

'বেলা-অবেলা-কালবেলা'র পাঠ যখন আপাতদৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হয়ে যায়, প্রকৃতপক্ষে তখনই শুরু হয় পাঠকমনে নতুন অভিজ্ঞতার অনুরণন। বাংলা কবিতার আবহে জীবনানন্দ অননুকরণীয় ; এই সংকলনে তথ্যটি সুপ্রতিষ্ঠিত হলো আরো। তাঁর বিবরণ-ভিত্তিক বাচনিক অকল্প অজ্ঞাতপূর্ব এক সামগ্রিকতার বার্তা বয়ে এনেছে। অনুভূতিদেশ থেকে আলো যদি না পেত তাঁর ভাবা, তাহলে সন্দর্ভ নিছক ক্রিয়া-বিশেষণের স্তূপ হয়েই থাকত ; হয়ে উঠত এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল। জীবনানন্দ শব্দবাহুল্য দিয়ে শব্দাতিগ সত্যে পৌছাতে চেয়েছেন যা একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব। সম্ভব, কারণ, আপাত-সময় আর এমন্ত-সময় এর দ্বান্দ্বিকতাকে তিনি যথাযথভাবে জানতে চেয়েছিলেন।

গভীরতম ইতিহাসবোধ তাঁর ছিল বলেই মানুষের 'মহাজিজ্ঞাসা'র উত্তর খুঁজতে বিমূর্ত অধ্যাত্মতার আশ্রয় নিতে হয়নি, মীমাংসা পেয়েছেন তিনি বস্তুস্বভাবের মধ্যেই। শব্দের লিরিকস্পন্দন নেই বলে যাঁরা এই সংকলনকে উপেক্ষা করেন, তাঁরা এইটে লক্ষ করেন না যে ঐ স্পন্দন এখানেও এসেছে, তবে বুদ্ধির পথ দিয়ে, সমাজ-স্বভাবের অনুশীলন ও সময়ের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞান উপলব্ধির সোপান বেয়ে। যে-প্রত্যয় ছিল পল এলুয়ারের ঃ 'The domain is here / it does not belong to the domain / of evasion'—এইটে হতে পারত জীবনানন্দেরও ; তিনি দেখিয়েছেন, কবিতা জীবন-বিচ্ছিন্ন কোনো বস্তুতা বা প্রতীকিতায় নেই ; কবি জীবনের বিভিন্ন অনুপুঙ্খকে কিভাবে গ্রহণ করেছেন এবং কোন্ নতুন আয়তন তাতে যুক্ত করেছেন—তার উপর নির্ভর করছে কবিতার হওয়া বা না-হওয়া।

'রূপসী বাংলা'র পৃথিবী

পবিত্র মুখোপাধ্যায়

'এই কাব্যগ্রন্থে যে-কবিতাগুলি সংকলিত হল, তার সবগুলিই কবির জীবিতকালে অপ্রকাশিত ছিল ; তাঁর মৃত্যুর পরে কোনো কোনো কবিতা বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।

কবিতাগুলি প্রথমবারে যেমন লেখা হয়েছিল, ঠিক তেমনই পাণ্ডুলিপিবদ্ধ অবস্থায় রক্ষিত ছিল ; সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত। পঁচিশ বছর আগে খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে কবিতাগুলি রচিত হয়েছিল। এসব কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—পর্যায়ের শেষের দিকের ফসল।

কবির কাছে এরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপর পক্ষে সার্বিক বোধে একশরীরী ; গ্রামবাংলার আলুলায়িত প্রতিবেশপ্রসৃতির মতো ব্যষ্টিগত হয়েও পরিপূরকের মতো পরস্পরনির্ভর।'

—অশোকানন্দ দাশ

রচনাকাল ১৯৩৪

জীবিতকালে কেন জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুচ্ছ প্রকাশ করলেন না তা ভাবলে বিস্ময় জাগে। বিস্ময় কি শুধু প্রকাশ না করার নির্লোভ ঔদাসীন্যে? অশোকানন্দ জানিয়েছেন, প্রথমবারে যেমন লেখা হয়েছিলো, তেমনি পাণ্ডুলিপিবদ্ধ অবস্থায়ই রাখা ছিলো, এবং জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি যারা দেখেছেন, লক্ষ্য করেছেন, কী ভীষণ খুঁত খুঁতে ছিলেন তিনি ; একটি পংক্তি বা শব্দকে কাটাছেঁড়া ক'রে কিছুতেই তৃপ্তি পাচ্ছেন না তিনি ; অথচ রূপসী বাংলার চতুর্দশপদী কবিতাগুলি রইলো 'সম্পূর্ণ অপরিমার্জিত' অবস্থায়। কেন? রচনাকাল ১৯৩৪ ; সারা বছর ধরে একটানা লিখেছিলেন, না কি কয়েকমাস ধরে টানা লিখেছেন, তার হদিশ পাচ্ছি না। অশোকানন্দ, কবিভ্রাতা জানাচ্ছেন 'খুব পাশাপাশি সময়ের মধ্যে একটি বিশেষ ভাবাবেগে আক্রান্ত হয়ে...লিখেছিলেন কবিতাগুলি।'

এইখানেই প্রশ্ন, কি সেই 'বিশেষ ভাবাবেগ' যার দ্বারা তাড়িত হয়ে একটির পর একটি চতুর্দশপদী লিখতে বাধ্য হয়েছিলেন কবি? কবি-অনুজের এই মন্তব্যও যথার্থ যে 'কবির কাছে এরা প্রত্যেকে আলাদা-আলাদা স্বতন্ত্র সত্তার মতো নয় কেউ, অপরপক্ষে সার্বিক বোধে একশরীরী।'

বাস্তবিকই, 'রূপসী বাংলা' গ্রন্থের কবিতাগুলি আলাদা নয় কোনোটাই, একটি আর একটির সঙ্গে সার্বিক বোধে জড়িয়ে আছে ; একটি বিশেষ ভাবাবেগ তাড়িত হয়ে যে স্বল্পকাল সীমায় সীমিত কবিতা, তা অনুরূপ চরিত্রই অর্জন করে ; বা করতে বাধ্য হয়।

প্রসঙ্গত সবিনয়ে জানাই, একটি বিশেষ প্রেম, বিরহ-জনিত বিষাদ বর্তমান লেখককে

এমনই গ্রস্ত করেছিলো যে ছ'সাত মাসের একটানা, প্রায় বিরতিহীন এক তাড়িত অবস্থায় রচিত হয়ে যায় 'অসীমার প্রতি সনেটগুচ্ছ' নামক প্রায় চল্লিশটি চতুর্দশপদী। মূলত একটিই কবিতা, আর তা পরস্পর নির্ভর, পরস্পর পরিপূরকও বটে।

এমন হয়ে থাকে। যখন কবির প্রেরণা এতোটাই অন্তর্জাত, গভীর ও বেগবান যে, এক বিশেষ বোধ বিস্ময় ও বেদনায় গ্রস্ত হয়ে পড়েন তিনি, তিনি থাকেন না আর নিজের চেতন-সত্তার অধিকারে, ভূতগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন কখন বা কিভাবে যেন লিখিয়ে নিচ্ছে কোন এক অজ্ঞাত শক্তি একটির পর একটি কবিতা পেত্রার্কার ভাষায় 'To unburden sad heart.'

জীবনানন্দের অন্তর্জগতের মৌলভূমি বিষাদ ; এক অনতিক্রমনীয় বিষাদ দ্বারা গ্রস্ত কবির সমগ্র অন্তর্জগৎ, আর স্বাভাবিক ভাবে আসে স্মৃতিমেদুরতা, বোধ ও অনুভব, তীব্র সংবেদনশীলতাকে আশ্রয় করেই তা প্রকাশ পায়।

এই বিষাদ যা একান্তই একার, বহন করতে হয় নিজেকেই তার ভার, 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলি রচনাকালে, কবি হয়েছিলেন তার দ্বারা গ্রস্ত বা ভূতগ্রস্তই বলা যায়, একটানা কয়েক মাস বা গোটা একটা বছর ধরেই ; 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র সমকালে যদি এই কবিতাগুলি রচিত হয়ে থাকে, তবে স্পষ্টতই আমরা বুঝে নিতে পারি, চেতন-অবচেতনের অর্গলমুক্তি যদি হয় 'রূপসী বাংলা'র কবিতায়, তবে অনেকটাই সচেতন স্তরে বসে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতা রচনা করেন কবি। যদি বলি, 'রূপসী বাংলা'র কবিতা আবেগের, অনুভবের মোক্ষমজাত শিল্প তবে, বিস্ময়, বোধ ও প্রজ্ঞার আশ্চর্য কারুনির্মিত 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতায় রয়েছে ছড়িয়ে।

॥ ২ ॥

আমার যৌবন-সন্ধিকালে 'রূপসী বাংলা' সিগনেট থেকে প্রকাশিত হয়েছিলো ; প্রথম সংস্করণ কিনেছিলাম মনে পড়ছে, দেশপ্রিয় পার্কের বিপরীতে সুসজ্জিত 'সিগনেট বুক শপ' থেকে ; আর রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পড়েছিলাম সেদিন একের পর এক কবিতা ; আচ্ছন্ন আর প্রাণিত ; অদ্ভুত সেই আচ্ছন্নতা। কেন? সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজেছি পরবর্তীকালে, দিনের পর দিন। এতোকাল পরে, সে উত্তর খুঁজে পেয়েছি বলেই এই সামান্য নিবন্ধের অবতারণা।

কবিতায় কি অনিবার্যভাবে থাকে দেশ কালের (Time & Space) সংক্রমণ, না 'দেশকাল সন্ততি' বিবর্জিত, কবিতাও হতে পারে? পারে দুরকম ভাবেই ; যেমন রোমান্টিক কবিদের কবিতা এতোটাই আবেগ-অনুভব-কল্পনা নির্ভর যে তার শরীরের মেদ-মজ্জা মনে হতে থাকে অ-লৌকিক ; লোকায়ত জীবন সব সময়ই পরিপার্শ্ব-নির্ভর ও সচেতন, রোমান্টিকতা আত্ম-সম্ভূত, আত্মমগ্ন। যদি মধ্যযুগের বৈষ্ণব কবিতাকে উদাহরণরূপে ধরা যায়, তবে রোমান্টিক-কবি-কল্পনা কতটা স্বভাবজাত তা উপলব্ধি করতে কষ্ট হয় না।

অন্যদিকে, মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলি দেশ-কাল পাত্র-চিহ্নিত এমন কি দেশকালের দলিলও তাকে বলা যেতে পারে। আখ্যানধর্মী পদ্য খুব কম সময়েই কবিতার দ্বারা আক্রান্ত হতে দেখি সেখানে। কবি মধুসূদনের 'মেঘনাদবধ কাব্য' বা 'বীরাঙ্গনা কাব্য' তো সে অর্থে দেশকাল চিহ্নিত নয়, তাতে কবিতার স্বাদ ও শান্তি তো পাই আমরা। কেন?

'মেঘনাদবধ কাব্যে' পুরাণ-প্রতিমা পায় প্রতীকী তাৎপর্য ; যেন বুঝতে পারি, কবির

অন্তরাত্মা বন্দিনী ভারতবর্ষের প্রেক্ষিত ভুলতে পারছেন না, কোথাও আছে পরাধীনতার জন্যে জ্বালা ও বিষণ্ণতা ; প্রচ্ছন্নভাবে স্বদেশ স্বজাতি রয়েছে, পুরাণ-প্রতিমাকে আশ্রয় করে।

রোমান্টিক কবিতা যতোই আত্মমন্থন-জাত হোক, তাতেও দেশকাল চিরকালীন চরিত্র নিয়ে বেজে উঠতে পারে। দেশ যদি মাত্রই একটা ভৌগোলিক চেতনা মাত্র না হয় তা যদি হয় আপন অস্থিমজ্জায় জড়িত এক গভীর অনুভব, এক শরীরী বোধ ও বিস্ময় ; দেশের মাটি, গাছপালা ঘাস লতাপাতা, নদনদী, কাব্যসাহিত্য, ইতিহাস ও পুরাণ লোক ব্যবহার ও ধর্মাচরণ কবির কাছে বিশেষ এক প্রেম ও গৌরবে হয়ে ওঠে জ্যোতির্ময় ; তাকে করে আবেগতাড়িত, মুগ্ধ ও বিস্মিত, তবে কবিতা উঠে আসে যে জায়গা থেকে, তা খাঁটি, সীমানাচিহ্নিত হয়েও অসীমের ব্যঞ্জনায় আশ্চর্যরকম সুন্দর ও স্বাভাবিক। যে কোনো সৎ কবি তাঁর স্বভূমি ও স্বকালকে আশ্রয় করে নিজের কাব্যপ্রতীতি গড়ে তোলেন ; কিংবা নিজে গড়ে তোলেন না, হয়ে ওঠেন যেমন তিনি, তেমনি তাঁর কবিতাও। রবীন্দ্রনাথের কবিতা বিশুদ্ধ বাংলার মাটি, ঐতিহ্য-জাত ; তেমনি জীবনানন্দের। কোনো আন্তর্জাতিক ব্যক্তিরূপে, বিশ্বনাগরিকরূপে নিজেকে চিহ্নিত করবার বাসনা জীবনানন্দের মধ্যে দেখি না। তিনি বিশেষভাবেই বাংলার। বাংলার ও বাঙালীর। হয়তো এই কারণেই বিশেষ হয়ে তিনিই ও বেশি পরিমাণে বিশ্ববোধে আক্রান্ত। তাঁর একটি নিজস্বতায় চিহ্নিত ভূ-প্রকৃতি আছে, তিনি সেই ভূ-প্রকৃতিকে প্রকৃত সন্তানের মতন চেনেন, জানেন, ভালোবাসেন। কোনো রোমান্টিক ভাবালুতায় নয়, একেবারেই বস্তু নির্ভর তাঁর ভালোবাসা ; তাঁর দেখা, এবং এই দেখা ক্ষুদ্র থেকে বিরাট, খন্ড থেকে সমগ্র, সর্বত্রই সজাগ আর সংবেদনাময় ; কোনো কৃত্রিম আদর্শ দ্বারা দেশবন্দনা করেন না তিনি, দেশ তার প্রকৃতি, ঐতিহ্য তার একান্তই বোধের গভীর থেকে উঠে আসে ; আর আসে বলেই, উপরিতলের চেতনার চাইতে অবচেতনার গভীরতা আমরা অনুভব করি, শিহরিত হই, উচ্চারণ হতে থাকে নিমগ্ন, একাত্ম। হয়তো কবি অনুভব করেছিলেন, তার চারপাশের 'আধুনিক' হয়ে ওঠার পেষল প্রতিযোগিতার দিনে একান্তই বাংলার রূপরসগন্ধ, স্পর্শ ঐতিহ্য-স্নাত এই চতুর্দশপদী কবিতাগুলি 'আধুনিক' বলে গ্রাহ্য হবে না, হবে না পাঠকদের দ্বারা অভিনন্দিত। এক প্রচ্ছন্ন সংকোচ থেকেই তিনি 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুলি আর প্রকাশ করেননি, এমনকি তাঁর স্বভাবজাত নিরন্তর পরিমার্জনাও নয়।

যে অন্তর্গত প্রেরণা থেকে 'রূপসী বাংলা'র চতুর্দশপদীগুলির জন্ম, সেই প্রেরণা আবহমান বাংলাকে ভালোবাসা; কিন্তু বাংলা দেশের সমগ্র রাঢ়, বরেন্দ্র, সমতট, দক্ষিণাঞ্চল যে বিশালায়তন, রূপসী 'বাংলার বাংলা' ততো বড়ো আয়তনের নয়, এ বাংলা খণ্ডিত, এর ভূগোল দক্ষিণ বাংলার নদনদী অধ্যুষিত বিশেষ একটি অঞ্চল, এবং অবশ্যই তার নাম বরিশাল, কবির জন্মভূমি, শৈশব কৈশোর যৌবনের, আংশিক পরিণত বয়সের বিচরণক্ষেত্র, হয়ে ওঠার, নানা স্মৃতিবিজড়িত সেই প্রিয় বাসভূমি—বরিশাল।

অবিসংবাদিতভাবে বরিশালের প্রকৃতি ব্রত, পুরাণকথা গাছপালা, ধানের ক্ষেত, উৎসব ইত্যাদি ইত্যাদি, লোকাল একটি স্বাদ-গন্ধযুক্ত অঞ্চল পেয়েছে প্রাধান্য। কারণ, কবিতাগুলি বিশেষ অভিজ্ঞতা অনুভূতি জড়িয়েই নির্বিশেষ হয়ে উঠতে চেয়েছে। আমরা, অন্তত সাহিত্যে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাকে এড়িয়ে যেতে পারি না ; লোকমুখ থেকে সংগৃহীত বস্তুভাব.আসলে ধারণামাত্র, অভিজ্ঞতায় জড়িত না হলে, 'অনুভূতি দেশ থেকে আলো' না পড়লে সাহিত্য ভীষণভাবে জীবন্ত ও সংক্রামক হয়ে উঠতে পারে না। যা নিজে দেখেছি,

প্রতিদিনের অভিজ্ঞতায় অর্জন করেছি, অনুভব করেছি, তার বর্ণ গন্ধ রূপ রসই আলাদা, অপ্রত্যক্ষ ধারণা অভিজ্ঞতা নয়, আর সেই ধারণা গভীরে শিকড় চারাতেও অসমর্থ।

এই অর্থে জীবনানন্দের প্রথম পর্বের কবিতায় প্রত্যক্ষ দেখা, অনুভূত জগৎ ও জীবন প্রধান হয়ে উঠেছে ; সেই দেখা বা অর্জিত অভিজ্ঞতা বা অনুভবরাজি তার জন্মভূমি বাংলা এবং বরিশাল সেখানে বাংলার ক্ষুদ্র প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি....' বলেছেন, সকলে দেখেছেন কীর্তনখোলা নদীর পারে বরিশাল শহর, শিরা উপশিরার মতন কালীগঙ্গা ভোলা, কচা, পায়রা প্রভৃতি নদী, নদীর পাবে বিশালাক্ষী মন্দির, শটীবন, ক্ষেতে ক্ষেতে সুবর্ণশস্য, ধানসিড়ি নদী, ব্রতপার্বণ, হিজলগাছের সোঁদা গন্ধের জল, বট অশ্বথ, রূপকথার এক দেশ, বাংলার বিশেষ অঞ্চলের খণ্ডিত এক অপরূপ রূপলোক।

পেত্রার্কার একটি সনেটে প্রকাশ পেয়েছে কোন গভীর বেদনার মোক্ষণ ঘটেছে কবিতাগুলিতে। বিষণ্ণ হৃদয়ের মুক্তি বা মোক্ষণ বলেই লরার প্রতি সনেটগুচ্ছ এতো বিষাদ, বেদনায় ভারাক্রান্ত। জীবনানন্দের মনের এক বিশেষ প্রবণতা হলো মৃত্যুচেতনা, যে কোনো বড়ো কবির চেতনায় মৃত্যুবোধ প্রচ্ছন্ন থাকে ; কীট্‌স-এর, রবীন্দ্রনাথের বোদলেয়রের জীবনানন্দের কবিতার মৌল অনুভূতি মৃত্যুচেতনা। 'রূপসী বাংলা'র সনেটগুলির প্রায় প্রতিটি সনেটে মৃত্যুর প্রগাঢ় বোধ রূপকে, প্রতীকে, চিত্রকল্পে জ্বলে উঠতে দেখি।

না, ঠিক জ্বলে ওঠেনি, বেজে উঠেছে, অণুরণিত হয়েছে। মৃত্যু দ্বারা জীবন খণ্ডিত বলেই জীবনের প্রতি প্রগাঢ় ভালোবাসা, থাকবোনা বলেই গভীরভাবে আঁকড়ে ধরা ; জীবনানন্দের কবিতায় আপাত নঞর্থকতার আড়ালে এই বাংলা, বাঙালি, মানুষ মানুষী পৃথিবীকে, প্রকৃতিকে প্রবল তীব্র ভালোবাসার মন্ত্র ধ্বনিত হতে দেখি। 'রূপসী বাংলা' গ্রন্থের সূচনায় বিচ্ছিন্ন একটি কবিতা বড়োই তাৎপর্যপূর্ণ :

> সেইদিন এই মাঠ স্তব্ধ হবে নাকো জানি—
> এই নদী নক্ষত্রের তলে
> সেদিনের দেখিবে স্বপ্ন —
> সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!
> আমি চলে যাব ব'লে
> চালতাফুল কি আর ভিজিবে না শিশিরের জলে
> নরম গন্ধের ঢেউয়ে?
> লক্ষ্মীপেঁচা গান গাবে নাকি তার লক্ষ্মীটির তরে
> সোনার স্বপ্নের সাধ পৃথিবীতে কবে আর ঝরে!

কোনোদিনই ঝরে না সোনার স্বপ্নের সাধ এই পৃথিবীর মানুষের ; কবিরই ভাষায়— 'মানুষের মৃত্যু হলে' তবুও মানব থেকে যায় ; এই বোধ ; একক ব্যক্তির মৃত্যু হবে, মানুষের জন্ম প্রজন্মের ধারা বইবে অবিরলভাবে; কিন্তু মানুষ কি তা ভাবে?

মহাভারতের বনপর্বে যক্ষের প্রশ্নের উত্তরে যুধিষ্ঠির বলেছিলেন—

> অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
> শেষা স্থিরত্বমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্যমতঃপরম।।

প্রাণীগণ প্রতিদিন যমালয়ে যাচ্ছে, তবুও অবশিষ্ট সবাই চিরজীবী হতে চায়। এর চাইতে আশ্চর্য কি আছে?

কিন্তু প্রজ্ঞাবান কবি জানেন, জন্মই বহন ক'রে আনে মৃত্যু, কিন্তু পৃথিবীর আর সবই থাকবে ; তার মৃত্যুর দিনও মাঠ স্তব্ধ হয়ে থাকবে না, নক্ষত্রখচিত আকাশের নিচে নদী স্বপ্ন দেখতে দেখতে বয়ে যাবে, শুধু সে-ই থাকবে না।

এই জ্ঞানই এনে দেয় এই স্পষ্ট উচ্চারণ—

চারিদিকে শান্ত বাতি — ভিজে গন্ধ — মৃদু কলরব ;
খেয়ানৌকোগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ;
পৃথিবীর এই সব গল্প বেঁচে রবে চিরকাল ;
এশিরিয়া ধুলো আজ — বেবিলন ছাই হয়ে আছে।

।। ৩ ।।

'খেয়ানৌকাগুলো এসে লেগেছে চরের খুব কাছে ; মনে পড়ছে আমার ছেলেবেলার দিনগুলো।

আমার জন্মস্থান বরিশাল শহর থেকে ঝালকাঠি হয়ে পটুয়াখালি, বরগুনা হয়ে বিশাল উন্মত্ত পয়রা নদী পাড়ি দিয়ে 'আমতলী' নামক একটি দ্বীপ বন্দরে। জল আর জল, মাঠঘাট, উপরে ছড়ানো 'নীল আকাশ', জীবনানন্দের ভাষায় যেখানে 'আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে।'

চারদিকে জলের শব্দ, ভেজা বাঁশের গন্ধ, নদীর ঢেউ, গাঙচিলের ওড়াউড়ি, জোয়ারের সময় ফুঁসে ওঠা নদীর জলের স্রোতে ভেসে যাওয়া কচুরীপানার দঙ্গল ; অজস্র ছোটো বড়ো নৌকো ; চরে লগি পুঁতে ডিঙি নৌকোর মাঝি রান্না করছে দ্বিপ্রহরে ; গয়নার নৌকো চলেছে যাত্রী বোঝাই, চলেছে মালবাহী বিশালায়তনের নৌকোগুলো, পালতোলা নৌকো, গুনটানা নৌকো বন্দরের নদীর পারে এসে লগি পুঁতে কেনাকাটার জন্যে অপেক্ষা করছে। বড়ো নদী থেকে ছোটো খাল বেরিয়েছে, ঢুকে গেছে গ্রামের মধ্যে ; ছেলেমেয়েরা জোয়ারের সময় ঝাঁপ দিয়ে পড়ছে খালে, খেলছে জলখেলা ; ভেসে চলেছে কাঠের গুঁড়ি, উচ্ছিন্ন গাছের কঙ্কাল ; প্রকৃতি ও মানুষের সুন্দর ও ভীষণ মিলনমিশ্রণ ; বৈরী নয় কেউ কারো ; নতুন বউ এসেছে নৌকো করে শ্বশুরবাড়ি, তাকে বাড়ির খাল-ঘাটে বরণ করছে প্রিয়জনেরা, গ্রামের নিস্তরঙ্গ জীবনে একটা ঢেউ ওঠে এই সব জন্ম মৃত্যু বিবাহকে কেন্দ্র করে ;

'চারিদিকে শান্ত বাতি—ভিজে গন্ধ—মৃদু কলরব ;

খুব ছেলেবেলায় বাবা মার সঙ্গে যাচ্ছিলাম মাসির শ্বশুরবাড়ির গ্রামে। বিশাল পায়রা নদীর শাখা উপশাখা ধরে সংকীর্ণ খালের মধ্য দিয়ে আমাদের নৌকো চলছিলো। নৌকোর ছইএর উপরে হিজলের ডাল-পালা, সোঁদা গন্ধের ফল ঝুলছিলো, জল ছুঁয়ে ছিলো হিজল পাতা, নানা গাছের লতাপাতা। আবার কখনো বিশাল শান্ত-নদীর উপরে ঝকঝকে সূর্যের আলো কাঁপছিলো, নদীর পারে ভাঙা মন্দিরের থাম, আধভাঙা পঞ্চরত্নের মন্দিরের চূড়া হেলে রয়েছে, দেখেছি। মামার সঙ্গে নলচিড়া গ্রামে গিয়েছি সেই ছেলেবেলায়। গ্রামের মন্দির সম্বন্ধে নানা গল্প-কাহিনী, যা সন্ধের সময় শুনলে গা ছমছম করে। অজস্র জোনাকী জ্বলা, ঝিঁ ঝিঁ ডাকা সন্ধ্যা নেমেছে, বিশালাক্ষী মন্দিরের পাশ দিয়ে গা ছমছমে ভাব নিয়ে ফিরছে গ্রামের মানুষ হাট সেরে।

আবার আমাদের দরিদ্র বাবা ছোটো ছোটো ছেলেদের নিয়ে নদী পার হয়ে চলেছেন শটী তুলতে। আমরা সারাদিন শটী তুলেছি। অদ্ভুত সেই শটীবনের গন্ধ আজো নাকে লেগে আছে। লক্ষ্মীপুজোর রাত ছিলো কী সুন্দর আর মায়াময়! ঘরে ঘরে লক্ষ্মীপুজো, সারাঘরে নিপুণ হাতে নতুন চালের আলপনা, তার উপরে লক্ষ্মীঘট, সুন্দর দেবীমূর্তির মুখে প্রদীপের আলো, ধূপ-ধুনোর গন্ধ ; অনৈসর্গিক পরিবেশ রচনা করতো। শীতকালে ঘাসকাটা, উঠোনে জড়ো করা ; গরুর গাড়ির চাকার দাগ মাটির উপর, ধানের শীষ, ছিন্ন ধান সর্বত্র। নিকোনো বাড়ির উঠোন, আলপনা, নবান্ন উৎসব ; বাড়ি বাড়ি নবান্নের গন্ধ, জীবনানন্দ বলেছেন যাকে 'অমৃত'; কাকদের ওড়াউড়ি ; বাড়ি বাড়ি নবান্ন খাবার নিমন্ত্রণ ; আবার নিকোনো উঠোনে বিশাল আলপনা, পাড়ার ব্রতে মেয়েদের ব্রতকথা শোনা ; জ্যোৎস্নায় রহস্যময় সুন্দর পৃথিবী।

শশীদ গ্রামে, কীর্তিপাশা নামক বিখ্যাত গ্রামের কাছেই শশীদ, সেখানে, সন্ধ্যায় গ্রামবৃদ্ধার মুখে 'পরাণ কথা' শোনার আশ্চর্য অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার। রাজা রাণী, রাক্ষস খোক্কসেরগা ছমছম করা গল্প, মাঝে মাঝে বৃদ্ধার নিজস্বভাঙা গলার গান থাকতো ; বাইরে আবছায়া আলো-অন্ধকার, ঝিঁঝিঁদের ডাক, জোনাকী পোকার জ্বলা-নেভা, শিয়াল ডাকার শব্দ ; ভুলিনি সেই আমার বাংলা, জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'।

আর ধান কাটার পরে খাঁ খাঁ শূন্য মাঠে ঘুরে বেড়াতাম ; শিশির ভেজা খড়গুলো জ্বলতো সকালসূর্যের আলোয় ; চারদিকে ভেজা প্রকৃতি ; খেজুর গাছ থেকে সদ্য উষ্ণ রস নিয়ে চাষীদের বাড়ি বাড়ি ফেরা ; কখনো নদীর পারে বাঁশের জাঙালে উঠে নদীর দিকে চেয়ে থাকতাম ; দেখতাম সূর্যাস্তের অপরূপ রূপ। আমতলীতে নদীর পারে শ্মশান, প্রিয়জনের মৃত্যুর চিহ্ন কখন নদী গ্রাস ক'রে নিয়েছে। খেলতাম বটের নিচে, লাল বটফল কুড়োতাম, যেতাম গাজিপীরের মন্দিরে ; পিতলের আশাবাড়ি দেখে ভয়ে শিউরে উঠতো আমাদের মন। জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'র এই তো প্রকৃতি, পটভূমি, এর থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তাঁর এই কবিতাগুলোর সৌন্দর্য ও গভীরতা উপলব্ধি করা অসম্ভব।

বরিশালে মনসা পুজো হতো আড়ম্বরের সঙ্গে। হতো রয়ানি, পাঁচালী গান। শীতলা মনসা পুজোর স্থান নির্দিষ্ট হতো ফণীমনসা গাছের নিচে। বর্ষাকালে একমাস ধরে পাঠ হতো বিজয়গুপ্তের মনসার পাঁচালী। ছেলেবেলার আমার কাছে মনসামঙ্গলের বেহুলা, সনকা, লখীন্দর, মনসা, চাঁদ সদাগর ছিলো অত্যন্ত জীবন্ত ; তাদের উপস্থিতি টের পেতাম পাঁচালী পাঠের সময় ; রূপকথার কাঞ্চনমালা, মহুয়া মলুয়ার কাহিনীও গল্প মাত্র, ভাবতে পারিনি। আসলে সুন্দরী গাছের অরণ্যের পাশে নদী নালার ভূখণ্ডটি আদিমতার গন্ধ তখনো গায়ে জড়িয়ে ছিলো ; সেখানে ভূত প্রেত দৈত্য দানো, দেবদেবী পুরাণকথার চরিত্রগুলি, কেউই অবিশ্বাস্য ছিলো না, থাকার কথাও নয়। বিজ্ঞানের আলোঝলমল বিশ্বের দেখা বরিশাল তখনো তেমন পায়নি।

এই পটভূমিতে জীবনানন্দের কবিতা, বিশেষ করে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা'র কবিতাকে স্থাপন করে না দেখলে তাদের বাইরের ও অন্তরের সৌন্দর্য ও ব্যঞ্জনা উপলব্ধি করা যাবে না।

তাও কি বলা যায়? কবিতার স্বাদ নিতে কবিতাই কি যথেষ্ট নয়? অন্তত জীবনানন্দের ক্ষেত্রে কবিতাই যথেষ্ট, কারণ তিনি সহজ স্বচ্ছন্দ অনুভবের ভাষায়, চিত্রল শব্দে, তার দেখা প্রকৃতি, মানুষ এঁকেছেন ; জীবনানন্দের ভাষায় খাঁটি বাংলা, খাঁটি ও বিশুদ্ধ বাংলা, পংক্তি রচনাও তেমনি পয়ার, প্রবহমান পয়ার যা আমাদের আদি ছন্দ। যার সঙ্গে রামায়ণ

মহাভারত পাঠের সম্বন্ধ সরল ভাবে রয়েছে ; তিনি চিত্রকল্প বা উপমা বা শুধুই নিসর্গ ছবি এঁকেছেন ব্যক্তিগত দেখার জগৎ থেকে ; তার জন্যে তাকে কামস্‌কাটকা বা ওক্‌লাহোম যেতে হয়নি ; তাঁর চেনা পৃথিবীই আজ আমাদের কারো কারো কাছে অচেনা মনে হচ্ছে। কারণ, শহুরে জীবনের বাঁধা থোড়বড়ি পরিবেশের বাইরে যে বাংলা তাকে আমরা অনেকেই তেমন ভাবে দেখিনি ; দেখিনি বলেই অনুমান-নির্ভর প্রকৃতি আসছে আমাদের পদ্যে, তাতে ব্যাপক অনুষঙ্গ নির্ভর ব্যঞ্জনা নেই ; খুব তাড়াতাড়ি হারিয়ে যাচ্ছে কালের গর্ভে।

আসলে এখানে, আমাদের নিজস্ব কোনো জন্মভূমি নেই, তাকে জড়িয়ে নেই বিহ্বল করা স্মৃতি ও তাকে হারানোর বেদনা ও পাওয়ার আনন্দ ; শ্রেষ্ঠ, গভীর শিল্পের জন্ম তো স্মৃতি থেকেই, saddest thought-ই তো Sweetest song হতে পারে।

।। ৪ ।।

(১) 'তোমারে যেখান সাধি চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে রয়ে যাব';

(২) 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ খুঁজিতে যাইনা আর';

প্রথম দুটি কবিতার প্রথম পংক্তিতেই জীবনানন্দ বাংলাকে নিবিড় ভালোবাসার কথা জানিয়ে দিলেন। 'বাংলার পারে/রয়ে যাব'; বা 'বাংলার রূপ আমি দেখিয়াছি...।' ইত্যাদি পংক্তি যদি গ্রন্থের কথামুখ ধরি তবে, প্রশ্ন উঠতে পারে, কবির এই বাংলাকে এতো ভালোবাসার কারণ কি, এবং পৃথিবীর রূপ দেখতে চান না, শুধু বাংলার রূপেই তিনি মুগ্ধ হয়ে আছেন কেন?

সে প্রকৃতিই হোক, বন্ধু হোক বা প্রেমিকাই হোক, তাকে যদি কেউ সর্বস্ব দিয়ে ভালোবাসে তবে সে প্রিয়জনের বুকের এতোটা জুড়ে থাকে, অন্য আর সব কিছু, তা যতোই মূল্যবান হোক, তুচ্ছ হয়ে যায় তার কাছে।

বাংলার প্রকৃতি, মানুষ, ঐতিহ্য জীবনানন্দের সত্তা জুড়ে রয়েছে। একান্তই বাংলার নিজস্বতা এবং বিশিষ্ট রূপ তাকে মুগ্ধ করে রেখেছে। তাই বিশাল পর্বতমালা, অরণ্যভূমি, সমুদ্র বা জলপ্রপাত, শহর বন্দর কবির কাছে, অন্তত 'রূপসী বাংলা' রচনাপর্বে কবির মনকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। খুবই সামান্য, যা কবির প্রতিদিনের জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে, সেই সামান্যের মধ্যে অসামান্য সৌন্দর্য ও তৃপ্তি স্বাভাবিক ভাবেই পাচ্ছেন তিনি।

(ক) দেখিব কাঁঠাল পাতা ঝরিতেছে ভোরের বাতাসে;
দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের সন্ধ্যায় হিম হয়ে আসে...

(খ) দেখিব মেয়েলি হাত সকরুণ শাদা শাঁখা ধূসর বাতাসে
শঙ্খের মতো কাঁদে...।

(গ) 'পরাণ-কথা'র গন্ধ লেগে আছে যেন তার নরম শরীরে
কলমী দামের থেকে জন্মেছে সে যেন এই দুপুরের নীড়ে।

(ঘ) ...অন্ধকারে জেগে উঠে ডুমুরের গাছে
চেয়ে দেখি ছাতার মতন বড় পাতাটির নীচে বসে আছে
ভোরের দোয়েল পাখি...

(ঙ) 'ফণীমণসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে'

এইসব, বাংলার নিজস্ব সুর ও সৌন্দর্যে কবি মুগ্ধ, তৃপ্ত ; তাই পরবর্তী জীবনানন্দের কবিতায় রবীন্দ্রনথ দেখেছিলেন সিরিনিটির অভাব ; টেনশানের উপস্থিতি আছে সেখানে ; কিন্তু রূপসী বাংলার কবি 'সিরিন', টেনশান মুক্ত ; বিশ্বাস ও শান্তির আশ্চর্য সমন্বিত পৃথিবীতে সামান্য বস্তুবিশ্বকে ভালোবেসে তৃপ্ত, শান্ত তিনি।

অষ্টক ষটকের বন্ধনে ষাটটি 'চতুর্দশপদী' একটি অন্যটির পরিপূরক যেন। কেন, 'চতুর্দশপদী'র পরিমিত স্টাইল বেছে নিলেন জীবনানন্দ দাশ 'রূপসী বাংলা'র কবিতাগুলি রচনার সময়?

একটা প্রবল প্রেরণা—চাপ অনুভব করেছিলেন অন্তর্জগতে ; সেই প্রেরণা বাইরের পৃথিবী থেকে আসেনি, এসেছে অন্তর্জগৎ থেকে। সনেটের আঁটোসাঁটো শরীরে প্রথম আট পংক্তিতে ভাবের উপস্থাপনা, শেষে ভাব মোক্ষণের রিলিফ প্রয়োজন হয়েছিলো কবির ; এভাবেই কবিতাগুলি পরপর এসেছিলো, বেজে উঠেছিলো ; কোনো স্বাভাবিক কবি আগে কর্ম নিয়ে ভাবতে বসেন না ; কোন রীতিতে লিখবেন তা ভাবেন না, কবিতা তার মধ্যে শরীর যখন নেয়, তখনি সে রীতি নিয়েই আসে ; আসলে সব সময়ই একজন প্রকৃত কবির মধ্যে ভাব হতে রূপে অবিরাম যাওয়া আসা চলতে থাকে ; গৌণ কবি পদ্ধতি নিয়ে ভাবতে বসেন, কেননা স্বাভাবিক ভাবে কবিতা তার মধ্যে শরীরী হয়ে ওঠে না।

কেউ যেন না ভাবেন, স্বভাব কবিদের পক্ষে সাফাই গাইছি আমি। কেননা, আমি জানি স্বভাব কবি তাঁর স্বভাবের দাস, আবেগের স্রোতকে বাঁধতে জানেন না ; কিন্তু স্বাভাবিক কবির মধ্যে গ্রহণবর্জন ও নির্মাণ সব সময়েই চলতে থাকে ; পঠন-পাঠনে গ্রহণ-বর্জনে তিনি ঋদ্ধ ক'রে চলেন নিজেকে ; ফলে সচেতন এক নির্যাস প্রক্রিয়া চলে অচেতন মনে ; এই তার রীতি, আর তা বদলে যেতে থাকে নানা পর্বে নানা চেহারা নিয়ে। স্বভাব কবি, যা উত্তরাধিকার সূত্রে পান তা নিয়ে সন্তুষ্ট, আর স্বাভাবিক কবি উত্তরাধিকারকে সুদে আসলে বাড়িয়ে যান অবিরল চর্চায় ; চর্চা বা অনুশীলনই তার স্বাভাবিকতার জন্ম দেয়।

প্রথম সনেটটিতে ভবিষ্যৎকাল নির্দেশক 'দেখিব' শব্দটি কবির দেখতে থাকা ও দেখতে থাকবো, এই ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয়টিতে 'দেখিয়াছি' (বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি) অর্থাৎ দেখেছি বলেই কবি বর্তমান নিয়ে সন্তুষ্ট (খুঁজিতে যাই না আর)।

> ...'চারি দিকে চেয়ে দেখি পল্লবের স্তূপ
> জাম-বট-কাঁঠালের-হিজলের-অশথের করে আছে চুপ ;
> ফণীমনসার ঝোপে শটিবনে তাহাদের ছায়া পড়িয়াছে ;
> বর্তমান থেকে কবি চলে যান মধ্যযুগের কিংবদন্তীর দেশে
> মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে
> এমনই হিজল-বট-তমালের নীল ছায়া বাংলার অপরূপ রূপ দেখেছিল ;

বাণিজ্যতরী নিয়ে চম্পকনগরে ফেরার সময় চাঁদ দেখেছিল হিজল, বট, তমালের নীলছায়াচ্ছন্ন বাংলার রূপ একদিন ; আজ একই রূপ দেখছেন কবি সেই অপরূপ বাংলার, শাশ্বত বাংলার আর বাংলার মেয়ে বেহুলাও ভেলায় স্বামীর শব নিয়ে যেদিন ভেসে যাচ্ছিলো, দেখেছিলো কৃষ্ণা দ্বাদশীর জ্যোৎস্না নদীর চড়ায়। দেখেছিলো সোনালী ধানের পাশে অসংখ্য অশথ বট, শুনেছিলো 'শ্যামার নরম গান' আর খঞ্জনা পাখির মতন স্বামীর প্রাণ ফিরিয়ে আনতে যেদিন দেবসভায় নেচেছিলো, সেদিনও সুদূর স্বর্গে তার

পায়ের ঘুঙুরের মতন তারই বেদনার সমব্যথী হয়ে বাংলার নদী মাঠ ভাঁটফুল কেঁদেছিলো একদিন।

সময়ের সীমা-প্রকৃতি পার হয়ে যাবার আশ্চর্য ক্ষমতা দেখেছি জীবনানন্দে। অতীত এসেছে বারবার কতো ভাবে ঘুরে ফিরে। রোমান্টিক কবির স্বধর্ম অতীতচারিতা ; অতীতের দিকে তাকিয়ে দীর্ঘশ্বাস ফেলা ; কিন্তু জীবনানন্দ তো অতীতের স্বপ্নস্বর্গের কথাই মাত্র বলেননি ; তিনি যে বর্তমানের বাংলা নিয়েও তৃপ্ত, গর্বিত।

কিন্তু, রূপসী বাংলা-র বর্তমানে কোনো দ্বন্দ্বসংকুল রাজনীতির উল্লেখ নেই। রাজায় রাজায়, রাজায় প্রজায়, প্রজায় প্রজায় নেই স্বার্থ-লিপ্সু সংঘাত ; হ্যাঁ নেই তেমন কিছু, যা আছে তা হলো চিরদিনের বাংলা ; গাছপালা ধান ভরা, ফসল কাটা শূন্য মাঠ, হিজল, শটী, বট অশথের ছায়া-কীর্ণতা, ঘাসে ঢাকা মাঠ প্রান্তর, বিশালাক্ষী মন্দির, লক্ষ্মী পেঁচার ওড়াউড়ি, ধান-কাটা মাঠের ইঁদুর, খই রঙা হাঁস, শঙ্খমালা, কিরণমালা, বেহুলা, চাঁদ, চম্পকনগরের, কালীদহের কমলেকামিনী, কিশোরীর চাল ধোয়া হাত, এমন এক চিরদিনের বাংলা, আমাদের বাস্তবের ও স্বপ্নের বাংলা।

'আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে
পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে
ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে,
যেইখানে এলোচুলে রামপ্রসাদের সেই শ্যামা আজো আসে,

কোথাও পাথর, কাঁকর, রাঙামাটির রুক্ষতা নেই এই বাংলার প্রকৃতিতে যেখানে শুধু ঘাস আর ঘাস, আর মাথার উপর 'অপরাজিতার মত' নীল আকাশ, যেখানে ধানচারা বা ধানগাছ সিড়ির মতন ধাপে ধাপে নদীর জল ছেড়ে মাঠের দিকে চলে গেছে, কিংবা 'ধানসিড়ি' নামের নদীটি শ্মশানের দিকে চলে গেছে যেখানে, সেইখানে রামপ্রসাদের মালসীগানের রেশ শুনতে পাওয়া যায়, তার পূজিত শ্যামা আজো আসেন, যে শ্মশানে কস্তাপেড়ে শাড়ি পরা সুন্দরীর শব চিতায় পুড়ে যায়, আর বেদনার্ত শুক পাখি কথা বলতে ভুলে যায়—এই বাংলায় 'যেইখানে সব চেয়ে বেশি রূপ — সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্ণতা' রয়েছে, এবং চিরদিনের বাংলা, জীবনানন্দের 'রূপসী বাংলা'।

'আমার ছেলেবেলায় দেখা বরিশালের গ্রাম, নদ-নদী, খালবিল, গাছপালার ঘন গহন নির্জনতা, চেনা পরিচিত নানা পাখি পাখালি, দেবস্থান, নদী বা খালপাড়ের নির্জন বিষণ্ন শ্মশান, প্রাচীন গাছের নিচে জরাজীর্ণ দেউল, ধানকাটা মাঠের হাহাকার, সব কিছু একটির পর একটি চতুর্দশপদীতে মেলে ধরেছেন জীবনানন্দ।

১৯৫০-এ দাঙ্গা হলো পূর্ব বাংলায়। ১৯৪৯-এ মাসির সঙ্গে বরিশালের মহকুমাশহর পিরোজপুরে যাই। ইস্কুলে আবার ভর্তি হই। ইস্কুলের পাশেই বালেশ্বর নদী। চরা পড়েছে, তেমন স্টিমার যাতায়াত করে না। দু'একটি নৌকো পারাপারের। খুবই নির্জন, তরঙ্গহীন সেই নদী।

একদিন আবার দাঙ্গা লাগলো। আমরা ঘরে আটকে রইলাম প্রাণভয়ে সারাটা রাত। সকালে রওয়ানা হলাম শহর ছেড়ে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ গ্রামের দিকে। বৈশাখ মাস। পিরোজপুর থেকে কাউখালি কয়েক মাইল দূর, আমি, মাসি ও মাসতুতো ভাই সামান্য জিনিসপত্র হাতে নিয়ে হাঁটছি। আরো অনেকেই চলেছে স্টিমার ধরতে আমাদের মতন। পথের ধারে সারি সারি তালবনের পাতাগুলো শ'ন শ'ন শব্দ তুলছে ; দু'ধারে বিস্তৃত দিগন্তলীন মাঠ, আমাদের মনে ভয়, শরীরে ক্লান্তি। শহরের সীমান্তে শ্মশান। দেখি, একটি

তরুণীর সুন্দর শরীর চিতায় তোলা হচ্ছে। তার প্রিয়জনদের আকুল কান্না আমার বুক দুমড়ে মুষড়ে দিয়েছিলো সেদিন।

আসলে খালবিল নদ-নদীতে-ভরা বরিশালের একটা নিজস্ব প্রকৃতি আছে, যা চোখে না দেখলে অনুভব করা কঠিন। বাংলার অন্যত্রও প্রকৃতির অঢেল রূপ উছলে পড়ছে, আছে বিশেষত্বও ; জীবনানন্দের চেতনায় বরিশালের প্রকৃতিই যে গভীর ভাবে প্রোথিত তার কথা চতুর্দশপদীগুলির সর্বত্র ;

'সবচেয়ে বেশি রূপ—সবচেয়ে গাঢ় বিষণ্ণতা';—এ উপলব্ধি সত্য ; বিশালাক্ষী মন্দিরের নীরবতা, দেবীর সামনে শুকনো পদ্মফুল, শঙ্খ মালা, চন্দ্র মালা, মানিক মালার কাঁকন বাজতো যেখানে একদিন—কবির জিজ্ঞাসা 'কোনোদিন বাজিবে কি আর'।

গ্রামবৃদ্ধার মুখে রূপকথার গল্পগুলো এমনই জীবন্ত হয়ে উঠতো যে গল্পে-বর্ণিত মানুষ, জীবজন্তু, গাছপালার কোনোদিন, কোনোখানে অস্তিত্ব নেই, ছিলো না, তা ভাবাই যেতো না। আমার এই অভিজ্ঞতার কথা আমি আগে বলেছি ; বরিশালে এই রূপকথাকে 'পরাণ কথা' বলে। আমি পরাণ কথা বলো, বলে মা, মাসির কাছে আবদার করেছি। 'পরাণ কথা' এসেছে পুরাণ কথা থেকে মনে হয়। আবার প্রাণের কথাও বলা যেতে পারে। অন্য জেলায় কি রূপকথাকে 'পরাণ কথা' বলে? জানি না।

একটা লোকাল চেহারা রয়েছে জীবনানন্দের কবিতায়, যেমন বিভূতিভূষণের গল্পে, উপন্যাসে, তারাশংকরেরও। সেই জগতটা বর্ণিত সাহিত্যই, সত্য করে তোলে। মনে হয় না, তার জন্যে আলাদাভাবে স্থানগত বৈশিষ্ট্যকে আগেভাগে জেনে নিতে হবে। তবে, জানার পরে যে সত্য ও সৌন্দর্য বেজে ওঠে, তার স্বাদ আলাদা হতে বাধ্য।

রূপসী বাংলার জীবনানন্দ

ইরাবান বসুরায়

১৯৩৪-এ লেখা হচ্ছিল অনেকগুলি কবিতা, জীবনানন্দ তাঁর অভ্যাসমতো যে-খাতায় লিখেছিলেন সেই কবিতাগুলি, সেখান থেকে একষট্টিটি কবিতা বেছে নিয়ে ১৯৫৮তে, জীবনানন্দের মৃত্যুর কয়েকবছর বাদে সিগনেট প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় 'রূপসী বাংলা'। সেই সংকলনে ছিল অশোকানন্দ দাশের সংক্ষিপ্ত একটি ভূমিকা। পরবর্তীকালে দেবেশ রায় সম্পাদিত 'রূপসী বাংলা—প্রকাশিত অপ্রকাশিত' এবং সম্প্রতিপ্রকাশিত দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'জীবনানন্দ দাশের কাব্যসংগ্রহ' থেকে যেমন ধরা পড়ে সিগনেট সংস্করণটির অসম্পূর্ণতা, তেমনি এই কবিতাগুলি সম্পর্কে নানা তথ্য জানা হয়ে যায় পাঠকের। এই তথ্যগুলি অবশ্য পাঠককে কিছুটা বিচলিত করে, সেই সঙ্গে এই প্রশ্নগুলি জাগতে থাকে, কেনই-বা এই রচনাগুলিকে প্রকাশযোগ্য মনে করেন নি কবি, আর যে-কবি আদৌ জনপ্রিয় নন, তাঁর এই বিশেষ কবিতাগুচ্ছ হঠাৎ এক বিশেষ সময়পর্বে কেন হয়ে ওঠে সর্বাধিক জনপ্রিয়, যার আড়ালে অন্য-অনেক কবি তো বটেই, এমনকি জীবনানন্দ নিজেও যেন চাপা পড়ে যান অনেকটা।

কী ছিল ১৯৩৪-এর দিনগুলিতে জীবনানন্দর ভাবনা! 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পর এই কবিতাগুলি রচিত, প্রায় এই সময়কালেই রচিত অন্যান্য কবিতা এসেছে 'বনলতা সেন' ও 'মহাপৃথিবী'তে, একটি কবিতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তেও। সময়ই যদি অনুভবের একমাত্র নিয়ন্ত্রক, তাহলে 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী' ও 'রূপসী বাংলা'-র এই কবিতাগুলি বাঁধা থাকত একই সূত্রে ; তা-হয় নি, আর একই সময়ে লেখা বহু কবিতাই গ্রন্থভুক্ত করলেও একটি বিশেষ মাস বা দিনগুলিতে লেখা এতগুলি রচনাকেই কবি সরিয়ে রেখেছিলেন পাঠকের কাছ থেকে—এতটাই কি পার্থক্য ঘটে গিয়েছিল তাঁর কবিতাভাবনার সঙ্গে এই কবিতাগুলির! 'রূপসী বাংলা'-র কবিতাগুলি লেখা ১৯৩৪-এর মার্চ-এর খাতায়, আর মার্চ-এপ্রিল চিহ্নিত খাতায় পাওয়া যাচ্ছে বনলতা সেন-এর পাঁচটি কবিতা, 'মহাপৃথিবী'-র দুটি, আর একটি যা পরে সংকলিত হয়েছিল 'বেলা অবেলা কালবেলায়'। ১৯৩৪ চিহ্নিত অন্য খাতাগুলির কবিতা একটু দূরবর্তী, এই কবিতাগুলির সঙ্গেই 'রূপসী বাংলা'-র কবিতাগুচ্ছের সর্বাধিক নৈকট্য।

কিন্তু আছে কি কোনো সাযুজ্য তাদের! 'রূপসী বাংলা'-য় সংকলিত কবিতাগুলির গরিষ্ঠ অংশেই খুঁজে পাওয়া যাবে অনুভবের এক সংযোগসূত্র, সেই সংযোগসূত্রকে চিহ্নিত করা যায় 'স্বদেশভাবনা' নামক এক স্থূল শব্দে। 'বনলতা সেন' 'মহাপৃথিবী' 'বেলা অবেলা কালবেলা'-য় সংকলিত এই সময়ের বাকি আটটি কবিতাতে আছে পরিচিত জীবনানন্দীয় অনুষঙ্গ, আছে চিল, শিশির, কুয়াশা, কাশবন, হিজল—যে শব্দগুচ্ছ ও প্রতিমা পাওয়া যাবে 'রূপসী বাংলা'-তেও, তবু 'রূপসী বাংলা'-য় ব্যাপ্ত যে নির্দিষ্ট বাংলাদেশ, সেই নির্দিষ্ট

কেন্দ্রটি এ-কবিতাগুলিতে নেই, এদের অনুভব স্বতন্ত্র ; বরং বলা ভালো স্বতন্ত্র 'রূপসী বাংলা'-র প্রধান কবিতাগুলিই।

কী সেই স্বাতন্ত্র্য! স্বদেশভাবনার যে-রূপটি এখানে অনুভূত হয় তাকে বলা যাবে না প্রচলিত অর্থে দেশাত্মবোধ, তাতে নেই কোনো প্রবল উদ্দীপক আবেগ, এমনকী নেই রবীন্দ্রনাথের 'আমার সোনার বাংলা' বা 'সার্থক জনম আমার জন্মেছি এই দেশে'-র নিবেদিত প্রণামও ; বদলে এই কবিতাগুলিতে থেকে যায় যেন এক শান্ত অভিমান, যে-অভিমানের পিছনে থেকে যায় গোপন রক্তক্ষরণ।

বস্তুত 'রূপসী বাংলা'-র কবিতা রক্তক্ষরণেরই কবিতা। 'বাংলার মুখ আমি দেখিয়াছি, তাই আমি পৃথিবীর রূপ / খুঁজিতে যাই না আর'—এই উচ্চারণে আপাতভাবে আছে এক প্রত্যাখ্যান, নিজেকে গুটিয়ে নেওয়ার ঘোষণা। কিন্তু পাঠক টের পান এখানে রয়ে গেছে এক আর্তি, তা কোনো রূপবিলাস নয়, অন্ধকারে জেগে ওঠার পর চারপাশে পল্লবের স্তূপের স্তব্ধতা আর ভোরের দোয়েলপাখির বসে থাকায় কোনো তীব্রতা নেই, তার শান্ততায় লেগে থাকে প্রগাঢ় বিষণ্ণতা। 'রূপসী বাংলা'-র কবিতায় বারবার ফিরে আসে বাংলার লৌকিক জগৎ—চাঁদ, বেহুলা, রামপ্রসাদের শ্যামা। বরিশাল জীবনানন্দের দেশ বিজয় গুপ্তের হাত ধরে মনসামঙ্গলের ঐতিহ্য এসে যায় তাঁর চেতনায়, কিন্তু সে পুরানকথা জীবনানন্দের কাছে বাংলার লোকজীবনের চেনাজানা মানুষের গল্পকথা ; সেই গল্পকথায় মিশে থাকে অনেকটাই স্মৃতি এবং স্মৃতির বেদনা। বস্তুত এক হারিয়ে-যাওয়া পৃথিবী যেন উন্মোচিত হতে থাকে 'রূপসী বাংলা'-র কবিতায়—অথচ বারবার অতীত কালের উল্লেখ সত্ত্বেও তা যেন এক স্পর্শযোগ্য বর্তমান। তবে কি অতীতকেই জীবনানন্দ জানছেন সত্য বলে—তাঁর বাংলাদেশ বর্তমানের বাস্তবতাকে সরিয়ে রেখে অতীতস্মৃতিকেই বাস্তবতা করে তুলতে চায়। জীবনানন্দর 'রূপসী বাংলা' বঙ্কিমচন্দ্রের 'মা যা ছিলেন' নয়, অতীতমহিমার জন্য দীর্ঘশ্বাস তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়, তবু যে অতীতের ছবি মিশে যায় বর্তমানে, তা আসলে এক আবহমানেরই সংকেতমাত্র। আবহমান, কিন্তু অপরিবর্তনেয় নয়, তাই বারবার জীবনানন্দকে মনে করিয়ে দিতে হয় তার পুরনো স্বাদ আর ঘ্রাণের কথা—"যতদিন বেঁচে আছি আকাশ চলিয়া গেছে কোথায় আকাশে/ অপরাজিতার মতো নীল হয়ে.../...আমি যে দেখিতে চাই—আমি যে বসিতে চাই বাংলার ঘাসে/পৃথিবীর পথে ঘুরে বহুদিন অনেক বেদনা প্রাণে সয়ে/ধানসিঁড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে"—এই উচ্চারণে যে মৃত্যুর ছায়া, সে-ছায়াতে অতীতের ছবি রাখা। এই মৃত্যুর ছায়া এমনকী কবিতাগুলিতে ঘুরে ঘুরেই আসে। এমনকী স্পষ্ট করেও, ব্যঞ্জনায় নয়, প্রত্যক্ষ ছবি হিসেবেই—"যেইখানে কল্কাপেড়ে শাড়ি পরে কোনো এক সুন্দরীর শব/চন্দন চিতায় চড়ে", "দেখিবে কখন কারা এসে আমকাঠে/ সাজায়ে রেখেছে চিতা...," "আবার যখন জাগি, আমার শ্মশানচিতা বাংলার ঘাসে / ভরে আছে ...", আর কোনো-কোনো কবিতায় যেন মৃত্যু তার চিহ্ন ছুঁয়ে দিয়ে যায়। কেন এই মৃত্যুস্পর্শ!

১৯৩৪-এ লেখা হচ্ছিল এই কবিতাগুলি। বাঙালি মধ্যশ্রেণীর জীবন, তার নাগরিকতার অভিঘাত সত্ত্বেও, তখনো শিকড় রেখেছে গ্রামীণ বাংলায়, কলকাতার বাইরে তার মফঃস্বলও আসলে গ্রামীণ সৌরভেই পূর্ণ। সেই গ্রাম যে শুধু প্রাকৃতিক মায়ায় ঘেরা তাই নয়, তা বাঙালি মধ্যশ্রেণীর অস্তিত্বের সঙ্গেই যুক্ত। সে-অস্তিত্ব এক মায়ায় আচ্ছন্ন, একথা অনস্বীকার্য। যাকে বলা যায় বাঙালি ঐতিহ্য, আর্যভারতের সংস্কৃতির থেকে স্বতন্ত্র এক লৌকিক সংস্কৃতির আবেগে তা পুষ্ট—যদিও কখনো তারা পরস্পরকে ছুঁয়েছে,

কাটাকুটি করে গেছে। বাঙালি শিক্ষিত মানস শাস্ত্র, পুরাণ, মহাকাব্য আস্বাদন করেছে, উনিশশতকে এসে সে পেয়েছে য়ুরোপীয় সাহিত্যের পরিচয় ; মধ্যযুগীয় এই আখ্যায়, ধর্মীয়তার প্রভাবের অভিযোগে পুরনো সাহিত্য-সংস্কৃতির সঙ্গে যোগও অস্বীকার করতে চাওয়া হয়েছে, এমনকী এড়াতে চাওয়া হয়েছে লোকজীবনকেও, তবু লৌকিক সংস্কৃতির একটা টান থেকেই গেছে। উনিশশতকের নতুন চেতনা য়ুরোপকে আত্মস্থ করতে চেয়েছে, তার রোম্যান্টিক বাসনা নিম্নবর্গের আর্থসামাজিক অবস্থান সম্পর্কে উদাসীন থাকলেও বা নিজস্ব শ্রেণীস্বার্থে তার বিরোধিতা করলেও সাংস্কৃতিক স্তরে তা যেন এক বিকল্পের সন্ধান করতে চেয়েছে, বিশেষত উনিশশতকের শেষ দশক থেকে নব্যহিন্দুজাগরণের বিপরীতেই যেন তা খুঁজতে চেয়েছে বাঙালি পরিচয়ের শিকড়।

সেই শিকড়সন্ধানের একটা প্রকাশ হয়ত ১৯০৫-এর বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে আন্দোলন। তার রাজনৈতিক তাৎপর্য যাই হোক-না-কেন সংস্কৃতির দিক থেকে তা এক 'বাঙালি' ভাবনার জন্ম দিয়েছিল, ভারতীয় স্বদেশের বদলে 'বঙ্গ আমার জননী আমার'—এই ডাকই ছিল প্রবল, "তবে আশ্রমে তোমার চরণে, হে ভারত, লব শিক্ষা" বা "এ ভারতে রাখো নিত্য প্রভু, তব শুভ আশীর্বাদ"—এর বদলে "আমার সোনার বাংলা, আমি তোমায় ভালোবাসি"-র আকুলতাই প্রধান হয়ে উঠল। এও এক মাতৃবন্দনার কবিতা, কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র থেকে তা দূরবর্তী—ফাগুনের আমের বনের ঘ্রাণ, অঘ্রানের ভরা ক্ষেত, ধেনুচরা মাঠ, পারে যাবার খেয়াঘাট—এইসব ছবি বা "আজি বাংলাদেশের হৃদয় হতে কখন আপনি/তুমি এই অপরূপ রূপে বাহির হলে জননী"-র মধ্যে "আঁচল ঝলে আকাশতলে রৌদ্রবসনী"-র ছবিই পরিস্ফুট ; এবার আর ভারত নয়, প্রার্থনা জেগে ওঠে বাংলার মাটি, বাংলার জল, বাংলার বায়ু, বাংলার ফল, বাঙালির ঘরে যত ভাই বোন তাদের জন্য। এ কোনো সংকীর্ণতা নয়, এ আসলে শিকড় খোঁজারই আকুলতা। এই শিকড়সন্ধান ছড়িয়ে যেতে চেয়েছিল নানাভাবেই, স্বদেশি-আন্দোলনের রাজনৈতিক কর্মপদ্ধতির অপেক্ষা না করেই।

১৯০৫-এ জীবনানন্দ শিশুমাত্র। সেই আন্দোলনের কোনো স্মৃতিকথা হয়ত পৌঁছেছিল তাঁর কাছে, বরিশালের পরিবেশও ছিল রাজনীতি-আলোড়িত, কিন্তু তা তাঁর পরবর্তী কাব্যজীবনকে প্রভাবিত করেছে, এমন ভাবনার সুযোগ কম। রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড সম্পর্কে তেমন কোনো উৎসাহও দেখান নি জীবনানন্দ। তবে চিত্তরঞ্জন দাশ যখন হয়ে উঠলেন দেশবন্ধু—জীবনানন্দকে যথেষ্টই আলোড়িত করেছিলেন তিনি। 'ঝরা পালক'-এর দেশবন্ধু সম্পর্কিত কবিতাটিকে অপরিণত উচ্ছ্বাসের স্বাক্ষর বলে যদি গুরুত্ব নাও দেওয়া হয়, 'রূপসী বাংলা'-র কবিতাটিকে এড়িয়ে যাওয়া চলে না। এ-কবিতাও কিছুটা স্মৃতিভারাতুর; 'রূপসী বাংলা'-য় যে মাত্র চারটি কবিতার শিরোনাম পাওয়া যায়, এ-কবিতাটি তারই একটি, শিরোনাম অনুযায়ী এ-কবিতা দেশবন্ধুর তুমুল রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের বৎসরগুলির স্মরণে। কিন্তু এ-কবিতায় নেই কোনো রাজনৈতিক ঘটনা বা তত্ত্বের প্রসঙ্গ,... "দেশবন্ধু আসিয়াছে ক্ষুরধার পদ্মায় এবার,/কালীদহে ক্লান্ত গাঙশালিখের ভিড়ে যেন আসিয়াছে ঝড়..." এই উচ্চারণ সত্ত্বেও এ-কবিতার মূল ভাবনা "রূপসী বাংলা"-র অন্যান্য কবিতার সঙ্গেই মিলে যায়—এতেও আছে এক মৃত্যুর ছায়া, আছে অতীতের ছবির প্রতিফলন—তার সঙ্গে দেশবন্ধুর কোনো যোগ নেই। রাজনৈতিক আলোড়ন নয়, জীবনানন্দ কি তাহলে ওই সাংস্কৃতিক শিকড়সন্ধানেই মুখ ফিরিয়েছিলেন!

রবীন্দ্রনাথ এ-ব্যাপারে অবশ্যই পথ দেখিয়েছিলেন—বাঙালি সংস্কৃতির লোক-

উপাদানের প্রতি তাঁর অদম্য উৎসাহের কথা মনে করতেই হয়। কিন্তু জীবনানন্দ কেন দেখাবেন তেমন উৎসাহ! শুধুই তাঁর জন্মভূমির প্রতি টানে, না কি ওই লোকজ সংস্কৃতির প্রতি চারপাশের নানা আগ্রহের প্রেরণায়! প্রথম বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী য়ুরোপের শিল্পী-বুদ্ধজীবীদের আদিম বা লোকশিল্পের প্রতি উদগ্র আগ্রহের প্রতিফলন নিশ্চয়ই এ নয়, কেননা এখানে জীবনানন্দ কোনো লুপ্ত শিল্পের প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক উৎসাহে তাকান নি। ইংরেজি সাহিত্যের ছাত্র জীবনানন্দ, 'ঝরা পালক'-এর হাত মক্শো করার পর্ব পেরিয়ে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে যখন পৌছন, সেখানে "আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে"; এর সঙ্গে 'রূপসী বাংলা'-র উচ্চারণের কোনো সাদৃশ্য থাকলেও সে-জগৎ রূপসী বাংলার নয়, সেখানে "স্বপ্ন নয়, এক বোধ কাজ করে", "অলস মাছির শব্দে ভরে থাকে সকালের বিষণ্ণ সময়" আর "মাঠ থেকে মাঠে মাঠে—সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে/শকুনেরা চরিতেছে",—এইসব অনুষঙ্গের প্রতিধ্বনি 'রূপসী বাংলা'-য় আছে বলে কখনো কখনো মনে হতে পারে, কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র সামগ্রিক ভাবনাটাই আলাদা। জীবনানন্দর উপর বিদেশি প্রভাব নিয়ে গবেষকদের নানা চিন্তা, সে-সব আলাদা প্রশ্ন। তবে য়ুরোপীয় ভাবনার সঙ্গে পরিচয়ের সহায়তায় জীবনানন্দ ও তাঁর সমকালীনেরা এক আন্তর্জাতিক মননের অধিকারী হয়ে উঠেছিলেন, সে-আন্তর্জাতিকতায় শুধু দেশ নয়, কালের সীমাও প্রায় লুপ্ত। সেখান থেকে জীবনানন্দ কেন এলেন 'রূপসী বাংলা'-র জগতে।

কল্লোল পত্রিকাকে কেন্দ্র করে কয়েকজন তরুণ স্পর্ধিত ভঙ্গিতেই শুরু করেছিলেন এক আধুনিকতার অভিযান—সেই পত্রিকা বা তার সহমর্মী 'কালি-কলম' ও 'প্রগতি'তে জীবনানন্দ লিখেছেন অনেকবার। এই আধুনিকতার ভাবনা অনেকটাই ছিল য়ুরোপপ্রভাবিত। মধুসূদন থেকে এই আধুনিকতার একটা বড়ো তফাৎ এই যে সুদূর য়ুরোপের জন্য উন্মনা হলেও মধুসূদন জেনেছিলেন তাঁর দেশজ সংস্কৃতির উপাদানগুলিকে—তাই কৃত্তিবাসের কাহিনীর কাছেই হাত পেতেছিলেন তিনি। কল্লোল-কেন্দ্রিক আধুনিকতা অনেকটাই এড়াতে চেয়েছিল দেশজ আবহকে—ঔপনিবেশিক নগরায়নের টানে শিক্ষিত মন আত্মীয়তা খুঁজতে চাইছিল যেখানে, সেখানে বাংলার নিজস্ব গ্রামজীবনের কোনো ছায়া নেই। এর একটা কারণ এঁরা সত্যেন্দ্রনাথদের মতো স্বভাবকবি নন—যে আধুনিকতার কথা তাঁরা বলেছিলেন, তার একটা লক্ষণই হলো তীব্র আত্মসচেতনতা। তারই ফলে সম্ভবত এই বাঙালি মধ্যশ্রেণী তাঁর গ্রামীণ শিকড়ের কথা ভুলে থাকতে চেয়েছিলেন ; শুধুই নাগরিকতা বা য়ুরোপমুখীনতার টানে নয়, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবাদে বাংলার গ্রামজীবনে যে পরিবর্তন এসেছিল, সেই পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থার মধ্যে মধ্যস্বত্বভোগী বাঙালি মধ্যশ্রেণীর ভূমিকা খুব উজ্জ্বল ছিল না, সেই অস্বস্তিতে ঐতিহ্য আর শিকড়কে এড়তে চাইছিলেন তাঁরা। অন্যদিকে স্বদেশি-আন্দোলনও শহরে শিক্ষিত শ্রেণীরই আন্দোলন হয়ে ওঠে—গ্রামীণ বাস্তবতা আর সমস্যাকে এড়িয়েই। 'গোরা' উপন্যাসে চরঘোষপুরের অভিজ্ঞতা আর 'ঘরে বাইরে'-র নিখিলেশের সতর্কবাণীতে সেই সত্য ধরা পড়ে।

কিন্তু ওই আত্মসচেতনতাই তো অস্থির করে তোলে—আত্মপরিচয়ের তাগিদ বড়ো হয়ে ওঠে। ফলে যে লোকজীবনের সংকটকে, তার আর্থসামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে মেনে নেওয়া যায় না, তারই ঐতিহ্য আর সংস্কৃতিকে ফিরে দেখতে হয়। বাস্তবতার একটা চাপ থেকেই যায়—লোকঐতিহ্য আর সমকালীন গ্রামজীবনের বাস্তবতার দ্বন্দ্বকে এড়ানো যায়

না; সেই দ্বন্দ্বের একটা বড়ো উদাহরণ বিভূতিভূষণের উপন্যাস—হরিহরের পুঁথিপালা, নিশ্চিন্দিপুরের প্রকৃতি আর দুর্গার মৃত্যুতে তার পরিচয়। অথচ জীবনানন্দ, বরিশালের সঙ্গে তাঁর মগ্ন আত্মীয়তার কারণে তো বটেই, শৈল্পিক সততাতেও বুঝতে চেয়েছিলেন ওই ঐতিহ্যকে। আর হয়ত টের পেয়েছিলেন যে অনিকেত জীবনের উদ্‌ভ্রান্তিকে তিনি ধরতে চেয়েছিলেন তাঁর রচনায়, তা শুধু য়ুরোপভাবিত নয়, শুধু নাগরিক মননের সংকট নয়, এই বাংলার গ্রামেও কোথায় তার যন্ত্রণা রয়ে গেছে—অতীত, স্মৃতিমগ্নতা, প্রবহমানতা, সর্বত্রই তার স্পর্শ। পাণ্ডুলিপির সাক্ষ্য থেকে জানা যায় অতি অল্পসময়েই লেখা হয়ে গিয়েছিল এতগুলি কবিতা। বোঝা যায় একটা আবেগের চাপ কাজ করছিল এই লেখাগুলির পিছনে, কিন্তু তাকে শুধুই তাৎক্ষণিক বলে চিহ্নিত করা চলে না। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র কোনো কবিতায় যেন ইঙ্গিত ছিল এর, রূপকথা বা লোকপুরাণের অনুষঙ্গে, যদিও সেখানে ঘুমন্ত কন্যাকে দেখে মনে হয়েছিল "চোখে ঠোঁটে অসুবিধা—ভিতরে অসুখ।/কে যেন নিতেছে তারে খেয়ে!"—কিন্তু "এ ঘুমনো মেয়ে/পৃথিবীর...", সেই পৃথিবীর মেয়ের অসুখ জেনে কি জীবনানন্দ খুঁজে দেখতে চেয়েছিলেন বাংলার মুখ, তার অতীতে, ইতিহাসে, ঐতিহ্যে আর প্রবহমানতায় আছে কিনা কোনো শুশ্রূষা।

কী আছে 'রূপসী বাংলা'-র কবিতায়! যে পাণ্ডুলিপি-খাতা থেকে এর আদি সংস্করণ প্রস্তুত করা হয়েছিল, তার সবকটি কবিতাই নয় বাংলাদেশস্পর্শিত, কিন্তু অধিকাংশ কবিতাতেই ছড়িয়ে রয়েছে এক মুখের ছবি—সে-মুখ বাংলার আর সে যেন এক মানবীর মুখ। জীবনানন্দ প্রস্তুত করতে চেয়েছিলেন ভাবনার ঐক্যে বাঁধা একগুচ্ছ কবিতা, কোনো একটি বা দুটি কবিতায় তাঁর এই আবেগকম্পিত বোধকে ধরা যাবে না জেনেই ; আর তাদের ঐক্য সম্পর্কে এতটাই সতর্ক ছিলেন তিনি যে এগুলিকে বেঁধে নিতে চেয়েছিলেন একই ধরণে, সনেটের রূপবন্ধে, অবশ্যই চোদ্দমাত্রার পংক্তিতে নয়, তাঁর দীর্ঘপয়ারের রীতিতেই, কিন্তু চোদ্দ পঙ্‌ক্তির বিন্যাসে, কখনো কখনো আট ও ছয় পঙ্‌ক্তির প্রথাগত স্তবকসজ্জাতেই। স্পষ্টতই আবেগকে নির্দিষ্ট সীমায় বাঁধার সচেতন প্রয়াস ছিল তাঁর, সেইসঙ্গে মনে ছিল একাধিক কবিতায় সেই আবেগকে সঞ্চারিত করে দেওয়ার ইচ্ছাও। কিন্তু কোন আবেগ তা, যা এতটাই ব্যাপক যে এতগুলি কবিতায় ছড়িয়ে দিতে হয় তাকে!

'রূপসী বাংলা'-র কবিতাগুচ্ছ এখানেই হয়ে ওঠে স্পষ্ট করে জীবনানন্দীয়। এই কবিতাগুলির সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে এক প্রগাঢ় ভালোবাসা, কিন্তু সে-ভালোবাসা কোনো নির্বস্তুক বায়বীয় কল্পনাবিলাস নয়। যে-বাংলাদেশকে ভালোবেসেছেন কবি, সে-বাংলাদেশ শরীরী হয়ে ওঠে শুধু প্রকৃতিতে নয়, ইতিহাসেও। এ-কথা ঠিক যে, সেই ইতিহাসের গায়ে আছে উপকথার আবরণ, কখনো-বা অতিকথাও, তবু সেই উপকথা, রূপকথা আর অতিকথার মানুষজন নিয়েই জেগে ওঠে এক বাংলাদেশ, যার সঙ্গে লেগে আছে এমনকী সহজ গেরস্তালির চেনা গন্ধও। এক অবিরল বাংলাদেশ, সে-বাংলাদেশে নেই কোনো নাগরিক আকাশরেখা, তা শুধু ভরে থাকে আমকাঁঠালের গন্ধে, হিজলের ছায়ায়, সেখানে আজও যেন সপ্তডিঙা মধুকরের যাওয়া আসা।

মনে হতে পারে জীবনানন্দ তৈরি করে নিতে চেয়েছেন এক পলায়নের আশ্রম। যা আজ আর নেই, সেই হারিয়ে-যাওয়া জগৎকেই করে তুলতে চাইছেন আঁকড়ে ধরার অবলম্বন—'রূপসী বাংলা'-র অতীতছবিতে ভুলতে চাইছেন বর্তমানের বাস্তবতাকে। 'রূপসী বাংলা'য় বারবার শোনা যায় এইসব উচ্চারণ "যেইখানে একদিন শঙ্খমালা চন্দ্রমালা, মানিকমালার/কাঁকন বাজিত, আহা কোনোদিন বাজিবে কি আর।" "কোথায়

সে নিয়ে গেছে সঙ্গে করে সেই নদী, ক্ষেত মাঠ, ঘাস, সেই দিন, সেই রাত্রি, সেইসব ম্লান চুল, ভিজে শাদা হাত'; এমনকী একথাও জানতে হয়—"বউকথাকও আর রাঙা বউটিকে/ ডাকে নাকো—হলুদ পাখনা তার কোন যেন কাঁঠাল পলাশে/হারায়েছে ; বউও তো উঠোনে নাই—পড়ে আছে একখানা ঢেঁকি ; ধান কে কুটিবে বলো—কতদিন সে তো আর কোটে নাকো ধান./রোদেও শুকুতে সে যে আসে না কো চুল তার..."। এইসব উচ্চারণে স্পষ্টতই মনে করিয়ে দেওয়া হয় হারিয়ে যাওয়া জগতের ছবি, কিন্তু তা যে হারিয়ে গেছে, সেই সত্যটিও মেনে নেওয়া হয়। আর তার বিপরীতেই যেন জেগে ওঠে শ্মশানের ছবি, অবসানের ছবি 'শ্মশানের দেশে তুমি আসিয়াছ...।" কোন্‌টি তাহলে কবির শুশ্রূষা। ওই হারিয়ে-যাওয়া জগৎ না এই শ্মশানের দেশ! এর কোনোটিকেই অস্বীকার করা যায় না, তবু তাঁর বাংলাদেশ জেগে থাকে এরপরেও—নদী, মাঠ, ধান, দাঁড়কাক, ঘুঘু, দোয়েলের ঝাঁক নিয়ে, শঙ্খমালার রূপকথার আবেশ নিয়ে, বেহুলার ভেলা ভাসানোর প্রবহমান স্মৃতি নিয়ে। এইসব ছাড়িয়ে জেগে থাকে আরো কিছু—বাংলার ধানী শাড়ি, কিশোরীর চালধোয়া ভিজে হাত, নারকোলনাড়ু, ঢেঁকিশাক, কলমিলতা—চেনা গেরস্তালির স্বাদগন্ধ। এই স্বাদগন্ধ একদিন পেয়েছিল শ্রীমন্ত, লহনা, বেহুলারা—কিন্তু তা থেকে যায়, এমনকী ১৯৩৪-এর সকালদুপুররাত্রি জুড়েও। সত্যেন্দ্রনাথের ধরনে "চণ্ডীদাস আর রামপ্রসাদের কণ্ঠ কোথায় বাজে রে/সে আমাদের বাংলাদেশ, আমাদেরই বাংলা রে' বলা সম্ভব ছিল না জীবনানন্দের পক্ষে, কিন্তু তাঁর কবিতায় আসে রামপ্রসাদের শ্যামা, ঐশ্বরিক মহিমার বদলে যে নিতান্তই ঘরের মেয়ে।

তাই অতীত আর বর্তমান অনেকসময় মিশে যায়। যেভাবে মুকুন্দরাম বা চণ্ডীমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল প্রসারিত হয়ে যায় উত্তরপুরুষের চেতনায়, তেমনি হারিয়ে-যাওয়া বাংলাদেশও তার কাঁকনমালা আর কেশবতী কন্যার গল্প নিয়ে মিশে যায় কীর্তন ভাসান গান যাত্রা পাঁচালীর সুরে জেগে-থাকা এক মানবীর মুখে—"আমি যে বিকায়ে দিছি মন/বাঙালি নারীর কাছে—চালধোয়া স্নিগ্ধ হাত, ধানমাখা চুল,/হাতে তার শাড়িটির কস্তাপাড়—ডাঁশা আম, কামরাঙা, কুল।"

এই ভালোবাসারই কবিতা 'রূপসী বাংলা'। আর ভালোবাসার উচ্চারণ বলেই তাতে এত বেদনার ছাপ। মৃত্যুর প্রতীকে সেই ভালোবাসার হারানোর ভয়ই রূপ পায়, যা তখনো সত্য, তাও যেন হারিয়ে যেতে চায় ; তাঁর বাংলাদেশও যেন পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মতো, রূপ নিয়ে চলে গেছে দূরে—কিন্তু তার জন্য হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে কবির কোনো দ্বিধা নেই। সেই রক্তক্ষরণই তাঁকে আর্ত করলেও ফিরিয়ে আনতে চায় এই বাংলাদেশের কাছে—"তোমরা যেখানে সাধ চলে যাও—আমি এই বাংলার পারে/রয়ে যাব...", "জীবন অথবা মৃত্যু চোখে রবে—আর এই বাংলার ঘাস /রবে বুকে...", "একদিন মৃত্যু এসে যদি দূর নক্ষত্রের তলে/ অচেনা ঘাসের বুকে আমারে ঘুমায়ে যেতে বলে, /তবুও সে ঘাস এই বাংলার অবিরল ঘাসের মতন"—আর এরপর "আবার আসিব ফিরে ধানসিঁড়িটির তীরে—এই বাংলায়"।

প্রবাসবেদনা একদিন মধুসূদনকে আকুল করে তুলেছিল স্বদেশের জন্য কাতরতায়—রচিত হয়েছিল তাঁর 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'। 'রূপসী বাংলা'-র কবিতাগুলির প্রধান অংশই সনেটের রূপবন্ধে রচিত, এই সাদৃশ্যটুকু ছাড়া মধুসূদনের সঙ্গে জীবনানন্দের আর কোনো মিল নেই। মধুসূদনের কাছে স্বদেশবিচ্ছেদ ছিল প্রত্যক্ষ এক ঘটনা—জীবনানন্দের কাছে তাঁর বাংলাদেশ ভৌগোলিক অর্থে দূরবর্তী নয়, কিন্তু সে-

বাংলাদেশকে যেন তিনি ঠিক ছুঁতে পারছিলেন না, অথচ তাকে ছোঁয়ার আকুলতা ছিল, ছিল প্রয়োজনও। স্বভাবকবির সহজিয়া আনন্দে নয়, নাগরিক জীবনের জটিল দ্বান্দ্বিক বোধ দিয়ে ছাড়া এই বাংলাদেশকে ছুঁতে চাওয়ার অন্য-কোনো উপায় ছিল না তাঁর—তাই তাঁকে বিক্ষত হতে হয়েছে বারবার। আর সেই ক্ষতমুখ থেকে উৎসারিত বিন্দু বিন্দু রক্তক্ষরণেই রচিত হয় রূপসী বাংলা-র কবিতা।

আর এ-কারণেই কি জীবনানন্দ সরিয়ে রেখেছিলেন এই কবিতাগুলিকে, প্রকাশিত হতে দেন নি! এই কবিতাগুলি মিলে তৈরি হয় এক অখণ্ড কাব্য, পত্রিকায় তাদের একসঙ্গে প্রকাশ করা সম্ভব ছিল না, এটা কি একটা কারণ! নাকি জীবনানন্দ মনে করেছিলেন বড়ো-বেশি ব্যক্তিগত হয়ে যাবে এই রক্তক্ষরণের ইতিহাস, তাই সংকোচ বোধ করেছিলেন। যে তীব্র আত্মসচেতনতায় তিনি কবিতা লিখেছিলেন, ধরতে চেয়েছিলেন সময়ের সংকটকে, তার বদলে এখানে বড়ো হয়ে উঠেছে আত্মসংকট, এমন কী মনে হয়েছিল তাঁর। নাকি ১৯৩৪-এর পর দ্রুত পরিবর্তিত পরিস্থিতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা, শিল্পসংস্কৃতিতে মার্কসবাদী চেতনার প্রভাব, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের আঁচে বাংলার গ্রামের ঝলসে যাওয়া—এইসব অভিজ্ঞতার সামনে এই কবিতাগুলির বিষাদযন্ত্রণা বোধহয় সংগত ঠেকবে না এ-রকম ভেবেছিলেন তিনি। আর শেষ পর্যন্ত ১৯৪৬-৪৭-এর বাস্তবতা বোধহয় একেবারেই বদলে দিল সবকিছু, নিস্তব্ধ নিস্তেজ বাংলার গ্রাম আর মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয় এমন মানুষের হাড়খুলির সামনে দাঁড়িয়ে যখন জানতে হয় "অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দুজনের হাতে।/পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকদের দাবি এসে/ সবই নেয়...", তখন আর কোন বাংলার মুখ দেখে পৃথিবীর রূপ ভুলবেন কবি!

ঝরা পালক আবার

আজ যখন জীবনানন্দ পড়ি, পড়ি দুজন জীবনানন্দকে। কবি জীবনানন্দ দাশ বললে এখন আর সম্বোধন করা হয় না সম্পূর্ণ জীবনানন্দ দাশকে। দুটি স্বতন্ত্র সত্তার বিকীর্ণ বৈভবে আজ তাঁর ক্রম-উদ্‌ভাসন। প্রয়াণের আগে আর প্রয়াণ-পরবর্তী স্বল্প সময়সীমায় প্রধানত কবি হিসেবেই তাঁর সাম্রাজ্য বিস্তার। যদিও প্রাবন্ধিক জীবনানন্দও ততক্ষণে গড়ে তুলেছেন তাঁর বড়ো সাম্রাজ্যের পাশাপাশি অন্য এক সমৃদ্ধ রাজ্যপাট, কিন্তু কবি জীবনানন্দের প্রতি অগাধ আচ্ছন্নতায় আমরা তাঁর কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ গ্রন্থটিকেও একাকার করে নিয়েছিলাম তাঁর কবিতারই নিকট আত্মীয় হিসেবে। গদ্যের জীবনানন্দের দিকে তাকানোর চোখ বোজানোই ছিল যেন।

প্রথমে ধীরে, পরে দ্রুত লয়ে, গল্পকার আর ঔপন্যাসিক জীবনানন্দের রাজকীয় আবির্ভাব। এখন তাই আমাদের জীবনানন্দ পাঠ শুধু একজন কবিকে পাঠ করার চৌকো পরিধির মধ্যেই আটকে থাকছে না আর। এখন আমাদের অবলোকন, স্বতঃস্ফূর্ত আগ্রহেই, ছড়িয়ে যায় তাঁর সৃজনভূমির দুই প্রান্তেই, যার একদিকে কবিতা, অন্য দিকে কথাসাহিত্য। যদিও, এত গল্প-উপন্যাস সত্ত্বেও জীবনানন্দ বললেই আমাদের চেতনার বেদীতে নিমেষে নির্মিত হয়ে যায় যে মূর্তি, সেটা কবিরই। আমাদের দৈনন্দিন কথোপকথনে, কথোপকথনের দৈনন্দিনতাকে রাঙিয়ে দিয়ে অথবা রাঙিয়ে দিতে, হাওয়ার মতো নিঃশব্দে আতার ক্ষীরের মতো যে সব পংক্তি, তা যে কবি জীবনানন্দ অধ্যয়নের আকণ্ঠ-তৃপ্ত অভিজ্ঞতা থেকেই অর্জন করা, কাউকে নতুন করে থাকে করিয়ে দেওয়ার মতো প্রসঙ্গ নয় আর তা।

কবি জীবনানন্দের সঙ্গেই আমাদের প্রথম বিমুগ্ধ পরিচয়। কিন্তু সে ঘনিষ্ঠতার নির্মাণে আদৌ কোনো পৌরোহিত্য ছিল কি তাঁর প্রথম কবিতার বই 'ঝরা পালক'-এর? অন্য ভাবেও সাজানো যেতে পারে এই একই প্রশ্নকে। আজও, তাঁকে অধ্যয়ন করছি যখন, আমাদের নিয়মিত পাঠ্য-তালিকায় থেকে যাচ্ছে যে-সব বই, সেখানে কি সে সবের মতো হাত বাড়ালেই ছোঁয়ার মতো অদূর নিকটে জায়গা পেয়েছে 'ঝরা পালক'? তেমন মনস্ক অভিনিবেশে পড়া হয়নি বলে কি আমরা অনুভব করি কোনো অস্থিরতা? ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে যত ভাবেই তোলা যাক না প্রশ্নটা, উত্তর মোটামুটি ভাবে একটাই, না। আবছাভাবে আমাদের ধারণায় যেন গেঁথে গেছে এইরকম একটা বিশ্বাস যে, 'ঝরা পালক' না পড়লেও জীবনানন্দকে জানার হিসেব-নিকেশে ঘাটতি ঘটবে না কখনো। অথচ, আরো তেরচা ভঙ্গীতে এমন উক্তিও সম্ভব যে, ওটা না পড়াই সুখদ। স্বাবলম্বনের সুষমা দানা বাঁধেনি ওখানে।

আমরা এটা সত্যিই যে আমার তাঁর আবিষ্ট পাঠক হতে শুরু করেছি সিগনেট প্রেস

থেকে বেরনো 'বনলতা সেন' থেকেই। হয়তো এর পিছনে অন্য একটা কারণ থেকে গিয়েছিল এটাই যে, তার আগে হাতের নাগালে তেমন সুলভ ছিল না তাঁর বই, আমাদের সেই যৌবনবিকাশের আর একই সঙ্গে পঠন-তৃষ্ণারও বহুমুখী বিস্তারের কালে। তার আগের ইতস্তত যে-সব পড়া বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার পাতায়, তা যদি ভালো লেগেও থাকে, তাকে নিশ্বাসের অন্তর্গত করে নেওয়ার মতো প্রস্তুতি ছিল আমাদের কারো কারো ; অন্ততপক্ষে আমারই। আমরা অনেকেই তখন অন্য কবিতে, অন্য ভাষা-ভঙ্গী ও অন্য বিষয়-সূচিতে সমৃদ্ধ কবিতার কাছেই কৃতজ্ঞ হওয়ার পাঠ নিচ্ছি। 'ঝরা পালক' পড়েছি, বা পড়বার মতো একটি দুর্লভ খণ্ড সংগ্রহ করেছি অনেক পরে। একদিকে থেকে হয়তো ভালই হয়েছে সেটা। 'ঝরা পালক' দিয়ে প্রথম পাঠ শুরু হলে হয়তো পরিচয়ের শুভ সূচনাতেই ঝিমিয়ে যেতে পারতো সান্নিধ্যলাভের স্বতোৎসারিত টান। যেমন ঘটতে পারতো রবীন্দ্রনাথের বেলাতেও, যদি 'কবি কাহিনী'-ই সবার আগে এগিয়ে আসতো ঘটকালির পুরোহিত হয়ে। তাছাড়া যদি পড়তামও, তখন কি আমাদের পক্ষে খুঁজে পাওয়া সম্ভব ছিল এসব নক্ষত্র-দীপ্তির ইশারা যে অনতিকাল পরে ইনিই রবীন্দ্র প্রভাবিত নদীস্রোতের ভিতরে থেকেও তার অভ্যন্তরে জাগিয়ে দেবেন মাইল মাইল শস্যের এক সবুজ দ্বীপ? হয়ে উঠবেন প্রেরণার শত ঝর্ণাজল?

'ঝরা পালক'-এ নজরুল-মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথের প্রলম্বিত প্রভাবের ছায়াটা বেশ প্রত্যক্ষ আর ঘন। যে বুদ্ধদেব বসুকে আমরা চিনি জীবনানন্দের আদি-আবিষ্কারক আর প্রথম গুণগ্রাহী ব্যাখ্যাতা হিসেবে, তাঁরও তাই মনে না হয়ে পারেনি যে ওখানে অর্থাৎ 'ঝরা পালক'-এ শিক্ষানবিশীটাই প্রধান, তাই স্বাতন্ত্র্য-ঝঙ্কৃত উচ্চারণ অস্পষ্ট ও অনুচ্চারিত। আরো আশ্চর্য যে কবি নিজেও আস্থাবান ছিলেন তেমন বিশ্বাসে। অনুজ এক কবিকে লেখা চিঠিতে জানিয়েও দিয়েছিলেন নিজের অসন্তুষ্টির সমাচার। তবুও, অপরিণতির বেড়া ডিঙিয়েও বুদ্ধদেব বসু ঐ 'ঝরা-পালক'-এর কিছু কিছু কবিতায় খুঁজে পেয়েছিলেন রোমান্টিকতার মৌল লক্ষণ, আর সেই সঙ্গে ভাষা আর ভঙ্গীর উপস্থাপনার হেরফের ঘটিয়ে এক ধরনের প্রথাভাঙা বিরুদ্ধাচারণেরও সচেতনতা।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তাঁর দ্বিতীয় কবিতার বই। ঐ বইটির পাতায় পাতায় কিংবা পরতে পরতে এক ধরনের ভারহীন হাওয়া আর ধারহীন আলোর এমনই লুটোপাটি আর দৃশ্যের ভিতরে প্রশান্ত বেদনার এমনই সুস্থির সঞ্চার যে তিনি হয়ে গেলেন 'নির্জনতার কবি' হিসেবে। 'নির্জনতার কবি' উপাধিটা বুদ্ধদেব বসুর দেওয়া। আর 'শুদ্ধতম কবি' অন্নদাশঙ্কর রায়ের। যতক্ষণ না বেরচ্ছিল 'মহাপৃথিবী' আর তারপরে 'সাতটি তারার তিমির', জীবনানন্দ যেন নিজের হাতেই এগিয়ে দিচ্ছিলেন সেই শিকল, যাতে সহজেই তাঁকে আটকে রাখা যায় ঐ দুটি উপাধির সংকীর্ণ পরিসরে। বাঁধা কাটার শুরু 'মহাপৃথিবী' থেকে। 'সাতটি তারার তিমির'-এ বাঁধন পুরোপুরি ছিন্ন। আর এখান থেকেই তাঁর বিচ্ছিন্ন হওয়ার শুরু পূর্ব-প্রশস্তিকারদের বিশেষণ বন্দনা থেকে। আর এখান থেকেই নবীন পাঠক ও সমালোচক গোষ্ঠীর সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তার ক্রমপ্রসারণ। এর প্রমাণ মিলবে দু দিক থেকেই। পূর্ববর্তী পাঠক আর তাঁকে পছন্দ করছেন না ততখানি। পরবর্তী পাঠক গ্রহণ করছেন পরিতৃপ্ত করতল বাড়িয়ে। তাঁর প্রাথমিক সিদ্ধির প্রবল প্রচারক বুদ্ধদেব বসু 'মহাপৃথিবী'-পরবর্তী কবিতার নতুন ভূমণ্ডলকে ততখানি হার্দ্য সম্পর্কে চিনতে না পেরে বিছিয়ে দিয়েছিলেন অভিমান মেশানো কণ্ঠস্বর—

'প্রকৃতির কবি তিনি, তা ছাড়া আর কিছুই নন—হয়তো কেন নিশ্চয়ই, কিন্তু সেই তাঁর

স্বদেশ থেকে, তাঁর রাজত্ব থেকে মনকে সরিয়ে এনে তিনি নিজেকে বন্দী করেছেন চলতি আন্দোলনের আন্দামানে।' বুদ্ধদেব বুঝতে পারেন না মহৎ কবির স্বাভাবিক নিয়মেই তিনি এগিয়ে চলেছেন প্রকৃতি পেরিয়ে সমাজ, সমাজ পেরিয়ে স্বদেশ, স্বদেশ পেরিয়ে বিশ্বভুবনের পথে। ক্ষণ মুহূর্ত থেকে চোখ সরিয়ে তাকাচ্ছেন মানব-ইতিহাসের প্রহরে। এই তাকানোর সদিচ্ছাকে তখন বুদ্ধদেবের মনে হয়েছে—পাছে কেউ এস্‌কেপিস্ট হিসেবে অবজ্ঞা জানায়, তাই ইতিহাসের চেতনাকে সাম্প্রতিক কবিতার বিষয় করে তুলতে তাঁর প্রাণান্তকর চেষ্টা। অন্যদিকে নবীন পাঠক পক্ষের প্রতিনিধিরূপে কবি অরুণ সরকার লিখছেন।

"যে জীবনানন্দকে নিয়ে সম্প্রতি উভয় বাংলায় তুমুল তোলপাড় চলেছে, সেই 'রূপসী বাংলা'-র লেখককে চিনি কি আমি? চিনি না। আমি যে জীবনানন্দকে চিনতুম তিনি ছিলেন 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'মহাপৃথিবী', 'সাতটি তারার তিমির' ইত্যাদির লেখক।"

আমাদের কারো কারো এখনো মনে পড়বে, সদ্য-প্রকাশিত 'সাতটি তারার তিমির' কীভাবে আমাদের চেতনার উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছিল আচমকা এক কাল-বৈশাখীর মতো, কীভাবে তাঁর সম্পর্কে আমাদের সমস্ত পূর্ব-লালিত ধারণার উপরে বইয়ে দিয়েছিল অকল্পিত এক ধূলি-ঝড়। চোখ মুখ থেকে যতই মুছতে থাকি সেই ধুলো-বালি, ততই মূর্তি পেতে থাকে জীবনানন্দের সেই ভিন্ন অবয়ব, যিনি শুধুমাত্র নন শুদ্ধ প্রকৃতির কবি, যিনি বিশ্বচরাচরের বিষয়েও চিন্তিত, যিনি সমসময়ের যে-কোনো রক্ত ক্ষরণের ভিতরেই ডুবিয়ে দিতে প্রস্তুত তাঁর নগ্ন নির্জন হাত, যিনি যাবতীয় সামাজিক প্রশ্নে সচেতন, রাজনৈতিক প্রশ্নে সজাগ, মানবিক প্রশ্নে বিপন্ন।

এখন তাই নতুন করেই প্রশ্নটাকে তুলতে ইচ্ছে করে, সত্যিই কি বিশুদ্ধ প্রকৃতির কবিই তিনি হতে চেয়েছিলেন আত্মপ্রকাশের সূচনাভূমিতে দাঁড়িয়ে? এখন কি আর একবার নতুন করে তাকানো যেতে পারে তার দিকে? তাকালে কি চোখে পড়বে ট্রাফিক-সিগন্যালের মতো অন্য কোনো ইশারা? আর সেই ইশারার পথে হেঁটে আমরা কি ভিন্ন ছন্দে বিন্যস্ত করে নিতে শিখবো আগেকার ছাপ-মারা ভাবনার ছক? তাহলে তাকানো যাক 'ঝরাপালক'-এর সেই কবিতাটির দিকে, নাম যার 'সেদিন এ ধরণী'র। এখানে রয়েছে একটি তালিকা, কারা কারা ডেকেছিল তাঁকে। সর্বাগ্রের ডাক মাটি-মা-র, যা অন্য ভাবে 'জননীর স্থবির ক্রন্দন।' তারপর—

> "ডেকেছিল ভিজে ঘাস-হেমন্তের হিম মাস, জোনাকীর ঝাড়!
> আমারে ডাকিয়াছিল আলেয়ার লাল মাঠ-শ্মশানের খেয়াঘাট আসি!
> কঙ্কালের রাশি
> দাউ দাউ চিতা,—
> কত পূর্বজাতকের পিতামহ-পিতা
> সর্বনাশ-ব্যসন-বাসনা
> কত মৃত গোক্ষুরার ফণা,
> কত তিথি, কত যে অতিথি
> কত শত যৌনবক্র স্মৃতি
> করেছিল উতলা আমারে।"

এই সব ডাকাডাকির প্রত্যেকটিতে সাড়া দিতে হয় যদি, যদি পালন করতে হয় তাদের আজ্ঞা-উপদেশ-অনুরোধ, তা কি সম্ভব আত্মমগ্ন নির্জনতার আবহে স্থিরতর বসবাসে?

আর বিশুদ্ধ প্রকৃতির নির্জনতম উপাসক হতে চাইবেনই যদি, কেন তাঁর নিসর্গভ্রমণকে করে তুলবেন ক্রমশই সংশয়-সংকটে আতুর? এখন কি আমাদের চোখে পড়ছে না যে প্রকৃতির বিশুদ্ধ উপকরণ অথবা বস্তুর পিছনে তিনি অসঙ্কোচে জুড়ে দিয়েছেন বিশুদ্ধতার বিপরীত সব বিশেষণ। তাই জ্যোৎস্নার আগে প্রেত। ধরণীর আগে ব্যাধবিদ্ধা। ঢেউয়ের আগে কেউটে। আগুনের আগে দানোয় পাওয়া। আকাশখানার সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে গোখরোফণা। হৃদয়ের গায়ে লেপে যাচ্ছে প্রেতপুর। এ থেকে হয়তো এটা বুঝে নেওয়া যেতে পারে যে ঠিক কেমনতরো প্রকৃতিকে কাছে পেলে তাঁকে ব্যবহার করতে হতো ওই সব বিরূপ বিশেষণ। কিন্তু এ থেকে বুঝে নেওয়া যায় না আরো যে বিশুদ্ধ প্রকৃতি অন্বেষণে যাঁর মৃগয়া, সে অনুসন্ধানের অখণ্ড টানেই তাঁকে যেতে হবে সেই গভীর অরণ্য-অন্ধকারের গহ্বর পর্যন্তই, যেখানে ঘুম থেকে প্রথম জেগে উঠেছিলেন ডিভাইন কমেডির দান্তে, আর যেতে যদি পৌঁছে যান নির্মমতম বাস্তবের রক্ত রণে আলোড়িত ঐতিহাসিক সময়ে, ইতিহাসের সেই দুঃসহ দাহকেও সরিয়ে দিতে পারবেন না তিনি। অমৃতসূর্যের বন্দনাকে সম্পূর্ণ করার তাগিদেই তাঁকে চুমুক দিতে হবে বিষাক্ত অভিজ্ঞতার পানপাত্রে।

এখন, কবিতা ও কথাসাহিত্য মিলিয়ে প্রায় সম্পূর্ণ জীবনানন্দই যখন আমাদের হাতের নাগালে, তখন, কেবল শিক্ষানবিশী ফসল অথবা রোমান্টিক মনের বিষয়-নিরপেক্ষ উচ্ছ্বাস ইত্যাদির মুখস্থ-ধরতাই থেকে দাঁড়িয়ে 'ঝরা পালক'কে টেনে নেওয়া উচিত আরো একটু মনোযোগী অধ্যয়নের দিকে। সে-রকম নিবিষ্ট পাঠে আমরা হয়তো এখানেই পেয়ে যাবো সেই সব স্ফুরণোন্মুখ, বীজকণাকে, তাঁর পরবর্তী আকাশ সমান বিকাশকে যারা জুগিয়েছে নীচের শিকড় আর উপরের ডালপালা।

ঝরা পালক

ডালিম ফুলের মতো ঠোঁট যার, রাঙা আপেলের মতো লাল যার গাল

বনলতা সেন

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য

ঝরা পালক

নিখিল আমার ভাই

বেলা অবেলা কালবেলা

পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার ভাই আমি

ঝরা পালক

টাইফুন-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছ অতীত-আখের

হে জলধি পাখি।

মহাপৃথিবী

জানি পাখি, শাদা পাখি, মালাবার ফেনার সন্তান
তুমি পিছে চাহোনাকো, তোমার অতীত নেই, স্মৃতি নেই,
বুকে নেই আকীর্ণ ধূসর
পাণ্ডুলিপি...

ঝরা পালক

আকাশে মন্থর মেঘ, নিরালা দুপুর
নিস্তব্ধ পল্লীর পথে কুহকের সুর
বাজিয়া উঠিছে আজ ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে
সে কোন্ পিপাসা কোন্ ব্যথা আসে কার মনে!

বনলতা সেন

হায় চিল, সোনালি ডানার চিল, এই ভিজে মেঘের দুপুরে
তুমি আর কেঁদোনাকো উড়ে উড়ে ধানসিড়ি নদীটির পাশে।

ঝরা পালক

কোন্ দূর দারুচিনি লবঙ্গের সুবাসিত দ্বীপ
করিতেছে বিভ্রান্ত তোমারে?

বনলতা সেন

সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ
বিকেলের নক্ষত্রের কাছে;
সেইখানে দারুচিনি-বনানীর ফাঁকে নির্জনতা আছে।

ঝরা পালক

ডুবে যায় নিলীমায়, স্বপ্নায়ত মুগ্ধ আঁখি পাতে
শঙ্খ শুভ্র মেঘপুঞ্জে, শুক্লাকাশে, নক্ষত্রের রাতে;
ভেঙে যায় কীটপ্রায় ধরণীর বিশীর্ণ নির্মোক,

বনলতা সেন

আকাশের বিরামহীন বিস্তীর্ণ ডানার ভিতরে
পৃথিবী কীটের মতো মুছে গিয়েছে কাল!

ঝরা পালক

আত্তার ক্ষীরের মতো সোহাগ সেথায় ঘিরে আছে

বনলতা সেন

আত্তার ধূসর ক্ষীরে-গড়া মূর্তির মতো।

অতিরিক্ত দৃষ্টান্তের দরকার নেই আর। এই স্বল্প নমুনাতেই স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে 'ঝরা পালক'-এর অনেক স্থূল ও নীরেট কুঁড়িই, কবির আত্মপ্রসারণের ভিন্নতর রোদ-জলের ছোঁয়া পেয়ে, ক্রমে ক্রমে স্তবকে স্তবকে কীভাবে খুলে যেতে থাকবে রহস্যের ভেজানো দরজাগুলো। সেই সঙ্গে এও মনে রাখতে হবে চিত্ররূপময় হয়ে ফুটবার যোগ্য এই মুকুলগুলির প্রথম উঁকি-ঝুঁকি তার প্রথম কবিতার বইটিতেই। যত এগোবেন, প্রথম কবিতার বইয়ের সিন্ধু, অন্ধকার, নাবিক, জাহাজ, ঝড়, সূর্য, প্রেত, হাড়, ঘাস বা শিশির আর ওড়াউড়ির নানান পাখি, আর জল তাঁকে দিয়ে যেতে থাকবে নিরবচ্ছিন্ন সঙ্গ হতে থাকবে তাঁর উপলব্ধির অবিচ্ছেদ্য অংশ, তাঁর উপমা অথবা স্তোত্র নির্মাণের নির্ভরযোগ্য সহচর। কবির প্রয়োজনে, কবিতার প্রয়োজনে, ব্যক্তির অভিজ্ঞতাকে শাশ্বত কোনো শঙ্খধ্বনির মতো বাজিয়ে দিতে, তার, কেবল পালটে পালটে পরবে নতুন নতুন পোশাক। তাদের গা থেকে তখন ঠিকরে বেরবে হীরে-ঝরা আলো।

দ্বিতীয় কবিতার বই দেখে প্রথম কবিতার বইয়ের জীবনানন্দকে চেনা যায় না আর। তাৎক্ষণিক বিভ্রান্তিতে মনে হতে পারে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-র কবি নন বুঝি 'ঝরা পালক'-এর কবি। এমনতরো মনে হওয়ার পিছনে কারণও যে নেই কোনো তাও নয়। দ্বিতীয় কবিতার বইয়ে অনেক আমূল ও সাহসিক পরিবর্তন ঘটিয়ে দেবেন তিনি অনেকগুলো। এক, অন্ত্যমিল সম্পর্কে ছিঁড়ে ফেলবেন মোহ। দুই, তৎসম আর গ্রন্থিবদ্ধ শব্দের জোড়কে ভাঙবেন আছাড় মেরে। 'ঝরা পালক'-এর পর তাঁর কবিতায়—

ব্যাধবিদ্ধা, অশ্রু-পাংশু, শঙ্খশুভ্র, পেতপুরদ্বার, জীবন-সৈকত, পিঞ্জর-হারা, বাড়ব-আরক্ত, কারাগার-মর্মর, হৃদয়-মাস্তুল, কপোত-ব্যথা, বক্ষকপোত, ক্ষুধা-দেবতা, বিষ্ণুচক্র, বসুধা-নির্মোক বা রক্তবহ্নির মতো রক্তহীন গুরুভার শব্দের ঝন্‌ঝনা শোনা যাবে না আর। তিন, বিসর্জনে ভাসিয়ে দেবেন আরবি-ফারসি শব্দ সম্পর্কে সাময়িক প্রবণতা।

'ঝরা পালক'-এর পর থেকেই জীবনানন্দের সেই প্রকৃত সত্তার আবির্ভাব যার প্রলম্বিত আভায় আচ্ছন্ন হয়ে পরে অনুজ কবিবৃন্দ আর রবীন্দ্রনাথের পরের প্রধান কবিদের মহাসম্মেলন থেকে তাঁকেই নির্বাচিত করে নেবে প্রধানতম হিসেবে। এসবই ঠিক। আর এও ঠিক যে 'ঝরা পালক'-কে নিভৃত দূরত্বে সরিয়েই আজ আমাদের জীবনানন্দ পাঠ, পাঠের কানা-উপচোনো পরিতৃপ্তি। 'মহাপৃথিবী'-র 'হাওয়ার রাত' কবিতার কথাটাই ভাবা যাক। পড়তে পড়তে আমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যেতে থাকি আমাদের নিজস্ব পরিবেশ থেকে, প্রতিরোধ ক্ষমতাহীন এক প্রবল ঘূর্ণির টানে যেন। আমরাও উড়ে যেতে থাকি যেন কবিতার সমান্তরালে, অথবা কবিতার ডানার উপরে ভর করে। কোথায় কতদূর ইতিহাস পরিধি জুড়ে আমাদের আকাশ-ভ্রমণ তখন? দেখি এসে যাচ্ছে জ্যোৎস্নারাতের ব্যাবিলন, এসে যাচ্ছে মৃত রূপসীদের এশিরিয়া, মিশর আর বিদিশা। গোটা কবিতাটি পাঠ অথবা গোটা কবিতাটির সঙ্গে আমাদের আকাশ পর্যটন শেষ হওয়ার পর আবার আমরা ফিরে

আসি নিজেদের চেনা বাস্তবে। তখনো আমাদের রক্তে, মনে, মনের অতলে অনুরণিত হতে থাকে এই কবিতার অনাস্বাদিতপূর্ব অনুরণন, প্রাচীন কোনো গুহার ভিতর থেকে ভেসে আসা মহিম্ন স্তোত্র পাঠের মতো। আমরা কবিতাটির নির্মাণ-কৌশল নিয়ে ভাবতে থাকি অতঃপর। আর তখনই এক প্রশ্নের এক বুদ্‌বুদ্‌ মনের ঐ অতল থেকেই ভেসে উঠতে চায় চেতনার উপর স্তরে। এর আগে, আর কোনো কবিতায় কি জীবনানন্দ এভাবে দূর ইতিহাসের পথে-প্রান্তরে ছুটে গেছেন হারানো স্মৃতির উদ্ধারে? তখনই খুলতে হয় 'ঝরা পালক'-এর পাতা। তখনই চোখের সামনে এসে যায় 'অস্তচাঁদে' নামের কবিতা। সেখানে ভ্রমণ-সূচী আরো দীর্ঘ। দূর উর, ব্যাবিলন, মিশরের মরুভূমি-সঙ্কট, পিরামিড তল, ইসিসের বেদিকার মূল, আসীরীয় সম্রাটের রাজগৃহ, প্রভেনস্‌ প্রান্তর, স্পেনের সিয়েরা-য়। আর ঐ 'অস্তচাঁদে'-র শেষ পর্বে যখন আকাশ থেকে তাঁর নেমে আসা নিজের দেশের মাটিতে, তখন আর এক বিস্ময় উজ্জ্বল দুপুরের শালিকের মতো নেচে ওঠে আমাদের চোখে। ঐ দীর্ঘ কবিতার শেষ ১২টি পংক্তিতে যেন খুঁজে পাই 'রূপসী বাংলার'-র মহড়া। শুধু ঐ একটি কবিতাতে নয়, হয়তো আরো অনেক কবিতারই গোপন গর্ভে লুকোনো রয়েছে 'রূপসী বাংলা'র ভ্রূণ। যেমন পরের আর সব রচনাবলীরও।

জীবনানন্দ-কাব্য

অমলেন্দু বসু

এক

জীবনানন্দর মৃত্যু হয় ১৯৫৪ সালের ২২শে অক্টোবর তারিখে। তাঁর মৃত্যুতে বাঙালি কাব্যরসিক যে কতটা অভিভূত হয়েছিলেন তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায় সেদিনের নানারকম সাহিত্যপত্রিকায়। কোনো কোনো পত্রিকায় (বিশেষত যেগুলি নবীন কবিদের রচনাশ্রয়ী) জীবনানন্দ স্মরণে বিশেষ আলোচনার মূল্যবান সমাবেশ হয়েছিল। জীবনানন্দর কবিপ্রতিভা সম্বন্ধে ধারণা বাঙালি কবি ও কবিতা পাঠকের কিছু মাত্র বদলায়নি বিগত দশ বৎসরে, বদলাবার কোনো লক্ষণ নেই, বরঞ্চ মনে হয় যতই দিন যাবে এই কবিপ্রতিভার মহত্ত্ব অনন্যতা সম্বন্ধে ধারণা ও ব্যাখ্যা ততই বেশি দৃঢ় ও পরিচ্ছন্ন হবে। জনৈক নবীন কবি এ-বিষয়ে যথার্থ বলেছেন ঃ

> "যদি কোনদিন এই ভয়ঙ্কর অপ্রেম-যুগের অবসান হয়ে অন্য নতুন-জীবনের অনুভব মানুষের চেতনায় স্পষ্ট হয় সেদিন আমরা জীবনানন্দর কবি-আসনটি অন্য কোন কবির জন্য এই দেশেও রচনা করবো। তার পূর্বে, অন্ততঃ বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে, যখন কবিকে অমৃতের পুত্র এবং কবিতাকে মন্ত্র করার মত কোন সুচেতন মুহূর্তই মানব সমাজের মধ্যে স্থির নেই তখন...এই বিষণ্ণ অপ্রেমের মধ্যেও যিনি শিশু-মানুষের নিরপরাধ প্রেম-চেতনাকে কবিতার বিষয় ক'রে গেলেন, তাঁর আসন আমাদের নিজেদের বুকের মধ্যে।
>
> বীরেন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ঃ জীবনায়ন

জীবনানন্দর কাব্য সম্বন্ধে অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ব্যাপক ও গভীর বলেই আমার আশ্চর্য লাগে যে, তাঁর কোনো জীবনীগ্রন্থ আজো রচিত হয়নি, তাঁর কাব্যের আলোচনায় কোনো সমগ্র গ্রন্থ নিবেদিত হয়নি, যদিও একাধিক সমালোচনা-গ্রন্থে আধুনিক বাংলা কাব্যের দিঙ্‌নির্ণয় কালে জীবনানন্দ সম্বন্ধে পুরো পরিচ্ছেদ নিয়োজিত হয়েছে। আশ্চর্য লাগে, কেননা অন্যান্য কোনো কোনো সাহিত্যের ইতিহাসে প্রিয় কবিদের সম্বন্ধে ভিন্ন আচরণের আভাস পাই। একটা দৃষ্টান্ত দেব। উইলিয়ম বাট্‌লার ইয়েট্‌স্ মারা গিয়েছিলেন ১৯৩৯ সালের ২৮শে জানুয়ারি তারিখে। চার বৎসর পরেই, ১৯৪৩ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারি তারিখে, প্রকাশিত হয় জোসেফ হোন্ প্রণীত ইয়েট্‌স্-জীবনী। (বস্তুত গ্রন্থখানা রচিত হয়েছিল প্রায় এক বৎসর পূর্বে, অর্থাৎ ইয়েট্‌সের মৃত্যুর তিন বৎসরের মধ্যে।) ইতিপূর্বে ১৯৪১ সালে কবি ম্যাক্‌নীস-রচিত "দ্য পোইট্রি অব ইয়েট্‌স্" প্রকাশিত হয় এবং ১৯৪৭ সালে আমার সতীর্থ অধ্যাপক নর্ম্যান্ জেফার্স ইয়েট্‌সের জীবনী ও কাব্য ব্যাখ্যা সম্বন্ধে তাঁর মূল্যবান গবেষণা-গ্রন্থ সমাপ্ত করেন। এরপরে যে ইয়েট্‌স্ সম্বন্ধে কতগুলি প্রবন্ধ

এবং গোটা বই লেখা হয়েছে তার হিসেব রাখা গ্রন্থপঞ্জীকারকের কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সম্ভবত ইয়েট্স্-প্রীতি ইদানীং কাব্যরসিকের উদার এলাকা ছাড়িয়ে চলে' গেছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্মবিচারী অধ্যাপক-সমালোচকের ও পরীক্ষার্থীর সঙ্কীর্ণ স্তিমিতপ্রাণ পাঠককে। জীবনানন্দর কাব্যে শ্রেষ্ঠ কাব্যের গভীর ও বিরাট মেঘ-ধবলিমা, কবিতার শান্তি ও মাত্রাচেতনা। ইতিহাসের নিয়ম অনুসারে স্বকালের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দর কাব্য নিকষিত হবে, হয়তো অদূর ভবিষ্যতেই হবে। তা' ছাড়া আলোচিত হবে এ কাব্যের নিজস্ব অচ্ছেদ্য দেশকালোত্তীর্ণ মূল্য কোথায় সে-প্রশ্ন, আবার বিশ্লেষিত হবে বাংলা কাব্যের অতীত পরম্পরা এবং কবির সমকালীন সংবেদনার সঙ্গে এ কাব্যের তুলনা কোথায় সে-জিজ্ঞাসা ; প্রবহমান বাঙালি ঐতিহ্যের সঙ্গে ওতপ্রোত হ'য়ে নিবিড় ভাবে অনুষিক্ত হ'য়ে এ-কাব্যের ব্যাপক ঐতিহাসিক মূল্য কোথায় সে-জিজ্ঞাসা। কিন্তু প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসা সেখানেই থামবে না। মহৎ কাব্য তো শুধু গ্রহণই করে না, শুধু ঐতিহ্য ও সমকালীন প্রেরণাপুষ্ট নয়, সে-কাব্য অচিরে নিজেই ঐতিহ্যের ভাণ্ডারভুক্ত হয়। আজকের ও আগামীকালের বাঙালি কবির কাছে জীবনানন্দ নিজেই ঐতিহ্যের প্রতীক। আজকের ও আগামীকালের সক্রিয় কবি তাঁর নিজ অভিব্যক্তিশীল কবিজীবনের পূর্বসূরী হিসাবে জীবনানন্দর কাব্য বিচার করবেন। সে-বিচার সশ্রদ্ধ ও সপ্রেম কিন্তু নিষ্করুণ হ'তেও পারে। যে hungry generation treading down-এর চিত্র কল্পনা করেছিলেন কীট্স্, সেই তীক্ষ্নখর জীবনক্ষুধায় জীবনেরই শাশ্বত অস্তি। জীবনানন্দর কাব্যে মন্ত্রমুগ্ধ হ'য়ে থাকলে একালের ও আগামীকালের বাংলা কাব্যের মুক্তি না বন্ধন সে-প্রশ্ন অচিরেই উঠবে, দেখতে পাচ্ছি অন্তত একজন এখনই প্রশ্ন তুলেছেন। শ্রীঅশোক মিত্রের একটি প্রবন্ধ থেকে কয়েকটি উদ্যতপ্রশ্ন বাক্যের উদ্ধার করছি ঃ

> "আজ থেকে অর্ধশতাব্দী আগেকার রবীন্দ্রানুসৃতির মতোই, বর্তমানের জীবনানন্দীয় ঘোর, আমার ধারণায়, বাংলা কাব্যকে এক জায়গায় আটকে রেখেছে, জীবনানন্দকে পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে না আসতে পারলে মুক্তি অসম্ভব। রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতায় জীবনানন্দের সৃষ্টি জ্যোতির্ময়তম, কিন্তু সেজন্যই বলছি, তাঁর সর্বসমাচ্ছন্ন করা প্রভাব পরম সর্বনাশের ব্যাপার।"
>
> পরিচয় ঃ আষাঢ় ১৩৭২

উত্তরসূরীর সংবেদনায় মহৎ কবির কাব্য যে-দুর্লঙ্ঘ্য প্রভাব বিস্তার করে, (কখনও বা সে-প্রভাবের পরিণামে সংক্রমিত, অনুকৃতির বিবর্ণ সৃষ্টি-বিফলতা) সে-প্রভাব সাহিত্যের ইতিহাসের চিত্তাকর্ষক প্রস্তাব বটে, এবং উত্তরসূরীর সৃষ্টিবেদনাপিষ্ট সংবেদনার স্বাক্ষরও বটে, কিন্তু সে-প্রভাবের আলোচনায় কবির কাব্যের স্বরূপ আলোচিত হয় না। বস্তুতঃ ইতিহাসের রসিক পরিহাসে এমন অবস্থাও ঘটেছে যে মহৎ কবির প্রভাব সর্বনাশেরই মূল হয়েছে। মিল্টনের প্রভাব এ প্রসঙ্গে অবধানের বিষয়। সে-প্রভাবে আঠারো-উনিশ শতকে ইংরেজি ভাষায় অনেক মন্দ পদ্য রচিত হয়েছিল। অনুরূপ সূত্রেই পেত্রার্কার অসংখ্য অনুকারকগণ পনেরো ষোল শতকে উজ্জ্বল প্রদীপের চারিদিকে নিরলস ঘূর্ণাবিষ্ট সবুজ পোকার মতো অদ্ভুত আত্মরতির অন্ধ ধাঁধায় ঘুরেছিল। এবং অনুরূপ সূত্রেই শতাধিক বর্ষকাল ইংরেজি ভাষায় ওয়র্ডসোয়র্থ-কোলরিজ-শেলি-কীট্স্-ব্রাউনিং-টেনিসন প্রমুখ বহু মেধাবী ও কুশলী কবি কাব্য-নাট্য সৃষ্টির প্রয়াসে শেক্সপিয়রের অনুকরণে স্বকীয় সৃজনীবীর্য হারিয়ে ফেলেছিলেন। আমাদের সমকালে আমরা দেখেছি রবীন্দ্রনাথের ও

এলিয়টের দুর্বার প্রভাব কত প্রতিশ্রুতির সংহারের কারণ হয়েছে। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে পরিণামে ও মূলে সাযুজ্য নেই, পরিণামের ভয়াবহতায় মূলের দোষ প্রমাণ হয় না। সীতার রূপে লঙ্কা জ্বলেছিল, হেলেনের অগ্নিশিখায় পুড়ে ছাই হয়েছিল ট্রয়। সেজন্য, ইচ্ছে হয়, দোষ ধরতে পারেন কাম-লালসার, রাবণের ও প্যারিসের। অথবা পরম পৌরুষের অমিত অভিমানে বলতে পারেন, যেমন খৃষ্টীয় ও ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে নানাভাবে বলা হয়েছে, স্ত্রীলোক থেকেই সর্বনাশ সমুৎপন্ন হয়। বলতে হয় বলুন, কিন্তু এমন কথা বলতে তো পারেন না যে স্বতন্ত্র ব্যক্তি হিসাবে সীতা এবং হেলেন লঙ্কা ও ট্রয়ের ধ্বংসের জন্য দায়ী। এলিয়ট যখন মিলটন-অনুকারকদের নির্বলতার প্রমাণে মিলটনেরই কাব্য দোষযুক্ত বলে' সাব্যস্ত করেছিলেন তখন তাঁর উক্তিতে যেমন তথ্যাভাব ঘটেছিল, তেমনই অভাব দেখা দিয়েছিল সুযুক্তির এবং সুরুচির। এলিয়টের উক্তির হেত্বাভাস অশোক মিত্রের আর্তনাদে প্রকাশ পায়নি, বরং তিনি তাঁর প্রবন্ধ শেষ করেছেন একথা বলে, "জীবনানন্দ আমার প্রিয়তম কবি।" কাব্যের শিল্পরূপ ও ঐতিহাসিক রূপ, এই দুই অভিন্ন নয় একথা অশোক মিত্র জানেন। তাঁর উক্তির উল্লেখ করেছি এই কারণে যে যদিও আমার নিজ বিশ্বাসে আজকের, বিংশ শতাব্দীর সপ্তম দশকের, বাংলা কাব্যে যে শিথিলতা পরিলক্ষিত হয় তার মূলে জীবনানন্দর 'কুহকিনী' কাব্য নয় বরং সে কাব্যের অমনোযোগী পাঠ, তাহলেও আমি অশোক মিত্রের মূল কথা মানি যে আগামী দিনের মহৎ কবি মহত্ত্ব অর্জন করবেন জীবনানন্দর দ্বারা আচ্ছন্ন থেকে নয়, স্বকীয়তায় মুক্তিলাভ ক'রে, যেমন জীবনানন্দ স্বয়ং পরম পূর্বসূরী রবীন্দ্রনাথের কাব্যপ্রতিভা সম্বন্ধে অনবশেষ শ্রদ্ধান্বিত হয়েও, সে-কাব্যের ঐতিহ্যপুষ্ট হয়েও, সে-কাব্যে আচ্ছন্ন হ'য়ে থাকেন নি। জীবনানন্দর কাব্য যে সমগ্রভাবে মেধার সহিত অধীত হচ্ছে না বরং তাঁর কাব্য সম্বন্ধে একপেশে দৃষ্টিই তাঁর অনুরাগী নবীন কবিদের রচনায় অনেক সময় প্রকট তার প্রমাণ তাঁর কাব্যের একটি উজ্জ্বল আদিম অংশ সম্বন্ধে বহু পাঠকের অমনোযোগ। জীবনানন্দর যে-সুচেতনা আমাদের চিত্তে অবশ শিহরণ জাগায়, সেই সুচেতনার মূলে ছিল গভীর লোকপ্রেম, নিবিড় বস্তুনিষ্ঠ বলিষ্ঠ লোকচেতনা। শুধুই ইংরেজি রোমান্টিক কাব্যের Man নয়, ব্রাউনিং-উল্লিখিত Men and Women। একদা কবি বলেছিলেন ঃ

১. আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়,
দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব ;

মৃত্যুর আগে ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি

২. এই বোধ—শুধু এই স্বাদ
পায় সে কি অগাধ—অগাধ!
পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ
চায় না সে? করেছে শপথ
দেখিবে সে মানুষের মুখ?
দেখিবে সে মানুষীর মুখ?
দেখিবে সে শিশুদের মুখ?

বোধ ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি

৩. দিনের উজ্জ্বল পথ ছেড়ে দিয়ে
ধূসর স্বপ্নের দেশে গিয়া
হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষার নদী
ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায়—ঢেউ তুলে তৃপ্তি পায় যদি,
তবে ওই পৃথিবীর দেওয়ালের 'পরে
লিখিতে যেয়ো না তুমি অস্পষ্ট অক্ষরে
অন্তরের কথা ;

স্বপ্নের হাতে : ধূসর পাণ্ডুলিপি

সে ছিল এক অদ্ভুত আলো-আঁধারী কল্পজগৎ কিন্তু সে জগতের ভিত্তিও সুনিষ্ঠ বস্তুচেতনা : পাতা কুটো ভাঙ্গা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত ; খড়-নাড়া-পোড়ো জমি-মাঠের ফাটল,/শিশিরের জল ; পেঁচা আর ইঁদুরের ঘ্রাণ ; শিশুর মুখের গন্ধ, ঘাস, রোদ, মাছরাঙা, নক্ষত্র, আকাশ ; বুনোহাঁস শিকারীর গুলির আঘাত/এড়ায়ে উড়িয়া যায় দিগন্তের নম্র নীল জ্যোৎস্নার ভিতরে। কবি বলছেন, "আমরা দেখেছি যারা।" দেখেছি। দর্শনেন্দ্রিয়ের আশ্চর্য তীক্ষ্ণ বিন্দুসংহৃত অভিজ্ঞায় বিধৃত হয়েছে বস্তুজগৎ, প্রত্যক্ষ জগৎ এমন কি সর্বদ্যোতক মানুষ-নামা প্রাণীরও জগৎ কিন্তু এখনও বিধৃত হয়নি বিশিষ্ট অনন্য স্বকীয়তা-সম্পন্ন মানুষ-মানুষীর জগৎ। এর পরে হ'ল প্রত্যক্ষজ্ঞাত নিসর্গলোক থেকে প্রত্যক্ষজ্ঞাত মানুষ-মানুষীর লোকে উত্তরণ—জীবনানন্দর কবিসত্তার বিচিত্র অভিব্যক্তিতে একটি উজ্জ্বল অধ্যায়। এই লোকে মানুষ-মানুষী ছায়াশরীরী নয়, এরা স্বকীয় নামাঙ্কিত দেহী নরনারী—ইয়াসিন হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ ; গগন বিপিন শশী ; পাথুরেঘাটার মানিকতলার শ্যামবাজারের গ্যালিফ স্ট্রিটের এন্টালীর। এতকাল নিসর্গচেতনা ও মানুষ-চেতনা দুই-ই এক অপার্থিব ধূসরতায়, এক অস্পষ্ট সীমাঙ্কিত কোমলতায়, রঞ্জিত ছিল, নিসর্গবস্তুর অথবা মানুষের যেন স্বতন্ত্রঅবয়ব-রেখা ছিল না, মানুষ যেন ইনডিভিজ্যুয়ল্ ছিল না। এখন মানুষ ইনডিভিজ্যুয়ল্ হ'ল, প্রত্যেক মানুষের নামধাম বাসস্থান নির্ণীত হ'য়ে তা'রা চারিত্রিক ব্যক্তিত্ব অর্জন করল। "এই সব অণুর মতন/উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলো।" অবশ্য সবারই জীবন উপেক্ষিত নয়, এই লোকে বাস করে অনুপম ত্রিবেদী, সুবিনয় মুস্তফী, লোকেন বোস, সোমেন পালিত। আর বেনামী বন্দরের কিছু নামহীন নাবিকও জীবনের সড়কের একপাশ দিয়ে চলে যায় : 'গান গায় আধো জেগে ইহুদী রমণী'; 'তিনজন আধো আইবুড়ো ভিখিরী '; 'এক ভিখিরিণী তিনজন খোঁড়া'। কিন্তু অনামা লোকেরও ব্যক্তিত্ব সুস্পষ্ট।

ফিরিঙ্গি যুবক ক'টি চ'লে যায় ছিমছাম।
থামে ঠেস দিয়ে এক লোল নিগ্রো হাসে ;
হাতের ব্রায়ার পাইপ পরিষ্কার ক'রে
বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে।

রাত্রি : সাতটি তারার তিমির

প্রত্যক্ষজ্ঞাত এই মানুষ-মানুষীর লোকে ইতিহাসাঙ্কিত মানুষের ভিড় : নচিকেতা জরাথুষ্ট্র লাওৎসে এঞ্জেলো রুশো লেনিন, কুইসলিং, হিটলার, কে এম মুন্সী, বীর নরীম্যান। আমার বিশ্বাস যেদিন জীবনানন্দর কাব্যপাঠ আত্মকেন্দ্রিক না হ'য়ে কবিকেন্দ্রিক হবে সেদিন তাঁর কাব্যের নিরন্তর বস্তুনিষ্ঠা উপযুক্ত মর্যাদা লাভ করবে এবং সে মর্যাদালাভে

কবির সম্পূর্ণ মূল্য যেমন হৃদয়ঙ্গম হবে, নবীন কবিদেরও আদর্শ তেমন উজ্জীবনকারক হবে।

দুই

যখন বলা হয় যে জীবনানন্দ ভয়ঙ্কর অপ্রেম যুগের বিষণ্ণ কবি তখন খণ্ডিত দৃষ্টিতে তাঁর কাব্যের মূল্যায়ন হয়। এ যুগের বাঙালি কবি মনে করেন তিনি যন্ত্রণাযুগের কবি, যে Angst-দ্বারা বিমথিত হয়েছে পশ্চিম ইওরোপের লাঞ্ছিত যুব-হৃদয়, তারই ছোঁওয়া লেগেছে তাঁরও গায়ে, যে Age of Anxiety অথবা Age of Nightmare হয়েছে প্রতীচ্য সভ্যতার পরিমণ্ডল তার বায়ুস্রোতে চঞ্চল হয়েছে অন্তত বাঙালি জীবন। বিগত আট দশ বৎসরের বাংলা কবিতায় 'যন্ত্রণা' শব্দটি অথবা এই অনুভূতিজ্ঞাপক অনুরূপ শব্দাদি যে কতবার কত ঘন ঘন ব্যবহৃত হয়েছে তার হিসাব রাখা শুমারনবিশের কাজ। এ যুগের কবির যন্ত্রণাবোধ আমি আদৌ পরিহাসের বা অবিশ্বাসের বিষয়ে মনে করি না। খুবই সম্ভবত কোনো এক আশ্চর্য বিপর্যয়বোধে, সর্বসত্তা-চূর্ণকারী সর্বনিষ্পেষণকারী এক সুতীব্র ক্লেশজ্ঞানে উদ্বেজিত হয় নবীন কবির সৃজনীশক্তি। প্রতীচ্য সমাজে ও বঙ্গীয় সমাজে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ঘটনার আনুরূপ্য কতটা, সে আনুরূপ্যে বাঙালি কবির বিপর্যয়বোধ সঙ্গত ও স্বাভাবিক ব'লে সাব্যস্ত করা যায় কিনা, এসব মামুলি ও হাল্‌কা প্রশ্ন তোলার আমি পক্ষপাতী নই কেননা আনুরূপ্য কখনও নিঃসংশয় অব্‌জেক্‌টিভ্‌ মানদণ্ডে নির্ণীত হতে পারে না, পরিজ্ঞাত হয় দ্রষ্টার একান্ত আপন দর্শনক্ষমতায়। অতএব নবীন বাঙালি কবির আত্মচেতনার দাবী মেনে নেব। আর বস্তুত সে-আত্মচেতনা আপাতত আমার আলোচনার অধিগত বিষয়ও নয়। আমার প্রশ্ন জীবনানন্দকে Angst-এর কবি বলা সঙ্গত কি না। এ প্রশ্নের স-বিশ্লেষণ উত্তর বর্তমান প্রবন্ধের সীমিত পরিধিতে সম্ভব নয়, আমার সংক্ষিপ্ত ‌উত্তর বিশ্লেষণ বর্জিত বটে কিন্তু বিন্দুমাত্র সংশয়-ধূমাঙ্কিত নয়। আমার অধ্যয়নের ফলে আমি দেখতে পাই যে যদিচ জীবনানন্দের শিল্পাবেগে সমকালীন জীবনের অনেক রিরংসার বলাৎকারের বীভৎসতার তিক্ত মানস অভিজ্ঞতা এসেছিল, যেসব অভিজ্ঞতার ফলে এই স্পর্শাতুর কবিহৃদয় ব্যঙ্গ ও শ্লেষের সজারুকাঁটায় আবৃত করেছিল আপন বিষণ্ণ মমত্ব বোধ ; যদিচ কামাচ্ছন্ন অর্ধসত্যের অর্থাৎ প্রবহমান ইতিহাসের ইদানীন্তন বিকৃত ব্যাদিত শ্বাপদ হিংস্র করালদ্রংষ্ট্রা চর্বণ করতে চেয়েছে কবির সকল ঐতিহ্যবোধ ও সংস্কৃতি-চেতনা, এবং যদিচ কবির চারিধারে অপহৃত হয়ে' চলেছে মানুষের বিশ্বাস ; শিল্পী দর্শনবিৎ ধর্মবিৎ ভেসেছেন লঘুতম প্রচেষ্টার গড্ডলিকা-স্রোতে ; যদিচ সৎ শুভ আস্তিক্যবুদ্ধিসম্পন্ন লোক খুঁজতে গিয়ে অনুসন্ধানীর চোখে ছানি প'ড়ে যায়, তবুও কবির বলিষ্ঠ অমল জীবনবোধ নেতিবাদী নয়, বরং সদর্থক জ্ঞানে অশুভের ওপারে শুভের পানে অভিসারী। অসৎ থেকে সতে, তমসা থেকে জ্যোতিতে, নেতি থেকে অস্তিতে, যে এক মহান অভিগমন লক্ষণীয়, জীবনানন্দের কাব্য বিবর্তনে তার প্রথম পর্যায় অনুধাবন করুন :

> বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
>
> * * * * * *
>
> সে-সব সন্তান আজ এ-যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়
> ক্লান্ত লোকসমাজের ভিড়ে চাপা প'ড়ে

মৃতপ্রায় ; আজকের এই সব গ্রাম্য সন্ততির
প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে—অন্ধকারে জমিদারদের
চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে।
ওরা খুব বেশি ভালো ছিলো না ; তবুও
আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতায়
অন্ধ শতছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে
পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিলো।

১৯৪৬-৪৭ : শ্রেষ্ঠ কবিতা

রূপসী বাংলার আজ এই হাল। আমাদের প্রগাঢ় প্রপিতামহগণ, 'ওরা খুব বেশি ভালো ছিলো না,' কিন্তু তারা অন্তত আজকের কাফকা-জগতের চেয়ে স্পষ্টতর জগতের অধিবাসী ছিল।

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।
যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয় !

অদ্ভুত আঁধার এক : শ্রেষ্ঠ কবিতা

—আতুর বিমথিত প্রাণের ক্রমধ্বস্ত উপলব্ধি। যতদূর দৃষ্টি যায়, ইতিহাসের ক্রমবিলীয়মান পশ্চাতের দিকে যখন তাকিয়ে দেখেন কবি (এবং আমারাও দেখি), সুপ্রাচীন যুগ থেকে গতকাল পর্যন্ত বিবর্তিত সময়ের শ্রেষ্ঠ চিন্তা ও কর্ম যখন স্মরণ করেন কবি (আমরাও করি), তখন আত্মস্থ থাকা যায় না এই ভাবলে যে সমস্ত ঐতিহ্য যেন কোন্ ক্রূর দানবের হাতে লণ্ড ভণ্ড হ'য়ে গেল। কিন্তু জীবনানন্দ এই উপলব্ধির উষর বন্ধ্যা জমিতে প্রস্তরীভূত হ'য়ে রইলেন না মহীনের অপ্রাকৃত ঘোড়ার মতো। তাঁর কম্প্র সংবেদনা, তাঁর সংহত মেধা ও মনন এগিয়ে নিয়ে গেল তাঁকে।

"সাহিত্যকে যদি যুগের দর্পণ হিসেবেই শুধু স্বীকার ক'রে নেয়া যায়, একটা ক্ষয়িষ্ণু যুগের নির্মম দর্পণ হয়েও সাংবাদিকী ও প্রচারধর্মী রচনার সঙ্গে কবিতার পার্থক্য এই যে প্রথমোক্ত জিনিসগুলোর ভিতর অভিজ্ঞতা-বিশোধিত ভাবনা-প্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতি কিছুই নেই, কবিতার তা আছে * * * সমাজ ও ইতিহাস ক্ষয়িষ্ণুতা দোষে দুষ্ট হ'লেও সাহিত্য তার ভিতরে লালিত হয়ে'ও যদি তাকে প্রয়োগ-প্রতিভার শেষ বৈচিত্র্যে কোনো না কোনো এক রকম সঞ্চার, ইঙ্গিতের দিব্যতা না দিতে পারে তাহ'লে তা শ্লেষ বা ধ্বংস বা গঠনাত্মক গুরুতর প্রবন্ধ বা প্রচারপত্র হতে পারে, কিন্তু তাকে কাব্যসৃষ্টি বলা যেতে পারে না।"

রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা : কবিতার কথা

কিন্তু এ-প্রত্যয় অর্জন করা সহজ ছিল না। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরে তিনি ভেবেছেন

"অভিজ্ঞতাবিশোধিত ভাবনা-প্রতিভার মুক্তি, শুদ্ধি ও সংহতির" কথা, কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জীবিত থাকতে তাঁকে লিখেছিলেন এই কথা ঃ

> "অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনও আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করবার জন্য উৎসাহে উন্মুখ হ'য়ে ওঠেন,—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হ'য়ে কখনও তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিম্বা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকরা serenity জিনিষটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে সেখানে কাব্য অক্ষুণ্ণ হ'য়েছে ব'লে মনে হয় না। দান্তের Divine comedy-র ভেতরে কিম্বা শেলীর ভেতর serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে ব'লে মনে হয় না। আমার মনে হয় বিভিন্ন রকমের বেষ্টনীর মধ্যে এসে মানুষের মনে নানা সময় নানা রকম moods খেলা করে। ...Mood-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্ব'লে ওঠে তাতে serenity অনেক সময়েই থাকে না—কিন্তু তাই ব'লেই তা সুন্দর ও স্থায়ী হ'য়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছি না।"
>
> চিঠিপত্র ঃ 'ময়ূখ', জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা, ১৩৬১

জীবনানন্দ-কাব্যের অভিব্যক্তির একটি মস্ত কথার আভাস এই উদ্ধৃতিতে পাওয়া সম্ভব। জীবনানন্দর কাব্য নিবিড় অর্থে Poetry of tension, যে-কাব্যে কবিচিত্তে যুগপৎ সঞ্চরমান একাধিক আবেগের ও মননের আকর্ষণ-বিপ্রকর্ষণে একাধিক বোধের দোটানায় অথবা বহুটানায়, একটা প্রচণ্ড আলোড়ন উদ্ভূত হয়, সেই আলোড়নই এই কাব্যের সর্বধাত্রী প্রেরণা। যতক্ষণ না এই টেন্‌শন্ একটা বহিরঙ্গ কর্মে (অর্থাৎ এ-ক্ষেত্রে কবিকর্মে) নিযুক্ত হয়, অর্থাৎ যতক্ষণ না অন্তরস্থিত আবেগ বহিরাশ্রয়ী হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত কবির শান্তি নেই। অশান্তিতে এ-কাব্যের জন্ম, সৃষ্টির বেদনার্ত শ্রান্তি, ক্লান্তি ও শান্তিতে এর অবশেষ। অশান্ত, বিক্ষুব্ধ, উদ্বেল, আলোড়িত, উন্মথিত চিত্ত শিল্পসৃষ্টির মধ্য দিয়ে পরিবর্তিত হয় শান্তিতে আত্মস্থতায় ভারসাম্যে। ডক্টর আইভর্ রিচার্ডস্ শিল্পকর্মের যে বহুমানিত মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা পেশ করেছেন তদনুসারে শিল্পকর্মের মাধ্যমে শিল্পী স্বয়ং এবং শিল্পগ্রাহীও একটা আত্মিক balance of opposites অনুভব করেন, কতকগুলি বিপরীত প্রবৃত্তির এক ভারসাম্য লাভ করেন। সৃষ্টির পূর্বে প্রবৃত্তিগুলি ছিল এলোমেলো, উত্তাল। সৃষ্টিক্রিয়াকালে একটা প্রচণ্ড সকর্মক শক্তির চাপে (এই শক্তিকেই ইংরেজিতে ইম্যাজিনেশন, সংস্কৃতে প্রতিভা বলা হয়েছে) প্রবৃত্তিগুলি সংযত সুশৃঙ্খল হয়ে যায়, কল্পনার নীহারিকা পুঞ্জ সুঠাম রূপ গ্রহণ করে। বিশৃঙ্খলা থেকে সুশৃঙ্খলায়, নীহারিকা থেকে গ্রহরূপে, বিমূর্ত থেকে মূর্তিতে, অশান্তি থেকে প্রশান্তিতে এই যে রূপায়ণ তারই উপলব্ধি হচ্ছে শিল্পের আনন্দ। এই রূপায়ণই ছন্দ, সুর, ভাস্কর্যের সিমেট্রি বা সাম্য, চিত্রের ও স্থাপত্যের সুঠাম সুষমা। এই অর্থে জীবনানন্দর কাব্য Poetry of tension, একটা আবেগব্যাকুল ভাববিচল উন্মন্থন ; উপরে উদ্ধৃত বাক্যগুলির প্রথম বাক্যটি আবার লক্ষ্য করুন। জীবনানন্দ বলছেন, "দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না"। এ যেন সেই প্রাচীন গ্রীকদের প্রতিহিংসাসাধিনী দুর্বারবেগ নিষ্করুণ অর্ধদেবিগণ, ইউমেনাইডিস্ বা

এইরিনাইএস্‌, যারা তাদের লক্ষ্যভূত মানবকে (যেমন অরেস্‌টেস্‌কে) নিরন্তর তাড়নায় অভিভূত ক'রে থাকে। কবিচিত্তের টেন্‌শন্‌ এই এইরিনাইএস্‌-এর তুল্য, সেই টেন্‌শন্‌ কবিকে তাড়না ক'রে চলে যতক্ষণ না তিনি শিল্পক্রিয়ায় রত হ'য়ে শিল্পকর্মের সিদ্ধিতে আপন চিত্তের সংযম ও ভারসাম্য লাভ করেন।

জীবনানন্দ তাহ'লে টেন্‌শন্‌-এর কবি। রবীন্দ্রনাথকে তিনি একথাই বলতে চেয়েছিলেন যে তাড়না থেকেও কবিতার জন্ম হয়।

তিন

কিন্তু জীবনানন্দ টেন্‌শনের কবি, মাত্র এই কথাটি বলার জন্য উপরের দীর্ঘ বাক্যস্তবকের অবতারণা করিনি। আমার বিশ্বাস (সে বিশ্বাসেরও বিস্তৃত বিশ্লেষণ ও প্রামাণ্য উদ্ধৃতি এই প্রবন্ধের স্বল্প পরিসরে দেওয়া সম্ভব নয়, এখানে অনেকটা যেন সমালোচনা অসঙ্গত আপ্তবাক্যেই ক্ষান্ত থাকছি), জীবনানন্দকাব্যের অভিব্যক্তির আর একটি উজ্জ্বল ও অনুপম স্বাক্ষর পাই অন্য এক গতিতে। জীবনানন্দর কাব্য টেন্‌শন্‌ থেকে মুক্তি লাভ ক'রে প্রশান্তিতে পৌঁছল, এই গতিতে। জীবনানন্দ উপরে উদ্ধৃত কথাগুলি লিখেছিলেন রবীন্দ্রনাথের যে-চিঠির জবাবে সে-চিঠিতে serenity সম্বন্ধে কী বলা হয়েছিল তা জানি না, রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা জানি না, আদৌ বিদ্যমান কিনা না চিরতরে হারিয়ে গেছে তা-ও জানি না। কিন্তু জীবনানন্দর জবাব প'ড়ে মনে হয় হয়তো, জ্যেষ্ঠ কবি বলেছিলেন যে কনিষ্ঠের কবিতায় প্রশান্তির কিছু অভাব তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ; হয়তো তিনি আরও বলেছিলেন যে প্রশান্তির অভাবে কাব্য সুন্দর ও স্থায়ী হ'য়ে উঠতে পারে না। জীবনানন্দর জবাবের মূলকথা যে প্রশান্তি ছাড়াও তো মহৎ সুন্দর স্থায়ী কাব্য পৃথিবীতে জন্মেছে। এই ব'লে তিনি দৃষ্টান্ত দিচ্ছেন গ্রীক কাব্যের, দান্তের, পরে বীঠোফেনের।

এই পত্রটি লেখা হয়েছিল ইংরেজি ১৯৩৭ সনে। (এই তারিখ আমার অনুমান মাত্র। "ময়ূখ" সম্পাদক তারিখ সম্বন্ধে অনিশ্চিত।) এর পরে এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে জীবনানন্দর আরো পত্র বিনিময় হয়েছিল কিনা জানি না। কোনও রকম ধ্রুব বহিঃপ্রমাণের অভাবে আমি কেবল আমার কাব্যচেতনার নির্ভরে একটি কথা বলব। কথাটি আমার অনুমান যে যদিচ এই চিঠিতে জীবনানন্দর প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে যে প্রশান্তির অভাবেও সৎকাব্য সম্ভব, তবুও রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছিল। আমার অনুমান যে দ্বিতীয় মহাসমরকালীন ও পরে দেশান্তরকালীন কবিতাগুলিতে তদানীন্তন বঙ্গসমাজের ও বৃহত্তর পৃথিবীর চরিত্রে ভ্রষ্টতা, আদর্শহানি ও সর্বৈব মিথ্যাচার লক্ষ্য ক'রে এই মেধাবী কবি যে-নিগূঢ় বেদনা ও অনাস্থা বোধ করেছিলেন, যে-তিক্ত বেদনা প্রকাশিত হয়েছে বাংলা ভাষার কয়েকটি শ্রেষ্ঠ প্রতীকী স্যাটায়ারে, সে-বেদনার নেতিবাদে দীর্ঘকাল আবদ্ধ থাকা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয়নি। এই নেতিবাদী ক্লিষ্ট রুষ্ট ব্যঙ্গের দুইটি দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করুন :

১. নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো।
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

রাত্রি : সাতটি তারার তিমির

২. আপিলা চাপিলা

—রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেডবাস্কেট খেলো শেষে।
এরা সব নিজেদের গণিকা, দালাল, রেস্ত, শত্রুর খোঁজে
সাত-পাঁচ ভেবে সনির্বন্ধতায় নেমে আসে ;
যদি বলি, তারা সব তোমাদের চেয়ে ভালো আছে ;
অসৎপাত্রের কাছে তবে তারা অন্ধ বিশ্বাসে
কথা বলেছিলো ব'লে দুই হাত সতর্কে গুটায়ে
হ'য়ে ওঠে কি যে উচাটন!
কুকুরের ক্যানারির কান্নার মতন ঃ
তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি-ঘায়ে।

সৃষ্টির তীরে ঃ সাতটি তারার তিমির

এ তীব্র স্যাটায়ার। এ যেন জোনাথান সুইফ্‌ট-কথিত ইয়াহু ও হুইহনিহম্‌দের জগৎ, জর্জ অরওয়েল-কথিত জানোয়ার-উপনিবেশ, অথবা পল ন্যাশ-অঙ্কিত বা রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত বিভীষিকার উল্কি মাখা অপ্রাকৃত অবপ্রাণীর জগৎ। মানুষের পৃথিবী যেন বিপর্যস্ত হ'য়ে গেছে, এই বিপর্যয় বোধ থেকে উত্তীর্ণ হয়েছেন সমসাময়িক পৃথিবীর অনেক কবিই। তাঁরা অনেকেই উত্তরণ করেছেন কোনো না কোনো বিশেষ মতবাদের ভেলায়, চিন্তার ও সিদ্ধান্তের দায়িত্ব অপরকে সমর্পণ করেছেন—আমাদের দেশের কবি, বিদেশের কবি। কিন্তু "তার প্রতিভার কাছে কবিকে বিশ্বস্ত থাকতে হবে।" জীবনানন্দর প্রতিভানিষ্ঠ একান্ত অমলিন। শকুন্তক্রান্তির কলরোলে যে-প্রলোভন সর্বাধিক মায়াময়—ছক-কাটা প্রত্যয়ের মসৃণ হাতে আত্মসমর্পণের প্রলোভন—সে প্রলোভনে জীবনানন্দ পথভ্রষ্ট হননি, আত্মপ্রতারণায় বিলোলপ্রজ্ঞ হননি। পুরোপুরি নির্মল ও নিঃসংশয় প্রত্যয়ে স্থিতধী হওয়ার পূর্বেই মহাকাল তাঁকে টেনে নিয়েছিল কুয়াশার ওপারে, সে জন্যই শেষ পর্যন্ত তাঁর কাব্যে থেকে থেকেই তাঁর ক্লিষ্ট বিপর্যস্ত আত্মার আর্তি রূপ পেয়েছে কিন্তু তবুও শেষ দিককার কাব্যে তিনি যে এক অন্তর্দীপ্ত স্থিরতা ও প্রশান্তি অর্জন করেছিলেন সে-বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই। জীবনানন্দ বলেছেন ঃ

রাত

এখনো রাতের স্রোতে মিশে থেকে সময়ের হাতে দীর্ঘতম
রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে-মাঝে বুদ্ধ সোক্রাতেস্‌
কনফুচ লেনিন গ্যেটে হ্যোল্ডেরলিন রবীন্দ্রর রোলে
আলোকিত হতে চায় ;—বেলজেনের সব-চেয়ে বেশি অন্ধকার
নিচে আরো নিচে নিচে টেনে নিয়ে যেতে চায় তাকে ;
পৃথিবীর সমুদ্রের নীলিমায় দীপ্ত হয়ে ওঠে
তবুও ফেনার ঝর্ণা,—রৌদ্রে প্রদীপ্ত হয়,—মানুষের মন
সহসা আকাশপথে বনহংসী-পাখির বর্ণালি
কী রকম সাহসিকা চেয়ে দেখে,—সূর্যের কিরণে
নিমেষেই বিকীরিত হয়ে ওঠে ;—অমর ব্যথায়
অসীম নিরুৎসাহে অন্তহীন অবক্ষয়ে সংগ্রামে আশায় মানবের

ইতিহাস-পটভূমি অনিকেত না কি? তবু, অগণন অর্ধসত্যের
উপরে সত্যের মতো প্রতিভাত হয়ে নব নবীন ব্যাপ্তির
সর্গে সঞ্চারিত হয়ে মানুষ সবার জন্যে শুভ্রতার দিকে
অগ্রসর হতে চায়—অগ্রসর হয়ে যেতে পারে।

পৃথিবী সূর্যকে ঘিরে : বেলা অবেলা কালবেলা

এই অগ্রসর হওয়ার, এই অগ্রগমনের, কোনো বিশিষ্ট গতিভঙ্গী আছে কি? "চরৈবেতি", "Excelsior", "আগে চল আগে চল ভাই," "কদম কদম বঢ়ায়ে যা"—কতরকম বাক্‌ভঙ্গীতে একই আহ্বান এসেছে মানুষের কাছে সময়ের অন্তিম ধূসর রাজবর্ত্ম বেয়ে! আহ্বানের যাথার্থ্য নিয়ে সংসারে দ্বিমত নেই। সঙ্কট উপস্থিত হয় কোন্ উপায়ে অগ্রগমন করব তাই নিয়ে। আর বস্তুতঃ এই উপায় সম্বন্ধে অস্পষ্টতা থাকলে আহ্বানের শক্তিশালিতা কমে যায়। শেলির বিপ্লবী মনোভাব শ্রদ্ধার্হ কিন্তু বিপ্লবের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাঁর অতি অস্পষ্ট ধারণাগুলি অনেক মেধাবী পাঠকচিত্তে বিরাগ জন্মিয়েছে। অগ্রগমনের গতি সম্বন্ধে জীবনানন্দ কোন্ ধরনের চিন্তা করতেন তার বিশেষ কোনো উল্লেখযোগ্য লিখিত সাক্ষ্য আমি পাচ্ছি না "সাতটি তারার তিমির" গ্রন্থের একটি স্মরণীয় স্তবক ছাড়া :

অন্ধকারে ইতিহাসপুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হ'য়ে যেতে চাই ;
কোথাও আঘাত ছাড়া—তবুও আঘাত ছাড়া অগ্রসর সূর্যালোক নেই।
হে কালপুরুষ তারা, অনন্ত দ্বন্দ্বের কোলে উঠে যেতে হবে
কেবলি গতির গুণগান গেয়ে—সৈকত ছেড়েছি এই স্বচ্ছন্দ উৎসবে ;
নতুন তরঙ্গে রৌদ্রে বিপ্লবে মিলনসূর্যে মানবিক রণ
ক্রমেই নিস্তেজ হয়, ক্রমেই গভীর হয় মানবিক জাতীয় মিলন?

সময়ের কাছে : সাতটি তারার তিমির

আঘাতেই জীবন, দ্বন্দ্বে জীবন, গতিই জীবন। জীবনই চলমান, জীবনই আহত হ'তে পারে, জীবন তো দ্বন্দ্বের সমার্থ। অতএব গতি দ্বন্দ্ব ও আঘাতের মধ্য দিয়েই জীবন আপনাকে সার্থক করবে, মিলনের স্বচ্ছন্দ উৎসবের পানে এগোবে।—এই ধারণার পশ্চাৎপটে সুপরিচিত দার্শনিক তত্ত্ব। আমাদের উপনিষদে আছে, আছে আমাদের মহাকাব্যে। পাশ্চাত্য জগতে প্রাচীন ও মধ্য যুগে ডায়ালেক্‌টিক্‌স্ নামক যে ক্ষুরধার তর্কশাস্ত্র প্রচলিত ছিল তারও গোড়ার কথা দ্বান্দ্বিক দর্শন। পরবর্তী কালে হেগেল এই দ্বান্দ্বিক দর্শনের মুখ্য উদ্গাতা হ'য়ে ওঠেন। এবং তাঁর দার্শনিক প্যাটার্ণের ভিত্তিতে মার্ক্‌স্‌বাদ দণ্ডায়মান। অপর পক্ষে গতিদর্শন ভারতীয় ও পাশ্চাত্য চিন্তার ঐতিহ্যে আবহমান কাল থেকেই প্রবল। এযুগে রবীন্দ্রনাথ এই চিন্তার শ্রেষ্ঠ ধারক।—জীবন-নিহিত আঘাত এ-ও পুরনো চিন্তা, গৌতম বুদ্ধের দুঃখবাদের গোড়ার কথা, খৃষ্টীয় 'প্রব্লেম অফ্ ইভল্'-এরও গোড়ার কথা, তাছাড়া উনিশ শতকে ডারুইনের বিচারে এ চিন্তা নতুন রূপে দেখা দিয়েছিল। জীবনানন্দ সুপাঠক ছিলেন, চিন্তাশীল ছিলেন, স্বল্পবাক 'ইন্‌ট্রোভার্ট' বা অন্তরাশ্রয়ী হওয়া সত্ত্বেও সমকালীন সংসার সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল ছিলেন। দ্বন্দ্ব-আঘাত-গতির ধারণা তিনি কি বাইরের অভিজ্ঞতা থেকে পেয়েছিলেন, অর্থাৎ দর্শন-অধ্যয়ন থেকে অথবা সমকালীন কোনো আন্দোলন বা প্রচার থেকে? না কি তাঁর চেতনা যতই গভীর

থেকে গভীরতর হ'তে লাগল, ব্যক্তিস্বরূপের বহিঃস্থিত যাবতীয় বিষয় ব্যক্তিস্বরূপেরই ক্রমোজ্জ্বল বর্তিকায় আলোকিত হ'তে লাগল, ততই এই দ্বন্দ্ব-আঘাত-গতির ধারণা সুপ্রতিষ্ঠ হ'তে থাকল?—প্রশ্নগুলির উত্তর আমি দিতে পারব না, কোনো সহায়ক তথ্য আমার আয়ত্তে নেই। কিন্তু সম্ভবতঃ এ হেন তথ্য অনাবশ্যক। তথ্যের সাহায্যে বড় জোর এইটুকুই বলতে পারব যে জীবনানন্দ এ সব ধারণা আহরণ করেছিলেন অমুক গ্রন্থ থেকে অমুক দর্শন থেকে অথবা একান্তই নিজ অপ্রভাবিত চেতনা ও সংবেদনা থেকে। বলতে পারব না কোন্ উপায়ে বিমূর্ত ধারণা গ্রহণ করল কাব্যের শরীর, অথচ কাব্যই তো আসল বস্তুটি, অন্য সব কথাই কাব্যাস্বাদের প্রস্তুতি মাত্র। সুতরাং যে-তাবৎ না কোনো নিঃসংশয় তথ্যের নির্ভরে বিশ্বাস করতে পারি যে জীবনানন্দর চিন্তার উৎস বহিঃস্থিত, ততদিন আমি বরং বিশ্বাস করব যে তাঁর গতি-দ্বন্দ্ব-আঘাত-ছন্দিত জীবনবোধ তাঁর নিজস্ব সকর্মক চেতনা থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। বস্তুত জীবন মানেই যে গতি দ্বন্দ্ব আঘাত, এই ধারণা কবির অনেক আগেকার রচনায়ও প্রকাশ পেয়েছিল, যদিচ এমন মেধাবী বচনে নয়। "জীবন" কবিতার একটি স্তবক তুলছি :

যতদিন রয়ে যাই এই শক্তি রয়ে যায় সাথে,—
বিকালের দিকে যেই ঝড় আসে তাহার মতন!
যে-ফসল নষ্ট হবে তারি ক্ষেত উড়াতে ফুরাতে
আমাদের বুকে এসে এই শক্তি করে আয়োজন!
নতুন বীজের গন্ধে ভরে দেয় আমাদের মন
এই শক্তি,—একদিন হয়তো বা ফলিবে ফসল!—
এরি জোরে একদিন সয়তো বা হৃদয়ের বন
আহ্লাদে ফেলিবে ভরে অলক্ষিত আকাশের তল!
দুরন্ত চিতার মত গতি তার,— বিদ্যুতের মত সে চঞ্চল!

জীবন : ধূসর পাণ্ডুলিপি

গতিময় দ্বন্দ্ব ও আঘাতময়, জীবনবোধের সঙ্গে ওতপ্রোত হয়েছে কবির ইতিহাস-চেতনা। ইতিহাস-চেতনায় নিহিত তাঁর শুভ্র আশার বীজ, কোনো সাজানো মতবাদের কেয়ারি-করা জমিনে নয়। ইতিহাস-চেতনা মানে কোনো সরলরেখ বা চক্রবৃত্ত বা কম্বুরেখ নিয়তির নিয়মে প্রত্যয় নয়। জিয়মবাটিস্টা ভিকো বা হেগেল বা স্পেংলার বা টয়ন্‌বি ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর গভীরে যে সব পুনরাবৃত্ত নিয়ম বা ছন্দ লক্ষ্য করেছেন তেমন কোনো অবশ্যমান্য বিশ্বাস আমাদের কাছে উপস্থিত করেননি কবি। তাঁর ইতিহাস-চেতনা পুরোপুরি কবিমানসিক, অর্থাৎ তত্ত্বমুখর নয় অনুভূতি নির্ভর, যুক্তি সাপেক্ষ নয় বাক্‌প্রতিমায় বিধৃত। আবহমান ইতিহাসের বঙ্কিম-বন্ধুর পথে তিনি কয়েকটি আলোক-বর্তিকা দেখেছেন—নচিকেতা বুদ্ধ ঈশা...গান্ধী, এই সব বর্তিকায় উদ্ভাসিত হয়েছে মানবিক জীবনধারার প্রকৃত অর্থ। এইসব বর্তিকা যেন সহস্র ঝঞ্ঝার ঊর্ধ্বে কোথাও নিবাত নিষ্কম্প শিখা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে এবং আজো যে এই নিটোল পবিত্র পরম্পরা অব্যাহত আছে তার প্রমাণ গান্ধীজীর জীবন। 'মহাত্মা গান্ধী' শীর্ষক কবিতায় কবি বলছেন :

এই অন্ধ বাত্যাহত পৃথিবীকে কোনো দূর স্নিগ্ধ অলৌকিক
তনুবাত শিখরের অপরূপ ঈশ্বরের কাছে
টেনে নিয়ে নয়—ইহলোক মিথ্যা প্রমাণিত ক'রে পরকাল

দীনাত্মা বিশ্বাসীদের নিধান স্বর্গের দেশ ব'লে সম্ভাষণ ক'রে নয়—
কিন্তু তার শেষ বিদায়ের আগে নিজেকে মহাত্মা
জীবনের ঢের পরিসর ভ'রে ক্লান্তিহীন নিয়োজনে চালায়ে নিয়েছে
পৃথিবীরই সুধা সূর্য নীড় জল স্বাধীনতা সমবেদনাকে
সকলকে— সকলের নিচে যারা সকলকে সকলকে দিতে।

মহাত্মা গান্ধী : বেলা অবেলা কালবেলা

ইতিহাসের বর্তমান সর্গে, জীবনানন্দ বলছেন : "চাই শান্তি পর্ব ও সুসীম আস্তিক্যের সুর"। অনেক বিক্ষোভ সত্ত্বেও, "যতদূর দৃষ্টি যায় জীবনের ও ইতিহাসের সত্যের ওপিঠ ও এপিঠের অন্তিমবর্ণে নিজেকে—মানবকে ফলিয়ে তুলে—তবুও এমন একটা সঙ্গতির আভাস পাওয়া যায়—যা কঠিনতম আনন্দ একজনের কাছে সফলতম বেদনা অন্যের নিকটে—তবুও তাদের প্রাণে এক সুরসাম্যের জন্ম দেয়।"—এই মনোমৈত্রী থেকে পরিণামে হৃদয়ে প্রশান্তির জন্ম হয়, আর প্রশান্তি মানে মাত্রাচেতনা। জীবনানন্দ কোথাও মাত্রাচেতনা কথাটির সংজ্ঞা দেননি, আমার মনে হয় ইংরেজ নিও-ক্লাসিকদের প্রযুক্ত good sense অর্থে তিনি কথাটির ব্যবহার করেছেন, যে good sense and equilibrium, মাত্রাচেতনা ও ভারসাম্য, ক্লাসিক্যাল বা ধ্রুপদী কাব্যের পরম লক্ষণ। সম্ভবতঃ এই প্রশান্তির দিকেই ইশারা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ এবং যদিও পত্রোত্তরে জীবনানন্দ বলেছিলেন যে প্রশান্তি ব্যতিরেকেই মহৎ কাব্য জন্মাতে পারে, তবুও, আমার বিশ্বাস, জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথের কথা ভোলেননি, নিদেনপক্ষে শেষ কয় বৎসর নিজ মননের গভীরে ও বৃহত্তর জাগতিক জীবনের প্রমাণে এই প্রশান্তি ও স্থিরতার দিকেই অগ্রসর হচ্ছিলেন। আমার অনুমান যে মহাযুদ্ধের অবসান কাল থেকেই জীবনানন্দর কবিচিত্তে তাড়নার স্থলে সুস্থিরতার তাগিদ প্রবল হচ্ছিল। এই সময়কার একটি চিঠি—তারিখ ২৬.১২.৪৫—এ প্রসঙ্গে মূল্যবান :

> কোনো কিছুকে 'চরম' ভেবে সুস্থিরতা লাভ করবার চেষ্টায় আত্মতৃপ্তি নেই, * * রয়েছে বিশুদ্ধ জগৎ সৃষ্টি করবার প্রয়াস—যাকে কবিজগৎ বলা যেতে পারে—নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে যা ফলিয়ে দেখতে চায়। এতে করে বাস্তব বাস্তবই থেকে যায় না ; দুয়ের একটা সমন্বয়ে সেতুলোক তৈরী হয়ে চলতে থাকে এক যুগ থেকে অপর যুগে—কোনো পরিনির্বাণের দিকে কারু মতে ; অল্পাধিক শুভ পরিচ্ছন্ন সমাজ-প্রয়াণের দিকে অন্য কারুর ধারণায় ; কবিজগতে যে পাঠকেরা ভ্রমণ করেছেন তাঁদের মনে (কিংবা হাতে) ইহজগৎ আবার নতুন ক'রে পরিকল্পিত হবার সুযোগ পায় তাই। * * রয়েছে হয়তো কবির ভাবনাপ্রসাদ ; চরম ভেবে আঁকড়ে থাকার ভিতর নির্বাণ-অনির্বাণেরও সমন্বয়স্বপ্নও আছে, শান্তি আছে, মাত্রাচেতনা আছে, উত্তেজনাও যে নেই, তা' নয়, কিন্তু তা নিরিখের সান্ত্বনায় ফিরে আসে।

[উদ্ধৃত অংশটি নেওয়া হয়েছে 'ময়ূখ' ১৩৬১ থেকে, তারকা-চিহ্নের অন্তর্বর্তী অংশটি 'পূর্বাশায়' প্রকাশিত হয়েছিল, আমি দুটি অংশ একই চিন্তা প্রবাহের উক্তি বলে এক সঙ্গে সাজিয়েছি।]

অর্থাৎ কবি কোনো সদ্যপ্রস্তুত রেডিমেড সার্বিক দর্শনের আলোকে জীবন দেখছেন না, তাঁর দৃষ্টি সব সময় 'নিজের শুদ্ধ নিঃশ্রেয়স মুকুরের ভিতর বাস্তবকে ফলিয়ে দেখতে

চায়।' এই হিসাবে তাঁর সমকালীন অন্য যে কোনো বাঙালি কবির তুলনায় জীবনানন্দ অধিক স্বাধীনচিত্ত। স্বাধীনচিত্ত আবার মুক্তচিত্তও বটে, নিশ্চয় স্বাধীন বলেই মুক্ত। তাঁর আবহমান ইতিহাস-চেতনায় সমভাবে বিধৃত হয়েছেন নচিকেতা জরাথুষ্ট্র লাওৎ-সে এঞ্জেলো রুশো লেনিন, সোফোক্লেস ও মহাভারত, বুদ্ধ, সোক্রাতেস্ কনফুচ লেনিন গ্যেটে হ্যোল্ডেরলিন রবীন্দ্র, জেসন ওডিসিয়ুস ধর্মাশোক, শ্বেতাশ্বতর যম নচিকেতা বুদ্ধদেব ঈশা। জীবনানন্দর স্বাধীন মুক্তচিত্ত আসলে স্থানকালোত্তর শুভ্র মানবিকতারই চিত্ত।

কিন্তু আমি এমন কথা বলতে চাই না যে সোনালি সিংহের দেশে যেমন হিরন্ময় সূর্য, নিরুত্তেজ বিকেল, প্রক্ষিপ্তরাত্রি এবং ভোরচক্রায়িত অনুক্রমে আসে যায় তেমনি বিমথিত বেদনা, ব্যাহত মূল্যজ্ঞান, তিক্ত পরিহাস, সুস্থিরতা ও প্রশান্তি জীবনানন্দর কাব্যবির্বতনে স্থান নিয়েছে পরিচ্ছন্ন পারম্পর্যে। যেন প্রয়াগ সঙ্গমে গঙ্গার শাদা জল পেরিয়ে যমুনার কৃষ্ণ নীল জলে পৌছলাম। না, এমন স্পষ্ট কালানুক্রম জীবনানন্দর কবিভাবনায় নেই। বস্তুত কোনো মহৎ কাব্যেই নেই। কোল্‌রিজের ভাষায় এ হেন স্পষ্ট পারম্পর্য হচ্ছে fixities and definites, যা কিনা fancy নামক নিরেস শক্তি থেকে উদ্ভূত হয়, অপর পক্ষে secondary imagination or esemplastic power নামক প্রাণপ্রচুর ও প্রাণচঞ্চল সৃজনী-প্রতিভায় কোনো শিলীভূত স্থবির অনুভূতির স্থান নেই। সুতরাং নিজ সৃজনী-প্রতিভার স্বভাবেই এমন হ'তে পারেনি যে জীবনানন্দ এককালে মানবিক ঐতিহ্যের ও আদর্শের পরাজয় এবং অন্যকালে সেই ঐতিহ্যের ও আদর্শেরই জয়লাভ দেখেছেন। তা'ছাড়া ১৯৪৫-এর পরে পরেই বহির্জগতে যে সব মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটেছিল—কলকাতার দাঙ্গা, দেশবিভাগ, কোটি কোটি নরনারীর দেশান্তর, জীবনানন্দর নিজ দেশান্তর, গান্ধীজীর হত্যা, আজাদ ভারতে বহু দেশপ্রেমিকের চরিত্রবিকার ইত্যাদি—তার ফলে নিতান্ত doctrinaire অনমনীয় মতবাদী না হ'য়ে যিনি শুধু শুভ্র মানবিক আদর্শের ভোর চেয়েছেন, তাঁর পক্ষে আশায় বা নিরাশায়, যন্ত্রণায় বা আনন্দে, জয়ে বা পরাজয়ে, একটি মাত্র বিন্দুতে স্থিতিশীল হওয়া অসম্ভব ছিল। অতএব জীবনানন্দর কবিতায় শেষ অবধি চিন্তার দ্বিধারা সমান্তরালে প্রবাহিত হয়েছে যদিও (আমার কাব্যপাঠে আমি দেখতে পাই) তাঁর অস্তিজ্ঞান ক্রমেই যেন নেতিজ্ঞান থেকে মুক্ত হয়ে আসছিল।

১. তবুও নক্ষত্র নদী সূর্যনারী সোনার ফসল মিথ্যা নয়।
মানুষের কাছ থেকে মানবের হৃদয়ের বিবর্ণতা ভয়
শেষ হবে ; তৃতীয় চতুর্থ—আরো সব
আন্তর্জাতিক গ'ড়ে ভেঙে গ'ড়ে দীপ্তিমান কৃষিজাত জাতক মানব।

সৌরকরোজ্জ্বল : সাতটি তারার তিমির

২. জানি তবু মানবতা নিজের স্বভাবে
কালকে ভোরের রক্ত প্রয়াস সূর্যসমাজ রাষ্ট্রে উঠে গেছে ;
ইতিহাসের ব্যাপক অবসাদের সময় এখন, তবু, নরনারীর ভিড়
নব নবীন প্রাক্‌সাধনার ;—নিজের মনের সচল পৃথিবীকে
ক্রেম্‌লিনে লণ্ডনে দেখে তবুও তারা আরো নতুন অমল পৃথিবীর।

প্রয়াণপটভূমি : বেলা অবেলা কালবেলা

এবং যদিও "বেলা অবেলা কালবেলা" গ্রন্থের কবিতা-বিন্যাসে কালানুক্রমিক রচনা-শৃঙ্খলা সর্বথা রক্ষিত হয়নি, তাহ'লেও এ-গ্রন্থের শেষ কবিতাটির তিন ছত্রে যেন তাঁর অস্তিজ্ঞান-সমুখ ভাবনার অন্তিম প্রতীক :

ইতিহাস খুঁড়লেই রাশি-রাশি দুঃখের খনি
ভেদ ক'রে শোনা যায় শুশ্রূষার মতো শত-শত
শত জলঝর্ণার ধ্বনি।

হে হৃদয় : বেলা অবেলা কালবেলা

আগের টেন্‌শন অন্তর্হিত হয়েছে। অবরুদ্ধ আবেগের উগ্র উৎক্ষেপ আর নেই। কবির আবেগ তাঁর মননের দ্বারা, তাঁর মানবিক ঐতিহ্যবোধ দ্বারা, সংযত হয়েছে। টেন্‌শনের বহির্লক্ষণ আমি আর দেখতে পাই না কেবল একটি ছাড়া ; তাঁর অতি নিজস্ব খেয়ালী ভাষা প্রয়োগে। অপ্রচলিত শব্দের প্রয়োগ ও বাক্যবিন্যাসের রীতি-লঙ্ঘন তাঁর কবিতায় প্রথম থেকেই প্রকট (বিশেষতঃ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে) কিন্তু "সাতটি তারার তিমির": ও "বেলা অবেলা কালবেলা" দুই গ্রন্থে অধিক, অর্থাৎ বিক্ষুব্ধ আবেগের কালেই অধিক। বিশদ বিশ্লেষণের সুযোগ এ-প্রবন্ধে নেই, শুধু একথা বলে' ক্ষান্ত হব যে ভাষা-প্রয়োগও শেষদিকে ক্রমশ সুস্থির সুবিন্যস্ত স্বচ্ছ হ'য়ে আসছিল বলে আমার মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'মহাত্মা গান্ধী' কবিতাটির উল্লেখ করতে পারি। কবিভাবনার গভীরে এমন সুস্থিরতা এমন অনবরুদ্ধ আবেগ বিদ্যমান যে ভাষা-প্রয়োগে কোনো অনচ্ছতা, কোনো বহু-ইঙ্গিত-জড়ানো অসম্পূর্ণ বাক্যবিন্যাস উপস্থিত হয় নি। যেমন চিন্তায় তেমনি ভাবায় নির্মলতা ঋজুতা প্রশান্তি। জীবনানন্দর কাব্য থেকে টেন্‌শন বিলীন হ'য়ে উদ্ভাসিত হ'ল কে এক পাখি যে গভীর সুসময়ে সূর্যের থেকে সূর্যের ভিতরে দীপ্ত প্রাণ দান করে। "নব সূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—প্রাণ দাও পাখি।"

টেন্‌শন্ বিলীন হল মানে মনন ও আবেগের অস্থিরতা ও বিপর্যয় বোধ বিলীন হ'ল। জীবনানন্দর কবিচিত্ত এখন আত্মবিকাশের সেই স্তরে পৌঁছেছে যেখানে কাব্যের জন্ম balance of opposites-এ নয়, কাব্যের জন্ম স্থিতধী চেতনায়। খুব কম কবির সংবেদনায় এই স্থিতধী সমন্বয়ী প্রশান্তি বিদ্যমান। যেখানে বিদ্যমান সেখানে হয়তো কবি গৌণ কবি, যিনি সংকীর্ণ স্বচ্ছন্দ ক্ষেত্রে সংক্ষেপে কিছু সুকাব্যের ফসল ফলিয়েই পরিতৃপ্ত, অথবা অন্যত্র বিদ্যমান যেখানে কবির বিরাটত্ব ও মহত্ত্ব রবীন্দ্রনাথের মহৎ প্রতিভার সমগোত্রজ, যে-প্রতিভায় বহু আবেগের অণুপরমাণুগুলি একটা সর্বধাত্রী জীবনবোধে বিধৃত হ'য়ে স্থিতপ্রজ্ঞ কবিকর্মে প্রশান্ত হয়। রবীন্দ্রনাথের জীবনে ও শিল্পে টেন্‌শন্ নয়, হার্মনির লীলা। আমার বিশ্বাস যে এ-যুগের বাঙালি কবিদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে বেশি সার্থক ভাবে রবীন্দ্রনাথের ভাব ও আঙ্গিক থেকে মুক্তি অর্জন করেছিলেন, যিনি এমন সুরের প্রবর্তন করেছেন—অবিস্মরণীয় সুর, সে-সুর জলের মতো ঘুরে ঘুরে একা কথা কয়—যে –সুর রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যায় না, অথচ যিনি রবীন্দ্রনাথের কাব্য-অভিব্যক্তিতে নিয়ত বহমান যে অপরিমেয়তল প্রশান্তির ধারা সে ধারা নিজ অভিব্যক্তিতে আয়ত্ত করেছেন, তিনিই রবীন্দ্রনাথের আত্মার নিকটতম আত্মীয়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে অন্য কবিদের যোগ বহিরঙ্গে, সে-যোগ জীবনানন্দর বেলায় অন্তর্গূঢ় ও আত্মিক। বাঙালি মানসের ও কাব্যের যে নিঃসংশয় ঐতিহ্য রবীন্দ্রনাথে বর্তেছিল তার ধারক জীবনানন্দ দাশ।

তিরিশের যুগে বিস্ময়ের বিবর্ণতা ঃ জীবনানন্দ

কীর্তি নিয়োগীর মাথার আবের দিকে তাকালে শশীর আর আকাশের চাঁদের দিকে তাকাতে ইচ্ছা করত না—'পুতুল নাচের ইতিকথা'-র শশী এভাবেই আক্রান্ত হয়েছিল বিস্ময়ের মৃত্যুর দ্বারা। তালবনের উঁচু টিলার ওপরে দাঁড়িয়ে সূর্যাস্ত দেখার মধ্যে যে-বিস্ময়, শশী তা হারিয়ে ফেলল গাওদিয়া নামক বাস্তবতার হাতে অধিকৃত হয়ে। এটা শুধু শশীরই ভবিতব্য নয়, প্রথম উত্তর-সামরিক মধ্যবিত্ত মানসের নানা ধূসরিমার এও এক লক্ষণ। শশীর ললাটলিখন এই যে, তারই জ্ঞান বা অবিরাম জানবার গাঢ় বেদনাই তাকে সব বিস্ময় থেকে বিচ্যুত করবে। যাদবের মৃত্যুর রহস্য শুধু সেই বোঝে—তাই সেই নিক্ষিপ্ত হয় অলৌকিক আশ্রয়ের উর্ধ্ব জগৎ থেকে নাস্তির নিষ্ঠুর ভূমিতে। অথচ জানার যে-বিস্ময় সেটাও তার হতে পারে না।

তা ছিল রোমান্টিকদের। যেদিন তারা জগৎ বা জীবন বলতে বুঝল নতুন একটা ব্যাখ্যার দায়িত্ব, সেদিনই তারা বিস্ময়কে বরণ করে নিয়েছে। প্রাক্‌রোমান্টিকদের কাছে 'বিশ্ব' ছিল সুনির্দিষ্ট, সুপরিকল্পিত এবং সুশৃঙ্খল নিয়মে বাঁধা—প্রত্যক্ষ। কিন্তু নদী সমুদ্র পাহাড়ে—বিজনতায় এবং একাকীত্বে রোমান্টিকরা অনুভব করলেন আর এক অস্তিত্বের উপস্থিতি। এই সমস্তই প্রকৃতির বিশালতা দুর্জ্ঞেয়তা এবং অব্যাখ্যেয় গূঢ়তা এক বিস্ময়ের জননী। কপালকুণ্ডলার সামনে নবকুমারের বিস্ময়-মৌনতা সৌন্দর্যের সামনে ব্যক্তির আপনার অনুভূতির অশেষত্বের নিদর্শন। নবকুমার সেই মানুষের প্রতিনিধি, এই বিস্ময় হবে যার ভবিতব্য। এক লহমায় নবকুমারের মনে হয়েছিল জীবনের সব ছেঁড়া তারগুলো বুঝি বা জোড়া লেগে গেল। এইখানেই বিস্ময়ের চূড়ান্ত সীমা। অথচ তখন থেকেই নবকুমার নিক্ষিপ্ত হল জটিলতর, গভীরতর অশান্তির মধ্যে—এটাই এই বিস্মিতের বিধিলিপি, বিস্ময়ের আয়রনি। এ বিস্ময় হতে পারে জীবনের বিস্ময় কখনো কখনো—'আকাশ ভরা সূর্যতারা, বিশ্বভরা প্রাণ, তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান'—এ বিস্ময় কখনো বা হতে পারে অস্তিত্বের দূরবগাহ রহস্যের বিস্ময়—দিনের শেষ আলো মেলে দেয় এক নিরুত্তর প্রশ্ন 'কে তুমি'—মেলেনি উত্তর।

রবীন্দ্রনাথের মধ্যে এ বিস্ময়ের ব্যাপ্তি ও গভীরতা নিশ্চয় এক নির্দিষ্ট আকার পেয়েছে। এবং তিনিই অন্য একভাবে এই বোধকে দিয়েছেন নতুন স্তর। তাঁর রুগ্ন ব্যাধিগ্রস্ত কোনো কোনো নায়ক যন্ত্রণাকে তুচ্ছ করেছে, সয়েছে এবং রয়েছে এই বিস্ময়কে স্বীকৃতি দিয়ে। দুঃখভোগ এবং আনন্দভোগ যে রোমান্টিকের কাছে দুই কোটির ব্যাপার নয়, বরং বিমিশ্র অনুভূতি তা বোঝা যায় ডাকঘরের অমলকে দেখলে, অথবা গল্পগুচ্ছের 'শেষের রাত্রি' গল্পের নায়কের যন্ত্রণা বোধে। রবীন্দ্রনাথের একাধিক নায়ক আছে যারা বিষণ্ণ, যারা কোনো একটা ধূসর নির্বেদ বহন করেছে আদ্যন্ত। এরাও কিন্তু জীবনের

বিস্ময়কে তুলে ধরে অন্যভাবে। এরা বলে জীবনের জটিলতার কথা। বস্তুতঃ বিস্ময় তো দুই-তিন বা বহুভাবেই জেগে উঠতে পারে। নিজেকে জেনে, নিজের চারিপাশের জগতকে জেনে, অথবা নিজেকে সম্পৃক্ত জেনে বা বিবিক্ত মেনে। নিজের শক্তিকে অনুমান করে, অথবা দুর্বলতাকে বুঝেও আমাদের অবাক হবার সীমা পরিসীমা থাকে না। সাবলাইমের অভিঘাতেও তা জাগতে পারে—কীটের কুটিলতাকে পাপড়ির মধ্যে দেখেও তার জাগরণ অসম্ভব নয়। যে সৌন্দর্য অপ্রতিরোধ্য তা যেমন বিস্ময়ের হেতু, আবার যে-সৌন্দর্য বেপথু, পতনশীল তাও আমাদের কাছে কম বিস্ময়জনক নয়। বিরাট স্থাপত্যকীর্তি যেমন আমাদের মনকে টানতে পারে, তেমনি তার ভগ্নদশা, ফাটলে ফাটলে অশথের চারা, তোরণের ভঙ্গুর সিংহমূর্তি, ম্লান গাত্রগরিমাও আমাদের অন্য এক বিস্ময়ে পূর্ণ করে। প্রথমোক্ত বিস্ময় জীবনের বিস্ময়, কেননা সেটা সৃষ্টির বিস্ময় ; দ্বিতীয় বিস্ময় মৃত্যুর বিস্ময়।

জীবন ও মৃত্যুকে বিস্ময়ের হেতু জেনে সার্থকভাবে অগ্রসর হয়েছেন জীবনানন্দ। একই সঙ্গে তাঁর দুটো কবিতা ও প্রসঙ্গ স্মরণীয়—'ক্যাম্পে' (ধূসর পাণ্ডুলিপি) এবং 'শিকার' (বনলতা সেন)। প্রতীক-ট্রিতিকের কথা পরে হবে, আপাতত কথা হল কবিতাদুটির অন্তর্মিল। একটি জঙ্গল, শিকারীদের আগমন, হরিণের মৃত্যু দুটি কবিতারই প্রধান বিষয়। প্রথম কবিতাটি প্রবহমান অসমচরণ মুক্তক তান প্রধানে লেখা। ব্যবহৃত ক্রিয়াপদগুলি সাধু বা লৈখিক। ছন্দ এবং ক্রিয়ার এই সাধুরীতির প্রয়োগে কবিতাটির ভাবঘন ধূসর ভাবটি সার্থক হতে পেরেছে। 'এক ঘাই হরিণীর ডাক শুনি। কাহারে সে ডাকে!' প্রথম ক্ষুদ্রতম স্তবকটিতে এই উচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে ঐ আহ্বান আমাদের বিস্ময়াতুর করে তোলে। তখনও তো আমাদের কাছে স্পষ্ট নয় ঐ ডাকের স্বরূপ। কিন্তু নৈসর্গিক হয়েও তা যে অলৌকিক ডাক তা বুঝি বোঝা যায়। রবীন্দ্রনাথের 'পদধ্বনি' কবিতাতেও তো এমনি না হলেও বলা আছে ঃ

আঁধারে প্রচ্ছন্ন ঘন বনে
আশঙ্কার পরশনে
হরিণের থর থর হৃৎপিণ্ড যেমন—
সেই মতো রাত্রি দ্বিপ্রহরে
শয্যা মোর ক্ষণতরে
সহসা কাঁপিল অকারণ।

মৃত্যুই সেখানে পরম বিস্ময়ের হেতু স্পন্দমান। জীবনের নানাবিধ বিস্ময়ের মধ্যে বুঝিবা মৃত্যুও একটা। 'ক্যাম্পে' কবিতায় জীবনানন্দ সহজ তুলিতে এঁকে দেন জীবনের আশ্চর্য রূপ—'চারিপাশে বনের বিস্ময়/বনের বাতাস/জ্যোৎস্নার শরীরের স্বাদ যেন,' অথচ এই বিস্ময়কর জীবনের মাঝখানে মৃত্যু আর প্রেম এক হয়ে যায়, 'ঘাই মৃগী সারারাত ডাকে'। ধীরে আমরা আমাদের ভবিতব্যের দিকে ঘনিয়ে যাই। অন্ধকার অস্তিত্বকে ছেড়ে আমরা এগিয়ে যেতে চাই সেই ভবিতব্যের বিস্ময়ের দিকে।

আজ এই বিস্ময়ের রাতে
তাহাদের প্রেমের সময় আসিয়াছে।

এ-বিস্ময় কিসের? সাধারণভাবে এ-বিস্ময় জীবনের। যে জীবনকে ঘিরে আমাদের আকাঙ্ক্ষা, আস্বাদ, সেই জীবনকে ঘিরে রয়েছে আমাদের মৃত্যু চেতনা।

কোথাও বাঘের পাড়া বনে আর
নাই যেন।

মৃগদের বুকে আজ কোনো স্পষ্ট
ভয় নাই,

এই যে-মৃত্যুবিস্মৃতি এ কিন্তু বস্তুত একটা আত্মছলনা। ভয়ের বদলে প্রবল হয়েছে জীবনের পিপাসা। 'মৃগীর মুখের রূপে হয়তো চিতারও বুকে জেগেছে বিস্ময়'—এই বিস্ময় প্রত্যেককে বুঝি প্রত্যেকের নিজ ভূমিকা ভুলিয়ে দেয়। রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনার সারাৎসারে মৃত্যু নিজেও বুঝি জীবনের রূপ দেখে বিস্ময় স্থগিত। বিস্ময় দুই ধরনের : এক, বিস্ময় আমাদের সঙ্গে জগতের ঐক্যকে চকিতে প্রতিষ্ঠিত করে। গ্রীক পানপাত্রকে দেখে কবির যে বিস্ময়, বা পশ্চিমা বাতাসকে অনুভব করে কবির যে আকুলতা তা এই জাতীয় বিস্ময়। আর এক বিস্ময় আমাদের আপাত ঐক্যকে সহসা খণ্ডিত করে—তার ফলে আমরা দেখতে পাই পরিদৃশ্যমানের অন্তরালে অন্য এক সত্যকে। ফরাসী প্রতীকী কবি যখন নগর-জীবনের বর্ণনা করেন, তখন তাঁর বর্ণনারই আড়ালে কাজ করে এক অবক্ষয়ের সত্য। দুয়ে মিলে গড়ে ওঠে এক ঐক্য। জীবনসম্বন্ধীয় পুরোনো বিস্ময়ের এইভাবে ঘটে অপসারণ। উদ্ভূত হয় এক নতুন বিস্ময়।

জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' ও 'শিকার' কবিতা দুটিতেও একত্র জড়িত হয়ে রয়েছে সৌন্দর্যের সঙ্গে নিয়তির ছায়া। আমাদের 'সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মতো এসে জাগে ধূসর মৃত্যুর মুখ'—এই জীবনানন্দীয় বিস্ময়ের মূল রয়েছে প্রথম উত্তর-সামরিক হতাশাবোধে। যে-ধূসরতা সমর সেনের কবিতায় পুনরাবৃত্ত তার সঙ্গে জীবনানন্দীয় ধূসরতার আত্মীয়তা নেই, এটা ঠিক কথা, কিন্তু এটাও ঠিক কথা যে, উভয়ে পরস্পরের বিপরীত নয়।

এই উত্তর-সামরিক ধূসরতা আমাদের বুঝিয়ে গেল ভাঙনের এবং অপচয়ের আত্যন্তিকতা। তবু এর মধ্যে, অন্তত জীবনানন্দ বলেন, এক মাত্র প্রেমই বোধ করি ভুলিয়ে দেয় সেই সব ভাঙন, বিনাশ, অপচয়ের কথা। 'একে একে হরিণেরা আসিতেছে গভীর বনের পথ ছেড়ে সকল জলের শব্দ পিছে ফেলে অন্য এক আশ্বাসের খোঁজে/দাঁতের নখের কথা ভুলে গিয়ে'...প্রেমই সেই বিস্মরণী। প্রেমই দেয় মৃত্যুকে অবহেলা করার ক্ষমতা। কিন্তু এ ক্ষমতাতেই মানুষের রেহাই মেলে না। ঘাইহরিণীর ডাক এবং বন্দুকের শব্দ মিশে যায়। মৃগপ্রেমিকদের শব পড়ে থাকে। হরিণের মাংসভরা ডিসের সামনে মানুষের মনে হবে :

তাদের মতন নই আমিও কি?
কোনো এক বসন্তের রাতে
জীবনের কোনো এক বিস্ময়ের রাতে
আমারেও ডাকেনি কি কেউ এসে
জ্যোৎস্নায় দখিনা বাতাসে
অই ঘাই-হরিণীর মতো?

'ক্যাম্পে' কবিতাটির রূপকার্যটিও অনুধাবনীয়। সহজ প্রাণীন জীবন ডাক দেয়, হতে পারে সে ডাকও নিয়তি-নির্দিষ্ট। তথাপি সেই বসন্ত-বিহ্বল রাত্রের হরিণের মতো মৃত্যু সত্য হলেও সে ডাকে সাড়া দিতে হয়। মৃত্যু তুচ্ছ হয়ে যায় সেই পরমাপ্রকৃতির অমোচনীয়, অলঙ্ঘ্য আকর্ষণে। ঘাইমৃগীরা যেন ছলনাময়ী আহুতি—সে ডাক প্রত্যেকটি পুরুষকে, প্রত্যেক প্রেমিককে শুনতে হয়। এ হল, বা হতে পারে এই কবিতাটির একদিকের অর্থ। আর একদিকে এ অর্থও গ্রাহ্য, হরিণ-হরিণী ব্যাঘ্রের স্বাভাবিক জীবনে ক্যাম্প একটা প্রক্ষিপ্ত উপস্থিতি—তাই ছন্দোপাত। মানুষেরও জীবনের স্বভাবছন্দ ভেঙে গেছে ঐ

সভ্যতার প্রক্ষিপ্ত উপস্থিতিতে। সেও মানুষের কাছে ধ্বংসের, মৃত্যুর প্রতীক। প্রেম বা বসন্ত এখনো মানুষকে এক-এক বার, সেই ধ্বংসাত্মক শক্তির কথা ভুলিয়ে দেয়। কিন্তু সে বিস্ময় ক্ষণিকের জন্য মাত্র। তারপরেই আমাদের শতাব্দীর অভিজ্ঞতা এসে জ্ঞানরূপে সে বিস্ময়কে চূর্ণ করে দেয়, যেমন 'ক্যাম্পে' কবিতার সমাপনী অংশে :

বসন্তের জ্যোৎস্নায় এই মৃত
মৃগদের মত আমরা সবাই।

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থে 'শিকার' কবিতাটি 'ক্যাম্প' কবিতার সংহত রূপ। 'ক্যাম্পে' যা ছিল বিস্তৃত, ছড়ানো ছিটানো, কাহিনী আকারে গ্রথিত, 'শিকার' কবিতায় তা পেয়েছে সূচ্যাগ্র, প্রতীকী সংহতি। 'ক্যাম্প' কবিতায় রঙের ব্যবহার ছিল স্তিমিত, সীমিত—'শিকার' কবিতায় রঙের ব্যবহার ইমপ্রেশনিস্টিক। প্রথম স্তবকেই ঘাসফড়িঙের নীল—যা কোমলতাবাচক, 'টিয়ার পালকের মতো সবুজ' 'গাছের রঙ, নীল মদের গেলাস' এমন এক বর্ণসমাবেশকে স্পষ্ট করে তুলেছে, যা ভোরের উজ্জ্বলতা অপেক্ষা মূর্খ উচ্ছ্বাসকে বেশি ফুটিয়ে তোলে। দ্বিতীয় স্তবকে আগুনের বর্ণাভার অপমৃত্যু সার্থকভাবে আভাসিত হল। উত্তাপদায়িনী যে আলো সারারাত জ্বলছিল 'মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন' 'সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর। হয়ে গেছে রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।' অথচ এবম্বিধ বিবর্ণ অপমৃত্যু চারিদিকে, তাই সকালের আলোয় শিশিরে ঝিলমিল করছে বন ও আকাশ ময়ূরের সবুজনীল ডানার মতো। এই ফ্রেমটি ইঙ্গিত করছে জীবনের অনাহত রূপ-প্রবাহের অঘ্রাণের রাতে যে প্রেম হাওয়ার মতো পাতার বুক ছিঁড়ে চলে যায় সেই শাশ্বত প্রকৃতির দিকে। আর ফ্রেমধৃত ছবিটি সঙ্কেতে জানিয়ে দিচ্ছে বিস্ময়ের মহাপ্রস্থানের কথা। তা এখুনি অন্তরালে সংঘটিত হল।

'মেহগনির মতো অন্ধকার' এই চিত্রকল্পে 'মেহগনি' শব্দটি অন্ধকারকে করে তুলেছে মূল্যবান। বাদামী হরিণের রঙটি প্রাণের প্রতীক। জীবনের সাধ অফুরন্ত। 'সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য' নীল আকাশের নিচে উদ্যত হরিণ যেন তৎপর জীবনের প্রতিমা। কিন্তু তার সেই সমস্ত সাধ, উদ্যমের মাঝখানে তার সমস্ত কামনার মধ্যপথে—'একটা অদ্ভুত শব্দ'। এই কবিতাটির নানা মূল্যবান শব্দপ্রয়োগের মধ্যেও 'অদ্ভুত' শব্দটি বড়ো বিচিত্রভাবে প্রযুক্ত। 'ক্যাম্প' কবিতায় মূল শ্রোতা ছিল মানুষটি। সে-ই ঘাই হরিণীর ডাক শুনেছে, বন্দুকের শব্দ শুনেছে। 'শিকার' কবিতাটিতে অনুরূপ কোনো শ্রোতা নেই। হরিণটি শুনেছে শব্দটি, কিংবা সেও শোনেনি। অরণ্যবাসীরা শুনেছে। বন্দুকের শব্দ বলে তারা এ শব্দকে জানে না। তাই 'অদ্ভুত' এই বিশেষণ। আরও গভীর কারণে এই বিশেষণটি তাৎপর্য পায়। এতক্ষণ ধরে সকালের একটা বর্ণনা গড়ে তোলা হয়েছে। নানা রঙের অনুষঙ্গ পূর্ণ করা হয়েছে সেই সকালটিতে। এতক্ষণ ধরে মূর্ত হয়েছে একটি নিস্তব্ধতা। এতক্ষণ ধরে কোনো শব্দের কথা বলা হয়নি। সেই কুমারী স্তব্ধতা ঐ 'অদ্ভুত শব্দে' সহসা ধর্ষিত হলো বিপুল বেগে।

'নদীর জল মচকা ফুলের পাপড়ির মতো লাল'—'মচকা' শব্দটি চাক্ষুষ অনুষঙ্গে 'আচমকা'কে স্মরণ করিয়ে দিল। এতক্ষণ যা ছিল, শিশির, আলোক, কাঁচা বাতাবি লেবুর মতো, সবুজ সুগন্ধি ঘাস, পাড়াগাঁর বাসর ঘরের, সবচেয়ে গোধূলিমদির মেয়েটির মতো তারা, ময়ূরের সবুজ নীল ডানা—সব বিস্ময় হারিয়ে গেল। এবারে এল উষ্ণ লাল হরিণের মাংসের মতো স্থূল ব্যবহারের সামগ্রী। 'আগুন জ্বলল আবার', কিন্তু সে আগুন একটু আগের দেশোয়ালিদের শরীরের 'ওম্ বজায় রাখার মতো স্বাভাবিক আগুন নয়'। 'সিগারেটের ধোঁয়া', 'টেরিকাটা কয়েকটি মানুষের মাথা' 'এলোমেলো কয়েকটা

বন্দুক'— সেই সব মানুষের কথা ধরিয়ে দিচ্ছে, এই অরণ্য এবং আকাশের যারা কেউ নয়। এই অরণ্যকে ঘিরে তাদের কোনো বিস্ময় নেই। 'তাদের নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম', তাদের বিবেকহীনতার পরিচয় নয়, এ তাদের বিস্ময়হীনতার চিহ্ন। এ তাদের স্থূল উদ্দেশ্যসিদ্ধির পরিচয়। সেখানে বিস্ময় নেই। আধুনিক রক্তেরই এক অংশে এক 'বিপন্ন বিস্ময়' খেলা করে। সমস্ত অর্থ কীর্তি সচ্ছলতার মধ্যেও মানুষের কাছে যখন বেঁচে থাকার মানে হারিয়ে যায়, তখনই মানুষ আর নিজেকে সনাক্ত করতে পারে না। ক্লান্তিকর সেই বিপন্ন বিস্ময়। সবকিছুর মধ্যে সে একা।

তাই জীবনানন্দের ক্লান্ত মানুষ কখনো কখনো এমন কথাও বলে—'আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভরে গিয়েছে ; সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি কোটি শূয়োরে আর্তনাদে উৎসব শুরু করেছে।' বিস্ময়াবসিত সেই ক্লান্ত মানুষ তখন বলে তার পুরাতন বিস্ময়ের উদ্দেশ্যে ঃ

গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে
আমার আত্মা লালিত ;
আমাকে কেন জাগাতে চাও?
হে সময়গ্রন্থি, হে সূর্য
হে মাঘনিশীথের কোকিল, হে স্মৃতি
হে হিম হাওয়া,
আমাকে জাগাতে চাও কেন?

শিল্প বিপ্লবের পরে মানুষ যেদিন এগিয়ে পড়ল টেক্‌নোলজির উৎকর্ষে, আয়ত্ত করতে শিখল নিজ জীবনের প্রতি খণ্ডাংশকে, তখন আর মানুষের বিজ্ঞান সাধনার প্রথম যুগের সেই প্রাচীন বিস্ময় কার্যকর ছিল না। প্রথম মহাকাশ তত্ত্ব, পৃথিবীর গতি, মানুষের কাছে প্রতিভাত হয়েছে বিস্ময়কর রূপে। প্রযুক্তিবিদ্যা যেদিন মানুষকে চাঁদে পৌঁছে দিল, কোপার্নিকাস যে বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন তার কাছে তা ম্লান। আমরা গড়েছি বড় বড় নগর, কত বিদ্যুৎ, কত না উপকরণ। এ নগরে কিন্তু কোনো বিস্ময় নেই। এই নগরের রাত্রির মধ্যে মহত্ত্ব নেই ঃ

হাইড্র্যান্ট খুলে দিয়ে কুষ্ঠ রোগী
চেটে নেয় জল ;
অথবা সে হাইড্র্যান্ট হয়তো বা
গিয়েছিল ফেঁসে
এখন দুপুর রাত
নগরীতে দল বেঁধে নামে।
একটি মোটরকার গাড়লের মতো
গেলো কেশে
অস্থির পেট্রল ঝেড়ে ;

এখানে বিস্ময় কোথায়? এখানে মানুষগুলি কাপড় পরে লজ্জাবশত, এখানে মানুষগুলি অতিবৈতনিক।

'আগন্তুক' নামে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটি গল্প আমরা সবাই পড়েছি। সে গল্পের মূলকথা হল সম্পর্কসূত্রগুলির শূন্যতা। দীর্ঘ ব্যবধানে ঘরে ফেরা চরিত্রপাত্রটি দেখল আবেগের পাত্র কবে যেন উপুড় হয়ে একেবারে নিঃশেষিত হয়ে গেছে। এক মহা অবিস্ময়

সমস্ত পরিবেশকে গ্রাস করেছে। এ জীবন যে শুধু বহু ব্যবহারে ঘষা সিকির মতো দাম হারিয়েছে, ঔজ্জ্বল্য হারিয়েছে তাই নয়, বহু পুনরাবৃত্তিতে সবকিছুই হয়ে গেছে নিরর্থক। এমনি এক বিস্ময়ের বিলীনতা, বিস্ময়ের মহাপ্রস্থান সমর সেনের কবিতাগুলিতে এক ধূসর রঙকে ঘন করে তুলেছে। 'ধূসর' জীবনানন্দেরও রঙ, 'ধূসর' সমর সেনেরও রঙ। কিন্তু একটি ধূসর সন্ধ্যার—হেমন্ত সন্ধ্যার ধূসরতা ; আর একটি হল মরু-ধূসরতা—রুক্ষতার জ্বালা ছড়ায় সে। সমর সেনের অঙ্কিত সকালে কোনো আলোকবিস্ময় নেই, নেই কোনো শিশির সমুজ্জ্বলতা, নেই কোনো আকাশ-নিলীমা। তা আমাদের বিবর্ণ বন্ধ্যা পুনরাবৃত্ত নিরর্থকতার বার্তাবহ ঃ

ক. কত সবুজ সকাল তিক্ত
রাত্রির মতো,

খ. সেই উজ্জ্বল স্তব্ধতায়
ধোঁয়ার বঙ্কিম নিশ্বাস
ঘুরে ফিরে ঘরে আসে
শীতের দুঃস্বপ্নের মতো

গ. কলতলায় ক্লান্ত কোলাহলে
সকালে ঘুম ভাঙে
আর সমস্ত ক্ষণ রক্তে জ্বলে
বণিক সভ্যতার শূন্য মরুভূমি।

ঘ. রাত্রির দূষিত রক্তে
বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে
আমাদের তন্দ্রা ভাঙে।

আমাদের শ্রেণীগত অচরিতার্থতা তিনের দশকে যত প্রবল হয়েছে, যত আমরা ইতিহাসের সিংহদরজায় ধাক্কা খেয়েছি, ততই আমাদের নিজেদের সম্বন্ধে মোহ ভাঙতে থেকেছে ; ততই যেন আমাদের জীবন থেকে বিস্ময়ের নির্বাসন ঘটেছে। এ যুগেরই একটি বিখ্যাত কবিতায় এই সাময়িক অনুভূতির প্রতিবিম্বন বাংলা কাব্য-সাহিত্যে প্রায় ক্ল্যাসিক হয়ে থাকল। কবিতাটি সমর সেনেরই 'উর্বশী'। আমাদের রক্তে তখন বণিক-সভ্যতার গঞ্জনা। আমাদের দিনযাত্রায় তখন নিরুদ্দেশ দিশা। মধ্যবিত্ত মন্থর রক্তে উর্বশীর সৌন্দর্য-কামনা দুরন্ত মেঘের মতো আবিভূর্ত হওয়া কি সম্ভব? না কি সেই দুরন্ত সৌন্দর্য, সেই রক্তিম বাসনার শেষ পর্যন্ত অবমূল্যায়ন ঘটবে। যতদিন না চারের দশকে মধ্যবিত্ত আবার ইতিহাসের ইশারা ঠিকভাবে বুঝে নিল, যতদিন না মধ্যবিত্ত আবার ইতিহাসের কুরুক্ষেত্রে নিজেকে ঠিকভাবে সনাক্ত করে নিল—ততদিন উর্বশী-স্বপ্নের বিকৃতি বিস্ময়কে দিল নির্বাসন ঃ

কিংবা আমাদের ম্লান জীবনে
তুমি কি আসবে,
হে ক্লান্ত উর্বশী,
চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে যেমন বিষণ্ণ মুখে
উর্বর মেয়েরা আসে
কত অতৃপ্ত রাত্রির ক্ষুধার ক্লান্তি,
কত দীর্ঘশ্বাস।

জীবনানন্দ দাশের আস্তিকতা

অরুণকুমার সরকার

কাব্যরসাস্বাদনে কবির বক্তব্যের আলোচনা কতদূর সহায়তা করে সে-বিষয়ে আমার ঘোরতর সন্দেহ আছে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুভব করেছি যে প্রত্যেক মহৎ কবি বিশেষ একটি সত্য, 'বাণী' কথাটায় আপত্তি না থাকলে, তা-ই, সাধারণ্যে উদ্‌ঘাটন করেন। সুতরাং জীবনানন্দ দাশ যে শব্দসৌন্দর্য রচনা ক'রে গেছেন তার আস্বাদন আপাতত পাঠকের ব্যক্তিগত বোধশক্তির উপরে ছেড়ে দিয়ে আমি যদি শুধু তাঁর অভিমতের পরিমাপে অগ্রসর হই তা হয়তো নেহাৎ অনর্থক হবে না। বিগত ১৩-১৪ বছর ধরে তিনি যে-সব কবিতা লিখেছিলেন, খুব অল্প লোকই বোধ হয় সেদিকে নজর দিয়েছেন। তাই সাধারণ পাঠকের কাছে এখনো তিনি নির্জনতার কবি, প্রকৃতির কবি ; তাঁর খ্যাতি এবং অখ্যাতি সংসারবিমুখ পলাতক কবি হিসেবেই। এই ধারণা কিন্তু, আমার বিবেচনায়, পূর্ণাঙ্গ সত্য নয়। শেষ দিকের রচনায় জীবনানন্দের চিন্তা ভিন্নমুখী এবং স্পষ্টতর হয়ে উঠেছিল। মনোময় জগৎ ছেড়ে কিছুদিন তিনি কর্মময় জগতে ভ্রমণ করেছিলেন এবং পুনরায় নবতর উৎসাহে মনোময় জগতেই ফিরে গিয়েছিলেন। এই স্বল্পকালের ভ্রমণকাহিনী নানা কারণে উল্লেখযোগ্য। এখানে জিজ্ঞাসা আছে, অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং তজ্জনিত বিক্ষোভ আছে, প্রাথমিক-বোধে সীমাবদ্ধ মেনে-নেওয়ার নিষ্ক্রিয়তা ছাড়িয়ে চোখে-দেখার জগৎটাও এখানে বিস্তৃত এবং অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। বলা বাহুল্য, যাঁর মন মূলত বহিরাশ্রয়ী, ধারণা-তৈরির খেলায়, অর্থাৎ, চিন্তা নিয়ে চিন্তা করায়, তিনি হয়তো ততটা মজা পান না ; ছবি-আঁকাতেই তাঁর আনন্দ, অনুভূতিকে প্রকাশ করতে পারলেই তাঁর নিষ্কৃতি। শেষের দিকের রচনায়, কিন্তু, জীবনানন্দ সমাজচিন্তায় ভাবিত এবং চিন্তাবস্তুকে আবেগগ্রাহ্য ক'রে তোলায় সচেষ্ট হয়েছিলেন।

'পৃথিবীর পথে গিয়ে কাজ নেই'—এই কথা ব'লে সমস্ত সাংসারিক উৎসাহে এবং উদ্যমের দিকে পাশ ফিরে 'জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ' যিনি জ্ঞাপন করেছিলেন, বলা বাহুল্য, সেই কবির মনোবিপ্লব রাতারাতি সংঘটিত হয় নি। লোকালয়ের সমুদ্রতীরে দাঁড়িয়ে, বিগত মহাযুদ্ধের বিক্ষুব্ধ আবর্তে, জীবনানন্দ দাশ প্রথম-প্রথম খুবই অস্বস্তি অনুভব করেছিলেন। সন্ধিকালের কবিতাগুলি, তাই, কখনো পরিহাস-তরল, কখনো-বা সামাজিক বৈপরীত্য এবং অসংলগ্নতার বোধে জটিল। কিন্তু এ-অবস্থাটা স্বল্পকালস্থায়ী হয়েছিল। কেননা, অপরাপর কবির মতো জীবনানন্দের কাছে বিগত মহাযুদ্ধ পক্ষনির্বাচনের সমস্যা হয়ে দেখা দেয় নি, দেখা দিয়েছে 'মধ্যম পথে' রুদ্ধগতি হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার যন্ত্রণায়, 'একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে' এবং তার জায়গায় 'আর একটি পৃথিবীর দাবি' স্থির করার কর্তব্য হিসেবে, সর্বোপরি, বেদনার্ত বাংলাদেশের হয়ে এবং সবকিছু জড়িয়ে মানুষের সৌন্দর্যচেতনার তিরোভাবজনিত দুরাবস্থারূপে :

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় নিস্তব্ধ নিস্তেল।
সূর্য অস্তে চ'লে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে?
আলুলায়িত হয়ে চেয়ে থাকে—কিন্তু কর তবে?
হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই ; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্য পটলচেরা চোখের মানুষী।
হতে পেরেছিল প্রায় ; নিভে গেছে সব।

এখানে 'বনলতা সেনে'র ঘোর কেটে গেছে। ছবি এঁকে, গতস্য শোচনায় অবগাহন ক'রে মাঝপথে বিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকায় আর তৃপ্তি নেই। যে-পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে, যাক ; নূতন পৃথিবী-নির্মাণ কি একেবারেই অসম্ভব? জীবনানন্দ 'গ্রন্থকে বিশ্বাস করে' পড়লেন, কিন্তু সেখানে কোনো আলোক পেলেন না : 'বিবর্ণ জ্ঞানের রাজ্য কাগজের ডাঁইয়ে পড়ে আছে।' প্রকৃতির কাছে আশ্রয় খুঁজলেন, সেখানে দেখলেন —হিংসা :

প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্নার জল দেখে তার পর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হয়ে আছে ব'লে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায় ...

নূতন পৃথিবী-নির্মাণে, অতএব, জীবনানন্দ বুঝলেন গ্রন্থ বা প্রকৃতি কেউই সাহায্য করবে না : 'ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে।'

আলোকের আশায় জীবনানন্দ মানুষের কর্মরাজ্যে প্রবেশ করলেন, তাকালেন শিল্পীদের দিকে। ক্ষুব্ধচিত্তে দেখলেন, 'কোনো আমলকী নেই আজ আর শিল্পীর নির্জন করতলে।' আরো বৃহত্তর পরিবেশে 'ভোট দিয়ে জনমতামতে মিশে' গিয়েও বুঝলেন 'কোথাও প্রীতি নেই।' হতাশ না হয়ে অতঃপর তিনি সমাজকর্মীদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন, সেখানেও উৎসাহ পাওয়া গেল না। তারা সব 'স্টালিন, নেহরু, ব্লক, অথবা রায়ের বোঝা ব'য়ে' বেড়াচ্ছে ; 'নকল সৈন্যের যত কলরব পাঁচালীর দেশে' ; বুলিসর্বস্ব পায়রার মতো মনে হল তাদের :

... মাঠে ময়দানে
কথা ব'লে জীবনের বিষ তারা ঝেড়ে ফেলে দিতে চায় আজ ;
অল্পায়ু হিমের দিন ততোধিক মিহিন কামিজে
কাটাতেছে যেন অগণন গিরেবাজ।

তবে কি বিপ্লবেই মুশকিল আসান হবে? জীবনানন্দ স্বীকার করেন :

চক্রাকারে ঘুরে গিয়ে কাল
সহসা খিঁচড়ে উঠে খচ্চরের মতন ফলত
অন্য কোনো জ্যামিতিক রেখা হতে পারে

কিন্তু তাতেও তাঁর মতে, সমস্যার সমাধান হবে না। কেননা বিপ্লব মানে 'মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সংগম' ; বর্তমান সমাজের ভোঁতামি আর ভাবী সমাজ-পরিকল্পনার নয়নাভিরাম হৃদয়হীনতার দ্বান্দ্বিক সংঘর্ষ ; ফলে যে-সমাজ সৃষ্ট হবে তাও তো আজকের মানুষকে কোনো বিশ্বস্ত আশ্রয় দিতে পারে না।

অতএব, জীবনানন্দ অনুধাবন করলেন, নিজের মন ছাড়া কারো উপরেই নির্ভর করা চলে না : 'পৃথিবীতে নেই কোনো বিশুদ্ধ চাকরি।' আর, যেহেতু জীবনকে অস্বীকার করে জীবিত থাকা অসম্ভব, ঈশ্বরসাধনাও কোনো কাজের কথা নয়। মৃত্যুহীন কৃষক আর প্রবহমান ইতিহাসের কাছ থেকে, যারা তাঁর চেতনায় শুরু থেকেই অস্পষ্টভাবে উপস্থিত, জীবনানন্দ বেঁচে থাকার নির্মোহ নূতনতর প্রেরণা পেলেন। পুনরায় বুঝলেন :

... জীবনকে সকলের তরে ভালো ক'রে
পেতে হ'লে এই অবসন্ন ম্লান পৃথিবীর মতো
অম্লান, অক্লান্ত হয়ে বেঁচে থাকা চাই।
একদিন স্বর্গে যেতে হ'তো

এই নতুন ক'রে পাওয়া পুরোনো উপলব্ধি নানা স্থানে তিনি প্রকাশ করেছেন। যেমন, 'আরেকটি পৃথিবীর দাবি স্থির ক'রে নিতে হ'লে লাগে সকালের আকাশের মতন বয়স।' জীবনানন্দ যা বলতে চান তা হয়তো এই যে বেঁচে থাকতে হ'লে দরকার সহিষ্ণুতা আর প্রত্যয় ; যে-অবিচলতা নিয়ে কৃষক তার মাঠ আর বলদের মধ্যে হাজার হাজার সাম্রাজ্যের উত্থান-পতনকে অগ্রাহ্য ক'রে লাঙলে নিযুক্ত রয়েছে, সেই স্বধর্মনিষ্ঠা। জীবনানন্দের কাছে, এখানে উল্লেখ করা দরকার, কৃষক সর্বদাই মাটি, আকাশের সগোত্র।

কোথাও শান্তির কথা নেই তার, উদ্দীপ্তিও নেই ;
একদিন মৃত্যু হবে, জন্ম হয়েছে ;
সূর্য উদয়ের সাথে এসেছিল খেতে ;
সূর্যাস্তের সাথে চ'লে গেছে।
সূর্য উঠবে জেনে স্থির ঘুমায়ে রয়েছে।

কৃষকের দৃষ্টান্ত সমস্যাকে এড়িয়ে যাবার প্রতারণা নয়, বিভ্রান্ত মানুষের কানে স্থির এবং সৃষ্টিশীল হয়ে ওঠার ইঙ্গিত। ইতিহাসেও জীবনানন্দ অনুরূপ সত্যের সন্ধান পেলেন : 'নব-নব মৃতুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় ক'রে...আছে আছে আছে—এই বোধির ভিতরে চলেছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি, মানুষের বিষয় হৃদয়...।'

যা ঘ'টে গেছে তার সঙ্গে যা ঘটছে এবং ঘটবে তার যোগসূত্র খুঁজে না পেলে ইতিহাসবোধ নেহাৎ ভূতুরে অনুভূতির জন্ম দেয়। এই প্রত্যয়, অবশেষে, জীবনানন্দকে স্থিতাবস্থার বিশ্লেষণে সাহায্য করল। লোভহিংসা-রক্তক্ষয়দুষ্ট সমাজের দিকে তাকিয়ে তিনি এক লহমায় উপলব্ধি করলেন যে আধুনিক মানুষের ব্যবহার যন্ত্রের মতোই নিখুঁত এবং যন্ত্রের মতোই প্রাণহীন ; কথায় এবং কর্মে সত্যকার আত্মীয়তা না থাকায় তাদের উচ্চারিত প্রত্যয়গুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসার শব্দাড়ম্বর মাত্র। আজকাল দর্শনবিজ্ঞান-নীতিশাস্ত্রের অন্তর্গত অনেক গুরুভার শব্দ এবং একাধিক বিমল সিদ্ধান্ত আমাদের দৈনন্দিন আলাপ-আলোচনাকে অলংকৃত করে ; আমরা অনেক কিছু জানি, মানি এবং বুঝি ; জ্ঞানের রাজ্যে আপাতত আমরা অনেক দূর অগ্রসর। এ-কথা স্বীকার্য, জীবনানন্দ বলেন, অর্জিত বুদ্ধি আমাদের উপকরণ বর্ধিত করেছে, মার্জিত করেছে, চতুরালি শিখিয়েছে, কিন্তু প্রয়োজনের সময়, ব্যবহারিক জীবনে, দুর্ভিক্ষে-রাষ্ট্রবিপ্লবে, তার নির্দেশ কি আমরা গ্রাহ্য করেছি? করি নি ; ফলে, জ্ঞান আজ শুধুই খবর-জানা, জ্ঞান আর কল্যাণকর্মের নির্দেশক নয়। তাই যদি হ'ত তা হলে পৃথিবীর সান্নিপাতিক হিংসাদ্বেষ কলকোলাহলের অবসান আমরাই স্বচক্ষে দেখে যেতে পারতাম। কেননা, চার দিকের শেষহীন বিরোধবিসংবাদ সত্ত্বেও আমাদের প্রত্যেকের মনে সুস্থভাবে বাঁচবার সাধ এবং সংকল্প রয়েছে :

ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায় ;
তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে ; মানুষের মন
জানে জীবনের মানে ঃ সকলের ভালো ক'রে জীবন যাপন।
কিন্তু সেই শুভ্র রাষ্ট্র ঢের দূরে আজ।
চারিদিকে বিকলাঙ্গ অন্ধ ভিড়—অলীক প্রয়াণ।
মন্বন্তর শেষ হলে পুনরায় নব মন্বন্তর ;
যুদ্ধ শেষ হয়ে গেলে নতুন যুদ্ধের নান্দীরোল ;
মানুষের লালসার শেষ নেই ;
উত্তেজনা ছাড়া কোনো দিন ঋতুক্ষণ
অবৈধ সংগম ছাড়া সুখ
অপরের মুখ ম্লান ক'রে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ
নেই।

মানুষ যদি সত্য-সত্যই জীবনকে ভালোবাসে, সৎ সুন্দর সমবায়িক জীবন-যাপনের আকাঙ্ক্ষা হয়, তবে কেন এই পৌনঃপুনিক মন্বন্তর, এই অশ্লীল উত্তেজনা, হিংসার নখদন্ত? ক্রান্তদর্শী জীবনানন্দ এ-প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন। তাঁর মতে আজকের মানুষ শুধু ধ্বনিময় শব্দই শিখেছে, শব্দের অন্তঃসার কি ব্যঞ্জনা তার অনুভূতিতে সঞ্চারিত হয়নি। কর্মের তাৎক্ষণিক প্রেরণা আবেগ। আধুনিক মানুষের ক্রিয়াকর্মের পিছনে যে-আবেগ চালকের আসনে রয়েছে, প্রায়শই তা কবন্ধ, বুদ্ধিবর্জিত। পক্ষান্তরে, আমাদের জ্ঞানবিজ্ঞানলব্ধ বুদ্ধি আবেগের দ্বারা পরিশীলিত তথা সক্রিয় হয়ে শুভবুদ্ধিতে রূপান্তরিত হচ্ছে না। প্রেমের অভাবে আমাদের জ্ঞান অর্থময় এবং জ্ঞানের অভাবে আমাদের প্রেম কার্যকরী না হওয়াতেই সাধের সঙ্গে সাধনার এত বিরোধ, বাচনের সঙ্গে ব্যবহারের ঃ

আমরা এ-পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।
মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া ; বিশেষণ ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল ;
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।
অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু
আমাদের এই শতকের
বিজ্ঞানে তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু ;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই ব'লে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে ; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

এ-যুগের সমাজসংকট জীবনানন্দ দাশের কাছে অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক অব্যবস্থার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম ব'লে মনে হয় নি, আধুনিক মানুষের যান্ত্রিক হৃদয়হীনতাই তাঁর কাছে সবচেয়ে ভয়াবহ এবং শোচনীয় ব'লে মনে হয়েছে। 'হৃদয়কে না জাগালে', মানুষের অন্তর্লোকের 'মানব'কে 'ভোর, পাখি অথবা বসন্তকালে'র সৌন্দর্য সম্বন্ধে পুনরায় অবহিত করতে না পারলে, কিছুতেই আর মুক্তি নেই—এই বাণীই তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন ;

এবং তার চাইতেও বেশি কিছু, সৌন্দর্য কাকে বলে তার অতুলনীয় নমুনা দিয়ে। সেই সৌন্দর্য শুধু চোখেরই নয়, মনেরও।

ফলত, জীবনানন্দ দাশের সামগ্রিক কাব্যসাধনা প্রেম ও জ্ঞানের সমন্বয়-প্রয়াস। জ্ঞান এবং প্রেম, ইতিহাস এবং নারী, স্মৃতি এবং সাধ—তাঁর কাব্যে একাত্ম, অবিভক্ত এবং সমার্থবাচক। প্রেমই, তাঁর মতে, সমুদয় মনুষ্যকর্মের উদ্দীপক, জীবনের সর্বশ্রেষ্ঠ পারমিতা। এই বোধ যেহেতু জ্ঞানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গ, তাই, যৌন একাগ্রতার চাইতে বিস্তারিত, জীবনানন্দ-কল্পিত নারীরা কদাচিৎ রক্তমাংসের, এই বোধ মনে হয় জীবন-ও-জগৎ-লীন হয়ে থাকার অনুভূতি, মাটির সঙ্গে আকাশের সঙ্গে একাত্ম অভিভূত হয়ে থাকার বিমিশ্র মরমী আনন্দ। যে-অন্ধকারের দিকে জীবনানন্দের কবিতা আমাদের টেনে নিয়ে যায়, যেটা আমার কাছে তাঁর কবিতার সবচেয়ে বড়ো আকর্ষণ, তাও এই প্রেম-প্রজ্ঞার মিশ্রিত-বোধ। 'নিঃসৃত অন্ধকার রাত্রির মায়ের মতো', 'নিবিড় ঘাসমাতার শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার', 'অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে', 'একান্তের অন্ধকারে অন্তঃশীল', 'মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার', 'স্নিগ্ধ আঁধার', 'অন্ধকার সনাতনে ডুবে যাওয়া—কিন্তু মরণের ঘুম নয়', 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা', 'থাকে শুধু অন্ধকার মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'—ইত্যাদি পঙ্‌ক্তির ইঙ্গিত, জীবনানন্দের ভাষাতেই বলতে গেলে, 'বাইরের জীবন থেকে সত্যিকারের জীবনে পালিয়ে যাওয়া', 'যে-জীবন অন্তর্লোকের অনুভূতিময়, 'উজ্জ্বল সময়স্রোতে' ভেসে থাকার চেতনায় সৎ, সাধু এবং সুন্দর। এই জীবনের স্বাদ না পেলে মহৎ মানুষ এবং সমাজ সৃষ্টি অসম্ভব।

আর, জীবনানন্দের কাছে জ্ঞান মানে পূর্বাপর সমগ্র মানবজাতির কর্ম-ভাবনার আবছায়া ; স্থূল গ্রন্থ নয়, বরং ধূসর পাণ্ডুলিপি ; কখনো-বা কতিপয় মেধাবী মনীষীর মুখাবয়ব। এটা ঠিক সুস্পষ্ট ইতিহাসচেতনা নয়, কেননা ইতিবৃত্তের প্রতি তাঁর কোনো হিসেবী উৎসাহ নেই, কিন্তু যেটা ইতিহাসের অন্তঃসার, একটা জন্মজন্মান্তরের শাশ্বত যাত্রীর বেদনা, একটা যোনিচক্রস্মৃতির প্রদাহ, উত্তরাধিকার বোধ—জীবনানন্দের কাব্যে তা প্রথমবধি উপস্থিত। যুদ্ধে নয়, আস্ফালনে নয়, আশায় ভালোবাসায় 'সকলের ভালো ক'রে জীবনযাপন' সম্ভব। স্বভাবতই দুর্যোগের দিনে জীবনানন্দ আমাদের প্রেমিক হ'তে উপদেশ দিয়েছেন, বিশ্বাস রাখতে বলেছেন 'জীবনের যতিহীন প্রগতিশীলতা'য় :

আমাদের আশা ভালোবাসা ব্যথা রণঘড়ি সূর্যের ঘড়ি
চিন্তা বুদ্ধি চাকার ঘুরনি গ্লানি দাঁতালো ইস্পাত
খাটিকটা আলো উজ্জ্বলতা শান্তি চায় ;
জলের মরণশীল চ্ছলচ্ছল শুনে
কম্পাসের চেতনাকে সর্বদাই উত্তরের দিকে রেখে
সমুদ্রকে সর্বদাই শান্ত হতে বলে
আমরা অন্তিম মূল্য পেতে চাই—প্রেমে ;
পৃথিবীর ভরাট বাজার ভরা লোকসান
লোভ পচা উদ্ভিদ কুষ্ঠ মৃত গলিত আমিষ গন্ধ ঠেলে
সময়ের সমুদ্রকে বার-বার মৃত্যু থেকে জীবনের দিকে যেতে ব'লে।

এত বড়ো প্রেমিক, আস্তিক এবং সত্যবাদী কবি আমাদের দেশে অল্পই জন্মেছেন।

জীবনানন্দ দাশ

রঞ্জিত সিংহ

১.

জনপ্রিয়তা সম্পর্কে এলিয়টের বিখ্যাত উক্তি যাঁদের জানা আছে, জনপ্রিয় কবিকে বঙ্কিম কটাক্ষে না দেখে তাঁদের উপায় নেই। কারণ সৎ কবির মতো সৎ পাঠকও হামেশা জন্মগ্রহণ করেন না। বস্তুত, পাঠক-অনটনের এই দারুণ সমস্যা মেটানোর জন্য পাউণ্ডকে একদা কোমর বাঁধতে হয়েছিল। তাঁর নানা প্রস্তাবের মধ্যে যেটি আমাদের বিশেষভাবে স্মরণ্য, তা হচ্ছে, কবিতার বিচারে অস্পষ্ট, দ্ব্যর্থক ও তথাকথিত মতামতের কোনো দাম নেই। সমালোচনার ভ্রান্তিকর পরিভাষার অলিগলিতে ঘুরে না বেড়িয়ে স্পষ্টভাবে যিনি তাঁর মতামত ব্যক্ত করতে পারেন কাব্যবিবেচকের উপাধি তাঁরই সাজে।

জীবনানন্দের কবিতাবিচারে পাউণ্ডের উক্তির উপযুক্ততা কোথায় সে সম্পর্কে সন্দিগ্ধ হবেন তিনিই—জীবনানন্দের উপর প্রকাশিত তাবৎ আলোচনা সম্পর্কে যিনি সম্পূর্ণ জাগ্রত নন। অবশ্য বর্তমান লেখক একথা কখনোই মনে করে না যে এই লেখা পাউণ্ড-উক্ত কাব্যবিবেচনার সাক্ষ্য বহন করছে। প্রকৃতপক্ষে, জীবনানন্দকে কেন্দ্র করে এত বেশি পরস্পরবিরোধী কথাবার্তা কানে এসেছে, যার ফলে কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর আসনটি চিনে নেওয়া যে কোনো আলোচকের পক্ষে দুরূহ।

জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরা পালক' যখন ১৯২৮ সালে প্রকাশিত হয়, বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে যতীন্দ্রনাথ-নজরুল-প্রেমেন্দ্র মিত্র তখন সূর্যাবর্তের অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ থেকে মুক্ত হওয়ার সর্বান্তঃকরণ প্রচেষ্টায় নিযুক্ত, যদিও পরিণামে তাঁদের আত্মবিলোপ ঘটল রবীন্দ্রনাথেই। অপর প্রান্তে সুধীন্দ্রনাথ দত্ত-অমিয় চক্রবর্তী-বিষ্ণু দে তাঁদের কবিতাচর্চা সবে শুরু করেছেন। যতীন্দ্রনাথের মরুভূমির ঊষরতা, নজরুলের ভাঙনের গান বা প্রেমেন্দ্রের অ্যামিবা বা ইলেকট্রন ইত্যাদি বিষয় তাৎকালিক কাব্যপ্রসঙ্গে প্রথাবিরুদ্ধ সন্দেহ নেই। কিন্তু ধারণা ও ধৃতির অমোঘ যোগফল যেহেতু ভালো কবিতা জন্মগ্রহণের শুভমুহূর্ত তাই ঐ কবিকুল বুঝতে পারেন নি যে শুধু প্রসঙ্গের পরিবর্তনেই ভালো কবিতার সন্ধান মেলে না। অপরপক্ষে বাঙলা কবিতায় রোমান্টিক ও নব্যক্ল্যাসিসিস্টদের মধ্যবর্তী কবি হিশেবে জীবনানন্দের স্থান নির্ণয় করতে গিয়ে যাঁর নাম আমার মনে পড়ে, তিনি ডব্লু. বি. ইয়েটস। অবশ্য কাব্যাত্মার মিল খুঁজে পেয়ে জীবনানন্দ প্রসঙ্গে যে ইয়েটসের নাম স্মরণ করি নি, বিবেকী পাঠক অন্তত তা উপলব্ধি করবেন। ঐ ধরনের তুলনা বা বিভাগ কল্পনার জন্য আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির অধ্যাপক-অধ্যাপিকারা নিযুক্ত আছেন।

যুগসন্ধির কবি হলেও ইয়েটসের কবিপ্রতিভা অবিসংবাদিত। পক্ষান্তরে জীবনানন্দ বুদ্ধদেব বসুর মতো প্রগতিশীল ভক্ত পেয়েছিলেন এবং লোকপরম্পরায় শুনেছি, রক্ষণশীল মোহিতলালের পৃষ্ঠপোষকতা থেকেও তিনি নাকি বঞ্চিত হন নি। সজনীকান্ত

দাস তাঁর নামের বিকৃতি ঘটিয়ে বিদ্রূপ করেছিলেন। সমসাময়িক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর সম্পর্কে সম্পূর্ণ নীরব এবং সাম্প্রতিক কবিদের অধিকাংশ জীবনানন্দ দাশের গুণমুগ্ধ। তাছাড়া, সিগনেট-প্রকাশিত জীবনানন্দের 'কবিতার কথা' প্রবন্ধগ্রন্থ তাঁর আত্মসৃষ্টির যে গদ্যসমর্থন—শুধু একথা বললে নিশ্চয়ই এই মৃত কবির প্রতি অবিচার করা হবে। কারণ তাতে এমন সব মতামতও স্থান পেয়েছে, যা কেবল প্রমাণ করে যে ভাগ্যদেবী চিরকাল পরিহাসনিপুণা। আসলে 'প্রেরণা', 'স্বভাবকবিত্ব' ইত্যাদি শব্দ শেষ পর্যন্ত ধোপে টেকে নি। কারণ, আবেগের মুণ্ডপাত করে একটানা লিখে যাওয়ার কৃতিত্ব সম্পর্কে জনসাধারণ যে জনশ্রুতিরই আশ্রয় নিক না কেন, সৎ কবিমাত্রেই জানেন যে কবিতা বহু সংস্কারের ফলশ্রুতি, এবং কলাকৌশলের অভিনবত্ব বহু পরিশ্রমের পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ কবিতার সঙ্কলনে জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপির যে আলোকচিত্র মুদ্রিত আছে তা কিন্তু প্রমাণ করে যে প্রেরণা, আবেগ ইত্যাদি শব্দ তাঁর অভ্যস্ত চৈতন্যের প্রাপ্তি, সমালোচনা-সাহিত্যের বহু ব্যবহৃত তথা পূর্বপুরুষপ্রদত্ত শব্দাবলি। আসলে ঐসব শব্দ প্রয়োগের পিছনে কতখানি চিন্তা যুক্ত আছে, সেসব খতিয়ে দেখবার এই পরিশ্রমবিমুখতা সাহিত্যবিবেচক সম্পর্কে বর্তমান আলোচনার শুরুতেই পাউণ্ডের বিখ্যাত উক্তিকে আমার স্মরণ্য মনে হয়েছে। যাই হোক, 'কবিতার কথা' থেকে আমরা জানতে পারি, প্রেমেন্দ্র মিত্রের কাব্যস্বভাবে আত্মস্থতার অনুপস্থিতি জীবনানন্দকে পীড়িত করেছিল। এবং জনপ্রিয়তার নিরন্তর করতালির মধ্যে এযাবৎ লক্ষ করা আমাদের সম্ভব হয় নি যে সেই দুর্লভ আত্মস্থতা জীবনানন্দের নিজের কবিতায় কতটা বজায় থেকেছে। তবু একথা সত্য, 'জনপ্রিয়তা' শব্দে ধার না থাকলেও ভার আছে। কিন্তু জনপ্রিয়তায় কর্ণপাত করে কবিতা রচনার ব্যাপারে যে কবি পূর্বপরিকল্পনার আশ্রয় নেন, তিনি যে চিরকালের জন্য পথে বসেন, সে ধারণায় বিবেচকেরা দ্বিমত নন।

যুগসন্ধির কবিদের কাছে পাঠকের কী প্রত্যাশা—তার অনুসন্ধানে বসলে ইংরেজি কবিতায় দেখি হপকিন্স, ইয়েটস এমন কি পাউণ্ডের চেয়ে এলিয়টের কবিতা নিঃসন্দেহে অনেক পরিণত, এমন কি অডেনেরও। এই ঘটনা প্রমাণ করে যে উত্তরসূরির কৃতিত্বে পূর্বসূরিরই স্থায়িত্ব পাকা হয়। প্রকৃতপক্ষে, যুগসন্ধির যিনি কবি তাঁর দায়িত্ব খুবই গুরুত্বপূর্ণ—এইসব তুলনার তর্জনীসঙ্কেত সেই দিকে। কারণ ভিক্টোরীয় কবিদের প্রথানুমোদিত ছন্দে হপকিন্স যে আস্থা খুইয়েছিলেন তার প্রধান কারণ এই নয় যে সেকালে ঐ ছন্দের কোনো আকর্ষণ ছিল না। আসলে ছন্দের বিধিনিষেধকে বিচলিত করে দিয়ে হপকিন্স যে 'স্প্রাং রিদম্'-এর জন্ম দিয়েছিলেন তাতে কথ্যছন্দের ধ্বনিগুণকে মর্যাদা দেওয়াই তাঁর লক্ষ্য ছিল। ছন্দের খাতিরে শব্দের সুবিধাবাদী বিকৃতি যে জৌলুস আনুক না কেন, মিল্টন অথবা রোমান্টিকদের চেয়ে শেক্সপীয়রের শ্রুতিধ্যান যে প্রকৃত মর্যাদাবান, 'স্প্রাং রিদম্'-এর স্রষ্টা হিশেবে হপকিন্সের কবিচৈতন্য তা অনুভব করেছিল। এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো যে আর. ডাব্লু. ডিক্সনকে লিখিত একটি চিঠিতে 'স্প্রাং রিদম্'-এর আদি উৎসের সন্ধান দিতে গিয়ে 'Samson Agonistes'-এ ব্যবহৃত মিল্টনের mounted rhythm-এর কথা হপকিন্স উল্লেখ করেছিলেন। মিল্টন যে 'স্প্রাং রিদম্'-এর অন্তর্নিহিত অভিপ্রায়ে যথেষ্ট সজাগ ছিলেন—এমন ধারণাও হপকিন্স প্রকাশ করেন। মিল্টন কেন ঐ অভিপ্রায়কে পূর্ণতা দিতে পারেন নি—সে সম্পর্কে হপকিন্স উচ্চবাচ্য না করলেও এলিয়টের পর আমাদের আর একথা বলতে দ্বিধা নেই যে মিল্টনের শ্রুতিবোধে [illegible] শব্দবোধই অন্তরায় ছিল। লক্ষ করাও গেছে, ভবিষ্যতের কবি ও কাব্যপাঠকের [illegible]

মিল্টন অপেক্ষা শেক্সপীয়রের শ্রুতিধ্যানই বেশি মর্যাদা পেয়েছে। এলিয়ট 'স্প্রাং রিদম্'-কে গ্রহণ করেন নি বটে, কিন্তু ঐ ছন্দোসৃষ্টির উদ্দেশ্য সম্পর্কে সজাগ ছিলেন বলেই তাঁর পক্ষে লেখা সম্ভবপর হয়েছিল :

'Grishkin is nice : her Russian eye
Is underlined for emphasis ;
Uncorseted, her friendly bust
Gives promise of pneumatic bliss.'

('Whispers of Immortality'—Poems 1920)

সমস্ত দেশের ইতিহাসেই মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের কিছু কিছু সামান্য লক্ষণ পাওয়া যায়—ইতিহাসের ছাত্রেরা তা জানেন। সাহিত্যের ইতিহাসও উক্ত সিদ্ধান্তের ব্যতিক্রম নয়। এক দেশের সাহিত্যের ইতিহাস অনেক সময় অন্য দেশের সাহিত্যের ইতিহাস বোঝায় সাহায্য করে। এবং ধারণা ও ধৃতির যে যোগফল ভালো কবিতার পক্ষে আবশ্যিক, অক্লান্ত চেষ্টাতেও তার সন্ধান পান নি যতীন্দ্রনাথ-নজরুল-প্রেমেন্দ্র মিত্র। পক্ষান্তরে হপকিন্স বা ইয়েটসের বিবেক-বিবেচনা না পাওয়া গেলেও, যুগসন্ধির কবির নিষ্ঠা ও প্রবণতা জীবনানন্দে সুস্পষ্ট। মন্তব্যটি বিশদতার অপেক্ষা রাখে। চিঠিপত্রে ও কবিতায় 'স্প্রাং রিদম্'-এর উদ্দেশ্য ও প্রয়োগে সমানুপাতিকভাবে যে শৈল্পিক সচেতনতা হপকিন্স দেখিয়েছিলেন অথবা প্রারম্ভিক পর্বের 'কেল্টিক গোধূলি'র বিবশতা থেকে সচেতনভাবে উদ্ধার করে পরবর্তী কবিতার শিকড় ব্যাপ্ত জীবনের গভীরে ছড়িয়ে কবিতায় ইয়েটস যে নৈরাত্ম্যসিদ্ধি (Negative Capability) লাভ করেছিলেন সেই সচেতনতা জীবনানন্দের ছিল কি? জীবনানন্দের গদ্যভাষণে যদি বা ঐ জাতীয় পরিবর্তনপ্রবণতার ইঙ্গিত ছিল, কবিতা রচনার বাস্তব ক্ষেত্রে প্রায় সর্বত্র তাঁর ছিল মানসিক দ্বিধা বা বলা যায় একরকমের খামখেয়ালিপনা। পরিবর্তনের দিকে চার কদম এগিয়ে তিনি হঠাৎ দু কদম পিছিয়ে যেতেন। এই আলোচনার অগ্রসৃতির সঙ্গে সঙ্গে আমার পর্যবেক্ষণের যৌক্তিকতা আরো পরিষ্কার হবে।

'নগরীর মহৎ রাত্রিকে তার মনে হয়
লিবিয়ার জঙ্গলের মতো
তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।'

('রাত্রি'—সাতটি তারার তিমির)

উপরের উদ্ধৃত পংক্তিগুলিতে যাথার্থ্য, প্রবহমানতা ও নৈরাত্ম্যতার সমবায় যখন আবিষ্কার করি, তখন ভাবতে অবাক লাগে যে এই কবিচিত্তই আবার অর্গলমুক্ত আবেগপ্রবাহে অবগাহন করে যথেষ্ট আনন্দ ও আত্মতৃপ্তি পেয়ে গিয়েছেন। বিশেষত, আলোচ্য পংক্তি চতুষ্টয়ের প্রবহমানতায় গদ্যভূমিক শব্দ-ক্রিয়াপদ-অব্যয়ের যথোচিত ব্যবহারে কথ্যছন্দের প্রতি কবির আগ্রহকেই লক্ষ করি। 'আজ এই রাস্তার গান গাইব'—এই ধরনের অত্যন্ত শাদামাঠা শব্দ প্রয়োগ করেও প্রেমেন্দ্র মিত্র কথ্যছন্দ তথা আধুনিকতার যথার্থ রাস্তা চিনে নিতে পারেন নি। অধিকন্তু, একটি দুঃসহ নিঃসঙ্গতার ব্যর্থতাবোধে উটের গ্রীবার সাদৃশ্যচিন্তায় যে প্রতীকী চিত্রকল্পের উদাহরণ 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় জীবনানন্দ রেখে গিয়েছিলেন তা নিশ্চয়ই তাঁকে স্মরণীয় করে

রাখবে। বস্তুত, যে বিক্ষিপ্ত গুণাবলির জন্য জীবনানন্দ আজ আমাদের স্মরণে আছেন, 'দি ওয়েস্টল্যান্ড' কবিতাবলি সেইসব গুণের পূর্ণাঙ্গ রূপ। অথচ সে আধুনিকতা জীবনানন্দকে যথেষ্ট পীড়িত করেছিল। এমন কি ঐ কাব্যগ্রন্থ সম্পর্কে এ কথাও তিনি বলেছিলেন—'বিশেষ সময় চিহ্নের ছাপ তার উপর এমন জাজ্বল্যমান যে আজ না হোক, কাল অন্তত ফিকে হয়ে যাবে।' অবশ্য আলোচ্য মন্তব্যে সাহিত্যপাঠকের মন মজুক বা না মজুক, এ ধরনের কথাবার্তা মনস্তত্ত্ববিদের কাছে যে বিশেষ উপাদেয় তাতে সন্দেহ নেই। আর যাই হোক, নিজের নাক কেটে অপরের যাত্রাভঙ্গের নীতি জীবনানন্দের মুখে যে শুনব, তা আশা করি নি। কারণ যাঁরা তাঁর ব্যক্তিগত সান্নিধ্যে এসেছিলেন, এমন দু-একজনের মুখে শুনেছি, তিনি নাকি প্রায় সর্বপ্রকার রিপুর আক্রমণ উপেক্ষা করতে পেরেছিলেন। অথচ আমাদের আলঙ্কারিকরাও এইটি বুঝতেন যে সঞ্চারীর (আধুনিক ভাষায় যাকে বলা যায় 'কালজ্ঞান') সহযোগ ব্যতীত কোনো স্থায়িভাবই কাব্যরসবস্তুতে পরিণত হতে পারে না। উপরন্তু, জীবনানন্দের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার যে চিত্রকল্প নিয়ে এত কথা উঠল, সেই কবিতার আদ্যন্ত পাঠে এমন সব কথাও মনে জাগতে পারে, যা হয়তো 'দি ওয়েস্টল্যান্ড' সম্পর্কিত জীবনানন্দের মতামতের বিরোধিতা করে না। অবিমিশ্র অনুভূতি আমাদের সুস্থ চেতনায় আসে না বলেই নব্যক্ল্যাসিকাল রীতির কবিতামাত্রই মিশ্রানুভূতির প্রাপ্তি। সঙ্গে সঙ্গে এ প্রশ্ন জাগা স্বাভাবিক, জীবনানন্দের আলোচ্য কবিতাটিতে মিশ্রানুভূতির যে সংঘট্ট দেখানো হয়েছে তাতে কবির অভিপ্রায় কি সিদ্ধ হয়েছে এবং পাঠকের আকাঙ্ক্ষা কি চরিতার্থ? উটের গ্রীবার দুঃসহতার পরেই—

> 'গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
> আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।'
>
> ('আট বছর আগের একদিন'—মহাপৃথিবী)

আলোচ্য পংক্তি কখনোই প্রমাণ করে না, অনুভূতির যে সামগ্রিকতার জারক রসে বিচিত্র প্রসঙ্গ ও বিভিন্ন ভাবানুষঙ্গ অখণ্ড রসবস্তুতে পরিণত হয়, উপরের ঐ দুই পংক্তিতে তা স্বতঃপ্রমাণ। বিচ্ছিন্নভাবে পংক্তি দুটি কাব্যগুণে সমৃদ্ধ হলেও কবিতাটির সামগ্রিকতায় অতিশয় আরোপিত বলে মনে হয়। কবিতাটির অন্তর্নিহিত বঞ্চনাবোধ ও তৎপরবর্তী মুক্তৈষণা কবির মিশ্রানুভূতির প্রাপ্তি নয়। কবিতাটির অখণ্ডতায় ঐখানেই সীবনকর্মের চিহ্ন দৃষ্টকটুভাবে থেকে গেছে, যা 'দি ওয়েস্টল্যান্ড'-এর মতো তিন শো পংক্তির বিশাল ও বিচিত্র আয়োজনের কোথাও চোখে পড়ে না। কবিদের মৌলিক চিন্তায় এলিয়ট কেন যে অনুৎসাহ দেখিয়েছিলেন, তার তাৎপর্যও হয়তো বা এই জাতীয় ব্যর্থতার মধ্যে লুকিয়ে আছে।

সত্যেন্দ্রনাথের পদাঙ্কেই জীবনানন্দ যে প্রকৃতি বর্ণনায় এত উৎসাহী, 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থে তার দৃষ্টান্ত ছড়ানো। অবশ্য ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ-শেলি-কীট্‌সের প্রভাব থেকে তিনি যে নিতান্ত বঞ্চিত—তাঁকে এমন ভাগ্যহীন মনে করা উচিত নয়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থের 'মৃত্যুর আগে' অথবা 'অবসরের গান' কবিতায় প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ নৈপুণ্যে তাঁর স্বকীয়তা লক্ষণীয়। তাছাড়া রোমান্টিক কাব্যান্দোলনের প্রকরণবিমুখতাও ঐসব কবিতার ভূষণ। না মেনে উপায় থাকে না, জীবনানন্দের এই জাতীয় প্রতিক্রিয়াশীল মনোভাবের হেতুসন্ধানে তাঁর 'কবিতার কথা' গ্রন্থটি বিশেষভাবে কাজে লাগে। সত্যেন্দ্রনাথের প্রকৃতিপ্রেম, প্রেমেন্দ্র মিত্রের ভূগোলজ্ঞান বা বিজ্ঞান-অনুসন্ধিৎসাকে তিনি গ্রহণ করেছিলেন। তদুপরি যে আকর্ষণীয় শব্দকৌশল এবং জনপ্রিয় ধ্বনিস্পন্দন তিনি

তৈরি করেছিলেন, তার পিছনে আর যিনি থাকুন, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন না। 'মানসী'র থেকে তা বটেই কবিতা লেখার গোড়া থেকেই রবীন্দ্রনাথ বরাবর প্রমাণ করেছিলেন যে নতুন অনুভূতির স্পন্দনের সঙ্গে নতুন ভঙ্গির কোনো কলহ নেই। উপরন্তু, মাত্রাবৃত্ত বা স্বরবৃত্ত ইত্যাদি ছন্দের কথা বাদ দিলেও, শুধুমাত্র অক্ষরবৃত্তের সম্ভাবনা যে কতখানি সুদূরপ্রসারী, 'কবিতার কথা'য় জীবনানন্দ সে বিষয়ে যথেষ্ট উৎসাহ দেখালেও রবীন্দ্রনাথের পর সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নামই মনে পড়ে, অক্ষয়বৃত্তের বিচিত্র ধ্বনিস্পন্দন আবিষ্কারে যিনি সমর্থ হয়েছিলেন। অবশ্য 'ঝরা পালক' কাব্যগ্রন্থ বাদ দিলে, প্রায় সারা জীবন অক্ষরবৃত্তে বা অক্ষরবৃত্তের ছাঁচে অধিকতর মাত্রাগত স্বাধীনতা নিয়ে গদ্যছন্দে জীবনানন্দও কবিতা লিখেছিলেন। 'বোধ' আর 'হাওয়ার রাত' কবিতার স্বরগত পার্থক্য এতই সামান্য যে কান দিয়ে নয়, চোখ দিয়ে ধরতে হয় প্রথমটি অক্ষরবৃত্তে ও দ্বিতীয়টি গদ্যছন্দে লিখিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ তথা বাঙলা কবিতার ঐতিহ্যে অনবধানতা দেখিয়ে আধুনিক (সমসাময়িক) কবিরা জীবনানন্দের যদিও ভর্ৎসনাভাজন হয়েছিলেন তবু তাঁর কবিতা পড়েও কারুর মনে হবে না, তিনি রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরি।

পক্ষান্তরে এলিয়টের কাব্যচর্চা 'কাব্যপ্রচেষ্টা'র নামান্তর—এহেন কথা বলে জীবনানন্দ আমাদের অনেক উপকার করেছেন। কবিতার ইতিহাসে জীবনানন্দের স্থান কোথায়—ভবিষ্যৎ পাঠকের একথা বোঝার পক্ষে আলোচ্য মন্তব্য বিশেষ আবশ্যক। রোমান্টিকদের আবেগপ্রধান মর্তাতিশায়ী কবিতা রচনা শুরু হয়েছিল ক্ল্যাসিসিজমের নৈরাত্ম্যতার বিরুদ্ধতা করে এবং নব্যক্ল্যাসিসিজমের প্রত্যাবর্তনও রোমান্টিকদের বিরোধিতায়। জীবনানন্দের সমগ্র কাব্যরীতি এই দুই রীতির মধ্যবর্তী ঘটনা। অবশ্য আত্মসচেতনতার অভাববশত ক্ল্যাসিসিজমের বেশ কয়েকটি গুণ আয়ত্তে এনেও শেষ পর্যন্ত জীবনানন্দ এক অর্থে প্রেমেন্দ্র মিত্রকে অতিক্রম করেছিলেন মাত্র। প্রথম দিকের 'অবসরের গান' অথবা শেষদিককার 'তিমির হননের গান' কিংবা কাব্যজীবনের মধ্য পর্বের রচনা 'বনলতা সেন' কবিতার কথাই ধরা যাক— প্রত্যেকটি কবিতাই আলোচ্য মন্তব্যের উদাহরণ। প্রসঙ্গান্বেষণে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড তোলপাড় না করে নিজের চোখ ও মন দিয়ে জীবনানন্দ যদি তাঁর পরিপার্শ্বকে যাচাই করে দেখতেন তবে, 'হায় চিল' ও 'আট বছর আগের একদিন'-এর মতো কবিতাদ্বয় এক গ্রন্থভুক্ত হওয়া দূরের কথা, এক কবির দ্বারাই রচিত হত না। আসলে চোখ কানের ঝগড়া মেটাতে মেটাতেই জীবনানন্দের সারা জীবন কেটে গিয়েছিল। অর্থাৎ প্রেমেন্দ্র মিত্রের কবিতায় যে 'আত্মস্থতা'র অভাব জীবনানন্দকে পীড়িত করেছিল, খুব অজ্ঞাতসারে সেই দায়ভাগ তাঁর উপরেও বর্তেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ওাও বুঝি যে সব সময়ে এবং সকলের কাছে সব সত্য খুব প্রীতিকর ঠেকে না। ফলে তিরিশের দশকের কবিদের বিদেশি কাব্যপ্রীতির নিন্দায় জীবনানন্দ পঞ্চমুখ হলেও রোমান্টিকদের শত প্রভাব সত্ত্বেও এলিয়টের 'কাব্য প্রচেষ্টা' তাঁকেই সবিশেষ আকর্ষণ করেছিল। এক দুঃসহ নৈরাশ্য ও বঞ্চনার খেদ অনুভব করতে শিখেছিলেন এলিয়টের পদাঙ্কে। কিন্তু তাঁর মন তাতেও স্থিতি পায় নি। ইয়েটস দিয়েছিলেন তাঁকে 'কেল্টিক গোধূলি'র বিষাদ। রোমান্টিকরা তাঁকে শিখিয়েছিলেন আবেগ, বাধাবন্ধহীন আবেগ। তিল তিল সংগ্রহ করে সংস্কৃত কবি তিলোত্তমা গড়েছিলেন বটে, কিন্তু ঐ বিভিন্ন উৎস থেকে গৃহীত বিরোধী লক্ষণগুলিকে জীবনানন্দ তাঁর মনন বা চৈতন্যের মধ্যে মেলাতে পারেন নি। মেলাতে পারেন নি বলেই আলোচনার গোড়ায় বলেছিলাম, কবিতাচর্চার ক্ষেত্রে তিনি চার কদম এগিয়ে দু কদম পিছিয়ে যেতেন। 'বনলতা সেন' লিখতে যে ধরনের মননকে কাজে

লাগানো হয়েছে, 'সুবিনয় মুস্তফী' কবিতার ব্যাপারে তা অন্য ধরনের। এর থেকেও যা মর্মান্তিক তা হচ্ছে, যখন তিনি তাঁর প্রাক্তন কাব্যপ্রকরণকে পরিত্যাগ করে নতুন কাব্যপ্রকরণের অন্বেষণে বেরিয়েছেন এবং পাঠক যখন অত্যন্ত মনোযোগের সঙ্গে এই পরিবর্তন লক্ষ করছেন, তখন এমন দু-একটি কবিতা তিনি লিখে ফেললেন যা তাঁর পূর্ব কাব্যপ্রকরণের কথা স্মরণে আনে। 'সাতটি তারার তিমির'-এর পরবর্তী কবিতাগুলির কথাই আমি বলছি। যে কাব্যধারায় 'লোকেন বোসের জর্নাল' বা 'যাত্রী' কবিতা লিখিত হয়েছে, সে ধারাতে 'তোমাকে ভালোবেসে' বা 'সে' কবিতাও লেখা হল। বিশেষত যে অধ্যায়ে কথোপকথনের ঢঙকে আয়ত্তে আনার জন্য জীবনানন্দ সচেতন প্রবণতা দেখাচ্ছেন, তখন হঠাৎ এই পুরনো মেজাজের কবিতা বিবেচক পাঠককে রীতিমতো বিচলিত করে তুলবে। 'পূরবী'-কবিতার ধারায় 'ক্ষণিকা'-কাব্যভঙ্গি তথা কাব্যমেজাজের প্রত্যাবর্তন কেউ কি ভাবতে পারেন? সুধীন্দ্রনাথের 'দশমী' কাব্য-পুস্তিকাটি যিনি পড়েছেন, তিনি সেখানে আশাই করতে পারেন না তাঁর 'অর্কেস্ট্রা' কাব্যগ্রন্থের 'নাম' কবিতাটির প্রকরণগত বৈশিষ্ট্য তথা মেজাজের হুবহু পুনরাবৃত্তি। কারণ 'নাম' কবিতায় অক্ষরবৃত্তের যে পরীক্ষা করা হয়েছে, 'দশমী'র অক্ষরবৃত্ত সেই সব প্রাক্তন পরীক্ষা-নিরীক্ষারই ক্রমবিকাশ। ফলে সচেতন পাঠকের মনে জীবনানন্দের ব্যক্তিত্ব স্বভাবতই প্রচ্ছন্ন।

উপরন্তু, শেষজীবনে 'বিশ্ববোধ' নামক দার্শনিক চিন্তায় জীবনানন্দ বিশেষভাবে মনপ্রাণ ঢেলে দিয়েছিলেন। সে চিন্তার ফলশ্রুতি যে কাব্যরীতির জন্ম দেয় তা স্বাভাবিকক্রমেই পাঠকের অনাদর কুড়িয়েছে। কারণ 'সংবর্ত', 'যযাতি' অথবা 'ক্রেসিডা' ইত্যাদি কবিতার সঙ্গে পরিচয়ের পর বাঙালি পাঠকের অজ্ঞাত নেই যে এই জাতীয় রূপকল্পের উৎকর্ষ নাটকীয় মুহূর্তের উপস্থিতিনির্ভর। এবং পুনর্বার স্মরণে আসে এলিয়টের অমোঘ বাণী। মৌলিক চিন্তায় কবিদের বিরত থাকতে তিনি উপদেশ দিয়েছিলেন। কারণ 'বিশ্ববোধ'-এর চিন্তা ব্যক্ত করার জন্য কবিতার বিড়ম্বনায় যাওয়ার প্রয়োজন কোথায়!

'ইতিহাস অর্ধসত্যে কামাচ্ছন্ন এখনো কালের কিনারায় ;
তবুও মানুষ এই জীবনকে ভালোবাসে ; মানুষের মন
জানে জীবনের মানে : সকলের ভালো করে জীবনযাপন।'

('এইসব দিনরাত্রি'—জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা,
নাভানা সংস্করণ)

এই ধরনের তত্ত্ব পরিবেশনের যথার্থ মাধ্যম কি গদ্য নয়? কারণ পদ্যের বাহনে হিতোপদেশ শোনানোর প্রচেষ্টা যে-কোনো কবিরই পক্ষেই লজ্জাকর এবং কবিতা-পাঠকের কাছে এসব রচনার অনাদরও তাই অনিবার্য।

আসলে সাহিত্যের আধুনিকতা বিশেষ স্থান-কাল-পাত্রে চিহ্নিত হয়েও আবদ্ধ নয়—অতিশায়ী রসবস্তু। তাই যেমন শেক্সপীয়র আধুনিক তেমনি 'দি ওয়েস্টল্যান্ড' রচয়িতাও। তাহলে আধুনিকতার সামান্য লক্ষণটি কি? যে কবির শ্রুতিধ্যান আমাদের চলিষ্ণু ও অনির্বাধ জীবনের ভাষা ও তার ভঙ্গিকে অনুসরণ করতে পারে, তাঁর রচনাই সব যুগে আধুনিক, অনিঃশেষ তথা কালজয়ী। ঐ জাতীয় কবিতা পড়তে পড়তে সব যুগের পাঠকেরই মনে হবে—'that is how I should talk if I could talk poetry.' এলিয়টের প্রসঙ্গের নতুনত্ব জীবনানন্দের মনকে টানলেও অপরাপর কাব্যপ্রসঙ্গের মতো

এলিয়টের প্রসঙ্গও সাম্প্রতিক। কিন্তু যে প্রকরণের সমানুপাতে প্রসঙ্গ বা উপলব্ধি প্রাণঘন রসসৃষ্টি, তা আধুনিক তথা কালজয়ী। বস্তুত, এলিয়ট যখন বলেন—

Half-past one,
The street-lamp sputtered,
The street-lamp muttered,
The street-lamp said, 'Regard that woman... "

('Rhapsody on a Windy Night'–Prufrock–1917)

তখন এই পুনরাবৃত্তিময়তা এমন এক নিরবলম্ব বিচ্ছিন্নতার পরিবেশ রচনা করে যা কথ্যভঙ্গির গুণে আরো তীক্ষ্ণমুখ শরের মতো সরাসরি পাঠকচৈতন্যে আঘাত আনে। সেই পুনরাবৃত্তিময় ভঙ্গির নজির আছে নিম্নোদ্ধৃত অংশেও—

'অথবা নাইকো ধান খেতে আর ;
ব্যস্ততা নাইকো আর,
হাঁসের নীড়ের থেকে খড়
পাখির নীড়ের থেকে খড়
ছড়াতেছে ; মনিয়ার ঘরে রাত, শীত আর শিশিরের জল।'

('কুড়ি বছর পরে'—মহাপৃথিবী)

এলিয়ট ও জীবনানন্দ —উভয়ের কবিতাতেই পঙক্তির পুনরাবৃত্তির ঢঙ, কিন্তু শিল্পগত উদ্দেশ্যে কত তফাত। যে প্রেরণালব্ধ 'দিব্যানুভূতি'কে মর্যাদা দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছিলেন জীবনানন্দ, সে ধারণা সর্বান্তঃকরণে নব্যক্ল্যাসিকাল রীতি বিরোধী। রোমাণ্টিকরাই সে সব ধারণার পূর্বপুরুষ। ফলে পুনরাবৃত্তিময় পংক্তির হ্রস্বতা ও দীর্ঘতা এলিয়টের কাছে কথ্যছন্দের যে ধ্বনিগুণকে নিয়ে এসেছে, সেই প্রসারণ-সঙ্কোচন বা পুনরাবৃত্তির ঢঙ জীবনানন্দের কাছে লিরিককল্প আবেগমাত্র অথবা তাঁর নিজের ভাষায়, 'বিশুদ্ধ কাব্যের আবেগ'। পক্ষান্তরে এও সত্যি যে জীবনানন্দের 'রাত্রি' বা 'ঘোড়া' কবিতার 'ঘেয়ো কুকুরের অস্পষ্ট কবলে হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস্-রেস্তরাঁতে' ইত্যাদির মতো কবিতা বা কাব্যপংক্তিতে যে দুঃসহ-বিচ্ছিন্ন-অসহায় জীবনের আর্তি প্রতীকত্ব লাভ করেছে, সে চৈতন্যের কাব্যঐতিহ্য খুঁজতে বসলে এলিয়টের 'The yellow fog tht rubs its back upon the window-panes,' অথবা 'Rhapsody on a Windy Night'-এর মতো কাব্যপংক্তি বা কবিতার কথা মনে আসে। কাব্যের ঐতিহ্যের অর্থ এই নয় যে তার পরিধি দেশকালের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এক দেশের কবির পুনর্মূল্যায়ন বা পুনর্জন্ম ঘটতে পারে ভিন্ন দেশের মাটিতে। প্রকৃতপক্ষে, এলিয়টকেও কাব্যঐতিহ্যের সন্ধান পেতে হয়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ে ফরাসি কবি লাফর্গ এবং পরবর্তী অধ্যায়ে 'Ash-Wednesday' ও 'Four Quarters'-এর আমলে ইতালীয় কবি দান্তের মধ্যে। এ ব্যাপারে আত্মলাঘবের কিছু নেই বরং এ মনোবৃত্তি যথেষ্ট স্বাস্থ্যকর। তবে 'কবিতার কথা' পড়ে জানতে পারি, জীবনানন্দ নিজে এ প্রবৃত্তিকে খুব সুনজরে দেখেন নি।

যাই হোক, জীবনানন্দ এইটুকু বুঝেছিলেন, 'বনলতা সেন' যতই জনপ্রিয়তা লাভ করুক না কেন, সে জনপ্রিয়তার আয়ু কোনোকালেই দীর্ঘ হতে পারে না। ফলে, ভঙ্গির পরিবর্তন তাঁর কাছে নিতান্ত অনিবার্য হল। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে পুনর্বার অক্ষরবৃত্তকে যেভাবে কাজে লাগাতে তিনি যত্নবান হয়েছিলেন এবং যে রূপকল্পের আশ্রয় তাঁর কাছে আবশ্যিক মনে হয়েছিল, তাতে বোঝা যায় অতিকথনদুষ্ট রোমাণ্টিক আর্দ্রতা

থেকে এই কবি নিজেকে এখন মুক্ত করতে চলেছেন। কাজে কাজেই তাঁর এই পর্যায়ে কবিতার প্রকরণেও ঘটল যাথার্থ্য, প্রবহমানতা ও কথ্যছন্দ সমন্বিত নব্যক্ল্যাসিকাল রীতির অনিবার্য প্রতিবিম্বপাত। কিন্তু অকস্মাৎ এই গ্রন্থের পরবর্তী রচনায় পুনর্বার প্রাকরণিক প্রতিলোমতা শুধু বিস্ময়করই নয়, এই শিল্পকর্মের ফলশ্রুতি যা দাঁড়াল 'কবিতার কথা'য় সে ব্যাপারের গদ্য সমর্থন রেখে যেতে তিনি চেষ্টা করেছিলেন।—'''অগ্রসর' মানে এক পর্যায়ের থেকে পর্যান্তরে গমন, ফলে মহত্তর কবিতা পাওয়া যেতে পারে, নাও পাওয়া যেতে পারে, কবিতা আগের চেয়ে খারাপও হ'য়ে পড়তে পারে. কিন্তু কবির কবিতার পরিবর্তন হয়েছে বলা যেতে পারে।'' অবশ্য এই অকাট্য যুক্তির স্বপক্ষে বলা যেতে পারে যে কবিতা লিখে জীবনানন্দ বুদ্ধদেব বসুর মতো বুদ্ধিমান ভক্ত পেয়েছিলেন। উপরন্তু তিনি নিজেও ছিলেন ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক। তবে এ জাতীয় পরিবর্তন-প্রীতি মনস্তত্ত্বের জটিলতাই প্রমাণ করে। কারণ যে পরিবর্তনকে মন্দ বলে জেনেছি তাকে লোকচক্ষুর অন্তরালে রাখাই তো বিধেয়, তাকে কে আবার ঢাকঢোল পিটিয়ে বিজ্ঞাপিত করে থাকে! পরিবর্তনপ্রীতি কবির কাছে উপলক্ষ্যমাত্র, লক্ষ্য—ভালো কবিতা লেখা। সুতরাং পরিবর্তনের জন্যই পরিবর্তন সৎ পাঠকের কাছে সব সময়েই মর্যাদাহীন।

তবে এই প্রাকরণিক পরিবর্তনের ব্যাপারে এলিয়টের শিক্ষা ছিল ভিন্ন ধরনের। তাঁর মতে, প্রকাশ কৌশল সম্পর্কে কবির ঘন ঘন মতি পরিবর্তন অভিপ্রেত তো নয়ই, এমনকি এ ধরনের পরিবর্তন, তাঁর মতে, পূর্বসূরির কাব্যপ্রকরণের অন্ধানুকরণের মতোই নিন্দার্হ। অবশ্য এলিয়ট বিদেশি, তাছাড়া জীবনানন্দ আমাদের শিখিয়েছেন, এলিয়টের কাব্যচর্চা 'কাব্যপ্রচেষ্টা'রই নামান্তর। জীবনানন্দের 'পরিবর্তন'-সম্পর্কিত ঐ যুক্তি অনুযায়ী তাঁর শেষের দিকের কবিতার আলোচনায় আমাদের বিরত থাকলেই ভালো হত কিনা জানি না, কিন্তু ঐ কবিতাগুলিকে যেহেতু 'শ্রেষ্ঠ কবিতা' গ্রন্থের তিনি অন্তর্ভুক্ত করেছেন, তখন আমরা পাঠকেরাও নিতান্ত নিরুপায়। অনুভূত রসবস্তুকে পাঠকের মনে সঞ্চার করাকে কবির প্রাথমিক ও প্রধান দায়িত্ব বলে সবাই যদি স্বীকার করেন, তবে একথাও মেনে নিতে হবে যে তাঁর অতিভক্তও শেষের দিকের কবিতাগুলি পড়ে উঠতে পারবেন না। আমি জানি, সত্যের অপ্রিয় অন্বেষণ বুদ্ধিমানের কাজ নয়। অপরপক্ষে এও ঠিক, মানুষের দুটি দুর্বল হাতে সূর্যালোকের প্রবাহ ঢাকা পড়ে না। ফলে, রবীন্দ্রনাথের উদ্ধৃতি তুলে পয়ারের মাহাত্ম্য জীবনানন্দ যতই প্রচার করুন না কেন, একথা তাঁর বিস্মৃত হওয়া উচিত ছিল না যে মাত্রাবৃত্ত ও স্বরবৃত্ত ছন্দকেও রবীন্দ্রনাথই জাতে তুলেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কবিমন গভীরভাবে অনুভব করেছিল যে এর দ্বারা বাঙলা কবিতার অনেক উপকার হবে এবং পাঠকের তো বটেই, কবিদেরও মুখ বদলানোর উপায় থাকবে। ছন্দের এই বিভিন্নতার কথা ছেড়ে দিলেও, 'সংবর্ত' বা 'যযাতি'র মতো কিছু কিছু কবিতা থেকে যায়। আগাগোড়া অক্ষরবৃত্তে লেখা হলেও তাতে অনুপ্রাসকে কোথাও অন্তে, কোথাও মধ্যবর্তী করে ও পর্বের হ্রাসবৃদ্ধির দ্বারা যে সব নাটকীয় মুহূর্তের সংঘট্ট দেখানো হয়েছে তার ফলে অত দীর্ঘ কবিতাও পড়তে গিয়ে কোনোদিন চোখে ঢুলুনি আসে না। শত দুর্বোধ্যতার অভিযোগ সত্ত্বেও 'ল সেপা' বা 'দি ওয়েস্টল্যান্ড' কবিতাদ্বয় সম্পর্কে সুধীন্দ্রনাথ এক সময় যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তাঁর ঐ দুটি কবিতার প্রসঙ্গেও সে মন্তব্যের পুনরুদ্ধার বেমানান হবে না—'বুদ্ধির অনুমতি পাবার বহু পূর্বেই তার (পাঠকের) মুগ্ধচৈতন্য কবিতাদুটির মহত্ত্ব নিঃসঙ্কোচে মেনে নিয়েছে।' জীবনানন্দের শেষের দিকের কবিতাগুলির মধ্যে এমন সব বিচ্ছিন্ন পংক্তি রয়ে গিয়েছে যাতে আশ্চর্যভাবে কথ্যছন্দের ধ্বনিমাধুর্য

আবিষ্কৃত। কিন্তু তাঁর প্রধান দোষ, কবিতায় আগাগোড়া সেই সমতাকে তিনি বজায় রাখতে পারেন নি। এতে কবিতার সামগ্রিক আবেদন অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়েছে। এও ঠিক, পর্বের হ্রাসবৃদ্ধিপ্রভাব নাটকীয়তায় সুধীন্দ্রনাথ যে কৃতিত্ব দেখিয়েছিলেন, দুই পরস্পরবিরোধী কাব্যরীতির দোটানায় পড়ে জীবনানন্দ তাঁর সেই সাধ ও প্রচেষ্টাকে সফল করে যেতে পারেন নি। যেমন, দৃষ্টান্ত হিশেবে উল্লেখ করা যেতে পারে '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটি। তাছাড়া, বড় কথা বলার প্রবণতা শেষের দিকে তাঁকে প্রায় পেয়ে বসেছিল।

রোমান্টিকদের প্রকরণ বিমুখতায় আংশিক জারিত বলেই কিনা জানি না, একমাত্র যে ছন্দে জীবনানন্দ প্রায় সারা জীবন কবিতা লিখেছিলেন, অক্ষরবৃত্তের সেই আইনরক্ষাতেও তিনি বিস্ময়করভাবে উদাসীন। ছন্দোবিপর্যয়ের মধ্যে দিয়ে যদি কোনো মহত্তর উদ্দেশ্য আবিষ্কৃত হয়, তাতে কিছু বলার থাকে না। কিন্তু যেখানে ত্রুটির উৎপত্তি অসাবধানতায়, সেখানে পাঠকের কাছে কবির কী জবাবদিহি থাকতে পারে? জানি, এহেন মন্তব্যে তাঁর গুণমুগ্ধেরা অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করীর উদাহরণ খুঁজে পাবেন। কিন্তু জীবনানন্দ যখন লেখেন—'কালো চোখ মেলে ওই' নীলিমা দেখেছো' কিংবা 'ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে' তখন মনে মৌলিক প্রশ্ন জাগে, ছন্দোরক্ষার জন্য কবিকে দৃষ্টির সাহায্য নিতে হয়, না শ্রুতির? প্রথম পংক্তিতে 'ওই' শব্দটি যদি দু-মাত্রা হয়, কবিতা লিখতে তবে কি শ্রুতির সহযোগ অপ্রয়োজনীয়? আবার এই যুক্তি মেনে নিলে অক্ষরবৃত্তে পাঁচ মাত্রায় 'ধর্মাশোকের' শব্দটি দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে কীভাবে স্থান পায়? তাহলে কি এই সিদ্ধান্তে আসব যে ছন্দের ব্যাপারে নিজের সুবিধে মতো ব্যবস্থা নিতেন জীবনানন্দ? একটি অক্ষরবৃত্তের কবিতায় পাঁচ মাত্রার 'ধর্মাশোকের' শব্দটিতে আমাদের কান খুব খুশি হতে পারে না। তবু 'রেফ'-এর যুক্তাক্ষর-অভিঘাতে শব্দটিকে পাঠক নিজগুণে সহনীয় করে নিতে পারেন। কিন্তু প্রশ্ন হল, আইন ভেঙে শিল্পগতভাবে কবি কি কোনো নতুন ধ্বনিব্যঞ্জনার মাত্রা যোজনা করতে পারলেন? বরং বলব, আইন অমান্য করে কিছু বেআইনী সুবিধে আদায় করেছেন কবি, যার উৎস হয় অসাবধানতা, নয় অলসতা। 'ওই' শব্দটিকে যদি 'ঐ' লেখা হত তাতে কি আমাদের শ্রুতি কোনো তারতম্য অনুভব করত? তার্কিকের সমর্থনে অমিয় চক্রবর্তীর নাম রয়েছে। 'নীহারিকা পাড় বোনা, বিদ্যুতি জরির উত্তবে।' 'বিদ্যুতি' শব্দটিতে উচ্চারণে যুক্তাক্ষরের ধ্বনিগত সুবিধে থাকায় পাঠকের শ্রুতিতে যে অভিঘাত জাগানো হয়েছে, 'বৈদ্যুতিক' বললে সে ধ্বনি খানিকটা প্রসারিত হয়ে আকাঙ্ক্ষিত রসসৃষ্টিতে বিঘ্ন আনত, যদিও জানি 'বৈদ্যুতিক' হলেই ছন্দের আইন বজায় থাকে। অমিয় চক্রবর্তী নানা জায়গায় এই ধরনের ছন্দোবিভ্রান্তি ঘটিয়েছেন কিন্তু কোথাও তা অসতর্কতা বা অসাবধানতাবশত নয়। তবে প্রতিবেশী সমস্ত কবির থেকে নিজেকে স্বতন্ত্র বলে যিনি মনে করতেন যাঁর মতে, রবীন্দ্র-ঐতিহ্যকে আত্মস্থ করা রবীন্দ্রোত্তরদের আদ্যকৃত্য, তিনি কেন যে এত অসতর্ক তা ভেবে ওঠা যায় না। অন্তত কবিতা লিখতে এসে এটা ভোলা অমার্জনীয় অপরাধ যে তাঁর চেয়ে অনেক বড় আধ্যাত্মিক কবি হয়েও রবীন্দ্রনাথ কোনোদিন ছন্দে ভুল করেন নি। পক্ষান্তরে এইসব প্রমাদকে যাঁরা জীবনানন্দের অতীন্দ্রিয় প্রীতির লক্ষণ বলে থাকেন তাঁদের সঙ্গে একমত হওয়া আমার সাধ্যের অতীত। কারণ ইতিহাসের পাতা ওলটালে রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, হপকিন্স, মালার্মে, এমন কি এলিয়টের নামও জীবনানন্দের বিপক্ষে সাক্ষী দেবে।

উপরন্তু, সাধু ক্রিয়াপদ ও ছন্দের বিকৃতি ঘটিয়ে জীবনানন্দ যে কৃত্রিম তথা মৃত ভাষা আমাদের পরিবেশন করে গিয়েছেন, তার নগদ মূল্য বড় কম নয়। মধুসূদন এককালে এ

ব্যাপারে বিশেষ লাভবান হয়েছিলেন। হেমচন্দ্র, নবীনচন্দ্রের মতো অনুকারক জুটিয়েছিলেন তিনি। পরিণামে ছাত্রপাঠ্য হিশেবে মর্যাদা পেয়ে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের বাঙলা সাহিত্যের ইতিহাসের তিনি বৃহদংশ জুড়ে রয়েছেন। জীবনানন্দেরও অসংখ্য অনুকারক তৈরি হয়েছে। আশা করি, তাঁর কাব্যপ্রতিভার অবমূল্যায়নে তাঁর অসংখ্য গুণমুগ্ধ ও গরিষ্ঠ পুচ্ছানুগ্রাহীর দল তাঁদের যথেচ্ছ ভাবনাকে স্থায়ী আকার দিতে চেষ্টার ত্রুটি করবেন না।

২.

> 'বাংলা কবিতার আধুনিক সময় যদি তা দান না করতে পারে ভবিষ্যৎ কালে (খুব দেরি না করেও) দীর্ঘ কবিতা ও শ্লেষে লিখিত মহা কবিতা আসতে পারে ; এবং কবিতায় নাট্য।... কেবলই খণ্ড কবিতার সিদ্ধি নিয়ে দূরতর ভবিষ্যৎ তৃপ্ত হয়ে থাকবে বলে মনে হয় না।'

১৩৫৭ সন অর্থাৎ ইংরেজি ১৯৫১ সালে লিখিত জীবনানন্দ দাশের 'বাংলা কবিতার ভবিষ্যৎ' প্রবন্ধের অন্তর্ভূত উপরের গদ্যপংক্তি কয়টি। প্রবন্ধটি পরবর্তীকালে 'কবিতার কথা' গ্রন্থে সংকলিত হয়েছিল। উল্লেখ্য এই, 'বনলতা সেন', 'হায় চিল' এবং সম্প্রতি 'রূপসী বাংলা'র বহুসংখ্যক খণ্ড লিরিক কবিতার মধ্যস্থতায় জনসাধারণের কাছে জীবনানন্দ গ্রহণীয় হয়েছেন। এমনকি ১৯৫১ সালের সংগ্রামী বাঙলাদেশ 'রূপসী বাংলা'র একটি লিরিককে তাঁদের অন্যতম জাতীয় সঙ্গীতে রূপান্তরিত করেছিলেন। এই সমস্ত ঘটনাই রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কবিতার পক্ষে যথেষ্ট গৌরবজনক। রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে অবিভক্ত বাঙলা দেশে পাঠকসাধারণ ও কবিতার মধ্যে ব্যবধিসূচক লৌহকপাট অর্গলযুক্ত হয়েছিল। ভাবতে ভালো লাগে, জীবনানন্দের মধ্যস্থতায় সে অর্গল আবার মুক্ত হয়েছে। অন্তত বোঝা যাচ্ছে, জাতীয় ও ব্যক্তি চেতনার সঙ্কটের মুহূর্তে কবিতার স্বরাভিঘাত আত্মার উদ্বোধনে কাজে লাগে। লক্ষণীয়, রবীন্দ্রনাথ তো বটেই, জীবনানন্দ দাশের কবিতাও একাজে সহায়ক হয়েছে। একটি কবিতার জীবনীশক্তির পরিমাপে এই ধরনের অগ্নিপরীক্ষার বিশেষ প্রয়োজন আছে। বস্তুত, মানুষের জীবনের সমস্ত স্তরপরম্পরা ও স্তরানৈক্যকে স্পর্শ করেই কবিতার স্থায়িত্ব, কবিতার ক্রিয়াশীলতা।

অবশ্য এই কথাগুলি বলবার জন্য ঐ উদ্ধৃত গদ্যাংশের অবতারণা নয়, আমার মূল প্রশ্নের ক্ষেত্র অন্যত্র। শুনেছি, 'বনলতা সেন' কবিতাটির অসম্ভব জনপ্রিয়তা একদিন জীবনানন্দ দাশকেও যথেষ্ট বিস্মিত করে তুলেছিল। অন্তত, জীবদ্দশাতেই জীবনানন্দ টের পেয়েছিলেন—কোন্ কোন্ কবিতার মধ্য দিয়ে তিনি শনাক্ত হচ্ছেন, তাঁর কবিসত্তা কোন্ শিল্পভিত্তিতে গ্রহণীয় হতে চলেছে। এবং সেই কবিতাগুচ্ছের অধিকাংশই খণ্ড কবিতা, দীর্ঘ কবিতা নয়। তবু খ্যাতির বিড়ম্বনায় না পড়ে দীর্ঘ নাট্যগুণসম্পন্ন কবিতা রচনায় জীবনানন্দ মনস্কতা দেখিয়েছিলেন, যে মনস্কতার গদ্য স্বীকারোক্তি ঐ উপরের উদ্ধৃতাংশ। উপরন্তু, এমন বিশ্বাস করার যথেষ্ট কারণ আছে, কবির সাহিত্যপ্রবন্ধ তাঁর কবিতারই চালচিত্রবিশেষ। সুতরাং উপরে উদ্ধৃত জীবনানন্দের উক্তিটিকে তাঁর একটি বিক্ষিপ্ত মন্তব্য বলে উড়িয়ে দেওয়া সম্ভবপর নয়।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'বোধ' কবিতা থেকে আরম্ভ করে 'বেলা অবেলা কালবেলা'র 'ইতিহাসযান' কবিতা পর্যন্ত বরাবর লক্ষ রাখলে জীবনানন্দের আলোচ্য উক্তির গুরুত্ব

উপলব্ধি সহজ হয়। আশ্চর্য লাগে, আর কোনো কবিই খণ্ড কবিতা বা লিরিকস্পৃষ্ট কবিতা লিখে রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দের মতো অতটা জনপ্রিয়তা অর্জন করেন নি। অথচ দ্ব্যর্থহীন গদ্যে জীবনানন্দই বলতে পেরেছিলেন, বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ-মুক্তি নিহিত আছে দীর্ঘ নাট্যধর্মী কবিতায়।

কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণের স্বতন্ত্র বিচারেও এই কাব্যধারণাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মনে করি, যদিও এও ঠিক একজন পাঠকের কাছে কবিতার প্রসঙ্গ ও প্রকরণের অভিজ্ঞান সর্বদাই অবিভাজ্য, অনোন্য ও ওতপ্রোত। প্রকৃতপক্ষে, অনুভূতির নতুন ব্যাপ্তি ও অন্যতর জটিলতায় কোন একটি প্রকরণ যখন অব্যবহার্য হয়ে যায় আরেকটি প্রকরণের জন্মও তখন আবশ্যিক বা অনিবার্য হয়ে ওঠে।

এই বইয়ের 'জীবনানন্দ দাশ ঃ ১' আলোচনায় একটি কথা স্পষ্ট করা আছে যে রবীন্দ্রোত্তর বাঙলা কবিতায় জীবনানন্দের যে স্থান তার সঙ্গে তুলনীয় ইংরেজি কবিতায় ডব্লু. বি. ইয়েটসের। জীবনানন্দের কবিতায়, লক্ষ করা গেছে, লিরিক এক দিক থেকে শিখরসন্ধিতে পৌঁছেছিল, আবার অন্য দিক থেকে সূচিত হয়েছিল নাট্যধর্মী কবিতার পদযাত্রা।

অধিকন্তু, মনে রাখা দরকার, জীবনানন্দের মতো জটিল ও প্রহেলিকাময় মনস্তত্ত্বের কবিপুরুষ তাঁর সমসাময়িকদের একজনও নন। এমনকি, সে বিচারে রবীন্দ্রনাথও অনেক সহজবোধ্য। কবিতা ছাড়াও, জীবনানন্দের 'কবিতার কথা' বইটির মনোযোগী পাঠক হিশেবে এই বিশ্বাস রাখবার যথেষ্ট যুক্তি আছে। এলিয়টের কাব্যসৃষ্টিকে 'কাব্যপ্রচেষ্টার' নামান্তর বলেছিলেন তিনি এই গ্রন্থে, তবু 'জীবনানন্দ দাশ ঃ ১' আলোচনাটিতে ইঙ্গিত আছে যে, জীবনানন্দ ও এলিয়ট এক পরিমণ্ডলে যত স্বচ্ছন্দ প্রতিবেশী, এলিয়ট-ভক্ত বিষ্ণু দে ততটা নন। তবে কেন জীবনানন্দ তাঁর গদ্যভাষণে এলিয়টের প্রতি আংশিক অনীহা দর্শিয়েছিলেন? হয়তো ধ্যানজগতের সীমান্তরেখাগুলিকে পাঠকের কাছে জীবনানন্দ স্পষ্ট করতে চান নি। নিজেকে নিজে শনাক্ত করতে আগ্রহী ছিলেন না হয়তো অথবা পাঠকের চোখেই নিজেকে চিনতে বা চেনাতে চেয়েছিলেন তিনি। আবার এও সম্ভবপর, এলিয়ট ও তাঁর নিজস্ব ধ্যান-ধারণার চরিত্রগত ঐক্য জীবনানন্দের কাছে হয়তো কোনোদিনই স্পষ্ট হয় নি। সমস্ত ব্যাপারটাই তাঁর কাছে হয়তো এক অবচেতনপ্রসূত মানসিক প্রক্রিয়া হিশেবে উপস্থিত ছিল। এক ছিন্নমূল উৎকেন্দ্রিকতা জীবনানন্দের কবিতার নিহিত পরিমণ্ডল—মানুষ ও তার বোধি, প্রকৃতি ও সমস্ত বস্তুলোক মৃত্যুর নিষ্ক্রিয়তার মধ্য দিয়ে সময়চেতনার নিরবলম্বতায় সমীপবর্তী। এলিয়টের 'প্রুফ্রক' থেকে 'ফোর কোয়ার্টেট্‌স্'-এর মধ্যে জীবনানন্দীয় এই ধারণার সমান্তরালতা কি লক্ষ্যগোচর হয় না? এই বইয়ের ১৯৫১ সালে লিখিত 'জীবনানন্দ দাশ ঃ ১' আলোচনায় এই সহধর্মিতার কথার উল্লেখ আছে। ১৯৫১ সালে প্রকাশিত সঞ্জয় ভট্টাচার্যের 'কবি জীবনানন্দ দাশ' প্রবন্ধে স্নিগ্ধ বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম, ঐ উক্তি বা পর্যবেক্ষণের সমর্থন। স্বীকার করতে বাধা নেই, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ঐ সমর্থন অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত করেছে আমাকে।

যাই হোক, দিন যত আমরা অতিক্রম করছি তত স্পষ্ট হচ্ছে, কবির জীবদ্দশায় যতটা সমসাময়িক ছিল তাঁর কবিতা, আজকের দিনে তা যেন আরো বেশি অন্তরঙ্গ। এ যুগের চরিত্রকে যদি কোনো বিশেষণে চিহ্নিত করা যায় তবে তা অনেক রক্তাক্ত গভীরতায় অনূদিত হয়েছিল জীবনানন্দের কবিতায়। কবিমানসিকতার প্রেক্ষিতে জীবনানন্দকে ইয়েটসের সঙ্গে যাঁরা তুলনা করেন, তাঁদের থেকে যথেষ্ট চিন্তাগত দূরত্ব অনুভব করি,

যদিও ঐতিহাসিক বিচারে, রোমান্টিক ও নব্যক্ল্যাসিকাল রীতির মধ্যবর্তী যুগসন্ধির কবি হিশেবে ঐ দুই কবি তুলনীয়। প্রকৃতপক্ষে, 'The Lake Isle of Innisfree' কবিতায় ইয়েটস রচনা করেছিলেন যে স্বপ্নাদ্য জগৎ তা আইরিশ লোকগাথা, পুরাণগাথা এবং আইরিশ প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে—স্লিগোর রম্য গৃহাভ্যন্তরে দিন কাটিয়ে কিংবা তাকে পরিক্রমা ক'রে। চতুষ্পার্শ্বস্থ জগতের সঙ্গে কবিহৃদয়ের সাযুজ্যের অভাব এবং অনিবার্য একাকীত্ব ইয়েটসের প্রকৃতিবিষয়ক কবিতায় কবির নিজস্ব পৃথিবীর ছবিকে স্পষ্ট করে তুলেছিল। মনুষ্যজগৎ থেকে এক মানসিক দূরত্ব অনুভব করে প্রকৃতির আশ্রয়ে ইয়েটস পরিত্রাণের পথ খুঁজেছিলেন, কিছুটা অনুব্যবসায়ী হয়ে পড়েছিলেন তিনি। রবীন্দ্রনাথের মানসিক ইতিহাসের বরং প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায় ইয়েটসের ভিতর।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত বরাবর লক্ষ করলে তিনটি বিশেষ কাব্যলক্ষণের আমরা সন্ধান পাব।

প্রথমত, প্রাকৃতিক ঐশ্বর্যে গরীয়ান বরিশালের যে রূপে জীবনানন্দ অন্তরঙ্গতা অনুভব করেছিলেন তাতে জীবনের উৎসার অপেক্ষা মৃত্যুর ঐশ্বর্যই বড় কথা ছিল।

'তারপর—একদিন
আবার হলদে তৃণ
ভ'রে আছে মাঠে,
পাতায়, শুকনো ডাঁটে
ভাসিছে কুয়াশা
দিকে-দিকে, চড়ুয়ের ভাঙা বাসা
শিশিরে গিয়েছে ভিজে—পথের উপর
পাখির ডিমের খোলা, ঠাণ্ডা—কড়্কড়্ ;
শসাফুল—দু-একটা নষ্ট শাদা শসা,
মাকড়ের ছেঁড়া জাল—শুক্‌নো মাকড়সা
লতায়—পাতায় ;   ('মাঠের গল্প' ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি)

প্রকৃতির মধ্যে কোথাও জীবনের স্পন্দন জীবনানন্দ অনুভব করেন নি। মৃত্যুর হিমশীতল নিরুপাখ্য করতল প্রকৃতির সর্বত্র প্রসারিত হয়েছে। নিজের মানসিক দূরত্বের জন্য রম্য গৃহাভ্যন্তর রচনা করে পরিত্রাণের উপায় খোঁজেন নি জীবনানন্দ। প্রকৃতপক্ষে, তাঁর প্রকৃতিচেতনা যতটা যন্ত্রণাময় রক্তক্ষরণের দিকে ঠেলে দেয় আমাদের, ইয়েটসে তা আদৌ নেই, রবীন্দ্রনাথে তো নেইই। বরং এলিয়টের নাম মনে আসে, ধূসর পাথর, যাঁর প্রকৃতি চেতনায়, শুষে নেয় দিনের অসহ্য উষ্ণতাকে—শূন্য স্তব্ধতায় ঘুমিয়ে থাকে ডালিয়া ফুল—পেঁচার প্রথম ডাকের জন্য যেখানে অপেক্ষা করতে বলা হয় ঃ

'In a warm haze the sultry light
Is absorbed, not refracted, by grey stone.
The dahlias sleep in the empty silence.
Wait for the early owl.'

('East Coker'—Four Quartets)

দ্বিতীয়ত, জীবনানন্দ যখন বরিশালবাসী তখন থেকেই তাঁর কবিতার জগতে দুইটি চেতনার, সমান্তরাল না হলেও, এক অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ লক্ষ করা যায় ঃ প্রকৃতিচেতনা ও

সময়চেতনা। প্রথম অধ্যায়ে প্রকৃতিচেতনা বড় স্থান জুড়ে ছিল, সময়চেতনা ছিল গৌণভাবে। 'বনলতা সেন' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' অধ্যায়ে ক্রমশ সময়-চেতনার প্রবাহের দিকে ঝুঁকেছেন কবি, প্রকৃতির অন্তরঙ্গতা ক্রমে গৌণতা পেয়েছে।

তৃতীয়ত, জীবনানন্দ মূলত মৃত্যুচেতনার কবি। মৃত্যুর অনবচ্ছিন্ন প্রবাহের মধ্যে জীবনকে মুহূর্তের জন্য বর্তমানে স্নাত হতে লক্ষ করা গেছে তাঁর কবিতায়, তারপর নীরন্ধ্র অন্ধকার।

'অন্ধকারের সারাৎসারে অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থেকে
হঠাৎ ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব ব'লে
বুঝতে পেরেছি আবার ;...
আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায়—আক্রোশে ভ'রে গিয়েছে ;
সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শূয়োরের আর্তনাদে
উৎসব শুরু করেছে।
হায়, উৎসব!
হৃদয়ের অবিরল অন্ধকারের ভিতর সূর্যকে ডুবিয়ে ফেলে
আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।'

('অন্ধকার' ঃ বনলতা সেন)

বস্তুভারশূন্য এক নিরবলম্ব নিরন্তর প্রবহমান সময়—যা বড় অন্ধকারময়— জীবনানন্দের বোধির অন্তর্গত সত্য ছিল।

ফলে কবিতার যথোচিত প্রকরণের সন্ধানের জন্য অনিবার্যভাবেই জীবনানন্দকে সম্পূর্ণ নতুন ও নিজস্ব পথ নিতে হয়েছিল। বস্তুত, কবিতার গঠনে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকলে কবিতার অন্তর্নিহিত স্বভাবকে চিনে নেওয়া অনায়াস হয়। ধ্বনি ও চিত্র সমন্বিত কবিতার ভাষার বয়নশিল্পের লক্ষণগুলিকে চিরে চিরে কবিতার নিহিত শোণিতপ্রবাহে অবগাহন বৈজ্ঞানিক ও শিল্পসম্মত প্রথা। অন্তত ভালো কবিতায় আকৃতি ও প্রকৃতিতে কখনো কোনো গরমিল থাকে না। জীবনানন্দের কবিতার দীর্ঘ পংক্তির বিন্যাস, যুক্তাক্ষরের স্বল্পতম ব্যবহার, পারিপাট্যহীনতার আপাতলক্ষণ সমস্তই তাঁর কবিচেতনার যথোচিত পরিভাষা।

এই প্রসঙ্গেই কয়েকটি কথা পরিষ্কার করে নেওয়া সম্ভবত উচিত হবে। জীবনানন্দ-সম্পর্কিত এই বইয়ের প্রথম আলোচনাকে কেন্দ্র করেই জবাবদিহি করবার মতো কিছু কথা জমা আছে। ঐ লেখাটির সঙ্গে যাঁরা পরিচিত, তাঁরা নিশ্চয়ই মানবেন, জীবনানন্দের অনুরাগীদের পক্ষে সেটি যথেষ্ট পরিমাণে রুচিকর ছিল না। কপট বিনয়কে একেবারে প্রশ্রয় না দিয়েই বলা যেতে পারে যে ঐ আলোচনাতে যুক্তির ফাঁক নিশ্চয়ই ছিল বা আছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে এই বইয়ের সেই সময়কার পাঠকবর্গ সেইসব ত্রুটি কেউই দর্শালেন না। প্রশ্ন উঠল, জীবনানন্দের ছন্দোবিভ্রান্তি নিয়ে আমি কেন এত তুলকালাম করলাম অথবা জীবনানন্দের কবিস্বভাবের প্রতি এতটা বৈমাত্রিক মনোভাবের কারণ কি হতে পারে? এবং এই বর্তমান রচনাটি পড়ে নতুন প্রশ্ন জাগা সম্ভব—তবে কি লেখক তার পূর্বের ভ্রান্তি বুঝে নিজেকে শুধরে নেওয়ার পথ খুঁজছে? অথবা পাঠককে শুধুমাত্র নিপট

ধাক্কা দেওয়ার অভিপ্রায়েই কি ঐ আগের আলোচনাটি লেখা হয়েছিল? এবং সে অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নি বলেই পুনর্বার মূষিক সাজবার কি এই নিরুপায় পন্থা?

উত্তর সম্ভবত একটিই। পূর্বআলোচনাটি মনোযোগের সঙ্গে পড়লে বোঝা যাবে, সে রচনায় নায়ক জীবনানন্দ ছিলেন না—তাঁর অন্ধ অনুকারক ও স্তাবকদের প্রতিই দৃষ্টি মূলত নিয়োজিত ছিল।

প্রকৃতপক্ষে, রবীন্দ্রোত্তর যুগের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ নতুন কবিযশোপ্রার্থীদের কাছে যতটা ভয়ঙ্করভাবে মোহবিস্তারী, তাঁর সমসাময়িকেরা ততটা নন। ছিন্নমূল জীবনতার পরিভাষা তাঁর কবিতার গঠনে এমন এক আশ্চর্য অভিনবত্ব এনেছিল যে মনে হয় এ-ভাষার, এ-গঠনের, এ-চিত্রকল্পের, এককথায় এ-স্বরমণ্ডলের যেন কোনো উৎস নেই অথচ তা বড় অনিবার্য।* একদিন রবীন্দ্রনাথের কবিতা পড়ে বাঙালি পাঠকের মজ্জাগত ধারণা হয়েছিল, কবিতার ভাষার সম্ভবত অপর নাম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। একথা নিশ্চয়ই মাননীয়, যে কবি যতটা আক্ষরিকভাবে প্রাতিস্বিক, সে কবি সেই পরিমাণেই অননুকরণীয়। বহুক্ষেত্রেই অনস্বীকার্য প্রতিভা ও অতুলনীয় অবদান সত্ত্বেও ভবিষ্যতের অগ্রগতিতে এইসব কবি প্রতিবন্ধকস্বরূপ। উজানের নদীতে অন্তত কিছুকাল ভাটার টান লক্ষ করা যায়। রবীন্দ্রনুসারী সত্যেন্দ্রনাথ-করুণানিধান-যতীন্দ্রমোহনের ভাগ্য আমাদের জানা আছে। জীবনানন্দের অনুকারকদের ভাগ্যে কি অন্যথা হবে?

---

* আসলে বাঙলা কবিতায় জীবনানন্দের বিশেষ স্বকীয়তা তাঁর চিত্রকল্পনায়। বাঙলা কবিতার মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, এবং তিরিশের দশকের সমস্ত কবিরাই মূলত শ্রুতিকল্পনার কবি, একমাত্র ব্যতিক্রম জীবনানন্দ। ফলে স্থানবর্ণিমা (Local Colour) জীবনানন্দের কাব্যাভিপ্রায়ের যতটা আবশ্যিক উপকরণ ছিল, রবীন্দ্রনাথ প্রমুখের কাছে ততটা নয়। এরই ফলে জীবনানন্দকে একতা আলাদা লাগে।

আরো একটি বিশেষ কারণে জীবনানন্দের কবিতার স্বাদ এতটা ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ যেখানে আক্ষরিক অর্থে ভারতীয় কবি, জীবনানন্দ সেখানে পূর্ববঙ্গীয় কবি। যদিও ভুলি নি, 'সুচেতনা', 'হাজার বছর শুধু খেলা করে', 'নগ্ন নির্জন হাত' ইত্যাদির মতো কবিতা যেখানে ভারতীয় ভৌগোলিক সীমাও অতিক্রম করে গিয়েছিলেন জীবনানন্দ, তবুও তিনি মূলত বঙ্গীয় কবিই। অপরপক্ষে রবীন্দ্রনাথ শ্রুতিকল্পনার কবি বলেই ধ্বনির দিক দিয়ে তিনি ভারতীয় প্রকৃতি ও ভারতীয় দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রসারিত করে দিয়েছিলেন। কালিদাস, বাল্মীকি ও বৈষ্ণব কবিতার ঐতিহ্যময় প্রকৃতিচেতনা রবীন্দ্রনাথে এমন এক প্রকৃতিবোধের জন্ম দিয়েছিল যা একাধারে প্রাচীন ও অব্যবহিত। রবীন্দ্রনাথ এতটা ভারতীয় ছিলেন যে বাঙালির চোখে জীবনানন্দের তুলনায় তাঁকে বিদেশি মনে হয়। রবীন্দ্রনাথের কবিতার স্থানবর্ণিমা বা আঞ্চলিকতা আমাদের চোখে তাই খুব স্পষ্ট হয়ে ধরা পড়ে না। এর থেকে অপর একটি সিদ্ধান্তে এসে যাই, আমাদের ভারতীয়ত্ব রাজনৈতিক আনুগত্যে, চেতনায় সমস্ত ভারতবাসীই আসলে প্রাদেশিক।

অথচ বিদেশির চোখে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয়ত্ব বা কবিতার স্থানবর্ণিমা এত সুস্পষ্ট যে 'গীতাঞ্জলি'র ইংরেজি অনুবাদেও তা নষ্ট হয় নি। ইয়েটস রবীন্দ্রনাথে লক্ষ করেছিলেন : 'Flowers and rivers, the blowing of conch shells, the heavy rain of the Indian July, or the parching heat, are images of the moods of that heart in union or in separation ;... A whole people, a whole civilization, immeasurably strange to us, seems to have been taken up into this imagination ;' অর্থাৎ সমস্যাটা হচ্ছে, বিদেশির চোখে রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় কিন্তু বাঙালির চোখে রবীন্দ্রনাথ যথেষ্ট বাঙালি ছিলেন না। যেমন :

'ওগো সন্ন্যাসী, পথ যায় ভাসি
বারবার ধারাজলে,

ফলে, জীবনানন্দ যে পরিমাণে বড় কবি, সেই অনুপাতেই আবর্তসঙ্কুল। এটি খুব স্পষ্ট, জীবনানন্দের কবিতার স্বরাভিঘাত তাঁর পরবর্তীদের এমনভাবে মাতিয়ে তুলেছে বা ধ্বনিপ্রবাহের চোরা-আবর্তে বেমালুম ডুবিয়ে দিয়েছে যে নিজের নিজের পৃথিবীকে চিনে নেবার বা দৃষ্টি খোলা রাখবার অবকাশও পান নি তাঁরা। সুতরাং যে আন্তরিক কারণে জীবনানন্দ ছন্দে স্বাধীনতা নিয়েছিলেন, পরবর্তীদের কলমে তা পর্যবসিত ছন্দ-অজ্ঞতায় বা অবজ্ঞায়। দু-একটি কাব্যপংক্তি তুলে কথাটাকে একটু বিশ্লেষণ করা প্রয়োজন—

'কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো ঃ
পুরুষ তাদের ঃ কৃতকর্ম নবীন ;
('গোধূলি সন্ধির নৃত্য' ঃ সাতটি তারার তিমির)
'তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক,
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।'
('রাত্রি' ঃ সাতটি তারার তিমির)

তমালবনের শ্যামল তিমিরতলে।
দ্যুলোক ভূলোকে দূরে দূরে বলাবলি
চিরবিরহের কথা।
বিরহিণী তার নত আঁখি ছলছলি
নীপ-অঞ্জলি রচে বসি গৃহকোণে,
ঢেলে ঢেলে দেয় তোমারে স্মরিয়া মনে,
ঢেলে দেয় ব্যাকুলতা।' ('বর্ষামঙ্গল' ঃ বনবাণী)

এই কবিতার ভিতরে যে প্রকৃতিবোধ ও জীবনদৃষ্টি তাতে বাঙালিত্ব কতটুকু? এর ঘ্রাণ কালিদাসের হাত ঘুরে আসা ভারতীয়ত্বের কিন্তু এই ভারতীয়ত্ব শুধুমাত্র বিদেশির চোখে ধরা পড়ে, আমরা ভারতীয়রা তার কতটুকু অনুভব করি! এই বিশেষ ক্ষেত্রে জীবনানন্দ বাঙালির হৃদয় জয় করেছেন, তাঁকে অনেক কাছের মানুষ বলে আমরা ভাবতে পারি। 'সাতটি তারার তিমির'-এর জীবনানন্দ অপেক্ষা 'রূপসী বাংলা'র জীবনানন্দ এই কারণেই আরো বেশি জনপ্রিয়।—

'নরম ধানের গন্ধ—কলমীর ঘ্রাণ,
হাঁসের পালক, শর, পুকুরের জল, চাঁদা সরপুঁটিদের
মৃদু ঘ্রাণ, কিশোরীর চাল-ধোয়া ভিজে হাত—শীত হাতখানা
কিশোরের পায়ে-দলা মুথাঘাস,—লাল-লাল বটের ফলের
ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা—এরি মাঝে বাংলার প্রাণ।'
('আকাশে সাতটি তারা' ঃ রূপসী বাংলা)

এই কবিতার আষ্টেপৃষ্ঠে এত বাঙালিত্ব যে অনুবাদে এর শতকরা কুড়ি ভাগ আবেদনও রক্ষা করা সম্ভব নয়।

সুতরাং জীবনানন্দের কাব্যআবেদনের জাত যে ভিন্ন তা কবির বাঙালিত্বে ও চিত্রকল্পনায়। মধুসূদন, রবীন্দ্রনাথ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বিষ্ণু দে কেউই জীবনানন্দের তুলনায় বাঙালিত্বের চর্চা করেন নি, তদুপরি ঐ কবিবর্গের সবাই অল্পবিস্তর শ্রুতিকল্পনার শিল্পী। ফলে বাঙলা দেশের পুরাণ ব্যবহারে কত তাজা অনুভূতি দিয়ে শিমুলের ডালে লক্ষ্মীপেঁচার ডাক শুনিয়েছিলেন জীবনানন্দ। কত অনায়াস কল্পনায় তিনি উদ্ভাসিত করে তুলেছিলেন মুকুন্দরাম লিখছেন 'দুপহরে সাধের সে চণ্ডিকামঙ্গল' অথবা গাঙুরের জলে বেহুলা একা চলেছে। অন্যান্য কবিদের কবিতায় ভারতীয় পুরাণেরই অধিক ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

উপরে উদ্ধৃত দুটি কাব্যাংশের নিম্নরেখাঙ্কিত শব্দগুলি লক্ষ করুন। ব্যাকরণগতভাবে শব্দগুলিতে মাত্রার ঘাটতি আছে অথচ পাঠকের শ্রুতি কোনোভাবেই বিরক্ত হচ্ছে না। বলা বাহুল্য, কবির প্রখর শ্রুতিচেতনা মাত্রার ফাঁকগুলিকে আশ্চর্যরকমভাবে ভরাট করে দিয়েছে। প্রথম উদ্ধৃতিতে 'কৃতকর্ম' শব্দের রেফ যদি একটি মাত্রার সম্মান না পায় তবে 'নবীন' শব্দের দীর্ঘ-ঈ একটি মাত্রার সম্মান নিশ্চয়ই পাবে। দ্বিতীয় উদ্ধৃতিতে 'তবুও' শব্দের 'ও' অক্ষরের উপরে পাঠককে দাঁড়াতে না দিয়ে দ্বিতীয় শব্দে টেনে নিয়ে গিয়েছেন কবি। ফলে 'তবুও' শব্দের 'ও' অক্ষরটি তার প্রাপ্য মাত্রার সম্মান পায় নি। 'লজ্জাবশত' শব্দেও 'লজ্জা'র যুক্তবর্ণ পৃথক পৃথক মাত্রার গুরুত্ব পেয়েছে। প্রশ্ন জাগতে পারে, এই ছন্দোবিভ্রান্তিকে জীবনানন্দ কি এড়াতে পারতেন না? উনি পারতেন না নিশ্চয়। কারণ এই শব্দসজ্জার অন্তর্নিহিত শৃঙ্খলা এত নিবিড় যে ছন্দের ব্যাকরণ ঠিক করা গেলেও ছন্দের ব্যঞ্জনা নষ্ট হয়ে যেত। 'লজ্জাবশত' শব্দের বদলে 'সরমবশত' লিখলে ছন্দের আইন বজায় থাকত, কবিতা নষ্ট হত। 'কৃতকর্ম নবীন' শব্দবন্ধকে ঘুরিয়ে 'কৃতকর্ম ও নবীন' করলে কবিতাটির সমস্ত ব্যঞ্জনাগত অভিপ্রায় বিঘ্নিত হয়। 'ও' এই সংযোজক অব্যয়ে 'কৃতকর্ম' এবং 'নবীন' দুইটি বিশেষ্যে রূপান্তর পেয়ে দুইটি স্বতন্ত্র সত্তা কল্পনার সম্ভাবনা দেখা দিত। কিন্তু কবি বলতে চান যিনি নবীন তিনিই কৃতকর্ম। 'নবীন'-এর বিশেষণ এখানে 'কৃতকর্ম'।

জীবনানন্দের এই অভিপ্রায়গত শিল্পস্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে এক পরিণামহীন শিল্প-অরাজকতায় পর্যবসিত হয়েছে। উপরন্তু, যে মগ্নচৈতন্য থেকে উৎসারিত হয়েছিল জীবনানন্দের প্রকরণগত শিথিলতা এবং যে শিথিলতা এক নিহিত শৃঙ্খলারই নামান্তর, পরবর্তীদের কাছে সেই গঠনপ্রকৃতি কি মাত্রই একটি তৈরি-বিশ্বাস বা ভঙ্গি হয়ে ওঠে নি?

আলোচ্য বিচারে যতটা শিক্ষাপ্রদ, স্বাস্থ্যকর ও কবিতার ভবিষ্যৎ মুক্তির সহায়ক সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতা, জীবনানন্দের কখনোই তা নয়, যেমন ছিল না রবীন্দ্রনাথের। প্রশ্ন নিশ্চয়ই জাগতে পারে, কতদূরই বা এগিয়ে দিতে পেরেছিলেন এলিয়ট তাঁর পরবর্তী ইংরেজি কবিতাকে ?

একজন কবির পক্ষে সরাসরি শেক্সপীয়রের কাছে যাওয়ার চাইতে অন্যান্য এলিজাবেথীয় নাট্যকারদের মধ্যস্থতায় এগোনো নিরাপদ—এলিয়টের এই পরামর্শের তাৎপর্য তখনই বুঝি যখন জীবনানন্দকে উপভোগের জন্যও অন্য কবির মধ্যস্থতা প্রয়োজন হয়। জীবনানন্দে মগ্নতার অর্থ হল এক বিপর্যয়কারী আত্মলাঘবের উৎপত্তি যা একজন নতুন পদ্যলেখকের পক্ষে স্বাস্থ্যকর হতে পারে না। জীবনানন্দের কবিতার পাণ্ডুলিপির আলোকচিত্র প্রমাণ করে, তাঁর কবিতার গঠনপ্রকৃতির আপাত-অমনস্কতা আসলে কবির গভীর ও নিহিত মনস্কতারই ফলশ্রুতি। জীবনানন্দের এক একটি কবিতা স্থায়িরূপ পেত বহু সংশোধনের ভিতর দিয়ে—কবির এক সময়ের ঘনিষ্ঠদের মুখেও তার সমর্থন পেয়েছি।

যাই হোক, জীবনানন্দের যে গদ্যপংক্তিগুলি আলোচনার গোড়ায় উদ্ধার করেছি, পাঠকের দৃষ্টি সেই দিকে আকর্ষণ করতে চাই। জীবনানন্দের ঐ গদ্যপংক্তির অর্থগৌরব কতটা ব্যাপক তার সম্যক উপলব্ধির জন্য পারিপার্শ্বিক জগৎকে বুঝতে বা চিনতে হবে। মুহূর্তের ভাবনাকে ধরে রাখে লিরিক, লিরিক একটি মর্জি বা বিশেষ মেজাজের শিল্পরূপ। কিন্তু আধুনিক মন এত জটিল যে সেখানে মনের সচেতন, অবচেতন ও অচেতন স্তর অবিভাজ্য অবস্থায় আছে। তদুপরি অনুষঙ্গ ও পারিপার্শ্বিকের চাপে মনের উপর যে অহরহ ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার টানাপোড়েন থাকে সেই মন যখন কবিতায় উন্মোচিত হতে চায়,

তখন তার পক্ষে লিরিকের স্বভাব ও গঠন অনুকূল শিল্পমাধ্যম হয়ে আর ওঠে না, দীর্ঘ কবিতার বহুলাঙ্গ নাট্যধর্মী রূপই যথার্থ প্রকরণ হিশেবে বিবেচিত হয়। অনেক জটিল অনুভূতিপুঞ্জের চাপ অনায়াসে পরিপাক করতে পারে এই বিশেষ প্রাকরণিক আধার। বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলা যায়, এই প্রকরণের জন্ম অনিবার্য মনে হবে যখন ঐরকম বিস্তৃত ও জটিল অনুভূতির টান অনুভব করবেন কবি। একথা নিশ্চয়ই স্বীকার্য, আজকের দিনে জীবনচর্যা যতটা জটিল, মানুষের মনস্তাত্ত্বিক রুগ্নতা যতটা অন্তর্নিহিত, আঠারো বা উনিশ শতকের জীবনযাত্রায় তার সহস্রাংশও উপস্থিত ছিল না। ফলে চোদ্দ, আঠারো বা ছাব্বিশ পংক্তির মধ্যে গতশতকের কবি তাঁর বক্তব্য যতটা সহজে রাখতে পারতেন, এই শতকের যুগসচেতন কবির পক্ষে তা কতদূর সম্ভবপর, সেটি ভাববার বিষয়। ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে লিখিত ইয়েটসের বিখ্যাত কবিতা 'The Lake Isle of Innisfree' মাত্র বারো পংক্তিতে সীমাবদ্ধ। অপর পক্ষে ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে লিখিত ঐ একই কবির বিখ্যাত কবিতা 'Under Ben Bulben' পঁচানব্বই পংক্তিতে বিস্তৃত। যুগসমস্যার দাবিতেই যেহেতু বিশেষ প্রকরণের জন্ম হয়, তাই কালজ্ঞানসচেতন কবি কখনো কবিতার প্রসঙ্গে বিমুখ হতে পারেন না। প্রকৃতপক্ষে, প্রসঙ্গ ও প্রকরণ কবির একই প্রযত্নে সিদ্ধ হয়। শুধুমাত্র দৈর্ঘ্যের জন্যই 'Under Ben Bulben' কবিতাটিকে দীর্ঘ করে তোলা হয় নি। কবিতার জগৎই এখানে তুলনামূলকভাবে অনেক বিস্তৃত হয়ে পড়েছে। এমন অনেক বিষয়বস্তুর অনায়াস প্রবেশ ঘটেছে এই কবিতাটিতে, যা তৎকালীন কবিতার প্রসঙ্গাধিক্ষেত্রে হয়তো কল্পনা করতে পারতেন না এমন কি পূর্ববর্তী ইয়েটসও। আশ্চর্য, এই কবিতাটিতেই কবিদের গ্রহণীয় বিষয়বস্তু সম্পর্কে ইয়েটস তাঁর যে পরামর্শটি জানিয়েছিলেন তা আইরিশ কবিদের প্রতি উদ্দিষ্ট হলেও পৃথিবীর যে কোন কবির পক্ষে গ্রহণীয়।

> 'Irish poets, learn your trade,
> Sing whatever is well made,'
>
> ('Under Ben Bulben'–Last Poems)

পূর্বোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে যদি রবীন্দ্রনাথের 'মানসসুন্দরী' কবিতার শিল্প-সঙ্গতির বিচার করি তবে মেনে নিতে হয় কবিতাটির অন্তর্নিহিত স্বভাবে আর গঠনে শিল্পগত ভারসাম্যের অভাব আছে। কবিতাটির নিহিত ভাবনার জটিলতার অনুপাতে কবিতাটির পরিসমাপ্তি আসা উচিত ছিল বড় জোর ছাব্বিশ পংক্তিতে। অপরপক্ষে আধুনিক জীবনচর্যার জটিলতা ও মনস্তত্ত্বের ঘোরানো সিঁড়িতে যাতায়াত করেই দীর্ঘ নাট্যধর্মী কবিতার প্রকরণগত উপযুক্ততা সম্পর্কে জীবনানন্দ দ্বিধাহীন হয়েছিলেন।

প্রশ্ন জাগতে পারে, জীবনানন্দের পর্যবেক্ষণ অনুমোদন করে পরবর্তী বাঙলা কবিতা তেমন সফল দীর্ঘ নাট্যধর্মী কবিতা বা কাব্যনাট্য উপহার দিতে পারল কিনা। কিন্তু সে কথা থাক। তবে জীবনানন্দের ঐ মন্তব্যের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ মুক্তির ইঙ্গিত যে ঐ মন্তব্যে সুপ্ত আছে তাতে সন্দেহ নেই।

তিরিশের দশকের প্রায় সমস্ত কবিরই কবিতার লক্ষণ ও সাফল্য মনে রাখলে ঐ পথে ভবিষ্যৎ বাঙলা কবিতার পূর্ণতর পরিণতির সম্ভবপরতা সম্পর্কে আশান্বিত হবার যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত কারণ থেকে যায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যন্ত জীবনানন্দও দীর্ঘ নাট্যধর্মী কবিতা রচনায় তাঁর মনোনিবেশ জাগরূক রেখেছিলেন। বস্তুত, এখন বিশেষভাবে মনে হয়, একটি দীর্ঘ নাট্যধর্মী কবিতা কতদূর কৃতিত্বের সঙ্গে উত্তরে

গেছে তারই উপর নির্ভর করে একজন কবির ক্ষমতার পরীক্ষা হয়ে যায়। অবশ্য এ কথা ভুললে চলবে না, দীর্ঘ নাট্যধর্মী কবিতা ও বর্ণনাত্মক কবিতা আকৃতিতে এক হলেও, প্রকৃতিতে ভিন্ন। বর্ণনাত্মক কবিতার মতো দীর্ঘনাট্যধর্মী কবিতা আনুপূর্বিক কাহিনীর বর্ণনা নয়। দীর্ঘ নাট্যধর্মী কবিতায় লিরিক উচ্ছ্বাস স্থান পায় না। এই জাতীয় কবিতার নায়ক অধিকাংশ ক্ষেত্রেই কবি স্বয়ং এবং তাঁর বিচরণভূমি পারিপার্শ্বিক জগৎ। ফলে এইসব কবিতায় নানা বিপরীত ভাবনার সংঘর্ষ থাকে, টুকরো মানুষের অবয়ব ভেসে এসে হঠাৎ উধাও হয়, স্রোতের টানে হঠাৎ একটি কাহিনীর ছেঁড়া সুতো চমক দিয়ে আবার সেই স্রোতের টানেই ভেসে চলে যায়। সব সময় একটি নিহিত নাটক বা নাটকীয় দ্বন্দ্ব অথবা একটি প্রবাহের উত্থান-পতন সংঘটিত হতে থাকে। নাট্যধর্মী কবিতার প্রকরণগত ধারণার পরবর্তী অধ্যায়—কাব্যনাট্য।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'বোধ' কবিতাটি স্মরণ করা যাক। অবশ্য কাহিনী বা পারিপার্শ্বিক মানুষের ভগ্নাংশ এই কবিতায় লক্ষ করা যায় না। তবে কবিতাটি কখনোই লিরিক নয়। নাটকীয় অভিঘাতে অন্তর্নিহিত আছে অনুভূতির সংঘর্ষ, যন্ত্রণার আন্দোলন। সর্বোপরি এই কবিতার নায়ক স্বয়ং কবি এবং চতুষ্পার্শ্বস্থ জগতে কবির সংঘাতপীড়িত বোধি কবিতাটির সঞ্চারী। 'হায় চিল'-এর মতো স্বল্প পরিসর কবিতায় এই জাতীয় বহুলাঙ্গ ভাবনাকে জীবনানন্দ ধরে রাখতে পারতেন না। ঐ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যগ্রন্থেরই 'ক্যাম্পে' কবিতায় কিছু টুকরো কাহিনীসূত্র জায়গা পেয়েছে। কবির অনুভূতি অনেকটা বস্তুগ্রাহ্য হয়ে উঠেছে তবু সমগ্র কবিতাটির নায়ক কবি স্বয়ং। তাঁরই অনুভূতির নানা তরঙ্গ ও বিভিন্ন বর্ণ কাহিনীর ভগ্নাংশে ছড়িয়ে আছে।—

'আমার হৃদয়—এক পুরুষহরিণ—
পৃথিবীর সব হিংসা ভুলে গিয়ে
চিতার চোখের ভয়—চমকের কথা সব পিছে ফেলে রেখে
তোমাকে কি চায় নাই ধরা দিতে?
আমার বুকের প্রেম ঐ মৃত মৃগদের মতো
যখন ধূলায় রক্তে মিশে গেছে
এই হরিণীর মতো তুমি বেঁচেছিলে নাকি
জীবনের বিস্ময়ের রাতে
কোনো এক বসন্তের রাতে?'

('ক্যাম্পে'—ধূসর পাণ্ডুলিপি)

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের 'অন্ধকার' কবিতাটি তিপ্পান্ন পংক্তিতে বিস্তৃত, খুব বড় নয়, তবুও কবিতাটিকে লিরিক বলা যায় কি? ভাবনার সংঘর্ষে ও ধ্বনির চরিত্রে দীর্ঘ নাট্যধর্মী কবিতার দিকেই এই কবিতাটির প্রাকরণিক প্রবণতা। সময়-চেতনা-স্রোতের এক অনবচ্ছিন্ন প্রবাহ—অতীত ও ভবিষ্যতে ছড়ানো অন্ধকার। এরই মধ্যে 'ভোরের আলোর মূর্খ উচ্ছ্বাসে নিজেকে পৃথিবীর জীব বলে' চিনতে পারার একটুকরো জীবনতা।—

'আবার ঘুমোতে চেয়েছি আমি,
অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে
থাকতে চেয়েছি।'

('অন্ধকার' ঃ বনলতা সেন)

'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থের 'হাওয়ার রাত' কবিতাটি সময়চেতনার আর একটি তরঙ্গ, যেখানে এক আশ্চর্য হাওয়ার রাতে বর্তমানের ভিতর মৃত বা অতীত মুহূর্তের জন্য স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। এলিয়টের 'Burnt Norton' কবিতাটি, যা দৈর্ঘ্যে আট পৃষ্ঠা তার সঙ্গে এই কবিতাটির সমান্তরালতা পাওয়া যায়। ছিয়াশি পংক্তিতে বিস্তৃত ঐ গ্রন্থের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটি দীর্ঘ কবিতার সমস্ত অভিপ্রায় ও উপসর্গকে অনেকাংশে চরিতার্থ করতে পেরেছে। একটি মানুষের আত্মহত্যার বিচ্ছিন্ন টুকরো কাহিনীসূত্র কবিতাটির মেরুদণ্ড হলেও এখানেও কবিই নায়ক। এক জটিল মনস্তাত্ত্বিক ক্লান্তির কথা আমরা এই কবিতায় পাই যা সচ্ছলতা বা গার্হস্থ্য সাফল্যের উপর নির্ভরশীল নয়। আধুনিক জীবনের কৃত্রিম দ্রুতিও বলা যায় একে অথবা এক যন্ত্রণাদিগ্ধ ছিন্নমূল জীবনবোধ যার নিদারুণ চাপে মানুষের সমস্ত সম্ভোগসুখ বিবর্ণ হয়ে যায়। কিংবা সেই প্রগাঢ় পিতামহী, মহাকালের প্রতিভূ, যিনি জীবনকে সৃষ্টি করেন, বর্তমানের আবির্ভাব ঘটান সেই ভাবনাতরঙ্গ রূপ ধরেছে মৃত্যুবোধকেই স্পষ্টতা দেওয়ার জন্য। জীবন মানেই যেন মোহভঙ্গের একটি অধ্যায়মাত্র।—

'আমরা দু-জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।'
('আট বছর আগের একদিন'— মহাপৃথিবী)

রবীন্দ্রনাথের কাব্যভাষায় :

'তাই এ ধরারে
জীবন-উৎসব-শেষে দুই পায়ে ঠেলে
মৃৎপাত্রের মতো যাও ফেলে।'
('শাজাহান' : বলাকা)

লক্ষণীয়, উপরের দুইটি কাব্যোদ্ধৃতির ভাবনাগত মূল লক্ষ্য এক হলেও ভাবনার চরিত্রে তফাত আছে। প্রথম পংক্তির কবিকণ্ঠ যেখানে উত্তম পুরুষে উচ্চারিত, সেখানে দ্বিতীয়টির কবিকণ্ঠ মধ্যম পুরুষে। সামান্য এই সর্বনামের তফাতে এই দুইটি কবিতার সামগ্রিক গঠনপ্রকৃতিতে (ধ্বনি ও ব্যঞ্জনাসমেত) আমূল প্রভেদ ঘটে গেছে। প্রথম কবিতাটির ভাবনাপুঞ্জ যেখানে নাট্যধর্মী কবিতার প্রকরণ গ্রহণ করেছে, দ্বিতীয়টি সেখানে লিরিক ও বর্ণনাত্মক কবিতার মধ্যবর্তী স্তরে এসে দোদুল্যমান—পথ ঠিক করতে না পেরে অনেকটা যেন দ্বিধাগ্রস্ত। অবশ্য এও ঠিক 'শাজাহান' কবিতাটিতে নাট্যধর্মী কবিতার সম্ভাবনা নিহিত ছিল।

'সাতটি তারার তিমির' জীবনানন্দের শুধুমাত্র পরিণততম কাব্যগ্রন্থই নয়, পরিশুদ্ধ-চৈতন্যের কবিতাগুচ্ছ. নাগরিক চেতনার যথোচিত কাব্যভাষার সমীকরণে এই গ্রন্থটি বাঙলা কবিতার ইতিহাসে উজ্জ্বল স্তম্ভের মতো। সত্যি কথা বলতে কি, প্রায় আঠাশ বছর আগে 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থটি তার জন্মলগ্নে যতটা সমসাময়িক ছিল, সময়ের অগ্রসৃতির সঙ্গে কবিতাগুলি জীবনীশক্তি যেন আরো বেড়ে গিয়েছে। ছিন্নমূল জীবনের শূন্যগর্ভতা, দুরন্ত ব্যস্ততাময় সময়প্রবাহ, প্রাণধারণের অসহনীয় গ্লানি, প্রচণ্ড ও ভয়ঙ্কর অনিশ্চিতি এবং মৃত্যুর নিরবলম্ব চেতনা গ্রন্থটিকে যুগের অনিবার্য কাব্যভাষায় চিহ্নিত করেছে। আর এই কাব্যগ্রন্থটি পড়লে বিশেষভাবে মনে হয়, এলিয়ট ও জীবনানন্দ একই চৈতন্যের যেন দুই ভিন্ন ভাষারূপ।

'They are rattling breakfast plates in basement kitchens,
And along the trampled edges of the street
I am aware of the damp souls of housemaids
Sprouting despondently at area gates.

The brown waves of fog toss up to me
Twisted faces from the bottom of the street,...
('Morning at the Window'– : Prufrock 1917)

'আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায় ;
বিষণ্ণ খড়ের শব্দ ঝ'রে পড়ে ইস্পাতের কলে ;
চায়ের পেয়ালা কটা বেড়ালছানার মতো—ঘুমে—ঘেয়ো
কুকুরের অস্পষ্ট কবলে
হিম হ'য়ে ন'ড়ে গেল ও-পাশের পাইস্-রেস্তরাঁতে'
('ঘোড়া' — সাতটি তারার তিমির)

এই দুটি ছোট কবিতায় একই প্রেক্ষিত একই পৃথিবীর রঙ ধরা পড়েছে। এই দুটি কবিতাকে এই দুই কবির সমগ্র কাব্যসংগ্রহের নান্দীমুখ বললেও অত্যুক্তি হয় না। শ্রুতিসচেতন পাঠকের কান কখনো এড়াবে না যে এক অসুস্থ, অনিশ্চিত মৃত্যুময়তা, এক অসহনীয় মরুভূর হাহাকার ভিন্ন ভাষায় দুই কবিতাতেই নিহিত। পংক্তির দৈর্ঘ্য ও অসমতা একই অভিপ্রায়ে সিদ্ধ হয়েছে দুইটি কবিতাতেই। এক বিবর্ণ অনিশ্চিত জগতের দিকে ধাবমান ধ্বনিরেখা যেন সহসা পথভ্রষ্ট—ছিন্নমূল। যাই হোক, 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থে সংগৃহীত 'ঘোড়া', 'গোধূলি সন্ধির নৃত্য', 'রাত্রি', 'উন্মেষ', 'খেতে প্রান্তরে', 'বিভিন্ন কোরাস', 'জুহু', 'সময়ের কাছে' ইত্যাদি কবিতায় এক সময়ের মৃত্যুনীল প্রকৃতিচেতনা মৃত্যুবিদ্ধ নাগরিতায় রূপান্তর পেয়েছে। ব্যক্তিগত জীবনের ক্ষেত্রে পটভূমিকার পরিবর্তন এক পরিবর্তিত, পরিশুদ্ধ ও পরিণততম বিষয়-বিষয়ীকে জীবনানন্দের কবিতায় আহ্বান জানিয়েছিল।

জীবনানন্দের সমগ্র কবিচৈতন্যকে তাঁর একটি প্রশ্নখন্ড কাব্যপংক্তির মধ্যে আশ্চর্যভাবে শনাক্ত করা যেতে পারে।—

'তিমিরহননে তবু অগ্রসর হ'য়ে
আমরা কি তিমিরবিলাসী?'
('তিমিরহননের গান' — সাতটি তারার তিমির)

আর এলিয়ট? সেই একই রাত্রিময় চৈতন্যে মথিত :

O dark dark dark. They all go into the dark,
The vacant interstellar spaces, the vacant into the vacant',
('East Coker' – Four Quartets)

এই যে রাত্রির কথা জীবনানন্দ ও এলিয়ট বিশেষভাবে উচ্চারণ করেছিলেন, সে রাত্রি সৌরজগতের নিয়মানুবর্তিত রাত্রি নয়। এ সেই সময়চেতনা যা অতীত-বর্তমান-অনাগতে বিস্তৃত হয়ে এক অনিশ্চিতের দিকে প্রবল গতিতে ধাবমান। বর্তমান যেন 'সহসা ভোরের মূর্খ উচ্ছ্বাসে' জেগে-ওঠা জীবন। তারপর আবার অন্ধকার। এলিয়টের ভাষায় : 'As, in theatre,/The lights are extinguished, for the scene to be changed/With a

hollow rumble of wings, with a movement of darkness on darkness,'। ফলে পুনরুক্তি হলেও বলছি, জীবনানন্দের (আশ্চর্যভাবে এলিয়টেও) কাব্যপংক্তি অসম্ভব রকমের দীর্ঘ। মনে হয় যেন এক ধ্বনিরেখার অনিশ্চিত আঘাতে এগিয়ে চলেছে—যে কোনো সময় ধ্বনিবিপর্যয় ঘটে যেতে পারে—পাঠক এই অনুভূতি নিয়ে যখন কবিতা পাঠ শেষ করবেন তখন তাঁর মনে হবে যে সমস্ত ধ্বনি-পরিমণ্ডল একটি নিবিড় সংযমের মধ্যে স্থিত আছে। বহুলাঙ্গ ভাবনাপুঞ্জের স্বাভাবিক দাবিতেই যেমন এলিয়টের তেমনি জীবনানন্দের কবিতা দীর্ঘতার দিকে ঝুঁকেছিল। অন্তত এঁদের সফল সময়চিহ্নবাহী কবিতাগুলির অধিকাংশই দীর্ঘ। বর্তমান মানুষ, যুগপরিস্থিতি এবং ব্যাপক শিল্পচেতনার বিচারে দীর্ঘ নাট্যধর্মী কবিতার প্রকরণ যে নিতান্ত প্রয়োজনীয়—জীবনানন্দ এই গদ্য উচ্চারণের দ্বারা বাঙলা কবিতার ভবিষ্যৎ মুক্তির সেই ইঙ্গিত দিয়ে গিয়েছিলেন।

তবু বলব, একজন শিক্ষানবীশ পদ্যলেখকের পক্ষে জীবনানন্দে মগ্ন হওয়া এক মস্ত ঝুঁকির ব্যাপার। আমাদের সময়ের যথোচিত ধ্বনি আর রঙ জীবনানন্দের কবিতায় যতটা গাঢ়ভাবে প্রতিফলিত তাঁর সমসাময়িকদের কবিতায় ততটা লক্ষ্যগোচর হয় না। ফলে পদ্যশিক্ষানবীশের কাছে জীবনানন্দ দাশের কবিতা বড় বিশ্বাসঘাতক, বড় নিরুপায় অনিবার্য মৃত্যুর টান। জীবনানন্দের কবিতার ঘূর্ণাবর্ত সহ্য করা কঠিন নতুন পদ্যলেখকের পক্ষে—অন্য কবির অন্তরাল প্রয়োজন হয়—অন্য কবির মধ্যস্থতা মানতে হবে জীবনানন্দের দিকে এগোতে হলে। জীবনানন্দের অসামান্য কৃতিত্বগুলি উপলব্ধি করে পরবর্তীরা নিজের পায়ে দাঁড়াবার আত্মবিশ্বাস পেতে পারেন তখনই। নিজের পরিপার্শ্বের চরিত্র, ব্যাপ্তি, জটিলতা ও তার উপযুক্ত প্রকরণ সম্পর্কে পরবর্তীরা তখনই নিজের মতো করে ভাববার একটি স্বাধীন রাস্তা খুঁজে পাবেন।

জীবনানন্দ দাশের একটি কবিতা ঃ 'পটভূমির'

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

পটভূমির ভিতরে গিয়ে কবে তোমায় দেখেছিলাম আমি
দশ-পনেরো বছর আগে ;—সময় তখন তোমার চুলে কালো
মেঘের ভিতর লুকিয়ে থেকে বিদ্যুৎ জ্বালালো
তোমার নিশিত নারীমুখের ;—জানো তো অন্তর্যামী।
৫ তোমার মুখ ঃ চারিদিকে অন্ধকারে জলের কোলাহল,
কোথাও কোনো বেলাভূমির নিয়ন্তা নেই,—গভীর বাতাসে
তবুও সব রণক্লান্ত অবসন্ন নাবিক ফিরে আসে ;
তারা যুবা, তারা মৃত; মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল।
সময় কোথাও নিবারিত হয় না, তবু, তোমার মুখের পথে
১০ আজো তাকে থামিয়ে একা দাঁড়িয়ে আছ, নারী,—
হয়তো ভোরে আমরা সবাই মানুষ ছিলাম, তারি
নিদর্শনের সূর্যবলয় আজকের এই অন্ধজগতে।
চারিদিকে অলীক সাগর—জ্যাসন ওডিসিয়ুস ফিনিসিয়
সার্থবাহের অধীর আলো,—ধর্মাশোকের নিজের তো নয়, আপাতত কাস
১৫ আমরা আজো বহন করে, সকল কঠিন সমুদ্রে প্রবাল
লুটে তোমার চোখের বিষাদ ভর্ৎসনা...প্রেম নিভিয়ে দিলাম প্রিয়।
(বেলা অবেলা কালবেলা, ৫২)

এই কবিতা, অশোকানন্দ দাশের কাছে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির অন্তঃসাক্ষ্য সমর্থন করে বলা যায়, প্রভূত সংশোধন ও পাঠভেদের ফল। ঐ পাণ্ডুলিপির দশনম্বর কবিতা এটি, নাম ঃ 'আকাশলেখাকে'। ঐ 'আকাশলেখা'ও ক্রমে এই সব নামের পরম্পরা পার হয়ে এসেছে ঃ 'পত্রলেখা', 'আলোকলেখা', 'জ্যোৎস্নালেখা', 'চিত্রাসেনী' এবং উপান্ত্য মুঘল নাম 'জাহান্-আরা'। সাময়িকীতে প্রকাশকালে প্রথম লাইনের শুরুতে সম্ভবত ছিল 'স্বাতী তারা' ('পটভূমির ভিতরে গিয়ে'র জায়গায়) এবং প্রান্তবর্তী 'আমি'র প্রাক্-শব্দ ছিল 'কলকাতাতে'। এখানে যে-পাঠ পাচ্ছি সেটি প্রথম থেকেই স্থানিক অনুষঙ্গ অতিক্রম করে গিয়েছে। অথবা ঘুরিয়ে বলা যায়, অচিরেই সময়কে পরিসর করে তুলতে পেরেছেন কবি, যেহেতু, 'our idea of time is always blended with the idea of space' (কোলরিজ)। অলঙ্কারশাস্ত্রে যাকে coenesthesia বা নানা ইন্দ্রিয়ের সংগৃহীত ফলশ্রুতি বলা হয়, এরকম পংক্তি তাঁর এই পর্বের (১৯৪৬) কাছাকাছি অন্যান্য রচনায়, যেমন গদ্যেও, বিরল নয় ঃ 'সময়ে কালো শেরওয়ানীর মতো অন্ধকার' (মাল্যবান ১৯৪৮ পৃ

২৭)। কিন্তু এই কবিতায় সময়কে প্রতিবেশের স্পষ্টতায় আরো স্পর্শবহ করে তোলা হয়েছে বলে মনে হয়। এরি মধ্যে, অনতিগোচরে, একটি নিদারুণ নিয়তিময় বিচ্ছেদের কথা বলা হয়েছে। একটি নারী, একাধারে নায়িকা ও নিয়তি, যে আক্ষরিক অর্থেই ঘটনাপ্রবাহকে তার স্বকীয় চাহিদায় এগিয়ে নিয়ে যায়, যাকে সংস্কৃতানুগ কিংবা সেমিটিক, এমন কি যেকোনো রকম মানবীনামের গণ্ডিতেই আর ধরা যাচ্ছে না। কবিতাটির প্রথম ঝোঁক শেষ হবার আগেই সেই নারী, রবীন্দ্রনাথের 'কৌতুকময়ী'র মতো, সর্বজ্ঞ ও সর্বনিয়ন্ত্রী একটি শক্তিতে পরিণত এবং দ্বিতীয় ঝোঁকে দেখা যাচ্ছে সমুদ্রের সীমাহীনতায় তার রহস্যের পটভূমি বিস্তারিত হয়েছে। হেলেন সম্পর্কে ডক্টর ফস্টাস-এর 'was this the face that launched a thousand ships' নিশিত এই মুখের উদ্দীপন-বিভাব। তাকে ঘিরে কোনোই অবরোধ নেই, সে নাবিকের নিরুদ্দেশ যাত্রার সমীপবর্তী, তা সত্ত্বেও অনারোহ থেকে যাচ্ছে। নাবিক বা প্রেমিককে প্রত্যর্পিত হতে হয়েছে, তার পুঞ্জিত পরিশ্রমের ব্যর্থতা নিয়ে। দ্বিতীয় স্তবকে (৮ লাইনে সূচিত) বেজে উঠেছে নিয়তিবিদ্ধ প্রেমিকের মিতভাষণ, নশ্বরতার মধ্য থেকে সেঁচে-আনা মন্ত্রমণির মতো। আকাঙ্ক্ষিত নারীকে উদ্দেশ করে শুদ্ধশীল দূরত্ব থেকে জয়গাথা রচনা ক্রুবাদুর বা মিনেসিঙ্গারের ব্রত হলেও আধুনিক কালের মানুষের অভীপ্সা অন্য : পাওয়া যাবে না জেনেও অর্জন করতে গিয়ে মৃত্যুবরণই তার ট্রাজিক অন্বিষ্ট। ভাবাসঙ্গে নিঃসন্দেহে ভিকতর হুগোর Les travailleurs de la mer (বা সমুদ্রের শ্রমিক) উপন্যাসের নামটির কথা মনে পড়ে। এই প্রেমিকও যেন সমুদ্রের শ্রমিক, যার কাছে তার অভিজ্ঞতার ফলশ্রুতি যে-কোন প্রাপ্তির চেয়েও মূল্যবান। সেই মুহূর্তে ব্যক্তি (আমি) পরিণত ব্যাপ্ত-সত্তায় (আমরা) রূপান্তরিত হয়ে যায়। নারীর ভিতরে সে তখন নিরীক্ষণ করে একটি আর্কেটাইপ, যে পরিবর্তমান সময়কে প্রতিহত করে রেখেছে। তার সঙ্গে ঐ নারীর ব্যক্তিগত সম্পর্কের চরিত্রও যায় পাল্‌টে। অথবা, সেই সম্পর্ক থেকে ঝরে যায় ঘরোয়া স্মৃতির রেশটুকুও, জেগে ওঠে নিরঞ্জন মানবিক চৈতন্য। ১১ পংক্তি থেকেই কবির এই অভিপ্রায় ব্যক্ত হয়ে ওঠে, বিশেষত মুদ্রিত পাঠের 'হয়তো' অংশের সঙ্গে খসড়ায় 'কোন-এক' অংশের তুলনা করলে। বস্তুত 'কোন্-এক' শব্দটি আরো জোরালো ছিল। একসময় আমরা মানুষ ছিলাম, কিন্তু তা যে ঠিক কবে সে-কথাটা ধরতে পারা যাচ্ছে না বলে এরকম সংশয় দেখা দিচ্ছে, আদৌ বুঝি কখনো আমরা মানুষই ছিলাম না, নাহলে এত অন্ধতা আজকের বস্তুবিশ্বে তৈরী হতো না। 'হয়তো' শব্দে কবি এই সত্যস্পর্শী রূঢ়তাকে ঈষৎ ঢেকে দিয়েছেন। বলা বাহুল্য, শর্তহীন এক মনুষ্যত্বের মূল্যবোধটিকেই ক্রমশ এই কবিতায় সন্দীপ্ত করে নেওয়া হয়েছে।

শেষ চার লাইনে এই মনুষ্যত্ব—জ্ঞান যার অন্য নাম—সন্ধান ও সাধনার বিষয় হয়ে উঠেছে। জ্যাসন এই সত্যসন্ধিৎসার প্রথম প্রতীকপুরুষ, যে তার সংক্ষিপ্ততম এই চরিত্রণের মধ্যেও তার পৌরাণিকতার কুহেলি ছিঁড়ে আধুনিকতার প্রমূর্তি হয়ে উঠেছে। তুলনীয়, সুধীন্দ্রনাথ : 'যে প্রাক্তন তৃষা/মেটাতেপারেনি সিন্ধু, হয়তো বা নির্বাণ হবে তা/জোয়ার-ভাঁটার সন্ধি নদীবক্ষে, যেথা/মুকুরিত মহাশূন্য, সমুদ্রের পিতা ও প্রতীক/দুরত্যয়, স্বস্থ, প্রগতিক।' (জেসন, ১৯৩৯)। এমন হতে পারে সুধীন্দ্রীয় সেই জেসনই জীবনানন্দের জ্যাসনের মৌল প্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। দুইয়েরই লক্ষ্য নির্বাণ। কিন্তু জীবনানন্দর হাতে এই চরিত্র বা ওডিসিউস (ইউলিসিস) তাদের জ্ঞানের অন্বেষায় ছিন্ন করে নিয়েছে তাদের সমস্ত প্রলোভন আরো সহজে। 'To follow knowledge like a sinking

star', ইউলিসিসকে নিয়ে রচিত টেনিসনের মৃত এই পংক্তিটিও এই সূত্রে যেন নতুন প্রাণ পেয়ে পাঠককে অতর্কিতে চমকে দেয়। মনে রাখতে হবে ফিনিসিয় 'সার্থবাহ' বলতে এখানে একযোগে যাত্রারত বণিকসংঘকে বোঝাচ্ছে না, বোঝাচ্ছে দিশারী একটি সত্তাকে। এই সত্তা নির্মোহ ঋজুতায় সত্যকে খুঁজে ফেরে প্রাণবন্ত আগ্রহে। ১৪ লাইনের এই তাৎপর্যময় প্রথম পর্বের মূল পাঠ ছিল 'বিরাট অন্বেষণের দিবস'। এই অন্বেষণের কালপট-হিসেবে রাত্রির কথা বলা হচ্ছে না, রাত্রির মোহমদির আচ্ছন্নতাকে বর্জন করে সেই দিনের কথা বলা হয়েছে যা 'নবজাতকের' একাধিক কবিতায় নন্দিত হয়েছে। ধর্মাশোকের যে তিতিক্ষার আলো, এ বুঝি সে-আলোকও নয়, কেননা ততোখানি শুদ্ধি তার অধিকারে আসেনি এখনো। ওই দিশারীদের প্রজ্ঞান বিশেষতই আপেক্ষিক, যদিও তাদের অন্বিষ্টার চেতনা কালকে অতিক্রম করে গিয়েছে। সেই অন্বিষ্টা হয়ে উঠেছেন ধীমন্ত দীপ্তির আধার, নির্মম সমুদ্রের প্রবাল লুণ্ঠন করে তাঁর দৃষ্টির মনস্বী বিষাদ ও ভর্ৎসনা যেন নির্মিত হয়েছে। এই বিষণ্ণ ভর্ৎসনা কবিকে (প্রেমিক/শ্রমিক/নাবিক) প্রেমের স্বপ্নাভিরাম সরণি থেকে সরে গিয়ে অনন্যশরণ জ্ঞানের দিকে মোহাঞ্জনমুক্ত সম্পূর্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে প্রবুদ্ধ করে। প্রেম নয়, প্রজ্ঞান, এই হলো কবিতাটির প্রমূল্য।

এই কবিতার এক-একটি অংশ স্বয়ম্পূর্ণ স্মৃতিধার্য সূক্তির মতো অনবদ্য এবং গোটা কবিতাটিই এক তুলনাহীন মহত্ত্বের দ্বারা আক্রান্ত। কিন্তু ঐ সূক্তিময়তা ও প্রবাহগুণের মধ্য অটুট কোনো সম্পর্ক তৈরি হয়ে উঠেছে কিনা সেটি সংশয়ের বিষয়। স্বরবৃত্তের চলনটি এক-এক জায়গায় যেমন রাবীন্দ্রিক সার্থকতাকেও ছাপিয়ে গিয়েছে, তেমনি কোনো কোনো ক্ষেত্রে (যেমন, 'জানো তো অন্তর্যামী' অথবা 'সময় কোথাও নিবারিত হয় না তবু') ক্লিষ্ট বলে মনে হতে পারে। এর কারণ এমন হওয়াই স্বাভাবিক, এই সব জায়গায় বেসুরো মধ্যখণ্ডন এবং/অথবা অনিয়মী সিলেবলস্থাপনের সাহায্যে তিনি পাঠকের মনকে শ্রুতি-সম্মোহ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে গিয়েছেন কিছু জরুরি কথা বলবেন বলে। পদান্বয় তাই বুঝি এত সেমিকোলন-লাঞ্ছিত। কিন্তু জীবনানন্দ লিখেছেন বলেই হয়তো আমরা এরকম পুনর্বিবেচনার প্রস্তাব সম্ভাব্য বলে মনে করছি, আর কোন পদকর্তার ক্ষেত্রে এটি আমরা মেনে নিতাম কিনা সন্দেহ। শেষ চারটি লাইন সম্পর্কেও বলা যেতে পারত, এই শ্লোকসম্মিত অনবকাশের মধ্যে ঘটে গিয়েছে সংস্কৃতির ইতিহাসের বিরাট একটি অধ্যায়, পাঠককে বিশ্বাস স্থাপন করার জন্যে এতটুকু সময় না দিয়েই। কিন্তু এটি নিশ্চয়ই এরকম প্রজ্ঞাপারমিতা কবিতার পক্ষে স্বাভাবিক। পাঠকের কাছে কবির প্রত্যাশা, ডিউইর মতোই, মূল রচয়িতার তল থেকে ব্যাখ্যাতিগ এই কবিতাটির অন্তঃশীল আস্বাদন।

নির্জনতম কবি?

স্নেহাকর ভট্টাচার্য

১

"নানা মুনির নানা মত থাকাটা দুঃখের বিষয় নয় ; নানা মুনির মতের ঐক্যটাই সাহিত্য-সমাজে আসল দুঃখের বিষয়। কেননা সে মত যদি ভুল হয় তাহলে সাহিত্যের বোল কড়াই কাণা হয়ে যায়। এবং মুনিদের যে মতিভ্রম হয়—একথা সংস্কৃতেও লেখা আছে।" (প্রমথ চৌধুরী)

জীবনানন্দের কাব্যবিচারে—অন্ততঃ একটি ক্ষেত্রে—মুনিদের ঐকমতের মত দুঃখজনক একটি ঘটনা ঘটে গেছে অনেক আগে। হয়তো বা তাঁকে শ্রীবুদ্ধদেব বসু অনুরাগেই 'নির্জনতম' সংজ্ঞায় অভিহিত করেছেন—কিন্তু, আজ সেই সংজ্ঞা-নির্ধারিত স্বাদ থেকে জীবনানন্দের কাব্যফলের স্বাদ ভিন্নতর।

জীবনানন্দ 'নির্জনতম কবি',—এই কথাটি বহুশ্রুত এবং বহুশ্রুত বলেই লোকমানসে এত পাকাপোক্ত। সংজ্ঞাটির ভঙ্গিটুকু যতখানি অনবদ্য তার যাথার্থ্য সম্পর্কে আমার সন্দেহ ঠিক ততখানি। জীবনানন্দের কাব্য বারবার নতুন করে ভাবায়। তাহলে এতদিনে সংজ্ঞাটির অবলুপ্তিই তো অনিবার্য ছিল। কিন্তু, যেহেতু আমরা নতুনকে বরণ করে নিই ততক্ষণ যতক্ষণ সেই নতুনকে পুরনো চিন্তাধারায় বিচার করতে পারি, চিহ্নিত করতে পারি। যখন আর সেটা সম্ভব হয় না—নতুন করে ভাবতে হয় তখনি উৎসাহ স্তিমিত হয়ে আসে, আমরা ভীত হই। জীবনানন্দের কাব্য সম্পর্কে প্রীতি হয়তো আছে তাঁদেরও এবং পরিশ্রমের ভীতিও যে কম নেই একটি কথার পুনরাবৃত্তিই তার প্রমাণ দেবে, অন্য সাক্ষীসাবুদের প্রয়োজন হবে না।

রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে বলেছেন 'চিত্ররূপময়'। কী আশ্চর্য সেই কথাটির সার্থকতা! একটি বিশেষ মানসকে সবার থেকে আলাদা করে—সত্যরূপে দেখা—চিরকালের মত করে দেখা প্রতিভাত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের কথায় ; যেন তা জীবনানন্দের অনিন্দ্য রূপলোকের মন্ত্র যাতে তাঁর সব কবিতার বন্ধ দরজা একে একে খুলে যায়। কবিতা বিস্তার আনে, সংজ্ঞা সংহত করে সবার থেকে বিচ্ছিন্ন করে আলাদা করে দেখায়। কিন্তু ভুল সংজ্ঞা সীমিত করে—বিপুলকে তার মর্মে না চেয়ে ভুলের মধ্যে পেতে চায় ; গতির মধ্যে যতি আনে।

'নির্জনতম কবি' সংজ্ঞাটি কোন্ অর্থ বহন করে আনে যাতে জীবনানন্দের কবিতার অন্তঃস্থল পর্যন্ত দেখতে পারি? মনে রাখতে হবে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন কবিতা সম্পর্কে, আর এটি হচ্ছে 'কবি' সম্পর্কে। অবিশ্যি কবির ব্যক্তিগত জীবন সম্পর্কে যদি প্রযুক্ত হত তাহলে আক্ষেপ না করলেও চলত। কিন্তু এই দিয়েই যখন তাঁর কবিতা বোঝাবার চেষ্টা

হয়ে থাকে আশ্চর্য মূঢ়তায় বিজ্ঞাপনে বিশেষণরূপে ব্যবহৃত হতে থাকে তখন নীরবতা মানে—আর যাই হোক—সততা নয়। বলার মাধুর্যটুকু বাদ দিয়ে জীবনানন্দের রূপলোকে যেতে পথের ইশারা কতখানি পাই, 'নির্জনতম কবি' প্রসঙ্গে সেই কথাটিই আজ বিচার্য।

'নির্জনতম' কথাটি কি জীবনানন্দের সৃষ্টির নিঃসঙ্গতা বোঝাতে প্রযুক্ত? তা যদি হয় তাহলে বলব, আত্মার একাকীত্বে লালিত সৃষ্টির পরম-লগ্নে কোন্ কবি নিঃসঙ্গ নন? কেননা সৃষ্টির চিরকালের কথা হচ্ছে নির্জনতা, অন্ধকার, নিঃসঙ্গ একাকী হৃদয়ে সেই সৃষ্টির বীজ যখনি ভাবের ও আবেগের আলো-হাওয়ার ডাক শুনল তখনি সৃষ্ট অঙ্কুর এল সবার মাঝখানে—অন্ধকার মাটি ভেদ করে। সেই মুহূর্তে সবাই একা ; শুধু জীবনানন্দ নন। আর যদি একটি বিরল মানসের বিস্তারকে তেমনি ভাবেই উপলব্ধি করতে যাই, তাহলে—আমার ভয় হয়—আমরা একই ভুল করব। মহৎ কবি মাত্রেই বিরল মানসের অধিকারী। সবার থেকে আলাদা হবার পথের সব বাধা জয় করেছেন বলেই তো তাঁর নিজের বলার কথাটুকু আর কারুর নয়, একান্ত ভাবে তাঁরই ; শুধু কথাটুকু নয়, ভঙ্গিটুকুও। তাই শেলীর কবিতা ওয়ার্ডসওয়ার্থের মত নয়, ওয়র্ডওয়ার্থের কবিতা বায়রণের মত নয় ; রবীন্দ্রনাথের কবিতার মত আর কারুর কবিতাই নয়। তাঁদের কি আমরা বিরল মানসের অধিকারী বলব না? যদি বলি, তবে বিরল মানসের অধিকারী বলে তাঁরা তো সবাই 'নির্জনতম কবি'। জীবনানন্দ নিজেও তার অধিকারী। কেমন করে তবে এই সংজ্ঞা দিয়ে তাঁকে আলাদা করে পেতে পারি।

প্রকৃতিকে ভালোবেসে—শুধু ভালোবেসে নয়—তার মধ্যে নারীর মদির মাদকতা আবিষ্কার করে, তার মধ্যে একা একা ডুবে যেতে চেয়ে, পৃথিবীর বেদনা থেকে মুক্তি কামনা করে, এমন কী পৃথিবীর প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভরে গিয়ে জীবনানন্দ নির্জনতাকে আহ্বান করেছেন মাঝে মাঝে ঃ

> আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ-মদের মতো
> গেলাসে-গেলাসে পান করি,
> এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘসি,
> ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
> ঘাসের ভিতরে ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
> শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে। (ঘাস)

> পৃথিবীর বাধা—এই দেহের ব্যাঘাতে
> হৃদয়ে বেদনা জমে ; স্বপনের হাতে
> আমি তাই
> আমারে তুলিয়া দিতে চাই। (স্বপ্নের হাতে)

> আমার সমস্ত হৃদয় ঘৃণায়—বেদনায় আক্রোশে ভ'রে গিয়েছে;
> সূর্যের রৌদ্রে আক্রান্ত এই পৃথিবী যেন কোটি-কোটি শূয়োরের আর্তনাদে
> উৎসব সুরু করেছে। (অন্ধকার)

কিন্তু জীবনানন্দ চিরকাল একটি মনোভাবের, একটি চেতনার বিন্দুতে লগ্ন হয়ে থাকেন নি। মহৎ কবির মত বারবার নিজেকে নতুন ভাবে সৃষ্টি করেছেন; রূপান্তরিত হয়েছেন ; নির্জনতার অন্ধকার থেকে স্বজনপ্রিয়তার ও বিশ্বাসের আলোকে ফিরে এসেছেন ঃ

কিংবা যারা এই সব মৃত্যু রোধ করে এক সাহসী পৃথিবী
সুবাতাস সমুজ্জ্বল সমাজ চেয়েছে—
তাদের ও তাদের প্রতিভা প্রেম সংকল্পকে ধন্যবাদ দিয়ে
মানুষকে ধন্যবাদ দিয়ে যেতে হয়। (এই সব দিনরাত্রি)

মৃত্যু আছে, তবু সেই মৃত্যু ভেদ করে উড়ে যাওয়া,
সূর্য নেই, তবু সেই অয়নের সূর্যের বিশ্বাসে। (নিবিড়তর)

আজ তবু কণ্ঠে বিষ রেখে মানবতার হৃদয়
স্পষ্ট হতে পারে পরস্পরকে ভালোবেসে। (আলোপৃথিবী)

পৃথিবীতে এই জন্মলাভ তবু ভালো ; (পৃথিবীতে এই)

উপরি-উক্ত উদ্ধৃতিগুচ্ছ দুটিতে জীবনানন্দের কবিমানসের রূপান্তরের চিত্র স্পষ্টতর হবে আশা করা যায়। জীবনানন্দের কাব্যে এ বিরোধ নয়, এ তাঁর কবিমানসের নব-নব বোধ।

'সমাজসচেতন কবি', 'ইতিহাসসচেতন কবি', 'প্রেমিক কবি' ইত্যাদি সংজ্ঞার স্বল্প-পরিসর ঘরে অনেক কবিই কবিজীবন কোনোমতে কাটিয়ে চলে যান। কিন্তু জীবনানন্দের চেতনার বিস্তার আরো ব্যাপক ছিল, যাতে সমস্ত সংক্ষিপ্ততার কাঠিন্য চুরমার হয়ে যাচ্ছে। তাই তাঁকে কোনো বিশেষ সময়ের কবিতায় পাওয়া যাবে না। তাঁকে পাওয়া যাবে সামগ্রিকতায়, তাঁর সময়ের ফলবান খণ্ডগুলির সংযোজনায়। তিনি নিজেও বলেছেন, "...সৎ কবির স্বভাব ও শিক্ষা ক্রমেই বদলাচ্ছে ;—এই বদলানোটাই প্রাণতত্ত্বের নিয়ম, কবিতারও খুব সম্ভব প্রাণের পরিচায়ক। শিক্ষিত স্বভাবের অব্যয় স্পষ্টতায় আজ যে কবিতা সৃষ্ট হচ্ছে তাঁর, সেটা তাঁর কবিজীবনের একটা পর্যায়ের ভিতর পড়ল ; অন্য সব পর্যায় পরে আসছে ; পরের পর্যায়গুলো আজকের পর্বের চেয়ে উন্নত বা ভালো হতে পারে, নাও হতে পারে, খারাপও হতে পারে,—কিন্তু বিভিন্ন।" এই ভিন্নতায় জীবনানন্দ অনন্য।

তাই কবি জীবনের শেষপ্রান্তে যখন জীবনানন্দের কবিমানসের উদ্দাম বলিষ্ঠ পাখি 'নির্জনতম কবি' সংজ্ঞার সোনার খাঁচা ভেদ করে অপার আলোকে সবার মাঝখানে ডানা মেলে দিয়েছে তখন তাঁকে কয়েকটি পরিত্যক্ত, বিচ্ছিন্ন ও ধূসর পালকের ঘ্রাণের মধ্যে পাবো না, পেতে পারি না। আর বাজারে চলতি মতামতের যারা স্বল্প-মূল্যের ক্রেতা,—তারা জীবনানন্দকে 'নির্জনতম' মেনে নিয়ে বাজারে ভাষাতেই তাঁকে আক্রমণ করেছে ; তাদের সামনে থেকে এই লক্ষ্যবিন্দুটি সরিয়ে নিলে যে অপার শূন্যতার হাহাকার উঠবে তা কি কোনোদিন পূর্ণ হবে?

২

মহৎ শিল্পীর মধ্য দিয়ে কাল নিজের উদ্দেশ্যটুকু ফুটিয়ে তোলে। দেশ-কাল-সমাজকে আত্মস্থ করেই মহৎ কবি, তাকে বাদ দিয়ে নয়। অবিশ্যি সময়ের সামান্যতম কম্পনটুকু বুকের বীণার মধ্যে ধরে রাখতে হলে তীক্ষ্ণ অনুভূতিসম্পন্ন সচেতন মনকে গড়ে তোলা প্রয়োজন। জীবনানন্দের সেই মন ছিল। অনেকে, যাঁরা কালকে ফুটিয়ে তুলেছেন বলে প্রচারিত তাঁদের কাল আর আসে নি। কবিতা—শুধু কবিতা কেন—যে কোনো শিল্পের

মহত্তর পরিণতি সময়ের যান্ত্রিক প্রতিফলনে সম্ভব নয়। কবি বাইরে থেকে উপাদান এনে এক অদৃষ্টপূর্ব মনোময় রূপলোকের নির্মাণপ্রয়াসী। কবি যত বড়ো তাঁর নিজস্ব জগতের পরিধি তত বিস্তৃত।

বহির্জগতের শব্দ-রস-রূপ-গন্ধ ঠিক যেমন আছে কবিতাতেও ঠিক তেমনি থাকবে আজ আর তেমন আশা কেউ করবে না। বাইরের আলো মনের পরকলার মধ্যে বিশ্লিষ্ট হয়ে নিগূঢ় চেতনার যে অংশটুকু আলোকিত করে ভিন্ন দৃশ্যাবলী ফুটিয়ে তুলবে, মনের অতল থেকে তারই একখণ্ড তুলে নিয়ে আসবেন কবি। কবি মনে আলোর এই আপতন-প্রতিফলন অবিশ্যি সাধারণ বিজ্ঞানের নিয়মানুযায়ী ঘটে না ; এ-তে বস্তু মনোময় হয়ে ওঠে, মন বস্তুরূপ হয়। তাই জীবনানন্দ রিয়ালিষ্ট নন্, সুররিয়ালিষ্ট। স্বাভাবিক ভাবেই জীবনানন্দ অন্তর্গূঢ় চেতনার নির্দেশ মেনেছেন, বাইরের বস্তু-পৃথিবীর পুনরাবৃত্তিতে উৎসাহবোধ করেন নি। অবচেতন, অর্ধচেতন মনের আলো-ছায়া বিলীন পথে চেতনার খণ্ডদ্যুতিকে অনুসরণ করে জীবনানন্দ সুররিয়ালিজমের পথে এসে পড়েছেন। মনের অনুশাসন মানলেই অবিশ্যি কেউ সুররিয়ালিষ্ট হয় না। কেননা সুররিয়ালিজম্ আজ আর শুধু অস্পষ্ট একটি পথ নয়, একটি সুনির্দিষ্ট মতও বটে। সুররিয়ালিজম্‌কে নৈরাশ্যসঞ্জাত বলা যায়। এই নৈরাশ্য শুধু কবির মনের একান্ত নিজস্ব নয়, বাইরের পৃথিবীতেও তার সমর্থন থাকা চাই। অথবা বাইরের পৃথিবীর নিরাশার ঘনিষ্ঠতায় মনের মধ্যে বস্তুর যে স্থানভেদ, প্রকারভেদ কিম্বা গুণগত প্রভেদ দেখা যাবে তাই হবে সুররিয়ালিষ্ট চিত্র। সুররিয়ালিজমের সঙ্গে সামাজিক অবক্ষয়ের এক অদৃশ্য যোগসূত্র রয়ে গেছে। ডালি যিনি সুররিয়ালিষ্ট আন্দোলনের অন্যতম পুরোধা চিত্রকর ছিলেন, তিনি এ-কে বলেছেন, "systematisation of confusion"; কালের ক্লান্তি ও ক্লেদটুকুকে বাঁচিয়ে নয়, তাকে গ্রহণ করে, আত্মস্থ করে ভিন্নতর পটভূমিকায় উপস্থাপন করাও হবে তাঁদের কাজ। চেতনা ও অবচেতনার মধ্যে সব প্রাচীর ভেঙে ফেলে, সেই অন্তর্লোক জয় করে ক্ষয়ের ছবিটি নিয়ে আসতে হবে সেই ক্ষণদ্যুতি উদ্ভাসিত ম্লান জগৎ থেকে। সুরলিয়ালিষ্ট ম্যাক্স আর্ণষ্ট-এর কথায় ঃ

"it is rather their aim to break down the barriers both physical and psychical, between the conscious and the unconscious, between the inner and the outer world, and to create a superreality in which real and unreal meditation and action, conscious and unconscious meet and mingle and dominate the whole of life."

জীবনানন্দের মন কালের ক্লান্তিকে আত্মস্থ করে অবগাহন করেছে চেতনার ছায়াসলিলে, কিন্তু এতখানি সচেতন সুররিয়ালিষ্ট তিনি ছিলেন না।

মহৎ শিল্পের সঙ্গে সময়ের মানসিক জলবায়ুর আত্মীয়তা আছে এবং জীবনানন্দেরও ছিল। তাঁর বিভিন্ন কাব্যপর্যায়ের মধ্যে সুররিয়ালিজম্ একটি পর্যায় মাত্র হলেও—যা না কি বিশেষ করে 'সাতটি তারার তিমিরে' ললিত—যে চেতনায় এই বোধ জন্ম নেয় তা প্রথম থেকেই তাঁর ছিল। 'ঝরাপালক' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতাটিতেই এই মনোবীজের সন্ধান পাওয়া যাবে ঃ

আমি কবি,—সেই কবি,—
আকাশে কাতর আঁখি তুলি' হেরি ঝরাপালকের ছবি।

(আমি কবি,—সেই কবি)

প্রায় abstract থেকে বাস্তবের ভয়ঙ্কর অসমঞ্জস মূর্তি পর্যন্ত সুররিয়ালিজমের রাজ্যের বিস্তার। তাই অবচেতন মনের সাঙ্কেতিক ভাষা না জানলে এই দেশের বর্ণপরিচয়ের জ্ঞান লাভ করা কঠিন। তবু প্রতীকি কবিতার চেয়ে সুররিয়ালিষ্ট কবিতায় সময়কে আবিষ্কার করা সহজতর। কেননা একই প্রতীকচিহ্ন যখন ভিন্ন ভিন্ন অর্থের দ্যোতনা বহন করতে পারে, তখন পাঠকের অনবধানতাকে দায়ী করে দায়িত্ব এড়ানো চলে—কাজ চলে না।

সন্ধ্যার নদীর জলে এক ভিড় হাঁস অই—একা ;
এখানে পেল না কিছু ; করুণ পাখায়
তাই তারা চলে' যায় শাদা, নিঃসহায়।
মূল সারসের সাথে হ'ল মুখ দেখা।

(একটি কবিতা)

এখানে যে মূল সারস কবির মৃত হৃদয়ের প্রতীক সে কি দেশ? কাল? মানব? পৃথিবী? সমাজ? প্রতীক যে কোনো একটির হতে পারে, সবগুলিরও হতে পারে, তাতে অর্থের এমন কিছু বৈষম্য হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু,

তিনবার তিন গুণে নয় হয় পৃথিবীর পথে ;
এরা তবু নয়জন মায়াবীর মত জাদুবলে। (হাঁস)

এই ন'টি হাঁস কেন যে স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রমে নয় হয়েছে তা খুব স্পষ্ট নয়। Abstract-এর দিকে খুব বেশি ঝুঁকে না পড়লে সুররিয়ালিষ্ট কবিতা লেখকের উদ্দেশ্য পাঠকের মনে পৌঁছে দিতে পারে :

নিদ্রায় আসক্ত হতে গিয়ে তবু বেদনার জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক ;—

এবং,

মোমের আলোকগুলো র'য়েছে পিছনে প'ড়ে অমায়িক সঙ্কেতের মত;
তারাও সৈকত। তবু তৃপ্তি নেই। আরো দূর চক্রবাল হৃদয়ে পাবার
প্রয়োজন র'য়ে গেছে,— (নাবিক)

এখানে যে পরাস্ত নাবিক নিদ্রাহীন বেদনার মধ্যে আরো এক সমুদ্রের তীর খোঁজে আমরা সবাই সেই বেদনার অংশীদার বলে তাকে সহজেই চিনতে পারি, উদ্দেশ্যকে অনুভব করতে পারি।

সারাদিন দূর থেকে ধোঁয়া রৌদ্রে রিরংসায় সে উনপঞ্চাশ
বাতাস তবুও বয়—উদীচির বিকীর্ণ বাতাস ;
নারকেলকুঞ্জবনে শাদা শাদা ঘরগুলো ঠাণ্ডা ক'রে রাখে,
লাল কাঁকরের পথ—রক্তিম গির্জার মুণ্ড দেখা যায় সবুজের ফাঁকে :

(নিরঙ্কুশ)

নগরীর মহৎ রাত্রির সঙ্গে অন্যত্র লিবিয়ার হিংস্র জন্তুসমাকুল অরণ্যের তুলনা এবং এই উদ্ধৃতিটির 'রক্তিম গির্জার মুণ্ড' বাক্যাংশটিতে 'মুণ্ড' কথাটির প্রয়োগ অন্তঃসারশূন্যতার উজ্জ্বলতা আর ঔপনিবেশিক দেশে গির্জার কপট মহিমাকে ধূল্যবলুণ্ঠিত করেছে।

সুররিয়ালিজম্‌কে এতক্ষণ শুধু অবক্ষয় এবং নিরাশার সঙ্গে যুক্ত করেছি। কিন্তু, জীবনানন্দ সনাতন নিয়মে আস্থা স্থাপন করতে গিয়ে সেই গণ্ডী লঙ্ঘন না করেও লিখেছেন :

কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই। (ক্ষেতে প্রান্তরে)

এই বোধ ছিল বলেই নির্জনতা জীবনানন্দকে ধরে রাখতে পারে নি কোনোদিন। অথচ সুররিয়ালিষ্ট বলে তাঁর নির্জনতম হওয়ারই কথা ছিল। সব সময়েই সময় তার ক্ষীণতম তরঙ্গের স্পন্দন রেখেছে তাঁর বুকে। তাই তাঁর কাব্যে সময় ও সমাজের, মানুষের ভাষা শুনি যতখানি ততখানি আর কারো কাব্যে নয়।

জীবনানন্দের কবিমানস যেন কামান গর্জনেরও ওপরের অনাবিল আকাশে অমল মরাল। এই সৌরকরময় প্রোজ্জ্বলতা তাঁর শেষ অর্ঘের উপহার এনেছে।

মানুষের মন থেকে কাটবে না যদিও সব গ্লানি
তবু আলো ঝলকাবে অন্য এক সূর্যের শপথে। (আলোপৃথিবী)

সমাজসচেতনতা, ইতিহাসচেতনা ইত্যাদি খণ্ড খণ্ড চেতনাবৃত্তের পারে জীবনানন্দ উজ্জীবিত হয়েছেন যে মহাপৃথিবীর আলোময়তায় তার নাম সৌর চেতনা। তাই জীবনানন্দ মানে আর ধূসর নির্জনতা নয়, জীবনানন্দ মানে আলোকিত স্বজনপ্রিয়তা।

বাংলা ছন্দোমুক্তির জীবনানন্দীয় সূত্র

আবদুল মান্নান সৈয়দ

মুখ্য অবলম্বন তাঁর, জীবনানন্দ দাশের, অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ; তত্রাচ অপরাপর ছন্দেও-যে তিনি কবিতা রচনা করেননি, তা নয়।

কবিজীবনের লগ্নপ্রাথমে, "ঝরা পালক"-এর বেশ কএকটি কবিতায়, মাত্রাবৃত্ত ছন্দ প্রযুক্ত—বিশেষত অভিনন্দন-বা তর্পণ-সূচক কবিতায়। বস্তুত সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত-নজরুল ইসলাম উক্ত রীতির যে সুপ্রচুর প্রয়োগ করেন তাঁদের কাব্যে, জীবনানন্দে ফলেছে তারই উত্তর-ফসল। আত্মকণ্ঠ আবিষ্কারের পরে তিনি প্রায় আর এই ছন্দের অনুবৃত্তি করেননি। একমাত্র ব্যতিক্রম "শ্রেষ্ঠ কবিতা" গ্রন্থভুক্ত 'লোকেন বোসের জর্নাল';—এবং এই কবিতায় জীবনানন্দীয় আবহ অনুপস্থিত।

তেম্নি কাব্যজীবনের উপান্ত্যকালে, যখন কবি একটি আলদা আয়তনে প্রবেশাকাঙ্ক্ষী, তদানীন্তন কবিতাকতিপয়ে স্বরবৃত্তের প্রয়োগ দ্রষ্টব্য। তাঁর শেষতম কবিতাগ্রন্থ "বেলা অবেলা কালবেলা"-র দশটি কবিতা ও "শ্রেষ্ঠ কবিতা"-গ্রন্থভূক্ত 'তোমাকে ভালোবেসে' ও 'অনন্দা' কবিতাদ্বয় এই পর্যায়ী। লক্ষণীয়ঃ 'তোমাকে ভালোবেসে-র মতো নিট প্রেমকবিতা স্বরবৃত্তে কবি লেখেননি আর; 'তোমাকে' নাম্নী প্রেমকবিতায় বা অন্যান্য স্বরবৃত্তিক কবিতাগুচ্ছেও তাঁর কবিতার জটিলগভীর লোকচক্রটিকেই তিনি প্রবেশ ও মূল্য দিতে চেয়েছিলেন।

গদ্য রচিত কবিতার প্রসঙ্গটিও এখানে চুকিয়ে দেয়া ভালো। গদ্যকবিতা লিখতে শুরু করেন তিনি কবিজীবনের মধ্যপর্বে ঃ "বনলতা সেন" কাব্যগ্রন্থেই প্রথম গদ্যকবিতার সূচনা, তৎপরবর্তী কাব্য "মহাপৃথিবী"-তেও ছোটোবড়ো বাক্যের ঢেউ তুলে পৌঁছেছে একেবারে অন্তপার্বণীর "বেলা অবেলা কালবেলা"-র 'আমাকে একটি কথা দাও' ও 'সময়ের তীরে'।

অনন্তর প্রধান প্রসঙ্গপ্রবেশ।

১

প্রথম কবিতাগ্রন্থ "ঝরা পালক" থেকে শেষ কবিতাগ্রন্থ "বেলা অবেলা কালবেলা" পর্যন্ত অক্ষরবৃত্তের একচ্ছত্র শাসন চলেছে। কিন্তু "ঝরা পালক"-এ জীবনানন্দীয় বিশিষ্টতা ফলবান হ'য়ে ওঠেনি ; এবং তাই যে-অক্ষরবৃত্ত আলম্বন তাঁর, তার ভিতরেও জ্ব'লে ওঠেনি কোনো নূতন সাহস,—কারণ ঃ ছন্দের সাহস কবিতারই অন্তর্গত সার্বিক সাহসেরই আর-একটি বাহু। তাই "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-তে যখন জীবনানন্দের আত্মতা জেগে উঠেছিলো, তখন তাঁর ছন্দব্যবহারেও তা দীপ্তিমতী হ'য়ে উঠেছে। তাঁর আত্মতার রূপমুদ্রা—অনন্তর—এই "ধূসর পাণ্ডুলিপি" থেকে অন্তকাব্য অবধি বিসারী ; এবং ছন্দেও।

পংক্তিস্বাধীন তথা অসমান অক্ষরবৃত্তে জীবনানন্দের প্রিয়তা। অক্ষরবৃত্তকে খুব নিয়মের প্রপীড়নের মধ্যে না-নিয়ে গিয়ে তিনি তাকে মুক্তি দিয়েছিলেন। যে-রোম্যান্টিক উচ্ছ্বাস তাঁকে বক্তব্যের সংযমন থেকে পংক্তিবিন্যাসের সংযমন থেকে শিকার ক'রে নিয়ে গিয়েছিলো একরকম এলায়িত প্রসারিত ক্রমারত গীতল উন্মুক্তিতে, তাই তাঁকে তাঁর নিজের মতো অক্ষরবৃত্তের একটি রূপ নির্মাণে সাহায্য করেছিলো। এই মনোভাব থেকেই "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-ভুক্ত 'মৃত্যুর আগে' কবিতায় বাইশ মাত্রার অক্ষরবৃত্তে ('আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষসন্ধ্যায়') হঠাৎ ব্যতিক্রম ঘটেছে ছাব্বিশ মাত্রার তিনটি পংক্তি : ১. 'যত নীল আকাশেরা র'য়ে গেছে খুঁজে ফেরে আরো নীল আকাশের তল'; ২. 'পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর'; ৩. 'ধূসর মৃত্যুর মুখ ; একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিলো—সোনা ছিলো যাহা'। এই মনোভাবের ফলেই "রূপসী বাংলা"-র কবিতাগুচ্ছ সনেট না-হ'য়ে চতুর্দশপদী কবিতাতে রূপান্তরিত হয়েছে। [১] বাইশ মাত্রার পংক্তিশরীর, এখানে, মাঝে-মাঝে সম্প্রসারিত হ'য়ে গেছে ; যেমন : 'যখন মৃত্যুর আগে শুয়ে র'বো—অন্ধকার নক্ষত্রের নিচে' এই বাইশ মাত্রা ষষ্টকের একটি পংক্তিতে স্ফারিত হ'য়ে গেছে ছাব্বিশ মাত্রায় : 'ভোমরা উড়িছে শুনি—গুবরে পোকার ক্ষীণ গুমরানি ভাসিছে বাতাসে'। এরকম ব্যতিক্রমের উপর্যুপরি সম্মুখীন হই এই কাব্যে ; স্ফারিত কখনো, যেমন :

'যদি আমি ঝ'রে যাই', 'যে-শালিখ ম'রে যায়', 'তোমার বুকের থেকে', 'একদিন পৃথিবীর পথে', 'ঘাসের বুকের থেকে' কবিতানিচয় ; কখনো সংকুচিত, যেমন : 'তবু তাহা ভুল জানি', 'একদিন পৃথিবীর পথে' কবিতামালা। শেষ পর্যন্ত বাইশ মাত্রার পংক্তিও তাঁর কাছে সংকুচিত ও রুদ্ধশ্বাস বোধ হওয়ায় আরম্ভ করেন লিখতে দীর্ঘ ছাব্বিশ মাত্রার মুক্তি-লাইন। বস্তুত, "রূপসী বাংলা"-ও নির্দিষ্ট ও অতিনিরূপিত ছন্দস্তবকবিন্যাসের বই নয় : বরং—মনে হয়—অক্ষরবৃত্তের যে-ছোটোবড়ো চালে জীবনানন্দ স্বস্তি বোধ করতেন অধিকতর, এখানে তারই আর-একটি আয়তন রচিত। এই উক্তির প্রকৃষ্ট নজির-স্বরূপ একটি কবিতার মাত্রাবিন্যস্ত উদ্ধার প্রয়োজনীয় :

(এইসব ভালো লাগে) : জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের
সোনালি রোদ এসে ২৬
আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়,—আমার কাতর চোখ—
আমার বিমর্ষ ম্লান চুল, ৩০
এই নিয়ে খেলা করে : জানে সে যে বহুদিন আগে আমি
করেছি কি ভুল ২৬
পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় রূপসীর মুখ ভালোবেসে ; ২৪
পউষের শেষ রাতে আজো আমি দেখি চেয়ে আবার সে
আমাদের দেশে ২৬
ফিরে এলো ; রং তার কেমন তা জানে এই টসটসে ভিজে
জামরুল, ২৬
নরম জামের মতো চুল তার, ঘুঘুর বুকের মতো
অস্ফুট আঙুল ; ২৬

---

[১] রবীন্দ্রনাথও সনেট না-লিখে চতুর্দশপদী কবিতাই লিখেছিলেন একদিন।

পউষের শেষ রাতে নিমপেঁচাটির সাথে আসে সে যে ভেসে ২২
কবেকার মৃত কাক : পৃথিবীর পথে আজ নাই সে তো আর ; ২২
তবুও সে ম্লান জানালার পাশে উড়ে আসে নীরব সোহাগে, ২২
মলিন পাখনা তার খড়ের চালের হিম শিশিরে মাখায় ; ২২
তখন এ পৃথিবীতে কোনো পাখি জেগে এসে বসেনি শাখায় ; ২২
পৃথিবীও নাই আর ;—দাঁড়কাক একা-একা সারারাত জাগে ; ২২
'কিবা, হায়, আসে যায়, তারে যদি কোনোদিন না পাই আবার।' ২২

[এই সব ভালো লাগে, রূপসী বাংলা]

অক্ষরবৃত্ত ছন্দের এই পংক্তিস্বাধীন মুক্তির চেয়েও যে-মুক্তিতে জীবনানন্দের বিশিষ্টতা, তা ছন্দের দিক থেকে দুঃসাহসিক। কারণ, অক্ষরবৃত্তের নিয়মের মধ্যে তিনি মাত্রাবৃত্তের একটি সূত্র যোজনা ক'রে দিয়েছিলেন। অক্ষরবৃত্তে মুক্ত ও রুদ্ধ সিলেবল তুল্যমূল্য ; কিন্তু মাত্রাবৃত্তে মুক্ত সিলেবল এক-মাত্রা ও রুদ্ধ সিলেবল দু-মাত্রা হিশেবে গণ্য। জীবনানন্দ অক্ষরবৃত্তে কোনো-কোনো রুদ্ধ সিলেবল দু-মাত্রা হিশেবে প্রয়োগ করতে শুরু করেন ; যেন প্রথম জীবনের পর যে-ছন্দকে তিনি আর প্রয়োগোপযোগী মনে করেননি, তা এইভাবে তাঁর উপর শোধ তুলে নেয়। সুখের কথা এই যে অক্ষরবৃত্তে রুদ্ধ সিলেবল যুগ্ম মাত্রায় ব্যবহার করলেও তা কোথাও শ্রবণপীড়ক হ'য়ে ওঠেনি, বরং জীবনানন্দীয় গীতলতার চমৎকার চারিত্র্যে পরিণত। আরো স্মরণীয় : উক্ত রীতি-যে একা জীবনানন্দ ব্যবহার করেছেন—তা নয়, কিন্তু তাঁর মতো এমন প্রবল প্রচুর ও অব্যর্থভাবে অপর-কেউ ব্যবহার করেননি।

২

উপযুক্ত ছন্দোমুক্তির সূচনা "ধূসর পাণ্ডুলিপি" গ্রন্থে। একগুচ্ছ উদাহরণ :

১. মেঠো চাঁদ—কাস্তের মতো বাঁকা, চোখা—
চেয়ে আছে ; এমনি সে তাকায়েছে কতোরাত—নাই লেখা-জোখা।

[মাঠের গল্প : মেঠো চাঁদ]

২. নিড়ানো হয়েছে মাঠ পৃথিবীর চারিদিকে
শস্যের খেত চ'ষে-চ'ষে
গেছে চাষা চ'লে ;

[মাঠের গল্প : কার্তিক মাঠের চাঁদ]

৩. ক্যাম্পের বিছানায় রাত তার অন্য এক কথা বলে।

[ক্যাম্পে]

৪. রাত্রির ফুলের মতো—ঘুমন্ত হৃদয়ের মতো
অন্তর ঘুমায়ে গেছে,—ঘুমায়েছে মৃত্যুর মতন।—

[জীবন : ২২]

৫. মানুষের মতো পায়ে চলিতেছি যতোদিন,—তাই,—
ক্লান্তির পরে ঘুম,—মৃত্যুর মতন শান্তি চাই।

[প্রেম]

৬. চুমে ল'য়ে রৌদ্রের রস

হেমন্ত বৈকালে
উড়ো পাখপাখালির পালে
উঠানের ;

[পিপাসার গান]

স্থূলাক্ষর শব্দসমুচয়ে রুদ্ধ সিলেবল দু-মাত্রা হিশেবে ব্যবহৃত। তবে অক্ষরবৃত্তের সনাতন মূল্যও দান করেছিলেন তিনি অধিকাংশ সময়ে, এমনকি স্থূলাক্ষর ঐ শব্দগুচ্ছকে ঐ কাব্যেই তিনি তার প্রাক্তন দাম চুকিয়ে দিয়েছিলেন ঃ

১. —কে বা সেই চাষা;—
কাস্তে হাতে,—কঠিন,—কামুক,—
আমাদের সবটুকু ব্যথাভরা সুখ
উচ্ছেদ করিবে এসে একা।

[পিপাসার গান]

২. **শস্যের** খেতের পাশে আজ রাতে আমাদের জেগেছে পিপাসা।

[পিপাসার গান]

৩. এখানে বনের কাছে **ক্যাম্প** আমি ফেলিয়াছি।

[প্রেম]

৪. পায়ের পথের মতো **ঘুমন্তেরা** প'ড়ে আছে কতো।

[প্রেম]

৫. জীবনের রোমাঞ্চের শেষ হ'লে **ক্লান্তির** মতন।

[প্রেম]

৬. লাল আলো,—**রৌদ্রের** চুমুক
অন্ধকার,—কুয়াশার ছুরি
মোরে যেন কেটে লয়।

[পিপাসার গান]

দেখা যাচ্ছে ঃ 'কাস্তে', 'শস্য', 'ক্যাম্প', 'ঘুমন্ত', 'ক্লান্তি', 'রৌদ্র' প্রভৃতি শব্দকে একই ছন্দে তিনি দু'রকম মাত্রায় ব্যবহার করেছেন। এমনকি "সাতটি তারার তিমির" বই-এর একটি কবিতাংশে দেখা যাবে একই 'সূর্য' শব্দকে তিনি দু'রকম মাত্রায় বিন্যস্ত করেছেন ঃ

নিজের মৎসর নিয়ে নিশানের 'পরে সূর্য এঁকে
চোখ মেরেছিলো তারা নীলিমার সূর্যের দিকে।

[লোকসামান্য]

৩

কবির বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে, আমার সিদ্ধান্তের সপক্ষে, দৃষ্টান্তমালা চয়ন করতে চাই। "ধূসর পাণ্ডুলিপি" থেকে উদাহরণ উপস্থিত করেছি পূর্ব পরিচ্ছেদে। "রূপসী বাংলা" থেকে ঃ

১. দেখিব খয়েরী ডানা শালিখের **সন্ধ্যায়** হিম হ'য়ে আসে

[তোমরা যেখানে সাধ]

২. মধুকর ডিঙা থেকে না জানি সে কবে চাঁদ চম্পার কাছে

[বাংলার মুখ আমি]

৩. আজ সারাদিন এই বাদলের জলে ধলেশ্বরী চড়ায়

[হায় পাখি, একদিন]

৪. হৃদয়ে জলের গন্ধ কন্যার—ঘুম নাই, নাইকো মরণ

[কতো ভোরে,—দু'পহরে]

৫. কতোদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে মিলিয়াছি আমরা দুজন

[কতোদিন সন্ধ্যার অন্ধকারে]

৬. নীলপাতা মৃদু ঘাস রৌদ্রের দেশে
ফিঙ্গা যেমন তার দিনগুলো ভালোবাসে—

[এই জল ভালো লাগে]

৭. আকাশে কমলা রঙ ফুটে ওঠে সন্ধ্যায়—কাকগুলো নীল মনে হয়

[একদিন পৃথিবীর পথে]

৮. সূর্যের রাঙা ঘোড়া ঃ পক্ষিরাজের মতো কমলারঙের পাখা ঝাড়ে

[মানুষের ব্যথা আমি]

৯. প্রাণ যে ব্যাকুল রাত্রি প্রান্তরের গাঢ় নীল অমাবস্যার

[হৃদয়ে প্রেমের দিন]

১০. খড়ের চালের নিচে, অন্ধকারে,—সন্ধ্যায় ধূসর সজল

[কতো দিন তুমি কার]

"বনলতা সেন" থেকে ঃ

১. কাঁচপোকা ঘুমিয়েছে—গঙ্গফড়িং সে-ও ঘুমে
আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে প'ড়ে আছো তুমি।

[তুমি]

২. তুমি ছাড়া সময়ের এ-উদ্ভাবনে।

[তুমি]

৩. প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো শব্দে—প্রেম অপ্রেম থেকে দূরে।

[তুমি]

৪. ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রের সাথে।

[সুরঞ্জনা]

৫. চারিদিকে ছায়া ঘুম সপ্তর্ষি নক্ষত্র ;
মধ্যযুগের অবসান
স্থির ক'রে দিতে গিয়ে ইওরোপ গ্রীস
হতেছে উজ্জ্বল খ্রীষ্টান।

[সবিতা]

"মহাপৃথিবী" থেকে ঃ

১. মেঘের দুপুর ভাসে—সোনালি চিলের বুক হয় উন্মন।

[সিন্ধুসারস]

২. চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম।

[শঙ্খমালা]

৩. মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

[আট বছর আগের একদিন]

৪. সবুজ পাতার 'পরে যখন নেমেছে এসে সূর্যের আঁচ।

[অবশেষে]

৫. বিকেলের শিশুসূর্যকে ঘিরে মায়ের আবেগে।

[শিরীষের ডালপালা]

"সাতটি তারার তিমির" থেকে :

১. আস্তাবলের ঘ্রাণ ভেসে আসে এক ভিড় রাত্রির হাওয়ায়।

[ঘোড়া]

২. প্যারাফিন লণ্ঠন নিভে গেল গোল আস্তাবলে।

[ঘোড়া]

৩. সময় পোহায়ে যায়, মলয়ালি ভয় পায় ভ্রান্তিবশত।

[নিরঙ্কুশ]

৪. সূর্যসাগরতীরে তবুও জননী ব'লে সন্ততিরা চিনে নেবে কারে।

[মনোসরণি]

৫. তবুও জন্তুগুলো আনুপূর্ব—অতিবৈতনিক
বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।

[রাত্রি]

"বেলা অবেলা কালবেলা" থেকে :

১. সূর্য আর সূর্যের বনিতা তপতী।

[চারিদিকে প্রকৃতির]

২. কোঁচকায়ে পৃথিবীর মসৃণ গিলা।

[মহিলা]

৩. নদীর ভিতরে জলে তলতা বাঁশের
প্রতিবিম্বের মতন নিখুঁত।

[সামান্য মানুষ]

৪. সেখানে তম্বুরার শব্দে ছিলো।
পৃথিবীতে দুন্দুভি বেজে ওঠে—বেজে ওঠে ;

[অবরোধ]

৫. সাগরের কূলে ফিরে আমাদের পৃথিবীকে যদি
প্রিয়তর মনে করি প্রিয়তম মৃত্যু অবধি।

[হেমন্তরাতে]

৪

অক্ষরবৃত্ত ছন্দোমুক্তির এই বিপজ্জনক সূত্রটি জীবনানন্দে গীতমর্মরিত ফসলায়তন হ'য়ে উঠেছে। কএকটি শব্দ—'সূর্য', 'মৃত্যু', 'সন্ধ্যা'—জীবনানন্দ অধিকাংশ সময় তিন মাত্রা হিশেবে ব্যবহার করেছেন। অক্ষরবৃত্তের নিয়মানুযায়ী 'জ্যোৎস্না' দুই অথবা তিন মাত্রার যে-কোনো একটি হিশেবে ব্যবহার করা যায়, এবং জীবনানন্দ দু'রকম ব্যবহারে অভ্যস্ত। বিবৃত ভঙ্গির ব্যবহারেই অবশ্য জীবনানন্দের বিশিষ্টতা : 'উড়ুক উড়ুক তারা পউষের জ্যোৎস্নায় নীরবে উড়ুক' (বুনোহাঁস, মহাপৃথিবী) পংক্তিতে 'পৌষ' ও 'জ্যোৎস্না' বিবৃতভাবে উচ্চারিত। জীবনানন্দ নিজের নিয়ম থেকে চ্যুত নন কোথাও : উপরের উদাহরণমালায় সর্বত্র দেখা যাবে জীবনানন্দ রুদ্ধ সিলেবলকে ভেঙে ও বিশ্লিষ্ট ক'রে দু-মাত্রা ব্যবহারের যে-সুযোগ, কেবলমাত্র তা-ই গ্রহণ করেছেন ; মুক্ত সিলেবল দিয়ে সে-কাজ সম্পাদন করা ছিলো অসম্ভব, এবং জীবনানন্দ একবারও সে-অপচেষ্টা করেননি। তবে উপর্যুক্ত মুক্তির সীমা এই যে একে একটি নির্দিষ্ট নিয়মবলয়ে দাঁড় করালে তা মাত্রাবৃত্তে বা স্বেচ্ছাচারী ছন্দে তথা ছন্দহীনতায় পর্যবসিত হবে। একে জীবনানন্দের উত্তর-কবিতায় ছন্দোমুক্তির কাজে বীজের মতো ব্যবহার করতে হ'লে তা করতে হবে খুব কুশলতার সঙ্গে।

শুদ্ধতম কবি

আবদুল মান্নান সৈয়দ

১

একদিন একজন কবি তাঁর প্রথম কবিতাগ্রন্থের শিরোদেশে 'অভিনব কাব্য' এই অপূর্ব স্বঘোষণা মুদ্রিত করেছিলেন ; একদিন একজন কবি 'ঐ নূতনের কেতন ওড়ে কালবোশেখীর ঝড়' ঃ এই নির্ঘোষে কবিতাজগতে প্রবেশ করেছিলেন নূতনের কেতন তুলেই ; আর-একজন সদ্যসমাগত কবি আর-একদিন প্রবেশসময়ে পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন ঃ 'কেউ যাহা জানে নাই—কোনো-এক বাণী—/আমি ব'হে আনি'। শেষোক্ত কবি, জীবনানন্দ দাশ, কবি-ও ব্যক্তিজীবনে একান্তরকম অতিঅন্তর্বৃত। অন্তর্বৃতি ভেঙে যে তাঁকে উপরের উচ্চারণ লিখিয়ে নিয়েছিলো, তাকে কবি-অস্মিতা ছাড়া আর-কোন শনাক্তিকরণ চলবে। বস্তুত কবি-অস্মিতার প্রবেশ-প্রয়োগ, বাঙালি কবিতায় তো মাইকেল মধুসূদন দত্তের হৃদয়-মনীষা-হাত থেকেই ঝিনুকশরীর থেকে রত্নের মতো নিষ্ক্রান্ত হ'য়ে এসেছে কিংবা বা তাঁর কবিতাদেহে আত্মার মতো লিপ্ত হ'য়ে আছে। অস্মিতার এই প্রয়োগে বিহারীলালকে তাঁরই আত্মীয় লাগে। কিন্তু এই অস্মিতাকে নির্বাপিত, বা অন্তত দমিত, ক'রে অপর-একটি স্রোতোরেখাও কি তখনই বেরিয়ে আসেনি—ভিজে সামাজিক বেদনা, রূঢ় সামাজিক ব্যঙ্গ, কঠিন সামাজিক বাস্তব ঃ বেদনা-ব্যঙ্গ-বাস্তব ঈশ্বর গুপ্তের কাব্যাচরণ থেকে? আসলে বিহারীলাল চক্রবর্তী ও ঈশ্বর গুপ্ত থেকে আধুনিক বাংলা কবিতার যুগল ধারানদী উৎসারিত হ'য়ে এসেছে ; কখনো কোনো-কোনো কবির ভিতর তরঙ্গিনীযুগ পদ্মা-মেঘনার মতো মিশে গেছে ; বিমিশ্রণ মেনে—কোথাও দু-রঙা চিৎস্রোতেও-বা—বিভক্ত হ'য়ে গেছে ফের। স্মরণ্য অবশ্য ঃ বিহারীলাল ও ঈশ্বর গুপ্তের মতো অপরকোনো কবিকে অমন স্পষ্ট বিভাজনে ফেলা যায় না। অস্মিতার প্রশ্ন থেকেই জাগ্রত হয় দু-রঙা অন্তর্বৃতি-বহির্বৃতির সমস্যা। মাইকেলে বহুকথিত ক্লাসিকতা-রোম্যান্টিকতার সমস্যা—ফলত—অন্তর্বৃতি-বহির্বৃতিরই সমস্যা ; উনবিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মুখ্যত অন্তর্বৃত, বিংশ শতাব্দীর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মূলত বহির্বৃত ; তেম্নি বহির্বৃতিপ্রধান হ'য়েও নজরুল ইসলামের একাংশ অন্তর্বৃত, যেমন অন্তর্বৃতিমুখ্য হ'য়েও জীবনানন্দের আধখানা বহির্বৃত। সেই মুখ্যের অনুসরণ করতে গিয়ে জীবনানন্দে লক্ষিতব্য ইএটস-কথিত 'প্রতিস্বিক উচ্চারণে'-র প্রতি পাখাবিস্তার। প্রাথম প্রাতিস্বিকতায় জীবনানন্দের কবি বেরিয়ে আসেন কএকটি মুক্তিলিরিকে, "ধূসর পাণ্ডুলিপি" বস্তুত হৃদয়োত্থ ধূসর কিন্তু প্রাণগতিবান কবিতাগ্রন্থই ("ঝরাপালক' নয় ; কারণ ঃ তা পূর্বজ কবিতাবলিরই অনুবর্তন,

যদিচ সেই অনুবর্তিত ক্রমজমির ভিতরে কোথাও-কোথাও যেন আলের সীমা ভেঙে ফসল ফ'লে উঠেছে)। অনন্তর সব কবির আকাঙ্ক্ষার মতোই জীবনানন্দ চাইলেন ভিতরপ্রসার,—যার চাপে "ধূসর পাণ্ডুলিপি" কাব্যের 'নির্জন স্বাক্ষর' বা 'বোধ' কবিতার আমি 'মৃত্যুর আগে' বা 'ক্যাম্পে' কবিতার বহুবাচনিক আমরা-য় স্ফারিত হ'য়ে গেলো। যে-সমুদ্র দুলে উঠেছে "ধূসর পাণ্ডুলিপি" গ্রন্থে, বারংবার, ('সহজ' 'কয়েকটি লাইন', 'পরস্পর' প্রভৃতি) যেন সেই সমুদ্রচারণা শুরু হ'য়ে গেলো উত্তরাবর্তী অজস্র কবিতাযাত্রায় ('বনলতা সেন', সুরঞ্জনা', 'সবিতা', 'সুচেতনা', 'সিন্ধুসারস' প্রভৃতি। আসলে এ হচ্ছে হৃৎসমুদ্রযাত্রা, এ হচ্ছে স্ববিস্তার। মনোবিদ্যার দিক থেকেও জীবনানন্দের মতো অন্তর্বৃত মানুষের এই স্ববিস্তারণপ্রয়াস অর্থগর্ভবতী। অথবা ঃ একে বলা যেতে পারে, তিরিশেরই সমুদ্রযাত্রা ; কেননা জীবনানন্দের আত্মজগতে এইভাবে বহিঃপৃথিবী এসে উপস্থিত হয়েছিলো, পল্বলে জেগে উঠেছিলো কল্লোল। জীবনানন্দের মানসকক্ষে এইভাবে বহিঃপৃথিবী জগচ্চিত্র টাঙিয়ে দিয়েছিলো। কিন্তু ততোক্ষণে আমি ও বিরুদ্ধ-আমির সংঘট্ট শুরু হ'য়ে গেছে। অতিঅন্তর্বৃত জীবনানন্দ mask হিশেবে নিলেন ইতিহাসচেতনা ; তাকেই ভরকেন্দ্র ক'রে তিনি প্রাতিস্বিকতা থেকে নৈর্ব্যক্তি-তে উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। অথবা, ভিন্ন স্থাপনায়, ঐ ইতিহাসচেতনা হচ্ছে জীবনানন্দের বিরুদ্ধ-আমি, সমাজচেতনা হচ্ছে জীবনানন্দের বিরুদ্ধ-আমি। "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র কবি এই ভিতররাস্তা অতিক্রম ক'রে "সাতটি তারার তিমির"-এর বিশাল মহালে গিয়ে উঠলেন। যে-কবি একদিন আত্মপরিচয় দাখিল করেছিলেন ঃ 'উৎসবের কথা আমি কহিনাকো ;/পড়িনাকো ব্যর্থতার গান ;—/শুনি শুধু সৃষ্টির আহ্বান, তাঁকেও জ্ঞাপন করতে হয় ঃ 'জীবনের ইতর শ্রেণীর মানুষ তো এরা সব ; ছেঁড়া জুতো পায়ে/বাজারের পোকাকাটা জিনিশের কেনাকাটা করে।'

এরই মধ্যবর্তী করিডোর ঐ "রূপসী বাংলা" ঃ আনন ও মুখোশের মধ্যকার নাট্যিক টেনশন থেকে জাত। মৃত্যুচেতনার আত্মআননে জীবনানন্দ পরিয়ে দিয়েছিলেন ঝাঁঝরা-ফোঁপরা স্বদেশের মুখ। [১] "ধূসর পাণ্ডুলিপি"-র প্রতিস্বিক মরণমুদ্রা "রূপসী বাংলা"-র মুখে এইভাবে যেন চিহ্নাকীর্ণ হ'য়ে গেলো। উজ্জ্বল এক দীর্ঘশ্বাস, এক নস্টালজিয়া, "রূপসী বাংলা", প্রাক্তন ধূসরতাকে যেন রূপসী ক'রে তুললো। ইএটস যেমন একদিন আয়ার্ল্যান্ডের দেশপুরাণকে ব্যাপকগভীরভাবে কাজে লাগিয়েছিলেন, জীবনানন্দ তেন্নি "রূপসী বাংলা"-য় 'চারিদিকে বাঙালীর ভিড়/বহুদিন কীর্তন ভাসান গান রূপকথা যাত্রা পাঁচালীর/ নরম নিবিড় ছন্দে' ক্বণিত-ঝঙ্কৃত ক'রে তুলেছেন। ঠিক শিক্ষিত লোকের নয়—বাংলার সব লোকজ কল্পকাহিনী ভিড় ক'রে এলো ঃ ফড়িং-কাচপোকা-প্রজাপতি আর জাম-লিচু-কাঁঠালের উজ্জ্বল-চঞ্চল পটভূমিকায় আস্তীর্ণ হ'য়ে এলো লোককাহিনীর ধনপতি-শ্রীমন্ত-বেহুলা-লহনা আর রূপকথার কঙ্কাবতী-শঙ্খমালা-চন্দ্রমালা-মানিকমালা। সমস্তে জুড়ে রইলো—ইএটস-এর মতো নাট্যিক-কবির নয়—লিরিক-কবির এক

স্বপ্নকল্পনা, এক বিষাদবাতাস। এবং এরই ভিতর দিয়ে জীবনানন্দ সম্পন্ন করলেন ইএটস-প্রোক্ত 'আধুনিক মানসের আত্ম-আবিষ্কার'।

উপর্যুক্ত বিস্তীর্যমানতা অতিসংবেদনশীল এই কবিমানসের ঘাস [২] থেকে নক্ষত্র পর্যন্ত বিহারে সূচিত হয়। জীবনানন্দের কবিতার এই মহাপৃথিবীলোকে প্রয়াণ বাংলা কবিতায় তুলনা পায় একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মিকমানসিক বিশ্বপর্যটনে। কেবল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হৃদয়ারণ্য থেকে একদিন নিষ্ক্রমিত হ'য়ে গিয়েছিলেন ; আর জীবনানন্দের সমস্ত ভ্রমণ হৃদয়ের নীল-সবুজ পথরেখা ধ'রেই সম্পন্ন হয়। কেবল রবীন্দ্রনাথে দ্রষ্টব্য পথিকচিত্ততা ; আর জীবনানন্দে নাবিকবৃত্তি। অলঙ্কাররণনে জীবনানন্দ তাই সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলাল-নজরুলের সহোদর বটে; কিন্তু মহাপার্থিব চেতনাপ্রসারে রবীন্দ্রনাথেরই আত্মীয় তিনি, যদিচ সেই চেতনাপ্রসারে যেতে তাঁর শরীর কাঁটায় ছিঁড়েখুঁড়ে রক্ত ক্ষরিত হ'য়ে আসে। দুই ভিন্ন সময়পৃষ্ঠে দণ্ডায়মান এই দুই অনন্তবিশ্বযাত্রীর হাতে-হাত ধ'রে দাঁড়ানোর ছবি ঃ

যাত্রী (পরিশেষ) ঃ রবীন্দ্রনাথ

যে-কাল হরিয়া লয় ধন
সেই কাল করিছে হরণ
সে ধনের ক্ষতি।
তাই বসুমতী
নিত্য আছে বসুন্ধরা।
একে একে পাখি গায়, গানের পসরা
কোথাও না হয় শূন্য,
আঘাতের অন্ত নেই, তবুও অক্ষুণ্ণ
বিপুল সংসার।
দুঃখ শুধু তোমার, আমার,
নিমেষের বেড়াঘেরা এখানে ওখানে।
সে-বেড়া পারায়ে তাহা পৌঁছায় না
নিখিলের পানে।
ওরে তুমি, ওরে আমি,
যেখানে তোদের যাত্রা একদিন যাবে থামি
সেখানে দেখিতে পাবি ধন আর ক্ষতি
তরঙ্গের ওঠা নামা, একই খেলা, একই তার
গতি
কান্না আর হাসি
একই বীণাতন্ত্রীতারে একই গান উঠিছে
উচ্ছ্বাসি,
একই শমে এসে
মহামৌনে মিলে যায় শেষে।
তোমার হৃদয়তাপ
তোমার বিলাপ

যাত্রী (শ্রেষ্ঠ কবিতা) ঃ জীবনানন্দ

মনে হয় প্রাণ এক দূর স্বচ্ছ সাগরের কূলে
জন্ম নিয়েছিলো কবে ;
পিছে মৃত্যুহীন জন্মহীন চিহ্নহীন
কুয়াশার যে-ইঙ্গিত ছিলো—
সেইসব ধীরে-ধীরে ভুলে গিয়ে অন্য এক মানে
পেয়েছিলো এখানে ভূমিষ্ঠ হ'য়ে—আলো
জল আকাশের টানে,
কেন যেন কাকে ভালোবেসে।
মৃত্যু আর জীবনের কালো আর শাদা
হৃদয়ে জড়িয়ে নিয়ে যাত্রী মানুষ
এসেছে এ-পৃথিবীর দেশে ;
কঙ্কাল অঙ্গার কালি—চারিদিকে রক্তের ভিতরে
অন্তহীন করুণ ইচ্ছার চিহ্ন দেখে
পথ চিনে এ-ধুলোয় নিজের জন্মের চিহ্ন
চেনাতে এলাম ;
কাকে তবু?
পৃথিবীকে? আকাশকে? আকাশে যে সূর্য
জ্বলে তাকে?
ধুলোর কণিকা অণুপরামাণু ছায়া বৃষ্টি
জলকণিকাকে ?
নগর বন্দর রাষ্ট্র জ্ঞান অজ্ঞানের পৃথিবীকে?
যেই কুজ্ঝটিকা ছিলো জন্মসৃষ্টির আগে, আর
যে-সব কুয়াশা রবে শেষে একদিন
তার অন্ধকার আজ আলোর বলয়ে এসে :
পড়ে পলে-পলে ;

চাপা থাক আপনার ক্ষুদ্রতার তলে।
যেইখানে লোকযাত্রা চলে
সেখানে সবার সাথে নির্বিকার চলো একসারে,
দেখা দাও শান্তিসৌম্য আপনারে—
যে-শান্তি মৃত্যুর-প্রান্তে বৈরাগ্যের নিভৃত,
আত্মসমাহিত;
দিবসের যত
ধূলিচিহ্ন, যত কিছু ক্ষত
লুপ্ত হল যে-শান্তির অন্তিম তিমিরে ;
সংসারের শেষ তীরে
সপ্তর্ষির ধ্যান পুণ্য রাতে
হারায় যে-শান্তিসিন্ধু আপনারি অন্ত আপনাতে;
যে-শান্তি নিবিড় প্রেমে
স্তব্ধ আছে থেমে,
যে-প্রেম শরীরমন অতিক্রম করিয়া সুদূরে
একান্ত মধুরে
লভিয়াছে আপনার চরম বিস্মৃতি।
সে পরম শান্তি-মাঝে হোক তব অচঞ্চল স্থিতি।

নীলিমার দিকে মন যেতে চায় ভেসে ;
সনাতন কালো মহাসাগরের দিতে যেতে বলে।
তবু আলো পৃথিবীর দিকে
সূর্য রোজ সঙ্গে ক'রে আনে
যেই ঋতু যেই তিথি যে-জীবন যেই মৃত্যুরীতি
মহাইতিহাসে এসে এখনও জানেনি যার মানে

সেদিকে যেতেছে লোক গ্লানি প্রেম ক্ষয়
নিত্য পদচিহ্নের মতো সঙ্গে করে ;
নদী আর মানুষের ধাবমান ধূসর হৃদয়
রাত্রি পোহালো ভোরে—কাহিনীর কতো শত ভোরে
নব সূর্য নব পাখি নব চিহ্ন নগরে নিবাসে
নব-নব যাত্রীদের সাথে মিশে যায়
প্রাণলোকযাত্রীদের ভিড় ;
হৃদয়ে চলার গতি গান আলো রয়েছে অকূলে
মানুষের পটভূমি হয়তোবা শাশ্বত যাত্রীর।

রবীন্দ্রনাথের স্বাস্থ্যবান সরল বিশ্বাস যুগ্ম পংক্তির মিলবিন্যাসেও দ্যোতিত ; জীবনানন্দের বন্ধুর আস্থা মিলবিন্যাসের অনিয়মের মধ্য দিয়েও প্রকাশিত। রৈবিক উপান্ত্য পংক্তির উপান্ত্য শব্দ 'স্থিতি' যেন মূল বিশ্বাসের থাম-কে নিবিড় আশ্রয় দান করেছে ; যেমন অনেক কোণ-মোড় বাঁক ঘুরে জীবনানন্দীয় ভিতরার্থ নিষ্কাশন 'মানুষের পটভূমি হয়তোবা শাশ্বত যাত্রীর' পংক্তিবাক্যে হিরন্ময় ঃ শেষ 'যাত্রীর' শব্দমিল 'ভিড়'-কে কেবল নয়— নিহিতার্থকেও আলিঙ্গন করেছে। অসমান অক্ষরবৃত্তে রচিত উভয় কবিতাই প্রাচ্য শান্তিপারাবারস্নাত।

প্রত্যেক কবি নিজের ভিতর দিয়ে একবার মানববাহিত আদ্যন্ত কাল পরিভ্রমণ ক'রে আসেন ; আতিজাগতিক ও মহাসময়বাহী একটি পৃথিবী কবির ভিতর দিয়ে অতিবাহিত হ'য়ে যায় যেন। জীবনানন্দেও মহাসময়-পরিভ্রমণের সেই পরিচিহ্ন পড়েছে ঃ তার প্রান্তিক যুগ্ম উদাহরণ 'মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে/শুরু হবে হেমন্তের নরম উৎসব।/হাতে হাত ধ'রে ধ'রে গোল হ'য়ে ঘুরে-ঘুরে-ঘুরে' (অবসরের গান, ধূসর পাণ্ডুলিপি) যেন পৃথিবীর আদিমকালের ফসলোৎসব ; 'ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হ'তো' (১৯৪৬-৪৭, শ্রেষ্ঠ কবিতা) সেই সুদূরাতীতের ফসলোৎসবের—তাঁর আপন কাব্যে উদ্‌যাপিতও বটে—স্মৃতিচারণার মতো মনে হয়।

মহাজাগতিক, মহাসময় বা অপর-সব জীবনানন্দীয় ভ্রমণ একটি শুদ্ধতার কেন্দ্র থেকে রওনা দ্যায় ; রবীন্দ্রনাথের মতো কল্যাণশীল নয় হয়তো, কিন্তু আত্মস্খালনকামী—এবং সেই আত্মস্খালনের মধ্য দিয়েই নিখিল মুক্তি নিঃশব্দে তার দাবি পেশ করেই; জয়ী হয়। সেই শুদ্ধ কেন্দ্র কবিহৃদয়ের নান্দনিক বৃত্তচক্র—যেখানে এসে মেশে জীবনের স্বপ্ন-সমস্যা-সংবেদন, যে-শুদ্ধ চক্র থেকে ফোয়ারার মতো ছিটিয়ে পড়ে কবিতা চারপাশে ঃ মহাজগৎ-মহাসময়ের প্রতি প্রতিন্যাস, সমাজ-রাজনীতির প্রতি প্রতিন্যাস, অস্তিত্ব ও

চেতনার প্রতি প্রতিন্যাস, দীপ্তিভিক্ষা-অন্ধকারভিক্ষা—সমস্তই সেই শুদ্ধ কেন্দ্রনাভি থেকে উচ্ছ্রিত। কিন্তু সমগ্রে তলে-তলে ক্রিয়াশীল মুখ্য সেই অন্তর্বৃতি ঃ

নদীর জলের ভিতর শম্বর, নীলগাই, হরিণের ছায়ার আসা-যাওয়া ;
একটা ধবল চিতল-হরিণীর ছায়া
আতার ধূসর ক্ষীরে-গড়া মূর্তির মতো
নদীর জলে
সমস্ত বিকেলবেলা ধ'রে
স্থির।

(আমাকে তুমি, বনলতা সেন)

এই-তো জীবনানন্দ, যিনি প্রত্যক্ষ দৃষ্টিস্থাপনা করেন না কিছুতেই— নদীজলের ভিতর দিয়ে লক্ষ্য করেন শম্বর-নীলগাই-হরিণের যাতায়াত, কিংবা চিতল-হরিণীর স্থিরমূর্তি। এই স্থৈর্য-চাঞ্চল্য নদীজলে নয়, কবির হৃদয়-দর্পণের মধ্য দিয়েই প্রতিফলন স্বীকার ক'রে নেয়। একদিন আলোচ্য আয়না ছিলো বিহারীলালেরও কাছে—কিন্তু অনচ্ছ কি?—'অতি অপরূপ রূপ! কেবল হৃদয়ে দেখি, দেখাইতে পারিনে'ঃ 'সাধের আসন'-এর উক্তি তুলে বিদ্রূপবঙ্কিত অর্থে তার প্রয়োগ সম্ভব। পক্ষান্তরে, জীবনানন্দীয় কাব্যের চরিতার্থতায় খুশি আমরা একে বলবো ঃ হৃৎদর্পণের ব্যবহার।

২

বক্ষ্যমাণ শারীরপন্থী আলোচনা-চক্রেও শুদ্ধতার সূত্র সর্বাধিক প্রযোজ্য জীবনানন্দ দাশ সম্বন্ধেই ঃ শুধুমাত্র কবিতা ও কবিতা বিষয়ক ভাবনা-বেদনায় নিবেদিত এই কবি যেন কবিতাসুন্দরীর কাছেই আপাদমাথা বিক্রয় ক'রে ব'সে আছেন। এবং সেই হৃদয়োত্থ কবিতায় এমন স্বাদ ফ'লে-ফুটে উঠলো যা ''তিলোত্তমাসম্ভব'' কাব্যের মতোই 'অভিনব' কিরীট প'রে নিতে পারতো মাথায়। অভিনব ; কেননা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পর্যন্ত, বা এমনকি ঠাকুরোত্তর সেই প্রথম তিন নিরুপম ব্রিজ—মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-নজরুল পর্যন্ত—কবিতার শাস্ত্রানুমোদিত আচরণই তৈরি হয়েছে ঃ যেমন প্রসঙ্গে তেন্নি প্রয়োগে। কবিতার অর্থেই, প্রাগ্বর্তী শ্রোণীভারাদলসগমনা অজস্র-অলঙ্কার-শিঞ্জিত রমণীদের স্থানে এলো জীবনানন্দের গহনারিক্ত একালের মেয়ে ঃ 'তোমার শরীর/তাই নিয়ে এসেছিল একদিন' (১৩৩৩, ধূসর পাণ্ডুলিপি)। পূর্বোক্ত পংক্তিতে বুদ্ধদেব বসু যে-বিস্ময় প্রকাশ করেছিলেন তা আসলে এতকাল-প্রচলমান অভ্যস্ত পাঠকের নূতনে আশ্চর্যতা। ললিত-মধুর-মোহন শব্দপ্রয়োগে জীবনানন্দের অভ্যাসধারা মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের মতো হলেও তাঁর শব্দপ্রয়োগ কিছুতেই মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের অনুসরণ করেনি ; নিজের জন্যে বানিয়ে নিয়েছিলেন তিনি নব্য শব্দান্বয়—নূতন ললিত-মধুর-মোহন শব্দাবলি এনে ঘর সাজিয়েছিলেন। মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতার সময়-ভাষা থেকে জীবনানন্দের কবিতার সময়-ভাষা স্বাতন্ত্রিক হয়ে দাঁড়িয়েছিলো ; খ্যাত-অখ্যাত অজস্র কবির ক্রমাগত ব্যবহারে ভাষা-নদী নিঃস্রোতা হয়ে পড়লে সময়েরই প্রয়োজনে শব্দের নবীন চরভূমি জেগে ওঠে ; এইভাবে মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের ললিত-মোহন-মধুর শব্দাবলি কবিতারঙ্গভূমি থেকে নেপথ্যনির্বাসনে গেলে জীবনানন্দ-বুদ্ধদেব বসু-অজিত দত্তের নব্য ললিত-মোহন-মধুর শব্দাবলি আদিম বিস্ময়ের প্রাণনা নিয়ে এসেছিলো একদিন। আবার ঃ মোহিতলাল-যতীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের কবিতানায়িকা থেকে

জীবনানন্দের কবিতানায়িকা খুব স্বভাবীরকমেই পৃথক হয়ে গিয়েছিলো। তাই মোহিতলালের 'নির্ভাবনায় ঘুমাও তুমি, আমার স্বপ্ন পাঠিয়ে দেব তোমায়,/আমায় তুমি হারাওনি তো!—সিঁদুর নিয়ে গেছ সিঁথির সীমায়' (মৃত প্রিয়া, বিস্মরণী) ও জীবনানন্দের 'শান্তি তবু : গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং /আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ' (ধান কাটা হয়ে গেছে, বনলতা সেন) অভিন্ন মৃতা দয়িতার প্রতি আক্ষেপোক্তি হয়েও অভিন্ন শান্তিশিখা উঁচু করে তুলে ধরলেও দুই আলাদা শামাদানে

আমরা দেখেছি বর্ণ ও শব্দ-ব্যবহারে তাঁর সঞ্জীবনী সর্তকতা। মৃণালিনী ঘোষাল, বনলতা সেন, অরুণিমা সান্যাল, শেফালিকা বোস প্রভৃতি নামশব্দ রূপকাঙ্ক্ষীও বটে : বনলতা সেন নামের বনলতা-অংশ বা শেফালিকা বোস-এর শেফালিকা-অংশ ছবি ধরায়, অরুণিমা সান্যাল জ্যোৎস্নায় রক্তাভা জাগিয়ে দিয়ে যায়, মৃণালিনী ঘোষাল প্লবমান এক অদৃশ্য মৃণালে। একদিন এরকম শব্দসন্নিবেশ ছিলো যাঁর : 'ধূধ মাঠ—ধানখেত—কাশফুল —বুনোহাঁস বালুকার চর', (সেদিন এ ধরণীর, ঝরা পালক) তাঁর বিচ্ছিন্ন উদাহরণমালার একত্রসন্নিপাতে কেবল গ্রামীনতা থেকে শাহরিকতায় উত্তীর্ণ হওয়া নয়, আস্তিক সারল্য থেকে জটিলতার আয়তনে গ্রেফতার হওয়া : 'আমাদের আশা ভালোবাসা ব্যথা রণঘড়ি সূর্যের ঘড়ি/ চিন্তা বুদ্ধি চাকার ঘুরুনি গ্লানি দাঁতালো ইস্পাত' (পৃথিবীতে এই, শ্রেষ্ঠ কবিতা)। শব্দ, পংক্তি ও স্তবকের আবৃত্ত ও পৌনঃপুনিক ব্যবহারে আচ্ছন্ন "ধূসর পাণ্ডুলিপি"—উপর্যুক্ত ব্যবহারে গীতলতা স্ফুট :

আমার পায়ের তলে ঝ'রে যায় তৃণ
তার আগে এই রাত্রিদিন
পড়িতেছে ঝ'রে!
এই রাত্রি,—এই দিন রেখেছিলে ভরে
তোমার পায়ের শব্দে,—শুনেছি তা আমি!
কখন গিয়েছে তবু থামি
সেই শব্দ!—গেছ তুমি চলে
সেই দিন—সেই রাত্রি ফুরায়েছে বলে!
আমার পায়ের তলে ঝরে নাই তৃণ,—
তবু সেই রাত্রি আর দিন
পড়ে গেল ঝ'রে!
সেই রাত্রি—সেই দিন—তোমার পায়ের শব্দে রেখেছিলে ভ'রে!

(১৩৩৩, ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এরকম ক্রমাগত-আবৃত্ত শব্দ-বাক্য-স্তবকে "ধূসর পাণ্ডুলিপি" ভরপুর গীতলতায় ও কণ্ঠকোমলতায়। [৩] স্মরণীয় : এ পর্যায়ে কীটসীয় রোম্যান্টিকতা দখল রেখেছে জীবনানন্দে ;—উত্তরকালে জীবনানন্দে ঘটেছে কীটসের রোম্যান্টিকতা থেকে ইএটসীয়

[৩] কীটস-এর 'To Autumn' কবিতায় 'soft' শব্দের তিনবার ব্যবহারের (ক. 'Thy hair soft-lifted by the winnowing wind';) খ. 'soft-dying day': গ. '... With treble soft/ the redbreast whistles...' সঙ্গে জীবনানন্দের 'অবসরের গান' কবিতায় 'নরম' শব্দের ত্রয়ী প্রয়োগ (ক. 'হেমন্তের নরম উৎসব; খ. 'রোদের নরম রঙ'; গ. 'নরম রাতের হাতে') তুলনীয়।

অর্থময়তায় উত্তরণ। তবু-নামক অব্যয়-শব্দটি জীবনানন্দের কবিতার বিষয়নাভির মতো ('পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন ;/মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।' সুচেতনা)। 'উপমাতেই কবিত্ব' জীবনানন্দের এই এ্যারিষ্টটলীয় সিদ্ধান্তের পটপরিসরে তাঁর কবিতাস্থাপন করা যেতে পারে। তাঁর অবিরল উপমাপ্রয়োগের একপাশে আছে নূতন দৃষ্টিগ্রাহ্য উপমা ; [৪] অপর-পাশে আত্মিক উপমা—যার ঃ সৃজনে বাংলা কবিতাবহে জীবনানন্দ একক ও তুলনাহীন [৫] রবীন্দ্রনাথ-নজরুল-মোহিতলাল-সত্যেন্দ্রনাথের উপমার তুলনায় জীবনানন্দের এই আত্মিক উপমারাশির বিশিষ্টতার প্রদীপন হবে। অথচ যে-সাহজিক সাধনা ইএটস-এর কাব্যে দ্রষ্টব্য, জীবনানন্দে তার স্থান করেছে স্বসমুখ উৎসারণ। স্বতঃস্ফূর্তির এই সাক্ষ্য রয়েছে কবির অন্তমিলবিন্যাসে ঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে মিলের অনিয়মিতিকেই নিয়মে দাঁড় করিয়ে নিয়েছেন তিনি—স্বস্বভাবী এই মিলপদ্ধতি অনেক জায়গায় দুই লাইনে স্তব্ধ হয়ে যায়নি, তিন লাইনের ত্রিত্ব মিলে পর্যবসান মেনেছে যদিচ কোনো নিয়ম সৃষ্টি না-করে [৬] ("বনলতা সেন"-এর 'অবশেষে' কবিতায় দ্বিত্ব

[৪] ক. বরফের মতো চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা (মাঠের গল্প ঃ পেঁচা, ধূ. পা.) খ. নিশীথের সমুদ্রের মতো চমৎকার (অনেক আকাশ, ধূ.পা.); গ. করুণ শঙ্খের মতো স্তন (এ-সব কবিতা আমি, রূ. বা.) ; ঘ. নরম জামের মতো চুল তার, ঘুঘুর বুকের মতো অস্ফুট আঙুল (এইসব ভালো লাগে, রূ. বা.); ঙ. খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষিয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে—/ গান গায়—গান গায়/এই দুপুরের বাতাস (আমাকে তুমি, ব. সে.); চ. সিংহের হুঙ্কারে উৎক্ষিপ্ত হরিৎ প্রান্তরের অজস্র জেব্রার মতো (হাওয়ার রাত, মহাপৃথিবী); ছ. মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব রোমশ উচ্ছ্বাস (হাওয়ার রাত মহাপৃথিবী); জ. কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলো (ঘাস, মহাপৃথিবী), ঝ. বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ (হায় চিল. মহাপৃথিবী); ঞ. শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ (শঙ্খমালা, মহাপৃথিবী)।

[৫] ক. তাই রাখিয়াছি ঢেকে পাখির মায়ের মতো প্রেম এসে আমাদের বুকে (প্রেম, ধূ. পা.) ; খ. পাখির নীড়ের মতো চোখ (বনলতা সেন. ব. সে.) ; ঘ. চারিদিকে রাত্রি নক্ষত্রের আলোড়ন এখন দয়ার মতো (শিরীষের ডালপালা, ব. সে.) ; ঙ. তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে (শঙ্খমালা, মহাপৃথিবী); চ. আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মতো অন্ধকার (নগ্ন নির্জন হাত, মহাপৃথিবী); ছ. শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো (আগুন) [শিকার, মহাপৃথিবী] ; জ. হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো (হাজার বছর শুধু খেলা করে, মহাপৃথিবী) ; ঝ উটের গ্রীবার মতো কোনো-এক নিস্তব্ধতা (আট বছর আগের একদিন, মহাপৃথিবী) ; ঞ. নমীল আগুনে ওই আমার হৃদয়/মৃত এক সারসের মতো (একটি কবিতা, সা. তা. তি.) ট. শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা (বনলতা সেন, ব. সে.)

(৬) ক. সকল পড়ন্ত রোদ চারিদিকের ছুটি পেয়ে জমিতেছে এইখানে এসে,/গ্রীষ্মের সমুদ্র থেকে চোখের ঘুমের গান আসিতেছে ভেসে,/এখানে পালঙ্কে শুয়ে কাটিবে অনেকদিন জেগে থেকে ঘুমাবার সাধ ভালোবেসে। (অবসরের গান, ধূ.পা.) ; খ. ওইদিকে শোনা যায় সমুদ্রের স্বর/স্কাইলাইট মাথার উপর /আকাশে পাখিরা কথা কয় পরস্পর। (পাখিরা, ধূ. পা.) ; গ. — যেন কোনো দূর থেকে অস্পষ্ট বাতাস/বাঘের ঘ্রাণের হৃদয়ে জাগায়ে যায় ত্রাস:/চেয়ে দ্যাখে ইহাদের পরস্পর নীলিম বিন্যাস/নড়ে ওঠে ত্রস্ততায়। (অবশেষে, ব. সে.) ; ঘ. তবুও তো পেঁচা জাগে/গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে/তার একটি প্রভাতের ইশারায় —অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে। (আট বছর আগের একদিন, মহাপৃথিবী ; ঙ. তোমার হৃদয় আজ ঘাস ঃ /বাতাসের ওপারে বাতাস—/আকাশের ওপারে আকাশ। (আকাশলীনা, সা. তা. তি.)।

মিল—প্রায় অকারণেই যেন—মাঝামাঝি হঠাৎ ব্যতিক্রান্ত হয়ে তিন লাইনের মিল তৈরি করেছে)। অথচ এরই ভিতরে কোথাও-কোথাও অনুসৃত মিলবিন্যাসের দৃঢ় রীতি ; কিন্তু কিরকম আচ্ছাদ পড়ে থাকে যেন তার উপরে ('মৃত্যুর আগে' 'বনলতা সেন', 'তুমি', 'সুরঞ্জনা', 'একটি কবিতা'র দ্বিতীয়াংশ 'রাত্রি', 'হাঁস' প্রভৃতি)। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতামণ্ডল থেকে নিঃসৃত হয়ে এসেছে তাঁর কবিতা। তার সাক্ষ্য তুলে ধরি এখানেই। 'কোটি-কোটি শূয়রীর প্রসববেদনার আড়ম্বর', (অন্ধকার, বনলতা সেন)—এর উপস্থাপনা বাস্তব সত্য হিশেবেই : এক বন্ধুর মুখে শুনেছি। 'অথবা আশ্চর্য হংসী অব্যর্থ ডানার অসংযমে/নির্ঝরের কোনো-এক রূপালি শঙ্কের দ্রুত মাছকে প্রণয়ী বলে ভেবেছিলো ভ্রণে ; / আজো ভাবে ; বরফের মতো শাদা ডানা নিয়ে পিঙ্গল ঢেউয়ের পিঠে চ'ড়ে/ যখন সে তীর খেয়ে—অথবা রক্তের হর্ষে সৌরপৃথিবীর মতো ঘোরে' (শিল্পী, বিংশ শতাব্দী, পৌষ ১৩৬৮)—বন্দুকের গুলির আঘাতে আর্ত ঘূর্ণ্যমান হংসপাখি নিজের চোখে না-দেখলে কি এই উক্তির নিহিতার্থ খুলে যেতো আমার কাছে? আছে আরো : উৎপ্রেক্ষা (১. যেন কোন মায়াবীর নষ্ট ইন্দ্রজাল/কাঁদিতেছে ছিঁড়ে গিয়ে। —অনেক আকাশ : ২. নক্ষত্রের রাতের আঁধারে /বিরাট নীলাভ খোঁপা নিয়ে যেন নারী মাথা নাড়ে। —শব), অনুপ্রাস (হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুল করিয়াছে খেলা।— মৃত্যুর আগে), নরত্বারোপ (শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপরে মাথা পেতে। —অবসরের গান)। আর চিত্রকল্প? কথা বললেই তিনি চিত্রকল্পের ইন্দ্রজাল সৃজিত হয়ে যায়। আছে কল্পনার সর্বমুখ সচ্ছলতা : পরাবাস্তবতার ব্যবহার, কবিতাসত্যের ব্যবহার। তাঁর কল্পনাকৌশলের অপর-এক সাক্ষ্য নিবেদন করতে চাই এখানেই। মরণমুদ্রা জীবনানন্দের কবিতার প্রথম থেকে শেষাবধি স্বাক্ষরিত। 'মৃত্যুই অনন্ত শান্তি হ'য়ে/অন্তহীন অন্ধকারে আছে' এই সিদ্ধান্তলেখ জীবনানন্দ বহুবার ব্যক্ত করেছেন। 'অন্ধকার' ও 'স্বপ্নের ধ্বনিরা' কবিতায় তিমির ও স্তব্ধতা ভিক্ষা ও আকাঙ্ক্ষা করেছেন। একদিন-যে তিনি প্রকল্পনার শরণ নিয়েছিলেন, তা ব্যথা-বিয়োগ-বাস্তবের কাছে গভীর মার খেয়েই। তাঁর মতো অপর-কোনো বাংলা কবি মরণাধিকৃত নন। এই মরণকল্পনা মরণচেতনার প্রাথমিক স্তর পরিত্যাগ ক'রে অপর-এক স্তরে আমগ্ন : মৃত্যুত্তীর্ণ সেই মজ্জমান অনুভূতিলোক থেকে কবিতা তাঁর নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসেছে—জীবনে থেকে যেখানে তিনি জীবনান্তের কল্পনাকে কল্পনা করছেন : সেই আয়নার ভিতরকার আয়না থেকে প্রতিফলিত চিত্র :

১. কি যেন কখন আমি মৃত্যুর কবর থেকে উঠে আসিলাম
আমারে দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী
শকুনের মতো কালো ডানা মেলে পৃথিবীর দিকে উড়িলাম
সাত-দিন সাত-রাত উড়ে গেলে সেই আলো পাওয়া যায় যদি
পৃথিবীর আলো প্রেম?
আমার দিয়েছে ছুটি বৈতরণী নদী।

(বৈতরণী)

২. কুয়াশা হতাশা নিয়ে স'রে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে ;—
তোমারে দেখেছি আমি পৃথিবীতে—নতুন নক্ষত্র আমি ঢের
আকাশ দেখেছি তাই— (পৃথিবীতে থেকে)

৩. ভেবে ভেবে ব্যথা পাবো;—মনে হবে, পৃথিবীর পথে যদি থাকিতাম বেঁচে
দেখিতাম সেই লক্ষ্মীপেঁচাটির মুখ যারে কোনোদিন
ভালো করে দেখি নাই আমি—

(ভেবে ভেবে ব্যথা পাবো)

আবৃত্তপদ, গীতলতা, চিত্রলতা—সব ক্রমশ স্তিমিত-শমিত হয়ে এসেছে জীবনানন্দের কবিতাধারায়। এ শুধুমাত্র বহিঃসময়প্রভাবের ফল নয় ; কবির অন্তঃসময়সম্পাতীও বটে ঃ বয়স বাড়ার সঙ্গে-সঙ্গে কবি-অনুভূতির শবলিত ইন্দ্রধনু এক-একটি রঙ ঝরিয়ে দিচ্ছিলো যেন। দেখা দিয়েছে ইংরেজি শব্দব্যবহার, কবিতার বাণীবিন্যাসে গদ্যভঙ্গি। প্রাগোদ্ধৃত ''ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের '১৩৩৩' শীর্ষক কবিতার পাশে অন্তপর্যায়ের একটি কবিতাংশের স্থাপনা যদি করি ঃ

সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ।
সৃষ্টির মনের কথা ঃ আমাদেরি আন্তরিকতাতে
আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা
খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্ণার জল দেখে নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হয়ে আছে ব'লে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধার;
মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে;

(১৯৪৬-৪৭, শ্রেষ্ঠ কবিতা)

প্রাক্তন সুররণন উড়ে যাওয়া উক্ত কবিতাংশকে প্রায় গদ্যে রূপান্তরিত ক'রে ফেলা যায়ঃ

সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ। সৃষ্টির মনের কথাঃ আমাদেরি আন্তরিকতাতে আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে সমুচ্ছল ঝর্ণার জল দেখে নিহত প্রাণীর রক্তে লাল হয়ে আছে বলে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায়; মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর ভ'রে গেছে।

—বিচিত্রবিধ উক্ত উচ্চারণাবলির মধ্য দিয়ে উচ্ছ্রিত হয়ে আছে কবি জীবনানন্দ দাশের বাণী ঃ 'অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ'।

জীবনানন্দ চেতনাজগৎ ঃ প্রেম

প্রদ্যুম্ন মিত্র

প্রকৃতি, ইতিহাস, সময় ও সমাজ-অনুধ্যানের পাশাপাশি অনেকটা সমান্তরাল, কখনও বা কিছুটা উচ্চতর ভূমিকায় যে বিষয়টি জীবনানন্দের কাব্যে পূর্বাপর প্রাণরস সঞ্জীবিত করেছে, তা হল প্রেম। এমন অনেক পাঠকই আছেন যাঁদের কাছে জীবনানন্দের কাব্যের মুখ্য আবেদন প্রকৃতি নয়, প্রেম। কাব্যের রসাস্বাদনে পাঠকের মনে যে আবেদন প্রাথমিক ও অতি প্রত্যক্ষ তার গুরুত্ব কোনো সময়েই অস্বীকার করা যায় না। তাই, জীবনানন্দের কাব্যের যদি কোনো দুটি মৌল বিষয় বেছে নিতে হয়, তা হবে প্রকৃতি ও প্রেম ; অথবা কবি স্বয়ং যেমন লিখেছিলেন, 'প্রকৃতির শোভাভূমিকায় প্রেম'। অন্তত তাঁর সৃষ্টির মধ্যপর্ব পর্যন্ত এ সিদ্ধান্ত অবশ্যমান্য। তবু যে প্রশ্ন অনিবার্য হয়ে আসে তা হ'ল, যে কবি কাব্যের মধ্যে মানব-অস্তিত্বের 'উৎসনিরুক্তি' সন্ধান করেছেন বারবার, তাঁর সৃষ্টিতে প্রেমের মুখ্যতম স্বরূপ কি। একমাত্র পরম্পরা ও প্রবণতাসাপেক্ষ বিশ্লেষণেই জীবনানন্দের বিকাশপ্রবণ কবিচেতনায় প্রেমের স্থান ও মহিমা নিরূপিত হতে পারে।

তাঁর প্রথম কাব্যগ্রন্থ 'ঝরাপালক'-এর প্রভাবিত পদ্যপ্রয়াসগুলিতে কোনও স্বকীয় উচ্চারণের সন্ধান পাওয়া দুরূহ ; তবু ছন্দচাপল্য এবং দূরাবগাহী ভাবপ্রবণতার (যা দেশজ পরিসীমা থেকে পাঠককে ভুলিয়ে নেয় পরদেশী আবহের বৈচিত্র্য ও রহস্যময়তার মোহে) পাশাপাশি 'ঝরাপালকে' রয়ে গেছে এমন কিছু ধ্বনি ও ভাববিশিষ্টতা যা উত্তরসূরী জীবনানন্দকে স্মরণ করিয়ে দেয়। তেমনই কিছু উদাহরণ থেকে যে কবি সামনে এসে দাঁড়ান, তিনি প্রেমের ব্যক্তিগত প্রসঙ্গের উত্তাপ কবিতায় সঞ্চারিত করে দিতে পারেন নি, পরিবর্তে নিয়ে এসেছেন এক অস্পষ্ট, অনির্দেশ্য প্রেমব্যাকুলতা যা ইপ্সিতাকে খুঁজে ফিরেছে অতীতের লুপ্ত গরিমা, বিষাদ ও মৃত্যুস্পৃষ্ট এমন এক অলীক জগতে যা বাস্তব থেকে দূরস্থিত অথচ কল্পনার যথার্থ উজ্জীবনে স্বপ্নেও আশ্বস্ত নয়। তাই, 'ঝরাপালকে'র 'বিহ্বল বিরহী' 'চলেছে কত শত যুগজন্ম বহি' অথচ তাঁর ইপ্সিতা তবুও হয়ে ওঠেননি কোনও স্বপ্ন প্রত্যয় কি নিশ্চিত অন্বিষ্টের প্রতিমা ; তাই, 'প্রেমপিপাসার অগ্নি-অভিসার' 'হৃদয়ের পাণ্ডুলিপি' রচনা করে 'অনন্ত অঙ্গারে'। 'কারা কবে বেসেছিল ভালো' কি 'যুগ যুগ ছুটিতেছে কার অন্বেষণে' জাতীয় চরণের অজস্র বিক্ষিপ্ত উদাহরণ পাঠকের কাছে স্পষ্ট করে তোলে 'ঝরাপালকে'র কবির প্রেমভাবনার অনিশ্চয়তা ও অপরিণতির রূপটি।

'অস্তচাঁদ' বা 'ছায়াপ্রিয়া'র মত কবিতা পাঠ করিলেই দেখা যায় এ সময়কার রচনায় প্রেমের কথা উচ্চারণ করতে গিয়ে নায়ক আত্মবিস্মৃত ভাবাতিশয্যে আপনাকে দেখেছে 'দূর উর ব্যবিলোন মিশরের মরুভূসংকটে' 'ইসিসের বেদিকার মূলে' আসীরিয় সম্রাটের বেশে', কখনও তাতার কি স্পেনীয় জলদস্যুর মত দাবীতে নির্মম, আবার কখনও 'বাংলার মাঠ ঘাটে বেণুহাতে ময়ূরপাখাচূড়া চিরকিশোরের মত মায়াবী। এভাবে অতীত ও ইতিহাস,

পুরাণ ও লোককথার উচ্ছ্বাসপ্রবণ, কিন্তু উদ্দেশবিহীন মিশ্রণে 'ঝরাপালকে' প্রেম ব্যক্তিগত আবেগের উত্তাপ ও প্রাণস্পন্দনকে হারিয়ে ফেলেছে। তবুও তারই মধ্যে কখনও 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল'-এর মত কবিতা দীর্ঘায়িত অক্ষরবৃত্তের বিষাদভারাবনত পাদচারণায় অভ্রান্ত জীবনানন্দীয় আমেজ নিয়ে আসে :

> চুল যার শাওনের মেঘ আর—আঁখি গোধূলির মত গোলাপীরঙিন,
> আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে'—স্বপ্নে—কতদিন।

উদ্ধৃত চরণ দুটি বুদ্ধদেব বসুর আলোচনার ফলে আজ যথেষ্ট পরিচিত ও প্রচারিত। কিন্তু 'রাজার দুলাল', যাকে ঘিরে কবির স্বকণ্ঠ উচ্চারিত হতে শুনেছেন বুদ্ধদেব, তাঁকে অতিক্রম করে এই কবিতার মধ্যেই দাঁড়িয়ে আছেন অভ্রান্ত জীবনানন্দীয় নায়িকা—সেই শঙ্খমালা নারী যাকে বারবার দেখি কবির স্বপ্নে ও জাগরণে বিষণ্ণ প্রত্যাবর্তনে :

> মীনকুমারীর মত কোন দূর সিন্ধুর অতলে
> ঘুরেছে সে মোর লাগি। ....
> ....
> .... নরম লালিমা !
> জ্বলে গেছে,—নগ্ন হাত,—নাই শাঁখা, হারায়েছে রুলি,
> এলোমেলো কালোচুল খসে গেছে খোঁপা তার,
> বেণী গেছে খুলি'।
> সাপিনীর মত বাঁকা আঙুলে ফুটেছে তার কঙ্কালের রূপ,
> ভেঙেছে নাকের ডাঁশা,—হিমস্তন,—হিম রোমকূপ।

এ কবিতার যে ত্রুটি তা রয়েছে অন্যত্র ; সে ত্রুটি দৃষ্টিকোণের ; অসংলগ্ন সংস্থান ও ভাবকেন্দ্রহীনতার। 'ডালিমফুলের মত ঠোঁট যার' সেই রাজার দুলাল—যাঁকে দিয়ে কবিতার সূচনা ও শেষ, যিনি নায়িকার ঘুমপথে, স্বপ্নে বারবার ফিরে আসেন—তাঁকে বিস্মৃত হয়ে কবিতায় মধ্যপথ হতে কবির চেতনায় বড় হয়ে উঠেছেন এক বিষাদময়ী নারী। সেই ম্লান বিষণ্ণ নারীর রূপ দু'চোখ ভরে দেখে নিয়ে ছবি এঁকেছেন কবি স্বয়ং—কিন্তু কবিতার প্রারম্ভিক ও অন্তিম উচ্চারণে আছেন নায়িকা নিজেই। এই ভাবসংস্থানগত বিচ্যুতি কবিতাটিতে যথোচিত সংযম ও ভারসাম্য দেয়নি, যদিও যথার্থ জীবনানন্দীয় কাব্যধ্বনি 'ঝরাপালকে'র পাঠক এখানেই প্রথম শুনে নেন। এই নারীদের আবার দেখি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'পরস্পর' কবিতায়, 'বনলতাসেন'-এর 'শঙ্খমালা'য়। 'রূপসী বাংলা'র চতুর্দশপদীগুলিতে তাঁরই মুখমণ্ডলের প্রচ্ছায়া বিষাদ ও স্মৃতিভারাতুরতার এক অপরূপ রোমাণ্টিক আবহ রচনা করে দেয়।

'ঝরাপালক' থেকে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে এসে জীবনানন্দের পাঠক কবিকে আবিষ্কার করেন তাঁর নিজস্ব মনোভঙ্গী ও স্বকীয় শৈলীতে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র চিত্রের পর চিত্রে ছড়িয়ে রয়েছে বিষণ্ণ শীতার্ত নৈসর্গিক পৃথিবীর রূপ। সেই প্রাকৃতিক পটভূমিকায় প্রেম বারবার নিয়ে এসেছে এক রোমাণ্টিক দীর্ঘশ্বাস। এ কাব্যের প্রথমতম কবিতা 'নির্জন স্বাক্ষর', যেখানে এক পরিব্যাপ্ত নৈসর্গিক নশ্বরতার প্রেক্ষাপটে মানবিক প্রেম তার মৃত্যুহীনতার এমন দ্যোতনা আনে যা 'নক্ষত্রের আকাশ' কিংবা 'সমুদ্রের জল' কখনও জানেনি। চারিপাশের সবুজ মাঠ ঘাস আর 'আকাশে আকাশে ছড়ানো' নীল আকাশ, ইন্দ্রিয়গোচর সব জাগতিক মাধুরিমার চেয়েও ঢের বড় বিস্ময় এই প্রেম :

কোনো এক মানুষীর মনে
কোনো এক মানুষের তরে
যে জিনিস বেঁচে থাকে হৃদয়ের গভীর গহ্বরে।
নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে
কোনো এক মানুষের তরে এক মানুষীর মনে।

লক্ষণীয়, আদিপর্বের এই কবিতাটিতে জীবনানন্দ প্রেমকে জৈব নশ্বরতার ঢের উর্ধ্বে রেখেছেন। নিসর্গের যে সৌন্দর্যতা স্পষ্টতই ইন্দ্রিয়গোচর, সাম্মোহনীক। কিন্তু 'জীবনের রঙ, কবির প্রশ্ন, ফলানো কি হয় এইসব ছুঁয়ে ছেনে?' উত্তরও তিনি দিয়েছেন :

'সে এক বিস্ময়
পৃথিবীতে নাই তাহা—আকাশেও নাই তার স্থল—
চেনে নাই তারে ওই সমুদ্রের জল।'

অর্থাৎ, প্রেমের আসন মানব-হৃদয়ের গভীরে—জৈব এবং ইন্দ্রিয়গোচর রূপাবিষ্টতার চেয়ে বড় এই প্রেম। তাই, কবির অনুভবে, যদিও প্রকৃতির বুকে নিত্য নবীনের আনাগোনা, নতুন সময় আর নতুন নক্ষত্রের ভিড়, তবু 'কোনো এক মানুষীয় তরে' পুরোহিত হয়ে যে প্রেমের পূজাদীপ তিনি জ্বালিয়েছেন তার শিখা চির-অম্লান। এভাবেই প্রেম কবির চেতনায় জড় এবং জৈব অস্তিত্ব ও কামনার উর্ধ্বে স্থিত এক অপরিবর্ত দিব্যসত্তায় মূর্ত হয়েছে ; এভাবেই কবি তার মধ্যে সঞ্চারিত করেছেন চিরআকাঙ্ক্ষিত অপ্রাপনীয়তার রোমান্টিক বোধ। প্রেমানুভূতির এই বহুমাত্রিক ব্যঞ্জনাকে আশ্রয় করেই 'নির্জনস্বাক্ষর' এবং ঐ জাতীয় আরও কয়েকটি কবিতায় ঘনীভূত হয়েছে বিষাদ ও স্মৃতিভারাতুরতার রোমাণ্টিক অনুষঙ্গ। জীবনানন্দ যখন বলেন, 'জীবনের স্বাদ লয়ে জেগে আছ—তবুও মৃত্যুর ব্যথা দিতে পার তুমি'—তখনই আমাদের মনে পড়ে শেলী, কীটস্, হাইনে, হুগো, গত্যিয়ের হোল্ডারলিন প্রমুখ রোমাণ্টিক কবিকুলের কথা যাঁরা প্রেমকে জেনেছিলেন এক অপ্রতিরোধ্য মরণাকর্ষ, এক চিরঅতৃপ্ত তীব্র আকাঙ্ক্ষার স্বরূপে যার হাত থেকে প্রেমিকের কোনো পরিত্রাণ নেই। মৃত্যু ও জীবনের প্রবল বিষমানুপাতিক টানে দীর্ণ হতে হতেই যেন 'নির্জন স্বাক্ষর'-এর নায়ক বলে ওঠেন :

আমি চলে যাব, তবু জীবন অগাধ
তোমারে রাখিবে ধরে সেইদিন পৃথিবীর পরে,
আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে।

জীবনানন্দের এ পর্যায়ের কবিতাবলীতে প্রেমের এই ক্ষণশাশ্বতী স্বরূপ কবিতার চরণে চরণে সঞ্চারিত করেছে আত্মদীর্ণ অনুভবের গাঢ়তা। প্রেমের যে লোকোত্তর মহিমার উপলব্ধি 'নির্জন স্বাক্ষরে'র নায়ককে শেষপর্যন্ত প্রত্যয়ী করেছে, ঠিক তার বিপরীত সংক্ষোভ 'সহজ', '১৩৩৩', 'কয়েকটি লাইন' প্রভৃতি কবিতায় নিয়ে এসেছে তীব্র, অপরিতৃপ্ত, বাসনার প্রহার, প্রেমের ক্ষণউল্লাসের বেদনা। এসব কবিতার নায়িকা নিতান্তই মানুষী, দেহবন্ধ বাসনার প্রতিমা। এখানে পঙক্তির পর পঙক্তিতে ধ্বনিত ভালবাসার ক্ষণউল্লাস, নশ্বরতার বেদনা :

ক তুমি শুধু একদিন,—এক রজনীর।
খ একদিন এসেছিলে,—
দিয়েছিলে একরাত্রি দিতে পারে যত।

গ একদিন দিয়েছিলে যেই ভালবাসা,
ভুলে গেছ আজ তার ভাষা।

তবু ক্ষোভ, সংশয়, হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনাই কেবলমাত্র 'ধূসরপাণ্ডুলিপি'র প্রেমভাবনাকে বিশিষ্টতা দেয়নি, তারই পাশাপাশি আছে ভালবাসার চিরন্তনতার জন্য প্রেমিকের সেই ব্যগ্র আকাঙ্ক্ষা যা সর্বকালীন :

তুমি যদি রহিতে দাঁড়ায়ে।
নক্ষত্র সরিয়া যায়,—তবু যদি তোমার দুপায়ে
হারায়ে ফেলিতে পথচলার পিপাসা।
একবার ভালবেসে যদি ভালোবাসিতে চাহিতে তুমি
সেই ভালবাসা।

জৈব দেহবদ্ধ বাসনার বিপরীত এই অনুভূতি দেহজ উপভোগের ক্ষণিক উল্লাসবোধ থেকে মুহূর্তের আনন্দকে উত্তরিত করে নিতে চায় চিরকালীন সম্পদে। তাই, জীবনানন্দের আদিপর্বের প্রেমকাব্যে কখনও কখনও যুক্ত হয়েছে বাস্তবতার অতিরিক্ত লোকোত্তরতার মাত্রা। কিন্তু, রচনারীতির কিছু অপসৃয়মান মুদ্রায় এবং মানসিকতার কোনও কোনও পুনরাবৃত্ত প্রকাশে এ সময়কার কাব্যেও কল্লোলকালীন দেহবাদিতার ভাবানুষঙ্গ স্পষ্ট। তবু রোমাণ্টিক প্রেমকাব্যের বিশিষ্ট কুললক্ষণ যে নিয়তিতাড়িত আকাঙ্ক্ষার মরণাকর্ষণ, এবং তার বিপরীত মেরুতে আশ্রিত যে অতীন্দ্রিয় লোকোত্তর সৌন্দর্যের প্রতিভাস রোমাণ্টিক কবি তাঁর ইপ্সিতা নারীর মধ্যে খুঁজে পান, অপ্রাপনীয় বলেই যা আকাঙ্ক্ষাকে করে নিরন্তর অচরিতার্থতায় তীব্রতর, জীবনানন্দের এ সময়কার প্রেমের কবিতাগুলিতে তার লক্ষণ আদৌ অপরিস্ফুট নয়।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাবলীর যে স্বতন্ত্র চেতনা ও আসক্তি বাংলা নিসর্গকাব্যে এক অশ্রুতপূর্ব ধ্বনিগভীরতা যুক্ত করেছে তা সবচেয়ে স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটিতে। এই কবিতায় নিসর্গরূপের অজস্র উদ্ভাসন ও মাধুরিমার অনুপুঙ্খ ভাষ্যকার কবি পাঠকের আবিষ্ট দৃষ্টি আলেখ্য থেকে আলেখ্যান্তরে চালিত করে নিয়ে যান এক ভারাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাসে :

জানিনা কি আহা
সব রাঙা কামনার শিয়রে যে দেয়ালের মত জাগে
ধূসর মৃত্যুর মুখ,

কামনার আগে 'রাঙা' বিশেষণ মৃত্যুর মুখ ধূসরতর করেছে এ চিত্রে; সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে 'দেয়ালের মত' শব্দ দুটির আঘাতের ব্যঞ্জনা। যেন, এতক্ষণ যে আলোছায়ার খেলা হিজলের জানালা থেকে নেমে এসেছিল জ্যোৎস্নার উঠানে, বৈশাখের প্রান্তরের সবুজ বাতাস আর নীলাভ নোনার বুকে আকাঙ্ক্ষায় গাঢ় হওয়া রস, ঘনান্ধকার বটের নিচে লাললাল ফল—পৃথিবীর মাসঋতু বৎসরের এই বর্ণাঢ্যতাকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে কবিতাটিতে আর এক প্রচ্ছায়া—যেদিকে 'বিকেলবেলার ধূসরতায়' 'পৃথিবীর কঙ্কাবতী'কে কেড়ে নেয় 'অন্ধকার নদী' : 'পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর।' লক্ষণীয়, কি আশ্চর্য অনায়াস কল্পনায় একটি সহজ সরল গ্রাম্য নিসর্গচিত্রের বর্ণনার মধ্য দিয়েই কবিতার মধ্যে জীবনানন্দ সঞ্চারিত করে দিতে পেরেছেন তন্নিষ্ঠ নিসর্গবর্ণনার অতিরিক্ত অন্য ব্যঞ্জনার মাত্রা। বিকালের ক্রমক্ষীয়মান আলোয় নদীর

উপর জমে ওঠা অন্ধকার আর তার মধ্যে অস্পষ্ট হয়ে-যাওয়া হারিয়ে-যাওয়া নারীর শরীর—এই অতিপরিচিত সাধারণ গ্রাম্যছবিটি থেকেই উঠে এসেছে মৃত্যুস্পৃষ্ট সৌন্দর্যের এক অপরূপ প্রতিমা—'ধূপের শরীর' পাওয়া পৃথিবীর কঙ্কাবতী নারী। 'কঙ্কাবতী' এই শব্দটির সুপ্রয়োগে লোককাহিনীর রূপসী নায়িকা বিয়োগান্তিক বেদনায় সর্বকালীন ও সর্বজনীন হয়ে উঠেছে। তবু, সাধারণভাবে বলা যায়, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে জীবনানন্দের কাব্যের নায়িকারা সকলেই প্রবলভাবে মানবী ; দেহজ বাসনায় বদ্ধ, ঈর্ষা ; বঞ্চনা, অবহেলা ব্যর্থতায় চরিত্রায়িত। দেহাতীত প্রেমের দিব্যতা সেখানে ক্ষণিক বিদ্যুৎদ্যুতির মতই কখনও কখনও আবির্ভূতমাত্র।

মৃত্যুর দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়া 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নিসর্গ-নিবিষ্টতাকে যেমন বিষাদঘন করেছে, তেমনই সেই মৃত্যুস্পৃষ্ট নিসর্গভূমিতে আবির্ভূত হয়ে কবির প্রেমভাবনাও হয়ে উঠেছে মৃত্যু-আহত। এ পর্যায়ে জীবনানন্দের কাব্যে প্রেম মরণজয়িতার অনুভবে বলশালী নয়, যতটা মরণার্ত নশ্বরতার বোধে পীড়িত। কবি জানেন, 'সূর্যের চেয়ে, আকাশের নক্ষত্রের থেকে প্রেমের প্রাণের শক্তি বেশি'; এবং মানুষের জীবন 'প্রার্থনার গানের মতন' হয়ে ওঠে 'তুমি আছ বলে প্রেম'। তবু সেই সঞ্জীবনী—'সকল ক্ষুধার চেয়ে বড়, সকল শক্তির আগে' যে প্রেম সেও মৃত্যুর কাছে পরাহত :

> আমি শেষ হবো শুধু ওগো প্রেম, তুমি শেষ হলে।
> তুমি যদি বেঁচে থাক, জেগে রব আমি এই পৃথিবীর পর—'
> যদিও বুকের পরে মৃত্যু রবে, —মৃত্যুর কবর।

এই সর্বায়ত মরণশীলতার বোধই কবিচেতনায় সঞ্চারিত করেছে নশ্বরতার বেদনা, ক্ষণ উল্লাসে অতৃপ্তি। একটির পর একটি কবিতায় 'সিন্ধুর-জল', 'সমুদ্রের ঢেউ' প্রেমের উপমেয় হয়ে আসে ;

> ক   তুমি জল—তুমি ঢেউ—সমুদ্রের ঢেউয়ের মতন
> খ   জলের আবেগে তুমি চলে যাও—

কারণ ঢেউয়েরই মতন প্রেম চিরপলাতক, উদ্বেল, অস্থির ; আবার প্রত্যাবর্তিত হতে জানে 'স্মৃতির হাড়ের মাঠে—কার্তিকের শীতে'।

অতএব দেখছি, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'রূপসী বাংলা' পর্যায়ে জীবনানন্দের প্রেমচেতনাও দুটি বিপ্রতীপ বিন্দুতে আবর্তিত। একদিকে, প্রেমের ঐশ্বর্যময় আবির্ভাবের রোমহর্ষ নৈসর্গিক প্রেক্ষাপটে মুদ্রিত :

> যখন সবুজ অন্ধকার,
> নরম রাত্রির দেশ, নদীর জলের গন্ধ কোন এক নবীনাগতার
> মুখখানা নিয়ে আসে—মনে হয়ে কোনোদিন পৃথিবীতে প্রেমের আহ্বান
> এমন গভীর করে পেয়েছি কি : প্রেম যে নক্ষত্র আর নক্ষত্রের গান,
> প্রাণ যে ব্যাকুল রাত্রি প্রান্তরের গাঢ় নীল অমাবস্যার—
> চলে যায় আকাশের সেই দূর নক্ষত্রের লাল নীল শিখার সন্ধানে,
> প্রাণ যে আঁধার রাত্রি আমার এ—, আর তুমি স্বাতীর মতন
> রূপের বিচিত্র বাতি নিয়ে এলে,—তাই প্রেম ধুলায় কাঁটায় যেইখানে
> মৃত হয়ে পড়েছিল পৃথিবীর শূন্যপথে পেল সে গভীর শিহরণ ;

অন্যদিকে, বিচ্ছেদকাতরতা, নশ্বরতার বেদনা, অচরিতার্থতার ভারাক্রান্ত দীর্ঘশ্বাস :

ক শরীরে ননীর ছিরি,—ছুঁয়ে দেখো—চোখা ছুরি,—ধারালো হাতির দাঁত!
হাড়েরই কাঠামো শুধু,—তার মাঝে কোনোদিন হৃদয় মমতা ছিল কই!
['পরস্পর'/'ধূসর পাণ্ডুলিপি']

খ জানি তবু,—নদীর জলের মত পা তোমার চলে ;—
তোমার শরীর আজ ঝরে
রাত্রির ঢেউয়ের মত কোনো এক ঢেউয়ের উপরে!
যদি আজ পৃথিবীর ধুলোমাটি কাঁকরে হারাই,
যদি আমি চলে যাই
নক্ষত্রের পারে,—
জানি আমি তুমি আর আসিবে না খুঁজিতে আমারে!
['১৩৩৩'/ধূ. পাঃ]

গ. জানালার ফাঁক দিয়ে ভোরের সোনালি রোদ এসে
আমারে ঘুমাতে দেখে বিছানায়, আমার কাতর চোখ,
আমার বিমর্ষ ম্লান চুল
এই নিয়ে খেলা করে ঃ জানে সে যে বহুদিন আগে আমি
করেছি কি ভুল
পৃথিবীর সবচেয়ে ক্ষমাহীন গাঢ় এক রূপসীর মুখ ভালোবেসে,
[রূপসী বাংলা]

চিরঅলভ্য প্রেম আর চিরঅতৃপ্ত হৃদয় উভয় মিলে রচনা করেছে জীবনানন্দের প্রথম পর্যায়ের কাব্যে স্মৃতিভারাতুরতার এমন আবহ যা স্বাভাবিকভাবেই রোমাণ্টিক কাব্য ঐতিহ্যের ধারায় আশ্রিত।

রোমাণ্টিক প্রেমকাব্যের নায়িকা নিষ্ঠুরা মোহিনী; 'লা বেল্ দাম সাঁ মের্শি' (অকরুণা এক রূপসী)। সেই 'ফাম্ ফাতাল' বা সর্বনাশীর প্রতি রোমাণ্টিক কবি অনুভব করেছেন অপ্রতিরোধ্য নিয়তিতাড়িত জৈব-বাসনা-সংরাগক্ষুব্ধ মৃত্যু-আকর্ষণ। সেই তীব্র একাগ্র আকাঙ্ক্ষা আপন অতৃপ্তি থেকে রচনা করেছে এমন এক অধরা মোহিনী-প্রতিমা যা কাম্য তবু অপ্রাপনীয়, চিরঅধরা তাই দিব্য। এভাবেই দেহজ বাসনায়প্রোথিত থেকেও শেষপর্যন্ত শ্রেষ্ঠ রোমাণ্টিক কাব্যে প্রেম হয়ে উঠেছে দেহাতীত দিব্য এক অন্বিষ্টের প্রতীক—ঈপ্সিতা নারী সেখানে মানবাত্মার চিরন্তন সৌন্দর্যপিপাসার গরীয়সী দেবী। মনে করা যাক শেলীর সেই বিশ্রুত পঙক্তিগুলির কথা ঃ

The desire of the moth for the star,
Of the night for the morrow,
The devotion to something after
From the sphere of our sorrow ?

রোমাণ্টিক প্রেমকাব্যের মূল্য ও মহিমার শিখরস্পর্শী তাৎপর্য এই চরণগুলিতে অভিব্যক্ত। এখানে ঊষার পশ্চাতে ধাবমান রাত্রির চিত্রকল্পে এক নিরবচ্ছিন্ন একাগ্র অন্বেষার কথা উচ্চারিত যা কিন্তু নিয়তিতাড়িত সর্বনাশের ইঙ্গিত বহন করছে প্রথমচরণের 'বহ্নিমুখ বিবিক্ষু' পতঙ্গের উল্লেখে। আবার, এ সব কিছুকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে অতীন্দ্রিয় দেহাতীত ব্যঞ্জনা ঃ কারণ, শেলী লিখলেন না অগ্নিশিখার প্রতি ধাবমান পতঙ্গের কাহিনী, নিয়ে এলেন নক্ষত্র আলোকমুখী পতঙ্গের চিত্র যা শেষ দুটি চরণে আরও

বিস্তারিত, ব্যাখ্যাত হয়েছে : প্রেম যেন এক অমর্ত্য আকাঙ্ক্ষা যা আমাদের শোকদুঃখুপীড়িত এই ভূলোক থেকে উত্তীর্ণ করে নেয় অন্য এক জগতে, অন্যতর মহত্তর অনন্যমুখী অন্বেষায়। একদিকে স্পর্শগন্ধময় এই নশ্বর মর্ত্যভূমির সহস্র আকর্ষণ আর সহস্র প্রহারে ধূলিম্লান মানবহৃদয়ের আকুতি, অন্যদিকে মরণাতীত দিব্য-সৌন্দর্যের প্রতিভাস ভালবাসায় ঐশ্বর্যময়ী এক নারীর প্রতিমায়—দেহ ও দেহাতীত, ইন্দ্রিয়গোচর ও অতীন্দ্রিয় এই দুই বিপ্রতীপ টানে রোমান্টিক প্রেমকাব্য গভীর ব্যঞ্জনাবহ।

জীবনানন্দ দাশ সময়ের দিক থেকে আধুনিককালের কবি। তবু কবিচেতনার নানা লক্ষণে তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতাগুলিতে রোমান্টিক ভাবনার স্পষ্ট স্বাক্ষর লক্ষ্য না করে উপায় নেই। অবশ্যই তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রেমকবিতাগুলি খুঁজে নিতে আমাদের পেরিয়ে আসতে হয় তাঁর কাব্যের আদি পর্যায়—'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'রূপসী বাংলা'র মানসিকতা—পৌঁছাতে হয় মধ্যপর্যায়ে 'বনলতাসেন'-সমকালীন কবিতাগুচ্ছে যার অনেকটাই উদ্ধৃত হয়েছে সিগনেট সংস্করণ 'বনলতাসেন' গ্রন্থটিতে। তবু, তার আগেই, রোমান্টিক প্রেমভাবনার কিছু কিছু সর্বকালীন বিশিষ্টতা 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগেও অনুপস্থিত নয় তাঁর কাব্যে। আমরা দেখেছি, নৈসর্গিক ক্ষয়বিলয়ের প্রেক্ষাপটে উপস্থাপিত প্রেম তাঁর এ'সময়কার রচনায় মৃত্যুস্পৃষ্ট এক বেদনার উৎসার ; আবার নশ্বরতার নিয়তিকে অতিক্রম করে সম্ভোগের ক্ষণ-উল্লাস খুঁজে পেতে চায় শাশ্বতের অভিজ্ঞান। মুহূর্তের মধ্যে চিরন্তনকে ধরার আকুতি, দেহজ রমণীয়তাকে কেন্দ্র করে বৈদেহী সৌন্দর্যের রহস্যময়তার উদ্ভাস—এসব কিছুই উনিশশতকী রোমান্টিক মানসচেতনার মনোবীজ বহন করছে।

লক্ষণীয়, জীবনানন্দের আধুনিক মন সনাতন দেশজরীতিতে প্রেমকে কামগন্ধহীন কোনও 'নিকষিত হেম' প্রমাণে তিলমাত্র আগ্রহ দেখায়নি। দেহ এবং সম্ভোগের উল্লাসানুভূতি দুই-ই তাঁর প্রথম পর্যায়ের কাব্যে প্রত্যক্ষভাবে উপস্থিত। 'পিপাসার গান'-এর মত কবিতায় জীবনানন্দ কোনরকম সংশয়ের অবকাশ না রেখেই বলেন 'দেহের পীড়নে /সাধ মোর—চোখে ঠোঁটে চুলে/শুধু পীড়া—শুধু পীড়া'। আবার, 'নারীর অধরে/চুলে চোখে—জুঁয়ের নিঃশ্বাসে/ ঝুমকোলতার মত তার দেহ ফাঁসে' একদিন কবি 'রক্তমাংসের স্পর্শসুখভরা' 'পৃথিবীর ঘ্রাণের পসরা' জেনেছেন। কিন্তু তখনকার মত রোমান্টিক ভাবনাদীপ্ত এই কবির চেতনা কোনও জৈব বাসনা কি দেহোল্লাসকেই প্রেম বলে চিহ্নিত করেনি ; আরও পরিণতি ভাবনায় উচ্চারিত হয়েছে : 'দেহ ঝরে—তার আগে আমাদের ঝরে যায় মন'। এই 'মন'ই তাঁকে শিখিয়েছে জৈবতা-অতিরিক্ত সংবেদ : 'এ জীবন ইহা যাহা, ইহা যাহা নয়'; এবং সেই বোধের নিরন্তর অনুভাবনাতেই তাঁর কাব্য আধুনিক। আসলে জীবনানন্দের কবিতায় প্রেম কোনও দেহবাদী প্রতিন্যাসেই আবদ্ধ থাকে নি, যদিও কাব্যসাধনার শিক্ষানবিশীযুগে তিনি ছিলেন মোহিতলাল, নজরুল প্রমুখের শৈলী ও বিষয়গত অনুকারী। দেহসর্বস্ব দেহবাদিতা জীবনানন্দকে প্রবলভাবে প্রভাবিত করেনি বলেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে তাঁর কাব্যে শোনা যায় দেহকে স্বীকার করে নিয়ে উচ্চারিত বৈদেহী প্রার্থনা : 'সমুদ্রের জলে দেহ ধুয়ে নিয়া/তুমি কি আসিবে কাছে প্রিয়া'। তবে, সেই সঙ্গে একথাও অবশ্যমান্য যে এ সময়ে তাঁর কাব্যে প্রেমের অতীন্দ্রিয় দেহাতীত উপলব্ধি ক্ষণভাসিতমাত্র। স্বপ্নপ্রয়াণের অন্তিম আবেদন সত্ত্বেও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রেম ঐহিক অস্তিত্বের সীমারেখা প্রবলভাবে লঙ্ঘন করেনি। কারণ, জীবনানন্দ জেনেছেন :

নক্ষত্রের পানে যেতে যেতে
পথ ভুলে পৃথিবীর পথে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল। ('স্বপ্নের হাতে'/ ধূ. পা.)

'জন্মিতেছি' এই ক্রিয়াপদটির অনবদ্য প্রয়োগে অন্তহীন ও প্রবহমান মানব জীবনধারার ইঙ্গিত, যেখানে একের 'পিপাসার ধার' অন্যের বুকে জাগিয়ে তুলছে বারবার 'প্রেমের পিপাসা'। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র নায়িকা তাই শেষাবধি এক মর্ত্যনারীই থেকে যান—যাঁর 'চোখে ঠোঁটে অসুবিধা ভিতরে অসুখ'। কবিরা যে রূপসীর কথা বারবার উচ্চারণ করেছেন তাঁদের কাব্যে, তিনি এক রূপকথার নায়িকা ঃ 'আমরা সাধিয়া গেছি যার কথা—পরীর মতন এক ঘুমানো সে মেয়ে'; কিন্তু জীবনানন্দ যার কথা আমাদের শোনালেন, সে—

এ ঘুমানো মেয়ে
পৃথিবীর,—ফোঁপরার মত করে এরে লয় শুষে
দেবতা গন্ধর্ব নাগ পশু ও মানুষে।

তাই, শেষপর্যন্ত, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রেম লৌকিক বাসনাসংরাগে মথিত মৃত্যুআহত সৌন্দর্যানুভূতির বিষণ্ণআবহ রচনা করেছে যা একান্তভাবেই মর্ত্যমুখীন ঃ

তোমার সৌন্দর্য চোখে নিয়ে আমি চলে যাব পৃথিবীর থেকে
রূপ ছেনে তখনও হৃদয়ে কোনও আসে নাই ক্লান্তি অবসাদ
('পৃথিবীতে থেকে'/ধূ. পা.)

এমনকি সব আহত ব্যর্থতার গ্লানিও উত্তীর্ণ এই নিবিড় মর্ত্যপ্রাণ রূপপিপাসায় ঃ

তুমি প্রেম দাও নাই —জানি আমি —তবুও রক্তাক্ত
কোনও রেখা
সোনার ভাঁড়ারে আমি রাখি নাই শীতমধু মোমের সঞ্চয়ে,
কুয়াশা হতাশা নিয়ে সরে আমি আসি নাই পৃথিবীর থেকে ;

যে অগাধ ইন্দ্রিয়মগ্ন সৌন্দর্য উপলব্ধি 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—'রূপসী বাংলা'র নিসর্গবর্ণনায় সঞ্চারিত করেছে আঞ্চলিক স্বাদ আর অনুপুঙ্খতার রমণীয় জাদু তাই যেন জীবনানন্দের এ সময়কার প্রেমের কবিতায় যুক্ত করেছে এক গভীর বিস্ময়বোধ ঃ

তোমারে দেখেছে ভালোবেসেছে অনেকে
তাহাদের সাথে আমি—আমিও বিস্ময় এক পেয়েছি যে টের
গভীর বিস্ময় এক শুধু তার ম্লান হাত-চুল—চোখ দেখে।

এই বিস্ময় বোধেই কবি বলে ওঠেন ঃ

তোমার মুখের রূপ নিয়ে তুমি বেঁচেছিলে তোমার শরীরে
তাইতো মসৃণ তুলি হাতে লয়ে জীবনেরে এঁকেছি এমন
অনেক গভীর রঙে ভরে দিয়ে, চেয়ে দেখ ঘাসের শোভা কি
লাগেনি সুন্দর আরো একবার তোমার মুখের থেকে ফিরে
যখন দেখেছি ঘাস ঢেউ রোদ মিশে আছে তোমার শরীরে।

এই অশ্রুতপূর্ব উচ্চারণের পর 'প্রকৃতির শোভাভূমিকায় প্রেম' বলে জীবনানন্দ কি বোঝাতে চেয়েছেন তার আর কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয় না।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ে জীবনানন্দের কাছে প্রকৃতিই ছিলেন সমস্ত প্রতীকের জননী ; 'মেঠো চাঁদ, শিঙের মত বাঁকা চাঁদ', 'কার্তিকের মাঠ' কিংবা 'পেঁচা' তাদের নিজস্ব নৈসর্গিক পরিমণ্ডলের অতিরিক্ত কিছু দ্যোতনায় কবিতার ভাববস্তুতে সঞ্চারিত করেছে প্রতীকী ব্যঞ্জনা। 'বনলতাসেন' পর্যায়ে প্রতীকায়নের সেই প্রবণতা আরও প্রবল ও পরিণত এবং বিষয়ের সঙ্গে গাঢ় সাযুজ্যে উপস্থাপিত। এ পর্যায়ে প্রতীক আর শুধুমাত্র কিছু নৈসর্গিক উপকরণের মধ্য দিয়ে শব্দের অভিধার অতিরিক্ত মাত্রাযোজনার কারণ হয়নি ; প্রায়শই তা বিষয় বা ভাববস্তুর উপস্থাপনার মধ্য হতেই উৎসারিত। প্রতীকী রীতির এই নবপ্রসৃতি অনেকগুলি কবিতার নামকরণেই আভাসিত। 'বনলতা' এই নামের মধ্যেও যে এক নিসর্গপ্রতিম নারী উপস্থিত তা আমরা আগেই লক্ষ্য করেছি ; প্রেম ও প্রকৃতি এ' কবিতাটিতে এক অভিন্ন প্রতিমায় উপস্থিত হয়ে কবিতার ভাববস্তুতে যোগ করেছে তাৎপর্য-গভীরতা। আর, সেইভাবে গৃহীত হলেই কবিতাটি যথার্থ অর্থময় হয়ে ওঠে। 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থে বা জীবনানন্দের সেই সময়ের অন্য রচনায় প্রেম প্রকৃতির শোভাভূমিকায় উপস্থিত শুধুমাত্র এটুকু বললে তা অর্ধসত্যের মত শোনাবে। 'বনলতাসেন' গ্রন্থের কবিতাবলীতে নারী এসেছেন বারবার নানা মূল্যবোধের আধারিকরূপে। প্রকৃতির প্রশান্তির সম্ভার নিয়ে 'বনলতাসেন' অপেক্ষা করে আছেন অন্বেষাক্রান্ত মানবাত্মার জন্য। 'সুরঞ্জনা', 'সুদর্শনা', 'সুচেতনা', 'শ্যামলী' প্রভৃতি কবিতার বাহিরের আয়োজনে কোনও নারী, কোনও মানবীর প্রেম বিষয়ীভূত বলে মনে হলেও নিবিষ্ট অনুধাবনে এসব কবিতার প্রতীকী আবরণ উন্মোচিত হয়ে যায়। দেখা যায়, মানব-জীবনের কোনও না কোনও অভীপ্সার শক্তি ও প্রেরণা এখানে নারীর প্রেমের রূপকে আশ্রিত ; নারী হয়ে উঠেছেন প্রতীক। 'সুরঞ্জনা' কবিতায় 'সুরঞ্জনা'কে সম্বোধন করে কবি মানবহৃদয়ের দুর্মর প্রেমবাসনাকেই তাঁর কবিতার উপজীব্য করেছেন এবং তাকে ইতিহাস চেতনায় জারিত করে নিয়েছেন ('সুরঞ্জনা, আজো তুমি আমাদের পৃথিবীতে আছো')। কিম্বা 'সুচেতনা' কবিতাটিতে পৃথিবীর গভীরতর অসুখের যুগে মানবহৃদয়ের 'সুচৈতন্য তথা সুস্থ চেতনা দূরতর দ্বীপের অবসিতপ্রায় প্রতীকে এই কথাটিই কবি জানাতে চেয়েছেন।

'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'রূপসী বাংলা' পর্যায়ের প্রেমের কবিতাবলী থেকে 'বনলতাসেন'-এর অন্তর্ভুক্ত প্রেমবিষয়ক কবিতাবলীর স্বাদ তাই ভিন্নতর। পূর্ব পর্যায়ের কাব্যের অনুপুঙ্খ চিত্রায়নের অবিরল প্রবাহের পরিবর্তে এ পর্যায়ের কবিতায় এসেছে মিতভাষণ আর প্রতীকী ব্যঞ্জনার নবীন বিস্তার। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবির ভূমিকা এক মুগ্ধ আবিষ্ট দর্শকের ; প্রকৃতির ক্ষয় বিলয়ের পটভূমিতে তাঁর সেই 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ' রূপান্তরিত হয়েছে বিষণ্ণ সংবেদনায়। ধূসর ম্লান হিমার্ত নিসর্গজগতে আবিভূর্ত হয়ে প্রেম সেখানে বহন করে এনেছে 'বঞ্চনা, হতাশা ক্ষোভ, যন্ত্রণার বিষ'। প্রেমের মৃত্যুহীনতার কথা সেখানেও আছে, আছে তার অমর্ত্যপ্রসাদ আর ক্ষণভাসিত উল্লাসের কথাও। কিন্তু অপ্রাপনীয়ের জন্য আর্তি আর বঞ্চিত প্রেমের সংক্ষোভই সেখানে প্রবল, নেই কোনও গাঢ় প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বাণী। 'বনলতাসেন' পর্যায়ে প্রেম আরো বড়, আরো গভীর চেতনার আলোকে মূল্যায়িত। নিসর্গ তাঁর একালের কাব্যে' শুধুমাত্র প্রেক্ষিতই রচনা করেনি, হয়ে উঠেছে জীবনের মূলাধার। ফলে 'বনলতাসেন' গ্রন্থটিতেও পরবর্তীকালের

১। 'বনলতাসেন'-'মহাপৃথিবী' পর্যায়ের কাব্যের রচনাকাল ১৩৩৬ থেকে ১৩৪৫-৪৮ সন; কবির নিজের দেওয়া হিসাব অনুযায়ী। দ্রষ্টব্য ঃ মহাপৃথিবী ১ম সং ভূমিকা।

অনেক কবিতায় বহুসময়েই জীবনানন্দের প্রেমভাবনা প্রকৃতিলীন এক জৈবিক অস্তিত্বের চেতনায় নিরাপত্তা ও শান্তি খুঁজেছে।[২] আবার, জায়মান এক ইতিহাসচেতনায় এ সময়কার কাব্যে প্রেম এক স্থির প্রতিশ্রুতির স্বপ্নে উদ্বুদ্ধ হয়েছে, পরিণত হয়েছে প্রশান্ত বিশ্বাসদীপ্ত উপলব্ধিতে। ফলে, কবিতার পর কবিতায় প্রেম আবির্ভূত এক গাঢ় আবেগার্দ্র উচ্চারণে।

এ পর্যন্ত জীবনানন্দের কাব্যে প্রেম-প্রতিরোধের প্রকাশনায় সংবেদনা ও মননের নবীন বিস্তারের কথাই বলেছি। 'বনলতাসেন' পর্যায়ের কবিতায় ভাবের প্রকাশ-মাধ্যমগুলিকেও জীবনানন্দ নূতন শক্তি ও ব্যঞ্জনায় সঞ্জীবিত করেছেন। ঠিক যতটা অংশে মাধ্যম বা রীতির নবীনতা এবং স্বাতন্ত্র্য বিষয়বস্তুকে এ যাবৎ দুর্লক্ষ্য কোনও ব্যঞ্জনা ও শক্তিতে চিহ্নিত করে ততটাই তা আমাদের বর্তমান আলোচনার অংশভুক্ত হবার দাবী রাখে। তেমনই একটি প্রসঙ্গ ঃ 'বনলতাসেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে প্রতীকের স্বচ্ছন্দ ব্যবহার ও তাৎপর্যময়তা। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে 'সাতটি তারার তিমির' পর্যন্ত জীবনানন্দের বিবর্তনশীল কাব্যপ্রবাহের এই প্রতীকী তাৎপর্যের উপস্থিতি ও তার উপলব্ধি কাব্যের অর্থ-অনুধাবনের বিশেষ সহায়ক। 'সুচেতনা'কে সম্বোধন ('সুচেতনা, তুমি এক দূরতর দ্বীপ') করে এজাতীয় উচ্চারণের অর্থোল্লাস কোনও রসবেত্তা পাঠকের কাছে গোপন থাকে না। কিন্তু কেন জীবনানন্দ বিশেষ করে নারীকেই বেছে নিলেন মানুষের চেতনানিহিত কোনও মূল্যবোধ তথা প্রেরণাশক্তির বিমূর্ত উপস্থিতিকে তাঁর কবিতায় একটি অবয়ব দিতে, কেন কোনও মানবীর প্রেমের সাঙ্গীকরণে রূপায়িত করলেন মানবসভ্যতার সম্মুখ-যাত্রার অন্তর্জাত শক্তিরূপী মূল্যবোধগুলি—এসব প্রশ্নও স্বাভাবিক। উত্তরে বলা যায়, সৌন্দর্য ও কল্যাণের সমাহারে নারী মানবহৃদয়ের চিরআদরনীয়া ; তার আকাঙ্ক্ষার অভীষ্ট, যেমন মানবমনের মূল্যবোধগুলি ইতিহাসের ঘনঘটায় কখনও কখনও দুর্নিরীক্ষ্য হলেও চিরন্তন, নাবিকের কাছে সৈকতের সত্যের মত, ধ্রুবতারকার মত অকম্প্র ও দিশারী ; আবার প্রেমেরই মত তারা যন্ত্রণাহত ও মৃত্যুস্পৃষ্ট হয়েও দুর্মর ও চিরজীবিত। জীবনানন্দের এ' পর্যায়ের কবিতায় নারী শুধু তাঁর সৌন্দর্যরূপেই আবির্ভূতা নন, তিনি এসেছেন তাঁর কল্যাণস্বরূপে। তাঁর নারী-নায়িকাদের সকলের নামের আগেই তাই 'সু' শব্দটি উপস্থিত ('সুদর্শনা', 'সুরঞ্জনা', 'সুচেতনা')।

নারীর প্রেমের রূপককে আশ্রয় করে কবিতাবস্তুর এই প্রতীকী বিস্তার ('বনলতাসেন' পর্যায়ে) জীবনানন্দের প্রেমচেতনায় নবীনতার স্বাদ ও তাৎপর্য সংযুক্ত করলেও বাঙলাকাব্যের পূর্বঐতিহ্যে তা একেবারে অপরিজ্ঞাত ছিল না। মনে করা যেতে পারে 'মহুয়ার' সেই 'নাম্নী' কবিতাগুচ্ছ ঃ শ্যামলী, কাজলী, জয়তী, উষসী, করুণী ইত্যাদি কবিতাগুলি লঘুভার হলেও এসব রচনায় নারীর ভাবরূপের এক একটি দিক চিহ্নিত এবং সেই ভাবনুযায়ী নামে নায়িকা সম্বোধিত। এভাবেই কোনও অব্যবহিত প্রয়োজনে রচিত হয়েও কবিতা সেই প্রয়োজনের বাস্তব সীমারেখা অতিক্রম করে যায় ঃ

> সৃষ্টির রহস্য আমি তোমাতে করেছি অনুভব
> নিখিলের অস্তিত্ব গৌরব।
> অন্তহীন কাল আর অসীম গগন
> নিদ্রাহীন আলো
> কি অনাদি মন্ত্রে তারা অঙ্গ ধরি তোমাতে মিলালো।

২। 'আমি যদি হতাম' ও 'শ্বাস' কবিতা দুটি দ্রষ্টব্য।

যুগে যুগে কি অক্লান্ত সাধনায়,
অগ্নিময়ী বেদনায়,
নিমেষে হয়েছে ধন্য শক্তির মহিমা
পেয়ে আপনার সীমা
ওই মুখে ওই চক্ষে ওই হাসিটিতে।[৩]

রবীন্দ্রনাথের হাতে যা ছিল বিমূর্ত ভাববস্তুর রূপাধার, জীবনানন্দের কাব্যে সেই রীতিতে সংযুক্ত হল প্রতীকী দ্ব্যর্থকতার অতিরিক্ত মাত্রা। রূপকায়নের মধ্যে অর্থের সমান্তরাল সাযুজ্য বা বিস্তার অনেক সময়েই আরোপিত বা যুক্তিধৃত, তাই কৃত্রিম বলে মনে হয়। জীবনানন্দের আধুনিক শিল্পী-মনস্কতা সেই রীতিগত কৃত্রিমতাকে অতিক্রম করতে চেয়েছে প্রতীকের গহনতা ও অভেদে। কবিতার বহিরঙ্গের আয়োজন তিনি সম্পূর্ণ করেছেন বাস্তবের পরিচ্ছদে ; কিন্তু তার অন্তরঙ্গ আবেদন এই বাইরের বেশ খুলে ফেলেই মেলে ধরে শব্দের প্রতীকী রহস্য-গভীরতা ও ভাবতাৎপর্য। তাঁর নারী-নায়িকাদের নামের সঙ্গে জীবনানন্দ কখনও যুক্ত করেছেন পদবী ('সেন', 'সান্যাল', 'ঘোষাল'), কখনও বা আঞ্চলিকতার আবহ ('নাটোরের বনলতাসেন')। এসবই কিন্তু এসেছে শিল্পরূপসিদ্ধির সম্পূর্ণতার প্রয়োজনে। প্রতীককে একটি নাতিস্পষ্ট যাথার্থ্য দেবার প্রয়োজনেই যেন কবিতার ওপরে বিস্তৃত রাখা হয়েছে বাস্তবিকতার একটি আবরণ।

রবীন্দ্রনাথ 'শক্তির মহিমা'কে নারীর চোখ, মুখ, ও হাসিতে, এক কথায় নারীর আবয়বিক রূপের সীমায়, প্রকাশিত হতে দেখেছিলেন। জীবনানন্দ মানবের চৈতন্যগত শুভবোধ বা প্রেরণাগুলির কল্যাণশক্তি ও ঐশ্বর্য নারীর প্রতীকে উদ্ভাসিত করেছেন। তাঁর 'সুরঞ্জনা', 'সুচেতনা', 'সুদর্শনা', 'বনলতা', 'শ্যামলী', 'সবিতা'রা তাই কেউ রক্তমাংসের মর্ত্যমানবীমাত্র হয়েই কবিতার পর কবিতায় উপস্থিত হননি, এনেছেন যথাক্রমে মানবহৃদয়ের দুর্মর প্রেমবোধ, শুভচেতনা, সৌন্দর্যপিপাসা, আদিম নিসর্গমুখিনতা, মানবেতিহাসের অন্তর্লীন যৌবন-অভীপ্সা ও প্রেমের সৌর-প্রেরণার ব্যঞ্জনা। এইসব কবিতার অর্থবোধ সহজতর হয় এবং যৌক্তিক ভিত্তির উপর দাঁড়ায় যখন আমরা কবিতার এই প্রতীকী ব্যঞ্জনার দিকটি সম্পর্কে অবহিত থাকি। এই কবিতাগুলির পূর্ণতর ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র অভিনিবেশের দাবী রাখে, যা এই পর্যালোচনার বর্তমান ধারার পক্ষে প্রক্ষিপ্ত মনে হতে পারে বলেই অন্তত এইখানে সে চেষ্টায় বিরত থাকাই উচিত মনে করেছি।

প্রেমচেতনার দৃষ্টিকোণ থেকে 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থটির অধিকাংশ কবিতাই রোমান্টিক ভাবাদর্শের চারিত্র্যচিহ্নিত। এক পরিপূর্ণ জীবন ও সৌন্দর্যজগতের কল্পনা, সেইজগতে প্রয়াণের আকাঙ্ক্ষা এবং অনুষঙ্গী অপ্রাপনীয়তার বোধ, স্মৃতিভারাতুরতা ও বিষাদ, মধ্যযুগীয় গরিমা ও সৌন্দর্যের জগতে বিচরণ এবং তার লুপ্ত জীবনৈশ্বর্যের বোধন —এই সমস্ত চেতনালক্ষণ জীবনানন্দের একালের কবিতাবলীকে বিশিষ্টতা দিয়েছে।

স্মৃতিভারাতুরতা ও ব্যর্থতার বিষাদ 'কুড়ি বছর পরে' 'দুজন' 'অঘ্রাণপ্রান্তরে' কবিতাগুলিতে নিজস্ব জীবনানন্দীয় আমেজ সঞ্চার করেছে। 'দুজন' ও অঘ্রাণপ্রান্তরে' কবিতা দুটি দীর্ঘ অক্ষরবৃত্তের চলনে, হৈমন্তিক নিসর্গ-পটভূমির বিস্তারে, চিত্রকল্পে ও ধ্বনির নানা অনুষঙ্গে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ক্ষয়িষ্ণু নিসর্গ-সৌন্দর্যের জগতের স্মৃতি বহন

৩। সৃষ্টিরহস্য : মহুয়া : রবীন্দ্রনাথ

করে। তবে, এখানে আর শুধু 'চিত্ররূপময়' প্রাকৃতিক পটভূমিতে 'তাকিয়ে দেখার আনন্দ'ই শেষ কথা নয় ; তার সঙ্গে যুক্ত হ'ল মানবিক অনুভাবনার মাত্রা ঃ

অঘ্রাণ এসেছে আজ পৃথিবীর বনে,
সে সবের ঢের আগে আমাদের দুজনের মনে
হেমন্ত এসেছে তবু,[৪]

এখানে অঘ্রাণ প্রান্তর আর ঘাসের ভিতরে পড়ে থাকা শুকনো ছেঁড়া পাতা যেন নিষ্প্রেম হৃদয়েরই শূন্য প্রান্তর আর-'জীবনের অনেক অতীত ব্যাপ্তি'র ভাববহ। মেজাজের দিক থেকে 'কুড়ি বছর পরে' কবিতাটিও 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র ভাবানুষঙ্গ নিয়ে আসে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রেমিক পঁচিশ বছর ঈপ্সিতা নারীর প্রতীক্ষায় কাটিয়ে শীতের শিশির ভেজা মাঠে পাখির ঠাণ্ডা কড়কড়ে ডিম, নষ্ট শাদা শসা, ছেঁড়া মাকড়ের জাল দেখতে দেখতে ব্যর্থ ক্লান্তিতে বলেছেন ঃ 'পঁচিশ বছর তবু গেছে কবে কেটে'—নারী তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখেননি। 'কুড়ি বছর পরে' কবিতার নায়ক কার্তিকের শস্যরিক্ত নৈশপ্রান্তরে পাঠককে ডেকে নিয়ে এসে হঠাৎ স্মৃতিবিস্মৃতির সরু আলপথে দাঁড় করিয়ে দেয় যখন শিরীষের ডালপালার ফাঁকে মধ্যরজনীর চাঁদ উঁকি দিয়ে যায়। তখন কবির সঙ্গে পাঠকও অনুভব করেন স্মৃতিমথিত আবেগ ঃ

"জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার
তখন আবার যদি দেখা হয় তোমার আমার।"[৫]

যে তিনটি কবিতার কথা এতক্ষণ উল্লেখ করেছি তার কোনোটিই কিন্তু জীবনানন্দের প্রেমচেতনার কোনও নতুন দিকনির্দেশ করে না ; প্রকৃতির শোভাভূমিকায় তারা মানবিক প্রেমকে উপস্থাপিত মাত্র করে প্রায় 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের কবিতাবলীরই মত। তবু, কবির নিজেরই কথায়, 'হৃদয়ে প্রেমের গল্প শেষ হলে ক্রমে ক্রমে সেখানে মানুষ/আশ্বাস খুঁজেছে এসে'। এই 'সেখানে' অবশ্যই নিসর্গের বিলয়ধূসর রূপের জগৎ, যেখানে 'ঝরিছে মরিছে সব—বিদায় নিতেছে ব্যাপ্ত নিয়মের বলে'। 'দুজন'[৬] কবিতার নায়কনায়িকাকে কবি ডেকে এনেছেন প্রকৃতির হৈমন্তিক বিষণ্নতার জগতে, কারণ হেমন্তের শস্যহীন মাঠের সঙ্গে প্রেম-অবসিত মানবহৃদয়ের সার্থক সাযুজ্য তিনি অনুভব করেছেন ঃ 'আজ এই মাঠসূর্য সহধর্মী অঘ্রাণ কার্তিকে / প্রাণ তার ভরে গেছে'। এই 'দুজন' কবিতাটির কয়েকটি উচ্চারণই পাঠককে সচেতন করে তোলে জীবনানন্দের প্রেমভাবনার নবনীত মনন-রূপটির দিকে। কবির কাছে 'পৃথিবী ও আকাশ', অর্থাৎ নিসর্গভুবন 'চিরস্থায়ী'। মানুষের মনোজগতে ভালবাসার জন্মমৃত্যুর চঞ্চল নশ্বরতার পাশে প্রকৃতির শান্তি ও সান্ত্বনার অপরিবর্তনীয় আশ্বাসের বাণী এখানেই যেন প্রথম উঁকি দিয়ে যায়। আবার, এই কবিতায় নায়িকা যখন বলে ওঠেন 'আজ তবু মনে হয় যদি ঝরিত না / হৃদয়ে প্রেমের শীর্ষ আমাদের',—কিংবা তাঁর প্রেমিকের যখন মনে হয় 'এই নারী অপরূপ—খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে' যেখানে 'অমৃতের হরিণীর ভিড় থেকে ঈপ্সিতাকে' খুঁজে পাওয়া যায়, তখন তাঁদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় প্রেমের সেই চিরন্তন দিব্যতার আদর্শ যা এক অপ্রাপনীয়ের সৌন্দর্যমূর্তি ঘিরে উৎসারিত হয়েছে রোমান্টিক কাব্যের দেশকালনিরপেক্ষ সম্ভারে।

৪। অঘ্রাণ প্রান্তরে : বনলতাসেন।
৫। কুড়ি বছর পরে : বনলতাসেন।
৬। 'দুজন'—বনলতাসেন।

জীবনানন্দের কল্পনা এবং চেতনায় ('বনলতাসেন' গ্রন্থটিতে বা সেই পর্যায়ের কাব্যে) নিসর্গ শুধু সৌন্দর্যের জগৎ নয় ; শান্তি ও নিশ্চিতির এক আশ্রয়ভূমি। এই পরিবর্তিত চেতনাভূমির ওপরই কবির প্রেমভাবনা নবাঙ্কুরিত হয়েছে মননোজ্জ্বলতায় এবং ইতিহাসবেদী বিশ্বাসে। 'শুদ্ধ প্রতর্কের ইঙ্গিত' (বা সংশয়বাদী মনন) এবং 'চতুর্দিককার প্রতিবেশ-চেতনা' কিভাবে কবিকল্পনায় সঞ্চারিত হয়ে তাকে পরিণতি ও সারবত্তা দেয় সে প্রসঙ্গে জীবনানন্দের অভিমত 'কবিতার কথা' নিবন্ধে অভিব্যক্ত। সেই মনন ও প্রতিবেশচেতনার অভিঘাত পরোক্ষে ধারণ করেছে তাঁর একালের কাব্য। চতুষ্পার্শ্বের বিরুদ্ধ বাস্তব, খণ্ডচৈতন্যের গ্লানি ও অপূর্ণতা থেকে প্রেম এক পূর্ণতর জীবন-অভিজ্ঞতার আস্বাদ ও আশ্রয় খুঁজেছে নিসর্গের জৈব প্রাণরঙ্গে। নিসর্গের নিবিড় নিরবচ্ছিন্ন প্রাণপ্রবাহের মধ্যে আত্মনিমজ্জনের অভীপ্সা 'আমি যদি হতাম' ও 'ঘাস' এই দুটি কবিতায় অভিব্যক্ত। 'ঘাসের ভিতরে ঘাস হয়ে' জন্মানোর যে ঈপ্সা কবির চেতনায় ধ্বনিত তারই স্পষ্টতর, সরলতর প্রকাশ ঘটেছে 'আমি যদি হতাম'-এর মত রোমান্সধর্মী কবিতায়। এ কবিতার বিষয় প্রেম, প্রেক্ষিত প্রকৃতি। প্রেম এখানে মুক্তি ও শান্তির আশ্রয় খুঁজছে নিসর্গলোকে, মনুষ্যভিন্ন অস্তিত্বের প্রকৃতিলীন জৈব সম্পূর্ণতার মধ্যে : 'কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে ধানক্ষেতের কাছে / ছিপছেপে শরের ভিতরে / এক নিরালা নীড়ে'। বনহংসমিথুনের জৈব প্রাণোল্লাস প্রতীকের অন্তরাল থেকে আভাসিত করে নিসর্গ-জীবনপ্রবাহের মধ্যে নিমজ্জনে কিভাবে কবির চেতনা খুঁজছে বাধাবন্ধহীন জীবনের প্রণয়োল্লাস। কবি জানেন নিসর্গজীবন নানা মারণ-আকস্মিকতায় ভরা. যে কোন মুহূর্তে নেমে আসতে পারে মৃত্যুর যবনিকা : 'হয়তো গুলির শব্দ আবার, আমাদের স্তব্ধতা, আমাদের শান্তি'। তবু সেই জীবনই কবির অভিপ্রেত ; কারণ সেখানে মানুষের জীবনের 'টুকরো টুকরো মৃত্যু', 'টুকরো টুকরো সাধের ব্যর্থতা ও অন্ধকার' নেই। এভাবেই মানুষের আধুনিক জীবনের ক্ষুদ্র খণ্ডত্বের বিপরীতে নিসর্গলীন অস্তিত্বের সপ্রাণ পূর্ণতার বাণী 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থেই পরিণত মননের আত্মবিশ্বাসের মধ্য দিয়ে কাব্যরূপ নিয়েছে। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়সংবেদিতার মধ্য দিয়েই প্রকৃতি জীবনানন্দের একালের কাব্যে তার ঐশ্বর্য অবারিত করেনি, নিয়ে এসেছে পূর্ণতর মনন অভিজ্ঞতায় লব্ধ এক নিশ্চিতি, অখণ্ড পরিপূর্ণ অস্তিত্বের বোধ ও প্রশান্তির আশ্বাস মানবের ইহজাগতিক অস্তিত্বে নিসর্গের এই নবমূল্যায়িত মহিমার পরিপ্রেক্ষিতেই এ পর্বে প্রেমের আবির্ভাব এমন উজ্জ্বল। 'বনহংস-মিথুন', 'বুনোহাঁস', 'হরিণ' হয়ে উঠেছে এক মুক্ত, নির্বাধ, পূর্ণতর প্রেমবাসনার প্রতীক। বুনোহাঁসের প্রতীকটি একই সঙ্গে বন্য জৈব কামনা ও বাধামুক্ত বাসনার উল্লাস আভাসিত করে বুনোহাঁস তখনই পাখা মেলে যখন 'পেঁচার ধূসর পাখা' উড়ে যায় 'নক্ষত্রের পানে'। পেঁচা এখানে বিচক্ষণতা, বুদ্ধি বা সংস্কার-আশ্রিত জীবনের প্রতীক—যে জীবন 'নিয়মের রূঢ় আয়োজনে বা নিষেধের শাসনে অবদমিত রেখেছে মানবহৃদয়ের প্রেমের মুক্তি স্পৃহা। 'পেঁচার ধূসর পাখা উড়ে গেলে' অর্থাৎ বিচারপ্রবণ বিচক্ষণ সর্তকতার অবরোধ অপসৃত হলে, 'বুনোহাঁস পাখা মেলে'—মগ্নচৈতন্যের গহনতা থেকে বেরিয়ে আসে বুনো হাঁসের দল। নির্বাধ উল্লসিত বাসনার পাখিরা তখন মুক্তির আনন্দে ডানা মেলে দেয় 'পউষের জ্যোৎস্নায়'। এ কবিতার শিল্পসিদ্ধি এমনই অনায়াস যে কখন বুনোহাঁসের দল 'কল্পনার হাঁসে' রূপান্তরিত হয়ে গিয়ে পউষের জ্যোৎস্না ছেড়ে 'হৃদয়ের শব্দহীন জ্যোৎস্নার' ভিতর উড়তে থাকে তা বুঝে উঠবার অনেক আগেই কবিতার যাদুকরী চরণগুলি পাঠকের কল্পনায় মুদ্রিত করে দেয় 'কবেকার পাড়াগাঁর অরুণিমা সান্যালের

মুখ'—দূরকালের ব্যবধান ভেঙে উঠে আসে হারানো প্রেম, ভালবাসার নারী, তার লজ্জারুণ মুখশ্রী। কিন্তু, এখানেও দেখি, নিসর্গের অবারিত জৈব প্রাণপ্রবাহের মধ্যে বুদ্ধিগত চেতনাকে নিমজ্জিত করে দিয়েই হৃত, অবদমিত প্রেমবাসনা কথা কয়ে উঠেছে। বুনোহাঁসের প্রতীকটির ব্যবহার সেই নিমজ্জনেরই ইঙ্গিতবহ।

ব্যবহারিক জীবনের অবলেপে দমিত প্রেমবাসনার ক্ষণজীবী মুক্তির উল্লাসের সাক্ষ্য বহন করছে এ গ্রন্থের সমধর্মী আর একটি কবিতা : 'হরিণেরা'। হরিণ শুধু তার লোকপ্রসিদ্ধ সৌন্দর্যের জন্যই নয়, প্রেয় ও অপ্রাপনীয়ের প্রতীক হিসাবেও সুপ্রতিষ্ঠ। আবার, দ্রুতচারী এই প্রাণীটি মুক্তির দ্যোতনাও বহন করে তার উল্লাসস্পৃষ্ট গতির ইঙ্গিতে। কিন্তু, ভুললে চলবে না, হরিণ নিসর্গচারী ; জীবনানন্দের কবিতাটিতে সে স্বপ্নের মধ্য হতে উঠে এসেছে ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় পলাশের বনে। চারিদিককার নিসর্গমাধুরিমার মধ্যে ক্রীড়াচঞ্চল হরিণদের নির্বাধ উল্লাস কবির চেতনায় জাগিয়ে তুলছে হারানো প্রেমের জন্য আর্তি : 'বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা বোস' নিসর্গের এই রম্য অন্তরাল থেকে তাঁর মনের মধ্যে উঁকি দিয়ে যায়। এক দূরাপসারিত স্বপ্নের জগৎ অবদমিত প্রেমবাসনার মুক্তির মধ্য দিয়ে আবার বাঙ্‌ময় হয়ে ওঠে :

বিলুপ্ত ধূসর কোন পৃথিবীর শেফালিকা, আহা,
ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায় হরিণেরা জানে শুধু তাহা।

আলোচিত দুটি কবিতাতেই দেখা যায় ভালবাসা বা ব্যর্থবাসনার বিষাদভার যে জগতে মুক্তি খুঁজছে তা প্রাত্যহিকতায় অবলীন আমাদের পরিচিত পৃথিবী নয়, এক কল্পজগৎ ('পৃথিবীর সব রঙধ্বনি মুছে গেলে পর') যেখানে নৈসর্গিক প্রশান্তির সঙ্গে ছন্দ মিলিয়ে বহে চলেছে এক পরিপূর্ণ প্রাণপ্রবাহ যা ইন্দ্রিয়সংবেদী, প্রতর্কতাড়িত নয়।

প্রকৃতির শোভাভূমিকায় প্রেমের উপস্থাপনা জীবনানন্দের পূর্ব-পর্যায়ের কাব্যেও দেখা গেছে। সে প্রকৃতিলোক ছিল ধূসর, হৈমন্তিক বিষাদ ও মৃত্যুর ভারাবলীন। নিসর্গসৌন্দর্যের ক্ষণজীবী রমণীয়তায় কবি তখন অনুভব করেছিলেন বিষাদ আর তারই সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছেন ভালবাসার নশ্বরতার বেদনা। জীবনানন্দের কাব্যের প্রাথমিক পর্বে প্রেম তাই মৃত্যুস্পৃষ্ট। তাঁর মধ্যপর্যায়ের কাব্যে, অর্থাৎ 'বনলতাসেন ও সমসাময়িক কবিতাবলীতে, প্রেমের এই মৃত্যু-আহত নশ্বরতার রূপটিই বড় নয়। একালে প্রকৃতি-পৃথিবী জীবনানন্দের কাছে হয়ে উঠেছে প্রশান্তি ও নিশ্চিতির কেন্দ্র, এক পরিপূর্ণ প্রাণ রঙ্গের দ্যোতক। নিসর্গনিমগ্ন প্রেমকে সেই পূর্ণজীবনলোকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন কবি। তাই, প্রেম 'বনলতাসেন' গ্রন্থে ও পরবর্তী পর্যায়ের বহু কবিতাতেই মৃত্যুর বৈনাশিক বিষাদকে অতিক্রম করে এক মরণজয়িতার শক্তিতে আবির্ভূত। আবহমান মানবচেতনার এক মৌল অপরাহত বোধের স্বরূপেই যেন তার প্রকাশ। প্রেমের মরণজয়িতার বোধ পরিপুষ্ট হয়েছে কবির ইতিহাসচেতনায়—জীবনানন্দের একালের কাব্যেই যার একটি সুনির্দিষ্ট ও মননঋদ্ধ বিগ্রহ পাওয়া যায়। প্রকৃতি সংযুক্তি করেছেন মানবচিত্ত গহনবাসী এই মৃত্যুত্তীর্ণ প্রেমবোধে তাঁর প্রশান্তির সম্পদ। এভাবেই জীবনানন্দের মধ্যপর্যায়ের কাব্যে 'প্রেম' হয়ে উঠেছে প্রেয় অন্বিষ্টের এক গরীয়সী প্রতিমা, যাঁকে আমরা আবিষ্কার করি দীর্ঘক্লান্ত সহস্রবর্ষব্যাপী অন্বেষার পরে 'সবুজ ঘাসের দেশে' বনলতাসেনের ইতিহাসমণ্ডিত অবয়বে, তার 'পাখির নীড়ের মত চোখে'র প্রত্যাশিত প্রশান্তির আশ্রয়ে। এই কবিতার প্রথম স্তবকের যুগযুগান্ত ব্যাপী মানব অন্বেষার উত্তর-ব্যক্তিক আবহ, দ্বিতীয় স্তবকের দিশাভ্রান্ত নাবিকের ঘাসের দেশে আশ্রয়-গ্রহণের চিত্রকল্প, নায়িকার ইতিহাসমণ্ডিত মুখচ্ছবি, আমাদের স্মরণ করিয়ে

দেয় ইতিহাসচেতনায় অভিষিক্ত প্রেমবোধের মূল্যমহিমার কথা। এই প্রেম চিরজীবিত, তাই 'দুদণ্ডের শান্তি'র প্রসঙ্গ অতিক্রম করে নায়ক শেষপর্যন্ত 'বনলতাসেন'কে যেন পুনরাবিষ্কার করেন কবিতার শেষস্তবকে ইহজাগতিক বিনিময়ের ঊর্ধ্বে স্থিত চিরন্তনতার মধ্যে। আবার প্রথম স্তবক থেকেই নায়ক যখন নিজেকে যুক্ত করে নেন 'হাজার বছর ধরে' পথ-হাঁটা মানবসত্তার সঙ্গে, তখনই 'বনলতাসেন' হয়ে এঠন আবহমানকালব্যাপী ভ্রাম্যমান মানবসত্তার অন্বিষ্টের প্রতীক, চিরমানবাত্মার প্রেয়সী। বিদিশা শ্রাবস্তীর উল্লেখ তখন তাঁকে ঐশ্বর্যময়ী করে তোলে ; কবির ইতিহাসচেতনায় সুগঠিত হয়ে ওঠে মানব-প্রেয়সীর প্রত্নপ্রতিমা। জীবনানন্দ যেন ঐহিক প্রেমের আয়োজন স্বীকার করে নিয়েই 'বনলতাসেন'কে ঘিরে রচনা করে ছিলেন মানবহৃদয়ের চিরন্তন অভীপ্সার পরিমণ্ডল। প্রেয়সী নারী হলেন প্রেয় অন্বিষ্টের ও নিশ্চিতির প্রতীক।

কিন্তু 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থে প্রেম মুক্তি ও শান্তির আশ্রয় খুঁজেছে নিসর্গলোকে, প্রকৃতিপৃথিবীর নির্বাধ ও অখণ্ডিত প্রাণপ্রবাহে। নাম-কবিতাটির তাৎপর্য তাই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকেও প্রণিধেয়। 'বনলতা' এই নামটির মধ্যেই রয়েছে প্রকৃতি-পৃথিবীর অপ্রতিরোধ্য উপস্থিতির ব্যঞ্জনা। এই বনলতা সেন শেষপর্যন্ত দীর্ঘঅন্বেষার সফেন-সমুদ্র পেরিয়ে আবিষ্কৃত হন 'সবুজ ঘাসের দেশের' মতন, আর অন্বেষাক্লান্ত মানবপ্রেমিকের প্রতি অভ্যর্থনা জানায় তাঁর 'পাখির নীড়ের মতো চোখ'। দুটি চিত্রকল্পই নিসর্গপৃথিবী থেকে আহৃত (ঘাস ও পাখি) হয়ে 'বনলতা'কে আরও সুনিশ্চিতভাবে করে তোলে প্রকৃতিস্বরূপিনী। এ কবিতাটিতে এক প্রকৃতি (নিসর্গলোক) ভাবসাযুজ্য পেয়েছে আর এক প্রকৃতি (নারীর) মধ্যে। জীবনানন্দের বিবর্তনশীল কাব্যপ্রবাহের পূর্বাপর প্রকৃতিমুখিনতা এবং 'বনলতাসেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে অভ্রান্তভাবে লক্ষণীয় প্রাকৃতিক জীবন-অস্তিত্বের পূর্ণতা ও প্রশান্তির প্রসঙ্গটি স্মরণে রাখলে এই দাবী স্বীকার্য মনে হয়। কিভাবে লৌকিক প্রেম-আখ্যানের বহিরঙ্গ ও আঞ্চলিক ভৌগোলিক স্বাদের বাস্তবতা ('নাটোর' ও 'সেন'—উপাধির প্রয়োগ) বজায় রেখেও জীবনানন্দ তাঁর এই অনবদ্য কবিতাটিতে সঞ্চারিত করেছেন লোকোত্তর ব্যঞ্জনা তা ভেবে আমরা বিস্ময়াবনত হয়ে পড়ি ঠিকই। তবু নিছক ব্যক্তিগত প্রেমকাহিনীর কবিতা হিসাবে সমস্ত রোমাণ্টিকতা ও উত্তাপ নিয়েও এ কবিতা তার অর্থের বহুতলবিস্তার উন্মোচিত করে না।

'বনলতাসেন' পর্যায়ের কবিতাবলীতে জীবনানন্দের প্রেমচেতনা ইতিহাসবেদে আশ্রিত ও পরিপুষ্ট। মানবসভ্যতার উত্থান পতনের মধ্য দিয়ে মানবসত্তায় প্রেয় অন্বিষ্টের জন্যে সম্মুখযাত্রার চিত্রকল্পটি 'বনলতাসেন' কবিতার প্রথম স্তবকেই ইতিহাসবেদিতার ভূমিতে আশ্রিত হয়ে মহত্তর ব্যঞ্জনা সঞ্চার করেছে। এই হাজার বছর ধরে পথহাঁটা মানবপথিকের চিত্রটি 'পথহাঁটা' কবিতাটির শেষ দুটি চরণে সহসা এক অপ্রতিরোধ্য অভিঘাতে পাঠককে পৌঁছে দেয় অব্যবহিত নাগরিক অস্তিত্ব থেকে আবহমান মানব অস্তিত্বে : 'বেবিলনে একা একা এমনই হেঁটেছি আমি রাতের ভিতর / কেন যেন, আজো আমি জানিনাকো হাজার হাজার ব্যস্ত বছরের পর।' কিন্তু সে কবিতার প্রসঙ্গে প্রেম নয়, শুধু হাজার বছরের ভ্রাম্যমানতার চিত্রকল্পটি কেমনভাবে পুনরাবৃত্ত হচ্ছে তাই দেখানোর প্রয়োজনে উল্লেখিত হল। অন্যদিকে 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতাটি অভ্রান্তভাবে সময়ের বিলয়ধর্মী পটভূমিতে চিররাত্রির আবহে ('চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান') মানবচেতনায় দীপ্যমান রেখেছে প্রেম। ইহজাগতিক লেনদেনের পরেও, ব্যক্তি মানবের মৃত্যু হলেও ('শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের') যেন এক মরণাতীত সত্তায় বিরাজ করেন বনলতা

সেন—মানবচেতনার গভীরে নিহিত দুর্মর প্রেমবোধ : 'মনে আছে'? সুধাল যে—' সুধালাম আমি শুধু—বনলতাসেন'?

'পৃথিবীর বয়সিনী' যে মেয়েটিকে কবি 'সুরঞ্জনা' বলে সম্বোধন করেছেন তিনিও এই চিরন্তন প্রেমেরই প্রতিমা। 'সুরঞ্জনা' নামটির বাগর্থ বিশ্লেষণেই উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে নারী প্রতীকের অন্তরালবর্তিনী প্রেমের মুখশ্রী। তিনিই সুরঞ্জনা যিনি আমাদেরকে হৃদয়কে সুন্দরভাবে রঞ্জন করেন। (মনে রাখা ভাল, 'রঞ্জন' আর 'রাগ' এই দুটি শব্দ একই ধাতু থেকে সংগঠিত।) 'বনলতাসেন' গ্রন্থে প্রেম বারবার আবির্ভূত হয়েছে নারীত্বের প্রত্নপ্রতিমায়, ইতিহাসচেতনার সারাৎসারে পরিপুষ্ট হয়ে। 'সুরঞ্জনা' কবিতাটিতে জীবনানন্দের দৈবী উচ্চারণে মানবসভ্যতার অন্তর্লীন প্রেরণা-স্বরূপিনী এই প্রেম অঙ্গীকৃত হয়ে ওঠে কবির ইতিহাসবেদে ; ধর্মাশোকের সন্তান মহেন্দ্রের সমুদ্র যাত্রা ও সভ্যতাবিস্তারের আকাঙ্ক্ষার পিছনে প্রেরণার মত কাজ করেছে এই কল্যাণী প্রেমেরই শক্তি :

> তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
> সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়
> আরো আলো : মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

পূর্ব স্তবকের নৈসর্গিক প্রেক্ষাপটে এই বক্তব্যকেই কবি উপস্থাপিত করেন যখন তিনি জানান মানুষের সভ্যতার বয়স বাড়ে, সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য-নক্ষত্রের আলোও হয়তো ক্রমক্ষীয়মান ; তবু প্রকৃতিরই জগতে আছে চিরপ্রাণরঙ্গলীলা : সমুদ্রের নীল, ঝিনুকের গায়ের আল্পনা, পাখির গান নবীন মানবমানবীকে ঢেকে নেয় ভালবাসায়। কারণ, 'মানুষ কাউকে চায়'; তার জায়মান বিশ্বচেতনার কেন্দ্রে এক নিশ্চিতির আশ্রয়। একদিন তার ছিল ঈশ্বরে উজ্জ্বল বিশ্বাস ; সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সেই ধর্মবিশ্বাসের আশ্রয়চ্যুত মানব নতুন আশ্রয় খুঁজেছে 'অন্য কোনো সাধনার ফলে', যা হল প্রেম। আর এই প্রেম বলতে জীবনানন্দ যদিও বোঝেন 'মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়'; তবু তার অমর্তদাক্ষিণ্য, মৃত্যুহীনতা ও প্রয়াণের শক্তি সম্পর্কে তিনি আশ্বস্ত করেন পাঠককে ইতিহাস-প্রদক্ষিণ পথে :

> 'যেন সব অন্ধকার সমুদ্রের ক্লান্ত নাবিকেরা
> মক্ষিকার গুঞ্জনের মতো এক বিহ্বল বাতাসে
> ভূমধ্যসাগরলীন দূর এক সভ্যতার থেকে
> আজকের নব সভ্যতায় ফিরে আসে,—
> তুমি সেই অপরূপ সিন্ধু রাত্রি মৃতদের রোল
> দেহ নিয়ে ভালোবেসে, তবু আজ ভোরের কল্লোল।'

'মিতভাষণ' ও 'সবিতা' কবিতা দুটির কেন্দ্রেও রয়েছেন জীবনানন্দের এই ইতিহাসবেদী প্রেম-চেতনায় উদ্ভিন্ন শ্রেয়সী নারী। 'মিতভাষণ' কবিতাটির প্রথম স্তবকেই প্রেয়সী নারীর সৌন্দর্যদীপ্তিকে কবি চিনেছেন তার ঐতিহ্য মহিমায় ('তোমার সৌন্দর্য, নারি, অতীতের দানের মতন')। প্রেম যেন এক 'শ্রেয়তর বেলাভূমি' যা 'সময়ের শতকের মৃত্যু' হলেও অর্থাৎ মানবেতিহাসের যুগ থেকে যুগাবসানের পরেও 'ধর্মাশোকের স্পষ্ট আহ্বানের মতো' মানবকে ডেকে নেয় উজ্জ্বল বিশ্বাসে ও প্রেরণায়। নারীর মুখশ্রীর 'স্নিগ্ধ প্রতিভায়' কবি সেই বিশ্বাস ও প্রেরণার শক্তি দেখেছেন। তাই কবিতার অন্তিম স্তবকে

সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় উত্তরণের যাত্রায় মানবের ভ্রান্তি, হতাশা ও স্বপ্নভঙ্গের বিকল্পে কবি রেখেছেন প্রেমের মৃত্যুমথিত উদ্বর্তনের ঘোষণা ঃ

'মানুষের সভ্যতার মর্মে ক্লান্তি আসে,
বড় বড় নগরীর বুক ভরা ব্যথা
ক্রমেই হারিয়ে ফেলে তারা সব সংকল্প স্বপ্নের
উদ্যমের অমূল্য স্পষ্টতা।
তবুও নদীর মানে স্নিগ্ধ শুশ্রূষার জল, সূর্য মানে আলো ঃ
এখনো নারীর মানে তুমি, কত রাধিকা ফুরালো।'

লক্ষণীয় জীবনানন্দ এখানে জল, আলো কিংবা সেসবের উৎস নদী সূর্যের মতো প্রাকৃতিক শক্তির সঙ্গে সমপর্যায়ে রেখেছেন নারীর প্রেমের প্রেরণাশক্তিকে। এভাবেই 'বনলতাসেন' গ্রন্থটিতে বারেবারেই নারী ও নিসর্গ—'প্রকৃতি' শব্দটির এই দুই অভিধাই খুব কাছাকাছি এসেছে, সাঙ্গীকৃত হয়েছে একে অপরের ভাব ও শক্তির সাযুজ্যে, যে কথা আমরা পূর্বেই 'বনলতা' নামকরণটির ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছি। 'সবিতা' কবিতাটিতেও নর-নারীর প্রেমজীবনচর্যার প্রেক্ষাপটে এসেছে ইতিহাসের বিস্তৃত প্রান্তরে সভ্যতা থেকে নব সভ্যতার যাত্রায় পরস্পরকে চেনা। তাই প্রেয়সী নারীর মুখের রেখায় আভাসিত 'মৃত কত পৌত্তলিক খ্রীষ্টান হিন্দুর/ অন্ধকার থেকে এসে নব সূর্যে জাগার মতন' প্রতিভা ও প্রেরণার শক্তি; তার নিবিড় কালো চুলের ভিতর 'কবেকার সমুদ্রের নুন'। ইতিহাস চেতনার উৎসারে ও বিস্তারে নারী হয়ে উঠেছেন শক্তি ও প্রেরণার এক প্রত্নপ্রতিমা—শুধুমাত্র সৌন্দর্য আর নিয়তিতাড়িত প্রেমবাসনার চির-অলভ্যা প্রতীক নন তিনি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে প্রেম যদি হয়ে থাকে প্রেয় ও অপ্রাপনীয় ; একালের কাব্যে তা হয়ে উঠল শ্রেয় ও আরাধ্য। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে প্রেমের ক্ষণজীবী অমর্ত আস্বাদের আনন্দ ধ্বনিত হয়েছে কবিতার পর কবিতায় নশ্বরতার বেদনাবহ উপলব্ধির প্রেক্ষাপটে। 'বনলতাসেন' পর্যায়ে কবিতার পর কবিতায় প্রেম তার মরণজয়িতার শক্তিতে উপলব্ধ এবং প্রেমের শক্তির এই মরণাতীত মহিমার বোধ জারিত হয়েছে কবির ইতিহাস চেতনায়। তাই প্রেমিক নায়ক হয়ে উঠেছেন আবহমান মানবসত্তার প্রতিভূ, প্রেয়সী নারী হয়েছেন এক পরমা অন্বিষ্টের প্রতীক। ইতিহাস-চেতনায় বলয়িত হয়ে এই প্রেম মানবাত্মাকে ডেকে এনেছে প্রকৃতি-পৃথিবীর প্রশান্ত আশ্রয়ে ; প্রেমের প্রেরণায় শক্তি ও নৈসর্গিক 'পূর্ণপ্রাণে'র শক্তি যেন সাঙ্গীকৃত হয়েছে একটি বিন্দুতে। 'বনলতাসেন' পর্যায়ের কাব্যে এভাবেই জীবনানন্দের প্রেমচেতনতা স্বাতন্ত্র্য ও পূর্ণতর পরিণতি-চিহ্নিত হয়েছে।

তবে কোনও কবিই, যদি তিনি মানব-অভিজ্ঞতার প্রতি বিশ্বস্ত থাকেন, তাঁর প্রেমের কবিতাবলী হতে সম্পূর্ণভাবে হতাশা, বিষাদ ও মৃত্যুর বোধগুলিকে মুছে দিতে পারেন না। তাই বিষাদ ও মৃত্যুর প্রচ্ছায়া, ব্যর্থতা, আহত বাসনার আর্তি 'বনলতাসেন' গ্রন্থের অনেক কবিতার মধ্যেই আবর্তিত। তবে সে সব কিছুই আগের মতো সংবেদনার প্রবলতায় প্রেমের শুভ ও প্রেরণাশক্তির নবজাত বোধকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি। 'দুজন' বা 'অঘ্রাণপ্রান্তরে' কবিতা দুটি পাঠককে ফিরিয়ে আনে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র হিমার্ত মৃত্যুস্পৃষ্ট জগতে। 'শঙ্খমালা' কবিতার নারী যেন পাঠককে স্মরণ করিয়ে দেয় 'ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল' কিংবা 'পরস্পর' কবিতার জীবনানন্দীয় নায়িকার কথা যাঁকে ঘিরে মৃত্যুর আবহ ; তবু তিনি আমাদের হৃদয়-সন্ধানে অব্যর্থ, ঘোর মায়াবিনী নিষ্করুণা এক নারী। 'সোনালি ডানার চিল' এই মায়াবিনীরই অপ্রাপনীয় মুখচ্ছবি বহন করে আনে' 'ভিজে

মেঘের দুপুরে'। পৃথিবীর যত রূপকথার রাজকন্যার সৌন্দর্যের সুদূরতা ও চিরঅলভ্যতা যা মানবকে চিরদিন করেছে হতাশ স্বাপ্নিক তা এই শঙ্খমালার প্রতীকেই হাহাকার করে ওঠে জীবনানন্দের কবিতায়। শঙ্খমালাও রূপকথা থেকে উঠে এসেছেন ; তিনি সুদূরিকা, অপ্রাপনীয় সৌন্দর্য ও প্রেমের প্রতীক। এই চির-আকাঙ্ক্ষিতা অথচ চিরঅলভ্যা নারী হয়ে ওঠেন অপ্রাপনীয়ের প্রত্নপ্রতিমা কবি যখন তাঁর চোখে দেখেন 'শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার', তার মধ্যে খুঁজে পান 'কবেকার শঙ্খিনীমালা'কে।

'শঙ্খমালা' কবিতাটি কয়েকটি কারণে আরও নিবিষ্ট মনোযোগ দাবী করে। শঙ্খমালাকে আমরা অপ্রাপনীয়ের প্রতীক বলে দেখেছি; কবিতার শেষচরণে ('পৃথিবী একবার পায় তারে—পায়নাকো আর') তার সমর্থন মেলে। শঙ্খমালা লোককাহিনী বা রূপকথার কল্পনাভূমি থেকে উঠে এসেছেন। তিনি 'কবেকার শঙ্খিনীমালা'র অনুষঙ্গ বহন করেন আর সেই অনুষঙ্গ হল : 'পৃথিবীর রাঙা রাজকন্যাদের মত সে যে চলে গেছে রূপ নিয়ে দূরে'। সেই সুদূর কালের রূপসীকে কবি ডেকে এনেছেন তাঁর স্বকালে। কিন্তু 'বনলতা'; 'সুরঞ্জনা' 'সবিতা'র মতো 'শঙ্খমালা', কবিকে মিলন ও প্রাপ্তিতে পূর্ণ করেন নি, রেখে গেছেন কবিতার চরণে চরণে ব্যবধানের হাহাকার ও স্বপ্নভঙ্গের বেদনা। কোনও একদিন যে মানব শঙ্খমালার মতো নারীকে ঘিরে রচনা করেছিল সৌন্দর্য ও প্রেমের রূপকথা প্রাপ্তির আনন্দে, এই অবিশ্বাসী সময়ে কবি তাঁকে স্বচেতনায় আবির্ভূত হতে দেখলেন সম্পূর্ণ ভিন্নরূপে, বিষাদ ('বিমর্ষপাখির রঙে ভরা তার দেহ'), চঞ্চল নশ্বরতা ('শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ' যার প্রতীক) আর মৃত্যুর আয়োজনে : 'কড়ির মতন শাদা মুখ তার, / দুইখানা হাত তার হিম ; / চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম / চিতাজ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায় / সে আগুনে হায়।' এ সবই যেন ইঙ্গিতে পাঠককে জানিয়ে দেয় এক রিক্তবিশ্বাস ও প্রতিশ্রুতিহীনতার যুগে পূর্ণ সৌন্দর্য আর প্রেমের অপমৃত্যুর কথা।

আরও লক্ষণীয়, কিভাবে এই কবিতায় দুই নারী পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী। কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে যে নারী কবিকে আহ্বান করেছেন 'নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে' তারই চোখে হিজল কাঠের রক্তিম চিতা জ্বলে, যার আগুনে শঙ্খমালা পুড়ে যায়। অন্যদিকে, জীবনানন্দের কবিতায় যে পেঁচা বারেবারে উপস্থিত বিজ্ঞতা ও জাগতিক বিচক্ষণতার প্রতিভূরূপে, সেই পেঁচার প্রাণের সঙ্গে সাযুজ্য দেখেছেন কবি কান্তারে আবির্ভূত নারীর, যাঁর যুগ প্রতিবেশ-সম্ভূত বিচক্ষণ মানসতা মানবহৃদয়ের চির-আকাঙ্ক্ষিত সৌন্দর্য ও প্রেমের স্বপ্নপ্রতিমা শঙ্খমালাকে দগ্ধ করে। একদিকে কঠিন জাগতিক আধুনিকা ; অন্যদিকে স্বপ্নবাসিনী শঙ্খমালা—এই দুই নারীর ট্রাজিক অনন্বয় থেকে 'শঙ্খমালা' কবিতাটি আহরণ করেছে তার অর্থগূঢ়তা। এই 'শঙ্খমালা' নারীকেই কবি 'হাওয়ার রাতে' আবিষ্কার করেছেন এশিরিয়া মিশর বিদিশার মৃত রূপসীদের মধ্যে যারা 'দীর্ঘ বর্শা' হাতে কাতারে কাতারে হানা দিয়েছে কবির 'আধোঘুমের' স্বপ্নে—

> মৃত্যুকে দলিত করবার জন্য?
> জীবনের গভীর জয় প্রকাশ করবার জন্য?
> প্রেমের ভয়াবহ গম্ভীর স্তম্ভ তুলবার জন্য?

এই নারীকে ঘিরেই গুঞ্জরিত 'নগ্ননির্জন হাত' কবিতার স্মৃতিভারাতুর অতীতচারিতার আনন্দবিষাদ : 'তোমার মুখের রূপ কত শত শতাব্দী আমি দেখি না, খুঁজি না'। এমনকি, নিতান্তই স্বকালে, কুড়ি বছরের ব্যবধান ভেঙে কবি যাকে 'ধানের ছড়ার পাশে কার্তিকের

মাসে' হেমন্তের নতুন কুয়াশার ভিড়ে ফিরে পেতে চান সেই নারীও মানবহৃদয়বাসিনী চিরন্তন স্বপ্নের শ্রেয়সী এই শঙ্খমালা যাঁকে আমাদের কবি পুড়ে যেতে দেখেন 'হিজল কাঠের রক্তিম চিতা'য় যেন তার নিজেরই সমকালবদ্ধ ঐহিক অভিজ্ঞতার আগুনে। তাই, শঙ্খমালাকে আমরা বলেছি সৌন্দর্য ও প্রেমের এক প্রত্ন-প্রতিমা বা archetype। আমাদের এই ব্যাখ্যার সমর্থন জানাবে 'মহাপৃথিবী'র 'সিন্ধু সারস' কবিতার শেষতম স্তবকটি—যেখানে শ্রেয়সী নারী হয়েছেন 'পৃথিবীর শঙ্খমালা নারী' যাঁর সঙ্গে তার মানব প্রেমিকের চিরন্তন ব্যবধানের যন্ত্রণা। শঙ্খমালার প্রেমিকের মুখের রূপ তাই ম্লান নিঃসঙ্গ, 'বিশুষ্ক তৃণের মতো তার প্রাণ।'

জীবনানন্দের বিবর্তনশীল কাব্যপ্রবাহে 'বনলতাসেন' গ্রন্থটি কবির প্রেমভাবনাকে রেখেছে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায়ের বিপরীতে এ কথা আমরা বলেছি। উভয় পর্যায়ের প্রেমের কবিতাবলীর উপস্থাপনা ঘটেছে কবির ভাষায় প্রকৃতির শোভাভূমিকায়। কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' যুগে সেই প্রকৃতিলোক ক্ষয়িষ্ণু রূপের বেদনায় মৃতুৎস্পৃষ্ট ; অন্যদিকে 'বনলতাসেন' ও তৎপরবর্তী 'মহাপৃথিবী' এবং সমসাময়িক অন্যান্য কবিতাবলীতে প্রকৃতির বিষণ্নম্লান মৃত্যুপীড়িত রূপটিই বড় হয়ে ওঠেনি, তার মধ্যে স্থান নিয়েছে এক শান্ত সুষমা ও পরিপূর্ণ প্রাণলীলা। 'অকূল সুপুরিবন স্থির জলে ছায়া ফেলে এক মাইল শান্তি কল্যাণ হয়ে আছে' এখানে ; 'এখানে প্রশান্ত মনে খেলা করে উঁচু উঁচু গাছ'; এখানে 'ফাল্গুনের জ্যোৎস্নায়' পলাশের বনে 'হাওয়া আর মুক্তার আলোকে' 'হরিণেরা খেলা করে', এখানে 'কচি লেবু পাতার মত নরম সবুজ আলোয়' ভোরের পৃথিবী জেগে ওঠে ; এখানে 'নীল আকাশে খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো' অজস্র তারার সমারোহ। এভাবেই অপরাজেয় প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের এক প্রকৃতি-পৃথিবী নিজের আসন নিঃশব্দে বড় করে নিয়েছে জীবনানন্দের কাব্যে। প্রেমের উপস্থাপনায়ও ঘটেছে এক শান্ত নিরুদ্বেগ নিসর্গপটভূমিতে। শুধুমাত্র নর-নারীর প্রণয় ও বিরহমিলন প্রসঙ্গই নয়, মানবেতর প্রাণীকুলের মধ্যেও এই প্রেমের বিস্তার ঘটিয়েছেন কবি কাব্যের শিল্পপ্রসাদ বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ না হতে দিয়ে। অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়ায় প্রেমিক চিলপুরুষের শিশির-ভেজা চোখ, মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জন, বনহংস-মিথুনের উল্লাস, সুন্দর বাদামি হরিণের সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেওয়া—নিসর্গআবহ নির্মাণের মধ্যে এসব ছোট ছোট অনুপুঙ্খ কারুকর্ম কবিতার পর কবিতায় রমণীয় চমকই শুধু নিচে আসেনি, প্রকৃতির বিরাট সজীব নিরবচ্ছিন্ন প্রাণরঙ্গ প্রবাহের শান্তি ও নিশ্চিতির মধ্যে মানবঅস্তিত্বের মৌল তাড়না বা প্রেরণাশক্তিটিতে উপস্থাপনার উপযুক্ত পটভূমিক্ষেপই এদের লক্ষ্য।

প্রাকৃতিক জীবনের আদিম প্রাণময়তা ও পূর্ণতার সঙ্গে অন্বয়ের উৎসাহ 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থে কবির চেতনায় এনেছে স্বাতন্ত্র্য ও অপূর্বতা। নর-নারীর প্রেম যেমন নিসর্গজীবনের পূর্ণতা ও সজীবতার পটে চিত্রিত হয়ে মানবিক অস্তিত্বের দুর্বলতাগুলিকে স্পষ্টতর করেছে, অন্যদিকে তেমনই এই মানব-মানবীর প্রেমের আখ্যানরূপকেই প্রকৃতি-পৃথিবী এবং মানবপৃথিবী ঘনিষ্ঠতর ও একাত্ম হয়েছে। যেমন, 'বনলতাসেন' কবিতাটিতেই এক প্রকৃতি (নিসর্গ) অন্যপ্রকৃতির (নারী) সঙ্গে ভাবসম্মিলনে অভেদাত্ম ও অভিন্নকায় হয়ে উঠেছে। মানব ও প্রকৃতির এই মিলনে মৃত্যুও 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থে কোনও অন্তরাল রচনা করেনি। জীবনের অমোঘ সত্যের মত মৃত্যু এখানে উপস্থিত ঠিকই ; কিন্তু অখণ্ড প্রাণপ্রবাহ-চেতনার উন্মেষে তার নিজের ভূমিকাটিতে সীমিত। কবি জেনেছেন এক

'ব্যাপ্ত নিয়মের' কথা যার বলে সবকিছুই একদিন বিদায় নেয়। কিন্তু তবু আকাশ ও পৃথিবী 'চিরস্থায়ী', যেখানে মানুষ বারবার ফিরে আসে 'যেন কিছু চেয়ে কিছু একান্ত বিশ্বাসে'।[৭] এভাবেই ব্যক্তিক প্রেমের স্বপ্ন ও হতাশা, 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানে' ও 'ইতিহাসবেদে' জীবনানন্দকে ফিরিয়ে আনে 'মাটি-পৃথিবীর টানে'। স্বপ্ন ও সৌন্দর্যের কল্পজগৎ ছেড়ে সেখানে ফেরার ইচ্ছা কবির প্রবল ছিল না।[৮] কিন্তু প্রত্যাবর্তিত হয়ে তিনি জেনেছেন মানবেতিহাসের সারসত্য, সুচৈতন্যের উদ্বোধনে সভ্যতা থেকে নবসভ্যতায় বারবার উত্তীর্ণ হওয়া।[৯] এই 'মানবজন্মের ঘরে' ফিরে আসা তাই কবির কাছে হয়ে উঠল, 'গভীরতর লাভ'। তারই আলোকে মানবের প্রেমানুভূতিকে ঘিরে বিষাদ, হতাশা ও মরণাধীনতার গ্লানিকে জীবনানন্দ যেন অনেকটাই অতিক্রম করেছেন শান্ত প্রজ্ঞায়। এই প্রজ্ঞার একটি উৎস ইতিহাসচেতনা, অপরটি পরিপূর্ণ নিসর্গমগ্নতা। প্রিয় যে নারীটির সঙ্গে 'হৃদয়ের খেলা নিয়ে' একদিন 'কত অপরাধ' করেছেন[১০] তার মুখ মনে পড়ে 'এরকম স্নিগ্ধ পৃথিবীর পাতাপতঙ্গের কাছে চলে এসে'।[১১] তবু অনর্গলিত যন্ত্রণার হাহাকার নেই ; কারণ, কবি জানেন কাচপোকা গঙ্গাফড়িঙের মতো সেও আজ 'ঘুমে'—'আম নিম হিজলের ব্যাপ্তিতে পড়ে আছে'—'প্রকৃতিস্থ প্রকৃতির মতো'।[১২] মানুষের জীবন যে চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অসংখ্য অভিঘাতে কাতর এবং দিশাভ্রান্ত তার থেকে ঢের গভীরতর এক শান্তির মধ্যেই শুয়ে আছেন কবির প্রেয়সী :

'শান্তি তবু—গভীর সবুজ ঘাস ঘাসের ফড়িং
আজ ঢেকে আছে তার চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ।'[১৩]

'শিরীষের ডালপালা', 'ধানকাটা হয়ে গেছে' ও 'তুমি'—এই তিনটি কবিতায় মৃত্যু শুধু দীর্ঘ প্রলম্বিত ছায়াই ফেলেনি, এসেছে চিরবিচ্ছেদের রূপে। তবু, এসব কবিতার কোনটিতেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-'রূপসী বাংলা' পর্যায়ের কবিতার মৃত্যু-আক্রান্ত আর্তি ও হাহাকার নেই—আছে মৃত্যুর শান্ত সম্মত অভিগ্রহণ যার অন্তরাল হতে স্ফুরিত হয় দীর্ঘশ্বাস। মৃত্যুর শেলতীব্রতাকে অতিক্রম করে জৈব সংসক্তির মধ্যে তাকে দেখা সম্ভবপর হয়েছে নিসর্গজীবনে নিমজ্জন ও প্রকৃতি-পৃথিবীর সঙ্গে অন্বয়ের চেতনার উদবর্তনের ফলেই, একথা স্মরণ রাখা প্রয়োজন।

'শঙ্খমালা' কবিতাটিকে কেন্দ্র করে 'বনলতাসেন' পর্যায়ে জীবনানন্দের প্রেমের কাব্যের কয়েকটি বিশিষ্ট লক্ষণ স্পষ্ট করতে চেয়েছি। এ'গ্রন্থের প্রশান্তিমগ্ন প্রকৃতিভুবনের দাক্ষিণ্যে স্মিত, লাবণ্যে স্নিগ্ধ 'সুরঞ্জনা', 'সবিতা', 'শ্যামলী' প্রমুখ নারী-প্রতিমাদের মাঝখানে 'শঙ্খমালা' দাঁড়িয়ে রয়েছেন বিষাদ ও মৃত্যুর পরিমণ্ডলে। 'বনলতাসেন' কবির কাছে 'দ্বিতীয় প্রকৃতি' হয়ে উঠেছেন তাঁর কল্যাণ ও প্রশান্তির আশ্বাসে ; শঙ্খমালাকে ঘিরে কিন্তু অপ্রাপনীয়তার দীর্ঘশ্বাস ('এ পৃথিবী একবার পায় তারে—পায়নোকো আর') আর

৭। 'দুজন'—বনলতাসেন।
৮। 'হাওয়ার রাত' : 'আমি যদি হতাম'—বনলতাসেন।
৯। 'সুচেতনা'—বনলতাসেন।
১০। 'ধান কাটা হয়ে গেছে'—বনলতাসেন।
১১। 'শিরীষের ডালপালা'—বনলতাসেন।
১২। 'তুমি'—বনলতাসেন।
১৩। 'ধান কাটা হয়ে গেছে'—বনলতাসেন।

স্বপ্নবিনাশের আর্তি ('শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়')। এই কবিতায় নেই নিসর্গজীবনের সঙ্গে একায়নের প্রত্যয় ; পেঁচা এখানে রচনা করেছে ব্যবধান স্বপ্নের প্রেয়সী। আর কান্তারের পথ থেকে উঠে আসা সেই স্বপ্নের প্রেত-প্রতিমার মধ্যে। 'শঙ্খমালা' এই অনন্বয় আর ব্যবধানের মধ্য দিয়ে আমাদের ফিরিয়ে নিয়ে যায় আদিপর্বের কবিতার অপ্রাপনীয় সৌন্দর্য আর পরিপূর্ণ জীবনের রোমান্টিক আদর্শের অনুধ্যানে, স্বপ্নে আর বাস্তবে আবার রচনা করে দূরপনেয় ব্যবধান যার পরিণতি ঘটে 'মহাপৃথিবী'র 'সিন্ধুসারস' কবিতাটিতে। সিন্ধুসারসের গান কবির চেতনায় বহন করে আনে স্বপ্নের প্রবলতা :

> নতুন সমুদ্র এক, শাদা রৌদ্র, সবুজ ঘাসের মতো প্রাণ
> পৃথিবীর ক্লান্ত বুকে

তার নৃত্যময় দুটি ডানার ছন্দে মানুষের মনে জেগে ওঠে প্রয়াণের নবীন উদ্যম। তবু, জৈব প্রাণেষনা ও উল্লাসের প্রতীক এই সিন্ধুসারসের সঙ্গে মানবের কোনও আত্মিক যোগ নেই। কারণ, সিন্ধুসারস স্বপ্ন দেখতে জানে না ; সিন্ধুসারস জানে না বাস্তবের অপর পিঠে আছে মানবের কল্পনার জগৎ যেখানে দেখা মেলে পৃথিবীর শঙ্খমালা নারীর :

> স্বপ্ন তুমি দ্যাখোনি তো—পৃথিবীর সবসিন্ধু সবপথ ছেড়ে দিয়ে একা
> বিপরীত দ্বীপে দূরে মায়াবীর আরশিতে হয় শুধু দেখা
> রূপসীর সাথে এক ;

সিন্ধুসারসের শাদা ডানা ধবল ফেনার মতো নেচে উঠে পৃথিবীকে আনন্দ জানায় বটে, তবে সেই 'আনন্দের অন্তরালে' নেই মানব-অস্তিত্বের 'প্রশ্ন আর চিন্তার আঘাত'। এ'ভাবেই প্রকৃতি-পৃথিবীর জৈব প্রাণোল্লাসময় জীবনের সঙ্গে মানবপৃথিবীর জীবনের আত্মিক সংযোগ, যা 'বনলতাসেন' গ্রন্থে অর্জিত হয়েছিলো, তা যেন ছিন্ন হয়ে যায়। প্রকৃতিপৃথিবীর একান্ত আবাস ও আশ্রয় থেকে কবি চলে আসেন 'মহাপৃথিবী'র বৃহদায়তন জীবন প্রান্তরে যেখানে নিসর্গ আর মানব আর একাত্ম নয়। বরং তাদের মুখোমুখি সাক্ষাতে এই দুই ভিন্ন জীবনঅস্তিত্বের মৌল ব্যবধানের চারিত্র্য বড় হতে থাকে। 'মহাপৃথিবী'র কবিতার পর কবিতায় নিসর্গজীবনের নিবিড়তা ও প্রশান্তির মধ্যে হানা দিয়েছে রূঢ় বাস্তব, পারিপার্শ্বিক মানব জগতের নানা সমস্যার অভিঘাত দীর্ণ করেছে প্রকৃতিপৃথিবীর প্রাচীন প্রশান্তির আশ্বাস। সেই পরিপ্রেক্ষিতে মানবমানবীর প্রেম আবার ক্লিন্ন দেহবাদিতায় প্রত্যাখ্যান ও প্রত্যয়হীনতার অভিশাপে জান্তব ও রক্তাক্ত হয়ে উঠেছে ; সঙ্গে সঙ্গে আর্ত ও বাঙ্ময় হয়েছে কবির আহ্বান। প্রেমকে তিনি ফিরিয়ে আনতে চান 'স্বপ্নে' 'ডাইনির মাংসের' থেকে 'কল্পনার অবিনাশ মহনীয় উদগীরণে',[১৪] 'আম নিম ঝাউয়ের জগতে'[১৫]। এই পরিপ্রেক্ষিতে বিচার করলে আমরা দেখি 'শঙ্খমালা' (যিনি অভ্রান্তভাবেই জীবনানন্দীয় নায়িকা) 'বনলতাসেন' কাব্যগ্রন্থে প্রকৃতি পৃথিবীর প্রশান্ত ভূখণ্ডে আবির্ভূত হয়ে আমাদের সচকিত করে তোলে বিষমানুপাতিক টানে। একদিকে অপ্রাপনীয় সৌন্দর্য : প্রেমের রোমান্টিক আদর্শে ঘিরে নিয়তিতাড়িত মৃত্যুর পরিমণ্ডল, অন্যদিকে প্রাকৃতিক জৈব প্রাণরসের সঙ্গে বিশ্বাস ও চিন্তার সঙ্কটে দীর্ণ মানবজীবনের পূর্ণ আত্মিক সংযোগের অসম্ভাব্যতার ব্যঞ্জনা যেন 'শঙ্খমালা' বহন করেন কবি কল্পনায় বিধৃত তাঁর প্রত্নপ্রতিমার সংকেতময় নির্দেশে।

১৪। মনোবীজ : মহাপৃথিবী।
১৫। ফিরে এসো : মহাপৃথিবী।

জীবনানন্দের অধিকাংশ প্রেমের কবিতাই রোমাণ্টিক প্রেমকবিতার চারিত্র্যচিহ্নিত এ কথা আদিসংস্করণ 'বনলতাসেন' গ্রন্থ সম্পর্কেই বিশেষভাবে সত্য। প্রেমের কবিতামাত্রেই স্বপ্নের কবিতা। জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির ইতিহাসে 'ধূসর-পাণ্ডুলিপি', 'রূপসী বাংলা' ও 'বনলতাসেন' পর্যায়ে সেই স্বপ্ন বিশেষভাবে অপ্রাপনীয় ও প্রেয়কে ঘিরে গুঞ্জরিত। উনিশশতকী মহাদেশীয় রোমাণ্টিক কাব্যের আরও একটি বিশেষ লক্ষণ ছিল অতীত গরিমা ও সৌন্দর্যের জগতে প্রত্যাবর্তন। মধ্যযুগীয় শৌর্য ও ঐশ্বর্যবহুল জীবনচর্যার কাব্যিক পুনর্নির্মাণ ঘটেছিল সে যুগের কবিতায়। রোমণ্টিক কাব্যের সমালোচকরা কল্পনার এ জাতীয় স্ফুরণের পশ্চাতে দেখেছেন পরিপূর্ণতা ও সৌন্দর্যের কল্পজগৎ পরিনির্মাণের শৈল্পিক প্রয়াস। আধুনিক কালের কাব্যে অতীতচারিতা কোনোসময়েই মুখ্যপ্রসঙ্গ হয়নি ; স্মৃতিভারাতুরতার অনুষঙ্গ সেখানে নিয়ে এসেছে বিগতের জন্য শোচনার পাশাপাশি সাম্প্রতের গ্লানিদীন খণ্ডজীবনের প্রতি প্রগাঢ় অনীহার প্রকাশ। 'বনলতাসেন' গ্রন্থে বা তার পরবর্তী কাব্যেও অতীতচারী আবেগ বারবার উচ্ছ্বসিত হয়েছে বটে, তবে সে আবেগ গরিমামণ্ডিত অতীতজীবনের শোচনায় বা স্বপ্নপ্রয়াণে অবসিত না হয়ে প্রকাশ করেছে বর্তমানের খণ্ডিত জীবনের গ্লানি, চেতনার শূন্যতা। 'হাওয়ার রাত' এবং 'নগ্ননির্জন হাত' -এর মত কবিতা দুটি এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বিচার্য। 'নগ্ননির্জন হাত' কবিতাটিতে মূল্যবান আসবাবে ভরা এক প্রাসাদের ধূসররূপ কবির মনে জেগে ওঠে, যার অনুষঙ্গে বাঙ্ময় হয়েছে লুপ্ত স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষার স্মৃতি। দুটি নিটোল গদ্য পংক্তি পাশাপাশি রেখে জীবনানন্দ বিগত ও বর্তমানের অনপনেয় ব্যবধান ও তজ্জনিত শোচনার অনুভূতি অনুরণিত করে দেন পাঠকের মনে ঃ

> 'পারস্য গালিচা, কাশ্মিরী শাল, বেরিনতরঙ্গের নিটোল মুক্তাপ্রবাল,
> আমার বিলুপ্ত হৃদয়, আমার মৃতচোখ, আমার বিলীন স্বপ্ন আকাঙ্ক্ষা।'

বিগতকালের ঐশ্বর্যবহুল জীবনোপকরণের উল্লেখমাত্র প্রথম চরণটির অবলম্বন ; কিন্তু দ্বিতীয় চরণ তাকে অতিক্রম করে উদ্‌বর্তিত করে গত জীবনের পরিপূর্ণতার সম্পদ যা থেকে কবি ভ্রষ্ট হয়েছেন এই অধুনায়। এ ভাবেই তুলনামূলক বৈপরীত্যে অতীত ও অব্যবহিত জীবন তাদের ব্যবধান প্রকট করে ; 'অপরূপ খিলান ও গম্বুজের রেখা' হয়ে ওঠে 'বেদনাময়'। এই ক্লিন্ন সাম্প্রতে অনধিগম্য সেই ঐশ্বর্যময় জীবনচর্যা ; তাই তার কাহিনী যেন এক 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', তাকে ঘিরে 'লুপ্ত নাশপাতির গন্ধ' । কিন্তু, লক্ষণীয়, 'নগ্ননির্জন হাত' -এর এই লুপ্ত ঐশ্বর্যের জগতের কেন্দ্রে রয়েছেন এক নারী, সেই চির-অপ্রাপনীয়া প্রেয়সী যার মুখের রূপ কতশত শতাব্দীর বিস্মৃতির অন্তরাল পেরিয়ে হানা দেয় কবির অনুভাবনায়। 'হাওয়ার রাত' কবিতার পরাবাস্তব বিস্তারেও এক অতীত ঐশ্বর্যের জগতের প্রবল উপস্থিতি কবির হৃদয়ে, পৃথিবী তথা অব্যবহিত অস্তিত্বের বন্ধন ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে যায় এক দুরন্ত 'শকুনের মত' । শকুনের উপমাটি ব্যগ্র ক্ষুধার ইঙ্গিত বহন করে এবং মৃত জীবনের অনুষঙ্গ গাঢ়তর করে। 'হাওয়ার রাতে' কবির সংবেদনা রয়েছে এক 'আধোঘুমে'র ভিতর, এই 'আধোঘুম' কবিচেতনায় জাগরণ ও স্বপ্ননিমজ্জনের বহির্সাক্ষ্য বহন করছে। কবি দেখেন মৃত রূপসীদের কাতারে কাতারে বর্শাহাতে দাঁড়াতে— মৃত রূপসীরা এক লুপ্ত সৌন্দর্যজগতের প্রতিভূ ; তাদের হাতে বর্শার মত মারণাস্ত্র পাঠককে প্রস্তুত করে তোলে 'হাওয়ার রাতে'র প্রবল নীল অত্যাচারের কাহিনী শোনবার জন্য। এই অত্যাচার কবির আধো-জাগরিত চেতনার উপর ; তা 'প্রবল' কারণ অতীতের ঐশ্বর্যময় জীবনের বলশালী উদ্বোধনে তা বর্তমানকে নিক্ষেপ করে এক তুচ্ছ

গ্লানিময়তার দৈন্যে। আবার এই 'অত্যাচার' 'নীল'—'নীল' এই বিশেষণটি নিয়ে আসে স্বপ্নের অনুষঙ্গ—যে স্বপ্নের প্রবলতায় 'পৃথিবী কীটের মতো' মুছে যায় এক অখণ্ডিত পূর্ণ জীবনের 'দুর্দান্ত নীল মত্ততায়'।

জীবনানন্দের কাব্যসৃষ্টির ধারায় প্রেমচেতনার উদবর্তনের প্রসঙ্গে 'বনলতাসেন' পর্যায়ের কবিতাবলীর আলোচনা দীর্ঘতর হয়ে পড়ে! তার অন্যতম কারণ, এ কালের কাব্যেই কবির প্রেমচেতনা পূর্ণতর প্রেক্ষিত, পরিণতি ও স্বকীয়তায় প্রোজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। রোমাণ্টিক প্রেমআদর্শের প্রভাব নিঃসন্দেহে তার এ সময়কার কবিতায় সংযোজিত করেছে এমন এক বিশিষ্টতা যা বাঙলা কাব্যের বহুতা ধারায় সহজদৃষ্ট নয়। নিয়তিতাড়িত প্রেমবাসনার আর্তি ও মরণাকর্ষ, অচিরতার্থতার বেদনা ও প্রেমের ব্যক্তিগত উপলব্ধির বিশ্বাসযোগ্য উত্তাপ ও তীব্রতা জীবনানন্দের প্রেমের কবিতায় যতটা প্রবলভাবে ও শিল্পপ্রসাদে অভিব্যক্ত তা বাংলা কবিতার আর কোথাও এমনকি রবীন্দ্রনাথেও, সুলভ নয়। তবু জীবনানন্দ প্রথমাবধি প্রকৃতিনিমগ্নপ্রাণ এবং প্রেমকে তিনি 'প্রকৃতির শোভাভূমিকা'য় দেখতে ও দেখাতে চেয়েছেন। 'বনলতাসেন' পর্যায়ে সেই প্রকৃতিনিমগ্নতা পূর্বের চেয়ে গভীরতর—ইন্দ্রিয়সংবেদনার ঐশ্বর্যের সঙ্গে এখানে যুক্ত হয়েছে মননের দীপ্তি। সেই মননোদ্ভাসিত প্রকৃতিচেতনার আলোকে প্রেম হয়েছে তাৎপর্যগভীর। ইতিহাসচেতনার অঙ্গীকারে এবং প্রকৃতিজীবনের একাত্মতার মধ্য দিয়ে প্রেম বঞ্চনা ও প্রাপ্তির, বিষাদ ও উল্লাসের ব্যক্তিগত অনুভূতির সীমারেখা পেরিয়ে বিশ্বজনীন মূল্যমহিমায় অভিষিক্ত ও অভিব্যক্ত হয়েছে। এরই ফলে অধিকাংশ প্রেমের কবিতা, 'যেমন 'বনলতাসেন', 'সুরঞ্জনা', 'মিতভাষণ', 'সবিতা' বা 'শ্যামলী' এমন এক ভাবঅনন্যতা পেয়েছে যা কবিতার স্নিগ্ধ সুষমামণ্ডিত বাণীরূপেও প্রতিফলিত।

পরবর্তী কাব্যগ্রন্থ 'মহা পৃথিবী'-কে কবি একটি সংলগ্ন বা পরিপূরক গ্রন্থ হিসাবে গ্রহণ করতে চেয়েছিলেন। তবু 'মহাপৃথিবী'র অন্তর্গত কবিতাবলী মৌলভাব ও সুরের বিচারে বহুলাংশেই বিচ্যুত 'বনলতাসেন' গ্রন্থের নিবিষ্ট প্রকৃতিমুখিনতার প্রশান্তি ও নিশ্চয়তা থেকে। 'মহাপৃথিবী'র আপৎকালীন প্রেক্ষাপটে বিপন্ন মানব অস্তিত্বের গ্লানিদীনতা, উদ্‌ভ্রান্তি ও অনিশ্চিতি মানবমানবীর প্রেমপ্রসঙ্গকে করে তুলেছে গৌণ। অন্যদিকে নৈসর্গিক অস্তিত্বের জৈবতা ও নিরবচ্ছিন্ন নিশ্চিতি প্রশ্ন চিন্তা ও নিশ্চয়তাহীনতায় দীর্ণ বিশশতকী জীবনের সঙ্গে কবির সংকল্পনা-সৃষ্ট প্রকৃতি-পৃথিবীর ব্যবধান ও অনন্বয়ই প্রকট করে দেয়। সিন্ধুসারসেরা জানে না মানবের রক্তাক্ত অন্বেষা ও ব্যর্থ স্বপ্নের কাহিনী ; যে জীবন ফড়িঙের 'দোয়েলের' তার সঙ্গে মানুষের কোনও দিন দেখা হয়নাকো জেনেই আত্মঘাতী চলে আসে অশ্বত্থের কাছে। প্রেম ও প্রকৃতির নিকট হতে ক্রমাপসারিত এবং রূঢ়বাস্তব পৃথিবীর সন্নিকটবর্তী কবি প্রত্যক্ষ করেছেন মানুষের বিরতিহীন অচরিতার্থতার শ্রম। তাই 'লাখো লাখো যুগ রতিবিহারের ঘরে'[১৬] তিনি প্রার্থনা করেছেন 'মনোবীজ'। আর সেই বীজ যখন উপ্ত হয়েছে চেতনায় তখন 'কান্তারের পথে সৌন্দর্যের ভূতের মতন'[১৭] তিনি আবিষ্কার করেন 'প্রণয়ের সম্রাজ্ঞী'দের। এক বিপন্ন পৃথিবী যখন 'সৌন্দর্যকে ফেলিতেছে ছিঁড়ে', তখন পৃথিবীর বয়সিনী সেই 'সুরঞ্জনা'দের জীবনানন্দ হারিয়ে যেতে দেখেন কুশ্রীতার মধ্যে

১৬। 'সিন্ধুসারস / মহাপৃথিবী

১৭। আট বছর আগের একদিন / মহাপৃথিবী

—তুমিও তো পৃথিবীর নারী
কেমন কুৎসিত যেন[১৮]

একদা যারা ছিল অপ্সরা উর্বশীর মত ক্রমে বাদুড়ের খাদ্য হয়ে যায় তারা; 'পৃথিবীর মানুষীর রূপ' ব্যবহৃত হতে হতে শেষপর্যন্ত 'শূয়ারের মাংস' হয়ে যায়।[১৯] এভাবেই 'মহাপৃথিবীর' জগতে প্রেমের সৌন্দর্য আর মাহাত্ম্য যুগবৈগুণ্যে ক্ষুণ্ণ হয়েছে এবং প্রেম হয়েছে নির্দেশে পরাহত, অচরিতার্থ, প্রেরণাবিহীন নিরাশ্বাস এক বোধ।

প্রেমের এই নিরর্থকতা ও প্রেরণাবিচ্যুতির বোধ 'মহাপৃথিবী'র 'প্রেম অপ্রেমের কবিতা' শীর্ষক তিন স্তবকবন্ধেই স্ফুট হয়েছে। কবি অনুভব করেছেন 'পৃথিবী ক্রমশ তার আগেকার ছবি' বদলে ফেলেছে যেন 'দানবের মায়াবলে'। পুরোনো বিশ্বাস বোধ সংকল্প ও স্বপ্নের জগৎ মৃত ; নতুন কোনও প্রত্যয়ও জন্ম নেয়নি :

'একটি পৃথিবী নষ্ট হয়ে গেছে আমাদের আগে
আরেকটি পৃথিবীর দাবী
স্থির করে নিতে হলে লাগে
সকালের আকাশের মতন বয়স,
সে সকাল কখনো আসে না ঘোর স্বধর্মনিষ্ঠ রাত্রি বিনে।

এই ঘোর অমাময়ী রাত্রির দেখা জীবনানন্দের পাঠক পান 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'র জগতে পৌঁছে। কিন্তু, তার আগে এই সন্ধিপর্বে, যখন সবকিছুই ধ্বংস ও পতনের তীরে, তখন মানবহৃদয়ের প্রেমচেতনাও অবসিত নিরালোক প্রত্যয়হীনতায় যার প্রতিধ্বনি 'মহাপৃথিবী'র কবিতার চরণে চরণে :

ক। তোমার প্রতিজ্ঞা ভেঙে ফেলে তুমি চলে গেলে কবে
সেই থেকে অন্যপ্রকৃতির অনুভবে
খ। সেই নারী ঢের দিন আগে এই জীবনের থেকে চলে গেছে।
ঢের দিন প্রকৃতি ও বইয়ের নিকট থেকে সদুত্তর চেয়ে
হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে।
গ। তোমার সংকল্প থেকে খসে গিয়ে ঢের দূরে চলে গেলে তুমি,[২০]

কিন্তু এর বিকল্পে 'মহাপৃথিবী'র কাব্যজগতে নেই কোনও তীব্র অন্বেষার আর্তি, নেই অন্যতর প্রত্যয়ের আহ্বানও, আছে এক বিপন্ন মানবঅস্তিত্বের কাহিনী যা আমাদের জানিয়ে দেয় 'নারীর হৃদয় প্রেম শিশু গৃহ নয় সবখানি'।[২১] উদ্‌ভ্রান্তি বিমূঢ়তা, এবং প্রেমের আলোকদেশিতা বা অন্য কোনও প্রেরণাউদ্দীপ্তির অভাবে 'মহাপৃথিবী' যেন মোহভঙ্গের তিক্ততা ও বিবমিষায়ে সংক্ষুব্ধ। প্রেমের অন্তর্ধানের পর :

ক। হলেও বা হয়ে যেতো এ জীবন দিনরাত্রির মতো মরুভূমি
খ। তবুও হেমন্তকাল এসে পড়ে পৃথিবীতে, এমন স্তব্ধতা,
জীবনেও নেই কো অন্যথা,

১৮। মনোবীজ / ম. পৃ.।
১৯। আদিম দেবতারা / মহাপৃথিবী।
২০। প্রেম অপ্রেমের কবিতা / মহাপৃথিবী।
২১। আট বছর আগের একদিন / ম. পৃ.।

গ। হেমন্তের সহোদর রয়ে গেছে, সব উত্তেজের প্রতি
উদাসীন।[২২]

আসলে 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থে কোনও শুদ্ধ প্রেমের কবিতাই নেই। যা আছে তা প্রকৃতির সান্ত্বনা ও প্রশান্তির জগৎ থেকে উৎক্ষিপ্ত মানবের অনিকেত অস্তিত্বের মধ্যে অপসৃয়মান, ব্যবধানদীর্ণ প্রেমানুভূতির আকস্মিক আবির্ভাব, (উল্লেখ বলাই হয়তো আরও সঙ্গত) যা সাম্প্রতের গ্লানি ও অবক্ষয়ী জীবনের স্বরূপ আরও উলঙ্গ করে উন্মোচিত করে দেয়। একটি কথা উল্লেখ না করে পারি না, নারীর প্রেমের প্রতিশ্রুতিহীনতায় বিশ্বাসভ্রষ্ট কবি প্রেমপাত্রীর জীবন থেকে সরে যাওয়ার পর প্রকৃতি ('অন্যপ্রকৃতির অনুভবে') ও গ্রন্থের নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন প্রেরণা ও প্রত্যয়ের প্রার্থনায়। কিন্তু সেখানেও যথেষ্ট উদ্দীপ্তির অভাবে কবিকে শেষে বলতে হয় 'হৃদয় ছায়ার সাথে চালাকি করেছে'। এই পরিপ্রেক্ষিতেই 'ফিরে এসো' কবিতাটির আর্ত আহ্বানের স্পষ্ট আন্তরিকতা বিচার্য। প্রেমকে সেখানে তিনি প্রত্যাবর্তনের আহ্বান জানিয়েছেন সেই প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ নিসর্গজীবনের প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের জগতে ('আম নিম ঝাউয়ের জগতে')। প্রেমের অবক্ষয়, বিশ্বাসভ্রষ্ট পৃথিবীতে তার দূরাপসারণ, অন্তর্ধানের স্থির, স্পষ্ট অথচ শোকাবহ কাব্যোচ্চারণই পরবর্তী গ্রন্থ 'সাতটি তারার তিমিরের' মুখবন্ধী কবিতা 'আকাশলীনা'কে যেমন আধুনিক মানস-অভিজ্ঞতার প্রতিনিধি করেছে, তেমনই মানবহৃদয়ের মৃত্যুহীন প্রেমচেতনাকে এক সমকালচিহ্নিত অথচ চিরন্তন বাণীরূপ দিয়েছে।

এখানে স্মরণ করা যেতে পারে, 'বনলতাসেন' গ্রন্থের 'শঙ্খমালা' কবিতাটিতে কবি প্রেম ও সৌন্দর্যের নারী কবেকার শঙ্খিনীমালাকে চিতার আগুনে পুড়ে যেতে দেখেছিলেন, সে চিতা কান্তারের পথে সন্ধ্যার আঁধারে আবির্ভূতা এক রমণীর চোখের আগুন। এই রমণীর পরিচয় আরও স্পষ্টতর হয় 'মহাপৃথিবী'র অন্তর্গত 'মনোবীজ' কবিতাটির অনুধাবনে। 'মনোবীজ' কবিতায় এই রমণীর দেখা মেলে আবার সেই কান্তারের পথে। এখানে কবি তাকে আবিষ্কার করেন 'সৌন্দর্যের ভূতের মতন'। যে পৃথিবীতে স্বপ্ন অবসিত, সৌন্দর্য ছিন্নভিন্ন ('পৃথিবী আজ সৌন্দর্যেরে ফেলিতেছে ছিঁড়ে) সেখানে প্রণয়ের সম্রাজ্ঞীরা তো যুগবিলীন মালিন্যেই উপস্থিত হবে। এই কবিতাটিতে এবং অন্যত্র ('আদিম দেবতারা') জীবনানন্দ তাঁর পাঠককে স্মরণ করিয়ে দিতে ভোলেননি প্রেমের সমুজ্জ্বল মহিমার অবক্ষয় ও দেহসর্বস্বতায় হারিয়ে যাওয়ার কথা। 'পৃথিবীর মানুষীর রূপ' 'স্থূল হাতে ব্যবহৃত' হয়ে 'শূয়ারের মাংস' হয়ে যায় অপ্সরা উর্বশীরা 'ডাইনির মাংসের মতন' তাদের 'জঙ্ঘা ও স্তন' মেলে ধরে। 'মহাপৃথিবী'র প্রধান উচ্চারণ তাই, অন্যান্য প্রসঙ্গে যেমন কবির প্রেমভাবনার ক্ষেত্রেও তেমনই, মূল্যবোধ ও আদর্শবিচ্যুতির অনুষঙ্গে ঘনীভূত হয়ে ওঠা এক শোকাবহ নিস্পৃহা, কবি নিজে যাকে বলেছেন, 'জীবনের হেমন্তকাল'—'সব উত্তেজের প্রতি উদাসীন' এক নৈরাশা।

'সাতটি তারার তিমির—'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্বে পৌঁছে জীবনানন্দের কবিতার পাঠক বিশ্বসঙ্কটের বিষমানুপাতিক টানে তাঁর কাব্যের ভাব ও বাণীরূপ, বিষয় ও চারিত্র্য আমূল পরিবর্তিত হতে দেখেন। পূর্ববর্তী কাব্যজগতের মূলত নৈসর্গিক শান্তি ও সৌন্দর্যের সমাহিতির রূপ ভেঙে দিয়ে এখন তাঁর রচনায় প্রবলভাবে প্রবেশ করতে চাইছে প্রথম বিশ্বমহাযুদ্ধের অভিঘাতে বিপর্যস্ত বিশ্বমানবের বিপন্ন নাগরিক অস্তিত্ব। সে

২২। প্রেম অপ্রেমের কবিতা / ম. পৃ.।

বিপন্নতা, 'মহাপৃথিবী'র পাঠকমাত্রই জানেন, তীব্রতম উপলব্ধির প্রহারে একই সঙ্গে ব্যক্তিগত ও উত্তরব্যক্তিক যুগ-যন্ত্রণার উদ্‌ভ্রান্তি ও নৈরাশ্য থেকে সঞ্জাত। জীবনানন্দের তৎকালীন কাব্যসৃষ্টির পরিধির মধ্যে 'মহাপৃথিবীতে'ই এই বিপন্নতার বোধ গাঢ়তর এবং নাগরিক জীবনের বাস্তবতার স্পর্শে তীব্র। তবু, 'মহাপৃথিবী'কে জীবনানন্দ 'বনলতাসেন'-এর সংলগ্ন গ্রন্থ হিসাবেই গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃতিলোক ও নগরজীবন উভয়েরই অন্তঃসারে কবিচেতনা তখনও পর্যন্ত দুই ভিন্নাবর্তে ঘূর্ণিত। একদিকে, 'আট বছর আগের একদিন'-এর মত কবিতায় আধুনিক মানবের তীব্র বিপন্নতার বোধ; অন্যদিকে, 'সিন্ধুসারস', 'ফিরে এসো', 'শ্রাবণরাত' কিংবা 'বলিল অশ্বত্থ সেই' প্রভৃতি কবিতার নিসর্গমদিরতা। উপলব্ধির এই দ্বিচারণিক স্পৃহা ও প্রবণতা 'মহাপৃথিবী'র কাব্যজগৎকে করেছে সন্ধিপর্বের লক্ষণযুক্ত। কিভাবে 'মহাপৃথিবী' কবিচেতনা 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে' অবলীন হলেও নিসর্গপৃথিবীর প্রশান্তি ও কল্যাণবহ প্রত্যয়ের আকাঙ্ক্ষায় একাগ্র ছিল, তার স্বপক্ষে একটি উদাহরণ উপস্থিত করছি ঃ

> অবাক হয়ে ভাবি, আজ রাতে কোথায় তুমি?
> রূপ কেন নির্জন দেবদারু দ্বীপের নক্ষত্রের ছায়া চেনেনা—
> পৃথিবীর সেই মানুষীর রূপ?

'আদিম দেবতারা' নামক বিখ্যাত কবিতাটির থেকে উদ্ধৃত এই চরণগুলির তাৎপর্য অনেকেরই চোখ এড়িয়ে গেছে। 'নির্জন দেবদারু দ্বীপ' ও 'নক্ষত্রে'র উল্লেখ 'সুচেতনা' কবিতাটির ভাবানুষঙ্গ বহন করে আনে ঃ

> সুচেতনা তুমি এক দূরতর দ্বীপ
> বিকেলের নক্ষত্রের কাছে ;
> সেইখানে দারুচিনি বনানীর ফাঁকে
> নির্জনতা আছে।
> এই পৃথিবীর রণরক্ত সফলতা
> সত্য, তবু শেষ সত্য নয়।
> কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে,
> তবুও তোমার কাছে আমার হৃদয়।

মানবহৃদয় তথা সমাজ থেকে যে সু-চৈতন্য দূরনির্বাসিত, তাকে কবি 'নির্জন দারুচিনি বনানী' তথা প্রকৃতিপৃথিবীর প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের জগতে আবিষ্কার করেন। আবহমান মানবসত্তা যে তারই প্রেমে চিরপ্রাণিত 'বনলতাসেন' গ্রন্থের কবিতাবলীর মৌলভাব-প্রেরণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উদ্ধৃত চরণগুলিতে সেই কথাটিই অভিব্যক্ত। 'মহাপৃথিবী'র ধ্বস্ত আধুনিক পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে কবি আহত বিমূঢ়তায় যেন প্রশ্ন করেন ঃ পৃথিবীর মানুষীর রূপ তথা সৌন্দর্য কেন সেই নির্জন দেবদারু দ্বীপের (নিসর্গ ভুবন) নক্ষত্রের (ধ্রুবতার প্রতীক) ছায়া চেনে না, অর্থাৎ এককথায়, সু-চেতনায় আশ্রিত নয়। সৌন্দর্য ও মঙ্গলের চিরঅনন্বয়ের প্রাচীন বেদনাই এখানে আধুনিক মানবের অভিজ্ঞতার নিকষে প্রতীকী কবিতার তির্যগ তীব্রতায় অভিব্যক্ত। অনুরূপ দৃষ্টিকোণ থেকে 'বনলতাসেন' গ্রন্থের 'সুদর্শনা' কবিতাটিও বিচার্য হলে গভীর অর্থময় হয়ে দেখা দেয়। আরও বহু অনুদ্ধৃত উল্লেখের সমর্থন পাঠককে জীবনানন্দের মধ্য পর্যায়ের কাব্যের অন্তিমপর্বে,

অর্থাৎ 'মহাপৃথিবী'র কবিতাবলীর রচনাকালের শেষপর্যায়ে কবিমানসে প্রকৃতিভুবনের সৌন্দর্য ও শান্তি ফিরে পাবার অন্তঃশীল প্রত্ন-আকাঙ্ক্ষাটি স্পষ্ট করে।

'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থ বা তৎপরবর্তী কবিতা কিন্তু এই সন্ধিপর্বসুলভ দ্বিধা বা দ্বিচারণা থেকে মুক্ত। নৈসর্গিক অভিকর্ষের বাইরে, সমকাল ও প্রতিবেশের অগ্নিপরিধির মধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে জীবনানন্দের কাব্যজীবনের এই উনশেষতম পর্যায়, দুই বিশ্বমহাযুদ্ধের অন্তর্বর্তী ও সমসাময়িক কাব্যে, যার কিছুটা সংকলিত 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা' কাব্যগ্রন্থদ্বয়ে, নিসর্গ জীবনের শান্তি সৌন্দর্য ও পূর্ণতার প্রসঙ্গ তিরোহিত ; পরিবর্তে এসেছে ভয়াল অন্ধকারময় এক নাগরিক জগৎ যেখানে মানুষের সংকটময় জীবন কেবলই জেগে ওঠে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে', যেখানে 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো' অস্তিত্বে নিমজ্জিত-মানব দিশাহীন সভ্যতার স্মরণীয় উত্তরাধিকারের দিকে তাকিয়ে দেখে 'সেইসব রীতি আজ মৃতের চোখের মত তবু'—যেখানে 'হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে'। 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের অজস্র অনুরূপ উল্লেখ এক সমাচ্ছন্ন অন্ধকার, সভ্যতার জান্তব অধঃপতন ও মূল্যবোধ-বিপর্যয়ের ইঙ্গিতবহ। এই পরিব্যাপ্ত মূল্যবোধহীনতা ও বিপর্যয়ের আলোকে 'সাতটি তারার তিমির' চিত্রকল্পটিও অর্থবহ হয়ে ওঠে। 'সাতটি তারা' আমাদের মনে আনে সপ্তর্ষিমণ্ডলের অনুষঙ্গ যা চিরকাল অন্ধকার রাত্রিতে, সমুদ্রে, বিপর্যয়ের ঘনঘটায় মানবকে দেখিয়েছে পথ। তেমনই যে সমস্ত মূল্যবোধের আশ্রয়ে মানুষের সমাজ এতকাল লালিত ও প্রাণিত হয়েছে, যুদ্ধ-অবলীন পৃথিবীর এই সংকটকালে যে সবকিছুই নির্দেশে ব্যর্থ, তাই নিরর্থক। সপ্তর্ষিমণ্ডল বা সাতটি তারা আজ আর আলোকদেশি নয়, তিমিরাচ্ছন্নতায় অবলীন। স্বাভাবিকভাবেই এই আবিশ্ব ঘোর অমানিশায় পথভ্রষ্ট মানবিক পৃথিবীতে প্রেম ও প্রকৃতির ভূমিকা গৌণ ও অনুল্লেখ্যপ্রায় হয়ে পড়েছে ; কারণ জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্য রচনায় প্রেম ও প্রকৃতিই বারংবার আবির্ভূত হয়েছে প্রেরণা ও শুভচেতনার কল্যাণ-ভূমিকায়। এ প্রসঙ্গ কবি নিজে মনে করেছেন তার 'শেষের দিকের কবিতায়' 'পারিপার্শ্বিক-চেতনা' 'প্রৌঢ় পরিণতি' লাভ করেছে। সে পারিপার্শ্বিক অবশ্যই সমাজ ও ইতিহাস নিয়ে।

'সাতটি তারার তিমির' ও তৎপরবর্তী কাব্যের আলোচনায় এই দিকপরিবর্তন ও কাল-প্রেক্ষিত বিস্মৃত হওয়া যায় না। এ সময়কার কাব্যে প্রেমের ভূমিকা-নির্ণয়ে আগ্রহী পাঠক কবিকে বলতে শোনেন : 'প্রেমিকেরা সারাদিন কাটায়েছে গণিকার বারে' কিংবা 'প্রেমিককে শেখায়েছি ফাঁকির কৌশল'। প্রেমের দিব্যপ্রেরণা ও মূল্যমহিমার এই অপহ্নব 'আমাদের স্পর্শাতুর কন্যাদের মন বিশৃঙ্খল শতাব্দীর সর্বনাশ হয়ে গেছে জেনে' সপ্রতিভ রূপসীর মত বিচক্ষণ, যে কোনও 'রাজার কাজে উৎসাহিত নাগরের তরে'। এক দিৎসাহীন প্রেমবিবিক্ত অন্ধকার আধুনিক পৃথিবীতে দাঁড়িয়ে 'অচল অভ্যাসের ভিতর' চেতনা ও বিবেক হারিয়ে যেতে দেখে কবির মতন পাঠকও যেন বলে ওঠেন : 'প্রেম নেই প্রেমব্যসনেরও দিন শেষ হয়ে গেছে'। 'সাতটি তারার তিমির' তাই বীতপ্রেম বিশ্বাসরিক্ত আধুনিকের মনের ছবিটিই প্রবলভাবে এঁকেছে। কখনও ক্ষীণ বিদ্যুৎ-দীপ্তির মত হয়তো বা শোনা যায় প্রেমের প্রত্যয় ও স্বপ্ন ফিরে পাবার ব্যাকুল আহ্বান : 'কোথায় প্রেমিক তুমি দীপ্তির ভিতরে'। লক্ষণীয় 'দীপ্তি' শব্দটি এখানে কিরকম অর্থবহভাবে সুপ্রযুক্ত, শুধুমাত্র জ্যোতি বা আভা নয়, শব্দটির উদ্দিষ্ট অভিধা এখানে উদ্দীপ্তি বা প্রেরণার ইঙ্গিত নিয়ে আসে, যে প্রেরণা কবি তাঁর ইতিহাসবেদী প্রজ্ঞায় জানেন, প্রেমই ফিরিয়ে দিতে পারে

অবিশ্বাসী মানবসমাজকে। এই উপলব্ধির আলোকে যখন 'দীপ্তি', ও 'জনান্তিকে' কবিতা দুটি পড়া যায় তখনই তারা উন্মোচিত হয় তাৎপর্যে। 'জনান্তিকে' কবিতাটির আরম্ভেই রয়েছে এক প্রেমবিবিক্ত অন্ধযুগের উদ্‌ভ্রান্ত মানবঅভিজ্ঞতার কথা ; মানুষের চেতনার গভীরে তবু নিহিত রয়েছে এক শুভ প্রেমবোধ :

তোমাকে দেখার মত চোখ নেই—তবু
গভীর বিস্ময়ে আমি টের পাই তুমি
আজো এই পৃথিবীতে রয়ে গেছ।

আধুনিক মানবের বিপন্ন অভিজ্ঞতার ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে কবি অনুভব করেছেন, মেশিন ও মেশিনের দেবতার জোরে নিজেকে স্বাধীন বলে মনে করে নিতে গিয়ে তবু মানুষ এখনও বিশৃঙ্খল। যুদ্ধ-আলোড়িত পৃথিবীতে কোথাও নেই সান্ত্বনা ও শান্তির নীড়। এই রিক্ততা ও উদ্‌ভ্রান্তির মূলে কিন্তু আছে জাতি ও নেশনের প্রতিভূদের অর্থনৈতিক বা রাজনৈতিক বিবেকবর্জিত উচ্চাকাঙ্ক্ষার চেয়েও যা বড় সেই আধুনিক মানুষের যান্ত্রিক হৃদয়হীনতা। তাই 'মানুষের হৃদয়কে না জাগালে', প্রতিটি ব্যক্তির হৃদয় প্রেম ও সৌন্দর্যের 'সুনিবিড় উদ্বোধনে' জাগরিত করতে না পারলে, মানবতার মুক্তি নেই, মুক্তি নেই মানুষের অন্তর্লোকের চির-মানবের :

মানুষের হৃদয়কে না জাগালে তাকে
ভোর, পাখি অথবা বসন্তকাল বলে
আজ তার মানবকে কি করে চেনাতে পারে কেউ।

চারিদিকে রণরক্ত মৃত্যু ও অন্ধ উদ্‌ভ্রান্তির মধ্যে জীবনানন্দ অনুভব করেন 'আরো এক আভা' যা আমাদের 'এই ধৃষ্ট শতাব্দীর' হৃদয়ের জিনিস না হয়েও চিরন্তন মানবতার 'হৃদয়ের নিজের জিনিস' হয়ে রয়ে গেছে। সংস্কার, গ্রন্থ বা বিজ্ঞানের কাছে নয়, মানবকে ফিরে যেতে হয় মানব-হৃদয়ের সেই শাশ্বত প্রেমবোধের উদ্দীপ্তি বা প্রেরণারই কাছে শুভ ও শান্তির প্রত্যাশায়। তখন প্রেয়সী নারী হয়ে ওঠেন প্রতিভূ ও প্রতীক :

অপরনারীর কণ্ঠ তোমার নারীর দেহ ঘিরে
অতএব তার সেই সপ্রতিভ অমেয় শরীরে
আমাদের আজকের পরিভাষা ছাড়া আরো নারী
আছে। আমাদের যুগের অতীত এক কাল
রয়ে গেছে।

'জনান্তিকে' কবিতার এই 'আদিনারী শরীরিনী' যাকে কবি 'মানবের হৃদয়ের ভাঙ্গা নীলিমায়' কিংবা 'বকুলের বনে অপার রক্তের ঢলে'র মধ্যেও চিরজীবিতের মত আবিষ্কার করেছেন, 'দীপ্তি' কবিতাটিতে তাকেই আবার পাঠক দেখেন সাম্প্রত ও শাশ্বতের অনন্বয়ের পটভূমিতে : 'তুমি যত বহে যাও / আমি তত বহে চলি / তবুও কেহই কারু নয়'। এই অনন্বয়ের পশ্চাদভূমিতে রয়েছে বিশ্বসংকট ও মূল্যবোধের বিপর্যয়। 'কলকাতা থেকে দূর /গ্রীসের অলিভবন' 'রক্তের সমুদ্রে' যখন একাকার এবং অগণন মানুষের নিরন্তর মৃত্যুর ঘটনাও যখন 'ব্যসনের মত মনে হয়', তখন মৈত্রেয়ীও ভূমার চেয়ে অন্নলোভাতুর হয়ে দেখা দেন। তবুও এই গ্লানি অবলীন সাম্প্রতের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়ে চতুর্দিকের দিংসাহীন স্তব্ধতার মধ্যেও মানুষের অন্তর্লোকের 'মানব' তার চেতনায় অনুভব করে: 'তবু এক দীপ্তি রয়ে গেছে।'

'সাতটি তারার তিমির' বা এই পর্যায়ের কাব্যসৃষ্টির চেতনা পটভূমিটির উল্লেখ আমরা আগেই করেছি। যে অন্ধ দেশকালে মানুষ কেবলি জেগে উঠেছে 'অফুরন্ত রৌদ্রের অনন্ত তিমিরে', সেখানে সমাজ চাইছে সকলের কাছ থেকে নিরন্তর 'তিমির বিদারী অনুসূর্যের কাজ'। যুদ্ধবিধ্বস্ত পৃথিবীতে মূল্যবোধের ব্যাপক বিনষ্টিতে যখন ঘরে ও বাহিরে নিরন্তর তমসা এবং সেই ভীষণ অমার উৎস শুধু বহির্জাগতিক বিপর্যয়ই নয় ('এই দিকে ঋণ, রক্ত লোকসান, ইতর, খাতক,'),[২৩] মানবের হৃদয় থেকে 'মহৎ সত্য বা রীতি' অর্থাৎ সকল মূল্যবোধের অন্তর্ধান, যার পরিণামে বিশশতকী মানুষের নাগরিক পৃথিবী হয়ে যায় 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো'[২৪] এবং কবি অনুভব করেন, সত্যভ্রষ্টের মতো, সভ্যতার এই জান্তব অধঃপাতের পেছনে আছে 'হৃদয়বিহীনভাবে ব্যাপ্ত ইতিহাস'[২৫]। 'সাতটি তারার তিমির', গ্রন্থে যে নিরন্ধ্র তিমিরাচ্ছন্নতার সম্মুখীন হন জীবনানন্দের পাঠক, তা প্রতিবেশজাত এবং সমকালবদ্ধ। কবি এই অমারাত্রি উৎস দেখেছেন মানুষেরই অধঃপতিত 'ইতিহাসবিবর্ণ' হৃদয় ('বেবুনের রাত্রি নয় তার হৃদয়ের রাত্রির বেবুন')[২৬]। কিন্তু অন্ধ যুগতমসা ও বীতবিশ্বাস উদভ্রান্তি থেকে মানবের অন্তর্লোকের প্রেমবোধই যে মুক্তির পথ দেখতে পারে এ কথাও বারংবার উচ্চারিত হয়েছে জীবনানন্দের শেষ পর্যায়ের কাব্যরচনায়, কিছুটা ক্ষীণ ও বিক্ষিপ্তভাবে 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে প্রবলতরভাবে 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় এবং একেবারে অনন্যনিরপেক্ষভাবে তাঁর শেষতম রচনাসম্ভারে। প্রেমের শক্তি ও প্রেরণায় এই আস্থাশীলতা 'মহাপৃথিবী' 'সাতটি তারার তিমির' পর্যায়ের কাব্যের প্রবলবিবমিষা, বিদ্রূপ ও উদভ্রান্তির বিপরীতে কবিচেতনার অন্তঃশীল মৌল আস্তিকতার প্রতিই সংবেদনশীল পাঠকের দৃষ্টি ফিরিয়ে আনে।

'সাতটি তারার তিমির'-এর নাগরিক জগৎ ভাব ও আবহে যেমন কাব্যসৃষ্টির পূর্ব-পর্যায়ের শান্ত নির্জন প্রকৃতিভুবন থেকে দূরস্থিত তেমনই প্রেমও এ জগতে তার চিরন্তন ঐশ্বর্য ও মহিমা থেকে স্খলিত হয়েই আত্মপ্রকাশ করেছে। গ্রনেছর প্রারম্ভিক কবিতা 'আকাশলীনা'র নায়িকা সেই 'পৃথিবীর বয়সিনী', 'প্রেমস্বরূপা' 'সুরঞ্জনা'কে কবি দেখেন যুবকের বাহুলগ্না, দূরাপসৃয়মানা। স্পষ্টতঃই যুবক এখানে দেহী বাসনার, জৈব জীবনের প্রতিভূ ; 'সুরঞ্জনা' যুগাবলীন মালিন্যে অধঃপতিত। মনে পড়ে 'বনলতাসেন' গ্রন্থে আমরা যে 'সুদর্শনা' নারীর সাক্ষাৎ পেয়েছিলাম তিনি 'যুগের সঞ্চিত পণ্যে' লীন হতে না দিয়ে তাঁর প্রেমিকের চেতনাকে করেছিলেন অমৃতসূর্যমুখী। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে সেই কবিরই উপলব্ধিতে প্রেম মূল্যবোধের অবক্ষয়ে মহিমাবিহীন, জৈবজীবন উপচারে পর্যবসিত। 'বনলতাসেন' কাব্যের ইতিহাস-উদ্বর্তিত চির-শ্রীময়ী 'সুরঞ্জনা'র হৃদয় তাই জীবনানন্দের কাছে 'ঘাস', ইতরপ্রাণের খাদ্যবস্তু হয়ে দেখা দেয়। গ্রন্থের অন্তিম কবিতা 'সূর্যপ্রতিম'—সেখানেও যুগের যন্ত্রণাহত মানবচেতনার নিকষে প্রেমের অবমূল্যায়নের অভিব্যক্তি—'প্রেমিককে শেখায়েছি ফাঁকির কৌশল। শেখাইনি?'[২৭] শতাব্দীর যুদ্ধধ্বস্ত সামাজিক ভূখণ্ডে মূল্যবোধবিবিক্ত নাগরিক দুনিয়ার 'মূর্খ আর রূপসীর ভয়াবহ সঙ্গমই স্বাভাবিক। তাই 'নিবিড়রমণী' তার জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে, 'অনেক রক্তমলিন পথ' হেঁটে 'আজ এই সময়ের পারে' খুঁজে পায় 'আবহমানের ভাঁড়'কে।[২৮] জ্ঞান ও প্রেমের যে

২৩। 'নাবিকী' / সা. তা. তি.। ২৪। রাত্রি / সা. তা. তি.।
২৫। সূর্যপ্রতিম / সা. তা. তি.। ২৬। উন্মেষ / সা. তা. তি.।
২৭। সূর্যপ্রতিম / সা. তা. তি.; পৃঃ ৭৯। ২৮। উন্মেষ / সা. তা. তি. ; পৃঃ ২৪।

শুভ অন্বয় বা মিলনের স্বপ্ন ও নির্মাণ জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্যে অভিব্যক্ত ; 'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা' পর্যায়ের রচনায় তাদের ব্যবচ্ছেদ ও অনন্বয়ের যন্ত্রণাই প্রধান। প্রেমের এই অবমূল্যায়ন ও নিরর্থকতার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর এ কালের কাব্যে তমসার আধিপত্য। কারণ, নারীকে জীবনানন্দ বারবার দেখেছেন জ্যোতিস্বরূপে—প্রেমের আন্তরমূল্যেই নারীকে ঘিরে এই উদ্ভাসনা, এই আলোকদেশিতা। তাঁর 'সুরঞ্জনা' ('বনলতাসেন') 'দেহ দিয়ে ভালোবেসে' তবু 'ভোরের কল্লোল' হয়ে ওঠেন, যাঁর আলোকদেশি আহ্বান কোনও একদিন ধর্মাশোকের ছেলে মহেন্দ্রকে যেমন, তেমনই অন্ধকার সমুদ্রের অন্বেষাক্রান্ত মানবকে, যুগ যুগে নবসভ্যতার উদয়সৈকতে ডেকে নিয়ে আসে। তাঁর 'মিতভাষণ' কবিতার নায়িকার হাতে সেই 'মণিকা-আলো' যা শ্রেয়তর বেলাভূমিতে নাবিককে আহ্বান জানায়। 'শ্যামলী' বা 'মিতভাষণ'-এর নায়িকার মুখশ্রীর বর্ণনা দিতে গিয়ে কবিকে ব্যবহার করতে হয় 'প্রতিভা' শব্দটি যা অভ্রান্তভাবেই বিভা বা ঔজ্জ্বল্যের দ্যোতক। আর 'সবিতা'র নায়িকার মুখ স্পষ্টতই 'অন্ধকার থেকে এসে নবসূর্যে জাগার মতন' বলে কবির কাছে মনে হয়েছে।

এভাবেই জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্যসৃষ্টিপটে নারী বারবার আবির্ভূতা এক উজ্জ্বল আলোকবৃত্তে। এই আলো অন্য দৃষ্টিকোণ থেকে বিচারে প্রয়াণের পথ-নির্দেশী ; সে প্রয়াণ ইতিহাসবেদে জারিত প্রেমচেতনার আলোকে, জীবনানন্দের পাঠককে জেনে নিতে হয়, নবসভ্যতার শ্রেয়তর বেলাভূমির অন্বেষায়। স্বভাবতই আলোকমহিমাময়ী, প্রেরণাদাত্রী ও সভ্যতার ধাত্রী এই জীবনানন্দীয় নারী 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে অনুপস্থিত। কারণ, এ কাব্য সমাচ্ছন্ন আঁধারের কাব্য যেখানে 'পৃথিবী প্রতিভা হয়ে আকাশের মত শুভ্রতাকে' চেয়ে শেষ পর্যন্ত 'ভঙ্গুর হয়ে নিচে রক্তে নিভে যেতে চায়'। তবু, এখানেও কবির চেতনালোক থেকে সেই 'আদি শরীরিনী নারী' নির্বাসিত নন। কবি গভীর বিস্ময়ে টের পান প্রেম এখনও এই পৃথিবীতে রয়ে গেছে। 'দীপ্তি' ও 'জনান্তিকে' এ দুটি কবিতাই এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। তবে, প্রেম বা নারী 'সাতটি তারার তিমির'-এ ঈপ্সিত ভূমিকায় অবতীর্ণ নয়—প্রেমের সেই প্রাচীন প্রেরণাশক্তির অন্তর্ধানই বরং প্রকটতর। তার কারণ ইতিহাসবেদী চেতনার আলোকে স্বকাল ও প্রতিবেশে নিবদ্ধ কবি জেনেছেন ঃ 'তিমির হননে' অগ্রসর হয়ে আমরা আজ 'তিমিরবিলাসী' বলেই 'কোথাও দিৎসা নেই,' 'প্রেম নেই'। পুনরাবৃত্তির মত শোনালেও বলতে হয়, জীবনানন্দ প্রেমের দিব্য-প্রেরণার শক্তিতেই যুগবিপর্যের মধ্যে দাঁড়িয়েও সম্পূর্ণ আস্থাভ্রষ্ট হতে পারেন নি ঃ

> চোখ না এড়ায়ে তবু অকস্মাৎ কখনো ভোরের জনান্তিকে
> চোখে থেকে যায়
> আরো এক আভা ঃ
> আমাদের এই পৃথিবীর এই ধৃষ্ট শতাব্দীর
> হৃদয়ের নয়—তবু হৃদয়ের নিজের জিনিস
> হয়ে তুমি রয়ে গেছ।[২৯]

এখানেও সচেতন পাঠককে লক্ষ্য করতে হয় নারীর প্রেমপ্রতিমা ঘিরে 'আভা', তাঁর আবির্ভাবের পটভূমি ভোরের আলোকলগ্ন। জীবনানন্দের চেতনায় প্রেম তাই সর্বদাই এক দীপ্ত আলোকবৃত্তের অনুষঙ্গে সৌন্দর্য ও পবিত্রতার মেলবন্ধনে আবির্ভূত। প্রেমকে কেন্দ্র

২৯। জনান্তিকে / সাতটি তারার তিমির

করে নারীর রূপবর্ণনায় কবি 'আভা' 'দীপ্তি' 'প্রতিভা'র মত ঔজ্জ্বল্য-দ্যোতক শব্দগুলিকে বেছে নিয়েছেন। যা আলোকদেশি তাই তিমির হন্তারক ; তাই ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে এই নারীকেই জীবনানন্দ 'তিমির-পিপাসী' রমণীর চিত্রকল্পে অঙ্কিত করেছেন 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে। তিমিরপিপাসী নারী-প্রেয়সীকে হারিয়ে নাবিক-মানবতা আজ পথভ্রান্ত ; সভ্যতার প্রয়াণ ও উত্তরণও তাই যেন স্তব্ধ জড়ীভূত।

পরবর্তী গ্রন্থ 'বেলা অবেলা কালবেলা'র কালপ্রেক্ষিত কিন্তু বিশ্বযুদ্ধের অব্যবহিত অগ্নিমুহূর্ত নয়, এক উত্তরসামরিক অধ্যায় যেখানে বহির্জাগতিক ধ্বংসস্তূপের মধ্যে দাঁড়িয়ে বিপর্যস্ত মানব-চেতনা নির্মাণ ও সৃজনের মৃত্যুহীন শক্তিগুলি চিনে নিতে, সংঘবদ্ধ করে নিতে চাইছে। স্বাভাবিকভাবেই মানবহৃদয়ের দুর্মর প্রেমবোধ, যা জীবনানন্দের কাব্যে চিরদিনই সৃজনের প্রতীতি ও উৎসবের প্রতীকে অভিব্যক্ত, এ গ্রন্থে আরও প্রবল ও প্রয়াণমুখী ভূমিকায় উপস্থিত। প্রেমের আধারস্বরূপা প্রেয়সী নারীও অঙ্কিত হয়েছেন সৃষ্টির প্রেরণাদাত্রী ও সভ্যতার ধাত্রীর আলোকদীপ্ত দ্বৈত ভূমিকায়। তবে এখানেও জীবনানন্দ সমসাময়িক কালের তিমিরাচ্ছন্ন রক্তঅবলীন রূপটিকে বিস্মৃত হননি, উপেক্ষা করতে পারেননি। 'সাতটি তারার তিমির' গ্রন্থে প্রেমের মূল্যমহিমা খণ্ড আপতিক দেশকালের দৌরাত্ম্যে অধঃপতিত, 'বেলা অবেলা'য় সেই প্রেম ইতিহাস চেতনার সঞ্জীবনে তার সনাতন কল্যাণশক্তিতে পুনরুজ্জীবিত। 'বেলা অবেলা'র মুখবন্ধী কবিতায় ঘোর তমিস্রার মহাবিশ্বপটে একটি পবিত্র নারীবোধনের সুর অনুরণিত; জ্যোতিষ্কের উজ্জ্বল আলোকবৃত্তের মত সৃষ্টির নিদ্রাহীন ধাত্রীর ভূমিকায় আবিষ্কৃত হয়েছেন শাশ্বত মানব-প্রেয়সী ঃ

> মহাবিশ্ব একদিন তমিস্রার মতো হয়ে গেলে
> মুখে যা বলনি, নারি, মনে যা ভেবেছ তার প্রতি
> লক্ষ্য রেখে অন্ধকার শক্তি অগ্নি সুবর্ণের মতো
> দেহ হবে মন হবে তুমি হবে সে সবের জ্যোতি।[৩০]

এই মূল সুরটি গ্রন্থের অন্যান্য বহু কবিতায়ও প্রতিধ্বনিত। 'তোমাকে' কবিতাটির সমকালীন অবক্ষয়ের চিত্রে বিচ্ছিন্নতা ও বিনাশের অপশক্তিগুলিই সক্রিয় ('প্রতিটি প্রাণ অন্ধকারে নিজের আত্মবোধের দ্বীপের মতো')। তারই মধ্যে কবি নারীকে চেনেন 'ইতিহাসের শেষে' এসে 'মানব-প্রতিভার নিষ্ফলতার অক্ষম অন্ধকারে' এক মৃত্যুহীন সৌন্দর্যদীপ্তির পরিচয়ে ঃ

> মানবকে নয় নারি শুধু তোমাকে ভালবেসে
> বুঝেছি নিখিল বিষ কী রকম মধুর হতে পারে।

'মানবকে নয় নারি'—কথাগুলি লক্ষণীয়। সমকাল ও যুগপ্রতিবেশবদ্ধ মানবকে জীবনানন্দ দেখেছেন ঐতিহ্যবিস্মৃত ('ব্যর্থ উত্তরাধিকারে'), মানবতাবর্জিত ('রক্তনদীর পারে') এবং জৈব জীবনে অধঃপতিত ('ক্রম-পরিণতির পথে লিঙ্গশরীরী')। পৃথিবীকে যখন 'বলয়িত মরুভূমি' বলে কবির মনে হয়েছে এবং ইতিহাসবোধের মধ্যেও যখন তিনি আস্থা ও প্রেরণার বাণী খুঁজে পাননি, বরং ইতিহাসকে মনে হয়েছে 'গোলকধাঁধায় বন্দী মরুভূমি', তখন চারিদিকে 'মৃতোপম মানুষের ভিড়' থেকে তিনি দৃষ্টি ফিরিয়ে নারীর মধ্যেই পেয়েছেন স্থির শুভ প্রেরণার আশ্বাস ও উদ্দীপ্তির বাণী ঃ

৩০। মাঘ সংক্রান্তির রাতে / বেলা অবেলা।

মলিন ইতিহাসের অন্তর ধুয়ে চেনা হাতের মতন :
আমি যাকে ভালবেসেছি আবহমান কাল সেই নারীর :

আমাদের পূর্ববক্তব্যের সূত্র ধরে বলা যায়, 'সাতটি তারার তিমির'-এর নিরন্ধ্র আঁধারে আবৃত পৃথিবী কবির প্রেমচেতনার আলোকে প্রয়াণের পথ খুঁজে পায় যেন, 'বেলা অবেলা কালবেলা'র জগতে পৌঁছে।—

যে নারী দেখেনি কেউ—ছ'সাতটি তারার তিমিরে
হৃদয়ে এসেছে সেই নারী।...
সৃষ্টির গভীর গভীর হংসীপ্রেম
নেমেছে—এসেছে আজ রক্তের ভিতরে।[৩১]

'খণ্ডিত রক্তবণিক পৃথিবীতে' 'অন্ধকারে যে শরণ সবচেয়ে ভালো' সেই শরণই বেছে নিয়েছেন জীবনানন্দ, আর তা হল : 'যে প্রেম জ্ঞানের থেকে পেয়েছে গভীরভাবে আলো'।[৩২] এই জ্ঞানসিঞ্চিত প্রেমই প্রয়াণের শক্তিতে বলীয়ান, কারণ এই প্রেমই মানুষকে জানায় 'মানব ক্ষয়িত হয়না জানি ব্যক্তির ক্ষয়ে' এবং সময়ের অমেয় আপতিক আঁধারে পৃথিবীতে বারবার 'জ্যোতির তারণ কণা আসে'। প্রেমই এ পৃথিবীতে নিয়ে আসে বারবার 'ক্রমায়াত আঁধারকে আলোকিত করার প্রমিতি'।[৩৩] এভাবেই একটির পর একটি কবিতায় আশ্চর্য অর্থগভীর সব চিত্রকল্পের মাধ্যমে মানবপ্রয়াণে নারীর প্রেমপ্রাণিত ভূমিকার কথা জীবনানন্দ তুলে ধরেছেন তাঁর কাব্যের অন্তিম পর্যায়ে। স্বকালচিহ্নিত অভিজ্ঞতায় 'আদি নারী শরীরিনী' প্রেমকে কবি নতুন করে চেনেন :

অন্ধ অন্ধকার তুষারপিচ্ছিল এক শোণ নদীর নির্দেশে
সেখানে তোমার সঙ্গে আমার দেখা হল, নারি,
তুমি যে মর্ত্যনারকী ধাতুর সংঘর্ষ থেকে জেগে উঠেছ নীল
স্বর্গীয় শিখার মতো,
সকল সময় স্থান অনুভবলোক অধিকার করে সে তো থাকবে
এইখানেই,
আজ আমাদের এই কঠিন পৃথিবীতে। (সময়ের তীরে)

'সাতটি তারার তিমির'-এর পরবর্তী কাব্যসৃষ্টিতে প্রেমই প্রবলতম বিষয় হিসাবে আবির্ভূত, যদিও কখনও কখনও কবির দৃষ্টি প্রত্যাবর্তিত স্মৃতি, নির্জনতা ও সর্বোপরি প্রশান্তি ও সৌন্দর্যের অনুষঙ্গময় প্রকৃতিলোকে। নিবিষ্ট পাঠক আরও অগ্রসর হয়ে কবির অন্তিমতম কবিতাবলীতে পৌঁছালে দেখবেন মানবীয় প্রেমের হৃদয়মূল্য এবং নৈসর্গিক প্রশান্তির সমাহারে এক নবজায়মান 'আলোপৃথিবী'র সংকল্প আন্তরিক প্রত্যয়ের শক্তিতে ও মন্ত্রকল্প ভাষায় ধ্বনিময়তার প্রসাদে উজ্জ্বল বিগ্রহরূপ ধারণ করেছে। সে সবের পর্যালোচনার আগেই 'বেলা অবেলা'র চেতনা-গোধূলি উজ্জ্বল হয়েছে কবিমানসে প্রেমের ইতিহাসপ্রাণিত প্রেরণাপ্রবণ আবির্ভাবে। মনে করিয়ে দেওয়া প্রয়োজন, 'বেলা অবেলা' বা তৎপরবর্তী কাব্যসৃষ্টির ক্ষেত্রেও ব্যক্তিগত প্রেমের বিশ্বাসযোগ্যতার উত্তাপ অনুপস্থিত বা অস্বীকৃত হয়নি, তবে ব্যক্তিক উপলব্ধির খণ্ডিত সীমায় কবির প্রেমবোধ আবদ্ধ থাকেনি,

৩১। অনেক নদীর জল / বেলা অবেলা।
৩২। যতদিন পৃথিবীতে / বে. অ.।
৩৩। অনেক নদীর জল/বে. অ.।

আত্মস্থ হয়েছে ইতিহাসবেদী চিরমানব-চেতনার ঐতিহ্য। তাই 'এই পৃথিবীর সাটিনপরা দীর্ঘগড়ন' কোনো নারীকে দেখে কবির মনে হয়, 'সকল অলাত ইতিহাসের হৃদয় ভেঙে বৃহৎ সবিতা'র মতো সে আত্মপ্রকাশিত। অথবা অন্যত্র :

কোথাকার মহিলা সে? কবেকার ? ভারতী নর্ডিক গ্রীক / মুস্লিম ও মার্কিন?

অথবা সময় তাকে সনাক্ত করে না আর, ('অবরোধ'/বে. অ.)

এভাবেই দেশ-কাল-নিরপেক্ষ বিশ্বজনীন চিরন্তনতায় ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির তাৎক্ষণিক সীমারেখাগুলি অতিক্রান্ত হয়ে যায়, অনন্তকালের পটে অপরাহৃত আলোকবৃত্তের মধ্যে নারী এসে দাঁড়ান উদ্দীপ্তি ও প্রয়াণের বাণী বহন করে :

'নিজের নারীকে নিয়ে পৃথিবীর পথে
একটি মুহূর্তে যদি আমার অনন্ত হয় মহিলার জ্যোতিষ্ক জগতে'।[৩৪]

'সাতটি তারার তিমির'-এর মুখবন্ধী কবিতাটিতে অপসৃয়মানা এক নারীর প্রতীকেই জীবনানন্দ আমাদের জানিয়েছিলেন সমরোত্তর নাগরিক পৃথিবীতে প্রেমের অবক্ষয় ও অধোগতির কথা। তবু 'ধৃষ্ট' স্বকালের ভূখণ্ডে দাঁড়িয়েও তিনি ভুলতে পারেননি কুয়াশা ভেদ করে 'সূর্যের সমস্ত গোল সোনার ভিতরে' এগিয়ে যাওয়া এক অনন্যা নারীকে। সেই সূর্যপ্রতিভ প্রয়াণ-প্রেরণাময়ী নারীকে জীবনানন্দ বারবার আহ্বান জানিয়েছেন পরবর্তী পর্যায়ের কাব্যে। 'বেলা-অবেলা' কবির প্রেমচেতনার সেই নবীন বিবর্তনের স্বাক্ষর বহন করছে অজস্র কবিতায়। এই নবাঙ্কুরিত প্রেম 'ইতিহাসবেদে' আশ্রিত ও 'পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞানে' শীলিত হয়েই দেশ-কালের গণ্ডী অতিক্রম করেছে এবং সে উৎক্রান্তি অবশ্যই ব্যক্তিগত প্রেমানুভূতির আন্তরিকতা আত্মস্থ করেই ঘটেছে। সময়াতীতের বোধে ও উত্তরব্যক্তিক অন্বিষ্টপ্রবণ অনৈহিকতার স্পর্শে ব্যক্তিগত প্রেমভাবনা থেকে জীবনানন্দ পাঠককে নিয়ে যান লোকোত্তর প্রেমচেতনায়। 'সকল প্রতীতি উৎসবের চেয়ে বড়' কোনো ভূমিকায় তিনি নারীকে চিনতে পারেন বলেই শুধুমাত্র 'মিলন ও বিদায়ের প্রয়োজনে' প্রেয়সী নারীর সঙ্গে মিলিত হতে পারেন না। অখণ্ড কাল ও মানবেতিহাসের মহাবিশ্বপটে তিনি নারী তথা প্রেয়সী তথা প্রেমকে উপলব্ধি করেন আপন চেতনায় :

তুমি তো জাননা, তবু, আমি জানি, একবার তোমাকে দেখেছি
পিছনের পটভূমিকায় সময়ের
শেষনাগ ছিল, নেই, বিজ্ঞানের ক্লান্ত নক্ষত্রেরা
নিভে যায়, মানুষ অপরিজ্ঞাত সে অমায়, তবুও তাদের একজন
গভীর মানুষী কেন নিজেকে চেনায়।[৩৫]

সেই অভিজ্ঞান সাময়িকতা ও ব্যক্তিক প্রয়োজনের দাবী-সীমারেখার বাইরে নিয়ে আসে কবিচেতনাকে :

অপার কালের স্রোতে না গেলে, কী করে তবু, নারি,
তুচ্ছ খণ্ড অল্পসময়ের স্বত্ব কাটায়ে অঋণী তোমাকে কাছে পাবে,[৩৬]

উদাহরণ বৃদ্ধির প্রয়োজন নেই। 'মাঘসংক্রান্তির রাতে', 'তোমাকে', 'অনেক নদীর জল', 'সূর্য নক্ষত্রনারী', 'অবরোধ', 'উত্তর সাময়িকী', 'নারীসবিতা' 'গভীর

৩৪। সূর্য নক্ষত্র নারী / তিন / বেলা অবেলা।
৩৫। সূর্য নক্ষত্র নারী / এক/ বেলা অবেলা।
৩৬। সূর্য নক্ষত্র নারী / দুই / বেলা অবেলা।

এরিয়েলে'—একটির পর একটি কবিতায় ইতিহাসবেদে অন্তর্দীপ্ত প্রেমের প্রয়াণোজ্জ্বল কালাতীত ভূমিকাই উপজীব্য। প্রেম এক 'তিমির-বিদারী' অভিজ্ঞতা, প্রকৃতির বিকীর্ণ শক্তিগুলির মতো প্রেম এক অবিনাশী সত্তায় বিরাজমান। জীবনানন্দের কাব্যের অভিনিবিষ্ট পাঠকের কাছে এ বক্তব্য অপরিচিত নয়। কারণ, সেই 'বনলতাসেন' পর্যায় থেকেই জীবনানন্দ নারী ও নিসর্গকে শুধুমাত্র সংস্থানগত সামীপ্যের পরিবর্তে আন্তরমূল্যের একাত্মতায় উপলব্ধি করেছেন। বিশ্বযুদ্ধের অন্তর্বর্তী ও উত্তরকালীন কাব্যবচনার কালে আপৎকালীন বিমূঢ়তায় অপসৃত হয়েছে নিসর্গের প্রশান্তি ও নারীর কল্যাণসুন্দর ধ্রুবতার আদর্শ। কিন্তু, এই অপসৃতি দীর্ঘ বা স্থায়ী হয়নি। নারী তাঁর সমুজ্জ্বল মহিমায় প্রত্যাবর্তিত হয়েছেন :

> জ্বলন্ত তিমিরের ভিতর তোমাকে দেখেছি
> শুনেছি বিরাট শ্বেত-পাখি সূর্যের
> ডানার উড্ডীন কলরোল
> আগুনের মহান পরিধি গান করে উঠেছে।[৩৭]

এই সেই চিরদীপ্তিময়ী নারী যাকে ঘিরে 'অপার আলোকবর্ষ', 'তিমির-পিপাসী' অগ্নিপরিধির মধ্যে যাঁর দৈবী সাক্ষাৎ একদা কবিকে জানিয়েছিল 'অমৃতসূর্যের আহ্বান'। 'বেলা অবেলা'য় এই শাশ্বতীর আবির্ভাব 'বিদ্যুতের মতো উজ্জ্বল প্রাণনে', এ কথা ঠিক। সংশয় হতাশা ও দিশাহীনতার যে তিমিরে সমাজ ও রাষ্ট্রের মত কবির চেতনাও উদ্‌ভ্রান্ত ছিল 'সাতটি তারার তিমির' পর্বে, প্রেমের আলোকদেশি প্রত্যয়ের নবজাগরণেই তার থেকে উজ্জ্বল উদ্ধার যেন সম্ভব হয়ে ওঠে। কিন্তু, এর পাশাপাশি আরেকটি প্রসঙ্গও লক্ষণীয় : নিসর্গের নিঃশব্দ পুনরাধিষ্ঠান এ কালের রচনাতেই ঘটেছে। নারীকে জীবনানন্দ 'উজ্জ্বল পাখিনী', "বনহংসী', 'সৃষ্টির মরালী'র চিত্রকল্পে অধিষ্ঠিত করেছেন, কখনও তাকে 'জলের উৎসারণের মতো', কখনও 'আভা আলো শিশিরের মতন' নিসর্গের নানা অনুষঙ্গে চিনেছেন। 'মহাপ্রাণের বৃক্ষের ওপর অধিষ্ঠিত এক 'উজ্জ্বল পাখিনীর' মত এই নারীকে আরও পরিচ্ছন্ন প্রাণবন্ত রঙে জীবনানন্দের পাঠক চিত্রিত হতে দেখেন কবির কাব্যসৃষ্টির অন্তিমপর্বে এসে : 'একটি বৃক্ষে সময় মরুভূমি/লীন দেখেছে, গভীর পাখি গভীর বৃক্ষ তুমি'।[৩৮] অথবা 'মহাপ্রাণের বৃক্ষ ও তার পাখি তো বারবার ভস্ম হয়ে জাগছে হরিৎ-নবহরিৎ গাছে'।[৩৯] এ জাতীয় চিত্রকল্প অসংখ্যাবার আবৃত্ত হয়েছে জীবনানন্দের শেষতম পর্যায়ের কাব্যরচনায়। এ সময় তাঁর চিত্রকল্পের ও প্রতীকের প্রিয় বিষয়গুলি ছিল নদী ও নীলিমা, সূর্য, বৃক্ষ ও পাখি , অন্য অর্থে জল, আলো ও নিসর্গ-শ্যামলিমার এক উজ্জ্বল প্রেক্ষাপট। বিষয়গুলি সবই জীবনানন্দের পূর্বাপর কাব্যের পাঠকের কাছে পরিচিত ও প্রিয় ; শুধু অন্তিম পর্যায়ের কাব্যে সে সুরের নবীন সম্বন্ধের অর্থদ্যোতনাই কবির চেতনার সাম্প্রতিক উদ্‌বর্তনটিকে পরিস্ফুট করে। সেই অন্তিমতম চেতন-বিবর্তনে এক নবীন সূর্যকরোজ্জ্বল 'আলো-পৃথিবীর' সংকল্পনাই অভিব্যক্ত এবং নারী ও তার প্রেমান্বেষী মানবপুরুষ আছেন এ পৃথিবীর জ্যোতির্বলয়কেন্দ্রে।

জীবনানন্দের কবিমানসে প্রকৃতিচেতনার বিবর্তন প্রবাহে আমরা দেখেছি যুদ্ধঅবলীন

৩৭। সময়ের তীরে / বে অ.।
৩৮। সূর্য নিভে গেছে / একক, ২য় বর্ষ, ১১শ সংখ্যা, ১৩৫৯।
৩৯। নবহরিতের গান / একক শারদীয়া, ১৩৬০।

পৃথিবীর বিপন্নতা, উদ্‌ভ্রান্তি ও নৈরাশ্যর বোধকে অতিক্রম করে অন্তিম পর্যায়ের কাব্য পাঠককে আহ্বান জানিয়েছে নিসর্গের প্রশান্তি ও মানবহৃদয়ের চিরন্তন ভালোবাসায় লালিত এক সুচেতনা-ভাসিত আলো-পৃথিবীতে :

আমাদের পৃথিবীর পাখলী ও নীলডানা নদী
আমলকী জামরুল বাঁশ ঝাউয়ে সেখানেও খেলা
করছে সমস্ত দিন ; হৃদয়কে সেখানেও করে না অবহেলা
বুদ্ধির বিচ্ছিন্ন শক্তি ; শতকের ম্লান চিহ্ন ছেড়ে দিয়ে যদি
নরনারী নেমে পড়ে প্রকৃতি ও হৃদয়ের মর্মরিত হরিতের পথে—
অশ্রু রক্ত নিষ্ফলতা মরণের খণ্ড খণ্ড গ্লানি
তাহলেও রবে ; তবু আদি ব্যথা হবে কল্যাণী
জীবনের নবনব জলধারা—উজ্জ্বল জগতে।[৪০]

এই অনির্বচনীয় কবিস্বপ্নের জগতেই প্রেমচেতনার পর্যালোচনাও পাঠককে ফিরিয়ে নিয়ে আসে চিত্রকল্পের অপ্রতিরোধ্য ভাবানুষঙ্গে :

সে সঞ্চিত মানবতা আজ প্রায় শূন্যে ফুরালো
অনুভব করে মানুষ তবুও
মৃত্তিকায় মূল রেখে লক্ষ্য রেখে আদি-নীলিমায়
শ্যামল গাছের থেকে অবিনাশ ধর্ম শিখবে?
অথবা নশ্বর প্রেম ভালবেসে বসবে ছায়ায়।[৪১]

নিসর্গের অবিনাশী প্রাণ আর মানবিক প্রেমের আলোক উদ্বর্তনাই মানবকে দিতে পারে 'রক্তনদীর তীরে' এই ধ্বস্ত পৃথিবীতে ধ্রুবজীবনের দিশা। তাই জীবনানন্দকে মন্ত্রোচ্চারণের পবিত্রতায় বলতে শুনি : 'মুখ থেকে রক্তের ফেনা /পায়ের নিচের থেকে ক্ষমতা যশের মরুভূমি / ফেলে দিয়ে হে হৃদয় কখন বসবে কয়েক / মুহূর্ত নীল শ্যামল বৃক্ষের নিচে তুমি'।[৪২]

এই নিসর্গচ্ছায়ায় মানবচেতনাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসেন জ্যোতিঃস্বরূপিনী সূর্যপ্রতিভ নারী যার কথা আমরা এ যাবৎ আলোচনা করেছি :

যে নারীর মতো এই পৃথিবীতে কোনদিন কেউ
নেই আর—সে এসে মনকে নীল—রৌদ্রনীল শ্যামলে ছড়ালো
কবে যেন—আজকে হারিয়ে গেছে সব,[৪৩]

সভ্যতার সঙ্কটে, যুদ্ধোত্তর পৃথিবীর মূল্যবোধবিপর্যয়ে এই 'নারীসবিতা'কে কবি সাময়িকভাবে হারিয়ে ফেললেও ইতিহাসবেদী চেতনার প্রসাদে মহাসময়ের প্রেক্ষাপটে তাকে চিরভাস্বর স্বরূপে উপলব্ধি করেন :

মনে হয় যেন কোন হরিতের—নব হরিতের
সঙ্গীতে নিশ্চিহ্ন হয়ে মানুষের ভাবা

৪০। আলোপৃথিবী / দেশ, কার্তিক ; ১৩৬১।
৪১। বৃক্ষ / দেশ, কার্তিক ; ১৩৬১।
৪২। ঐ
৪৩। দু'দিকে ছড়ায়ে আছে / শ্রেষ্ঠ কবিতায় (নাভানা) প্রকাশিত।

এ জন্মের আরো দূর জন্ম-জন্মান্তের মুখোমুখি ফিরে এসে
অনাদি আলোর ভালবাসা
সামাজিক অন্তহীন আকাশের নিচে
জ্বালিয়ে শ্যামলনীল ব্যথা হতে চায়।
আমি সেই মহাতরু লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
উঠে তুমি জাগিয়েছো অনাদির সূর্য নীলিমায়।[৪৪]

এই গম্ভীর মন্দ্র উচ্চারণে বোধনের পবিত্রতার সঙ্গে উপলব্ধির তীব্র আন্তরিকতা একাত্ম হয়েছে। কবির প্রেমভাবনা বৃক্ষের মত দিব্য নিলীমার অন্বেষায় উর্ধ্বমুখীন—লৌকিক প্রেমোপলব্ধির সত্যে সংযুক্ত হয়েছে বিশ্বজনীনতা ও লোকোত্তরতার ব্যঞ্জনা। বৃক্ষের প্রতীকটি এদিক থেকে সার্থক। মাটিকে আশ্রয় করে বৃক্ষের যে উর্ধ্বমুখী যাত্রা জীবনানন্দের অন্তর্দৃষ্টির গভীরতা তার মধ্যে খুঁজে পেয়েছে মৃত্তিকা ও নীলিমা, পার্থিব ও স্বর্গীয়, জৈব ও আত্মিক-এর সহজ অন্বয়ের প্রতীকসূত্র। জীবনানন্দের আদ্যন্ত কাব্যসৃষ্টির সঙ্গে পরিচিত পাঠকের কাছে এই বৃক্ষটি সুপরিচিত। 'সুদর্শনা' কবিতাটিতে শুনেছি 'কিন্নরকণ্ঠ দেবদারুগাছে' পঙক্তিটি যে দিব্যরমণীয়তার উদ্ভাস নিয়ে আসে পাঠকের মনে, 'লাবণ্যসাগর থেকে নিজে উঠে জাগানো মহাতরু'টি তারই আরও ব্যঞ্জনাগভীর বিকাশের সাক্ষ্য বহন করে। বৃক্ষের অনুষঙ্গে, 'শ্যামল নীল' বা 'নবহরিত' -এর মত শব্দের প্রয়োগে প্রকৃতি-লালিত জীবনচর্যার ইঙ্গিত; অন্যদিকে, পাখি, শ্বেতহংসী বা সৃষ্টির মরাল-এর চিত্রকল্পগুলি প্রয়াণ ও প্রাগ্রসরমানতার ভাববাহী। সূর্য, নক্ষত্র বা রৌদ্রস্বচ্ছল ভূখণ্ডের প্রতীকে আলোকিত এক নতুন পৃথিবীর অন্বিষ্টের ব্যঞ্জনা। এ সব কিছুর কেন্দ্রে বা এগুলির কোনও একটি আশ্রয় করে বা তাদের হার্দ্য সমন্বয়ে রূপায়িত হয়েছে চিরন্তন এক নারীপ্রতিমা—যার ভালোবাসার ঐশী প্রসাদে মানবচিত্তে অঙ্কুরিত শুভ- প্রয়াণের শক্তি ও প্রেরণা। এভাবেই শুভ ও সুন্দরের প্রেরণায় মানবচেতনার যে দেশকালাতীত অন্বেষা তারই মহত্তর পরিসরে জীবনানন্দের প্রেমভাবনা শেষপর্যন্ত উত্তরিত হয়ে চিরমানবের যুগযুগধাবিত সৌরপ্রয়াণের অংশভাগ হয়ে উঠেছে। কবির ব্যক্তিক প্রেমোপলব্ধির অন্তঃসার লৌকিক ও লোকোত্তরের আততি ও অন্বয়ের মধ্য দিয়ে দিব্যপ্রেরণাস্বচ্ছল হয়েও মর্ত্য-বিমুখীন হতে দেয়নি কবির সৃষ্টিকে। মানুষের পৃথিবীর তথা ঐহিক অভিজ্ঞতার বাস্তবতা থেকেই বৃক্ষের মতো উদ্বর্তিত, উর্ধ্বায়িত হয়েছে তাঁর কল্পনায় মানবের শুভ ও সুন্দরের সৌরচেতনা, যার অন্য নাম, জীবনানন্দের কবিতার ক্ষেত্রে অন্তত, প্রেম।

ইতিহাসের অন্ধকারে প্রথম শিশু মানুষ জাগিয়ে
চলেছে আজো একটি সূর্য হঠাৎ হারিয়ে ফেলার ভয়ে ;
হয়তো, মানুষ নিজেই স্বাধীন, অথবা তার দায়ভাগিনী তুমি ;
ওরা আসে, লীন হয়ে যায়, হে মহাপৃথিবী
সূর্যকরোজ্জ্বল মানুষের প্রেম চেতনার ভূমি।[৪৫]

৪৪। দু'দিকে ছড়ায়ে আছে / শ্রেষ্ঠ কবিতায় (নাভানা) প্রকাশিত।
৪৫। সূর্যকরোজ্জ্বলা /মাসিক বসুমতী, ফাল্গুন, ১৩৫৬।

আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত

সুচেতা মিত্র

বাংলা কবিতাধারায় রবীন্দ্রনাথের পরেই উল্লেখযোগ্য প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ দাশ, এ-কথা উল্লেখ করেছিলেন বুদ্ধদেব বসু। শুধু প্রকৃতির কবি হিসাবেই নয়, আমার তো মনে হয়, রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার অন্তর্ধর্মে ও বহিরঙ্গে জীবনানন্দের কবি ও শিল্পীসত্তার সম্মিলিত চিত্ত যে-বর্ণময় আভা ছড়িয়ে দিয়েছে, সে-আভা একজনমাত্র কবির দ্বারা আর ছড়ানো সম্ভব হয়নি। গবেষক-সমালোচকের বিচারে জীবনানন্দ বাংলা কাব্যের একমাত্র ইম্প্রেশনিস্ট কবি, সুররিয়ালিস্টিক কবি। তাঁর কবিতার বহিরঙ্গে প্রকাশের বহুবর্ণ শিল্পাঙ্গিক ও অন্তরঙ্গে দার্শনিকচেতনার গভীর উপলব্ধিজাত প্রতিক্রিয়া তাত্ত্বিক-বিচারে ধরা পড়তে পারে। কিন্তু তাঁর কবিতার গভীর স্তরে ডুব দিতে চাইলে সচেতন পাঠক কিছু অন্যতর অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করতে পারেন। আমার অভিজ্ঞতাও এক্ষেত্রে তত্ত্বসন্ধানীর নয়, অনুরাগী পাঠকের। জীবনানন্দের কবিতা তার সংগীতগুণ ও আপাত-সরল প্রকাশরীতির দ্বারা পাঠককে অনায়াসে মোহগ্রস্ত করতে পারে। সুরেলা ছন্দ ও শব্দগ্রন্থন-নৈপুণ্য সংগীতের মায়াজাল বিস্তার করে আমাদের অনুভূতিকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ভালো-লাগার অদ্ভুত এক আবেশ আবেগাপ্লুতও করে তোলে। কিন্তু যদি কবিতার যথার্থ অর্থ প্রতি পংক্তি বা চরণ-অনুযায়ী বুঝতে চেষ্টা করি, তাহলে দেখব, এর মায়াবী আকর্ষণে একে যত সরল বলে মনে হয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে ততখানি সরল নয়। আমার তো মনে হয় তার সমকালীন কবিদের মধ্যে তিনি সবচেয়ে জটিল মনের অধিকারী, সবচেয়ে অস্থির মানসিকতার ধারক। শুধু তাই নয়, জীবনানন্দের মধ্যে একই সঙ্গে অনেক বৈপরীত্য (কনট্রাডিকশন) লক্ষ করা যায়। তিনি একই সঙ্গে নৈরাশ্য ও আশাবাদী, প্রেমে আস্থাহীন ও আস্থাশীল, মৃত্যু সম্পর্কে একান্ত সচেতনভাবে কুণ্ঠিত আবার উদাসীন। তিনি কখনও এই পৃথিবীর বাইরে নক্ষত্রলোকের মানুষ, কখনও বা এই পৃথিবীর নিজস্ব জন। কখনও একান্ত বস্তুবাদী আবার কখনও রোমান্টিক। এমনিতর অসংখ্য বিপরীতমুখী অনুভবে জীবনানন্দ কবিহিসাবে বহু সময় আমাদের কাছে দুর্বোধ্য বা অস্পষ্ট। অথচ তাঁর কবিতার শব্দপ্রকরণ ইত্যাদিতে সে-রকম ব্যঞ্জনাধর্মী নতুন ধরনের শব্দ ব্যবহার প্রায় অলক্ষ্য—বা সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বা বিষ্ণু দে-র কবিতায় লক্ষ করি। জীবনানন্দের কবিতার ওপর তলায় কোনও কাঠিন্য স্পর্শ করে না। কিন্তু প্রায় মোলায়েম ওপরতলা, বা সদর পার হয়ে অন্দর মহলে পুরোপুরি প্রবেশের ছাড়পত্র সহজে মেলে না। দেউড়ির পর দেউড়ি, মহলের পর মহল পেরিয়ে ক্রমশই আমাদের এগিয়ে যেতে হয়। অবশেষে অনুভূতির তীব্রতা থাকলে হয়তো অন্তঃপুরের সেই পুরোহিতকে দেখা যাবে—যিনি এই জগতের কাব্যও জীবনধারা থেকে একেবারেই ভিন্ন মার্গের মানুষ।

আমাদের এই আলোচনায়, কবির কাব্যের সেই ভিতরমহলে-প্রবেশের চাবিকাঠি

তাঁরই বিভিন্ন কবিতার অংশ। সেই দিক্ থেকে প্রথমেই জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' গ্রন্থের "নির্জন স্বাক্ষর" কবিতাটি প্রথম কুঞ্চিকা হয়ে ওঠে। ওই কবিতায় কবির আত্মভাবনা প্রকাশ পেয়েছে :

'আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত!—
যে-নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে,—

এখানে বিশেষ করে দুটি শব্দ লক্ষ করতে চাইছি। পুরোহিত ও নক্ষত্র। পুরোহিত, যিনি অগ্রভাগে স্থাপিত হন, তিনি অনেক আগে জীবনের গভীরকে দেখে থাকেন। যাজনকর্তা অর্থ ধরেও বোঝা যায় যে-পুরোহিত জগৎ-জীবনের যজন-যাজন পাঠ করেন ; জীবনানন্দ নিজেকে সেই ঋত্বিকের স্থানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। নক্ষত্র শব্দটি জানিয়ে দেয় জগতের উর্ধ্বলোকের কোনও অনন্ত জগতের ইঙ্গিত। কবি যেহেতু একজন পুরোহিত, যেহেতু জীবনকে সকলের অগ্রভাগে দাঁড়িয়ে দেখার দৃষ্টির অধিকারী তিনি, তাই সাধারণ লোকজীবন থেকে দূরবর্তী মহাজগতের স্পর্শ তিনি পেয়েছিলেন। যে-নক্ষত্র বা যে-মহাজীবন মহতের পথে যেতে গিয়ে মৃত্যুর কবলে পড়তে বাধ্য হয়েছে, তার অনন্ত সম্ভাবনার শীতল পরিণামের অসহনীয় বেদনা কবিকে একান্তভাবে স্পর্শ করে। কারণ কবি যে বড় বেশি অনুভূতিপ্রবণ, বড় বেশি সংবেদনশীল। আমরা জীবনানন্দের কবিতায় নক্ষত্রদিশারী সেই পুরোহিতকে সবার প্রথমে দেখতে পাই। তাঁর কবিতায় নক্ষত্রলোকের কথা কতবার উল্লিখিত হয়েছে। এই কবিতাতেই পাচ্ছি ; 'রাতে-রাতে হেঁটে-হেঁটে নক্ষত্রের সনে,' 'নক্ষত্রের চেয়ে আরো নিঃশব্দ আসনে,' 'পুরোনো সে নক্ষত্রের দিন শেষ হয়,' 'নক্ষত্রের হইতেছে ক্ষয়, নক্ষত্রের মতন হৃদয় পড়িতেছে ঝরে,—সর্বত্র এই নক্ষত্র কবির লক্ষ্য এক মহাজীবন বা মহাজগৎ। কবির পা যদিও পৃথিবীর মাটিতেই ধৃত, তবু তাঁর দৃষ্টি সেই নক্ষত্রের উর্ধ্বলোকেই। তাই তিনি নক্ষত্রের সঙ্গে হেঁটে হেঁটে ফিরেছেন মহাজীবনের আকাঙ্ক্ষার সুবৃহৎ আকুতি নিয়ে, নক্ষত্রের পতনে তেমনি করে বেদনাবিহুল হয়েছেন, তবুও পুরোনো নক্ষত্রের ক্ষয় হলেও তাঁর সান্ত্বনা, নতুনেরা আসন্ন। চারপাশের কত গ্লানি তাঁর ক্লান্তির উদ্বোধক, তবুও তাঁর সৃষ্টি গ্লানিভারে নিরুদ্ধ সংগীত নয়, কারণ,

'পৃথিবীর কানে
নক্ষত্রের কানে
তবু গাই গান।'

এই নক্ষত্রের দিকে কবি শুধু পূর্ণ দৃষ্টি মেলে তাকিয়েই থাকেন না অন্তরে পোষণ করেন একটি সুনিবিড় ইচ্ছাকে—'নক্ষত্রের মত র'ব নক্ষত্রের সাথে।' কবি-পুরোহিতের দৃষ্টি তখন মাটিতে নয়, অনেক ওপরে :

'কোনো এক নক্ষত্রের চোখের বিস্ময়
তাহার মানুষ-চোখে ছবি দেখে একা জেগে রয়।'

কবির সারাজীবনের সন্ধিৎসা আর অস্থিরতা এই বস্তুপৃথিবী ও নক্ষত্রলোকের দ্বৈত-আকর্ষণের কারণে। সেই আকর্ষণের কোনও সমাধান তিনি পুরোপুরি করতেও পারেননি। তাই প্রশ্নে, দ্বিধায় চঞ্চল হয়ে বলেছেন, 'পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ চায় না সে?' এ প্রশ্ন তাঁর আত্মিক প্রশ্ন। তবু মনে হয় কবি যেখানে পুরোহিতরূপে সজাগ, সেখানে একটি নক্ষত্রের ইশারা তাঁকে ধরে রেখেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'অবসরের গান'

কবিতায় যেখানে ফলন্ত পৃথিবীর সঙ্গে কবির আত্মা মিশে গেছে সেখানেও আছে নক্ষত্রের পরিজ্ঞান-প্রসঙ্গ।

জীবনানন্দ রবীন্দ্রোত্তর বাংলা কবিতার আসরে এক বিচিত্র এবং অভিনব ব্যক্তিত্ব। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'কয়েকটি লাইন'-এ কবি অতিরিক্ত আবেগ ও আত্মবিশ্বাসে যে কয়েকটি লাইন তুলে ধরেছেন আমার বক্তব্য প্রসঙ্গে তা বিশেষ করে স্মরণীয় :

'কেউ যাহা জানে নাই—কোনো এক বাণী—
আমি বহে আনি ;
একদিন শুনেছ যে সুর—
ফুরায়েছে,—পুরানো তা—কোনো এক নতুন-কিছুর
আছে প্রয়োজন
তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন
আর নাই কেউ।'

সরল স্পষ্ট বাক্‌বিন্যাসে চরণকটি যা ব্যক্ত করেছেন, তার মধ্যে জীবনানন্দের কবি-ব্যক্তিত্বের সেই বিশিষ্টতা গোপন থাকে নি। কবি তাঁর চিরসন্ধানী মনের ঘাত-প্রতিঘাত নিয়ে বাংলা কবিতার আকাশের গায়ে একটি উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক হয়েই আছেন। কী বক্তব্য-বিষয়ে, কী প্রকরণে, কী মানসিকতায়—জীবনানন্দ এক একক কবিসত্তা আর রবীন্দ্রনাথের পর যার কবিতা পঞ্চাশ বছরের অধিক কাল ধরে বাঙালি পাঠককে মুগ্ধ বিহ্বল করে রাখতে পেরেছে, সে কবির নামও জীবনানন্দই। তাই ওপরের উদ্ধৃতিতে কবি যে-সংবাদটুকু তুলে ধরেছেন, তার মধ্যে তাঁর অহংমন্যতা প্রকাশ পেলেও অসত্য প্রকাশ পায়নি বলা যায়।

কবি তাঁর নিভৃত মর্মলোকের এক জগৎ-স্রষ্টা প্রজাপতি, ভারতীয় আলংকারিকের মতো একথা আমরাও বিশ্বাস করি! কবির সৃষ্টিশীল সত্তায় অনুভূতির সূক্ষ্ম তারে সুরের অনুরণন অহরহ জাগতে থাকে উপরন্তু 'He is by nature abnormally sensitive,'[১] এই সংবেদনশীল কবিচিত্ত যখন বস্তুজীবন অতিক্রম করে আলোকিত জগতের স্পর্শ পেতে চায়, তখন তিনি সাধারণ মানবজীবন, সাধারণ কবিচিত্ত পার হয়ে যেখানে পৌছান, সেখানে তিনি এক ধ্যানযজ্ঞের ঋত্বিক্‌, পুরোহিত। জীবনানন্দ যতখানি কবি, তার চেয়ে অনেক বেশি পুরোহিত। আর এই পুরোহিত কবিসত্তা তাঁর কবিতায় বারবার অতিপ্রকট হয়ে উঠেছে। প্রধানত তিনি লিরিক কবি, কারণ তাঁর ব্যক্তি-অনুভূতেই তাঁর কবিতার একমাত্র বিষয়—সাধারণভাবে অবজেকটিভ বা তন্ময় দৃষ্টি দিয়ে তিনি জগৎ-জীবনকে দেখেন নি। কবিমাত্রই একটি নিজস্ব ধ্যানজগতের পরিমণ্ডলে সৃষ্টিকর্মে নিরত থাকেন : অমিয় চক্রবর্তী-র চেতন স্যাকরার মতো 'অতীব নোংরা গলিতে' নর্দমার দোকান-দেহলিতে বসে তিনি সেই সুন্দরের ধ্যানে নিরত থাকেন। তার চারপাশের পরিমণ্ডল যতই বিসদৃশ হোক, ধ্যানীকবির রূপনির্মাণ তাতে বাধা পায় না। কিন্তু সেই ধ্যানীর লক্ষ্য সোনার সুন্দর, 'রূপোর রূপকার' তৈরি। তার একটা রূপ আছে, লক্ষ্য আছে। সংশয় বা বেদনা থাকলেও তার একটা মূর্তি আছে। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত জীবনের ক্ষণবাদিতাকে স্বীকৃতি দিয়েছেন, জীবনে ও সাহিত্যে লোকায়ত ও লোকোত্তরের মিলন ঘটাতে চেয়েছেন।

১. 'Herert Read, Phases of English Poetry.

প্রেমেন্দ্র মিত্র মানুষের, বিশেষত পীড়িত মানুষের কবি হিসাবে নিজেকে ঘোষণা করেছেন। বুদ্ধদেব বসু রোমান্টিক প্রেমস্বপ্নে বিভোর হয়ে, অসুন্দরের মধ্যেও সৌন্দর্যের আকৃতি জাগাতে চেয়েছেন। অচিন্ত্যকুমার সেনগুপ্তও প্রেম ও নারীর মধ্যে জীবনপিপাসা তৃপ্তির পথ পেয়েছেন। কিন্তু জীবনানন্দ প্রেম, প্রকৃতি, জীবনভোগ এই সবকিছু চেয়েও চাননি। তাঁর দৃষ্টি নিবিড়তায়, তীব্রতায়, গভীরতায় যেন সব কিছুকে স্পর্শ করেও করেনি। এত বেশি গভীর আর ঊর্ধ্বায়িত বলে তাঁর দৃষ্টির ঔজ্জ্বল্য যেন অতিরিক্ত। বড় বেশি নিবিড় আর ইন্দ্রিয়জ বলে তাঁর অনুভূতি যেন অতি প্রখর। বড় বেশি সন্ধানী বলে মনোজগৎ যেন বিস্ময়করভাবে রহস্যময়। যে-মন সর্বদা সতর্ক ও সক্রিয় সেই বাহিরমহলের মন ছাড়াও তার ভিতরমহলের ইনার মাইণ্ডও প্রায় একই সঙ্গে সচেতন। এজন্য তাঁর ভাবনা-চিন্তায় ব্যাপ্তির সঙ্গে জটিলতা ও অস্পষ্টতা জড়িয়ে মিশিয়ে গেছে। বিশাল বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে নিজের জীবনকে মেলে ধরেও কোথায় যেন তাঁর সংশয় কাটতে চায় না ঃ

'রয়েছি সবুজ মাঠে—ঘাসে—
আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে ;
জীবনের রং তবু ফলালো কি হয়
এই সব ছুঁয়ে ছেনে।—'

এই সংশয়ের মূলে আছে তাঁর বাইরের মধ্যবর্তী সেই ভেতরের মন। সেই ভেতরের মন ইন্দ্রিয়জ সমস্ত চেতনার ঊর্ধ্বে পুরোহিতের মতো গভীর আত্মধ্যানের হোমানল জ্বালিয়ে রাখতে চায়। সেখানে কবি স্পষ্ট করে 'প্রেম' শব্দটির উচ্চারণ করলেও তাঁর কয়েকটি কবিতায় বর্ণিত সাধারণ প্রেমের সঙ্গে এই প্রেমের পার্থক্য আছে।

জীবনানন্দ যখন বলেন, 'কোনো এক মানুষীর তরে যেই প্রেম জ্বালায়েছি পুরোহিত হয়ে তার বুকের উপরে!'—তখন সেই প্রেম সাধারণ ইন্দ্রিয়জ প্রেম থেকে কিছু স্বতন্ত্র হয়ে দেখা দেয়। পুরোহিতের যজ্ঞধূমের মধ্য থেকে জাগ্রত সেই হোমানল-সদৃশ প্রেম নক্ষত্র-দৃষ্টি কবির গহন মনের নিভৃত সঞ্চয়। এই সঞ্চয় থাকা সত্ত্বেও কবি প্রেমকে দু-দণ্ডের শান্তি বা 'ধুলো আর কাদা' বলতে পেরেছেন এখানেই তাঁর কবিচেতনার কনট্রাডিকশন। 'পাখিরা' কবিতাটিতে পাখিদের প্রতীকে মানবজীবন ও জৈবিক প্রেমকে তুলে ধরেছেন কবি, কিন্তু সেখানেও শুধু জৈবধর্মই বড় হয়ে ওঠেনি, 'ভালোবাসা আর ভালোবাসার সন্তান' কথাটি গুরুত্ব পেয়েছে। পুরোহিতের হোমানল-সদৃশ ভালোবাসা ও ভালোবাসার সন্তান মানুষের মহৎ সৃষ্টিকে প্রকাশ করতে পারে। এই সৃষ্টিই সম্ভবত কবিভাষার বহু ক্ষেত্রে একটি প্রতীকী শব্দ হিসাবে 'নক্ষত্র' ব্যবহৃত হয়েছে। নক্ষত্র' বলতে কবি মহৎপ্রাণ বা মহৎজীবন এবং মহৎ বা সুন্দর দৃষ্টি-ও কোথাও কোথাও বোঝাতে চেয়েছেন মনে হয়। যেমন 'পাখিরা' কবিতায় কবির অস্থির মনে সুস্থতা এনেছে নক্ষত্রের আলো ঃ

'জানালার থেকে অই নক্ষত্রের আলো নেমে আসে,
সাগরের জলের বাতাসে
আমার হৃদয় সুস্থ হয় ;'

নক্ষত্র কথাটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁর কবিতায় মহৎপ্রাণের প্রতীক হয়ে উঠেছে। 'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতায় তো বটেই, 'স্বপ্নের হাতে' কবিতাতেই তিনি বলেছেন!

'সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব
নক্ষত্রের আয়ু শেষ হয়!'.

কালচক্রের অমোঘ ধ্বংস-লীলার সত্য বুদ্ধদেব বসুকে ব্যথিত করেছে, কারণ সময়ের পরিমিতি দ্বারা কবির প্রেমস্বপ্ন বারবার প্রতিহত হয়েছে। এ জন্য তিনি 'যেখানে মোদের প্রেমের সময় সময়হীন' এমন এক জগতে পৌঁছতে চেয়েছেন (দ্রঃ শেষের রাত্রি, কঙ্কাবতী)। এখানে জীবনানন্দও কালের ধ্বংসকারী, ক্ষয়কারী শক্তির প্রকাশ দেখেছেন নক্ষত্রের মৃত্যুর মধ্যে। সত্যকে উপলব্ধি করেও কবি ঠিক দার্শনিকের স্থিরতায় দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন নি, কারণ মৃত নক্ষত্রের 'বুকের শীত লাগিতেছে আমার শরীরে' এই স্বীকারোক্তিতে কবির অতিরিক্ত অনুভূতিপ্রবণতা সেই পুরোহিতের গভীর জীবনানুভবের বেদনাকেই প্রকাশ করেছে।

জীবনানন্দ তাঁর এই-পুরোহিতসত্তার আরও স্পষ্ট পরিচয় রেখেছেন 'মৃত্যুর আগে' কবিতায়। কবি সকলের আগে জীবনকে দেখেছেন, মৃত্যুকে দেখেছেন। দেখেছেন আরও এক আলোকে—'আমরা বুঝেছি, যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর আরো এক আলো আছে'; সেই আলো কি ওই নক্ষত্রের আলো? না, এ আলো মৃত্যু। পুরোহিত ঋত্বিকের মতো তিনি মৃত্যুকে দেখেছেন : 'চোখের-দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির' : এই আলো মৃত্যু হয়ে এসে দেখা দেয় তারপর, 'একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন ছিল—সোনা ছিল যাহা নিরুত্তর শান্তি পায় ;' মৃত্যুর স্বরূপ তাঁর কাছে ধরা দিলেও অনেক সময়ই মৃত্যুকে তিনি ওই রকম আলোর মতো গ্রহণ করতে পারেন নি। তাঁর মানসিকতার মধ্যে যে-দ্বন্দ্ব ছিল সেই দ্বন্দ্বের পরিচয় 'মহাপৃথিবী' গ্রন্থে 'নিরালোকে' কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে ; 'একবার নক্ষত্রের দিকে চাই—একবার প্রান্তরের দিকে।' বস্তুত জীবনানন্দের কবিতার মূল অর্থ-অনুসন্ধানে পাঠককে যে হোঁচট খেতে হয়, তার অনেকটাই কবিমানসের এই দ্বন্দ্ব-সংকুলতার জন্য। তাঁর কবিতায় যে-বৈপরীত্য বা পরস্পর বিরোধিতার কথা আগে উল্লেখ করেছি এই দ্বন্দ্বও সেই কন্ট্রাডিকশনের জন্য। কবি পুরোহিত ঠিকই, কিন্তু দুই জগতের বা মনোধর্মের ভাবনা বলব, দুই অর্থে। ভাবনা-চিন্তা, জীবন-জগতের চেতনার অগ্রভাগে অধিষ্ঠিত বলে তিনি যেমন পুরোহিত তেমনি স্বর্গ ও মর্ত্যের, নক্ষত্রলোকের ও পৃথিবীর, মহৎপ্রাণের ও সাধারণ মানবজীবনের মধ্যে তিনি যাজকের ভূমিকা গ্রহণ করেছেন এই অর্থেও তিনি পুরোহিত বলে অভিহিত হতে পারেন।

পুরোহিত জীবনানন্দ পৃথিবীর ওপর দাঁড়িয়েও এক মহাপৃথিবীকে প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেই মহাপৃথিবীরপথ মাঝে মাঝে তাঁর কাছে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সাধারণ লোকজগতের মধ্যে তিনি কিছুতেই শান্তি পান নি। নিজের এই একক বিচ্ছিন্ন সত্তাকে তিনি তুলে ধরেছেন 'বোধ' কবিতায় :—

'জন্মিয়াছে যারা এই পৃথিবীতে
সন্তানের মত হয়ে,—
সন্তানের জন্ম দিতে দিতে
যাহাদের কেটে গেছে অনেক সময়,
কিম্বা আজ সন্তানের জন্ম দিতে হয়
যাহাদের ; কিম্বা যারা পৃথিবীর বীজক্ষেতে আসিতেছে চলে
জন্ম দেবে—জন্ম দেবে বলে ;
তাদের হৃদয় আর মাথার মতন
আমার হৃদয় নাকি?—তাহাদের মন
আমার মনের মত নাকি?—'

জৈবজীবনধর্মই যেখানে আত্মপ্রকাশের একমাত্র পথ, সেখানে জীবনানন্দের সঙ্গে লোকসমাজ একীভূত হতে পারে না। যদিও এই লোকজীবনের ওপর তাঁর লোভও কম নয়। 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায় সেই লোভের সুস্পষ্ট প্রকাশ দেখতে পাই : ''আমরা দুজনে মিলে শূন্য করে চলে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।' এই আকাঙ্ক্ষা বা স্বীকৃতির সঙ্গে পূর্ববর্তী আত্মসমীক্ষা বিপরীত মনে হতে পারে। তবে জীবনের ভাঁড়ার শূন্য করে দেবার অর্থ যে-ভোগ, সে-ভোগ নিছক জৈবজীবনধর্ম পালনই নয়, এই ভোগ্যতার মধ্যে আছে কবি-পুরোহিতের মুগ্ধ বিস্ময়বোধ দ্বারা লব্ধ জীবনানুভব। ঠিক এই কারণেই বাংলার মুখের সৌন্দর্যে মুগ্ধ কবি পৃথিবীর রূপ খুঁজতে একেবারেই অনাগ্রহী। যে যেখানে খুশি চলে যাক, কবি বাংলার বুকের ওপর ঘাসের ওপর শুয়ে কাটিয়ে দিতে চান। এই স্থির অনুভূতি বা সত্যলাভের মধ্যে কবি-পুরোহিতের যে-বিস্ময়-বিহ্বল উপলব্ধি নিহিত, আমার মনে হয় কবি-জীবনের অস্থিরতার মূলেও আছে সেই একই পুরোহিতসত্তার প্রক্রিয়া।

জীবনানন্দ সারাজীবন অস্থিরভাবে কোনও কিছু মহাবস্তুর সন্ধানে ঘুরে মরেছেন। হাজার বছর ধরে কবি যে পথ হেঁটে চলেছেন, সিংহল সমুদ্র থেকে অতিদূর নিশীথের মালয় সাগর পর্যন্ত এই যে যাত্রা, মিশর-ব্যাবিলন-এশিরিয়া-ভূমধ্যসাগরের তীরে তীরে ইতিহাসের পর ইতিহাসে এই যে পরিক্রমণ, এ তো সেই সন্ধানী মনের অস্থির তাড়না-জনিত প্রতিক্রিয়া। এই সন্ধানী মনকেই আমি পুরোহিতমন বলতে চাই। সেই মন অসত্যের জগতের কোনও সত্য কোনও প্রাণকে কখনও খুঁজে পেয়েছে, কখনও বা পায়নি। 'শঙ্খমালা' কবিতায় যে-নারী এসে কবিকে আহ্বান জানিয়েছে, সেই নারী কবি-পুরোহিতের দৃষ্টিকে দেখেছে :

> 'বলিল, তোমারে চাই ;
> বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
> খুঁজেছি নক্ষত্রে আমি—কুয়াশার পাখনায়—
> সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
> জোনাকির দেহ হতে—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে'—

কবি-দৃষ্টিতে বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত প্রকাশ—যা নক্ষত্রে, কুয়াশায়, সন্ধ্যার নদীজলে-নামা জোনাকির দেহের আলোর মতোই বেদনা-নিষ্প্রভ। এই বেদনা সেই অন্বিষ্ট বস্তুকে না পাবার বেদনা, এই আলো অন্বিষ্ট বস্তুর উপলব্ধিজনিত আলো। আবার কবি যে-শঙ্খমালাকে প্রত্যক্ষ করেছেন সে নারীও দুর্লভ—'এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।' সেই পৃথিবীর দুর্লভ প্রাপ্তিকে একবারই হয়তো লাভ করেছিলেন। না পেলেও তিনি সন্ধানী। কারণ মানুষের যথার্থ পরিচয় যে শুধু জৈবজীবনধর্ম-পালনের মধ্যেই নয়, এ-সত্য কবিকে অস্থির করে তুলেছে। কবি নিজের মধ্যে মানুষের সেই পূর্ণ শক্তির উৎস দেখেছিলেন। তাঁর নিজের জীবনের অস্থিরতার পরিমাপে বুঝেছিলেন :

> 'অনেক অপরিমেয় যুগ কেটে গেল ;
> মানুষকে স্থির—স্থিরতর হতে দেবে না সময় ;
> সে কিছু চেয়েছে বলে এত রক্ত নদী।'

মানুষের সেই চাওয়ার যথার্থ রূপ কি? কবি শেষ পর্যন্ত সেই বস্তুর স্বরূপ-সন্ধানেই এত অস্থির, এমন উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে ঘুরে ফিরেছেন। 'বোধ' কবিতাতে সেই অস্থির অনুসন্ধানী

মনের চেহারা আমাদের সামনে ধরা দিয়েছে, কিন্তু সেই বস্তু প্রকৃতপক্ষে কি সে কথা কবি স্পষ্ট করে বলেন নি। এক বিশেষ বোধের তাড়নায় তিনি জীবন থেকে জীবনান্তরে ঘুরে ফিরেছেন, তথাপি তার সম্যক্ পরিচয় পেতে পারেন নি। কবি যে যথার্থই একজন পুরোহিত এই-কবিতার প্রথম স্তবকে তা উপলব্ধ :

'আলো-অন্ধকারে যাই—মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়,—কোন্ এক বোধ কাজ করে।
স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয়,
হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়!
আমি তারে পারি না এড়াতে,
সে আমার হাত রাখে হাতে ;
সব কাজ তুচ্ছ হয়,—পণ্ড মনে হয়,
সব চিন্তা—প্রার্থনার সকল সময়
শূন্য মনে হয়,
শূন্য মনে হয়।'

কবি যে পুরোহিত তার বিশেষ প্রমাণ পাচ্ছি প্রার্থনা শব্দের উল্লেখে। হৃদয়ের বোধের তাড়নায় জর্জরিত কবিমনে প্রার্থনার সময়টুকুও শূন্যতায় পর্যবসিত হচ্ছে। প্রার্থনাকারী পুরোহিত তার অন্তরের মানবধর্মের তাগিদে এক অদৃশ্য, অবোধ্য, অব্যক্ত বোধের দ্বারা তাড়িত হতে হতে কেবলই উদ্‌ভ্রান্ত দিশাহারা হয়ে পড়েছেন। এই বোধ কিসের? কোনও বিশেষ জীবনধর্ম বা হৃদয়বৃত্তি বা কর্ম-প্রবৃত্তির কারণে কি এ-বোধের জন্ম? তা যে নয়, এই কবিতায় তা ব্যাখ্যা করে দিয়েছেন কবি নিজেই :

'মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।'

প্রেম-জীবনস্বপ্ন—উচ্চাকাঙ্ক্ষা—জৈবিক চাহিদা কোনও কিছুর চাহিদায় নয়, নক্ষত্রদৃষ্টি কবি-পুরোহিত উদ্বেল প্রশ্নে উচ্চকিত হয়েছেন; 'পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ চায় না সে?' এই বোধের স্বরূপ কি তার যথার্থ উত্তর তিনি পেয়েছেন 'আট বছর আগের একদিন' কবিতায়। এই কবিতায় এক যুবকের আত্মহননের ঘটনাকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে কবি পেয়েছেন কতগুলি সত্যোপলব্ধি। এই যুবকের জীবন ছিল সচ্ছল, জীবনে ছিল বধূর প্রেম ও মনন, ছিল ভবিষ্যতের আশার প্রতীক শিশু, তবুও ফাল্গুনের জ্যোৎস্নার মতো এক বিসদৃশ সময়ে যুবকটি আত্মহত্যার পথ বেছে নিল কেন? সমস্ত জীবজগৎ যেখানে জীবনসুখী, জীবন ভোগের তাড়নায় ব্যাকুল, গলিত স্থবির ব্যাংও যেখানে জীবনের জন্য 'আরও দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে', দুরন্ত শিশুর মুষ্টিবদ্ধ হাতে সামান্য ফড়িংটিও যেখানে বাঁচার জন্য সংগ্রাম করে, সেখানে এই যুবক কেন এমন মড়কের ইঁদুরের মতো লাশকাটা ঘরের টেবিলে শুয়ে থাকার পথ বেছে নিল। কবি শেষ পর্যন্ত সমস্ত ঘটনার সমীকরণ দ্বারা যে-সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা হল :

'জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—।
আরো-এক বিপন্ন বিস্ময়

আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;

মানুষ তার অন্তর্গত রক্তের বিপন্নবিস্ময়ের তাড়নাতেই শেষ পর্যন্ত অস্থিরতর হতে হতে ক্লান্তির চরম পরিণাম ঘটায় আত্মহননের মধ্যে। অন্তর্গত রক্ত বলতে এখানে মানুষের অবচেতন মনের আকুলতাকেই সম্ভবত বোঝানো হয়েছে। কারণ বিপন্ন-বিস্ময় বা বোধ কোনও শব্দ দ্বারাই এই আকুলতার মূল বা রূপ ধরা পড়ে না। অবচেতন মনের আকুলতাকে পুরোহিত জীবনানন্দ অনুভব করলেও সেই অন্তরতর মনের ইচ্ছার চেহারা স্বাভাবিকভাবেই তাঁর কাছে অজ্ঞাত। তবু এটুকু জানাও তো সন্ধানী পুরোহিতের জানার সশ্রম পরিণতি।

জীবনানন্দের কাব্যসাধনার একটা বৃহৎ অংশ বেদনার সুরে ম্রিয়মাণ। কবি যদিও বস্তুজীবন ও জগৎকে অস্বীকার করেন নি, তবু মনে হয় তিনি এই পৃথিবীর সাধারণ ধূলি-মাটির মানুষ নন। কবিজীবন অবশ্য রূঢ় বস্তুধর্ম থেকে সরে এসে অন্যতর মহৎ জীবনের স্বাদ চায়। তার দৃষ্টান্ত দেখছি সমকালীন সব কবির মধ্যেই। বুদ্ধদেব বসু আক্ষেপ করে বলেছেন ঃ

বিধাতা জানো না তুমি কী অপার পিপাসা আমার
অমৃতের তরে।

কৃমিঘন পঙ্কসারে নিমজ্জিত থেকেও তিনি নিজেকে শাপভ্রষ্ট দৈবশিশু মনে করেছেন। অমিয় চক্রবর্তী-র 'চেতন স্যাকরা' অতীব নোংরা গলিতে বসে বানিয়ে চলেছে তার ধ্যানের জগতখানি। বলাবাহুল্য, এই চেতন স্যাকরার প্রতীকের আড়ালে আছে কবির নিজস্ব স্রষ্টা মন। প্রেমেন্দ্র মিত্র-ও প্রাণেশ্বরী পরমা যন্ত্রণার—কবি-সৃষ্টির ব্যথায় উদ্বেল হয়েছেন। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ক্ষণজীবনের দার্শনিকতায় বিশ্বাসী হয়েও লোকায়তের সঙ্গে লোকোত্তরের মিলন-সাধনা করতে চেয়েছেন। অন্যবল্লভা প্রেমিকার প্রেমে ব্যর্থ হয়েও নিজের প্রেমকে সম্মানিত করেছেন দুই চরণে ঃ

সে ভোলে ভুলুক, কোটি মন্বন্তরে
আমি ভুলিব না, আমি কভু ভুলিব না।'

কবিরা এ-ভাবেই বস্তুজীবন থেকে বস্তু-অতীত জীবনে, মহৎ জীবনে উত্তীর্ণ হতে চেয়েছেন। তবু জীবনানন্দ এঁদের সমগোত্রীয় বলে মনে হয় না। তাঁর দৃষ্টি, চিন্তা, ধ্যান, অনুভূতি, প্রচেষ্টা—সবই অনেক বেশি ঊর্ধ্বায়ত। লোকজীবনে এসে, ফলন্ত মাটির গন্ধ গায়ে মেখে পৃথিবীর ভাঁড়ার আগ্রাসে পান করলেও তিনি প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীর কেউ নন। তাঁর নিজের স্বীকৃতিই এখানে আমাদের বোঝার পক্ষে যথেষ্ট ঃ

'নক্ষত্রের পানে যেতে-যেতে
পথ ভুলে বার-বার পৃথিবীর ক্ষেতে
জন্মিতেছি আমি এক সবুজ ফসল।'—

কবি আসলে নক্ষত্রচারী পুরোহিত, কিন্তু পৃথিবীর অমোঘ আকর্ষণে বারবার সবুজ ফসল হয়ে মাটির রস পান করে চলেন। রবীন্দ্রনাথ বলাকার সাত-সংখ্যক কবিতায় শাজাহানের জীবনসত্যের মধ্য দিয়ে যে-গতির কথা ব্যক্ত করেছেন, এখানে আমরাও জীবনানন্দের

পক্ষে সেই গতিতত্ত্বই প্রয়োগ করে দেখতে পারি। মর্ত্যজীবনের মধ্য দিয়ে মানুষ মহাজীবনের পথে যাত্রা করে। পান্থশালার বিশ্রামার্থী পথিকের মতো দু-দিনের মর্ত্যজীবন তাকে ক্ষণকালীন স্থিরতায় বাঁধে। কিন্তু তার অনন্ত যাত্রা তাতে শেষ হয় না। শেষ পর্যন্ত 'জীবন-উৎসব-শেষে' এ পৃথিবীকে 'মৃৎপাত্রের মতো' দুই পায়ে ঠেলে যেতে হয়। জীবন তো ধরে রাখার বস্তু নয়—

'আকাশের প্রতি তারা ডাকিছে তাহারে
তার নিমন্ত্রণ লোকে লোকে
নব নব পূর্বাচলে আলোকে আলোকে।'

সেইজীবন

'চলিয়াছে রাত্রির আহ্বানে
নক্ষত্রের গানে
প্রভাতের সিংহদ্বারপানে।'

জীবনানন্দও এই নক্ষত্রের গানে উর্ধ্বলোকের আলোর সন্ধানী পথিক। তাঁর যাত্রা এই পৃথিবীর পথে পথে হলেও 'নক্ষত্রের সাথে হেঁটে হেঁটে' দুদিনের জন্য পৃথিবীর সবুজ ফসল হয়ে জন্মানোর ফলে পৃথিবীর 'ফসলের স্তন আঙ্গুলে নিঙাড়ি' নিয়েছিলেন কবি। তাই তাঁর পিপাসা অফুরন্ত। অথচ পৃথিবীর ধুলো আর কাদা নিয়ে 'চাষার মতন বীজ বুনে আর স্বাদ কই?' তাই দুই-জগতের মধ্যবর্তী এক পুরোহিত হয়ে কবি কেবলই আনেন নক্ষত্রের সংবাদ ঃ

'আজ এই জ্যোৎস্নায় কাহারে জানাই
আমার এ বিস্ময়—বিস্ময়ের ঠাঁই
নক্ষত্রের থেকে এল ;'

বিস্ময়ের সঙ্গে বেদনার সংমিশ্রণে জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতি গড়ে উঠেছে বলা যায়। জ্যোৎস্নায় রাত্রির আকাশে, শস্যময় প্রান্তরে মেঠো চাঁদে, প্রকৃতিতে, প্রেমে—সর্বত্রই কবির বিস্ময় ছড়িয়ে পড়েছে। বুনো হাঁসের পাখার আন্দোলনে দূরের 'বুনো মোরগের বুকে তাই এই রাতে জেগেছে বিস্ময়',—এই বিস্ময় কবিপ্রাণের বিস্ময়ের সঙ্গে সমসূত্রে বাঁধা। জীবনের সঙ্গে মহাজীবনের আকর্ষণে এই বিস্ময় আরও নিবিড় হয়ে উঠেছে। বিস্ময় যেমন কবিপ্রাণের অঙ্গাঙ্গী চেতনা,তেমনি বেদনাও আছে তার প্রকৃতির সঙ্গে জড়িয়ে। জীবন, জীবনের সব কিছু যে ফুরিয়ে যায়, ঝরে—মরে যায়—এ বেদনা কবিকে নিত্য ব্যথিত করে তুলেছে। বাংলার সৌন্দর্যের যে-বিস্ময় তার রূপ-রঙ-গন্ধ নিয়ে তাঁর কাছে বিস্ময়কর অদ্বিতীয় বলে মনে হয়েছে—সেখানে ব্যথা একটি বিশেষ গুণ। সময়ের ডানা ছিঁড়ে ব্যথা, ক্ষুধা হয়ে ব্যথা মানুষের ব্যথা ব্যথিত গন্ধের ক্লান্ত নীরবতা, বেদনার গন্ধ— সব অনুভব করেছেন কবি। এই বেদনার সঙ্গে বিস্ময় জড়িয়ে কবি-দৃষ্টি কখনই বস্তুবাদী হয়ে ওঠে নি। যে-বেদনা তাঁকে জীবনবিমুখ করে তুলতে পারত, সেই বেদনাই করে তুলেছে জীবনমুখী। কারণ জীবনানুভবে তিনি এমনই এক বিস্ময়কে লাভ করেছেন যে, সে-বিস্ময় তাঁকে জীবন থেকে পালাতে দেয়নি। পাড়াগাঁর পথের বিস্ময়, জীবনের রঙ ছুঁয়ে-ছেনে যে-বিস্ময়, পাখ-পাখালির রবে যে-বিস্ময়—সেই বিস্ময় তাঁকে বেদনার মধ্যেও দিয়েছে বেদনাভরা সুখ। ফলে নৈরাশ্যবাদী না হয়ে কবি হয়েছেন আশাবাদী। জীবনানন্দকে পুরোহিত বলার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নৈরাশ্যবাদিতার দিক্‌টি স্বভাবতই সরে

যাবে। যে-কবি বারবার পৃথিবীর, মানুষের, নারীর, প্রকৃতি ও জীবজীবনের গভীর অসুখ ও বেদনার স্পর্শ পেয়েছেন, সেই কবি কার্যকারণ-সূত্রেই নৈরাশ্যবাদী হতে পারেন। অথচ জীবনানন্দ কোথাও কোথাও নৈরাশ্যের পরিচয় দিলেও তিনি নৈরাশ্যবাদী হন নি শেষ পর্যন্ত। কারণ তাঁর ঐ পুরোহিত সত্তা। কবি দেখেছেন পৃথিবীর আপাত সৌন্দর্যের আড়ালের অসুন্দরকে—'রূপ ঝরে যায় তবু করে যারা সৌন্দর্যের মিছা আয়োজন' তাদের। দেখেছেন সুন্দরী নারীকে ঃ

'ব্যর্থতা লুকায়ে রাখে বুকে,
দিন যায় যাহাদের অসাধে,—অসুখে।—
দেখিতেছিলাম সেই সুন্দরীর মুখ,
চোখ ঠোঁটে অসুবিধা,—ভিতরে অসুখ!'

পুরোনো প্রেমিকার সাক্ষাতেও তিনি এমনি দেখেছেন ঃ 'সব বাসি—সব বাসি, —একেবারে মেকি!' এই নৈরাশ্যবাদ তাঁর 'ক্যাম্পে' কবিতাতেও লক্ষণীয়। সেখানে পুরুষ-হরিণের প্রতীকে কবি নিজেকেই দেখেছেন, নিজের সামগ্রিক ব্যর্থতাকে। যেমন ঃ

'মৃত পশুদের মত আমাদের মাংস লয়ে আমরাও পড়ে থাকি
বিয়োগের—বিয়োগের—মরণের মুখে এসে পড়ে সব
ঐ মৃত মৃগদের মত—।
প্রেমের সাহস-সাধ-স্বপ্ন লয়ে বেঁচে থেকে ব্যথা পাই,
ঘৃণা-মৃত্যু পাই;
পাই না কি?'

'সিন্ধুসারস' কবিতায় পৃথিবীকে আনন্দ জানিয়ে যে-সিন্ধুসারসের দল তাদের সাদা পাখার মুক্ত স্বাচ্ছন্দ্য গতিকে প্রকাশ করেছে, তাদের প্রতি বেদনাহত কবি মানুষের নিরানন্দ সত্তার সংবাদ জানিয়ে দিয়েছেন—'এই বর্তমান হৃদয়ে বিরস গান গাহিতেছে আমাদের —বেদনার আমরা সন্তান।' কবির বেদনা যেন সেই নৈরাশ্যেরই ধারক। পৃথিবীর সৌন্দর্যও বস্তুসত্যের রূঢ়তায় তার স্বরূপ বিসর্জন দিয়ে চলেছে—'সৌন্দর্য রাখিছে হাত অন্ধকার ক্ষুধার বিবরে';—এ-বেদনা কবির আশাবাদকে সরিয়ে দিতে চায়। মনে হতে পারে কবির কাছে এই সভ্যজগৎ, এই বর্তমান যন্ত্রসভ্যতা সব কিছু যন্ত্রণাকর অনুভূতিমাত্র। শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর-এর যে-সভ্যতাকে তিনি দেখেছেন, সে-সভ্যতা, সে-জীবন তাঁকে কী আশ্বাস দিতে পারে? কিন্তু তা সত্ত্বেও আমি বলব জীবনানন্দ আশাবাদী। কবি-পুরোহিতের সেই আশাবাদিতার একটা বড় লক্ষণ তাঁর শান্তিকামী মন। পুরোহিতের মন্ত্রোচ্চারণের মতোই তিনি শান্তিপাঠ শোনাতে চেয়েছেন—কখনও নিজের আত্মাকে কখনও পৃথিবীর মানুষকে—পাঠককে। তাঁর কবিতার সেই শান্তিকামনার দিকগুলি সন্ধান করা যাক।

জীবনানন্দের কাছে মৃত্যুও শান্তি বলে মনে হয়েছে, তাঁর পূর্বসূরিদের মতো। কিন্তু সেই মৃত্যুই তাঁর কাছে একমাত্র শান্তি নয়। শান্তির যথার্থ রূপ কি কবি তাঁর সন্ধানে নিজেকে বিরত রেখেছেন—যার দৃষ্টান্ত দেখি ঃ

'...আমারো হৃদয় আজ চুপ হয়ে শুধু রং ঘ্রাণ
শুধু শান্তি—নিঃশব্দতা—আবিষ্কার;'

এই-আবিষ্কারের মধ্যে দিয়েই কবি জেনেছেন মৃত্যুতে যেমন শান্তি 'একদিন পৃথিবীতে স্বপ্ন

ছিল সোনা ছিল যাহা নিরুত্তরে শান্তি পায় ;' তেমন শান্তি আছে প্রেমে ও জীবনভোগে। পুরোহিতের মতোই কবি উর্ধ্বস্থান থেকে মন্ত্রের মতো উচ্চারণ করেছেন এক শান্তিবাণী :

'আমার জীবন এই ; তোমারো জীবন তাই; এইখানে পৃথিবীর পর
এই শান্তি মানুষের ; এই শান্তি।'

প্রেম কবিকে ব্যথিত করেছে, বিহ্বল করেছে। প্রেমিকার রূপ, দেহ, স্মৃতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে বেদনার সঙ্গে সঙ্গে কবি লাভ করেছেন শান্তি। 'তবু শেষে শান্তি এল মনে' এই স্বীকৃতি দ্বারা তাঁর শান্তিচেতনা স্পষ্ট হয়ে উঠল আমাদের কাছে। আবার কখনও কখনও কবি-পুরোহিত তাঁর নক্ষত্রদৃষ্টি তুলে শান্তি সন্ধান করেছেন :

সন্ধ্যার নক্ষত্র, তুমি বলো দেখি কোন পথে কোন ঘরে যাব!
কোথায় উদ্যম নাই, কোথায় আবেগ নাই,—চিন্তা স্বপ্ন
ভুলে গিয়ে শান্তি আমি পাব?'

তারপর নক্ষত্রের ইশারা ধরে কবি উত্তরও পেয়েছেন, 'তোমারি নিজের ঘরে চলে যাও'— কবি দেখেছেন এই লোকজীবনের মধ্যে, অন্ধকারের মধ্যেও 'শান্তি তার রয়েছে সম্মুখে।'

জীবনানন্দের এই শান্তিচেতনার উজ্জ্বল পরিচয় ছড়িয়ে আছে তাঁর 'রূপসী বাংলা' কাব্যের সনেটগুলিতে। বাংলার রূপসৌন্দর্যের মধ্যে কবি খুঁজে পেয়েছেন বিস্ময় ও বেদনার সঙ্গে একজাতীয় শান্তি—'এখানে ঘুঘুর ডাকে অপরাহ্ণে শান্তি আসে মানুষের মনে;'—সর্বত্র খুব স্পষ্ট করে শান্তি শব্দটি প্রযুক্ত না হলেও কবির গভীর শান্তি-অনুভব সব কটি কবিতার মধ্যেই ছড়ানো, যার ফলে কবি বলতে পেরেছেন 'আমি হৃষ্ট কবি আমি এক ;' প্রকৃতির অনাবিল শান্তির মধ্যে কবির নিজস্ব শান্তি মিলে-মিশে একাকার হয়ে গেছে। বাংলার শান্ত নীরব স্নিগ্ধ সৌন্দর্যই কবিপ্রাণের প্রশান্তির ধারক।

জীবনানন্দকে পুরোহিত-কবি বলে গ্রহণ করতে গেলে তাঁর কাব্যপ্রকরণ-প্রসঙ্গটিও অনুল্লেখ্য থাকার কথা নয়। জীবনানন্দ কবিপ্রতিভার মূলানুসন্ধানে লিপ্ত হয়ে জানিয়েছেন : "সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি;—কেন না তাদের হৃদয়ে কল্পনার এবং কল্পনার ভিতরে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সারবত্তা রয়েছে এবং তাদের পশ্চাতে অনেক বিগত শতাব্দী ধরে এবং তাদের সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক জগতের নব নব কাব্য-বিকিরণ তাদের সাহায্য করছে। সাহায্য করছে ; কিন্তু সকলকে সাহায্য করতে পারে না ; যাদের হৃদয়ে কল্পনা ও কল্পনার ভিতরে অভিজ্ঞতা ও চিন্তার সারবত্তা রয়েছে তারাই সাহায্য প্রাপ্ত হয় ; নানা রকম চরাচরে সম্পর্কে এসে তারা কবিতা সৃষ্টি করবার অবসর পায়[১]।" কবিকথিত এই বিশ্লেষণসূত্রে কবিতার স্বরূপ ও কবিসৃষ্টির স্বরূপ সম্বন্ধে এই ধারণাই জন্মায় যে, কবিতা-রচনার অধিকারী সেই বিশেষ স্রষ্টা, যাঁর হৃদয়ে কল্পনার সঙ্গে চিন্তা ও অভিজ্ঞতার সাযুজ্য আছে এবং সেই চিন্তা ও অভিজ্ঞতা প্রাচীন ও আধুনিক দুই যুগের আলোকস্পর্শে পরিশুদ্ধ হয়েছে। এমন একজন প্রতিভাবান স্রষ্টাই নানা জাগতিক সম্পর্কের পথ ধরে যথার্থ কবিতাসৃষ্টির অধিকারী হতে পারেন। কবি মনে করেছেন কবিতাসৃষ্টির জন্য প্রয়োজন এক বিশেষ মুহূর্তের। যে-সব পদ্য রচনার মধ্যে লোকশিক্ষা বা সমাজশিক্ষার নানা চিন্তা ও মতবাদের ব্যায়াম ও প্রাচুর্য পাঠকের আনন্দের পরিবর্তে আঘাতই দেয়, তেমন রচনা কবিতানামচিহ্নের ধারক নয়। কবি তাঁর ব্যক্তিজীবন ও সৃষ্টি

১. জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা।

অভিজ্ঞতার একটি স্ফুলিঙ্গ তুলে ধরেছেন ওই একই রচনায় : "আমাকে অনুভব করতে হয়েছে যে, খণ্ড-বিখণ্ডিত এই পৃথিবী, মানুষ ও চরাচরের আঘাতে উত্থিত মৃদুতম সচেতন অনুনয়ও এক এক সময় যেন থেমে যায়,—একটি পৃথিবীর অন্ধকার-ও-স্তব্ধতার একটি মোমের মতো জ্বলে ওঠে হৃদয়, এবং ধীরে ধীরে কবিতা-জননের আস্বাদ পাওয়া যায়।" কবি-হৃদয়ে মোমের মতো জ্বলে-ওঠা এই মহূর্তটি যেই কবি-হৃদয়কে ছেড়ে যায় 'সে সব মুহূর্তে কবিতার জন্ম হয় না',— যা হয় তা পদ্য। জীবনানন্দের কবিভাষ্যকে আর একটু ব্যাখ্যা করে বলা যায় বহুকালের চিন্তা ও অভিজ্ঞতা আধুনিক জীবনের আলোক বিকিরণের দ্বারা বিশুদ্ধ হয়ে কবিকল্পনাকে পরিপুষ্ট করে যখন বিশেষ এক সৃষ্টিমুহূর্তের বাতাবরণ প্রস্তুত করে, তখন জন্ম হয় বিশুদ্ধ কবিতা। এই কবিসত্য বা কবি-লব্ধ সত্য প্রকৃতপক্ষে পুরোহিতের লব্ধ সত্য। এই কারণেই সমকালীন কবিদের কল্পনা চিন্তা উপলব্ধির সঙ্গে জীবনানন্দের কবিসত্তার অমূল পার্থক্য ধরা পড়ে। কবি যখন বস্তুবাদী হন, তখন তিনি বস্তুসত্যের ঊর্ধ্বে যেতে চাইলেও, বস্তুবাদিতাই তাঁর ভিত্তি। তেমনি রোম্যান্টিক কবি বস্তুবাদিতাকে অস্বীকার না করলেও, তাঁর কবিতার মূলে রোমান্টিসিজ্‌ম্ স্থির থাকে। জীবনানন্দের কবিতায় যে এই সবগুলি ভাবানুভূতি একাকার হয়ে গেছে এবং চেতন-অতিচেতন মনের চিন্তার মিশ্রণে কবিতাভাবের মধ্যে জটিলতা দেখা দিয়েছে সে-কথা আগেই বলেছি। লক্ষ করার বিষয় এই, জীবনানন্দের পুরোহিতসত্তা তাঁর কবিতার আঙ্গিকের মধ্যেও সমান ভাবে প্রকাশমান। কবির মানসিকতার মধ্যে যেমন কনট্রাডিকশনের পরিচয় পেয়েছি, তেমনি পেয়েছি তাঁর শব্দব্যবহারপদ্ধতিতে। 'সকলেই কবি নয়, কেউ কেউ কবি' এই বিশ্বাসে জীবনানন্দ কবিতার যে জনন-ইতিহাসকে সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন তার মধ্যে এই সত্যও সম্ভবত নিহিত ছিল—'poetry springs from the contradiction between the instincts and experience of the poet'[২]। এই কারণে তাঁর কবিতায় শব্দব্যবহারেও বৈপরীত্য একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। শব্দপ্রয়োগের ক্ষেত্রে তৎসম বা সাধু শব্দ যেমন ব্যবহার করেছেন, তার পাশে তেমনি হঠাৎ একটি একান্ত লৌকিক দেশজ শব্দকে নিয়ে এসেছেন অদ্বিধায়। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে সব সময়ই প্রায় সাধুরীতির অনুকরণ করেছেন তিনি। 'বরফের মতে চাঁদ ঢালিছে ফোয়ারা' 'সহজ লোকের মত কে চলিতে পারে!' 'আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই,' 'কোথাও হরিণ আজ হতেছে শিকার,' 'সমুদ্র গাহিবে গান বহুদিন,' 'যখন যাইব চলে আরবার আসিব কি আমি,' 'আমরা মৃত্যুর আগে কি বুঝিতে চাই আর?' 'বলিল নক্ষত্র চুপে হেসে'—'সৌন্দর্য রাখিছে হাত,' 'যেখানে রুপালি জ্যোৎস্না ভিজিতেছে,' 'কোনোদিন জাগিবে না আর,' 'আমারে কুড়ায়ে নেবে,' 'যেদিন সরিয়া যাব তোমাদের কাছ থেকে,' 'আসিয়াছে শান্ত অনুগত,' 'কাঁদিবে সে সারারাত'—এমনি অজস্র উদাহরণ তুলে ধরা যায়। যেখানে সাধু ক্রিয়াপদের সরাসরি প্রয়োগ করেন নি, সেখানে সাধু বাক্‌রীতি থেকে গেছে কয়েকটি বিশিষ্ট প্রয়োগে। যেমন—'আমারেই পাবে তুমি ইহাদের ভিড়ে,' 'ইহারা আমারে ভালোবাসে,' 'সজিনার ডালে পেঁচা কাঁদে,' 'বুঝি নাকো চিল কেন কাঁদে,' 'পাব নাকো তারে কোনো পৃথিবী নিঙাড়ি?', 'আশ্চর্য বিস্ময়ে আমি চেয়ে রব,' 'শান্তি লেগে রয়,' 'শটিবন চুমি,' 'শুধাই, শুন লো,' 'আমি এই সমুদ্রের পারে চুপে থামি,' 'হামাগুড়ি দিয়ে তুমি পিছে পিছে আস,' 'আজ শুধু দেহ—আর দেহের পীড়নে সাধ মোর,' 'আজো তারে যায় নাই ছুঁয়ে,'

২. Christopher Caudwell, Illusion and reality.

'তাহারাও তোমার মতন,' ইত্যাদি। জীবনানন্দের এই সাধু ক্রিয়াপদযুক্ত বিশিষ্ট বাক্‌রীতি প্রধানত পূর্ববঙ্গীয়, যা ভাষাতাত্ত্বিক বিচারে বঙ্গালী উপভাষার অন্তর্গত—তার প্রভাবজাত। পিছলায়ে, ঝিমায়ে, থুতনি, শেমিজ, ছেঁড়া ফাঁড়া, হাতখান গাড়ল, ঘুঁজি, ঠ্যাঙ, ঘাই হরিণ, বিয়ানো, ডাঁট, হুঁচোট, ফেঁসে যায়, ফোঁপরা, ঝাঁঝরা আঢুল, ফিক করে, বালটি, শ্যালা, আঁশটে, ক্ষুদ-কুঁড়া, গেঁয়ো, ঢের, লালপেড়ে, পায়চারি, ঝাড়ফুঁক, পাট্‌কিলে, দু-পহর, বিনুনি, ক্ষীরুই, কলায়ে গেছে, সোঁদা, জুলজুল, কস্তা পাড়,—এই শব্দগুলি অধিকাংশ বঙ্গালী উপভাষার নিজস্ব শব্দভাণ্ডারের সঞ্চয়। জীবনানন্দ শব্দব্যবহারের সময় সাধু তৎসম শব্দের পাশে এই জাতীয় গ্রাম্য—যা কখনও মনে হতে পারে স্থূল, অনায়াসে ব্যবহার করে গেছেন। নতুন শব্দসৃষ্টি-প্রয়াস তাঁর কবিতায় নেই বললেই চলে, নক্ষত্র, আকাশ, সমুদ্র, গহ্বর, নির্জন, অবসাদ, ব্যর্থতা, শান্তি, প্রেম, ঘ্রাণ, স্পষ্টতা—এমনি কতগুলি শব্দ অনেক বেশিবার প্রযুক্ত হয়েছে। ইংরেজি শব্দও তিনি কম ব্যবহার করেন নি। গভীর গম্ভীর বিষয়ের বর্ণনা প্রসঙ্গেও আকস্মিক একটি লোকায়ত শব্দ ব্যবহার করেছেন—যা কবিবক্তব্যের সমর্থনের জন্য একান্ত প্রয়োজনীয় মনে হয়। যে-শব্দ আপাতভাবে অশোভন বা অসুন্দর মনে হয় পাঠকের, জীবনানন্দের কবিতায় তা কী আশ্চর্যভাবে মানানসই হয়ে উঠেছে। উদাহরণ দিচ্ছি ঃ

> 'যে-যৌবন ছিঁড়ে বেড়ে যায়
> যারা ভয় পায়
> আয়নায় তার ছবি দেখে।' অথবা
> 'থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—
> সব বাসি—সব বাসি,—একেবারে মেকি।'

নারীরূপের জীর্ণ কঙ্কালখানি এভাবেই টেনে বার করেছেন কবি। কিংবা হেমন্তের আসন্নপ্রসবা ধরিত্রীর রূপবর্ণনায় দেখি ঃ

> ''আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এপারে
> বিয়োবার দেরি নাই,—রূপ ঝরে পড়ে তার,—
> শীত এসে নষ্ট করে দিয়ে যাবে তারে।'

অন্যত্র বিকৃতির মধ্যেও জীবনধারণের আসক্তি বোঝাতে—বলেছেন ; 'গলিত স্থবির ব্যাঙ আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে' বা 'রক্ত ক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের ফিরে যায় মাছি,'—আরো দৃষ্টান্ত দেওয়া যায় যেখানে কবিব্যবহৃত শব্দগুলি সাধারণ বোধ ও ধারণা-অনুসারে সুন্দর বা সুশ্রাব্য নয়। কিন্তু জীবনানন্দের কবিতায় ওই সব শব্দ সুন্দর-অসুন্দরের ঊর্ধ্বে উঠে প্রমাণ করেছে যে, '...any word well-eshtablished in its own language is either beautiful or ugly;'[১] এই প্রয়োগপদ্ধতি এবং কবির শুচিবায়ুহীন মানসিকতাও প্রমাণ করে কবির পুরোহিত সত্তাকে। শব্দ তাঁর কাছে সর্বপাপহর অগ্নির[২] মতোই পরিশুদ্ধ। শুধুমাত্র নির্বাচন ও বিন্যাসকুশলতায় সে জ্বলে ওঠে, অর্থঘনত্ব এবং ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করে।

জীবনানন্দের কবিভাষার একটি বড় অংশ তার সংগীতধর্ম। কবিতার সংগীত তার

১. T. S. Eliot. Selected prose.
২. শঙ্খ ঘোষ, নিঃশব্দের তর্জনী

অর্থ-ধ্বনি-ব্যঞ্জনা-ছন্দ সবকিছু বহন করে এ-সবের চেয়ে স্বতন্ত্র এক কাব্য-প্রকরণ। রাগ-রাগিণীর বিস্তার যেমন ভাষাহীন সুরের আরোহণ-অবরোহণের মধ্য দিয়ে সূক্ষ্ম মায়াজাল সৃষ্টি করে, কবিতার সংগীতও অনেকাংশে তাই। তবে সংগীতের বিশিষ্ট প্রকরণ তার অর্থ থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। জীবনানন্দের কবিতার সংগীতধর্ম ছন্দের ধ্বনিস্পন্দনজনিত তরঙ্গভঙ্গে নয়, কথায়, শব্দে, অর্থে ও ব্যঞ্জনায়। সংগীত হল আর্টের এক বিশিষ্ট প্রক্রিয়া। যাকে অনেকেই মনে করেন 'the typically perfect art'[৩], কবির 'বোধ' কবিতার কয়েকটি পংক্তি উদ্ধৃত করে বুদ্ধদেব বসু এর সংগীতধর্ম সম্পর্কে ইঙ্গিত করেছিলেন।[৪] সেই অংশটুকু উদ্ধার করছি :

> 'বলি আমি এই হৃদয়েরে :
> সে কেন জলের মত ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়'

বস্তুত, মাত্র দুটি লাইনে কবি-আত্মার নিঃসীম একাকীত্বের যে-বেদনা বা বিচ্ছিন্নতার গহন-গভীর বিস্ময় প্রকাশ পেয়েছে তার মূলে আছে ওই সংগীতধর্ম—যা কবিতার ব্যঞ্জনা ও অর্থের সঙ্গে বিজড়িত। এ রকম সংগীতগুণ তাঁর আরও অসংখ্য কবিতায় পাব। 'বনলতা সেন' কবিতার সুপরিচিত লাইনকটি—'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' তো বটেই, 'শঙ্খমালা' কবিতার—

> 'চোখে তার
> যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার
> স্তন তার
> করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র-কবেকার শঙ্খিনী মালার।'

অথবা 'নির্জন স্বাক্ষর' কবিতার :

> 'আমি চলে যাব তবু জীবন অগাধ
> তোমারে রাখিবে ধরে সেই দিন পৃথিবীর পরে ;—
> আমার সকল গান তবুও তোমারে লক্ষ্য করে।'

এই সব উদ্ধৃতি তার বাচ্যার্থ ছাড়িয়ে যেমন বিশেষ ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করেছে, তেমনি অদ্ভুত এক সুরের ধ্বনিময়তায় কবিভাবকে যেন সুদূরাভিসারী করে তুলেছে। অনুভবের এই দীপ্তিতে তাঁর কবিতা যতখানি অন্তরে-লব্ধ অপ্রকাশ্য ভাবানুভূতি, ততখানি বোধ্য বিষয় নয়। তাঁর কবিতার এই সংগীতগুণও তাঁর পুরোহিত-সত্তার অন্যতম ধারক।' বৈদিক ঋষি সামগানের মধ্য দিয়ে তাঁর হোতা পুরোহিত-পরিচয় বিধৃত করে গেছেন। জীবনানন্দও তাঁর কবিতার মধ্যে সংগীতগুণ সঞ্চারিত করে সেই পুরোহিতের উত্তরসাধক হয়ে দেখা দিয়েছেন।

জীবনানন্দের কবিতার সংগীতধর্মকে প্রকাশ করতে সহায়তা করেছে তাঁর বিশেষ ধরনের নূতন উপমারীতি ও ছন্দোপ্রকরণ। প্রথমে উপমার বিশিষ্টতার দিকে সংকেত করতে চাই। বাংলা কবিতায় প্রথাসিদ্ধ অলংকরণ-রীতি ভঙ্গে আধুনিক কবিদের যে-অবদান, সেখানে জীবনানন্দ প্রাথমিক উচ্চারিত নাম। তাঁর 'পাখির নীড়ের মতো চোখ,' উটের গ্রীবার মতো নিস্তব্ধতা, প্রেমিক চিলপুরুষের চোখের মতো নক্ষত্র, বেতের ফলের

৩. Walter Pater, Style.
৪. বুদ্ধদেব বসু, কালের পুতুল

মতো ম্লান চোখে, রোদের নরম রঙ শিশুর গালের মতো লাল, করুণ শঙ্খের মতো স্তন, হেলিও ট্রোপের মতো দুপুরের অসীম আকাশ, মিশরের মতো মেঘ,—এই সব উপমা অনেক সময় অ্যাবস্ট্রাক্ট মনে হলেও কবি-পুরোহিতের বিস্ময়কর জীবনবোধ ও দৃষ্টি থেকে এদের জন্ম। এই সঙ্গে তাঁর কবিতায় ছন্দোপদ্ধতিও উল্লেখ্য। জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় কোথাও অক্ষরবৃত্ত ছন্দ ছাড়া অন্য ছন্দোরীতি ব্যবহার করেন নি। এ-বিষয়ে তাঁর বক্তব্য ; "আধুনিক বাংলা কবিতায় পয়ার প্রায় সর্বব্যাপী। আমার তো মনে হয় আজকের শ্রেষ্ঠতর বাঙালী কবিরা পয়ারকে স্বচ্ছন্দে এবং নিরবচ্ছিন্নভাবে যত বেশি গ্রহণ করেছেন, এমন আর কোনো ছন্দকে নয়।"[১] জীবনানন্দ দাশ পয়ার বলতে অক্ষরবৃত্ত রীতিকেই বুঝিয়েছেন। এ-বিষয়ে তাঁর প্রমাদের কারণ মনে হয় বুদ্ধদেব বসু-র একটি প্রবন্ধ[২] যেখানে তিনি অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে পয়ার বলে উল্লেখ করেছেন। এই ছন্দের বিশেষত্ব হল শব্দধ্বনির অতিরিক্ত তান বা সুরের বিস্তার। তাছাড়াও এই ছন্দের চরণগুলি দীর্ঘ হয়ে থাকে এবং মাত্রাসংখ্যা নির্দিষ্ট রেখে অনেক বেশি যুক্ত-ব্যঞ্জন চরণের মধ্যে প্রবেশ করানো যায়। রবীন্দ্রনাথ একেই এই ছন্দের 'অসাধারণ শোষণ শক্তি' বলেছেন। অক্ষরবৃত্তের পয়ার-জাতীয় যে-রীতিটি জীবনানন্দ আশ্রয় করেছেন সব চেয়ে বেশি, তার মূল পর্ব আসে আট মাত্রায়। রবীন্দ্রনাথ প্রথম দেখালেন যে, "এদের চলন খুব লম্বা। এদের প্রত্যেক পদক্ষেপে আট মাত্রা। এই আট মাত্রার মোট ওজন রেখে পাঠক এর মাত্রাগুলিকে অনেকটা ইচ্ছামতো চালাচালি করতে পারেন।"[৩] এই যুক্তাক্ষরবহুলতার সঙ্গে যুক্তাক্ষরহীনতার মিশ্রণে অক্ষরবৃত্তের পয়ার জাতীয় ছন্দরীতি আপনা থেকেই একটা ধীর-গম্ভীর চলন পায়। জীবনানন্দ অক্ষরবৃত্তের এই রীতিকে আরও দীর্ঘ চরণে বিন্যস্ত করলেন। রবীন্দ্রনাথ চৌদ্দ মাত্রার পয়ারকে আঠারো মাত্রায় সাজিয়ে ছিলেন, জীবনানন্দ তাকে বাইশ, চব্বিশ এমন কি ছাব্বিশ মাত্রাতেও বিন্যাস করেছেন। উদাহরণ দিচ্ছি :

হাজার বছর ধরে / আমি পথ হাঁটিতেছি / পৃথিবীর পথে।।
সিংহল সমুদ্র থেকে / নিশীথের অন্ধকারে / মালয় সাগরে-।।

এখানে আট, আট, ছয়—মোট বাইশ মাত্রার চরণ পাচ্ছি। আবার কোথাও কোথাও চব্বিশ মাত্রার একটি চরণও তিনি প্রবেশ করিয়ে দিয়েছেন। যেমন :

অনেক সোনার ধান। ঝরে গেছে জানো নাকি। অনেক গহন ক্ষতি।।

তবে চব্বিশ মাত্রার চরণ তিনি কমই নির্মাণ করেছেন। কারণ চব্বিশ মাত্রার চরণ পড়তে অসুবিধা ঘটে। সেখানে বাইশ বা ছাব্বিশ মাত্রা অনায়াসে পড়া যায়। ছাব্বিশ মাত্রাব অক্ষরবৃত্ত রীতির চরণের উদাহরণ দিচ্ছি :

ধানের সোনার কাজ। ফুরায়েছে জীবনেরে। জেনেছে সে কুয়াশায় খালি।।
তাই তার ঘুম পায়। ক্ষেত ছেড়ে দিয়ে যাবে। এখনি সে ক্ষেত্রের ভিতর।।

প্রথম পর্যায়ের কিছু কবিতায় সামান্য পরিমাণে মাত্রাবৃত্ত ছন্দ ও শেষ পর্বের কিছু কবিতায় গদ্যছন্দ-ব্যবহার করা ছাড়া কবি প্রায় সব কবিতাই অক্ষরবৃত্তের এ-জাতীয় পয়ার বা মুক্তক রীতিতে লিখেছেন। তাঁর 'বোধ', 'আট বছর আগের একদিন', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'পাখিরা', 'ক্যাম্পে', ইত্যাদি সুপরিচিত কবিতা সবই অক্ষরবৃত্তের মুক্তক রীতিতে লেখা।

১. জীবনানন্দ দাশ, কবিতার কথা।
২. বুদ্ধদেব বসু, সাহিত্যচর্চা
৩. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ছন্দ

এই রীতির বৈশিষ্ট্য হল চরণদৈর্ঘ্য সমান হয় না, অর্থাৎ চরণের পর্বসমতা থাকে না। দীর্ঘ চরণের সঙ্গে একটি অতি ছোট চরণ অনায়াসে নিয়ে আসা যায়। ফলে কবিতাপাঠে যেমন বৈচিত্র্য আসে, তেমনি কবিও শব্দ-ভাব-প্রকাশে কিছু স্বাধীনতা পান। দৃষ্টান্ত দিচ্ছি :

আমার বুকের পরে। সেই রাতে জমেছে যে। শিশিরের জল।।
তুমিও কি চেয়েছিলে। শুধু তাই শুধু তার স্বাদ।।
তোমারে কি শান্তি দেবে।।
আমি চলে যাব তবু। জীবন অগাধ।।
তোমারে রাখিবে ধরে। সেই দিন পৃথিবীর পরে।।

পাঁচটি চরণে পর্বসংখ্যা কোথাও তিন, কোথাও দুই, কোথাও এক। চরণের এই হ্রস্ব-দীর্ঘতা কিন্তু কবিতার মূল সুর ও লয়কে পরিবর্তিত করে নি। ধীর-গম্ভীর সুরপ্রবাহ শব্দধ্বনির উত্থান-পতনে প্রবাহিত হয়েছে। এই রীতি যেন মন্ত্রের মতো, গানের মতো বা শ্লোকের মতোই কবি-পুরোহিতের বাণীকে আমাদের সামনে তুলে ধরেছে। জীবনানন্দ কবিতার মধ্য দিয়ে মানুষের হৃদয়ের পরিবর্তন ঘটাতে চেয়েছিলেন। তার বক্তব্য ছিল, 'ভিড়ের হৃদয় পরিবর্তিত হওয়া দরকার।' তিনি বিশ্বাস করেছিলেন ; 'শ্রেষ্ঠ কবিতার ভিতর একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায় এই যে মানুষের তথাকথিত সমাজকে বা সভ্যতাকেই শুধু নয় এমন কি সমস্ত অমানবীয় সৃষ্টিকেও যেন তা ভাঙছে—এবং নতুন করে গড়তে চাচ্ছে ; এবং এই সৃজন যেন সমস্ত অসঙ্গতির জট খসিয়ে কোনো একটা সুসীম আনন্দের দিকে। ...এই জন্যেই সমস্ত অতীত ও বর্তমান শ্রেষ্ঠ কাব্য তাদের নিজের প্রণালীতে মানুষের চিত্তকে যত বেশি অধিকার করতে পারবে সভ্যতার তত বেশি উপকার।' (কবিতার কথা) এই বিশ্বাসও সেই কবি-পুরোহিতের বিশ্বাস, যিনি যুগ-যুগান্তর ধরে মানুষকে বোঝাতে চেয়েও পারেন নি :

তবুও কাউকে আমি পারিনি বোঝাতে
সেই ইচ্ছা সঙ্ঘ নয় শক্তি নয় কর্মীদের সুধীদের বিবর্ণতা নয়,
আরো আলো ; মানুষের তরে এক মানুষীর গভীর হৃদয়।

সভ্যতার তিক্ত গ্লানিভারের মধ্যেও তিনি বিশ্বাস করেছেন 'কোথাও জীবন আছে—জীবনের স্বাদ রহিয়াছে, কোথাও নদীর জল রয়ে গেছে, সাগরের তিতা ফেনা নয়।' এই বোধ ও বিশ্বাস মন্ত্রধ্বনির মতো তুলে ধরেছেন কবি-পুরোহিত জীবনানন্দ।

বিশ শতকের শেষে জীবনানন্দ

বিজয়কুমার দত্ত

সাহিত্যের প্রবহমান ইতিহাসে এক একটা সময় আসে, যখন কোনো বিশেষ ধারণা ও বিশেষ সাহিত্য-ব্যক্তিত্ব, মানুষের বোধশক্তিকে গ্রাস করে সর্বাত্মক প্রভাবে। সেই বিশেষ ধারণা বা সাহিত্য-ব্যক্তিত্বকে হয়তো প্রথম যুগে, সমকালীন মানুষ অবজ্ঞা বা শীতল উদাসীনতায় দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয় অন্যত্র। পরে তার বিপরীতমুখী প্রতিক্রিয়ায়, অন্য সব কিছু, অন্য ধ্যান-ধারণা বা অন্য সাহিত্যব্যক্তিত্বদের সৃষ্টি থেকে মুখ ফিরিয়ে, সেই বিশেষ ব্যক্তিত্বের সৃষ্টি, মানুষকে বা তার ধ্যান-ধারণাকে গ্রাস করে। এই দুটি অবস্থার কোনোটিকেই সুস্থ সাহিত্যবোধসম্মত নৈর্ব্যক্তিক বিচার বা সমালোচনা বলা যায় না। আমাদের অভিজ্ঞতায় বহুদৃষ্ট অনেক উদাহরণের মধ্যে আমরা যাঁদের নাম করতে পারি তাঁরা হলেন শেক্‌সপীয়র, কীট্‌স, রবীন্দ্রনাথ এবং অবশ্যই জীবনানন্দ দাশ।

অপ্রিয় কথনের দায়ভাগ নিয়ে আমি একথা বলতে বাধ্য হচ্ছি যাঁরা এক নিঃশ্বাসে বলে ওঠেন, রবীন্দ্রনাথের পরেই একমাত্র কবি জীবনানন্দ, তাঁরা অতিসরলীকরণের সহজ পথে সঞ্চরণে এতই অভ্যস্ত যে, অন্য পথ মাত্রই তাঁদের কাছে বিপথ বা অধঃপতনের পথ। তাঁদের সঙ্গে বিতর্কে নামার মজ্জাগত অনীহার কথা অকপটেই স্বীকার করছি।

রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কবিতার একটা ব্যাপক ধারা কবিত্বের রসে উজ্জীবিত স্রোতকে একটা আশ্চর্য ঊর্মিমুখরতা দান করেছিল। জীবনানন্দের কবিতা সফেন ঐশ্বর্যে শুভ্র-সমুজ্জ্বল হয়েছিল সন্দেহ নেই; কিন্তু যাঁরা মনে করেন সেইটিই একমাত্র ধারা,—বাংলা কবিতার নিয়তি সেই ধারাজলে অবগাহনের মধ্যেই, তাঁরা জীবনানন্দ প্রেমিক হতে পারেন, কিন্তু বাংলা কবিতার প্রেমিক নন। এই ধরনের কবি-প্রেমিকদের দর্শন আমরা পেয়েছি রবীন্দ্র-প্রতিভার মধ্যগগনে একদেশদর্শী কিছু রবীন্দ্রভক্তদের মধ্যে।

* * * *

কিছুদিনের মধ্যেই জীবনানন্দের জন্মশতবার্ষিকীর সূচনা হতে চলেছে। সঙ্গত কারণেই জীবনানন্দকে কেন্দ্র করে উদ্দীপনা-উৎসাহ-উন্মাদনা বাংলা কবিতার অনুরাগীদের মধ্যে সঞ্চারিত হয়েছে, এবং নানা পত্র-পত্রিকায় জীবনানন্দের কবিপ্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা-সমালোচনা-গবেষণার জোয়ারে প্লাবিত হবেন বাংলা কবিতার পাঠকেরা। বর্তমান প্রবন্ধে আমি সেই অ্যাকাডেমিক আলোচনায় যেতে চাই না। এই প্রবন্ধটি জীবনানন্দের কবিপ্রতিভার বিস্তার, সমসাময়িক বিচারের প্রেক্ষিত এবং এই শতকের শেষ পর্বে জীবনানন্দের প্রাসঙ্গিকতার একটা চালচিত্রের আভাস দেওয়ার প্রয়াস মাত্র।

জীবনানন্দের প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ, আমরা জানি—ঝরাপালক (১৯২৮), গ্রন্থটি তিনি রবীন্দ্রনাথকে পাঠিয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথ তার উত্তরে লিখেছিলেন: 'তোমার কবিত্বশক্তি

আছে তাতে সন্দেহ মাত্র নেই।—কিন্তু ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন বুঝতে পারিনে। কাব্যের মুদ্রাদোষটা ওস্তাদীকে পরিহসিত করে।

বড়ো জাতের রচনার মধ্যে একটা শান্তি আছে, যেখানে তার ব্যাঘাত দেখি সেখানে স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ জন্মে। জোর দেখানো যে জোরের প্রমাণ তা নয় বরঞ্চ উলটো।'

জীবনানন্দ তার উত্তরে দীর্ঘ চিঠি লিখেছিলেন, সেটি সম্ভবত রবীন্দ্রনাথকে পাঠানো হয়নি। বর্তমান আলোচনায় সেটি অপ্রাসঙ্গিক। বাস্তবিক পক্ষে 'ঝরাপালক' তাব শিরোনামের মতো বাংলা কবিতার আবহ থেকে প্রায় উড়ে গেছে। রবীন্দ্রকাব্যচেতনা থেকে মুক্তিকামী হলেও, জীবনানন্দ সে সময়ের তিনজন কবির প্রভাব অস্বীকার করতে পারেন নি—তাঁরা হলেন সত্যেন দত্ত, মোহিতলাল ও নজরুল। অন্ততঃ সে সময় তিনি নিজস্ব কাব্যভঙ্গিমা খুঁজে পাননি। আশ্চর্যের কথা নয়, তাঁর শ্রেষ্ঠ কবিতায়, 'ঝরাপালক'-এর মাত্র তিনটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে—যার মধ্যে 'পিরামিড' কবিতাটি অবশ্যই বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে ও দৃষ্টিভঙ্গীর স্বতন্ত্রতায় উল্লেখের দাবী রাখে. সঞ্জয় ভট্টাচার্য সঙ্গত কারণেই এই কবিতাটির সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের 'শাজাহান' কবিতাটির সুন্দর প্রতিতুলনা দিয়েছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় তাজমহল ও জীবনানন্দের পিরামিড—দুটিই স্মৃতিস্তম্ভ। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ যেখানে ব্যক্তিকেন্দ্রিক—তথা শাজাহানের প্রেমিক রূপটি দেখেছেন তাজমহলের মধ্যে, জীবনানন্দের পিরামিড সেখানে ইতিহাসকেন্দ্রিক। তার মধ্যে কোথাও ফারাও-এর মহিমা বন্দিত হয়নি। তাঁর ভাষায় "কতো আগন্তুক কাল অতিথি সভ্যতা/তোমার দুয়ারে এসে কয়ে যায় অসম্বৃত অন্তরের কথা,/ তুলে যায় উচ্ছৃঙ্খল রুদ্র কোলাহল,/তুমি রহো নিরুত্তর—নির্বেদী নিশ্চল/মৌন—অন্যমনা; /প্রিয়ার বক্ষের 'পরে বসি' একা নীরবে করিছ তুমি শবের সাধনা—"; এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, যদিও শব্দ ও ছন্দের ব্যবহারে ও গঠন ভঙ্গিমায় তিনি পূর্বোক্ত কবিদের প্রভাব এড়াতে পারেন নি, কিন্তু এই কবিতাটির ইতিহাসচারিতা, মৃত্যুভাবনা ও অতীত স্মৃতির মধ্যে জীবনানন্দের পরবর্তী কাব্যবোধ ও বোধির বীজ সুপ্ত ছিল।

দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'-তে এসে জীবনানন্দ তাঁর নিজস্ব ভাষা, মেজাজ এবং শব্দ ব্যবহারের স্বতন্ত্র চরিত্র খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর কবিস্বভাবের যে অমোঘ বৈশিষ্ট্য তিনি সারাজীবন বহন করে নিয়ে গেছেন—তার প্রকাশ ঘটেছে এই গ্রন্থেই,—অর্থাৎ নিঃস্ব রিক্ততা, রোমান্টিক প্রেমে অবিশ্বাস, জীবনের অসম্পূর্ণতা ও জীবন-যাপনে তুচ্ছতার সমাহার : 'আমরা হেঁটেছি যারা নির্জন খড়ের মাঠে পউষ সন্ধ্যায়/দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল/কুয়াশার ; কবেকার পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়/ তারা সব ; আমরা দেখেছি যারা অন্ধকারে আকন্দ ধুন্দুল/জোনাকিতে ভরে গেছে ; যে মাঠে ফসল নাই তাহার শিয়রে/চুপে দাঁড়ায়েছে চাঁদ—কোনো সাধ নাই তার ফসলের তরে।'

এই যে অতীতচারিতা প্রত্যক্ষ প্রকৃতির শরীরে একাকার হয়ে গেছে—তা যেমন জীবনানন্দের কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, তেমনি ক্ষয় ও মৃত্যুচারিতার আশ্চর্য সমন্বয় ঘটেছে, এই একই কবিতায়—'আমরা বুঝেছি যারা পথ ঘাট মাঠের ভিতর/আরো এক আলো আছে : দেহে তার বিকাল বেলার ধূসরতা ;/চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির :/পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর।' কবি অন্য এক আলোর কথা বলেছেন—সে আলো কোনো রোমান্টিক কল্পনার মায়াবী বর্ণালী নয় যা ওয়ার্ডওয়ার্থের ভাষায়,

'The light, that never was on sea or land
The consecration and the poet's dream'

জীবনানন্দের কল্পনার আলো-ও স্থলে জলে কোথাও নেই, কিন্তু তাঁর স্বপ্নের আলোর চরিত্র স্বতন্ত্র ; কারণ সে আলোয় কোনো উজ্জ্বলতা নেই। তা শুধু স্থির নয়, তা ধূসর-অস্পষ্ট-অচেনা ; এবং তার চেয়েও বড় কথা পৃথিবীর কঙ্কাবতীর ট্রাজিক পরিণতি ঘটে সেই স্থির আলোয়, নিঃশেষ হয়ে যাওয়া ধূপের শরীরে, অর্থাৎ ক্ষয়িষ্ণু মৃত্যুর প্রতীকে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' জীবনানন্দের আর একটি বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত, আর তা হল দীর্ঘ কবিতার রূপ। এই গ্রন্থের 'অবসরের গান' শীর্ষক কবিতাটি সম্ভবত তাঁর দীর্ঘতম কবিতা—এবং তার মধ্যেও ক্লান্তি-নীরক্ত অনুভব ; এবং প্রকৃতির অজস্র রম্যতার মধ্যেও বিলীয়মান জীবনযাত্রার ছবি ফুটে উঠেছে। মানবজীবনের চলচ্চিত্র-প্রতিম দৃশ্যপটে কবি সৃষ্টি করেছেন তাঁর কবিতার ক্যানভাস—'শীতল চাঁদের মতো শিশিরের ভেজা পথ ধ'রে/আমরা চলিতে চাই, তারপর যেতে চাই ম'রে/দিনের আলোয় লাল আগুনের মুখে পড়ে মাছির মতন ;/অগাধ ধানের রসে আমাদের মন/আমরা ভরিতে চাই গেঁয়ো কবি—/ পাড়াগাঁর ভাঁড়ের মতন।'

আশ্চর্যের কথা নয়, ধূসর পাণ্ডুলিপি গ্রন্থটি পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠিতে জানিয়েছেন—'তোমার কবিতাগুলি পড়ে খুসি হয়েছি। তোমার লেখায় রস আছে, স্বকীয়তা আছে এবং তাকিয়ে দেখার আনন্দ আছে।'

জীবনানন্দের কবিচরিত্রের মধ্যে সময়চেতনা যে অনন্য স্বাদ-গন্ধ-ঘ্রাণের আভাস পাঠকের মনে সঞ্চারিত করে, তা বাংলা কবিতায় প্রকৃতির অজস্র রম্যতায় আগে দেখা যায়নি ; এই সময়-চেতনা সুধীন্দ্রনাথ দত্তের নাগরিক বোধ ও বোধির নিরাসক্ত ও নৈর্ব্যক্তিক প্রকাশ নয় ঃ তার মধ্যে প্রাণী-উদ্ভিদ-মহাকাশ-জ্যোতিষ্ক মণ্ডলী একাকারে বিধৃত ঃ তার অজস্র উদাহরণ আমরা পাই 'মাঠের গল্প', 'পঁচিশ বছর পরে', 'কার্তিক মাঠের চাঁদ', 'সহজ' ইত্যাদি শীর্ষক কবিতাগুলিতে। কয়েকটি উদ্ধৃতি মাধ্যমে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হবে।

১. 'মেঠো চাঁদ রয়েছে তাকায়ে/আমার মুখের দিকে, ডাইনে আর বাঁয়ে/পোড়াজমি-খড় নাড়া-মাঠের ফাটল,/শিশিরের জল।/মেঠো চাঁদ—কাস্তের মতো বাঁকা, চোখে—/চেয়ে আছে ; এমনি সে তাকায়েছে কতো রাত—নাই লেখা জোখা।'

২. 'শেষবার তার সাথে যখন হয়েছে দেখা মাঠের উপরে—/বলিলাম—'একদিন এমন সময়/আবার আসিয়ো তুমি—আসিবার ইচ্ছা যদি হয়—পঁচিশ বছর পরে।'/এই বলে ফিরে আমি আসিলাম ঘরে ;/তারপর, কতবার চাঁদ আর তারা/মাঠে মাঠে মরে গেল ইঁদুর পেঁচারা....'

৩. 'উজ্জ্বল আলোর দিন নিভে যায়,/মানুষেরো আয়ু শেষ হয়।/পৃথিবীর পুরনো সে পথ/মুছে ফেলে রেখা তার—কিন্তু এই স্বপ্নের জগৎ/চিরদিন রয়।/সময়ের হাত এসে মুছে ফেলে আর সব—/নক্ষত্রেরো আয়ু শেষ হয়।'

* * * *

সমালোচকদের যথেচ্ছ উদ্ধৃতি এবং আবৃত্তিকারদের কৃপায় রূপসী বাংলা এবং বনলতা সেন—এই দুটি গ্রন্থের কবিতাগুলি জনগণমনের কাছে অবিশ্বাস্য লোকপ্রিয়তা অর্জন করেছে। সম্ভবত প্রথম যুগের নৈরাশ্য-মৃত্যুচেতনা-ধূসর জীবনদর্শনের মধ্যে জীবনানন্দের কবিতায় একটা বাঁক এসেছিল—রূপসী বাংলা ও বনলতা সেন ; এই গ্রন্থ

দুটিতে অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলিতে। তার মধ্যে প্রেম রোমান্টিকতা ছাড়িয়ে অশরীরী প্রেমের উদ্ভাসিত চেতনা,—অরণ্যপ্রকৃতি-সমুদ্র-জল-আশ্বিনের অকূল আকাশ-দূরতর দ্বীপ, এই সব কিছু মিলিয়ে একটা আশ্চর্য সত্তা দান করেছে তাঁর কবিতার শরীরে। কবির ভাষায়—'সৃষ্টির ভিতরে মাঝে মাঝে এমন শব্দ শোনা যায়, এমন বর্ণ দেখা যায়, এমন আঘ্রাণ পাওয়া যায়, এমন মানুষের বা এমন অমানবীয় সংঘাত লাভ করা যায়—কিংবা প্রভূত বেদনার সঙ্গে পরিচয় হয়, যে মনে হয় এই সমস্ত জিনিসই অনেকদিন থেকে প্রতিফলিত হয়ে আরো অনেক দিন পর্যন্ত, হয়তো মানুষের সভ্যতার শেষ জাফরান রৌদ্রালোক পর্যন্ত কোথাও যেন রয়ে যাবে...'। এই বিচিত্র রূপে হয়ে থাকার সুন্দর উদাহরণ তাঁর 'তোমাকে' শীর্ষক কবিতায় ফুটে উঠেছে : 'একদিন মনে হতো জলের মতন তুমি।/ সকালবেলার রোদে তোমার মুখের থেকে বিভা—/অথবা দুপুরবেলা—বিকেলের আসন্ন আলোয়—চেয়ে আছে—চলে যায়—জলের প্রতিভা।'

এই চেয়ে থাকা অথবা চলে যাওয়া মুহূর্তগুলির তাৎক্ষণিক রূপই অনন্তের স্পর্শ এনে দেয় আমাদের রক্ত-মাংস-মজ্জা-অস্থি-গ্রন্থি-রক্তের আলোড়নে, স্পন্দনে, রোমাঞ্চিত জাগরণের দৃষ্টিতে। সেই দৃষ্টিতেই নতুন বাকপ্রতিমায় দেখা যায় সুরঞ্জনা-সুচেতনা, দুধের মতো শাদা নারীদের। জীবনানন্দের কবিচেতনার এই প্রেক্ষিতে 'বনলতা সেন' কবিতাটি ব্যতিক্রান্ত উদাহরণ হিসেবেই গণ্য। তাঁর জীবদ্দশায় এই কবিতাটির খ্যাতি স্বয়ং জীবনানন্দকে বিস্মিত করেছিল। এই কবিতাটির এত ব্যাখ্যা প্রকাশিত, তারপরে নবতর সংযোজন বাহুল্যমাত্র। তবে আধুনিক উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের জীবনে দু-দণ্ডের শান্তির চেয়ে মহৎ কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। অস্থির বিক্ষিপ্ত—কেন্দ্রাতিগ শক্তির তাড়নে দূর দিগন্তে ক্রমধাবমান মানুষের অনিবার্য নিয়তির আভাস দেওয়া হয়েছে এই কবিতাটিতে। তাছাড়া অন্যকোনো অভিনব অর্থোদ্ধারে আমার স্পৃহা নেই। তবে প্রতিটি বাকপ্রতিমা স্থির চিত্রের তাৎক্ষণিক মন্ময়তার প্রতীক। অন্ধকার বিদিশার নিশার মতো চুল, শ্রাবস্তীর কারুকার্যের মতো মুখ (শ্রাবস্তী কি প্রাচীন ভারতীয় স্থাপত্য বা ভাস্কর্যের জন্য বিখ্যাত ছিল?), দিশাহারা ভগ্নহাল নাবিকের সবুজ দ্বীপের প্রতি দৃষ্টিপাত—এবং অবশেষে পাখীর নীড়ের মতো চোখ,—এসবই নিশ্চিন্ত, নিরুপদ্রব, প্রগাঢ় শান্তির পরিবেশের প্রতি আকুলতা : যে পরিবেশ, যে দুর্লভ শান্তির মাধুর্য দিতে পারে 'মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন'। এক হিসেবে, মধ্যযুগের ত্রুবাদুর কবিদের আরাধ্যদেবীপ্রতিমার মতো প্রেমিকাদের স্বরূপে, বনলতা সেন, বাঙালী মানসের চিরকালীন অধরা-অস্পৃশ্য-অনাঘ্রাত নারীর শিল্পিত বিস্ময়।

এই কবিতাটির খ্যাতির কারণ সম্ভবত তাই, এবং রোমান্টিক চেতনায় প্লুত না হয়েও জীবনানন্দ বাঙালী কবিতা অনুরাগীর মর্মে মর্মে এই চেতনার অনুপ্রবেশ ঘটিয়ে দিয়েছেন ; সম্ভবত নিজেও সে সম্পর্কে তিনি অবহিত ছিলেন না। সেই প্রেক্ষিতেই বোঝা যায়, কবিতাটির খ্যাতিতে তিনি কেন বিস্মিত হয়েছিলেন।

* * * *

মহাপৃথিবী কবিতাগ্রন্থে এসে আমরা শুধু যে জীবনানন্দের কবিতার নতুন পৃথিবীতে পা রাখি, তা নয়—বাংলা কবিতার উন্মোচিত দিগন্তলোকেও প্রবেশ করি, গ্রহান্তরে পদার্পণ করার রোমাঞ্চে। এই কবিতাগ্রন্থটির ভাষা-ভঙ্গি-শব্দব্যঞ্জনা বাংলা কবিতায় এমনভাবে আগে দেখা যায়নি—হয়তো ভবিষ্যতেও দেখা যাবে না। জীবনানন্দের ভাষায় "চোখে তার/যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার,/স্তন তার/করুণ শঙ্খের মতো—দুধে

আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার ;/এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায়নাকো আর।" এই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে 'হায় চিল', 'সিন্ধুসারস,' 'বুনো হাঁস', 'শব', 'শঙ্খমালা' প্রভৃতি কবিতা বাঙালী পাঠকদের কাছে স্বতন্ত্র মর্যাদা পেয়েছে। বিশেষ করে 'কুড়ি বছর পরে' কবিতাটি তো স্মৃতিচারিতা তথা নষ্টালজিয়ার মদির ও মধুর আবেশ আনে—"জীবন গিয়েছে চলে আমাদের কুড়ি কুড়ি বছরের পার—/তখন হঠাৎ যদি মেঠো পথে পাই আমি তোমারে আবার!/হয়তো এসেছে চাঁদ মাঝ রাতে একরাশ পাতার পিছনে/সরু-সরু কালো কালো ডালপালা মুখে নিয়ে তার,/শিরীষের অথবা জামের,/ঝাউয়ের—আমের ;/কুড়ি বছরের পরে তখন তোমারে নাই মনে"।

আমার কাছে অবশ্য দুটি কবিতা—'হাওয়ার রাত' ও 'আট বছর আগের একদিন'—বিশেষ তাৎপর্যময়। প্রথম কবিতাটিতে যে প্রবল ও দীপ্ত আবহ রচিত, তা তাঁর কবিতায় ব্যতিক্রম রূপে চিহ্নিত হবার যোগ্য। এই কবিতাটিতে ক্লান্তি, নির্জনতা, বিষাদ-চেতনা পুরোপুরি অন্তর্হিত—'হৃদয় ভরে গিয়েছে আমার বিস্তীর্ণ ফেল্টের সবুজ ঘাসের গন্ধে...মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট/সজীব রোমশ উচ্ছ্বাসে,/জীবনের নীল মত্ততায়'। রেখাঙ্কিত শব্দসমাহারে প্লুত বাকপ্রতিমা বিস্ময়কর ভাবে সজীব—যা তাঁর কবিতায় দুর্লভ। এই একই কবিতায় সচেতন পাঠক অবশ্যই লক্ষ করেছেন অনুরূপ জীবন্ত বাকপ্রতিমা—'জ্যোৎস্না রাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের ওপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার/শালের মতো জ্বলজ্বল করছিল বিশাল আকাশ!/কাল এমন আশ্চর্য রাত ছিল'।

দ্বিতীয় কবিতাটি অবশ্য জীবনানন্দের অনুরাগী সব পাঠকের কাছে একান্ত পরিচিত। লাশকাটা ঘরের ভয়ঙ্কর পরিবেশ নিয়ে এমন কবিতা যে লিখিত হতে পারে—তা কি কেউ ভেবেছিল! 'জানি—তবু জানি/নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু-গৃহ—নয় সবখানি ;/অর্থ নয়, কীর্তি নয় সচ্ছলতা নয়—/আরো এক বিপন্ন বিস্ময়/আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে/খেলা করে ;/আমাদের ক্লান্ত করে,/ক্লান্ত-ক্লান্ত করে ;/লাসকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই ;/তাই/লাসকাটা ঘরে/চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের পরে।' নির্জনতা—একাকিত্ব-বিষণ্ণতা—এবং সবচেয়ে বড় কথা, ক্লান্তি থেকে মুক্তির এমন পথনির্দেশ সম্ভবত কবিত্বের স্বাধিকার প্রমত্ত অনুপম কল্পনা ছাড়া কি সম্ভব হতে পারত?

*　　*　　*　　*

সাতটি তারার তিমির ও বেলা অবেলা কালবেলা—এই দুটি গ্রন্থ জীবনানন্দের কবিতায় ভিন্নমাত্রা এনেছে। কারো কারো কাছে হয় প্রথমটি, না হয়, দ্বিতীয়টি তাঁর কবিত্বের শীর্ষমুখ স্পর্শ করেছে। আমরা কোনো মাননির্ণয়ের পদ্ধতিতে বিশ্বাসী নই। তাই এ সম্পর্কে দুটি গ্রন্থের পরিচয় দিয়ে তাঁর কবিতার চালচিত্র সম্পূর্ণ করতে চাই।

সাতটি তারার তিমির মূলত গতির কবিতা—অর্থাৎ কবির ভাবনার স্রোত যেন বয়ে যাচ্ছে একটা অজানা দিগন্তপারে, যার সীমা-পরিসীমার ছবি কবির কাছে স্পষ্ট নয় ঃ

১। কোথাও তরণী আজ চলে গেছে আকাশ-রেখায়—তবে—এই কথা ভেবে
নিদ্রায় আসক্ত হতে গিয়ে তবু বেদনায় জেগে ওঠে পরাস্ত নাবিক ;
সূর্য যেন পরম্পরাক্রম আরো—ওই দিকে—সৈকতের পিছে...

২। রাত্রির সংকেতে নদী যতদূর ভেসে যায়—আপনার অভিজ্ঞান নিয়ে
আমারো নৌকার বাতি জ্বলে

মনে হয় এইখানে লোকশ্রুত আমলকী পেয়ে গেছি
আমার নিবিষ্ট করতলে ;

৩। হেমন্ত ফুরায়ে গেছে পৃথিবীর ভাঁড়ারের থেকে/এরকম অনেক হেমন্ত ফুরায়েছে/ সময়ের কুয়াশায় ;/মাঠের ফসলগুলো বারবার ঘরে/তোলা হতে গিয়ে তবু সমুদ্রের পারের বন্দরে/পরিচ্ছন্নভাবে চলে গেছে।

৪। সময়ের কাছে এসে সাক্ষ্য দিয়ে চলে যেতে হয়
কী কাজ করেছি আর কী কথা ভেবেছি।
সেইসব একদিন হয়তো বা কোনো এক সমুদ্রের পারে
আজকের পরিচিত কোনো নীল আভার পাহাড়ে
অন্ধকারে হাড় কঙ্করের মতো শুয়ে
নিজের আয়ুর দিন তবুও গণনা করে যায় চিরদিন

এই একরেখীয় গতির যে ছবি কবি এঁকেছেন, তার মধ্যে মানবসমাজ—সভ্যতা—তার আদর্শ—বিশ্বাসহীনতা—অন্তহীন ব্যর্থতা—সাফল্য, তাঁর ধ্যানে, মননে, কল্পনার অভিনিবেশে অন্য মাত্রা পায় যখন তিনি বলেন—'যে মানুষ—যেই দেশে টিকে থাকে সে-ই/ব্যক্তি হয়—রাজ্য গড়ে—সাম্রাজ্যের মতো কোনো ভূমা/চায়...'—এই সাম্রাজ্যলোভী মানবচরিত্র ছাড়া অন্য কোনো অমল পরিশুদ্ধ রাজনীতি পেতে হলে কবির ভাষায় 'উজ্জ্বল সময় স্রোতে চলে যেতে হয়।/সেই স্রোত আজো এই শতাব্দীর তরে নয়।/সকলের তরে নয়।'

তাহলে কোন্ আগামী শতাব্দীতে মানুষ সময়ের উজ্জ্বল স্রোতে অবগাহন করে অমল হৃদয় খুঁজে পাবে? সেই অমেয় প্রাপ্তির সম্ভাবনার ইঙ্গিতটুকুই তিনি দিয়েছেন, কেননা তার বেশি, কবির কোনো দায়বদ্ধতা নেই।

বেলা অবেলা কালবেলা জীবনানন্দের ইতিহাস চেতনার প্রামাণ্য দলিল : এই ইতিহাস অবশ্য ইতিহাসবিদদের ঘটনা-পরম্পরার সঞ্চয় নয়। এই ইতিহাস অনুভবের ক্রম-উত্তরণের প্রতীক। জীবনানন্দ যখন বলেন—'হে পাবক অনন্ত নক্ষত্রবীথি তুমি, অন্ধকারে/তোমার পবিত্র অগ্নি জ্বলে'—তখন সে আগুন মানবসভ্যতার প্রথম আবিষ্কারের আগুন নয় ; সে আগুন মানবচৈতন্যের অন্ধকারে অভিনব দীপ্তির আগুন, সৃষ্টির প্রথম আলোর ছটা ; তাই কবি বলতে পারেন, 'অমাময়ী নিশি যদি সৃজনের শেষ কথা হয়,/আর তার প্রতিবিম্ব হয় মানব হৃদয়/তবুও আবার জ্যোতি সৃষ্টির নিবিড় মনোবলে/জ্বলে ওঠে সময়ের পৃথিবীর আকাশের মনে ;'—লক্ষ করার বিষয় ত্রৈমাত্রিক মনের কথা কবি বলেছেন, সময়ের, পৃথিবীর, আকাশের। এই মনের কথা, ইতিহাস-দর্শন-মনস্তত্ত্ব-সমাজতত্ত্বের পাতায় কোথাও লেখা নেই। কিংবা 'তবু' শীর্ষক কবিতাটির কথা স্মরণ করা যাক : কবি বলছেন, তিনি আড়াই হাজার বয়সী,—দেখেছেন স্বচক্ষে বুদ্ধকে চলে যেতে আশ্চর্য শান্তিতে, 'তবু—অবিরল অশান্তির দীপ্তি ভিক্ষা করে এখানে তোমার কাছে দাঁড়ায়ে রয়েছি'। এক নিঃশ্বাসে অতীত ও বর্তমানের অবিশ্বাস্য সমন্বয় জীবনানন্দের সময় ও ইতিহাস চেতনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য, যেন জীবনের ক্রমপ্রবহমান স্রোত, তিনি দেখতে পাচ্ছেন, সাত সমুদ্র তেরো নদীর জলধারার মতো। সম্ভবত তাঁর কবিতায় বহমান জলধারার উপমা এত সহজ-স্বচ্ছন্দ-প্রত্যক্ষ। এই চঞ্চল ধারা ফুটে উঠেছে কবিতার

ভাষায়—'দেখ/পাখি চলে, তারা চলে, সূর্য মেঘে জ্বলে যায়, আমি/তবুও পথে দাঁড়ায়ে রয়েছি—তুমি দাঁড়াতে বলোনি...'

জীবনানন্দের দীর্ঘ কবিতার কথা আমরা আগেই বলেছি। বেলা অবেলা কালবেলা-র অধিকাংশ কবিতাই দীর্ঘ—সম্ভবত পরিণত চেতনার গভীরে অবগাহনে কবি, মানুষের জীবনচর্যা-সমাজ-সভ্যতা-অন্বিত সমসাময়িক কালের প্রেক্ষিতকে অনেক বড় ক্যানভাসে বিম্বিত করতে চেয়েছেন। কোনো কোনো কবিতা বোদ্ধার ধারণায় এই ধরনের কবিতা লিখে, জীবনানন্দ কবিতার শুদ্ধতম (?) আঙিনা থেকে বিচ্যুত হয়েছেন ; এবং শুধু শব্দের কুশলী ও যাদুকরী সজ্জায় যাঁরা প্লুত হতে চান না—তাঁরা বেলা অবেলা কালবেলার কবিতাগুলির মধ্যে পরম আশ্রয়-আশ্বাস-বিশ্বাসের প্রতিবিম্ব দেখতে পেয়েছেন।

'মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব/থেকে যায় ; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে/প্রথমত চেতনার পরিমাপ নিতে আসে।' এ ধরনের কবিতার ভাষাকে যাঁরা আপ্তবাক্য বলে খারিজ করতে চান, তাঁদের উন্নাসিক ধারণা এই,—যে কবিতা সাধারণ-শিক্ষিত-বোধসম্পন্ন মানুষকে স্পর্শ করে, তা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কবিতা। জীবনানন্দ স্বয়ং অবশ্য বলেছিলেন যে, কবিতা সকলের জন্য নয়; কিন্তু একথাও তিনি বলেন নি যে, কবিতা শুধু মুষ্টিমেয় অধ্যাপকবর্গীয় ও অ্যাকাডেমিক আবহের সর্বজ্ঞ বিশ্লেষণীকারীদের জন্য ; পাঠক-পাঠিকারা স্মরণ করতে পারেন তাঁর 'সমারূঢ়' শীর্ষক কবিতাটি। এ কারণেই ১৯৪৬-৪৭ শীর্ষক কবিতাটি সমসাময়িক বিষয় নিয়ে লিখিত বলে, কিছু সর্বজ্ঞ সমালোচক সেটি বিশুদ্ধ কবিতার তথাকথিত সর্ত মানা হয়নি বলে খারিজ করতে পারেন। এ প্রসঙ্গে আমার মতো অত্যন্ত সাধারণ পাঠক বিনীত নিবেদনে জানাতে ইচ্ছুক যে সমসাময়িক বিষয় সম্পর্কিত কবিতা যেমন মহৎ কবিতার ছাড়পত্র নয়, তেমনি সাহিত্যের ইতিহাস যুগে যুগে প্রমাণ করেছে যে, কোনো সৃষ্টিশীল প্রতিভা সম্পর্কে বা তাঁর কোনো বিশেষ সৃষ্টি সম্পর্কে সমসাময়িক বা বিশেষ সময়ের বিচারবোধও অভ্রান্ত নয় ; এবং আমার নিশ্চিত ধারণা—তা যতই অকিঞ্চিৎকর বলে গণ্য হোক—জীবনানন্দের এই কবিতাটির উদ্ধৃত পংক্তিগুলি কবিতার শীর্ষমুখ স্পর্শ করেছে—'মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো/না পেলে নিছক ক্রিয়া ; বিশেষণ ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল/জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।/অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু/আমাদের এই শতকের/বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিষের ভিড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু ;/তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই বলে অর্থময়/জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে ; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।' সমালোচক ; বোদ্ধা এবং বাংলা কবিতার স্বেচ্ছারূঢ় অভিভাবকদের শীতল উদাসীনতা সত্ত্বেও, বেলা অবেলা কালবেলা—জীবনানন্দের কবিতার একটি স্মরণীয় ল্যাণ্ডমার্ক।

*　　*　　*　　*

আলোচনার শুরুতে যে কথা বলেছি, পরিশেষে, সে কথায় ফিরে আসি। আমি আবার বলি রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দই একমাত্র উল্লেখযোগ্য কবি—এই অতিসরলীকরণের সমর্থকেরা জীবনানন্দের পরম ভক্ত হতে পারেন, কিন্তু বাংলা কবিতার সামগ্রিক অক্ষাংশ-দ্রাঘিমার ঘূর্ণ্যমান তথা চলমান বিবর্তনের প্রতি তাঁরা শুধু উদাসীনই নন, তার ভূগোল-ইতিহাস সম্পর্কে তাৎপর্যজনক ভাবেই অনীহ। ধারালো বোধসম্পন্ন কবি-সমালোচক শ্রী রঞ্জিত সিংহ, তাঁর শ্রুতি ও প্রতিশ্রুতি গ্রন্থে, জীবনানন্দকে রোমান্টিক ও নব্যক্লাসিকাল

রীতির মধ্যবর্তী তথা যুগ সন্ধির কবিরূপে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতামতকে মান্য করেই বলতে চাই যে বাংলা কবিতার ব্যাপক আবহে জীবনানন্দ যুগন্ধর তথা যুগনায়ক নন—বাংলা কবিতার পালাবদলের অন্যতম নিয়ামক হিসেবেই স্মরণীয়।

সেই পালাবদলে বাংলা কবিতার তাৎপর্যজনক বাঁক তাঁর মৃত্যুর চারদশক পরেও আমাদের চোখে পড়েনি। বরং জীবনানন্দের বহুল ব্যবহৃত অক্ষরবৃত্তের ঘূর্ণি থেকে বেরিয়ে আসার মরীয়া চেষ্টায়, শতাব্দী শেষের বাংলা কবিতা নিছক গদ্যভঙ্গির স্বাধিকার প্রমত্ততায় আপন অস্তিত্বের বৈজয়ন্তী মেলে দেওয়ার প্রয়াসী।

রীতিচমৎকার কবি

রবীন্দ্রনাথ সামন্ত

ভাষা।। জীবনানন্দের কোন একটি বা কয়েকটি কবিতা পরপর সাধারণ ভাবে পড়লে পাঠকের মনে একটি আলোড়ন উত্থিত হয়। অচিরেই এই বিশ্বাস দৃঢ় হয় যে জীবনানন্দের কাব্যভাষা, কাব্যবাণী পুরাতনী ঐতিহ্যের অনুসরণ করছে না। একেবারে নতুন বৈশিষ্ট্য নিয়ে এগুলি উপস্থিত হয়েছে। ঝরা পালক কাব্যের পক্ষে এই সত্য সার্বিক সত্য নয় একথা সত্য, কিন্তু পরবর্তী কাব্যগুলির যে কোন কবিতা সম্বন্ধেই সত্য। কোন্ ভাষায় জীবনানন্দ কবিতা লিখতেন? তাঁর নিজের ভাষায়। বাংলা ভাষার শক্তি, সৌন্দর্য ও সম্পদকে তিনি বহু গুণ বাড়িয়ে দিয়েছেন। তাঁর ভাষা কত অমোঘরূপে স্বকীয় বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে তা ধরা পড়ে তাঁকে অনুকরণ করার সময়। যে কেউ তাঁকে অনুকরণ করেছেন ও করতে গেছেন, তিনিই হতে পারেন নি জীবনানন্দ শিষ্য, জীবনানন্দের অক্ষম অনুকারকরাই বাংলা আধুনিক কাব্যে সংখ্যাতীত। মধুসূদন ও রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রেও এই ব্যাপারটি ঘটেছিল। জীবনানন্দ অব্যবহৃত হয়ে থাক এটিই কাম্য, কারণ তাতেই প্রতিভার সুমহান প্রকৃতি অটুট আদ্যন্ত চোখে পড়ে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের অনুসারক নেই, মেঘনাদবধ কাব্যের ব্যর্থ অনুকরণ সম্ভব হয়েছে, বলাকা কাব্যের সমযোগ্য উত্তরসাধক কোথায়, রূপসী বাংলার দোসর আজও দেখতে পাই না।

বিদেশী ভাবনায় ভাবিত হয়ে জীবনানন্দ বলেননি— Poetry is written with words, not ideas, তবু জীবনানন্দ আপন কাব্যভাষা চয়নে দেশী-বিদেশী কাব্যপাঠের আন্তরিক শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন। তার মানেই এই নয় যে জীবনানন্দকে সেকস্‌পীয়র, কীটস, ইয়েটস, এলিয়ট মিলিয়ে মিলিয়ে পড়া উচিত এবং সেই ভাবেই জানা যাবে তাঁর কারুকৃতির গোপন খবর। মধুসূদনের কলারীতি বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আমাদের পূর্ববর্তী পণ্ডিতেরা যে মহান ভ্রান্তি ঘটিয়েছেন তা জীবনানন্দের বেলা করা উচিত নয়। শব্দের সুকরতা, শব্দের মাধুর্য, শব্দের ব্যঞ্জনা ও শব্দের বিন্যাস জীবনানন্দের হাতে এমন ভাবে সৃষ্টি হয়েছিল যার ফলশ্রুতি একটি আধুনিক কাব্যপরিমণ্ডল গঠন করেছে। তিনি পূর্ব বঙ্গ ও পশ্চিম বঙ্গ—ঢাকা-বরিশাল ও কলিকাতার কথ্য ও লেখ্য শব্দরীতির কাছে কাব্যভাষার জন্য অঞ্জলি পেতেছিলেন। ঢের, নষ্ট, অইখানে, মিছা, নোনা মেয়েমানুষ, আইবুড়ো, ফোঁপাস, ঠ্যাং, থুরথুরে প্রভৃতি মুখের ভাষার শব্দ তিনি সরাসরি কাব্যে গ্রহণ করেছেন।

জীবনানন্দের কাব্যে ইংরাজী শব্দাবলীর নিয়ন্ত্রিত ও সাহসী ব্যবহারও লক্ষ্য করার মতো। যেমন ডায়নামো, ব্রায়ার পাইপ, নক্টার্ণ, পিস্টন, ব্রেডবাস্কেট, ট্রাফিক, ব্যালট, ব্লিজার্ড, মর্গ, ডক, নিওলিথ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করে তিনি বাংলা ভাষাকে প্রয়োজন মতো শক্তি ও ধ্বনিসম্পদ দান করেছেন। আধুনিক বঙ্গভাষী শিক্ষিত অল্পশিক্ষিত নারীপুরুষ ইংরাজী শব্দ ব্যবহার না করে বক্তব্য প্রকাশ করতে পারেন না। জীবনানন্দের কাব্যে

ইংরাজী শব্দাবলী সেইজন্য এত বেশী এসেছে। কোন শব্দকেই তিনি কাব্যের প্রয়োজনের দিক থেকে অচ্ছুৎ রাখেন নি। আরবী ফার্সী প্রভৃতি শব্দের সঙ্গে বাংলা ভাষার মিতালি অনেক দিন থেকে, ঐতিহাসিক নবাবী আমল থেকে—বাংলা গদ্যে পর্তুগীজ প্রভাবের কাল থেকে। জীবনানন্দ আরবী ফারসী শব্দে কাব্যশরীর গঠন করার শিক্ষা গ্রহণ করেছিলেন নজরুলের কাছ থেকে। ঝরা পালক কাব্যে সেই শিক্ষার নগ্ন নমুনা আছে। আখের, খুনখাবারি, শরাব, মসলাদরাজ, জমিন, সাকী, জিন, পশমিনা, রোশনাই প্রভৃতি পরিচিত শব্দের ব্যবহারে তিনি ঋণ করার ভঙ্গিটাকেও গোপন করেন নি। কিন্তু সেই ভাষা বৈশিষ্ট্যে নজরুলী পরাশ্রয় তিনি ঝরা পালক কাব্যেই উত্তীর্ণ হয়ে স্বকীয়তায় কবিতাকে মুদ্রিত করতে চেয়েছেন। এই স্বকীয়তায় পৌঁছোতে নজরুলের সঙ্গে সত্যেন্দ্রনাথকেও অতিক্রম করতে হয়েছে।

* লাল সাহারার শেরের সোয়ার,—বালুর ঘায়ে ঘেয়ো
* সঙ্গে স্যাঙাত্ মসুদ ডাকাত, তাতার যাযাবর
* ইয়াঙ্কী ঐ, ঐ য়ুরোপী, চীনে তাতার মূর
তোমার বুকের পাঁজর দলে ট'লতেছে হুড়মুড়,
ফেণিয়ে তুলে খুনখারাবী,—খেলাপ,—খবরদারী!
* ভোরগেলাসেয় সুরা,—তহরা,—করেছি মোরা চুপে চুপে পান।

এই সব উদাহরণে নজরুল ও সত্যেন্দ্রনাথের ভাষামুষ্টির ঋণ ধরা পড়ে খুবই সহজে। কিন্তু তারই মধ্যে যখন তিনি বলেন—

* দূর উর—ব্যাবিলোন্ মিশরের মরুভূ-সঙ্কটে
* জ্বলে গেছে,—নগ্ন হাত,—নাই শাঁখা,—হারায়েছে রুলি
* ভেঙেছে নাকের ডাঁশা, হিমস্তন,—হিম রোমকূপ
* করবী কুঁড়ির পানে চোখ তার সারাদিন চেয়ে আছে চুপে
* নষ্ট নীড়,—ঝরাপাতা,—পূবালির হাহা।

তখন বুঝতে পারি জীবনানন্দ আপন ভাষাক্ষেত্রে আসতে চাইছেন।

'ডেকেছিল ভিজে ঘাস,—হেমন্তের হিম মাস, জোনাকীর ঝাড়।
আমারে ডাকিয়াছিল আলোয়ার লাল মাঠ, শ্মশানের খেয়াঘাট আসি।'

জীবনানন্দকে চিনে নিতে আর দেরী হয় না, ক্রিয়াপদের ব্যবহার, বিশেষণের নতুনত্ব, বাক্‌রীতি সব মিলিয়ে অতুলনীয় জীবনানন্দ ঝরা পালক কাব্যেও আছেন। ইংরাজী আরবী ফার্সী শব্দ মিশিয়ে তাঁর কবিতা কিভাবে স্বতন্ত্র ভাষাসত্তা পেয়েছিল পরিণত কাব্য পর্যায়ে তার উদাহরণ নিয়ত পাওয়া যায়। যেমন জুহু কবিতায়—

কখন সে বাজেট-মিটিং, নারী, পার্টি পলিটিক্স, মাংস মার্সালেড ছেড়ে
অবতার বরাহকে শ্রেষ্ঠ মনে করেছিলো ;
টোমাটোর মতো লাল গাল নিয়ে শিশুদের ভিড়
কুকুরের উৎসাহ, ঘোড়ার সওয়ার, পার্শী, মেম, খোজা,
বেদুইন, সমুদ্রের তীর।
জুহু, সূর্য, ফেনা, বালি—সান্টাক্রুজে সবচেয়ে পররতিময় আত্মক্রীড়
সে ছাড়া তবে কে আর?

(সাতটি তারার তিমির)

জীবনানন্দের কবিতা কথ্যরীতির কত কাছে চলে আসতে পারে একটি উদাহরণ নিয়ে তা দেখা যেতে পারে—

> চলে এল কাছে,—
> জটার মতন খোঁপা অন্ধকারে খসিয়া গিয়াছে,
> আজো এত চুল।
> চেয়ে দেখি,—দুটো হাত, ক'খানা আঙুল
> একবার চুপে তুলে ধরি ;
> চোখ দুটো চুণ চুণ,—মুখ খড়ি খড়ি।
> থুতনিতে হাত দিয়ে তবু চেয়ে দেখি,—
> সব বাসি, সব বাসি,—একেবারে মেকি।

'খসিয়া গিয়াছে' ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হলেও এটি চলিত রীতর বাংলা ভাষাকেহ্ অঢ়ঢ তুলে ধরতে পেরেছে। কিন্তু এত উদাহরণ কুড়িয়েও আমরা জীবনানন্দের পরম পরিণত বৈশিষ্ট্য এখনো পাইনি। তিনি যখন বলেন—

> দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ
> হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা,
> ইঁদুর শীতের রাতে রেশমের মতো রোমে মাখিয়াছে খুদ,
> চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
> নির্জন মাছের চোখে, পুকুরের পারে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
> পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ—মেয়েলি হাতের স্পর্শ লয়ে গেছে তারে'

তখন জীবনানন্দের তুলনাহীন অদ্বিতীয় কবিবাণীর সৌষ্ঠব সৌন্দর্য স্বয়ংপ্রকাশ হয়ে উঠে। এখানে আঘ্রাণ, রেশম, ধূসর, তরঙ্গ, নির্জন, স্পর্শ প্রভৃতি সাধু ভাষার শব্দাবলীর সঙ্গে খুদ, মেয়েলি, পুকুর প্রভৃতি চলিত শব্দ সহাবস্থান নিয়েছে। কোথাও কোন সুরচ্ছেদের সম্ভাবনা ঘটেনি। করিয়াছে, মাখিয়াছে প্রভৃতি পূর্ণ ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয়েছে, দেখেছি, ঝরেছে, লয়ে গেছে প্রভৃতি চলিত সংকুচিত ক্রিয়াপদের সঙ্গে। এখানেও ছন্দহানি ঘটেনি। একটিও অজানা শব্দ না ব্যবহার করে তাঁর শব্দাবলী আমাদের নিয়ে গেছে অজানা অনুভবের জগতে। ধূসর গন্ধ, ঘুমের ঘ্রাণ সেই অজানিত মায়া অনুভবে আমাদের নিয়ে যায়। ইন্দ্রিয় চেতনার দ্বার খুলে দিলে এই ভাবে আন্তরিক দান প্রতিদান চলে এক ইন্দ্রিয় থেকে অন্য ইন্দ্রিয়ে। জীবনানন্দের প্রতিভার সফলতা নির্ভর করেছে এই ধরনের শব্দগুচ্ছের সহমিলন বোধের জগতে অর্থকে পৌঁছে দিয়ে। ব্যাকরণ না মেনেই সেগুলি কাব্যকে করেছে মহিমান্বিত।

জীবনানন্দের কবিতায় বেশ চোখে পড়ে ক্রিয়াপদের বৈচিত্র্য। বাংলা ভাষা ক্রিয়াপদের জন্য অনেক দিন ধরেই বিব্রত। বাক্যের কাম্য বাঁধুনিকে শিথিল করে দেয় আমাদের ক্রিয়াপদের দীর্ঘত্ব ও তরলতা। ইংরাজি ভাষার দৃঢ় সংযুক্তি বাংলার ক্রিয়াপদে আসে না। তাই মধুসূদন নামধাতু ব্যবহার করে বীররসের কাব্যে দার্ঢ্য অক্ষুন্ন রাখতে চেয়েছেন, সফল হয়েছেন অনেকাংশে। রবীন্দ্রনাথও নামধাতু ব্যবহার করার প্রবণতা দেখিয়েছেন।[১] কিন্তু জীবনানন্দ সে পথে যাননি। তিনি ক্রিয়াপদ ব্যবহারে নির্ধারিত

বৈয়াকরণিক নিয়ম না মেনে চলিত, সাধু ও আঞ্চলিক ক্রিয়াপদ একই সঙ্গে একই কবিতায় ব্যবহার করলেন—এতে বাংলা কবিতা এমন একটি স্তর লাভ করলো যা মুখের ভাষা নয়, ব্যাকরণের ভাষাও নয়, হল কাব্যভাষা, যে কোন সূ ও গভীর ভাব ব্যক্ত করতে যা সদা সক্ষম। যার নতুনত্ব আপাত বিবেচনায় ত্রুটিময় মনে হলেও পরিণাম অন্বেষী বিবেচনায় গ্রাহ্য যেমন—

> ডেকে ছিলো ভিজে ঘাস হেমন্তের হিম মাস জোনাকির ঝাড়,
> আমারে ডাকিয়াছিলো আলেয়ার লাল মাঠ—শ্মশানের খেয়াঘাট আসি'

পর পর দুটি চরণে একই ক্রিয়াপদের দুই রূপ অবলীলায় ব্যবহার করেও সুরবিভ্রাট বা ছন্দপতন হয়নি।

জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় অপূর্ব, অচিন্ত্যপূর্ব সব বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। যেমন, নোনা মেয়েমানুষ, ধূসর গন্ধ, নির্জন মাছ, ধোঁয়াটে ধারালো কুয়াশা, মেধাবী নীলিমা, হিম মাস, নষ্ট শশা, কমলালেবুর করুণ মাংস, নির্বচন মেঘ, খলখল অন্ধকার, ম্লান চুল, ঝাপসা হাত, নীল বাংলা, ক্লান্ত জামের শাখা। বিশেষণে সবিশেষ বলার আধুনিকতা ও নবীনত্ব জীবনানন্দের ছিল বলেই তাঁর কাব্য এই বিশিষ্ট চরিতার্থতা লাভ করেছে। বিশেষণ কোথাও হয়ে উঠেছে উপমা রূপক, কোথাও দান করেছে সেই সাহায্য যা দিয়ে নিরূপম চিত্রকল্প গড়ে উঠেছে। বিশেষণ ব্যবহারে জীবনানন্দ শুধু কুশলী কবিরূপেই প্রতিভাত হন না, তাঁর নিভৃত মানস প্রকৃতিও ধরা পড়েছে।

জীবনানন্দ লৌকিক মৌখিক খাঁটি বাংলার কবিতা রচনা করেছেন তার উদাহরণ আমরা জানি। রূপসী বাংলার ভাষার সৌন্দর্যকলা শতদল বিস্তার করেছে এবং সেখানে বিশুদ্ধ বাংলার আয়োজন। ইংরাজী শব্দ ব্যবহারের প্রবণতা, আরবী ভাষা ব্যবহারের লোভ কোন কিছুই সেখানে প্রশ্রয় পায় নি। কিন্তু লেখ্য ভাষার প্রায় পণ্ডিতি শব্দরূপকেও তিনি গ্রহণ করেন। সন্ধিবর্জন করা বাংলা ভাষার সচল স্বভাব। জীবনানন্দ সন্ধি সমাসবদ্ধ শব্দাবলী ব্যবহারে সৃষ্টিতে বিশেষ পারঙ্গমতা দেখিয়েছেন। তাঁর কবিতার নামগুলি লক্ষ্য করলেই এই মনোভঙ্গি ধরা পড়ে—মিতভাষণ, সিন্ধুসারস, শীতরাত, মনোবীজ, সূর্যসাগরতীরে, আকাশলীনা, খেতে প্রান্তরে, সময়সেতুপথে, প্রয়াণপটভূমি, নারীসবিতা, উত্তর সামরিকী, ইতিহাসযান প্রভৃতি। কবির প্রথম জীবন থেকে শেষ জীবনেই এই প্রবণতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। কবিতার মধ্যে প্রবেশ করলে এই উদাহ্রণ আরো বেশি মিলবে।

কাব্য যখন লৌকিক জীবনে নেমে আসার সাধনা করছে তখন ভাষাগত প্রাচীনতায় প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে ফিরে গিয়ে জীবনানন্দ স্বকীয়তাকেই রক্ষা করেছেন। কবিতার ভাষা কোন নিয়মে বদ্ধ নয়। স্বয়ং জীবনানন্দ লৌকিক মৌখিক শব্দাবলী ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে পণ্ডিতি শব্দগুচ্ছে যখন কবিতার দেহগঠন করছেন তখন আধুনিক একজন কবির ধারণাকেই যেন উদাহরণসহ স্পষ্ট করে তুলেছেন। "কবিতা রচনায় তাই কোনোরকম শব্দ সংস্কারই জরুরী নয়। কোনো কবি কবিতায় প্রাকৃত শব্দ ব্যবহার করেছেন বলে বাহবা দেওয়া যেমন অর্থহীন, সেই রকম ধ্রুপদী শব্দ ব্যবহারের জন্য প্রশংসা।"[২] কবিতায় জীবনানন্দীয় ভাষা নিজের কণ্ঠে কথা বলেছে সেইটিই তাঁর প্রতিভার সফল নির্দেশ। যে ভাষা সামাজিক সম্পত্তি সেই ভাষাকেই তিনি কাব্যের সম্পদ করে তুলতে গিয়ে গ্রহণ

২. কবিতার ভাষা, আলোক সরকার, অন্তর্বাহ পত্রিকা, ৭ম সংকলন।

বর্জনের নিয়ম মেনেছেন। রবীন্দ্রনাথকে পেরিয়ে জীবনানন্দের সিদ্ধি এসেছে বহু সাধনায়, বহুতর ক্ষমতায়। পণ্ডিত সমালোচকের ভাষায়—"সেই জন্য কবিতার ভাষা তাঁর অনুভূতির সব সংগ্রাম ও সিদ্ধির পরিচয়"।[৩]

ছন্দ।। আধুনিককালে অক্ষরবৃত্ত ছন্দের প্রধান কবি জীবনানন্দ। জীবনানন্দ পাঠ করতে করতে আমাদের শ্রুতি ও মানস যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করে তার সাক্ষে আমরা অক্ষরবৃত্ত ছন্দকে অক্ষরবৃত্ত না বলে তান প্রধান ছন্দ বলতে অনুপ্রাণিত হই। তাঁর দ্বিতীয় পর্যায়ের ধূসর পাণ্ডুলিপি, রূপসী বাংলা, বনলতা সেন, মহাপৃথিবী কাব্যের কবিতাগুলিতে অক্ষরবৃত্ত ছন্দে কী আশ্চর্য তান ফুটেছে। অনতিমুখর ছন্দঃস্পন্দে আমাদের চিত্ত মৃদু রণিত হতে থাকে। সুরের আমেজে ভরে যায় আমাদের চেতনা—

হিজলের জানালায় /আলো আর বুলবুলি / করিয়াছে খেলা।

৮ + ৮ + ৬ মাত্রার পর্বে গঠিত দীর্ঘায়িত চরণটি 'ল' অক্ষরের ধ্বনিনির্ভর নূপুর বাজিয়ে চলে এসেছে আমাদের স্নায়ুতন্ত্রীর কাছে, চরণটি পড়া শেষ করেও অনুরণন শেষ হয় না। সমস্ত চরণটিতে যেমন অনন্যদৃশ্য ছবি ফুটেছে তেমনি গান উঠেছে গুঞ্জরিত হয়ে। দৃষ্টি আর শ্রুতির প্রত্যাশা মিটিয়ে দিতে এই চরণটির সার্থক সাধনা জীবনানন্দকে প্রতিভাবিশিষ্ট কবিরূপেই চিনিয়ে দেয়।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।

চরণটিতে সেই অন্তঃশীল সুর একটি স্পষ্ট প্রকাশে লীলা করেছে। 'র' ধ্বনির তৎপরতা প্রতিটি শব্দের শেষে এমনভাবে দেখা গেছে যে অন্ত্যমিল চরণের শেষে আছে কি না আছে আমরা খোঁজ করার সময় পাই না। প্রায় প্রতি শব্দান্তিক মিলের চারুত্ব, সূক্ষ্মত্ব, সর্বোপরি পর্বের গণ্ডী অতিক্রমকারী ধ্বনি প্রবণতা চরণটিকে কবিতার প্রধান অবলম্বন করে তুলেছে। তারই সঙ্গে 'আ' স্বরবর্ণের দীর্ঘ টানা উচ্চারণও লক্ষণীয় হয়ে উঠেছে। তা আর, কা আর, কা আর, শা আর—এই সব দীর্ঘ আ স্বরের উচ্চারণ ফিরে ফিরে তরঙ্গিত তালে এসে বনলতা সেন কবিতাটির নায়ক-পরিচিতি তুলে ধরা প্রথম চরণ 'হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি'র পদযাত্রা ও কালসীমাকেই ব্যঞ্জিত করেছে। সেই ব্যঞ্জনার সূত্র শেষ চরণ পর্যন্ত পৌঁচেছে—

থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন

এইভাবে সমগ্র কবিতাটি একটি সুরের বৃত্তাকার ধ্বনিপরিধিতে বাঁধা পড়েছে।

সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দের ঝর্ণা, ইলশে গুঁড়ি আর পরীর পাখনা ও নজরুলের বলিষ্ঠ আবেগতপ্ত উদ্দাম ছন্দ গর্জনের পরে জীবনানন্দের বিষণ্ণতাঘন শান্ত কমনীয় সুরলেশমাখা ছন্দের জন্য একটু থেমে একটু ধীরতর মানসপট নিয়ে কান তৈরি করতে হয়। জীবনানন্দ লক্ষ্যে অলক্ষ্যে ছেদ ও যতির মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটিয়েছেন। তাঁর মুক্তক ও গদ্যছন্দ তাই রাবীন্দ্রিক নয়।—ড্যাস ব্যবহারের দ্বারা তিনি সেই প্রয়োজন সাধন করেছেন, মধুসূদন অতিমাত্রায় কমা ব্যবহারের দ্বারা যা করেছিলেন তাঁর অমিত্রাক্ষর ছন্দে। তৎসত্ত্বেও জীবনানন্দের ছন্দের সুরলীলা বিলম্বিত কমনীয় ধীর (deep sound অর্থে)। কারণ জীবনানন্দ অন্ত্যমিলহীন অক্ষরবৃত্ত ছন্দ লিখেও মধুসূদনের মতো ৮ + ৬ মাত্রার পর্ববন্ধন দেওয়া অটুট ১৪ মাত্রার চরণ সাজিয়ে কবিতা লেখেননি। জলতরঙ্গের মতো কম্পন তুলে

দিয়েই জীবনানন্দ আপন ছন্দকে মুক্তিপথ দিয়েছেন। কোন কঠিন কারুনিপুণতায়, কোন ছন্দ ব্যাকরণ সম্মত সংহত কলাকৌশলে সে সুরতরঙ্গের মৃদু বলয়িত মুক্তি ভ্রমণকে বাঁধতে চান নি, উচ্চকণ্ঠ করতে চান নি। সেই জন্যই কোন কোন পণ্ডিতের মনে হয়েছে জীবনানন্দ ছন্দ সৃষ্টিতে স্বচ্ছন্দ ছিলেন না। তিনি ছন্দসঙ্গীতের ক্ষেত্রে 'আলাপ'ই করেছেন বেশী, তান কর্তব ঝালাইয়ের কাজ কম। ভারতচন্দ্র থেকে নজরুল পর্যন্ত বাংলা ছন্দের যে ইতিহাস তার ঐতিহ্য অনুযায়ী জীবনানন্দও যে ছন্দ নির্মাণ করতে পারতেন তার প্রমাণ তাঁর কাব্যে অপ্রতুল নয়। কিন্তু সেখানে জীবনানন্দীয় বৈশিষ্ট্য নেই। সবার উপরে সংগীত সত্য—জীবনানন্দের কবিতা সেই সত্যকেই স্বীকৃতি দিয়েছে। আত্মপরিচয় উদ্ঘাটন কালে তিনি বলেছিলেন—'একদিন শুনেছ যে সুর ফুরায়েছে, পুরানো তা কোনো এক নতুন কিছুর আছে প্রয়োজন, তাই আমি আসিয়াছি,—আমার মতন আর নাই কেউ।' সেই নতুন সুরসাধনায় তিনি আমৃত্যু নিয়োজিত ছিলেন। আমাদের সাধনা হবে সেই সুরকে চিনে নেওয়া, মেনে নেওয়া।

ইলেকট্রন প্রোটন বিভাজনের দ্বারা যেমন আণবিক শক্তির সীমাহীন উদ্ভব সম্ভব তেমনি ছেদ ও যতির বিভাজনের দ্বারা সম্ভব হয়েছে সীমাহীন সুরস্রোত। জীবনানন্দ যা করেছেন। তাঁর কোন একটি গোটা কবিতা সেই সচল অন্তঃপাতী অথচ অবধারিত সুরে আপ্লুত প্রথম থেকে শেষাবধি। যেমন 'আট বছর আগের একদিন' যেমন 'অবসরের গান' প্রভৃতি কবিতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত একই অন্তঃশীলা স্রোতের মতো সুরে কখনো চঞ্চল, কখনো দীপ্ত, কখনো বেগায়ত, কখনো মন্থর, কখনো স্তব্ধ। আর সারা রূপসী বাংলা কবিতাটিতে সেই সুরের অর্কেস্ট্রা। সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁর 'অর্কেস্ট্রা' কবিতায় পাশ্চাত্য সংগীত অর্কেস্ট্রার বৈচিত্র্য ও সংহতিকে কবিতায় ধারণ করতে গিয়ে ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডে ভাগ করে বিভিন্ন ছন্দ ব্যবহার করেছেন। তাতে বৈচিত্র্য এসেছে সত্য কিন্তু সামগ্রিক ফলশ্রুতিতে অর্কেস্ট্রার সহনীয়তা আসে নি। জীবনানন্দের রূপসী বাংলায় তা এসেছে। যাঁদের কান ও মন তৈরি নয়, তাঁদেরই মনে হয় পুনরাবৃত্তি, পৌনঃপুনিকতা, একঘেয়েমিতে আচ্ছন্ন। কোন্ অর্কেস্ট্রাকেই তা না মনে হয়, অর্কেস্ট্রা জাজ সংগীত নয়, রক্-এন-রোল নয়। ভারতীয় উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতকেও আপাত শ্রবণে তাই মনে হয়। উত্তীর্ণ প্রতিভা তবু মুগ্ধ করতে পারেন সর্বরসিককে, জীবনানন্দও পারেন। পাঠকের অক্ষমতা ও অলসতা কবির উপর আরোপ করে দোষ বাছাই করা ঠিক নয়। আপাত বিরোধ চলে গেলেই জীবনানন্দের ছন্দে সুরে আমাদের কান তৈরি হবে। আমরা তাঁর 'শিশিরের শব্দ'গুলিও শুনতে পাবো, শুনতে পাবো পেঁচার নরম পাখনার গান। তা কালিদাসীয় মেঘমহিম মন্দাক্রান্তা নয়, সত্যেন্দ্রসম্মত ঝর্ণাকল্লোল নয়, তাই কান পাততে হয় নতুন নীরবতায়—সতর্ক সচেতনতায়।

জীবনানন্দ প্রধানতঃ অক্ষরবৃত্ত ছন্দের কবি। তাঁর দোষ গুণ কৃতিত্ব কারুকতা প্রায় সবই এই ছন্দকে অবলম্বন করে প্রকাশিত হয়েছে। অক্ষরবৃত্তের পরেই তাঁর সৃষ্টিসম্ভারে স্বরবৃত্তের স্থান। ঝরা পালক অর্থাৎ তাঁর প্রথম কাব্য থেকে শেষ কাব্য বেলা অবেলা কালবেলা পর্যন্ত এই ছন্দের উদাহরণ ও ক্রমবিকাশ আছে। চটুল চপল সত্যেন্দ্রনাথের ছন্দচাঞ্চল্যে তিনিও কান সেধেছিলেন। ঝরা পালক থেকে—

এল আমার ছায়া-প্রিয়া,
কিশোর বেলার সই গো।

পুরের বধূ ঘুমিয়ে আছে
দুধের শিশুর বুকের কাছে ;
মনের মধু,—মনোরমা,—
কই গো সে মোর, কই গো!
কিশোর বেলার সই গো! (ছায়া-প্রিয়া)

জীবনানন্দের শেষ পর্যায়ের কাব্যে যেমন বিশুদ্ধ চলিত ভাষার প্রাধান্য তেমনি স্বরবৃত্ত ছন্দের প্রতি সঠিক আগ্রহ বড় হয়ে দেখা দিচ্ছিল। অকালমৃত্যু না ঘটলে তাঁর হাতে স্বরবৃত্তের অর্থাৎ লৌকিক ছন্দের সুমহান উৎসার দেখতে পেতাম। রবীন্দ্রনাথই প্রথম লৌকিক ছন্দকে গভীর বাণীর কাব্যে স্থান দিয়েছিলেন। পলাতকা কাব্যের কবিতাগুলিতে তিনি দেখালেন স্বরবৃত্ত শুধু ছড়া রচনারই ছন্দ নয়, এ ছন্দের ধারণ ও প্রসাদ ক্ষমতা অন্য ছন্দেরই মতো। জীবনানন্দের পরে সাম্প্রতিক কালে এই ছন্দেরই প্রাধান্য। শক্তি চট্টোপাধ্যায় প্রভৃতি কবিরা ছড়ার ছন্দেই কাব্যকথা বলেন বেশী। বেলা অবেলা কালবেলা কাব্যের অনেকগুলি কবিতায় ছড়ার ছন্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন—

আমরা যদি রাতের কপাট খুলে ফেলে এই পৃথিবীর নীল সাগরের বারে
প্রেমের শরীর চিনে নিতাম চারিদিকের রোদের হাহাকারে,—
হাওয়ায় তুমি ভেসে যেতে দখিণ দিকে— যেইখানেতে যমের দুয়ার আছে ;
অভিচারী বাতাসে বুক লবণ বিলুণ্ঠিত হলে আবার আমার কাছে
উৎরে এসে জানিয়ে দিতে পাখিদেরও—শাদা পাখিদেরও সখলন আছে।
(নারীসবিতা)

নারীসবিতার মতো বিখ্যাত কবিতা ছাড়াও তোমাকে, সময়সেতু পথে, গভীর এরিয়েলে, আজকে রাতে প্রভৃতি কবিতায় তিনি ছড়ার ছন্দই ব্যবহার করেছেন অবলীলায়। দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত একটি কবিতায় তিনি লিখেছিলেন—

মৃত্যু এলে ; ম'রে যেতে হবে
ভালবাসা নদীর জলের মতন হয়ে রবে,
জলের থেকে ছিঁড়ে গিয়েও জল
জোড়া লাগে আবার যেমন নিবিড় জলে এসে। (জল)

'শ্রেষ্ঠ কবিতা' সংকলনের 'অনন্দা' কবিতাটিও স্বরবৃত্তে রচিত। স্বরবৃত্ত ছন্দেও জীবনানন্দ কতখানি স্বচ্ছন্দ ছিলেন তা বুঝিয়ে দেবার অপেক্ষা করে না। তবু জনৈক সমালোচক অভিযোগ করেছেন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বিমুখ জীবনানন্দ স্বরবৃত্ত রচনা না করে কালের দাবীকে অগ্রাহ্য করেছেন। তিনি তাই বিস্মিত হয়ে বলেছেন, "সারা জীবন পয়ারে লিখে কেন যে জীবনানন্দ 'তোমাকে ভালবেসে' কবিতায় স্বরাঘাতের আশ্রয় নিলেন, তার কোন কার্যকারণ সম্বন্ধ পাওয়া যায় না।"[৪] এই বিস্ময় পূর্বাপর বিচারহীন সমালোচকের বিস্ময়। অস্থির জিজ্ঞাসা সুস্থির উত্তর পায় না। সারা জীবনে জীবনানন্দ স্বরবৃত্তে কবিতা লেখেননি, এই সিদ্ধান্ত অসম্পূর্ণ সিদ্ধান্ত। জীবনানন্দ নিরীক্ষাবিমুখ স্বভাবকবিমন্য নন। প্রথম জীবনে হয়তো স্পষ্ট প্রভাবিত হয়ে তিনি স্বরবৃত্তে লিখেছেন, কিন্তু শেষ জীবনে আন্তর প্রেরণার তাগিদেই স্বরবৃত্তকেও গ্রহণ করছিলেন।

মাত্রাবৃত্ত ছন্দের ব্যবহার জীবনানন্দের কাব্যে একান্ত অনুসন্ধান যোগ্য। সূর্যসাগর তীরে, প্রার্থনা নামক মহাপৃথিবী কাব্যের কবিতা দুটিতে মাত্রাবৃত্ত ছন্দের উদাহরণ আছে। কিন্তু জীবনানন্দের কবিত্ব মাত্রাবৃত্ত ছন্দে তেমন প্রকাশিত হয়নি। তাহলেও ৬ মাত্রার মাত্রাবৃত্ত সুন্দর ফুটেছে সূর্যসাগরতীরে কবিতায়—

চারিদিকে স্থির-ধূম্র-নিবিড় পিরামিড যদি থাকে —
অনাদি যুগের অ্যামিবার থেকে আজিকে মানবপ্রাণ
সূর্য্যতাড়সে ভ্রূণকে যদিও করে ঢের ফলবাণ,—
তবুও আমরা জননী বলিব কাকে?
গড়িয়া উঠিল মানবের দল সূর্যসাগরতীরে
কালো আত্মার রহস্যময় ভুলের বুনুনি ঘিরে।

অনেক আগে মরীচিকার পিছে, যে কামনা নিয়ে কবিতা দুটি (ঝরা পালক কাব্যের) লিখিত হয়েছিল ঐ মাত্রাবৃত্ত ছন্দে।

জীবনানন্দ যেমন বহুতর মুক্তক ও গদ্যছন্দ লিখেছেন, তেমনি লিখেছেন সনেট ও Terza Rima ছন্দ। সমগ্র রূপসী বাংলার প্রথমটি ও কাব্যসমাপ্তি পূর্বিক তৃতীয় কবিতাটি ছাড়া অন্য সবগুলি সনেটবন্ধে রচিত। প্রধানত ৮ + ১০ মাত্রার মহাপয়ারে লিখিত। সব চেয়ে বড় চরণে পাওয়া যায় ৮ + ৮ + ৮ + ৬ মাত্রার চতুষ্পর্ব বিন্যাস। জীবনানন্দ সনেটে অন্ত্যমিল রচনার ক্ষেত্রে সাধারণতঃ পেত্রার্কাপন্থী। অষ্টক ও ষট্‌ক রচনায় তিনি অবিচ্যুত descriptive ও reflective নিয়ম অনুসরণ না করলেও মিলবিন্যাসে রক্ষণশীলতা ও বৈচিত্র্যমুখীনতা—উভয় প্রবণতাই দেখিয়েছেন। রূপসী বাংলায় 'প্রথম আট লাইনে প্রচলিত প্রেত্রার্কীয় ক খ খ ক ক খ খ ক মিল দিয়ে বাকী ছয় (দু' একটি কবিতায় পাঁচ) পঙক্তিতে অন্তত তেইশ রকমের মিলবৈচিত্র্য এনেছেন।"[৫] অন্য কাব্যের সনেটগুলিতে আরো নানা ধরনের মিলের উদাহরণ মিলবে। কিন্তু পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ জীবনানন্দের সনেটচর্চায় প্রসন্ন নন। "রূপসী বাংলার সনেটগুলির অঙ্গসন্ধি শিথিল, বাণীবিন্যাস ভাস্কর্যধর্মী নয়, চিত্রধর্মী। .....কবিকর্তৃক অনাদৃত এই গ্রন্থখানি কবির পরিত্যক্ত রচনা বলে গ্রহণ করলেই জীবনানন্দের প্রতি সুবিচার করা হবে। এর শিথিলগ্রথিত অপরিমার্জিত কলাকৃতির মধ্যে কবিপ্রতিভার স্বাক্ষর ক্বচিত কখনো উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। তার অধিক মর্যাদা এ কাব্যের নেই।"[৬] কিন্তু সনেটগত অঙ্গশৈথিল্যের (?) জন্য সমালোচকের এই সিদ্ধান্তকে কী আমরা গ্রহণ করতে পারবো? বঙ্গভাষী কেউ কি এই নির্দেশ মেনে নিয়েছেন? যে কোন প্ররোচনায় রূপসী বাংলাকে অস্বীকার অবহেলা করতে কোন পাঠকই রাজী হবেন না। জীবনানন্দের কবিতা বিশুদ্ধ কারুকৃতির থেকে অনেক বড়, অনেক আপন—একথা বলার মধ্যেই জীবনানন্দের শিল্পধর্মকে স্বীকার করা যায়।

আধুনিক কাব্যে দান্তে প্রবর্তিত Terza Rima বহুলভাবে গৃহীত হয়েছে। Terza Rima-তে লেখা ফরাসী, ইংরাজী কবিতার বাংলা অনুবাদে যেমন ঐ ছন্দপ্যাটার্ণ গৃহীত হয়েছে তেমনি মৌলিক বাংলা কবিতাও রচিত হয়েছে ঐ ছন্দে। জীবনানন্দ দান্তেভক্ত কবি, Terza Rima ছন্দ গ্রহণে তিনি সাগ্রহ ও সুকৃতি দেখিয়েছেন। যেমন অঘ্রাণ, শীত

শেষ, পায়রারা, এই শান্তি, বুনো হাঁস, (ধূসর পাণ্ডুলিপি) পথ হাঁটা (বনলতা সেন) প্রভৃতি কবিতায় জীবনানন্দের ছন্দ-অনুকৃতি প্রশংসনীয়।

উনবিংশ শতাব্দীর কবিদের মতো জীবনানন্দের কাব্যে নয়নলোভন শিল্প-দক্ষতার স্বাক্ষর স্তবকবন্ধ বিশেষ নেই। স্তবক নির্মাণে তিনি বিদেশী কবিদের দ্বারা কখনো কখনো প্রভাবিত হয়েছেন। তাই দেখতে পাই স্পেন্‌সরীয় স্তবক রীতির অনুসরণ। সুদীর্ঘ্য 'জীবন' নামক কবিতাটির (ধূসর পাণ্ডুলিপি) প্রতিটি স্তবক, আটটি সমদৈর্ঘ্য চরণ ও শেষেরটি দীর্ঘতম চরণ অর্থাৎ নয়টি চরণ বিন্যাসে গঠিত। বুনো হাঁস, হরিণেরা (বনলতা সেন) কবিতা দুটি দুই দুই চরণের শীর্ণ স্তবকবন্ধে রচিত। কখনো চতুষ্‌চরণের ব্যালাড রীতির স্তবকবৈশিষ্ট্য তিনি অনুসরণ করেছেন। একথা তবুও ঠিক স্তবক নির্মাণের আগ্রহ ও পরিশ্রম জীবনানন্দের ছন্দপ্রতিভার বৈশিষ্ট্য নয়। নিয়ন্ত্রিত স্তবকে যেন তিনি আড়ষ্ট হয়ে যান।

তাঁর কবিতায় আছে গল্পের কাঠামো, কিন্তু 'দুই বিঘা জমি'র মতো নয়। তাঁর অনেক কবিতাই দীর্ঘ নেপথ্য গল্পের প্রত্যক্ষে বর্ণিত অন্তিম পর্যায়। যেমন পাঁচিশ বছর পরে, কুড়ি বছর পরে, লোকেন বোসের জর্নাল প্রভৃতি। তাঁর অনচকিত কবিতার আমেজের মধ্যেও নাট্যস্ফুলিঙ্গ আছে। সংলাপের ঢঙে কথা বলা আছে। উত্তমপুরুষে কথা বেশী বলেন কবি। গীতিকবিতার প্রধান ধর্মকে তিনি এই ভাবে পালন করেন। মন্ময় হতে তাঁর কবিতা সর্বদা আগ্রহী। কবিতায় কোন কোন চরণে ধুয়া (refrain) চকিত আলোড়ন সৃষ্টি করে। আবার একই শব্দগুচ্ছের পৌনঃপুনিক উচ্চারণের বিক্রিয়া চমৎকার। যথা—

ভালোবেসে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে,
অবহেলা করে আমি দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে,
ঘৃণা করে দেখিয়াছি মেয়ে মানুষেরে।

... ...

সে আগুন জ্বলে যায়—দহে নাকো কিছু।
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায়
সে-আগুন জ্ব'লে যায় দহে নাকো কিছু।

কখনো একটি শব্দের ব্যবহার বার বার ঘটায় আশাতীত ফল পাওয়া যায়। যেমন 'আমাদের ক্লান্ত করে,/ক্লান্ত—ক্লান্ত করে;/লাশকাটা ঘরে সেই ক্লান্তি নাই।'

ইয়েটস বা লোরকার মতো তিনিও প্রচ্ছন্ন প্রভাবিত হয়েছেন লোকগীতির দ্বারা। সে প্রভাব খুব স্পষ্ট ভাবে ধরা পড়বার জন্য স্বতন্ত্র কোন কবিতা রচনা করেন নি জীবনানন্দ। কিন্তু তাঁর কবিতা পড়লেই বোঝা যায় রবীন্দ্রনাথের (বধূ, ঢাকিরা ঢাক বাজায় খালে বিলে : আকাশ প্রদীপকাব্য ও ছড়া কাব্য) পর জীবনানন্দই লোকসাহিত্যকে কাব্যে ঋণ হিসাবে গ্রহণ করার মানসিকতা নীরবে অর্জন করেছিলেন। মাণিকমালা, শঙ্খমালা, কেশবতী কন্যার স্মৃতি তিনি ভুলতে পারেন নি। রূপকথারূপময় কী অপূর্ব বাক্যবিন্যাস তাঁর কবিতায় করেছেন—

কড়ির মতন সাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম ;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম

চিতা জ্বলে ঃ দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।
চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার।
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার।
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

(শঙ্খমালা)

এ কবিতার বাস্তব অর্থ অন্বেষণ অবান্তর, লোককথার স্বপ্নে আমেজে এ কবিতা চর্চিত—এ অভিজ্ঞতা মনে রাখলেই আস্বাদন পুরা আনন্দজনক হয়।

প্রতীক।। আধুনিককালে অলংকার, চিত্র, চিত্রকল্প, রূপকল্প, 'বাক্‌প্রতিমা, ইমেজ, রূপক, প্রতীক প্রভৃতি শব্দগুলি কাব্যের অঙ্গনির্মিতির সুবিচারের সময় বারবার শোনা যায়। অলংকার সুপ্রাচীন শব্দ, রসশাস্ত্রকে অলংকার শাস্ত্র নাম দিয়ে এর গরিমা অনেক দূর স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। চিত্রকল্প, রূপকল্প, বাক্‌প্রতিমা শব্দত্রয়ী ইংরাজী 'ইমেজ' শব্দটির নিপুণ পরিভাষা রচনার প্রচেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন পণ্ডিতদের দ্বারা ব্যবহৃত। রূপক 'এলিগরি'র অর্থকেই বাংলা ভাষায় বোঝাতে চেয়েছে। কিন্তু প্রতীক এ সবের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। জীবনানন্দের কাব্য বিচার কালে চিত্রকল্প ও প্রতীকের সম্বন্ধে বিস্ময়বিস্ফার পরিচয় বারবার ঘটে।

চিত্রকল্প রচনায় কবি সজ্ঞান প্রচেষ্টা নিয়োগ করেন, না, অনুভূতির বাতায়ন খুলে রেখে সংশ্লেষণী কল্পনার সহায়তায় চিত্রকল্প চান অথবা সৃষ্টি করেন, তার কোন সুষ্ঠু উত্তর দেওয়া সম্ভব নয়। চিত্রকল্প মূলতঃ চিত্র হলেও তা অনুভূতি, ইন্দ্রিয়, কল্পনা, বুদ্ধি প্রভৃতি সব ক্ষেত্রের তিল তিল দান গ্রহণ করে তৈরী হয়। চিত্রকল্প একাধারে অথবা পৃথক পৃথক ভাবে শব্দ দৃশ্য স্বাদ স্পর্শ গন্ধের চিত্র আঁকে শব্দাবলীর কাব্যিক কলারীতিতে। প্রতীক কেবল কোন চিহ্ন নয়, তা অভিপ্রেত কাব্যের বহির্বিশ্ব ও অন্তর্বিশ্বের রূপে ধ্যানতন্ময়। একটি প্রতীকে একটি মানবজাতির সমগ্র ইতিহাস থাকতে পারে, আবার একক কবির ব্যক্তিমনের রঙ নিয়ে তা দেখা দিতে পারে। ব্যক্তিত্ব-অনুরঞ্জিত হয়েই প্রতীক অপরূপতা লাভ করে ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে বিশেষ কবির কাব্যে। প্রতীক অনির্দেশ্যের অভিসারী, তবু তার প্রাণ ও সৌন্দর্য মূলতঃ তার সংহতিতে। প্রতীকী কবি পরম রোমাণ্টিক আবার তীর্যক রিয়ালিষ্টিক। দুইয়ের আয়োজনে তিনি প্রতীকের সম্ভাবনাময় সুযোগ উদ্‌ঘাটন করে দিয়ে এই কথাই বলেন যে এই সর্বপরিচিত নিত্য ব্যবহৃত জগতের বাইরেই রয়েছে জীবনের প্রকৃত সত্য ও স্বরূপ, আনন্দ ও পূর্ণতা। তাই প্রতীক হচ্ছে জীবনের জীবন, কবিতার কবিতা। সে কোন কথা না বলেই অনেক কথা বলে যায়, তার অপেক্ষিত জগতে ইঙ্গিতে ডাক দিয়ে যায়। প্রতীক কোন সময়েই সাধারণ অর্থেও অর্থহীন নয়, তাই বাইরের একটি অর্থ থাকে, কিন্তু তার ভিতরের অর্থটিই প্রধান এবং সংগত এবং সুগভীর—সেই দিকেই ইঙ্গিত করা প্রতীকের প্রবল সরল ধর্ম। আবিশ্বের নানা দেশের নানা কাব্যে নানা প্রতীক ব্যবহৃত হয়েছে, তাদের মধ্যে যেমন মিল খুঁজে পাওয়া যায় তেমনি অমিলও আছে। যেখানে অমিল সেখানে তারা তাদের বিশেষ দেশ-কালের মাত্রার দ্বারা সৃজিত। যেমন, মেটারলিংকের নীলপাখি, ইয়েটসের হাঁস, রবীন্দ্রনাথের ঝর্ণা। এদের ব্যঞ্জনা ভারতবাসী

যেমন বোঝে তেমনি য়ুরোপীয়রাও। বর্তমানে আধুনিক বাঙালী কবিরা প্রতীক নির্মাণে ও ব্যবহারে সিদ্ধহস্ত।

তবু "জীবনানন্দই একমাত্র আধুনিক কবি যাঁর কাব্যে অলংকার এবং কল্পনা, চিত্র এবং চিত্রকল্প উভয়েই উভয়ের সমমর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত এবং এদের পার্থক্য বুঝতে হলেও তাঁর কবিতা অপরিহার্য।"[১১] জীবনানন্দের স্বকীয় চিত্র রচনার বৈশিষ্ট্য সহজেই ধরা পড়ে—

* আকাশ ছড়ায়ে আছে নীল হয়ে আকাশে আকাশে
* নির্জন জলের রঙ তাকায়ে রয়েছে
* কোথায় মাস্তুল তুলে জাহাজের ভিড় সব লেগে আছে মেঘে
* আঁধার বিশাল ডানা পাম গাছে—পাহাড়ের শিঙে-শিঙে সমুদ্রের পারে

চিত্রের মুখর মধুর বিস্তৃত বাণীর অতীত কিছু এরা বলে না। কিন্তু যখন পড়ি—

* জানো না কি আজো কাঞ্চী বিদিশার মুখশ্রী মাছির মতো ঝরে
* বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
* বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ
* স্বর্গীয় পাখির ডিম সূর্য যেন সোনালি চুলের ধর্মযাজিকার চোখে
* একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে অস্থির পেট্রল ঝেড়ে
* কোকিলের গান বিবর্ণ এঞ্জিনের মতো খ'শে খ'শে চুম্বক পাহাড়ে নিস্তব্ধ
* হীরের প্রদীপ জ্বেলে শেফালিকা বোস যেন হাসে।

তখন বুঝতে পারি নিছক চিত্রের সীমিত অর্থে এগুলি আবদ্ধ নয়। বাস্তবাতীত কল্পনার রঙ, বক্তব্যের বেধ এতে মিশেছে। উদাহরণগুলিতে নিসর্গসাহায্য যেমন আছে, তেমনি নাগরিক সভ্যতার যান্ত্রিক পরিচয়ও আছে—কিন্তু জীবনানন্দীয় চিত্রকল্প নির্মাণে উভয়েই সমান সমর্থ। তাঁর হেমন্ত ঋতুর বর্ণনা যেখানে তিনি করেছেন, সেখানে মাঠ, ঘাট, আকাশ, অরণ্য, নদীতে তিনি যা দেখেছেন তারই মধ্যে তাঁর রচিত বাংলা সাহিত্যে অদৃষ্টপূর্ব শ্রেষ্ঠ চিত্রকল্পগুলির সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। হেমন্ত জীবনানন্দের কাব্যে চিত্রকল্পের পরিধি অতিক্রম করে প্রতীকদ্যোতনায় অনুস্যূত হয়েছে।

জীবনানন্দের কাব্যে নীড়, নক্ষত্র, নদী, পেঁচা, স্তন, পাণ্ডুলিপি, ঘোড়া, সিন্ধুসারস বা পাখি প্রভৃতি উপাদান বারবার ব্যবহৃত হয়েছে প্রতীক রূপে। বাংলা কাব্যে জীবনানন্দই প্রতীকের প্রধান কবি। ইয়েটস-এর মতো তিনিও বলতে পারতেন— I have no speach but symbol. তাঁর কবিতা বক্তৃতা নয়, স্বগতভাষণ। স্লোগান নয়, স্বরূপ অন্বেষণ। স্বগত -ভাষণের প্রায় সর্বত্রই প্রতীক আনয়নের কৃতিত্ব। প্রতীক রূপকে নয়, স্বরূপকে ধারণ করে। সব সময় তা 'transparent flame of a spiritual lamp' নয়, কিন্তু সব সময় ধারণাতীতকে সংবেদনের কাছে, অনুভূতির কাছে এনে দেয় নিগূঢ়ার্থ সুষমা ও বিপুলায়তন সাযুজ্য।

'পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন'—এই নীড় পাখির হলেও পাখির নয়। নীড় বিশ্রামের প্রতীক, সন্তান ও সান্ত্বনার আধার। হাজার বছর ধরে পথহাঁটা পথিক ক্লান্ত হয়ে যখন মমতাময়ী দুটি আঁখির আলো দেখে ও শোনে 'এতদিন কোথায়

ছিলেন' চারু সম্ভাষণকাঙ্ক্ষিত প্রশ্ন, তখনই প্রশ্নকারিণী নায়িকার দীঘল চোখ দুটিকে পাখির নীড়ের প্রতীকে না ধরতে পারলে কিছুই ধরা হত না। চারিদিকে যখন জীবনের সমুদ্র সফেন তখন শাখায় বাঁধা নীড় যে কোন মুহূর্তে খসে পড়ার ভেসে যাওয়ার ডুবে যাওয়ার সম্ভাবনা। তাই চোখের নীড়ের জন্যে কবির মনে এমন এক অমোঘ ভালোবাসা আছে যা কেবল অনুভবগম্য। শুধু সফেন সমুদ্র নয়, অন্ধকারও সীমাহীন হয়ে আছে নায়ক নায়িকার চারপাশে। মুখোমুখি বসবার অন্ধকার যতই প্রিয় হোক না কেন, তা দু'চোখের নীড়ের অবয়ব দেখতে দেয় না। আর ঐ 'নীড়' প্রতীকটির ব্যঞ্জনার সূত্র ধরে দিতে জীবনানন্দকে আরো দূরপ্রসারী ও গভীরতর স্তরের উপমা, চিত্রপ্রতিমা আনতে হল—

অতিদূর সমুদ্রে 'পর
হাল ভেঙ্গে যে-নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

বনলতা সেন কবিতায় নায়িকার দেহবর্ণনা আছে। সে সবই চমৎকার। কবির সংযত বিস্ময়, উদ্বেলিত উচ্ছ্বাস কিন্তু নিটোল পূর্ণতা পেয়েছে ক্লাসিক দেহবর্ণনায় নয়, রূপকমালা গ্রন্থনে নয়, রোমান্টিক আঁখি অঙ্কনে। নীড় আর আঁখি কবিতাটিতে এমনই সংযুক্ত ও ওতঃপ্রোত যে কোন ধারালো বিশ্লেষণেই তাদের বিশ্লিষ্ট করা যায় না। অথচ 'নীড়' শব্দটি অনেক কথার ধারক। উদ্ধৃত অংশে নাবিকের চোখের কথা আছে, কিন্তু তা প্রতীক নয়। সে চোখ বিস্ময় বিমুগ্ধ আশাউজ্জ্বল হলেও নয়। বনলতার চোখ দেহাংশ মাত্র নয়—প্রতীক, অনন্ত ব্যঞ্জনায় যে প্রতীক সমাহিত। জীবনানন্দের কাব্যে 'নীড়' বারবার প্রতীক বিশেষে ব্যবহৃত হয়েছে। নীড় যেমন আশ্রয়দ্যোতক তেমনি আশ্রয়চ্যুতির আভাসও বহন করে—

ধানকাটা হয়ে গেছে কবে যেন ক্ষেতে মাঠে পড়ে আছে খড়
পাতাকুটো ভাঙা ডিম—সাপের খোলস নীড় শীত।

'একটি নক্ষত্র আসে' নামক কবিতায় জনৈক নায়িকার আগমন প্রতীক্ষার প্রতীক হয়ে উঠেছে নক্ষত্র। নক্ষত্রের প্রভাব কবিমন বিশ্বাস করে ও বিশ্বাস করায়—'এ রকম হিরণ্ময় রাত্রি ছাড়া ইতিহাস আর কিছু রেখেছে কি মনে'। এমনিভাবে নক্ষত্র হয়ে উঠেছে চিরন্তনতার, বিশ্বাসের, ভালোবাসার, অমরত্বের প্রতীক। অন্যত্র অন্য কবিতায় শুনি 'নক্ষত্রেরা চুরি করে নিয়ে গেছে, ফিরিয়ে দেবে না তাকে আর'। এই উক্তিতে একটু রূপকথার আমেজ আছে, কল্পনার ভঙ্গিমাও বলা যায়, কিন্তু এ নক্ষত্র প্রতীক মাত্রা লাভ করে নি। অথবা হাওয়ার রাত কবিতায় শুনি—'যে নক্ষত্রেরা আকাশের বুকে হাজার হাজার বছর আগে মরে গিয়েছে তারাও কাল জানালার ভিতর দিয়ে অসংখ্য মৃত আকাশ সঙ্গে করে এনেছে।' এই উক্তিতে বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আছে, আছে কবি-ভাবনার চমৎকারিত্ব, নক্ষত্র প্রীতির অবাধ উৎসারণ কিন্তু প্রতীকের দ্যোতনায় তা নিগূঢ় গভীর নয়। জীবনানন্দ নীলিমার কবি। অন্ধকারে নীলিমা হারিয়ে গেলে থাকে কবির আশ্বাস, বিশ্বাস, স্থিতির প্রতীক ঐ নক্ষত্র।

জীবনানন্দের কাব্যে পাণ্ডুলিপিও প্রতীক হয়ে উঠেছে। মনে হয়, এর পিছনে দান্তের প্রতীক ভাবনার প্রভাব আছে। দান্তেই প্রথম কাব্য জগতে আধুনিক প্রতীক ব্যবহার করেন।

জীবনানন্দ দান্তের সম্বন্ধে উৎসুক শ্রদ্ধাবান ছিলেন।[৮] গ্রন্থ, পাণ্ডুলিপি, পুঁথি, বইয়ের পাতা, শাস্ত্র প্রভৃতি প্রতীকের মাধ্যমে মানুষের শাশ্বত চিন্তা, শাশ্বত জ্ঞানের কথা বলেছেন দান্তে। জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপির প্রতীকে ইতিহাসবোধের ব্যক্ত অব্যক্ত ভাবনা রক্ষিত আছে। এশিরিয়া মিশরীয় প্রাচীন সভ্যতার অন্বেষণেও কবি খুঁজে পেয়েছিলেন লক্ষ লক্ষ পাণ্ডুলিপির পরিচয়। তাই তিনি বলেন—

ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্রপারের কাহিনী
অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা,
লুপ্ত নাসপাতির গন্ধ,
অজস্র হরিণ ও সিংহের ছালের ধূসর পাণ্ডুলিপি।

(নগ্ন নির্জন হাত)

কিন্তু উদ্ধৃতিতে পাণ্ডুলিপি প্রতীক হয়ে উঠেনি। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' কাব্যনামে সেই প্রতীকের প্রতিষ্ঠা। সব ধ্বসে যায়, ক্ষয়ে যায়, মরে যায়, কিন্তু মানুষের কীর্তি-কথা থেকে যায় পাণ্ডুলিপির বুকে সাজানো অক্ষরে। হাজার বছর পথহাঁটা প্রেমের পূর্ণতার ইতিহাস লিখে রাখতে হবে, তাই পাণ্ডুলিপির আয়োজন চলে—'পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন/তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল'। প্রতীতি কবিতায় কবি বলেছেন—

সময় কাটায়ে গেছে মোহ ঘোচাবার
আশা নিয়ে মঞ্জুভাষা, ডোরিয়ান গ্রীস,
চীনের দেয়াল, পীঠ, পেপিরাস, কারারা-পেপার।

পেপিরাস—প্রাচীন পুস্তকের পাতা যে আশার ধারক হয়ে আছে, সেই আশার ভাষা আছে বেদের পাতায়—'একদিন সমুদ্রের কালো আলোড়নে/ উপনিষদেরও শাদা পাতাগুলো ক্রমে ডুবে যাবে'।

হোমার ও মধুসূদনের কাব্যে যেমন প্রাণীনির্ভর অলংকারগুলি প্রাচুর্যে, প্রাণময়তায়, বৈশিষ্ট্যে ভুবননন্দিত তেমনি জীবনানন্দের কাব্যে প্রাণ-প্রতীকও অজস্র। পাখি, পেঁচা, পায়রা, হরিণ, ইঁদুর, হাঁস, সিন্ধুসারস, দোয়েল, বিড়াল প্রভৃতি বিচিত্র প্রতীকের আয়োজনে কবি কখনো কালচেতনা, কখনো প্রেমচেতনা, কখনো ব্যর্থতাবোধের, কখনো শাশ্বত মানব অস্তিত্বের কথা বলেছেন। এই সব প্রতীক বাংলা কাব্যের ঐতিহ্য-বিরোধী নয়। চর্যাপদের পৃষ্ঠায় এমন উপাদান অজস্র। 'তিন ন চ্ছুপই হরিণা পিবই ন পানী/হরিণা হরিণীর নিলয় ন জানী'—চর্যাপদের এই হরিণই জীবনানন্দের ঘাই হরিণী হয়ে এসেছে যেন।

জীবনানন্দ এই ভাবেই রীতিচমৎকার কবি। ছন্দকুশলী বা ভাষাবিদ্, প্রতীকী বা নব্যরীতিস্রষ্টা প্রভৃতি কোন একটি বিশেষণে সম্পূর্ণ জীবনানন্দকে জানানো যায় না। তাঁর কাব্যে আপাত জ্ঞানে যে অনাচার, তা সচেতন সম্ভাবনা অন্বেষী ও যুগক্রান্তির লক্ষণাক্রান্ত। রবীন্দ্রনাথকে অতিক্রম করতে গিয়ে জীবনানন্দ ও সমসাময়িক কবিরা কাব্যের রাবীন্দ্রিক রীতিনীতিকে ভেঙেছিলেন। জীবনানন্দই সবচেয়ে বেশি ভেঙেছিলেন। রীতিমত ঐতিহ্য রক্ষা করেও যে তিনি উত্তীর্ণ কবিতা ছন্দে ভাষায় ভাবে অলংকারে লিখতে পারতেন তার প্রমাণ তাঁর কাব্যে অপ্রতুল নয়। তবু যখন দেখি ছন্দের নিয়ম তিনি মানেন নি, তখন উত্তর

৮ 'কি হিসাবে শাশ্বত' প্রবন্ধ, কবিতার কথা

পাবার জন্য দ্বিতীয়বার চিন্তা করতে হয়। সাম্প্রতিক কালের একজন কবি বলেছেন—"বিশেষ করে ছন্দ মেলাবার জন্য কবিতার দেহ বিঘ্নিত করা আমার কাছে অসহনীয় অপরাধ।"[১] জীবনানন্দ সম্বন্ধেও কি একথা ভাবা যায় না? কবিতার নিগড় ভেঙে মধুসূদন ও জীবনানন্দ দু'জনেই দুই শতাব্দীতে কীর্তি রেখেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'টবের কবিতা'কে প্রান্তরে রোপণ করে জীবনানন্দ কবিতায় প্রাকৃত প্রাণত্ব অনেক বেশি এনেছেন। জীবনানন্দ সেই কবি যিনি প্রতীকের সম্ভাবনাময় বাতায়ন খুলে স্বরূপের অপরূপতাকে ধরতে চেয়েছেন। কাব্যের এতদিনের চেনা কাঠামো তাই তাঁর কাব্যে কবিতার আন্তর প্রয়োজনে ভাঙা। জীবনানন্দ বিভ্রান্ত যুগের বিভ্রান্ত কবি বলেই তাঁর কাব্যকলায় স্থিতি নেই নিয়ম নেই—এ যুক্তি অসংগত। একই যুগে জন্মে তাহলে সুধীন্দ্রনাথ সম্ভব হতেন না। শব্দ ব্যবহারের স্বাধীনতা দেখেও জীবনানন্দের বিরুদ্ধে অনেক অভিযোগ। কিন্তু অমান্য করা যায় না এ সিদ্ধান্ত যে—"শব্দচয়নের ঐশ্বর্যে জীবনানন্দ সম্ভবতঃ এ যুগের সবচেয়ে সমৃদ্ধিমান কবি। আর সে শব্দ চয়নে কৃত্রিম প্রয়াসের চিহ্ন একেবারেই অনুপস্থিত, এই তার সাফল্য।"[১০] তাঁর কবিতা সম্বন্ধে দুর্বোধ্যতার অভিযোগের যুগ আমরা উত্তীর্ণ হয়ে এসেছি। তাঁকে আমরা ভালবাসতে শিখছি, শিখেছি। জীবনানন্দ তাঁর নিজের কাব্যভুবনে নিজেই অনবদ্য, অদৃশ্যপূর্ব। তাঁর ত্রুটির, অস্বাভাবিকতার, জটিলতার অভিযোগগুলি পার হয়ে জীবনানন্দ সম্বন্ধে সানন্দে সবিস্ময়ে শেষ মন্তব্য করতে হয় যে জীবনানন্দ রীতিচমৎকার কবি।

জীবনানন্দের কবিতায় চিত্রকল্প

অম্বুজ বসু

বাক্‌প্রতিমা : ১৯৩০ সালে জীবনানন্দ দাশের কবিতা পড়ে রবীন্দ্রনাথ মন্তব্য করেছিলেন জীবনানন্দের কবিতা হলো 'চিত্ররূপময়'। এর আগে 'ঝরাপালক' প্রকাশিত হয়ে গেছে। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' রচনাও সমাপ্ত ; তবে গ্রন্থাকারে প্রকাশ হতে আরো কয়েক বছর দেরী রয়েছে। এই সময়ে জীবনানন্দের কবিতা সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের এই উন্মোচনী অভিধা বিস্ময়কর অন্তর্দৃষ্টির কথা সন্দেহ নেই। কেননা জীবনানন্দের কবিতা যে যে গুণে আমাদের প্রিয়, তার মধ্যে চিত্ররূপময়তা নিশ্চয়ই একটা বড়ো গুণ। কিন্তু সে গুণের বিকাশ হয়েছে ক্রমে ক্রমে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'রূপসীবাংলা', 'মহাপৃথিবী' এবং 'সাতটি তারার তিমির'-এ। এ বইগুলির একটিরও সাক্ষাৎ পরিচয় না পেয়ে, দুএকটি বিচ্ছিন্ন কবিতা দেখে অভ্রান্ত ভবিষ্যৎ-দ্রষ্টার মতো একটি উন্মেষশীল কবিচিত্তকে এভাবে চিনতে পারা ও নির্দেশ করা বিস্ময়কর বৈকি!

আজ জীবনানন্দের এই চিত্রসামর্থ্য সম্পর্কে সম্ভবত সব সমালোচকই একমত। "এবং এই জন্যেই তাঁকে একটি সংস্থা বা institution বলা হয়।" এতবড় সশ্রদ্ধ সিদ্ধান্তের পরেও প্রাজ্ঞ সমালোচক শ্রীশুদ্ধসত্ত্ব বসু মন্তব্য করেছেন "চিত্রসৃষ্টি তাঁর নিজস্ব ভংগীতেই তিনি করেছেন—তবু কাব্যে চিত্রকল্প সৃজনের ক্ষেত্রে তাঁকে আমরা পথিকৃতের গৌরব দান করতে পারি না।"

চিত্রকল্প সৃষ্টিতে জীবনানন্দ পথিকৃত কিনা তা আজকে আমার বিচার্য নয়। বাংলা ভাষায় প্রথম চিত্রকল্প স্রষ্টা কে, তিনি সচেতন স্রষ্টা কিনা, এসমস্ত কূটতর্ক ভাবী সমালোচকদের জন্যে সরিয়ে রেখে আমি শুধু দেখাবার চেষ্টা করবো জীবনানন্দ চিত্রকল্প নিয়ে কি ভেবেছেন বা কি করেছেন। আলোচ্য উদ্ধৃতি প্রসঙ্গে আমার বিনীত বক্তব্য এইমাত্র যে, চিত্র ও চিত্রকল্প সৃষ্টিকে একাকার করে শুদ্ধসত্ত্ববাবু প্রমাদে পড়েছেন। 'চিত্র' মাত্রই 'চিত্রকল্প' হলে চিত্রকল্প শব্দটি উদ্ভাবনের প্রয়োজন হতো না। আমার তাই মনে হয় আজকের আলোচনা—চিত্রকল্প কি, এখান থেকেই শুরু হলে ভাল হয়।

'গল্প যেমন চিরকালের জিনিস কিন্তু 'ছোটগল্প' হাল আমলের আবিষ্কার, কবিতায় শব্দচিত্র তেমনি আবহমানের জিনিস বটে কিন্তু 'চিত্রকল্প' আধুনিক কালের যোজনা। বাংলা কবিতায় এই রূপ ও প্রকরণটি এসেছে ইংরেজি সাহিত্যের অনুসৃতিক্রমে। মূল ইংরাজী শব্দটি হলো 'ইমেজ' যার প্রাচীন ও সহজ অর্থ হলো 'শব্দ দিয়ে তৈরি ছবি'। একে 'চিত্র' বললে দোষ হয় না কিন্তু কবিতার ইমেজ আজ বিবর্তনের পথে অনেকটা পৃথক হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই পার্থক্য নির্দেশ করতে আমরা দুটো দৃষ্টান্ত দিচ্ছি—

ডাকিয়া কহিল মোরে রাজার দুলাল,
ডালিম ফুলের মত ঠোঁট যার রাঙা আপেলের মত লাল যার গাল,

চুল যার শাঙনের মেঘ,—আর আঁখি গোধূলির মত গোলাপী রঙীন,
আমি দেখিয়াছি তারে ঘুমপথে, স্বপ্নে কতদিন।

এখানে এই যে শব্দ দিয়ে আঁকা ছবি রাজপুত্রের ঠোঁটের রঙ, গালের রক্তাভা, চুলের নিবিড় কৃষ্ণরূপ—বস্তুরূপকেই যেন চিত্রপটের মতো এঁকে তুলছে, কিন্তু কোনো ভাবকে ফুটিয়ে তোলা কল্পনাকে জাগিয়ে তোলার শক্তি তো এসব ছবিতে নেই। 'আঁখি গোধূলির মতো গোলাপী রঙিন,' এ তো চোখের রঙ নয়, এখানে সন্ধ্যারাগের মদির আবেশ, বিবাহলগ্নের উচ্ছলতার অবচেতনায় মিশে যায় ; কিন্তু কবি যখন বলেন :

মা-মরা শিশুর মতো আকাঙ্ক্ষার মুখখানা কি যে
ক্লান্তি আনে, ব্যথা আনে, তবুও বিরল কিছু নিয়ে আসে নিজে

আকাঙ্ক্ষার ব্যর্থ বিষণ্ণতা ব্যক্ত করতে মা-মরা শিশুর করুণ বিমর্ষ মুখের প্রতিভাস আমাদের মনে এমন গেঁথে দেবার শিল্পিতা, এটা একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন, একেবারে নতুন জিনিষ। এতো নিছক একটা ছবি নয়—একটা ভাবনাও। আকাঙ্ক্ষার আগে একটি দুটি বিশেষণ দিয়ে কেমন আকাঙ্ক্ষা তা বোঝানোর নিষ্ফল চেষ্টা না করে তার দৈন্য তার অসহায়তাকে এমন একটা স্পষ্ট মূর্তি দিয়ে প্রকাশ করতে একটা কবির প্রতিভারই প্রয়োজন হয়েছে। এটাই হলো চিত্রকল্প। কবিতার এই যে নূতন প্রকরণ এর গুরুত্ব ও বৈশিষ্ট্য বোঝাতে Ezra Poundকে বলতে হয়েছে—

An 'Image' is that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time..... It is the presentation of such a complex instantaneously which gives that sense of sudden liberation, that sense of freedom from time limits and space limits, that sense of sudden growth which we experience in the presence of the greatest works of art.

It is better to present one Image in a lifetime than to produce voluminous works.

চিত্রকল্প যদি চিত্রমাত্র হতো তাহলে তা কবির সারাজীবনের সাধনার শ্রেষ্ঠফলও হতো না, অত বিরলও হতো না।

চিত্রকল্প শুধু চিত্র নয়। যদিও শব্দচিত্রই বিকাশের একস্তরে চিত্রকল্প হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা ছিল সাজানো ছবির অ্যালবামে, বর্ণনার বর্ণালী পেরিয়ে তা পৌঁছেছে মনের মণিমঞ্জুষায়। তুলি আর রঙের সঙ্গে মিশেছে কল্পনার অভিজ্ঞান। তাই 'চিত্র' দিয়ে যে Imageএর প্রতিশব্দ হয় না একথা রসজ্ঞরা সকলেই অনুভব করেছেন। রবীন্দ্রনাথ 'ইমেজ'এর বদলে লিখেছেন 'রূপক'। ড. অমলেন্দু বসু 'বাক্‌প্রতিমা' শব্দটি উদ্ভাবন করেন। 'চিত্রকল্প' শব্দটি কবে কে প্রথম ব্যবহার করেছেন, আমি জানি না। যিনিই করুন তাঁর কাছে আমরা কৃতজ্ঞ। কাউকে কাউকে আবার ব্যবহার করতে দেখেছি 'রূপকল্প'ও।

'রূপকল্প' শব্দটির ব্যবহারে পারিভাষিক জটিলতা সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের আলোচনার প্রয়োজনে 'বাক্‌প্রতিমা' শব্দটিকে 'ইমেজ'-এর প্রতিশব্দ হিসাবে রেখে অন্য দুটি শব্দের অর্থ পরিধি অনেকখানি কমিয়ে আনতে চাই। আমার প্রস্তাব এজ্রা পাউন্ডের সংজ্ঞানুযায়ী কোন অমূর্ত ভাব বা বস্তুরূপ পরিস্ফুট করতে যখন একটি অভিব্যক্তিময় চিত্র উদ্ভাবিত হয় কবিপ্রতিভার সেই অনবদ্য উন্মোচনই শুধু 'চিত্রকল্প'। 'রূপকল্প' শব্দে আমরা কি বোঝাতে চাই তা যথাস্থানে নিবেদিত হবে।

চিত্রের সঙ্গে চিত্রকল্পের প্রভেদ নির্দেশ করে বলা যেতে পারে চিত্রকল্প মাত্রই

অল্পবিস্তর কল্পনাশ্রয়ী। কিন্তু কল্পনার এমন অভিজ্ঞান কি প্রাচীন রচনাতে পাওয়া যায় না? মহাকবি কালিদাস যখন স্বয়ংবর সভায় ইন্দুমতীর রূপবর্ণনায় লিখলেন 'সঞ্চারিণী দীপশিখাইব' তখন সেই ব্যঞ্জনাগর্ভ উপমার আলোতে বারঙ্গনার প্রদীপ্ত লাবণ্যই তো দেখিনি আমরা, দেখতে পেয়েছিলাম অগ্রসরমান রমণীর বরমাল্যের প্রত্যাশায় উদ্দীপ্ত ও পরমুহূর্তেই হতাশাম্লান রাজপুরুষদের মুখচ্ছবিও। এইরকম রক্ষণাযুক্ত উপমায় চিত্রকল্পের সম্ভাবনা ছিল। কিন্তু সেই সম্ভাবনা বিকশিত হয়নি এদেশে, কালিদাসের উত্তরসাধকদের হাতে। আমাদের গিয়ে দাঁড়াতে হলো ফরাসী প্রতীকী কবিদের দরবারে।

প্রতীকী কবিরাই প্রথম কবিতায় বাচ্যার্থ পরিহার করে চেতনার অবাচ্য অনুভূতিগুলিকে অবয়ব দিতে চিত্রের, চিত্রকল্পের মুখ অবারিত করে দিলেন। প্রতীকী কবি গুস্তাভ খান চিত্রকল্পের গুরুত্ব বাড়িয়ে দিলেন। তাঁকে অনুসরণ করে এলেন নূতন এক কাব্য আন্দোলনের নায়করা—টি. ই. হালমে, এফ. এস. ফ্লিন্ট ; লাফর্গের অনুসরণ করে এলেন মার্কিনী কবি টি. এস. এলিয়ট এবং এজরা পাউন্ড। কবিতা থেকে কৃত্রিম আবর্জনা জ্ঞানে এঁরা ছন্দ, মিল এমনকি চিরাচরিত অলংকারগুলিও বাদ দিতে চাইলেন। ভিক্টোরীয় যুগের সুনির্দিষ্ট বিষয়বস্তুও বাতিল হলো। এলো নতুন মুক্তবন্ধ ছন্দ, বাকসংহতি, কান্তি, যথাযথ্য ও লক্ষ্যভেদী শব্দচয়ন। আর কবিতার বরাঙ্গ হয়ে এলো নূতন ঐশ্বর্য চিত্রকল্প। আন্দোলনের নামই হলো ইমেজিসম্।

১৯১০ সালে প্রকাশিত হলো টি. এস. এলিয়টের Potrait of a Lady প্রথম সার্থক চিত্রকল্পবাদী কবিতা। নূতন ধরনের চিত্রকল্প দেখা গেল এইসব কবিতার মধ্যে। ব্যঙ্গদিগ্ধ এক অভিজাত রচনারীতি নূতন যুগের সূচনা করলো। ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হলো প্রথম কবিতা সংকলন "Some Imagist Poets" ভূমিকায় ঘোষিত হলো—'বাকসংহতিই কবিতার প্রাণরস।

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে চিত্রকল্পবাদী কবিদের সংযোগ ছিল পূর্বাবধি। 'বলাকার' নূতন প্রকাশভঙ্গী ও নূতন ছন্দ হয়তো এই সংযোগেরই ফলশ্রুতি। অবশ্য চিত্রকল্পবাদের আরো গভীরে রবীন্দ্রনাথ পৌঁছেছেন আরো পরে। সে তাঁর গদ্যকবিতা 'পুনশ্চ'র কাল ১৯৩২ সাল। তারও আগে ১৯৩০-এর মধ্যেই জীবনানন্দ যে এক সিদ্ধিতে পৌঁছেছেন একথা উপলব্ধি করতে রবীন্দ্রনাথের কোনো অসুবিধা হয়নি। পাশ্চাত্য কবিদের এই ঋণ সম্পর্কে জীবনানন্দের স্বীকারোক্তি খুব স্পষ্ট। তিনি লিখেছেন :

> "আধুনিক বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য দিকটার অভ্যুত্থান হল নতুন সময় তার নতুন দায়িত্ব নিয়ে এসেছে বলে। মধুসূদন যেমন বিদেশী সাহিত্যিকদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী—রবীন্দ্র-বঙ্কিমও তাঁদের কাছে অল্পাধিক গিয়েছিলেন—বর্তমান কবিদেরও অল্পবিস্তর পরস্পর নিঃসক্ত বিশেষ বিশেষ গোষ্ঠী তেমনি বোদেলেয়র ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের কাছ থেকে শুরু করে ইয়েটস, এলিয়ট ও পাউন্ডের কাছে গেল খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমা সে সব জায়গায় খুঁজে পেয়েছে বলে।.... অন্ততঃ যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি, রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট সম্ভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভারলেন, রঁসার ও ইয়েটসের সদর্থক মনন বিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।"
>
> —রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা।

জীবনানন্দ তাঁর কোনো রচনায় 'চিত্রকল্প' শব্দটি ব্যবহার করেন নি। কিন্তু 'উত্তর রৈবিক বাংলা কাব্য' প্রবন্ধে 'ইমেজিসম' শব্দটি উল্লেখ করে এই আন্দোলনের প্রভাব স্বীকার

করেছেন। তখনো চিত্রকল্প শব্দটি উদ্ভাবিত হয়েছিল কিনা বা হয়ে থাকলেও জীবনানন্দের জানা ছিল কিনা বলতে পারবো না। কিন্তু তার কবিতাতে চিত্রকল্পের সজ্ঞান ও সর্বতোমুখী ব্যবহার এই ইঙ্গিতই স্পষ্ট করে যে চিত্রকল্পবাদী কবি যদি বাংলা ভাষায় কেউ থাকেন তবে তিনি জীবনানন্দই।

পাউন্ড একদা ইয়েটসের সম্পর্কে লিখেছিলেন :

> "মিঃ ইয়েটস কি চিত্রকল্পবাদী? না মিঃ ইয়েটস প্রতীকী কবি। কিন্তু তিনি পূর্বতন অনেকগুলো ভালো কবির মতই অনবদ্য চিত্রকল্প রচনা করেছেন। সুতরাং তাঁর বিরুদ্ধে কিছুই বলার নেই, এবং আমি যতদূর জানি তাঁর ও চিত্রকল্পবাদীদের বিরুদ্ধে, 'তাঁদের নারকীয় ছন্দ' এই মন্তব্যটি ছাড়া আর কিছু বক্তব্য ছিল না।"

কথাগুলি জীবনানন্দ সম্পর্কেও প্রযোজ্য। জীবনানন্দও প্রতীকী কবি, ইয়েটসের দ্বারা প্রভাবিত ও তাঁর সমধর্মী। ইয়েটসের মতই জীবনানন্দও ছন্দের ব্যাপারে চিত্রকল্পবাদীদের মত যথেচ্ছাচারী নন। তবু আরো উত্তরকালের মানুষ হিসাবে জীবনানন্দের পক্ষে চিত্রকল্পবাদীদের রচনারীতির সফলতাগুলি আত্মস্থ করা ও বিফলতাগুলি এড়িয়ে যাওয়া সহজ হয়েছিল। জীবনানন্দ যখন লেখেন :

> "আধুনিক কালের প্রাণের কথা একদিক দিয়ে যেমন সংহতি সন্ধান করছে অন্যদিক দিয়ে তেমনি তথাকথিত আপেক্ষিক কালের প্রতীকের মতো সমাজ জীবনের আধুনিক বন্দিদশার সীমা লঙ্ঘন করে অমেয়তার অন্তঃকরণে ছড়িয়ে পড়তে চাচ্ছে"।

তখন বোঝা যায় চিত্রকল্পবাদীদের সঙ্গে তাঁর কতখানি চিন্তা ও চেতনার মিল।

চিত্রকল্প : বাংলা সাহিত্যে সার্থক ও অজস্র চিত্রকল্প সৃষ্টিতে জীবনানন্দ দ্বিতীয়রহিত। বাংলা কাব্যে তিনি এর প্রবর্তক যদি নাও হন—এর নির্বিকল্প প্রতিষ্ঠা যে তাঁর কবিতার মাধ্যমে তাতে সন্দেহ নেই। 'বনলতা সেন'-এর চিত্রকল্পগুলির দূর-প্রসারী ব্যঞ্জনা নিয়ে অনেকেই আলোচনা করেছেন। তবু তারই একটি নমুনা নেওয়া যাক—

> চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা
> মুখ তার শ্রাবস্তীর কারু-কার্য

সুপ্রাচীন লুপ্ত-ইতিহাস বিদিশার রাত্রির অন্ধকারের দিশাহীনতার কথা স্থগিত থাকুক আপাতত। প্রশ্ন করবেন না এর অব্যবহিত পরের দারুচিনি দ্বীপের সন্নিহিত ভগ্নহাল নাবিকের চিত্রকল্প এড়িয়ে যাচ্ছি কেন। শুধু মুখের ওই অংশটুকু দেখুন 'মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য'। এখানে শুধু মুখের নিখুঁত নিটোল গঠনই কি কবির বাচ্য? অথবা, সেই কথাটুকুকে বক্রোক্তিতে কাব্যময় করে তোলা? প্রাচীন ভারতের এক শিল্পসমৃদ্ধ স্বর্ণযুগের অভিজ্ঞান কি এতে নেই যার ফলে একটি নারীর মুখশ্রীতে ভারতীয় সৌন্দর্যপিপাসা ও প্রেমের কালাতিসরণ বোঝা যায়? 'শ্রাবস্তীর' অনুষঙ্গে তো আর্য-নারীত্বের ব্যঞ্জনা পেয়েছেন শ্রদ্ধেয় সঞ্জয় ভট্টাচার্য। কারুকার্য কথাটিতে কেন জানি না আমার তো গ্রীক ভাস্কর্যের সংহত সুষমা ও শরীরী লাবণ্যের স্মৃতি আসে।

চিত্রকল্পে যেহেতু কল্পনার স্থান অনেকখানি তাই পাঠকের মনোগঠনের বাসনালোকের তারতম্যে তার গ্রহণশীলতার তারতম্য ঘটবেই। একই চিত্রকল্প নানা মানুষের চেতনায় নানা সূক্ষ্ম তাৎপর্য নিয়ে ধরা পড়বে। কবি এক লাইন লিখবেন পাঠককে দিয়ে দশ লাইন ভাবিয়ে নেবেন, এ না হলে চিত্রকল্প হলো কি?

সুতরাং চিত্রকল্প মাত্রই কিছু পরিমাণে কল্পনাশ্রয়ী, আবার উল্টো দিক থেকে দেখলে সব চিত্রকল্পেই একটা দৃশ্যরূপ কোনো না কোনো ভাবে প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। যে সব চিত্রকল্প অন্য ইন্দ্রিয়নির্ভর তাতেও ক্ষীণ দৃশ্যমান অনুষঙ্গ যুক্ত থাকে।

নরম জলের গন্ধ দিয়ে নদী বার বার তীরটিকে মাখে

এই দৃষ্টান্তে স্পর্শানুভূতিই প্রধান। তার সঙ্গে যুক্ত আছে ঘ্রাণ। তবু গন্ধকে ছাপিয়ে নদীর তটে জলের আঘাতের ছবিটি যেন রূপান্তরিত হয়ে যায় ময়দার মতো কিছু মাখার চিত্রপটে। আবার—

শত শত শূকরের চিৎকার সেখানে
শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার আড়ম্বর
এই সব ভয়াবহ আরতি।

এ চিত্রকল্পে বিকট ধ্বনি ও যন্ত্রণানুভূতিরই প্রতিষ্ঠা তার মধ্যে আশ্চর্যভাবে লিপ্ত আছে বিশৃঙ্খলা ও জুগুপ্সা। কিন্তু সেও তো আসছে একটা দৃশ্যের আভাস থেকে।

কিন্তু এ ধরনের ছাড়া কি ভিন্ন ধরনের চিত্রকল্প হতে পারে না? যে সব চিত্রকল্প একান্ত আবেগধর্মী বা মননধর্মী তার দু-একটা দৃষ্টান্ত দেখা যাক—

১. প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই।

২. হরিণ খেয়েছে তার আমিষাশী শিকারীর হৃদয়কে ছিঁড়ে
সম্রাটের ইশারায় কঙ্কালের পাশাগুলো একবার সৈনিক হয়েছে
সচ্ছল কঙ্কাল হয়ে গেছে তারপর।

৩. কবি নয়—অজর, অক্ষর
অধ্যাপক, দাঁত নেই চোখে তার অক্ষম পিঁচুটি ;
বেতন হাজার টাকা মাসে আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি ;

নিদ্রা নয়, মৃত্যুর মোহময় আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে প্রথম উদাহরণে। দ্বিতীয়টিতে প্রহেলিকার মতো করে উদ্ঘাটিত হয়েছে জীবনের বর্তমান বৈপরীত্য ও অসংগতি, খাদ্য খাদকের বিপর্যয়, পাশার চালের মতো রাজকীয় ইচ্ছায় চালিত সৈনিকদের প্রতিবাদহীন অপমৃত্যু, সমালোচকদের বীভৎস ও ঘৃণ্য রূপ এঁকে তুলতে চূড়ান্ত কল্পনাপ্রতিভার স্বাক্ষর পড়েছে তৃতীয়ে। যাই হোক না কেন, সব চিত্রকল্পেই ইন্দ্রিয়চেতনা অবর্জিতই রয়ে গেছে। বস্তুতঃ ইন্দ্রিয়চেতনা চিত্রকল্পের সামান্য লক্ষণ।

এসবই চিত্রকল্প। সার্থক পরমরম্য চিত্রকল্প। কিন্তু যদি প্রশ্ন করেন চিত্রকল্প কি তবে কোনো বিশেষ ধরনের অলংকার? কোনো কোনো বাক্‌প্রতিমা বস্তুত একটা অলংকার বা সমতুল্য জিনিস হতেও পারে কিন্তু যথার্থ চিত্রকল্প শুধুমাত্র কবিতার শোভা সজ্জা বা প্রসাধন নয়। তা আরো বেশি কিছু, তা কবিতা। সাধারণ বাক্‌প্রতিমা পাঠকের নজর এড়িয়ে যেতে পারে কিন্তু প্রকৃত চিত্রকল্প লেখকের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর দাঁড়িয়ে থাকে বলে তা পাঠকের মন স্পর্শ করবেই। কেননা কবিতা হলো স্মৃতিচর্বণা, চিত্রকল্প মানুষের পূর্বলব্ধ অভিজ্ঞতার উন্মোচন। জীবনানন্দের অননুকরণীয় ভাষায় বলা চলে—

"ভালো—যাকে অক্ষর বলা যেতে পারে এরকম কবিতা পড়ে অনুভব করা

যায় খুব হাল্কা জিনিসের স্পর্শে এসেছি, এই কবির কবিতায় যা রয়েছে আমার অভিজ্ঞতায়ও সে জিনিস ছিল, কিন্তু ঠিক এরকম স্পষ্ট কৃতার্থ সংস্থানের ভিতরে ছিল না ; ...উঁচু উঁচু গাছ দেখেছিলাম, বাতাস পাখি, কাছে কোথাও অনেকখানি জল ঝিকমিক করছে রোদে—অনেকদিন ভেবে দেখিনি সে সব কথা, কবিতাটি স্মারক আঙুলের মতো এসে আমার বিশেষ কোনো অভিজ্ঞতাকে ডাক দিয়ে সচেতন করিয়ে দিল আবার।"

চিত্রকল্পের মর্মের ব্যাপারটা প্রকৃতপক্ষে এই রকমেরই। খণ্ড বিখণ্ড স্মৃতি, নষ্টালজিয়া আবেগময়তা নানাপ্রসঙ্গে কবির জাদুকরী মায়াদণ্ডের ছোঁয়ায় জেগে ওঠে আমাদের চেতনাকে জাগিয়ে তোলে। অনুভূতির এক সূক্ষ্মতর অনুশীলন ক্রিয়ার মধ্য দিয়ে আমাদের কবিচেতনায় ক্ষণদীক্ষা দেয়। যেখানে তা করতে পারে সেখানেই চিত্রকল্প সার্থক।

আবার কিছু নমুনা তোলা যাক জীবনানন্দের রচনা থেকে—

১. দেখেছি মাঠের পারে নরম নদীর নারী ছড়াতেছে ফুল
কুয়াশার ; কবেকার, পাড়াগাঁর মেয়েদের মতো যেন হায়
তারা সব ;

২. খররৌদ্রে পা ছড়িয়ে বর্ষিয়সী রূপসীর মতো ধান ভানে গান গায়—গান
গায়
এই দুপুরের বাতাস

৩. বিকেলের বারান্দার থেকে সব জীর্ণ নরনারী
চেয়ে আছে পড়ন্ত রোদের পারে সূর্যের দিকে

কে অস্বীকার করবে এগুলো আমাদেরই অভিজ্ঞতা, আমরা দেখিনি কবিই কেবল দেখেছেন। কবি সেই দেখাগুলোকে স্মরণ করিয়ে তাঁর নিজের কবিতার ভাবপুষ্টির প্রয়োজনে লাগিয়ে দিয়েছেন। বাল্মীকি যেমন রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'-র গল্পটাকে চুরি করে নিয়ে রামায়ণে লাগিয়ে দিয়েছিলেন আগে ভাগে ঠিক তেমনি। পাঠকের মনোলোকের সঙ্গে কবিকল্পনার যেখানে সাযুজ্য হয় সেখানেই চিত্রকল্প সার্থক।

এসব বিতর্কিত কথা। আপনারা অস্বীকার করতে পারেন। আপনারা বলতে পারেন তাজা কল্পনা আর কবির নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে তৈরি হয় সার্থক চিত্রকল্প। কোনো কবি যদি লেখেন—'অন্ধকার, নেকড়ের মুখের অতলগহ্বর যেন' তখন চিত্রটা কবির নিজস্ব দৃষ্টিকোণ থেকে এসেছে সন্দেহ নেই—কিন্তু আমি বলবো ওটা অসার্থক। এই চেষ্টাকৃত ধূর্ত উপমা পাঠকের অভিজ্ঞতার বাইরে বলেই যে ব্যর্থ শুধু তা নয়, পাঠকরা যদি নেকড়ের মুখের গহ্বরটা কল্পনাও করতে পারতেন তাহলেও তা কি অন্ধকারের দ্যোতক হোতো? যদি তাও হয়, তখনো প্রশ্ন থাকবে শুধু নেকড়ে কেন, হাতী বা তিমি মাছ নয়? আসল কথা কবিকে অন্ধকারের আরো অভিব্যক্তিময় চিত্রকল্প খুঁজতে হবে। জীবনানন্দের কবিতায় এমন অসার্থক চিত্রণ বোধহয় পাওয়া যাবে না।

কিন্তু চিত্রকল্পে অন্যধরনের অসুবিধাও থাকতে পারে, কবির ভাবনাটা পাঠকের চেতনায় ধরা না পড়তেও পারে। যেমন জীবনানন্দ যখন লেখেন—অথবা এ জীবনের বিচ্ছেদের বিষণ্ণ লেগুন কেঁদে ওঠে। তখন 'লেগুন' শব্দটির অর্থ যিনি না জানেন তাঁর

কাছে পুরো তাৎপর্যই অস্পষ্ট হয়ে যায়। এজন্যে অনেকে কবিকেই দোষ দেন। এঁদের মতে জীবনানন্দের কবিতার ভিনদেশী চিত্রকল্পের প্রয়োগ প্রচুর কিন্তু এদের উপযোগিতা ততখানি নেই। চিত্রকল্প যদি পাঠ মাত্রই পাঠকের অন্তর্লোকে দৃশ্যমান রূপ না ধরলো তাহলে সব আয়োজনই যে ব্যর্থ। মার্মালেড, মেন্নন, ম্যাগ্নেটিক মাইন, বডকিন, ব্লিজার্ড ইত্যাদি প্রসঙ্গ আমাদের জাতীয় মানসে সংস্থিত নয়। 'গগ্যাঁর ছবি', 'পিস্টনের উল্লাস', 'চক্কের ফসফরাশনস' সাধারণ পাঠকের কাছে বিশেষ কোন অর্থ বহন করে না। এমন কি 'উটের গ্রীবার মত নিস্তব্ধতা' এই অতিখ্যাত চিত্রকল্পটিও পাঠকের চেতনায় তেমন দৃশ্যমান হয়ে না উঠবার সঙ্গত কারণ আছে।

তবে কি কবি এসব চিত্রকল্প বর্জন করবেন? ভিনদেশী বা অচেনা চিত্রকল্পে সংবেদনার লাঘব যেমন হতে পারে তেমনি অনভিজ্ঞাত রূপলোকের বিস্ময় ও মায়া স্বাদের বৈচিত্র্য এনে চিত্রকল্পকে আকর্ষণীয়ও করতে পারে। কবিতা তো চিরকালের জিনিস। পাঠকের আজকের অজ্ঞতা কালক্রমে দূর হবে। তাছাড়াও যদি ধরাও যায় যে এর ফলে সামান্য রসাভাস হয়েছে তবু কাব্যের রসবিচারে পাঠকের পরিচিতি নয় কবিতার অভিব্যক্তির দিকটাই সর্বাগ্রে বিচার্য। জীবনানন্দের কবিপ্রাণ পাশ্চাত্য কবিতার রসে জারিত বলেই এইসব প্রসঙ্গ তাঁর কবিতায় সবচেয়ে সজীব ও স্বচ্ছন্দ। বিজাতীয়তার অজুহাতে এসব ঐশ্বর্য সম্ভোগে আমাদের অনীহা নেই।

সুতরাং বিদেশী প্রসঙ্গের বিরুদ্ধে যদি কোন অসার্থক শিল্প প্রয়োগের অভিযোগ থাকে তবেই তা গ্রাহ্য হতে পারে—অন্য কোনো অভিযোগ নয়। 'যেন এক দেশলাই' কবিতায় প্রেমিকের হৃদয়ের দহন যখন দেশলাই জ্বলার চিত্রকল্পে প্রমূর্ত হয়ে ওঠে—

যেন এক দেশলাই জ্বলে গেছে—জ্বলিবেই-হালভাঙা জাহাজের স্তূপে/তোমারে সিঁড়ির পথে তুলে দিয়ে অন্ধকারে যখন গেলাম চলে চুপে।

তখন চিত্রকল্পটি সার্থক হলেও, 'জ্বলিবে'ই শব্দটির প্রয়োগ শিথিল, অনাবশ্যক এমন কি রসহন্তারক। আবার অন্য একধরনের নমুনা নিচ্ছি। যেমন—

সেই সব শহরের ইট পাথর
কথা কাজ আশা-নিরাশার ভয়াবহ হৃতচক্ষু
আমার মনের বিস্বাদের ভিতর পুড়ে ছাই হয়ে গেছে।

'আশা-নিরাশার ভয়াবহ হৃতচক্ষু' নিঃসন্দেহে ব্যক্তিগত চিত্রকল্প। কিন্তু পাঠকের কাছে তেমন স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলো কি? কবি যা দেখে বা দেখাতে চেয়ে চিত্রকল্প নির্মাণ করলেন তা যদি পাঠকের কাছে তুলে ধরতে না পারেন তবে কবিতার পুরো আবেদনই তো নষ্ট ও নিষ্ফল। কিন্তু যে পাঠক এলিয়টের কবিতায় পড়েছেন—

The eyes are not here
there are no eyes here
In this valley of dying stars
In this hollow valley
This broken jaw of our lost kingdom

Sightless, unless
The eyes reappear
As the perpetual star
Multifoliate rose

Of deaths twilight kingdom
The hope only
Of empty men

(The Hollow Men)

তাঁরা বুঝবেন কি অর্থব্যঞ্জনা ওই 'ভয়াবহ হৃতচক্ষু'র প্রেক্ষাপটে। কবিতায় ভাবসংহতি অবশ্যই কাম্য, কিন্তু পাঠককে ক্ষুধার্ত বা বঞ্চিত রেখে নয়। কবিতায় চিত্রকল্পই ভাবসংহতি আনে, কিন্তু কবিকে লক্ষ রাখতে হয় বা সংযম যেন চিত্রকল্পটি বোঝার পক্ষে বাধা হয়ে না দাঁড়ায়।

ভাল চিত্রকল্প মাত্রই তরতাজা ও প্রত্যক্ষ। তা স্পষ্ট ও নিঃসন্দিগ্ধভাবে বুঝিয়ে দেয় বিষয়ের উপর লেখকের প্রশ্নাতীত অধিকার। জীবনানন্দের কবিতায় দেখা যাবে অতিপরিচিত বস্তু ও চিরাচরিত বর্ণনার মাধ্যমে ও বিস্ময়কর চিত্রকল্প গড়ে তুলতে তিনি সিদ্ধহস্ত। 'আকাশলীনা' কবিতায় মুগ্ধ প্রেমিকের প্রতিদ্বন্দ্বী যুবকের সম্পর্কে নায়িকার কাছে অনুযোগ—

কি কথা তাহার সাথে? তার সাথে?
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ ঃ
তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে।

মাটির নীরব সহিষ্ণুতাকে ঘাস যেমন নিঃশব্দ সঞ্চারী ব্যাপ্ত আবরণে ধীরে ধীরে আচ্ছন্ন আবৃত করে ফেলে, ওই যুবকের প্রেম তেমনই নায়িকাকে গ্রাস করতে চলেছে। 'বিভিন্ন কোরাস' কবিতায় কবি লিখেছেন ঃ

ঘাসের উপর দিয়ে ভেসে আসে সবুজ বাতাস।
অথবা সবুজ বুঝি ঘাস।
অথবা নদীর নাম মনে করে নিতে গেলে চারিদিকে প্রতিভাত
হয়ে ওঠে নদী
দেখা দেয় বিকেল অবধি ;

ঘাসের সবুজের উপর প্রবাহিত বাতাস প্রতিভাত হচ্ছে যেন সবুজ ; নদীর নাম করলে প্রতিভাত হয়ে উঠছে নদী। কল্পনার অভিনবত্ব এখানে চিত্রকল্পে চমক সৃষ্টি করছে। আবার 'শঙ্খমালা' কবিতায় শঙ্খমালার রূপান্তরিত রূপবর্ণনা—

চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে ; দক্ষিণ শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়!

চিত্রকল্পের আধুনিকত্ব যারা আধুনিক প্রসঙ্গের মধ্যে খোঁজেন তাঁদের চিত্রকল্প ক্ষণজীবী হওয়ার সম্ভাবনা এড়াতে পারে না। জীবনানন্দের চিত্রের বস্তু এখানে চিরাচরিত, কিন্তু দৃষ্টিকোণটি, উপস্থাপনাটি নূতন এবং অভিনব, সেইজন্যে তিনি আধুনিক।

মায়াদর্পণ ঃ চিত্রকল্পের সার্থকতার একটা বড়ো শর্ত হলো—কবিতার সামগ্রিক পরিকল্পনার সঙ্গে চিত্রকল্পটি বা চিত্রকল্পগুলি তাৎপর্যময় সম্পর্কে যুক্ত হয়ে এক যৌথ সামগ্রিক জটিল পূর্ণতা সাধন করবে। নইলে স্বতন্ত্রভাবে চিত্রকল্প যত আকর্ষণীয় বা গুণযুক্ত

হোক বিষয়ের সঙ্গে সঙ্গতিহীন হয়ে ব্যর্থ হয়ে যায়। জীবনানন্দ কবিতার এই সামগ্রিক উত্তরণ সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করেছেন। তিনি বক্তব্য রেখেছেন :

> "কবিতার প্রত্যেকটি আঙ্গিক অন্য প্রত্যেকটি আঙ্গিককে স্পষ্ট ও সুসমঞ্জস করে তোলে, এতে করে একটি বিশেষ ছত্রের দাম হয়তো ক্ষুণ্ণ হয় কিন্তু সমস্ত নক্সাটার উজ্জ্বলতা চোখে পড়ে বেশি।"

জীবনানন্দের প্রতিটি ভালো কবিতায় এই পরিকল্পনার, এই নক্সাটার উজ্জ্বলতা নিপুণভাবে পরিস্ফুট। এবং তার প্রকাশ কত বিচিত্র 'মহাপৃথিবী'তে 'হঠাৎ মৃত' বলে একটি অতিপরিচিত কবিতা আছে। আকস্মিক হত্যা, মৃত্যু, শিকার এ নিয়ে কত কবিতাই তো তিনি লিখেছেন, তেমনই একটি কবিতা শান্ত সুরে খণ্ড খণ্ড কটি আকস্মিক অপমৃত্যুর কথা বলছিলেন কবি। তার পরে এল মাঝের স্তবক—

এইসব হঠাৎ মৃত্যু—
এইসব হঠাৎ মৃত
আজ এই শীতের রাতের অরণ্যের কিনারে
বিক্ষুব্ধ বাঘের মত গর্জন করে উঠছে যেন
গর্জন করে উঠছে আমার হৃদয়ের অরণ্যে।

সবশেষে আবার কবির অন্তরের বিষাদ ও ঘৃণার কিছু সংক্ষিপ্ত অভিব্যক্তি। মৃত্যুর এই বেদনাহত নীরবতার মধ্যে মৃতদের বিক্ষোভ, কবির হৃদয়ের বিক্ষোভ নিস্তব্ধ অরণ্যে আহত বাঘের মত গর্জন করে উঠেছে দু-দুবার। (পূর্বোদ্ধৃত স্তবকের শেষ পংক্তি দুটিতে) শব্দ ও চিত্রের এই যুগপৎ সুকল্পিত সন্নিবেশ কবিতাটিকে আশ্চর্য শ্রীমণ্ডিত করেছে। অথবা স্মরণ করুন 'হাওয়ার রাতে' কবির সেই উর্ধ্বোৎক্ষিপ্ত আকাশচারী কল্পনা, স্মরণ করুন—

মিলনোন্মত্ত বাঘিনীর গর্জনের মতো অন্ধকারের চঞ্চল বিরাট সজীব
রোমশ উচ্ছ্বাস,
জীবনের দুর্দান্ত নীল মত্ততায়।

যখন কবির :

হৃদয় পৃথিবী ছিঁড়ে উড়ে গেল,
নীল হাওয়ার সমুদ্রে স্ফীত মাতাল বেলুনের মতো গেল উড়ে
একটা দূর নক্ষত্রের মাস্তুলকে তারায় তারায় উড়িয়ে নিয়ে চলল
একটা দুরন্ত শকুনের মতো।

অজস্র সার্থক সর্বার্থসাধক চিত্রকল্পের প্রবাহ পাঠকের চেতনাকে যেখানে আপ্লুত করেছিল স্মরণ করুন 'আট বছর আগের একদিন', যেখানে আত্মঘাতী এক মানুষের রক্তাপ্লুত বিক্ষত শব এবং তার মৃত্যুকামনার শবব্যবচ্ছেদ এবং তারই পাশাপাশি জীবন কামনায় উগ্র উদগ্রীব অসংখ্য কীটপতঙ্গ, পাখি, গলিত স্থবির ব্যাঙ, থুরথুরে অন্ধ পেঁচার তুমুল গাঢ় সমাচার, অজস্র টুকরো টুকরো স্ববিরোধী চিত্রকল্পের সমাহারে ও আবর্তনে বিষয়ের অসামান্য অনিবার্যতাকে পাঠকের অন্তর্ভেদী করে তোলার রহস্য উপলব্ধি করুন। Cicil Day Lewis-এর সেই অবিস্মরণীয় বর্ণনা মনে পড়বে—

> The images in a poem are like a series of mirrors set at different angles so that, as the theme moves on it is reflected in a number of different aspects. But they are magic mirrors ; they do not

merely reflect the theme, they give it life and forms, it is in their power to make a spirit visible.

বস্তুতই কবিতার সেই মায়াদর্পণ হলো চিত্রকল্প, যাতে প্রতিফলিত হলে সব কিছু রূপ পায়, প্রাণ পায়। কবিতার আত্মাকে প্রত্যক্ষ করে তোলে, এবং তা যদি জীবনানন্দের কবিতাতে হয়ে থাকে তবে এইসব কবিতাতেই হয়েছে। হয়েছে 'শিকার' কবিতায়, যেখানে নিপুণ চিত্রকরের মতো অসংখ্য উপমাগর্ভ বর্ণময় বর্ণনায়, দু-তিনটি নিপুণ মহার্ঘ চিত্রকল্পে হিংস্র হত্যার পটভূমি ও হত্যার বেদনাকে কবিতায় অবিনশ্বর করা হয়েছে। অথবা মনে আনুন 'নগ্ন নির্জন হাত' হৃদয়ের আকাঙ্ক্ষা থেকে যে সৌন্দর্যলোকের জন্ম এ সেই অমর্ত্যলোকের কাহিনী। যেখানে অস্তিত্বহীন এক নগরী গড়ে তুলেছেন কবি, এক প্রাসাদ, অসংখ্য অনুপুঙ্খের বর্ণনায় তার কক্ষ কক্ষান্তরকে জীবন্ত করে তুলেছেন, একই বস্তুর বারবার বর্ণনায় বিশ্বাস জন্মিয়েছেন তার অস্তিত্বে, ঐশ্বর্যের নিপুণ আড়ম্বরের অন্তঃপুরে কল্পনার দৃঢ় ভিত্তির আসনে বসিয়েছেন সেই নারীকে যে তাঁকে চিরদিন ভালবেসেছেন অথচ যার মুখ তিনি কোনদিন দেখেন নি। ভোগ ও উপভোগের সুপ্রচুর উপকরণের সিংহাসনে আসীন সেই নারীর হাতের নগ্ন নির্জনতা ইন্দ্রিয় পিপাসাকে জাগিয়েছে এ বিশ্বাস সৃষ্টি করা গেছে। এই বিলুপ্ত জগত থেকে কবি নির্বাসিত হয়েছেন স্বর্গচ্যুত আদমের মতো, জাতিস্মরের স্পষ্ট চেতনা ও দৃঢ় বিশ্বাস এই কবিতাটির ভিত্তি, কিন্তু এও কি সেই মায়াদর্পণে অনন্ত কৌণিক দৃশ্যরূপ পরম্পরায় প্রতিফলনের ফলেই পর্দায় পর্দায় উন্মোচিত রূপ রং স্পর্শ গন্ধের দ্বারা উজ্জীবিত সম্মোহন সৃষ্টি করেনি। আরো লক্ষ করুন ঐ কবিতাটিতে বিধৃত রূপের সঙ্গে, রঙের সঙ্গে, আলোছায়ার মায়া। আলোর রহস্যময়ী সহোদরার মত এক অন্ধকারে যার শুরু, যার পটভূমিকাই ফাল্গুনের অন্ধকার অথচ শেষের অংশে 'রক্তাভ রৌদ্রের বিচ্ছুরিত স্বেদ' আর 'রক্তিম গেলাসে তরমুজ মদ' আমাদের মনে এমন একটি প্রদীপ্ত সমৃদ্ধির অতিঘাত রেখে যায়,যে মনেই হয় না পুরো কবিতাটিতে আলো ছাড়া, উজ্জ্বলতা ছাড়া অন্য কোনো প্রসঙ্গ আছে। বুদ্ধদেব বসুর মতে চিত্রকল্পের প্রয়োগ কৌশলে পাঠকের চেতনাকে মায়ামুগ্ধ বশীভূত করতে পারাতেই ডে লুইস কথিত 'মায়া দর্পণে'র সার্থকতা।

রূপকল্প : জীবনানন্দের কবিতায় এই উন্নতমানের চিত্রকল্প নিয়ে পর্যাপ্ত আলোচনা বহু প্রসঙ্গে বহু আলোচক করেছেন। সুতরাং এ বিষয়ে আর বাগ্‌বিস্তার না করে এবারে আমি নেমে আসতে চাই বাক্‌প্রতিমার এক নিম্নতর সোপানে যা চিত্র নয় চিত্রকল্পই কিন্তু তার আয়োজন এত সুচিন্তিত নয়। এগুলির সৃষ্টির পিছনে প্রতিভার অতখানি সক্রিয়তা দেখা যায় না, হয়তো প্রয়োজনও হয় না। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর চিত্রকল্পকে পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে আমি 'রূপকল্প' শব্দটি ব্যবহার করবো। যাঁরা 'রূপকল্প' শব্দকে 'চিত্রকল্প'র প্রতিশব্দ হিসাবে ব্যবহার করতে অভ্যস্ত তাদের কাছে আমি মার্জনা চাই। রূপকল্পে চিত্রকল্পের তুলনায় কল্পনার বিস্তার কম, প্রকরণের প্রাধান্য বরং বেশী। কখনো কখনো মনে হতে পারে রূপকল্প যেন বিশেষ কোনো অলংকারের বিশিষ্ট প্রকাশ। কখনো মনে হতে পারে পাশ্চাত্যের বিভিন্ন সাহিত্য আন্দোলনে, প্রতিচ্ছায়াবাদ, প্রতীকবাদ, চিত্রকল্পবাদ ও পরাবাস্তববাদে বাক্‌প্রতিমার যে নানা রূপ ও বৈশিষ্ট্য দেখা গিয়েছিল জীবনানন্দ সজ্ঞানে সেইসব ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণের অনুসরণ করে জীবনের পর্বে পর্বে এমন বহু বিচিত্র রূপকল্পের উদ্ভব করেছিলেন।

জীবনানন্দ মনে করতেন 'উপমাই কবিত্ব'। তাঁর প্রতিভার অবিনশ্বর স্বাক্ষর বিচিত্র উপমা প্রয়োগের মাধ্যমে কিভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল আমি আমার গ্রন্থে আলোচনা করেছি। 'বনলতা সেন' পর্বের কবিতা অবধি জীবনানন্দের উপমা ও রূপকল্প প্রয়োগের মধ্যে প্রতিচ্ছায়াবাদী বর্ণচেতনা এবং অনুভূতিশীলতা লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বের রূপকল্পগুলিতেও উপমাশ্রয়িতা লক্ষ্য করা যাবে। উপমা অর্থে আমরা উপমা রূপক উৎপ্রেক্ষা দৃষ্টান্ত অতিশয়োক্তি প্রভৃতি তুলনাত্মক অলংকারের কথা মনে রেখেছি।

১. উৎসব লোভে অতি
আসেনি হেথায়,
কীটের আঘাতে শুকায়ে গিয়াছে কবে কামনার কবি।

২. অশ্রুর অঙ্গারে তার নিটোল ননীর গাল, নরম নীলিমা
জ্বলে গেছে,

৩. যেখানে মাঠের দৃঢ় নীরবতা দাঁড়ায়েছে আকাশের পাশে
আরেক আকাশ যেন।

৪. কাস্তের মত বাঁকা চাঁদ
ফেলিয়াছে আলো
প্রণয়ীর ঠোঁটের ধারালো
চুম্বনের মত।
রেখে গেছে ক্ষত
সবজীর সবুজ রুধিরে।

৫. কিশোরীর স্তন
প্রথম জননী হয়ে যেমন ননীর ঢেউয়ে গলে
পৃথিবীর সব দেশে।

লক্ষ করবেন এগুলি মুখ্যত অলংকারই। কিন্তু সেই অলংকারের শব্দে বর্ণনায় অনুপুঙ্খ প্রতিচ্ছায়াবাদী বর্ণ ও ভাবের অনুভূতি একে ক্রমে ক্রমে উজ্জীবিত করে তুলেছে। দেখবেন জীবনানন্দের কল্পনা যত পরিণত হয়েছে ততোই যেমন তাঁর বিশেষণের বিস্তার ঘটেছে তেমনি উপমাত্মক রূপকল্পে খুঁটিনাটি বর্ণনার প্রাচুর্যে বাক্ প্রতিমাগুলি বিশাল ব্যাপক ও মর্মস্পর্শী হয়ে উঠেছে। কল্পনার এই বিস্তার ও সৌন্দর্য 'বনলতা সেন' গ্রন্থেই সবচেয়ে বেশী।

অন্ধকার রাতে অশ্বত্থের চূড়োয় প্রেমিকচিল পুরুষের
শিশির ভেজা চোখের মত
ঝলমল করছিলো সমস্ত নক্ষত্রেরা
জ্যোৎস্না রাতে বেবিলনের রাণীর ঘাড়ের উপর চিতার উজ্জ্বল চামড়ার
শালের মত জ্বল জ্বল করছিলো বিশাল আকাশ।

লক্ষ করবেন শব্দের পর শব্দ সাজিয়ে কবি ছবিটিকে যত নিখুঁত করেছেন অন্তঃস্থিত ভাবটি তত নিপুণ অভিব্যক্তি পেয়েছে। এইরকম ব্যাপক ও বিশদ রূপকল্প কবির সৃষ্টিশীল কল্পনার ফসল তাতে সন্দেহ নেই। এমন রূপকল্পই আমাদের মুগ্ধতার গলিপথে চিত্রকল্পের মহান আসন অধিকারের জন্যে হাত বাড়ায়।

কিন্তু চিত্রকল্পের সঙ্গে রূপকল্পের পার্থক্যটা স্মরণে রাখতে হবে। চিত্রকল্প শুধু অলংকার নয়, যেখানে অনুভূত ভাব বা রূপকে ব্যক্ত করতে একটি চিত্র আসে এবং সেই চিত্র আবার পাঠকের চেতনাকে এক ভাবলোকে উত্তরিত করে দেয়। কিন্তু রূপকল্পে গুণীভূতব্যঙ্গ্যের মতো তার অলংকারত্ব অতিক্রম করে না।

আরো আরেক ধরনের রূপকল্পে দেখা যাবে প্রতীকবাদী কবিদের রীতিই হলো ইন্দ্রিয়ানুভূতিগুলির হেরফের ঘটিয়ে অথবা বস্তুকে গুণের মত, গুণকে বস্তুর মতো ব্যবহার করে বর্ণনা করা। এর ফলে অতি সহজে যে সব বাক্‌প্রতিমা গড়ে ওঠে তাকে আপাত দৃষ্টিতে চিত্রকল্প বলে মনে হতে পারে। কিন্তু এগুলির সৃষ্টির নেপথ্য কৌশল কঠিন নয়, বরং বলবো যান্ত্রিক। এই প্রতীকী প্রকরণ মুখ্য, রূপকল্পের নমুনা ঃ

১. চালের ধূসর গন্ধে তরঙ্গেরা রূপ হয়ে ঝরেছে দু'বেলা
নির্জন মাছের চোখে, পুকুরের পাড়ে হাঁস সন্ধ্যার আঁধারে
পেয়েছে ঘুমের ঘ্রাণ, মেয়েলি হাতের স্পর্শ নিয়ে গেছে তারে।

২. শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে, ডানায় রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল,
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে...

গন্ধের ধূসরতা, মাছের চোখের নির্জনতা, ঘুমের ঘ্রাণ, মেয়েলি স্পর্শ, বা পরের দৃষ্টান্তে শিশিরের শৈত্যের বদলে শব্দ, রৌদ্রের বর্ণের বদলে গন্ধ, রঙের মতো গন্ধেরও মুছে যাওয়া, আলোর মতো রঙেরও নিভে যাওয়া এইসব বর্ণনার কৌশলে এক ধরনের সমাসোক্তি বা Personification জাতের অলংকার এবং বাক্‌প্রতিমার এক ধরনের কল্পনাধর্মী উত্তরণ লক্ষ্য করা যায় কিন্তু রীতি নিয়ন্ত্রিত এই ধরনের ব্যঞ্জনাকে রূপকল্পের অধিক মর্যাদা দেওয়া যায় না।

সাররিয়ালিস্ট চিত্রকল্প ছিল বুদ্ধিবৃত্তির নিয়ন্ত্রণহীন অবচেতনার উন্মোচন। ভাবনা, কল্পনার ও চিত্রের এমন বিশৃঙ্খল সমাবেশ না থাকলেও জীবনানন্দের পরাবাস্তববাদী বা Surrealist মনোভঙ্গির রচনাতেও এক ধরনের যান্ত্রিক রূপকল্প রচনায় পারঙ্গমতার পরিচয় আছে। 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমির'এ বিবৃত কিছু কবিতায় এই ধরনের চতুর চটুল রূপকল্পের প্রাচুর্য দেখা যায়, পরস্পর বিরোধী বিশেষণের যোগে অসংলগ্ন বস্তুসমূহকে পাশাপাশি সংবদ্ধ করে বা প্রচলিত কিংবদন্তীতে প্রসারিত করে নির্মিত বাক্‌প্রতিমা দিয়ে এই রূপকল্পগুলি গড়ে তোলা হয়েছে।

১. ধূসর বাতাস খেয়ে এক গাল—রাস্তার পাশে
ধূসর বাতাস দিয়ে করে নিলো মুখ আচমন

২. রুটি খেতে গিয়ে তারা ব্রেড বাস্কেট খেলো শেষে

৩. যেন তার দুই গালে নিরুপম দাড়ির ভিতরে
দুটো বৈবাহিক পেঁচা ত্রিভুবন আবিষ্কার করে তবু ঘরে
বসে আছে।

৪. পরের খেতের ধানে মই দিয়ে নক্ষত্রে লাগানো
সুকঠিন নয় আজ ;

এমনি 'নিরাশার খাতে ততোধিক লোক উৎসাহ বাঁচায়ে রেখেছে', 'লবেজান হাওয়া এসে গাঁথুনির ইট সব করে ফেলে ফাঁস',—এইসব রূপকল্পে বিস্ময়ের চমক আছে কিন্তু

কবিহৃদয়ের তৃপ্তি আছে এমন কথা বলতে পরি না। জীবনানন্দ অন্তত জীবনের অন্তিম পর্বে এইসব প্রতীকবাদী এবং পরাবাস্তবাদী রূপকল্পের মোহমুক্ত হয়েছিলেন। 'বেলা অবেলা কালবেলা'য় তিনি যে এমন বুদ্ধিজীবী রূপকল্প আর রচনা করেননি এতেই অনুমিত হয় কবিতার এই বন্ধ্যা প্রকরণে পদচারণা তিনি নিষ্ফল মনে করেছিলেন।

শেষ উত্তরণ (১৯০৯ - ১৭) : ইউরোপে চিত্রকল্পবাদী আন্দোলন মাত্র ৮/১০ বছর স্থায়ী হয়েছিল। চিত্রকল্পবাদীরা সংহতি ও শুদ্ধতার সাধনা করতে গিয়ে কবিতার রীতি প্রকরণকে এমন এক সীমাবদ্ধ আবর্তে নিয়ে গিয়েছিলেন যেখানে জীবন ও জনতা থেকে ত্যক্ত কবিতার জন্য অপেক্ষা করছিল অপমৃত্যু। সুতরাং এই কবিদের অনেকেই কবিতা লেখা ছেড়ে দিয়েছিলেন। বাকিদের বলতে হয়েছিল—

> এবার ফিরাও মোরে লয়ে যাও সংসারের তীরে
> হে কল্পনে, রঙ্গময়ী। দুলায়ো না সমীরে সমীরে
> তরঙ্গে তরঙ্গে আর, ভুলায়ো না মোহিনী মায়ায়
> বিজন বিষাদঘন অন্তরের নিকুঞ্জচ্ছায়ায়
> রেখোনা বসায়ে আর।

জীবনের সমস্যা, জীবনের সংগ্রাম, জীবন-পিপাসার দিকে ফিরতে হয়েছিল জীবনানন্দকেও। আর যেহেতু কোনো সাধনা, শব্দসাধনা, কাব্যসাধনা, শিল্পসাধনা নিঃশেষে ব্যর্থ হবার নয়, এই চিত্রকল্পবাদ এই সংযম সাধনা জীবনানন্দের কবিভাষাকে এরপর এক তপঃশুদ্ধ শক্তি ও দ্যুতি দিয়েছিল, সাররিয়ালিজমের কানাগলি ছেড়ে তিনি বাস্তবের সুপ্রসর রাজপথে এসে দাঁড়ালেন। মানুষের সমস্যা ও তা থেকে উত্তরণের সাধনাকে তাঁর কবিতার কথাবস্তু করলেন। শুদ্ধ শিল্প ছেড়ে তিমিরবিনাশী কবি ইতিহাসযানে জ্ঞানে প্রেম সমাহিতির মধ্যে স্থিত হলেন। তখনো চিত্রকল্পই নতুনভাবে কবিতার সেই নূতন শিল্পপ্রকরণকে যেন এক মন্ত্রপূত ঋজুতা দিল, মরমী ব্যঞ্জনায় ভরে দিল তাঁর কণ্ঠস্বর। চূড়ান্ত আশাহীনতার মধ্যেও যখন চারিদিকে 'অভিভূত নৃমুণ্ডের ভিড়', দিনের আলোর দিকে তাকালেই দেখা যায় লোক। কেবলই আহত হয়ে মৃত হয়ে স্তব্ধ হয়।' তখনো কবিকে বলতে শুনি—

> অভিভূত হয়ে গেলে মানুষের উত্তরণ জীবনের মাঝপথে থেমে
> মহান তৃতীয় অঙ্কে! গর্ভাঙ্কে তবুও লুপ্ত হবে নাকি
> সূর্যে আরো নবসূর্যে দীপ্ত হয়ে প্রাণ দাও—
> প্রাণ দাও পাখি।

প্রত্যাশা করেছেন আবহমানের ইতিহাসচেতনা জীবনে স্বাভাবিক পরিণতির পথে অগ্রসর করে দেবার শক্তি যোজনা করবে। নদীর মতই মানুষের ধূসর হৃদয়ও নিত্যধাবমান, রাত্রির শেষে নূতন ভোর, নূতন সূর্য, নূতন পাখি, নূতন সভ্যতার চিহ্ন এনে দেয়। নূতন যাত্রীরা এসে যাত্রীদের ভীড় বাড়িয়ে দেয়। লক্ষ্যের পরিবর্তন হয় :

> যদি কেউ এসে বলে : এই সেই নারী
> একে তুমি চেয়েছিলে ; এই সেই বিশুদ্ধ সমাজ
> তবু দর্পণে অগ্নি দেখে কবে ফুরায়ে গিয়েছে কার কাজ?

যুগের অভিসরণের সাথে সাথে অন্ধকারের আলোর রূপভেদ হয়েছে। আদিম সৎ অন্ধকার যেমন ক্রমেই আবিল আমিষ অন্ধকার হয়ে উঠছে।

ঝর্ণার জল দেখে তারপর হৃদয়ে তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হয়ে আছে বলে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায়;
মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভরে গেছে ; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি।

এই হিংসার বলয় থেকে উদ্ধারের পথ আলো, প্রেম, করুণা। অতীতের মূঢ়তার তিমির কেটে এসেছি আমরা, বর্তমানের জ্ঞানপাপের তিমির কেটে ভবিষ্যতে এক মহত্তর তিমিরের মুখোমুখি হতে হবে আমাদের

অনেক আঁধার আলো দেখেছি তবুও
আরও এক বড় আলো অন্ধকারের প্রয়োজন
এখন গভীরভাবে বোধ করে মন
আকাশ প্রান্তর পথ নক্ষত্রলোকের কাছে গিয়ে।

'মহা জিজ্ঞাসা'র মুখোমুখি হয়ে কবি এই সুদৃঢ় প্রত্যয়ে স্থিত হয়েছেন যে,

"আমরা চলেছি সেই উজ্জ্বল সূর্যের অনুভবে।"

এই অন্তিম পর্যায়ে জীবনানন্দের কবিতায় চিত্রকল্প বিরল। কিন্তু যেখানেই আছে তা নিছক কাব্যকলা কুতূহল বশে আসেনি, বোধ ও বোধির সমীকরণে তা উজ্জ্বল আন্তর উপলব্ধির মর্মরসে তা উজ্জীবিত। এমনটি আমরা দেখেছিলাম উপনিষদের শ্লোকে, সূফীদের রচনায়, রিলকের কবিতায়, রবীন্দ্রনাথের গানে। তখন আলো আর পার্থিব আলো নয়, পাখি তখন আবহমানের ইতিহাসচেতনা, যাত্রী সেখানে অনন্ত মহাজীবন, প্রকৃতি সেখানে অন্তহীন শুশ্রূষা। সেই পর্বে চিত্রকল্পকে চিত্রকল্প মনে হয় না আর, মনে হয় কবির হৃদয় রহস্যের মিস্টিক মর্মবাণী। যেমন তাঁর অন্তিম কবিতার তাঁর আত্মোপলব্ধ আশাবাদের ঘোষণা ঃ

আমি সেই মহাতরু—লাবণ্যসাগর থেকে নিজে
উঠে তুমি জাগিয়েছো অনাদির সূর্য নীলিমায়
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ করে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্যসাগর।

8

শিকার ঃ জীবনানন্দ দাশ

ভোর ;
আকাশের রং ঘাসফড়িঙের দেহের মতো কোমল নীল ঃ
চারিদিকের পেয়ারা ও নোনার গাছ টিয়ার পালকের মতো সবুজ।
একটি তারা এখনও আকাশে রয়েছে ঃ
পাড়াগাঁর বাসরঘরে সবচেয়ে গোধূলি-মদির মেয়েটির মতো ;
কিংবা মিশরের মানুষী তার বুকের থেকে যে-মুক্তা আমার নীল মদের
গেলাসে রেখেছিলো
হাজার-হাজার বছর আগে এক রাতে... তেমনি—
তেমনি একটি তারা আকাশে জ্বলছে এখনও।

হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা সারারাত মাঠে
আগুন জ্বেলেছে—
মোরগফুলের মতো লাল আগুন ;
শুকনো অশ্বত্থপাতা দুমড়ে এখনও আগুন জ্বলছে তাদের ;

সূর্যের আলোয় তার রং কুঙ্কুমের মতো নেই আর ;
হ'য়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ ময়ূরের
সবুজ নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।

ভোর ;
সারারাত চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে-বাঁচিয়ে
নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে
ঘুরে-ঘুরে
সুন্দর বাদামী হরিণ এই ভোরের জন্য অপেক্ষা করছিলো।
এসেছে সে ভোরের আলোয় নেমে ;
কচি বাতাবী লেবুর মতো সবুজ সুগন্ধি ঘাস ছিঁড়ে-ছিঁড়ে খাচ্ছে ;
নদীর তীক্ষ্ণ শীতল ঢেউয়ে সে নামলো—
ঘুমহীন ক্লান্ত বিহ্বল শরীরটাকে স্রোতের মতো
একটা আবেগ দেওয়ার জন্য ;

অন্ধকারের হিম কুঞ্চিত জরায়ু ছিঁড়ে ভোরের রৌদ্রের মতো
একটা বিস্তীর্ণ উল্লাস পাবার জন্য :
এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার মতো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।

একটা অদ্ভুত শব্দ।
নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।
আগুন জ্বললো আবার—উষ্ণ লাল হরিণের মাংস তৈরি হ'য়ে এলো।
নক্ষত্রের নিচে ঘাসের বিছানায় ব'সে অনেক পুরোনো শিশিরভেজা গল্প ;
সিগারেটের ধোঁয়া ;
টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা ;
এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক—হিম—নিস্পন্দ নিরপরাধ ঘুম।

এক দিক থেকে দেখতে গেলে কবির প্রত্যেকটি কবিতাই নতুন, কারণ কবিতাটির লালনপর্বে উদ্ভূত অনুভূতি ও 'ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক' যেমন সম্পূর্ণ নতুন, ঠিক তেমনি নতুন কবিতার মুক্তিপ্রয়াস, সংরক্ত সম্ভব-যন্ত্রণা। আবার একটু অন্যভাবে দেখলে, কবি সারাজীবন ধরে, খন্ড খন্ড ভাবে, একটাই কবিতা রচনা করেন—যে কবিতায় তিনি নিজেকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করেন, সেই তীব্রমধুর যন্ত্রণা উপভোগ করেন, এবং তার চেয়েও রোমাঞ্চকর ভাবে নিজেকে আবিষ্কার করেন। আপনাকে এই জানা কবির কোনদিনই ফুরোয় না, ফুরোলে কবিতা লেখার ইচ্ছেটাই ফুরিয়ে যায়।

কথাটা ভীষণভাবে মনে হয় জীবনানন্দের 'শিকার' কবিতার রোমাঞ্চিত অনুভূতি স্মরণ করলে। 'কবিতা' পত্রিকায় ১৩৪৩ বঙ্গাব্দের আশ্বিন সংখ্যায় প্রকাশিত এই কবিতার সঙ্গে কী গভীর সাদৃশ্য অনেকদিন আগে লেখা 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত 'ক্যাম্পে' কবিতাটির। শুধু যে উপাদানের মিল তা নয়—যদিও উপাদানের মিলও আমাদের বার বার সচকিত করে—সেই হরিণ, অরণ্য, শিকার, নদী, বন্দুকের শব্দ ; আমরা বিস্মিত হই অনুভূতিরও অভিন্ন সংবেদন লক্ষ করে। 'শিকার' কবিতা পড়তে গেলে যে অনিবার্য বিষণ্নতা ও নিরাশ্রয়তার দ্বারা আমরা আক্রান্ত হই, সেটাই যে 'ক্যাম্পে' কবিতারও বিশিষ্ট অনুভূতি সে সম্বন্ধে আমরা নিঃসন্দেহ হই কবির নিজেরই দেওয়া ব্যাখ্যা স্মরণ করলে। এই ব্যাখ্যা অবশ্য প্রকাশিত হয়েছে অনেক পরবর্তী কালে, ১৯৫১ সালে, 'শতভিষা' পত্রিকার একচল্লিশতম সংকলনে, সেখানে কবি বলেছিলেন, 'যদি কোনো একমাত্র স্থির নিষ্কম্প সুর এ কবিতাটিতে থেকে থাকে তবে তা জীবনের—মানুষের—কীট-ফড়িঙের সবার জীবনেরই নিঃসহায়তার সুর। সৃষ্টির হাতে আমরা ঢের নিঃসহায়... স্থূল হরিণ-শিকারীই শুধু প্রলোভনে ভুলিয়ে হিংসার আড়ম্বর জাঁকাচ্ছে না, সৃষ্টিই যেন তেমন এক শিকারী, আমাদের সকলের জীবন নিয়েই যেন তার সকল শিকার চলেছে।'

ভাবতে অবাক লাগে, এটি 'শিকার' কবিতার ব্যাখ্যা নয়, এবং সেই সঙ্গেই অনিবার্য প্রশ্ন জাগে এটি কি 'শিকার' কবিতারও ব্যাখ্যা নয়! আসলে এটা অনেক কবিতারই ব্যাখ্যা, এটি জীবনানন্দ দাশের বিশিষ্ট মানসিকতায় লালিত এক অনুভূতি। সৃষ্টি এগিয়ে চলে, সভ্যতা এগিয়ে চলে, সমস্ত পৃথিবীতে—যেমন বলা হয়েছে 'বনলতা সেন' কবিতায়,

হাজার বছর ধরে অবিরাম সক্রিয় সাফল্যের ক্লান্তিকর পরিক্রমা চলবেই। কিন্তু 'এই পৃথিবীর রণ রক্ত সফলতা/ সত্য ; তবু শেষ সত্য নয়।' সভ্যতার এই প্রখর সূর্যালোকের ক্লান্তি সহনীয় করার জন্য থাকে প্রেম। সভ্যতার উত্তাল তরঙ্গ থেকে যে মানুষকে নিয়ে আসতে পারে এমন এক 'নিঃসৃত' অন্ধকার, যা 'রাত্রির মায়ের মতো', যেখানে সমস্ত সত্তা জানে, পাখির নীড়ের মতো এক সুনিশ্চিত আশ্রয়ের দৃষ্টিপ্রলেপ রয়েছে। কাজেই সৃষ্টির বিশাল কর্মযজ্ঞে মানুষের মৃত্যু হলেও মানব থেকে যায়, যে মানব মনুষ্যেতর জীবের মতোই, নিশ্চিত মৃত্যু জেনেও শিকারী সৃষ্টির ফাঁদে পা দেয়। হয়তো কারণটা এই যে, এই প্রেম মৃত্যুর চেয়ে বড়ো, মৃত্যুভয়কে সে অনায়াসে উত্তীর্ণ হতে পারে। 'ক্যাম্পে' কবিতায় হরিণ ছুটেছিল এক ঘাইহরিণীর ডাক শুনে, 'শিকার' কবিতাতেও কি হরিণ শুধু নিজের প্রয়োজনে নদীর জলে নেমেছে নাকি আরো এক প্রচ্ছন্ন আবেগ সেখানে কাজ করেছে, যার উল্লেখ কবি এই ভাবে করেছেন—

'এই নীল আকাশের নিচে সূর্যের সোনার বর্শার ম'তো জেগে উঠে
সাহসে সাধে সৌন্দর্যে হরিণীর পর হরিণীকে চমক লাগিয়ে দেবার জন্য।'

'শিকার' কবিতার ব্যাখ্যা এরপরও কিছু বাকি আছে বলে আমার মনে হয় না, অন্তত কবিতার ব্যাখ্যা যাকে বলে। তবু নিজের কাছে নিজেকে স্পষ্টতর করে নেওয়ার জন্য অপ্রয়োজনীয় কথাও কিছু বলবো।

'শিকার' কবিতাটি আখ্যানধর্মী, কিন্তু আখ্যান-অংশ খুবই সংক্ষিপ্ত। অরণ্যের একটি ভোরের দৃশ্যে কবিতার সূত্রপাত, যখন সূর্যোদয়ের আভাস দেখা যাচ্ছে অথচ রাতের একটি তারাও জ্বলজ্বল করছে। সারা রাত দেশজ মানুষ শরীর উষ্ণ রাখবার জন্য আগুন জ্বেলে তাপ নিয়েছে, আর সুন্দর বাদামী হরিণ চিতাবাঘিনীর হাত থেকে নিজেকে বাঁচাবার জন্য ঘুরে বেড়িয়েছে সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে বনে। ভোরের আলোয় তার সাবধানতার অবসান হয়েছে ভেবে যে মুহূর্তে সে নদীর জলে স্নান করতে নেমেছে সেই মুহূর্তেই বোঝা গিয়েছে চিতাবাঘিনীর চেয়েও সাংঘাতিক কোন আততায়ী আত্মগোপন করেছিল এই অরণ্যেই। নাগরিক সেই শিকারীর আচমকা গুলিতে প্রাণ হারিয়ে হরিণ তাদের ভোজ্যে পরিণত হয়েছে।

ক্যাম্পে কবিতাটি এক কথায় অসাধারণ, কিন্তু এর অসাধারণত্বের কারণগুলি যতোখানি অনুভবগম্য, ততোটা ব্যাখ্যেয় নয়। কবিতা বিচারের যে বিশিষ্ট তাত্ত্বিক খুপরি আমরা বানিয়ে রেখেছি, আমাদের সৌভাগ্য অথবা দুর্ভাগ্য, কবিতাটি তার চেয়ে মাপে অনেক বড়ো—কেটে ছেঁটে কোন একটা খোপে তাকে ঢোকাবার চেষ্টা করতে পারি, এরকম চেষ্টা আগেও অনেক হয়েছে ; কিন্তু তাতে কবি, কবিতা এবং কাব্যপাঠক কারো প্রতিই সুবিচার করা হবে না। আমরা বলতে পারি এটি একটি ইমেজিস্ট কবিতা, বস্তুত অনেকেই সে কথা বলেছেন। ফবিস্টদের কবিতায় যে চড়া রঙের ব্যবহার থাকে, এখানে তাও আছে। কেউ যদি ইম্প্রেশনিস্ট কবিতার আস্বাদ এখানে পেতে চান, নিঃসন্দেহে তাও তিনি পেয়ে যাবেন। একটি সংবেদনের মধ্যে একাধিক ইন্দ্রিয়-সংবেদনের অবস্থান, এক কথায় যাকে আমরা বলি সাইনেস্থিসিয়া, তার উদাহরণও এই কবিতায় নির্ভুলভাবে পাওয়া যাবে। এবং কাব্য আঙ্গিকের প্রাণ যে চিত্রকল্পের অনুপম ব্যবহার, এই কবিতা হতে পারে তার আদর্শ দৃষ্টান্ত। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে একে ঠিক কোনও একরকমের কবিতা হিসাবে চিহ্নিত করতে গেলে আমাদের লাভের চেয়ে ক্ষতির আশঙ্কাই সমূহ।

সুতরাং সমস্ত তত্ত্ব কথা ছেড়ে বলা যাক, কবিতাটির প্রধান সৌন্দর্য দুভাবে বিচার্য—এক।। পরিবেশ চিত্রণে এর বর্ণবৈভব, দুই।। এর সংযমের ঐশ্বর্য। প্রথম ব্যাপারটিকে আমরা চিত্রকল্পের অনুরূপ কোন প্রক্রিয়া মনে করতে পারি, রবীন্দ্রনাথ যে ব্যাপারে জীবনানন্দের প্রতিভাকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁর কবিতাকে বলেছেন 'চিত্ররূপময়'। দ্বিতীয় ব্যাপারটি কতো গুরুত্বপূর্ণ তা জীবনানন্দের 'ক্যাম্পে' কবিতার সঙ্গে এ কবিতার তুলনা করলেই বোঝা যাবে। একই রাগিণীর বিস্তৃত আলাপ যদি হয় 'ক্যাম্পে' কবিতা, তবে তার দ্রুত লয়ের কিছু তান বলা যায় 'শিকার' কবিতাকে। কবিতা যে 'সবচেয়ে ভালো শব্দগুলির সবচেয়ে ভালো সজ্জা', তারও সুনিশ্চিত দৃষ্টান্ত এই কবিতাতেই পাওয়া যাবে বলে আমার বিশ্বাস।

শিকারের এক টান টান উত্তেজনা ছড়িয়ে আছে সমগ্র কবিতায়। অবশ্য এই শিকার-যজ্ঞে যে অরণ্যে বহিরাগত নাগরিক মানুষও আছে, সে কথা আমরা জেনেছি কবিতার একেবারে শেষ পর্বে—এমনকি শিকারের যে একটি আয়োজন আছে, হরিণীকে চিতাবাঘিনীর ভয়ে জঙ্গলে জঙ্গলে আত্মগোপন করে থাকতে হয়েছে, সে কথাও আমরা জানতে পারি কবিতার মধ্য পর্বে। এর আগে শুধুই প্রভাত ও রাত্রির সন্ধিক্ষণে মায়াবী এক আরণ্য ভোরবেলার পটভূমি চিত্রণ।

কী অসাধারণ নৈপুণ্যে, এবং বর্ণসচেতনতায়, এবং অনুভূতির গাঢ়তায় এ চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে, কবিতাটি বার কয়েক পড়লেই সে কথা সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝতে পারা যাবে। 'কাদম্বরীচিত্র' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ বাণভট্টের বর্ণসচেতনতার নৈপুণ্য বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছিলেন, লাল রঙের ব্যবহারে তাঁর বৈচিত্র্যসৃষ্টির বৈশিষ্ট্য দেখে। ঠিক সেই ব্যাপারটির দিকেই আমরা অঙ্গুলিসঙ্কেত করতে পারি, তবে অতিরিক্ত শুধু এই কথাটি স্মরণ রাখতে বলবো যে, এই রক্তিম বর্ণবৈচিত্র্য কেবল ইন্দ্রিয়জ বর্ণবৈভব নয়, একটি অত্যন্ত স্পর্শকাতর হৃদয়ও সেখানে সদা সক্রিয় রয়েছে।

যে আগুন গভীর রাতে জ্বেলেছিল দেশোয়ালী মানুষ, সে আগুন ছিল 'মোরগফুলের মতো' লাল। অন্ধকারের পটভূমিকায় ওইরকমই লেগেছিল তাকে। কিন্তু ভোর বেলায় যখন আসন্ন সূর্যালোকের আভাস পাওয়া যাচ্ছে, তখন অশ্বত্থপাতা পোড়ানো সেই আগুনই অনেক ফিকে মনে হয়। কবি বলেন তার রং এখন আর কুঙ্কুমের মতো নেই, তা এখন হয়েছে 'রোগা শালিখের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো'। কী বলা যাবে এ অলংকারকে তা নিয়ে পণ্ডিতেরা বর্ষব্যাপী বিতর্কে রত হতে পারেন, কিন্তু একমাত্র কবিই জানেন নিতান্ত রুগ্ন শালিখেরও হৃদয় থাকে, তার বিবর্ণ ইচ্ছাকে কবিই ছুঁতে পারেন এবং শুধু তিনিই জানেন, সেই ইচ্ছেরও একটা পাণ্ডুর রং থাকে।

শুধু লাল রং নয়, রঙের প্রায় শোভাযাত্রা এই কবিতায় আমরা দেখি— অথবা অত্যন্ত সাদামাটা ভাষায়, উপমাচিত্রের। আকাশের রঙে এখন কবি খুঁজে পান ঘাসফড়িঙের দেহের নীল, চারদিকের পেয়ারা ও নোনা গাছে টিয়াপাখির পালকের সবুজ, অন্ধকার তাঁর হাতে মহার্ঘ হয়ে ওঠে 'মেহগনির' সঙ্গে তুলনায়, হরিণকে তিনি বলেন বাদামী। আকাশে জেগে থাকা একটি মাত্র তারাকে একবার বাসরঘরের সবচেয়ে গোধূলি-মদির মেয়ের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছিল, সঙ্গে সঙ্গে কবির মনে পড়ে গিয়েছে তিনি হাজার বছরের অবিচ্ছিন্ন পদচারণায় ক্লান্ত মানুষ। তাই এবার আকাশের সেই তারাকে দেখে তার মনে পড়ে যায় 'মানুষীকে', মিশরদেশের মানুষী, তাঁরই মানুষী এবং নীল আকাশের মধ্যে

একটিমাত্র তারাকে এবার তাঁর মনে হয়, তাঁর নীল মদের গেলাসে রাখা মিশরের সেই মানুষের বুকের থেকে বার করা মুক্তো। সৃষ্টির নিয়ত শিকারে বিপন্ন কবির অন্তরে আসলে কী গভীর জীবনতৃষ্ণা, এ কথা যেমন বোঝা যাবে এই চিত্রকল্প থেকে, তেমনি এই অসহ্য রোম্যান্টিক পংক্তি আমাদের বুঝিয়ে দেবে রোম্যান্টিকতার প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গিতে আছে কী সুতীব্র জীবনবাদ!

লাল রঙের ব্যবহারের আর-একটি দৃষ্টান্তের কথা এখনও বলা হয়নি, ইচ্ছা করেই। বড় নির্মম সে পংক্তি, কবিতার একেবারে শেষ স্তবকে আছে। কবির ঈর্ষণীয় সংযমের ভালো দৃষ্টান্ত আছে এই শেষ স্তবকেই। পৃথিবীর একটি নির্মমতম ঘটনা ঘটে গিয়েছে এই স্তবকে, যাকে সবিস্তারে লিখবার প্রলোভন সংবরণ করাই শক্ত। যে হরিণ, হরিণরা বরাবরই বোধহয় একচক্ষু হয়, বাঘিনীর হাত থেকে বাঁচাটাকেই সবচেয়ে কঠিন মনে করে অন্ধকারের মোড়কে নিজেকে লুকিয়ে বেড়িয়েছে, বাঘিনীর চেয়েও হিংস্র জন্তু যে দিনের আলোয় অসঙ্কোচে দূর থেকে প্রাণঘাতী আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করতে পারে, তা বোধহয় তার জানা ছিল না। অরণ্যে কারোই বোধহয় তা জানা থাকে না, সেই জন্যই শেষ স্তবকের প্রথম পংক্তি 'একটা অদ্ভুত শব্দ'। তারপরই বিক্ষত সেই পংক্তি—'নদীর জল মচকাফুলের পাপড়ির মতো লাল।' আমরা যারা মচকা ফুল কখনো দেখিনি, তাদের চোখের সামনে এখন ফুলের পাপড়িতে ছিটকে লাগে হরিণের রক্ত। মৃত্যুর আয়োজনে একটুও সময় অপব্যয় না করে 'উষ্ণ লাল' হরিণের মাংসের ভোজে আমাদের উপস্থিত করেন কবি। ঘাতকদের পরিচয় তিনি দিয়েছেন কয়েকটা মাত্র বাক্যাংশে—'সিগারেটের ধোঁয়া /টেরিকাটা কয়েকটা মানুষের মাথা ;/এলোমেলো কয়েকটা বন্দুক'।

অব্যর্থ এবং অপরিহার্য শব্দ ব্যবহারের এমন নিপুণ দৃষ্টান্ত মহৎ কবিদের রচনাতেও খুব বেশি পাওয়া যায় না।

জীবনানন্দ যাঁদের আনন্দ দেন, জীবনানন্দ যাঁদের বিষণ্ণ করেন, এ কবিতা তাঁদের নতুন করে ভাবাবেই। কারণ জীবনানন্দে আমরা যে রমণীয় স্ববিরোধিতা দেখি—'গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদে আমার আত্মা লালিত' এ কথা বলার পরও যিনি বিশ্বাস করেন 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়'—তাঁর সেই স্ববিরোধী সত্তার এক কাব্যিক সমীকরণ আমরা 'শিকার' কবিতাটিতে পাই, এটিই কবিতাটির সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

হাজার বছর শুধু খেলা করে ঃ জীবনানন্দ দাশ

অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত

> হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো ঃ
> চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান ;
> বালির উপরে জ্যোৎস্না—দেবদারু ছায়া ইতস্তত
> বিচূর্ণ থামের মতো ঃ দ্বারকার ;—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
> শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন ;
> 'মনে আছে?' সুধালো সে—সুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন?'

মানুষের জীবনের (ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক) অতিক্রান্ত অতীত পর্যায়গুলি কখনোই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় না, পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মতো রয়ে যায়, অন্ধকারে যেমন অপ্রতাপ জোনাকি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকে। একদা আয়োজিত সমস্ত আড়ম্বর কতো তুচ্ছ ব'লে মনে হয় সর্বব্যাপী, অনিবার্য এই রাত্রির কাছে। দিনের যাবতীয় ক্ষমতালিপ্সু অনুষ্ঠানকে অর্থহীন করে দিয়ে রাত্রি তার অপরূপ অবসানের চরাচর নিয়ে জেগে ওঠে। ['রাত্রির নিধান' শব্দটির অর্থ এখানে রাত্রির নির্দেশ। নিধান শব্দটির আভিধানিক অর্থ ১ স্থাপনা ২ সংরক্ষণ ৩ প্রত্যর্পণ ৪ দান ৫ অনুপস্থিতি ৬ কুবেরের সপ্তনিধির যে কোনো একটি ৭ ঐশ্বর্য ৮ শস্যকোষ ৯ ভিত্তিস্তর (বীজগণিত)। করুণানিধান শব্দটির অর্থ করুণায় ভরা, দয়াময় ইত্যাদি। আলোচ্য প্রসঙ্গে এই অর্থসমূহ থেকে সংগৃহীত একটি সঙ্কেত মেলে। চারিদিকে আবহমান কাল ধরে রাত্রির নির্দেশ জারি করবার অধিকার অমোঘরূপ সক্রিয়। দিন কখনোই সেই বিরাটত্ব অর্জন করতে পারে না রাত্রির পক্ষে যা সম্ভব।] আমাদের বহুমুখী কর্মোদ্যমের ধ্বংসরাশির উপরে রাত্রির বাৎসল্য ছড়িয়ে থাকে, বালির উপরে জ্যোৎস্নার ব্যঞ্জনার মতো। দেবদারু গাছের ছায়াগুলি মনে হয় বিশাল প্রাসাদের রণধ্বস্ত স্তম্ভ। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের শেষে কৃষ্ণ ফিরেছিলেন দ্বারকায় ; এই দ্বারকাই একদিন সমুদ্রশরীরে নিলীন হয়ে গিয়েছে। 'দ্বারকা' এখানে কৃতকর্মা পুরুষের প্রতিষ্ঠাভূমির প্রতীক—এবং একদিন যে কৃতী পুরুষের সকল প্রস্তুতি-শ্রম-স্থাপত্য নিরর্থক হয়ে যায় জীবনানন্দের অনেক কবিতায় তার ইঙ্গিত রয়েছে। একটি উদাহরণ, 'তারা যুবা, তারা মৃত, মৃত্যু অনেক পরিশ্রমের ফল।' এখানে দ্বারকা প্রতিষ্ঠা, পরিণতি ও সংহার-পরিণামের দ্যোতনাবাহী শব্দ। জীবনানন্দ এখানে 'দেবদারু' শব্দের অনুষঙ্গে অকস্মাৎ 'দ্বারকার' শব্দটি ব্যবহার করেছেন এবং তার ফলে চতুর্থ পংক্তিতে এসে কবিতাটি অতর্কিতে পৌরাণিক পূর্বসূত্রের (allusion) উল্লেখে অপরিমেয় ঐশ্বর্য লাভ করেছে। জাগ্রতাবস্থায় সূচিত ও সাধিত সমস্ত কর্মের আপাত-সার্থকতার আড়ালে লুকোনো অকৃতার্থতা ও অন্তিম অবসাদে নেমে আসে ঘুম। ('ঘুম' 'ঘ্রাণ' 'ঘুচে গেছে' শব্দগুলি অনুপ্রাসের স্রোতে স্বতশ্চালিত)। আমরা আমাদের যৌথ-অবচেতনা (Collective Unconscious) থেকে ফিরে আসি

ব্যক্তিস্বরূপের সর্বস্বতায়। যে-প্রেমিকা ব্যক্তির ধ্রুব আশ্রয়, সেই তখন অবজ্ঞার প্রদোষচ্ছায়া থেকে তার জীবনসুভগ মুখচ্ছবি নিয়ে অমোঘ হয়ে ওঠে।

> হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো ঃ
> চারিদিকে পিরামিড—কাফনের ঘ্রাণ ;
> বালির উপরে জ্যোৎস্না—খেজুর ছায়ারা ইতস্তত
> বিচূর্ণ থামের মতো ঃ এশিরিয়—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।
> শরীরে মমির ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন,
> 'মনে আছে?' সুধালো সে—সুধালাম আমি শুধু, 'বনলতা সেন!'

মানুষের জীবনের (ব্যক্তিগত ও নৈর্ব্যক্তিক) অতিক্রান্ত অতীত পর্যায়গুলি কখনোই সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে যায় না, পরিকীর্ণ ধ্বংসস্তূপের মতো রয়ে যায়, অন্ধকারে যেমন অপ্রতাপ জোনাকি ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকে। একদা আয়োজিত সমস্ত আড়ম্বর কতো তুচ্ছ ব'লে মনে হয় সর্বব্যাপী, অনিবার্য এই রাত্রির কাছে। চতুর্দিকে পরিকীর্ণ পিরামিডগুলি মানুষের অমর হবার উদ্যমকে যতোই ঘোষণা করুক সেই সবি মৃত্যুর স্মারক। দুর্গন্ধবহ শবাধারের মর্যাদাও মৃত্যুত্তীর্ণ নয় (এখানে শবাধার সুঘ্রাণ ছড়াচ্ছে না, প্রসঙ্গ থেকে সেটা স্পষ্ট। 'কফিন' শব্দটি আরব-শব্দ কফন-এর ইংরেজি সংস্করণ। জীবনানন্দ মূল শব্দের আদলে কাফন শব্দটি এনে ধ্বনির সাহায্যে আরো বিস্তারিত অবসন্নতা সৃষ্টি করেছেন)। আমাদের বহুমুখী কর্মোদ্যমের ধ্বংসরাশির উপরে রাত্রি বাৎসল্য ছড়িয়ে থাকে, বালির উপরে জ্যোৎস্নার ব্যঞ্জনার মতো। সেমেটিক মরুনিসর্গে ছড়ানো খেজুর গাছের ছায়াগুলি চূর্ণদম্ভ নৃপতিবর্গের প্রতিহত উচ্চাশা মনে করিয়ে দেয়—বিশাল রাজপ্রাসাদের বিনষ্ট স্তম্ভের মতো বোবা ছায়াগুলি দাঁড়িয়ে থাকে। আমরা প্রত্যেকেই আমাদের উচ্চাশা ও উচ্চকিত সংকল্পের সৌজন্যে সম্রাট ছিলাম। অতঃপর আমরা অসহায়ভাবে লক্ষ্য করেছি আমাদের বহিরাশ্রয়ী সাম্রাজ্য ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গিয়েছে। আমরা চেয়েছিলাম ঐহিক শক্তিপুঞ্জকে প্রসারিত করে দেহাবসানেও একটি স্মৃতিশরীর সংরক্ষিত করবো, কিন্তু আমাদের সেই মমি সেই অবিনাশী বাসনার সৌন্দর্যটুকুও অক্ষুণ্ণ রাখতে পারছে না, উপরন্তু আমাদেরই ঐ সুরক্ষিত শবদেহ এক অপঘ্রাণ নিয়ে বিব্রত করছে আমাদেরই ঈর্ষা-প্রতিযোগিতাবৃত্তি—বাণিজ্যিক ও জাগতিক সমস্ত বিনিময় চুকিয়ে দেখতে পাচ্ছি সমগ্র জীবনযাপন ব্যর্থ হয়ে গিয়েছে। আমাদের প্রধান প্রতিভা যে-প্রেম অথবা প্রেমিকা তাকে এতদিন উপেক্ষা করেছিলাম, কিন্তু জিগীষা ও জিঘাংসার যৌথাবস্থা থেকে একান্ত-অস্মিতার কাছে ফিরে আমরা সেই প্রেমের ধারণা বা প্রেমিকার কাছেই সমর্পণ করতে উন্মুখ হয়ে উঠি। সেই প্রেম যখন ফিরে আসে, জিজ্ঞাসা করে তাকে সনাক্ত করতে পেরেছি কিনা, তখন তাকে কোনো দ্বিধান্বিত উত্তর জ্ঞাপন করি না, আমাদের প্রশ্ন স্থগিত হয় সেই মহাশ্রয়ের কাছে একটি প্রত্যয়ে।

জীবনানন্দের এই দুটি কবিতার উৎসে স্পৃশ্যত তিনটি কবিতা দেখতে পাচ্ছি—১ Ozymandius শেলি (তর্জমা, 'দাম্ভিক' ঃ সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র) ২ প্রান্তিক ১৬ ঃ রবীন্দ্রনাথ ৩ বনলতা সেন ঃ জীবনানন্দ। শেলির অভ্যস্ত চিন্তনের প্রত্যন্তশায়ী এই কবিতায় যে-Colossal wreck বর্ণিত হয়েছে, রবীন্দ্রনাথের সনেটের সেই বিভাব অত্যন্ত তীব্র। সুরেন্দ্রনাথের ভাষান্তরের অংশবিশেষ 'দেখা হলো পান্থ সনে প্রাচীর মিশর হতে আসি/কহে সে, আসিনু দেখি দেহহীন চরণযুগল/রয়েছে দাঁড়ায়ে পার্শ্বে বালুকায় লোটায়

কেবল/ছিন্ন মুণ্ড সে মূর্তির, ওষ্ঠাধর গর্ব পরকাশি/...এই শিলালিপিটুকু অবশিষ্ট যেন তূরী ভেরী/বাজাইছে তার স্বরে, মরুভূমি নিঃশব্দ বধির/যতদূর দৃষ্টি যায় চৌদিকে সাহারা করে ধূ ধূ/ সে বিপুল ধ্বংসরাশি মাঝখানে পড়ে আছে শুধু'। রবীন্দ্রনাথের ঃ 'পথিক দেখেছি আমি পুরাণে কীর্তিত কত দেশ/কীর্তিনিঃস্ব আজি ; দেখেছি অবমানিত ভগ্নশেষ/ দর্পোদ্ধত ; প্রতাপের অন্তর্হিত বিজয়নিশান/বজ্রপাতে স্তব্ধ যেন অট্টহাসি...চিহ্ন লোপ করে/অসংখ্যের নিত্য পদপাতে। দেখিলাম বালুস্তরে/প্রচ্ছন্ন সুদূর যুগযুগান্তর, ধূসর সমুদ্রতলে/যেন মগ্ন অকস্মাৎ মহাতরী ঝঞ্ঝাবর্ততলে/লয়ে তার সব ভাষা, সর্বদিনরজনীর আশা/মুখরিত ক্ষুধাতৃষ্ণা, বাসনা প্রদীপ্ত ভালোবাসা.../অসীমের হৃৎস্পন্দন তরঙ্গিছে মোর দুঃখে সুখে।' সুভদ্র রবীন্দ্রমুদ্রা পরিস্ফুট হওয়া সত্ত্বেও এক নিদারুণ অবসানের চিত্রকল্প এখানে অনপনেয় রূপে উপস্থিত। যখন চতুর্দিক থেকে অবসানের ধূসরতা মর্মান্তিক স্পষ্ট হয়ে ওঠে, নিজের কাছে ফেরার সময় আসে—শেলিতে এই এষণা ছিল না, রবীন্দ্রনাথ এনেছেন। জীবনানন্দের প্রবাদপ্রতিম 'বনলতা সেন' কবিতায় প্রত্যাবর্তনের এই অসহায় মহিমা 'প্রকৃতিস্থ প্রকৃতি' ও প্রেমে সমাহিত হয়েছে। কিন্তু বনলতা সেনও অপরিবর্তনে চিরায়ত কোনো প্রতিমা নয় ; তাকেও সময়, অভিজ্ঞতা ক্লান্ত করে, ক্লান্ত, ক্লান্ত করে। তা সত্ত্বেও ব্যক্তির সর্বশেষ আশ্রয় ব্যক্তিহৃদয়—নির্বিকল্প হৃদয়। নির্বিকল্প হৃদয়ের নিদর্শন জীবনানন্দের নানা কবিতায় দেখতে পাই। কিন্তু এই দুটি কবিতায় ঐ বোধ বিশেষ প্রবল। প্রথমে ব্যাখ্যাত কবিতাটির পরিবেশ প্রাচীন ভারতবর্ষ। অন্য কবিতাটিতে পটভূমি সেমিটিক আবহ পর্যন্ত প্রসারিত। পটভূমিকা যতোই প্রসারিত হচ্ছে কবির মনে ততোই গূহনিহিত সনাতন শরণের অনিবার্যতা দেখা দিচ্ছে। অন্ধকারে এই শরণাগতি, দেশগত ও কালগত পরিব্রজনের শেষে গচ্ছিত, অথচ ঈষৎ ক্ষয়প্রাপ্ত পরমতার কাছে প্রত্যাগমন,—দুটি কবিতায় তারি অণিমাসিদ্ধি।

এমন বলা চলে না যে কবিতাদুটির প্রত্যংশ সার্থক। 'অন্ধকারে জোনাকির মতো' এবং 'বালির উপরে জ্যোৎস্না'—দুটি ছবি পরস্পর-বিসদৃশ। অন্ধকার বলতে আমাদের জ্যোৎস্না মনে পড়ে না এবং জ্যোৎস্নায় জোনাকির আলো তীক্ষ্ণ বৈষম্যের কোনো সৌন্দর্য বহন করে আনে না। দুটি ছবিকে আলাদা করে নিলে এই সংগতি-দোষ চোখে পড়ে না। কখনো কখনো একই বর্ণের প্রয়োগে আশ্চর্য বিসংগতি রচনা করা যায়, যেমন 'অস্থি-র গায়ে জ্যোৎস্না পড়েছে যারা ছিল চলে গেছে/বুঝবে না দেখ, রাত্রি করেছে' (অমিয় চক্রবর্তী)। একই রঙে পাশাপাশি ভীষণ ও শান্তকে অন্বিত করার ইচ্ছা এক্ষেত্রে জীবনানন্দের ছিল না ; অতিশয় মৃদু রঙের কাজ অল্প একটু জায়গায় করতে চেয়েছিলেন ব'লেই। এই স্বল্পাক্ষর কবিতার পক্ষে এরকম সংগতি-দোষ মারাত্মক হতে পারত কিন্তু প্রথম লাইন থেকেই মন্ত্র দুলে উঠেছে এবং ছবিগুলি সেই মন্ত্রের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। দুটি কবিতাই চিত্রনির্ভর নয়, মন্ত্রনির্ভর। একটি কবিতা আরেকটি (অথবা আরো কয়েকটি) কবিতা থেকে জন্ম নিয়ে কি রকম আত্মপ্রভ হতে পারে, দুই কবিতার তুলনায়নেই সেটি প্রমাণিত।

বনলতা সেন ঃ জীবনানন্দ দাশ

পার্থপ্রতিম বন্দ্যোপাধ্যায়

হাজার বছর ধরে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
সিংহল সমুদ্র থেকে নিশীথের অন্ধকারে মালয় সাগরে
অনেক ঘুরেছি আমি ; বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে
সেখানে ছিলাম আমি ; আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে ;
আমি ক্লান্ত প্রাণ এক, চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন,
আমারে দুদণ্ড শান্তি দিয়েছিল, নাটোরের বনলতা সেন।

চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা,
মুখ তার শ্রাবস্তীর কারুকার্য ; অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে অন্ধকারে ; বলেছে সে, 'এতদিন কোথায় ছিলেন?'
পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।

সমস্ত দিনের শেষে শিশিরের শব্দের মতন
সন্ধ্যা আসে ; ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল ;
পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলে পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন
তখন গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল ;
সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন ;
থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

আধুনিক ভাষাতাত্ত্বিক কবিতা-আলোচনায় কবিতার পুরো টেক্সট্‌কেই একটি বাক্য হিসাবে দেখার প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। বাক্যমালা বা পরম্পরা নয়, বরং সমগ্র কবিতাটিই যেন একটি বাক্য। কিছু বাক্য দিয়ে গঠিত কবিতাটি একটি বাক্যই যেন—ফলে বাক্যের বিশ্লেষণে যে গঠন-অন্বয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়, কবিতাটিকেও একটি বাক্য, একটি স্টেট্‌মেন্ট হিসাবে ধরে সেভাবেই বিশ্লেষণ করা উচিত বলে মনে করা হয়। বাক্যের গঠনে বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনামের মতোই কবিতার টেক্সট্‌-এও বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনামকে দেখতে হবে, নোঅম চোমস্কির বাক্যের গভীর ও উপরি-গঠনের মতো কবিতারও উপরি ও গভীর গঠনের বিশ্লেষণ করা কাম্য। অবশ্যই সব রকম কবিতার ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি বিশেষ ফলপ্রসূ হয় না, কিন্তু জীবনানন্দ দাশের বনলতা সেনের মতো কবিতার উদ্‌ঘাটনে-আবিষ্কারে এ পদ্ধতি খুবই কার্যকর।

বনলতা সেন কবিতাটির ছত্র সংখ্যা ১৮। তিনটি স্তবক—প্রতি স্তবকে শব্দ সংখ্যা প্রায় একই—৪৫, ৪৬, ৪৬। কমা-সেমিকোলন-এর বিরতি সহ বাক্য তিনটি। অর্থাৎ বাক্য-শেষের পূর্ণচ্ছেদ তিনটিই আছে। এই তিনটি বাক্য কবিতার টেক্সট্-এর বৃহৎ বাক্যটিকে গঠন করেছে। প্রতিটি বাক্যে যেমন একটি 'ফর্ম' ও একটি 'কন্‌টেন্ট' থাকে, কবিতার বাক্যতেও তাই থাকে। চোমস্কিয় 'সারফেস স্ট্রাক্‌চার' হচ্ছে লক্ষ্য-যোগ্য বা প্রকাশিত 'expressive' স্তর বাক্যের ; আর স্পষ্ট করে বলা যায় ধ্বনি বা লিখিত প্রতীক—বিমূর্তভাবে বললে অন্বয়, শব্দ ও শব্দাংশের সাজানোটি। কবিতার একটি যুক্তি-শৃঙ্খলা গঠন-শৃঙ্খলা থাকে, উপরিতলের গঠনে সেটিই ধরা পড়ে—প্রথমে যেটা জানানো হল তার পটে বা প্রতি-তুলনায় নতুন "সংবাদ" এই তলে আসে—জটিল গঠনের পার্থক্য 'differentials'-টি স্পষ্ট করে। বিশেষভাবে নির্বাচিত (সর্বদা যে সচেতনভাবে হয় তা নয়) প্রকাশ-পদ্ধতি পাঠকের অভিজ্ঞতার ওপর নানা প্রভাব ফেলে। এই প্রকাশের গঠন থেকেই সে অর্থ নিষ্কাশিত করে। বলা যায় এই 'Structure of the Syntatic Surface'-ই কবিতা-পাঠের কর্মটির ওপর সরাসরি অভিঘাত আনে : বাঁদিকে থেকে ডানদিকে পড়ায় ছত্রের হ্রস্বতা-দীর্ঘতা, এর পুনরাবৃত্তি এ কারণেই গুরুত্বপূর্ণ। প্রকাশের পদ্ধতিতেই কবির সম্পর্কেও ধারণা তৈরি করে—প্রচ্ছন্ন কবিকে আবিষ্কার করা যায়, সর্বনাম-বিশেষ্য হয়ে ওঠে বিশেষ্য-সর্বনাম।

বনলতা সেন কবিতাটিতে প্রথম ছত্রের সর্বনাম 'আমি' কবিতার বাক্যে কবি, পরিশেষে মানুষে রূপান্তরিত—অর্থাৎ বিশেষ্যে তার উত্তরণ ঘটে। "হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে"—একেবারে গদ্যের বাক্য-গঠন অনুযায়ী যাকে বলা যায় 'গ্রামাটিক্যাল'। 'হাজার বছর' অর্থাৎ হিসাব মতো চতুর্থ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে, আবার 'হাজার' অর্থে দীর্ঘ সময়কেও দ্যোতনা করা হয়ে থাকতে পারে। 'পথ' শব্দটি দু'বার ব্যবহৃত—'হাঁটিতেছি', এই সাধু-ক্রিয়ায় সময়ের দূরত্ব প্রতিফলিত হয়েছে। কিন্তু সময়ের জায়গায় যখনই 'স্পেস' বা দেশ-এর প্রসঙ্গ এনেছেন কবি, তখনই ক্রিয়ার রূপও পাল্টেছে,—"অনেক ঘুরেছি আমি"। সিংহল সমুদ্র থেকে মালয় সাগরে—এই পরিক্রমা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর আগে বস্তুত কোনো ভারতবাসীর পক্ষে সম্ভব ছিল না, তাই তো হাজার বছরের উল্লেখ করেন কবি। এই চক্রমণ "নিশীথের অন্ধকারে", এরও আগে তিনি ছিলেন, "বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতে"—'ধূসর' বিশেষণটি লক্ষণীয়, আরো দূর অন্ধকারে বিদর্ভ নগরে। অন্ধকার ও ধূসর—এই দুটি রং এখানে আছে। সময়ের দীর্ঘ দীর্ঘ পথে এই একাকী পরিক্রমা, অন্ধকারে ও ধূসর জগতে। 'অন্ধকার' শব্দটি কবিতায় পাঁচ বার ব্যবহৃত—অন্ধকারের এই পুনরাবৃত্তি পাঠকের মনে একটি নির্জন ক্লান্তির চেতনা আনে। "আমি ক্লান্ত প্রাণ এক"—কবি নিজের পরিচয় এভাবেই দেন। ইতিমধ্যে দীর্ঘ লাইনের ছন্দে ও আ-কারের ব্যবহারে এই ক্লান্তি ও সময়ের দূরত্ব দুই-ই ধরা পড়ে। আর এর মধ্যেই কবি জানিয়ে দেন, "চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন"—শেষ দুটি শব্দে 'স' পর-পর থাকায় জীবনের চঞ্চলতা আভাসিত হয়, কিন্তু ঐ ক্লান্তিকে না ভেঙেই।

এরপর, কবিতার বড় বাক্যের দ্বিতীয় অংশে, আর কবিতাটির দ্বিতীয় স্তবকে বনলতা সেন সম্পর্কে বলা হয়। প্রথম বাক্যাংশে বা স্তবকে 'আমি' বা কবি স্বয়ং প্রতিষ্ঠিত, দ্বিতীয়টিতে বনলতা সেন। বনলতা নামটিও তাৎপর্যপূর্ণ : ইতিহাস অতিক্রমকারী প্রকৃতিরই অনুষঙ্গ জড়িয়ে। বিদিশার নিশা ও শ্রাবস্তীর কারুকার্য—বনলতার চুল ও মুখের উপমা-চিত্রকল্প হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই দুটি নগরীই রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ,

বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখিত। দুটিই বণিকদের কেন্দ্রস্থল, বৌদ্ধ পরম্পরার সঙ্গে যুক্ত। অর্থাৎ বনলতা ইতিহাসের পর্যায়ে পর্যায়ে প্রসারিত—সময়ের উৎক্ষেপ তার চুলে ও মুখে। লক্ষণীয় : হল—সিংহল, সমুদ্র, মালয় সাগর, বিদিশা, শ্রাবস্তীর উল্লেখে 'আমি' বা কবিকে শুধু ক্লান্ত পথিক মনে হয় না, মনে হয় সমুদ্র-যাত্রী বণিক। আর প্রচ্ছন্ন উপমাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে এই চিত্রকল্পে—

অতিদূর সমুদ্রের পর
হাল ভেঙে যে নাবিক হারায়েছে দিশা
সবুজ ঘাসের দেশ যখন সে চোখে দেখে দারুচিনি-দ্বীপের ভিতর,
তেমনি দেখেছি তারে, অন্ধকারে ;

এখানে নাবিকের এই উপমাটি, দারুচিনি-দ্বীপের উল্লেখে সমুদ্র-অভিযানকারী প্রাকৃতিক দুর্যোগ-বিপর্যস্ত এক বণিকের চিত্রকল্পই নিয়ে আসে। সার্বিক এক সর্বনাশের ইঙ্গিত : সর্বনাশের হতাশা ক্লান্তির, অন্তহীন ক্রুদ্ধ জলরাশির পর সবুজ ঘাসের মতো বনলতা সেনকে মনে হয়েছিল। প্রকৃতির উপমা আবার। আর চোখের উপমা তাই হয় "পাখির নীড়"। বিপর্যস্ত অভিযানকারীর কাছে "নীড়"—আশ্রয়, শান্তিও ঈঙ্গিত। সেই নারী প্রশ্ন করে, "এতদিন কোথায় ছিলেন?" 'ছিলেন' শব্দটিতে এ সময়ের ধ্বনিই উচ্চারিত। সে অপেক্ষা করে আছে, আসতে এত দেরি কেন? 'এতদিন' শব্দবন্ধটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি 'কোথায়' প্রশ্নবোধক এই শব্দটি কবিতার বাক্যের প্রথমাংশে দেখেছি—কোথায়-এর উত্তর দুরূহ—কারণ পথিকের ঠিকানা পরিক্রমায় পাল্টায়।

কবিতাটির বড় বাক্যের তৃতীয়াংশে অর্থাৎ তৃতীয় স্তবকে কবি ও বনলতা সেনের পরিচয়ের পর নতুন একটি "সংবাদ" আসে। জানা হয়ে গেছে বনলতা নাটোরের—একটি বিশেষ স্থানের। যদিও সময়ের উড়ালে সে কবেকার বিদিশার, শ্রাবস্তীর। দেশ-কালের এই 'টেনশন' কবিতাটির টেক্সট্-এর, বাক্যের তৃতীয় অংশ নিয়ে আসে। এই অংশে প্রকৃতি : শিশিরের শব্দের মতন সন্ধ্যা আসে। ডানার রৌদ্রের গন্ধ মুছে ফেলে চিল। এই অংশে রৌদ্র ও জোনাকির রঙে ঝিলমিলের মতো শব্দ-শব্দসমষ্টি ব্যবহৃত হয়েছে ধূসর—অন্ধকারের প্রায় পতিপক্ষেই। শুধু তাই নয়, চিত্রময়তা শ্রাব্য চিত্রকল্পে আশ্রয় নেয় "শিশিরের শব্দের মতন"। কিন্তু "রৌদ্রের গন্ধ"র মতো চিত্রকল্পে, যা চিত্রময় নয় প্রত্যক্ষত। এই অংশে, পৃথিবীর সব রঙ নিভে গেলেও ধূসর অন্ধকার থাকে না : বরং পাণ্ডুলিপি করে আয়োজন। পাণ্ডুলিপি—যে লিপিতে কারুর হস্তক্ষেপ ঘটেনি, যে লিপি ব্যক্তির নিজ জগতের একটি অকুণ্ঠ প্রয়াস : গল্পের তরে জোনাকির রঙে ঝিলমিল। এগারো লাইনের "দেখেছি তারে অন্ধকারে" আর ষোলো লাইনের "গল্পের তরে....ঝিলমিল" পৃথক, কবিতার গঠনের 'differential'-টি স্পষ্ট। ১৭ লাইনে আবার ব্যবসার উপমা ফুরায় এ জীবনের সব লেন-দেন। সব পাখি, নদী ঘরে আসে। সময়-ইতিহাস যেন এক নটরাজ-মুহূর্তে স্থির—থাকে শুধু অন্ধকার, এ অন্ধকার প্রথম দুটি স্তবক বা অংশের ধূসর দূর অতীতের অন্ধকার নয়, এ অন্ধকার বর্ণময়, নিজেকে পাবার, মুখোমুখি বসিবার—বনলতা সেন, নিজ প্রেম-অভিজ্ঞানকে আবিষ্কারের।

একটু লক্ষ্য করলেই দেখা যায়, কবিতার বাক্যটির প্রথম দুই অংশে, অর্থাৎ স্তবকের 'আমি' বা কবির ক্লান্ত প্রাণের স্বরূপ জানানো ও বনলতা সেনের পরিচয় এবং দেখা পাওয়া এক গভীর স্তরের অর্থের দিক থেকে আপাতভিন্ন হলেও, মূলত এক : দুটি

স্তবকের শেষের ছত্র দুটি ''নাটোরের''—এই বিশেষ চিহ্নে এক সূত্রে গাঁথা। তবে উপরি বা বহির্স্তরের পার্থক্য, দুটি ভিন্ন ছবি পাঠকের মনে আঁকে—প্রথম স্তবকের লয় দ্বিতীয় স্তবকে আরও ধীর ও বিলম্বিত।

১) হাজার বছর ধ'রে আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে,
২) চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।

এই দুটি লাইন যখন পড়া যায়, তখনই মূল ছন্দ প্যাটার্ণের তারতম্য না থাকলেও, নিজের মতো এক সুরময় স্থিতিস্থাপক যে পয়ার জীবনানন্দ নির্মাণ করেছিলেন, তার চারিত্র একই হলেও, পড়ার সময় পর-পর আ-কার ধ্বনিতে দ্বিতীয়টিতে দূর বিলম্বিত ছন্দস্পন্দ আসে। অথচ শেষ লাইনে, এই দূরত্ব অদূর থাকে না, নাটোরের বনলতা সেনের। বিদিশা-বিদর্ভ-শ্রাবস্তীর বিপরীতে এই নাটোর, একেবারেই বর্তমান ও প্রাত্যহিক। কিন্তু বনলতা, প্রকৃতির মতোই অম্লান ঃ ইতিহাসের ক্লান্ত প্রাণের নীড়ের আশ্রয়, দূরগামী নানা ঝড়-ঝঞ্ঝায় বিপর্যস্ত পাখির প্রত্যাবর্তনের, বাঁচবার স্থল। কবি বা 'আমি' এখানে প্রচ্ছন্নভাবে ঐ পাখিরই মতন।

আসলে কবিতাটির গঠনের গভীর স্তরে প্রথমাবধিই এমন ঘটনা বা চিন্তার কথা বলা আছে, যা ভাষার সীমার বাইরের। 'আমি' এই সর্বনামটি যখনই প্রথম লাইনে এল, তখনই সামান্য মানুষ বা কবি সম্পর্কে এক পূর্বধারণা এসে যায়, যা কবিতাটির মূল মাধ্যম শব্দ বা ভাষার আগেকার। একাধিক স্থান ও ব্যক্তির নাম কবিতাটিতে আছে, যা কবিতার ভাষা-নিরপেক্ষ। ''আমি পথ হাঁটিতেছি পৃথিবীর পথে''—'আমি' বা মানুষ এই ভাষাতিরিক্ত বিষয়, 'হাঁটা' এই কর্মের সঙ্গে যুক্ত। এই সম্পর্ক কবিতাটির প্রক্রিয়া ও অর্থের দিক থেকে খুবই জরুরি। উপস্থাপনার প্রণালী বা পদ্ধতিতেই কবির দৃষ্টিভঙ্গী ধরা পড়ে। পথ হাঁটার প্রতিপক্ষে ক্লান্ত প্রাণ আসে। 'হাঁটিতেছি'—এই ক্রিয়ার ঘটমান বর্তমান রূপে স্পষ্ট কবি এখনও গতিময়। কবিতার শেষ অংশের সব ফুরাবার ও অন্ধকারে মুখোমুখি বসিবার জন্য যে থামা বা স্থিরতা, তা স্তব্ধ হয়ে যাওয়া বন্ধ হয়ে যাওয়া নয়। বরঞ্চ আর এক যাত্রার, নিজেকে, নিজের অভিজ্ঞানকে আবিষ্কার করার চূড়ান্ত মুহূর্ত ঃ বনলতা সেন একই সঙ্গে তার ঈপ্সিতা সেই নারী, আবার অভিজ্ঞান—নিজেকে আবিষ্কারও বটে। এই দ্বন্দ্বময় বিষয়-বিষয়ীর মিলনের যাত্রাই 'পথ হাঁটিতেছি' এই ক্রিয়ায় ধ্বনিত—আমি ক্লান্ত প্রাণ, কিন্তু চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন। এ জীবন কোন হালকা উচ্ছ্বাস বা অর্থহীন কলরোল নয় ঃ জীবনের সমুদ্র, এই চিত্রকল্পে জীবনের বিরাট ব্যাপ্তিই ধরা দেয়। কবিতাটির উপরিস্তরের বিশেষণগুলির দিকে মনোযোগ দিলেই, এই আততি লক্ষ্য করা যায় ঃ একদিকে ধূসর, দূর, ক্লান্ত, অন্যদিকে সফেন সবুজ। আরও দেখার, কবিতাটিতে ঠিক যথার্থ বিশেষণ যাকে বলে তা কম, বরঞ্চ ক্রিয়া, হাঁটা, ঘোরা, হারানো, বলা, আসা, মুছে যাওয়া, নেভা, ফুরানো, বসা—ঘুরে ফিরে এসেছে। বার বার হারানো-নেভা-ফুরানো-বসার পাশাপাশি হাঁটা-ঘোরা-বসা-আসা-যাওয়ার ক্রিয়া আমরা পাই। উভয়ের এই অবস্থিতিতে কবির নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গী ধরা পড়ে। বনলতা সেনের সে অর্থে কোন বিশেষণ নেই—নাটোরের একটি স্থানবাচক চিহ্ন আর 'মুখোমুখি বসিবার'—এই ক্রিয়া আবার ক্রিয়ার শেষের কথা।

'বনলতা সেন' কবিতাটির বাক্যের, টেক্সটের ক্রমপ্রসারণে আধুনিক কবিতারই এক যাত্রা দেখি। য়াকবসেন দেখিয়েছেন, শিল্পশৈলী রোমান্টিকতা থেকে বাস্তববাদের মধ্য দিয়ে

প্রতীকীবাদের অভিমুখী হয়েছে। বলা যেতে পারে রূপক থেকে লক্ষণার, আবার রূপকে ফিরে আসার এক প্রক্রিয়া লক্ষণীয়। আবার ডেভিড লজ মনে করেন, আধুনিকবাদ ও প্রতীকীবাদ মূলত রূপকালঙ্কারী, আর আধুনিক বিরোধীই বাস্তববাদী ও লক্ষণাত্মক। বনলতা সেন-এর রূপ-প্রতীকী উন্মোচনে এটাই লক্ষ্য করা যায়। প্রথম দুই স্তবকে অর্থাৎ টেক্সটের দুই অংশে বনলতা সেন রূপক, নাটোরের বনলতা। কিন্তু দুটি অংশে দু'ধরনের উপাদানের ক্রম : একটির প্রসঙ্গে আরেকটি এসেছে। এর থেকে আসে শেষ অংশের প্রতীকী রূপান্তর। আগের দুই অংশের বস্তুভিত্তিক বিষয় প্রতিষ্ঠা ডানার শব্দ, রৌদ্রের ঘ্রাণ-এর চিত্রকল্পকে সম্ভব করে। নাটোরের বিশেষ স্থানের হাত ছাড়িয়ে বনলতা সেন স্বাধীন প্রতীকের মর্যাদা পেয়ে যায়। প্রথম দুই স্তবকের বাস্তব, কবিতাতিরিক্ত স্থান-নামের ভিত্তির ওপরেই আসে এই নির্বিশেষ প্রতীক : বনলতা সেনের মরণজয়ী চিত্রকল্পতে। এখানেই জীবনানন্দ য়াকবসনীয় অর্থে আধুনিক।

॥ ২ ॥

বনলতা সেন কবিতাটি প্রকাশিত হয় ১৩৪২-এর পৌষে। ১৩৪২-এর আশ্বিনে প্রকাশিত 'হাজার বছর শুধু খেলা করে' কবিতায় বনলতা সেন আবার ফিরে আসে। কবিতা দুটির মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষণীয়, যেন ৪২-এর বনলতা সেনের স্মৃতিই ধরা :

হাজার বছর শুধু খেলা করে অন্ধকারে জোনাকির মতো :
চারিদিকে চিরদিন রাত্রির নিধান ;

প্রথম বনলতা সেনে কবি হাজার বছর পথ হেঁটেছেন, এ কবিতায় হাজার বছর অন্ধকারে খেলা করে 'জোনাকির মতো'। ৪২-এর কবিতার জোনাকির রঙে ঝিলমিল, এখানে এভাবে এল। আবার—

বালির উপরে জ্যোৎস্না—দেবদারু ছায়া ইতস্তত
বিচূর্ণ থামের মতো : দ্বারকার,—দাঁড়ায়ে রয়েছে মৃত, ম্লান।

এখানে এক ঐতিহাসিক ভগ্নস্তূপের ছবি : দ্বারকা এই স্থানের উল্লেখে আরও স্পষ্ট। এই ভগ্নস্তূপ, প্রথম বনলতা সেনে নেই। বরঞ্চ বিদিশা-শ্রাবস্তীর জায়গায় দ্বারকা লক্ষণীয়। 'মৃত' এ শব্দও নেই।

শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের—ঘুচে গেছে জীবনের সব লেনদেন,
'মনে আছে?' সুধাল সে—সুধালাম আমি শুধু 'বনলতা সেন?'

লক্ষণীয়, 'আমাদের' শব্দটি ব্যবহার হয়েছে এই কবিতায়, বনলতা সেনে যা হয়েছে 'আমি'। কবিতাটির প্রথম অংশে আমি-আমার মিলে অন্তত পাঁচ বার ব্যবহৃত হয়েছে। শরীরে ঘুমের ঘ্রাণ আমাদের—এই বহুবচন নেই। আরও লক্ষণীয়, বনলতা সেনের দ্বিতীয় স্তবকে বা অংশে সে-তার-তারে মিশিয়ে পাঁচ বার ব্যবহৃত। শেষ অংশে বা স্তবকে সর্বনাম নেই : আছে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। "হাজার বছর..." কবি আমাদের এই সমূহের ব্যবহারের সঙ্গেই আছেন "মনে আছে?" ইতিমধ্যেই বিস্মরণ? কবি চিনলেন, জিজ্ঞাসা করলেন "বনলতা সেন?" যেন, চেনা-না-চেনার মাঝামাঝি। নিজের চেনাকে নিশ্চিত করতে এই প্রশ্ন। এখনও জীবনের লেন-দেন শেষ। তবে ক্রিয়ার ব্যবহারের পার্থক্য তাৎপর্যপূর্ণ। বনলতা সেন-এ আছে, "ফুরায় এ-জীবনের সব লেন দেন", আর "হাজার বছর..."-এ, "ঘুচে গেছে জীবনের সব লেন দেন।" ফুরায়

ও ঘুচে গেছে, এক হিসাবে অর্থ এক, কিন্তু ব্যঞ্জনায় পৃথক। ঘুচে গেছের মধ্যে একটা বিনষ্টি, ধ্বংসের ইঙ্গিত। 'বনলতা সেন' কবিতাটিই কি কয়েক মাসের মধ্যে এভাবে পুনর্লিখিত হল? এই দুটি কবিতা মিলিয়েই কি রচিত হল সম্পূর্ণ বাক্যটি, কবিতার টেক্সট্‌টি?

কবিতার টেক্সট্‌টির গঠন অবশ্য বৃহত্তর পট থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। শুধুমাত্র ব্যক্তিগত বৃত্তেই এর সীমা নির্ধারিত নয়, একটি বিশেষ শ্রেণীর বা অন্তর্গত অংশের 'trans-individual mental structure'-এর মধ্যে অন্তর্নিহিত থাকেই। পরিবর্তমান বাস্তবের একটি বীক্ষা আসঞ্জিত রূপ পায় বড় কবির কাজে। ভাষা সামাজিক ঘটনা। বাইরের সামাজিক শ্রেণীগত, ঐতিহাসিক দ্বন্দ্ব বড় কবিতায় 'multi-accentuality' নিয়ে আসে। অনেক সময় তার, ব্যবহৃত ভাষা, ছন্দের মধ্যেই প্রচলিতের বিরোধিতা থাকে, কর্তৃত্বের প্রতিবাদ থাকে, বিকল্প স্বর থাকে। ১৯৩০-এর দশকের মধ্য ভাগে বনলতা সেন কবিতাটি লিখিত। এই কবিতায় সেই সময়টি বিশেষভাবে জড়িয়ে। ২৬/১২/৪৫-এ জীবনানন্দ লিখেছেন, "আমার কাব্যপ্রেরণার উৎস নিরবধিকাল ও ধূসর প্রকৃতির চেতনার ভিতর রয়েছে ব'লেই তো মনে করি। তবে সে প্রকৃতি সব সময়ই যে 'ধূসর' তা হয়তো নয়।" ১৩৫৩-র আষাঢ়ে আবার বলছেন, "আধুনিক কবিতায় যে 'আমি'র ব্যবহার করা হয়—যেমন 'ইতিহাসক্ষণে' একটু-আধটু করেছি—সে 'আমি' যে কবির নিজের ব্যক্তিগত সত্তা মোটেই নয়, কবি-মানসের কাছে সমাজ ও কালের রূপে যেভাবে ধরা পড়েছে তারই প্রতিভূ সত্তা—আধুনিক কাব্য পড়বার সময় অনেক সমালোচকই তা মনে রাখেন না।" দুটি উদ্ধৃতি মেলালে বোঝা যায় সময় প্রকৃতি ও কাললগ্ন মানুষই তাঁর কবিতার উৎস। ১৯৩০-এর দশকে মধ্যবিত্ত শ্রেণী নানা শক্তির, ইতিহাসের নানা স্রোতের টানাপোড়েনে অস্থির ঃ এর মধ্যেই বড় কবিকে গড়তে হয় নিজ বীক্ষাটিকে। সময়ের দ্রুত পরিবর্তনের বাইরে রাজনীতি-অর্থনীতির আশা-হতাশায় সময় বড় হয়ে ওঠে জীবনানন্দের কবিতায়। অথচ সময়কে তিনি স্থির দেখতে পান না, কবির সময়ের নানা বিচূর্ণ থামগুলি তাঁর কাছে বড় হয়ে উঠতে চায়। কিন্তু এই সময়ে আবার নানা সম্ভাবনাও দেখা দিচ্ছে—আজ যে সম্ভাবনাকে হয়তো আমরা অপূর্ণ দেখি, ১৯৩৫-৩৬-এ কিন্তু তা মনে হয়নি। তখন এই সময়কেই ধারাবাহিকতায়, একসূত্রে দেখতে ইচ্ছা হয়। শ্রাবস্তী-বিদিশা-বিদর্ভের ধূসরতাকে পেরিয়ে, আবার তার চুলের নিশা ও কারুকার্যের স্মৃতিতেই, সময়ের সূত্রেই বাঁচতে হয়। এ বাঁচাই ইতিহাস—মানুষের অবিরাম পথ হাঁটা। ব্যক্তি-জীবনের সব লেন-দেনের শেষেও তাই বনলতা সেন জেগে থাকে, ক্লান্ত প্রাণ ইতিহাসের অন্ধকারেই খুঁজে পায় অভিজ্ঞানের দীপ্তি।

আধুনিক সাহিত্য-ভাবনায় লেখককে 'স্রষ্টা' হিসাবে না দেখে প্রোডিউসার বা উৎপাদক হিসাবে দেখেন কেউ কেউ। Pierre Macherey লেখককে দেখেন সেই উৎপাদক হিসাবে যিনি কিছু নির্দিষ্ট উপাদানকে, নতুন 'প্রোডাক্ট'-এ পরিণত করেন। তিনি এই উপাদানের স্রষ্টা নন। রূপ, মূল্যবোধ, পুরাণ বা অতিকথা, প্রতীক, আইডিয়লজি তাঁর কাছে আসে উৎপাদনের ইতিমধ্যে-প্রাপ্ত উপাদন হিসাবে। এ-সবকেই তিনি রূপান্তরিত করেন তাঁর 'প্রাকটিসের' দ্বারা। ভাষা ও অভিজ্ঞতার উপাদান একটি 'diterminate product'-এ রূপান্তরিত হয়। আর এই রূপান্তরে লেখক বা কবি কি বললেন সেটি যেমন গুরুত্বপূর্ণ, কি বললেন না, কোন্ বিষয়ে নীরব থাকলেন তাও—এর মধ্যেই তাঁর সময়, তাঁর উৎপাদনের বৈশিষ্ট্য প্রতিফলিত হয়। বনলতা সেন, কবিতার ভাষা, ছন্দ,

প্রতীক জীবনানন্দ পৃথক ভাবে সৃষ্টি করেননি ঃ তাদের তিনি রূপান্তরিত করেছেন। পয়ারের মতো পুরনো উপাদানকে নতুন মাত্রা দিয়েছেন, ক্লান্ত প্রাণের চিত্র ও চিত্রকল্পকে এমনভাবে মিশিয়েছেন যাতে মনে হয় অভিনব। বিখ্যাত 'পাখির নীড়ে'র চিত্রকল্পে রবীন্দ্রনাথের "আমার এ আঁখি উৎসুক পাখি"র কথা মনে পড়ে, কিন্তু কত ভিন্ন। রবীন্দ্রনাথ অন্তবিহীন পথ পেরিয়ে "তোমার দ্বারে" এসেছিলেন—"মরুতীর হতে সুধাশ্যামলিম পারে"। জীবনানন্দের 'আমি'ও ইতিহাসের কত পথ সময় পেরিয়ে বনলতা সেনের কাছে পৌঁছায়। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 'আমি' দূর হতে নিভৃত প্রদীপ জ্বালা দেখেন, তাই তাঁর "আঁখি উৎসুক পাখি", আর জীবনানন্দের 'আমি'র জন্য থাকে অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন। ১৯৩০-এর দশকেরদেশীয় ইতিহাসের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গে, আইন অমান্য আন্দেলনের ব্যর্থতার গোধূলিতে, আন্তর্জাতিক ফ্যাসী-নাৎসীবাদ-এর ভয়াবহ বিকাশেই হাল ভাঙা নাবিকের উপমা আসে, তখনই ইতিহাসের পথিক বলে, "আমি ক্লান্ত প্রাণ এক"। আর রবীন্দ্রনাথও যেমন সেই আদি প্রকৃতি, বৃক্ষের সঙ্গে একাত্মতা বোধ করতেন, তেমনি জীবনানন্দও হাল ভাঙা নাবিক সবুজ ঘাসেরদেশের মতো বনলতা সেনকে পান—সব কিছুর শেষে অন্ধকারে এই নারীই একমাত্র থাকে। জীবনের সমুদ্র সফেনকে তিনি আপাতত দূরে রাখেন, এ সম্পর্কে তাঁর আপেক্ষিক নীরবতা অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের, মন্বন্তরের, কালো মেঘের সামনে এই ক্লান্ত প্রাণ—জীবনের কলরোলের মধ্যে যায় না। অথচ এই কবিই কয়েক বছর পর আর এক নাবিকের কথা বলেন ঃ

> প্রায় ততদূর ভালো মানব সমাজ
> আমাদের মতো ক্লান্ত ক্লান্তিহীন নাবিকের হাতে
> গ'ড়ে দেব, আজ নয়, ঢের দূর অন্তিম প্রভাতে।

ঐতিহ্য ও 'বনলতা সেন'

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

আধুনিক বাংলা কবিতার বিশিষ্ট ও নিদারুণ সফল সৃষ্টি জীবনানন্দের 'বনলতা সেন'। এই কবিতা একলাই এক ঐতিহ্যের সৃষ্টি করেছে, জীবনানন্দের কালে এবং তাঁর পরবর্তী সময়ে এই কবিতার প্রভাব বহু কবির মধ্যেই দেখা যায়। সাধারণ পাঠক জীবনানন্দকে মনে না করতে পারলেও, বনলতা সেনকে খুব সহজেই মনে রেখেছেন। এমন কি, কোন আধুনিক কাব্যপত্রিকার নাম 'বনলতা' হল না কেন এমন প্রশ্নও কেউ কেউ করে থাকেন।

প্রথম পাঠে এই কবিতা সম্পর্কে নানারকম অনুভবের প্রতিক্রিয়া দেখা যায়। কেউ বলেছেন, 'কী অনুভবের যাতনায় এমন একটা বিষণ্ণ কবিতা লেখা হল।' (সঞ্জয় ভট্টাচার্য, 'জীবনানন্দ', জীবনানন্দস্মৃতি সংখ্যা, ময়ূখ, শীত-গ্রীষ্ম, ১৩৬১)। সঞ্জয় ভট্টাচার্য এই কবিতার ইতিহাস-সচেতনতা সম্পর্কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে আদি বাঙ্গালীর পটভূমিকা উপস্থাপন করে আর এক ঐতিহাসিক কবিতারই সৃষ্টি করেছেন ('কবি জীবনানন্দ', উত্তরসূরী, পৌষ-ফাল্গুন ১৩৬১)। সেই বিখ্যাত রচনাটি থেকে কিছুটা উদ্ধৃত করতে পারি : 'বাঙ্গালীর বিদিশার রাত্রি থেকে একটু অন্ধকার তুলে এনে (বোদলেয়ার-ও তেমন ভঙ্গী দেখিয়েছেন) কোশলের শিল্পশালার নর্তকীর মুখাবয়ব বসিয়ে, মালয় সুমাত্রা যাত্রী বঙ্গ-নাবিকের বি-দিশা ও ভ্রান্তি কল্পনা করে মসলার দেশ থেকে একটু ঘাস কুড়িয়ে তার ভাঙা হাল-সমেত প্রোথিত করে যে দৃশ্য-পট তৈরী, তেমন একটি গৃহান্ধকারের সাংসারিক ভ্রূণে নাটোরের পক্ষীজাতীয় মেয়ে এক ক্লান্ত-প্রাণ নাবিককে কুশল-পরিচয় জিজ্ঞাসা করছেন। এই সেনীয়া রমণী নাবিককে চোখের আহ্বানে পাখীর নীড়ের স্বপ্ন দেখাচ্ছে, যেহেতু তাঁর জন্মগত সংস্কার তাই। কিন্তু পরভৃতিক কোকিল ত জানে এ-নীড় তার নয়—দুদণ্ডের খেলা শুধু। সন্তানের লালনের জন্যে এই ধাত্রী কাকিনী।' কিংবা, 'নাটোরের বনলতা সেনের যে চোখের সঙ্গে পাখির নীড়ের উপমা, সেই নাটোর, বনলতা সেন এবং তার চোখ—এ-সমস্তই যে কোনো সর্বদেশকাল-ব্যাপী ভাবের চিত্রকল্প তা অনুভব করলেই আমরা কবিতাটির মর্মস্থলে প্রবেশ করতে পারব।' (বুদ্ধদেব বসু, 'জীবনানন্দ দাশ : বনলতা সেন', কালের পুতুল)। জীবনানন্দের কবিতার বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁর 'বনলতা সেন' লেখা হওয়ার আগেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে প্রকাশ পেয়েছিল—'এমন একটি স্বাদ, এমন একটি সৌরভ আমরা পেয়েছিলাম যা তার আগে বাংলা সাহিত্যে আমাদের জানা ছিল না। তা যেন অনেক দূরদেশের, তা যেন আকস্মিক, ঘরোয়া কথার সঙ্গে আকাশবিহারী কল্পনার সংমিশ্রণে তা পদে পদে অপ্রত্যাশিত' (ঐ, ঐ)। আমার মনে হয় 'বনলতা সেন' তার ঐতিহ্যানুসরণ ও ঐতিহ্যোত্তীর্ণতায় মহৎ সৃষ্টির দিকনির্দেশ করছে। এই কবিতার মধ্যেই তিনি পৃথিবীর, বিশেষত রোমান্টিক যুগের কবিতার সঙ্গে যুক্ত এবং যুগোত্তরও বটে। বস্তুত তাঁর কাব্যসৃষ্টিকে যদি নাটকীয় কোন পর্ববিভাগে ভাগ করা যায়

তাহলে এই কবিতাটিকে ক্লাইম্যাক্সে রেখে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাগুলিকে প্রারম্ভ ও ক্রমবর্ধমান ঘটনা এবং 'মহাপৃথিবী' ও 'সাতটি তারার তিমিরে'র কবিতাগুলিকে শেষ পর্বের ঘটনা বলে মনে করা যেতে পারে।

বদল্যার কিংবা পো-র নাতিদীর্ঘ কবিতার সংস্কার আবেগমধুর স্ফটিক দার্ঢ্য ফুটে উঠেছে আঠোরো পংক্তির এই কবিতায়। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র মুক্তকের সিঁড়িভাঙা দীর্ঘ সব কবিতায় এর আগেই জীবনানন্দ নিজের বৈশিষ্ট্য দেখিয়েছেন—কিন্তু 'বনলতা সেন'-এ তাঁর প্রযত্ন অনেক সংযত, মনে হয় ক্লাসিক ও রোমান্টিক রীতির সংশ্লেষ ঘটেছে এই কবিতায়। চিত্রকল্পগুলি অবশ্যই জীবনানন্দের নিজের ('পাখির নীড়ের মত চোখ', 'চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা' ইত্যাদি), কিন্তু কবিতাটির মূল পরিকল্পনায় এটি ঐতিহ্যের সঙ্গে যুক্ত, যে-রোমান্টিক ঐতিহ্য একশো বছরের মধ্যেই পো, কিংবা রবীন্দ্রনাথ, এমন কি ডসনের মধ্যে দেখা যায়, সৌন্দর্যের প্রতি কবির সেই অনন্ত নিরাকরণীয় পিপাসা—যার প্রকাশ পূর্ববর্তী অনেকের কবিতাতেই দেখা গেছে।

এই সৌন্দর্য ও সৌন্দর্যবোধ রোমান্টিক বিষণ্ণতার আরোপে শিল্পসমৃদ্ধ হয়। মারিও প্রাৎস এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। জীবনানন্দের কবিতাও আমরা সেই ঐতিহ্যবিধৃত রোমান্টিক কবিতাবলীর পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করে বিচার করতে পারি। সেই রোমান্টিক কবিতার চরিত্র একদিকে পুরাণ থেকে গ্রহণ করা হয়েছে, অন্যদিকে সমসাময়িক জীবন থেকে, যেমন করেছেন জীবনানন্দ (বনলতা সেন) কিংবা ডসন (সাইনারা)। পো দীর্ঘ কবিতার দাবি অস্বীকার করেছিলেন—তাঁর কথামতই সে কারণে তাঁর 'হেলেনের প্রতি' ও জীবনানন্দের আলোচ্য কবিতাটির কথা মনে পড়ে। আমরা বলি না জীবনানন্দ সচেতনভাবে সেই কবিতাটি থেকে কোন শব্দ বা ছবি গ্রহণ করেছেন—নারীসৌন্দর্য দেখবার জন্যে দুই কবিকে সমান্তরালভাবে উপস্থাপনই আমাদের লক্ষ্য। একই রোমান্টিক পরিমণ্ডলে যে দুজনের এবং আরো অনেকজনের অধিষ্ঠান তাই আমাদের বিচার্য। পো-র কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করতে পারি ঃ

Helen, thy beauty is to me
    Like those Nicean barks of yore
That gently, o'er a perfumed sea,
    The weary, way-worn wanderer bore
    To his own native shore.
On desperate seas long wont to roam,
    Thy hyacinth hair, thy classic face,
Thy Naiad airs have brought me home
    To the glory that was Greece,
    And the grandeur that was Rome.
Lo ! in yon brilliant window-niche
    How statue-like I see thee stand,
The agate lamp within thy hand,
    Ah, Psyche, from the regions which
    Are Holy-Land !

জীবনানন্দের নায়কের সমুদ্র পরিভ্রমণকে, পো-র নায়কের সমুদ্র পরিভ্রমণের পাশাপাশি রাখা যায়। যেমন রাখা যায় জীবনানন্দের 'আমি ক্লান্ত প্রাণ এক' এবং পো-র 'the

weary, way-worn wanderer', কিংবা জীবনানন্দের 'দারুচিনি দ্বীপের ভিতর' ও পো-র 'perfumed sea'। 'অনেক ঘুরেছি আমি'র পাশাপাশি 'on desperate seas long wont to roam' কথাটিকেও রাখা যায়। কিন্তু এই মিল দেখে একটা কথাই আমাদের মনে হয় তা হল রোমান্টিক সৌন্দর্যানুভূতির কবিতার যে ঐতিহ্য তাতে প্রত্যেকেই নিজের অবদান রেখে গেছেন। জীবনানন্দ ঐতিহ্যকে নিজের মধ্যে স্বীকার করে সেই ঐতিহ্যকে ছাড়িয়ে গেছেন নতুনতর আবেগে, চিত্রগ্রন্থনে, বাগভঙ্গিমায়। পো যেখানে সরাসরি পৌরাণিক চরিত্র বেছে নিয়েছেন, জীবনানন্দ সেখানে নতুন পুরাণ সৃষ্টি করেছেন। রোমান্টিক কবির ইতিহাসের সুদূরতার বোধ পো-তেও যেমন, জীবনানন্দেও তেমন। পো প্রথমত হেলেনকে বেছে নিয়েছেন, তা ছাড়া তিনি গ্রীস ও রোমের মহিমা স্মরণ করেছেন। জীবনানন্দ নাটোরের বনলতা সেনকে আমাদের জগৎ থেকে বেছে নিলেও 'বিদিশার নিশা' কিংবা 'শ্রাবস্তীর কারুকার্য' অথবা 'বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগতের' ক্লাসিক সুদূরতায় সৌন্দর্যবৃত্ত লক্ষ ও জাগ্রত করেছেন। হেলেনের ক্লাসিক সুদূরতার বিষাদ বনলতা সেনের মধ্যেও আমরা দেখি—সেই রোমান্টিক বিষাদ ঃ

> সব পাখি ঘরে আসে—সব নদী—ফুরায় এ-জীবনের সব লেনদেন ;
> থাকে শুধু অন্ধকার, মুখোমুখি বসিবার বনলতা সেন।

এই সৌন্দর্যচেতনা যার মধ্যে বিষাদের সুর স্পষ্ট বদল্যারের মধ্যে ছিল, যেমন ছিল রোমান্টিক সব কবিদের মধ্যেই। বদল্যারের 'সৌন্দর্য-প্রশস্তি' কিংবা 'দুই সুন্দরী ভগিনী' কবিতা দুটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয় যেমন স্মরণীয় 'রোমান্টিক আর্ট' নামে তাঁর গদ্যরচনা। ইংরেজি ডেকাডেন্ট কবিদের রচনাতেও সেই বিষাদ, মানুষের সৌন্দর্যের প্রতি অনন্ত পিপাসা যে কোনদিন মেটবার নয় সেই বোধজনিত বিষাদ লক্ষ করা যায়—এবং সেই কবিরাও মূলত রোমান্টিক। ডসনের সেই কটি পংক্তি এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে ঃ

> I cried for madder music and for stronger wine,
> But when the feast is finished, and the lamps expire,
> Then falls thy shadow, Cynara ! the night is thine ;
> And I am desolate and sick of an old passion,
> Yea, hungry for the lips of my desire :
> I have been faithful to thee, Cynara ! in my fashion.

রোমান্টিকদের আদর্শবাদ হয়ত নেই এই কবিতায়, কিন্তু এর মধ্যে রোমান্টিক আবেগ কিছু কম নয়। 'সায়নারা' এবং 'বনলতা সেন'কে আমার একই সৌন্দর্যের প্রতীক বলে মনে হয়, যদিও নিঃসংশয়ে 'বনলতা সেনে'র ব্যাপ্তি ও গভীরতা অন্য কবিতাটির চেয়ে ঢের বেশি।

রোমান্টিক সৌন্দর্যচেতনার প্রতীক যে নারী তার ঐতিহ্য হেলেনের চরিত্রে যেমন পাশ্চাত্যে, আমাদের দেশেও তেমনি উর্বশীতে। হোমর থেকে আরম্ভ করে ইস্কিলাস, ইউরিপিডিস, শেক্সপীয়র, হাইনে, ভেরআর্ন, ভালেরি প্রমুখ বহু কবিই হেলেনের উল্লেখ করেছেন। উর্বশীর উল্লেখও তেমনি বেদে আছে, পুরাণে আছে। কালিদাস উর্বশীর আখ্যান নিয়ে নবতম রূপে 'বিক্রমোর্বশী' নাটক লিখেছিলেন। আমাদের মধুসূদনও 'পুরূরবার প্রতি উর্বশী' এই পত্রকাব্য রচনা করেছেন। রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী' সেই মহান ঐতিহ্যের মধ্যে নিজের স্বাতন্ত্র্যে দীপ্যমান। টমসন এই কবিতা সম্পর্কে লিখেছেন ঃ

"The greatest poem of all, Urbasi, is perhaps the greatest lyric in all Bengali literature, and probably the most unalloyed and perfect worship of Beauty which the world's literature contains."

গ্রাম বাংলার পটভূমিতে অবস্থানকালে জলপথে শিলাইদহে যাওয়ার সময় রবীন্দ্রনাথ বিস্ময়কর এই রোমান্টিক কবিতাটি লিখেছিলেন। সেই গ্রাম বাংলার কিছু কিছু ছবি আছে এই কবিতায় ঃ

> গোষ্ঠে যবে সন্ধ্যা নামে শ্রান্ত দেহে স্বর্ণাঞ্চল টানি
> তুমি কোনো গৃহপ্রান্তে নাহি জ্বাল সন্ধ্যাদীপখানি,
> দ্বিধায় জড়িত পদে কম্প্রবক্ষে নম্রনেত্রপাতে
> স্মিতহাস্যে নাহি চল সলজ্জিত বাসরশয্যাতে
> স্তব্ধ অর্ধরাতে।

কিংবা, 'শস্যশীর্ষে শিহরিয়া কাঁপি উঠে ধরার অঞ্চল'...ইত্যাদি। এই ঐতিহ্যসূত্রেই মোহিতলাল 'উর্বশী'র মধ্যে সুইনবর্ণের 'আফ্রোদিতি'র (এ্যাটালান্টা ইন ক্যালিডন) মিল কিংবা তার চেয়ে বেশি কিছু খুঁজে পেয়েছেন।

জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' যেমন রবীন্দ্রনাথের 'উর্বশী'ও তেমনি দেশকাল উত্তীর্ণ হয়ে যায়। দুটি কবিতারই ব্যাপ্তি অপরিসীম, মনে হয় সারা পৃথিবীর সৌন্দর্যচেতনাই বুঝি এখানে ধরা পড়েছে। রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও আছে সেই রোমান্টিক বিষাদ ঃ

> ফিরিবে না; ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী,
> অস্তাচলবাসিনী উর্বশী।
> তাই আজি ধরাতলে বসন্তের আনন্দ-উচ্ছ্বাসে,
> কার চিরবিরহের দীর্ঘশ্বাস মিশে বহে আসে...।

রোমান্টিক কবিতার স্বভাবেই আছে এই ব্যাপ্তি, বিষাদ, সৌন্দর্যচেতনা, পাওয়া এবং পেয়ে হারানোর বেদনা। দুই কবির মধ্যেই আমরা সে সব বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ দেখেছি।

জীবনানন্দ অবশ্যই রোমান্টিক প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য নিজের মধ্যে অনুভব করেছিলেন, যার প্রকাশ দেখি এই কবিতায়। এলিয়টের সেই বিখ্যাত উক্তিগুলি স্বভাবতই এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে...the historical sense involves a perception, not only of the pastness for the past, but of its presence,... This historical sense, which is a sense of the timeless as well as of the temporal and of the timeless and of the temporal together, is what makes a writer...most acutely conscious of his place in time, of his own contemporaneity (Tradition and the Individual Talent).

দেশী-বিদেশী সাহিত্যে সুপঠিত জীবনানন্দ তাঁর কবিতায় রোমান্টিক প্রেমকাব্যের ঐতিহ্য স্বীকার করে সেই ঐতিহ্যকে উত্তীর্ণ হয়ে গেছেন নিজের বৈশিষ্ট্যের অবদানে। কী সেই অবদান? কেন জীবনানন্দ এই কবিতাটি রচনার আগেই 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র একাধিক কবিতায় বৈচিত্র্যে, অভিনবত্বে নিজের শক্তির পরিচয় দিয়ে থাকলেও এই কবিতাটির জন্যে সমধিক পরিজ্ঞাত? আমি শুনেছি 'কবিতা' পত্রিকায় যখন এই কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল, এবং পরে 'একপয়সায় একটি' সিরিজে, তখনকার চেয়ে এই কবিতাটি ঢের বেশি খ্যাতি অর্জন করেছে পঞ্চাশের দশকে—অবশ্যই 'বনলতা সেনের' নবতর প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে। কেন এমন হল সেটাও আমাদের প্রশ্ন।

'বনলতা সেনের' সংক্ষিপ্ত পরিসরের দার্ঢ্যের মধ্যে এর এক স্ফটিক-দ্যুতি আছে যার জন্যে এর আকর্ষণ তাৎক্ষণিক। ইতিহাসের উল্লেখ স্বভাবতই এই কবিতায় এক ব্যাপ্তি এনেছে, যেমন পৌরাণিক বর্ণনা এনেছে পো-র 'হেলেন' কিংবা রবীন্দ্রনাথের উর্বশীতে। কিন্তু ইতিহাস-সচেতনতা ত রোমান্টিক আকুতিরই একটি বৈশিষ্ট্য, সে কারণে এর আকর্ষণ রোমান্টিক কবিতার প্রতি আকর্ষণেরই মত। 'বনলতা সেন' সৌন্দর্যের প্রতীক, এবং 'উর্বশী'র মতই তার প্রতি পুরুষের পেয়ে হারানোর বেদনা। উর্বশী স্পষ্টতই 'নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ সুন্দরী রূপসী' কিন্তু 'বনলতা সেন' ঘরণী ও প্রেমিকার দোলাচলে দুলছে—একজনকে পেলে বুঝি আর একজনকে হারাতে হয় ; সেই দূরবর্তিনীর প্রতি আর্তিই প্রকাশিত হয়েছে এখানে। জীবনানন্দ নারীর এই দ্বৈত রূপের কথা ত আগেই প্রকাশ করেছেন ঃ

> আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
> বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝ'রে পড়ে তার—
> শীত এসে নষ্ট ক'রে দিয়ে যাবে তারে
> ... ...

বা, ডেকে নেবো আইবুড়ো পাড়াগাঁর মেয়েদের সব (অবসরের গান)

এই দ্বৈতরূপের বোধ সৌন্দর্যের প্রতীকে দানা বেঁধেছে 'বনলতা সেন'এ। চিত্রকল্পের অভিনবত্ব অবশ্যই এই কবিতার একটি সবিশেষ গুণ—সেই 'পাখির নীড়ের মত চোখ', 'শিশিরের শব্দ' ইত্যাদি। দূরের ইতিহাস এবং সমসাময়িকতা দুইই একাধারে সংশ্লিষ্ট হয়েছে এখানে। 'এতদিন কোথায় ছিলেন?' এই জিজ্ঞাসাই যেন ইতিহাসের চমক ভাঙিয়ে ইতিহাসকে সমসাময়িকের রক্তে প্রবাহিত করেছে। ফার্টিলিটি কাল্টের যে বোধ জীবনানন্দের কবিতার প্রথম যুগ থেকে শেষ যুগ পর্যন্ত বর্তমান, যার জন্যে পুনঃ পুনঃ তিনি জন্ম, মৃত্যু, নারী সম্পর্কিত উল্লেখ ও চিত্ররূপায়ণ করে গেছেন তারই মধ্যমণি এই কবিতা, এইখানেই তিনি সৌন্দর্যবোধ ও ফার্টিলিটিবোধের মুখোমুখি হয়েছেন, এবং সৌন্দর্যের মধ্যে না পাওয়ার যে-বেদনা আছে তাই প্রকাশ করেছেন।

এই সব নানা কারণের জন্যে এই কবিতাটির আবেদন সর্বজনীন। সৎ কবিতা—যাকে কোন ইজমের মধ্যেই ধরা যায় না, এমন কি সুররিয়ালিজমও নয়; আবার যার মধ্যে বহুরকম ইজমই খুঁজে পাওয়া যেতে পারে—চিরকালের কবিতা। 'বনলতা সেন' সেইরকম একটি কবিতা।

জীবনানন্দের কবিতা 'ঘাস'

অরুণ ভট্টাচার্য

শ্রীরবীন্দ্রকুমার দাশগুপ্ত, যিনি প্রায় পঁয়তাল্লিশ বছর অধ্যাপনা করেছেন দেশে বিদেশে, যিনি জাতীয় গ্রন্থাগারের অধ্যক্ষ হিসেবে কয়েক বছর কাজ করেছিলেন এবং সর্বোপরি যিনি ইংরেজী সমেত বেশ কয়েকটি স্বদেশী ভাষায় সুপণ্ডিত হয়েও বাংলা সাহিত্যেরই গবেষণাধর্মী আলোচনায় দিন কাটিয়েছেন,—তিনি একদা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজীর অধ্যাপক ছিলেন, চল্লিশ দশকের মাঝামাঝি। ছাত্র হিসেবে স্বাভাবিকভাবেই তাঁর বেশ কাছে এসেছিলুম। এবং সেই নৈকট্যের স্মৃতি সাঁয়ত্রিশ আটত্রিশ বছরেও মলিন হয়নি। আমাদের পত্রিকার জন্য মাঝেমধ্যেই তাঁকে তাগাদা দিই কিছু সাহিত্য প্রবন্ধ লেখবার জন্য। লিখব, লিখছি করতে করতে দিন যায়। আমি হতাশ হই। মনে মনে বলি, মাস্টার মশাইকে আদতে বেশ কুঁড়েমি ভর করেছে। সময় নেই, একথা বলবার উনি সুযোগ পান না ; কারণ, তাঁর কাছে গেলে উনি আমাদের সঙ্গে মশগুল হয়ে গল্পে গল্পে যে সময় নষ্ট করেন তাতে অন্তত আধ ফর্মার একটি মিনি প্রবন্ধ হয়ে যায়।

একদিন টেলিফোন করতেই বললেন, শীগ্‌গির চলে এসো—তোমার কথাই ভাবছিলুম। একটা লেখার কথা মনে হয়েছে। আমি দেরী না করে দুচার দিনের মধ্যেই তাঁর কাছে গিয়ে উপস্থিত হলুম। একথা সেকথার পর বললেন, জীবনানন্দ বিষয়ে একটি বেশ ভালো প্রবন্ধ হবে মনে হচ্ছে। তারপর থেকে যথারীতি আমি তাগাদা দিয়ে আসছি। সেবার পুজো সংখ্যার আশাও গেল। ওঁর লেখা হয়ে উঠল না, উনি বললেন, যে-সব মেটিরিয়াল কাজে লাগাবো ভেবেছিলুম তা কিছুতেই হাতের কাছে পাচ্ছি না। ন্যাশনাল লাইব্রেরী থেকে গলফ গ্রীনে যাবো। সব গুছিয়ে না উঠতে পারলে বোধহয় সেগুলির হদিশ পাবো না। তথাস্তু। আমি ধৈর্য ধরে রইলুম।

শেষ পর্যন্ত আবার মাস্টার মশাইর কাছ থেকে খবর এলো ঃ এসো। প্রায় দুতিন ঘণ্টা রিক্সাওয়ালা এবং আমি প্রায় ডজনখানেক মানুষকে জিজ্ঞেস করতে করতে গলফ গ্রীনের বাড়ি খুঁজে বার করলুম। এবং মাস্টার মশাইকে। প্রাথমিক কথাবার্তার পর বার করলেন একটা ফাইল। বললেন, জীবনানন্দের যে-ব্যাপারটা তোমাকে দেবো ভাবছি তা এই ফাইলের মধ্যে। সর্বনাশ, এখানেও 'কি রাইটার্স-এর ফাইল! শুধুই ফাইল-জাত। উনি বললেন, ভেবে দেখলুম আমার কাছে যে মেটিরিয়াল রয়েছে তুমিই তার সদ্‌ব্যবহার করো। অর্থাৎ প্রবন্ধটি জীবনানন্দ বিষয়ে কিন্তু গবেষণাধর্মী নয়। প্রবন্ধটি একটি কবিতা নিয়ে, যে কবিতা ৬টি ভাষা ভাষী দেশের লোক গভীর আগ্রহের সঙ্গে একদা আমার মুখ থেকে শুনেছিল, আট দশ বছর আগে কানাডার একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে। আমি জিজ্ঞেস করলুম, খুলে বলুন, সঠিক ব্যাপারটি কি। আমি কিন্তু ধরতে পারছি না। উনি বলতে শুরু করলেন ঃ

১৯৫১ ইংরেজী সালে আমি কানাডার অ্যালবার্টা বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি অধ্যাপনার কাজে নিযুক্ত ছিলুম। আমার পদটি ছিল 'Distinguished Visiting Professor Comparative Literature' ; আমার পড়াবার কথা ছিল তিন ধরনের বিষয়। প্রথমত, সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্র ; দ্বিতীয়ত, ভারতীয় সাহিত্য বিষয়ে পশ্চিমী দুনিয়া কি ভাবছে তার বিবরণ ; তৃতীয়ত, অনুবাদের মধ্য দিয়ে ভারতীয় সাহিত্য। তৃতীয় বিষয়ের মধ্যে আবার পাঠ্যতালিকাভুক্ত ছিল শ্রীমদ্ভবদ্‌গীতা, শকুন্তলা, গীতাঞ্জলি, ডাকঘর, পথের পাঁচালী এবং জীবনানন্দের দশটি নির্বাচিত কবিতা। এই কবিতাগুলির অন্যতম ছিল 'ঘাস' কবিতাটি।"

এবার মাস্টার মশাই একটু থামলেন। আমি পাঠকদের কাছে 'ঘাস' কবিতাটি এই ফাঁকে এখানে লিখে দিচ্ছি, যদিও জানি উত্তরসূরির সমস্ত পাঠকবর্গেরই এই কবিতাটি একাধিকবার পড়া আছে। কেন আবার উদ্ধৃতি দিচ্ছি তা লেখাটির শেষে পাঠক সহজেই বুঝবেন ঃ

ঘাস

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবীর মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—
হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে।
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘসি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হ'য়ে জন্মাই কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

[কবিতাটি কবির চতুর্থ কাব্যগ্রন্থ 'মহাপৃথিবী'র অন্তর্গত। 'মহাপৃথিবী'র প্রকাশকাল ১৯৪৪, কবিতা ভবনের 'এক পয়সার একটি' সিরিজের 'বনলতা সেন' প্রকাশকালের দুবছর পরে। সময়ের উল্লেখ আমি এখানে করলুম একটি বিশেষ কারণে। জীবনানন্দের কবিতা-গ্রন্থ তাঁর জীবিতকালে যেভাবে প্রকাশিত হয়েছে তাতে 'মহাপৃথিবী' কাব্যগ্রন্থকে চতুর্থ বলা যেতে পারে। 'ঝরা পালক' ১৯২৮, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ১৯৩৬, 'বনলতা সেন' ১৯৪২ এবং 'মহাপৃথিবী' ১৯৪৪। এরপর ১৯৪৮-এ 'সাতটি তারার তিমির'। 'মহাপৃথিবী'র কবিতাবলীর এবং 'সাতটি তারার তিমির' এর কবিতাবলীতে দুস্তর ব্যবধান। অনেককেই বলতে শুনেছি, সেই জীবনানন্দ আর নেই। আমি সেসময় ওঁর একটি কবিতা পড়ে মুগ্ধ হয়ে ওঁকে চিঠি লেখাতে উনি দুঃখ করে, খানিকটা ক্ষোভ প্রকাশ করেই, আমাকে তার উত্তরে জানিয়েছিলেন যে তাঁর পরবর্তী রচনা অনেক পাঠকেরই আগের মত ভালো লাগে না। এবং আমার মত একজন নগণ্য কাব্যপাঠকের যে অত ভালো লেগেছে সেজন্য জীবনানন্দের মত কবিও প্রগাঢ়চিত্তে সেকথা স্মরণ করে খুশি হয়ে আমাকে সেকথা জানিয়েছিলেন। যে বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের একান্ত অনুরক্ত পাঠক ছিলেন, যাঁর 'কবিতা' পত্রিকায় জীবনানন্দের স্থান ছিল সর্বাগ্রে, তিনিও, যতদূর জানি, জীবনানন্দের শেষ দিককার লেখায় তত আনন্দ পেতেন না। যাই হোক। ফিরে আসি 'ঘাস' কবিতাটির প্রসঙ্গে।]

কার্তিক ভোরে ঃ ১৩৪০ / জীবনানন্দ দাশ

আলোক সরকার

কার্তিকের ভোরবেলা কবে
চোখে মুখে চুলের উপরে,
যে শিশির ঝরলো তা'
শালিক ঝরালো বনে ঝরে।

আমলকীর গাছ ছুঁয়ে তিনটে শালিক
কার্তিকের রোদে আর জলে
আমারি হৃদয় দিয়ে চেনা তিন নারীর মতন
সূর্য? নাকি সূর্যের চপ্পলে

পা গলিয়ে পৃথিবীতে এসে
পৃথিবীর থেকে উড়ে যায়।
এ জীবনে আমি ঢের শালিক দেখেছি
তবু সেই তিনজন শালিক কোথায়।

যে কোনো কবিতার সরাসরি মানে বলতে যাওয়া যে এক ধরনের ভ্রান্তশ্রম তা আমরা সবাই জানি, তবু কবিতা পড়ার পর আমরা যে কেবল একটা 'না-বোঝার' বিমূর্ত আনন্দ নিয়েই বিভোর হয়ে থাকি তা কিছুতেই মানবো না। সব কবিতা, অর্থাৎ সব যথার্থ কবিতাই আমাদের কাছে বোধগ্রাহ্য একটা তাৎপর্য নিয়ে আসে, আর যে-কোনো অনুভূত সত্যই যেহেতু ভাষায় প্রকাশ করা সম্ভব, কবিতা পাঠের ব্যক্তিগত ভাবানুভবেরও একটা ভাষার শরীর দেওয়া খুবই স্বাভাবিক এবং সম্ভবপর ঘটনা। সব কবিতা বিষয়েই নিজের মতো করে কিছু বলা যায়। যেমন জীবনানন্দের 'হায় চিল' নামের কবিতা বিষয়ে আমাকে প্রশ্ন করা হলে, আমি বলব, 'হায় চিল' যতটা না প্রেমের কবিতা, তার চাইতে অনেক বেশি মৃত্যুচেতনার কবিতা। অন্তত আমার কাছে। 'হায় চিল' আমাকে এক আবহমান মৃত্যুচেতনার মুখোমুখি রাখে। একজন ছিল, সে আর নেই, সে আর কোনোদিন ফিরবে না—এই স্তব্ধ বোধ ধানসিড়ি নদীর এপার ওপার ব্যাপ্ত নির্জন নিস্তব্ধতায় প্রগাঢ় হয়। আবহমানের এই কান্না, এই অসহায়তা, এই শোক। 'হায় চিল' বিষয়ে এর অতিরিক্ত আর একটি কথাও আমার বলার নেই। তবু এটুকু তো আছে। প্রথম পাঠের পর 'হায় চিল' আমাকে এক অনতিক্রম নিস্তব্ধতার প্রচ্ছায়ার অন্তর্লীন করেছিল, যা আজও অতিক্রান্ত হলো না। 'হায় চিল' বিষয়ে যদি প্রশ্ন করা হয়, আমি এই কথাটাই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে বলব।

তবু অনেক বিদগ্ধ ব্যক্তিই কবিতার মানে বুঝতে চান। লীলা মজুমদার, যিনি আমার কাছে এক বিশেষ শ্রদ্ধেয় নাম, তার 'পাকদণ্ডী' নামের আত্মজীবনীতে অমিয় চক্রবর্তীর 'পার্থিব' নামের কবিতা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন 'আমি আবার মানে না বুঝলে রস উপভোগ করতে পারি না।' অমিয় চক্রবর্তীর 'পার্থিব' কবিতাটির 'মাথামুণ্ডু' কিছুই কেন লীলা মজুমদারের মতো ইংরেজী সাহিত্যের কৃতী ছাত্রী এবং সবার উপরে বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম সারির লেখিকা বুঝলেন না এটা আমার কাছে বড় বিস্ময়। আমি বলব শুরুতেই কবিতাটিকে অর্থহীন মজাদার কিছু না ভেবে একটু মন দিয়ে পড়লেই অন্তত আপাত গ্রাহ্য একটা মানে পাওয়া শক্ত ছিল না।

বিশুদ্ধ একজন নলিনীচন্দ্র পাকড়াশি,
মাছ, বা ন্যাংড়া আম,
আধুনিক কৃষ্ণ বাজায় ফ্লুটের বাঁশি,
সবই বাস্তব—

বিশুদ্ধ একজন নলিনীচন্দ্র পাকড়াশি—অর্থাৎ নির্ভেজাল একজন মানুষ, যেমন রাম যেমন শ্যাম, অর্থাৎ চিরদিনের প্রাকৃতিক একজন মানুষ ; যেমন মাছ বিশুদ্ধ একটা মাছ, ন্যাংড়া আম বিশুদ্ধ একটা ন্যাংড়া আম তেমন নির্ভেজাল সাধারণ মানুষ। তেমন কোনো অদলবদল হয়নি চিরদিনের মানুষের। চিরদিনের মানুষ ঠিক সেই সর্বলক্ষণযুক্ত চিরদিনের মানুষই থেকে গেছে। চিড়িয়াখানার একটা বাঘ যেমন সব বাঘের প্রতিনিধি মানুষও প্রায় সেইরকম—চিরটাকাল এইরকমই, কেবল সময় পাল্টে যায়, পরিবেশ বদলায়, মানুষের ওপরের ভাব-ভঙ্গী, তার সাজপোশাকের নাম অন্য হয়। আজকের মানুষ গভীর স্বভাবে প্রাচীন মানুষেরই প্রতিধ্বনি করে, প্রতিচ্ছায়া আঁকে। আজকের প্রেমিক-প্রেমিকারা ঠিক একই আবেগে প্রেমের আহ্বান জানায় যেমন তার পূর্ববর্তীরা, তারা পুরোনো দিনের মতো একই বাঁশির তান পৌঁছে দিতে চায় তাদের ভালোবাসার মানুষের গানে, কেবল বাঁশির আধুনিক নাম হয় ফ্লুট—

তবু দেখো সেই কটাক্ষ
আঁখির কোণে দিচ্ছে সাক্ষ্য
যেমনটি ঠিক দেখা যেত
কালিদাসের কালে। (সেকাল ঃ রবীন্দ্রনাথ)

যাই হোক, এ সবই প্রাসঙ্গিক কথা। ব্যাপারটা এই যে কালীকৃষ্ণ গুহ, অশোক দত্তচৌধুরী, নির্মল হালদার আমাকে জীবনানন্দের 'কার্তিক ভোরে ঃ ১৩৪০' কবিতাটি বুঝিয়ে লিখতে বলেছে। কবিতাটি আমি কীভাবে বুঝেছি বলি।

একটা কবিতা বোঝার সবচেয়ে সহজ পদ্ধতি, আমার মনে হয়, প্রথমে কবিতাটির সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে যাওয়া। আগের থেকে মস্ত বড় কোনো দার্শনিক তত্ত্ব শোনার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করার দরকার নেই ; সময় চেতনা, ইতিহাস চেতনা, ব্যক্তি আধার, সমষ্টির ঐকতান ইত্যাদি বারতা শোনার জন্য নিরুৎসুক থাকাই ভালো। আমরা আপাতত কবিতাটির সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে যাই।

অনেক দিন আগে ১৩৪০ সালের কোনো এক কার্তিকের ভোরবেলা চোখে মুখে চুলের ওপরে যে শিশির ঝরেছিল তা আমলকীগাছের পাশ দিয়ে শালিকেরা যাবার জন্যই ঘটেছিল। 'কবে' কথাটি আমাদের বলে দিচ্ছে ঘটনাটি অনেক দিন আগে ঘটেছিল। 'চোখে

মুখে চুলের উপরে' অর্থাৎ সেই শিশিরের জল অজস্র ধারায় ঝরেছিল,—শান্তি, পবিত্র আনন্দ স্পর্শে ভরে দিয়েছিল। আমলকী গাছের কথা আমরা দ্বিতীয় স্তবকের শুরুতে জানতে পারি, তারা যে সংখ্যায় তিনজন ছিল তাও আমাদের জানা হয়। দ্বিতীয় স্তবকের ২ আর ৩ চরণে আমরা আরো জানি লেখকের হৃদয় দিয়ে চেনা অর্থাৎ গভীর ভালোবাসার তিন জন নারীর মতন ছিল সেই তিনজন শালিক। এটা বুঝে-নেওয়া খুব শক্ত হয় না যে কবির একান্ত প্রিয় তিনজন নারী যেমন একদিন তাদের ভালোবাসার স্নিগ্ধতায় কবিকে ভরে দিয়েছিল, ঠিক তেমনই তিনজন শালিক কার্তিকের ভোরের রৌদ্র-শিশিরের জলে কবিকে এক নিবিড় আনন্দঘন মুহূর্ত এনে দিয়েছিল।

সেই তিনজন শালিক আর ফিরে আসেনি। আর কোনোদিন তারা উড়ে যায়নি আমলকীগাছের পাশ দিয়ে, শিশিরের শান্তি জলে স্নান করায়নি কবিকে, যেমন সেই তিনজন নারী আকাশের অনেক অনেক দূরে চলে গেছে। সূর্য অর্থাৎ সময়—সূর্যের সঙ্গে সঙ্গেই দিন হয় রাত হয় আবার দিন হয়। সময় এগিয়ে চলে চলমান সময় কখনো স্থির নয়, তার মুখ কখনো পিছন দিকে ফেরে না। সময়ের নিয়মে অথবা সময়ের হাত ধরে তিনজন নারী তিনজন শালিক পৃথিবীতে আসে, পৃথিবী ছেড়ে চলে যায়। সূর্যের, সময়ের চপ্পলে পা গলিয়ে এইসব যাওয়া-আসা। যা কিছু ঘটে তা একবারই ঘটে। সদর স্ট্রীটের বারান্দা একবারই আলোকিত উন্মোচন দেখায়। তারপর কতবার কত শালিক দেখা হলো, কত শিশিরের জল ঝরল তবু কেউই সেই তিনটি শালিকের মতো নয়, যাদের ডানার আন্দোলনে আমলকী শাখা দুলে উঠতে পারে, আনতে পারে শিশিরের জলের সেই অমৃত স্পর্শ। যেমন সেই তিনজন নারী। তাদের মতো আর কেউই হৃদয়ের শুশ্রূষা করতে পারবে না, তারা একবারই এসেছিল, আর কখনোই আসবে না।

বিশুদ্ধ পবিত্র আনন্দের স্বাদ, ভালোবাসার স্বাদ জীবনে একবারই পাওয়া যায়, তার আর কোনো দ্বিতীয় উদ্ভাসন নেই। সময়ের, ঘটনার আকস্মিক সংযোগে যে আনন্দমুহূর্ত তা কেবল সারা জীবনের অমৃত স্বাদ হয়ে থাকে—তা অবিস্মরণীয়, তাকে ফিরে পাওয়ার ইচ্ছেটা যেমন চিরদিনের, তেমন তাকে না-পাওয়ার বেদনাও অম্লান। ১৩৪০ সালের কার্তিকের ভোরবেলা আমলকীগাছ থেকে যে শিশিরধারা ঝরেছিল, তা তিনটি শালিকের আকস্মিক আগমনেই ঘটেছিল ; চোখে মুখে চুলের ওপরে সেই শিশিরস্পর্শ যে প্রাণস্পন্দিত স্নিগ্ধ অনুভব এনেছিল তা হৃদয় দিয়ে, ভালেবাসার সবুজ আলো দিয়ে চেনা সেই তিনজন নারীর মতো। সময়ের ধারাবাহিকতার মাঝখানে একদিন সেই তিনজন নারী এসেছিল, শিশিরের জলের মতন পবিত্র মধুরিমায় জীবন ভরে দিয়েছিল—তারা চলে গেছে, যেমন শিশির-ঝরানো সেই তিনটি শালিকও আর ফিরে আসেনি।

এইভাবেই সব শেষ হয়। সময়ের হাত ধরে সব কিছুই চলে যায় ; সূর্যের উদয় হয়, সূর্য অস্ত যায়। সূর্য অর্থাৎ চলমান সময়ের ভূমিতে দাঁড়িয়ে কত কিছুর অভিজ্ঞতা স্পর্শ মাধুরী আমাদের ভ'রে তোলে, তারপর সব কিছুই নিঃশেষ হয়। শালিক থাকে কিন্তু সেই তিনজন শালিক আর থাকে না যারা জীবনকে শান্তি শুশ্রূষায় ভরে দিতে পারে ; নারী থাকে কিন্তু সেই তিনজন নারী আর নয় যাদের চিনে নিতে গেলে হৃদয়ের আলো জ্বলে ওঠে।

নিশীথের বাতাসের মতো
একদিন এসেছিলে,

দিয়েছিলে এক রাত্রি দিতে পারে যত।

(সহজ ঃ ধূসর পাণ্ডুলিপি)

এতটা লিখলুম, কিন্তু তার কোনো প্রয়োজন ছিল না। 'হায় চিল'-র মতো এই কবিতাও আমাকে বলছে একটা থাকা, তার না-থাকা, আর তার চিরদিনের না-থাকার কথা। এই কবিতা আমাকে বলছে এক অনির্দেশ নিয়তি, দৈব-সংঘটন আর তার অসহায় অবসানের কথা। যা হয় তা একবারই হয় তারপর, আর হয় না। এই চেতনা, এই মৃত্যুচেতনা-এই অবসানবার্তা—এর বোবা স্তব্ধতাই 'কার্তিক ভোরে ঃ ১৩৪০' পড়ার পর আমাদের নিরতিশয় আর্ত করে।

প্রসঙ্গত বাংলা ১৩৪০ অর্থাৎ মোটামুটিভাবে ইংরেজি ১৯৩৩ জীবনানন্দের সৃষ্টিকর্মের এক অত্যুজ্জ্বল ফসল ফলানোর সময়। এইরকম সময়, বলা যেতে পারে, দৈবক্রমেই কবি-লেখকের জীবনে কখনো কখনো আসে। ১৯৩৩-এ জীবনানন্দ কেবল 'কারুবাসনা' 'জীবনপ্রণালী' বা 'নিরুপম যাত্রা' (বড় গল্প)র মতো অবিস্মরণীয় উপন্যাস রচনা করেননি। অসংখ্য ছোটগল্পও রচনা করেছিলেন। আর কবিতা তো আছেই।

আরো জানাই 'কার্তিক ভোরে ঃ ১৩৪০' প্রকাশের (শতভিষা, শারদীয়, ১৩৬১) কয়েকদিন পরেই জীবনানন্দ-র দেহাবসান হয়। তার মৃত্যুর অল্প পরে বুদ্ধদেব বসু 'কবিতা' পত্রিকার জীবনানন্দ-সংখ্যা প্রকাশ করেন। সেখানে 'কার্তিক ভোরে ঃ ১৩৪০' আবার ছাপিয়ে তিনি এটাই জীবনানন্দ শেষ রচনা কিনা এ-প্রশ্ন তোলেন। 'শতভিষা'র সম্পাদক দীপঙ্কর দাশগুপ্ত জানিয়েছেন সে বছর শারদীয় পূজা শুরু হবার দিন পনের আগে জীবনানন্দর কাছে কবি 'শতভিষা'র জন্য কবিতা প্রার্থনা করতে গেলে তিনি হাতে কোনো কবিতা নেই, সব কবিতা disopsed of এ-কথা বলে সাতদিন পরে আসতে বলেন। সাতদিন পরে 'কার্তিক ভোরে ঃ ১৩৪০' কবিতাটি শতভিষায় প্রকাশের জন্য দেন। পূজোর ঠিক আগে শারদীয় 'শতভিষা' প্রকাশ হয়, সে বছরের বিজয় দশমীর পরের দিন সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটে।

অদ্ভুত আঁধার এক

বিনয় মজুমদার

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা ;
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—
করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া।

যাদের গভীর আস্থা আছে আজো মানুষের প্রতি
এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়
মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

— জীবনানন্দ দাশ

কবিতাটিতে সৌন্দর্যতত্ত্বের কয়েকটি ব্যাপার অনুপস্থিত। উপস্থিতির সুযোগের অভাবহেতু এ-প্রকার ঘটেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা উচিত নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি নেই ঃ

এক। এতে elimination নেই। যে-কোনো রচনা সঠিক পরম্পরাবদ্ধ এবং ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ-সংবলিত হওয়ার কথা। কিন্তু তা থেকে কোনো অংশ (স্তবক ইত্যাদি) কিংবা বাক্য সুপরিকল্পিতরূপে বাদ দিলে এই বাদ দেওয়ার ব্যাপারটিকে বলি elimination–যেমন রবীন্দ্রনাথের 'পূজারিনী' কবিতাটির শেষ স্তবক এবং ঠিক তার আগের স্তবক এই দুইয়ের মাঝখানে ঘটনার বিবরণ মহাকবি স্বেচ্ছায় সুপরিকল্পিতরূপে বাদ দিয়েছেন*। শেষ স্তবকের ঠিক আগের স্তবকে কবি লিখেছেন যে প্রাসাদের প্রহরীরা

* এমন সময় হেরিলা চমকি প্রাসাদে প্রহরী যত,
রাজার বিজন কানন-মাঝারে
স্তূপপদমূলে গহন আঁধারে
জ্বলিতেছে কেন যেন সারে সারে প্রদীপমালার মতো।

মুক্তকৃপাণে পুররক্ষক তখনি ছুটিয়া আসি
শুধালো, "কে তুই ওরে দুর্মতি,
মরিবার তরে করিস আরতি।"
মধুর কণ্ঠে শুনিল, "শ্রীমতি, আমি বুদ্ধের দাসী।"

সেদিন শুভ্র পাষাণফলকে পড়িল রক্তলিখা।
সেদিন শারদ স্বচ্ছ নিশীথে
প্রাসাদকাননে নীরবে নিভৃতে
স্তূপপদমূলে নিবিল চকিতে শেষ আরতির শিখা।।

দেখতে পেলো রাজার বিজন কাননে স্তূপপদমূলে প্রদীপমালা জ্বলছে। তারপরেই শেষস্তবক— শেষ স্তবকে শুধু লিখেছেন যে সেদিন পাষাণফলক রক্তচিহ্নিত হলো এবং শেষআরতির শিখা চকিত নিভে গেলো। এতে রচনা অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়েছে, বেশি সৌন্দর্যমণ্ডিত হয়েছে। অনুরূপভাবে কোনো রচনার কোনো বাক্য বা বাক্যাংশ বাদ দেওয়ার উদাহরণরূপে উল্লেখ করছি বর্তমান প্রবন্ধের রচয়িতারই একটি কবিতা। "আমার ঈশ্বরীকে' গ্রন্থের তৃতীয় সংস্করণে ছিলো : 'যে গেছে সে চ'লে গেছে, দেশলাইয়ে বিস্ফোরণ হয়ে / বারুদ ফুরায় যেন, অবশেষে কাঠটুকু জ্বলে /আপন অন্তরলোকে' ; ইত্যাদি। পরে 'ঈশ্বরীয় কবিতাবলী'র সংস্করণে পরিমার্জনার পর লিখি : 'যে গেছে সে চ'লে গেছে, অবশেষে কাঠটুকু জ্বলে / আপন অন্তরলোকে'', ইত্যাদি। এতে কবিতাটি অধিকতর হৃদয়গ্রাহী হয়েছে বলে আমার ধারণা। চিত্রশিল্পীদের এই ধরনের elimination ব্যবহার করা ভিন্ন গত্যন্তর নেই। পিকাসোর চিত্রে (একটি উদাহরণ 'মা' ও 'ছেলে'), মাতিসের চিত্রে (একটি উদাহরণ, 'সেই দীর্ঘ গ্রীবাবিশিষ্ট তরুণী মহিলা') দেখা যায় বিশদরূপে আঁকতে গেলে যতো রেখা ব্যবহার করতে হতো ততো রেখা তাঁরা ব্যবহার করেননি, বহু রেখাই বাদ দিয়ে দিয়েছেন। দিয়েছেন সংক্ষেপে কাজ সারার জন্য নয়, চিত্রকে অধিকতর শ্রীমণ্ডিত করার জন্য। Elimination-এর ফল রহস্যময়তা এবং দুর্বোধ্যতা। এতক্ষণে জীবনানন্দের নিজেরই রচনায় climination-এর অত্যন্ত সুন্দর একটি উদাহরণ মনে পড়লো :'বিবর্ণ প্রাসাদ তার ছায়া ফেলে জলে। /ও প্রাসাদে কারা থাকে? কেউ নেই—সোনালি আগুন চুপে জলের শরীরে/নড়িতেছে জ্বলিতেছে— মায়াবীর মতো জাদুবলে' ইত্যাদি। এখানে এই আগুন কি কোনো আলেয়ার, না কি ঐ প্রাসাদ থেকে আসা আলোর প্রতিফলন, না কি অন্য কোনো স্থান থেকে আসা আলোর প্রতিফলন হতেও পারে। কবি সে-কথাটি বাদ দিয়ে দিয়েছেন, যেন বিষয়টি অত্যন্ত গোপন কথা। ফলে কবিতাটির এ-স্থানটি রহস্যময় হয়ে উঠেছে, পাঠক উপরিউক্ত বিকল্প সম্ভাবনাগুলির কোনটি হতে পারে ভাবতে শুরু করেন ; পথ চলতে-চলতে রহস্যের ঘ্রাণ পেয়ে থেমে পড়ার মতো, থেমে প'ড়ে চতুষ্পার্শ্ব একটু খতিয়ে দেখার মতো। এর ফলে সেই খতিয়ে দেখা স্থানটি পথিকের মনে গেঁথে যায়, গেঁথে যায় অনুরূপভাবে কবিতাটির পঙক্তিগুলিও। এই যে প্রয়োজনমতো পাঠককে বিশেষ-বিশেষ স্থানে থামিয়ে দেওয়া, থামিয়ে দিয়ে ভাবানো—এ কাজ কবির করতে হয় সুপরিকল্পিত রূপে। ফলে দেখা যাচ্ছে climination কবিদের মস্ত সহায়, প্রায়শই ভরসা। Elimination-এর ফলে রহস্যময়তা বাড়ে, দুর্বোধ্যতা বাড়ে—মাঝে-মাঝে কবিতার অর্থ 'কোনোদিন বোঝা-যাবে-না' অবস্থায়ও এসে দাঁড়ায়। কিন্তু কবির চরম উদ্দেশ্য পাঠককে ভালো লাগানো, বোঝানো নয়, এবং দেখা গেছে আমাদের সর্বাপেক্ষা প্রিয় বাস্তব বস্তুগুলি—চাঁদ, তারা, ফুল, লতা, নানাবিধ পাখি, পাখিদের গতিভঙ্গি ইত্যাদি কখনোই আমরা সম্পূর্ণ বুঝি না। বুঝি না ব'লে যে ভালো লাগে তা হয়তো নয়, হয়তো ভালো লাগাতে গিয়ে রহস্যময় ও দুর্বোধ্য হয়ে পড়ে। কলামূলক বিষয়ে সবচেয়ে স্পষ্টবোধ্য হচ্ছে অভিধান। কিন্তু অভিধানের চেয়ে সার্থক কবিতার হৃদয়গ্রাহিতা অনেক বেশিই হয়। ফলে দেখা গেছে elimination কবিদের অত্যন্ত নির্ভরযোগ্য বন্ধু।

দুই ।। আলোকচিত্রধর্মিতা থেকে চ্যুতি নেই। সংবাদপত্রের সংবাদকে আলোকচিত্রের অনুরূপ মনে করা যেতে পারে। বাস্তব ব্যাপারকে কোথাও ভিন্নাবয়ব না ক'রে অবিকলরূপে উপস্থিত করলে হয় সাংবাদিকতা। কিন্তু অঙ্কিত চিত্র যেমন আলোকচিত্র নয়,

কবিতাও তেমনি সাংবাদিকতাময় সংবাদ নয়। অর্থাৎ চিত্রশিল্পীকে ভেবে-চিন্তে, সুপরিকল্পিতরূপে আলোকচিত্র থেকে চ্যুত হতে হয়—তার উদ্দেশ্য দর্শককে অধিক পরিমাণে ভালো লাগানো। তেমনি কবিকেও ভেবে-চিন্তে সুপরিকল্পিতরূপে সংবাদসুলভ রচনা থেকে চ্যুত হতে হয়—তারও উদ্দেশ্য পাঠককে ভালো লাগানো। ফলে জন্ম হয়েছে ইমপ্রেশনিস্ট চিত্রের, অ্যাবস্ট্র্যাক্ট চিত্রের। ফলে জন্ম হয়েছে অ্যাবস্ট্র্যাক্ট চিত্রের সমধর্মী আধুনিক কবিতার। আলোকচিত্রধর্মিতা থেকে চ্যুতির একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত জীবনানন্দের—"ঘাসের উপর দিয়ে ব'য়ে যায় সবুজ বাতাস/অথবা সবুজ বুঝি ঘাস?/ অথবা নদীর নাম মনে ক'রে নিতে গেলে চারদিকে প্রতিভাত হয়ে ওঠে নদী, ইত্যাদি। এখানে কবি স্বেচ্ছায় আলোকচিত্রধর্মিতা থেকে অত্যন্ত বেশি দূরে সরিয়ে নিয়ে এসেছেন রচনাকে এবং রচনাও আশ্চর্য হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠছে। অর্থাৎ যখন কবিতাকে সাংবাদিকসুলভ বর্ণনা বা বিবরণ থেকে দূরে সরিয়ে আনতে হয় তখন কীভাবে কোনদিকে সরালে হৃদয়গ্রাহিতার আবির্ভাব হয় তা কবির আগে থেকে জানতে হয়। অর্থাৎ 'ভালো লাগার মনস্তত্ত্ব' জানতে হয়। জানা এমন-কিছু দুঃসাধ্য ব্যাপার নয়, কী-কী জিনিস আমাদের ভালো লাগে—তাদের সামনে রেখে কেন ভালো লাগে তা ভাবতে চেষ্টা করলেই ক্রমে-ক্রমে জানা যায়।

তিন। চিত্রকল্প, রূপকল্প এবং উপমা নেই। এর মধ্যে একমাত্র উপমাই আমরা দৈনন্দিন কথাবার্তায় প্রচুর পরিমাণে ব্যবহার করি—হাজার-হাজার বৎসর ধ'রেই ব্যবহার করছি। সেইজন্যই উপমা কবিতার সবচেয়ে স্বাভাবিক অলংকার। অনুপ্রাস যেমন পর-পর দশটি কি পনেরোটি কবিতায় ব্যবহার করলে অসহ্য বোধ হয়, উপমা তেমন নয় ; হাজার-হাজার বছর ধ'রে ক্রমাগতই উপমা ব্যবহৃত কোনো উপমা 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতাটিতে নেই। তার পরিবর্তে উপমার চেয়েও বেশি স্বাভাবিক ব্যাপার এ-কবিতায় রয়েছে—রয়েছে প্রতীকের মাধ্যমে analogy-র ব্যবহার, যার আলোচনা পরের দিকে করা হবে।

চার । মূল বিষয়বস্তু যা কবিকে 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতায় উক্ত বা ব্যক্ত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করেছিলো সেই মূল বিষয়বস্তুটি নেই। অর্থাৎ সাক্ষ্যপ্রমাণহীন অবস্থায় রয়েছে কবিতাটির বক্তব্যবিষয়। এতক্ষণ যে-ব্যাপারগুলি লিপিবদ্ধ করলাম সেগুলি কবিতার editing-এর মাধ্যমে ভিন্ন করা প্রায় অসম্ভব। অর্থাৎ 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতাটি রচনাকালে editing-এর প্রয়োজন প্রায় হয়নি। editing খুবই দুঃসাধ্য কাজ। প্রায় সাংবাদিকতাসুলভ রচনা লিখে পরে বারংবার কাটছাট করে edit করতে হয়। এতগুলি ব্যাপার 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতাটিতে নেই। কিন্তু এই কবিতাটিতে আছে নিম্নলিখিত ব্যাপারগুলি ঃ

এক। আবিষ্কার আছে। যে-কোনো নতুন আবিষ্কার চমকপ্রদ এবং সেহেতু মনকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে। আবিষ্কার অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহীও হতে পারে। আবার যে-কোনো নতুন আবিষ্কারের ব্যবহারিক মূল্যও আছে—আবিষ্কার বিশেষে মূল্য অপরিসীমও হতে পারে। কবিতার বিষয়বস্তুরূপে এ-প্রকারের আবিষ্কারের ব্যবহার বিরল হলেও প্রচলিত আছে, বিশেষ ক'রে দর্শনশাস্ত্রে নতুন আবিষ্কারের ব্যবহার। শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতা যেমন কেবলমাত্র দর্শনশাস্ত্রে নতুন আবিষ্কারের বিবৃতিমাত্র—কোনো অলংকার নেই, কেবলমাত্র বিবৃতি ; তা সত্ত্বেও ঐ তত্ত্বকথাগুলির চমকপ্রদতা, ব্যবহারিক মূল্য ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতাকে অমরত্ব দিয়েছে। কোনো কবি যদি এ-প্রকারের কিছু আবিষ্কার ক'রে ফেলতে পারেন তবে তাঁর সাফল্যলাভ অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। যেমন হয়েছে 'অদ্ভুত

আঁধার এক' কবিতায় জীবনানন্দের। উদ্ধৃতি দেওয়া অর্থহীন, সম্পূর্ণ কবিতাটি তাঁর আবিষ্কারের নিরাভরণ বিবৃতিমাত্র, পাঠককে সম্পূর্ণ কবিতাটি একবার পড়ে দেখতে অনুরোধ করছি।

দুই। উপমার বদলে substitution আছে। প্রকৃতপক্ষে মূলে সাংবাদিকসুলভ কতকগুলি বাক্য কবির লেখার কথা ছিলো ; সেই বাক্যগুলোর substitute রূপে কতকগুলি বাক্য কবি লিখেছেন, মূল বাক্যগুলি একদম না লিখে। Substitution করতে গিয়ে কবি তিনটি স্তরে কার্য সমাধা করেছেন, এবং সাধারণত এই তিনটি স্তরেই substitution করতে হয়। প্রথমে তিনি একটি উপমাই ভেবেছিলেন—যাদের বিদ্যা নেই, বুদ্ধি নেই, জ্ঞান নেই সেই ব্যক্তিগুলিই আজকাল প্রকৃতপক্ষে সবকিছু সহজে বুঝতে পারে, জানতে পারে, ভবিষ্যৎ দেখতে পারে, এ-ব্যাপারটি যেন অন্ধ ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি চোখে দেখার মতো। দ্বিতীয় স্তরে তিনি মূল বিষয়টি বাদ দিয়ে দিলেন—রেখে দিলেন কেবলমাত্র 'এ-ব্যাপারটি যেন অন্ধ ব্যক্তির সবচেয়ে বেশি চোখে দেখা' অংশটুকু। এবং তৎক্ষণাৎ 'অন্ধ ব্যক্তি' একটি প্রতীকে রূপান্তরিত হলো। তৃতীয় স্তরে কবি এই প্রতীকটির আচার-ব্যবহার একটু বেশি পরিমাণে তাঁর বাক্যের অন্তর্ভুক্ত করলেন—'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ, যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা'; এবং তৎক্ষণাৎ কবি প্রতীকও পার হয়ে এলেন, পার হয়ে এসে analogy-তে উপস্থিত হলেন। মূল বিষয়বাহী বাক্যের substitute-রূপে কবি analogous বিষয়বাহী বাক্য লিখলেন, এবং তা করতে উপমার থেকে প্রতীক তাঁকে সাহায্য করলো। এ গেলো কবির রচনাকালীন পদ্ধতি। পাঠকের পঠনকালীন অবস্থাও তাঁর স্বভাবত ভাবতে হয়েছিলো—পাঠক 'আঁধার' শব্দটিকে অনুল্লিখিত মূল বিষয়গুলির (অ-জ্ঞান ইত্যাদির) substitute-রূপে যেন বুঝতে পারে, না-হলে কবির সমস্ত উদ্দেশ্য ও শ্রম ব্যর্থ হয়ে যাবে! যেমন ব্যর্থ হয়েছে জীবনানন্দের পূর্বসূরি বহু কবির রচনায়। রবীন্দ্রনাথের 'জাগরণে যায় বিভীবরী, আঁখি হতে ঘুম নিল হরি' কিংবা 'এই কথাটি মনে রেখো, তোমাদের এই হাসি খেলায়,/ আমি যে গান গেয়েছিলেম জীর্ণ পাতা ঝরার বেলায়' ইত্যাদি কবিতায় ক-জন পাঠক বোঝেন যে কবি নিজে 'জাগরণ' শব্দটিকে সাধারণ নিদ্রাহীনতা অর্থে ব্যবহার করেননি, সর্বপ্রকারের সার্থকতা, সদাসতর্কতা, সদাসজাগদৃষ্টি ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করেছেন? ঠিক তেমনি ক-জন পাঠক বোঝেন যে 'ঘুম' এখানে সতর্কতাহীনতা, আলস্যময়তা ইত্যাদি অর্থে ব্যবহার করেছেন? এবং তেমনি 'গান'ও তাঁর সারা জীবনের সাধনার ফলশ্রুতি, দর্শন প্রচার। অথচ না বুঝলে কবির সব উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়ে যায়, এবং তার জন্য কেবল পাঠককে দোষ দেওয়া যায় না। পাঠক যাতে বুঝতে বাধ্য হয়, তার পদ্ধতি আবিষ্কার কাব্যতত্ত্বের ক্ষেত্রে জীবনানন্দের এক প্রধান আবিষ্কার। 'জাগরণে যায় বিভাবরী,/ আঁখি হতে ঘুম নিল হরি'—এই phenomenon এত স্বাভাবিক অবস্থায় বাস্তব জীবনে রয়েছে যে পাঠক এর স্বাভাবিক বাচ্যার্থ গ্রহণ করেই থেমে যায়। কিন্তু 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ,/যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দেখে তারা', এই phenomenonটি যেহেতু স্বাভাবিক অবস্থায় বাস্তব জীবনে নেই সেহেতু পাঠক বাধ্য হয়ে বাক্যটির 'প্রকৃত অর্থ' অনুসন্ধান করে। আবার 'এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়/ মহৎ সত্য বা রীতি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা/শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়' : এখানেও পাঠককে 'প্রকৃত অর্থ' অনুসন্ধানে বাধ্য করার ব্যবস্থা রয়েছে; এবং পাঠক বাধ্য হয়।

আবার উল্লেখ করা ভালো যে এই দ্বিতীয় বাক্যটিও—'এখনো যাদের কাছে স্বাভাবিক ব'লে মনে হয়/ মহৎ সত্য বা রীতি, কিংবা শিল্প অথবা সাধনা / শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়' জীবনানন্দ পূর্বে বর্ণিত ত্রিস্তর পদ্ধতিতে লিখে খাড়া করেছেন— উপমা থেকে প্রতীক, প্রতীক থেকে analogy। এবং এতো স্বতঃপ্রকাশ যে কবিতাটি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট চিত্রের অনুরূপ। কাব্যতত্ত্বের এই পদ্ধতিটি বর্তমান প্রবন্ধের লেখক কয়েক শত বার ব্যবহার করেছেন।

উপমা থেকে প্রতীক (সাধারণত বিশেষ্য পদ হয়) সন্ধান করার পদ্ধতি ভিন্ন আরেকটি পদ্ধতিতে প্রতীক সন্ধান করা যায় এবং সন্ধান ক'রে পাওয়া যায়। সে পদ্ধতির মূল রহস্য 'চারিত্রিক সমীকরণ'—equating the characters of two nouns। 'শকুন' এবং 'শেয়াল' শব্দ দুটি সেই পদ্ধতিতেও হয়তো আবিষ্কৃত হয়েছিল। যে-ব্যক্তিগুলির substitute রূপে 'শকুন' ও 'শেয়াল' নামক বিশেষ্য দুটি এলো, স্পষ্ট বোঝা যায়, সেই ব্যক্তিগুলির চরিত্র ভিন্ন অন্য-কিছুর সঙ্গেই 'শকুন' ও 'শেয়ালে'র মিল নেই। অর্থাৎ কেবল মাত্র চরিত্রই কবিদের প্রতীক নির্বাচন করে। এই ধরনের equation বা সমীকরণ ব্যবহার না ক'রে কবিদের উপায় থাকে না। আকৃতি অবয়ব ইত্যাদির মিল দেখে যে-সব উপমা রচিত হয়েছে হাজার-হাজার বছর ধ'রে, দেখা গেছে, 'হৃদয়াবেগ সমীকরণ' থেকে পাওয়া উপমা তদপেক্ষা অনেক বেশি হৃদয়গ্রাহী। উদাহরণ 'ফুলের মতো সহজ সুরে / প্রভাত মম উঠিবে পুরে' বা 'ঘন শ্রাবণমেঘের মতো/রসের ভারে নম্র নত, /বা 'পাখিরনীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন' ইত্যাদি। পদ্ধতিটি প্রয়োগ করতে হয় এইভাবে ঃ আমার প্রভাত সুরে পূর্ণ হয়ে উঠবে, তার দ্বারা সঞ্জাত হৃদয়াবেগ হবে ভারি মিষ্ট, মাদক এবং মনোলোভন। এখন কথা হচ্ছে, আমাদের বাস্তব জীবনে বারংবার ভারি মিষ্ট, মাদক এবং মনোলোভন হৃদয়াবেগ জাগায় কে, কিসে? খুবই সচরাচর জাগায় কিসে? ফুল, ফুল জাগায়—এই হচ্ছে একমাত্র উত্তর। তৎক্ষণাৎ, আর অন্য কিছু না ভেবেই ফুলকে সুরের উপমা রূপে ব্যবহার করা। এইভাবে নানাবিধ হৃদয়াবেগ জাগানোর standard elements যা আমাদের জানা সেগুলির একটি তালিকাই ক'রে ফেলা যায়, প্রয়োজন অনুসারে ব্যবহারের জন্য। এবং সে তালিকায় পাখির নীড় থাকতে বাধ্য, এবং এই 'পাখির নীড়' থেকে নেহাৎ 'হৃদয়াবেগ সমীকরণে'র মাধ্যমে 'পাখির নীড়ের মতো চোখ' নামক আশ্চর্য উপমা পাওয়া যায়। অনুরূপ ভাবে 'হৃদয়াবেগ সমীকৃত' করে 'শকুন' ও 'শেয়াল' পাওয়া সম্ভব। এখানে 'শকুন' ও 'শেয়াল' প্রাণী দুটি বীতশ্রদ্ধা এবং বিকর্ষণ সঞ্চার করে, যা কিনা কবির পক্ষে প্রয়োজন ছিলো।

তিন। বারংবার পঠনেচ্ছাউদ্রেকের ব্যবস্থা আছে। রসাত্মক এই বাক্যগুলি (পাঠককে মূল কবিতাটি আর একবার প'ড়ে দেখতে, অনুরোধ করি) কীভাবে রসাত্মক হয়েছে তাই-ই আমাদের আলোচ্য বিষয়। কিন্তু যেভাবেই রসাত্মক হয়ে উঠে থাকুক, অন্যতম প্রকৃত চিন্তনীয় বিষয় এই যে কবিতার অদ্ভুত সংসৃজন, এতে বিবৃত দার্শনিক আবিষ্কার, এর অন্তর্নিহিত এবং অনুল্লিখিত বেদনা (অত্যন্ত গভীর ব'লেই হয়তো অনুল্লিখিত), কবিতায় সৃষ্ট বিষণ্ণ পরিবেশ, মন্থর গতি ইত্যাদি সব মিলিয়ে পাঠককে কবি দ্বিতীয়বার পাঠে বাধ্য করতে সমর্থ হয়েছেন। এবং প্রথম, দ্বিতীয় বার পাঠের পরে তৃতীয় বার পাঠের আগ্রহ আরো বাড়তে থাকে— কারণ পাঠক নিজে তখন পাঠক কবি হতে থাকেন, চিন্তায় প'ড়ে, বাধ্য হয়ে। পাঠকের মনে হয় এই আজগুবি, অর্ধসৃষ্টি রচনাটি আসলে তিনি নিজেই সম্পূর্ণ করে তুললেন, এবং পাঠক তা করে অধিকতর আনন্দ পান এবং আত্মতৃপ্তি

বোধ করেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতা পাঠ করতে করতে পাঠক নিজেকে অত্যন্ত তুচ্ছ (রবীন্দ্রনাথের তুলনায়) মনে করতে বাধ্য, আর জীবনানন্দের কবিতা পাঠ করতে করতে পাঠক নিজেকে অত্যন্ত মূল্যবান মনে করতে বাধ্য, যার ফলে পাঠকের পঠনেচ্ছা বাড়তেই থাকে।

অদ্ভুত আঁধার এ এসেছে এ-কবিতায় আজ—এভাবেও জীবনানন্দ ভেবে লিখেছিলেন কিনা কে জানে।

চার। সহজে মুখস্থ করে রাখার ব্যবস্থা আছে। বারংবার পড়তে পড়তে যাতে কবিতাটি স্মৃতিস্থ হয়ে যায় সেদিকে কবি দৃষ্টি রেখেছেন। সুন্দর, সাবলীল, অনায়াস-উচ্চার্য, বিষণ্ণ ছন্দে গ্রথিত করেছেন শব্দগুলিকে। ব্যস, তাহলেই তো কবির উদ্দেশ্য অধিকাংশ সফল। অথচ পুরোনো সংবাদপত্রের সংবাদ কে আর পাঠ করে। একশত বৎসর পূর্বেকার সংবাদপত্র কে আর পুনর্মুদ্রণ করে? তার রচনা এক শতাব্দী পরেও যাতে পুনর্মুদ্রিত হয় সেদিকে লক্ষ্য রাখতে কবি সাংবাদিক সুলভ রচনাকে এইভাবে পরিস্রুত করেছেন, ক'রে সার্থক কবিতা সৃষ্টি করেছেন।

পাঁচ। গভীরতা আছে। অর্থাৎ পাঠকের চিন্তার খোরাক প্রচুর পরিমাণে এই কবিতায় বিদ্যমান।

ছয়। সংযম আছে। সংযম কবিদের অত্যন্ত প্রয়োজনীয়, এক দুরূহ তপস্যার মতো। যে-সব ব্যাপার লক্ষ্য ক'রে কবি এই 'সিদ্ধান্তে' পৌঁছেছেন, সে-সব ব্যাপার অনুল্লিখিত, অলিখিত ; 'সিদ্ধান্ত'টিই কবিতা। আমরা দেখলাম কবিতার বিষয়বস্তু কবির স্বকৃত একটি নতুন আবিষ্কার। অর্থাৎ মূল ব্যাপার, বিষয় ও সেগুলির বিশ্লেষণ ইত্যাদিও কবির স্বকৃত একটি নতুন আবিষ্কার। অর্থাৎ সেগুলি দিয়ে তিনি অনায়াসে একটি মূল্যবান প্রবন্ধের পুস্তক রচনা করতে পারতেন। তা না ক'রে কবিসুলভ সংযমবলে জীবনানন্দ একটি সার্থক কবিতা লিখেই চুপ করে রইলেন। এবং সকল মহৎ কবিই তাঁদের স্বকৃত আবিষ্কার (যার প্রত্যেকটি দিয়ে এক-একখানি বৃহৎ গ্রন্থ রচনা করা যেতো) একটিমাত্র রসোত্তীর্ণ বাক্যে বিধৃত ক'রে রেখেছেন, বড়োজোর একটি কি দুটি স্তবকই লিপিবদ্ধ ক'রে গেছেন। জ্ঞানভাণ্ডারে হয়তো তাঁদের সংযোজন কম হয়েছে, কিন্তু রসভাণ্ডার ক্রমাগত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে।

সাত। বহুমাত্রিক চরিত্র আছে। 'বহুমাত্রিক' শব্দটি আমি multidimensional অর্থে ব্যবহার করেছি। 'মাত্রা' বা dimension মানে স্বয়ংসম্পূর্ণ কিন্তু একটি মাত্র বিষয় ধরছি—যেমন প্রেম, জীবনদর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি, বিজ্ঞান ইত্যাদি। যেহেতু বিভিন্নপ্রকারের বহু বিষয়ে পৃথক-পৃথক ভাবে চিন্তা ক'রে একটিমাত্র সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি সেহেতু, বিপরীতভাবে, মূল চিন্তার বিষয় যদি সম্পূর্ণ অনুল্লিখিত থাকে তবে উপস্থিত 'সিদ্ধান্ত' থেকে মূল বিষয় খুঁজতে খুঁজতে বিভিন্ন প্রকারের বিষয়ের সাক্ষাৎ পেতে পারি। কবিতাকে বহুমাত্রিক করার অন্যতম পদ্ধতি এই, অন্যবিধ পদ্ধতিও আছে। জীবনানন্দ 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতাটিকে বহুমাত্রিক ক'রে তুলেছেন। এই আঁধার কিসের আঁধার, অন্ধগণ এইভাবে কী কী ব্যাপারে চোখে দ্যাখে? এই প্রশ্ন করলে এবং তার উত্তর ভাবতে গেলে মনে হয় প্রেমের ক্ষেত্রের কথা ; প্রেমের দেবতা অন্ধ। মনে হয় মানুষের পারিবারিক জীবনের কথা, মনে হয় জীবনদর্শনের কথা, সমাজনীতির কথা, এমনকি কাব্যতত্ত্বের কথাও মনে এসে যায়। এবং হয়তো পৃথক-পৃথক ভাবে প্রত্যেকটি বিষয়কেই এ-কবিতা ছুঁয়ে আছে।

১৯৪৬-৪৭ ঃ জীবনানন্দ দাশ

শুদ্ধসত্ত্ব বসু

দিনের আলোয় ওই চারিদিকে মানুষের অস্পষ্ট ব্যস্ততা ঃ
পথে-ঘাটে ট্রাক ট্রামলাইনে ফুটপাতে ;
কোথাও পরের বাড়ি এখুনি নিলেম হবে—মনে হয়,
জলের মতন দামে।
সকলকে ফাঁকি দিয়ে স্বর্গে পৌঁছুবে
সকলের আগে সকলেই তাই।

অনেকেরই ঊর্ধ্বশ্বাসে যেতে হয়, তবু
নিলেমের ঘরবাড়ি আসবাব—অথবা যা নিলেমের নয়
সে-সব জিনিস
বহুকে বঞ্চিত ক'রে দু-জন কি একজন কিনে নিতে পারে।
পৃথিবীতে সুদ খাটে ঃ সকলের জন্যে নয়।
অনির্বচনীয় হুণ্ডি একজন দু-জনের হাতে।
পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকদের দাবি এসে
সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।
বাকি সব মানুষেরা অন্ধকারে হেমন্তের অবিরল পাতার মতন
কোথাও নদীর পানে উড়ে যেতে চায়,
অথবা মাটির দিকে—পৃথিবীর কোনো পুনঃপ্রবাহের বীজের ভিতরে
মিশে গিয়ে। পৃথিবীতে ঢের জন্ম নষ্ট হ'য়ে গেছে জেনে, তবু
আবার সূর্যের গন্ধে ফিরে এসে ধুলো ঘাস কুসুমের অমৃতত্ত্বে কবে
পরিচিত জল, আলো আধো অধিকারিণীকে অধিকার ক'রে নিতে হবে
ভেবে তারা অন্ধকারে লীন হ'য়ে যায়।

লীন হ'য়ে গেলে তারা তখন তো—মৃত!
মৃতেরা এ-পৃথিবীতে ফেরে না কখনো।
মৃতেরা কোথাও নেই ; আছে?
কোনো-কোনো অঘ্রানের পথে পায়চারি-করা শান্ত মানুষের
হৃদয়ের পথে ছাড়া মৃতেরাও কোথাও নেই ব'লেই মনে হয় ;
তাহ'লে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে
কিছুটা সুস্থিরভাবে পেলে ভালো হ'তো।

বাংলার লক্ষ গ্রাম নিরাশায় আলোহীনতায় ডুবে নিস্তব্ধ নিস্তেল।
সূর্য অস্তে চ'লে গেলে কেমন সুকেশী অন্ধকার
খোঁপা বেঁধে নিতে আসে—কিন্তু কার হাতে ?
আলুলায়িত হ'য়ে চেয়ে থাকে—কিন্তু কার তরে?
হাত নেই—কোথাও মানুষ নেই ; বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আলপনার, পটের ছবির মতো সুহাস্যা, পটলচেরা চোখের মানুষী
হ'তে পেরেছিলো প্রায় ; নিভে গেছে সব।

এইখানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে ;
নতুন চালের রসে রৌদ্রে কতো কাক
এ-পাড়ার বড়ো মেজো...ও-পাড়ার দুলে বোয়েদের
ডাকশাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত ;
এখন টুঁ শব্দ নেই সেই সব কাকপাখিদেরও ;
মানুষের হাড় খুলি মানুষের গণনার সংখ্যাধীন নয় ;
সময়ের হাতে অন্তহীন।

ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হ'তো
ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি বাগ্‌দির
ঈশ্বরী মেয়ের সাথে
বিবাহের কিছু আগে—বিবাহের কিছু পরে—সন্তানের জন্মাবার আগে।
সে-সব সন্তান আজ এ-যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়
ক্লান্ত লোকসমাজের ভিড়ে চাপা প'ড়ে
মৃতপ্রায় ; আজকের এই সব গ্রাম্য সন্ততির
প্রপিতামহের দল হেসে খেলে ভালোবেসে—অন্ধকারে জমিদারদের
চিরস্থায়ী ব্যবস্থাকে চড়কের গাছে তুলে ঘুমায়ে গিয়েছে।
ওরা খুব বেশি ভালো ছিলো না ; তবুও
আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতায়
অন্ধ শতছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে
পৃথক আর-এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিলো।

আজকে অস্পষ্ট সব? ভালো ক'রে কথা ভাবা এখন কঠিন?
অন্ধকারে অর্ধসত্য সকলকে জানিয়ে দেবার
নিয়ম এখন আছে ; তারপর একা অন্ধকারে
বাকি সত্য আঁচ ক'রে নেওয়ার রেওয়াজ
র'য়ে গেছে ; সকলেই আড়চোখে সকলকে দ্যাখে।

সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ।
সৃষ্টির মনের কথা ঃ আমাদেরি আন্তরিকতাতে
আমাদেরি সন্দেহের ছায়াপাত টেনে এনে ব্যথা

খুঁজে আনা। প্রকৃতির পাহাড়ে পাথরে সমুচ্ছল
ঝর্ণার জল দেখে তারপর হৃদয় তাকিয়ে
দেখেছি প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল
হ'য়ে আছে ব'লে বাঘ হরিণের পিছু আজো ধায় ;
মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
ভ'রে গেছে ; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
ভাই আমি ; আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
হৃদয় কঠিন হ'য়ে বধ ক'রে গেল ; আমি রক্তাক্ত নদীর
কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজপ্রতিম বিমূঢ়কে
বধ ক'রে ঘুমাতেছি—তাহার অপরিসর বুকের ভিতরে
মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী
সকলকে আলো দেবে মনে ক'রে অগ্রসর হ'য়ে
তবুও কোথাও কোনো আলো নেই ব'লে ঘুমাতেছে।

ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি?' আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে—রক্তনদী উদ্বেলিত হ'য়ে
ব'লে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার ;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালীর—'
কোথাকার কেবা জানে ; জীবনের ইতর শ্রেণীর
মানুষ তো এরা সব ; ছেঁড়া জুতো পায়ে
বাজারের পোকাকাটা জিনিসের কেনাকাটা করে ;
সৃষ্টির অপরিক্লান্ত চারণার বেগে
এই সব প্রাণকণা জেগেছিলো—বিকেলের সূর্যের রশ্মিতে
সহসা সুন্দর ব'লে মনে হয়েছিলো কোনো উজ্জ্বল চোখের
মনীষী লোকের কাছে এই সব অণুর মতন
উদ্ভাসিত পৃথিবীর উপেক্ষিত জীবনগুলোকে।
সূর্যের আলোর ঢলে রোমাঞ্চিত রেণুর শরীরে
রেণুর সংঘর্ষে যেই শব্দ জেগে ওঠে
সেখানে সময় তার অনুপম কণ্ঠের সংগীতে
কথা বলে ; কাকে বলে? ইয়াসিন মকবুল শশী
সহসা নিকটে এসে কোনো-কিছু বলবার আগে
আধ-খণ্ড অনন্তের অন্তরের থেকে যেন ঢের
কথা ব'লে গিয়েছিলো ; তবু—
অনন্ত তো খণ্ড নয় ; তাই সেই স্বপ্ন, কাজ, কথা

অখণ্ড অনন্তে অন্তর্হিত হ'য়ে গেছে ;
কেউ নেই, কিছু নেই—সূর্য নিভে গেছে।

এ-যুগে এখন ঢের কম আলো সব দিকে, তবে।
আমরা এ-পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।
মানুষের ভাষা তবু অনুভূতিদেশ থেকে আলো
না পেলে নিছক ক্রিয়া ; বিশেষণ ; এলোমেলো নিরাশ্রয় শব্দের কঙ্কাল
জ্ঞানের নিকট থেকে ঢের দূরে থাকে।
অনেক বিদ্যার দান উত্তরাধিকারে পেয়ে তবু
আমাদের এই শতকের
বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু ;
তবুও কোথাও তার প্রাণ নেই ব'লে অর্থময়
জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে ; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।

এ-যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের ; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো : মানুষের বিহ্বল দেহের
সব দোষ প্রক্ষালিত ক'রে দেয়—মানুষের বিহ্বল আত্মাকে
লোকসমাগমহীন একান্তের অন্ধকারে অন্তঃশীল ক'রে
তাকে আর শুধায় না—অতীতের শুধানো প্রশ্নের
উত্তর চায় না আর—শুধু শব্দহীন মৃত্যুহীন
অন্ধকারে ঘিরে রাখে, সব অপরাধ ক্লান্তি ভয় ভুল পাপ
বীতকাম হয় যাতে—এ-জীবন ধীরে-ধীরে বীতশোক হয়,
স্নিগ্ধতা হৃদয়ে জাগে ; যেন দিকচিহ্নময় সমুদ্রের পারে
কয়েকটি দেবদারুগাছের ভিতরে অবলীন
বাতাসের প্রিয়কণ্ঠ কাছে আসে—মানুষের রক্তাক্ত আত্মায়
সে-হাওয়া অনবচ্ছিন্ন সুগমের—মানুষের জীবন নির্মল।
আজ এই পৃথিবীতে এমন মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার
নেই আর? সুবাতাস গভীরতা পবিত্রতা নেই?
তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হ'তে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলেছে আজো—তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজ গুণ র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়।

জীবনানন্দকে এখনো সকলেই নির্জন রোমান্টিক কবি বলেই চিহ্নিত করে থাকেন। কথাটা একেবারে উড়িয়ে দেবার নয়, কিন্তু তিনি যে কল্পনাময় বাস্তবাতীত লোকের বাসিন্দা এমনও নয়। তাঁর ইতিহাস চেতনা এবং কালজ্ঞান স্পষ্টই প্রমাণ করে যে তিনি প্রখরভাবে সমাজসচেতন কবিও ছিলেন। অন্ততঃ তাঁর শেষ দিকের কবিতাগুলি সে সাক্ষ্য দেয়।

জীবনানন্দের কাব্যে একটি পরিণতি আছে। 'ঝরাপালকে' দেখা যায় তিনি পূর্বসূরী কবিদের প্রভাব সম্পূর্ণ কাটিয়ে উঠতে পারেন নি, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'—অর্থাৎ তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ থেকেই তিনি বক্তব্য ও প্রকরণে নিজস্বতায় অনন্য সাধারণ হয়ে উঠলেন, রোমান্টিক আর্তি ও আবেগে অনুকরণীয় হলেন, চিত্ররূপময় কবি বলে আখ্যাত হলেন, শেষ জীবনে তাঁর কবিতায় জগৎ, জীবন এমনই নিবিড়ভাবে ধরা পড়লো যাতে তাকে সমাজ সচেতন কবি ছাড়া আর চিহ্নিত করা গেল না। 'সাতটি তারার তিমির' আর 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্য গ্রন্থ দুটি তার জ্বলন্ত প্রমাণ। শেষোক্ত গ্রন্থের '১৯৪৬—৪৭' কবিতাটির রসগ্রহণে কবির বাস্তব চেতনার পরিচয় পেতে দেরী হবে না।

তাঁর বিবর্তন দেখানো আমার উদ্দেশ্য নয়, তবু সূত্র হিসাবে গোড়ায় বলে কবিতাটির আলোচনা করা হলো।

'ঝরা পালক' কবির প্রথম কাব্যগ্রন্থ, সেখানে কবির উন্মেষ পর্বের কবিতা স্থান পেয়েছে ; সে সব কবিতায় পূর্বসূরীদের প্রভাব কাটিয়ে কবির স্বাতন্ত্র্য স্পষ্ট হয়ে ফোটেনি। পরবর্তী গ্রন্থে 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে কবি নিজস্বতা খুঁজে পেয়েছেন ; রোমান্টিক স্বপ্ন মেদুরতায় তিনি বিভোর। প্রকৃতিকে তিনি ইম্প্রেশনিস্ট কবির মতো নরম শব্দের তুলিতে বর্ণনা করেছেন। পরে তাঁর কবিতায় যুক্ত হয়েছে ইতিহাস চেতনা, 'বনলতা সেন' কবিতাটি তার প্রমাণ। তারপর কবি সমাজের দিকে নজর দিয়েছেন, নিজের অধিবাস্তবতায় বিধৃত হয়েছে বর্তমানের রূপ। কবি সম্পূর্ণ বাস্তব সচেতন জীবনবাদী হয়ে উঠেছেন '১৯৪৬—৪৭' এই কালেরই ফসল।

সুতরাং জীবনানন্দকে নির্জন রোমান্টিক কবি বলায় কবির পূর্ণ পরিচয় ফুটে ওঠে না। তিনি সমাজ সচেতন বাস্তববাদী কবিও এবং ইতিহাস চেতনা তাঁর কাব্যে যেমন স্পষ্ট তেমনই উগ্রভাবে ধরা পড়েছে। তাঁর শেষ পর্যায়ের কাব্যে—বিশেষ করে 'সাতটি তারার তিমির' এবং 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যে জীবনানন্দের সমাজ সচেতনতা এবং ইতিহাসশ্রয়ী মানসিকতার প্রতিচ্ছবি স্পষ্টভাবে প্রতিফলিত। তিনি নিজে এ বিষয়ে তাঁর প্রবন্ধ গ্রন্থ কবিতার কথায় বলেছেন "কবির পক্ষে সমাজকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস চেতনা আর মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান"। কবি ইতিহাস চেতনাকে গ্রহণ করেছেন মূলতঃ বর্তমান পৃথিবীর আত্মিক শূন্যতায় বিভ্রান্ত হয়ে। এই ইতিহাস চেতনা তাঁকে সমাজচেতনার পথে নিয়ে গেছে, অতীত থেকে করেছে ভবিষ্যৎমুখী।

কবি শুধু ধূসর বা রোমান্টিক জগতে স্বপ্ন ও কল্পনায় বিহার করবেন এমন কথা তিনি ভাবতেন না, অন্ততঃ তিনি জীবন ও জীবনের প্রেক্ষিত সম্পর্কে যে কতদূর সজাগ ছিলেন তা এই ১৯৪৬—৪৭ কবিতাটি বলে দেবে।

এই সময়টা অর্থাৎ ১৯৪৬—৪৭ সাল বাঙালীর জীবনে এক বিশেষ রকমের ক্রান্তিকাল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হয়েছে—সেই যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে বিশ্বের সাধারণ মানুষের জীবন বিপর্যস্ত। বাংলার পক্ষে এই সময়টি আবার বিশেষভাবে খারাপ, কারণ

শাসক ইংরেজ সরকার বুঝেছিল যে ভারতবর্ষ থেকে তাদের চলে যেতেই হবে, এই দেশ স্বাধীনতালাভের জন্যে প্রচন্ড আন্দোলনে সামিল। শাসক ইংরেজরা আগে থেকেই হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে Dvivide and Rule নীতি নিয়েছিলেন। এবং ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগষ্ট মুসলিম লীগের নেতা মহম্মদ আলী জিন্নাহ প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবস ঘোষণা করেন, এবং কলকাতায় পরে তা শহরতলি হয়ে ছড়িয়ে পড়ে নানা গ্রামে গঞ্জে। পাকিস্তান আদায়ের জন্যে এই দাঙ্গাকে রাজনৈতিক চেহারা দেওয়া হয়েছিল, দাঙ্গাকে বলা হলো প্রত্যক্ষ সংগ্রাম, দাঙ্গার দিনকে বলা হলো Direct Action Day.

কবি জীবনানন্দ সংবেদনশীল অনুভূতিপ্রবণ মানুষ। একে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পৃথিবীকে প্রায় ধ্বংস করে দিয়েছে—দুর্ভিক্ষ, মন্বন্তর, মহামারী তদুপরি এই দাঙ্গা, ভ্রাতৃহত্যা কবিকে শোকে বেদনায় বিহ্বলতায় আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। মানুষ কি করে এই কু মানবের তৈরি দানবতা থেকে মুক্তি পাবে, কোন পথে আসবে আলো কবি সে প্রশ্ন তুলেছেন। '১৯৪৬—৪৮' কবিতাটি এই পটভূমিতে বিচার করতে হবে।

মানুষের হৃদয়ে সুকুমার বৃত্তিগুলি মরে এসেছে, মায়া মমতা, স্নেহপ্রেম, প্রীতি ভালবাসা অন্তর্হিত হয়েছে, সেখানে এসেছে হিংসা দ্বেষ, অবিশ্বাস ও সন্দেহ প্রবণতা। সে কথা কবি এই কবিতায় ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি। তিনি বলেছেন—"সৃষ্টির মনের কথা মনে হয় দ্বেষ"।

মানুষ মানুষকে হিংসা করছে এর চেয়ে অবক্ষয় আর কী হতে পারে? বিশ্বাস করছি না আমি আপনার ভাইকে। যুগ যুগ ধরে হিন্দু মুসলমান একত্রে ভাইয়ের সোহাগ ও সৌহার্দ্য বিনিময় করে বাস করে এসেছে ; হঠাৎ আজ রাজনীতির কূট চক্রান্তে পরস্পর পরস্পরের প্রতি বিদ্বিষ্ট হয়ে গেল, একে অন্যকে হত্যা করতে দ্বিধা পর্যন্ত করছে না। কবি এই বেদনাময় অনুভূতিতে আপ্লুত হয়ে রাজনৈতিক দুর্বুদ্ধি ও স্বার্থসিদ্ধিকে নিন্দা করেছেন—নিজের হৃদয়ের বেদনা ও সহানুভূতি প্রকাশের মাধ্যমে। স্বার্থপর নিজের সঙ্কীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে মানুষ ও মানবতাকে হত্যা করতে দ্বিধা করে না। কবি বেদনার সঙ্গে তা উচ্চারণ করলেন ঃ

> মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
> ভ'রে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
> ভাই আমি ঃ আমাকে সে কনিষ্ঠের মতো জেনে তবু
> হৃদয়ে কঠিন হয়ে বধ করে গেল, আমি রক্তাক্ত নদীর
> কল্লোলের কাছে শুয়ে অগ্রজ প্রতিম বিমূঢ়কে
> বধ করে ঘুমাতেছি তাহার অপরিমেয় বুকের ভিতরে
> মুখ রেখে মনে হয় জীবনের স্নেহশীল ব্রতী
> সকলকে আলো দেবে মনে করে অগ্রসর হয়ে
> তবুও কোথাও কোনো আলো নেই বলে ঘুমাতেছে।

মানবজাতির এই পাপে কবিও অংশ নেন। মানবলোকে আজ যে অধঃপতন কবির তাতেও অংশগ্রহণ আছে। যাঁরা আলোর লোক নন, যাঁরা মানুষের এই অকল্যাণ বুদ্ধিকে রোধ করতে পারেন না—নিজের অন্তরের বিবেক বোধ জাগ্রত করতে পারেন না, তাদের জন্যেও কবি আক্ষেপ করছেন। কবি এখানে বিশ্বমানবমৈত্রীতে বিশ্বাসী পৃথিবীর পথে নিহত ভাই-এর জন্যে তাঁর বেদনা ; মানুষ স্বার্থসিদ্ধির জন্যে ছোট বড়, আপনপর কিছুই

বিবেচনা না করে শুধু নিজের স্বার্থ সিদ্ধি ঘটাবার জন্যে মানবতাকে বিনষ্ট করলে। মানবিক প্রেমিক দরদী জীবনানন্দ এখানে সম্পূর্ণ রূপে মানুষের ভালবাসায় নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন। কবিতাকে বাস্তব মূর্তি দেবার জন্যে তিনি তাঁর মানব প্রেমকে Abstract করে বা তুরীয় স্তরে রাখেন নি, প্রত্যক্ষ বাস্তব চিত্রের উদ্ভাসে বলেছেন, নিহত ভাইয়ের নাম দিয়ে স্পষ্ট করেছেন, এদের শব মানুষের রক্তে কল্লোলিত হয়ে বয়ে যাওয়া নদীতে ভাসছে। কবি যদি ডাকেন এদের এই নিহত ভাইদের সাংসারিক পরিচয় পাবেন—

ঘুমাতেছে।
যদি ডাকি রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
বলে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—
আর তুমি? আমার বুকের 'পরে হাত রেখে মৃত মুখ থেকে
চোখ তুলে শুধাবে সে রক্তনদী উদ্বেলিত হয়ে
বলে যাবে, 'গগন, বিপিন, শশী, পাথুরেঘাটার,
মানিকতলার, শ্যামবাজারের গ্যালিফ স্ট্রিটের, এন্টালীর'

জীবনানন্দের বাস্তব বোধের প্রাখুর্যে পাঠক চমকিত হন যে কবি রোমান্টিক স্বপ্ন মেদুরতায় অলৌকিক মায়াময় চিত্রার্পিত জগতে পাঠককে নিয়ে যেতেন, সেই কবি ১৯৪৬—৪৭ সালের রাজনৈতিক তরঙ্গে বিক্ষিপ্ত জীবনের ছবি উপহার দিচ্ছেন, অসহায় কিছু মানুষ—যারা রাজনৈতিক মতলববাজ দাদাদের বলি রূপে জীবনে বা সংসারে এসেছে। এরা তো সব ইতর শ্রেণীর মানুষ, জীবনের সুভোগ্য সব কিছু থেকেই বঞ্চিত, ছেঁড়া জুতো পায়ে বাজারের পোকা কাটা জিনিসের কেনা কাটা করে সৃষ্টির প্রেরণায় এঁরা পৃথিবীতে এসেছে। কী গভীর মমতায় কবি এদের কথা বলেছেন—এরা আজ শাঠ্যের, চক্রান্তের বলি, তাদের স্বপ্ন, কথা, কাজ আজ অন্তর্হিত হয়ে গেছে, কেউ নেই কিছু নেই, সূর্য নিভে গেছে।

জীবনানন্দ পল্লী প্রকৃতির চিত্রাঙ্কনে সিদ্ধ হস্ত। পাড়া গাঁর বিশেষ করে পূর্ব বাংলার নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গে তিনি আত্মিক যোগ অনুভব করেন। এই কবিতায় কবি বাংলার সেই গ্রাম ও গ্রামবাসীদের কথা স্মরণ করেছেন। বাংলার লক্ষ লক্ষ গ্রাম নৈরাশ্যের আলো হীনতায় ডুবে আজ নিস্তেজ, নিস্তব্ধ হয়ে পড়েছে। সেখানে আজ আলো নেই। অথচ এই গ্রামগুলি একদা সুহাস্য ছিল। আজ সব নিভে গেছে, আজ সব ছন্নছাড়া। এখানে কত উৎসব হতো, প্রাণচাঞ্চল্যে উচ্ছল ছিল গ্রামবাসী, ঘরে ঘরে হতো নবান্নের উৎসব। অপরিসীম মমতায় কবি তা বর্ণনা করেছেন।

এই খানে নবান্নের ঘ্রাণ ওরা সেদিনও পেয়েছে ;
নতুন চালের রসে রৌদ্রে কত কাক
এ পাড়ার বড়ো মেজো.... ও পাড়ার দুলে বোয়েদের
ডাক শাঁখে উড়ে এসে সুধা খেয়ে যেত ;
এখন টুঁ শব্দ নেই সেই সব কাক পাখিদেরও।

কবির ইতিহাস চেতনার গভীর পরিচয় রয়েছে এই সব পঙক্তিতে পল্লী প্রকৃতির সুহাস্যরূপ, পল্লী জীবনে জমিদারদের অত্যাচার সহ্য করার কথা, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অসুবিধার ঐতিহাসিক সত্যের উল্লেখ কবি করেছেন। তবু পল্লীর সন্ততিদের 'প্রপিতামহের

দল হেসে খেলে ভালবেসে অন্ধকারে' থেকে জীবন কাটিয়ে গেছে। বাংলার বুকে আনন্দের ঔজ্জ্বল্য, জীবনে ছিল উচ্ছলতা, মানুষ অনাবিল আনন্দে দিন কাটাতো—

ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ হতো
ধানের অদ্ভুত রস খেয়ে ফেলে মাঝি বাগদির
ঈশ্বরী মেয়ের সাথে
বিবাহের কিছু আগে—বিবাহের কিছু পরে—সন্তানের জন্মানোর আগে।
সে সব সন্তান আজ এ যুগের কুরাষ্ট্রের মূঢ়
ক্লান্ত লোক সমাজের ভিড়ে চাপা পড়ে
মৃতপ্রায়।

মানুষ আজ অমানুষে পরিণত হয়েছে, বর্তমান যুগের হিংস্র রাজনীতিও রাষ্ট্র ব্যবস্থা এজন্যে দায়ী। অতীত রাষ্ট্র ব্যবস্থা যে আজকের রাষ্ট্রব্যবস্থার চেয়ে খুব ভালো ছিল এমন নয়, তবু অতীতের সমাজনীতির স্পষ্টতার কথা কবি বলেছেন—

ওরা খুব বেশি ছিলো না, তবুও
আজকের মন্বন্তর দাঙ্গা দুঃখ নিরক্ষরতার
অন্ধ শতছিন্ন গ্রাম্য প্রাণীদের চেয়ে
পৃথক আর এক স্পষ্ট জগতের অধিবাসী ছিলো।

এই অতীত গ্রাম্য সমাজ জীবন অপেক্ষা বর্তমান জীবনে শুধু কুয়াশার অস্পষ্টতা, আধুনিক জীবনের অবক্ষয় মানুষের সুস্থ জীবনকে গ্রাস করতে চলেছে, প্রাচীন মূল্যবোধগুলি মানুষ আজ ভুলে গিয়ে একে অপরকে আড়চোখে দেখে এড়িয়ে যায়,

এ যুগে ঢের কম আলো সব দিকে, তবে।
আমরা এ পৃথিবীর বহুদিনকার
কথা কাজ ব্যথা ভুল সংকল্প চিন্তার
মর্যাদায় গড়া কাহিনীর মূল্য নিংড়ে এখন
সঞ্চয় করেছি বাক্য শব্দ ভাষা অনুপম বাচনের রীতি।

বাকসর্বস্ব রাজনীতিবিদদের স্তোক কথার প্রতি কবি বিশ্বাস রাখেন নি, তাঁর শেষ জীবনে তিনি বিশ্বাস করতেন হিংস্র রাজনীতির বলি এই সরল সহজ মানুষগুলি তিনি পৃথিবী থেকে আলো নিভে যাচ্ছে—এই বেদনার কথা তিনি তাঁর শেষ পর্যায়ের কবিতায় বার বার ব্যক্ত করেছেন—"অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ" নামের ছোট আট লাইনের কবিতাটি এই প্রসঙ্গে স্মরণ করা যেতে পারে। যারা মূঢ়, মূর্খ, কল্যাণ বুদ্ধি বিবর্জিত তারাই আজ পৃথিবীর চালক, যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই, প্রীতি নেই, করুণার আলোড়ন নেই তাদের পরামর্শেই রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছে। ফলে হিংস্রতা, পৃথিবীর সব আলো নিভিয়ে দিচ্ছে।

এ যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ার মতো মানুষের বিহুল দেহের
সব দোষ প্রক্ষালিত করে দেয়।

সমাজের এই অন্যায় ও অবক্ষয়ের মধ্যে থেকেও মানুষ কল্যাণবুদ্ধি থেকে বিচ্যুতি হয় নি। কবিও সমাজে অনুষ্ঠিত অমানুষিক হিংস্রতায় ব্যথিত হয়েও দেখছেন—মানুষ

শুভবুদ্ধি-প্রাণিত হয়ে মানবাত্মার মুক্তি ও কল্যাণের জন্যে সংগ্রাম করছে। কবি তাই সমাজের অন্যায় অবিচার দেখেও হতাশ হন নি, প্রচন্ড একটা আশাবাদে তিনি উদ্দীপ্ত হয়ে এক বলিষ্ঠ প্রত্যয় বাণী ঘোষণা করলেন—

> তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
> অন্ধকারে হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
> যে অনবনমনে চলেছে আজো—তার হৃদয়ের
> ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম করে চেতনার
> বলয়ের নিজ গুণ রয়ে গেছে বলে মনে হয়

'১৯৪৬—৪৭' কবিতাটি জীবনানন্দ দাশের সমাজ সচেতনতার এক উজ্জ্বল নিদর্শন। মানুষের পীড়িত নিষ্পেষিত জীবনের প্রতি কবির মমতা ও সহানুভূতি যেমন অপূর্ব কবিত্বময় ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে, তেমনি কবির আশাবাদ ও বলিষ্ঠ প্রত্যয় কবিতাটির শেষে সুন্দর ইঙ্গিতে রূপায়িত হয়েছে। বাঙালী জীবনের এক ক্রান্তিকালের ইতিহাসকে কবি সহানুভূতিশীল মমতাময় ভাষায় ব্যক্ত করেছেন।

জীবনানন্দের দীর্ঘ কবিতা : ১৯৪৬-৪৭

পার্থপ্রিয় বসু

বালির দানার মতো গুঁড়ো গুঁড়ো পুকুরের পানা থেকে বিরাট মেহগিনি সকলেই উদ্ভিদ, সগোত্র। সকলেই এনার্জিকে ম্যাটারে নিয়ে যাচ্ছে। যার যেমন উৎস তার তেমন বাড়। কবিতাও গাছপালার মতো। কবির চিন্তায় ভাবনার ভাণ্ডার যতটুকু, কবিতাও ততটাই লম্বা। কবি কখনো এই ভাণ্ডারের সীমাবদ্ধতা, এর বাইট্-স্পেস জানেন এবং ধারণা মতো লিখতে লিখতে পাতার একটা জায়গায় এসে থামেন, কখনো জানেন না ; লিখতে লিখতে ভাবছেন, বুঝি এই স্তবকে শেষ, কিন্তু এক হাজার আরব্যরজনীর গল্পের মতো ঠিক স্তবকের শেষে একটা নতুন ভাবনামুখ এসে উঁকি দিল, এ ভাবে যতক্ষণ না বাদশা বউয়ের গর্দান নেবার ভাবনা মুছে ফেলেন ততক্ষণ কবিতা বেড়ে চলে। এই লম্বা তালগাছের মতো কবিতাই হল দীর্ঘকবিতা।

রামশ্যামযদুমধু সকলেই এখন এই কবিতা মক্শো করেন। সাময়িক পত্রিকা এই কবিতা দিয়ে বিশেষ সংখ্যা করে। ছবি-আঁকিয়ে এই কবিতার নিচে মোটিফ্ ফুটিয়ে তুলে কবিতার কাঙ্খ্য পরিবেশ আনার চেষ্টা করেন। সেসব কবিতা অনেক সময় কবিতামালা, এক এবং অবিচ্ছিন্ন নয়। অনেক সময় পুরো গপ্পো, টাইট্ল্ মরাল্ সহ কথামালার আখ্যান। আবার পাঠকের বরাত জোরে এদেরই দু একটি সুলিখিত দীর্ঘকবিতাও বটে।

যে কোনো কবিরই দীর্ঘকবিতার সংখ্যা ছোট কবিতার চেয়ে কম। ভাবনার দীর্ঘতা যে কোনো বীজ থেকে উদ্ভিন্ন হতে পারলেও সবার কাছে সব সময়ে তা ঘটে না। ভাবনার তল ভাবনার অতল দেখার মতো সময়ও কবিদের হাতে যে খুব বেশি থাকে তা নয়। তাই ফুলকি হল, রঙমশাল হল, কিংবা চরকি হল, ব্যস্! অন্ধকার আকাশে তারার পাশে পাশে জ্বলতে জ্বলতে চলা আলোর মালা আর কটা [illegible]বাজি হয়ে উঠতে পারে!

দীর্ঘ কবিতার ভাবনা এত প্রোথিত থাকে যে তাকে অনেক গভীরে অঙ্কুরোদ্গম ঘটিয়ে ক্রমশ ধীরে ধীরে উঠে আসতে হয় প্রকাশ্যে কান্ড পাতা ডালপালা ফুল ফলের দিকে। এই ক্রমান্বয়ী বিস্তারই দীর্ঘ কবিতার সম্ভাবনা সূত্র, কবি সেখানে অনেকটা না বললে ভাবনার বীজকে পূর্ণ মাত্রায় প্রকাশ করতে পারেন না। একটা তুলনা করে বলা যায় গল্পকারের কোনো কোনো ভাবনা যেমন ছোট গল্পের তীক্ষ্ণতা, আকস্মিকতা দাবি করে তেমনি কোনো কোনো ভাবনা উপন্যাসের আকার ছাড়া কিছুতেই পুরোপুরি ফুটে ওঠে না।

জীবনানন্দের '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটি পড়লে বোঝা যায়, যে মূল্যবোধের অবক্ষয় ও অস্থিরতার কথা, যে বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বজন-বিরোধের কথা তিনি বলছেন তার দাবি অনেক, যতক্ষণ না তা 'ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার বলয়ের নিজগুণে' পৌঁছচ্ছে ততক্ষণ নিরবচ্ছিন্ন প্রকাশ ছাড়া কবির উপায় নেই। জীবনানন্দ কবিতার নামকরণে সময়কে চিহ্নিত করে ঐতিহাসিক সূত্রের খুঁট ধরিয়ে দিয়েছেন পাঠকের হাতে।

বর্তমান পাঠক নিশ্চয়ই স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পরে সুবর্ণ জয়ন্তীর অন্ধকার ছায়াদের সূচনা সময়কে চিনতে পারছেন কবিতার সারা শরীরে। ওই সন্ধিসময়কে ঠিক কতটুকু বলা হলে পূর্ণ ফুটে ওঠে বলা কঠিন, কিন্তু অস্থিরতার ছবিটুকু স্পষ্ট হয় যখন পড়ি, 'তা হলে মৃত্যুর আগে আলো অন্ন আকাশ নারীকে কিছুটা সুস্থির ভাবে পেলে ভালো হত।'— বোঝা যায় এই আফশোসটুকু ছাড়া অস্থিরতার ছবিটি এতটা দৃশ্য হয়ে উঠতো না। একই ভাবে বাংলার লক্ষ গ্রামের অন্ধকার চাষার নাচের প্রসঙ্গে আরো মূর্ত হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দ এই গ্রামীণ অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে দেন 'অর্ধসত্য'-কে। 'তারপর একা অন্ধকারে বাকি সত্য আঁচ করে নেওয়ার রেওয়াজ রয়ে গেছে'। সমস্ত গ্রামবাংলার সামাজিক অনালোক যেন ফুটে উঠলো এই কথায়, এখানেই কবির সিদ্ধি। কবি কি কবিতাটি এখানেই শেষ করতে পারতেন?

দেখা যাক কবিতার বাকি দৈর্ঘ্য অপরিহার্য ছিল কি না। এরপর তিনি একটি মন্ত্র উচ্চারণ করলেন—'সৃষ্টির মনের কথা মনে হয়—দ্বেষ।' সময়ের অস্থিরতার আর একটা দরজা খুলে গেল। 'দ্বেষ' ছাড়া তখন সম্পূর্ণ হচ্ছে না সৃষ্টি। 'প্রথম জল নিহত প্রাণীর রক্তে লাল', সৃষ্টির শুরুতে এই দ্বেষ থেকে স্বজন-বিরোধের ধারণায় নিয়ে গেলেন কবি, রক্তপাতের কল্লোল শোনালেন। কলকাতা শহরের অলিতে গলিতে মানুষের গায়ে দাগ কেটে কেটে দেখালেন সাধারণ মানুষের ধ্বংস-সূচনা। আবার প্রাণের সন্ধান সূত্রটিও যে ওই অণু জীবনের রোমাঞ্চিত রেণু থেকেই উদ্ভিন্ন হয়, তার সূত্রটিও ধরিয়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে। যেন এনট্রপির অস্থিরতার ভেতর যে অনিশ্চয়তা, সৃষ্টির মুখটিও যে তারই ভেতর গাঁথা তা স্পষ্ট হল।

সৃষ্টির ধারক যেমন জীবন, তেমনি ভাষাও। কিন্তু এরপর জ্ঞান প্রসঙ্গটি যেন একটু প্রক্ষিপ্ত। তবে তার প্রাসঙ্গিকতা স্পষ্ট হয় যখন পড়ি 'বিজ্ঞান তো সংকলিত জিনিসের ভিড় শুধু—বেড়ে যায় শুধু'। সময়ের ভোগবাদী চেহারার সূত্রটি ছাড়া এই সময়ের অসহিষ্ণুতা, অস্থৈর্যকে চেনা যাবে না তা বোঝার সঙ্গে সঙ্গে স্তবকটি যে প্রক্ষিপ্ত নয় সে ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হওয়া গেল।

এরপর জীবনানন্দ সরাসরি সতর্ক করলেন পাঠককে, অনুকরণযোগ্য আদর্শের অভাব ঘটে গেছে এই ছটফটে সময়ের ভেতর, 'কোনো কান্তিময় আলো চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের'। যে অন্ধকার জীবনে জীবনে, সময়ের পর্দায় পর্দায় ছড়ানো তা সৃষ্টির স্নেহশীল মাতৃত্বের মতো, 'মহানুভব ব্যাপ্ত অন্ধকার' কিনা কবির সংশয়। এই সংশয়, প্রশ্নবোধই তাঁকে পথ দেখিয়ে দিল। অস্থিরতার ভেতর জীবনপ্রবাহের গতি যে অন্ধকারকে অতিক্রম করে চেতনার স্তরে তুলে আনে মানুষকে, তা কবির প্রত্যয়ের ভেতর আলোর বাক্যের মতো ফুটে উঠল।

পাঠক এবার একটি লাইনও বাদ দিতে নারাজ ছাপা ৫ পৃষ্ঠার '১৯৪৬-৪৭' কবিতাটি থেকে। এখানেই কবিতাটির দীর্ঘ হওয়ার যুক্তি। বর্তমানে যে সব দীর্ঘ কবিতা আকছারই লেখা হচ্ছে তার কটি অপরিহার্যতার এই প্রত্যয়ে পৌঁছচ্ছে?

গোধূলিসন্ধির নৃত্য ঃ জীবনানন্দ দাশ

দরদালানের ভিড়—পৃথিবীর শেষে
যেইখানে প'ড়ে আছে—শব্দহীন—ভাঙা
সেইখানে উঁচু-উঁচু হরিতকী গাছের পিছনে
হেমন্তের বিকেলের সূর্য গোল—রাঙা—

চুপে-চুপে ডুবে যায়—জ্যোৎস্নায়।
পিপুলের গাছে ব'সে পেঁচা শুধু একা
চেয়ে দ্যাখে ; সোনার বলের মতো সূর্য আর
রুপার ডিমের মতো চাঁদের বিখ্যাত মুখ দেখা।

হরিতকী শাখাদের নিচে যেন হীরের স্ফুলিঙ্গ
আর স্ফটিকের মতো শাদা জলের উল্লাস;
নৃমুণ্ডের আবছায়া—নিস্তব্ধতা—
বাদামী পাতার ঘ্রাণ—মধুকূপী ঘাস।

কয়েকটি নারী যেন ঈশ্বরীর মতো ঃ
পুরুষ তাদের ঃ কৃতকর্ম নবীন ;
খোঁপার ভিতরে চুলে ঃ নরকের নবজাত মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে হংকঙের তৃণ।

সেখানে গোপন জল ম্লান হ'য়ে হীরে হয় ফের,
পাতাদের উৎসরণে কোনো শব্দ নাই ;
তবু তারা টের পায় কামানের স্থবির গর্জনে
বিনষ্ট হতেছে সাংহাই।

সেইখানে যূথচারী কয়েকটি নারী
ঘনিষ্ঠ চাঁদের নিচে চোখ আর চুলের সংকেতে
মেধাবিনী ; দেশ আর বিদেশের পুরুষেরা
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের রক্তে আর উঠিবে না মেতে।

প্রগাঢ় চুম্বন ক্রমে টানিতেছে তাহাদের
তুলোর বালিশে মাথা রেখে আর মানবীয় ঘুমে
স্বাদ নেই : এই নিচু পৃথিবীর মাঠের তরঙ্গ দিয়ে

ওই চূর্ণ ভূখণ্ডের বাতাসে—বরুণে
ক্রূর পথ নিয়ে যায় হরিতকী বনে—জ্যোৎস্নায়।
যুদ্ধ আর বাণিজ্যের বেলোয়ারি রৌদ্রের দিন
শেষ হ'য়ে গেছে সব ; বিনুনিতে নরকের নির্বচন মেঘ,
পায়ের ভঙ্গির নিচে বৃশ্চিক—কর্কট—তুলা—মীন।

কয়েকটি সর্বনাশপন্থী নারী কোথাও এক জঙ্গলের মধ্যে সদ্য জ্যোৎস্নায় নাচ শুরু করেছে। তাদের ঘিরে কয়েকটি নবীন পুরুষ। কবিতাটির 'বিষয়' এইটুকুই—আর কিছু নেই—এখন, এরপর নানা রকম তত্ত্ব-গবেষণা ও মাথার চুল ছেঁড়া যেতে পারে। কিন্তু কবিতাটি এইটুকুই।

যাই হোক, এখানে একটি প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন তুলতে চাই, জীবনানন্দ দাশ ভুল ছন্দ লিখতেন কেন? আমি কিছুতেই এর উত্তর খুঁজে পাই না। ভুল ছন্দের জন্য তাঁর কবিতার কোথাও একটুও ক্ষতি হয় নি, অনেক জায়গায় বরং শব্দবন্ধ গাঢ় হয়েছে, অনেক জায়গায় অবশ্য তেমন সুফল হয় নি, কিন্তু, তিনি ভুল ছন্দ লিখতেন কেন এবং কী করে? 'জ্যোৎস্নায়' এবং 'নিস্তব্ধতা' এই শব্দ দুটির আগে পরে দুটি করে ড্যাশ দিয়ে দুই মাত্রা সরানো হয়েছে, তাতে জ্যোৎস্না ও নিস্তব্ধতা উভয়েই অতীব প্রগাঢ় বিলম্বিত, কিন্তু 'কৃতকর্ম নবীন' ও 'রৌদ্রের দিন' কেন লিখেছিলেন তার কোনো উত্তর নেই। কেননা, তিনি তো অটোম্যাটিক রাইটিং বা মনে যে-রকম শব্দ আসছে ঠিক সেইকরমই লিখে যাবার পক্ষপাতী ছিলেন না। তাঁর প্রতিটি লাইনই অত্যন্ত চিন্তিত রচনা। 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ১৪৪ পাতায় পাণ্ডুলিপির সেই ভয়াবহ ফোটোগ্রাফ স্মরণ করা যাক। একটা কবিতা নিয়ে ও-রকম কাটা-কুটি মানুষের কল্পনাতীত। কবিতা লেখার পর কাটাকুটি হয় কোনো-কোনো শব্দ বদল, ছন্দ আঁট করা, কোনো লাইন বর্জন বা নতুন যোগ করা, এই জন্য। কিন্তু, ও-রকম কাটাকুটি করে, ইচ্ছে করে, কবিতায় ভুল ছন্দ, এলোমেলো বন্ধন, আপনঃভোলা রূপ ফোটাবার প্রয়াস ছিল তাঁর। সুতরাং, জীবনানন্দ দাশকে উদাসীন, আলগা স্বভাবের কবি কিছুতেই মনে করা যায় না। তিনি জানতেন, এইটাই তাঁর প্রতিষ্ঠিত ডিকশন, কবিতায় এক অভিনব এবং অলৌকিক রীতি, এবং তিনি যথেষ্ট পরিশ্রম ও চেষ্টায় তাঁর কবিতাকে এইরকমভাবে প্রস্তুত করতেন। সুতরাং মালার্মে কিংবা এজরা পাউণ্ডের কবিতার মতো কিংবা তাঁর সমসাময়িক এবং আত্মীয় ধরনের কবি ফ্রাঁসিস পঁজ-এর রচনার মতো জীবনানন্দের কবিতার প্রতি শব্দের ব্যাখ্যা বা মানে কিছুতেই খুঁজে পাওয়া যাবে না, খোঁজা উচিতও নয়। স্বদেশী কবিতা সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান খুবই কম, তবু মনে হয়, আধুনিক পৃথিবীর কোনো ভাষাতেই একজন সমসাময়িক শ্রেষ্ঠ কবি ভুল ছন্দ লিখেছেন বারবার, এর আর দ্বিতীয় উদাহরণ নেই।

নিজের কবিতার নানান ব্যাখ্যা সম্পর্কে এই কবি সচেতন। পাঠকের বিচার ও রুচির সঙ্গেও কবিকে যুক্ত থাকতে হবে—এ-কথাও তিনি লিখেছেন। সুতরাং, অতিসচেতনভাবে কবিতাকে পাঠক ও সমালোচকের ধরা-ছোঁয়ার বহু উর্ধ্বে রহস্যময় লোকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছেন তিনি। কবিতার এই রহস্যকে আমরা ভাঙবো না।

ছন্দ অমন আলগা, অথচ মিলের জন্য ভারি লোভ দেখা যায়। যেখানে-সেখানে লাইনের শেষে মিল দিতে চান। মিলের জন্যই এসেছে 'হুণ্ডকাণ্ডের তৃণ', এবং ফট্ করে অন্ধকার ঘরের জানলা খুলে যাবার জন্য লাইনটা উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কবিতার মধ্যে

আবহাওয়া সৃষ্টিতেই তাঁর প্রধান ঝোঁক, শব্দার্থের চেয়ে শব্দের পাশে শব্দের মানিয়ে যাওয়া। এইজন্যই, তাঁর কবিতায় অনেক শব্দের মানে নেই, মানে হয় না, কিন্তু প্রতিটি শব্দই অবধারিত। মিল ছাড়া, তাঁর আর একটি দুর্বলতা হচ্ছে ছোটো অনুপ্রাসের ব্যবহার। অনুপ্রাসের ঝোঁকে যে-শব্দ এসেছে তা অনেক সময়েই নিরর্থক হলেও অভিলষিত। যেমন, এই কবিতায়, 'নরকের নবজাত', 'বাণিজ্যের বেলোয়ারি', 'বিনুনিতে নরকের নির্বচন', 'বাতাসে—বরুণে'। 'আর' কথাটা আছে আটবার, তার মধ্যে আবার একই লাইনে দু-বার—এ-সব দুর্বলতা সমেতও একটা কবিতা কী করে এমন সার্থক হয়ে ওঠে—তার উত্তর কেউ জানবে না।

কবিতার নামের মধ্যে কোনো গভীর অর্থ ঢোকানো তাঁর রীতি নয়। সাধারণত তাঁর নাম থাকে খুব শাদাশিধে, 'হাওয়ার রাত', 'ঘোড়া', 'বুনো হাঁস', 'খেতে প্রান্তরে'—এইসব, অথবা লাইনের আরম্ভ দিয়ে। এখানে, নামের মধ্যে খুব-একটা গভীর ভাব ঢোকাবার চেষ্টা করেছেন। সেদিক দিয়ে অবশ্য এমন কিছু নয়। এই রচনা একটু উচ্চাভিলাষী, একটা বড়ো বিষয়কে নির্ভর করতে চেয়েছেন কিন্তু সেটা অকিঞ্চিৎকর, কবিতাটা সেদিক থেকে উল্লেখযোগ্য নয়। গোধূলিসন্ধি বলতে সভ্যতার সন্ধিক্ষণ, মহাযুদ্ধে কেঁপে উঠছে যে-সভ্যতা, যেখানে রাত্রি আসন্ন—বিষয় হিসেবে এই কথাগুলো শুনতে বড়ো, কিন্তু কবিতায় এ-বিষয় ব্যবহৃত বহু ব্যবহৃত, অনেকটা মূল্যহীন, ও-সব চিন্তা কবির ছেলেমানুষি, এ-কবিতায় নৃত্যই প্রধান। এই কবিতার নাম হওয়া উচিত ছিল শুধু 'নৃত্য'। কারণ, বিষয় হিসেবে তিনি যুদ্ধ এবং সভ্যতার সংকট বেছে নিলেও, তাতে খুবই অস্বস্তি বোধ করেছেন, কবিতায় ঠিক মানাতে পারেন নি, সেইজন্য গোধূলির উল্লেখ মাত্র করে মুহূর্তে চলে গেছেন জ্যোৎস্নায়। জ্যোৎস্নার মধ্যে নাচ যে তাঁর প্রিয় বিষয়। সম্পূর্ণ নাচের উৎসবটাই হচ্ছে জ্যোৎস্নায়, গোধূলিসন্ধি অনেক পিছনে পড়ে রইলো, যুদ্ধের পর পৃথিবী সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে যায় নি।

ঘুমন্ত নারীর বর্ণনা যেমন ভালেরির কবিতায় ফিরে-ফিরে আসে, তেমনি জীবনানন্দের কবিতায় মেয়েদের নাচের উৎসবের কথা বারবার: 'মাঠের নিস্তেজ রোদে নাচ হবে' ('অবসরের গান'), 'ওখানে চাঁদের রাতে প্রান্তরে চাষার নাচ' (১৯৪৬-৪৭)। ওদিকে কামানের গর্জনে বিনষ্ট হয়ে যাচ্ছে সাংহাই, যাক, কয়েকটি নাচের পায়ের ভঙ্গির নিচে পড়ে আছে মানুষের ভাগ্য ও ভবিষ্যৎ, পুরুষরা নিবিড় চুম্বনে সেই নারীদের বিছানায় টেনে নিয়ে গেলেও, ঘুমে আর তৃপ্তি নেই। যেখানে পৃথিবী যুদ্ধের আঘাতে বিধ্বস্ত হয়ে যাচ্ছে—সেখানেও ভেসে যাচ্ছে এই নাচের লহরী। বস্তুত এ-কথাই ঠিক, যুদ্ধে আর পৃথিবীর কিছুই ভাঙতে পারবে না, মানুষের নিজের মধ্যে ধ্বংস শুরু হয়ে গেছে। কবিতার 'বিষয়' এইটুকুই, বাকি সব আবহাওয়া—অর্থাৎ বিষয় বাদ দিয়ে বাকি অংশই কবিতা।

নাচটা হচ্ছে কোথায়—কোনো বিদেশে কি—কেন না 'পৃথিবীর শেষে'। কিন্তু হরিতকী গাছ ভারতবর্ষ ছাড়া পৃথিবীর আর কোথাও আছে কিনা জানি না, বোধহয় নেই, 'হরিতকী' শব্দটায় এমন সংস্কৃত গন্ধ যে মনে হয় এ-সব গাছ খুবই আমাদের নিজস্ব, বাংলাদেশের গোপন অরণ্যে ভিড় করে থাকে। তা ছাড়া কোনো কারণে, জীবনানন্দ বাংলা-দেশকেই পৃথিবীর শেষ বা পৃথিবীর কোণ বলতেন, 'এইসব দিনরাত্রি' কবিতায়ও সে-রকম উল্লেখ আছে।

আট বছর আগের একদিন ঃ জীবনানন্দ দাশ

সুব্রত রুদ্র

শোনা গেল লাসকাটা ঘরে
নিয়ে গেছে তারে ;
কাল রাতে—ফাল্গুনের রাতের আঁধারে
যখন গিয়েছে ডুবে পঞ্চমীর চাঁদ
মরিবার হ'লো তার সাধ ;

বধূ শুয়েছিলো পাশে,—শিশুটিও ছিলো ;
প্রেম ছিলো, আশা ছিলো—জ্যোৎস্নায়—তবু সে দেখিল
কোন ভূত? ঘুম কেন ভেঙে গেল তার?
অথবা হয়নি ঘুম বহুকাল—লাসকাটা ঘরে শুয়ে ঘুমায় এবার।
এই ঘুম চেয়েছিলো বুঝি!
রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার ;
কোনোদিন জাগিবে না আর।

'কোনোদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—'
এই কথা বলেছিলো তারে
চাঁদ ডুবে চ'লে গেলে—অদ্ভুত আঁধারে
যেন তার জানালার ধারে
উটের গ্রীবার মতো কোনো এক নিস্তব্ধতা এসে।

তবুও তো পেঁচা জাগে ;
গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে
আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে।

টের পাই যূথচারী আঁধারের গাঢ় নিরুদ্দেশে
চারিদিকে মশারির ক্ষমাহীন বিরুদ্ধতা ;
মশা তার অন্ধকার সঙ্ঘারামে জেগে থেকে জীবনের স্রোত ভালোবাসে।

রক্তক্লেদ বসা থেকে রৌদ্রে ফের উড়ে যায় মাছি ;
সোনালি রোদের ঢেউয়ে উড়ন্ত কীটের খেলা কতো দেখিয়াছি।

ঘনিষ্ঠ আকাশ যেন—যেন কোন বিকীর্ণ জীবন
অধিকার ক'রে আছে ইহাদের মন ;
দুরন্ত শিশুর হাতে ফড়িঙের ঘন শিহরন
মরণের সাথে লড়িয়াছে ;
চাঁদ ডুবে গেলে পর প্রধান আঁধারে তুমি অশ্বত্থের কাছে
এক গাছা দড়ি হাতে গিয়েছিলে তবু একা-একা ;
যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয়নাকো দেখা
এই জেনে।

অশ্বত্থের শাখা
করেনি কি প্রতিবাদ? জোনাকির ভিড় এসে সোনালি ফুলের স্নিগ্ধ ঝাঁকে
করেনি কি মাখামাখি?
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা এসে
বলেনি কি ঃ 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার!'
জানায়নি পেঁচা এসে এ তুমুল গাঢ় সমাচার?

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ক যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'লো ;
মর্গে কি হৃদয় জুড়োলো
মর্গে—গুমোটে
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

শোনো
তবু এ মৃতের গল্প ; কোনো
নারীর প্রণয়ে ব্যর্থ হয় নাই ;
বিবাহিত জীবনের সাধ
কোথাও রাখেনি কোনো খাদ,
সময়ের উদ্বর্তনে উঠে এসে বধূ
মধু—আর মননের মধু
দিয়েছে জানিতে ;
হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ-জীবন কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই

লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

জানি—তবু জানি
নারীর হৃদয়—প্রেম—শিশু—গৃহ—নয় সবখানি ;
অর্থ নয়, কীর্তি নয়, সচ্ছলতা নয়—
আরো এক বিপন্ন বিস্ময়
আমাদের অন্তর্গত রক্তের ভিতরে
খেলা করে ;
আমাদের ক্লান্ত করে,
ক্লান্ত—ক্লান্ত করে ;
লাসকাটা ঘরে
সেই ক্লান্তি নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

তবু রোজ রাতে আমি চেয়ে দেখি, আহা,
থুরথুরে অন্ধ পেঁচা অশ্বত্থের ডালে ব'সে এসে
চোখ পাল্টায়ে কয় ঃ 'বুড়ি চাঁদ গেছে বুঝি বেনোজলে ভেসে?
চমৎকার!
ধরা যাক দু-একটা ইঁদুর এবার—'

হে প্রগাঢ় পিতামহী, আজো চমৎকার?
আমিও তোমার মতো বুড়ো হবো—বুড়ি চাঁদটারে আমি ক'রে দেবো
কালীদহে বেনোজলে পার;
আমরা দু-জনে মিলে শূন্য ক'রে চ'লে যাবো জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার।

অরবিন্দ গুহ-র লেখা একটি কবিতার কথা মনে পড়ে গেল। কবিতাটির নাম 'লাশকাটা ঘরের নাতিদূরে'। এই কবিতার সঙ্গে জীবনানন্দ দাশের 'আট বছর আগের একদিন' কবিতার কোনো মিল নেই। জীবনানন্দ বরিশালে লাশকাটা ঘরের কাছাকাছি থাকতেন তার সুন্দর ছবি এই কবিতায় আছে। মনে হলো, কবিতাটি পড়া থাকলে বোঝা যাবে বরিশালেই লাশকাটা ঘরের কল্পনা জীবনানন্দের মাথায় এসেছিল। তিনি হয়তো ভাবতেন এখানে যারা লাশ হয়ে আসে তারা কী ভাবে, কেন তারা হঠাৎ লাশ হয়ে যায়, এইসব লাশেদের ঘিরে তাঁর মনে কিছু প্রশ্ন দানা বাঁধছিল তখন ঃ

বরিশালে বিশাল মাঠের মধ্যে টিনের আটচালা—
লাশকাটা ঘর।
সুরকির রাস্তার পাশে মাঠ, তার অন্যদিকে নালা—
মাঠে আমাদের কলস্বর।

কেননা সেখানে আমরা দল বেঁধে গিয়ে খেলাধুলো
করি। যদি লাশকাটা ঘরের এদিকে—
একদিন আমাদের মধ্যবর্তী একজন নুলো
বলেছিল—কখনও হঠাৎ দেখি একটি প্রেতিনীকে?

প্রেত কিংবা প্রেতিনীর দেখা আমরা কেউ কোনদিন
পাইনি। এখানে বলা যাক,
লাশকাটা ঘরে আমরা সংখ্যাহীন নামগোত্রহীন
নতুন-নতুন লাশ দেখেছি। নির্বাক।

দুর্গন্ধে আচ্ছন্ন সেই লাশকাটা ঘরের নাতিদূরে
একজন কবির স্নিগ্ধ বাড়ি।
হ্যাঁ, জীবনানন্দ দাশ—একাধারে গ্রাম্য ও শহুরে,
একাধারে সন্ন্যাসী, সংসারী।

কৃত্তিবাস পত্রিকার সপ্তদশ সংকলন, আশ্বিন ১৩৭০ সালে প্রথম ছাপা হয়েছিল। 'জীবনানন্দের সঙ্গে কথা' শীর্ষক নিবন্ধে ভূমেন্দ্র গুহ লিখেছিলেন একবার : 'কথায় কথায় বরিশালের কথা উঠে পড়ত। বলতেন, তোমার মতো অরবিন্দও আমার কাছে হুটহাট চলে আসত, এমন নিষ্পাপ ভালো-লাগছে-জানান-দেওয়া কথাবার্তা বলত যে কী বলব, তার সঙ্গে আমার খুব বনত...'।

আমি কোনোদিন বরিশালে যাইনি। কিন্তু দেখতে পাই, খুব বৃষ্টি পড়ছে, মাঠের মধ্যে টিনের আটচালা, লাশকাটা ঘর। একটু দূরে জীবনানন্দের বাড়ি। হাওয়ায় ভাসতে ভাসতে বরিশালের নদী আসছে ঝাউগাছ দেখছি আবার বেতবন স্টিমারের জেটি জল আর জল আর জল তারপর মাঠভরা ঘাস ছড়িয়ে আছে দূরে।

রামেন্দ্র দেশমুখ্যের কবিতার বই আলোচনা করতে গিয়ে নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর মন্তব্য ছিল : 'জীবনানন্দ দাশের আত্মঘাতী ক্লান্তি থেকে তিনি (রামেন্দ্র দেশমুখ্য) মুক্ত....'। এ-প্রসঙ্গে তখনই একটু ক্ষুণ্ণ হয়ে জীবনানন্দ লিখলেন : 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'—আমার কবিতার প্রধান আবহাওয়া নয়, কোনোদিনই ছিল বলে মনে পড়ে না। 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'-র অভিযোগ প্রতিষ্ঠা করবার জন্য তিনি লাশকাটা ঘরের কবিতাটি বেছে বের করেছেন। এ কবিতাটি প্রায় ১২/১৪ বছর আগে রচিত হয়েছিল। কবিতাটি subjective নয়, একটা dramatic representation মাত্র ; কবিতাটি পড়লেই তা বোঝা যায়। Hamlet বা Lear বা Macbeth-এর 'আত্মঘাতী ক্লান্তি'-র সঙ্গে শেক্সপীয়রের যা সম্পর্ক, ও-কবিতার ক্লান্তির সঙ্গে লেখকের সম্পর্কটুকুও সেইরকম। কবিতাটিতে subjective note শেষের দিকে ফুটেছে ; কিন্তু সে তো লাশকাটা ঘরের ক্লান্তির বাইরে—অনেক দূরে—প্রকৃতির প্রাচুর্য ও ইতিহাসের প্রাণশক্তির সঙ্গে একাত্ম করে আনন্দিত করে রেখেছে কবিকে। তবু নীরেনবাবু লাশকাটা ঘরের নায়ককে নায়কের স্রষ্টার সঙ্গে ওতপ্রোত ক'রে না জড়িয়ে কবিতাটি আস্বাদ করতে পারেন না মনে হয়। তিনি কি শেক্সপীয়রকে Macbeth বা Bordolph, Dogberry বা Golbs মনে করেন?

তাছাড়া লাশকাটা ঘরের কবিতাটি তো আমার সমগ্র কাব্যের একটি শ্রেষ্ঠ representative হিসেবে গ্রহণ করা যায় না। ঐ কবিতাটির নিকষে আমার সমস্ত কাব্য অধ্যয়ন করতে যাওয়া ভুল।

'আত্মঘাতী ক্লান্তি' বা আজকের যুগের যে কোন রকম ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে হ'লে শুধু 'আশাবাদী মনোভাব' কবচের মতন যে কোনো জ্ঞান-বিজ্ঞানালয় থেকে কিনে আনলে চলবে না। সে মনোভাব আশাবাদী হ'তে পারে, কিন্তু তা আরোপিত ও আড়ষ্ট—স্বাভাবিক ও সার্বজনীন নয়। 'প্রচুর হয়েছে শস্য, কেটে গেছে মরণের ভয়' বালভাষিত, কিন্তু কবিতা নয়; শস্য প্রচুর হলেই কি 'মরণের ভয়' কেটে যায় না আজকের এই জটিল শতাব্দীতে শিশুকে এ-কথা বোঝাবে? নীরেনবাবু হয়তো মনে করেন এরকম কতকগুলো লাইন লিখতে পারলেই কবিতা হয়, আশাবাদী মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায় এবং আত্মঘাতী ক্লান্তির থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব; বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিরও উদয় হয়। কিন্তু স্বর্গের সিঁড়ি এত সোজা নয়।'

এই 'আট বছর আগের একদিন' কবিতা নিয়ে বুদ্ধদেব বসুর বিচার : 'যদি এই অচিকিৎস্য জীবন-ক্লান্তিতেই কবিতার শেষ হ'তো, তাহ'লে এটি এতদূর পর্যন্ত আলোচ্য হ'তো না। কিন্তু ঠিক শেষের ক-লাইনেই আবার আমরা অন্য একটি স্বর শুনলাম—যেন একটি ঢেউ স'রে যেতে-যেতে দ্বিগুণ বেগে ফিরে এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো—কবি ফিরিয়ে আনলেন জরাজীর্ণ প্যাঁচাটাকে, যে আত্মহত্যায় বাধা দিতে পারে নি, কিন্তু জীবিতের কানে অবিরাম জপে যাচ্ছে তার প্রাণসত্তার আদিম আনন্দ। আর এই প্রগাঢ় পিতামহীর দৃষ্টান্তেই কবি উদ্বুদ্ধ হলেন—'আমরা দু'জনে মিলে শূন্য করে চ'লে যাব জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার'—মৃত্যু পার হ'য়ে বেজে উঠলো জীবনের জয়ধ্বনি, আর—সেই সঙ্গে—নির্বোধ ও পাশবিক জীবনের প্রতি চৈতন্যের বিদ্রূপ।'

বুদ্ধদেব বসুর ভাবনার সঙ্গে একমত হওয়া গেল না। এই কবিতাটি পড়ে মনে হয়েছে আমার, এই কবিতার যুবকের আত্মহত্যা ব্যাখ্যার অতীত। ঠিক সেইজন্যেই কবিতাটি উত্তীর্ণ হয়েছে, এইখানেই রহস্যের চাবি। এইজন্যে এতদিন পর্যন্ত কবিতাটির আলোচনা হচ্ছে, এর অভিনবত্ব এইখানেই।

আসলে মনে হয়, জীবনানন্দ নিজে আট বছর একদিনের চরিত্র নন ঠিকই, কিন্তু ভিতরদিক থেকে তিনিই আবার সেই চরিত্র। একটা মানুষ কখন সংসার স্ত্রী সচ্ছলতা প্রকৃতি শিশুপুত্র বেঁচে থাকার টানাপোড়েন সব থাকতেও এইভাবে একা হয়ে যায়? বলেছেন, 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়', কিন্তু কি সেই বিপন্ন বিস্ময়? যা চরিত্রটাকে জীবনের বাইরে নিয়ে গেল? নিজের মতো তার একটা সন্ধান আমরা করতে পারি।

একটু ভিন্ন প্রসঙ্গে হ'লেও অনেক সময় দেখা গেছে যাঁরা ধর্মীয় আধ্যাত্মিকতায় গভীরভাবে বিশ্বাসী তাঁদের কাছে দারা পুত্র পরিবার সব বৃথা মনে হয়। তাঁরা একটা কৌপীনমাত্র অবলম্বন ক'রে বেরিয়ে পড়েন। আমরা সংসারী লোকেরা ভাবি কী পান তাঁরা এই সংসারের সুখ দুঃখ আনন্দ ব্যথা ছেড়ে। অল্পবয়সে আমারও একবার মনে হয়েছিল, এই যে ভালোখাওয়া ভালোপরা সুন্দর সাজগোজ এই যে চারপাশের জীবন, যদি ঈশ্বর-অনুভূতি না-হ'লো তো এসব দিয়ে কী হবে। কী সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে মানুষ থাকে। একটু বড়ো হ'তে সে ঝোঁক কেটে গেল। ঈশ্বরচিন্তা সমাজে ধর্মে ইতিহাসে এতবড়ো জায়গা ক'রে নিয়েছে যে আমরা এই অধ্যাত্মপ্রিয় মানুষদের ভালোবাসি, শ্রদ্ধা

করি।

কিন্তু কখনো কোনো মানুষের কাছে এই সমস্যা যদি দেখা দেয় জীবনকে যেভাবে দেখানো হচ্ছে জীবন মোটেও তা নয়, সে অন্যকিছু, অন্যরকমভাবে তাকে দেখতে হবে, জানতে হবে, বুঝতে হবে—আর পারলে বোঝাতেও হবে। এই বোঝানোর মধ্যে আছে আর্টের কাজ। ১৯৩২ সালে 'আর্টের অত্যাচার' গল্পে (নামকরণ তাঁরই) জীবনানন্দ লিখলেন : 'এখন বয়স তার তেত্রিশ। গত আঠার-কুড়ি বছর ধরে সে কি করেছে? সেই ইস্কুলে থাকতেই সে কবিতা পড়তে শুরু করেছে। সাহিত্য আরম্ভ করেছে, এখনো এ জিনিশটা এমন মারাত্মক হয়ে ওঠে নি, কিন্তু তখন থেকেই অন্য সব মানুষদের সান্ত্বনা হতাশা বিশ্বাস তাদের উৎসব ব্যথা সান্ত্বনা, সান্ত্বনা-শান্তি নিখিলকে যেন তেমন স্পর্শ করতে পারে নি। সর্ববাদিসম্মত মানুষও তাদের পৃথিবীটাকে এমন বেকুব মনে হয়েছে।

তারপর তার মন নিদারুণ ঠাট্টা শিখল, মানুষের আগ্রহ আন্তরিকতা যখন অভ্রভেদী হয়েছে, স্বর্গ পেয়েছে, তখন নিখিলই জানত যে বাস্তবিক তারা কিছুই পায় নি, তাদের মনে সরলতা কী বিসদৃশ, কী বীভৎস! কিন্তু তবুও তাদের জীবন বিসদৃশ সরলতা নিয়ে তারা আনন্দ পেয়েছে, নিখিলের মন তেমন সাধারণ হল না কেন? কেন সে মরণের সঙ্গে মিশে যেতে পারল না ভিড়ের মাঝে ভিড় হয়ে? সফল হয়ে? কিন্তু সাহিত্য মানুষকে ভিড় থেকে টেনে আনে, তারপর ছবি দেখতে বলে, তারপর ছবি আঁকতে বলে। এ সবই কি গভীর অসহ্য।'

গল্পের নিখিল ভাবতো, আছে কি? সেই আবিষ্কারের চোখ : 'কাল ক্রমে দেখল "আছে, সবই আছে, এক-একটা ইশারা এসে তাকে গভীর অন্ধকার রাতে ঘুমের থেকে জাগিয়ে দিয়েছে তারপর বলেছে আমি ছায়া, শুধু কতগুলো এলোমেলো শব্দ, একটা দুঃসাধ্য চিন্তা, তুমি আমাকে সাজিয়ে দাও, গুছিয়ে দাঁড় করার তুমি ছাড়া কেউ তা পারবে না, তোমায় ছাড়ব না।"

এতে মানুষের জীবন অসহ্য হয়ে ওঠে।'

জীবনানন্দ নিজের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে দেখলেন একটা চরিত্র, একজন যদি আর্টের অত্যাচার সইতে না পারে, প্রকাশ করতে না পারে নিজেকে, কেমন হয় তার জীবন। 'আট বছর আগের একদিন' যুবকের মৃত্যুকে এভাবে দেখলে কেমন হয়? খুব ভুল হবে কি? ওইযে নিখিল ভাবতো, সে কাল থেকে স্বাভাবিক জীবনযাপন করবে ব্যারিস্টার কেরানী ব্যাঙ্কচাকুরে যাকিছু একটা হবে, তাহলে তার কোনো কষ্ট থাকবে না। কিন্তু সে পারে কই। কোনো কোনো মানুষ পারে না কিছুতেই স্বাভাবিক গন্ডীবাঁধা জীবন নিয়ে খুশি থাকতে। তাই বিকল্প পথ খুঁজে ফেরে, সে পথ কেমন হবে তাও আগে থাকতে ঠিক করা থাকে না।

জীবনানন্দ নিজে আর্টের অত্যাচার সহ্য করেছেন অজস্র গদ্য পদ্য লিখেছেন আর তাই প্রগাঢ় পিতামহীর সঙ্গে জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শেষ করবার কথা বলেছিলেন। সেইসঙ্গে এক বিপন্ন বিস্ময়ের দরজা খুলে দিয়ে গেছেন আমাদের চোখের সামনে।

জীবনানন্দের 'আকাশলীনা'

সুজিত সরকার

সুরঞ্জনা, অইখানে যেয়োনাকো তুমি,
বোলোনাকো কথা অই যুবকের সাথে ;
ফিরে এসো সুরঞ্জনা :
নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে ;

ফিরে এসো এই মাঠে, ঢেউয়ে ;
ফিরে এসো হৃদয়ে আমার ;
দূর থেকে দূরে—আরো দূরে
যুবকের সাথে তুমি যেয়োনাকো আর।

কী কথা তাহার সাথে? তার সাথে!
আকাশের আড়ালে আকাশে
মৃত্তিকার মতো তুমি আজ :
তার প্রেম ঘাস হ'য়ে আসে।

সুরঞ্জনা,
তোমার হৃদয় আজ ঘাস :
বাতাসের ওপারে বাতাস—
আকাশের ওপারে আকাশ।

জীবনানন্দের কবিতা তাঁরই সমসাময়িক যে দুজন কবি অত্যন্ত গভীরভাবে পড়েছিলেন তাঁরা হলেন বুদ্ধদেব বসু ও সঞ্জয় ভট্টাচার্য। তবু, একথা আমাকে বলতেই হচ্ছে, সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর 'কবি জীবনানন্দ দাশ' গ্রন্থে 'আকাশলীনা' কবিতাটি যেভাবে ব্যাখ্যা করেছিলেন, তা আমি মেনে নিতে পারিনি। কবিতাটি প'ড়ে সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মনে হয়েছে 'কবি তৃপ্ত', 'তোমার হৃদয় আজ ঘাস' বলতে তিনি বুঝেছেন 'যৌনতামুক্ত প্রেম', আর সুরঞ্জনা, তাঁর মতে, 'পৃথিবীর বয়সিনী এক মেয়ে'। আমি কিন্তু এরকম কিছু বুঝিনি, বরং এর উল্টোটাই ভেবেছি। বুদ্ধদেব বসুর কথা চুরি ক'রেই বলছি, আমি পণ্ডিত নই, প্রেমিকমাত্র।

কবিতাটিতে একটিও জটিল শব্দ নেই। যিনি বলেছিলেন 'উপমাই কবিত্ব' এবং কবিতায় 'মতো' শব্দের অত্যধিক ব্যবহার যাঁকে ক'রে তুলেছিল 'শনিবারের চিঠি'র আক্রমণের লক্ষ্য, সেই জীবনানন্দের এই কবিতায় 'মতো' শব্দটি একবার মাত্র ব্যবহৃত হয়েছে—'মৃত্তিকার মতো তুমি আজ'। যেমন অন্যান্য কবিতায়, তেমনই এই কবিতাটিতেও

'নৈশতার প্রতি পক্ষপাত' লক্ষ্য করা যায়। 'নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাতে' জন্ম নিয়েছে এই কবিতা। কবিতাটিকে দেখে যতটা সহজ মনে হয়, ততটা সহজ কিন্তু নয়, কারণ আমরা তো জানি 'সহজ কথা ঠিক ততটা সহজ নয়'।

কবিতাটি প্রথমবার পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনটি প্রশ্ন আমাদের মনে জেগে ওঠে : (ক) 'সুরঞ্জনা' শব্দটি প্রথম স্তবকে কোনো একক লাইনের মর্যাদা পায়নি, কিন্তু শেষ স্তবকে পেলো কেন? (খ) জীবনানন্দ একই লাইনে একবার 'তাহার সাথে', আর একবার 'তার সাথে' বললেন কেন? (গ) 'ঐখানে', 'ঐ যুবকের' না ব'লে 'অইখানে', 'অই যুবকের' বললেন কেন? এরকম ভাবা অত্যন্ত ভুল যে কবিতাটির এমন নির্মাণে কবির কোনো পূর্বপরিকল্পনা ছিল না। কবিতাটি 'সাতটি তারার তিমির' কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা। সুতরাং, না বললেও চলে, এটি জীবনানন্দের কবিজীবনের পরিণত পর্বের কবিতা। তিনটি প্রশ্নের উত্তর বের করতে পারলেই কবিতাটির অনেক ভিতরে পৌঁছানো যাবে।

কবিতাটির নাম থেকেই আমরা বুঝতে পারি যে এই কবিতা এক নারীর উদ্দেশে রচিত। আকাশে লীন হয়ে গেছে যে নারী, সেই আকাশলীনা। কিন্তু আকাশে লীন হওয়া কি সম্ভব? আমরা যে আকাশ দেখি, সেটাই তো সমস্ত আকাশ নয়, তারও পরে অনেক আকাশ রয়ে গেছে। একটি পাখি উড়তে উড়তে যখন দূর আকাশে বিলীন হয়ে যায় তখন কিন্তু সে সত্যসত্যই বিলীন হয় না, আমাদের দৃষ্টির বাইরে অন্য এক আকাশের নীচে চ'লে যায়। কবিতার শেষ লাইনে বলাও আছে 'আকাশের ওপারে আকাশ'। কোথায় চ'লে গেছে সুরঞ্জনা? 'অইখানে'। কার সঙ্গে গেছে সে? 'অই যুবকের সঙ্গে'। ওয়র্ড্স্‌ওয়র্থ পাহাড়ের অনেক ওপর থেকে নীচে, উপত্যকায়, এক নির্জন শস্যকর্তনকারিনীকে দেখেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন 'you solitary Highland Lass'। দূরত্ব বোঝাতেই তিনি 'that'-এর পরিবর্তে 'You' ব্যবহার করেছিলেন। দূরত্ব বোঝাতেই জীবনানন্দও 'ঐ'-এর পরিবর্তে 'অই' ব্যবহার করেছেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে,. জীবনানন্দ ইংরাজীর অধ্যপক ছিলেন। 'ঐ' না ব'লে 'অই' বলাতে এক অজানা অস্পষ্ট সুদূরের প্রতি ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়, বোঝা যায় সুরঞ্জনা যেখানে গেছে সেই জায়গাটি যথেষ্ট দূর এবং সেই জায়গাটি ও সেই যুবকটি কবির অপরিচিত। দ্বিতীয় স্তবকের তৃতীয় লাইনে 'দূর' শব্দটি যে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে তা শুধুই দূরত্ব বোঝানোর জন্য নয়, অন্য একটি কারণও রয়েছে। সুরঞ্জনা কী কী ছেড়ে গেছে? (১) নক্ষত্রের রুপালি আগুন ভরা রাত (২) মাঠ (৩) কবির হৃদয়। তাই, 'দূর' শব্দটিও তিনবার এসেছে। 'ফিরে এসো'-ও সেই একই কারণে তিনবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম স্তবকে কবি বলেছিলেন 'যেয়োনাকো তুমি', কিন্তু দ্বিতীয় স্তবকের শেষ লাইনে বলেছেন 'যেয়োনাকো আর'। বলার সঙ্গে সঙ্গেই বোঝা গেল, সুরঞ্জনা কবির কথা শোনে নি। সে চ'লে যাচ্ছে। যাবেই। তাই প্রথম দুটি স্তবকে 'ফিরে এসো' বারবার বলা হলেও শেষ দুই স্তবকে কবির আর কোনো অনুরোধ নেই। সুরঞ্জনা চ'লে গেল, আর তারপর, যা অনিবার্য ছিল, তা-ই হ'ল। সুরঞ্জনা যুবকটির সঙ্গে শারীরিকভাবে মিলিত হ'ল। 'মৃত্তিকার মতো তুমি আজঃ/তার প্রেম ঘাস হয়ে আসে'—লাইন দুটির মাধ্যমে এই শারীরিক মিলনের ছবিটি সুন্দরভাবে ধরা পড়েছে। কিন্তু কবিকে 'ঘাস' ও 'মৃত্তিকা'র সাহায্যে কেন শারীরিক মিলনের ব্যাপারটি ফুটিয়ে তুলতে হ'লো? যেহেতু তিনি মাঠে দাঁড়িয়ে আছেন। সুরঞ্জনা ও ঐ যুবকটির শারীরিক নৈকট্য বোঝাতে তাই খুব সঙ্গত কারণেই ঘাস ও মাটির নিবিড় সম্পর্কের ছবি উঠে এসেছে কবিতাটির মধ্যে। 'তাহার সাথে' বলার মাধ্যমে কবির সঙ্গে যুবকটির অপরিচয়ের দূরত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিন্তু

পরমুহূর্তেই কবির মনে হয়, যুবকটি তার অপরিচিত হ'লেও সুরঞ্জনার খুবই পরিচিত। তাই, 'তার সাথে' ঐ একই লাইনে জায়গা ক'রে নেয়। অন্য একটি কারণও থাকতে পারে। 'কী কথা তাহার সাথে'-এর পর একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন এবং 'তার সাথে'-এর পর একটি বিস্ময়সূচক চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। কবি হয়তো জানবার জন্য কৌতূহলী হয়ে উঠেছেন যে সুরঞ্জনার কী এমন কথা থাকতে পারে ঐ যুবকটির সঙ্গে, কিন্তু পরমুহূর্তেই ভেবে অবাক হচ্ছেন তাঁর ভালোবাসার নারী অবশেষে কিনা অতি সাধারণ এক যুবকের সঙ্গে কথা বলতে বলতে চ'লে যাচ্ছে! 'তাহার'-এর পর 'তার'-এর ব্যবহারের দ্বারা যুবকটির প্রতি কবির তাচ্ছিল্য প্রকাশ পেয়েছে। 'সুরঞ্জনা' প্রথম স্তবকে কোনো একক লাইনের মর্যাদা পায়নি কারণ কবি তো তাঁকে নিজের ব'লেই জানতেন, নিজের জীবন থেকে আলাদা ক'রে কখনও তো তাঁকে ভাবেননি, কিন্তু সহসাই তিনি টের পেলেন, সুরঞ্জনা তাঁর নয়, অন্যের। এই সুরঞ্জনা অন্য এক নারী, তাঁর চেনা সেই সুরঞ্জনা নয়। তাই অন্তিম স্তবকে 'সুরঞ্জনা' একক লাইনের মর্যাদা পায়। ইংরাজীতে একটি অলংকার আছে, যার নাম Euphemism। এই অলংকারের মাধ্যমে 'disagreeable' কোনো কিছুকে 'agreeable' ক'রে প্রকাশ করা হয়। পাঠক নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এখানে 'মর্যাদা' শব্দটির মাধ্যমে আমি Euphemism-কেই প্রয়োগ করতে চেয়েছি। সঞ্জয় ভট্টাচার্য লক্ষ্য করেছেন, কবিতাটির পরিণতি ঘটেছে সুরঞ্জনার 'যৌনতামুক্ত প্রেম'-এর এবং জীবনানন্দের তৃপ্তিতে। আমি কিন্তু শেষ স্তবকে 'ঘাস', 'বাতাস' ও 'আকাশ'-এর অন্ত্যমিলে জীবনানন্দের দীর্ঘশ্বাসই শুনতে পেয়েছি।

শঙ্খমালা ঃ জীবনানন্দ দাশ

রফিক উল ইসলাম

কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে
সে কে এক নারী এসে ডাকিল আমারে,
বলিল, তোমারে চাই ঃ
বেতের ফলের মতো নীলাভ ব্যথিত তোমার দুই চোখ
খুঁজেছি নক্ষত্রে আসি—কুয়াশার পাখনায়—
সন্ধ্যার নদীর জলে নামে যে আলোক
জোনাকির দেহ হতে—খুঁজেছি তোমারে সেইখানে—
ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকারে
ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে
সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।

দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা ;
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা—
বাঁকা চাঁদ থাকে যার মাথার উপর,
শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ শোনে যার স্বর।

কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম ;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে ঃ দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।

চোখে তার
যেন শত শতাব্দীর নীল অন্ধকার।
স্তন তার
করুণ শঙ্খের মতো—দুধে আর্দ্র—কবেকার শঙ্খিনীমালার!
এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর।

'মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো ; কবিতা লিখবার পথে কিছু দূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার

কাছে।'—'পূর্বাশা', কার্তিক ১৩৫৩ সংখ্যায় প্রকাশিত কবিতা-সম্পর্কিত একটি নিবন্ধে জীবনানন্দ নিজেই একথা জানিয়েছেন। জীবনানন্দের কবিতা বুঝবার পক্ষে 'মহাবিশ্বলোকের ইশারা' এবং 'সময়চেতনা' এই শব্দবন্ধদুটি আমার কাছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। তিনি ছিলেন খাঁটি কবি, নির্জনতার কবি। তাই শব্দের মূল্যবোধের আভা তাঁর কবিতায় নিয়ত নিরূপকরূপে চিহ্নিত হয়ে আছে। এক অনাড়ম্বর ঘরোয়া ভাষায় কবিতা লিখতেন তিনি। যেখানে ' প্রত্যেকটি অক্ষর, প্রত্যেকটি শব্দপ্রয়োগ, প্রতিটি ছত্র কত দীর্ঘ কালের অনির্বচনীয় অপরিমেয় শক্তির বিকাশ! তাহা অন্যান্য কথাবার্তা বা কাজকর্মের মতো ক্ষণিকের প্রয়োজনজনিত নহে' (কল্লোল, ভাদ্র ১৩৩১)। জীবনানন্দের কবিতা পড়তে যাওয়ার আগে এই সামান্য নিবেদনটুকু আসলে নিজের সংগে বোঝাপড়া করে নেওয়া, খানিকটা মানসিক প্রস্তুতি অর্জন করে ফেলা।

'শঙ্খমালা' কবিতাটির প্রকাশকাল ১৩৪৩, 'কবিতা' পত্রিকার আষাঢ় সংখ্যায় মুদ্রিত এবং 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের (প্রথম প্রকাশ ঃ ১৩৪৯) অন্তর্গত। ১৯৩৬-৩৭ সালে একবছরের কিছু বেশি সময় ধরে অর্থাৎ পৌষ ১৩৪২ থেকে চৈত্র ১৩৪৩-এর মধ্যে 'কবিতা' পত্রিকার ছ'টি সংখ্যায় জীবনানন্দের নতুন বারোটি কবিতা ছাপা হয়েছিল 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের। তার অন্যতম একটি 'শঙ্খমালা'।

'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের মূল সুর—প্রেম-বিরহ। এই কাব্যগ্রন্থের মূল প্রেমিকারাও প্রায় সবাই পুরো নামে আমাদের কাছে প্রকাশিত। যেমন বনলতা সেন, অরুনিমা সান্যাল, শেফালিকা বোস ইত্যাদি। মাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে এইসব প্রেমিকারা রহস্যের বাতাবরণে সমাহিত। কোথাও রহস্যময়ী, কোথাও আলোর মতো রহস্যময়ী, সহোদরার মতো রহস্যময়ী, কোথাও তাদের নগ্ন নির্জন হাতের স্পর্শ, কখনো আবার রূপকথার জগতের শঙ্খমালা। এইসব ইঙ্গিতারা তাদের কোমলতা, মেদুরতা, উত্তাপ, বেদনা নিয়ে কখনো সুদূরের কখনো বা সংশ্লিষ্ট হয়ে আছে। আর তৃষিত, অনুসন্ধানরত কবি নিরবিচ্ছিন্ন খুঁজে চলেছেন সন্ধ্যেবেলার মেঠো পথে কিংবা অঘ্রাণের অন্ধকার ধানক্ষেতে, 'ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে'। এখানে 'ধূসর' শব্দটির ভিতর বিচ্ছেদ আর বেদনার সুর জাগরিত। যেমন 'অন্ধকার' ঘোষণা করে সুদূরকালের এক মৃত্যুর দিকে তাঁর যাত্রা। খণ্ডিত সময়কে আরো ভেঙে ভেঙে, 'নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে'। এই সেই নির্জনতা, যা একাকীত্বের সাক্ষ্য বহন করে। সন্ধ্যেবেলার মেঠো পথ, কার্তিকের ধানক্ষেত, সরু সরু কালো ডালপালা মুখে নিয়ে মাঝরাত্রির চাঁদ আমাদের ইতিপূর্বে চিনিয়েছেন কবি। তেমনি আমরা জেনেছি মেঘের দুপুর, আর সোনালি ডানার চিল উড়ে উড়ে কেমন করে কাঁদে ধানসিড়ি নদীটির পাশে। আর সেই কান্নায় 'বেতের ফলের মতো তার ম্লান চোখ মনে আসে'। এই কবিতাটিতে চিল নয়, কবি কখনো 'ধূসর পেঁচা' কখনো 'নির্জন পেঁচা'য় সমর্পিত।

> 'ধূসর পেঁচার মতো ডানা মেলে অঘ্রাণের অন্ধকারে
> ধানসিড়ি বেয়ে বেয়ে
> সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে
> তোমারে খুঁজেছি আমি নির্জন পেঁচার মতো প্রাণে।'

দিনের আলো নয়, অন্ধকারের ঐশ্বর্যই কবিকে পথ চেনায়, উড়িয়ে নিয়ে চলে। 'কান্তারের পথ ছেড়ে সন্ধ্যার আঁধারে'যে নারী, যে রূপকথার নারী একদিন নিবেদন করেছিল নিজেকে, কোথায় হারিয়ে গেল সে! শুধু ভেসে আছে 'বেতের ফলের মতো নীলাভ

ব্যথিত' তার দুটি চোখ। কবি খুঁজছেন নক্ষত্রে, নদীজলে বিচ্ছুরিত জোনাকির আলোয় আর অঘ্রাণের অন্ধকারে ধানসিড়ি নদীটির পাড়ে পাড়ে 'সোনার সিঁড়ির মতো ধানে আর ধানে'। কুয়াশা যেমন অস্পষ্ট আর দিক্‌হীনতায় আক্রান্ত, কবিও তেমনই। ঐ অস্পষ্ট দিক্‌চিহ্নহীন ডানাটুকুই একমাত্র সম্বল তাঁর। কবি বলছেন 'কুয়াশার পাখনা'। অর্থাৎ ঠিক ওড়া নয়, কুয়াশার পাখনা জুড়ে সন্তরণ। যেন ধানসিড়ি নদীটির পাড়ে রোপিত হয়ে আছে সব আনন্দক্ষণের স্মৃতি। যেন শঙ্খমালা জন্মান্তরিত হয়ে আছে ধান আর ধানের ভিতর ; অবারিত প্রকৃতির ভিতর। তার ম্লান, ব্যথিত চোখদুটি যেন সন্ধ্যার নক্ষত্রে স্থাপিত হয়ে আছে। সেসব অন্বেষণে কুয়াশার পাখনায় ভর করে আছেন কবি। 'সিঁড়ি' শব্দটি কি এখানে উচ্চতা জ্ঞাপক কোন দ্যোতনা বহন করে? আর 'ধানসিড়ি'? 'ঝালকাঠী থেকে রাজাপুর পর্যন্ত ধানসিড়ি নদী এখন ভরাট হয়ে খালে পরিণত হয়েছে। পূর্বে এ নদী দিয়ে স্টিমার যাতায়াত করত। বরিশালের বিখ্যাত কবি জীবনানন্দ দাশ এ ধানসিড়ি নদী নিয়ে কবিতা লিখেছেন।' (বরিশালের ইতিহাস/সিরাজউদ্দিন আহমেদ)

রূপকথার ধূসর নগরীর এইসব অপরূপ কন্যারা নিয়ত তাড়িত করেছে কবিকে। 'নক্ষত্র মাখা রাত্রির কালো দিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মতো' কবি তাদের খুঁজেছেন। শঙ্খমালাকেও অবশেষে খুঁজে পেয়েছেন তিনি। সন্ধ্যার অন্ধকারে নীড়ে ফেরা বিমর্ষ পাখির রঙ ছেয়ে আছে তার শরীরে।

'দেখিলাম দেহ তার বিমর্ষ পাখির রঙে ভরা ;
সন্ধ্যার আঁধারে ভিজে শিরীষের ডালে যেই পাখি দেয় ধরা'—

এ নীড় পরিপূর্ণ তৃপ্তির ইঙ্গিত বহন করে না। কেননা শিরীষের ডাল সিক্ত হয়ে আছে, হয়তো কুয়াশাপতনে নয়তো কোন অকালবৃষ্টি বিমর্ষ পাখিটির নীড় সিক্ত করে তুলেছে। শুধু মাথার উপর শিঙের মতন বাঁকা নীল চাঁদ একমাত্র সাক্ষী হয়ে আছে। এমনই অতিপ্রাকৃত শঙ্খমালার রূপ, এমনই অতিপ্রাকৃত এই দেখা-হওয়ার ক্ষণলগ্নটি। বাঁকা নীল চাঁদ শ্রবণ করছে যে পাখিটির স্বর, তার নীড় স্বস্তির নয় আজ। আর তার বিমর্ষতা ছেয়ে আছে শঙ্খমালার শরীর! হঠাৎ একরাশ ভয় জড়ো হয় বুকের ভেতর—শঙ্খমালা কোথায় তবে? এর স্পষ্ট উত্তর খুঁজে পাবো পরবর্তী স্তবকে :

'কড়ির মতন শাদা মুখ তার,
দুইখানা হাত তার হিম ;
চোখে তার হিজল কাঠের রক্তিম
চিতা জ্বলে : দখিন শিয়রে মাথা শঙ্খমালা যেন পুড়ে যায়
সে আগুনে হায়।'

ভয় পরিণত হয় সত্যে। স্পষ্ট দেখতে পাই, দক্ষিণ শিয়রে শুয়ে শঙ্খমালা পুড়ে যাচ্ছে দাহের আগুনে। রক্তহীনতায় শাদা হয়ে আছে তার মুখ, দুই হাত থেকে ঝরে গেছে যাবতীয় উষ্ণতা। শুধু রক্তিম হিজল কাঠের মতন সামান্য অনুরাগ ভেসে আছে তার চোখদুটিতে। অল্প পরেই ধিকিধিকি জ্বলে উঠবে চিতার আগুন। যেটুকু অবশিষ্ট, তাও স্মৃতি হয়ে যাবে। কবি কি নিজেই উপস্থিত ছিলেন এই দাহস্থলে? আর তাঁকে ঘিরে আছে শ্মশান পুড়িয়ে ফেরা সেইসব মানুষজনের অবয়ব! আবছা অন্ধকার বিদীর্ণ করা সেইসব মুখ শরীর, ফেরার পথে মদের নাকি তাড়ির ঠেকের নিশ্চিন্ত আশ্রয়ে অবশেষ স্মৃতিচিহ্নটুকু বিলীন করে দেওয়া। প্রত্যক্ষতার সূত্রে এমন আশ্রয় কি কখনো সান্ত্বনা দিয়েছে কবিকে?

এ প্রশ্ন বারংবার অনুসন্ধিৎসু করে তোলে আমাদের। শঙ্খমালা পুড়ে যাচ্ছে দাহের আগুনে, তবুও করুণ শঙ্খের মতো তার স্তন দুধে আর্দ্র হয়ে আছে। 'দুধে আর্দ্র স্তন' নিশ্চয়ই অপূর্ণ বাসনার প্রতীক। নিঃশেষিত হবার আগে এই আর্দ্রতা আমাদেরকে অস্থির করে তোলে।

কাকে পুড়িয়ে এসেছিলেন কবি? সে কি কিশোরী প্রেমিকা কেউ? যার কথা লিখতে গিয়ে কবি একদা লিখেছিলেন—'আমার হৃদয়ে যে গো শঙ্খমালা কিশোরীটি বাঁধিতে আসিয়ছিল ঘর'। সে ঘর বাঁধা হয়নি তার! তবে সে কি বধূ ছিলো কারো? পরস্ত্রী? এইসব প্রশ্নাবলীর সামান্য নির্ণয় আর দাহকর্মে কবির প্রত্যক্ষতার অনুসঙ্গ আমরা পেয়ে যাই অন্য একটি কবিতার খসড়াতে। প্রসঙ্গত উল্লেখ করি :

'এই চরে—এই নদীটির পাশে—অই আম হিজলের বনে
তখন ছিল না ডোম বস্তিটা—পাড়াগাঁর আমরা কজনে
একদিন জ্যোৎস্নায়—অঘ্রাণের জ্যোৎস্নায়—আজও পড়ে মনে

মাস্টারের সেই মৃতা স্বর্ণলতা, আহা সেই আলোকলতারে
সোনার চিতার মতো, চিতল মৃগীর মতো রূপসীরে নদীটির পারে
পোড়ায়েছি : এত ব্যথা পাই নাই কোনো দিন শবের সৎকারে.....'

সহস্র কাজের ভিড় অতিক্রম করে কবি ঘুরছেন, খুঁজছেন তাকে। 'এ পৃথিবী একবার পায় তারে, পায় নাকো আর'। পৃথিবী একবারই পেয়েছিল তাকে ; কবি কিন্তু পেয়ে যান বারংবার—'এক তারা ফুটিলেই রূপসী প্রেতিনী সেই দেখা দেয় মাঠের বাতাসে'। এ রকমের অজস্র অন্বেষণ থেকে বারংবার খুঁজে পাওয়া যাবে শঙ্খমালাদের। শেষ যাত্রীদল পার হয়ে গেছে, পাটনীও ফিরে গেছে নৌকো ফেলে রেখে, একাই দাঁড়িয়ে আছেন কবি। পারাপারহীন নির্জনতা গ্রাস করছে চতুর্দিক ; কবি কামনা করছেন—'পাটনী চলিয়া যায়—আমি দেখা চাই প্রেতিনীর'।

শঙ্খমালার বেশ কয়েকটি ইঙ্গিত ছড়ানো আছে 'রূপসী বাংলা'র কবিতাতেও। এ থেকে স্পষ্ট, এই নারী শুধুমাত্র রূপকথার নারী নয় ; মানবী। যেমন :

১. 'শঙ্খমালা নাম তার : এ বিশাল পৃথিবীর কোনো নদী ঘাসে
তারে আর খুঁজে তুমি পাবে নাকো—বিশালক্ষী দিয়েছিল বর
তাই সে জন্মেছে নীল বাংলার ঘাস আর ধানের ভিতর।'
(রূপসী বাংলা/২৮ সংখ্যক কবিতা)

২. 'বহু—বহু দিন আগে—যেইখানে শঙ্খমালা কাঁথা বুনিয়াছে
সে কত শতাব্দী আগে মাছরাঙা-ঝিলমিল—এঁকেছে কড়ির ঘর'
(রূপসী বাংলা/৩২ সংখ্যক কবিতা)

এ কাব্যগ্রন্থটির ৫ এবং ১৩ সংখ্যক কবিতাতেও আমরা লক্ষ্য করেছি প্রত্যক্ষ দাহকথা :

'ধানসিড়িটির সাথে বাংলার শ্মশানের দিকে যাব বয়ে...
যেইখানে কস্তাপেড়ে শাড়ি পরে কোনো এক সুন্দরীর শব
চন্দন চিতায় চড়ে—আমের শাখায় শুক ভুলে যায় কথা'

এখানেও একটি কবিতাতে আমরা পেয়ে গেছি 'করুণ শঙ্খের মতো স্তন' চিত্রকল্পটি

(৩৯ সংখ্যক কবিতা)। অর্থাৎ এইসব নারীরা কবিতা/কাব্যগ্রন্থের বলয় অতিক্রম করে সমগ্রতায় ছড়িয়ে আছে।

পৃথিবীর শান্ত হিমঘরের আস্তরণ ভেঙে ভেঙে এইসব অপরূপ মনের সন্ধানেই কবির নির্জন অন্বেষণ। কখনো বনলতা সেনের মধ্য দিয়ে, কখনো অরুনিমা সান্যাল, শেফালিকা বোসের মধ্য দিয়ে ; কখনো আবার শঙ্খমালা কিংবা চন্দ্রমালার মধ্য দিয়ে। যেন এক দীর্ঘ যাত্রার ভেতর অ-শরীরী প্রেমের যথার্থ স্বপ্ন—অনুসন্ধান, প্রেতের মতন দিগ্বিদিক ডানা মেলে। এই দীর্ঘ যাত্রায় 'শঙ্খমালা' একটি খণ্ডিত স্বপ্নমুহূর্ত মাত্র। এ যাত্রার শুরু বহুকালের অতীত, পরিসমাপ্তি নেই কোথাও। কখনো মানবী সত্তা থেকে প্রেতিনী সত্তার অভিমুখে, কখনো প্রেতিনী সত্তা থেকে আবার মানবিক সত্তায়—এই দোলাচলের ভিতর কবির অন্বেষণ বর্ণময় আলো ফেলে। আর কবির সমগ্র যাত্রা পথ জুড়ে ছড়িয়ে থাকে মহাবিশ্বলোকের ইশারা থেকে উৎসারিত সেই দ্বন্দ্বময় সময়চেতনা, যা মুহূর্তের মধ্য দিয়ে বিকশিত হলেও, আপন দক্ষতায় সর্বকালের হয়ে ওঠে।



রবীন্দ্রনাথ ও জীবনানন্দ ঃ দু-জন অসবর্ণ কবি

নিরুপম চট্টোপাধ্যায়

শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু তাঁর আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলন* শুরু করেছেন রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে এবং এই সংকলনে সংখ্যা এবং বিস্তারে রবীন্দ্রনাথের কবিতাই সবচেয়ে প্রধান। উদ্দেশ্যে এবং চরিত্রে এই সংকলনকর্ম যদি Oxford Book of English Verse-এর তুল্য হত তাহলে এই প্রাধান্য খুবই সংগত হত, সন্দেহ নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে সংকলনটি নেহাৎই আধুনিক, বাংলা কবিতার যে-কালটি এতে বিধৃত করার চেষ্টা হয়েছে তা আধুনিক কাল। স্পষ্টতই, শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর মতে, রবীন্দ্রনাথ প্রথম আধুনিক, এবং আধুনিক বাংলা কাব্যের চূড়াও তাঁর কবিতা স্পর্শ ক'রে গেছে।

এই মতে অনেকেই সায় দেবেন, সন্দেহ নেই। কেননা, রবীন্দ্রনাথ আধুনিকদের অগ্রগণ্য, রবীন্দ্রনাথের পর প্রথম নতুন রবীন্দ্রনাথ নিজে, এ-জাতীয় উক্তি আমাদের সাহিত্য-সমালোচনায় স্বতঃসিদ্ধ বলে গ্রাহ্য হয়েছে। কিন্তু সমালোচনার ক্ষেত্রে যেহেতু কোনো স্বতঃসিদ্ধ থাকা উচিত নয়,এ-জাতীয় সকল সিদ্ধান্তেরই যেহেতু নিয়মিত পর্যালোচনা হিতকারী, এই উপলক্ষ্যে রবীন্দ্রনাথের আধুনিকতার বিচার আশা করি হঠকারিতা হবে না।

আমরা যে-সময়ে জন্মগ্রহণ করি, শুনেছি তখন থেকে বাংলা সাহিত্যে নতুন হাওয়া বইতে শুরু করে। 'প্রগতি' ও 'কল্লোলে'র পাতায় রবীন্দ্র-ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা ক'রে এবং 'রবীন্দ্রপ্রভাব-মুক্ত' হবার চেষ্টা ক'রে তার আরম্ভ। আজ পঁচিশ বছর পরে আধুনিক বাংলা কবিতার সংকলনটি হাতে নিয়ে তাই খটকা লাগে। এর সম্পাদক একদা সেই বিদ্রোহের নান্দীপাঠ করেছিলেন। আজ তাহলে হয় বিদ্রোহের অবসান হয়েছে, সেদিনের তরুণ কবিরা উপলব্ধি করেছেন রবীন্দ্রনাথের পর বাংলা কাব্যে যে নতুন সুর তাঁরা বাজাবার চেষ্টা করেছিলেন তা আসলে মূল সুরেরই উদারা তারা। অথবা এই বিদ্রোহ একদিন রবীন্দ্রনাথকে দলে টানতে পেরেছিল।

আমরা যদি রবীন্দ্র-রচনার অবিভেদ স্বীকার করি, যদি মনে করি জীবনদৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু অবিচল ঋজুতার পরিচয় দিয়েছেন, তাহলে তাঁকে এই সংকলনে স্থান দেয়া মানে আধুনিকতার চরিত্রটিকে অস্বীকার করা। কেননা, জীবনদৃষ্টির পার্থক্যই আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলনকে সে-কালে অনিবার্য ক'রে তুলেছিল। অপর পক্ষে, যদি শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসুর মত মেনে নিই যে রবীন্দ্রনাথ নিজে বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেন এবং তার পুরোভাগে এসে দাঁড়ান তাহলে ধ'রে নিতে হয় যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাচীন ঐতিহ্যকে অস্বীকার ক'রে এই সময় থেকে নতুন ধারায় কবিতা লিখতে শুরু করেন।

---

* আধুনিক বাংলা কবিতা। বুদ্ধদেব বসু সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ : ফাল্গুন ১৩৬২। সাড়েপাঁচ টাকা।

এই দ্বিতীয় মতটির বিচার ক'রে দেখা যাক। 'লিপিকা' ও তৎপরবর্তী গ্রন্থে যে রবীন্দ্রনাথের রচনা মোড় নিয়েছে তা যে-কোনো পাঠকেরই নজরে পড়বে ; এই সব রচনায় আধুনিকতার অনেক গৌণ লক্ষণ উপস্থিত ঃ কাব্যের বিশিষ্ট ভাষা এখানে উপস্থিত হয়েছে, ক্ষুদ্র ও সামান্য বস্তুকে কাব্যের উপাদানের মর্যাদা রবীন্দ্রনাথ দিয়েছেন, গদ্য রীতির আসন কায়েম হয়েছে। বর্তমান কালের জীবনও এই কাব্যে অধিকতর প্রতিফলিত। কিন্তু এই সব লক্ষণকে গৌণ ছাড়া অন্য কিছু বলা যায় না। যে-সব সামান্য লক্ষণে 'আধুনিক বাংলা কবিতা' সংকলনের অধিকাংশ কবি সমকালীন, তা রবীন্দ্রনাথে অনুপস্থিত। রবীন্দ্র-রচনার আলোচনা প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু একজায়গায় বলেছেন তাঁর কবিতায় উৎস বিশ্ববিধানে আস্থাবান এক চিত্তবৃত্তি। অথচ এই চিত্তবৃত্তির অভাবই আধুনিক বাংলা কবিতার মূল লক্ষণ। রবীন্দ্রনাথের 'প্রশ্ন' (ভগবান, তুমি যুগে যুগে) কবিতাটি প্রায়ই তাঁর আধুনিকতার নজির হিসেবে দাখিল করা হয়ে থাকে। এই কবিতাটিতে বিশ্ববিধানের শুভময়তায় প্রশ্ন এবং কবিচিত্তে সংশয় কিছু প্রকাশ পেয়েছে সন্দেহ নেই। কিন্তু বক্তব্যের গভীরতায় এই কবিতাটির পাশে যদি আমরা জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ-পৃথিবীতে আজ' কবিতাটি দাঁড় করাই, তাহলে তৎক্ষণাৎ বোঝা যাবে 'প্রশ্ন' কবিতাটির দুর্বলতা কোথায়। 'অদ্ভুত আঁধারে' যেখানে কবির গভীর হতাশা ও বিক্ষোভ ধ্বনিত হচ্ছে, সেখানে 'প্রশ্ন' ঈশ্বরের সঙ্গে কেবল মান-অভিমানের খেলা। জীবনানন্দের চোখে জল নেই, কেননা তার স্তর বহুপূর্বেই তাঁর চেতনা অতিক্রম ক'রে এসেছে। অপর পক্ষে রবীন্দ্রনাথের 'অশ্রুজল' কেবল কিঞ্চিৎ সান্ত্বনার অপেক্ষা রাখে ; পাঠকের মনে সন্দেহ হয়, বুঝি বা কবির বিক্ষোভমোচন ঈশ্বরের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত বোঝাপড়ার মুখাপেক্ষী মাত্র।

'বাঁশি' কবিতাটিও ('কিনু গোয়ালার গলি') আমাদের সহায়তা করবে। দীন, সাধারণ জীবন থেকে সেখানে অনেকগুলি রূপকল্প উপস্থিত করা হয়েছে। এগুলি বাদ দিলে অবশ্যি কবিতাটি পুরোপুরি রবীন্দ্র-ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ। কিন্তু রূপকল্পগুলি কী-প্রকৃতির দেখা যাক ঃ

বর্ষা ঘন ঘোর।
ট্রামের খরচা বাড়ে,
মাঝে মাঝে মাইনেও কাটা যায়।
গলিটার কোণে কোণে
জ'মে ওঠে প'চে ওঠে
আমের খোসা ও আঁটি, কাঁঠালের ভূতি,
মাছের কানকা,
মরা বেড়ালের ছানা,
ছাইপাঁশ আরো কত কী যে।
ছাতার অবস্থাখানা, জরিমানা-দেওয়া
মাইনের মতো,
বহু ছিদ্র তার।

এখানে যে ফর্দ উপস্থিত করা হয়েছে তা কেবল নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে, গলির নোংরামি প্রমাণ করা ছাড়া তার অন্য কোনো ব্যঞ্জনা নেই। এর সঙ্গে আমরা যদি জীবনানন্দের কয়েকটি পংক্তি মিলিয়ে পড়ি ঃ

আমিও ফিয়ার লেন ছেড়ে দিয়ে—হঠকারিতায়
মাইল মাইল পথ হেঁটে—দেয়ালের পাশে
দাঁড়ালাম বেন্টিঙ্ক স্ট্রীটে গিয়ে—টেরিটি বাজারে ;
চীনে বাদামের মতো বিশুষ্ক বাতাসে। ('রাত্রি')

তৎক্ষণাৎ লক্ষ্য করব চীনেবাদামের একটিমাত্র উল্লেখে জীবনানন্দ কত সুষ্ঠুভাবে আমাদের নগর-জীবনের বিশুষ্ক সত্তাকে ফুটিয়ে তুলেছেন। এখানে চীনেবাদামে বিধৃত হয়েছে নাগরিক আত্মা। এলিয়টের Gerontion কবিতাটিতেও রবীন্দ্রনাথের মতো একটি ফর্দ আছে।

The goat coughs at night in the field overhead,
Rocks, moss, stonecrop, iron, merds.

কিন্তু এই ফর্দটির প্রত্যেকটি রূপচিত্র এক-একটি প্রতীক। ছাগলের কাশি, প্রস্তরখণ্ড, শৈবাল, পাথুরে আগাছা, লৌহখণ্ড, বিষ্ঠা—এর প্রত্যেকটি দেউলিয়া সভ্যতার স্বরূপে পরতে-পরতে খুলে দেখাচ্ছে।

এ-কথা প্রমাণ করা উদ্দেশ্য নয় যে রবীন্দ্রনাথের রূপকল্প কখনো প্রতীক হয়ে উঠতে পারে না, আমি কেবল এই কথা বলতে চাই যে আধুনিক ভাব বা রূপচিত্র কোনোটিতেই রবীন্দ্রনাথ বিশেষ স্বস্তি পাননি। আধুনিক কালের যে-রূপকল্প তিনি ব্যবহার করতে গেছেন তাতে এসেছে আড়ষ্টতার আভাস। যেমন 'এই তো তোমার প্রেম ওগো হৃদয়হরণ' কোনো আধুনিক কবির পক্ষে লেখা সম্ভব ছিল না, তেমনই আধুনিকতার সব চেষ্টা রবীন্দ্রনাথের কবিতায় বহিরঙ্গের শোভাই থেকে গেছে, কখনো অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠে নি।

আধুনিক কবিরা রবীন্দ্রনাথ ছাড়া হয়ে উঠতে পারতেন না, রবীন্দ্রনাথের কাছে তাঁদের ঋণ অমেয়, একথা সত্য। কিন্তু এটা স্বীকার করা আর রবীন্দ্রনাথকে আধুনিকদের অগ্রগণ্য বলার ভেতর অনেক তফাৎ আছে। কবি আধুনিক কোন গুণে হন? ভাষাব্যবহারে কিছুটা, প্রতীক উপমা উৎপ্রেক্ষায় কিছুটা, কিছুটা—নিজের অজান্তে—কালধর্মিতাকে বরণ ক'রে। কিন্তু এ-সবই বাহ্য। আধুনিকতার প্রাণ যে-মনোভঙ্গি, যার উদ্ভব বিশেষ ক'রেই বর্তমানের উপলব্ধি ও চেতনা থেকে, তার যদি অভাব কারো কাব্যে ঘটে তাহলে তাঁকে পংক্তি থেকে বাদ দিতে হয়।

২

রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আধুনিক কালের কবিদের তফাৎ মূলত দুটি। সংস্কৃত ও বাংলা কাব্যধারার পরিপূর্ণ ঐতিহ্যে রবীন্দ্রনাথ আবাল্য অনুপ্রাণিত। তবু, বাংলা ও সংস্কৃত কাব্য থেকে বর্জনও তিনি কম করেননি। প্রাচীন সাহিত্যে প্রকৃতি ও মানব-চরিত্রে যে উদার সাযুজ্য, পার্থিব সববিষয়ে নির্মল আনন্দ, এবং সর্বোপরি জীবনের শুভময়তা সম্পর্কে যে নিশ্চিত প্রত্যয় তা রবীন্দ্রনাথের রচনায় সর্বদা প্রতিফলিত। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের রচনায় সংস্কৃত মহাকাব্যগুলির সর্বাঙ্গ সত্যতা, বৈষ্ণব মহাজনপদাবলীর দেহাত্মপ্রত্যয় এবং প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের বাস্তবতা নেই। এজন্য কোনো আক্ষেপ বা অনুযোগ না-ক'রেও বলা যায় রবীন্দ্রনাথ কতকগুলি জিনিসকে চিরকাল পরিহার ক'রে এসেছেন। অপরপক্ষে 'কল্লোল'-যুগের কবিরা রবীন্দ্রনাথের প্রভাবে কৈশোর এবং বয়ঃসন্ধি অতিক্রম ক'রে যৌবনে উপনীত হলেও, বিশ্বসাহিত্য বিশেষভাবে আস্বাদন করেছিলেন। সমসাময়িক ইংরেজি বা ইওরোপীয় সাহিত্য কেবল যে কালধর্মিতায় প্রবল ছিল তাই নয়, তার ভেতর বাস্তবতার

সহজ প্রকাশও ছিল বিস্ময়কর। রবীন্দ্রনাথ যে সর্বতোমুখী নন, তাঁর কাব্যে যে জীবনের সমগ্র রূপটি ধরা পড়ে নি এই চেতনায় তখনকার কবিকিশোরেরা বিশেষভাবে উত্তেজিত হয়েছিলেন। কিন্তু প্রাচীন বাংলা সাহিত্য অন্বেষণ ক'রে তাঁরা রবীন্দ্রনাথের অভাবপূরণ করার চেষ্টা করেননি, নিজেদের একাত্ম করেছিলেন ইওরোপীয় সাহিত্যের ঐতিহ্যের সঙ্গে। তার ফল শুভ কি অশুভ হয়েছিল সেটা আপাতত বিচার্য নয়।

কিন্তু রবীন্দ্রনাথের পর একটি বিশিষ্ট কাব্য-আন্দোলনের হেতু কেবল এই নয়। রবীন্দ্রনাথের অসম্পূর্ণতা ইতিপূর্বে কারো চোখে পড়ে নি, সেজন্য কোনো অতৃপ্তি আমাদের পিতা বা জ্যেষ্ঠতাতদের কখনো ছিল বলে জানি না। রবীন্দ্রনাথ যে-কারণে আর অর্বাচীনদের তুষ্ট করতে পারলেন না তার কারণ বাংলা দেশের মানসিক ও সামাজিক হাওয়া-বদল। ইওরোপীয় মহাযুদ্ধ পাশ্চাত্ত্য মহাদেশে এক শূন্যত্য, এক অভাববোধের সৃষ্টি করে। শুভবস্তুর নিশ্চয়তায় পৃথিবীর লোকে আস্থা হারাল, যে-বিশ্বাস, যে-সহজ আত্মসমর্পণ ভিক্টোরীয় চিত্তবৃত্তিকে ইংলন্ডে কায়েম করেছিল তা যেন হঠাৎ আহত হল। ভিক্টোরীয় মনোভঙ্গির প্রবঞ্চনা ও তার অসারতা মহাযুদ্ধ এমনভাবে উদ্ঘাটিত করল যে তার পুনরুজ্জীবন ইওরোপে আর ঘটল না। আমাদের দেশে কিন্তু তার প্রত্যক্ষ প্রভাব ততটা দেখা যায় নি, কেননা আমরা তখন রাজনৈতিক সংগ্রামে অনন্যমন। প্রথম মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পরে আমাদের রাজনৈতিক আন্দোলন খুব তীব্র হয়ে উঠেছিল ; কিন্তু মনে রাখা দরকার, তখনো এর মধ্যে কোনো ব্যর্থতাবোধ আসে নি। বরং এমন একটি স্বদেশী উন্মাদনা দেশময় তখন ছড়িয়ে পড়েছিল যে তাতেই আমরা জীবনের অনেক দীনতা ও গ্লানি ভুলে থাকতে পেরেছিলাম। কিন্তু তৃতীয় দশকের শেষভাগে পৃথিবী জুড়ে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বানচাল হয়ে গেল। বাণিজ্যে অতিমন্দা দেখা দেবার ফলে সর্বত্র বেকার সমস্যা দারুণ হয়ে উঠল, বিশ্বের মধ্যবিত্ত সমাজ আশঙ্কা। করল তার বিলোপের সব আয়োজনই সম্পূর্ণ হয়েছে। চিরাচরিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যা সাধারণ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই স্বাধীন ও শুভ্র বলে মেনে নিয়েছিল, এতদিনে তার স্বরূপ উদ্ঘাটিত করল। মানুষের মনে এর প্রতিক্রিয়া সহজেই অনুমান করা যায়। আমাদের দেশে একদিকে যেমন হাহাকার পড়ল, অন্যদিকে তেমনি এলো গভীর অনিশ্চয়তা, বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যতে অনাস্থা, এবং হতাশা। প্রচলিত অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রতারণায় যে স্বাভাবিক ক্রোধ মানুষের মনে সেই সময়ে জেগেছিল, তা আমাদের দেশে প্রবল হয়ে ওঠে নি, কেননা আমাদের সকল ক্রোধের পাত্র ছিল তখন বিদেশী শাসক। স্মরণ থাকতে পারে, আমাদের জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে এই কয়েক বছরই সবচেয়ে রক্তাক্ত ও গ্লানিময়।

রবীন্দ্রনাথের তৎকালীন রচনা 'লিপিকা' পড়লে দেখা যাবে তাতে এক বেদনার আভাস আছে, ছোটোখাটো নানা দুঃখের উল্লেখ আছে। কিন্তু হৃদয়ের যে পরিপূর্ণতা থেকে বেদনা আসে, চিত্তের যে বিস্তার সর্বজীবে সহানুভূতি আনে তা সেই সময়ে দু-একজন মহাপুরুষে দেখা গেলেও দেশে সমগ্রভাবে একান্তই অনুপস্থিত ছিল। রবীন্দ্রনাথ দেশের দুঃখ বিষয়ে গভীরভাবে সচেতন ছিলেন ; কিন্তু ভিন্ন ঐতিহ্যে মানুষ তিনি কী ক'রে সমসাময়িক হতাশার অন্তস্থল স্পর্শ করবেন? দেশে তখন এমনই দুর্যোগ যে বর্তমান ও ভবিষ্যতে আস্থাহীন বঙ্গযুবকের পক্ষে রবীন্দ্রনাথে কোনো আস্থা বা চিত্তশুদ্ধি লাভ করা অসম্ভব ছিল। সমগ্রভাবে দেশের জীবন রবীন্দ্রনাথে প্রতিফলিত হয় নি, বিশ্ব জুড়ে সভ্যতার যে মড়ক তখন লেগেছিল তার আভাস সর্বশেষ 'সভ্যতার সংকটে' ছাড়া তার

লেখায় নেই। তাঁর দুর্বর আশা, ঔপনিষদিক শুভবোধ তাঁকে ঘিরে অন্য একটি পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেছিল, যা উজ্জ্বল বা ধ্রুব হলেও বর্তমান জীবন থেকে একেবারেই বিচ্ছিন্ন ছিল।

আধুনিক বাংলা কবিতার আন্দোলন এই পরিপ্রেক্ষিতে অনিবার্য মনে হয়। সাহিত্যের সঙ্গে, শেষ বিচারে, বর্তমানের, প্রত্যক্ষ সত্যের একটি অবিচ্ছেদ সম্পর্ক আছে ; সুতরাং কালের প্রয়োজনে সাহিত্যেও হাওয়া-বদল অনিবার্যরূপে দেখা দেয়। আধুনিক বাংলা সাহিত্যে এর প্রথম ইঙ্গিত আমরা পাই যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, মোহিতলাল মজুমদার ও নজরুল ইসলামের রচনায়। তবু এঁরা যে কেউই আধুনিক কাব্য-আন্দোলনের পুরোভাগে দাঁড়াতে পারেন নি, তার কারণ হয়ত এঁদের রচনায় একাগ্রতার অভাব। এঁরা চেয়েছিলেন নতুনকে পুরোনোর পোষাকে সাজিয়ে পাঠকদের কাছে পেশ করতে, ভাষা ও কাব্যরীতির প্রথা থেকে কবিতাকে মুক্তি দেবার চেষ্টা করেন নি। ফলত এঁদের কাব্যে আধুনিকতার হাওয়া এসে লাগলেও সেটা কখনো কাব্যের প্রাণ হয়ে ওঠে নি। নজরুল ইসলামে প্রাণশক্তি ছিল দুর্দম, তখনকার দিনের ব্যর্থতাবোধ তাঁর উচ্ছৃঙ্খলতায় কিছুকাল বিকল্প-মুক্তিও খুঁজে পেয়েছিল ; কিন্তু নজরুলের রচনা কালকে মাতালেও মনে পৌঁছয় না। তাই কিছুকালের খ্যাতি উপভোগ ক'রে সেই কবিকৃতি আজ বুদ্বুদ হয়ে গেছে। অপর পক্ষে যতীন্দ্রনাথের দুঃখবাদ রবীন্দ্রনাথের পর নতুন হলেও তা যেন ভঙ্গি ছাড়িয়ে অন্য কিছু হয়ে উঠতে পারে নি। পাঠকের মনে সন্দেহ জাগে এই দুঃখবাদের মূলে হয়তো কোনো আপাত-সহজ অগভীর জীবনদর্শন রয়েছে। জীবনানন্দের কবিতাপাঠান্তে কোনো-কোনো পাঠক তাঁর সিদ্ধান্তের সঙ্গে ভিন্ন মত হলেও তাঁর সম্পর্কে অনুরূপ সন্দেহ প্রকাশ করবেন না।

মোহিতলালের রচনায় সে-সময় যে-জিনিশটি সকলের চোখে পড়েছিল সমালোচকেরা তার নাম দিয়েছেন 'বলিষ্ঠ ভোগবাদ'। রবীন্দ্রনাথে এর অভাব ছিল। কিন্তু আমার মনে হয় না এই অভাব বাঙালি পাঠক তখন প্রবলভাবে অনুভব করেছিলেন। প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে ও বৈষ্ণবপদাবলীতে যদিও ভোগের বন্দনাগান কবিরা চূড়ান্তভাবে ক'রে গেছেন, তবু মোহিতলালের কাব্য-রচনার সময় আমাদের জীবনে ভোগের বড়ো সুযোগ বা লিপ্সা ছিল না। একদিকে রবীন্দ্রনাথের সাত্ত্বিক প্রভাব, অন্যদিকে রাজনৈতিক জীবনে অস্থিরতা ও সমাজের সংকট—এই দুয়ের ফলে বাঙালি পাঠক ঠিক মোহিতলালের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মোহিতলাল তাই কিছুটা খাপছাড়া ভাবে বাংলা কবিতায় এলেন এবং স্থায়ী কোনো প্রভাব রেখে যেতে পারলেন না। বিশুদ্ধ ভোগে আমাদের কোনোদিনই অভিরুচি ছিল না, আমরা হয় তাকে গার্হস্থ্যে মসৃণ করেছি, নয়তো অনুরাগে সম্পৃক্ত ক'রে তাকে শুদ্ধ করেছি। ভাবী বধূকে চোখে না-দেখেই তার সম্পর্কে প্রাক্‌বিবাহ মিলনোৎকণ্ঠা অস্বাভাবিক নয়, কিন্তু কবিতায় তার প্রকাশ আমাদের কাছে নিতান্ত অশোভন লাগে। কবিতায় মোহিতলাল এই মিলনোৎকণ্ঠাকে যত সুন্দর সাজই পরান, পাঠকের কাছে তা নেহাৎই মেসে-হোটেলে থাকা অবিবাহিত যুবকের কামকল্পনা মনে হয়।*

৩

বাংলা নিসর্গকবিতায় রবীন্দ্রনাথের পরবর্তী আসনটি জীবনানন্দ দাশের, এ-কথা নিশ্চিত। কিন্তু এই দুই কবির নিসর্গকবিতা পাশাপাশি রেখে পড়লে আমরা প্রায় বিপরীত আস্বাদ

* আমার এই মন্তব্যে মোহিতলালের অনুরাগী পাঠক যদি ক্ষিপ্ত হন তাঁকে অনুরোধ করব 'মিলনোৎকণ্ঠা' কবিতাটি আবার প'ড়ে দেখতে।

লাভ করি। প্রকৃতি উভয়েরই কাব্যচেতনার অবলম্বন, জীবনকে দুই কবিই প্রকৃতির বিভিন্ন প্রকাশের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু কী সেই জীবন, এঁদের চেতনায় যা প্রকৃতিতে আশ্রয় পেয়েছে?

রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে সহজেই বলা যায়, শুভময় জীবনের ধারণা তাঁর চোখে দেখা প্রকৃতিতেও প্রতিফলিত হয়েছে। প্রকৃতিতে তিনি আনন্দ ঐশ্বর্য বিস্ময় যা-ই দেখেছেন, সর্বদাই মানুষের জীবনে তার সত্যতা সম্পর্কে নিঃসন্দেহ হয়েছেন। এমনকি প্রকৃতিতে যে-দুঃখ আছে তা যে মানুষের মনে মহত্তর আনন্দের চেতনা এনে দেবার জন্যই—এই প্রতীতি কখনো রবীন্দ্রনাথে আশা, ক্ষোভ, অথবা গ্লানি এনে দেয় নি। হয়তো এর জন্যই রবীন্দ্রনাথের নিসর্গকবিতায় হেমন্ত ঋতুর তেমন সমাদর নেই। রিক্ততার ঋতু হেমন্ত ; প্রকৃতি এবং মানুষের মনে কুয়াশা, অবসাদ আর মৃত্যুর ধূসর ছায়াফেলা এই ঋতুকে তাই অনিচ্ছুক খাজনা দিয়েই রবীন্দ্রনাথ কর্তব্য শেষ করেছেন। যে-হেমন্ত রবীন্দ্রনাথের ঋতুসংগীতে সসংকোচে একটুখানি জায়গা ক'রে নিয়েছে জীবনানন্দের কাব্যে কিন্তু তারই অবাধ পদচারণা। হেমন্তেও যে এত রূপ ছিল তা আমরা জীবনানন্দেই প্রথম আবিষ্কার করলাম। দৃষ্টি এবং স্পর্শের যে-জগৎ জীবনানন্দ আমাদের কাছে এনে দিয়েছেন তাতেই নিশ্বাস ফেলে আমরা যেন স্বস্তি পাই। রবীন্দ্রনাথের পাঁচ ঋতু আমাদের মুগ্ধ করে সন্দেহ নেই, কিন্তু জীবনানন্দের হেমন্তে এসে হঠাৎ আমরা উপলব্ধি করি আসলে আমরা এতকাল হেমন্তেই জীবনযাপন করেছি, হয়তো হেমন্তেই লীন হব। হেমন্তের রিক্ততায় যেন আমাদের সমাজসভ্যতার অন্তর্জলি তার সেই নাভিশ্বাস যেন প্রকৃতিতে কুয়াশার পর্দা ফেলেছে। হেমন্তের বহু ঐশ্বর্য, বহু রূপ জীবনানন্দের একাধিক কবিতায় আছে তবু তার সেই চেহারাই আমাদের মনে লেগে থাকে যার সন্ধ্যার আকাশে নক্ষত্রেরা হিম হ'য়ে ঝরে যায়, যার বাতাসে বাসি পাতা ভূতের মতো উড়ে আসে, যার গাছে অসুস্থ বাসি পাতা দুলে খ'সে পড়ে।

হেমন্তের বর্ণনায় যেমন, জীবনদৃষ্টিতেও তেমনি জীবনানন্দের কবিচেতনার দ্বিমুখিতা লক্ষণীয়। তাঁর কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে তাঁকে আস্তিক বা নাস্তিক সহজেই প্রমাণ করা যায়। জীবনানন্দকে প্রেমিক, আস্তিক, এবং সত্যবাদী প্রমাণ ক'রে ইতিমধ্যে একাধিক রচনা প্রকাশিত হয়েছে। কিন্তু আমার মনে হয়, রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে আস্তিকতার সিদ্ধান্তে আসা সহজ হলেও জীবনানন্দের ক্ষেত্রে সেটি বিপজ্জনক। এ-কথা সত্য যে কোনো কবির অন্তিম রচনায় প্রেমপ্রীতিকরুণায় স্নিগ্ধ শিল্পচেতনার সন্ধান পেলে আমরা যেন নিশ্চিন্ত হই। ইংরেজি সাহিত্যে যে-সব কবির মনে দ্বিধা ছিল, যাঁরা একদা সংশয়ের কবিতা লিখেছেন, তাঁদের প্রত্যেকের সম্পর্কেই পণ্ডিতেরা প্রমাণ ক'রে দিয়েছেন যে জীবনের সায়াহ্নে তাঁদের সব দ্বন্দ্বের বা সন্দেহের নিরসন হয়েছিল। মনে হয় চরম সিদ্ধান্ত এবং আস্থার প্রতি আমাদের জন্মান্তরের কোনো আকর্ষণ আছে, তাই কবিদের শেষ বিচারে তাঁদের আস্তিক প্রমাণ করতে পারলে আমরা খুশি হই।

জীবনানন্দ সম্পর্কে আমার মনে হয়, শেষ পর্যন্ত তিনি কোনো আস্তিকতার স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি। তাঁর কবিতায় আমরা প্রথম যে-বিস্ময়ের আভাস পেয়েছিলাম তা শেষ পর্যন্ত উপস্থিত আছে। কবিতার বিষয়বস্তু বদলেছে, কিন্তু কোনো সিদ্ধান্তের ঋজুতা কখনো কোথাও আসে নি। রচনাকালের দিক থেকে সম্ভবত তাঁর শেষ কবিতা যে-তিনটি ('রক্তনদীর তীরে কালো পৃথিবীর', 'অদ্ভুত আঁধার এক', 'দুদিকে ছড়িয়ে আছে দুই কালো সাগরের ঢেউ'), তাতে অবশ্যই অমৃতের আভাস আছে ; শকুন

আর শেয়ালের রাজত্ব এই পৃথিবীতেও হরিণের অক্ষয় গুঞ্জরণ অথবা অন্তহীন হরিণের মর্মরিত লাবণ্যসাগর শেষ পর্যন্ত সত্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। কিন্তু এই মন্ত্রগ্রহণ করতে হলে, জীবনানন্দ বলছেন, নিমিত্তের ভাগী হয়ে মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়কে যাত্রা করতে হবে। মানুষের বুদ্ধি, চেষ্টা, সংকল্প কোনো কাজে লাগবে না, এমন কি তার ইতিহাসচেতনাও তাকে কোন ধ্রুবতার প্রতিশ্রুতি দেবে না। অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে যে মহাকাল, তার প্রতি মুহূর্তে নশ্বরতা ; মৃত্যুর ধূসর ছায়াই মানুষের চেতনায় চিরকাল অবিনাশী সত্য হয়ে আছে।

কিন্তু জীবনানন্দের প্রতীতি যদি স্বীকার ক'রে নিতে হয়, তাহলে কী অর্থ এই আত্মসমর্পণের চেষ্টায়, কি সান্ত্বনা ভবিষ্যতে আনন্দের আশ্বাসে? যদি সাহস সংকল্প প্রেমকে বিসর্জন দিতে হয়, আমাদের বুদ্ধি যদি কোনোকালে শুভ হয়ে না উঠতে পারে, তাহলে কোন ঐশ্বর্যের উত্তরাধিকার আমরা লাভ করব?

জীবনানন্দের অন্তিম রচনা প'ড়ে তাই আমি প্রতারক সান্ত্বনায় তৃপ্ত হতে পারি না। অমৃতের যে-মূল্য জীবনানন্দ ধার্য করেছেন ('জ্ঞানপাপ মুছে ফেলে', 'নিমিত্তের ভাগী হয়ে মানুষের রক্তাক্ত হৃদয়/হরিণের কাছে এসে শিখবে অক্ষয় গুঞ্জরণ') মানুষ তা কোনোদিন দিতে পারবে না, আর তা দিতে না-পারলে যদি সেই মাশুল আদায় করতে শকুন আর শেয়ালের পেয়াদারা পৃথিবীর সর্বত্র ঘুরে বেড়ায় তাহলে আস্তিকতার কী অর্থ হয়?

৪

জীবনানন্দকে বাংলার নির্জনতম কবি একাধিকজনে বলেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতায় বিদ্রোহের, অতৃপ্তির, ব্যক্তির অহমিকার যে সুরটি বেজেছিল, জীবনানন্দ আপাতত তা থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে তিনি একান্তভাবেই বাংলাদেশের কবি, ভাষা বা চিত্ররূপে কোথাও বিদেশী গন্ধ লাগে নি।* অনেকের মনে এইসব কারণে প্রশ্ন জাগতে পারে, 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' তাহলে কী অর্থে আধুনিক।

বাংলা নিসর্গকাব্যের যেটি মূল ধারা তা রবীন্দ্রনাথে বিশেষ পরিপূর্ণতা লাভ করেছিল, কিন্তু প্রকৃতির মধ্যে বাঙালি কবিরা বারবার অবিনশ্বরতার স্পর্শ পেয়েছেন। প্রকৃতি ঈশ্বরেরই আলেখ্য এবং প্রকৃতিরাজ্যে ঈশ্বরের চরম ন্যায়বিধান মানুষকে অহরহ মঙ্গলের দিকে পরিচালিত করছে—এই কথা বাঙালি কবিরা বিভিন্নভাবে ব'লে গেছেন। ঈশ্বর-সাযুজ্যেই প্রকৃতির এই কল্যাণীরূপ, তার ফলেই মানবজীবনে তার অন্তহীন আশীর্বাদ—এই বোধ বাঙালি কবিদের নিসর্গকবিতাকে সমপর্যায়ে ফেলেছে। সচেতন মন দিয়ে, মানুষের বুদ্ধি ও যুগান্তের সঞ্চিত জ্ঞানসহকারে প্রকৃতিকে যাচাই করার কথা কদাপি কেউ ভাবেন নি। মানুষের ইতিহাসচেতনা, যুক্তিপক্ষপাতী মন সমাজে প্রযুক্ত হয়েছে, মানবসভ্যতার ধারানির্ণয়ে সহায়তা করেছে। কিন্তু এই মন প্রকৃতিতে নিয়োজিত হল জীবনানন্দের কবিতায় প্রথম। বুদ্ধির বিচারে, ইতিহাস-চেতনার প্রয়োগে জীবনানন্দ ফলত অন্য সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন। তাঁর প্রকৃতি-প্রেম অন্য কারো তুলনায় একরতি কম না হলেও

* এ-প্রসঙ্গে ইংরেজ রোমান্টিক কবিকুল, বিশেষ ক'রে কীটসের কথা আমি ভুলি নি। কিন্তু জীবনানন্দ এঁদের এমনভাবে পরিপাক করেছিলেন যে ইংরেজি-না-পড়া পাঠক মুহূর্তের জন্যেও অস্বাভাবিক কিছু সন্দেহ করবেন না। কৃত্রিমতা যে প্রথম শ্রেণীর কবির রচনায় স্বকীয়তার মর্যাদা পায় জীবনানন্দ তার একাধিক প্রমাণ রেখে গেছেন।

বুদ্ধির আত্মসমর্পণজনিত প্রকৃতিবিলাস তাঁর কাব্যে কোথাও নেই। প্রকৃতিকে অবিনাশী জানলেও জীবনানন্দ তার প্রতি মুহূর্তটিতে অন্তহীন প্রাণের স্ফুলিঙ্গকে নিভে যেতে দেখেছেন। তাই এই বিচিত্র ঐশ্বর্যময় প্রকৃতিতেও প্রেম নশ্বর, কাল বিনাশী এবং আকাশ আর প্রান্তর চিরহেমন্তে বিলীন।

জীবনানন্দের কবিতায় এই চেতনা বা সিদ্ধান্ত যথার্থরূপে বিদ্রোহী, কেননা বাংলা নিসর্গকাব্যের ধারাকে বর্জন ক'রে এখানে একটি নতুন পথ বেছে নেয়া হয়েছে। 'আধুনিক বাংলা কবিতা'র অন্যান্য কবিরা রবীন্দ্রনাথকে চোখের সামনে রেখে তাঁকে অস্বীকার করার চেষ্টা করছেন, অথচ জীবনানন্দ সে-রকম কোনো চেষ্টা না-ক'রেই বাংলা কবিতার চরিত্র বদলে দিয়েছেন। আজকাল কেউ-কেউ জীবনানন্দের দৃষ্টিতে ছাড়া প্রকৃতিকে ভাবতেই পারেন না।

৫

জীবনানন্দের কবিতায় একটি সজ্ঞান মনের ক্রিয়া, ইতিহাসচেতনা-দ্বারা বিচারের একটি চেষ্টা আমরা বরাবর লক্ষ্য করি। অথচ এই কবি শেষে তাঁর বুদ্ধি সমর্পণ করেছেন নির্জ্ঞানের কাছে, সাহস সংকল্প প্রেম আহুতি দিচ্ছেন শান্তির আকাঙ্ক্ষায়। জীবনানন্দে যদি কোনো আস্তিকতা থেকে থাকে তবে তা রিক্তের, পরিক্রমাক্লান্ত পথিকের আত্মসমর্পণের। হয়ত নশ্বরতার যে-আবহমান লীলা তিনি প্রত্যক্ষ করেছিলেন, যুগ-যুগান্তের যে-ক্লান্তি তাঁর উত্তরাধিকার বলে জেনেছিলেন ; সভ্যতার নগর-গ্রামের যে-মড়ক তাঁকে উদ্‌ভ্রান্ত করেছিল—তার সঙ্গে মানুষের জ্ঞানের বা যুক্তির কোনো মিল তিনি খুঁজে পান নি। আমাদের বুদ্ধি কেবল বিপথে চালিত করে, জ্ঞান এবং পর্যালোচনা ক্লান্তি ও নেতি ছাড়া কিছুই দিতে পারে না। ঘড়ির দুটি ছোটো কালো হাত আমাদের সেই শব্দহীন মাটি ঘাসে নিয়ে যেতে চায়, আমরা সহজ বুদ্ধিতে সেদিকে কখনো যাবো না; তবু পায়ের চিহ্ন সেদিকেই চ'লে যায় 'কী গভীর সহজ অভ্যাসে'। তাই হয়তো শেষ পর্যন্ত বুদ্ধি বৃথা, জ্ঞান বৃথা, যুগান্তের সঞ্চিত অভিজ্ঞতা বৃথা।

৬

জীবনানন্দ-স্মৃতি-সংখ্যা 'কবিতা'য় (পৌষ ১৩৬১) শ্রীযুক্ত বুদ্ধদেব বসু 'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটির বিস্তারিত ব্যাখ্যা করেছেন। কবিতাটি জীবনানন্দের প্রধান কবিকর্মের অন্যতম এবং এতে এমন একটি মনোভঙ্গি প্রকাশ পেয়েছে, যা উপলব্ধি করতে পারলে জীবনানন্দ সম্পর্কে আমাদের মনস্থির করার সহায়তা হতে পারে।

পরবর্তী কালের অনেক কবিতার মতো এই কবিতাটিতে কবি কাহিনী বা তাঁর সিদ্ধান্ত থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন রেখেছেন। কাহিনীর ফাঁকে-ফাঁকে তাঁর প্রশ্ন আছে, সমাপ্তিতে মন্তব্য আছে। কিন্তু এই প্রশ্ন বা মন্তব্য কবির নিজের নয়, আত্মঘাতীর প্রতি জীবিতের অবিশ্বাসী জিজ্ঞাসামাত্র।

এই কাহিনীতে আত্মহত্যার কোন সহজগ্রাহ্য কারণ নেই। মৃত্যুর, ঘুমের যে-সাধ অতৃপ্ত জীবন থেকে জাগে তা এক্ষেত্রে সক্রিয় নয়। প্রেম, আশা, গৃহস্থালি, এমনকি বাৎসল্য রসেরও কোনো ত্রুটি তার জীবনে ছিল না ; তবু কোন ভূত এই ব্যক্তি দেখল, উটের গ্রীবার মতো কোন নিস্তব্ধতা জানালার ধার থেকে তার কানে সর্বনাশের মন্ত্র দিয়ে গেল :

কোনোদিন জাগিবে না আর
জানিবার গাঢ় বেদনার
অবিরাম—অবিরাম ভার
সহিবে না আর—

কিন্তু কেন এই মন্ত্রণা? ক্লান্তি, জানার বেদনার প্রত্যাহের ভার তো সকলেই বহন করে, তবু বেঁচে থাকার কী অসীম তৃষ্ণা সকলের বুকে। পেঁচা, গলিত স্থবির ব্যাং, অন্ধকারের সঙ্ঘারামে জেগে-থাকা মশা, রক্তক্লেদবসার মাছি—জীবনের প্রতি এদের সকলের উষ্ণ অনুরাগ অনুমেয়। এমনকি অল্পপ্রাণ ফড়িংও তার মৃত্যুর আগে আপ্রাণ প্রতিবাদ করে।

কবিতার এই অংশে বারোটি পংক্তির সাহায্যে কবি জীবনের একটি চিত্র উপস্থিত করেছেন। এখানে লক্ষণীয়, জীবনের প্রতি যে-সব প্রাণীর অনুরাগ অনুমেয়, তারা অনেকেই গলিত স্থবির, থুরথুরে অন্ধ, রক্তক্লেদবসাভোজী, অন্ধকারের অধিবাসী। অথচ ঘনিষ্ঠ আকাশ, বিকীর্ণ জীবন এদেরই মন অধিকার ক'রে আছে। অপরপক্ষে যে-লোকটি আত্মহত্যা করল তার সুস্থ স্বাভাবিক জীবন ছিল, জীবনে স্বাভাবিক দাবি ছিল। তবু সে যে একগাছা দড়ি হাতে একা-একা অশ্বত্থের কাছে গেল সে কি, 'যে-জীবন ফড়িঙের, দোয়েলের—মানুষের সাথে তার হয় নাক' দেখা'—এই জেনে?

এইখানে কবি কবিতাটির আসল কথা বলেছেন। যে-জীবনের অনন্ত ঐশ্বর্যের গান 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'তে জীবনানন্দ গেয়েছেন, সেই জীবন সম্পর্কেই এই লোকটির প্রতীতি হল মানুষের জন্য তার ভালোবাসা নয়। যদি ফড়িঙের দোয়েলের জীবন মানুষের লভ্য হত, তাহলে হয়তো জীবনের বিশুদ্ধ প্রেমে সে নিজেকে সমর্পণ করতে পারত। কিন্তু আমাদের হৃদয়ে এক বোধ জন্ম নেয়, 'সব চিন্তা, প্রার্থনার সকল সময় শূন্য মনে হয়, শূন্য মনে হয়।'

মাথার ভিতরে
স্বপ্ন নয়—প্রেম নয়—কোনো এক বোধ কাজ করে।
আমি সব দেবতারে ছেড়ে
আমার প্রাণের কাছে চ'লে আসি,
বলি আমি এই হৃদয়ের :
সে কেন জলের মতো ঘুরে-ঘুরে একা কথা কয়!
অবসাদ নাই তার। নাই তার শান্তির সময়?
কোনোদিন ঘুমাবে না? ধীরে শুয়ে থাকিবার স্বাদ
পাবে নাকি?

হয়তো এই ক্লান্তিতেই, অবসাদের এই ভারেই, ধীরে শুয়ে থাকার ইচ্ছা দুর্দম হয়ে উঠেছিল ব'লেই অশ্বত্থের শাখায় সে দড়ির গিঁঠ বেঁধেছিল। অশ্বত্থশাখার প্রতিবাদ, জোনাকির মাখামাখি, অন্ধ পেঁচার তুমুল গাঢ় সমাচার—কিছুই তার সিদ্ধান্তকে বদলাতে পারে নি। তার চতুর্দিকে জীবনের লীলা তাকে নিরন্তর ধিক্কার দিয়েছে, কিন্তু এই মহাজ্ঞানী জেনেছে, এ-জীবন মানুষের নয়; শান্তির সময়, ধীরে শুয়ে থাকার স্বাদ কোনোদিন সে পাবে না। স্বভাবতই এই সিদ্ধান্তে জীবিতের মনে ব্যঙ্গ উদ্যত হবে, কেননা যে জীবিত, সে এই মৃত্যুর কাহিনীতে বিস্মিত, তার এই ক্লান্তির ভার এখনো অসহ্য হয় নি। এই মৃত্যুকে সে তাই স্বভাবতই প্রশ্ন করবে—

জীবনের এই স্বাদ—সুপক্ব যবের ঘ্রাণ হেমন্তের বিকেলের—
তোমার অসহ্য বোধ হ'ল :—

মর্গে কি হৃদয় জুড়োল
থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে।

এই ব্যঙ্গের কোনো উত্তর নেই।

পরবর্তী অংশটুকুতে মৃতের জীবন আবার পর্যালোচনা ক'রে তার মৃত্যুর কারণ আবিষ্কার করার চেষ্টা করা হচ্ছে। প্রেম, দাম্পত্যজীবন, সচ্ছলতা—কিছুরই অভাব ছিল না। কিন্তু এ-কথা বলার পর অপ্রত্যাশিতভাবে কবি বলছেন, 'তাই লাসকাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।' কবিতার এই অংশে এসে কবি হঠাৎ তাঁর বিচ্ছিন্নতার দূরত্ব থেকে কিছুক্ষণের জন্য স'রে এলেন। জীবিত মানুষের যুক্তিতে এই মৃত্যুর কোনো অর্থ খুঁজে পাওয়া যাবে না, এই কথাটা বলার জন্যই তিনি রূঢ়ভাবে কবিতাটির মোড় ফেরালেন ঃ

হাড়হাভাতের গ্লানি বেদনার শীতে
এ জীবনে কোনোদিন কেঁপে ওঠে নাই ;
তাই
লাসকাটা ঘরে
চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে।

এখানে 'তাই' কথাটির ওপর অনেকখানি ঝোঁক এসে পড়ছে। মানুষের দৈনন্দিন দুঃখ এই ব্যক্তিটির ছিল না, সুতরাং এর মৃত্যু সাধারণ আত্মহত্যা নয়। সর্বপ্রকার সাংসারিক সফলতা এর ছিল, তাই সে আজ আত্মঘাতী। হয়তো এই সফলতা না-থাকলে সে তার চেষ্টায় নিজেকে ভুলে থাকতে পারত, হয়তো পরিশ্রমে, অনুশীলনে হৃদয়ের সেই বোধ ভোঁতা হয়ে আসত। কিন্তু তার পরিবর্তে সে কেবলই ক্লান্ত হয়েছে ; প্রেম, সংসার-সুখ, সচ্ছলতা কেবল তাকে ক্লান্ত করেছে ; তার সেই বোধ —যা স্বপ্ন নয়, প্রেম নয়, অন্য কিছু, তা সহবাসের শয্যাতেও তাকে বিনিদ্র রেখেছে। এই ব্যাখ্যা কবি মৃতের পক্ষ নিয়ে আমাদের কাছে পেশ করেছেন। বহু বিনিদ্র রাত্রির ক্লান্তি থেকে মুক্তি পেতে লোকটি শেষে অশ্বত্থশাখায় গলায় দড়ি দিল, যে-লাসকাটা ঘরে ক্লান্তি নেই সেখানে সে আজ চিৎ হয়ে শুয়ে আছে।

কিন্তু কবি কি এখনো মৃতের সিদ্ধান্ত বা তার কীর্তি সমর্থন করেন? এই স্তবকেই কবি বলছেন এক বিপন্ন বিস্ময় আমাদের রক্তের ভিতর কাজ করে, আমাদের ক্লান্ত করে। কিন্তু এই ক্লান্তির সমাধান করতে গিয়ে সে 'লাসকাটা ঘরে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে টেবিলের 'পরে'। এখানে আর কবি মৃতের সঙ্গে একাত্ম নন, এমনকি তার শুয়ে থাকার বর্ণনায় মৃদু করুণারও আভাস আছে।

কবিতাটি এবার মৃতের জগৎ ছেড়ে জীবিতের পৃথিবীতে ফিরে এল। আমরা জীবিত ব্যক্তিরা জানি, অর্থ কীর্তি সচ্ছলতার পরেও ক্লান্তি আছে, আমরা জানি হৃদয়, প্রেম, শিশু, গৃহ, সব নয়। তবু একই সত্য জেনে সে মৃত, আমরা জীবিত। পরিণতির এই বিষমতায় জীবনের বড়ো একটা ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রয়েছে। এই ব্যঙ্গ স্পষ্ট হয়েছে কবিতার শেষ অংশে, যেখানে কবি আবার থুরথুরে অন্ধ পেঁচাকে সেই অশ্বত্থেরই ডালে বসিয়েছেন। পেঁচার পেছন পেছন, আমরা অনুভব করি, ব্যাং মাছি মশার বাহিনীও উপস্থিত হয়েছে। জীবনের

স্রোতে কোনো টান পড়ে নি, একজন মানুষের মৃত্যু সেখানে কোনো আঁচড় কাটে না। 'প্রগাঢ় পিতামহী' প্যাঁচার সমাচারই শেষ পর্যন্ত বিচক্ষণ, কেননা কী হয় মানুষের আত্মহত্যায়, জীবনে তার কোনো স্বাক্ষর নেই। আমাদের মাথার ভিতরে যে-বোধ নিরন্তর কাজ করে, যা আমাদের ক্লান্ত করে, শ্রান্ত করে, তা থেকে আত্মহত্যায় মুক্তি খুঁজতে যাওয়া মূঢ়তা। এই জ্ঞান নিশ্চয়ই আমরা লাভ করেছি, তাই আমরা বেঁচে থেকে এ-মৃতের কাহিনী শুনছি। আর এই জ্ঞানের সদ্ব্যবহার ক'রে আমরা জীবনের প্রচুর ভাঁড়ার শূন্য ক'রে চ'লে যাব।

জীবিতের এই সিদ্ধান্তের প্রতিও কবির ব্যঙ্গ প্রচ্ছন্ন রয়েছে, কিন্তু যেহেতু এক্ষেত্রে জীবিত ব্যক্তি ও কবি-স্বয়ং অভেদ, আজ আট বছর পরে যেহেতু তিনি সেই অপঘাতের পর্যালোচনা করছেন, ব্যঙ্গ তাঁকেও লেগেছে।

'আট বছর আগের একদিন' কবিতাটিতে কবির এই প্রকীর্ণ ব্যঙ্গ—যা কবি বা পাঠক কাউকেই রেহাই দেয়নি—কবিতাটির সহজ ব্যাখ্যা বিপজ্জনক ক'রে তুলেছে। এই ব্যঙ্গটুকু বাদ দিলে কবিতাটির কোনো অর্থ হয় না, যদি মৃত্যুকে অতিক্রম ক'রে জীবনের জয়ধ্বনি শোনাবার ইচ্ছেই জীবনানন্দের থাকত তাহলে এই পদ্ধতিতে কবিতাটি তিনি লিখতেন না। লাসকাটা ঘরের শান্তি আমাদের কাছে অবোধ্য, তাই আমরা প্যাঁচার সমাচার গ্রহণ করেছি। মনে থাকতে পারে, যখন অশ্বত্থশাখা, জোনাকির স্নিগ্ধ মাখামাখি সমস্বরে আত্মহত্যার প্রতিবাদ করেছিল, তখন এই থুরথুরে অন্ধ পেঁচা তার চূড়ান্ত নিস্পৃহতা দেখিয়েছে। কবিতার শেষে, আত্মহত্যার পরও এই নিস্পৃহতায় কোনো পরিবর্তন ঘটে নি। আসলে এটা জীবনেরই নিস্পৃহতা, মানুষ যার বিধানে প্রক্ষিপ্ত।

জীবনানন্দ তাঁর সবশেষের কবিতাগুলিতে ব্যাকুলভাবে শান্তির অভিলাষী হয়েছিলেন। জীবনে পবিত্র আনন্দ ও অবিনাশী শান্তির জন্য যে-কোনো মূল্য দিতে তিনি রাজি ছিলেন ; কিন্তু তাঁর এই ব্যাকুল প্রার্থনায় দ্বন্দ্বের দীর্ঘ ইতিহাস, ক্ষত-বিক্ষত হৃদয়ের অশান্ত ক্রন্দন আমাদের বিষণ্ণ ক'রে তোলে। জ্ঞানপাপ মুছে ফেলতে আমরা পারি নি, অহমিকার কারাগার থেকে মুক্ত হয়ে কোনোদিন তা পারব কিনা তাও জানি না। তাই আনন্দের, শান্তির এষণা আমাদের আমৃত্যু তাড়না করবে। রবীন্দ্রনাথের গানে সুগভীর আস্থায় সেই আনন্দের, শান্তির কথা বারবার ধ্বনিত হয়েছে। 'অসীমের পথে জ্বলিবে/জ্যোতি ধ্রুবতারকার'—এই পংক্তিতে বিশ্বাসের সে-স্বচ্ছতা আছে, 'তাই তোমার আনন্দ আমার 'পর,/তুমি তাই এসেছে নিচে/আমায় নইলে, ত্রিভুবনেশ্বর,/তোমার প্রেম হতো যে মিছে।।'—এই গানে অমৃতের যে-আত্মা বিধৃত হয়েছে—তা বিশ্বসাহিত্যে দুর্লভ। কিন্তু আজকের বিশ্বজোড়া মহামারীতে আমাদের চেতনা খণ্ডিত, বিশ্বাস শিথিল। বর্তমান এমন আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধেছে আমাদের যে রবীন্দ্রনাথের অমর্ত্যলোকে সহজভাবে নিঃশ্বাস নেয়া আমাদের সাধ্যাতীত। আমাদের জীবন, আমাদের দ্বন্দ্ব, আমাদের শান্তি ও আনন্দকামী চেতনার রক্তাক্ত সাধনা জীবনানন্দের কবিতায় প্রাণ পেয়েছে। জীবনানন্দ তাই আমাদের কবি।

রবীন্দ্র-জগৎ, সমসময় ও জীবনানন্দ

উজ্জ্বলকুমার মজুমদার

এই শতাব্দীর তৃতীয় দশকের মাঝামাঝি সময় থেকে রবীন্দ্র-বিরোধী কবিরা যখন কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন তখন তাঁদের জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুল-মোহিতলাল তো প্রেরণা যোগাতেনই, এমন কি করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন, কালিদাসের মতো পল্লীনিষ্ঠ রোম্যান্টিক কবিরা—যাঁরা 'সমতল রকমের সদৃশ' বলে রবীন্দ্রানুসারী কবিসমাজের ভিড়ে হারিয়ে গেছেন আজ—তাঁরাও রবীন্দ্র-বিরোধীদের কবিতা কল্পনালতার আশ্রয়স্থল ছিলেন। এঁরা সকলেই ছিলেন রবীন্দ্র-কাব্যের গোপন প্রেমিক কিন্তু প্রেম তাঁদের ব্যক্তিত্বকে অবলুপ্ত করে দেয়নি। বিহারীলালের স্বকীয় কণ্ঠ যেমন রবীন্দ্রনাথের স্বকীয়তার পথ করে দিয়েছিল, তেমনি রবীন্দ্র-ব্যক্তিত্ব এই বিদ্রোহীদের স্বকীয় ব্যক্তিত্ব অর্জনের পথ করে দিয়েছিল। কিন্তু বিহারীলাল থেকে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাংলা কাব্যের বিবর্তন যতটা ভাবাবেগ ও রোম্যান্টিসিজম্-এর সংহতির দিকে, হৃদয়ের সংহতি বা precise emotion প্রকাশের দিকে, ততটা যুগচেতনার দিকে নয়। কিন্তু 'কল্লোল'-'কালি-কলম'-'প্রগতি'র কবিরা রবীন্দ্রবিরোধিতা করে কাব্যরাজ্যে যে বিবর্তনের সূচনা করেছিলেন তা শুধু রবীন্দ্রকাব্যের চেয়ে কঠিনতর precision-এর নূতনত্বই নয়, সে বিবর্তন পরিবর্তিত মূল্যবোধের জন্যও ঘটেছিল। বাস্তবতার কঠিনতর চাপ, গভীরতর চেতনার উদ্দীপন, শুধু দেশিক নয়, সার্বদেশিক, সার্বকালিক সাহিত্যিক ও মানবিক জ্ঞানের ঐতিহ্যে অবগাহন—ইত্যাদি সব কিছুরই সমষ্টিজাত সেই নতুন মূল্যবোধ রবীন্দ্র বিরোধিতার অনুকূল আবহাওয়া তৈরী করেছিল। এই বিরোধীদের প্রেরণাদাতা ছিলেন সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুল, মোহিতলাল কিংবা যতীন্দ্রনাথ। এঁদের মধ্যে একমাত্র যতীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর মধ্যেই রবীন্দ্র-বিরোধিতার বীজ ছিল না। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের প্রচণ্ড প্রভাব এবং অনুত্তরণীয় ভাব ও ভাষার চাপ সত্ত্বেও উল্লিখিত কবিরা এক-একটি নিজস্ব জগৎ সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন। বহুক্ষেত্রে রবীন্দ্র-প্রভাবের লাঞ্ছনা নিয়েও এই কবিগোষ্ঠীর প্রত্যেকেরই এমন এক-একটি ক্ষেত্র ছিল যেখানে তাঁরা প্রভাব মুছে ফেলে স্বস্তিতে গৃহসুখের স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেছেন। সত্যেন্দ্রনাথ খুলে দিয়েছিলেন রূপকথা ও শিশুদৃষ্টির বিস্ময়রসের জগৎ—সেখানে নানা রঙের পরীদের রাজ্য আর ঋতুর পট শিশুলোভন হয়ে দেখা গিয়েছিল। নজরুল খুলে দিয়েছিলেন বা বলা উচিত ভেঙে খুলে দেখিয়ে দিয়েছিলেন সাম্যবাদের জগৎ, উড়িয়েছিলেন দৃপ্ত আমিত্বের রঙিন কেতন। মোহিতলাল নিয়ে এসেছিলেন তান্ত্রিক বলিষ্ঠতা-ভরা কামনাময় সত্যজগৎ। আর যতীন্দ্রনাথ খুলেছিলেন দুঃখের উৎসমুখ। যেন রবীন্দ্র-মরূদ্যানে দাঁড়িয়ে তুলনায় মরুভূমির ব্যাপকতাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। মনে হয়েছিল মরূদ্যান যেন পরিহাস। কিন্তু মরুভূমির যে বালির ঝড়ে তিনি পাঠককে সন্ত্রস্ত করে তুলেছিলেন সে ঝড় ধীরে ধীরে কেটে গেল।

দেখা গেল মরূদ্যানই দৃশ্যমান হয়ে উঠছে, শুধু দৃশ্যমানই নয়, মরূদ্যানের সবুজই ক্রমপ্রসরমান। তাঁর রবীন্দ্র-ভক্তি নতুন করে উদ্দীপ্ত হলো যে সময়ে সে সময়ে রাবীন্দ্রিক মূল্যবোধে পারিপার্শ্বিকের অদ্ভুত অনীহা। যতীন্দ্রনাথের রবীন্দ্র-দ্রোহিতা ব্যক্তিগত দার্শনিক তারই ফল, ঠিক সময়গত যন্ত্রণার অভিব্যক্তি নয়। তিনি যখন রবীন্দ্র-মূল্যবোধে ফিরে এলেন তখন রবীন্দ্র-বিরোধিতা কোন ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে আর আবদ্ধ নেই। যুগগত প্রয়োজনেই ব্যাপক ও স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। কাজেই নিঃশব্দে তাঁকে বিদায় নিতে হয়েছে। এই যুগগত প্রয়োজন আর কিছু নয়—নতুন মূল্যবোধের চাপ। এই চাপেই উত্তররৈবিক-কাল রবীন্দ্র-কাব্যকলাকে বর্জন করতে চেয়েছিল। জীবনানন্দ সেই ইঙ্গিত করেই লিখেছেন :

> 'এ যুগ অনেক লেখকের—একজনের নয়—কয়েকজন কবির যুগ। সাহিত্য রবীন্দ্রনাথের একচ্ছত্র প্রভাব অনেকদিন পর্যন্ত অনুভব করার পর এই নতুন কবি সাধারণ-সঙ্ঘ সাহিত্যের কাছে সময়ের দান।'[১]

এই 'সময়' বলতে স্বাধীনতা আন্দোলনের তীব্রতা, দেশ-বিদেশে সেই আন্দোলনের সক্রিয়তা, সমাজ ও অর্থনীতির নতুন তত্ত্বচেতনা, রুশবিপ্লবোত্তর মানবিক চেতনা ও স্বপ্ন, বিশ্বযুদ্ধোত্তর আর্থিক সঙ্কট ও সামাজিক হতাশা, বৈজ্ঞানিক ও মনোবৈজ্ঞানিক চিন্তার ক্রমবর্ধমান জটিল চাপ, নাগরিক জীবনের যান্ত্রিকতা ও নানান জৈব সমস্যা ইত্যাদির ফলে সৃষ্ট যে যুগচেতনা তাকেই বোঝানো হয়েছে। এই নতুন বোধের জন্ম হওয়াতেই রবীন্দ্র-সাহিত্য মহত্তর কবিপ্রতিভার সংশ্লেষে সৃষ্ট হলেও তার মধ্যে সমসাময়িক অশান্তি ও আলোড়নের অভাব বোধ করে 'কল্লোল'-'কালি-কলমে'র কবিরা আপাততঃ তাঁকে ভুলে থাকতে চেষ্টা করলেন। অন্যদিকে যে সব বিদেশী কাব্য-আন্দোলনে ভাব-ভাষার নানান ধরনের যুক্তি-চেষ্টা গড়ে উঠেছিল তাতেই উপযুক্ত খোরাক পেলেন। নতুন বিদ্রোহের আদর্শ-নির্বাচনে পূর্বজ বিদ্রোহীদের স্মরণ করা হলো যথেষ্ট আবেগ ও শ্রদ্ধার সঙ্গে। ১৯৪৬ সালের একটি চিঠিতে জীবনানন্দ লিখেছেন :

> 'ইস্কুলে পড়বার সময় যেমন প্রমথ চৌধুরী, সত্যেন দত্ত, প্রভাত মুখুজ্যে ফরাসী ও রুশ গল্পের 'ছায়া অবলম্বনে'র ওস্তাদ রূপকার চারুবাবু ও মণি গাঙ্গুলী—ও পরে অন্য গ্রামে শরৎ চাটুজ্যেকে অন্তর্জীবনে জড়িত করে নিতে হয়েছে। কল্লোলের যুগে তেমনি সমালোচকদের পেয়েছি আর এক রকমভাবে, অনেকটা নাগালের ভিতরে। মানসপরিধি থেকে পূর্বজেরা তখন সরে গিয়েছেন খানিক দূরে—অনেক দূরে—রবীন্দ্র, বঙ্কিম ও বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন ঐতিহ্যও ধূসরায়িত হয়ে গিয়েছিল বড় বড় বৈদেশিকদের উজ্জ্বল আলোর কাছে। বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল'-আন্দোলনের প্রয়োজন ছিল। সাহিত্য ও জীবনের ঘুরুনো সিঁড়ি দুয়ে মিল এক হয়ে এক পরিপূর্ণ সমাজ-সার্থকতার দিকে চলেছে মনে হয়, 'কল্লোলে'র সাময়িকতা সেই সিঁড়ির একটা দরকারী বাঁক।'[২]

এই কথা বলবার পাঁচ বছর আগে (১৩৪৮) 'রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা' প্রবন্ধে এই রবীন্দ্র-অতৃপ্তিকে স্পষ্ট করেছিলেন :

'মধুসূদন যেমন বিদেশী সাহিত্যিকদের কাছে যথেষ্ট পরিমাণে ঋণী—রবীন্দ্র-বঙ্কিমও তাঁদের কাছে অল্পাধিক গিয়েছিলেন—বর্তমান কবিদেরও অল্পবিস্তর পরস্পর-নিঃসক্ত বিশেষ-বিশেষ গোষ্ঠী তেমনি বোদলেয়র ও ফরাসী প্রতীকী কবিদের থেকে শুরু করে ইয়েটস্ এলিয়ট ও পাউণ্ড-এর কাছে গেলে খানিকটা হৃদয়ের সাহচর্য ও কিছুটা অভিনবত্বের গরিমা সে সব জায়গায় খুঁজে পেয়েছে বলে। রবীন্দ্রনাথের কবিতার চর্চা আধুনিক বাঙালী কবির তেমন মন যোগাতো না ; অন্তত যারা আধুনিক বিশিষ্ট বাঙালী কবি রবীন্দ্রনাথকে তারা বিস্পষ্ট বিভ্রমে প্রণাম জানিয়ে মালার্মে ও পল ভারলেন, রঁসার ও ইয়েটস্ ও এলিয়ট-এর সদর্থক বা নঙর্থক মননবিচিত্রতার কাছে গিয়ে দাঁড়াল।'[৩]

জীবনানন্দের মতে 'নতুন সময় তার নতুন দায়িত্ব নিয়ে এসেছে' বলেই রবীন্দ্রনাথকে এ কালের কবিরা 'মর্মান্তিক শ্রদ্ধায় সমসাময়িকতার অসাচ্ছন্দ্যের থেকে ঘুচিয়ে দিয়ে আধুনিকেরা গ্রহণ করলেন এলিয়টকে' যে এলিয়ট কতকগুলি রিক্ত নিঃস্ব মানুষের বাক্‌শক্তিহীন অর্থহীন স্বপ্নের ছবি এঁকেছেন। এই নতুন সময়চেতনার ফলেই জীবনানন্দ বলেছেন, 'আধুনিক কালের ভাব ও চিন্তা বৈষম্যের হেঁয়ালির ভিতরে পড়ে ক্ষয়িষ্ণুতার সুর আধুনিকদের স্পর্শ করেছে বেশী।' বোদলেয়র থেকে শুরু করে যে কবিদের কথা পূর্বের উদ্ধৃতিতে পাচ্ছি তাঁরা সকলেই মানুষের গভীরতম জটিলতার নানা দিক স্পর্শ করেছেন, গভীরতর ব্যক্তিত্বের প্রকাশে সচেষ্ট হয়েছেন, নিজেদের দিব্যানুভূতির বাণীবাহকরূপে ততটা প্রচার না করে এলিয়ট যাকে বলেছেন 'dark embryo', ব্যক্তিত্বের সেই নিহিত সৃষ্টিমুখী অন্ধকার ভ্রূণের আহ্বানে সাড়া দিয়ে নতুন নতুন ছবি প্রতীক খুঁজেছেন, ঐতিহ্যবৃত কাল ও সময়-চেতনা সম্পর্কে সচেতন থেকে বস্তুজগতের নৈতিক ও সৌন্দর্যগুণকে মিশিয়ে সমৃদ্ধতর, তীব্রতর মানবচেতনাকে প্রকাশ করার চেষ্টা করেছেন। অর্থাৎ রোম্যান্টিকদের থেকে প্রচারমুখীনতা থেকে সরে এসে, তাদের নতুন সমাজ গঠনের স্পষ্ট ও তীব্র স্বপ্ন থেকে বিরত থেকে, আর বোদলেয়র যাকে বলেছেন 'purile utopias'–সেই ইউটোপিয়াকে ঘৃণা করে পশ্চিমের আধুনিক কবিরা যেমন অন্তঃসংগ্রামে ডুবে গেছেন, তেমনি যুদ্ধোত্তর বাঙালী কবিরাও দেশ ও কাল এই বৃহত্তর চেতনাজ্ঞানে রবীন্দ্রনাথের দিব্যানুভূতিতে অতৃপ্তি বোধ করেছেন। জীবনানন্দের ভাষায়, 'দু-একজন কবির কিছু-কিছু কবিতা ছাড়া আধুনিক বাংলা কবিতায় ভঙ্গুরতার ছাপ এমন দেদীপ্যমান যে মুহূর্তের জন্যেও রবীন্দ্রনাথের যে-কোনো কবিতা বা গানের সংস্পর্শে এলে মনে হয়, তাঁর সঙ্গে আধুনিকদের আদর্শগত বিসদৃশতা কী ভয়াবহভাবে চমৎকার।'[৪]

এই ক্ষয়িষ্ণুতার পরিবেশেই জীবনানন্দের পক্ষে বলা সম্ভব হয়েছিল, 'বিশ্বাস বা তার অভাবের পরিমিত প্রসার ও গভীরতা নিয়েই কবির কাজ।'[৫] একই সঙ্গে বিশ্বাস অবিশ্বাসের দুটি দিকেই জীবনানন্দের কবি-চেতনাকে তৈরী করেছিল। অবিশ্বাসজনিত অন্য কোন স্বপ্ন সত্যে আস্থা কিংবা মৃত্যুবোধে আচ্ছন্ন হয়ে জীবনের গভীর স্বাদে আকুল হয়ে মেঠো চাঁদের উদাসীনতাকে স্পর্শ করার চেষ্টা অন্তত রবীন্দ্রনাথে পাওয়া যাবে না। খুব সম্ভব জীবনানন্দের এই ধারণা ছিল যে জীবন অসৎ পরিণতি, আত্মনাশ ও সর্বনাশের

৩। কবিতার কথা : পৃষ্ঠা ২৩।
৪। কবিতার কথা : পৃষ্ঠা ২৫।
৫। সত্য, বিশ্বাস ও কবিতা ; কবিতার কথা : পৃষ্ঠা ৮২।

ভয়াবহ অভিজ্ঞতা ছাড়া জীবনের বা কবিতার স্বাদ গভীর হয়ে ওঠে না। শেষ বয়সে মৃত্যুর অন্তিম মুহূর্তে রবীন্দ্রনাথ সৃষ্টির পথে মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন, সন্দেহবাদীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। এ ছাড়াও বৈপরীত্যের মধ্যেই যে শাশ্বতের অনুভব ঘটে থাকে—এই চিন্তা তাঁরও মৌলিক চিন্তা ছিল, কিন্তু সেই বৈপরীত্য যে 'সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতের কঠিন আবছায়া'য় কতখানি তীব্র ও রক্তক্ষয়ী অংশ নিয়ে রয়েছে তা রবীন্দ্রনাথে যেমন 'বিশুদ্ধ দুঃখ' রূপে দেখা দিয়েছে জীবনানন্দের কবিতায় তেমন দেখা যায়নি। বরং অনেক বেশী ইন্দ্রিয়ময় তিক্ততার মধ্য দিয়ে তার অস্তিত্ব এখানে বুঝতে পারি। সৃষ্টির স্রোতে একান্তর তরঙ্গে জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়া একই সঙ্গে দেখেছেন তিনি ঃ

> "সৃষ্টির নাড়ীর 'পরে হাত রেখে টের পাওয়া যায়
> অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে রয়ে গেছে অমোঘ আমোদ
> তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋণ শোধ।"

সৃষ্টি যে দুঃখ বেদনার মধ্য দিয়ে উদ্দিষ্ট আনন্দের 'আবহমান' ঋণ শোধ করে চলেছে এই রাবীন্দ্রিক চিন্তা আপাতত জীবনানন্দে দেখতে পাই না।

কিন্তু জীবনানন্দের কাব্যবিবর্তন লক্ষ্য করলে দেখা যাবে এই অসম্ভব বেদনাকে মেনে নিয়ে অমোঘ আনন্দের জীবন কীভাবে চেতনার প্রদীপের আলোকে সংহততর হয়ে চলেছে জন্ম-জন্মান্তরে কবি-চেতনার মধ্য দিয়ে।

তৃতীয় দশকে নবীন কবিতার স্বভাব নির্ণয়ে রবীন্দ্রোত্তীর্ণতার প্রসঙ্গ টেনে বুদ্ধদেব বসু একবার বলেছিলেন ঃ

> 'যাকে 'কল্লোল'-যুগ বলা হয়, তার প্রধান লক্ষণই বিদ্রোহ, আর সে বিদ্রোহের প্রধান লক্ষ্যই রবীন্দ্রনাথ। এই প্রথম রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে অভাববোধ জেগে উঠল—বদ্ধা প্রাচীনের সমালোচনার ক্ষেত্রে নয় অর্বাচীনের সৃষ্টির ক্ষেত্রেই। মনে হ'লো তাঁর কাব্যে বাস্তবের ঘনিষ্ঠতা নেই, সংরাগের তীব্রতা নেই, নেই জীবনের জ্বালাযন্ত্রণার চিহ্ন, মনে হ'লো তাঁর জীবন-দর্শনে মানুষের অনতিক্রম্য শরীরটাকে তিনি অন্যায়ভাবে উপেক্ষা ক'রে গেছেন।...এর মূল কথাটা আর কিছু নয়—সুখস্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার প্রয়াস, রবীন্দ্রনাথকে সহ্য করার, প্রতিরোধ করার পরিশ্রম। প্রয়োজন ছিলো এই বিদ্রোহের—বাংলা কবিতার মুক্তির জন্য নিশ্চয়ই, রবীন্দ্রনাথকেও সত্য ক'রে পাবার জন্য। লক্ষ করতে হবে, এই আন্দোলনে অগ্রণী ছিলেন সেই সব তরুণ লেখক, যারা সবচেয়ে বেশি রবীন্দ্রনাথে আপ্লুত।"[৬]

এই রবীন্দ্র-বিরোধী সংগ্রামে রসদ জুগিয়েছিল পশ্চিমী সাহিত্য। যুদ্ধোত্তর জীবনের সংশয়, ক্লান্তি, বিতৃষ্ণার উপকরণ পশ্চিমী কাব্যেই ঘনিষ্ঠ ভাবে পাওয়া গিয়েছিল। বিশ্বযুদ্ধ ভারতীয় চেতনাকে আন্তর্জাতিক জীবনচেতনার সঙ্গে অনেক বেশী ঘনিষ্ঠ ও অনিবার্যভাবে যুক্ত করে দিয়েছিল। এই পরিবেশকে জীবনানন্দও ব্যাখ্যা করবার চেষ্টা করেছেন এবং তাতে 'প্রতিরোধ করার পরিশ্রম'টুকু কোথায় তা আরও একটু স্পষ্ট হয়েছে ঃ

'দৃষ্টিভঙ্গীর এই ব্যতিরেকী গতির জন্যে আধুনিক বাংলা কবিতার চিন্তা ও ভাষা

রবীন্দ্র-কাব্যের থেকে পৃথক পথে চলতে শুরু করেছে—এইটুকু মাত্র বলতে পারা যায়। কিন্তু তবুও বাংলার মাটিতে রবীন্দ্রনাথের যুগে এসে যারা ভাবাবেগ ও রোম্যানটিসিজম্‌কে সংহত করে কবিতার ভিতরে তীর্থিকের মতো তপঃশক্তি অথবা হোরেসের রীতি অথবা নিজেদের হৃদয়ের ঈশদঙ্কুরিত অন্য এক সংহতি আনতে চায় তারা তাকিয়ে দেখে উপরে-নীচে-সম্মুখে রবীন্দ্র-কাব্যের অনপনেয় ছায়ায় তাদের স্বাবলম্বনের বিবর্তন চলেছে।'[৭]

এখন জীবনানন্দের কাব্যচেতনায় পূর্বজ কবি-মনের ছায়া কতটুকু এবং কোথায় স্বকীয় অস্তিত্বের বোধকে তিনি খুঁজে পেয়েছেন বা স্বাবলম্বনের বিবর্তন ঘটাচ্ছেন তা লক্ষ্য করা যেতে পারে।

প্রথমেই লক্ষণীয় যে 'ঝরা পালক' (১৯২৭) এবং 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' ১৯৩৬)—এই দুটি বইতে কবি যে স্বকীয় অস্তিত্বকে খুঁজতে চাইছেন, সময়ের হাত থেকে বাঁচিয়ে যে স্বপ্নকে নিজের মতো গড়ে নিতে চাইছেন তা যে সর্বত্রই তপঃশক্তির শক্তিতে সারবান একথা বলা যাবে না। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র দ্বিতীয় সংস্করণে প্রথম সংস্করণের সমকালে রচিত কিছু নতুন কবিতা যুক্ত হয়েছে। সেগুলির মধ্যে কিছুটা সংহতি চোখে পড়ে। কিন্তু সাধারণভাবে এক ধরনের শিথিলতা, নানা উপমায় ঘুরিয়ে ফিরিয়ে মূল অনুভব সূত্রটিকে গেঁথে তোলবার চেষ্টা, যুদ্ধোত্তর ইংরেজ কবিদের শব্দ ও বাক্‌ভঙ্গী, পুনরাবৃত্তির কৌশলকে ব্যবহার করে উদ্দিষ্ট ভাবকে হৃদয়ের গভীর থেকে গভীরতর প্রদেশে অন্তর্লীন করে দেবার চেষ্টা ইত্যাদি রোম্যান্টিক, ভিক্টোরিয় ও আধুনিক ইংরেজী-কাব্যের নানা বাহুল্যকে জীবনানন্দ আত্মসাৎ করেছেন। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র 'বোধ', 'নির্জন স্বাক্ষর', 'অবসরের গান' ইত্যাদি কবিতায় এইসব কৌশল-প্রয়োগের প্রমাণ মিলবে। অবশ্য সর্বত্রই যে শেষোক্ত কৌশলটি বাহুল্য তা নয়, তার মধ্যে দক্ষতার প্রমাণও যথেষ্ট আছে। বিশেষ করে জীবনানন্দের কবিচেতনার যে বিষণ্ণ আলস্যভরা দিকটি আছে, যে অলস চেতনায় তিনি প্রায়ই রক্তের মধ্যে ক্ষয় ও মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পান সেই চেতনার সঙ্গে 'বিয়োগের-মরণের মুখে এসে পড়ে সব/ঐ মৃত মৃগদের মতো' [ক্যাম্পে] কিংবা শূন্য মনে হয়, শূন্য মনে হয়' [বোধ] ইত্যাদি পংক্তিগুলি কবির অবচেতনবাসীর সঙ্গে পরিচয় ঘটিয়ে দেয়। মূলকথা, রোম্যান্টিক ও ভিক্টোরীয় যুগের বাহুল্য যেমন রবীন্দ্রনাথের রোম্যান্টিক চেতনায় ও কাব্যশরীরে জড়িয়ে আছে, জীবনানন্দের কবিতাও—বিশেষ করে তিরিশের দশকের কবিতা—এই বাহুল্যে প্রায়শঃ বিকীর্ণ, আলুলায়িত।

জীবনানন্দের কবি-ব্যক্তিত্বের রোম্যান্টিক চেতনাটুকু রবীন্দ্র-কাব্যেরই অনস্বীকার্য দান। ইতিহাস-চেতনা, স্বপ্ন-প্রয়াণ, অন্তর্নিহিত কবিত্ব শক্তিকে জীবনদেবতার মতো পরিচালকের মর্যাদা দান ('অনেক আকাশ' কবিতায় 'ওগো শক্তি', 'হে তুমি ক্ষমতা', 'আমি প্রণয়িণী',—'তুমি হে অধীর, আমার প্রণয়ী'—ইত্যাদি সম্বোধন ও সম্পর্কসূত্রগুলি স্মরণীয়), নিরুদ্দেশ অতীত ও দুনিরীক্ষ্য ভবিষ্যতের প্রতি টান, প্রকৃতি ও মানুষের একাত্মতা, প্রকৃতির মুখে জীবনের উল্লাস, যন্ত্রণা-বেদনা ও হতাশার প্রতিফলন, রোমাঞ্চ, ভয় ও বিস্ময়ের প্রতি আকর্ষণ, আনন্দ বেদনায় মিশ্র শিহরণ, নির্বস্তুক ভাবরূপের উপমার মূর্ত ইপমেয়ের প্রকাশ মানসী-প্রিয়ার, করুণ লাবণ্য ও অবক্ষয়িত রূপের প্রতি টান, মৃত্যুমোহ, সৌন্দর্যের প্রাচুর্যে উল্লাস ও অতৃপ্তিবোধ, সৌন্দর্যের পলাতকাবৃত্তি ইত্যাদি

৭। কবিতার কথা ঃ পৃষ্ঠা ২১।

যতগুলি লক্ষণ রবীন্দ্র-কাব্যালোকে ও সমসাময়িক কবি সঙ্ঘের মনোজগতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের কাব্যোপলব্ধিগত সংঘর্ষে সমাহৃত হয়েছিল তা সমস্তই জীবনানন্দের কাব্যজগতে সঞ্চারিত হয়েছে। তা ছাড়াও যে বিশিষ্ট লক্ষণগুলি তাঁর কাব্যশরীরে লক্ষণীয় সে প্রসঙ্গে পরে আসছি। সেই লক্ষণগুলি জীবনানন্দকে রবীন্দ্রোত্তর কালের আধুনিকতায় পৌঁছে দিয়েছে।

এই সব রোম্যান্টিক লক্ষণ ছাড়া যে রোম্যান্টিক কৃত্রিমতা ও চাকচিক্যে রবীন্দ্রানুসারী কবি সমাজ এই শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে কাব্যজগতে বিশিষ্ট হয়ে উঠেছিলেন সেই কৃত্রিমতা, চাকচিক্য, নিরুত্তাপ হৃদয়াবেগ কিংবা বাঁধভাঙ্গা উদ্দামতা, ছন্দ ও শব্দচেতনা, সমতল সাংবাদিকতা, ঈষৎ পল্লীনিষ্ঠ রোমান্স জীবনানন্দের সূচনা-পর্বের কবিতায় খুঁজে পাওয়া যাবে। সত্যেন্দ্রনাথ, মোহিতলাল কিংবা নজরুলের বক্তব্য ও ধ্বনিসঙ্গীত জীবনানন্দের 'ঝরা পালকে'ও প্রতিধ্বনিত হতে দেখি :

'ফেনার বৌয়ের নোনতা মৌয়ের মদের গেলাস লুটে/ভোর সাগরের সরাবখানায়—মসগুলাতে জুটে/হিমের ঘুণের বেড়াস্ গুণের আগুনদানা জ্বেলে।' কিংবা 'নবীন প্রাণের সাড়া/আকাশে তুলিয়া ছুটিছে মুক্ত যুক্তবেণীর ধারা' কিংবা 'ছেড়ে গেলে মর্মন্তুদ মর্মর বেষ্টন/সমুদ্রের যৌবনগর্জন/তোমারে ক্ষ্যাপায়ে দেছে, ওহে বীর শের/টাইফুন-ডঙ্কার হর্ষে ভুলে গেছ অতীত আখের/হে জলধি পাখি!' কিংবা 'পাড়ার মাঝারে সবচেয়ে সেই কুঁদুলি মেয়েটি কই?/কতদিন পরে পল্লীর পথে ফিরিয়া এসেছি ফের,—/সারাদিনমান মুখখানি জুড়ে ফুটিত যাহার খই....।' এইসব উদাহরণগুলিতে সত্যেন্দ্রনাথ, নজরুলের, মোহিতলাল, রবীন্দ্রনাথ এবং শেষতঃ করুণানিধান, যতীন্দ্রমোহন, কুমুদরঞ্জন কিংবা কালিদাস রায়ের অনুশীলিত কাব্য-চর্চার অনুসরণ চোখে পড়ে। সত্যেন্দ্রনাথ-নজরুলের শব্দধ্বনি-সঙ্গীত-সচেতনতা, প্রাণশক্তির উন্মাদনা ও সেই ঐতিহ্যাশ্রিত স্বপ্ন-আবেগ, নজরুল-মোহিতলালের শৈলী সুলভ ঝোড়ো উন্মাদনা ও সেই সূত্র ধরে 'বলাকা'র প্রতীক-স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথের বিসারিত মুক্তিচেতনা এবং করুণানিধান-কুমুদরঞ্জন ইত্যাদির পল্লী-নিষ্ঠা ও পল্লীরোম্যান্স জীবনানন্দকে বাংলা কবিতার দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের মধ্যেই স্থিত হতে শিক্ষা দিয়েছে। জীবনানন্দ এই ঐতিহ্য-লগ্নতাকেই 'কবির শিক্ষা' বলেছেন :

> "যে কালে সমাজে ও যে বিসারে কবি রয়েছেন এবং যে সময় যে সমাজে তিনি ছিলেন না, কিন্তু তবু সে জিনিসগুলো রয়ে গিয়েছিল, আছে, থাকবে—সে সবের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে সৎ কবি তাঁর প্রতিনিয়ত শিক্ষিত মনকে আরও বেশী শিক্ষিত করে নিচ্ছেন, যা স্বভাব-প্রতিভা বলে মনে হয়েছিল সেটাকে আরও স্থির ও বিশুদ্ধ করে।"[৮]

কিন্তু এই স্থিরতা ও বিশুদ্ধির পর্যায় কবিকে যদি স্বাবলম্বী হতে না শেখায় তবে তিনি অনুকারকের ভীড়ে হারিয়ে যান। পরিবর্তমান বিশ্ব ও প্রবহমান অভিজ্ঞতা তাঁকে যদি নতুন দৃষ্টি ও ভাষার সন্ধানে উদ্বিগ্ন না করে তবে তাঁর বিশিষ্টতা গড়ে ওঠে না। 'কল্লোল'-গোষ্ঠীর কবিরা এই কারণেই রবীন্দ্র কাব্যের 'অনপনেয় ছায়ায়' থেকেও 'স্বাবলম্বনের বিবর্তন' ঘটাতে সচেষ্ট হলেন। স্বদেশ-বিদেশের সামাজিক ও রাজনৈতিক দ্রুত পট-পরিবর্তন, মানবিক মূল্যবোধের পরিবর্তন,—

৮। কবিতার কথা : পৃষ্ঠা ৯৩।

অবক্ষয় ও প্রসার, গভীরতর চেতনা ও উপলব্ধির প্রকাশে নানা দেশের কবি-সাধনা সেই বিবর্তনের ধারাকে অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করছে। জীবনানন্দ লিখেছেন ঃ

"নিজের দেশের কবিতায় দীর্ঘকালের ঐতিহ্যের ভিতর স্থিত হয়েও আজকের মুখ্য কবি পৃথিবীর, বিশেষত পশ্চিমের শ্রেষ্ঠ কাব্য উপলব্ধি করতে পেরে বাংলা কবিতাকে এমন এক জায়গায় এনে দাঁড় করাতে পেরেছেন যে তার ভবিষ্যৎ পরিণতির প্রশ্ন বৈষ্ণব পদাবলী, মঙ্গল-কাব্য, পূর্ববঙ্গ গীতিকা বা মধুসূদন বা রবীন্দ্রনাথের সত্যের ভিতরই শুধু আটকে নেই—কিন্তু যেখানেই মানুষ তার আধুনিক চেতনাকে মহান কবিতায় প্রকাশ করতে পেরেছে সে-সবের সঙ্গেও যুক্ত।"[৯]

এই আন্তর্জাতিক আধুনিক চেতনার মুখে দাঁড়িয়েই তৃতীয় দশকে 'কল্লোল' ও 'কল্লোল'-সংস্পৃষ্ট কবিরা শ্রমিক-সচেতন হয়েছেন, নিখিল মানবতার আত্মীয় হয়েছেন, মানবিকতার সঙ্গে ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ অণু-পরমাণুতেও সেই সহানুভূতির বেদনা অনুভব করেছেন, মানবিক অবক্ষয়ে নিরাশ হয়েছেন, মনের গহন-গভীরে নানা সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা (বিশেষতঃ যৌন আকাঙ্ক্ষা) সম্পর্কে সচেতন হয়েছেন, মৃত্যুকে পাশে রেখেই জীবনের স্বাদকে নতুন ইন্দ্রিয়ময়তায় ধরবার চেষ্টা করেছেন। অচিন্ত্যকুমার রবীন্দ্র-প্রভাবিত রোম্যান্টিক হয়েও আরও গাঢ়বদ্ধ, কামনা ও সুন্দরের সম্মেলনে আগ্রহী বৃহৎ মানব ও জড়-চেতনায় বিশ্বাসী। প্রেমেন্দ্র মিত্রের মধ্যেও বৃহৎ মানবচেতনা ও জড়চেতনা বিশেষ ক্রিয়াশীল, তার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নিপীড়িত-শ্রমিক-চেতনা ও প্রোটোপ্লাজম্ বাহিত আদি পঙ্কের ঋণ (এই চেতনা ও নিপীড়িত মানুষের প্রতি সহানুভূতিকে রোম্যান্টিক আবেগেই মেলানো হয়েছে, মানুষের বলিষ্ঠ আত্মপ্রত্যয়ের ওপর এই আদিপঙ্কের ঋণ শোধের দায়িত্ব দেওয়া হয়নি)—যা বিশেষ ভাবেই রবীন্দ্র-জগতের বাইরে আধুনিক পৃথিবীর উপলব্ধিজাত ভাবনা। বুদ্ধদেব বসু রবীন্দ্র-প্রভাবিত হয়েও প্রেম ও যৌবনাকাঙ্ক্ষয় প্রকৃতি ও শিল্পের সম্পর্ক বিচারের ক্ষেত্রে পশ্চিমের কাব্যোপলব্ধির কাছে বিশেষভাবেই ঋণী, ইন্দ্রিয়সচেতন সৌন্দর্য সচেতনতায় বোদল্যার, রিল্‌কে ও হ্যেল্ডালিনের অভিজ্ঞতায় তিনি সমৃদ্ধ ও রবীন্দ্র-প্রভাব অতিক্রান্ত। বিষ্ণু দে শ্রেণী-সচেতনতা, লৌকিক সংস্কৃতি-চেতনা, বিদ্রূপ-ব্যঙ্গের দক্ষতা, জনশক্তি-প্রত্যয় ও প্রকৃতিচেতনাকে বুদ্ধি ও আবেগ মিশিয়ে রবীন্দ্র-প্রভাবকে উত্তীর্ণ হয়েছেন। আধ্যাত্মিকতায় রাবীন্দ্রিক হয়েও সংগতিবোধে, আন্তর্জাতিক চেতনায়, জঙ্গমতা-বোধে, সূক্ষ্ম চীনে তুলির আঁচড়ে, ইমেজিষ্ট ভঙ্গিতে আপাত-অসংলগ্ন ছবির মধ্যে নিগূঢ় সংশক্তি এনে, স্বল্পবাক্ এমন কি স্তব্ধবাক্ সংহতিতে অমিয় চক্রবর্তী, রবীন্দ্র-জগৎ থেকে সরে এসেছেন। সৎ-পরিশ্রমী সংহতি-সাধক সুধীন্দ্রনাথ সমকাল-চেতনায় এক বলিষ্ঠ নিঃসঙ্গতাকে আয়ত্ত করে জীবন-মৃত্যু রহস্য-সন্ধানী হতে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু বুদ্ধি ও অনুভবের প্রচণ্ড সংগ্রামে সেই নিঃসঙ্গতা ও মৃত্যুচেতনাকে অবখ্যাত রেখে দিতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁর অনুসন্ধানী আত্মা ও প্রতিবাদী আত্মার দ্বন্দ্ব এমন বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের ট্র্যাজেডিকে ফুটিয়েছে যা ইতিপূর্বে রবীন্দ্রনাথ বা রবীন্দ্রানুসারী কবি-গোষ্ঠীর মধ্যে দেখা যায়নি। উল্লিখিত সব কবিরাই কাব্যরীতিতে গদ্য-পদ্যের মিলন সাধনের চেষ্টায় অনেক দূর এগিয়েছেন—রবীন্দ্রনাথ যার সূচনা করে দিয়েছিলেন। অথচ সকলেই রবীন্দ্রোত্তর জগতে এসে সমধর্মী হলেন না। কিছুটা সাধারণ সমধর্মিতা তো

৯। কবিতার কথা ঃ পৃষ্ঠা ১১৪।

থাকবেই, 'স্বতন্ত্র আধুনিক চেতনা'র ব্যবহারগত সমস্যার সমাধানে এই স্বাতন্ত্র্যচেতন কবিদের ব্যক্তি-বৈশিষ্ট্যের প্রয়োজন আছে বলেই সমকালীন উল্লিখিত কবিদের মতো জীবনানন্দও এক স্বতন্ত্র পথ ধরলেন।

'ঝরা পালকে' ঐতিহ্য-মগ্নতা সত্ত্বেও দেখা গেল জীবনানন্দ রাবীন্দ্রিক কোনো মানসী মূর্তির কল্পনায় বিভোর হতে চাইছেন না। এমন এক নতুন আকাশকে তাঁর 'নীলিমা' কবিতাটিতে তিনি ব্যবহার করলেন যা "বাস্তবের রক্ততটে' 'মোহিনী মায়া'র স্পর্শ নিয়ে এলো। জীবন-পাখির ঝরা পালকের দুঃখ ঘোচাতে স্বপ্ন-ময়ূরের ডানা বিস্তারিত হলো। যেন ইয়েট্‌সের স্বপ্নাতুরতার সান্নিধ্যে এলেন। রবীন্দ্রনাথ যেমন স্মৃতির অমর শিল্প ছেড়ে জীবনকে মৃত্যুর মধ্য দিয়ে ভারমুক্ত চির পথিকের নতুন সিংহদ্বার যাত্রায় গতিশীল করে তুললেন, দেবতার অমর মহিমায় মৃত্যু তুচ্ছ হলো, বসন্তের উজ্জ্বল চিরনবীন স্মৃতি নিয়ে তিনি হেমন্ত.পার হতে চাইলেন, তেমনি জীবনানন্দ অতীত স্মৃতিকে বসন্তের রঙে জাগাতে গিয়েও পারলেন না, হেমন্তের বিদায় গোধূলি তাঁকে আচ্ছন্ন করলো, অতীতস্মৃতির বেদনাকে বুকে নিয়ে অনিবার্য মৃত্যুকে তিনি বরণ করলেন। রবীন্দ্রনাথের 'তাজমহল' চির-পথিক জীবনকে যদি মুক্তি দিয়ে থাকে তবে জীবনানন্দের 'পিরামিড' বৃথাই বসন্তের অপেক্ষায় থেকে শ্মশানের ছাই উড়িয়ে জীবনের বুকে ব্যথার পাথর চাপিয়েছে। তাই জীবনের তৃষ্ণা ও স্বপ্নের মধ্যে মৃত্যুর অঙ্গারকেই দেখেছেন কবি, অন্ধকার থেকে অন্ধকারে যাবার পথে জীবনের এই 'পলাতকা নীলিমা'র অর্থ খুঁজে পাননি।

একদিকে জন্মের অন্ধকার অন্যদিকে মৃত্যুর অন্ধকার—এই দুই অন্ধকারের মাঝে যে ইতিহাস তা মৃত্যুর ঘ্রাণেই ধূসর। এই মৃত্যুর ঘ্রাণকে তিনি ইতিহাসের নির্মম সত্য থেকে আরও ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছেন। অতীতের এই মৃত্যুচেতনা ভবিষ্যতের নির্মম পরিণতি সম্পর্কেও তাঁকে সজ্ঞান করেছে এবং প্রতি মুহূর্তে অতীত ভবিষ্যৎ-চিন্তার সূত্রে বর্তমানকে জড়িয়ে ফেলেছেন তিনি, দেশ-কাল-সন্ততির চেতনার সঙ্গে মৃত্যুচেতনা যুক্ত হয়ে এক বিরাট জিজ্ঞাসার চিহ্ন তৈরী হয়ে গেছে তাঁর মনে। রবীন্দ্রনাথের কাছে মূলতঃ ইতিহাস ছিল সার্থকতার ধাপ, জীবনানন্দের কাছে ইতিহাস জীবন-মৃত্যুর ওঠা-পড়ার এক বিরাট শোভাযাত্রা—যার স্পষ্ট কোন অর্থ নেই বলেই তা 'চিন্তা আর জিজ্ঞাসার অন্ধকার স্বাদ' ছাড়া আর কিছু নয়।—'যে জীবন যেই মৃত্যুরীতি/মহা ইতিহাস এসে এখনও জানেনি যার মানে, [যাত্রী]। এই মৃত্যুরীতিময় জীবনচেতনাকে নির্ভর করেই এমন এক জগৎ জীবনানন্দ তৈরী করলেন যা একেবারেই অরাবীন্দ্রিক এমনকি সমসাময়িক উল্লিখিত কবিদের জগৎও তার থেকে অনেক দূরে। সে জগতে হেমন্তের ধানকাটা ফাঁকা মাঠে বাঁকা চাঁদ মৃত্যুর প্রেতসাক্ষী হয়ে দেখা দেয়, জীবনের তৃষ্ণা ফুটে ওঠে ইঁদুরের খুদ চুরিতে, সাদা হাড়ের কঙ্কালের ওপর সৌন্দর্যের বোরখা পরে সুন্দরী ঘুরে বেড়ায়, মহাকাল পেঁচা চোখ উলটে শিকার খোঁজে, সোনার ধান নুয়ে থাকে কাস্তের অপেক্ষায়, ঘাই-হরিণীর ডাকে বলির পাঁঠার মতো চমকে ওঠে বনের হরিণ, হৃদয়ের পরিণত ফল যেখানে রসভরে অসহ উচ্ছ্বাসে ফেটে পড়ে না, নষ্ট শসা, পচা চালকুমড়োর মতো যার বিকৃতি ও বিনষ্টি, কুঁজ ও গলগণ্ডের মতো যার বীভৎস বাহুল্য, মণিরতন হারে রাজবেশী নায়ককে সরিয়ে যেখানে ছিমছাম ফিরিঙ্গি যুবক চলাফেরা করে, থামে-ঠেস দেওয়া ব্লায়ার পাইপ হাতে বুড়ো গরিলার মতো লোল নিগ্রোর হাসি শোনা যায়, ইতিহাস-দর্শন-রাজনীতির নানা পরিক্রমা ও প্রেক্ষাপটের আভাস দিয়ে যায় নচিকেতা, বুদ্ধ, শ্রীজ্ঞান, জরথুষ্ট্র, লাওৎসে, রুশো, মার্কস, লেনিন, কুইস্‌লিং, হিটলার, কে. এম.

মৃণী ইত্যাদি নাম, নায়িকারা যেখানে সর্বনাম ছেড়ে বাস্তবের নাম নিয়ে শরীরী হয়ে কবির বিশেষ বিশেষ চেতনার মুহূর্তে তাৎপর্যময় নাম নিয়ে এসেছে কিংবা বাস্তব থেকে নির্বিশেষ চেতনায় অবলীন হতে গিয়েও কখনো কখনো নাম-ধাম নিয়ে এসেছে, শহর-সভ্যতা পৃথিবীর বুকের ক্ষত হয়ে কবিকে যেখানে নিসর্গের শান্তি ও স্বচ্ছতা খুঁজতে বাধ্য করেছে,—কোনো অসীমের টানে খুঁজতে হয়নি।

কিন্তু ইতিহাসচেতনার সূত্রে মৃত্যুচেতনাকে জেনেও, মানুষকে বেদনার সন্তান জেনেও জন্ম-মৃত্যু-চক্রের ওঠা-পড়া, জীবনের অসুখ ও প্রকৃতির স্নিগ্ধ-শুশ্রূষার আবহমানচেতনা সম্পর্কে কবি সজ্ঞান হয়ে উঠেছেন ক্রমশঃ। শাশ্বত রাত্রির বুকে অনন্ত সূর্যোদয় দেখে আশ্বস্ত হয়েছেন। মানুষের জীবন ক্ষত-বিক্ষত হয়ে মৃত্যুকে বিলীন হয়েও বারবারই নানা অভিজ্ঞতায় চেতনার গভীর, গভীরতর প্রদেশে আলো ফেলে চলতে থাকে। এক এক যুগের মানুষ বিপন্নবোধকে জেনে শাশ্বত যাত্রীর ভূমিকা নিয়ে চলেছে, আর তার চেতনাকে 'পবিত্র-অগ্নি', 'অমেয় সুসময়', 'মহানীলাকাশ', 'শতজলঝর্নার ধ্বনি' উপলব্ধি প্রতিবিম্বিত হয়েছে। তার অনির্দিষ্ট আঁধার ভবিষ্যৎ সেই চেতনার গভীরতর উপলব্ধিতে 'স্নিগ্ধ' হতে চেয়েছে। চেতনাকে আলোকিত করতে, চিরন্তন সৃষ্টিলীলা রহস্যকে রঞ্জিত করতে উঠে এসেছে সুচেতনা-সুরঞ্জনার দল ঃ

"মানুষের মৃত্যু হলে তবুও মানব
থেকে যায়, অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো—আরো স্থির দিক নির্ণয়ের মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতদূর অগ্রসর হয়ে গেল জেনে নিতে আসে।"

[মানুষের মৃত্যু হলে]

প্রায় আশি বছরের রবীন্দ্রনাথ মানব-ইতিহাসের একটি ছবি এঁকেছিলেন। তাতে লেখা ছিল ঃ

"এমন নির্ভীক সহিষ্ণুতা
এমন উপেক্ষা মরণেরে
হেন জয়যাত্রা
বহ্নিশয্যা মাড়াইয়া দলে দলে
দুঃখের সীমান্ত খুঁজিবারে
নামহীন জ্বালাহীন কি তীর্থের লাগি—
এমন সেবার উৎস আগ্নেয় গহ্বর ভেদ করি
অফুরান প্রেমের পাথেয়" [আরোগ্য ৫]

এই জয়যাত্রার সামনে ছিল—

"পৃথিবীর নাটমঞ্চে
অঙ্কে অঙ্কে চৈতন্যের ধীরে ধীরে প্রকাশের পালা।" [জন্মদিন ৫]

এই পালা দেখেই কবির প্রার্থনা ছিল ঃ

"সর্ব মানুষের মাঝে
এক চিরমানবের আনন্দকিরণ
চিত্তে মোর হোক বিকিরিত।" [আরোগ্য ৩৩]

জীবনানন্দের চেতনায় মানুষের মৃত্যু হলে তবুও যে 'মানব' থেকে যায় সে 'মানব'

রবীন্দ্রনাথের এই 'চিরমানব' ছাড়া আর কি? এই চিরমানব বা মানবকে চেতনার জন্যই ইতিহাস ভুবনে নবীন যাত্রীরা এগিয়ে চলেছে চেতনায় সুনিবিড় উদ্বোধনের দিকে :

"নব নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে মানুষের চেতনার দিন
অমেয় চিন্তায় খ্যাত হ'য়ে তবু ইতিহাস—ভুবনে নবীন
হবে না কি মানবকে চিনে—তবু প্রতিটি ব্যক্তির—বাট বসন্তের তরে!
সেই সব সুনিবিড় উদ্বোধনে—'আছে আছে আছে' এই বোধির ভিতরে
চলছে নক্ষত্র, রাত্রি, সিন্ধু, রীতি মানুষের বিষয় হৃদয় :
জয় অস্তসূর্য, জয়, অলখ অরুণোদয়, জয়।"

[সময়ের কাছে : সাতটি তারার তিমির]

রবীন্দ্রনাথ যে তীর্থে নতুন চৈতন্যের উদ্বোধন দেখেছেন জীবনানন্দ মানুষের রক্তাক্ত আত্মাকে সেই সুনিবিড় উদ্বোধনের দিকেই নিয়ে গেছেন। জীবনের প্রেম—যার সর্বনাম 'তুমি'—কবির ভিতরকার 'আলো—অন্ধকারে বিহ্বল লাবণ্যসাগর' রূপী চেতনাকে সর্বমানব চেতনার সঙ্গে একাত্ম করে কবিকে দুর্জ্ঞেয় জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখান থেকে জাগিয়ে তুলেছে এক মহাতরুর মতো—রাবীন্দ্রিক পরিণত চিন্তায়। 'নির্ভীক সহিষ্ণুতা'ই যার ধর্ম :

"আমি সেই মহাতরু—লাবণ্য সাগর থেকে নিজে
উঠে তুমি জাগিয়েছো অনাদির সূর্যনীলিমায়—
পৃথিবীর ভয়াবহ কোলাহল ভেদ ক'রে অবিনাশ স্বর
আনন্দের আলোকের অন্ধকার বিহ্বলতায়
অন্তহীন হরিতের মর্মরিত লাবণ্য-সাগর" [দুদিকে : বেলা অবেলা কালবেলা]

সামগ্রিক পরিক্রমার বিচারে মনে হয়, রবীন্দ্রনাথের চেয়ে আরও তিমির বিলাসিতার ভয়াবহ পথে এগিয়েও শেষ পর্যন্ত একই তিমির বিনাশিতার চেতনায় পৌঁছেছেন 'আধুনিক' কবি জীবনানন্দ।

রবীন্দ্রনাথকে একটি চিঠিতে জীবনানন্দ একবার লিখেছিলেন :

'অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই।.....রচনার ভেতর যদি সত্যিকার সৃষ্টির মর্যাদা থাকে তাহলে তার ভেতরকার বিশিষ্ট সুরের প্রশ্নটি হয়তো অবহেলাও করা যেতে পারে। শান্তি বা সিরিনিটির সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টির প্রেরণার অভাব থাকলে হয়ত তাও নিষ্ফল হয়ে যায়।'[১০]

দুঃখের তুমুল তাড়না জীবনানন্দকে অনেকখানি আলোকিত করেছিল বলেই তার মধ্যেই তিনি সৃষ্টিপ্রেরণাকে খুঁজেছেন, তাতেই সুরের আগুন জ্বালিয়েছেন। পারিপার্শ্বিক সমাজ ও কবি-ব্যক্তিত্বের নিজস্ব সংবিতে তিনি রাবীন্দ্রিক ধ্যানস্তব্ধ প্রশান্তিকে সব সময় খুঁজে পাননি। তবু শেষ পর্যন্ত সেই তুমুল কোলাহলের তাড়না ভেদ করে প্রশান্তিকেই ধরতে চেয়েছিলেন তিনি। কিন্তু সৃষ্টির আন্তরিক প্রেরণার অভাব তাঁর ছিল না বলে সেই তুমুল কোলাহলের আগুনকে বহুক্ষেত্রেই সার্থকভাবেই সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। ওয়ার্ডসওয়ার্থ বা রাবীন্দ্রিক ধ্যানতন্ময়তা তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য নয়। দান্তের মহাকাব্য বা শেলীর কবিতায় বা বীঠোফোনের কোনো সিম্ফনি বা সোনাটায় যে গভীর অশান্তির আগুনের আঁচ পাই, সেই অশান্তির আগুন জীবনানন্দের মধ্যেও ছিল।

১০। জীবনানন্দ (প্রথম খণ্ড জীবনী) বইটি থেকে উদ্ধৃত। পরিশিষ্ট, পৃষ্ঠা ৬৭-৬৮।

জীবনানন্দ ঃ রবীন্দ্রনাথ

সুতপা ভট্টাচার্য

অনেক কবি আছেন, যাঁরা নিজেদের কবিতা-ভাবনা, ভাবনার নিজস্বতা গদ্যে প্রকাশ করবার তাগিদ বোধ করেছেন, কবিতা-জগতে নতুন কোনো আন্দোলন কিংবা নতুন ঐতিহ্য সৃষ্টি করতে চেয়েছেন তাঁরা সচেতনভাবে। জীবনানন্দ দাশ এই জাতীয় কবি নন। কোনো পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন না জীবনানন্দ, তাঁকে ঘিরে গড়ে ওঠে নি কোনো বিশেষ গোষ্ঠী। সাধারণভাবে প্রবন্ধ লেখাতে যেন একসময় অনীহা ছিল তাঁর, তাঁর ডায়েরির পাতা খুললে দেখা যায়—বাক্যে নয়, বাক্যাংশে তার ঝোঁক, তাঁরও বেশির ভাগ ইংরেজি ভাষায়। সমমনস্কদের সঙ্গে আলাপচারিতাতেও খুব উৎসুক ছিলেন না এই কবি। উনিশ শ'বিশ-তিরিশের দশকে, বাংলা কবিতা যখন নবীনতায় আন্দোলিত, এমনকি, রবীন্দ্রনাথও বিচলিত যার দমকে, জীবনানন্দ তখন তর্কবিতর্ক থেকে দূরে কবিতা লিখে চলেছিলেন নিজের মতো। অথচ আশ্চর্য এই, রবীন্দ্রনাথের পর সবচেয়ে বেশি অনুসৃত হলো তাঁরই কবিতা, তাঁরই কাব্য-ঐতিহ্য বিসারিত সবচেয়ে।

যে-কোনো পাঠকই লক্ষ করেন, আধুনিকদের মধ্যে জীবনানন্দই একক কবি, যিনি রবীন্দ্রপ্রভাবকে এড়াতে পেরেছেন প্রথমাবধি। তাঁর পূর্বসূরী যে কবিদের কবিতায় রবীন্দ্রনাথকে ছাড়তে চাওয়ার বিশেষ প্রয়াস তিনি লক্ষ করেছেন—সেই সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুলের প্রভাবই বরং পরিবর্তে মেনেছিলেন জীবনানন্দ। সত্যেন্দ্রনাথের মতো রবীন্দ্রভক্তের কবিতায় তিনি যে রবীন্দ্রপ্রভাব এড়ানোর সফলতম প্রয়াস দেখেছিলেন—মনে হয় তার কারণ সত্যেন্দ্রীয় ধ্বনিবিলাসকে বর্ম করেছিলেন তিনি নিজেই, সত্যেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গে শব্দ ও ছন্দকে ভালোবাসার কথাই তাই তাঁর বিশেষ উল্লেখ্য হয়। আর নজরুলের কবিতায় তিনি লক্ষ করেন "বিশেষ সময়ধর্ম", হয়ত তাঁর লোকজ শব্দ ব্যবহারের টান তিনি পেয়েছিলেন নজরুল থেকেই। অবশ্য, প্রথম কবিতার বই 'ঝরা পালক'-এর পরই এঁদের প্রভাব অতিক্রম করেছিলেন তিনি, যেন "ধ্বনিময়তা"-র প্রতিক্রিয়াতেই সরিয়ে দিয়েছিলেন ধ্বনিসমারোহ, দ্বিতীয় গ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' থেকে দেখা গেল যুক্তাক্ষর-বিরল স্পন্দনহীন এক মৌলিক স্পন্দ, পূর্বকার বাংলা কবিতার সব ঐতিহ্যকে অস্বীকার করা এক নতুনতা। নতুনতা শুধু শব্দচয়নে শব্দগ্রন্থনে নয়, নয় চরণ-স্থাপনায় দেশের বিশিষ্ট বিন্যাসে, নতুন এক বোধ-এর কথা প্রায় ঘোষণা করলেন তিনি—বিশ্বচরাচরকে উপলব্ধি করার নতুন এক ভঙ্গি।

কী সেই বোধ? তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় পাওয়া যায় "গভীর অন্ধকারের ঘুমের আস্বাদ"-এর কথা, যেখানে "সব ক্লেশ আনন্দের ভেদ" ভুল মনে হয়—এমন এক অবসাদ, যার থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় কখনো মৃত্যুর দ্বারস্থ হয় মানুষ। 'আট বছর আগের একদিন'-এ যে ক্লান্তির কথা আছে তা মনে পড়িয়ে দেয়

শোপেনহাওয়ারের দর্শন—"ইচ্ছার মূলেই আছে অভাব, অভাবের বেদনা...। অন্য দিকে সহজ সন্তোষে যদি ঈপ্সিত বস্তুর ·ভাব ঘটে, তবে এমন এক মর্মন্তুদ শূন্যতা ও অবসাদ দেখা দেয় যে সত্তা আর অস্তিত্বই হয়ে ওঠে দুর্বহ বোঝা।" অথচ এরই পাশাপাশি প্রকৃতির প্রতি, জীবনের প্রতি অপরিসীম আসক্তি তাঁর কবিতায় "চিত্ররূপময়", "দৃশ্যস্পর্শগন্ধময়" হয়ে দেখা দেয় বলে দুঃখবাদীর লেবেল লাগানো যায় না তাঁর নামের আগে। শঙ্করাচার্যের দেশে বুদ্ধের দেশে দুঃখবাদী কবিতা খুব নতুনও লাগত না। শুধু না নয়, শুধু হ্যাঁ তো নয়ই, না আর হ্যাঁ-র ভিতর নিরন্তর টানাপোড়েন থেকে উৎসারিত জীবনানন্দের কবিতা। "নাই আর আছে / এক হয়ে যেথা মিশিয়াছে"—তার খবর জানতেন রবীন্দ্রনাথ, 'প্রভাতসংগীত'-এর ভূমিকায় যে প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন তিনি—"ক্ষণে ক্ষণে হাঁ আর ক্ষণে ক্ষণে না নিয়ে এই জগৎ নয়"—দেখা যাচ্ছে কাব্যের অন্তিম পর্বেও তাতে কোনো ব্যত্যয় ঘটে নি। এইখানেই মৌলিক পার্থক্য এই দুই কবির। জীবনানন্দের বেদনাবোধের নিজস্বতা থেকে সহজ হয়েছিল পূর্বজদের সরিয়ে দেওয়া দূরে, "রবীন্দ্র, বঙ্কিম ও বাংলা সাহিত্যের প্রাক্তন ঐতিহ্য"কেও "ধূসরায়িত" করা, আর তিনি অবলম্বন পেয়েছিলেন নিশ্চয়ই "বড় বড় বৈদেশিকদের উজ্জ্বল আলোর" থেকে, কেননা যুদ্ধোত্তর ইয়োরোপীয় সাহিত্যে তো বটেই, তার বহু আগে থেকেই শেক্সপীয়র-এর ট্র্যাজেডি কিংবা "গ্রীক নাটকের আদ্যোপান্ত ছেদ ও বিচ্ছেদের ধারণা ও প্রকাশ"-এর ভিতর মানুষ আর তার পরিস্থিতির অনন্ত বিরোধ রূপ নিয়ে চলেছে। সেই বিরোধ, সেই সংকটবোধ জীবনানন্দের কবিতার মূল থীম পূর্বাপর, কিন্তু তার ভিতরের হ্যাঁ এবং না-র ভূমিকায় পরিবর্তন ঘটেছে। তাঁর প্রথম দিকের কবিতায় ('ধূসর পাণ্ডুলিপি', 'বনলতা সেন', 'মহাপৃথিবী') "প্রকৃতির শোভাভূমিকা"-র বিপরীত পটে তিনি স্থাপন করেছেন আবহমান মানবচৈতন্যের অসুস্থতা—তার থেকে উদ্ভূত মৃত্যু ইচ্ছাকে। সে মৃত্যুইচ্ছাও অসুস্থ—"থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্ত-মাখা ঠোঁটে", সে নয় রবীন্দ্রনাথের জন্ম থেকে জন্মান্তরে ঘোমটা খুলে খুলে পদ্ম-ফোটা। আর প্রকৃতির ব্যবহারে, এ-সময়কার কবিতায় যার প্রাধান্য খুব—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁর পার্থক্য আকাশ-পাতাল। প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সামঞ্জস্যই রবীন্দ্রনাথের অন্বিষ্ট, জীবনানন্দের কবিতায় প্রকৃতির সৌন্দর্যের সঙ্গে মানুষের অনন্বয়ের অমোঘতাই প্রকাশ্য। তারপরে বদলে গেল পট—এল নাগরিক কৌটিল্য, দুর্যোগের কাল। তাঁর পরবর্তী কবিতায় ('সাতটি তারার তিমির', 'বেলা-অবেলা কালবেলা') আবহমান মানব-চৈতন্যের শুভৈষণাকে স্থাপন করেছেন জীবনানন্দ এই বিশেষ শতাব্দীর অন্ধকার পটভূমিকার বৈপরীত্যে। বেয়াল্লিশ, তেতাল্লিশ, চুয়াল্লিশ, ছেচল্লিশ-সাতচল্লিশ—এইসব সালগুলির উল্লেখে যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ, দাঙ্গা আর সাম্রাজ্যবাদের চাপ যত ঘনিয়ে আসে তাঁর কবিতায়, ততই দেখি ঋণাত্মক এই সমসময়কে সমস্ত দিয়ে উপলব্ধি করে ও তাকেই চরম বলে মানতে অস্বীকার করছেন কবি। কেননা তা হলে জীবনকেই প্রত্যাখ্যান করতে হয়—যা ট্র্যাজিক মনের ধর্ম নয়। তাই "মনকে চোখঠার দিয়ে" মানুষের শুভময় ভবিষ্যৎ-এর সম্ভাবনাকেই চরম বলে ধরতে চেয়েছেন কবি—"টেম্পরারি সাসপেনশন অব ডিজ-বিলিফ হিসেবে", মনে রাখতে চেয়েছেন যে মানুষ এখনো শিশু—তার সভ্যতার অন্তিমক্ষণ এত দূরে যে আমাদের পক্ষে তা নেই ; আমরা এসেছি কেবলমাত্র ভূমিকার ভাঙাগড়ার ভিতর। হ্যাঁ এবং না-এর মধ্যে প্রতি মুহূর্তে দীর্ণ যে ট্র্যাজিক মন, গোল্ডমান দেখিয়েছেন, তা একই

সঙ্গে দুই বিপরীতধর্মী বস্তুর দাবি করে—"চরম বাস্তবতা এবং পরম মূল্যবোধ"[২]-দুয়ের সংঘাতের নিদর্শন ছড়িয়ে আছে জীবনানন্দের শেষ দুটি কাব্যগ্রন্থে।

তাঁর কবিতার বাস্তবতা তাই নিছক বস্তুময়তা নয়। কলকাতার ফুটপাথে দুর্ভিক্ষ-পীড়িত মানুষের মৃত্যু, কিংবা কামানের স্থবির গর্জনে বিনষ্ট সাংহাই জীবনানন্দের কবিতার বিষয়মাত্র নয়। মহাবিষয়ের অন্তঃসার কী ভাবে আত্মস্থ করে নেন বিষয়ী, জীবনানন্দ তারই দৃষ্টান্ত। 'আমি'-র সংজ্ঞা দেন তিনি এই ভাবে :

> "আজকে মানুষ আমি তবুও তো—সৃষ্টির হৃদয়ে
> হৈমন্তিক স্পন্দনের পথের ফসল ;
> আর এই মানবের আগামী কঙ্কাল ;
> আর নব—
> নব নব মানবের তরে
> কেবলি অপেক্ষাতুর হয়ে পথ চিনে নেওয়া—
> চিনে নিতে চাওয়া ;
> আর সে-চলার পথে বাধা দিয়ে অন্নের সমাপ্তিহীন ক্ষুধা ;
> (কেন এই ক্ষুধা—
> কেনই সমাপ্তিহীন।)
> যারা সব পেয়ে গেছে তাদের উচ্ছিষ্ট,
> যারা কিছু পায় নাই তাদের জঞ্জাল ;
> আমি এই সব।"

এই 'আমি'র সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের আত্মগত 'আমি'-র পার্থক্য যেমন মৌলিক, বস্তুগত কবিতার থেকে এ কবিতার ভিন্নতাও তেমনই।

২

তাই, "সমাজ-সচেতন" কবি হিসেবে চিহ্নিত হতে অস্বীকৃত ছিলেন জীবনানন্দ। তাঁর একাধিক চিঠিতে এই অস্বীকারের উল্লেখ আছে। সঞ্জয় ভট্টাচার্য তাঁর কবিতায় "পারিপার্শ্বিক চেতনা"র পরিণতির কথা জানিয়েছিলেন তাঁকে, সে-কথা উল্লেখ করে একটি চিঠিতে জীবনানন্দ লেখেন—"কিন্তু আরো দু-চার রকম চেতনা আছে, আজো যাদের কবিতায় শুদ্ধ ক'রে নিয়ে নির্ণয় ক'রে দেখতে আমি ভালোবাসি।"[৩] "শুদ্ধ"—এই পদটি তাঁর আলোচনায় বড় বেশি ব্যবহৃত হয়। বারবারই তিনি মনে করিয়ে দেন : 'ইতিহাসবেদের দরকার এবং সমাজবেদের ; কিন্তু সব কবিতায়ই একইভাবে, অথবা কোনো কবিতায়ই উত্তমর্ণ হিসেবে নয়।"[৪] কবিতার ভাষা হবে অনুভূতির ভাষা, তবে আজকের বিশেষ সময়ে অনুভূতি হবে "সমাজোৎসারিত বা ইতিহাসবেদী"। প্রসঙ্গত ব্লেকের কবিতার কথা উল্লেখ করেন জীবনানন্দ—"রসাত্মক বাক্য বা সমাজচেতন আবেগ বললে যাঁর কাব্যের কোনো স্পষ্ট সংজ্ঞাই দেওয়া হয় না", এবং রিলকের কাব্য, যার মধ্যে তিনি দেখেছেন "নতুন সম্ভাবনা—হয়ত সিদ্ধিরও উন্মেষ"। কবি অমিয় চক্রবর্তীকে জীবনানন্দের কবিতা যে মনে পড়িয়ে দেয় রিল্‌কের কথা—তার অর্থময়তা হয়ত এখানেই। "আমরা যদি ক্রমাগত ভালোবাসায় অযোগ্য, সিদ্ধান্তে অনিশ্চিত এবং মৃত্যুর কাছে অক্ষম, তবে কী করে সম্ভব টিকে থাকা? ...হাজার হাজার বছর ধরে জীবন নিয়ে কারবার করছে মানুষ, অথচ প্রাথমিক জরুরী সমস্যাগুলোর সামনেই সে এমন নিঃসহায়,

ভয় আর অপসারণের এমন মাখামাখি, এমন দুর্বল।"[৫] একটি চিঠিতে ব্যক্ত রিল্‌কের এই বোধের সঙ্গে জীবনানন্দের সামীপ্য স্পষ্ট এবং কবিতায় ভাষার বিশুদ্ধতার কথা বলেছেন রিল্‌কেও, তাঁর কাব্যসাধনাও দিব্যানুভূতিরই সাধনা।

শিল্পপ্রকরণের দিক থেকে জীবনানন্দ হয়ত সাহায্য পেয়েছিলেন ফরাসী কাব্যের "প্রতীকযান" থেকে, তবু প্রতীকী কবি মালার্মের থেকে তাঁর কাব্যজগৎ ভিন্ন অনেকটাই। অথচ তাঁর কবিতাভাবনা প্রায়ই মনে পড়ায় মালার্মেকে, বিশুদ্ধ কবিতার উদ্‌গাতাদের মধ্যে যিনি প্রধানতম। "আমি যখন উচ্চারণ করি 'একটি ফুল' তখন আমার স্বর যে বিস্মরণ থেকে মুছে ফেলে সব ধরনের ফুলের আকৃতি, সেখান থেকেই সাধারণ বোঁটাটুকুর উপর দুলে ওঠে অন্য কিছু, এমন কিছু—যা কেবলি সুর, অন্তঃসার, কোমলতা—পৃথিবীর কোনো তোড়ায় সে ফুল নেই"[৬]—মালার্মের এই ভাবনার সঙ্গে খুব পৃথক নন জীবনানন্দ, যখন পৃথিবীর সমস্ত জল ছেড়ে দিয়ে নতুন জল কিংবা পৃথিবীর সমস্ত দীপ ছেড়ে দিয়ে নতুন প্রদীপের কল্পনার কথা বলেন তিনি। মালার্মের মতোই তাঁরও তো ধারণা—কবিতা "সকলের জন্যে নয়—অনেকের জন্যে নয়।"

ইয়োরোপের এই-সব বিশুদ্ধ কাব্যের পরম্পরা থেকে রবীন্দ্রনাথের কবিতা পৃথক, কিন্তু তার বিরোধী নয়। এদের মিল যেখানে, জীবনানন্দ তাঁর নিজের কবিতার পারম্পর্য পেয়েছেন সেখানেই, সেখানে থেকেই অনুভূতির ইঙ্গিতের দিব্যতার কথা উচ্চারণ করেন তিনি বারবার, বলেন "কল্পনা-প্রতিভা" "ভাবনা-প্রতিভা"র কথা, কখনো তা রবীন্দ্রনাথের মতোই। আর তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আবেগের শুদ্ধতার মূল্য দেন তিনি, উপলব্ধি করেন ঃ "উক্ত কাব্যের সবচেয়ে বেশি বেদনা সবচেয়ে বেশি চেতনারই পরিচায়ক।"[৭] রবীন্দ্রকাব্যধারার কোনো একটি মাত্র পর্যায় তাঁর উল্লেখ্য নয়, কবিস্বভাব যে "ক্রমেই শিক্ষিত ও শুদ্ধ হয়ে প্রতি পর্যায়ে কবিতার সারাৎসার রেখে যেতে পারে, এরকম পর্যায় থেকে পর্যায়ে তার প্রাণনা চলতে পারে—কবির মৃত্যু পর্যন্ত"[৮]—তারই দৃষ্টান্ত তিনি দেখেছিলেন রবীন্দ্রনাথে। তাঁর মতে 'শেষ লেখা', 'পূরবী' অথবা 'বলাকা' কেউ কারো চেয়ে কম মূল্যবান নয়। জীবনানন্দ যে রবীন্দ্রনাথকে দেখতে পেয়েছিলেন তাঁর সমগ্রতায়—এই তার এক প্রমাণ। পাশাপাশি স্মরণ করে নেওয়া যায় বুদ্ধদেব-সুধীন্দ্রনাথের প্রথম দিকের কাব্যধারার প্রতি এবং বিষ্ণু দে-র শেষ পর্যায়ের কাব্যের প্রতি পক্ষপাতিত্বের কথা।

কল্লোল-কালিকলম যুগের প্রাথমিক রবীন্দ্র-বিদ্রোহের পর বাংলা কবিতায় দুটি বিশেষ ধারা স্পষ্টতা পাচ্ছিল। একটি ধারায় কবিতার বিশুদ্ধতার উপর জোর পড়ছিল বেশি, অন্য ধারার কবিতায় প্রধান হয়ে উঠছিল ইতিহাস-বিজ্ঞানময় বাস্তবতা। এই দ্বিতীয় ধারার কবিতায় জীবনানন্দের অনীহাই স্বাভাবিক। "ক্ষয়িষ্ণু যুগের নির্মম দর্শন" হয়েও যে-সব কবিতা সীমাবদ্ধ তার মধ্যেই, সমাজ-ইতিহাস-চেতনার নামে সে-সব রচিত হলেও জীবনানন্দের বিচারে তার অধিকাংশই "সাংবাদিকী ও প্রচারধর্মী রচনা" মাত্র। এই ধারার পক্ষ থেকে যে যে অভিযোগ তোলা হচ্ছিল তখন রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে, যেমন জনজীবনের সঙ্গে যোগ ছিল না রবীন্দ্রনাথের, কিংবা বুর্জোয়া বলেই বর্জনীয় তিনি—এ-সবের অর্থহীনতা খুব স্পষ্ট করেই নির্দেশ করেছেন জীবনানন্দ। বুর্জোয়া সভ্যতার পরিবেশের মধ্যে থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর সামগ্রিক সাহিত্য-জীবনে রাজনীতিতে সে সভ্যতার যে সমালোচনা করে গেছেন, জীবনানন্দের মতে পাশ্চাত্যের আধুনিক কবিকুলচূড়ামণি পাউণ্ড বা এলিয়ট-এর চেয়ে সে কম নয়। এঁদের তুলনায় সাধারণ

মানুষের সঙ্গে যোগও যে রবীন্দ্রনাথের বেশি, বরং দেশ-জাতিকে গঠন করতেই অনেকাংশে ক্ষয় করেছেন তিনি নিজের কবিজীবন—জীবনানন্দ তাও স্মরণ করিয়ে দেন।

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মনন-এর অভাব লক্ষ করছিলেন যাঁরা, জীবনানন্দ তাঁদের দলেও নন। বরং অকাতরভাবে মননজীবীদের প্রতি একান্ত অবিশ্বাসই ব্যক্ত করেন তিনি। জ্ঞানের সঙ্গে প্রেমকে যেমন, তেমনি "শুদ্ধ তর্কের ইঙ্গিত"-এর সঙ্গে "ভাব প্রতিভাজাত অন্তঃপ্রেরণা"-কেও মেলাতে চেয়েছিলেন জীবনানন্দ।

বিশ শতকের ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রভাবে বাংলা সাহিত্যে যে আধুনিকতার আন্দোলন জেগে উঠেছিল, এলিয়ট ছিলেন তার প্রধান আচার্য। কিন্তু জীবনানন্দের আলোচনায় এলিয়ট বিষয়ে কিছুটা বিমুখতাই প্রকাশ পায়। ইংরেজী কবিতায় এলিয়ট-পাউণ্ড-এর বুদ্ধিবাদের প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল, পরাবাস্তবতার উদ্ভব তার থেকেই। তিরিশের দশকের বাংলাদেশের আধুনিক কবিরা যখন বিদেশী কবিতা পড়ছিলেন তখন সবই তাঁরা হাতে পেলেন একসঙ্গে। তাই সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষ্ণু দে-কে যখন আকর্ষণ করল বুদ্ধিবাদ, কিংবা বুদ্ধদেব বসুকে সৌন্দর্যবাদ, জীবনানন্দ তখন বহির্জ্ঞান আর অন্তর্জ্ঞান, চেতনা আর অবচেতনার সংশ্লেষণ ঘটালেন তাঁর কাব্যতত্ত্বে, কবিতায়। দুই ধরনের মানুষের কথা বলেছিলেন উনামুনো, 'জীবনের ট্রাজিক বোধ' নামে বইটির প্রথম অধ্যায়ে —"এক ধরনের মানুষ চিন্তা করে শুধুই তাদের মস্তিষ্ক দিয়ে ; আর আরেক দল আছে, যারা চিন্তা করে তাদের সব দিয়ে—সমস্ত শরীর আর আত্মা, রক্ত, অস্থিমজ্জা, হৃদয়, ফুসফুস আর উদর সব দিয়ে, সারাজীবন দিয়ে।"[৯] এই দ্বিতীয় দলের মানুষ হলেন জীবনানন্দ। কেবল মননশীলতা তাঁর নিরিখ নয়।

আধ্যাত্মিক বিশ্বাস নিয়ে রবীন্দ্রকাব্যের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ, জীবনানন্দের কাছে তাও ছিল ভিত্তিহীন। বিশ্বাসহীনতার চেয়ে তাঁর বরং বিশ্বাসময়তাই কাম্য। এই অছিলায় রবীন্দ্রনাথের কবিতার থেকে মুখ ফিরিয়ে যাঁরা এলিয়টের কবিতার কাছে আশ্রয় চান, তাঁদের তিনি মনে করিয়ে দেন এলিয়টের প্রগাঢ় ধর্ম-বিশ্বাসের কথা। যদিচ তিনি জানেন আধুনিক কবির সামনে ধর্ম বা দর্শন দিয়ে নির্দিষ্ট কোনো বিশ্বাসভূমি নেই, রবীন্দ্রনাথের কাছে যা ছিল সহজলভ্য। অর্থাৎ এ ক্ষেত্রে আধুনিক কবিতার সঙ্গে রবীন্দ্রকাব্যের দূরত্ব উপলব্ধি করলেও সে কাব্যকে এই কারণেই খারিজ করে দিতে নারাজ তিনি। নিজে তিনি ঐকান্তিক বিশ্বাসের মতো ঐকান্তিক অবিশ্বাসকেও পরিত্যাজ্য বলে মনে করেন ; মানুষের জীবনের "অন্তর্নিঃসহায়তা" উপলব্ধি করেও আশা রাখতে চেষ্টা করেন, কিংবা চেষ্টা করে আশা রাখেন। কিন্তু তাঁর সে প্রয়াস রাবীন্দ্রিক বিশ্বাসময়তার থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন জাতের। কেননা তাঁর ধারণা যে একজন কবি ঃ "আনুষঙ্গিক অনাস্থার অতীত কী বিশেষ আস্থা রয়েছে, সেটা একজন ব্যক্তির নয়—কবির নিজের ব্যক্তিকতার নয়—সমস্ত দেশ কাল সন্ততির পরিচয় হিসেবে স্থির করতে পেরেছে।"[১০] রবীন্দ্রনাথের কবিতায় আস্থার উপলব্ধি ব্যক্তিক উপলব্ধিতেই লভ্য। "এ দ্যুলোক মধুময়, মধুময় পৃথিবীর ধূলি / অন্তরে নিয়েছি আমি তুলি / এই মহামন্ত্রখানি / চরিতার্থ জীবনের বাণী"—এ কবিতায় কবির নিজের জীবনের চরিতার্থতার সঙ্গে সমাজ-জীবনের সার্বিক অচরিতার্থতার কোনো সেতু রচনা হয়নি।

বিশুদ্ধ কবিতার প্রবক্তা বুদ্ধদেব বসুর থেকেও এখানে সরে যান তিনি, যে কারণে 'বনলতা সেন'-এর পরবর্তী কাব্যে তিনি তাঁর (বুদ্ধদেব বসুর) পৃথিবীর অপরিচিত। রবীন্দ্রকাব্য সম্বন্ধে এই দুই কবির অভাববোধও তাই ভিন্নতর। 'বলাকা' থেকে

রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজ প্রাধান্য পেতে থাকে বলে আপত্তি করেন বুদ্ধদেব, অথচ জীবনানন্দ চেয়েছিলেন : "কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাস-চেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান"—তাই রবীন্দ্রনাথের কবিতায় সমাজবোধ আছে বলে তাঁর অসুবিধা নয়। তবে তাঁর এই উক্তিতে 'অস্থি' ও 'মর্ম' শব্দদুটির প্রয়োগ থেকে বোঝা যায় সময় ও সমাজের ধারণা থাকাই সব নয়, কবি শুষে নেন তার অন্তঃসার, কবির ব্যক্তিকতার মজ্জায় তা জড়িয়ে থাকে। নিজের যুগের "প্রাণপরিসর" যে রবীন্দ্রনাথের আয়ত্তে ছিল জীবনানন্দ তা জানেন। এই আয়ত্তীকরণের ভিতর দিয়ে স্বভাবকবিত্ব পরিশীলিত হতে পারে, রবীন্দ্রনাথে যার নজির দেখেন তিনি : "পৃথিবীর ও নিজের জীবনের ক্রমিক অভিজ্ঞতায়, কোন অভিজ্ঞতার কি মূল্য সেই চেতনায়, বিজ্ঞান কি দিতে পারছে, পারবে, জ্ঞান কি দিল—এইসব অন্তঃসারের ভিতর ...সহজ কবিগুণকে তিনি সজাগ ও তপঃশক্তিশীলভাবে শিক্ষিত ও অনুভূতিঘন সুস্পষ্ট করে চলেছিলেন।"[১১] কিন্তু সেই সঙ্গে এও উপলব্ধি করেন জীবনানন্দ : "তাঁর প্রকৃত কাব্যলোকে সমাজ ও ইতিহাস-চেতনা একটা নির্ধারিত সীমায় এসে তারপর মন্থর হয়ে গেছে।"[১২] বিংশ শতাব্দীর সভ্যতার সংকট নানান দিক থেকে রবীন্দ্রসাহিত্যে স্থান পেয়েছে ঠিকই, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট ভাবাদর্শের দিক থেকেই বোধ হয় সম্ভব হয়নি এ যুগের ক্ষয়িষ্ণুতার ভঙ্গুরতার নির্যাসটুকু আত্মসাৎ করে নেওয়া। তাই পৃথিবীর সংকটের কথা বললেন তিনি, কিন্তু তা তাঁর নিজের সংকট হয়ে উঠল না। চিরসময়ের কথা বললেন, কিন্তু পৃথকভাবে ; তার সঙ্গে সমসময়কে মেলাতে চাইলেন না। এইভাবেই রবীন্দ্রনাথের সমাজ-ইতিহাস-চেতনা সেই সীমা পায়, যেখান থেকে, জীবনানন্দ বলেন, "সূত্র তুলে নিয়ে" আধুনিকেরা অন্য ধরনের কবিতা রচনা করছেন।

এর ফলে আধুনিকদের বাস্তবতার পরিগ্রহণ যে কত স্বতন্ত্র হয়ে উঠেছে, রবীন্দ্রনাথের 'আরোগ্য' কাব্যের দশ নম্বর কবিতার ("অলস সময়ধারা বেয়ে...") পাশাপাশি জীবনানন্দের 'খেতে-প্রান্তরে' ('সাতটি তারার তিমির') কবিতাটি পড়লে তা স্পষ্ট হয়। "শত শত সাম্রাজ্যের ভগ্নশেষ পরে/ওরা কাজ করে"—এই চরণে যে উদ্দীপ্তি আছে, শ্রমজীবী মানুষের জীবনে তার খুব তাৎপর্য নেই। অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে বাস্তবকে উপলব্ধি করার পরিবর্তে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবকে আদর্শায়িত করে তোলেন এইভাবেই। অথচ জীবনানন্দের মতো আধুনিক কবি একই আদর্শকে সমাজবাস্তবে রূপায়িত হতে দেখেন যখন, তখন সত্যটিই ভিন্ন হয়ে যায় :

> "ঢের সম্রাটের রাজ্যে বাস ক'রে জীব
> অবশেষে একদিন দেখেছে দু-তিন ধনু দূরে
> কোথাও সম্রাট নেই, তবুও বিপ্লব নেই, চাষা
> বলদের নিঃশব্দতা খেতের দুপুরে।...
> কেবল কাস্তের শব্দ পৃথিবীর কামানকে ভুলে
> করুণ, নিরীহ, নিরাশ্রয়।
> আর কোনো প্রতিশ্রুতি নেই।"

"কোথাও সম্রাট নেই, তবুও বিপ্লব নেই"—জীবনানন্দ এই স্থাবরতার কথা জানেন, কিন্তু মেনে নেন না। "বিপ্লব" শব্দটি তাঁর গদ্য-আলোচনাতেও চলে আসে—রবীন্দ্র-ঐতিহ্য থেকে সরে যে সব আধুনিক কবিতা নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে, তাদের তিনি "অল্পাধিক বিপ্লবাত্মক ভাববাদী কবিতা" আখ্যা দেন। কাজের মধ্যে দিয়ে যে বিপ্লব তা

সমাজশক্তি কিংবা রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে। কিন্তু কবিতা দাঁড়াতে চায় "গোটা পরিপ্রেক্ষিত"-এর মুখোমুখি। শতাব্দীর সেই পরিপ্রেক্ষিত-জোড়া পাতালছায়ার তলায় দাঁড়িয়ে নিঃসহায় মানুষের প্রতিবাদ কখনো বা অট্টহাসি হয়ে বেজে উঠতে চায়। অন্তত জীবনানন্দের নিজের কবিতায় সে হাসি শুনতে পাই আমরা—অমরুহীন চোখের অন্তর্জ্বালা থেকে উঠে আসা অ্যাবসার্ডের জগৎ—"অত্যন্ত অদ্ভুত এক টুপি ব্যবসায়ী" কিংবা "চায়ের মগের কুটুম" সেই "চার জোড়া কান" যার অধিবাসী, যে জগতে "নিবিড় রমণী" তার "জ্ঞানময় প্রেমিকের খোঁজে" এসে শুধু দেখে—"আবহমানের ভাঁড় এসেছে গাধার পিঠে চড়ে"। বিশ শতকের ট্রাজিক মন জীবনের সীমাবদ্ধতা আর অনিবার্য হতাশাবোধের মধ্যে দাঁড়িয়ে এইভাবেই নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নিতে চায় ; ট্রাজিক ভিশন-এর ভিতরকার বিদ্রূপের এই বুনটের থেকেই অ্যাবসার্ডের বোধ জন্ম নেয়। রবীন্দ্রকাব্যের থেকে অনেক দূরের জগৎ এ, জীবনানন্দকে বলতেই হয় যে এ-সব কবিতার জীবনদর্শন রবীন্দ্রকাব্যের জীবনদেবতা বোধের চেয়ে ভিন্ন জিনিস।

"দৃষ্টিভঙ্গীর এই ব্যতিরেকী গতির জন্যেই" জীবনানন্দ জানান—আধুনিক কবিতার ভাষায় ও প্রকাশভঙ্গিতেও পরিবর্তন এসেছে, রবীন্দ্রনাথের ছন্দ ও ভাবস্বাধীনতার রীতির পরিবর্তে আধুনিক কবির হাতে ঘটেছে "ক্লাসিক বা মাত্রানিষ্ঠ রীতি"-র প্রতিষ্ঠা। "সংহতি" শব্দটি যেমন প্রায়ই আসে তাঁর আলোচনায়, তেমনি মালার্মের মতোই, ইঙ্গিতের কথা, উৎসারের কথাও বলেন তিনি বারবার। সংহতি আনার একটি রীতি হল "হোরেসের রীতি", অন্য যে "ঈষদস্ফুরিত" সংহতির কথা বলেছেন জীবনানন্দ, তারই নাম প্রতীকবাদ। উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী কবিদের সাধনা আত্মস্থ করেছিলেন বলেই দুর্লভ স্বল্পতার বিষয়ে সচেতনতা দেখি তাঁর লেখায়। এই ফরাসী কবিকুল এবং এঁদের ইংরেজ শিষ্যদের তুলনায় যাঁর কবিস্বভাব অনেক বেশি ঋদ্ধ, সেই রবীন্দ্রনাথের কবিতা তবু যে তত আকৃষ্ট করে না, তার কারণ তা আসে "নিসর্গের শোকাবহ প্রাচুর্যে"। এর "শোকাবহ" বিশেষণটি তাঁর মনোভাবকেও বিশেষিত করে। রবীন্দ্রনাথের গদ্য কবিতা, আধুনিকদের মধ্যে যা তাঁকে কিছুটা জনপ্রিয় করেছিল—জীবনানন্দের যে সমর্থন পায় না, সেইটেই স্বাভাবিক, কেননা ছন্দোবদ্ধ কবিতার তুলনায় তাঁর গদ্য কবিতা অনেক বেশি ছড়িয়ে পড়া, এলিয়ে পড়া। রবীন্দ্র-সাহিত্যের অসংযমের দিক তাঁকে ভিতরে-ভিতরে পীড়িত করে তুলেছিল সম্ভবত, তাঁর ডায়েরিতে বিচ্ছিন্নভাবে চলে আসে এরকম একটি লাইন, "রবীন্দ্রনাথের অবিরল পত্রধারা (অসংযম)।"[১৬]

প্রতীকী কবিতা, কিংবা "চেতনা-অনুচেতনা"র কবিতা—যে দুই ধারার ঐতিহ্যে রূপকল্প গড়ছিলেন জীবনানন্দ তাঁর নিজের কবিতায়—এদের কোনোটিই সহজবোধ্যতার দায় বহন করে না। জীবনানন্দ তাই আধুনিক কবিতার কথা বলতে গিয়ে বারবারই নিহিতার্থের কথা বলেন, বলেন তার ভাসা ভাসা অর্থ পেরিয়ে উপলব্ধির আলোয় অর্থের অনমনীয় শিবত্বে পৌঁছোনোর কথা। রবীন্দ্রনাথের কবিতায় নিহিতার্থের মহিমা কোথাও যে নেই তা নয়, তবু সাধারণভাবে তাঁর প্রবণতা খুলে বলার দিকেই। জীবনানন্দ এই পার্থক্যের দিক নিয়ে পৃথকভাবে বলেন নি কোথাও, কিন্তু তার ইঙ্গিত দিয়েছেন একই বাক্যে আধুনিক কবিতার "নিহিত অর্থের" বৈপরীত্যে রবীন্দ্রকাব্যের "অর্থগৌরব"-এর কথা বলে।

"আধুনিকদের অনুভূতি ও বোধ রবীন্দ্রনাথের স্তরে নেই, সরে গেছে, বিশেষ হয়েছে"[১৪]—এ বাক্যটিতেও আধুনিকদের বৈপরীত্যেই রবীন্দ্রনাথকে রাখা হয়েছে। অথচ

এর পাশাপাশি জীবনানন্দ এমন উক্তিও করেছেন—"রবীন্দ্রনাথের সেসব দিনের অনেক কবিতা আজও আধুনিক।"[১৫] আপাতদৃষ্টিতে বাক্য দুটি পরস্পরবিরোধী। কিন্তু জীবনানন্দের আধুনিকতার ধারণাতে এরা অন্বিত। প্রথম উক্তিটিতে "আধুনিক" বলতে জীবনানন্দ তাঁদেরই বুঝিয়েছেন, যাঁদের কবিতা এই বিশেষ যুগের সারাৎসার গ্রহণ করতে পারছে। কিন্তু মানুষের বিশেষ কালের সঙ্গে যুক্ত যে পরিচয়, সেই তার সব নয়, তাই জীবনানন্দের কাছে আধুনিকতার অন্য তাৎপর্যও আছে ঃ মানুষের মনের চিরপদার্থ যে সাহিত্যে প্রকাশ পেয়েছে তাও আধুনিক তাঁর মনে ঃ এই অর্থেই দ্বিতীয় উক্তিটি তাৎপর্য পায়। প্রকৃতপক্ষে, বিশেষ কালের সঙ্গে চিরকালের যে মিলন-বিন্দুটি তাঁর নিজের কবিতায় সর্বত্রই ছুঁতে পারি আমরা, তাঁর আধুনিকতার বোধ বিশিষ্টতা পায় সেখানেই ঃ "এসব কবিতা... সব মানুষেরই নাড়ীকম্পন অনুভব করছে যেন, আজকের সূর্য জল ও নক্ষত্রদের দেখতে দেখতে অনেককালের প্রকৃতিকে ; বিফলতা দুঃখ ও আশাকে ; বিশেষ কোনো যুক্তি নেই মানুষের অন্তিম ব্যর্থতার বিপক্ষে—দীনাত্ম হৃদয়ে সেই কথা মনে রেখে।"[১৬] রবীন্দ্রনাথের কবিতায় মানুষের এই "অন্তিম ব্যর্থতা"-র অনুভব নেই হয়ত, সেই দিক থেকেই "তাঁর সঙ্গে আধুনিকদের আদর্শগত বিসদৃশতা..." ভয়াবহভাবে চমৎকার।[১৭] অথচ তবু সে কাব্যে আছে আরেকভাবে "সব মানুষেরই নাড়ীকম্পন"-এর অনুভব ঃ তাই জীবনানন্দের কাছে এ-কাব্যের একটা বড় অংশই আধুনিক, যেমন আধুনিক মহাভারতের কিছু অংশ কিংবা কোনো কোনো গ্রীক ট্রাজেডি। তাই তিনি মনে করেন আধুনিকদের বিদ্রোহ রবীন্দ্রনাথের কবিতার বিরুদ্ধে ততটা নয়, যতটা রবীন্দ্র প্রভাবিত কবিস্বভাবের বিরুদ্ধে।

রবীন্দ্রনাথের ঐতিহ্যকে অস্বীকার করার উপায় নেই আধুনিক কবির, তার কারণ শুধু এই নয় যে তাঁর প্রভাব এড়াবার সজ্ঞান আয়াস সত্ত্বেও অবচেতনায় তাঁরই কাব্যে তাঁরা "অনুভাবিত", জীবনানন্দ মনে করেন রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে "সাহায্য ও ইঙ্গিত" পেয়েই বাংলায় আধুনিক কাব্যের সূচনা ঘটেছে, সে সাহায্য সে ইঙ্গিত একদিকে যেমন সমাজ-ইতিহাস চেতনায়, অন্য দিকে তা কল্পনাপ্রতিভার বিস্ময়কর ভাস্বরতায়। আবার জীবনানন্দ এ-কথাও জানেন যে এই আধুনিক কবিতা পরিণামে "রবীন্দ্রনাথের ভিত্তি ভেঙে ফেলে কোনো সম্পূর্ণ অভিনব জায়গায়" দাঁড়াতে পারে। আধুনিক কাব্যের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্বন্ধ এইভাবেই সম্পূর্ণতা পায় জীবনানন্দের চেতনায়।

অথচ, তিরিশের দশকের কবিদের মধ্যে জীবনানন্দই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে যোগাযোগ করেছিলেন সবচেয়ে কম। কবিতার বই রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে মতামত চেয়েছিলেন হয়ত তিনিও, কিন্তু রবীন্দ্রনাথের থেকে দূরত্বের বোধ যে তাঁর কী তীব্র তা তাঁর চিঠির ভাষায় ফুটে উঠেছে ঃ "আমি একজন বাঙালী যুবক, মাঝে মাঝে কবিতা লিখি। অনেকবার দেখেছি আপনাকে; তারপর ভিড়ের ভিতর হারিয়ে গেছি। আমার নিজের জীবনের তুচ্ছতা ও আপনার বিরাট প্রদীপ্তি সব-সময়ই মাঝখানে কেমন একটা ব্যবধান রেখে গেছে— আমি তা লঙ্ঘন করতে পারি নি। —আজ যদি St. Paul, কিংবা খৃষ্ট অথবা গৌতম বুদ্ধ পৃথিবীতে ফিরে আসেন, আবার, তাহলে ভিড়ে চাপা পড়ে তাঁদের সঙ্গে দেখা করে আসব হয়ত ; কিন্তু তারপর তাঁরা আমাকে ভিড়ের মানুষ বলে বুঝে নেবেন।"[১৮]

রবীন্দ্র-প্রয়াণের পটভূমিতে 'রবীন্দ্রনাথ' নামে তাঁর একটি কবিতাতেও এই দূরত্বের বোধ স্পষ্ট ঃ

"পতঞ্জলি, প্লেটো, মনু ওরিজেন, হোমরের মত
দাঁড়িয়ে রয়েছ তুমি একটি পৃথিবী ভাঙা-গড়া-শেষ করে দিয়ে কবি,
দানবীয় চিত্রদের অন্তরালে আপনার ভাস্বরতা নিয়ে,
নিকটে দাঁড়িয়ে আছে নিবিড় দানবী।
অথবা ছবির মত মনে হয় আমার অন্নপানদোষে ম্লান চোখে ;
অল্প আলোকের থেকে যেই পুরাণ-পুরুষ সব
চলে যায় অনুমেয়, অজ্ঞেয় আলোকে।" ('পরিচয়', ১৩৪৮ অগ্রহায়ণ)

প্লেটো বা হোমরের মতো রবীন্দ্রনাথের ছবিটিও ভাস্বর, কিন্তু তা ছবিই ; উপরন্তু সে ছবি আড়াল করে আছে "দানবীয় চিত্র"-রা এবং "নিবিড় দানবী"-যুগের কুমন্ত্রণা। সে ছবি যিনি দেখেছেন, তাঁর 'অন্নপানদোষে ম্লান চোখ'-এর উল্লেখ যখন করেন জীবনানন্দ, তখন দূরত্বের বোধের সঙ্গে যেন জড়িয়ে থাকে অভিমানের সুরও। একই সময়ে লেখা 'রবীন্দ্রনাথ' নামে অন্য একটি কবিতায় সে অভিমান প্রায় যেন শ্লেষ হয়ে উঠেছে ঃ

"অনন্ত আকাশবোধে ভরে গেল কালের দু'ফুট মরুভূমি
অবহিত আগুনের থেকে উঠে যখন দেখেছ সিংহ, মেষ, কন্যা, মীন
ববিনে জড়ানো মমি—মমি দিয়ে জড়ানো ববিন,—
প্রকৃতির পরিদেবনার চেয়ে বেশী প্রামাণিক তুমি
সামান্য পাখি ও পাতা ফুল
মর্মরিত ক'রে হ'লে ভয়াবহভাবে সৎ অর্থসঙ্কুল।"
('পূর্বাশা', রবীন্দ্র-সংখ্যা ১৩৪৮)

এ পঙ্‌ক্তি ক-টি প্রমাণ করে সাহিত্যিক উত্তরাধিকার বিষয়ে ভালোবাসা ও ঘৃণার দ্বান্দ্বিকতার তত্ত্ব। পূর্বসূরী কবির প্রতি প্রাথমিক ভালোবাসাকে প্রতিকূল প্রতিক্রিয়ায় প্রতিহত করাতেই কোনো কবি তাঁর আত্মতা অর্জন করেন—হ্যারল্ড ব্লুমের মতো সাহিত্যতাত্ত্বিকের এই ভাবনা দিয়ে আধুনিকদের রবীন্দ্রনাথ-পরিগ্রহণ সাধারণভাবেই বুঝে নেওয়া যায় ; জীবনানন্দের কাব্য-প্রতিভার প্রাখর্যে সে দ্বন্দ্ব ছিল তীব্রতর, যদিচ নিহিত। তাঁর কাব্যজগতের উজ্জ্বল নিজস্বতা থেকেও সে কথা বলা যায়।

অদ্ভুত আঁধার এক

রবীন্দ্রনাথ আগুনকে বলেছিলেন ভাই। স্পেনের বেদনার্ত দার্শনিক উনামুনো বলেছিলেন, বেদনা হল জীবনের ভগিনী। জীবনানন্দ আঁধারকে বলেছিলেন, আলোর রহস্যময়ী সহোদরা। আলোর সঙ্গে অন্তরঙ্গ আত্মীয়তা গড়ে তোলার পথেই অন্ধকারের সঙ্গে জীবনানন্দের নিবিড় পরিচয়। আর হয়তো রহস্যময়ী বলেই তার প্রতি আরো একটু অতিরিক্ত টান। আসলে পর্বতচূড়ায় পৌঁছবার পথ যেমন পাথুরে এবং পিছল, আলোর অমরাবতীতে পৌঁছবার পথ তেমনি অন্ধকার, অমঙ্গল দিয়ে মোড়া। আলোর আত্মাটুকুই সুন্দর, তার বাইরের চামড়া পাড়াগাঁর ফকিরের আলখাল্লার মতো কালো, কুৎসিত আর বীভৎস নানান অসুন্দরের জোড়াতালি দিয়ে বোনা।

জীবনানন্দ এবং অবনীন্দ্রনাথ, দুজনেই আলোর যাত্রী। আর সেই কারণেই যত কিছু অন্ধকার, যত অমঙ্গল, যত বিনাশ এবং সর্বনাশ, যত রক্ত এবং রণ, যত হত্যা এবং ধ্বংস সম্বন্ধে এরা দুজনেই প্রখররূপে সচেতন। নানা উপমায়, নানা প্রতীকে অন্ধকার যে কত অজস্রবার এঁদের দুজনের রচনায় ছায়া ফেলেছে, তা পরিমাপের বাইরে। যদিও জানি, অবনীন্দ্রনাথের অন্ধকার প্রধানত বর্ণনার। জীবনানন্দের অন্ধকারবোধে সংক্রামিত হয়ে আছে বহু অবিশ্বাস, বহু অশুভ ভাবনা। এই ব্যবধান সত্ত্বেও তাঁদের মিলটাও আশ্চর্য।

জীবনানন্দকে কেউ কখনো অন্ধকারের কবি বলেননি। ইচ্ছে করলে তাও বলা যেতো। কেননা এতো অন্ধকার আমাদের দেশের কবিতায় আর কেউ জড়ো করেননি কখনো। তাঁর সব উল্লেখযোগ্য কবিতাতেই উটের গ্রীবার মতো মুখ বাড়িয়ে দিয়েছে অন্ধকার। তাঁর সমস্ত স্মরণীয় কবিতার শরীরের সবচেয়ে ঝলমলে, সবচেয়ে প্রখর, সবচেয়ে আকর্ষক পোশাক অথবা অলঙ্কারটি হল অন্ধকার। আর অন্ধকারের এই রত্নহার গাঁথার জন্যেই তার অধিকাংশ কবিতার পটভূমি সন্ধ্যে থেকে রাত্রি।

অনুমান করতে পারি, অন্ধকারকে বড় প্রয়োজন ছিল তাঁর। নিজস্ব নিখিলের প্রয়োজনেই তাঁর অন্ধকার ঘেঁটে বেড়ানো। কত মাইল অন্ধকার হাঁটার পর আলোয় উত্তীর্ণ হতে পারবেন তিনি অথবা আলোর বর্শাকে কতখানি ধারালো করলে ভেদ করতে পারবেন অন্ধকার দুর্গের দরজা, এই অঙ্কের উত্তর মেলাবার জন্যেই তাঁর মেধা অথবা প্রজ্ঞার আগুন যজ্ঞের মতো জ্বলে গেছে অবিরল। অন্ধকার আহরণ, তাঁর কাছে সত্য আহরণেরই সমতুল্য।

তাঁর অন্ধকার দু জাতের। একটা অন্ধকার পৃথিবীর অস্তিত্বের ভিতরকার। যেন যুগ যুগান্তরব্যাপী সময় অথবা ইতিহাসচেতনার সারাৎসার সে। যেন কালকালান্তরব্যাপী মানুষের, মর্মমূলের সবচেয়ে গভীর এবং গোপনীয় সত্য সংবাদ। যথা—

১। "অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশী আজ চোখে দেখে তারা"

২। "অন্ধকারে ইতিহাস-পুরুষের সপ্রতিভ আঘাতের মতো মনে হয়
যতই শান্তিতে স্থির হয়ে যেতে চাই।"

৩। "সহসা দেখেছি তারে দিনশেষে,
মুখে তার সব প্রশ্ন সম্পূর্ণ নিহত ;
চাঁদের ওপিঠ থেকে নেমেছে এ পৃথিবীর
অন্ধকার ন্যুব্জতার মতো।"

৪। "পাখি নেই, সেই পাখির কঙ্কালের গুঞ্জরণ
কোন গাছ নেই, সেই তুঁতের পল্লবের ভিতর থেকে
অন্ধ-অন্ধকার তুষার পিচ্ছিল এক শোন নদীর নির্দেশে।"

৫। "চারদিকে অন্ধকার বেড়ে গেছে
মানুষের হৃদয় কঠিনতর হয়ে গেছে
বিজ্ঞান নিজেও এসে শোকাবহ প্রতারণা করেই ক্ষমতাশীল দেখ।"

আরেক ধরনের অন্ধকার হল পৃথিবীর বাইরের শরীরের। অর্থাৎ দৃশ্যময় অন্ধকার। প্রথমটাকে যদি বলি চেতনার অন্ধকার, দ্বিতীয়টিকে বলা যেতে পারে চিত্রের অন্ধকার। চিত্ররূপময়, বর্ণাঢ্য, বর্ণনাযোগ্য।

১। "চুল তার কবেকার অন্ধকার বিদিশার নিশা।"

২। "ধূসর প্যাঁচার মতো ডানা মেলে আঘ্রাণের অন্ধকারে..."

৩। "নক্ষত্রহীন, মেহগনির মতো অন্ধকারে
সুন্দরীর বন থেকে অর্জুনের বনে ঘুরে ঘুরে..."

৪। "অন্ধকারকে ছোট ছোট বলের মতো থাবা দিয়ে
লুফে আনল সে ..."

৫। "তবু তুমি শীত-রাতে আড়ষ্ট সাপের মতো শুয়ে
হৃদয়ের অন্ধকারে পড়ে থাক, কুণ্ডলী পাকায়ে।"

আমাদের আলোচনার অন্তর্গত যে-অন্ধকার, তা প্রধানত প্রাকৃতিক। অর্থাৎ যে অন্ধকারে আমরা থাকি, বসি, উঠি, হাঁটি, মাখি, ছুঁই, ঘাঁটি এবং স্বপ্ন দেখি আলোর। আমরা খুঁজবো, আমাদের দুই আলোচ্য কবি সেই অন্ধকারকে এঁকেছেন কে কেমন রঙে, বাজিয়েছেন কে কেমন সুরে।

জীবনানন্দ যত এগিয়েছেন অন্ধকার থেকে অমৃত সূর্যের দিকে, ততই দেখা যায় তাঁর কবিতায় অন্ধকারের উল্লেখ চলেছে বেড়ে।

বনলতা সেন-এর পঙক্তি সংখ্যা-১৮। সেখানে 'অন্ধকার' এই শব্দটির উল্লেখ ৫ বার। সাতটি তারার তিমির-এ 'উন্মেষ' নামের কবিতাটির শেষ ১৮ লাইনে তিমির, অন্ধকার আঁধার এবং রাত্রির বেবুন মিলিয়ে অন্ধকারের অনুষঙ্গ ৮ বার।

জীবনানন্দ যখন লেখেন—

"পথ চলি, ঢেউ ভেঙে পায়ে
রাতের বাতাস ভেসে আসে
আকাশে আকাশে

নক্ষত্রের পরে

এই হাওয়া যেন হা-হা করে

হু হু করে অন্ধকার"

তখন অবনীন্দ্রনাথেও খুঁজে পাই একই অন্ধ হাওয়ার ছবি, অন্য সুরে।

"মথুরাপুরের ঝড়ের বাতাস দেবকীর কারাগারে লোহার কপাট নাড়া দিয়ে নগরবাসীদের ঘর-দুয়ার ভেঙে চুরে শিকল-ছেঁড়া পাগলের মতো হু হু করে হা-হা করে হেসে সারা শহর ঘুরে বেড়াতে লাগল।"

অবনীন্দ্রনাথ যখন বলছেন,

"আকাশে একটা কালো সূর্যি উঠেছে

তখন জীবনানন্দ লিখেছেন,

"আমার আকাশ কালো হতে চায়

সময়ের নির্মম আঘাতে।"

অবনীন্দ্রনাথ—

"রাত্রি অন্ধকার, প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পাথরের খিলান, তার মাঝে গজদন্তের কাজ করা বড়ো বড়ো দরোজা খোলা ...হাঁ হাঁ করছে,—"

জীবনানন্দ—

"ফাল্গুনের অন্ধকার নিয়ে আসে সেই সমুদ্র পারের কাহিনী

অপরূপ খিলান ও গম্বুজের বেদনাময় রেখা।"

অবনীন্দ্রনাথ আঁকছেন এমন জ্যোৎস্না, যার—

"ম্লান পাণ্ডুতা একখানি শোণিতহীন মুখচ্ছবির মতো"

অথবা এমন সূর্য, যাকে দেখতে—

"একখানা কলঙ্কধরা থালার মতো।"

জীবনানন্দ আঁকছেন এমন রাত্রি, যা শোণিতহীন নয় কিন্তু রুগ্ন, ফ্যাকাশে, অসুস্থ।

"ফ্যাকাশে মেঘের মতো চাঁদের আকাশ পিছে রেখে

চলে যাই, কোনও এক রুগ্ন হাত আমাদের টানে।"

অথবা এমন আকাশ যার রঙ মড়ার চোখের রঙের মতো।

তাঁর গদ্যেও অন্ধকারের আসা-যাওয়ার দরজাটা খুলে-রাখা। কখনো আঁকছেন চরিত্রের ভিতরকার অস্থি-মজ্জার অন্ধকার। কখনো পৃথিবীর অন্ধকার। কখনো আবার পৃথিবীর অন্ধকার এসে তাঁর চরিত্রদের অবয়বে-অনুভবে আলপনা কিংবা আঁকচারা কেটে যাচ্ছে যখন যেমন খুশী।

১। সুস্মিতা হাসতে-হাসতে অন্ধ হয়ে পড়েছিল যেন—না, সন্ধ্যার অন্ধকার হয়ে গেল।" বিলাস

২। "চাতাল দেয়াল, মশারি কখন যে অন্ধকার হয়ে গেল ঘুমের ভিতর, শান্তিশেখর তা বুঝতেই পারল না ; নির্জন, অন্ধকার নিজেও এখন সে—" বিলাস

৩। "কতকগুলো আলমারির লবেজান অন্ধকার—অন্ধকারের তিব্বতী পবিত্রতা

তবু—ধুপের আবছায়া আর মনিপদ্মে হুম—টেবিল ডেস্ক ও একটা বৈরাগ্যের ছায়ান্ধকার ছাড়া কিছুই দেখছিল না সে তবুও।" বিলাস

৪। "বাংলার পাড়াগাঁর উচ্ছন্ন-যাওয়া ভিটের ওপরেও যে অন্ধকার নেমে আসে, যে-ঘেঁটু ফুল ফণীমনসা বাসা বাঁধে তা কী নরম—নিবিড়।"

গ্রাম ও শহরের গল্প

৫। "মাল্যবান ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল। কিন্তু বাইরের একটা আলো ঘরের ভেতরে ঠিকরে পড়ছে, অমরেশের সাইকেলটা ঝিকঝিক করে উঠেছে তাই। যখনই সাত-পাঁচ ভাবে মাল্যবান—অন্ধকারের ভেতর চলে যায় ; সুফলা ফলার মতো অন্ধকারটা কেটে সাইকেলটা ঝলসে ওঠে আবার" মাল্যবান

৬। "স্বপ্ন হচ্ছে অন্তিম জিনিস-এর পর আর কিছু নেই ; ছোট অন্ধকার আর বড় অন্ধকারের টানা-পোড়েনে রাতের আলোয় অন্তিম ঘনিয়ে উঠলে স্বপ্ন দেখা যায়—দুঃস্বপ্ন ; ভালো স্বপ্নও, আশ্চর্য রকমের স্নিগ্ধ স্বপ্ন সব।"

মাল্যবান

এই প্রসঙ্গে মনে পড়ে যায় তাঁর কবিতার মধ্যেকার অন্য এক মন্ত্রোচ্চারণ

"হয়তো বা অন্ধকারই সৃষ্টির অন্তিমতম কথা।"

যদিও আমরা জানি তাঁর নিজের সৃষ্টিতে অন্ধকার অন্তিমতম কথা নয়। অন্তিমতম উপলব্ধি হল, আলো। সেই আলোকে অন্তরতমরূপে পাওয়ার জন্যেই পৃথিবীর অন্ধকার পথ ধরে তাঁর এমন দীর্ঘ, দীর্ণ হাঁটা।

অবনীন্দ্রনাথ তো তাঁর 'আপন কথা' শুরুই করেছেন অন্ধকার দিয়ে।

"রাতের অন্ধকারের মাঝে দাঁড়িয়ে সারি সারি পাল তোলা থাম, এরই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে আমাদের তেতলার উত্তর-পূর্ব কোণের ছোট ঘরটা..."

অথবা

"একেবারে রাতের অন্ধকারের মতো কালো ছিল আমার দাসী—সে কাছে বসেই ঘুম পাড়াত কিন্তু অন্ধকারে মিলিয়ে থাকত সে, দেখতে পেতেম না তাকে।"

অথবা

"প্রায় রাতের মতো চুপচাপ আর অন্ধকার হয়ে যেত ঘরখানা দিন দুপুরে।... কাজেই এই সময়ে আমাদের সঙ্গে ছাড়া পেয়ে জিনিসগুলোও যেন হঠাৎ বেঁচে উঠত এবং তারাও বেরিয়েছে দিন-দুপুরের অন্ধকারে খেলার চেষ্টায়।"

স্মৃতি-কথায় বাইরে নিজের সৃষ্টি করা যে রাজ্যপাট, যে-রাজত্বের সম্রাট তিনি, অর্থাৎ তাঁর শিশু সাহিত্যে অন্ধকারের ছবি যে কত বার, কত রঙে এঁকেছেন, তার হিসেব-নিকেশ নেই। তাঁর 'আলোর ফুলকি'র অনেকখানি জুড়ে অন্ধকার রাত। সেখানে যেই ঘনিয়ে এল রাত্রির নীল অন্ধকার, নিশুতি হল চারদিক অমনি কালো বেড়ালের সবুজ চোখ দুটো ঝকঝক করে উঠল অন্ধকারে। অন্ধকারে বাদুড়গুলো জাদুকরের হাতের তাসের মতো দেখা দিচ্ছে আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। রাত্রির অন্ধকারকে বিকৃত শব্দে ভরে দিয়ে পেঁচারা ডানা ঝাপটায় আর জয়ধ্বনি দেয় অন্ধকারের। তাদের 'চৌপ' বলে ধমকে দিয়ে হুতুম প্যাঁচা নিজেই গায়ত্রী পাঠ করে যায় অন্ধকারের—

"নিঝুম রাত, দুপুর রাত, নিশুত রাত। কেষ্ট পক্ষের কষ্টিপাথর কালো আকাশের কালো রাত। বর্ষাকালের কাজলমাখা পিছল রাত। নিখুঁত রাত। কালোর পরে একটি খুঁত

তারার টিপ। ভয়ঙ্করী নিশীথিনী, বিরূপা ঘোর, ছায়ার মায়ায়, থাকুন, তিনি রাখুন। নিশাচর নিশাচরী, রক্তপাত করি, আচম্বিতে নিঝুম রাতে দুপুর রাতে। নষ্ট চন্দ্র, ভ্রষ্ট তারা, ভিতর-বার অন্ধকার-রাত সারা রাত। নিঝুম দুপুর, নিখুঁত দুপুর, অফুর রাত।"

আর এই অন্ধকারের মধ্যেই ডাইনীর কালো চুলের মতো জট পাকাতে থাকে একটা ষড়যন্ত্র, কুঁকড়োর বিরুদ্ধে, কুঁকড়োকে হত্যার জন্যে, যে-কুঁকড়ো আলোর গান গেয়ে পৃথিবীতে ডেকে আনে সাদা ফুলের মতো সাদা আলোর, রাঙা ফুলের মতো রাঙা আলোর ভোরবেলা।

তাঁর 'রাজকাহিনী'তে অধিকাংশ প্রধান ঘটনাই ঘটে অন্ধকারে।

পৌষ মাসের প্রথমে ঘন কুয়াশায় পৃথিবী যখন অন্ধকার, যখন আদিত্যমন্দিরের সূর্য-পুরোহিত ভীমের বুকপাটাখানার মতো মন্দিরের দরজাটা বন্ধ করেছেন বহু কষ্টে, সেই সময়েই দেবাদিত্যের একমাত্র কন্যা সুভাগা, বিয়ের রাতেই যিনি বিধবা, তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় আশ্রয় মেগে। আবার সেই ব্রাহ্মণ যখন আরতি-শেষের নিভন্ত প্রদীপের মতো নিভে গেলেন তখনও পৃথিবী অন্ধকার, অস্ত গেলেন সূর্য। 'বাপ্পাদিত্যে' নাগাদিত্য মারা গেলেন অন্ধকারে। বাপ্পাদিত্যকে যখন মহারানীর কোল থেকে ছিনিয়ে নিতে এল ভীল সর্দার, তখনও আকাশে ঘোর অন্ধকার। 'পদ্মিনী'তে একদিন গভীর রাত্রে ভীম সিং পদ্মিনীকে ডেকে নিয়ে এলেন কেল্লার ছাদে, সমুদ্র দেখাতে।

'অন্ধকার আকাশ—চন্দ্র নেই, তারা নেই, পদ্মিনী দেখলেন সেই অন্ধকার আকাশের নীচে আর একখানা কালো অন্ধকার কেল্লার সম্মুখ থেকে মরুভূমির ওপর পর্যন্ত জুড়ে রয়েছে। পদ্মিনী বলে উঠলেন, 'রানা এখানে সমুদ্র ছিল, আমি তো জানি না, মাগো, সাদা সাদা ঢেউ উঠছে দেখ।'

ভীম সিং হেসে বললেন, 'পদ্মিনী এ যে-সে সমুদ্র নয়, এ পাঠান-বাদশার চতুরঙ্গ সৈন্যবল! ঐ দেখ, তরঙ্গের মতো শিবিরশ্রেণী জল-কল্লোলের মতো ঐ সৈন্যের কোলাহল!...

ভীম সিং আরো বলতে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ একটা কালো পেঁচা চিৎকার করে মাথার উপর দিয়ে উড়ে গেল, তার প্রকাণ্ড দুখানা কালো ডানার ঠাণ্ডা বাতাস অন্ধকার ছাদে রাজা-রানীর মুখের উপর কার যেন দুখানা ঠাণ্ডা হাতের মতো বুলিয়ে গেল!"

ঐ 'পদ্মিনী' উপাখ্যানেই আবার—

"অমাবস্যার রাত্রি, আকাশে শুধু তারার আলো, পৃথিবীতে কালো অন্ধকার ; ঘরে ঘরে দরজা বন্ধ—"

এরই কয়েক লাইন পরে...

"তখন রাত্রি আরো অন্ধকার হয়েছে ; পাহাড়ের গায়ে বড়ো-বড়ো নিমগাছ কালো-কালো দৈত্যের মতো রাস্তায় দুই ধারে সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে।" আরো খানিক পরে—

"মহারাজা দীর্ঘশ্বাস ফেলে চারিদিকে চেয়ে দেখলেন—ঘরের এককোণে সোনার দীপদানে একটি মাত্র প্রদীপ জ্বলছিল, প্রকাণ্ড ঘরের আর সমস্তটা অন্ধকার। খিলানের পর খিলান, থামের পর থামের সারি অন্ধকার থেকে গাঢ় অন্ধকারে মিশে গেছে—"

প্রচুর অন্ধকার ছড়ানো রয়েছে 'নালকেও'।

১। "রাগে দুই চক্ষু রক্তবর্ণ করে বিকট হুঙ্কার দিয়ে তখন আকাশ ধরে টান দিলে 'মার'। তার নখের আঁচড়ে অমন-যে চাঁদ-তারায় সাজানো নীল আকাশ সেও ছিঁড়ে পড়ল

শত টুকরো হয়ে একখানি নীলাম্বরী শাড়ির মতো। মাথার উপরে আর চাঁদ নেই, তারা নেই ; রয়েছে কেবল মহাশূন্য, মহা অন্ধকার।"

২। "আজ ম্যারের ডাকে রসাতলের কাজল অন্ধকার কাঁথার মতো সর্বাঙ্গে উড়িয়ে নিয়ে আর্তনাদ করে ছুটে আসছে সে 'মারী'।"

ভূত-পত্‌রীর দেশেও অন্ধকার। সে অন্ধকার আরো বিচিত্র। সেখানকার অন্ধকারে কালো বেড়ালের মতো গুঁড়ি মেরে বসে থাকে শেওড়া গাছের ঝোপ। সেখানে অন্ধকারে নেমে আসে লণ্ঠন-ভূত, ঘোড়া-ভূতেরা। জ্বলন্ত বালি তুবড়ি-বাজির মতো ফস করে জ্বলে ওঠে অন্ধকারে। ভূত-বেহারারা পাল্কী বয়ে নিয়ে যায় হাড় খটখট, দাঁত কিটমিট সুরের কাতরানিতে—

ভূত পেরেতে
চলছে রেতে
হনহনিয়ে
ভূত পেরেতে।
সব ভূতুঁড়ে
সব ভূতুড়ে
আলো আলেয়া
জ্বলছে দূরে।

অন্ধকারের এত অফুরান বর্ণনা আঁকতে আঁকতে হঠাৎ আমাদের চমকে দিয়ে বলে উঠলেন—

"ভূতচতুর্দশীর রাত্রি এমন অন্ধকার যে, ভূতকে পর্যন্ত দেখা যায় না।"

অবনীন্দ্রনাথ শুধু অন্ধকারের ছবি আঁকেননি। ছবি আঁকার বেলাতেও অন্ধকারের কতখানি দরকার, তাও জানিয়েছেন অনেকবার। সরকারী আর্ট স্কুল থেকে একদল ছাত্র গেছে দেখা করতে। কথায় কথায় বললেন—

—কি এনেছ দাও।

অর্থাৎ ছাত্রদের আঁকা কাজের নমুনা দেখতে চাইলেন। আর সেই কাজ দেখতে দেখতেই বলে উঠলেন

—কোন্ রঙ সেরা রঙ বলতো? কালো, কথায় বলে জগতের আলো। জান না? দেখো জাপানীরা চীনেরা রঙ ছেড়ে কালি ধরেছে। শুধু কালি দিয়ে কি চমৎকার ছবি আঁকছে।

আরেক দিনের ঘটনা রানী চন্দে-র লেখায়—

"আমার বড়দা নিজের আঁকা ছবি একখানা নিয়ে এলেন অবনীন্দ্রনাথকে দেখাতে। ছবির সাবজেক্ট, তীর্থযাত্রী। স্ত্রী পুত্র ও বৃদ্ধা মাকে নিয়ে চলেছে পুরুষ তীর্থের পথে। বনপথ, রাত্রিবেলা; পুরুষটির হাতে লণ্ঠন, সেই লণ্ঠনের আলোয় পথ চলেছে সবাই।

অবনীন্দ্রনাথ তুলিভরা কালো রঙ তুলে বন, পথ আকাশ সব ঢেকে দিলেন।

: বড়দা তখন কলকাতার আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষের পদ থেকে অবসর নিয়ে শান্তিনিকেতনে বসবাস করছেন। তাঁর প্রৌঢ় বয়সের ফিনিশ করা ছবি, তার উপরে অবনীন্দ্রনাথ কালি ঢালছেন আর বড়দা নিঃসাড়ে পাশে বসে দেখছেন। যেন পাঠশালার বালক ধমক খেয়ে থতমত হয়ে আছে। অবনীন্দ্রনাথ কালো রঙ দিয়ে সব কিছু ঢাকছেন

আর বলছেন, লণ্ঠন ঝুলিয়ে দিলেই বুঝি হল? আলো বোঝাবে কী দিয়ে? কালো করো আগে চারিদিক। যেখানে আলো সেইখানেই অন্ধকার। অন্ধকার নইলে আলো ফুটবে কী করে।"

শিল্পীগুরু অবনীন্দ্রনাথ

অবনীন্দ্রনাথ এবং জীবনানন্দ দুজনেই আলো ফোটানোর জন্যে, কালো অন্ধকারকে বুনে গেছেন তাঁদের রচনার মর্মে মর্মে।

জীবনানন্দের সুতীর্থ উপন্যাস যত এগিয়ে চলে শেষের দিকে, ঘন হয়ে ওঠে অন্ধকার। গাছপালা, আকাশের উঠোন, শহরের অলিগলি, ঘরের দরজা-জানলা—চৌকাঠ-বারান্দা পার হয়ে অন্ধকার ঢুকে পড়ে জীবনে, শ্বাস-প্রশ্বাসে, চিন্তায়, জীবন-ভাবনায়, ইতিহাস-চেতনায়। ঘরের আলো জ্বালালেও চোখের সামনে এঁটে থাকে, সে অন্ধকার এমন। বড়ো-আকারের বিপ্লব, মাঝারী-রকমের ধর্মঘট, অথবা এসবের চেয়ে অনেক বেশী সাধারণ গড়নের ঠুনকো কথাবার্তা, সমস্ত কিছুর মাঝখানেই সুতীর্থ অনুভব কিংবা প্রত্যক্ষ করে এক অবধারিত, নিরবলীন অন্ধকারের যেন শরীরময় উপস্থিত। তার মনে হয়—

"আজকাল পৃথিবীটাই এমন অন্ধকার, আঁশটে যে নির্মল মন খুব উত্তেজিত হয়ে ওঠে, তা পুড়ে যাবার আগে খুব উজ্জ্বলতা ফলিয়ে যায়, খুব তেজস্ক্রিয় তাপ ; কিন্তু তার পরে কালো ছাই পড়ে থাকে।...শান্ত ঠাণ্ডা হয়ে থাকার চেয়ে ভালো জিনিষ এই অন্ধকার আঁশটে পৃথিবীতে থাকতে পারে না কিছু আর ; বেশ তিরিক্ষে তামাশাবোধ ছাড়া কেউ শান্ত হয়ে থাকতে পারে না এই কাদা রক্ত আগুন বিষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে।"

অবনীন্দ্রনাথ যখন শান্ত এবং ঠাণ্ডা হয়ে, ছবিতে যা কিছু উজ্জ্বলতা অথবা তেজস্ক্রিয় তাপ জ্বালিয়ে দেওয়ার পর, একরকম তামাশাবোধ থেকেই রচনা করে বলেছিলেন উদ্ভট-অদ্ভুত যাত্রাপালা আর কুটুম-কাটাম-এর অনাসৃষ্টি, তখন তিনিও কি সময়ের অথবা পৃথিবীর কিংবা ইতিহাসের রক্ত আগুন বিষের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দেখতে পেয়েছিলেন অমনি তরো অন্ধকার, যা কোনো লৌকিক সূর্যের আলোয় পরাভূত হওয়ার নয়?

কবিতায় শিল্পদৃষ্টি ঃ জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ

কিরণশঙ্কর সেনগুপ্ত

একালের কবিতার ব্যাপ্তি ও সর্বত্রগামীতার সঙ্গে-সঙ্গে কবিতার প্রয়োজন, ব্যবহার এবং শিল্পরূপ সম্পর্কেও বহু আলোচনার সূত্রপাত হয়েছে। অধ্যাপক, দার্শনিক কিংবা পেশাদার সমালোচক ছাড়াও কবিরা নিজেরাও অনেকেই এই আলোচনার ক্ষেত্রকে প্রশস্ত করেছেন। আধুনিক বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, অমিয় চক্রবর্তী, বুদ্ধদেব বসু, বিষ্ণু দে প্রমুখ কবির অবদান এদিক থেকে উল্লেখ্য।

যে-কবি কাব্যচর্চার জগতে সুদীর্ঘ জীবনের অধিকারী হন এবং নব নব পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে কবিতার ক্ষেত্রকে উর্বর ও প্রশস্ত করেন তাঁর বক্তব্যকে, শিল্পচিন্তার বিষয়সমূহকে তাঁর সৃষ্ট কবিতাবলীর পরিপ্রেক্ষিতেই বিচার করা সংগত ও স্বাভাবিক। কবি যেহেতু অনবরতই নতুন নতুন শিল্পরচনায় উৎসাহী এবং লিখতে না পারলেই যেহেতু অসীম যন্ত্রণার মুখোমুখি হ'তে থাকেন সেহেতু মানস জগতে শিল্প সম্পর্কেও কবির ধ্যানধারণা নব নব অভিজ্ঞতা ও প্রত্যয়ের সূত্রসন্ধানী। কবি সবার আগে মানব অভিজ্ঞতার লিপিকার এবং মানবমনের অফুরন্ত ঐশ্বর্যের উৎস সন্ধান তাঁর প্রতি কবিতারই শর্ত। তাঁর উপলব্ধির জগৎ সাধারণভাবে সমসাময়িক কালের মানবসমাজের উপলব্ধির জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন নয় ; পার্থক্য সম্ভবত এইখানটায় যে চতুর্দিকের নানা বিশৃঙ্খল ঘটনাবলীর চাপে সাধারণ মানুষ যখন দিশেহারা ঠিক সেই সময়ই কবির উপলব্ধি ঘটনাবলীকে বিভিন্ন বা একটি তাৎপর্যে চিহ্নিত করতে পারে। আর সেইহেতু কোনো প্রতিনিধিস্থানীয় কবি যখন কবিতার আদর্শ বা তাৎপর্য সম্পর্কে কোনো মতামত ব্যক্ত করেন তখন তাঁর রচনাবলীর মধ্যেই, অজস্র কবিতার কাব্যরূপের মধ্যেই, তাঁর শিল্পপ্রত্যয়কে অনুসন্ধান করা সংগত এবং স্বাভাবিক। রবীন্দ্রনাথ অবশ্য বলেছেন যে কবিকে তার আত্মচরিতে খুঁজতে যাওয়া ঠিক নয় ; কিন্তু কবির শিল্পচিন্তায় কবিকে খুঁজে পাওয়া অবশ্যই সম্ভব। রবীন্দ্রনাথ নিজেই উদাহরণ। কবিতা সম্পর্কে বিভিন্ন প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য যদি তাঁর দীর্ঘকালের সময়সীমার মধ্যে রচিত নানা কবিতাগুলো মনে রেখে বা সামনে রেখে বিচার করা যায় তা হলে কবির উক্তি ও উপলব্ধিতে কোনো প্রভেদ বা বাধা আছে কিনা জানবার সুবিধে হয়। যদিও কবি মাত্রেই কতগুলো পূর্বপরিকল্পিত বা পূর্বনির্দিষ্ট শর্ত মনে রেখে কবিতা রচনা করেন না এবং করলেও অনেক সময় শর্তের গণ্ডী অতিক্রম ক'রে তাঁর পরিকল্পনা শিল্পকে পরিশুদ্ধ রকমের কোনো বিষয় ক'রে তোলে তথাপি সমগ্রভাবে দেখা যায়, যে-কোনো শক্তিমান ও প্রতিনিধিস্থানীয় কবির কবিতা কবির উক্তি ও উপলব্ধিকে অনেক সময়েই খুব কাছাকাছি নিয়ে আসতে পারে। কবি যে ক্ষেত্রে সমালোচক সে ক্ষেত্রে তিনি উক্তি করে যেতে থাকেন এবং যখন তিনি কবিতারচনায় নিযুক্ত তখন তাঁর উপলব্ধিই কবিতায় স্বরূপ

পায়। উক্তি ও উপলব্ধির সাযুজ্যসন্ধান যে-কাব্যপাঠকের উদ্দেশ্য তাকে অত্যন্ত দুরূহ প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়েই যেতে হয় কেননা উক্তি ও উপলব্ধিকে মেলাবার কোনো দায় কবির নিজের নেই।

অথচ কাব্যপাঠক যখন জানছেন যে কবি তাঁর কবিতার স্বরূপ সম্বন্ধে যে-সব উক্তি ক'রে যাচ্ছেন তাঁর কবিতায়ও সে-সব কথার সমর্থন খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে তখন আনন্দিত হওয়ার কারণ ঘটে হয়তো। কাব্যপাঠক অনুভব করেন কবি তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সৎ আচরণের পক্ষপাতী এবং কবির ধ্যানধারণা যে-ধরনেরই হোক না কেন কবির শিল্পপ্রত্যয়ের শিকড় একটি নির্দিষ্ট প্রাণদায়িনী ভূমিতে দৃঢ়প্রোথিত।

কবিতা কী এবং কেন এ সম্বন্ধে আধুনিক কালের কবিসমাজের নানা বক্তব্য থাকতে পারে। গ্রীক ও লাতিন সাহিত্য, ইংরেজি ও সংস্কৃত সাহিত্য কাব্যচিন্তার জগতে অজস্র স্মরণযোগ্য মত ও সিদ্ধান্তের সমাবেশ ঘটিয়েছে। ধ্রুবসাহিত্য পঠনপাঠনের মাধ্যমেই অতএব যেমন সাহিত্যের অন্য শাখাসমূহ বিষয়ে তেমনই কবিতার স্বরূপ সম্পর্কেও সম্যক ধারণা করা সম্ভব। অতএব আধুনিক কবি যখন কবিতা সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করেন তখন তার সবটাই যে সে-কবির সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত উপলব্ধির অন্তঃসার এরকম মনে করা যায় না। প্রাচীন কাব্যসাহিত্যের অনেক সিদ্ধান্তই এখনকার দিনেও মূল্য পায় এবং আধুনিক কবি রক্তের মধ্যে সম্ভবত নিজের অগোচরেই সেই-সব সিদ্ধান্তকে লালন করে থাকেন। কিন্তু কাল চলিষ্ণু এবং সমাজও বদলায়। সুতরাং কবির দৃষ্টিভঙ্গিও আধুনিক কালের সমাজ ও সভ্যতার প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে বদলাতে থাকে। সচেতন কবিমাত্রেই অতএব প্রাচীন বা পূর্ববর্তীকালের কাব্যচিন্তাকে স্বকালের কষ্টিপাথরে বিচার ক'রে নিশ্চিত হতে চান এবং প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর নিজের অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্যে পুরাতন বিষয়েই নতুন ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ যুক্ত করে থাকেন। আধুনিক কাব্যপাঠক সম্ভবত একজন আধুনিক কবির কাছ থেকে প্রচলিত ও প্রাচীন বা চিরাচরিত ব্যাখ্যা শুনতে প্রস্তুত নন। বরং বলা যায় একালের কবির ব্যক্তিগত উপলব্ধির তাৎপর্যই তাঁরা কবির উচ্চারণে অনুসন্ধানপ্রয়াসী। পুরাতন বিষয়ে কবি অবশ্যই বলতে পারেন কিন্তু আধুনিক কবির আলোচনায় পুরাতন বিষয়ের ওপর নতুন আলোকসম্পাতই পাঠকমনকে আকর্ষণ করতে পারে। যেমন অন্যান্য ক্ষেত্রে তেমনই কবিতার কথাপ্রসঙ্গেও একই কথার পুনরাবৃত্তি চর্বিতচর্বণের নামান্তর এবং অতএব পরিত্যক্ত। বরং যে-আধুনিক কবি নিজের ব্যক্তিগত উপলব্ধির মাধ্যমে কবিতাবিষয়ে নতুন তাৎপর্যের আভাস দিতে পারেন আধুনিক পাঠকসমাজ অনতিবিলম্বেই তাঁকে স্বাগত জানান। প্রসঙ্গত এলিয়ট স্মর্তব্য। অনেক পুরাতন বিষয়ে নতুন কথা, নতুন ব্যাখ্যা যেমন তাঁর কবিতাবিষয়ক আলোচনার শর্ত, অন্য, অন্য দিকে তেমনই একান্তভাবে ব্যক্তিগত উপলব্ধির আলোকেও তাঁর আলোচনা বিকীর্ণ। কিন্তু আধুনিক কবিসমালোচকের সমালোচনা পদ্ধতির বিষয় বর্তমান প্রবন্ধের অঙ্গীভূত নয়, একজন সৎকবি মুখে যা বলেন আচরণে পালন করেন কিনা এই প্রশ্নের কতকটা সদুত্তর অনুসন্ধানই আপাতত উদ্দেশ্য।

আধুনিক বাংলা কবিতায় জীবনানন্দ পথিকৃৎ কবিদের মধ্যে প্রধানতম। কাব্যজীবনের প্রথম দিকে তিনি প্রকৃতির কবি ; নৈসর্গিক চিত্ররম্যতায় অভিভূত প্রকৃতি ও মানুষের যোগাযোগের অন্তর্গূঢ় রহস্যসন্ধানের কবি। কিন্তু তাঁর পরবর্তীকালের কবিতায় একালের

নগরজীবনের পটভূমিকায় জীবনানন্দ সভ্যতার গভীর সংকটে চিন্তিত এবং মানবচৈতন্যের নবউদ্বোধনের সন্ধানী। (বলা-ই বাহুল্য, এরকম একটি সাধারণ ও সংক্ষিপ্ত উক্তিতে জীবনানন্দীয় কাব্যজগৎ খুব স্পষ্ট হতে পারে না। বর্তমান প্রবন্ধকারের উদ্দেশ্যও অনুরূপ নয়।) জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আধুনিক মননের উপযোগী হয়েও একজন কবির স্বভাবধর্মকে তিনি সর্বদাই স্বতন্ত্রভাবে চিহ্নিত করতে উৎসুক। 'কবির প্রণালী অন্যরকম, কোনো প্রাক্‌নির্দিষ্ট চিন্তা বা মতবাদের জমাট দানা থাকে না কবির মনে—কিংবা থাকলেও সেগুলোকে সম্পূর্ণ নিরস্ত করে থাকে কল্পনার আলো ও আবেগ ; কাজেই চিন্তা ও সিদ্ধান্ত, প্রশ্ন ও মতবাদ প্রকৃত কবিতার ভিতর সুন্দরীর কটাক্ষের পিছনে শিরা, উপশিরা ও রক্তের কণিকার মতো লুকিয়ে থাকে। লুকিয়ে থাকে ; নিবিষ্ট পাঠক তাদের সে সংস্থান অনুভব করে ; বুঝতে পারে যে তারা সংগতির ভিতর রয়েছে, অসংস্থিত পীড়া দিচ্ছে না ; কবিতার ভিতর আনন্দ পাওয়া যায় ; জীবনের সমস্যা ঘোলা জলের মুষিকাঞ্জলির ভিতর শালিকের মতো স্নান না ক'রে বরং যেন করে আসন্ন নদীর ভিতর বিকেলের শাদা রৌদ্রের মতো ;—সৌন্দর্য ও নিরাকরণের স্বাদ পায়।'[১] এবং জীবনানন্দ প্রায় কাব্যজীবনের শুরু থেকে তাঁর কবিতায় সংগতি, সৌন্দর্য ও নিরাকরণের স্বাদ বিস্তৃত করবার পক্ষপাতী। 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবিতাবলীতে কবি সৌন্দর্যের হাতে ধরা দিয়েছেন ; নৈসর্গিক পরিবেশ বিক্ষত মনুষ্যহৃদয়কে নিরাময় ক'রে তুলতে পারে কিংবা হৃদয়ের মধ্যে এমন এক গভীরতর অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির প্রসার ঘটাতে পারে যা মানবচৈতন্যের মুক্তিরই সমার্থক। কবি যখন একক ও নিঃসঙ্গ তখনও তাঁর মানসজগৎ সতত স্পন্দিত ; 'মাথার ভিতরে স্বপ্ন নয়, কোন্ এক বোধ কাজ করে।' বাইরের জগতের কাজ তখন তুচ্ছ মনে হয় এবং 'পৃথিবীর পথ ছেড়ে আকাশের নক্ষত্রের পথ' অগাধ স্বাদের দিকেই নিয়ে যেতে চায়। বলা বাহুল্য, এই উপলব্ধির দার্শনিক কি সমাজনীতিবিদ কিংবা বৈজ্ঞানিকের উপলব্ধি থেকে স্বতন্ত্র। 'স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—কোন্ এক বোধ কাজ করে মাথার ভিতরে।' এবং

পারাপারে

উপেক্ষা করিতে চাই তারে ;
মড়ার খুলির মতো ধ'রে
আছাড় মারিতে চাই, জীবন্ত মাথার মতো ঘোরে
তবু সে মাথার চারিপাশে,
তবু সে চোখের চারিপাশে,
তবু সে বুকের চারিপাশে ;
আমি চলি সাথে-সাথে সেও চ'লে আসে।[২]

এবং জীবনানন্দ বলেন : [কবিতা] যা দিতে পারে দর্শনও তা দিতে পারে, ধর্মও তা দিতে পারে ; সমাজসংস্কারক, জাতিসংস্কারক মনীষীরা এমন-কি কর্মীরাও তা দিতে পারে। তা হলে কাব্যের স্বকীয় সিদ্ধির কোনো প্রয়োজন থাকে না।'[৩] এবং এ প্রসঙ্গে তাঁর সুস্পষ্ট ভাষণ : 'অন্য সমস্ত প্রতিভার মতো কবি-প্রতিভার কাছেও শ্রেষ্ঠ জিনিস পেতে হলে

১। কবিতার কথা। জীবনানন্দ দাশ।
২। 'বোধ' কবিতার অংশ। শ্রেষ্ঠ কবিতা।
৩। কবিতার কথা।

যেখানে তার প্রতিভার স্বকীয় বিকাশ হবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা সেই শিল্পের রাজ্যে তাকে খুঁজতে হবে; সেখানে দর্শন নেই, রাজনীতি নেই, সমাজনীতি নেই, ধর্মও নেই—কিংবা এই সবই রয়েছে কিন্তু তবুও এ-সমস্ত জিনিস যেন এ-সমস্ত জিনিস নয় আর ; এ-সমস্ত জিনিসের সম্পূর্ণ সারবত্তা ও ব্যবহারিক প্রচার অন্যান্য মনীষী ও কর্মীদের হাতে যেন—কবির হাতে আর নয়।[৪]

কবিতার মতো শিল্পের আলোচনায় জীবনানন্দ সর্বদাই বৃহত্তর পটভূমি সামনে রেখেছেন। ব্যক্তি সমাজ ও সভ্যতার, অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যতের একটি বিশাল পটভূমি তাঁর কাব্যালোচনার ভিত্তি। তাঁর কবিতার মধ্যেও থেকে থেকে এই মহাজাগতিক পটভূমি পরিব্যাপ্ত।

আজ এই পৃথিবীর অন্ধকারে মানুষের হৃদয়ে বিশ্বাস
কেবলি শিথিল হয়ে য়ায়, তবু তুমি
সেই শিথিলতা নও, জানি, তবু ইতিহাসরীতি প্রতিভার
মুখোমুখি আবছায়া দেয়ালের মতো নীল আকাশের দিকে
ঊর্ধ্বে উঠে যেতে চেয়ে তুমি
আমাদের দেশে কোনো বিশ্বাসের দীর্ঘ তরু নও।
তবু
কী যে উদয়ের সাগরের প্রতিবিম্ব জ্ব'লে ওঠে রোদে!
উদয় সমাপ্ত হয়ে গেছে নাকি যে অনেক আগে?
কোথাও বাতাস নেই তবু
মর্মরিত হয়ে ওঠে উদয়ের সমুদ্রের পারে। —"তবু"

কবি যখনই কোনো উক্তি করেছেন তখন বর্তমান কাল এবং অতীতের সেতুবন্ধের বিষয় তাঁর মনে স্থিরতা পেয়েছে।

মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায়, অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো—আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজ
কতো দুর অগ্রসর হ'য়ে গেল জেনে নিতে আসে।
—"মানুষের মৃত্যু হ'লে"

৩

পক্ষান্তরে সুধীন্দ্রনাথ যখন বলেন যে 'শিল্পোৎকর্ষের অনন্য পরীক্ষা সাময়িক জীবনের কষ্টিপাথরে তার যোগ্যতা ক'ষে দেখা'[৫] এবং 'কাব্যের মুক্তি পরিগ্রহণে ; এবং কবি যদি মহাকালের প্রসাদ চায়, তবে শুচিবায়ু তার অবশ্যবর্জনীয়, তবে ভুক্তাবশিষ্টের সন্ধানে ভিক্ষাপাত্র হাতে নগরপরিক্রমা ভিন্ন তার গত্যন্তর নেই।' তখন শিল্পচিন্তার অন্য একটি

৪। তদেব।
৫। কাব্যের মুক্তি। স্বগত। ১৩৪৫

স্বতন্ত্র তোরণে পৌঁছানো সম্ভব হয়। 'গত্যন্তর নেই' কথাটি তাৎপর্যপূর্ণ। মানুষ পৃথিবীতে যা চায় তা পায় না এবং যা এড়াতে চায় তার মুখোমুখী তাকে অনিচ্ছাসত্ত্বেও হতে হয়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতার একটি প্রধান সুর বিষাদের, নাস্তিকতার। 'কোথায় পালাবে? ছুটবে বা আর কত? /উদাসীন বালি ঢাকবে না পদরেখা। /প্রাক্‌পুরাণিক বাল্যবন্ধু যত / বিগত সবাই, তুমি অসহায় একা।' এবং একই কবিতায় কবি যখন বলেন ঃ

আমি জানি এই ধ্বংসের দায়ভাগে
আমরা দুজনে সমান অংশীদার ;
অপরে পাওনা আদায় করেছে আগে,
আমাদের 'পরে দেনা শোধব্যর ভার। —"উটপাখি"

তখন কাব্যপাঠক এক নিমেষেই বর্তমানকালের দেশকাল সমাজের প্রতিকূল পরিস্থিতি সম্পর্কে এবং কবির কাব্যপ্রত্যয় সম্পর্কেও সজাগ হন। 'কাব্যের কল্পতরু আজকে আর বটের মতো ধরিত্রীর অঙ্কে বদ্ধমূল নয় ; সে-গাছ পর্বতজাত রডড্রেন্ড্রনের মতো তনুবাত অন্তরীক্ষে উচ্ছ্বসিত ; এবং সেই জন্যেই তার দেহ গ্রন্থিল, তার পরিসর খর্ব, তার তলায় ছায়া নেই, ফল নেই তার শাখায়, আছে শুধু একটা অহৈতুক আন্দোলন, আর আছে ফুল, নির্মম রক্তাক্ত ফুল।'[৬] এবং অন্যত্র 'ব্যক্তি সব সময়েই সীমাবদ্ধ, তার মজ্জায় মজ্জায় যত বিদ্রোহী-ই থাকুক-না কেন, স্থান-কালের দাসত্ব তার অবশ্যকর্তব্য।'[৭]

অমেয় জগতে
নিজস্ব নরক মোর বাঁধ ভেঙে ছড়ায়েছে আজ,
মানুষের মর্মে মর্মে করিছে বিরাজ
সংক্রমিত মড়কের কীট ;
শুকায়েছে কালস্রোত, কর্দমে মিলে না পাদপীঠ। —"নরক"

সুধীন্দ্রনাথ বরাবরই শিল্পচিন্তার ক্ষেত্রে দেশকাল সম্পর্কে চিন্তিত; তাঁর বিবেচনায় যুগসংকটের দিনগুলোতে স্রষ্টা এবং সমালোচক প্রায় সমার্থক। এবং 'জীবন যেহেতু শৃঙ্খলা ও বিশৃঙ্খলার বিকল্পে তরঙ্গায়িত, তাই শিল্পপ্রসূ সামঞ্জস্য সাধনের প্রয়োজন কোনো সময়ে উহ্য, কখনো ব্য ব্যক্ত' এবং এই প্রসঙ্গে সুধীন্দ্রনাথের বক্তব্য ঃ 'শুধু কবি কেন, আমার বিশ্বাস ভাবুকমাত্রেই যে-রহস্যের উদ্‌ঘাটনে বদ্ধপরিকর, সে হচ্ছে ব্যক্তি ও সমাজের, ব্যষ্টি ও সমষ্টির, বিশেষ ও সাধারণের সম্পর্ক। যে-সময়ে সমাজবন্ধন নিবিড়, যখন লোকোত্তর আদর্শের প্রতি মানুষের ভক্তি অচলা,—যেমন ছিলো মধ্যযুগের য়ুরোপে—তখন কাব্যবিবেচনাকে গৌণ ক'রে, মুখ্যত অনুকরণের সাহায্যেই কাব্যরচনা সম্ভব। কিন্তু যখন উপনিপাত বিশ্ব ব্যাপারের ছত্রপতি, যখন অতিজীবিত আদর্শকে আঁকড়ে থাকা মারাত্মক,— যেমন আমাদের যুগে—তখন স্রষ্টা আর সমালোচক সমার্থবাচক।'[৮]

মানুষের হৃদয় যখন কোনো বিশ্বাসে স্থির হতে পারছে না তখন মর্মান্তিক যন্ত্রণায় তার জগৎ আচ্ছন্ন। সুধীন্দ্রনাথ পরিশ্রমী, অন্বেষণে উদ্যোগী এবং অনলস পঠনপাঠনের মাধ্যমে বিজ্ঞান, দর্শন ও শিল্পকলা সম্পর্কে অভিজ্ঞ। এই অভিজ্ঞানই সম্ভবত তাঁর যন্ত্রণাবোধের

৬। কাব্যের মুক্তি। স্বগত। প্রথম সংস্করণ। ১৩৪৫
৭। ছন্দোমুক্তি ও রবীন্দ্রনাথ। ঐ।
৮। ঐতিহ্য ও টি-এস-এলিয়েট। স্বগত। প্রথম সংস্করণ। ১৩৪৫

চেতনাকের সম্প্রসারিত করেছে। জীবনানন্দের যন্ত্রণাবোধ শেষ পর্যন্ত শিল্প প্রত্যয়ের চেতনায় পরিশুদ্ধ ; অর্থাৎ, যন্ত্রণাবোধের পরেও যে বিবেকী মানুষের উত্তরণ কোনো এক ভবিষ্যতে সম্ভব হতে পারে এরকম একটি চেতনা জীবনানন্দের কবিতায় অন্তঃসলিলা ফল্গুর মতো প্রবাহিত : 'চারিদিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি / অসীম স্বর্গ খুলে দিয়ে লক্ষ কোটি নরককীটের দাবি /জাগিয়ে তবু সে-কীট ধ্বংস করার মতো হ'য়ে / ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রেখেছে কিছু হয়তো হৃদয়ে।'[৯] পক্ষান্তরে সুধীন্দ্রনাথে এই আশ্বাসের সমর্থন অনুপস্থিত। সম্ভবত দেশকালের ঘোর দুর্যোগে সংবর্তের মহাআবর্তেব অন্ধকারে কবিচিত্ত প্রগতি এবং প্রলয়ের মধ্যে পার্থক্য খুঁজে পান না। এই প্রসঙ্গেই সুধীন্দ্রনাথের নিম্নলিখিত উক্তি, আমার বিশ্বাস, তাঁর শিল্পচিন্তাকে স্পষ্টতর করবে : 'আমাদের যুগে নিদ্রালু মন্থরতার স্থান নেই , এবং অধুনাতনী ধ্বংসলীলার ব্যাখ্যায় অভিব্যক্তিবাদের শরণ নেওয়া অসম্ভব। আমরা যে আজ ঐতিহ্যের শাসনমুক্ত, ব্যক্তিকে সমষ্টির ভগ্নাংশ বলতে আমরা যে আজ অনিচ্ছুক, তার কারণ এ নয় যে পুরাতন আদর্শ আমাদের প্রগতির প্রতিবন্ধক, তার কারণ শুধু এই যে আমাদের ইতিহাসে প্রগতি আর প্রলয়ের মধ্যে বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই। [প্রসঙ্গত, এলিয়টও বর্তমান যুগকে অগ্রগামী অধঃপতনের যুগ বলে চিহ্নিত করেছিলেন।[১০]] সেইজন্যে যে-আদর্শ এই সর্বনাশ ঘটিয়েছে, শুধু তাকে নয়, প্রাচীন-অর্বাচীন, সকল আদর্শকেই আমরা তফাতে রাখি। সেইজন্যে আজকে আর আমরা কেবল বৃহত্তম সংখ্যার মহত্তম মঙ্গলে বিশ্বাস হারিয়েই থামতে পারি না, সংখ্যা শব্দটাকে ভয়ের চক্ষে দেখি। সেইজন্যে আমরা স্বাধীনতা খুঁজি না, চাই মাত্র নির্বিবোধ। কিন্তু এই মনোভাব নিয়ে জীবনযাত্রা নির্বাহ যতই সহজসাধ্য হোক-না কেন, সৌন্দর্যসৃষ্টির, অন্ততপক্ষে কবিতায় সৌন্দর্যসৃষ্টির, পদ্ধতি সম্পূর্ণ পৃথক।'[১১] সুধীন্দ্রনাথের এই শিল্পচিন্তা উত্তরকালেও পরিবর্তিত হয় নি। 'আমাদের সৌন্দর্যবোধ নির্মাণ প্রবৃত্তির সঙ্গে সংযুক্ত, এবং আমাদের সত্যবোধ আর শ্রেয়োবোধের শিকড় কৌতূহলের ও সমাজ সংগঠনের প্রবৃত্তিদ্বয়ে।' এবং 'যদি ভাবি সে কল্যাণবোধ বস্তুমাত্রেব স্বাভাবিক ধর্ম, তাহলে সত্য, শিব, সুন্দরের যথার্থ পরিচয় আমরা পাব না, আমাদের জিজ্ঞাসার অকালমৃত্যু ঘটবে ভাববাদের প্রতিধ্বনিমুখর শূন্যতায়।'[১২]

মোটের ওপর সুধীন্দ্রনাথ মেধা ও মননের সাহায্যে সভ্যতা, ব্যক্তি ও সমাজের যে স্বরূপ উপলব্ধি করেছিলেন তাঁর উক্তির সঙ্গে তার সাদৃশ্য অধিকাংশ ক্ষেত্রেই লক্ষণীয়। তাঁর উপলব্ধিতে সমসাময়িক জগৎ সংসারের বিভীষিকা যত ব্যাপক কোনো প্রকারের উত্তরণের আশা সেই পরিমাণেই সুদূরপরাহত।

'... আমি বিংশ শতাব্দীর
সমানবয়সী ; মজ্জমান বঙ্গোপসাগরে ; বীর
নই, তবু জন্মাবধি যুদ্ধে যুদ্ধে, বিপ্লবে বিপ্লবে
বিনষ্টির চক্রবৃদ্ধি দেখে, মনুষ্যধর্মের স্তবে

৯। "অনন্দা" ('শ্রেষ্ঠ কবিতা')। জীবনানন্দ দাশ। ১৩৬১
১০। বন্ধনীচিহ্নের মন্তব্য বর্তমান প্রবন্ধাকারের।
১১। "ঐতিহ্য ও টি-এস-এলিযট," স্বগত।
১২। "আত্মেব অত্যাচার" সাহিত্য পত্র। ১৩৬৩ , এই রচনাটি পবে 'কুলায় ও কালপুরুষ' গদ্যগ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

নিরুত্তর, অভিব্যক্তিবাদে অবিশ্বাসী, প্রগতিতে
যত না পশ্চাৎপদ, ততোধিক বিমুখ অতীতে। —''যযাতি', সংবর্ত।

বস্তুত, সুধীন্দ্রনাথের কাব্যভাবনা ও শিল্পচিন্তা এইজন্য উল্লেখ্য নয় যে পরিব্যাপ্ত অপ্রেমের অন্ধকারে, বিংশ শতকের সর্বব্যাপ্ত অশুভ সংকেতের মধ্যে তিনি কোনো আশার আলোক নিজে দেখতে পেয়েছেন অথবা পাঠককে দেখাতে পেরেছেন। বরং বলতে পারা যায় শূন্যতা ও অমঙ্গলবোধেব মুখোমুখী তিনি যেরকম অসম সাহসিকতার সঙ্গে দাঁড়াতে পেরেছেন তার মধ্যেই তাঁর কবিতা ও শিল্পচিন্তার তাৎপর্য নিহিত।

শিল্পচিন্তার অপর একটি ক্ষেত্রে, আঙ্গিকের প্রসঙ্গে, কবি সুধীন্দ্রনাথের উক্তি সুস্পষ্ট। 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি জানিয়েছেন 'মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট ঃ আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদান শব্দ।' এবং শব্দ নিয়ে পরীক্ষা তাঁর সমগ্র কাব্যজীবনে শেষ পর্যন্ত অব্যাহত ছিল। 'ছন্দে শৈথিল্যের প্রশ্রয় না দিয়ে, লঘু-গুরু, দেশী-বিদেশী, এমন-কি পারিভাষিক, শব্দও আচরণীয় কিনা' সে-অনুসন্ধান 'সংবর্ত' কাব্যগ্রন্থের অন্যতম উদ্দেশ্য, এমন-কি প্রধান উদ্দেশ্যও বলতে পারা যায়। জীবনানন্দ প্রাত্যহিক এবং দৈনন্দিন সংসারের অনেক শব্দকে কবিতার জগতে নিয়ে এসেছেন। 'মেয়েমানুষ' 'পেঁচা' 'ইঁদুর' কিংবা 'বিয়োবার দেরি নাই'র মতো পঙ্‌ক্তিযোজনা, 'চুরুট', 'শূয়োর' 'যোনি' 'ডিনামাইট' প্রভৃতি শব্দের ব্যবহারে তাঁর কবিতায় স্বতন্ত্র অভিব্যক্তি। জীবনানন্দ ও সুধীন্দ্রনাথ উভয়েই শব্দসচেতন ; কিন্তু শব্দ ব্যবহারে মৌলিক পার্থক্য অস্পষ্ট নয়। সুধীন্দ্রনাথের কবিতায় অনেক প্রাচীন শব্দও নতুন তাৎপর্য পেয়েছে যেমন জীবনানন্দের কবিতায় পেয়েছে গ্রামীণ শব্দের উচ্চারণ। 'উচ্ছ্বাস সংবরণ যে সাহিত্য সাধনার আদ্যকৃত্য' সুধীন্দ্রনাথ এই উক্তি মনে রেখেই কাব্যশরীর নির্মাণে সচেতন হয়েছিলেন। জীবনানন্দ কবিতা রচনার ক্ষেত্রে 'অনুপ্রেরণা' নামক বস্তুটিকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারেন নি যদিও সুধীন্দ্রনাথের বিবেচনায় সার্থক শিল্প সচেতন কবির শ্রমের পুরস্কার। কবিতায় গদ্যবাক্যের সচেতন ব্যবহারের চেষ্টায় 'সংবর্ত'র অনেক কবিতাই চিহ্নিত ; কাব্যরীতিকে অব্যাহত রেখে তাঁর এই সশ্রম উদ্যোগ বাংলা কবিতার একটি অভিনব পরীক্ষা ব'লে মেনে নিতে বাধা থাকে না। শব্দ মূলত অর্থবাহক হবে, আবেগবাহক নয়, এবং এই ধারণায়ই সুধীন্দ্রনাথ জানিয়েছিলেন ঃ 'আজকালকার অধিকাংশ সাহিত্যেই শব্দ অর্থবাহকরূপে ব্যবহৃত না-হয়ে, হয় আবেগবাহকরূপে। অথচ আবেগ অন্তঃপুরচারী ; তার বিশ্রম্ভালাপ সদবে শোনা গেলে, সোহাগেব চেয়ে পরিহাসই বোধহয় স্বাভাবিক, পরিহাসই বোধহয় শোভন।'[১৩] এবং কবিব লক্ষ্য শেষ পর্যন্ত 'প্রবহমান ঐতিহ্যের সঙ্গে স্বকীয় প্রণালীর সঙ্গম-সাধনই অব্যক্তিব মরুভূমিতে ফসল ফলানোর একমাত্র উপায়। ব্যক্তিগত অনুভূতি যখন অভিব্যক্তি আবেগেব অন্তঃপ্রবেশে রসিয়ে ওঠে, তখনই সে রত্নগর্ভা-পদবীর যোগ্য, শুধু তখনই রূপের জন্ম সম্ভব।'[১৪]

কিন্তু সুধীন্দ্রনাথেব শব্দচেতনা অনেকের কাছে সর্বদা সার্থক মনে হয় নি। অন্তত বুদ্ধদেব বসু সুধীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত গুরুগম্ভীর শব্দাবলীর প্রয়োগ সম্পর্কে একবার বলেছিলেন ঃ '...বলেছিলুম মাইকেল 'নির্বীজ', কিন্তু এই পূর্বসূরীর সঙ্গে—এমনকি মিল্টনের সঙ্গে—সুধীন্দ্রনাথের আত্মীয়তা ক্রমশই স্পষ্ট হ'য়ে উঠছে, আর যদিও

১৩। 'কাব্যসাহিত্যেব ভবিষ্যৎ', ('পরিচয়'; কার্তিক ১৩৩৯)।

১৪। 'ঐতিহ্য ও টি-এস-এলিয়ট'।

'বীরাঙ্গনা কাব্যে' ও সংবর্ত কবিতার হার্দ্য আবেদন সুদূরপরাহত, তবু সুধীন্দ্রনাথ অন্তত এটুকু প্রমাণ করেছেন যে মাইকেলের কাছে বাঙালি কবির এখনো কিছু শেখবার আছে। এও একটি কারণ, যার জন্য আমাদের অবাক লাগে যখন তাঁর মুখে শুনি যে মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যদর্শনই তাঁর অম্বিষ্ট।'[১৫]

চলতি ভাষায় ইডিয়ম কিংবা প্রচলিত সহজ শব্দাবলীর নিপুণ ব্যবহার জীবনানন্দের কবিতার বৈশিষ্ট্য একথার উল্লেখ করা হয়েছে ; সুধীন্দ্রনাথের শব্দনির্বাচন সুনিশ্চিত ভাবেই সাধু ভাষার শব্দজগতের সন্ধানী। তৎসত্ত্বেও মাঝে মাঝে কখনো কখনো সহজ শব্দের ব্যবহার সুধীন্দ্রনাথের কবিতায়ও শেষের দিকে নজরে পড়ে। বুদ্ধদেব বসুর বিবেচনায় 'সংবর্ত' কবিতায় অন্তত এটা স্পষ্ট যে ভাষাকে সহজ ক'রে তোলার জন্য কবি এখানে সচেতনভাবে প্রয়াসী ছিলেন।'[১৬] কিন্তু সুধীন্দ্রনাথের কাব্যচিন্তায় এই প্রয়াস সমগ্রভাবে কোনো উদ্যোগের অঙ্গীভূত হতে পারত কিনা তা তর্ক বা অনুমানসাপেক্ষ বিষয়।

শিল্পদৃষ্টির উপস্থাপনায় জীবনানন্দের ভাষা তাঁর কবিতার মতোই উপমাবহুল। কবিতায় যে-সব উপমা কাব্যপাঠককে চমৎকৃত করে গদ্যেও সে-রকম উপমাদির প্রয়োগ জীবনানন্দর গদ্যরীতির বিশেষত্ব। 'কবিতার কথা' প্রবন্ধটির কোনো কোনো অংশ দ্রষ্টব্য। সুধীন্দ্রনাথের গদ্য তাঁর কবিতার মতোই জটিল এবং গুরুগম্ভীর ; সতর্কপাঠক যথেষ্ট মনোযোগী হ'লে এবং তাঁর সংস্কৃতঘেঁষা শব্দাবলীর যথাযথ অনুসরণ করতে পারলে তবেই পুরস্কৃত হন। জীবনানন্দের গদ্যভাষণে যতিচিহ্নের অভিনবতা লক্ষণীয় ; সুধীন্দ্রনাথের গদ্যে শব্দ নির্বাচনের স্বাতন্ত্র্য। এই উপস্থাপনার বৈচিত্র্য-বিচার অবশ্যই একটি স্বতন্ত্র প্রবন্ধের বিষয়।

১৫। 'কবিতার অনুবাদ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত'। 'কবিতা' ত্রৈমাসিক পত্র। বর্ষ ১৯ সংখ্যা ৪। সম্ভবত এই একটি আলোচনায় বুদ্ধদেব সুধীন্দ্রনাথের কবিতার অনুবাদ, শব্দপ্রয়োগ এবং পয়ারের ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি বিরূপ মন্তব্য করেছিলেন।

১৬। তদেব।

জীবনানন্দ দাশ

আবুল ফজল

অবিমিশ্র কবি বললে যা বোঝায় আধুনিক বাংলা সাহিত্যে জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত হচ্ছেন তাই। জীবনানন্দ আগেই পরলোকগত, সম্প্রতি সুধীন্দ্রনাথও গতায়ু। দেখে কিছুটা আশ্চর্য লাগে সাম্প্রতিক বাংলা সাহিত্যে এ দু'জন কবি মৃত্যুর পরই বেশী করে স্মরণীয় হয়ে উঠেছেন। মৃত্যুর পর কোনো মানুষকে স্মরণ করার কারণ, নিঃসন্দেহে তাঁর সাধনা ও অবদানের বিশিষ্টতারই প্রমাণ। স্লো-সাইকেল রেসের মতো লেখার ক্ষেত্রেও যদি মন্থর গতির কোনো প্রতিযোগিতা থাকতো তাতে এঁরা নিশ্চিত প্রথম ও দ্বিতীয় হতেন। সম্ভবতঃ জীবনানন্দ দাশই হতেন প্রথম।

কবি হিসেবে এ দু'জনের বিশিষ্টতা অনস্বীকার্য কিন্তু দু'জনের কেউ-ই অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী ছিলেন এ বললে তা হবে অতিরঞ্জন। এঁদের সাধনা ছিল অকৃত্রিম, একনিষ্ঠ ও সুগভীর কিন্তু প্রতিভা ছিল সীমিত। শিল্পী হিসেবে এঁরা নিপুণ কিন্তু বিচিত্র নন। এঁদের রচনা গভীর কিন্তু ব্যাপ্তিহীন। এঁদের সুর ও স্বর ছিল অনন্য ও স্বতন্ত্র। প্রধান কবিদের বেলায় যে-রকম সুর ও স্বর-বৈচিত্র্য দেখা যায় তা এঁদের রচনায় অনুপস্থিত। অপ্রধান হলেও এঁদের গৌরব এঁরা বিশিষ্ট, চরিত্রে ও ব্যক্তিত্বে এঁরা স্বতন্ত্র—কারো সঙ্গে নয় 'এক মানসে লীন।' এঁরা দশের সহিত এক নন। তাই এঁদের রচনায় রয়েছে একটা আলাদা স্বাদ। তবে সেই স্বাদ উপভোগ করতে হলে হতে হবে connoisseur।

এঁরা ছিলেন বিশেষ করে ও একান্তভাবে কবি। জীবিকার জন্য যে-পেশাই এঁরা অবলম্বন করুন না কেন আদতে মন-মেজাজ ধ্যান-ধারণায় এঁরা নিছক কবি ছাড়া আর কিছুই ছিলেন না। এঁদের পাণ্ডিত্য এঁদের কবিতারই অঙ্গ, তারই প্রস্তুতিপর্ব। হয়তো-বা উপাদান ক্ষেত্র।

কোনো ইজম নয়। কোনো প্রচার-প্রচারণা নয়। কোনো দর্শন বা আদর্শও নয়—শুধু কবিতা। শুধু কবিতাই লিখেছেন এঁরা। সবচেয়ে প্রশংসার কথা কবিতায় এঁরা সংযত বাকের চূড়ান্ত। উভয়ে গদ্য লিখেছেন খুব কম। যা লিখেছেন তাও তাঁদের কবিতার মতোই সংহত ও বাকবাহুল্যবর্জিত।

সমসাময়িক বিষয়েও যখন এঁদের মন-মানস হয়েছে আলোড়িত এবং সেই সম্বন্ধেও যখন কথা বলতে চেয়েছেন এঁরা, তা-ও কবিতার রসে জারিয়ে নিয়ে তবেই বলেছেন। ফলে তা কথাকে ডিঙিয়ে হয়েছে কবিতা। এবং বিপরীত দৃষ্টান্ত নজরুল ও সুকান্তের অনেক কবিতা। যাতে কবিতাকে ছাড়িয়ে কথা হয়েছে প্রধান ও উচ্চরোল। এসব কবিতার আকর্ষণ একমাত্র কথাতেই সীমাবদ্ধ। কিন্তু দাশ ও দত্ত কবির কবিতার প্রধান আকর্ষণ তার কবিত্ব। কথা এখানে গৌণ।

যাঁদের কাছে কবিতা শুধু কবিতার জন্য প্রিয় জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ দত্ত তাঁদের

প্রিয় কবি এবং থাকবেন অনেকদিন প্রিয়। কথা যতো সহজবোধ্য কবিতা ততো নয়। ফলে সুকবি ও সুকবিতার রসোপলব্ধি বিলম্বিত হতে বাধ্য। অনেককে তার জন্য মৃত্যুর পরও বহুকাল অপেক্ষা করে থাকতে হয়।

কবিতার এই সর্বব্যাপী দুর্দিনেও বিশিষ্ট কবি যে নেই তা নয়, কিন্তু সেই বিশিষ্ট কবিদের মধ্যেও সুধীন্দ্রনাথ ছিলেন সবিশেষ। যেমন সবিশেষ ছিলেন জীবনানন্দ দাশ। উভয়ে বিশিষ্ট অর্থাৎ নিজস্ব সুর আঙ্গিকের ছিলেন সাধক আর উভয়ের সেই সাধনার একনিষ্ঠ একাগ্রতায় আমৃত্যু কখনো ছেদ পড়েনি। কিন্তু বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে তাঁদের নিজেদের মধ্যে ব্যবধান ছিল প্রায় সুমেরু কুমেরু। আর দু'য়ের কেউই ছিলেন না জনতার কবি। তবে সুধীন দত্তের কবিতা অধিকতর উপভোগ্য যদি সঙ্গে থাকে একজন সাকী, আধুনিক পরিভাষায় বান্ধবী। জীবনানন্দ দাশের কবিতার বেলায় তারও দরকার নেই। তা বিরল মনে গুনগুন করে পড়ার ও অনুভব করারই কবিতা। একটা শান্ত-সুন্দর নির্মল অনুভূতির পরিমণ্ডল সৃষ্টি করেই তিনি থেমে পড়েন। কোথাও ব্যবহার করেননি বাড়তি বা ফালতু শব্দ একটিও। কবিতায় থামা বা থামতে জানা কবির জন্য যে কত বড় মৌলিক গুণ তার প্রমাণ জীবনানন্দের কবিতা।

সুধীন দত্তের কবিতা প্রসঙ্গে সাকীর উল্লেখে কেউ কেউ বিস্মিত হতে পারেন। কারণ আমাদের অনেক পাঠকই যে-সব কবির রচনা দুরূহ ও শক্ত তাঁদের অনায়াসে মিস্টিক ও দার্শনিক ভেবে বসেন। সুধীন্দ্রনাথ নিঃসন্দেহে দুরূহ ও শক্ত, কিন্তু তিনি ঐ দু'য়ের কোনোটিই ছিলেন না। তিনি ছিলেন প্রেমের কবি, লিখেছেনও বেশীর ভাগ প্রেমের কবিতা। এমনকি বিদেশী সাহিত্য থেকেও যে-সব কবিতা তিনি অনুবাদ করেছেন তারও অধিকাংশই প্রেমের কবিতা। তাঁর অধিকাংশ প্রেমের কবিতাই মনের দিক দিয়ে প্রায় ওমর খৈয়ামী। শুধু ভাষা ও আঙ্গিকটাই আধুনিক। অদ্বৈতবাদী বৈদান্তিক দার্শনিক পণ্ডিতের ছেলে হয়েও সুধীন দত্তের কবিতায় দেহাতীত প্রেম স্থান পায়নি। তবে তাঁর পিতা হীরেন্দ্রনাথ দত্ত শুধু বৈদান্তিক ছিলেন না। বৈষ্ণব সাহিত্যেও ছিলেন সুপণ্ডিত। দার্শনিক পাণ্ডিত্যের সঙ্গে বৈষ্ণবীয় লীলার সংমিশ্রণ ঘটলে যে-সুফসল ফলতে পারে তার এক উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত সুধীন দত্তের কবিতা। বৈষ্ণব সাহিত্যের ফলিত কোমল মাধুর্যকে তাঁর ক্লাসিক পাণ্ডিত্য দিয়েছে এক সংহত সংযত কাঠিন্য। এই কাঠিন্য সৌবর্ণেয়।

ক্রোচের মতে উক্তি ও উপলব্ধির একাত্মতাই রসোত্তীর্ণ কবিতা। এ বিষয়ে আধুনিক বাংলা কাব্যে জীবনানন্দ দাশ ও সুধীন্দ্রনাথ অনন্য। তাই এঁরা এক একটা কবিতা, এমনকি জুৎসই এক একটা শব্দের পেছনে ও তার সন্ধানে অকল্পনীয় দীর্ঘ সময় ব্যয় করেছেন। তাঁরা যা প্রকাশ করতে চেয়েছেন তাকে তাঁদের উপলব্ধির তাদাত্ম্য করতে অথবা উপলব্ধিতে যথাযথ ও তাঁদের মনের মতো উক্তিতে পরিণত করতে এ সময় ব্যয় করাকে তাঁরা অপব্যয় মনে করেননি। বলা বাহুল্য, আধুনিক বাংলা কবিদের মধ্যে এঁরা দু'জন পরিমাণের চেয়ে গুণকে মূল্য দিতেন বেশী। তাই এঁদের রচনা সংখ্যায় পরিমিত কিন্তু গুণে অপরিমিত।

জীবনানন্দ সহজ, সরল ও পরিচিত শব্দ ও ছন্দে গড়ে তুলেছেন তাঁর কাব্য জগৎ। সেই জগৎ কিছুটা আলো আঁধারী। তার কিছু দেখা যায় তো অনেকটা দেখা যায় না, কিছু বোঝা যায় তো অনেক কিছু থেকে যায় অবোধ্য। টি, এস, এলিয়ট বলেছেন, অনেক ভালো কবিতাই তিনি প্রথম পাঠে বুঝতে পারেননি। এমনকি অনেক কবিতা শেষ পর্যন্ত অর্থাৎ বহুবার পাঠের পরও তাঁর কাছে থেকে গেছে দুর্বোধ্য। অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ কবিতা সব

সময় যে দু'য়ে দু'য়ে চারের মতো অসন্দিগ্ধ অর্থ প্রকাশ করে তা নয়। তাই অর্থের বোধগম্যতা কখনো কবিতা বিচারের একমাত্র ও নির্ভরযোগ্য মাপকাঠি বলে গ্রাহ্য হতে পারে না। পাঠকদের মনে একটা পরিবেশ ও অনুভূতির অনুসরণ সৃষ্টি করতে পারলে কবিতা সহজেই অর্থ-সীমা ডিঙিয়ে যেতে পারে। গদ্য অর্থের শিকলে বাঁধা পড়েই ভালো গদ্য হয় আর কবিতা অর্থ-সীমা ছাড়িয়েই হয়ে ওঠে ভালো কবিতা। জীবনানন্দের কবিতাও তাই। শব্দ দিয়ে তিনি ছবি এঁকেছেন আর সেই ছবি চাক্ষুষ হয়ে ওঠে পাঠকের মনের সামনে। তাঁর তুলির আগা অতি সরু ও অত্যন্ত মিহি। কিন্তু আঁকা ছবিটি সুস্পষ্ট। শিল্পী হিসেবে তাঁর এই এক অদ্ভুত সাফল্য। ছবি ও অনুভূতির পরশ পেয়ে যাঁরা খুশী নন্, তেমন অর্থ-খোর পাঠক তাঁর কবিতায় পদে পদে হোঁচট খাবেন বইকি।

জীবনানন্দ ছিলেন পূর্ব-বাংলার মানুষ। এ খবর যাঁদের অজানা, আমার বিশ্বাস তাঁর কবিতা পাঠের পর, তাঁদের কাছেও এ খবর আর অজানা থাকবে না। তাঁর কবিতায় এখানকার প্রকৃতি এত বেশী ছায়া ফেলেছে যে, স্থূলবুদ্ধি পাঠকের দৃষ্টিও তা এড়াবার কথা নয়। পূর্ব-বাংলায় খাল-বিল ধান-পাটের একটা শ্যামলরূপ, তার একটা সুঘ্রাণ যেন তাঁর কবিতার গায়ে সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে। এখানকার সুপরিচিত প্রকৃতির প্রতীক দিয়ে অনুভূতির যে অনুরণন তিনি সৃষ্টি করেছেন, তা যে শুধু অনুভব্য তা নয়, তা যেন হাত দিয়ে ছোঁওয়া যায়। যায় স্পর্শ করা। কথা দিয়ে, ন্যূনতম কথা দিয়ে এই সৃষ্টিতে জীবনানন্দ দাশ অনন্য ও অদ্বিতীয়। তাঁর প্রত্যেকটি কবিতা যেন এক এক মুঠো তাজা শ্যামল সুকোমল অনুভূতি। তাঁর যে-কোনো কবিতা থেকেই দৃষ্টান্ত নেওয়া যায় ঃ

আমি যদি হতাম বনহংস,
বনহংসী হতে যদি তুমি ;
কোনো এক দিগন্তের জলসিঁড়ি নদীর ধারে
ধানক্ষেতের কাছে
ছিপছিপে শরের ভিতর
এক নিরালা নীড়ে ;
তাহলে আজ এই ফাল্গুনের রাতে
ঝাউয়ের শাখার পেছনে চাঁদ উঠতে দেখে
আমরা নিম্নভূমির জলের গন্ধ ছেড়ে
আকাশের রূপালি শস্যের ভিতর গা ভাসিয়ে দিতাম—
তোমার পাখনায় আমার পালক,
আমার পাখায় তোমার রক্তের স্পন্দন—
নীল আকাশের খই ক্ষেতের সোনালি ফুলের মতো অজস্র তারা
শিরীষ বনের সবুজ রোমশ নীড়ে
সোনার ডিমের মতো
ফাল্গুনের চাঁদ। [আমি যদি হতাম, বনলতা সেন]

অথবা

কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা ;
কাঁচা বাতাবির মতো সবুজ ঘাস—তেমনি সুঘ্রাণ—

হরিণেরা দাঁত দিয়ে ছিঁড়ে নিচ্ছে!
আমারো ইচ্ছা করে এই ঘাসের ঘ্রাণ হরিৎ মদের মতো
গেলাসে গেলাসে পান করি,
এই ঘাসের শরীর ছানি—চোখে চোখ ঘষি,
ঘাসের পাখনায় আমার পালক,
ঘাসের ভিতর ঘাস হয়ে জন্মায় কোনো এক নিবিড় ঘাস-মাতার
শরীরের সুস্বাদ অন্ধকার থেকে নেমে।

[ঘাস, বনলতা সেন]

রবীন্দ্রনাথ প্রকৃতিকে দেখেছেন নিরাসক্ত চিত্তে, দূর থেকে তার সৌন্দর্যে তিনি হয়েছেন মুগ্ধ। 'সমুদ্রের প্রতি' কবিতায় তাঁর সৌন্দর্যানুভূতি বিবর্তনবাদের সঙ্গে মিশে এক অপূর্ব আবেগে রূপান্তরিত হয়েছে কাব্যলোকে। যেমন ঃ

মনে হয়, যেন মনে পড়ে
যখন বিলীনভাবে ছিনু ওই বিরাট জঠরে
অজাত ভুবন—ভ্রূণ-মাঝে, লক্ষ কোটি বর্ষ ধরে
ওই তব অবিশ্রাম কলতান অন্তরে অন্তরে
মুদ্রিত হইয়া গেছে। সেই জন্ম-পূর্বের স্মরণ,
গর্ভস্থ পৃথিবী পরে সেই নিত্য জীবন স্পন্দন
তব মাতৃহৃদয়ের—অতি ক্ষীণ আভাসের মতো
জাগে যেন সমস্ত শিরায়, শুনি যবে নেত্র করি নত
বসি জনশূন্য তীরে ওই পুরাতন কলধ্বনি। [সমুদ্রের প্রতি]

এই কবিতা একই সঙ্গে জ্ঞান (বিবর্তনের জ্ঞান) ও আবেগের সংমিশ্রণ। কিন্তু জীবনানন্দের মতো তিনি—প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে মিশে যাননি। জীবনানন্দের প্রকৃতিপ্রেম তাঁর অনুভূতির অঙ্গ। রবীন্দ্রনাথ যেখানে জ্ঞানে ও আবেগে অপূর্ব সেখানে জীবনানন্দ অনুভূতিতে তন্ময়। এ ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের চেয়েও জীবনানন্দের বরং ওয়ার্ডসওয়ার্থের সঙ্গে মিল অনেক বেশী। অবশ্য ওয়ার্ডসওয়ার্থের মতো তিনি প্রকৃতির কাছে পাঠ নিতে ছুটে যাননি। কারণ তাঁর কাছে শিক্ষার চেয়েও অনুভূতির স্বাদ অধিকতর লোভনীয়।

জীবনানন্দের লেখায় কোথাও কঠিন বা অপরিচিত শব্দের ব্যবহার নেই—ব্যবহার করার প্রয়োজনই বোধ করেননি তিনি। চিরপরিচিত সহজ সরল শব্দে নিজের চেনা জগতের ছবি দিয়ে কবি নিজের উপলব্ধিকে দিয়েছেন অভিব্যক্তি। এমন সহজ কথা দিয়ে নিজের অনুভূতিকে রূপ দেওয়া খাস পশ্চিমবঙ্গের অতি মাত্রায় বিদগ্ধচিত্ত সুধীন দত্তের কাছে আশা করাই বৃথা। এটা সুধীন দত্তের পক্ষে নিন্দার কথা নয় বরং তিনি যদি তাঁর আজন্মলব্ধ ও স্বোপার্জিত মানস-পরিমণ্ডল ছেড়ে জীবনানন্দের মতো সহজ হতে চেষ্টা করতেন তা'হলে নির্ঘাত নিষ্ফল হতেন। তেমনি জীবনানন্দও যদি তাঁর আজন্মের মানস-পরিমণ্ডল ছেড়ে সুধীন্দ্রনাথ হতে চাইতেন তাহলে তিনি না হতেন সুধীন দত্ত না হতেন জীবনানন্দ। সত্যিকার শিল্পীরা নিজের জগৎ ও নিজের সীমাকে কখনো ভুল করেন না।

চাঁদের আলোকে 'রূপালি শস্য' বলে যে-রূপকল্প সৃষ্টি, পূর্ব-বাংলার স্বাভাবিক পরিবেশ ও আবছায়ায় মানুষ না হলে, তা কবির কলমে এমন অবলীলাক্রমে আসত কিনা সন্দেহ। তাঁর রচনার আর এক বিশেষ গুণ তাঁর আশ্চর্য তন্ময়তা। জীবনানন্দ নিজের

অনুভূতি ও রূপকল্পে নিজে তন্ময় হয়ে তাঁর পাঠককেও করে তোলেন তন্ময়। এ যেন ধ্বনি দিয়ে স্বপ্ন রচনা।

কবি ভাষা ও শব্দ প্রয়োগের বেলায় কোথাও কঠিন হতে চেষ্টা করেননি। বরং মনে হয় তিনি কি করে সহজ করে নিজের মনের কথাকে প্রকাশ করবেন সারা জীবন সেই সাধনাই করেছেন। এমনকি নিজের অনুভূতির কাছে সহজ ও খাঁটি হতে গিয়ে তিনি পূর্ব বাংলার খাস গ্রাম্য শব্দকেও কবিতায় স্থান দিতে দ্বিধা করেননি। যেমন :

> হিমের রাতে শরীর 'উম্' রাখবার জন্য দেশোয়ালীরা
> সারারাত মাঠে আগুন জ্বেলেছে—
> মোরগ ফুলের মতো লাল আগুন ;
> শুকনো অশ্বত্থ পাতা দুমড়ে এখনো আগুন জ্বলছে তাদের ;
> সূর্যের আলোয় তার রঙ কুঙ্কুমের মতো নেই আর ;
> হ'য়ে গেছে রোগা শালিকের হৃদয়ের বিবর্ণ ইচ্ছার মতো।
> সকালের আলোয় টলমল শিশিরে চারিদিকের বন ও আকাশ
> ময়ূরের সবুজ-নীল ডানার মতো ঝিলমিল করছে।
>
> ['শিকার', বনলতা সেন]

'Imagery' সম্বন্ধে এলিয়টের এই মন্তব্য স্মরণীয় : 'It comes from the whole of his sensitive life since early childhood.' শৈশব থেকে 'উম' শব্দ কবির মনে যে sensitiveness সৃষ্টি করেছিল তা-ই তাঁর উপলব্ধির অঙ্গ হয়ে পড়েছে। ফলে তাঁর অভিব্যক্তিরও। এ তাঁর অধীত বা অর্জিত কল্পরূপ নয়। 'উম' পূর্ব-বাংলার একেবারে খাস শব্দ। পশ্চিমবঙ্গের কবিরা, পূর্ববঙ্গেরও অনেক অভিজাত ও তমদ্দুনবিলাসী কবি, এই আটপৌরে শব্দটাকে তাঁদের কবিতায় স্থান দিতে বোধ করি হাজারবার দ্বিধা করতেন। অবশ্য ইচ্ছা করে গায়ে পড়ে স্থান দেওয়ার কথা আমি বলছি না। শব্দ কবির অনুভূতি ও রূপকল্পের স্বাভাবিক বাহন। সেই বাহন উদ্দেশ্যমূলক হলে তা ব্যর্থ ও স্বাভাবিকতা হারাতে বাধ্য। ইচ্ছা করে বা কোনো সচেতন প্রচেষ্টার ফলে 'উম্' শব্দের এখানে আমদানী হয়নি। কবি-চিত্তের স্বাভাবিক বাহন হয়েই শব্দটা এখানে নিজের জায়গা করে নিয়েছে। এ শব্দের যথাযথ অনুবাদ বিশুদ্ধ বাংলায় সম্ভব কিনা জানি না, হলেও তাতে কবির অভিব্যক্তি পঙ্গু হয়ে পড়তো। তাঁর উপলব্ধি হতো খণ্ডিত।

শব্দের ব্যবহার সম্বন্ধে যে-কোনো সংস্কার বা prejudice কবির জন্য মারাত্মক। এই সংস্কার যে-কবির মনে আছে ধরে নিতে হবে তিনি তাঁর কবিতার উপরে সংস্কারকেই দিয়ে থাকেন বড় স্থান। নজরুল যখন অসংকোচে তাঁর কবিতায়—'লা শরীর আল্লাহ' ব্যবহার করেছিলেন, তখন তা তিনি ইচ্ছা করে ভাষায় আরবি শব্দ ঢোকাবার মতলব নিয়ে করেননি। তাঁর কবি-ধর্মের তাগিদেই করেছিলেন। অর্থাৎ তিনি যখন 'খেয়া-পারের তরণী' নামক কবিতা লিখছিলেন, তখন তা তাঁর সেই মুহূর্তের অনুভূতি-উপলব্ধির অঙ্গ বা বাহন হয়েই তাঁর মনে ও কলমে এসে গিয়েছিল। ঠেকানোর কোনো উপায় ছিল না। এছাড়া দ্বিতীয় রূপকল্প তাঁর মনে স্থান পায়নি তখন, সেই মুহূর্তে। কারণ অনিবার্য ঐ ভাব ও তার ঐ প্রকাশ তাঁর মনের সঙ্গে এক ও একাত্ম হ'য়ে বিরাজ করছিল। ঐ আরবি উক্তির বাংলায় অনুবাদ করে নেওয়া নজরুলের পক্ষে কিছুমাত্র অসম্ভব ছিল না, কিন্তু করলে তাঁর সেই মুহূর্তের কবি-ধর্ম যে শুধু ব্যর্থ হত তা নয়, কবিতাটিও হয়ে পড়ত

শোচনীয়রূপে দুর্বল, হারিয়ে বসত তার অনিবার্য আবেদন আর থাকতো না তাতে এখনকার যতো ছন্দের অনির্বচনীয় দোলা। কবিকে হতে হয় সবরকম prejudice-মুক্ত। আমাদের সাহিত্যে নজরুল এর এক মহৎ দৃষ্টান্ত। আমার মনে হয় নজরুলের সাফল্যের বড়ো কারণ এটি। এমন সর্ব-সংস্কার-মুক্ত মন কদাচিৎ দেখা যায়। কীভাবে, কী ভাষায় কোথাও তিনি কোনো সংস্কারের শিকার হননি। এ না হ'লে এত কম সাধনা নিয়ে এতখানি সাফল্য (কবি হিসাবে) তাঁর পক্ষে কিছুতেই সম্ভব হত না। তাঁর কবিতার আবেদনও হত না এতখানি ব্যাপক।

কবিতা যে আজ কঠিন ও দুরূহ হয়ে উঠেছে, এ অভিযোগ পৃথিবীব্যাপী। এ প্রসঙ্গে এ যুগের দুরূহতম কবি এলিয়টের মন্তব্য হচ্ছে, অনেক কবিতা এ কারণে কঠিন মনে হয় যে কবিরা এখন হাতে রেখে কথা বলেন। প্রকাশ করেন না অনেক কিছুই, ইচ্ছা করেই অনেক কিছু ছেড়ে যান। তাঁরা যা ছেড়ে যান পাঠক তা পূরণ করে নেবেন বা নিতে পারবেন এই ভরসায়। পাঠকের মনকেও দিতে হবে কল্পনা করবার তথা ভাববার সুযোগ, উড়বার অধিকার। কবি নিজেই যদি সব কিছু খোলসা করে দেন তা হলে পাঠকের মন হয়ে পড়ে বেকার। আজকের দিনের কবিরা চান না তেমন অলস পাঠক।

জীবনানন্দ দাশের কবিতার কাঠিন্য হচ্ছে এলিয়ট-বর্ণিত এই কাঠিন্য। তিনি তাঁর কবিতার লাইনে-লাইনে অনেক শূন্য স্থান রেখে যান। তা পূরণ করে নেওয়ার দায়িত্ব পাঠকের। কল্পনার সংকীর্ণতা ও অপ্রসার অভিজ্ঞতা যাঁদের একমাত্র সম্বল জীবনানন্দ-শ্রেণীর কবিরা তাঁদের কাছে দুর্বোধ্য হতে বাধ্য। অভিজ্ঞতা মানে সাহিত্যের অভিজ্ঞতা। আর আজকের দিনে সাহিত্য মানে বিশ্বসাহিত্য।

সময়ের এ ব্রত যাত্রায় দুই কবি ঃ জীবনানন্দ ও বিষ্ণু দে

মীনাক্ষী চট্টোপাধ্যায়

'এ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষদিকে কয়েকজন সাহিত্যিকের আবির্ভাব বাংলায় হয়, যাঁরা লেখায় কঠিন সংযম ও বুদ্ধিবৃত্তি ফিরিয়ে আনতে সচেষ্ট হন। তাঁরা বুঝলেন যে হৃদয়ের কল ঘুরিয়ে ছন্দের তোড় নামালেই কবিতা হয় না, তাঁরা বুঝলেন যে আমাদের কাব্যজীবনে অলসতা ও অকর্মণ্যতা সম্ভবপর হয়েছে তার কারণ এই যে, বাকতাল্লা সত্ত্বেও আমরা অতীতের বাংলা ঐশ্বর্যের সন্ধান করি না, আমাদের সাহিত্যগ্রাজদের স্বচ্ছন্দ রসবোধ এবং সহজ আক্কেলজ্ঞান থেকে ক্রমশ আমরা নিজেদের বঞ্চিত করেছি। এ সঙ্গে তাঁরা দেখলেন চারিদিকে ধ্বংসের রূপ, সমাজে সংহতির অভাব, মনের ও কর্মের জীবনে নৈরাশ্যের জয় পৃথিবীর অধিকাংশ দেশ থেকে সামাজিক জীবনের মূল সূত্র অদৃশ্যপ্রায়। এ পরিস্থিতিতে আশাবাদী হওয়া ও তরলকণ্ঠে ছন্দে ফুর্তি করা বিরাট প্রবঞ্চনা ; এ উপলব্ধি তাঁদের কাব্যে নৈরাশ্য ও বিদ্রূপের সুর আনল।' [সমর সেন]

কবি সমর সেনের এই বক্তব্যের পরিপ্রেক্ষিতে জীবনানন্দ দাশ ও বিষ্ণু দের কাব্যই এ প্রবন্ধে আলোচ্য। বলাবাহুল্য প্রায় সমসাময়িক কালের হয়েও এবং দুজনেই শিক্ষায় ইংরাজীতে এম. এ. এবং জীবিকায় অধ্যাপক হওয়া সত্ত্বেও এই দুই কবির মননে ও মেজাজে দুই মেরু প্রমাণ ব্যবধান। জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থের নাম 'ঝরা পালক' আর বিষ্ণু দের কাব্যগ্রন্থ 'উর্বশী ও আর্টেমিস'। নামকরণেই দুজনের মনোভঙ্গির বৈষম্য তাঁদের কাব্য জগতের স্বাতন্ত্র্যকে চিহ্নিত করেছে বলা যায়। আধুনিক বাংলা কবিতার যদি শরীরীরূপ কল্পনা করা যায় তবে তার মস্তিষ্কে আছেন বিষ্ণু দে, আর হৃদয়ে বসে আছেন জীবনানন্দ।

বুদ্ধদেব বসুর ভাষায় তিনি আমাদের 'নির্জনতম কবি', তাঁর কবিতার জগৎ---'এক সান্ধ্য ধূসর আলোছায়ার অদ্ভুত সম্পাতে রহস্যময়, স্পর্শগন্ধময়, অতি সূক্ষ্ম—ইন্দ্রিয়চেতন জগৎ—যেখানে পতঙ্গের নিঃশ্বাস পতনের শব্দটুকুও শোনা যায়, মাছের পাখনার ক্ষীণতম স্পন্দনে কল্পনার গভীর জল আন্দোলিত হয়ে ওঠে।' আঙ্গিকে অভিনবত্ব তাঁর বৈশিষ্ট্য নয়। কিন্তু ছন্দ, মিল, চিত্রকল্প, উপমার কাব্যালঙ্কার তাঁর কবিতার মধ্যে এমনভাবে ব্যবহৃত মনেই হয় না এগুলি কাব্যের প্রসাধনবাহুল্য—এগুলি তাঁর কবিতার সৌন্দর্যকেই আরো পরিস্ফুট করতে সাহায্য করেছে মাত্র। জীবনানন্দের মতে 'উপমাই কবিত্ব' সেই উপমার ব্যবহারে তিনি ঈশ্বর। আবারও বুদ্ধদেবের উদ্ধৃতি দিতে হচ্ছে— 'তাঁর কাব্য বর্ণনাবহুল, তাঁর বর্ণনা চিত্রবহুল, এবং তাঁর চিত্র বর্ণবহুল।'

বুদ্ধদেবের মতে জীবনানন্দের কবিতা ভালো লাগতে গেলে পাঠকের চোখ এবং কান খোলা রাখতে হবে। জীবনানন্দের কবিতার জগৎ বহির্জাগতিক বিষয়কে কেন্দ্র করে আত্মগত অনুভবের উচ্চারণ। সমসাময়িক বিক্ষোভ ও অশান্তির আলোড়নে তিনি

আলোড়িত হয়েছেন অবচেতনে, কিন্তু তা নিয়ে প্রত্যক্ষ সোচ্চার কবিতা তিনি কমই লিখেছেন। জীবনানন্দের কবিতার জগৎ অবচেতনের লীলাভূমি সেখানে 'স্বপ্ন নয়—শান্তি নয়—ভালোবাসা নয় হৃদয়ের মাঝে এক বোধ জন্ম লয়' এই বোধই অন্যত্র 'আরো এক বিপন্ন বিস্ময়' যা মানুষকে ক্লান্ত করে। নিজেকে মুখে গান্ধীবাদী বললেও রাজনীতি এই কবির মর্মস্থলে কখনো পৌঁছায়নি ; কবি ধর্ম ছাড়া অন্যকোন ধর্মে তিনি দীক্ষিত হননি। জীবনের জটিলতাকে তিনি জানেন, আবার এও জানেন আদিম অন্ধকারময় ক্ষুধার বিবরে সৌন্দর্য এসে হাত রাখে তাই—

'তবুও তো পেঁচা জাগে/গলিত স্থবির ব্যাং আরো দুই মুহূর্তের ভিক্ষা মাগে/আরেকটি প্রভাতের ইশারায়—অনুমেয় উষ্ণ অনুরাগে। —'

তাঁর সমগ্র কাব্যচেতনায় পরিব্যাপ্ত বিষণ্নতা, গাম্ভীর্য, মৃত্যুচেতনা ছাপিয়ে উঠে এসেছে জীবনের প্রতি এক দুর্নিবার অনুরাগ।

বিষ্ণু দে অবচেতনের উপাসক নন—তিনি জাগ্রত চৈতন্যের কবি। তিনি বলেন—'অবচেতন? না। চিনি চেতনে তাকে। চেতন ও জানি যে স্বয়ং ফেরারী যুবক।' [এদিকে ওইদিকে কপাট] এদিকে ওইদিকে তাঁর নাগরিক সত্ত্বায় সবকিছু স্পষ্ট স্বচ্ছ, দিনের আলোর মত তাঁর অনুভূতি পরিষ্কার। তিনি পরিষ্কারভাবেই জানিয়েছেন—'প্রগতিশীল সাহিত্যের চিরকালীন লক্ষণ হল এই চৈতন্য-জ্যাবদ্ধ টান।' কিংবা 'কাব্যের উৎস যতই রহস্যময় হোক, কাব্য কিছু গোপন তন্ত্রমন্ত্র নয়।' বাংলা সাহিত্যে প্রগতি কাব্যের নির্মাণ রীতি এবং বিষয়ে ঐতিহ্যাশ্রয়ী হওয়ায় বিষ্ণু দে কাব্যে ছিলেন প্রায় সর্বাংশেই এলিয়টের শিষ্য। প্রখর সমাজ সচেতক এই কবি ছিলেন রাজনীতিতে বামপন্থী। সমর সেনের মতে এই বামপন্থার পথ ধরেই তিনি কাব্যে মুক্তি খুঁজে পেয়েছেন। তাঁর কাছে কবিতা লেখা ছিল প্রায় সামাজিক কর্তব্যের সামিল। এক হিসাবে বিষ্ণু দে আধুনিক বাংলা কাব্যে প্রথম কারিগর। বিষ্ণু দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ পড়ে রবীন্দ্রনাথ তাঁকে চিঠি লিখেছিলেন—'সাহিত্যে অনেকে নতুনের বড়াই করে। কিন্তু চলে পুরাতনের পিছুপিছু। তোমার মধ্যে যথার্থই নতুন পথ খননের অধ্যাবসায় দেখা গেল।' কবিতাকে আবেগ সর্বস্বতার উর্ধ্বে রাখতে চেয়ে তার আঁটো বাক্যবন্ধনের জন্য তিনি দেশীবিদেশী রূপকথা, লোকগাথা, পুরাণ শিল্প, সাহিত্যের অজস্র অনুষঙ্গ এবং উদ্ধৃতির সাহায্যে কবিতাকে প্রতীক করে তুলেছেন। কবিতার ঢিলেঢালা নির্মাণ রীতিও তিনি বদলাতে চেয়েছিলেন—

> নববাবু বিলাস ছাড়ো মন
> সাঁওতালী ধনুকের টানে টানে ঝনন রণনে
> সাবেক নূতন ছন্দে মেলাও সে নাচ
> গ্রামে ও শহরে পাবে কবিতার ভাষা।

শুধু সাহিত্যেই নয় ; বিজ্ঞান, দর্শন, দেশীবিদেশী সংগীত, চিত্র, নৃত্যনাট্য, যন্ত্রশিল্প কি এই কবির প্রিয় বিষয় নয়? সবকিছুকেই অগস্ত্যমুনির মত তিনি আত্মসাৎ করে নিজের কাব্যরসে জারিত করে ফেলেছেন। বৈদগ্ধ্যের চূড়ান্ত প্রতিমূর্তি বলা যায় তাঁকে।

রবীন্দ্রনাথ জীবনানন্দের কবিতাকে প্রথম পর্যায়েই সার্থক বিশেষণ দিয়েছিলেন চিত্ররূপময়। এই চিত্রধর্মই আজীবন জীবনানন্দের যেমন বৈশিষ্ট্য বিষ্ণুদের বৈশিষ্ট্য তাঁর সংগীতধর্ম। বস্তুতে সুর এবং সংগীত তাঁকে এমন আচ্ছন্ন করেছিল যে ধ্বনির উপর তাঁর ছিল স্বচ্ছন্দ প্রভুত্ব। নৈঃশব্দের ধ্বনি থেকে মিছিলের ধ্বনি মেঘের মন্দ্ররব থেকে

অশ্বক্ষুরধ্বনি এবং সংগীতের মৃদুমূর্ছনা, দ্রুত এবং বিলম্বিত লয়কেও কবি প্রয়োগ কৌশলে কবিতার মধ্যে পাঠকের কানে তুলে ধরতে পেরেছেন এবং এখানে তিনি কবি থেকে প্রায় সুরকারের পর্যায়ে চলে গেছেন। বুদ্ধদেব বলেছেন—'তাঁর কবিতায় কোন কথাই মড়ার মত পড়ে থাকে না, প্রত্যেকটি কথাই নিজের অস্তিত্বকে জানান দেয়। পুরনো কথায় নতুন প্রাণ আনতে পারেন তিনি ...এই কারণে তাঁর কোন কবিতাই নীরস হয় না। নিছক প্রোপাগাণ্ডার পদ্যও উপভোগ্য হয়।'

এই দুই কবির কাব্যেব শরীর ও আত্মায় কোন মিল পাওয়া না গেলেও রবীন্দ্র পরবর্তী কবিতায় স্বতন্ত্র সুর সৃষ্টির কৃতিত্বের দাবীতে দুজনেই এক ধর্মের। এঁদের আরো কিছু মিল আছে কিনা তাঁদের কবিতা আলোচনা করে দেখা যেতে পারে। যেমন ইতিহাসচেতনা—এ বিষয়ে দুজনের বক্তব্যই সুস্পষ্ট। জীবনানন্দ বিশ্বাস করতেন একজন কবিকে সর্বদাই ইতিহাস সচেতন হতে হয়—'কবির পক্ষে ইতিহাসকে বোঝা দরকার, কবিতার অস্থির ভিতরে থাকবে ইতিহাসচেতনা ও মর্মে থাকবে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান।' তাই নিসর্গ ছাড়াও সমকালীন রাজনীতি, বিশ্বযুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ বা সত্যেন্দ্রনাথ, গান্ধীজী, রবীন্দ্রনাথ এঁদের নিয়েও লেখা তাঁর কিছু কবিতা রয়েছে। বিশ্বযুদ্ধ দুর্ভিক্ষ বিষ্ণু দের মতো তাঁকেও উত্তেজিত করেছে কবিতা লিখতে কিন্তু তিনি তত সোচ্চারে নন স্বভাব ধর্মের জন্য। সাম্রাজ্যবাদকে তাঁর মনে হয়েছে এশিয়ার মাঠে চরা শকুনের প্রতীক। তার বীভৎস রূপকে তিনি দেখেছেন হংকং-এর পণ্য নারীর মধ্যে। যুদ্ধকে মনে হয় 'পৃথিবীর গভীরতর অসুখ' ব্যথিত কবি লেখেন—'মানুষের লালসার শেষ নেই। অপরের মুখ ম্লান করে দেওয়া ছাড়া প্রিয় সাধ নেই।' দাঙ্গা সম্পর্কে কবিতা—

লঙ্গরখানার অন্ন খেয়ে
মধ্যবিত্ত মানুষের বেদনার নিরাকার হিসেব ডিঙিয়ে
ফুটপাত থেকে দূর নিরুত্তর ফুটপাতে গিয়ে
নক্ষত্রের জ্যোৎস্নাতে ঘুমাতে বা মরে যেতে জানে।

কিন্তু বেদনা তাঁকে যেভাবে স্পর্শ করতে পারে, সক্ষম রাজনীতি ততখানি নয়। তাই 'সে' কবিতায় তাঁর স্বাভাবিক কাব্যস্ফূর্তির অভাব লক্ষণীয়।

এখানে রাতের স্রোতে মিশে থাক সময়ের হাতে দীর্ঘতম
রাত্রির মতন কেঁপে মাঝে মাঝে বুদ্ধ সোক্রতেস
কনফুচ, লেলিন, গ্যেটে, হোল্ডেরলিন, রবীন্দ্রের কোলে
আলোকিত হতে চায়—বেলজেনের সবচেয়ে বেশী অন্ধকার

কিংবা 'নচিকেতা জরথুস্ট্র লাওৎসে এঞ্জেলো রুশো লেলিনের মনের পৃথিবী হানা দিয়ে আমাদের স্মরণীয় শতক এনেছে?—'

এ ধরনের কবিতাতেই তাঁর প্রিয় পাঠক বুদ্ধদেব পর্যন্ত আপত্তি করে লেখেন—'হুজুগের হুংকারে তিনি আত্মপ্রত্যয় হারিয়েছেন। সমকালীন জটিল জীবনের যে ঢেউ তাঁর কবিতায় আছড়ে পড়ছে তা তাঁর নিজস্ব আবেগের পথ থেকে সরে দাঁড়িয়ে ধর্মভ্রষ্ট করছে।' এই নিজস্ব আবেগেই রবীন্দ্রনাথ বা সমসাময়িক রাজনীতি নিয়ে লেখা বিষ্ণু দের কবিতাগুলি অনেক জীবন্ত। আসলে এখানেও জীবনানন্দ সেই ইতিহাসের কাছে দায়বদ্ধ। ইতিহাস চেতনাকে অস্বীকার করতে পারেন নি, কিন্তু তাঁর ইতিহাস চেতনারও গভীরে পরিচ্ছন্ন কালজ্ঞান সর্বদাই কাজ করে গেছে। জীবনানন্দ ইতিহাসের পথ মাড়িয়ে সমকালকে অতিক্রম করে অনন্তকাল চেতনায় পৌঁছেছেন। অতীত আর বর্তমানের

অনায়াস সমীকরণ ঘটে তাই তাঁর কবিতায়। ইতিহাস তাঁর কাছে কখনোই ঘটনার বিবরণ নয়। হাজার বছর ধরে পথ হেঁটে বিম্বিসার অশোকের ধূসর জগত মাড়িয়ে অনায়াসে তিনি একালের বনলতা সেনের কাছে অন্ধকারে মুখোমুখি বসে থাকেন। তাঁর কবিতায় বারবার ঘুরে এসেছে অতীত মিশর, মমি, পিরামিড, ভূমধ্য সাগর, ব্যবিলন, ইউরোপীয় মধ্যযুগের স্পেন। শুধু ইতিহাসের সালতামামি নয় তার বর্তমানের জীবন্ত গতিমুখর বর্ণময় রূপ আঁকেন তিনি—

> পশ্চিমে প্রেতের মতন ইউরোপ
> পুব দিকে প্রেতায়িত এশিয়ার মাথা,
> আফ্রিকার দেবতাত্মা জন্তুর মতন ঘনঘটাচ্ছন্নতা
> ইয়াঙ্কীর লেনদেন ডলারে প্রত্যয়—

কিন্তু এই বিশ্বজাগতিক সাময়িক রাজনীতি তাঁর সব কথা নয়। তিনি জানেন বা বিশ্বাস করেন যে—

> এছাড়া অমন কোন রাজনীতি পেতে হলে তবে
> উজ্জ্বল সময়স্রোতে চলে যেতে হয়।
> সেই স্রোত আজো এই শতাব্দীর তরে নয়
> সকলের তরে নয়। [জনান্তিকে]

অপরপক্ষে 'ইতিহাস অতীতেই স্পষ্ট সহজীব্য দৃষ্টিগ্রাহ্য বিষাদের বর্তমানে ইতিহাস কোথা?' তাঁর ইতিহাস চেতনা মিলেছে ঐতিহ্যের আশ্রয়ে সমাজচেতনায় এবং সমকালীন ঘটনাবলির সজাগবন্ধে। পারিপার্শ্বিকের প্রতি তাঁর মনের অবিরাম সাড়া আমাদের আশ্চর্য করে। তাঁর বিশ্বাস ছিল 'বিশ্বরূপদর্শনেই ব্যক্তির ঐশ্বর্য'। বিষ্ণু দে ইতিহাসকে বা তার ঘটনাবলীকে ব্যবহার করেছেন বক্তব্যকে অধিকতর পরিস্ফুট করার জন্য। ইতিহাস ছাড়িয়ে দেশীবিদেশী পুরাণ রূপকথাকেও এজন্য তিনি বেছে নিয়েছেন। এভাবেই মিলেছে উর্বশীর সঙ্গে আর্টেমিস। চণ্ডীদাসের সঙ্গে দান্তে মহাকাব্যের যুগের সঙ্গে আধুনিক যুগ। বর্তমান সভ্যতার মুমূর্ষু সময়ে যুবমানসের অমিত অপচয়ের পরিপ্রেক্ষিতে মহাকাব্যের বীর অর্জুনকে তিনি বেছে নেন ব্যর্থ, হতাশার রূপকে—

'হে ভদ্রা আমার। হে সঞ্জয় ব্যর্থ আজ গাণ্ডীব আমার'—তারপরই অতীত যুগের সঙ্গে সুকৌশলে একালকে মেশান—

> ঘুমন্ত নগর, ঘরে ঘরে খিল,
> উর্ধ্বশ্বাস উৎসবকাতর বিলাসী যাদের যুবাদল
> অতীত অর্জিত সুখে এলোমেলো অলস ভোগের
> স্বার্থপর আবিষ্কার ক্লান্তিভাবে নিদ্রান্ধ বিকল। [পদধ্বনি]

এই জটিলতা ও বৈচিত্র্যের জন্য তাঁর কাব্য পরিভাষা জর্জরিত এবং দুর্বোধ্যতার অভিযোগে অভিযুক্ত। তাঁর পাণ্ডিত্যের অলিতে গলিতে পাঠক অনেক সময়েই হোঁচট খেতে বাধ্য হন। এই কবির কবিতা পাঠে আনন্দ পেতে গেলে 'হেঁয়ালীভাঙার' পরিশ্রম এবং মেলানোর আনন্দ একসঙ্গে পাওয়া যায়। তাঁর কবিতায় ব্যক্তিগত অনুষঙ্গের বাহুল্য দেখে মননশীল কবি সুধীন্দ্রনাথও লিখেছিলেন—

'আপনার পদ্ধতি ও প্রসঙ্গের মধ্যে কোথায় যেন একটা বিবাদ আছে। নিজেকে জনগণের প্রতিনিধি হিসাবে দেখেও আপনি কবিতা লেখার সময়ে যুক্তির সাধারণ্য

ছেড়ে ব্যক্তিগত মানুষের আশ্রয় নেন বলেই এ সন্দেহ উত্থাপন করছি না। আমার বিচারে আপনার রচনারীতি যতটা সঞ্চারী, আপনার বক্তব্য ততখানি পরিণামী নয়।' আর এক ডাকসাইটে বুদ্ধিজীবী ধূর্জটিপ্রসাদও 'চোরাবালি' কাব্যগ্রন্থ সম্বন্ধে লিখেছিলেন—

'তোমার বিষয়গুলি আধুনিক বিদেশী সাহিত্যের অনুগামী তুমি বিদেশী বিষয় বস্তুগুলি নাওনি, সাহিত্যের ভারতীয় ও শহুরে মায়া নিয়ে 'নখাড়া' করেছ।...সমাজবোধ না থাকলে ঐতিহাসিক বোধ আসে না, আবার ঐতিহাসিক বোধ না থাকলে ট্রাজিক সেন্স জন্মায় না। কি করে 'ওফেলিয়া' ও 'ক্রেসিডা' আমার প্রাণের বস্তু হতে পারে? তোমার মতন কে আর বিদেশী সাহিত্যে পণ্ডিত বল? কে তোমার মত সাহিত্য সোফিস্টিকিটেড হতে পারে?'

দিকপাল কবি ও সমালোচকদেরই যখন এই অবস্থা তখন সাধারণ পাঠকের দশা সহজেই অনুমেয়। অমনযোগী এবং অপরিশ্রমী পাঠক চাননি বিষ্ণু দে, বলা যায় পাঠকের উপর শিক্ষিত হবার দায়িত্ব তিনি চাপিয়ে দিয়েছেন। তবু কবিতানুরাগী পাঠক নিজের দায়ে বিষ্ণু দের প্রকরণ, সাহিত্য, শিল্প, চিত্র এবং গানের অনুষঙ্গগুলি সম্বন্ধে ওয়াকিবহাল হলেও হতে পারেন, এবং সে অনুষঙ্গে সর্বদাই যদি কবিতা নাও বুঝতে পারেন ক্ষতি নেই—অন্যত্র এই কবির কাছে আশ্রয় নেবার মতো বহু কবিতা আছে। কিন্তু যিনি কবি তাঁর তো এই দায় নেই, ফলে বিষ্ণু দের অনুসারী কবির সংখ্যা নেই বললেও ভুল হয় না। তাঁর রীতি এবং প্রিয় অনুষঙ্গগুলি অথবা রাজনীতির মতামতে কোন কোন কবি প্রভাবান্বিত হলেও সর্বাত্মকভাবে তাঁব অনুসরণকারীর দেখা পাওয়া যায় না পরবর্তীকালের বাংলা কবিতায়। অপরপক্ষে জীবনানন্দের প্রতিটি শব্দ অনুসরণকারী এবং চিত্রগুলি চোখ খোলা রাখলে এবং গ্রহণশীল মন হলেই কবিচিত্তে ছাপ রেখে যাবে। এই রূপসী বাংলার নিসর্গ দৃশ্য দেখাও দুর্লভ নয়। ক্লান্তি, অবসাদ, আচ্ছন্নতা বুদ্ধি নয়—অনুভবের গাঢ়তায় জীবনানন্দ বাঙালী চরিত্রের মর্মমূলের অনেক কাছে পৌঁছতে পেরেছেন। শিশির-নক্ষত্র-নির্জনতা, হেমন্ত ঋতু, ক্লান্তি, অনন্ত নক্ষত্রবীথি, নৈঃসঙ্গ, বিপন্ন বিস্ময় এগুলির শব্দগত এবং মননগত সার্থক এবং অসার্থক অনুসারী কবিতে কবিতে পরবর্তীকালের বাংলা কাব্য ভরে গেছে বলা যায়।

যদিও বিষ্ণু দের রবীন্দ্রসংগীত নীতির প্রকাশ যা তাঁর কবিতার লাইনে বহুবার অনুষঙ্গ হিসেবে ঢুকে পড়েছে—তার প্রভাবেই পরবর্তী বাঙালী কবিদের হাড়ে মজ্জায় রবীন্দ্রসংগীত প্রীতি ঢুকে পড়েছে কিনা তা অবশ্য বলা মুশকিল।

দুটি যুগের প্রচ্ছন্ন সাদৃশ্য এভাবেই ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে দেখানো তাঁর বৈশিষ্ট্য। এমন বহু কবিতা লিখেছেন তিনি—যযাতি, ক্রেসিডা, বিভীষণের গান, সাতভাই চম্পা ইত্যাদি। 'জন্মাষ্টমী' কবিতাটিতে এই প্রকরণের চরম ঔৎকর্ষ লক্ষ্য করা যায়। পৃথিবীর অন্যদেশের যুদ্ধবিগ্রহের ছবি আর আমাদের দেশের ছবিও একই ক্যানভাসে আঁকা হয়ে যায় পাশাপাশি নানা রঙের আঁচড় টেনে যুদ্ধ, লুণ্ঠন, দস্যুতা, রাহুগ্রস্ত দেশ চিত্রিত হয়। আসলে ইতিহাস সব সময়েই নিজেকে পুনরাবৃত্ত করে। পৃথিবীর যে কোণেই যুদ্ধ হোক—দস্যুতা হোক, সর্বত্রই ফল এক—লুণ্ঠন, পীড়ন, নিষ্ঠুর শাসক সর্বত্রই ক্ষেত ভরা ফসল কাড়ে, অসহায় মানুষের স্থিতি-অবসর কেড়ে নেয় মানুষ হতাশায় ক্লীবতা প্রাপ্ত হয়। এই কবিতায় আত্ম-উপহাস-শ্লেষ ব্যঙ্গ আর নাগরিক বাস্তবতা আবেগপিষ্ট হয়ে স্তবক থেকে স্তবক কখনো একই স্তবক স্বরের এবং প্রকরণের বদল করে। কবিতায় বিমূর্ত চিন্তা তত্ত্বের

প্রয়োগ কৌশল বিষ্ণু দের অত্যন্ত প্রিয়। এই সঙ্গে দেশবিদেশী পৌরাণিক উপমা, রাজনৈতিক পুরুষ এবং রাবীন্দ্রিক কবিতার অনুষঙ্গে তাঁর কবিতা জটিল থেকে জটিলতর হয়। এ প্রসঙ্গে উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে 'স্মৃতি সত্তা ভবিষ্যৎ'-এর কয়েকটি পংক্তির —'দেশ ভাবো সুজলা সুফলা এই মলয়শীতলা মাতাদেশ / ছিন্নভিন্ন, অথচ প্রাচীন পরিচয়ে সত্তার চৈতন্যে ধনী।'...

বিশ্বযুদ্ধ বিপ্লবের পটভূমিকায় লিখিত 'বাইশে জুন', 'সাতভাই চম্পা'ত কবির রাজনৈতিক বিশ্বাসের জগৎ প্রায় প্রচারের পর্যায়ে চলে গেছে। কবিতাতেই যেন তিনি সক্রিয় সংগ্রাম করেছেন তীব্রভাবে। দাঙ্গাদুর্ভিক্ষ-দেশের মাৎস্যন্যায়ের উপর কবির ঘৃণার তিক্ততম প্রকাশ পেয়েছে, এই ঘৃণার সমুদ্র মন্থন করেই জেগে উঠেছে 'সন্দীপের চর'-এর বিশাল পটভূমিকা। এই কবিতার—দেশজোড়া জাতীয় আন্দোলন, তেভাগার লড়াই, নৌবিদ্রোহ, দাঙ্গা, দেশভাগ আর তেলেঙ্গানা বিদ্রোহ রূপকথার অনুষঙ্গে এসেছে—

ওদিকে ওড়ে লালকমলের নীলকমলের হাতে।
ভায়েইর মিলে প্রাণের লাল নিশান।

কিংবা 'সাতভাই চম্পা'র রাক্ষসের বাড়ির পাহাড়ের অনুষঙ্গ এসেছে এবং বাগ্‌ধারাতে বৈষ্ণব পদাবলী এসেছে উঠে

ঘোচাও চম্পা দুস্থ ছদ্মবেশ
এ মাহ ভাদরে ভরা ভাদরের শেষে
চকিতে দেখাও জনগণ মনে মুখ।

বস্তুতে এই রূপকথা, পুরাণ, প্রাচীন-নবীন, স্বদেশ-বিদেশ, প্রাচীন কবির রচনাধারাও তাঁর লেখাতে মেলানোর খেলাই বিষ্ণু দেকে একক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে। তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গবিদ্রূপের ভঙ্গি তাঁর লেখার আর এক বিশিষ্টতা। এই চাতুরী আর ব্যঙ্গের ক্ষুরধার অস্ত্র তাঁকে সমসাময়িক কবিদের মধ্যে অনন্য করে তুলেছিল।

হয়তো বা ছুটে আসে মগধের পদাতিক
হয়তো বা অশ্বারূঢ় রক্তবর্ণ সেনা।
বাড়ি যাই ঊর্ধ্বশ্বাসে

নাগরিকতার শ্লেষ—তারপর চা এবং তাস
ব্রিজই ভালো, না হয়তো ফ্লাশ,

স্তবক থেকে স্তবকান্তরে বদলায় ছন্দ-মিল-রীতি। পৌরাণিক উপমার পটভূমিতে সমসাময়িক রাজনীতি ও মাৎস্যন্যায়—

হরি আমাদের রথস্‌চাইল্ড। দেশের মাথা ও
মুখ উজ্জ্বল
দুটো মিলও চলে—ধর্মঘটের উপমায় নেই,
জামাই যে তরে নিজে ম্যানেজার
খাদিপ্রচারের মস্ত লীডার
দেশের লীডার স্বনামধন্য ত্যাগ স্মরণীয় তার বেয়াই
বণিকের মানদণ্ডই রাজদণ্ড তাই [জন্মাষ্টমী]

এই ক্ষয়কারী বিদ্রূপের আঘাত আবার বুমেরাং হয়ে শেষ পর্যন্ত নিজেকেই ক্ষতবিক্ষত

করেছে। আমরা ব্যথিত এবং বিস্মিত হয়ে এই আজন্ম সংগ্রামী কবিকে ক্লান্ত অবসন্ন হয়ে বলতে শুনি—

কিন্তু কেন বকুলের বনে ফণীমনসা প্রান্তর?
অবিচ্ছিন্ন গান কেন করে দাও গৌণ অবান্তর
মনে হয় কি নির্বোধ? বৃথা গেছি আজীবন বকে—

অথবা—

যৌবনের নিঃসঙ্গতা আজ বাজে বৃদ্ধ হাড়ে হাড়ে
হৃদয়ের চেরাপুঞ্জী নব্যন্যায়ে বর্ধিষ্ণু সাহারা

[বৃথা স্মৃতির পাহারা]

ব্যঙ্গ জীবনানন্দের কবিতাতেও যে ছিল না তা নয়। অধ্যাপকদের প্রতি তীব্র বিরক্তিতে তাঁর 'সমারূঢ়' কবিতাটি কবি ও ব্যাখ্যাতার সম্পর্কের এক চিরকালীন দলিল।

জীবনানন্দের ব্যঙ্গ কদাচিৎ এবং প্রচ্ছন্ন ; তাঁর কবিপ্রকৃতিতেই তা সোচ্চারভাব দেখা যায় না—নীরব আত্মমগ্ন ভাবে তিনি উচ্চারণ করে যান—

বেতন হাজার টাকা মাসে—আর হাজার দেড়েক
পাওয়া যায় মৃত সব কবিদের মাংস কৃমি খুঁটি
যদিও সে-সব কবি ক্ষুধা প্রেম আগুনের সেঁক
চেয়েছিলো—হাঙরের ঢেউয়ে খেয়েছিল লুটোপুটি...

আবার আধুনিক যান্ত্রিক সভ্যতার প্রতি তীব্র বিরক্তিতে লেখেন—

'কখনো একটি মোটরকার গাড়লের মতো গেল কেশে।'

নগরীর মহৎ রাত্রিকে তাঁর মনে হয় 'লিবিয়ার জঙ্গলের মতো/তবু জন্তুগুলো অবৈতনিক বস্তুত কাপড় পরে লজ্জাবশত।'

জীবনানন্দ যতখানি আত্মসমাহিত নিমগ্ন থাকতে ভালবাসেন বিষ্ণু দে ততটাই সরব উচ্ছল সচেতন। ঠাট্টা আর ব্যঙ্গ বিষ্ণু দের প্রেমের কবিতা সম্পর্কেও এক নির্মোহ দৃষ্টি দিয়েছিল—'বুদ্ধি আমার অপাপ বিদ্ধরবির/জড়কবন্ধ অন্ধকর্মে ফুৎকার মোরনর্মাচার'। ঠাট্টা করে তিনি বলে ছিলেন—প্রেমে পতন ভিন্ন অন্য কিছু নেই। এই রুগ্ন সভ্যতার ফাঁপা নাগরালি প্রেম সম্বন্ধে তাঁর বক্রোক্তি—

অভ্যাস শুধু অভ্যাস লিলি তাই তো আসি
তোমার উষ্ণ প্রেমের হাস্যচপল নীড়ে
অভ্যাস শুধু অভ্যাস ভালো তাই তো বাসি। [কন্‌ডিশন্‌ড রিফ্লেক্স]

আত্মসচেতনতা ও নিজের সম্পর্কে আস্থা থেকে তিনি বলতে পারেন —

তুমি ভেবেছিলে উন্মাদ করে দেবে?
উদ্বায়ু আজো হয়নি আমার মন। [ক্রেসিডা]

স্বদেশপ্রেম প্রখর হলেও গ্রামবাংলায় ক্রমশ শ্রীহীনরূপে বীতশ্রদ্ধ কবি রবীন্দ্রনাথের উক্তিকে বদলে নিয়ে ব্যঙ্গ করেন—জীর্ণ মঠ, ঝিরঝিরে মজা নদী, মজা খাল/কচুরি পুকুরে দূর থেকে নম নম সুন্দরী মম জননী বঙ্গভূমি। [বৈকালী]

কিন্তু এই তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ তাঁর প্রেমের কবিতার নারকোলের শক্ত আবরণ মাত্র। চতুরালির প্রেমে অনাস্থা প্রকাশ করলেও তার গাঢ় অনুভবে কবি সারাজীবনই আচ্ছন্ন থেকেছেন—

'তোমাতেই বাঁচি প্রিয়া /তোমারই ঘাটের কাছে /ফোটাই তোমারই ফুল বাগানে বাগানে /জল দাও শিকড়ে' (জল দাও)। তাঁর প্রেমের শিকড় জীবনানন্দের মতো অধরা রহস্যময় নয়—তার মূল মাটির গভীরে।

স্নিগ্ধতার অবিচ্ছিন্ন ধারাপ্রবাহে প্রিয়াকে বারবার তিনি জলপ্রবাহের প্রতীকে পরিণত করেছেন 'আমার বৈশাখে তুমি শ্রাবণের সেই নদী।' বিষ্ণু দের কবিতায় প্রেমের রঙ বড় মিশ্র এবং গাঢ় প্রেম তার বিচিত্র রহস্যে স্বদেশ কাল প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে গেছে এমনকি 'চিত্র' ও সেই মুখ আঁকার জায়গা করে নিয়েছে—এই মুখে বহু মুখের আদল

এ মুখ সাবেক দেশী বাংলা মনের
ঐতিহ্যের ছবি—যেন যামিনী রায়ের

প্রকৃতির মধ্যে—আমার শ্রাবণ চায় তোমার বাহুর মৃদু কোণ

আমার আশ্বিন চায় রঙে রঙে তোমার সন্ধান।

তারপর একই স্তবকে

তুমি অশেষ তোমাকে জানাজানি
দেশেও কালে ব্যাপ্ত দশদিশ
তোমার আশা ইতিহাসের কাল
বিজ্ঞ বলে এ বুর্জোয়া চাল। [অন্বিষ্ট]
অন্যত্র এই প্রেমিকা বদলে গেছে

অন্যভাবে— তোমাকে আমি কত বছর জানি?
জানো না তা কি? বহু দশক পার
... ...
ছিল সাম্য আর মৈত্রী, কতবার
বীর প্রয়াসে লক্ষ্য ভগীরথ
প্রাণ গঙ্গা নামাল, দিলে-প্রাণ
স্বপ্ন দিনমান।

প্রেম, প্রিয়া, স্বদেশ, সমাজ এমনকি ছবি পর্যন্ত তাঁর কবিতায় এমন একাকার যে কারণে একই কবিতায় 'তুমি' শব্দটির মুহুর্মুহু রূপবদলে পাঠকের বিভ্রান্তি ঘটে। সুধীন্দ্রনাথ থেকে বুদ্ধদেবও এই অভিযোগ এনেছেন।

একসময়ে (এখনও বোধ হয়) প্রেমের কবিতার প্রতীক ছিল 'বনলতা সেন'। এই সময়ের কবিরা সুধীন্দ্রনাথ, বিষ্ণু দে, জীবনানন্দ সকলেই ভারতীয় রূপকথা পুরাণের অনুষঙ্গে বর্তমানকে নতুন আলোয় দেখতে ভালবাসতেন। এর মধ্যে জীবনানন্দ রূপকথার নারীদেরই বেছে নিয়েছেন বেশী, কিন্তু তারই ভিতরে জাতিস্মরের মতো শঙ্খমালা, কঙ্কাবতী, মীন-কন্যাদের তিনি মিলিয়ে দেন একালের বনলতা সেন, শেফালিকা ঘোষ, মৃণালিনী ঘোষালের সঙ্গে। নায়িকাকে নাম পদবী শুদ্ধ তুলে আনার ব্যাপারে বিষ্ণু দের সঙ্গে তাঁর মিল রয়েছে। বিষ্ণু দের নায়িকাদের নাম— অলকা বসু, ডলু, লিলি, রমা— কিন্তু তারা একেবারেই নাগরিকা রমণী, তাই সেখানে ব্যঙ্গ অবধারিত —

তোমার রঙেরো লিলি হবে খড় রং
কালো চোখ হবে ফিকে হারাবে চাতুরী
তার চেয়ে বড় কথা যাবে মিঠে ঢং।

কিন্তু জীবনানন্দের নায়িকারা নামেই একাকিনী। তাঁর সময়চেতনা এই প্রেমচেতনাতেও বাসা বেঁধেছে। পুরনো ঐতিহাসিক শহরকে রমণীর রূপের সঙ্গে মিলিয়ে আলোছায়া মাখা রোমাণ্টিক প্রেম সৃষ্টিতে তাঁর তুলনা তিনিই। যে রমণীর নিবিড় কেশভার কবেকার বিদিশা নগরীর রাত্রির কালো অন্ধকারকে স্মরণ করায়, মুখশ্রীর সৌকর্যে বৌদ্ধযুগের শ্রাবস্তী নগরীর কারুকার্যের আদল। যার চোখের তারায় অনন্ত নিশ্চিন্ত শান্তির আশ্বাস—এমন অপরূপা রমণীর ঘোর বাঙালী পাঠকেরা আজও কাটাতে পারে নি। আবহমানকালের সহজ সত্য সব পাখী ঘরে আসে। আর অনন্ত ইতিহাসের পটভূমিকায়, গভীর নির্জনতায় জীবনের সব হিসেবনিকেশ চুকিয়ে দেবার পর কবি সেই অপরূপা আশ্রয়দাত্রী রমণীর মুখোমুখি বসে আছেন—স্থির দৃশ্য ; তাঁদের কোন ভালবাসার কথা নেই, আচরণ নেই, আছে শুধু প্রগাঢ় এক চৌম্বক আকর্ষণ! এই আকষর্ণের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন নৈর্ব্যক্তিকতা প্রেমের বিষাদকেই যেন গাঢ় করে তুলেছে। কবি জানেন পার্থিব সৌন্দর্যের নশ্বরতা—কিন্তু যে কাল, সময় নিরবধি তারমধ্যে সৌন্দর্যচেতনাকে তিনি বেঁধে ফেলেছেন। তাই এক অদ্ভুত উদাসীনতায় নারী শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের তিনি অনায়াস নিরুচ্ছ্বাস বর্ণনা করেন — 'বেতের ফলের মতো ম্লান চোখ', 'নগ্ন নির্জন হাত', 'হিম-স্তন', 'হিম-রোমকূপ', 'মিয়ম্রান আঁচলের সর্বস্বতা দিয়ে মুখ ঢেকে / উদ্বেল কাশের বনে দাঁড়িয়ে রহিল হাঁটুভর', 'স্তন তার করুণ শঙ্খের মত—দুধে আর্দ্র—কয়েকবার শঙ্খিনীমালার', এই নারীকে—'এ পৃথিবী একবার পায় তারে/পায় নাকো তার'। বস্তুত যে প্রেম আর ফিরবে না এমন নিঃশেষিত বা অচরিতার্থ প্রেমের কবি তিনি। তাই তাঁর উপমা অতীতের কালে সুদূর নক্ষত্রে—'তোমার সৌন্দর্য নারী অতীতের দানের মতন'—'এই নারী অপরূপ খুঁজে পাবে নক্ষত্রের তীরে।' এই প্রেমের পটভূমিকায় তাঁর হাহাকার—

যদিও বীণার মত বেজে ওঠে হৃদয়ের বন
তবু প্রেম তবু তারে ছিঁড়ে ফেড়ে গিয়েছে কখন।

তাঁর প্রেম ও বিষাদ এক হয়ে যায় বিষণ্ণ হাহাকারে—'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালবাসে'—(বস্তুতঃ রোমাণ্টিকতার বেদনায় জীবনানন্দের অনেক লাইনের মত এই লাইনটিও কাব্যপ্রসিদ্ধি অর্জন করেছে)।

প্রকৃতপক্ষে এমনতর প্রেমের কবিতায় আমাদের বিভ্রান্তি জাগে এ কোন নারী—কেমন প্রেমের কবিতা লিখছেন কবি। এ সন্দেহ আরো প্রবল হয় যখন দেখি—'নারীর হৃদয়-প্রেম-শিশু-গৃহ নয় সবখানি'। তাঁর প্রেমের ধারণা অনন্তকাল নির্ভর।

'মানুষে রবে না আর/রবে শুধু স্বপ্ন তখন/সেই মুখ আর আমি রব সেই স্বপ্নের ভিতর।' জীবনসন্ধানী কবির প্রেম শুধু নরনারীর প্রেম নয়, ইতিহাসের পথ মাড়িয়ে, সমকালকে অতিক্রম করে ভবিষ্যৎ জীবনের আকাঙ্ক্ষায় এ বেঁচে থাকার প্রেম। এই প্রেমের জন্যই তিনি আবার ফিরে আসতে চান এই রূপসী বাংলায় এ তার জন্য মানুষ না হলেও চলবে 'হয়তো মানুষ নয় শঙ্খচিল শালিখের বেশে, ফিরে আসতেও তিনি রাজী। 'কিংবা 'আবার যেন ফিরে আসি/কোনো এক শীতের রাতে / একটা হিম কমলালেবুর করুণ মাংস নিয়ে।'

শুধু কবিতাতেই নয় তাঁর উপন্যাস 'প্রেতিনীদের রূপকথা'র নায়ক ঠিক এই কথাই আরো পরিষ্কারভাবে বলেছে—'আমার মনে হয় ভবিষ্যতে কোন এক জন্মে পক্ষীর জীবন পাব ; হয়তো এক জঙ্গলে ময়না হয়ে জন্মাবো, কিংবা তোমাদেরই এই আম্র কাঁঠালের

ডালে সিঙ্গাপুরের টুনি হয়ে আসবো—দাম্পত্য না হোক ভালবাসা ও জীবনের এক নতুন আস্বাদ পাব সেদিন।'

এই বাংলারই প্রতি কোণে ভোরের বাতাসে কাঁঠালপাতা ঝরছে, নিতান্ত ঘরোয়া পাখীরা-কাক, শালিখ, চড়ুই নিজেদের মত বেঁচে আছে, বুড়ো অশ্বত্থতলায় পাড়াগাঁর আইবুড়ো মেয়েরা গ্রাম্যদেবতার পুজো করছে—একে কবি প্রাণভরে উপভোগ করে গেছেন। জীবনের এই পাওয়ায় তিনি অভিভূত ; অতি তুচ্ছ সাধারণও অসাধারণ লাগে তাঁর—

কি বুঝিতে চাই আর?
রৌদ্র নিভে গেলে পাখি পাখালির ডাক
শুনিনি কি? প্রান্তরের কুয়াশায় দেখিনি কি উড়ে গেছে কাক?

[জীবন]

বিষ্ণু দে প্রেমকে মূলতঃ স্বদেশ প্রেমে নিয়ে গেছেন এবং তাঁর প্রেম চেতনা রাজনৈতিক একথা আগেই আলোচিত, কিন্তু জীবনানন্দ প্রেমকে নিয়ে গেছেন নিসর্গ প্রেমে—জীবন প্রেমে। প্রাকৃতিক বর্ণনায় তিনি অতিমাত্রায় উজ্জীবিত হয়ে ওঠেন, কলকাতার পথ হাঁটতে গিয়েও অন্য কিছু নজরে পড়ে না—'আর কিছু দেখেছি কি? এক রাশ তারা আর মনুমেন্ট।' তাঁর মতে সৌন্দর্য, প্রেম পূর্ণতা এখনো একেবারে লুপ্ত হয়ে যায় নি তবে তা মানুষের মধ্যে নেই আছে ঘাসে, মনুষ্যেতর প্রাণীর জীবনে। তবে তাদের জীবনেও গুলির আঘাতে মৃত্যু এসে প্রেম ভালবাসাকে ছিন্নভিন্ন করে দেয়, আর মানুষের মৃত্যু আসে তিলে তিলে টুকরো ব্যর্থতায়। সবচেয়ে ভালো প্রকৃতি, তাই ঘাসমাতার বুকে তিনি নিবিড় ঘাস হয়ে আবার এসে জন্মাতে চান। জীবনানন্দের উপমাই কবিত্ব—নানাভাবে এই উপমা এসেছে প্রকৃতির বর্ণনায়। এত আন্তরিকতাময় এ বর্ণনা যে, রোদ, জ্যোৎস্না, তারার আলোর রঙ বার বার বদল হলেও অস্বাভাবিক লাগে না। বাতাসেরও রঙ সবুজ মনে হতেই পারে ঘাসের উপর দিয়ে গেলে। ভোরের আলো কখনো নরম সবুজ আলো' কখনো 'ঘাস ফড়িং'-এর যত কোমল নীল, সূর্যের রঙ কখনো জাফরান, কখনো রাঙা, কখনো রক্তাভ, কখনো নিবিড় মেরুণ আলো, কখনো আবার সে শিশুর গালের মতো লাল—ভিজে হলেও ক্ষতি নেই। জীবনানন্দের মুক্তি 'এই আকাশে আলোয় আলোয়—ঘাসে ঘাসে'। সারাজীবন ধরেই কোন না কোন কবিতায় তিনি এর মহিমা কীর্তন করে গেছেন।

বিষ্ণু দে নিসর্গ ভালবাসতেন ঠিকই তবু তাঁর প্রশ্ন ছিল—

নিসর্গে কি মানবজীবন একমাত্র বার্ধক্যের স্বাভাবিক রোগে
নিজ সম্পূর্ণতা পায়?

[অষ্টপদী ঘৃণা]

পূর্ণতার প্রতীক কবি রবীন্দ্রনাথ তাঁর শয়নে স্বপনে থাকলেও 'দাঙ্গার কালোয়' পীড়িত কবির মনে হয় 'হঠাৎ নিভন্ত শান্তিনিকেতন আমার চৌদিকে

নিসর্গে বেসেছি ভালো নীল ঢেউয়ে পাহাড়ে তুষারে ;
তবুও চোরাই মুখে ছেয়ে গেলো আমার শহর। [২২শে শ্রাবণ]

হতাশ ক্লান্ত কবির চোখে 'কৃষ্ণচূড়া জ্বালা ধরায়', কিন্তু প্রকৃতির হাত থেকে তার কবিধর্ম রেহাই পায়নি। অথচ, আকাশ বক্ষ নীল কলকাতার আহত আকাশ ধোঁয়ায়

ধোঁয়ায় তিলতিল / ফুসফুসের ধূসর সন্ত্রাস।' প্রথম থেকেই মেঘ, বৃষ্টি, নদী, সমুদ্র, বৃক্ষ বার বার তাঁর প্রেম প্রকৃতিতে এসে মিশে গেছে শেষ পর্যন্ত। তাঁর প্রিয় উপমা। ক্রমে প্রকৃতির আরো নিবিড়তর হয়েছে—হরিণ, তিতির, ময়ূর, স্বর্ণচাঁপা, পিয়াশাল, পাহাড় আর হিজল-সোঁদালে ভরে গেছে তাঁর কবিতা। 'দূর বাংলায় সমুদ্রের হাওয়া চাই অহরহ পাহাড়ে প্রান্তরে বনে আর সবুজ বা গেরুয়া টিলায়।'

মুখের কথার ব্যবহারে কবিতার লক্ষ্যভেদ করা যেমন জীবনানন্দের বৈশিষ্ট্য বিষ্ণু দেরও তেমন, কিন্তু এখানেও দুজনের প্রয়োগ রীতি স্বতন্ত্র।

জীবনানন্দের ভাষায় হামাগুড়ি দিয়ে পেঁচা নামে, 'লবেজান হাওয়া, গোড়োলের মত কেশে' 'চমৎকার'।—ধরা যাক দু একটা ইঁদুর এবার, 'হাড় হাভাতের গ্লানি', 'বিয়োবার দেরি নাই' 'এমন কি হ'তো জাঁহাবাজ? ভিখিরিকে একটি পয়সা দিতে ভাসুর ভাদ্র-বৌ সকলে নারাজ' 'কি করে ধর্মের কল ন'ড়ে যায় মিহির বাতাসে'; 'দাঁড়িয়ে রহিল হাঁটুভরে', 'কি কথা তাহার সাথে? তার সাথে।' এমনতর অজস্র উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে সাধুভাষার সঙ্গে কথ্য ভাষা মিশিয়ে বিষাদময় উচ্চারণ জীবনানন্দের। বিষ্ণু দে ভাষার উজ্জ্বল কাঠিন্য আনার জন্য মিশিয়েছেন দেশজ আর তৎসম শব্দের সঙ্গে তদ্ভব শব্দকে — যেমন দুরন্ত-বর্ষা, জরতী-সন্ধ্যা, মেদুর-ঘাস, অপাপবিদ্ধস্নবিয়, ক্রতুকৃতম জাতিস্মর-অন্ধকার এমন অনেক শব্দে নতুন ঝংকার সৃষ্টি করেছেন। ইংরেজী শব্দকে জীবনানন্দও কবিতায় প্রয়োগ করেছেন তবে কম—প্যারাফিন, লণ্ঠন, নাইস, রেস্তোরাঁ, ব্রায়ার পাইপ, মিডলম্যান, অরেঞ্জ পিকো, অরেঞ্জ স্কোয়াশ, বজেট মিটিং, পার্টি-পলিটিক্স আটলান্টিক চার্টার, কো প্রসপেরিটি—এইসব শব্দ মাঝে মাঝেই সাবলীলভাবে তাঁর কবিতায় ঢুকে পড়েছে। বিষ্ণু দেরও তাই তবে তাঁর প্রয়োগ হালকা—ধারালো চালে—'পার্টির স্লোগানে যোগান দেব তো, কিউ করো ভাই/ডিভিডেন্ড চেপে প্যানিক ছড়াই /বাজারে গুমোট আমরা ছড়াই/তারপরে ছাড়ি অনডরসেল হাত চেপেই'—ইংরাজী ভাষা কথ্য ভাষা হয়ে ছন্দের মধ্যেই গাঁথা পড়েছে।

ধ্বনির উপর তাঁর সহজাত অধিকার। এই ধ্বনিপ্রধান বা মাত্রাবৃত্তেই তাঁর হাত খোলে বেশি— কত বুলবুলি খেল ধান,

কত মা গাইল বর্গীর গান,
তবু বেঁচে থাকে অমর প্রাণ
এ জনতার ... [এ জনতার]

বাক্‌রীতি ও কাব্যরীতির সংমিশ্রণে এ রীতি সুকঠিন। সুধীন্দ্রনাথ বলেছিলেন 'বিষ্ণু দে যখন মাত্রাবৃত্তের মতো রাবীন্দ্রিক যন্ত্রকেও নিজের সুরে বাজিয়েছেন তখন তাঁর প্রতিভা নিঃসন্দেহ, তাঁর উৎকর্ষ সপ্রমাণ তিনি আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন'। রবীন্দ্র উদ্ধৃতিকে, তার ছন্দকে ওলট পালট করা বিষ্ণু দের প্রিয় খেলা—

নামে সন্ধ্যা তন্দ্রালসা তার
সোনার কবরী খসা একটি কুসুমে
তোমায় সাজাব কবে সম্পূর্ণ দিনের শেষে প্রিয়া পরিচ্ছন্ন ঘুমে।

জীবনানন্দের ছন্দ সম্বন্ধে বুদ্ধদেবের মনে হয়েছিল—এ যেন জলের মতো ঘুরে ঘুরে কথা কয়। জীবনানন্দ জানতেন—"যে কোনো আবেগ যে কোনো ছন্দে রূপ পরিগ্রহ করতে পারে না এবং কবিপ্রেরণার তারতম্য অনুসারে ছন্দের জাত নির্ণয় হয়।' প্রথম কাব্যগ্রন্থেই তাঁর কাব্যের প্রিয় ঋতু স্থির হয়ে গিয়েছিল হেমন্তের—কখনো শীতের সেখানে বাসা

বেঁধেছিল মৃত্যু চেতনা। ফসলবিহীন মাঠের শূন্যতা ভাঙা ঘাট, মজা দিঘী, চূর্ণ মঠ, জীর্ণ বট, শ্মশানের দেশের এই পোড়ো মাঠে বর্ষা নয় শিশিরের জল জমে। তাকে সূর্য আলোকিত করে না, করে 'বরফের মতো চাঁদ'। তাঁর হৃদয়ের বন সবুজ নয়— 'হলুদ পাতায় ভরে'। এমনকি তাঁর বিখ্যাত প্রেমের কবিতার নায়িকার শরীরেও 'মমির গন্ধ কফিনের ঘ্রাণ—আর কিছু নয়'। এই ক্লান্তি আর অবসাদকেই মূর্ত করে তাঁর পয়ারের অলস ছন্দের বিস্তৃতি। ছন্দবলয়েও দেখা যায় তাঁর 'নির্জনতা' ক্রমশঃ বেড়ে গেছে প্রথম জীবনে স্বরবৃত্ত রবীন্দ্রনাথের 'বলাকার ছন্দ' বা মুক্তক ছন্দ নিয়ে কবিতা লিখতে শুরু করে তাকে কথোপকথনের ভঙ্গিমায় এনে একই সঙ্গে স্বাভাবিকতা এবং গাম্ভীর্য দান করেছেন। একই শব্দকে কবিতায় বারবার ব্যবহার করে তিনি পাঠককে কোন অনুভবের কাছাকাছি নিয়ে যান যেমন—ক্লান্ত ক্লান্ত ক্লান্ত করে অথবা ব্যবহৃত ব্যবহৃত ব্যবহৃত (তিনবার)। টানা লাইনের প্রভাবে একটা লতায়িত তান সৃষ্টি করেন স্বরের প্রসারণে—

'পাড়াগাঁর গায় আজ লেগে আছে রূপশালি রূপসীর শরীরের ঘ্রাণ।' শঙ্খ ঘোষের মতে ক্রমে শেষের দিকে স্বরবৃত্তের মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ 'মুখের ভাষাকেও এমন একটা অবয়ব দেন যেন তা ঠিক মুখের ভাষা নয়। কেননা কাছে নিয়েও আমাদের অল্প সরিয়ে রাখতেই চান তিনি, ভিতরের নিবিষ্টতাকে জেগে উঠবার সময় দেবার জন্য। এ থেকে তাঁর স্বপ্নজগৎ, জেগে ওঠার শব্দ শোনেন কবি 'পাতা পথের মৃত কাজের ভূকন্দরের থেকে'—'সবই তিনি দেখেন ওই ভূকন্দরের থেকে, তাই এই আচ্ছাদনই হয় জীবনানন্দের ছন্দ, এই হলো তাঁর কাছে এ যুগের কাব্যছন্দ ...মুখর উচ্চারণ থেকে যা খুব দূরের নয়। প্রতিদিনের সন্নিহিত যা, কিন্তু তবু এক আপাত আলস্যের মন্থর ভারে যাকে মনে হতে পারে যেন অনেক দূরের।'

> আরো এক আলো আছে, দেহে যার বিকালবেলার ধূসরতা
> চোখের দেখার হাত ছেড়ে দিয়ে সেই আলো হয়ে আছে স্থির
> পৃথিবীর কঙ্কাবতী ভেসে গিয়ে সেইখানে পায় ম্লান ধূপের শরীর

রবীন্দ্রনাথকে স্বীকার করে নেবার ব্যাপারে এই দুই কবির মতামত সম্পূর্ণ একরকম। বিষ্ণু দে সেখানে লেখেন—'বাংলার ছোট ঐতিহ্যের ধারায় রবীন্দ্রনাথের আবির্ভাব একটা প্রাকৃতিক ঘটনা ..,তাঁর তুলনা অন্য সাহিত্যেও ঠিক পাওয়া যায় না। একদিকে ইংরেজীতে চসার, অন্যদিকে জর্মানের গয়টে মিলিয়ে হয়তো খানিকটা ঐতিহাসিক তুল্যাভ্যাস দিতে পারে।...রবীন্দ্রনাথ আমাদের শেখালেন শালীনতা ...প্রাদেশিকপুষ্ট বাংলায় তিনি আনলেন বিশ্বের মানদন্ড। ...বাংলা সাহিত্যের ঐতিহ্যই তাঁর ব্যাপক কর্মক্ষেত্র ছিল, তবু তাঁর ব্যক্তিস্বরূপ নদীর মুখর স্রোত নয়, সংহতসত্ত্বা হিমালয় নামে নগাধিরাজ যেন।' সেখানে এই কথারই ওপিঠ যেন—জীবনানন্দ লিখেছেন—'রবীন্দ্রনাথ আমাদের ভাষা, সাহিত্য, জীবনদর্শন ও সময়ের ভিতর দিয়ে সময়ান্তরের গরিমার দিকে অগ্রসর হবার পথ যেরকম নিরঙ্কুশভাবে গঠন করে গেছেন পৃথিবীর কোন দেশই একরম লোকোত্তর পুরুষকে ধারণ করেনি। ...রবীন্দ্রসাহিত্য ও কবিজীবন দেশ ও জাতির মেরুদণ্ড গঠন করতে গত পঞ্চাশ-ষাট বছর ধরে যেভাবে নিজেকে ক্ষয়িত করেছে, বাঙলা ছাড়া অন্য কোনো দেশে হলে হয়তো বা তার অপেক্ষাকৃত সুব্যবহার হত।'

[রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা]

এই দুই কবি রবীন্দ্রনাথকে সম্পূর্ণ স্বীকার করে নিয়েও রবীন্দ্রপরবর্তী কাব্যে মৌলিক

সুরের আমদানী করেছিলেন, কিন্তু তাঁদের আরো এক মিল যে তাঁকে স্বীকার করে নিয়েও তাঁর ঔপনিষদিক দর্শনে স্থিতধী থাকতে পারেননি এঁরা। রবীন্দ্রনাথ যেখানে নিজ বিশ্বাসে ভূমিতে স্থির সময়ের এবং পারিপার্শ্বিকের আলোড়নে এঁরা তত অস্থির। জীবনানন্দ আধুনিক কবিদের সম্পর্কে বলেছেন—'এমন একটা বিড়ম্বিত যুগের শেষে এসে তাঁরা দাঁড়িয়েছেন এবং সম্মুখে এমন গভীরতর কুমন্ত্রণা...এসব কবিতার জীবনদর্শন রবীন্দ্রনাথের জীবন-দেবতাবোধের চেয়ে অন্য জিনিস। ...তাঁদের কবিতা প্রধানত শ্লেষাত্মক এবং বর্তমান কালের সমগ্র পৃথিবীর সমাজব্যবস্থার অন্যায় ও অত্যাচারের মুখোস বার করে ফেলবার জন্য প্রযুক্ত।' [রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা]

জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে মোট তিনটি কবিতা লিখেছিলেন— সেখানেও বিরাট সময়ের পটভূমিকার তাঁর শ্রদ্ধার্ঘ—'অনন্ত আকাশবোধে ভরে গেল কালের দুফুট মরুভূমি।'

বিষ্ণু দের শিরা-উপশিরায় বহমান ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। তিনি প্রথম সচেতনভাবে রবীন্দ্রনাথকে আত্মস্থ করে কবিতায় তাঁর নাম এবং কাব্যানুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। রবীন্দ্রনাথের কবিতার লাইন ছন্দ সামান্য অদল বদল করে গভীরতর বা নূতনতর ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে তিনি ক্লান্তিহীন।

সূর্যদেব এখানে নামল সন্ধ্যা,
কবিতা' সন্ধ্যা
বড়োবাজারের উপল উপকূলে
জনগণের প্রবল স্রোত /উগারিছে ফেনা...

'টপ্পাঠুংরী' গোটা কবিতার প্রায় প্রতি স্তবকেই এমন নিদর্শন মিলবে। শুধু তাই বা কেন বিষ্ণু দের কবিতার এলাকা তল্লাসী করলে ২৫শে বৈশাখ, ২২শে শ্রাবণ রবীন্দ্রনাথের নাম বা তাঁর কাব্য-নাটকের গানের এমনকি রবীন্দ্র সঙ্গীতের গায়ক গায়িকারও নাম এবং কোন না কোন অংশ অনুষঙ্গ হিসাব উঠে আসেনি, এমন জায়গা পাওয়া খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। রবীন্দ্রনাথের ঔপনিষদিক দর্শনের শ্লোক উদ্ধৃত করে সামাজিক মুক্তির বিশ্বাসে তার বিশ্লেষণ করেছেন। নাগরিক যান্ত্রিক সভ্যতা শান্তি খান খান করলেও মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথকে —

কোথা রাবীন্দ্রিক প্রিয় গান?
... বেসুরে জীবন খান খান। [সাধ্যেসাধে]

তাঁর প্রণামের মন্ত্র— রবীন্দ্রব্যবসা নয়, উত্তরাধিকার ভেঙে ভেঙে
চিরস্থায়ী জটাজালে জাহ্নবীকে বাঁধি না বরং
আমরা প্রাণের গঙ্গা খোলা রাখি, গানে গানে নেমে
সমুদ্রের দিকে চলি। [২৫শে বৈশাখ]

এই নাগরিক কবি শহরে অস্থির হয়েছেন ক্রমাগত—
গান কোথা? ঊর্মিচারী ক্রোধ সরাতে
আলকাৎরা, কয়লাকুচি, ধোঁয়া আর তেল।

তবুও কলকাতা বারবার ঘুরে ফিরে তাঁর কবিতায় এসেছে—চৌরঙ্গী, খিদিরপুর, মানিকতলা খাল, রেড রোড—কখনো কলকাতার ঐকতান /খুলে দেয় রাত্রিশেষে সকালের প্রখর আকাশ। 'ফুসফুসের ধূসর সন্ত্রাস এই কলকাতা' মহানগরীর রুদ্ধশ্বাস

রুচিহীনতায় তিনি অস্থির হয়ে উঠেছিলেন। সাঁওতাল পরগণার 'রিখিয়া'ই হয়েছিল তাঁর দ্বিতীয় আবাস। 'যেখানে পাহাড় জ্যামিতির নানা সাজে হৃদয় ভেলায় প্রকৃতির মন্টাজে' সেখানে প্রকৃতির বুকে আজন্ম সংগ্রামী এই নাগরিক কবি শান্তি পেতে চেয়েছিলেন পাহাড়ের রেখায় সূর্যাস্তের রঙে আর যামিনী রায়ের ছবির মধ্যে।

আর প্রকৃতির কবি জীবনানন্দ এসেছিলেন পুব বাংলার ঘনসবুজ বরিশালের গ্রাম থেকে ইঁটের শহর কলকাতায়। মাঝে কয়েকবছরের জন্য দিল্লীতে চাকরি করেছিলেন কিন্তু আর ফিরে যাননি সেখানে। 'গলিত নষ্ট ভয়ঙ্কর' এই মহানগরী ধর্মতলা তাঁকে সর্বতোভাবে গ্রাস করেছিল—তাঁর মনে হয়েছিল 'মৃগনাভি ঘন বড় নগরের পথে'। মনুমেণ্ট, ট্রাম, টেরিটি বাজার, চিনে পাড়া, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট কলকাতার নানা পথ ঘুরে ফিরে এসেছে কবিতায়। তিনি এখান থেকে অন্য কোথাও যেতে চান নি—সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই লাইনটি তাঁর মুখে বসিয়ে দিলে বোধ হয় অন্যায় হয় না। 'তারপর সেই রাক্ষুসীই আমাকে খেলো।'

বর্তমান শতাব্দীর তৃতীয় দশক থেকে পঞ্চম দশকের মাঝামাঝি—জীবনানন্দ ও আশির দশকের শুরু পর্যন্ত—বিষ্ণু দে সময়ের আঁশটে গন্ধ নাকে নিয়ে উচ্ছৃলতার গান কানে শুনে, দৃশ্যপট দ্রুত বদলে যাওয়াকে প্রত্যক্ষ করে কবিতায় অতিক্রম করেছিলেন বিস্তৃত পথ। সেই পথ স্বভাবতই ছিল স্বতন্ত্র। তবুও বাঙলা কবিতার ক্ষেত্রে তা এক উজ্জ্বল উদ্ধার।

সমকালীন কবি জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব ঃ মিল ও অমিল

প্রভাতকুমার দাস

'দ্বীপের মতন একা আমি তুমি ;
অনন্ত সব পৃথক দ্বীপের একক মরুভূমি'

বিশের দশকের শেষের দিকে যখন জীবনানন্দ দাশ সমকালীন পত্র-পত্রিকায় আবির্ভূত হন, তখন আধুনিক কবিদের বিরোধী গোষ্ঠীর দ্বারা তিনি যে বহুলভাবে নিন্দিত হয়েছিলেন তা আজ ঐতিহাসিক ঘটনা। আর সেই দূর সময়ে, জীবনানন্দ যখন 'গণ্ডার-কবি' হিসেবে উল্লেখিত হয়ে নানা রকম অমার্জিত কটাক্ষ ও অট্টহাসির বিষয় হয়ে উঠেছিলেন, সে সময়ে মাসিক 'প্রগতি' পত্রিকাকে কেন্দ্র করে আধুনিক তরুণদের যে ক্ষুদ্র সাহিত্যমঞ্চ গড়ে উঠেছিল, তাতে প্রথম সংবর্ধিত হন জীবনানন্দ—'প্রকাশ্যে, একক কণ্ঠে, সোচ্চার ঘোষণায়।' একথা নিশ্চয় নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার প্রয়োজন নেই যে এই সোচ্চার ঘোষণাকারীর একক কণ্ঠটির অধিকারী ছিলেন, কবি-সম্পাদক বুদ্ধদেব বসু, প্রকাশ্যে অর্থাৎ 'প্রগতি'র পৃষ্ঠাতেই তিনি জীবনানন্দকে সর্বজন সমক্ষে তুলে ধরার চেষ্টা করেন।

'প্রগতি' পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছিল (১৩৩৪ আষাঢ়) ৪৭ নং পুরানা পল্টন, রমনা, ঢাকা থেকে, বুদ্ধদেব বসু ও অজিতকুমার দত্ত-র সম্পাদনায়। বুদ্ধদেব তখন আঠারো-উনিশ বছরের যুবক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি অনার্সের ছাত্র। বয়সের তুলনায়, তাঁর সাহিত্য সম্পর্কে তখনই খ্যাতি-অখ্যাতি দুই-ই অতি পরিচিত। তিনি তখনই 'মর্মবাণী' (১৯২৪) নামের একটি নিরীহ কাব্যগ্রন্থের প্রণেতা ; কিন্তু 'কল্লোল'-এ (১৩২৩ জ্যৈষ্ঠ) তাঁর 'রজনী হলো উতলা' গল্পের প্রকাশকে কেন্দ্র করে তিনি সে সময়ে সাহিত্যক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্যতা অর্জন করেছেন। যদিও শেষোক্ত ঘটনাটি যখন তরুণ-মহলে আলোড়ন তুলেছিল, তারই অল্প কয়েকমাস পূর্বে 'কল্লোল'-এর পাতাতেই জীবনানন্দে-র 'নীলিমা' কবিতাটি প্রকাশিত হয় (১৩৩২ ফাল্গুন), তখনও তাঁর পদবীর 'গুপ্ত' বর্জিত হয়নি। এই কবিতাটির জন্যই তিনি সমসাময়িক পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

প্রসঙ্গত স্মরণ করা দরকার, জীবনানন্দ এবং বুদ্ধদেবের বয়সের ব্যবধান বছর ন'য়েক। প্রথমজন জন্মেছিলেন ১৮৯৯-এ পূর্ববঙ্গের বরিশাল শহরে, দ্বিতীয় জনের জন্ম কুমিল্লায় ১৯০৮-এ। জীবনানন্দ ইংরেজি সাহিত্যে এম. এ. পাশ করার পর কলকাতার সিটি কলেজে (১৯২২) অধ্যাপনা কর্মে নিযুক্ত হন। বুদ্ধদেব সে সময়ে, প্রাক্-ম্যাট্রিক দুটো ক্লাস পড়বার জন্য, ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্র। কয়েক বছর পরে, হাতে লেখা 'প্রগতি' পত্রিকা ছাপার অক্ষরে রূপান্তরিত হয়, পূর্বোক্ত 'নীলিমা' কবিতাটির কল্যাণেই উদ্যোক্তারা জীবনানন্দকেও অত্যন্ত আগ্রহের সঙ্গে আমন্ত্রণ জানান, তিনিও তার উত্তর দিয়েছিলেন 'উষ্ণ', অকৃপণ প্রাচুর্যে ; তাঁর 'খুশরোজী' কবিতাটি প্রথমবর্ষের দ্বিতীয় সংখ্যায় প্রকাশিত

হয়, তখনো তিনি অধ্যাপনা সূত্রে সিটি কলেজে আছেন, আর আহ্বানকারী সম্পাদক, এই তরুণ কবি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী অনার্সের ছাত্র।

'কবে কোথায় জীবনানন্দকে প্রথম দেখেছিলাম মনে পড়ছে না'—সদ্যপ্রয়াত প্রিয় কবি সম্পর্কে লিখতে গিয়ে প্রথম সাক্ষাতের স্মৃতিটি ঠিক স্মরণ করতে পারছিলেন না বুদ্ধদেব ; কিন্তু পরবর্তীকালে নিজেদের যৌবন বয়সের অনেক ঘটনার লিখিত বিবরণ উপস্থাপন করার সময় এই সংশয় কাটিয়ে লিখেছিলেন, 'জীবনানন্দকে আমি প্রথম দেখেছিলাম ঢাকায়'। জীবনানন্দ কয়েকদিনের জন্য ঢাকায় গিয়েছিলেন, সে যাত্রায় বুদ্ধদেবের পুরানা পল্টনের বাসায়, তরুণ সাহিত্যিকদের সঙ্গলাভ করলেন তিনি, মেঘলা দিনের মাঠের পথে ঘুরলেন দুজনে। এরপর জীবনানন্দে-র বিবাহ বাসরে ঢাকায় রামমোহন লাইব্রেরীতে বরযাত্রী হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বুদ্ধদেব, অজিত দত্ত ও অন্যান্য বন্ধুরা। জীবনানন্দ তাঁর সদ্য-বিবাহিতা স্ত্রী লাবণ্য-র সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিয়েছিলেন বিশ্ববিদ্যালয়ের এই উজ্জ্বল রত্নটির, সম্ভবত বুদ্ধদেব সে বছরই ইংরেজীতে অনার্স সহ প্রথম শ্রেণীতে বি. এ. পাশ করে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েই এম. এ.-তে ভর্তি হয়েছিলেন।

প্রগতি যখন প্রকাশিত হয়, জীবনানন্দ তখন কলকাতায়, কিন্তু বুদ্ধদেব তাঁর ছাত্র জীবন শেষ করে যখন কলকাতায় এলেন, (১৯৩১) তখন ঘটনাক্রমে জীবনানন্দ বরিশালে সর্বানন্দ ভবনের বাসিন্দা। এ সময়ে জীবিকার প্রয়োজনে অল্প কিছুদিন বাংলার বাইরেও কাটাতে হয়েছে তাঁকে অধ্যাপনা সূত্রে, যদিও কলকাতার সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ ছিন্ন হয়নি। এ সময়ে বুদ্ধদেব, রমেশ মিত্র রোডের একটি ঘরে সাময়িকভাবে বসবাস করেন, শীতকালে একটি বিকেলের স্মৃতি অক্ষয় হয়েছিল বুদ্ধদেবের জীবনে, কেন না একতলায় সেই ঠাণ্ডা ঘরে অতিথি জীবনানন্দ-র সঙ্গে গল্প করছেন, এমন সময় হঠাৎ চেয়ার টেবিল নড়ে উঠলো, বাইরে ছোট্ট বারান্দায় এসে দাঁড়ালেন তাঁরা, মিনিট খানেক পরে আবার ঘরে ফিরে বসলেন। পরের দিন কাগজে দেখা গেল উত্তর বিহারের ভূমিকম্পের খবর। কিছুদিন আগে তাঁদের আরেক বন্ধু বিরাম মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন যে তিনিও ঐ বিকেলে তাঁদের সঙ্গে ছিলেন।

কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বরিশালে গিয়ে বসবাস করা জীবনানন্দে-র অভিপ্রেত ছিল না, হয়তো এরকম কোনো সময়েই, কিংবা আরও কয়েক বছর পরে, তিনি বুদ্ধদেবকে লিখেছিলেন নিজের মানসিক অবস্থার কথা ;

> 'কলকাতার অলিগলি মানুষের শ্বাসরোধ করে বটে কিন্তু কলকাতার ব্যবহারিক জীবনে একটা প্রান্তরের মত মুক্তি পাওয়া যায়। এখন যখন জীবনে কর্মবহুলতার ঢের প্রয়োজন কলকাতার এই স্বচ্ছন্দ পটভূমির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা চলে না আর।'

'প্রগতি'র সময় থেকেই উভয়ের মধ্যে সাহিত্যিক বন্ধুতা ও সাযুজ্য ছিলো বিরামহীন, দেখা সাক্ষাৎ হয়তো হয়েছে যৎসামান্য, তাতে তাঁদের পারস্পরিক ঘনিষ্ঠতার কোনো ঘাটতি হয়নি—জীবনানন্দে-র রচনার ভিতর দিয়েই বুদ্ধদেব তাঁকে পেয়েছেন গভীর ভাবে। বিশেষত জীবনানন্দের 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' (১৯৩৬) গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত অধিকাংশ কবিতাই প্রকাশিত হয়েছিল বুদ্ধদেব সম্পাদিত পত্রিকায় এবং বইটি ছাপা হওয়ার সময় ধাত্রীর কাজ করতে হয়েছিল বুদ্ধদেবকে। আর অন্য দিক থেকেও উভয়ের সাহিত্য জীবনের এটি একটি স্মরণীয় ঘটনা, কেননা জীবনানন্দ তাঁর এই 'প্রথম পরিণত' গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন 'বুদ্ধদেব বসুকে'। চার বছর পরে বুদ্ধদেব তাঁর 'দময়ন্তী' কাব্যগ্রন্থে

(১৯৪০) 'বিচিত্রিত মুহূর্ত', অংশটি উৎসর্গ করলেন—'জীবনানন্দ দাশ কবি করকমলে' —আর এই উৎসর্গ পত্রটি লক্ষণীয় হয়ে উঠলো একটি ছোট্ট কবিতার সংযোজনে :

সে-পথ নির্জন,
যে-পথে তোমার যাত্রা।
সে-পথে আসে না অশ্বারোহী,
পদাতিক বীর সৈন্যদল।
অস্ত্রের ঝঞ্ঝনা নেই, যান-যন্ত্র-মুখরিত নাগরিক জনতার স্রোত নেই ;
নেই যোদ্ধা, নেই জয়ী, নেই পরাজিত।
সে-পথ সন্ধ্যার।
শুধু সমুদ্রের স্বর, অন্য কোনো শব্দ নেই।
শুধু সমুদ্রের স্রোত, অন্য কোনো গতি নেই।
একটি জ্বলন্ত তারা
আকাশের জ্বলন্ত হৃৎপিণ্ড যেন,
এঁকে যায় সেই পথ স্বচ্ছ নীল ঝলকে-ঝলকে
সমুদ্রের মানচিত্র-নীলে।

কবিতাটির সূচনায় যে 'নির্জন' শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে, জীবনানন্দের কবিতার অন্যতম বিশিষ্টতা হিসেবেই পরবর্তীকালে তা হয়েছে চিহ্নিত। জীবনানন্দের 'বনলতা সেন' কাব্যগ্রন্থের সমালোচনার (১৯৪৩) সূচনাই করেছিলেন : 'আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে জীবনানন্দ দাশ সবচেয়ে নির্জন, সবচেয়ে স্বতন্ত্র।' আর উপসংহারে বললেন 'তিনি আমাদের নির্জনতম কবি।' এ কথা সত্যি, তাঁর সম্পর্কে প্রচারিত এই অভিধা সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করেননি জীবনানন্দ স্বয়ং, কিন্তু উত্তরকালে, কবিজীবনে তাঁর কবিপ্রকৃতির বিশিষ্টতা চিহ্নিত করতে সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে এই শব্দটি, আজকের দিনে উদ্ধৃতি চিহ্ন ছাড়া যে এই বিশেষণ ব্যবহার করা যায় না, তার কারণ এই মন্তব্য বুদ্ধদেবই প্রথম উচ্চারণ করেছিলেন।

জীবনানন্দের এই তৃতীয় কাব্যগ্রন্থ ষোলো পাতার 'বনলতা সেন' প্রকাশিত হয়েছিল, সেও 'কবিতাভবন'-এর 'এক পয়সায় একটি' গ্রন্থমালার অন্তর্ভুক্ত উল্লেখযোগ্য প্রকাশন হয়ে। জীবনানন্দের এই দুটি কাব্যগ্রন্থের প্রকাশনকর্মের সঙ্গে যুক্ত থেকেই ক্ষান্ত হননি বুদ্ধদেব, প্রকাশিত হওয়ার পর স্ব-সম্পাদিত 'কবিতা' পত্রিকার পাতায় দীর্ঘতম সমালোচনা লিখেছিলেন। প্রথম গ্রন্থটি আলোচনার সময় প্রকৃতির কবি হিসেবে রবীন্দ্রনাথের পরে জীবনানন্দের বিশিষ্টতা সম্পর্কে নিজের মত জানিয়ে লেখেন : 'আমার মনে হয়, আমাদের আধুনিক কবিদের মধ্যে একজনকে বিশেষ অর্থে প্রকৃতির কবি বলা যায়, তিনি জীবনানন্দ দাশ।' প্রসঙ্গক্রমে বুদ্ধদেব লিখলেন :

> 'তাঁর কল্পনা নব-নব রূপের সন্ধানী, তাঁর রচনাভঙ্গি গভীরতর পরিণতির দিকে উন্মুখ। কিন্তু এত দিনেও আমাদের সাহিত্যের 'বাজারে' তাঁর খ্যাতির রোল ওঠেনি। আমাদের সুধীসমাজও তাঁর কাব্যের সঙ্গে যথেষ্ট পরিচিত ব'লে মনে হয় না। আধুনিক বাংলা কাব্য সম্বন্ধে কোনো আলোচনাতেই জীবনানন্দর উপযুক্ত উল্লেখ এ পর্যন্ত দেখেছি বলে মনে পড়ে না। জীবনানন্দের ব্যক্তিত্ব লোকচক্ষু থেকে একেবারেই প্রচ্ছন্ন, এ ছাড়া এই অন্যায়ের আর কোনো কারণ আছে কি না জানি না।'

নিজের পত্রিকায় শুধু জীবনানন্দের কবিতাকে যোগ্য মর্যাদায় প্রকাশ করা নয়, ইতর রসিকতা মিশ্রিত আক্রমণের জঘন্য বিরুদ্ধতা, কিংবা আধুনিকতার শত্রু পক্ষের শর নিজের দিকে বর্ষিত দেখে, বুদ্ধদেব যতটা উত্তেজনা বোধ করতেন, তার চেয়ে বেশি উত্তেজিত হতেন জীবনানন্দের অবমাননায়, যেহেতু তাঁর কবিতাকে তিনি অত্যন্ত ভালো বেসেছিলেন। তা ছাড়া জীবনানন্দ তখন সব অর্থে সুদূর কবিতা ছাড়া অন্য সব প্রসঙ্গে নিঃশব্দ, তাই তাঁর বিষয়ে যে কোনো রকম সাহিত্যিক বিরুদ্ধতা প্রতিরোধ করা 'বিশেষ কর্তব্য' হিসেবেই গ্রহণ করেছিলেন তিনি। যেজন্য 'প্রগতি'র সম্পাদকীয় রচনায় 'জীবনানন্দ-প্রসঙ্গ' সমসাময়িকদের তুলনায় কিছু বেশি পৌনঃপুনিক বলে মনে হতে পারে, এবং তার অনেকটা অংশই যে প্রতিবাদ, পরবর্তীকালে সে কথা ভেবে খুব খারাপ লাগত বুদ্ধদেবের।

শুধু বিরোধিতার প্রতিবাদ মাত্রই নয়, জীবনানন্দের অবজ্ঞাকে বুদ্ধদেব সামগ্রিকভাবে আধুনিক বাংলা কাব্যের অবমাননা বলেই মনে করতেন। রবীন্দ্রনাথ কৃত 'বাংলা কাব্য পরিচয়' (১৩৪৫) সংকলন গ্রন্থে কবিতা পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় প্রচলিত 'মৃত্যুর আগে' কবিতাটি রবীন্দ্রনাথ অংশত বর্জন করে গ্রহণ করায় তীব্র আপত্তি জানিয়েছিলেন বুদ্ধদেব। সম্পাদক রবীন্দ্রনাথকে উদ্দেশ্য করে লিখেছিলেন ঃ 'সাহিত্য ক্ষেত্রে কেউ কারো কৃপাপ্রার্থী নয়। দয়ার গ্রহণের চাইতে স্পষ্ট উপেক্ষার বর্জন অনেক সম্মানের।' এই ঘটনার এক বছর পরে, যখন 'কবিতাভবন'-এর উদ্যোগে, কিন্তু আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়-এর সম্পাদনায় 'আধুনিক বাংলা কবিতা' (১৯৪৬) সংকলনটি প্রকাশিত হয়, তাতে সন্তুষ্ট হতে পারেন নি বুদ্ধদেব, তাঁর পক্ষে সবচেয়ে বড়ো বেদনার কারণ জীবনানন্দের উপেক্ষা—যার 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র পরেও আরো অনেক উৎকৃষ্ট কবিতা বেরিয়ে গেছে ততদিনে, অথচ তিনি স্থান পেয়েছিলেন 'অতি সংকীর্ণ'। বুদ্ধদেব সম্পাদকের সঙ্গে অনেক তর্ক করেও বোঝাতে পারেন নি, যে জীবনানন্দ শুধু 'বর্ণনাধর্মী' লিপিকার নন, অতি গভীর ভাবনাঋদ্ধ এক কবি তাঁদের মধ্যে অন্যতম। চৌদ্দ বছর পরে, যখন নতুন করে সম্পাদনার কাজ বুদ্ধদেব গ্রহণ করলেন, তখন পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত নতুন সংস্করণে জীবনানন্দকে তাঁর যোগ্য সম্মানে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

২.

জীবনানন্দের কবিতায় প্রচার সম্পর্কে কথা উঠলেই, অনিবার্যভাবে বুদ্ধদেবের কথা উঠবেই, কিন্তু আশ্চর্য লাগে যখন পঁচিশ বছরের উপর একটানা বন্ধুত্ব ও সৌহার্দ থাকা সত্ত্বেও বুদ্ধদেব জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে আক্ষেপ করেছিলেন ঃ 'তাঁর মুখে তাঁর নিজের কবিতা পাঠ আমি কখনো শুনিনি। যদিও শুনেছি ইদানিং তরুণদের কাছে তাঁর সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল।' 'কবিতা ভবন'-এর উদ্যোগে এক সময় নিয়মিত পাক্ষিক কবিতা পাঠের আসর বসত বুদ্ধদেবের ফ্লাটে, অনেকেই আসতেন, জীবনানন্দ একবার অকস্মাৎ উপস্থিত হয়েছিলেন, কিন্তু 'তিনি এসেই বললেন তাঁর দাঁত-ব্যথা', বুদ্ধদেব জানাচ্ছেন, 'আমরা অনেক সাধ্যসাধনা করেও তাঁকে দিয়ে একটা ছোটো কবিতাও পড়াতে পারলাম না'—'আমার দাঁত-ব্যথা, বড্ড দাঁত ব্যথা' বলতে বলতে গালে হাত চেপে তাঁর চিরাচরিত শশক পদক্ষেপে উঠে চলে গেলেন।' সিনেট হাউসের জনসভায় সেই জীবনানন্দই মাইক্রোফোনের সামনে দাঁড়িয়ে কবিতা পড়েছিলেন, দূর দেশে এই খবর পেয়ে চমৎকৃত হয়েছিলেন বুদ্ধদেব। এবং দুঃখিত কেননা তাঁর ভাগ্যে তা শোনার সুযোগ হয়নি বলে।

জীবিতবস্থায় বুদ্ধদেবের এই হয়তো অচরিতার্থ আকাঙ্ক্ষাগুলির মধ্যে একটি, যা তাঁর জীবনের অন্তিম স্মৃতিচারণ, 'আমাদের কবিতাভবন' শীর্ষক রচনার সর্বশেষ প্রসঙ্গ হিসেবেই উত্থাপিত হয়েছিল।

জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে 'কবিতা' পত্রিকার 'জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যায়' (১৩৬১) বুদ্ধদেব, 'জীবনানন্দ দাশ'—শীর্ষক রচনাটিতে কবির সামগ্রিক এবং দীর্ঘ মূল্যায়ণ করেন। অপ্রকাশিত আটটি কবিতার পাঠান্তর ও জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপি প্রসঙ্গে তাঁর মন্তব্যও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। পরবর্তীকালে দেখা যায়, ভিন্নতর গদ্য রচনাতেও জীবনানন্দ প্রসঙ্গ বার বার উঠেছে বুদ্ধদেবের কলমে, বিশেষত বছর ছয়েক পরে যখন সুধীন্দ্রনাথ মারা গেলেন, তাঁর বিয়োগ ব্যথায় শোকস্তব্ধ বুদ্ধদেব যে দীর্ঘ রচনাটি লিখলেন, সেখানেও সুধীন্দ্রনাথের পাশে জীবনানন্দের জীবন ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ে সমকালীন এই দুই মৃত কবির পারস্পরিক ব্যবধানের প্রসঙ্গ।

...'আর আমার যৌবনকালের সহযোগী বন্ধুদের মধ্যে শুধু তাঁরই সঙ্গে—আমার দেখাশোনাও হয়েছে—অবিচ্ছিন্নভাবে, অনেক মাস বা দু এক বছর বাদ দিয়ে দিয়ে, খুব অল্প সময়ের জন্য, চিঠি লিখতেন সংক্ষেপে, শুধু কাজের কথা।' স্বাভাবিক ভাবে আমাদের জানতে ইচ্ছে করে, 'সম্পূর্ণ নিজের জন্যে গুটোনো' এই মানুষটি, সম্পাদক বুদ্ধদেবকে কিভাবে চিঠি লিখতেন, সেই স্বভাব-সংকোচের নমুনাটুকু হয়তো আমাদের পক্ষে দেখার সুযোগ হবে না, বুদ্ধদেব নিজেও জানিয়েছেন সেইসব চিঠি খুইয়েছেন তিনি। কিন্তু জীবনানন্দকে লেখা বুদ্ধদেবের চিঠি? তার কিছু নিশ্চয়ই জীবনানন্দের সংগ্রহে থেকে যাওয়া স্বাভাবিক, যেগুলি ভবিষ্যতে আবিষ্কৃত হলে, আমরা এই পত্র বিনিময়ের ঐতিহাসিক গুরুত্বের সঙ্গে পরিচিত হতে পারব।

'কল্লোল'-এর সময়, জীবনানন্দকে মাত্র দু-বার দেখেছেন বুদ্ধদেব, অথচ সেই সাক্ষাৎকারের কেন্দ্রস্থল 'কল্লোল' কার্যালয় নয়, এক বিকেলে অচিন্ত্যকুমারের সঙ্গে বুদ্ধদেব, প্রেসিডেন্সি বোর্ডিং-এর তেতলায় বা চারতলায় আরোহন করেছিলেন, জীবনানন্দ তখন ঘরেও ছিলেন, কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁকে নিয়ে কোথাও বেরোনোর ইচ্ছাটি পূরণ হয় নি। আর একদিন কয়েকজন বন্ধু, নিঃসঙ্গ পথচারী জীবনানন্দকে 'কল্লোল' দলের প্রিয় রেঁস্তোরা বৌবাজারের মোড়ে ইন্দো-বর্মার পথে অনুসরণ করতে করতে ধরে ফেলেছিলেন, যদিও জীবনানন্দের গন্তব্যও 'ইন্দো-বর্মা', কিন্তু জীবনানন্দ বসলেন আলাদা টেবিলে, আহারের পরেই হলেন অন্তর্হিত। বহুকাল পরে তাঁরা যখন দু-জনেই বালীগঞ্জের বাসিন্দা, তখনও প্রায় সাদার্ণ অ্যাভিন্যুর ফুটপাতে দেখা হতো, কিন্তু দেখা হলেই অপ্রস্তুত বোধ করতেন। জীবনানন্দের স্বভাবের এই 'দূরতিক্রম্য দূরত্ব'—'যে অতি লৌকিক আবহাওয়া তাঁর কবিতার, তাই যেন মানুষটিকেও ঘিরে থাকতো সব সময়'—ব্যক্তিগত জীবনে বুদ্ধদেব তা অতিক্রম করতে পারেন নি, অথচ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পর্যায় থেকে মৃত্যুকাল পর্যন্ত তাঁর কবি জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন তিনি।

বুদ্ধদেব বিষয়ে জীবনানন্দ লিখছেন যৎসামান্য 'উত্তররৈবিক বাংলা কাব্য' পর্যালোচনা করতে গিয়ে, কিংবা কবিতার আত্মা ও শরীর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে নাম না উল্লেখ করেও 'কঙ্কাবতী'র একটি অংশ উদ্ধৃত করে। আর এ ঘটনা অত্যন্ত লক্ষণীয় যে জীবনানন্দ তাঁর সমকালীন কবিদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধদেবের 'কঙ্কাবতী' নিয়ে 'কবিতা'য় (পৌষ ১৩৪৪) দীর্ঘ আলোচনা লিখেছিলেন; নিজের ভালোলাগা এবং না-ভালোলাগার বিশ্লেষণ করে উপসংহারে জানিয়েছিলেন :

> 'বুদ্ধদেব অনেকদিন থেকে কবিতা লিখছেন। কঙ্কাবতী ছাড়া কবিতার বই আগেও আরো প্রকাশ করেছেন। কিন্তু শুধু এই বইটির ভিতরেই নিহিত রইল তাঁর কবি-যশ ; এর রস পান করে বুঝতে পারলাম আধুনিক বাংলা সাহিত্যে তিনি একজন প্রধান কবি ; প্রধানদের ভিতর অন্যতম ; তাঁর 'কঙ্কাবতী' অবশ্যম্ভাবী পিপাসা জাগিয়ে গভীর পরিতৃপ্তি-কুহক নিয়ে এসেছে।'

বাংলা কবিতার ধারাবাহিকতার তাঁর নিজের কাব্যধারার সংযোগের কথা লিখতে গিয়ে কোনো অনামা ব্যক্তিকে চিঠিতে জীবনানন্দ জানিয়েছিলেন ঃ

> 'বুদ্ধদেব বসুর 'প্রগতি' এল নতুন সম্ভাবনা ও উৎসাহ নিয়ে। ব্যক্তিগত ভাবে প্রগতি ও বুদ্ধদেব বসুর কাছে আমার কবিতা ঢের বেশি আশা নিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। সে কবিতাগুলো হয়তো বুদ্ধদেবের মতে আমার নিজের জগতের এবং তাঁরও পরিচিত পৃথিবীর বাইরে কোথাও নয় ...আমার কবিতার জন্য বড় স্থান দিয়েছিলেন তিনি প্রগতিতে এবং পরে কবিতার প্রথম দিক দিয়ে। তার পরে 'বনলতা সেন'—এর পরবর্তী কাব্যে আমি তাঁর পৃথিবীর অপরিচিত, আমার নিজেরও পৃথিবীর বাইরে চলে গেছি বলে মনে করেন তিনি।'

স্পষ্টত বোঝা যায়, উক্ত পত্রাংশের শেষ বাক্যটিতে জীবনানন্দ তাঁর গভীর অভিমানের কথা প্রকাশ করেছেন। এ অভিমান তাঁরই সবচেয়ে বড় সুহৃদ, প্রচারক, এবং ভক্তপাঠক বুদ্ধদেবের উদ্দেশ্যে। অথচ এ ঘটনা অনেকের কাছেই আজ অজানা, একটা সময় বুদ্ধদেব নিজে জীবনানন্দের কবিতার নতুন পটপরিবর্তনকে সহজে মেনে নিতে পারেন নি। 'মহাপৃথিবী' (১৯৪৪) প্রকাশের পর খুবই অসন্তুষ্ট এবং বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন বুদ্ধদেব, যে জন্য তীব্র ভাষায় আক্রমণ করে 'কবিতা'য় সম্পাদকীয় লিখতে দ্বিধা করেননি। 'মহাপৃথিবী'র প্রকাশকে সাদরে গ্রহণ করতে পারেন নি বলেই 'কবিতা'তে বু. ব. স্বাক্ষরিত একটি আলোচনা লিখেছিলেন যেন কিছুটা অবহেলায়, আরো কয়েকজন কবির সদ্য প্রকাশিত গদ্যগ্রন্থের সঙ্গে। আর জীবনানন্দের জীবিতাবস্থায় প্রকাশিত 'সাতটি তারার তিমির' (১৯৪৮) কাব্য গ্রন্থটিকেও বুদ্ধদেব সহজভাবে নেননি। লক্ষ্য করার বিষয় সেই কাব্য গ্রন্থটি আলোচনার দায়িত্ব দিয়েছিলেন তদানীন্তন তরুণতর অশোক মিত্রকে। উভয়ের দীর্ঘ বন্ধুতার ইতিহাসে, এই অধ্যায়টুকুই, কঠিন ভুল বোঝাবুঝির কয়েকটি বছর মাত্র, কিছুটা বিভ্রান্তির দেয়াল গড়ে তুলেছিল দু'জনের মাঝখানে। কিন্তু সে দেয়াল, নিছক দেয়ালই। তার তুলনায়, উভয়ের কাব্য জীবনের ইতিহাসে একজন কবি, আর অন্যজন তাঁর প্রচারক— এই পরিচিতি নিয়ে জীবনানন্দ ও বুদ্ধদেব আধুনিক বাংলা কবিতার সুদীর্ঘ পটভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন।

৩

বুদ্ধদেব তাঁর কবি-সুহৃদ সুধীন্দ্রনাথ দত্তে-র মৃত্যুর পরে যে শোক জ্ঞাপক নিবন্ধ লিখেছিলেন তাতে উপসংহার অংশে নিদারুণ বেদনার সঙ্গে তাঁর কালের অগ্রগণ্য জীবনানন্দের মৃত্যু স্মরণ করেছিলেন। 'আকস্মিক অকাল মৃত্যু দু-জনেরই' কিন্তু তাঁদের এই মৃত্যু মর্মান্তিক হওয়া সত্ত্বেও যেমন তাঁদের উভয়ের ব্যক্তিগত জীবন ও সাহিত্য ধারা পরস্পর বিরোধী। বুদ্ধদেব একটি চমৎকার উপমায় তাঁদের পার্থক্য ও পারস্পরিকতা চিহ্নিত করেছিলেন, 'এই দু-জন, পরস্পারের দিকে পিঠ ফিরিয়ে, স্থাপত্য-ক্ষোদিত অর্ধ-দেবতার মূর্তির মতো, আমাদের সমগ্র আধুনিক কবিতাকে ধারণ করে আছেন।' আজ

বুদ্ধদেব অনুপস্থিত, তাঁর মৃত্যুও আকস্মিক, কিন্তু জীবনানন্দের মৃত্যু সাহিত্য ও জীবনের সঙ্গে, সুধীন্দ্রনাথের স্থলে বুদ্ধদেব শব্দটি ব্যবহার করে সেই পুরাতন প্রতিতুলনাও ব্যবহার করা সম্ভব নয়। বরং আমাদের কল্পনায়, এমন দুই স্থাপত্যক্ষোদিতমূর্তির উপমা উদ্ভাসিত হতে পারে ; যদিও একই বেদীতে অধিষ্ঠিত তবু আদর্শ ও নির্মাণ পদ্ধতি দুই মূর্তির দু-রকম, দুই বিপরীতের দুর্লভ সমন্বয়। অথচ তাঁরা পরস্পরের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে আছেন যেন একই বেদীতে দুজনেরই প্রয়োজন ছিল একই সময়ে। যাঁদের কাব্যচর্চার দুই ধারা সমান্তরালভাবে বহে চলেছে, সেই আদি মুহূর্ত থেকেই একই নদীতে, দু-রকমের স্রোতের মতো কষ্টকল্পনীয়, তবু সত্য। বুদ্ধদেবের জীবন, জীবনানন্দের জীবনের মতো গোপন ও স্বল্পভাষী কিংবা নেপথ্যলালিত নয় ; আমরা জানি বাংলা কবিতার আধুনিকতা প্রতিষ্ঠিত করতে অনেক শ্রম করেছেন তিনি। পত্রিকা-চালনার মতো দুরূহ কাজে ব্যয় করতে হয়েছে অনেক মূল্যবান প্রহর, যেন একা থাকার উপায়ই ছিল না, যেন একান্ত নিজস্ব সময় বলে কিছুই নেই তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে। তাঁর সদাকর্মময় সাহিত্য জীবন মনে হয়, নির্জনতার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ।

জীবনানন্দের মৃত্যু পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা মোট ছটি মাত্র, এবং প্রত্যেকটিই কবিতার, আর বুদ্ধদেব এই সময়সীমায় অন্তত সর্বমোট নব্বইটির মতো গ্রন্থের লেখক (অন্যদের সঙ্গে লেখা গ্রন্থগুলি বাদ দিয়ে) উপন্যাস ছোটোগল্প কিংবা অনুবাদ ছাড়াও যেগুলির মধ্যে শুধুমাত্র কবিতার বইয়ের সংখ্যা বারো। নিছকই পরিমাণ বা সংখ্যার দিক থেকে উভয়ের প্রতিতুলনা অত্যন্ত অসঙ্গত, তবু শুধুমাত্র সাহিত্য সৃষ্টি নয়, সাহিত্য প্রকাশের ক্ষেত্রেও উভয়ের ভিন্নতার প্রসঙ্গে এই উল্লেখ। অন্য দিক থেকেও এই তুলনা আজকের দিনে অনেকটাই ব্যর্থ, কেননা মৃত্যুর পরে জীবনানন্দ শুধু কবি নন আর, তাঁর কথাসাহিত্য যদিও তা জীবিতাবস্থায় অপ্রকাশিত কিন্তু সংখ্যা ও রচনার গুণে সেগুলিও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। তাছাড়া আমরা জানি, বুদ্ধদেবকে তাঁর যৌবনের অধিকাংশ গল্প-উপন্যাসগুলি লিখতে হয়েছিল নিজের আর্থিক প্রয়োজনের কথা ভেবেই প্রকাশকদের বাণিজ্যিক সাফল্যের কথা ভেবে, কিন্তু জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাস পড়ে, এতদিন পরে সন্দেহ থাকে না, এক ভিন্নতর প্রেরণায় লিখতে চেয়েছিলেন তিনি সেগুলি, আত্মপ্রকাশের নিজস্ব আতত ক্ষেত্র আবিষ্কারের প্রয়োজন, বাণিজ্য সফলতার শতহাত ব্যবধান সম্পর্কে সচেতন হয়েই। তাই বিষয়ভাবনা, চরিত্রসৃষ্টি কিংবা ভাষানিরীক্ষার দিক থেকে সম্পূর্ণ পৃথক উভয়ের রচনা।

কবিতা নির্মাণের ক্ষেত্রেও দুজনের পথ প্রথম থেকেই ভিন্ন, বিষয়ের মিল, বলার ধরনের ভিন্নতায় পরস্পরের কবিতায় দু-রকম সুর বাজিয়েছে। নিঃসঙ্গতা, ক্লান্তি কিংবা যৌবনের আবেগতাড়িত অসহায়তার অভিজ্ঞতা এক নয় বলেই তাঁদের একজন কামনার অন্ধকারে একাকী, নিজের যৌবনকে অভিশাপ মনে হয় তাঁর। 'বন্দীর বন্দনা'র প্রথম কবিতার শেষ পংক্তিতে ঘোষিত হল ঃ

> অমাবস্যা-পূর্ণিমার পরিণয়ে আমি পুরোহিত।—
> লক্ষ্যভ্রষ্ট দেবশিশু আমি।

আর 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র কবি কণ্ঠে, প্রথম কবিতাতেই শোনা গেল আত্মপরিচয়ে অন্যরকম পুরোহিতের কথা ঃ

> আমি সেই পুরোহিত—সেই পুরোহিত!

যে-নক্ষত্র মরে যায়, তাহার বুকের শীত
লাগিতেছে আমার শরীরে,—

বলার অপেক্ষা রাখে না, প্রথম কবির কবিতায় যে একাকী যাবার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয় আমাদের, 'উচ্ছ্বসিত যৌবনের সিন্ধুতীরে' দেহের বন্ধন ছিঁড়ে যেতে চায় দেহের নীলিমার দিকেই। আর, দ্বিতীয় কবির নির্জনতার বোধে, তাঁর সকল গান যাকে লক্ষ্য করে, তাঁকে তিনি দেহের প্রান্তে কল্পনা করেননি, সমগ্র জগত নিয়েই যেন তার প্রাকৃতিক পটভূমি, 'যে-পৃথিবী জেগে আছে, তার ঘাস—আকাশ তোমার।' প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে, দিলীপকুমার রায়-এর অভিলাষ মতো 'বন্দীর বন্দনার' কিছু কবিতা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল, 'জলভরা ঘন মেঘের মতো, যার ভিতর থেকে সূর্যের আলোর রক্তরশ্মি বিচ্ছুরিত', এবং কবিতাগুলির ভিতর, 'সৃষ্টিছাড়া নূতনত্বের গলদঘর্ম প্রয়াস' দেখতে পাননি বলে নিশ্চিন্ত হয়ে ছিলেন গুরুদেব। এর বছর তিনেক আগে রবীন্দ্রনাথ, জীবনানন্দের প্রথম কাব্যগ্রন্থ পাঠের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে সংক্ষিপ্ত একটি পত্রে তরুণ কবির কবিত্বশক্তি নিঃসন্দেহে স্বীকার করার পরও প্রশ্ন করেছিলেন ভাষা প্রভৃতি নিয়ে এত জবরদস্তি কর কেন।' কিন্তু 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' পাঠ করে জীবনানন্দের কবিতায় পেলেন তিনটি জিনিস রস স্বকীয়তা, আর তাকিয়ে দেখার আনন্দ।

জীবিত অবস্থায় শেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থে, অন্ধকারের অভিজ্ঞতার দিকে মুখ করে উদ্বেল প্রশ্ন উঠেছিল জীবনানন্দের মনে 'তিমির হননে তবু অগ্রসর হয়ে। আমরা কি তিমির বিলাসী?' আর প্রায় সমসময়ে বুদ্ধদেবের কবিতায় নিজের কাছে প্রশ্ন 'যৌবনের বন্দনা আমার সে কি শুধু জননশক্তির পূজা? উভয়ের এই সমীচীন আত্মগত প্রশ্নের মাঝখানে চিরকালের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছে দুজনের মনন পার্থক্যের ভূমিকা।

উন্মেষ চিহ্নিত উভয়ের প্রাথমিক কাব্যগ্রন্থ দুটির কথা বাদ দিলেও বুদ্ধদেবের 'বন্দীর বন্দনা'র সঙ্গে জীবনানন্দ-র 'ধূসর পাণ্ডুলিপি'র প্রকাশ কালীন ব্যবধান বছর ছয়েক। কিন্তু গ্রন্থভুক্ত কবিতাগুলির রচনাকাল প্রায়ই একই সময় সীমায় চিহ্নিত। শুধু তাই নয়, কবিতাগুলির প্রকাশ বাহন পত্রপত্রিকাগুলিও প্রায় এক। তা সত্ত্বেও একথা অনস্বীকার্য, আবির্ভাব মুহূর্তেই নিন্দা ও প্রশংসা দু-ই অর্জন করেছেন বুদ্ধদেব, সেদিক থেকে তাঁর নাম বহুপ্রচারিত। হয়তো এই খ্যাতি ও অখ্যাতির বোধ তাঁর তীব্র ছিল বলেই, বুদ্ধদেব সহজে যোগ্য সমকালীনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হতে পেরেছিলেন, আর নিজে নিন্দিত হয়েছিলেন বলেই সহযাত্রীদের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রতিরোধ করা সাহিত্যিক কর্তব্য বলেই গ্রহণ করেছিলেন।

'ভয়ে ভয়ে কয়েকটি কথা' বলতে গিয়ে অশোক মিত্র 'কবিতা' পত্রিকায় বুদ্ধদেব বসুর সম্পাদকীয় গুণের অন্যতম কৃতিত্বের কথা প্রসঙ্গে বলেছিলেনঃ 'কবিতা পত্রিকার অভাবে বরিশালের কবি জীবনানন্দ হয়তো চুপচাপ কবিতা লিখে চুপচাপই তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখতেন, চিরকালের জন্য আমাদের অনুভবের অন্তরালে থেকে যেত।' একথা সত্য, জীবনানন্দের ব্যক্তি ও সাহিত্য জীবনে অগাধ উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলির মধ্যে, একটি অন্যতম ঘটনা তিনি, 'জীবনানন্দের দ্বারা অনবরত আন্দোলিত' বুদ্ধদেব বসুর মতো এমন একজন ভক্ত পাঠক, সম্পাদক, ও সমকালীন কবিকে পেয়েছিলেন, যাঁকে ছাড়া তাঁর মতো 'কবিতা ভিন্ন অন্য প্রায় সমস্ত বিষয়ে অকৃতী, ভীরু, সশঙ্ক, সংসর্গহীন, মনীষীমণ্ডলে অবহেলিত' কবির সাহিত্য জীবনের আলোচনা পূর্ণ হতে পারে না।

জীবনানন্দ দাশ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়

জ্যোতির্ময় দত্ত

একজনের মৃত্যুর আঘাত সামলে ওঠার আগেই অন্য জন মারা গেলেন; শুধুমাত্র মৃত্যুর তারিখে তাঁরা সন্নিকট; নিতান্ত অর্থহীন অযৌক্তিক এই সংযোগ। আর মৃত্যুতেও কি তাঁরা ভিন্ন নন? অকালমৃত্যু দুজনেরই, এবং কেউই সম্ভ্রান্ত, তৃপ্ত গৃহস্থের মতো সম্পত্তির নিপুণ ব্যবস্থা ক'রে, শুভাকাঙক্ষী স্বজনবর্গকে পরামর্শ ও সন্তপ্ত আত্মীয়গণকে শোকপ্রশমনের উপদেশ দিতে-দিতে পরলোকের উদ্দেশ্যে যাত্রারম্ভ করেন নি। এঁদের মৃত্যু কোনো শীতল প্রলেপ, শান্ত সমাধি, পরম সমাধান নয় ; এ হ'লো মুদ্গরের আঘাত, উৎপাটন, বিচ্ছেদ, যতি। কিন্তু এই নিষ্ঠুর মৃত্যু যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সুপরিকল্পিত। জৈন তীর্থংকর যেমন খাদ্য বর্জন করে নিজেকে ধীরে-ধীরে শুকিয়ে মারেন, তেমনি যেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর অস্ত্রে ধীরে-ধীরে বিষ সঞ্চয় ক'রে নিজেকে হত্যা করলেন। আর জীবনানন্দের মৃত্যু হ'লো অকস্মাৎ; এটুকু অন্তত বলা যাক যে এ-মৃত্যু এমনকি তিনিও আকাঙ্ক্ষা করেন নি। দলিত উদ্ভিদের মতো তিনি শুধু আঘাত গ্রহণ করলেন ; ল্যান্সডাউন রোডের মোড়ে মৃত্যু যখন তাঁকে আঘাত করলো, এই নিতান্ত নিরুদ্যম বোধসর্বস্ব কোমল মানুষটি সে-আঘাত সহ্য করলেন শুধু। জীবনানন্দ সারা জীবন পালন ক'রে গেলেন যেন কোনো-এক নিরভিমান বিধবার ব্রত। শুচিবায়ুগ্রস্ত সমাজের অত্যাচার, দারিদ্র্য, পাঠকসমাজের উপেক্ষা, সব-কিছু শুধু সহ্য ক'রে গেলেন; অথচ কোথাও একবিন্দু তিক্ততা রেখে গেলেন না। কোনোদিন কোনো তর্কে প্রবৃত্ত হন নি, বিদ্বেষ করেন নি কাউকে, শুনেছি ব্যক্তিগত জীবনে তিনি মঠবাসী সন্ন্যাসীর চেয়ে নির্লিপ্ত ছিলেন, যাবজ্জীবন দ্বীপান্তরিতের চাইতে সুদূর। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবন যেন এক তুমুল অগ্নিকান্ড। লোকসংসার দগ্ধ ক'রে যখন আর-কিছুই অবশিষ্ট রইলো না তখন তিনি নিজেকে আহুতি দিলেন।

একজন এমন লাজুক, সর্বদাই বিনয়ে ও আত্মসংশয়ে এমন আনত, সামাজিক আলাপে এমনি অক্ষম যে পরম হিতৈষী ভক্তের কাছেও তাঁর সঙ্গ ছিল শ্বাসরোধকর। আর অন্যজন অজস্র কথা বলতেন, অনায়াসে নিষ্ঠুর হ'তে পারতেন, সকলকে অবাক ক'রে দিতেন তাঁর সরল নির্লজ্জতায়। আগন্তুকের আক্রমণে পশু কিংবা ত্রস্ত শিশুর মতো নিজেকে আত্মগোপনের চেষ্টা করতেন জীবনানন্দ দাশ, আর বালকের মতো নির্ভয় ছিলেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

আকৃতিতেও ভিন্ন ছিলেন তাঁরা। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের গায়ের রং কালো, বাঙালীর পক্ষে তাঁর দৈর্ঘ্য লক্ষণীয়, বড়ো বড়ো পা জীর্ণ জুতোয় আবৃত। ঘরে ঢুকতেন তাড়া-খাওয়া জন্তুর মতো হুড়মুড় ক'রে। কেউ যে এমন ত্বরিতগতিতে এতো কিছু এমন অনায়াসে (এবং নিজের অজ্ঞাতসারে) সংঘটিত করতে পারেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের

প্রবেশ ও নির্গমন না দেখে থাকলে তা নাকি কল্পনা করা যায় না। আর জীবনানন্দের ভঙ্গি ছিল ভিতু, বড়ো-বড়ো চোখ সর্বদা বিস্ময়ে বিস্ফারিত: প্রশস্ত কিন্তু অলস তাঁর খর্বকায় শরীর।

ভিন্নতার তালিকা দীর্ঘতর করা সহজ কিন্তু নিষ্প্রয়োজন। একজন শেষ জীবনে সাহিত্যকে রাজনীতির প্রয়োজনে ব্যবহার করলেন, অন্যজন রাজনীতিকে সাহিত্যের। জীবনানন্দের অন্তিম কবিতাগুলিতে সমকালীন ঘটনার যতো উল্লেখ আছে, প্রথম দিকের কবিতায় তার শতাংশও নেই। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় শুধুমাত্র শেষ জীবনে একজন সাহিত্যিককে তাঁর উপন্যাসের নায়ক করলেন। কিন্তু এ-সাহিত্যিক যেকোনো গণপ্রচারসভায় সম্পাদককেও টেক্কা দিতে পারেন, তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থবুদ্ধি এমন টনটনে, তাঁর চিন্তা এমন বুলিসর্বস্ব। আর জীবনানন্দের রাজনীতি এক বায়বীয় লোকে সংঘটিত হয়; "স্তালিন-নেহেরু-ব্লক' মানুষ নন, প্রতীকও নন, শুধুমাত্র শব্দবিশেষ; এ-কালের রাস্তায় হাঁটলে এই সব সাইনবোর্ড চোখে পড়ে কিন্তু অনুপম ত্রিবেদী অথবা জীবনানন্দের হৃদয়ে এরা অর্ধসত্যের অধিক স্বীকৃতি পায় না।

কিন্তু এই নামগুলি ছাড়াও আরো আছে। হয়তো স্তালিন-নেহেরু শুধু নাম, "রিরংসা, অন্যায়, রক্ত, উৎকোচ, কানাঘুষো, ভয়" তাঁর হৃদয়ে সাড়া তোলে। শুধু সাড়া নয়; শেষ বয়সে এইগুলিই জীবনানন্দের প্রধান ভাবনা হ'য়ে উঠলো; যে-কবি অলস গ্রাম্য ভাঁড়ের মতো সব-কিছু ভুলে মদের পাত্রে, ঘুমে, মৃত্যুতে শান্তি খুঁজেছিলেন, তিনি "বাংলার তেরশ চুয়ান্ন সালে" এসে থমকে দাঁড়ালেন, প্রত্যক্ষ করলেন রক্তাক্ত পৃথিবীকে, উপায় খুঁজলেন পরিত্রাণের।

অবশ্য জীবনানন্দ যৌবনেও অনভিজ্ঞ ছিলেন না। তাঁর কবিতা প্রথম থেকেই এমন এক তীব্র বেদনায় ভরা যার নাম আমরা জানি না, শুধু যখন মাঝে-মাঝে "উটের গ্রীবার মতো" আমাদের মনের জানালায় হানা দেয় তখন তার প্রভাব অনুভব করি। সেই পরম বিষণ্ণ উট আবির্ভূত হ'লে দেহধারণ অসম্ভব হ'য়ে ওঠে। সে-বিষাদে কাতর হ'য়ে গ্রাম্য কবি মদের পাত্রে আরাম চেয়েছিলেন, ব্যথায় অবশ হ'য়ে লাশকাটা ঘরে শান্তি খুঁজেছিলো আর-একজন, আর যখন জৈব প্রেরণা এবং প্রবৃত্তির চাইতে চৈতন্যের ভার বেশি হ'য়ে গেলো, যখন "জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক' বেসামাল হ'য়ে উঠলো, তখন এমনকি চতুর অনুপম ত্রিবেদীরও মৃত্যু ছাড়া গতি রইলো না। আর যে কবি অনেক "রাজনীতি রুগ্ন নীতি মারী" প্রত্যক্ষ ক'রেও বিশ্বাস হারাননি কারণ তিনি বুদ্ধকেও স্বচক্ষে দেখেছিলেন, তিনি ১৩৫৪ সালে ঠেকে যেতে চান একই বেদনায় কাতর হ'য়ে। কবিমাত্রেই দূরদ্রষ্টা ও কোমলচিত্ত; তাই, কোনো বিস্মৃত অতীতে কিংবা দূর ভবিষ্যতে, দূরদেশের কোনো অচেনা ব্যক্তিও যদি আঘাত পান বা পেয়ে থাকেন তবে তিনিও আহত হবেন। বেঁচে থাকে তারা "যারা কিছুই সৃষ্টি করেনি", প্রতিদিন "তাদের আবিষ্কার মন শৃঙ্খলায় জেগে ওঠে কাজে।" বেঁচে থাকে নীচ প্রাণী, জেগে থাকে পেঁচা। অথচ আশ্চর্য এই যে অনুপম ত্রিবেদীদেরই শুধু মৃত্যু ঘটে; বিস্মৃতিপ্রার্থী কবির চেতনার জ্বালা জুড়োয় না, হৃদয়হীন প্রাণীদের সঙ্গে-সঙ্গে তিনি বেঁচেও থাকেন।

চল্লিশ বছর বয়সে জীবনানন্দ উপলব্ধি করলেন বেঁচে থাকার প্রেরণার সঙ্গে চৈতন্যের বিরোধ আছে। এ-বিরোধ প্রাচীন, এবং অলৌকিক মধ্যস্থতা বিনা এ-বিরোধের সমন্বয় প্রায় অসম্ভব। অর্জুনের অবশ হাত থেকে গাণ্ডীব খ'সে পড়েছিলো; দেবতা তাঁকে সাহায্য না-করলে আবার সে-ধনুক হাতে তুলে নেবার সাধ্য এমনকি তাঁরও ছিলো না। আর সেই

প্রেমিক কিশোর, বিবেকহীন সুন্দর গ্রীক দেবীগণ যাঁর ইন্দ্রিয়গুলিতে ভর করলেও যাঁর হৃদয় মৃত্যুকে ভুলতে পারেনি, সেই কীটস বেঁচে থাকার জন্য কতো কৌশলই না অবলম্বন করেছিলেন! আলস্য, বিস্মৃতি, সৌন্দর্য— নিশ্চতনায় অন্তত নিশ্চিন্ত করুক, ভুলিয়ে দিক তাঁর ভ্রাতার মৃত্যু, তাঁর নিজের অচিকিৎস্য ব্যাধি, তাঁর অতৃপ্ত প্রেমের তীব্রতা। কীটস মাত্র কয়েক মুহূর্তের জন্য প্রেমকে পরিপূর্ণ, জীবনকে অনন্ত ও মৃত্যুকে উষ্ণরূপে দেখতে পেরেছিলেন। কিন্তু সে-মুহূর্ত ক্ষীণ। মহাকাব্যের প্রচেষ্টা তাঁর ব্যর্থ হ'লো, র'য়ে গেলো শুধু শান্তির আকুতি, সমাধানের আভাস। জীবনানন্দ যখন সমন্বয়সাধনে উদ্যোগী হলেন তখন তাঁর হাতে ছিলো দীর্ঘ পনেরো বছর, আর পাথেয় ছিলো পয়ার ছন্দ এবং প্রায় জন্তুদের মতো জাগ্রত ইন্দ্রিয়। জীবনানন্দ অস্থির থেকে অস্থিরতর হ'য়ে উঠলেন। শেষ যৌবনে দেখেছিলেন অভিভূত চাষা ডিনামাইটের স্তূপের উপর ব'সে পৃথিবীর অনাদি তামাসা দেখছে; দেখেছিলেন গাঢ় থেকে গাঢ়তর অন্ধকারে পৃথিবী প্রবেশ করছে। কিন্তু তখনো অত্যন্ত বেশী বিচলিত হননি; "আবহমান" কবিতাটির অন্তত প্রথম অংশে মিলগুলি পংক্তির শেষে বসানো, আর ত্রিলোকধ্বংসের ছবিও ("বাঙ্গের আতাফল মারীগুটিকার মতো পেকে'...) কেমন ঘরোয়া। কিন্তু ক্রমে তিনি অধৈর্য হ'য়ে উঠলেন, অনুপম ত্রিবেদীর মৃত্যুর পর আত্মসংবরণ পীড়াদায়ক মনে হ'লো। এর পরের কবিতা কবিতার খোসায় মোড়া ইতিহাস, দূরদর্শন, চৈতন্যহরণী শিকড়, নির্বিবেককরণী বটিকা, আশাসঞ্জীবনী সুরা, সান্ত্বনা, সেবা। একযোগে সব-কিছু হ'য়ে উঠলো, কবিতা নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু উদ্দেশ্য হয়তো কবিতার চাইতেও মহৎ। ধীর এবং আত্মবিশ্বাসী কোনো সদাপ্রসন্ন চিকিৎসক তাঁর প্রাণপ্রিয় কাউকে অচিকিৎস্য এবং অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক কোনো ব্যাধির দ্বারা কবলিত জেনে হঠাৎ শোকে অধীর এবং যুক্তিহীন আশায় উন্মত্ত হ'য়ে উঠতে পারেন, যেমন হঠাৎ তিনি তাঁর এতকালের আশ্রয়, তাঁর প্রিয় চিকিৎসা শাস্ত্রে সংশয়ী হ'য়ে বিশ্বাস করতে পারেন স্বপ্নাদ্য ভেষজ বা গুরুপ্রদত্ত মাদুলিই ভালো, বুদ্ধিকে জলাঞ্জলি দিয়ে সহজ মন্ত্রোচ্চারণে যেমন তিনি আত্মসমর্পণ করতে পারেন, তেমনি জীবনানন্দও এক সময় শোকে ব্যাকুল হ'য়ে কবিতাকে পরিহার করতে উদ্যত হয়েছিলেন।

"পুতুলনাচের ইতিকথা"তেও মানুষেরা শুধু অভ্যাসে সচল। যে-মানুষ জীবনকে মায়া বলে মনে করেন এমনকি তিনিও মৃত্যুকে ভয় পান; শুধু তিনি নন, আমরা সবাই অন্ধকার পথে লাঠি ঠুকে-ঠুকে চলি। এবং এমনকি আত্মহত্যাও মানুষের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। অসহায় মানুষের সেই একটিমাত্র স্বেচ্ছাচার, স্বভাবকে পরাজিত করবার তার সেই একমাত্র উপায়কে নিষ্ঠুর লেখক কেড়ে নিলেন। "পুতুলনাচের ইতিকথা"য় এক অন্ধ শক্তি যাদবের নিজের ও তাঁর ভক্তদের মন অধিকার করলো। সে-শক্তির বাহন গুজব, খাদ্য মানুষের মন, ক্ষুধা অপরিমেয়। সারা গ্রাম, এমনকি সরকারি কর্মচারী ও শশী ডাক্তার, এক দুর্বার প্লাবনে ভেসে গেলেন। এই যুগ্ম-আত্মহত্যা, এই হৃদয়হীন, নাস্তিক মৃত্যু ও পরম সতীদাহ রোধ করে সাধ্য কার? সারা পৃথিবীর সাহিত্যে যাদবের আত্মহত্যার মতো নিষ্ঠুর, রোমাঞ্চকর ও বিশ্বাসনাশক ঘটনা বিরল। "The Possessed" উপন্যাসে ডস্টয়েভস্কি শাটভকে হত্যা করেছিলেন, তার প্রেমকে করেন নি; কিরিলভকে হত্যা করেছিলেন, তার দেবদুর্লভ ইচ্ছাশক্তিকে নয়। শাটভ ও কিরিলভ ঋষি, দেবদূত বা দেবতার চেয়েও গৌরবময়। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষকে তার চৈতন্যের অধিকারটুকুও দিলেন না। এবং শুধু মৃত্যু নয়, জন্ম ও জীবনকেও তিনি সেই অন্ধ পশুশক্তির প্রকারান্তর ব'লে চিত্রিত করলেন। যামিনী কবিরাজের বউ যে শিশুকে গর্ভে ধারণ করলো তাও তো তার কুড়িয়ে-

পাওয়া—যেমন সে কুড়িয়ে পেয়েছিলো শ্রীনাথের মেয়ের হারানো পুতুল। বেঁচেই বা ছিলো কেন? সৌন্দর্য তার হরণ করে নিয়ে গেলো রোগে, তবু দেখা গেলো গোপাল তার কাছে ফিরে এসেছে জৈব প্রয়োজনে, এমনকি প্রেম এ-জগতে বিকশিত ও বিনষ্ট হয় কোনো সচেতন শক্তির ইচ্ছায় নয়; উদ্ভিদের মতো মানুষের ঋতুসমাগমে অঙ্কুরোদাম হয়, প্রেম নামক সেই ঋতু প্রাণ মুকুল বসন্তে যেমন বিকশিত হয় কাল অতীত হ'লে ঝরেও যায়। শুধু কি প্রেম? মানুষের চেতনা যেন এক ছাঁকুনি মাত্র, কোনো-এক আদিম কটাহ থেকে উত্থিত কালো ধোঁয়া তাতে শোধিক হ'য়ে বাইরে নির্গত হয়। এক নিশ্চেতন শক্তির আলোড়নে যে-সব তরঙ্গের সৃষ্টি হয় তা আমাদের মনের তটে আছড়ে পড়ে, আমাদের হৃদয়েও কম্পন ওঠে। সে-কম্পনকেই কখনো সাধ ক'রে বলি প্রেম, কখনো সভয়ে চিনি বৈনাশিক ব'লে। হিংসা অথবা লুপ্তির আকাঙ্ক্ষা, প্রেম কিংবা বেঁচে থাকার সাধ—সবই আমাদের নাগালের বাইরে। আর, এই নিশ্চেতন নিষ্ঠুরতা দেখে আমরা যতটা বিচলিত হই, তার চেয়ে অবাক হয়ে গেছেন তিনি, আত্মগোপন করেছেন এমন এক সুদূর লোকে যে মনে হয় তাঁর কল্পনার শিশুদের চীৎকার সেখানে তাঁকে স্পর্শ করছে না ; তাঁর উপন্যাস যেন স্বতই গড়িয়ে চলে তাঁর সাহায্য বিনা। কেমন বাস্তব, নিস্পৃহ, নৈর্ব্যক্তিক তাঁর লেখার ভঙ্গি। "পুতুলনাচের ইতিকথা"র ঢংটি যেন লেখকের আত্মরক্ষার বর্ম, তিনি যে-জগৎ সৃষ্টি করেছেন তার দিকে বেশিক্ষণ তাকালে, তার সঙ্গে বেশি ঘনিষ্ঠ হ'লে তিনি উন্মাদ হ'য়ে যাবেন। আর বেঁচে থাকতে হ'লে ভুলে থাকার কৌশল আয়ত্ত করতে হবে, শশী ডাক্তারের মতো ধীরে-ধীরে ক্ষ'য়ে যাবে প্রেম, পৃথিবীকে বদলাবার ইচ্ছা, কল্পনা, মনুষ্যত্ব। উপন্যাসেব গোড়ায় বজ্রাহত মানুষটির মৃত্যুতে শশী যতটা বিচলিত হয়, যাদবের ইচ্ছামৃত্যুতেও ততটা হয় না। ক্রমে-ক্রমে কুসুমের প্রেম যেমন শুকিয়ে যায়, লেখকও উপন্যাস থেকে সজল, সরস ও প্রাণবন্ত সব-কিছু শুষে নেন। তা না-হ'লে কি আমরা শশী ডাক্তারের পরাজয় স্বীকার ক'রে নিতে পারতাম? না পারতেন লেখক স্বয়ং? অথচ পাঠকও মানুষ মাত্র, যখন জীবন শুধুমাত্র বেঁচে থাকার অভ্যাস ব'লে মনে হ'তে থাকে তখন ইচ্ছা করে লেখক অন্তত একবারের জন্য নির্বিকার দ্রষ্টার পদ ত্যাগ ক'রে ব্যথিত মানুষ হ'য়ে উঠুন। এবং ঈশ্বরের মতো, নিষ্ঠুর লেখকও কি এক সময় তাঁর নিজের জগৎ অবলোকন ক'রে স্তম্ভিত হ'য়ে যান নি? তাঁর কুসুম, পশুদের মতো সরল, চৈতন্যের ক্লেদ ও ভার থেকে মুক্ত, স্বভাব-সর্বস্ব নিষ্পাপ কুসুম যখন নিজেকে শশীর কাছে দান করলো তখন কে যেন ব'লে ওঠে : কুসুম, কুসুম, তোমার কি শুধু শরীর আছে, মন নেই? কুসুমকে, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিষ্ঠুর, নিশ্চেতন জগৎকে, এ-প্রশ্ন কে করে? শশী? উপন্যাসে স্পষ্ট কোনো ইঙ্গিত নেই, তবু বোঝা যায় বক্তা শশী নয়। আমাদের রুদ্ধ মনের আক্ষেপে এই একবারের জন্য যোগ দেন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় এবং জীবনানন্দ দুজনেই যৌবনে এমন জগৎ সৃষ্টি করেছিলেন যা সত্য হ'তে পারে, কিন্তু সহনীয় নয়। মানুষকে প্রকৃতি এমন দুর্বল ক'রে গড়েছেন, এমন ক্ষীণ তার ইন্দ্রিয়, এমন কাতর তার শরীর যে এমনকি জড়-প্রকৃতির কতটুকু সে অনুভব করতে পারে? আমাদের শরীর যতটা গ্রহণ করে, বর্জন করে তার চেয়ে বেশি, আমাদের হৃদয় ভুলে থাকে যতটা, অনুভব করে তার ক্ষীণাংশ; আমরা তৃপ্তিতে বেঁচে থাকি আমাদের অন্ধতার সুযোগে। আমাদের প্রত্যেকের মৃত্যু আসন্ন, অর্বুদ শতক আগে নির্বাপিত নক্ষত্রেব প্রেত প্রতি রাত্রে আকাশে হানা দিচ্ছে, কাল প্রাণীগণকে ব্রহ্মাণ্ডরূপ কটাহে ক্রমাগত রন্ধন করছে, তবু আমরা ফুর্তিতে মেতে আছি বিস্মরণ নামক সব-জ্বালা-

জুড়োনো প্রলেপের সাহায্যে। জীবনানন্দ আমাদের ইন্দ্রিয়গুলিকে সজাগ করলেন; এমনকি কমলালেবুর মধ্যে বধ্য পশুর প্রাণ ভ'রে দিলেন; হরিণীকে দিলেন আর্ত প্রণয়িনীর হৃদয়। এর পর আমরা কী কৌশলে তাদের আর্তনাদ না-শোনার ভাণ করতে পারি? আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কেড়ে নিলেন প্রত্যেকের প্রাণ। জীবনানন্দের কল্পনায় সমস্ত প্রাণী ব্যথায় বিহ্বল, মোহ্যমান; যেমন গুবরেপোকার ডানা দেখা যায় না—এতো দ্রুত তার পাখার কম্পন—জীবনানন্দের প্রাণীরা তেমনি এমন তীব্র যন্ত্রণায় কাতর যে তাদের জড় ব'লে ভুল হয়। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুতুলগুলিকে জীবন্ত ব'লে মনে হ'লেও তাদের নাচায় কোনো-এক নিশ্চেতন শক্তি। বিপরীত এই দুই অভিজ্ঞান? আসলে বিপরীত নয়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাকৃতিক মানুষেরা জীবনানন্দের কবিতায় অন্য ছদ্মবেশে প্রবেশ করে। যে-মাছি "রক্ত ক্লেদ বসা থেকে উড়ে যায়," তিনজন ভিখিরি, সেই প্যাঁচা, এরা সবাই তো প্রকৃতির বিবেকহীন সন্তান। এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসের তুল্য এক জগৎ দর্শন ক'রেই তো জীবনানন্দের নায়কেরা ব্যথায় অবশ হ'য়ে জড় রূপ প্রাপ্ত হন। দুজনের মধ্যে তফাৎ শুধু এইটুকু যে শশীর মুক্তির আকুতিকে হৃদয়হীন সমাজ বিনষ্ট করলো; জীবনানন্দের কবিতায় হ'লে সে হয়তো হৃদয় হারাতো না, তার বদলে লাশকাটা ঘরে সঁপে দিতো তার প্রাণ।

এমন নিষ্ঠুর জগৎ যাঁরা সৃষ্টি করলেন তাঁদের চেয়ে সহৃদয় আর কোনো লেখক আমাদের ভাষায় লেখেন নি। শরৎচন্দ্রের সমবেদনা প্রধানত বালক ও স্ত্রীজাতির জন্য; তাঁর ব্যথার কারণ সামাজিক বা পারিবারিক দুর্যোগ, সে-দুর্যোগ দূর হ'লেই তাঁর উপন্যাসের চরিত্ররা সুখী গৃহস্থে পরিণত হয়। আর রবীন্দ্রনাথ বড়ো বেশি ঈশ্বরের পক্ষে; তিনি চরম আঘাতকেও পরম করুণা ব'লে মেনে নেন। তাঁর কল্পনায় ঈশ্বর মানুষের এমন ঘনিষ্ঠ যে যদি তার স্ত্রীপুত্রধন সবই যায়, তবু তার ঈশ্বর থাকেন। জীবনানন্দের বিষণ্ণ উট, নৈরাশ্যের, নিরীশ্বরের যে বার্তাবহ সে কখনো রবীন্দ্রনাথের জগতে হানা দেয় না।

সত্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্তের কবিতায় সে প্রবেশের চেষ্টা করে, কিন্তু সেখানে তার জান্তবতা লুপ্ত হয়, বুদ্ধির অ্যাসিডে ক্ষ'য়ে যায় তার বিকট গ্রীবা, অশোভন কুঁজ—সে পরিণত হয় এক বিদগ্ধ প্রাণীতে। জীবনানন্দ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়—এঁরা সুধীন্দ্রনাথের তুলনায় সরল নিষ্পাপ শিশুমাত্র। সুধীন্দ্রনাথ আবেগের চেয়ে শৃঙ্খলাকে, আত্মবিস্মৃতির চেয়ে নিজের উপর প্রভুত্বকে বেশি কাম্য ব'লে মনে করেন। তাঁর কবিতার যে-লক্ষণ আমাদের সবচেয়ে আগে চোখে পড়ে তা তাঁর অসামান্য নৈপুণ্য, মিলগুলির বিস্ময়কর অনিবার্যতা, মিলের সংখ্যা, অপ্রত্যাশিত শব্দের যথোচিত ব্যবহার। আর জীবনানন্দ করে-পরে ঝড়ে-নড়ে ধরনের মিলেই সন্তুষ্ট থাকেন; তাঁর শব্দসংখ্যা কী পরিমিত এবং অধিকাংশই দেশজ;—এবং সেই এক পয়ার ছাড়া আরকোন ছন্দ তিনি স্বস্তিতে ব্যবহার করেছিলেন? তাঁর কবিতা আমাদের মুগ্ধ যত না করে, দীর্ণ করে তার ঢের বেশি; তারিফ যত না করি, তার চেয়ে বেশি যন্ত্রণা পাই।

স্বভাবকবি বলতে যে-অর্বাচীন, উন্মাদ, বন্য প্রতিভার ছবি ভেসে ওঠে তা যতই অলীক হোক, এঁদের দুজনের সঙ্গে তার কিছু মিল আছে। পুরোপুরি মিল নয়,—কে কবে মাতৃগর্ভ থেকে মহান শিল্প সৃষ্টি করতে শুরু করেছে? শিক্ষা বিনা এমনকি সহজ অথবা স্বাধীন হওয়াও যায় না; স্বতঃস্ফূর্তির অভিনয়ও আসলে কৌশল; কৃষক-কবি সবচেয়ে বেশি প্রাচীনপন্থী—অর্থাৎ অ-স্বাভাবিক;—লোক-সাহিত্য কী অপরিবর্তনীয়—এবং সব দেশের লোকসাহিত্যই কেমন একই রকম,—সুতরাং গ্রামীন-শিল্পীর গতানুগতিকতা ছাড়া

গতি নেই। অন্য কবিদের মতো জীবনানন্দও শুধু ক্রমে-ক্রমে সহজ হ'তে শিখেছিলেন; "রৌদ্র ঝিলমিল মধ্য এশিয়ার নীল"-এর কৃত্রিমতা বর্জন করতে তাঁকেও শিখতে হয়েছিলো। "জননী" ও শিক্ষানবিশের লেখা উপন্যাস এবং যদিও জীবনানন্দের কবিতা প'ড়ে মনে হয় তিনি গুরুমন্ত্র বিনাই তাঁর কাব্যমার্গ বেছে নিয়েছিলেন, মনে হ'তে পারে কাউকে অনুকরণ না-ক'রেও তিনি সফলতা লাভ করেছিলেন, আসলে এমনকি তিনিও অন্যাকে অনুসরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। সুধীন্দ্রনাথ অনুকরণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথকে; তরুণ জীবনানন্দের উপর প্রভাব পড়েছিলো সত্যেন্দ্রনাথ ও নজরুল ইসলামের। সত্যেন্দ্রনাথের তরলতা ও অতিলালিত্য, বা নজরুলের স্বাস্থ্য ও উচ্ছ্বাসের সঙ্গে জীবনানন্দের কী মিল থাকতে পারে? কিন্তু অসম্ভব উৎস থেকে অভাবনীয় পুষ্টি সংগ্রহ করার ক্ষমতার নামই বোধ হয় প্রতিভা। এঁদের দুজনের মধ্যে যা স্থূলভাবে উপস্থিত তা জীবনানন্দ পরিশোধন করলেন—রূপান্তরিত করলেন মধ্যপ্রাচীকে, তার আপেল, আঙুর, নাসপাতি, তার নরম গালিচা আর সজল তরমুজ নিয়ে। সুধীন্দ্রনাথ বেছে নিলেন বুদ্ধিকে, সভ্যতাকে, রবীন্দ্রনাথকে, আর জীবনানন্দ বরণ করলেন দূরদ্রষ্টা সাধকের পথ। দুজনে যে দুই ভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন তার ইঙ্গিত লুকিয়ে আছে কবিতা সম্পর্কে তাঁদের দুই বিখ্যাত উক্তিতে : "সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি," এবং "মালার্মে-প্রবর্তিত কাব্যাদর্শই আমার অন্বিষ্ট; আমিও মানি যে কবিতার মুখ্য উপাদন শব্দ"। জীবনানন্দের উক্তিটি আক্ষরিক অর্থে এতই সত্য যে শুধু তা-ই বলা যদি জীবনানন্দের উদ্দেশ্য হ'তো তবে না-বলাই হয়তো ভালো ছিলো; আর সুধীন্দ্রনাথের ঘোষণাটিকে আমরা আক্ষরিক অর্থে নিতে পারি না, কেননা তাঁর কাব্যকলা স্পষ্টতই মালার্মে-পন্থী নয়। আসলে, জীবনানন্দ রোমান্টিক ধর্মের মূল বিশ্বাসটিকে প্রকাশ করেছিলেন—শিক্ষা নয়, প্রেরণা কবিতার জনক; কবিব্রত কেউ ইচ্ছে ক'রে গ্রহণ করে না, এক নিষ্ঠুর ডাকিনী কারো-কারো উপর ভর করে; কবিতায়, কবির নয়, সেই আশ্রয়ী প্রেতের স্বরূপ প্রকাশিত হয়। সকলেই কবি নয়, কেউ-কেউ কবি, কারণ কবিত্ব এক অযাচিত, অপ্রত্যাশিত, অপরিত্যাজ্য সৌভাগ্য; শিক্ষিত সবাই হতে পারে কিন্তু কবি শুধু তিনি, যাঁরা উপর দেবী ভর করেন। আর সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের মধ্যে প্রতীকীবাদের বুদ্ধিবিরোধী, এমনকি প্রতীকবিরোধী রূপটিকে উপেক্ষা করেছেন, তিনি ইচ্ছে ক'রে লক্ষ করেননি যে মালার্মের শব্দব্যবহার যথার্থ তো নয়ই, যথোচিত শব্দ যাতে ব্যবহার করতে না হয় তারই জন্য মালার্মের সব পরিশ্রম। সুধীন্দ্রনাথ মালার্মের মধ্যে সেই ঈশিত্ব আবিষ্কার করেছিলেন যা তিনিও কামনা করেন। প্রেরণানির্গত, অসংবরণীয়, অসংশোধিত কাব্যস্রোতের বাহক হ'তে তিনি চান না। নিপুণতা চেয়েছেন তিনি, চেয়েছেন "স্বায়ত্তশাসন", কবিতার উপর স্রষ্টার কর্তৃত্ব চেয়েছেন।

এই দুইজন সমবয়স্ক কবি (জীবনানন্দ বিশ শতকের এক বছর আগে জন্মেছিলেন—এক বছর পর সুধীন্দ্রনাথ) দুই বিপরীত আদর্শকে মূর্ত করলেন। জীবনানন্দ ব্লেক, হোল্ডারলীন, কীটস এবং ইয়েটস-এর মতো দিব্যদর্শী। সুধীন্দ্রনাথ কালিদাস ও হরেস, এবং ভালেরি-কল্পিত লা ফঁতেন-এর মতো সচেতন। যে-জীবনানন্দকে মনে হয় এত দিশি, তাঁর কাব্যের মূল কোন ভারতীয় কবির কবিতায় পাওয়া যাবে না; সত্যেন্দ্রনাথ এবং নজরুল ইসলামের কবিতাকে তিনি শুধু ব্যবহার করেছিলেন, তাঁদের অনুকরণ করেন নি। তাঁর আদর্শ সেই সব বিদেশী সাধক-কবি যাঁরা পরম নিপুণ, যাঁরা এক দীর্ঘ যদিও বেসরকারি ঐতিহ্যের বাহক, কিন্তু যাঁদের রচনার কৌশলই এমন যে মনে হয় তা রচিত

নয়, তা শুভক্ষণে প্রাপ্ত। আর সুধীন্দ্রনাথ, যাঁর ফরাশি-জর্মনে পারদর্শিতা বহুবিদিত, যাঁর প্রতীচী-প্রীতি শুধুমাত্র সাহিত্যে আবদ্ধ নয়, তাঁর ব্যক্তিগত জীবনেও যার প্রভাব লক্ষ করা যায়, যাঁর কাব্যের নায়িকা বিদেশিনী এবং কাব্যগুরু মালার্মে, তাঁর কবিতা একেবারেই ভারতীয় এবং তিনি স্বীকার করেছেন তাঁর কাব্য সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের দ্বারা প্রভাবিত।

তবুও জীবনানন্দ বিদেশ থেকে যতো কিছুই আহরণ ক'রে থাকুন, যতোই তিনি অনুকরণ করুন অপরকে, তাঁকে মনে হয় কোনো-কোনো বিষয়ে শিশুর মতো সরল, শিশুদের মতো অশিক্ষিত। এমন হ'তে পারে যে তাঁকে এতো নতুন, এ-রকম স্ব-প্রসূত মনে হবার কারণ এই যে তাঁর আদর্শ অপর কোনো ভারতীয় কবি নন—মহাভারত এবং কালিদাসের চিহ্নমাত্র নেই তাঁর কাব্যে—অথচ তাঁর সারল্য অভিনয় নয়। তিনি নিজেকে ঘোষণা করতে চাননি ব'লেই দেবী তাঁর মধ্য দিয়ে নিজেকে অতো সহজে প্রকাশ করতে পেরেছেন। এত স্বচ্ছ, এমন তিমিরভেদী তাঁর দৃষ্টি তার কারণ তিনি অহমিকাহীন। কত নিচু প্রাণী তাঁর কবিতায় প্রবেশ করেছে, কতো সূক্ষ্ম বস্তু, কতো ঘোর রহস্য হয়েছে উদ্ঘাটিত। তার কারণ তিনি শ্রদ্ধাভরে এমন কি মাছির চরণের প্রতি তার দৃষ্টি অবনত করেছিলেন। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তো চেতনাতে অন্য কোনো কিছুর বর্ষণ ধারণ করার জন্য সৃষ্ট পাত্রবিশেষ। তাঁর মধ্যে অহমিকা তো নেইই, মাঝে-মাঝে মনে হয় তাঁর বিনয়' প্রায় আত্মবিলোপকারী। এঁদের দুজনেরই শিল্পের মধ্যে মাঝে-মাঝে এমন এক মধুর বালক-মন প্রকাশ পায়, যা দেখে আমরা—বিদগ্ধ, সুরুচিকাতর, আত্মসচেতন পাঠকেরা—আত্মপ্রসাদ অনুভব করি। যখন জীবনানন্দ, কিংবা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, ফ্রয়েড ডারুইনের উল্লেখ করেন তখন স্পষ্টই বোঝা যায় নতুন পুতুল পেয়ে বালিকার মতো তাঁরা চমৎকৃত হচ্ছেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ধনী শ্রেণীর পারিবারিক জীবনের যে বর্ণনা দেন তা থেকে অনুমান করা যায় যে এ-জীবন তিনি জানেন না, কিন্তু খেলার ঘরে বন্দী শিশুর মতো তিনি দেয়ালের ওপারের জগৎকে ইচ্ছেমতো ভরিয়ে তুলছেন। জীবনানন্দের "সকলের আগে নিজে অথবা নিজের নিজের নেশন" মনে করিয়ে দেয় কোনো গ্রাম্য সাধকের বাচনভঙ্গি; যামিনী রায় যেমন মানুষজাতিকে বোঝাতে "হিউমন" ছাড়া অন্য কোনো শব্দ ব্যবহার করেন না, জীবনানন্দও "নেশন" শব্দটিকে যেন একটু আলাদা মূল্য দিয়েছিলেন, একটু বেশি ভারি ব'লে মনে করেছিলেন।

এঁদের এই সরলতাকে গ্রাম্যতা বলেও ভুল করা সম্ভব। এটুকু নিশ্চিত যে গ্রাম্য না হোক, এঁদের রচনার পরিবেশ বাংলা দেশের গ্রাম। জীবনানন্দের ধানসিড়ি নদী হয়তো বরিশালে নয়, হয়তো তা আসামে,—ভূগোলে পড়েছিলেন বা মানচিত্রে দেখেছিলেন শুধু—হয়তো তাঁর খেজুর-ছায়া সুমেরু-ম্যমি বাইবেল কিংবা ইতিহাসের বই থেকে আহৃত, কিন্তু স্পষ্টতই তিনি গ্রামকে (গ্রাম ঠিক নয়, গ্রামের গন্ডির বাইরের নির্জনতাকে) এমন কি রবীন্দ্রনাথের চেয়েও ভালো চিনতেন। এ-যুগের "ভদ্রমহিলা" অথবা চিরকালের নারীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয় সেই শাশ্বত বাংলা দেশে—রাত্রে কৃষক-পরিত্যক্ত নির্জন মাঠে। ত্রিলোকধ্বংসকেও তিনি প্রাদেশিক রূপ দিয়েছেন; যে-কবিতার নাম "পৃথিবীলোক" এবং বিশ্বের ইতিহাস ও পরিণতি যার বিষয়, সেখানেও প্রলয় আসে পদ্মার ছদ্মবেশে :

> দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে ;
> গ্রামপতনের শব্দ হয়।

আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের সার্থক উপন্যাস দুটির ঘটনাস্থল বাংলাদেশের গ্রাম:

এমন কি "জননী" নামক উপন্যাসেরও পরিবেশ গ্রাম্য—যদিও থিয়েটার ও ঘোড়ার গাড়ির উল্লেখ আছে।

এমন নয় যে ইংরেজের গড়া এই কলকাতাকে তাঁরা বাদ দিয়েছেন। কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের তো বটেই, জীবনানন্দের কলকাতাও এমন এক শহর যেখানে বড়ো রাস্তা নেই, শুধু গলি আছে। প্রধানত ভিখিরি, ইহুদি ও কাফ্রিদের অধ্যুষিত এই অবাস্তব, রোমাঞ্চকর নগর শুধু রাত্রিকালে জেগে ওঠে। সংখ্যায় যে-সব সম্প্রদায় নগণ্য, নগরীর প্রাণের সঙ্গে যাদের সংযোগ নেই, নগরীর বিপুল শরীরের ত্বকের উপর ব'সে যারা অন্ধকারে মশার মতো একটু উদ্বৃত্ত রক্ত পান ক'রে বেঁচে থাকে, তাদের দিয়ে জীবনানন্দ কলকাতা ভরিয়েছেন। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের কলকাতা বেকার, কেরানি ও সাম্যবাদীদের নগর, সেখানে যেন সারাক্ষণ সবাই রাস্তায় হাঁটছে। সমর সেনের কলকাতার বাসিন্দা নিরাশ বুদ্ধিজীবী। আর বুদ্ধদেব বসুর কলকাতায় কুকুরেরা রান্নাঘরের বাতাসে স্বর্গের স্বপ্ন দেখে; রহস্যময় সেই নগর, কিন্তু আমাদের অচেনা নয়। তাঁর কলকাতায় বসার ঘরও আছে, মসীজীবী বেতনভোগী নাগরিকেরা ট্রামের হাতলে ঝুলে দশটায় আপিশেও যায়। চেনা শহর মায়াময় হ'য়ে যায় সংগোপনে, নিভৃতে, কল্পনার প্রভাবে। বুদ্ধদেব বসুর জঞ্জাল-কুড়ুনিরাও পরম নিঃসঙ্গ; বসার ঘর পরিত্যক্ত হ'লে তবেই গৃহী স্বরূপ ধারণ করেন; ট্রামের হাতলে—শরীর যখন শত শরীরের সান্নিধ্যে ঘর্মাক্ত—তখনো মন সুদূর, নিঃসঙ্গ ও প্রবাসী। আর জীবনানন্দের নির্ধন, ভাবনাহীন সম্প্রদায় পশুদের মতো যূথচারী; তাদের প্রতি জীবনানন্দের আসক্তির প্রধান কারণ হ'লো তারা পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয় নি। বুদ্ধদেবের জঞ্জাল-কুরুনি নিঃসঙ্গ, ঈশ্বরকে তাই তার এতো প্রয়োজন। 'কল্লোল'-যুগের সেই চরিত্রহীন বাউন্ডুলে আজ প্রকৃতিকে পরিত্যাগ করেছেন; সেই উচ্ছৃঙ্খল শব্দবিলাসী যুবক প্রৌঢ় বয়সে এমন এক নির্মম সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন যে এমন কি গৈরিকও তাঁর পক্ষে অতিরিক্ত রঙিন, প্রকৃতি খুব বেশি উত্তপ্ত, ক্যাকটাস-ও বড়ো বেশি লীলায়িত। রোমান্টিক ও ক্লাসিকালের সনাতন বৈপরীত্য যে কত অর্থহীন তার প্রমাণ এই যে সেই অতি-রোমান্টিক আজ অতি-ক্লাসিকাল। অথবা, এই উন্মত্ত সন্ন্যাস, এই নিদারুণ নিস্পৃহতা, এই তৃষ্ণার্ত বৈরাগ্যও আসলে তাঁর রোমান্টিকতারই ছদ্মবেশ। তিনি চান "মলের ভান্ড" থেকে "সম্ভাব্য ঈশ্বর"কে ছেঁকে তুলতে, মাংসের পচনক্রিয়াকেও এক আধ্যাত্মিক রসায়নে তিনি পরিণত করেছেন। তাঁর পতিতজন পাপাবোধক্ষম ধার্মিক; জীবনানন্দের লোল নিগ্রো প্রাকৃত। "বুড়ো এক গরিলার মতন বিশ্বাসে" সে হাসতে পারে, তার কারণ তার মনে পাপ-পুণ্যের স্থান নেই, আছে শুধু সুখ-দুঃখের। তার হৃদয় বেদনার দ্বারা দীর্ণ হ'তে পারে, পাপের স্পর্শে ক্লিন্ন হ'তে পারে না; সে বড়ো জোর শুধু সৎ, পুণ্যবান নয়। জীবনানন্দ উদার, সংবেদনশীল, এবং মানবপ্রেমিক; তাঁর চেতনায় ঈশ্বরের স্থান নেই, তিনি ভূলোকধর্মী। বুদ্ধদেব বসু কঠিন, ক্ষমাহীন, এমন কি নিপ্প্রেম; তিনি তাঁর দেবীর জন্য জগতের লোকে যাকে অন্যায় ব'লে মনে করে বোধ হয় তাও করতে পারেন; ঐহিক অর্থে তিনি সাধু নন। জগতের লোকের সুখবৃদ্ধি করতে তিনি চান না। বুদ্ধদেব বসু দুঃখকে, অসুখকে শুধু প্রয়োজনীয় নয়, কাম্য ব'লে মনে করেন। জীবনানন্দের অন্তিম কবিতাগুলিতে মানুষের দুঃখমোচনের জন্য এক তীব্র আকূতি লক্ষ করা যায়; বুদ্ধদেব বসুর সাম্প্রতিক কবিতা প'ড়ে কোনো মানবহিতৈষী, পরোপকারী, সমাজসংস্কারক সমালোচকের মনে হ'তে পারে তিনি দুঃখকে কোনো এক তীব্র মাদকদ্রব্যের মতো ব্যবহার করেন, মনে হ'তে পারে তাঁর ভোগী ইন্দ্রিয় এখন এমন এক তীব্র অনুভূতি, চরম উত্তেজনা

কামনা করে যা দুঃখ ছাড়া আর কিছু দিতে পারে না, মনে হ'তে পারে বুদ্ধদেব বসু এখন দুঃখবিলাসী।

জীবনানন্দের বয়স যখন চল্লিশের কাছাকাছি তখনও মাঝে-মাঝে তিনি ঐ লোল নিগ্রোটির মতো প্রাকৃতিক হবার প্রার্থনা করেছেন। তখনো "জড় ও অজড় ডায়ালেকটিক' বেসামাল হ'য়ে পড়েনি। তখনো তিনি ঘাসেদের নিশ্চিন্ত জীবন কাম্য ব'লে মনে করতেন। ঘাস-মাতার নিবিড় গর্ভে তিনি এমন এক উষ্ণ জীবন আবিষ্কার করেন যেখানে আত্মীয়তা আছে ঘনিষ্ঠতা আছে, কিন্তু সংগ্রাম নেই, বিচ্ছেদ নেই, প্রাণ আছে, আর্তি নেই, বৃদ্ধি আছে, মৃত্যু আছে, কিন্তু আত্মা নেই, নেই পরকাল। তখনো কেমন অনায়াসে সব-কিছু যোগ-বিয়োগ ক'রেও অঙ্কের শেষে বলতেপারতেন কলকাতা একদিন কল্লোলিনী তিলোত্তমা হবে। আর কোনো-কোনো গভীর হাওয়ার রাত্রে, যখন তাঁর সুখশয্যা তরণীতে পরিণত হ'তো, স্ফীত মশারির পাল তুলে তাঁর নিদ্রালু দেহ নভোমন্ডলে অভিযানে যেতো, তখন তিনি সর্বকালকে এক মুহূর্তে প্রত্যক্ষ করতে পারতেন। সে-মুহূর্তে ধ্বংস ও মৃত্যু ধারণ করতো এক মহান কলেবর, যা দেখে ভয় করে, কিন্তু পুলকও জাগে।

আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কোনো-এক সুখের মুহূর্তে "হলুদপোড়া" গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন। নাম-গল্পটিতে মানুষ কোনো-এক নৃশংস শক্তির ক্রীড়নক-মাত্র। কিন্তু তৃতীয় গল্পটিতে চৈতন্য জয়ী হ'লো। রমেন সচেতন কিন্তু আত্মসচেতন নয়; অপরের দুঃখকে সে অনুভব করতে পারে, নিজর দুঃখে সে তাই কাতর হয় না; "কিশোর সন্ন্যাসীর মতো সে একেবারে নির্বিকার থাকে তা নয়, ভালবাসা দেখালে শিশুর মতো খুশি হ'য়ে ওঠে কিন্তু গ'লে পড়ে না"; অপরেরা তাই তার "সহজ ও অকৃত্রিম আবেগের ধাক্কায়" প্রথমে যেমন বেসামাল হ'য়ে পড়েন, পরে পরিবর্তিতও হন। জীবনানন্দের মতো মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়েরও জীবনে অন্তত এক সময় ধনুকের ছিলা টান ছিলো। কিন্তু কী অল্প সময়ের জন্য। পরমাণুর মত্ত হৃদয়েও এক ক্ষীণ মুহূর্তের জন্য স্থিতি আসে, পরমুহূর্তেই ভাঙন শুরু হয়, হয় তাকে পরিবর্তিত হ'তে হয় অন্য কিছুতে, অন্য এক স্থিতাবস্থায়, অথবা সে বিনষ্ট হয়, পরিণত হয় অপর পরমাণুর দাসে। এঁদের দুজনের জীবনেও সংকটের এমনি মুহূর্ত এসেছিলো; ধনুকের ছিলা গিয়েছিলো ছিঁড়ে; আস্থা রাখা দুরূহ হ'য়ে উঠেছিলো; রচনার কৌশল পরিণত হয়েছিলো শুধুমাত্র অভ্যাসে।

কিন্তু তার আগে তাঁরা রচনা ক'রে গেলেন বাংলা ভাষার প্রথম আধুনিক কবিতা ও উপন্যাস। জীবনানন্দ উপমার পরিচিত সামান্যতার ধারণাকে ধ্বংস ক'রে দিলেন। বস্তুর মধ্যে অজ্ঞাত জীবন আবিষ্কার করলেন; ঘ্রাণ পরিণত হ'লো দৃশ্যে; ছবি পরিণত হ'লো স্পর্শে, স্পর্শ হ'য়ে গেলো ধ্যান। চিত্রকল্পের মধ্যে আচম্বিতে মিলিত হ'লো বিপরীত অভিজ্ঞতা; বিপরীত চিত্রের মধ্যে জন্ম নিলো নতুন বোধ। যেন তাঁর পাঁচটি নয়, সহস্র ইন্দ্রিয়। তাঁর শরীরে সবটুকু যেন কম্পমান স্নায়ু; তাঁর প্রত্যেক স্নায়ু শুধু যে উত্তাপ-শীতলতা, দুঃখ-হর্ষ বোধ করতে পারে তা-ই নয়, তারা যেন বিবেকবান। এবং সেই সহস্র ইন্দ্রিয় আমাদের জন্য আবিষ্কার করলো এমন এক চৈতন্যময় জগৎ যা নিতান্তই আমাদের কালের। আগেকার কবিতায় জগৎ ছিলো মানুষের সুখদুঃখের প্রতিবিম্ব, এখন মানুষ জগতের বিবেকে পরিণত হ'লো। আধুনিক কবিতা আবেগ এবং বুদ্ধির অতীত; জীবনানন্দ অতি-চেতনার কবিতা রচনা করলেন। প্রকৃতির মধ্যে যিনি শুধুমাত্র সৌন্দর্য নয়, দুঃখও আবিষ্কার করলেন, তিনি কী ক'রে আর নিছক নিসর্গ-কবিতা রচনা করবেন।

জীবনানন্দের পর থেকে বাংলা ভাষায় নিছক নিসর্গ কবিতা লুপ্ত হ'লো। আর নিছক প্রেমের কবিতাও। যাঁর দৃষ্টিতে প্রেম মৃত্যুর মতো সবকিছুতেই নিহিত আছে যাঁর অনুভবে জল, নদী, বিশ্বাস—যা-কিছু সিঞ্চিত করে, জন্ম দেয়, ভাসিয়ে নেয়—তা-ই নারী; যিনি স্বীকার করেন "ঘাস, রোদ, শিশিরের কণা/তারাও জাগিয়ে গেছে আমাদের শরীরের ভিতরে কামনা," তিনি কী ক'রে "এমন দিনে তারে বলা যায়" ধরনের প্রেমের কবিতা লিখবেন? আর নারী পরিণত হ'লো প্রকৃতির তীব্রতম, মদিরতম, উষ্ণতম, স্নিগ্ধতম জন্তুতে। সে "রক্তকরবী"র নন্দিনী নয়, কোনো মহান চিন্তার ফ্যাকাশে প্রতিমূর্তি নয়, সে নারী প্রকৃতির রূপক নয়, সে দ্বিতীয় প্রকৃতি। আর, তাঁর কবিতায় আলো আর অন্ধকার মিশে গেলো পরস্পরের মধ্যে, ঘুম আর জাগরণের ব্যবধান লুপ্ত হ'লো। বেঁচে থাকার সঙ্গে জড়িয়ে গেলো মৃত্যু। ভাবতে অবাক লাগে যে জীবনানন্দের আগে বাংলা কবিতায় আত্মহত্যা প্রবেশ করেনি। স্থির বিশ্বাসে আত্মদানের নিদর্শন প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যে আছে, কিন্তু আত্মহত্যার উদাহরণ নেই। এবং য়োরোপীয় সাহিত্যেও অকারণ আত্মহত্যা নতুন। জীবনানন্দের আগে সেই উট কি কোনো ভারতীয়কে আহ্বান করেনি? ডস্টয়েভস্কির আগে কোনো য়োরোপীয়কে?

মহাভারতেও আত্মহত্যার উল্লেখ আছে ঃ ভীষ্মের। কিন্তু সেই মহান মৃত্যু আত্মহত্যা নয়, আত্মবিজয়। বিশ্বসাহিত্যে আর কার মৃত্যু এমন পরিপূর্ণ, এমন সার্থক? আর আধুনিক বাংলা সাহিত্যেও ইচ্ছামৃত্যুর দৃষ্টান্ত আছে—যাদব ও তাঁর স্ত্রীর। এই যুগ্ম-আত্মহত্যার চিন্তা পাঠকদের অবশ ক'রে ফেলে; অকারণ, নিতান্ত অকারণ এঁদের আত্মহত্যা। এমনকি "আট বছর আগের একদিন"-এর নায়কের মৃত্যুও এক অকারণ নয়। তবু তো সে নিজে, সজ্ঞানে, তার মৃত্যু চেয়েছিলো। যাদব বা তাঁর স্ত্রী এ-মৃত্যু চাননি; অথচ পরিত্রাণের সুযোগ থাকা সত্ত্বেও ধরা দিলেন। যেন তাঁদের মনের অন্তরালে যে-সব সূক্ষ্ম তারে বা স্নায়ুতে জীবনশক্তি সঞ্চালিত হয় তা ছিঁড়ে গেছে। এক অন্ধ শক্তির কবলে এই ইচ্ছার হিত দম্পতি নিজেদের ছেড়ে দিলেন। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাসে, এবং গল্পে, এই প্রথম আমরা এমন শক্তির পরিচয় পাই যা খাদ্য বস্ত্র যৌন প্রয়োজন এর কোনোটাই নয়, যার অস্তিত্ব সম্পর্কে আমরা সচেতন নই, অথচ যা আমাদের সারাক্ষণ পরিচালিত করছে। অর্থাৎ, বুদ্ধির অগম্য যে-লোক তা তিনি আমাদের সামনে উদ্‌ঘাটিত করলেন।

উপন্যাসে এতোকাল ব্যাখ্যা ছিলো, ছিলো বর্ণনা, ছিলো ইতিহাস, বক্তৃতা, বিতর্ক। "পুতুলনাচের ইতিকথা"য় আছে চরিত্রের ও ঘটনার স্পষ্টতা, এমন স্পষ্টতা যা গাঢ় হ'তে-হ'তে পরিণত হয় অর্থের আভাসে ও সংকেতে। ভূতোর মৃত্যুর দিন যাদবের সঙ্গে শশীর দেখা—লাঠি ঠুকু-ঠুকে যাদব উপন্যাসে প্রবেশ করলেন। "লাঠি ঠুকিয়া যাদব পথ চলেন। শশী জানে এত জোরে লাঠির শব্দ করা সাপের জন্য। মরিতে যাদব কি ভয় পান—জীবন-মৃত্যু যাঁর কাছে সমান হইয়া গিয়াছে? অথবা শুধু সাপের কামড়ে মরিতে তাঁহার ভয়?" এটুক যথেষ্ট। মুহূর্তে আমরা বাকিটা দেখতে পাই। যে-অন্তরিন্দ্রিয় দিয়ে সেই প্রথম পরিচ্ছেদের শেয়ালটি দেখেছিলো, সেই রকম এক জান্তব বোধ পাঠকের মধ্যেও জাগ্রত হ'য়ে ওঠে।... "মরা শালিকের বাচ্চাটিকে মুখে করিয়া সামনের মাঠ দিয়া ছপছপ করিয়া পার হইয়া যাওয়ার সময় একটা শিয়াল বার বার মুখ ফিরাইয়া হারুকে দেখিয়া গেল। ওরা টের পায়। কেমন করিয়া টের পায় কে জানে!" পাঠক কী ক'রে টের পান তা তিনি স্পষ্ট বোঝেন না....লেখক তাঁর সংকেতগুলি এমন গোপনে শশীর ভাবনায় লুকিয়ে রেখেছেন। মরতে যাদব কি ভয় পান? পান, আবার পানও না। জীবন-মৃত্যু তাঁর

কাছে সমান, আবার সমানও নয়। সমান না-হ'লে তিনি কি নিজেকে ঐভাবে হত্যা করতেন—পলায়নের উপায় থাকা সত্ত্বেও? আবার সমানও নয়; মৃত্যুর মুহূর্তেও জনমতকে ভয় ক'রে গেলেন, সংসারীর চেয়েও তিনি মোহগ্রস্ত। সাপের কামড়ে ভয়? হয়তো। কিন্তু আফিম-নামক বিষেই তো তাঁর মৃত্যু, এবং স্বেচ্ছায় সে-বিষ তিনি পান করলেন। টোমাস মান্ হ'লে ইঙ্গিতটিকে আরো জটিল করতেন, বিস্তারিত করতেন, "পাগল দিদি" নামের অর্থময়তা আরো স্পষ্ট হ'তো। কিন্তু হয়তো এই ভালো, এমন সংগোপনে বিকশিত অর্থের সৌরভ তীব্রতর হ'লে আমরা তার মূলের সন্ধান করতাম, অজ্ঞাতকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করতাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা টোমাস মান্ কিংবা অন্য যে-কোনো আধুনিক ঔপন্যাসিকের রচনার মতো অতিপ্রাকৃত ব্যঞ্জনায় টইটুম্বর। শুধু তিনি তাঁদের মতো আত্মসচেতন নন। ধ্যানলব্ধ ছবির মধ্যে আরো কিছু ভ'রে দেবার তাঁর প্রয়াস নেই। টোমাস মানের উপন্যাসে দিব্যদৃষ্টি তো আছেই, আরো আছে বুদ্ধি, আছে আবহমান সাহিত্যের স্মৃতি। তাঁর উপন্যাস শুধু সাহিত্য নয়, খুব বেশি সাহিত্য। আর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখার মধ্যে কোনো সচেতন প্রয়াসই যেন নেই। মনে হয় যেন প্রকৃতির মতোই নিজের অজ্ঞাতে তিনি স্তরে-স্তরে এমন রত্ন রেখে গেছেন, এই আমাদের মতো বিচক্ষণ ভূতত্ত্ববিদ্ না-থাকলে বুঝি সে-ঐশ্বর্য অন্ধকারেই প'ড়ে থাকতো। যে-সব চিহ্ন দেখে কোনো আধুনিক লেখকের গুপ্ত ঐশ্বর্যের আমরা সন্ধান পাই, সে-সব ইঙ্গিত কোথায়? কোথায় সেই ব্যাকরণলঙ্ঘন, সেই আজগুবি "পরীক্ষা-নিরীক্ষা" যা দেখামাত্র এমনকি "পত্র-পত্রিকা"র সমালোচকেরা যে কোনো উপন্যাসকে অভিনব ব'লে চিনতে পারেন?

প্রথম পাঠে "পুতুল নাচের ইতিকথা"কে মনেই হয় না আধুনিক। অথচ এই উপন্যাস অন্য কোনো যুগে রচিত হ'তে পারতো না। আঠারো শতকের ইংরেজি উপন্যাসে কোনো-না-কোনো দার্শনিক বা নৈতিক প্রতিপাদ্য ছিল; উনিশ শতকের উপন্যাসে ধরা পড়েছে ব্যক্তি এবং সমাজের চরিত্র, স্বাভাবিকতা ছিলো সে-যুগের শিল্পীর চরম লক্ষ্য। আর বিশ শতকের গোড়ার দিকে ইংরেজ ঔপন্যাসিক (এবং এমন কি বুডেনব্রকস্-এর টোমাস মান্) রচনা করেছেন পুরুষানুক্রমিক ইতিহাস, ক্রমাবনতির পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা, বিভিন্ন যুগের দ্বন্দ্ব। বিশ শতকে গোড়ার দিকের উপন্যাস আসলে উনিশ শতকে রচিত হওয়া উচিত ছিলো। বিশ শতকে এসে উপন্যাস যেমন ছড়িয়ে পড়লো তেমনি আবার গুটিয়ে নিলো নিজেকে; তার বিষয় হ'লো একদিকে যেমন সারা ব্রহ্মাণ্ড, অন্য দিকে দিব্য দৃষ্টিতে দেখা, অন্তরিন্দ্রিয়ে পাওয়া অনির্বচনীয়, সূক্ষ্ম এক অভিজ্ঞান। চরিত্র নয়, ব্যক্তির অন্তস্থলে যে-রহস্যটি আছে; সমাজ নয়, সমাজের আদিতে যে-সংস্কার, প্রাণ, ধর্ম লুকিয়ে আছে, প্রকৃতি নয়, চেনা জগতের মর্মে যে-শক্তি আবদ্ধ আছে তা আত্মপ্রকাশ করলো আধুনিক উপন্যাসে। মানুষ ও পশু, যন্ত্র ও প্রকৃতির সংঘর্ষে মানুষ হারালো তার বিবেক, পরিণত হ'লো পশুতে; জন্তুরা হারালো তাদের পশুত্ব, হ'লো বিশুদ্ধ প্রাণী; আর প্রকৃতি তাঁর ভীরুতা থেকে মুক্ত হলেন, স্থূলত্ব হারালেন, তাঁর জড়ত্ব উবে গেলো। কোথায় গেলো আঠারো শতকের শিথিল, অগোছালো, নির্জীব প্রকৃতি? আর রোমান্টিকদের প্রিয় সেই সরল, স্নেহশীল প্রকৃতি? বিশ শতকে তিনি তাঁর মানবিক রূপ হারালেন; প্রকৃতি এখন নির্বিবেক, নিশ্চেতন, নির্মম। আরো পরিবর্তন হ'লো। এখনকার উপন্যাসে চরিত্রের বা ঘটনার, সমাজের বা প্রকৃতির ভিন্ন কোনো সত্তা নেই। লেখক আর চরিত্র উদ্ঘাটনের নিমিত্ত ঘটনার বর্ণনা করেন না, বিশাল সমাজের ছোটো আয়না হিশেবে ব্যবহার করেন

না ব্যক্তিচরিত্রকে, নায়কের মেজাজের প্রতিধ্বনি শোনেন না প্রকৃতির মধ্যে। যেমন ছবি শুধু রেখা নয়, রং নেই, ঘন-হালকা ছায়া-আলো নয়, তা যেমন এই সব-কিছু দিয়ে গড়া নতুন এক সত্তা, তেমনি এ-কালের উপন্যাসে চরিত্র, ঘটনা ও সমাজ পরস্পরে মিশে যায় সব মিলে তৈরি হয় এক পরিপূর্ণ ছবি। "পুতুল-নাচের ইতিকথা"য় গল্প নেই, অন্তত এমন গল্প নেই যা সংক্ষেপে মনোহরণ করতে পারে। আর চরিত্র? অসংখ্য চরিত্র,—জীবন্ত, স্বাভাবিক,—কিন্তু কোনো চরিত্রকেই আমাদের চোখের সামনে বেশিক্ষণ রাখা হয় না, তারা পরিপূর্ণরূপে বিকাশলাভ করার আগেই অপসৃত হয়, যেন লেখক তাঁর জগন্নাথের রথের তলার সবাইকেই বলি দিতে পারেন, যেন উপন্যাসের সম্মিলিত গতিকে যে-কোন চরিত্রের চাইতে বেশি মূল্যবান মনে করেন তিনি। এবং, উপন্যাসে বর্ণিত গ্রামের ভূগোল যদিও আমাদের কাছে স্পষ্ট—বাংলাদেশের সজলতায়, শ্যামলতায় যেন উপন্যাসটিও স্যাঁৎস্যাঁত করে, পড়তে-পড়তে পাঠক চোখের সামনে সবুজ ছাড়া অন্য কোনো রং দেখতে পান না—তবুও বিশেষ ক'রে নিসর্গশোভার বর্ণনা আছে সারা উপন্যাসে কয়েক লাইনমাত্র। বিভূতিভূষণ থেকে কত ভিন্ন তিনি! এবং তারাশঙ্করও তিনি নন। প্রকৃতি যেমন তাঁর উপন্যাসের বিষয় নয়, তেমনি গত যুগ এবং এ-যুগ, যামিনী কবিরাজ ও শশীর ডাক্তারি, যাদবের পঞ্জর-নির্মিত হাসপাতাল ও চরক-সুশ্রুতের বিরোধ তাঁকে আকৃষ্ট করে না। তাঁর উপন্যাস পড়লে অন্তত মুহূর্তের জন্য মনে হয় যে গলসওঅর্দি বা তারাশঙ্কর বর্ণিত বিরোধিতা মানুষে-মানুষে বিরোধ, আত্মীয়দের মধ্যে মনোমালিন্য ও জায়ে জায়ে কলহের মতো তা স্থানীয়, ক্ষণকালীন ও নগণ্য। কী বিপুল, নিষ্ঠুর, মীমাংসাহীন যুদ্ধের সঞ্জয় তিনি; সে-যুদ্ধ চিরকাল ধ'রে চ'লে এসেছে; হিম, জড়, স্থবির নক্ষত্র থেকে পরমাণুর হৃদয়ে দুরন্ত বিদ্যুৎপুঞ্জ পর্যন্ত সব-কিছু সে-যুদ্ধে লিপ্ত; জড়ত্বের সঙ্গে চৈতন্যের সে-অনাদি সংঘর্ষে কোনো পক্ষই পরাজিত হয় না—শশী যদিও হেরে যায়, লেখক তাকে কল্পনা ক'রেই প্রমাণ করেন চৈতন্য এখনো লুপ্ত হয় নি।

জীবনানন্দ এক সময়ে সেই সব মমতাবান মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন যারা "মরণের আগে মৃতদের জন্য" একটু আরামের ব্যবস্থা ক'রে দেন। তিনি লক্ষ করেছিলেন মৃতপ্রায় রোগীও বেঁচে থাকতে চায় "উজ্জ্বল সমাজে"র আশায়। কিন্তু শরীরের সব অভাব দূর হয়ে গেলেও মানুষের মনে সেই নিরীশ্বরের দূত হানা দিতে পারে। আর, পদ্মার তীরে প্লাবন যেমন আসে, সে-বন্যা নেমেও যায়; প্রচণ্ড ঝড়ের আয়ুও মাত্র এক রাত। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, প্রকৃতির কৃপণতা, সামাজিক অবিচার,—সবই মানুষের চেষ্টায় বদলাচ্ছে, সংশোধিত হচ্ছে। কিন্তু কোথায়, কবে, কী উপায়ে প্রশমিত হবে শোক? "পদ্মানদীর মাঝি"র যে-একটিমাত্র বাক্যকে মনে হয় লেখকের আপন কথা তাতে মানুষের হৃদয়ের এই দুর্বলতার উল্লেখ আছে। বন্যার জল যখন ক'মে এলো তখন সে যেন সংগোপনে নিঃশব্দে সংশয় প্রকাশ করে। এই কিছুক্ষণ আগেও তো প্লাবন ছিল দুর্জয়! আকাশ যখন বিরুদ্ধতা করে মানুষ তখন আত্মগোপন করবে কোথায়? প্রলয় নেমে এসেছিলো পদ্মার তীরে। সে-প্রলয় কি এত শীঘ্র দমিত হয়েছে?

কমে মাঠ ঘাটের জল।

ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কমিবে বই কি। একদিন মালার বড় ভাই অধর খবর লইতে আসে।

অকথিত সংশয়ের উত্তর দিতে গিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় মানুষের চৈতন্য সম্পর্কে এমন এক তথ্য প্রকাশ করলেন যার পর বন্যার প্রশমনের সংবাদেও আমরা সুখে অধীর

হ'য়ে যাই না। জীবনে সুখের কারণ নিশ্চয়ই আছে, মৃত্যু যেমন সত্য, তেমনি সত্য জন্ম। তবুও মানুষের চোখের জল শুকোয় না, তার কারণ যে-মানুষ মারা যায় সে আর ফিরে আসে না, যে-শিশু ভূমিষ্ঠ হয় তারও একদিন মৃত্যু হবে। এবং দুঃখ যেমন সুখের স্মৃতি এবং আশা মুছে ফেলতে পারে না—তা না-হ'লে কে আর প্রিয়জনের মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে পারতো?—তেমনি সুখই দুঃখের উর্বরতম ভূমি। জীবনানন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় "সৃষ্টির নাড়িতে হাত রেখে" টের পেয়েছিলেন "অসম্ভব বেদনার সাথে মিশে র'য়ে গেছে অমোঘ আমোদ;/তবু তারা করে নাকো পরস্পরের ঋণ শোধ"।

অথচ কয়েক বছরের মধ্যেই মনে হলো ঋণ শোধ হ'য়ে গেছে। জীবনানন্দ শেষ জীবনে এক নতুন শব্দের ব্যবহার শিখলেন : "তবু"। একটি কবিতার নাম "তবু"। কত কবিতা শেষ হয় "তবু" দিয়ে কতো কবিতার গতি বদলে যায় এই শব্দটির আকস্মিক আবির্ভাবে।

এযুগে কোথাও কোনো আলো নেই—কোনো কান্তিময় আলো
চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের ; নেই তো নিঃসৃত অন্ধকার
রাত্রির মায়ের মতো.................
তবুও মানুষ অন্ধ দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে
অন্ধকার হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের পানে
যে অনবনমনে চলছে আজো—তার হৃদয়ের
ভুলের পাপের উৎস অতিক্রম ক'রে চেতনার
বলয়ের নিজগুণ র'য়ে গেছে ব'লে মনে হয়।

(১৯৪৬-৪৭)

মানুষের মৃত্যু হ'লে তবুও মানব
থেকে যায়; অতীতের থেকে উঠে আজকের মানুষের কাছে
আরো ভালো—আরো স্থির দিকনির্ণয়ের মতো চেতনার
পরিমাপে নিয়ন্ত্রিত কাজে
কতোদূর অগ্রসর হ'য়ে গেল জেনে নিতে আসে।

('মানুষের মৃত্যু হ'লে)

চারিদিকে নীল নরকে প্রবেশ করার চাবি
অসীম স্বর্গ খুলে দিয়ে লক্ষ কোটি নরককীটের দাবি
জাগিয়ে তবু সে—কীট ধ্বংস করার মতো হ'য়ে
ইতিহাসের গভীরতর শক্তি ও প্রেম রয়েছে কিছু হয়তো হৃদয়ে।

('অনন্দা')

উদ্ধৃতির আধিক্যের কারণ আছে। শেষ জীবনে জীবনানন্দ যে শুধু "তবু"র অযৌক্তিক মায়ায় ভুলেছিলেন তা-ই নয়, তাঁর শেষ কবিতাগুলি যেন মোহাবেশে লেখা—এমন স্রোতের মতো শব্দগুলি ব'য়ে যায় যে মনে হয় লেখক বুঝি আত্মসমর্পণ করেছেন। তাঁর পুরোনো কবিতা ইন্দ্রিয়কে সিঞ্চিত ক'রে তবে পৌঁছতো বিবেকে, বুদ্ধিতে; তাঁর জাদুতে আমরা অবশ হতাম। এখন কেউ যেন তাঁকেই মোহিত করেছে, যেন এক ঘোরের মধ্যে লিখে চলেছিলেন তিনি। "অসীম স্বর্গ," "নীল নরক," "কান্তিময় আলো," "অন্ধদুর্দশা," "ইতিহাসের গভীরতর শক্তি"—এরকম সব শব্দের আঘাতে আমরা কাতর

হই। সেই কবি, যাঁর ঘ্রাণশক্তি ছিলো জন্তুর মতো, বাদুড়ের মতো জাগ্রত কান, মাছি এবং ইন্দ্রের মতো যাঁর সহস্র নয়ন, যাঁর ত্বক ধরণীর সূক্ষ্মতম স্পন্দন সাপের মতো গ্রহণ করতো, সেই উপমার সম্রাট চিত্রকল্পের জাদুকর, হঠাৎ কেমন যেন গরিব হ'য়ে গেলেন, জরা যেন আচ্ছন্ন করলো তাঁর ইন্দ্রিয়, স্নায়ুরা এমন দুর্বল হ'য়ে পড়লো যে শুধু শব্দ, অগণিত শব্দ প্রসব করতে শুরু করলেন তিনি। অবশ্য এখনো কোনো-কোনো পংক্তির স্পষ্টতায় চমকে উঠতে হয়, পাঠকের মন ভ'রে যায় গন্ধে, বর্ণে। "সেই রক্ত দেখে আঁশটে হৃদয়ে" (কী অতিপ্রাকৃত স্পষ্টতা ঐ অপ্রত্যাশিত বিশেষণে!) আমরা "জেগে উঠে দেখি" কে যেন (এঁ কে চিনি না, ইনি আমাদের সে-জীবনানন্দ নন) "ইতিহাসের অধম স্থূলতাকে ঘুচিয়ে দিতে জ্ঞান প্রতিভা আকাশ নক্ষত্রকে ডাকে।" আমরা লক্ষ করি "সাতটি তারার তিমিরে"ই যেন তিনি স্পষ্ট দেখতে পেতেন, "সময়সাগরের তীরে", অতিরিক্ত আলোয় সর্বকিছু ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছে বর্তমান জগৎ বেদনাদায়ক হ'তে পারে, কিন্তু তা ইন্দ্রিয়গোচর; আকাশকুসুম যতই সুন্দর হোক, তার রূপ মরচক্ষুতে কেউ দেখেনি। তাঁর পরিচিত জগৎকে তিনি অস্বীকার করলেন, কারণ তা এতো স্পষ্ট, এতো জীবন্ত ছিলো যে তাঁর ইন্দ্রিয়গুলিকে অনুভূতিতরঙ্গে তা প্লাবিত করতো, ব্যথা দিতো বিবেকে, বুদ্ধিকে করতো কাতর। এর পরিবর্তে, তিনি শুধুমাত্র ইচ্ছার দ্বারা আরেক জগৎ গড়ে তুলতে চাইলেন, কিন্তু সেই ঈপ্সিত জগৎ নিরুত্তাপ, নির্জীব, অশরীরী। আমরা বুঝি কেন তাঁর হৃদয় অনুভূতির এমন তীব্র বর্ষণে গ'লে গেলো, ভেঙে গেলো—সামান্য মানুষ আর কতটুকু সহ্য করতে পারে! কিন্তু আমাদের শরীরে আর সেই রোমাঞ্চ জাগে না, অভিভূত হয় না ইন্দ্রিয়।

আর আমাদের বুদ্ধিও নিরাশ হয়। কেন, আমরা প্রশ্ন করি, কেন তাঁকে অবিশ্বাস্য, অযৌক্তিক জোড়াতালি দিয়ে প্রত্যেক কবিতা শেষ করতেই হবে? এমনকি শিল্পীকুলচূড়ামণি ঈশ্বর তাঁর মানবজীবন-নামক মহৎ নাটক শেষ করেছেন নায়কের মৃত্যুতে; আমাদের কেন তবে প্রতি নাটককে কমেডিতে পরিণত করতেই হবে? মানুষের যে-শরীর আমরা চিনি তা রোগজীবাণুতে পূর্ণ, তার অন্ত্র কখনোই মলহীন হয় না। কোনো চিকিৎসকের যদি এমন বাসনা হয় যে তিনি তাঁর রোগীকে নির্মল করবেন, যদি তিনি মানুষের শরীরের শরীরত্ব অস্বীকার করেন, তবে বিশুদ্ধ প্রেতে পরিণত হবে তাঁর রোগী। যিনি পৃথিবীর অসম্পূর্ণতাকে সত্য ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে পারেন না, তিনি অন্ধ, তিনিই জীবনবিরোধী, তাঁরই জীবন-বোধ শিথিল। মিথ্যাভাষণ, অজ্ঞতা ইচ্ছাকৃত অন্ধত্ব—এরাই মৃত্যুর সহায়। যে-কবি সময়সাগরের পরপারে অবস্থিত এক বিশুদ্ধ জগতের ধ্যান করেন, "আগুনে-আলোয় জ্যোতির্ময়" এক লোকে "উত্তর প্রবেশ" করেছেন ব'লে প্রচার করেন, মানুষকে হিংস্র, লোভী, ভীত জেনেও বলেন তবু এ-সব সে নয়, তিনি তাঁর শিল্পকে, তাঁর অভিজ্ঞতাকে, তাঁর "জীবনবোধ"কে বিসর্জন দিয়েছেন। কবিতা ততো দূরই অগ্রসর হ'তে পারে যতো দূর মানুষের অবচেতনা, চেতনা এবং অতিচেতনার অধিগম্য। তার পরে যা আছে তা প্ল্যানচেটে জানা যায় হয়তো, রাজনৈতিক কল্পকথায় মানুষ হয়তো হিংসা, লোভ, ভয় পরিত্যাগ করতে পারে, জাদুবিদ্যায় হয়তো প্রকৃতির নিয়ম বদলে দেওয়া যায়। কিন্তু কবিতায়, দর্শনে এবং বিজ্ঞানে মেনে নিতে হয় মানব বা জড়প্রকৃতিকে। কোনো আহ্লাদি ভোটদাতা যদি নিষ্কণ্টক সমাজের আব্দার করেন তবে ভোটলোভী নির্বাচন প্রার্থী সে-চিবসতেজ আকাশ-কুসুমের বর্ণের ছটা, গন্ধের মাদকতা বর্ণনা করতে বাধ্য হবেন। কিন্তু যে ভূতত্ত্ববিদ মনে করেন পৃথিবীর বুকে আরেক তুষারযুগ আসন্ন, তিনি, সে-সম্ভাবনা

ভয়াবহ বলে, কী ক'রে অভয় দেবেন তুষার-যুগ আসছে তবু আসছে না? কোন জ্যোতির্বিদ বলবেন সৌরলোক অবিনশ্বর? পাঠকের তুষ্টির জন্য কোন শেক্সপীয়র বলবেন যে মানুষ স্বর্গের শিশু? কবে কোন কোমল ডস্টয়েভস্কি আশ্বাস দিয়েছেন পৃথিবী নিষ্পাপ ব'লে?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ধর্মান্তরের কাহিনী সুবিদিত। তিনি যে জগৎ শিশুর মতো উপলব্ধি করেছিলেন তা হৃদয় বিদারক, যে-নতুন পুরাণ-কথা তিনি সংশয়হীন চিত্তে মেনে নিলেন তাতে ঐ সব হৃদয়বিদারক ঘটনার মানে খুঁজে পাওয়া গেলো। দেখা গেলো যে নিষ্ঠুরতা মানুষেরই এক চিত্তবৃত্তি নয়, আসলে তা নেহাৎই অস্থায়ী এক নড়বড়ে সমাজের বিধিপ্রসূত। বরং বর্তমানে যতোই নিষ্ঠুরতা বৃদ্ধি পাবে ততই উজ্জ্বল হবে ভবিষ্যতের আশা। কী সহজে হঠাৎ সব-কিছু শিশিতে ভরা, লেবেল-মারা হ'য়ে গেলো। এখন কোনো চরিত্র রচনা করতে তাঁকে একটুও বেগ পেতে হয় না। যে-মুহূর্তে তিনি ঠিক করেন একজন জোতদার কিংবা একজন ঠিকেদারের চরিত্র গড়তে হবে, তৎক্ষণাৎ তিনি "সাবধান বিষ"-মার্কা আলমারি থেকে নামিয়ে আনেন বোতলের পর বোতল। স্বার্থ-চিহ্নিত শিশি থেকে অনেকটা, হিংসার শিশি থেকে আরেকটু, লোভ, ক্রোধ, কপটতা থেকে বাকিটা ঢেলে নিয়ে তৈরি হয় পাঁচন। সহজ, অতি তরল হ'য়ে গেল সব-কিছু। চরিত্রের কোনো জটিলতা, ক্রমবিকাশ, পরিবর্তন, পরিণতি—কিছুই রইলো না। রূপকথায় যেমন সকল দুঃখের কারণ একটিমাত্র ঈর্ষাতুর সতিন কিংবা সিংহাসন লোভী বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, বর্তমান দুঃখের হেতু এই অযৌক্তিক সমাজ। এই সমাজ পরিবর্তিত হলেই—এবং কোন সমাজ অমর? —মানবসন্তানের জীবন অবিমিশ্র সুখের হ'য়ে উঠবে। রূপকথার শেষে তিলমাত্র সংশয়েরও স্থান নেই ; পাঠকের এমন মনে হয় না যে বিগত রাজা যদি বিনয়ী ও ধৈর্যবতী দুয়োরাণীকে ভালো না-বেসে অস্থিরচিত্ত, লাস্যময়ী, স্বার্থপর সুয়োরাণীকে ভালোবাসতে পারেন, রাজপুত্রও তবে তাঁর আজকের প্রেয়সীকে পরিত্যাগ করে আর কারো কালো কেশের সন্ধানে যেতে পারেন। আমাদের এমন সন্দেহ হয় না, তার কারণ রূপকথার চরিত্ররা মানুষ নয়, মানুষের ইচ্ছার ও আতঙ্কের ছায়া মাত্র। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যে স্বর্গলোকের স্বপ্ন দেখেছিলেন তাও এমনি অপরিবর্তনীয়; তাঁর জোতদারেরা চিরকালের জন্য দাগি, তাদের লুপ্তি হতে পারে কিন্তু কখনো তাদের সম্বিৎ জাগবে না, যা-ই ঘটুক তাদের মধ্যে কেউ শ্রেণীস্বার্থ পরিত্যাগ করে সন্ত হবে না কোনোদিন।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আগে অত নিষ্ঠুর ছিলেন ব'লেই অত বেশি সহৃদয় হ'তে চেয়েছিলেন। দয়া করতে গিয়ে তিনি যা রচনা করলেন তা নিরানন্দ ও নির্জীব। কিন্তু তবুও, মাঝে-মাঝে, লেখকের সকল কৌশল ব্যর্থ ক'রে, তাঁর চরিত্ররা বুলির খোলস ফেটে আত্মপ্রকাশ করে; তাঁর সন্তানগণ তাঁর কাছে দাবি করে শুধু নাম বা আয়ু নয়, ব্যক্তিত্ব। এবং তখন, অতিরিক্ত দয়ার বশে, লেখক তাদের কাহিনীর উপর হঠাৎ যবনিকাপাত করেন। যেমন দুর্ভিক্ষপীড়িত মাতা তাঁর ক্ষুধিত সন্তানদের আর্তনাদ সহ্য করতে না-পেরে তাদের হত্যা করেন, যে প্রাণ তাঁরই দান, যাদের এ পৃথিবীতে আনবার জন্য নিজে বারংবার মৃত্যুর দরজায় হানা দিয়েছেন, সেই প্রাণ, তাঁর নিজের শরীরের চেয়ে আপন শরীর তিনি যেমন ধ্বংস ক'রে দিতে পারেন স্নেহের তীব্রতায়, তেমনি দয়ার আতিশয্যে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর আর্ত, তৃষিত শিশুদের কণ্ঠরোধ করতে বাধ্য হন। গল্পের নিয়ম উপেক্ষিত হয়, শিল্পীর সততা কোথায় হারায় কে জানে। যে-কাহিনীর

সূত্রপাতে তিনি সতর্ক হন নি, সে-কাহিনী যখন অমোঘ ভাবে এমন এক সংকল্পের দিকে ধাবিত হয় যা তাঁর ঐ রাজনৈতিক রূপকথার বিরোধী, তখন বলতে বাধ্য হন ঃ

গল্পের উপসংহারে লেখকের ব্যক্তিগত মন্তব্য। (গল্পলেখার চিরন্তন আইন ভঙ্গ ক'রে) ঃ নব'র মা এবং পিসী ঐ বন্যাতেই অক্কা পেয়েছে।' জ্বরে অজ্ঞান অনাথ, ছেলেমানুষ নব এবং বাচ্চা মেয়েটাও যে মরে গেছে তা বলাই বাহুল্য। সুতরাং এটা যে বানানো গল্প নয় প্রমাণ করার জন্য জ্যান্ত সাক্ষী খাড়া করতে পারবো কিনা ভাবছি।

গল্পের জন্য "জ্যান্ত সাক্ষী"র প্রয়োজন অন্য কোনো লেখকের হয় না, কিন্তু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হয়। নব'র মা অভাবে এমন কাতর হয়েছিলো যে গুজব রটেছিলো সে আত্মহত্যা করেছে। কিন্তু সে মরেনি, টাকাও জোগাড় হয়েছিলো, ডাক্তারও ডাকা হয়েছিলো অনাথের জন্য। সমাজ যদি সুখের একমাত্র প্রতিবন্ধক হ'তো তবে কোনো দুঃখ ছিলো না তাদের। কিন্তু আরো শত্রু আছে, এক যুদ্ধে জয়ী হয়ে পরমুহূর্তেই মানুষকে রণসজ্জা ধারণ করতে হয়। সাক্ষী চাই, নিজের কাছে, ও সমবিশ্বাসীদের কাছে, প্রমাণ করা চাই যে এ-কথা সত্য। তাঁর বানানো গল্প হ'লে সবটুকু দায়িত্ব তাঁর, কৌশলে এড়ানো চাই সে দায়িত্ব। কারণ, এ গল্পের আসল যে উপসংহার তা এখন আর তিনি লিখতে পারেন না। সে-উপসংহার ভোলার ভান যতই করুন তিনি, আমরা ভুলিনি ঃ

কমে মাঠঘাটের জল।

ও তো মানুষের চোখের জল নয়, কমিবেই তো।

লোককল্পনার যৌবন নির্ভীক, এমনকি দুঃসাহসী। বার্ধক্যের শিল্পী নাকি অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করেন, বিপরীতের সমন্বয় ঘটান, স্বর্গনরকের যুগ্ম ছবি আঁকেন। গ্যেটে এবং টোমাস মান্ অন্ধকার থেকে আলোয় রোমান্টিক থেকে ক্লাসিকে, নরক থেকে স্বর্গে নাকি পৌঁচেছিলেন। শেক্সপিয়রের যে ছবি ছাত্রদের সামনে উপস্থিত করা হয় তা এক বিষাদবিলাসী, নরকদর্শী যুবকের, যিনি প্রৌঢ় বয়সে সংশয়ের ঝড় ঝঞ্ঝা অতিক্রম ক'রে মিলনে, সমাধানে, শান্তিতে উপনীত হয়েছিলেন। লোককল্পনার সেই শিল্পী জীবনানন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়। যৌবনে তাঁরা ছিলেন বেহিশেবি; পাঠককে তাঁরা শেখাতে চান নি কী ছলে বেঁচে থাকা যায়, শুধু জানাতে চেয়েছিলেন কী ব্যথার ছায়ায় আমরা বেঁচে থাকি। পরিণত বয়সে জীবনধারণের মন্ত্র দিলেন তাঁরা, শোনালেন আশার বাণী, শেখালেন বিস্মৃতির কৌশল। মহৎ শিল্পী তো তিনিই যিনি তাঁর রচনা ছেড়ে জীবনকে বরণ করেন? মানুষের চেয়েও কি মহৎ তিনি নন যিনি দুঃখের গরলকে কণ্ঠে ধারণ করে পৃথিবীকে নিরাপদ ও বাসোপযোগী করে তোলেন?

সায় দিতে যতই চাই, আমরা এ-প্রশ্নের উত্তরে "হ্যাঁ" বলতে দ্বিধা করি। আমাদের মনে হয় এ-বিস্মরণ জীবন নয়, নিদ্রা। মিথ্যা যদি সুখপ্রদ হয় তবে তীব্র ব্যথায় অধিকাংশের পক্ষে এ-বটিকা সেবন না-ক'রে উপায় নেই, কিন্তু স্রষ্টা যিনি, তিনি কী উপায়ে মিথ্যা থেকে প্রাণ সৃষ্টি করবেন? সংজ্ঞালোপের এতো উপায় থাকতেও চিকিৎসক আসন্নপ্রসবাকে জাগ্রত থাকতে বলেন। শিল্পীকে নিষ্ঠুর হ'তেই হবে—না-হ'লে অপর নয়নে অশ্রু উদগত হবে কেন? শিল্পী সেই রহস্যময় হোসেন মিয়া, যার আসল ইতিহাস কেউই সঠিক জানে না, যে যৌবন কাটিয়েছে বিদেশী বন্দরে-বন্দরে, দিক হারিয়ে যে রাত্রে খুঁজেছে তারার নিশানা। যা শুধু কল্পনা ছিলো, অলস মনে একটি ঝিলিকের মতো যা এসেছিল এবং সেইভাবেই যা মিলিয়ে যেতে পারতো তাকে স্থায়ী রূপ সে দেবে—এই ছিলো তার জীবনের ব্রত। সেই সংকল্পকে প্রতিষ্ঠা করবার জন্য সে'সঁপে দিলো তার সব-

কিছু। যা কিছু সে উপার্জন করেছিলো—শুধু সঞ্চিত অর্থ নয়, তার সারা জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতাও—সে সমর্পণ করলো তার স্বপ্নকে। এবং তার উপনিবেশে আশ্রয় নিলো সেই সব মানুষ, প্রকৃতি এবং সমাজ যাদের পরিত্যাগ করেছে। তারা হোসেন মিয়ার কল্পলোকে কষ্টকর কিন্তু নতুন জীবন লাভ করলো। এই জীবনশিল্পীর দৃষ্টি স্বচ্ছ, হৃদয় একাগ্র। তার ঐ অদ্ভুত উপন্যাসের চরিত্র সংগ্রহ করবার জন্য সে যে-কোনো নিষ্ঠুর উপায় অবলম্বন করতে রাজি ছিলো। তার বিষয়বুদ্ধি—যার দ্বারা সে ইতিপূর্বে ব্যবসায়ে বিস্ময়কর সাফল্য লাভ করেছিলো—তা সে নিয়োগ করলো স্বপ্নের কাজে। এবং যখন তার রচনায় পুরানো পৃথিবীর নীতি প্রবেশ ক'রে বিবাদ বাধালো তখন এই নিষ্ঠুর শিল্পী বর্জন করলো সেই কোমল নীতি, তার উপন্যাসের পক্ষে দুর্বল চরিত্রটিকে হোসেন মিয়া উৎপাটিত করলো। হোসেন মিয়া নিষ্ঠুর মানুষ, কিন্তু সফল শিল্পী। যখন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপন্যাস শেষ হ'য়ে আসে, তখন কুবেরের নৌকো চলে হোসেন মিয়ার দ্বীপের দিকে, উপন্যাসের পাত্র-পাত্রী সংগ্রহ পর্ব শেষ হয়, কাহিনী এতক্ষণে জমে ওঠে।

যে-মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হোসেন মিয়ার স্রষ্টা তিনি কি জানতেন না তাঁর নিজের পরিণতির অর্থ? যে-জীবনানন্দ দাশ "তিমিরহননের গান" রচনা করেছিলেন, তিনি কি ঐ কবিতার শেষ কয় পংক্তির রমণীয় ফাঁকি লক্ষ করেননি? তিনি কি জানতেন না যে ঐ কবিতাটিতে চাওয়া অকস্মাৎ পরিণত হয় পাওয়াতে?

আমরা কি তিমিরবিলাসী?
আমরা তো তিমিরবিনাশী
হ'তে চাই।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও জীবনানন্দের মতো সত্যদর্শী কী ক'রে ভুলে ছিলেন যে এমনি এক ফাঁকি তাঁদের সমগ্র কাব্যেও লুকিয়ে আছে? আর যদি তাঁরা এ-কথা জানতেন, তবে কী বেদনাদায়ক না জানি তাঁদের জীবনের সায়াহ্নকাল! বন্ধ্যাত্বের চেয়ে মৃত্যু বরণীয় মনে করেছিলেন তাঁরা? অথবা, তাঁরা শান্তি পেয়েছিলেন তাঁদের শিল্পকে নিদ্রার চরণে অর্ঘ্য দিয়ে—গোগোল যেমন স'পে দিয়েছিলেন তাঁর উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি, ফ্লরেন্সের চিত্রকরগণ যেমন সাভনারোলার প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে নিজেদের অমর ছবি নিক্ষেপ করেছিলেন?

অসংখ্য প্রশ্ন, উত্তরহীন প্রশ্ন। কিন্তু যদিও এগুলি আমাদের এতো ব্যাকুল করে, কে জানে এ-সব প্রশ্ন আসলে তেমন জরুরি কিনা। গ্যেটের চরম সৃষ্টি ফাউস্টের দ্বিতীয় খন্ড নয়, তাঁর পরম সৃষ্টি তাঁর জীবন। ফাউস্ট সম্পর্কে সংশয় জাগলে, তাঁর কাব্যে তৃপ্তি না-পেলে, আমরা ধ্যান করতে পারি গ্যেটের অমর সৃষ্টি সেই দ্বিতীয় গ্যেটেকে। প্রশ্ন করতে পারি তাঁকে, তন্নতন্ন ক'রে খুঁটিয়ে দেখতে পারি তাঁর জীবন, নিশ্চিন্ত জানি যে কোথাও-না-কোথাও তিনি আমাদের সংশয়ভঞ্জনের মন্ত্র রেখে গেছেন। কিন্তু জীবনানন্দ এবং মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁদের সৃষ্টির বাইরে কিছু লুকিয়ে রাখেননি, "পুতুল-নাচের ইতিকথা"য় যা নেই তা লুম্বিনি পার্কের খাতাপত্রে পাওয়া যাবে না, জীবনানন্দের ঘনিষ্ঠতম আত্মীয়কে শত প্রশ্ন করলেও জানা যাবে না "আট বছর আগের একদিন" রচনাকালে তাঁর আত্মার মধ্যে কী ঘটেছিলো। তাঁদের এই বিনয় উপেক্ষা করলে আমরা অতিরিক্ত কিছু লাভ করবো না, শুধু হারাবো শ্রদ্ধাবনত হৃদয়ে যা পেয়েছিলাম। তাঁদের শ্রেষ্ঠ রচনা এক স্বচ্ছ এবং শীতল গভীর হ্রদ যাতে অবগাহন করলে আমাদের নির্জীব

স্নায়ুতে আবার প্রাণের স্রোত সঞ্চালিত হয়। জলের প্রাণের বর্ণ কী, তার শরীরের আসল আকৃতি কী, এমন কৌতূহল যদি কারো থাকে, যদি সে আকাশের ছায়ায় সন্তুষ্ট না-হ'য়ে দেখতে চায় জলের মুখের ছবি, তবে সে সেচনের ফলে উপরের ছবি হারাবে কিন্তু তল পাবে না। তার চেয়ে শুধু সবিস্ময়ে চেয়ে থাকা ভালো। বস্তুত, এমন নীল, এমন শীতল, এমন গভীর সরোবর এই দেশে কেন, সারা পৃথিবীতে বিরল। এবং, যদি কোনো তরুণ হোসেন মিয়া তাঁর শিল্পকে এই প্রাণদাত্রী জলে সিঞ্চিত করেন তবে তাঁর ফসল দেখেই কি জানা যাবে না এ-জলের বর্ণ কী, শক্তি কী, কী তার অবয়ব?



মিথুন-সমীক্ষণ ঃ ছায়ানট

জীবনানন্দের গল্প ঃ গল্প পড়ার আগে কথাটা শুনেই সোনার পাথরবাটির কথা মনে হওয়া আশ্চর্য নয়, কিংবা মাছ-পাখির। সোনা-ই যদি হয় তাহ'লে তা থেকে পাথরবাটি হবে কেমন ক'রে? মাছ আর পাখি, জাতি ধর্ম সব কিছুতে আলাদা। জীবনানন্দের পরিচয়টা আমাদের কাছে সম্পূর্ণভাবে কবিতার হরফে লেখা ব'লেই তাঁর গল্পকার হিসেবে ভূমিকাটা আজগুবী লাগে।

কিন্তু ব্যাপারটা সত্যিই কি অমন সম্ভবের সীমা-ছাড়ানো?

কবি ও কাহিনীকারের যথার্থ স্বরূপ বুঝলে তা বোধহয় মনে হ'ত না। সৃষ্টির প্রেরণা যেখান থেকে আসে সেখানে তাঁরা অভিন্ন। জীবন-বেদের গভীরে না-পৌঁছলে মহৎ কবি কি কেউ হয়? বুকের ভেতর কবিতার গহন উৎস না-থাকলে জীবনের কথা জীবনের ভাষায় বলবার ক্ষমতা কেউ পায়?

প্রায় চল্লিশ বছর আগে এই সত্যটি উল্টো একটি ঘটনায় উপলব্ধি করার সুযোগ পেয়েছিলাম। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় আমাকে তাঁর একটি হাতে-লেখা চটি খাতা দেখিয়ে অবাক ক'রে দিয়েছিলেন। অবাক শুধু খাতার পাতায় পাতায় মানিকের স্বরচিত কবিতা দেখে হইনি, হয়েছি তার চেয়ে বেশী কবিতাগুলির বিস্ময়কর মৌলিক স্বাতন্ত্র্যে।

গল্প-উপন্যাস যিনি লেখেন তাঁর হাত দিয়ে কবিতা বার হওয়া এমন একটা আশ্চর্য ব্যাপার অবশ্য নয়। একাধারে কাহিনীকার ও কবি আমাদের সাহিত্যেই বিরল ন'ন। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথই ত' তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত।

তা সত্ত্বেও জীবনানন্দের গল্প লেখা বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের কবিতা লেখা নিয়ে এত উচ্ছ্বাস উত্তেজনার কারণ এই যে এঁদের দু'জনের কারুর মধ্যেই উভচরের বিন্দুমাত্র লক্ষণ ওপর থেকে ধরা পড়ে না। মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় যেন পুরোপুরি গদ্যের ডাঙার জীব আর জীবনানন্দ কবিতার আকাশের। তাই সাহিত্যের স্থলচরের শরীর থেকে মানিক যে কখনো খেচরের ডানা বার করতে পারেন তা যেমন কল্পনাই করা যায় না, তেমনি যায় না জীবনানন্দের মতো আকাশচারীর দুঃসাহসী স্থলবিহার।

এ-স্থলবিহার যেমন-তেমন হলেও আমরা অখুশী হতাম না। কালোয়াৎ সেতারীর হাতে তবলার দুটো চলনসই বোল শুনলেই আমরা বাহাবা দিতে প্রস্তুত। জীবনানন্দের গল্প কিন্তু সেই ভিন্ন খ্যাতির দৌলতে তরে-যাওয়া বস্তু নয়। নিজস্ব দামেই তা সাহিত্যের খাস-দরবারের দাবীদার।

গদ্যগল্পের স্থলভূমিতে জীবনানন্দের বিহারকে অকারণে দুঃসাহসিক মনে করি না। যে-গল্পটি সামনে রেখে এসব কথা লিখছি তা গুটি কয়েক পাতার নিতান্ত ছোট একটি রচনা। লেখা হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর আগে। সম্ভবত, জীবনানন্দ এই রচনাটি দিয়েই

গল্পসাহিত্যে পা বাড়িয়েছিলেন। গল্প তিনি তারপর আরো কয়েকটি লিখেছিলেন। কিন্তু তাঁর স্বভাবসুলভ আত্মগোপনতার প্রবণতায়, না অতিরিক্ত আত্মসচেতনতার দ্বিধায় জানি না, বহুকাল পর্যন্ত এগুলি অপ্রকাশিতই থেকে গেছে।

রচনার প্রায় পঁচিশ বছর পরে এগুলির কয়েকটিকে প্রথম আবিষ্কার ক'রে সাহিত্যের দিবালোকে উপস্থিত করবার গৌরব 'অনুক্ত' পত্রিকার।

'অনুক্ত' পত্রিকার যে ভুল হয়নি, সাহিত্যের সত্যকার রসিক গোষ্ঠীর স্বতস্ফূর্ত বিস্ময়-চাঞ্চল্যে তা প্রমাণিত।

জহুরী হিসেবে কি চোখে পড়েছিল 'অনুক্ত' পত্রিকার এই অগোচরে পড়ে-থাকা বাতিল পাণ্ডুলিপিগুলিতে? কি পেয়ে বিস্মিত চঞ্চল হ'য়ে উঠেছিলেন বিচক্ষণ পাঠকের দল?

সে-হদিস গল্পগুলি রচনার সময়টা আর একবার স্মরণ করলেই কিছুটা পাওয়া যাবে।

এ-শতাব্দীর তৃতীয় দশকের আরম্ভে 'সবুজ পত্র' ভাষায়-ভাবনায় নতুন সজীব আন্দোলনের দোলা আনলেও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের নতুন ফল ফলাতে পারেনি। পরিমাণে যতটুকুই হোক 'কল্লোল-কালিকলম'—রাজনৈতিক অর্থনৈতিক থেকে সামাজিক পারিবারিক পর্যন্ত সবকিছুর সাবেকী শৃঙ্খল-সম্বন্ধে একটা অনির্দিষ্ট সচেতনতাকে কিছুটা সার্থক সাহিত্য-মূর্তি দিতে পেরেছে।

প্রকাশিত না-হ'লেও জীবনানন্দের 'ছায়ানট' গল্পটি সেই সময়ে সেই আবহমণ্ডলে লেখা। রচনায় সেকালের ছাপটুকু থাকলেই যথেষ্ট হ'ত, কিন্তু যত অস্থিরই হোক সেই বলিষ্ঠ অন্বেষণের যুগের বিচারেও বিষয় ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে গল্পটি অভিনব ও দুঃসাহসিক।

এক দিক দিয়ে দেখতে গেলে গল্পের পদক্ষেপ কেমন যেন অনিশ্চিত, দুর্বলতা ধরা-পড়বার ভয়েই যেন ভাষা-সংক্ষেপ!

কিন্তু সত্যি কি তাই?

ত্রিশের দশকের শুধু বাংলা কেন সমস্ত আলোকিত পৃথিবীর পক্ষেই অগ্রসরতম মিথুন-সমীক্ষণ যে গল্পের প্রেরণা তাকে ক'টি সঙ্কেত-বিন্দুর বাইরে ছড়াতে দিলে তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হ'য়ে যেত নাকি?

'ছায়ানট' গল্প হিসাবে অসামান্য এমন দাবী যদি না-ই টেঁকে তবু কবিতার আকাশ থেকে গদ্য-কাহিনীর স্থলভাগে জীবনানন্দ বৃথাই নামেননি, একথা বিনা দ্বিধায় মুগ্ধ-বিস্ময়ে বলা যায়।

জীবনানন্দের উপন্যাস ঃ 'নিরুপম যাত্রা'

গোগ্রাসে গালগল্প গেলার কাল যখন আসে তখন মাঝে মাঝে পেশাদার ঔপন্যাসিক নন এমন কোনো লেখক অথবা শিল্পী গল্প উপন্যাস স্মৃতি-কাহিনী লিখলে উপকারই হয়। কেননা ভাবনাচিন্তার দিকটা একটু জোর পায়, জীবনের ওপর এক বিশেষ দৃষ্টির আলো পড়ে। নিজস্ব প্রকৃতিতে যাঁরা কবি এবং শিল্পী তাঁদের পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা এবং জিজ্ঞাসা বিষয়কে যে বহিঃস্তর থেকে গভীরে নিয়ে স্থাপন করবে এবং তাঁদের রচনা যে সেই কারণে গড়পড়তা কাহিনী থেকে ভিন্ন স্বাদের হবে তাতে সন্দেহ নেই। কবি ও শিল্পীদের এই রকম রচনার দৃষ্টান্ত সব দেশেই দেখি। আমাদের দেশেও। আবার একই লেখকের মধ্যে কবি ও ঔপন্যাসিকের এক স্বাভাবিক সহাবস্থানও দেখা যায়। আমাদের এখানে তার সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালের বাঙালী সাহিত্যিকদের মধ্যেও সব্যসাচী-লেখক একাধিক। এটা অবশ্য একটু স্বতন্ত্র ব্যাপার, এই সহাবস্থান। এই দ্বিত্ব প্রথম থেকেই রূপ নেয়। হঠাৎ একটা সময়ে কোনো কবির কলমে উপন্যাসের রূপায়ণ এ নয়। |এর উল্টোটা কেন ঘটে না, সাহিত্যজিজ্ঞাসুর পক্ষে তা এক কৌতূহলের বিষয়। কোনো ঔপন্যাসিক কেন এক সময়ে কবিতা লিখতে থাকেন না? দু একজনকে এ-বিষয়ে কিছু উৎসাহী হতে যদি দেখা গিয়ে থাকে তো সেটা এতই তৈরি-করা ঠাট যে, তাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়া যায় না।|

কবিতা ও উপন্যাসের ঐ সহাবস্থানেও কিন্তু দুই প্রবণতা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে চলে না সাধারণত, একটাকে বেশি প্রবল দেখা যায় এবং সেটা কবিতার। রবীন্দ্রনাথ উপন্যাস যতই লিখে থাকুন না কেন, সব সময়ই ছাপিয়ে উঠেছে তাঁর কবি-ব্যক্তিত্ব। আর সম্পূর্ণ কবিতা থেকে কোনো এক সময় উপন্যাসে আংশিক এসে পড়লে সেই পূর্ব-ব্যক্তিত্বের আধিপত্য-সম্ভাবনা আরো বেশি। যেমন ঘটেছে জীবনানন্দ দাশের ক্ষেত্রে।

তবে সেই সঙ্গে এও লক্ষ্য করবার যে, উপন্যাস রচনায় জীবনানন্দের কবি-মন চাতুর্যের আশ্রয় নেয় না, লোকদেখানো চোখধাঁধানো কোনো কিছু তৈরি করার চেষ্টা করে না, জীবনের পীড়া জীবনযাপনের অভ্যন্তরে নির্ণয় করতে চায়। এর এক জাত-নিদর্শন গত শারদীয় 'প্রতিক্ষণ'-এ প্রকাশিত তাঁর উপন্যাস 'নিরুপম যাত্রা'। কিন্তু এ-রচনাকে কি উপন্যাস বলব? না-বলার পক্ষে কতকগুলো যুক্তি আছে। যেমন—এর আকার বেশ ছোট; সব কথাটা একই অবস্থান থেকে বলা ; তাৎপর্যময় কোনো চরিত্রেরই প্রত্যক্ষতা নেই, একজনের কল্পনায় ও আত্মকথনে তারা এসেছে আংশিকভাবে এবং প্রতিফলিতভাবে। এ-লেখাকে বড় গল্প বলা বোধহয় বেশি সঙ্গত।

যাই হোক তা, উপন্যাস অথবা বড় গল্প, এক অনন্য অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় তাতে আমরা পাই। অর্থের ভূমিকা যে মানুষের জীবনে কী সর্বনাশা হয়ে দাঁড়িয়েছে সেই সত্য এ-

কাহিনীর ভেতর থেকে ফুটে উঠেছে। সমগ্র কাহিনীতে তো বটেই, তা ছাড়াও নানা মন্তব্যে ও উল্লেখে তা পরিস্ফুট। যেমন, নায়ক বেকার প্রভাতের নগর-প্রবাসের অভিজ্ঞতা হিসেবে এই কয়েকটা ছত্র ঃ "এই চার বছর কলকাতায় কবিত্ব করে আর বুলবুলির গান শুনে কাটায়নি সে। শুধু আর্থিক অধঃপতনের অপরাধে আত্মিক জীবনের অমর্যাদা ও গ্লানি সহ্য করতে যারা অভ্যস্ত তাদেরই একজনের মতো সারাদিন পথে পথে ধাক্কা খেয়ে ফিরেছে সে।" পথে পথে ধাক্কা খাওয়াই শুধু নয়, ব্যক্তিগত ঘনিষ্ঠতম সম্পর্কও যে আর্থিক ব্যর্থতায় বিষিয়ে ওঠে এবং সাফল্যে রমণীয় হয়, তাও এই কাহিনীতে আমরা দেখি। অর্থোপার্জনের ক্ষমতাই স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ প্রতিভা, অন্য যে-কোনো ক্ষমতা, সমস্ত সংবেদনশীলতা তার পাশে অকিঞ্চিৎকর, আধুনিক সমাজের এই মানবতাক্ষয়ী রূপ 'নিরুপম যাত্রা'র কেন্দ্রীয় বিষয় ব'লে আমার মনে হয়েছে।

এই সত্যের অনুপূর্বক আর এক সত্যেরও মুখোমুখি হই আমরা। তা হলো প্রকৃতি থেকে আমাদের নির্বাসন। শারীরিকভাবে মফঃস্বলের বাংলা তো দূরে যায়ই, কলকাতার প্রাকৃতিক স্পর্শটুকুও সরিয়ে দিতে হয় জীবিকার ধমকে। গাছপালা লতাপাতা পাখি ফড়িং ঝিঁঝি প্রজাপতি ইত্যাদি মুক্ত প্রকৃতির নানা প্রকাশে জড়ানো কাহিনী বিভূতিভূষণের মতো জীবনানন্দের প্রকৃতি-তন্ময়তাকে ফুটিয়ে তোলে এবং তারই পরিপ্রেক্ষিতে মূর্ত হয় মর্মান্তিক এই বিচ্ছেদ।

'নিরুপম যাত্রা' সম্পাদনার মুখবন্ধে যে-ঐতিহাসিক বাস্তবতার উল্লেখ করা হয়েছে, তা অবশ্যই প্রণিধানযোগ্য। তিরিশ দশকের প্রথমে মন্দার কবলে যখন পরাধীন ভারতবর্ষ টালমাটাল তখন তার প্রধান শহর কলকাতায় একজন শিক্ষিত সংবেদনশীল যুবক জীবিকার তাড়নায় কী উদ্‌ভ্রান্ত জীবন যাপন করে এবং কীভাবে চূর্ণস্বপ্নের শয্যায় জীবনের উপসংহারে পৌঁছয়, তার চিত্রণ আমরা পাই এতে। তবে এর তাৎপর্য আরো বিস্তৃত ব'লে আমার মনে হয়। সাময়িক বাস্তবতার ভিত্তিতে লেখক আমাদের সামনে খাড়া করেছেন সমাজের এক শ্বাসরোধী মূর্তি যা নিছক সাময়িকতাকে অতিক্রম ক'রে যায়।

কিন্তু উপন্যাস বা যে-কোনো শিল্পের সমস্যা সত্য উচ্চারণেই মিটে যায় না। উচ্চারণ কী ভাবে করা হলো, সেটা বিষয়ের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত। প্রকৃতপক্ষে সাহিত্যকর্মের সার্থকতাই নির্ভর করে তার শিল্পরীতি বা পদ্ধতির ওপর। কোনো সমাজ-সত্য বা জীবন-সত্য, কোনো মানবিক বাস্তব বা মানবিক আকাঙ্ক্ষা অন্যের হৃদয়সংবেদ্য হতে পারে তার প্রকাশের গুণে। সেখানেই প্রতিভার ভূমিকা। এবং সাধারণত প্রতিভার এক-একটা বিশেষ ক্ষেত্র থাকে। একাধিক ক্ষেত্রে প্রায় সমান পারঙ্গমতার দৃষ্টান্ত বিরল। কোনো বড় কবি উপন্যাস রচনায় হাত দিলে যে বড় ঔপন্যাসিক হবেন, এটা মোটেই ধ'রে নেওয়া যায় না। বরং উল্টোটারই সম্ভাবনা বেশি। তাঁর কাব্যিক ক্ষমতার কাছে প্রশ্রয় পায় ঔপন্যাসিক (কিংবা নাট্যিক) ন্যূনতা। এমনকি, রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসে ও নাটকেও আমরা এই ঘাটতির নিদর্শন দেখি, কী চরিত্রায়নে, কী সংলাপে। জীবনানন্দের উপন্যাসে তা সহজেই নজরে আসে। সাহিত্যের অন্যান্য বিভাগের মতো উপন্যাসেরও এক বিশিষ্ট প্রকাশ-পদ্ধতি থাকে, যা তাকে অন্যান্যদের থেকে পৃথক করে। অবশ্য তা কোনো ছক-বাঁধা পদ্ধতি নয়, প্রত্যেক ক্ষমতাবান লিখন-শিল্পী তাকে নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে চিহ্নিত করেন। এমনকি, কোনো প্রতিভাধর হয়তো সাধারণগ্রাহ্য ভেদরেখা মুছে দিয়ে এক সমন্বিত নতুন পদ্ধতি প্রবর্তন করতে পারেন যাতে পাঠক চিত্তে তাঁর সৃষ্টির ক্রিয়াশীলতা আরো অমোঘ হয়। সে রকম দৃষ্টান্ত আমরা অন্য দেশে পেয়েছি। জীবনানন্দ তেমন কিছু করতে উদ্যোগী হন নি। তিনি

মোটামুটি পূর্ব-প্রবর্তিত পথই নিয়েছেন। এবং তাঁর এই রচনার কোনো নিশ্চিত সামগ্রিক শৈল্পিক-সার্থকতা আমার চোখে ধরা পড়েনি। অবশ্য সুন্দর সুন্দর কল্পনা-ছবি আছে, যা আমাদের হৃদয় স্পর্শ করে। যেমন—নায়কের নিজের বাল্যকালের সঙ্গে তুলনা করে সন্তানের বাল্যকাল মনশ্চক্ষে দেখা; বয়েস বাড়ার প্রসঙ্গ আনা, সময়ের সঙ্গে ফলফুল যাবতীয় প্রাণী মানুষ সবার জীর্ণতা, মৃত্যু ও পরিবর্তনের কথা ভাবা, এ সবের অনুরণন বেশ আচ্ছন্ন করে। এ-প্রসঙ্গে তাঁর বিশিষ্ট গদ্যভাষার উল্লেখ অবশ্যকর্তব্য। কেননা পাঠকের মনে আচ্ছন্নতা সৃষ্টিতে তাঁর এই গদ্যের ভূমিকা খুব বড়। নিসর্গ-পরিবেশে নায়কের মৃত্যুমুখিনতার কথাও আছে এতে (যা জীবনানন্দীয় কাব্যেরই এক সুর), তার সঙ্গে শহরে নায়কের নিঃসঙ্গ নীরস মৃত্যুর Contrast এক প্রচণ্ড উপসংহার বটে। কিন্তু এসব তো খণ্ডগুণ। সামগ্রিক সৃষ্টির সাফল্য তাঁর দ্বারা নির্মিত হয়নি, হওয়ার কথাও নয়। কেননা অনেক ফাঁক, অনেক অবাস্তবতা, অনেক অপরিণত কল্পনা এ রচনায় রয়েছে, যা পাঠকের উপলব্ধিকে বিক্ষিপ্ত করে। চরিত্রের পরিকল্পনা ও বিকাশের ক্ষেত্রে, কথোপকথনে এবং ঘটনার উপস্থাপনে এই সব প্রতিবন্ধ সামনে আসে। যেমন, প্রথমেই বাধা দেয় দরিদ্র বেকার নায়কের অনবরত চুরুট খাওয়া। যেমন, নিরঞ্জন ধোপার পাট চাষ করা, যাত্রাথিয়েটারে নামা, পরে কাপড় কাচা এবং সেই সঙ্গে তার চালচলন কথাবার্তা। এ-সব এমন তালগোল পাকানো যে, বেশ ছেলেমানুষি মনে হয়। শিক্ষক প্রভাতের সঙ্গে ছাত্র সমীরের কথাবার্তাও যথেষ্ট অস্বাভাবিক লাগে। সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া বন্ধু হেমন্তের প্রসঙ্গও তেমনি। আর নায়ক প্রভাতের মৃত্যু যেন জোর-করে-আনা। তার জীবনের ব্যর্থতা চরমে দেখাবার জন্যে লেখকের সঙ্কল্পের লেবেল তাতে লাগানো। মোটের ওপর প্রচলিত ধারাতেই উপন্যাস লিখেছেন জীবনানন্দ, কিন্তু তার শৈল্পীক গঠন সম্বন্ধে তিনি যথেষ্ট সচেতন ছিলেন ব'লে মনে হয় না। আমার ধারণা, অন্তরায় ছিল তাঁর বিশিষ্ট কবি-স্বভাব, যার প্রভাবে উপন্যাসের 'বাস্তবতা' তাঁর দৃষ্টির বাইরে থেকে গেছে এবং রচনার ভারসাম্য তাঁর আয়ত্তে আসেনি।

জীবনানন্দের মার্কস লেনিন কমিউনিস্টরা

রণেশ দাশগুপ্ত

'বেলা অবেলা কালবেলা' ও রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশের দুটি উপন্যাস 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি'। কবির মৃত্যুর তিন দশক পরে প্রকাশিত। মহাকাব্যিক গদ্যে রচিত প্রত্যাশিত ও অপ্রত্যাশিত ঘটনা ও সংলাপবহুল এই দুটি উপন্যাসে একদিকে যেমন এদের রচয়িতার প্রতিভার একটা অপ্রত্যাশিত দিক বেরিয়ে এসেছে, তেমনি এদের মধ্যে মার্কস লেনিন ও কমিউনিস্টদের নিয়ে যেসব কথাবার্তা রয়েছে, তা থেকে বুঝতে পারা যায়, বিশ ও তিরিশের দশকে যখন আমাদের উপমহাদেশ তথা বাংলায় বিষয়টি সম্বন্ধে ভাবনা-চিন্তা ও লেখাজোখা শুরু হয়েছিল, তখন থেকেই এই নিয়ে কবি জীবনানন্দ ভাবনাচিন্তা শুরু করেছিলেন এবং চল্লিশের দশকে শুধু কাব্যে নয় বড় মাত্রার উপন্যাস লেখারও প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। এখানে সাধারণভাবে উপন্যাসদুটির বৈশিষ্ট্যের উপর আলোকপাত করে বিশেষ করে মার্কস লেনিন ও কমিউনিস্টদের তথা সমাজতন্ত্র ও সাম্যবাদকে তিনি বিশ্ব উপমহাদেশীয় এবং তার মধ্যেই প্রথমে যুক্ত ও পরে দুই বাংলার স্বাধীনতা ও সাম্যের দাবীতে লোকউত্থানের ঘটনাপরম্পরার প্রেক্ষাপটে যেভাবে দেখেছিলেন, তার একটা নিরীক্ষা উপস্থিত করছি।

(১)

অস্তমিতপ্রায় বিশশতকের প্রভাতী বাংলার বিপ্লবী বিদ্রোহী জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামী লোকউত্থানের উদগাতা চারণ যুবাকবি অগ্নিবীণার সুরসাধক ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সাম্যবাদী ভাবনার উদাত্ত ভাষ্যকার বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল ইসলাম। তাঁরই সমবয়সী ও সেই সঙ্গেই কল্লোল কালিকলম প্রগতি গোষ্ঠীর আধুনিক লোকবাদী ধারারই এক অভিনব রূপকার কবি জীবনানন্দ দাশ। অনন্য তাঁর কাব্যের ভঙ্গী তাঁকে দিয়েছে একটা বিশেষ স্বাতন্ত্র্য। এদিক থেকে তিনি বাংলা কাব্যে একটি নতুন রাগ সৃষ্টিরও অধিকারী বলে সাব্যস্ত হয়েছেন। কিন্তু তাঁর এই বৈশিষ্ট্যের বিচারবিবেচনা ও পরিণতি তাঁর দৃষ্টি ও সৃষ্টির সমগ্র মহাজীবন ভাবনা ও লোকমুখিতার দিকটাকে প্রায় চাপা দিয়ে রেখেছে। সুতরাং মার্কস লেনিন ও কমিউনিস্টদের কাজ-কারবারের সঙ্গে তাঁর প্রত্যক্ষ পরিচয় তো দূরের কথা, সাধারণভাবে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক এমনকি সামাজিক সাংসারিক ঘটনা ও সম্পর্ক এবং সেই সূত্রে এই সব ক্ষেত্রে বিদ্রোহ ও বিপ্লবের আঁচও গায়ে লাগান নি তিনি, এই ধরনের একটা সাধারণ ধারণা বিশ তিরিশ ও চল্লিশ দশকের প্রবল থেকে গিয়েছে আধুনিক বাংলাকাব্যের জমজমাট আসরে ঘরে বাইরে। বর্তমান তো দূরের কথা, সুদূর অতীতের ইতিহাসের তত্ত্বে ও তথ্যের উদ্ধারণে কিংবা ভবিষ্যতের কল্পনায় কোনরকমের সাম্যবাদী উত্থানের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা নিয়ে কোন কথা বলাবলি ছিল সাধারণভাবে

কাব্যসমীক্ষার আসরে জোরাজুরি। আমাদের উপমহাদেশের এবং বাংলার পৌরাণিক অথবা আদি পর্বকে তিনি কাব্যে স্বপ্নের আধারে স্থাপন করেছেন এবং মানবমানবীর আধুনিক বৈজ্ঞানিক জনউত্থানের প্রতি তাঁর কোন ঔৎসুক্য নেই,—এই ধরনের একটি ধারণা শুধু যে লোকশ্রুতি হয়ে উঠেছিল তাই নয়, আধুনিকতার আলোচক সমালোচকরাও তাঁর কবিতার উদ্ধৃতি দিয়েই সে কথা বলতে বলতে অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিলেন। এমনকি আশির দশকেও তাঁকে বাংলা কাব্যের জনবৈপ্লবিক সামাজিক রাজনৈতিক সাম্যবাদী ধারার বিপরীত মেরুতে স্থাপন করে তাঁকে পলাতক আখ্যা দেয়া হয়েছে কোন কোন বিদগ্ধজনের ভাষ্যে। এটা করা হয়েছে তাঁর কাব্যের মৌলিকতার নাম করেও। কিন্তু, এই ধারণাটাকে আজ অবধি কিংবা নব্বই-এর দশকে, তাঁর মৃত্যুর চারদশক পরে না বদলালে আর চলছে না। উপরোক্ত ধারণাটাই বরং আর একটা জোরাজুরির ব্যাপার বলে বিবেচিত হতে বাধ্য। অভিজ্ঞ অনভিজ্ঞ সকল মহলেই। ১৯৪৭ সালে আমাদের উপমহাদেশ দীর্ঘ দুশ-বছরের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যবাদী বৈদেশিক শাসনের নাগপাশ ছিন্ন করে বেরিয়ে এলেও সাম্রাজ্যবাদী অভিসন্ধির পাল্লায় পড়ে ধর্মীয় ভিত্তিতে বিভক্ত হবার সময় মর্মন্তুদ ব্যাপক আত্মঘাতী রক্তাক্ত মৃত্যু ও মড়কবাহী নারকীয় অধ্যায়ের মুখোমুখি হয়। এই সময়ে ললিতবাণীর শুধু নয়, রূঢ় কড়চা লেখার ব্যাপারীও সাধারণভাবে স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু এই নারকীয় ডামাডোলের মধ্যেই জীবনানন্দ দাশ দুটি মহাকাব্যিক ধারার উপন্যাস রচনা করেছিলেন 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' নাম দিয়ে। অবশ্য এই উপন্যাস নিয়ে তখনই কোন প্রকাশকের সঙ্গে সংযোগ সাধন করেন নি তিনি। হয়তো তাঁর ভাষাতেই একটা সুস্থির সুস্থিতির জন্য তিনি অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। চেয়েছিলেন একটানে লিখে ফেলা এই দুই গদ্য-মহাকাব্যিক লেখাকে মাজাঘষা করতে। কিন্তু আকস্মিক দুর্ঘটনা বাদ সাধলো। কলকাতা মহানগরীর যে পথে ঘাটে তাঁর নিত্য যাওয়া-আসা ছিল বহু বছরের, সেখানে সামান্য অসতর্কতায় তিনি প্রাণ হারালেন। তাঁর পাণ্ডুলিপি 'রূপসী বাংলা' কাব্য অনুরাগী মহলে তাঁকে হারাবার বেদনাকে কিছুটা প্রকাশিত করলো প্রকাশিত হবার পরে। শুধু তাই নয়। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের বিপ্লবী গণঅভ্যুত্থানে তাঁর 'রূপসী বাংলা' তাঁকে এক বিপ্লবী কবির মর্যাদায় অভিষিক্ত করলো। তিনি এমন কি বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের কবিদের একজন হয়ে গেলেন। এই সূত্রেই জীবনানন্দ দাশের কাব্যসমগ্র পেলো গভীর ও ব্যাপক সমাদর, তাঁর কাব্যের সূচনাপর্ব থেকে পরিণত সৃষ্টিকে খতিয়ে দেখার জন্য বিশিষ্ট গবেষকরা ব্রতী হলেন। এই পর্বেই প্রকাশ পেলো যে, একেবারে শুরুতেই কিছুটা অস্থিরতার মধ্যে এবং পরবর্তী মৌলিক রূপরসরাগ নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষার পর্যায়ে পর্যায়ে বিশেষ করে 'বেলা অবেলা কালবেলা' কাব্যের পর্বে জীবনানন্দ দাশ মার্কস ও লেনিনকে বিশ্ব মানব-মানবীব ইতিহাসের ধারায় মহামহিম প্রাজ্ঞ পুরোধা বা ধারাবাহক রূপে উপস্থাপিত করেছেন। তবু যেন কোথায় একটা সংশয় থেকে যাচ্ছিল, যে কারণে তাঁর রূপরসরাগ সৃষ্টির পদ্ধতিটিকেই তাঁর কাব্যের তথা সমগ্র সৃষ্টিদৃষ্টির বড় কাজ বলে চিহ্নিত করার রেওয়াজটা থেকে যায়।

তবে এই দোলাচলের মুহূর্তেই প্রকাশিত হলো তাঁর রেখে যাওয়া দুই উপন্যাস 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি'। এই দুটি উপন্যাস প্রকাশিত হবার আগে তাঁর রেখে যাওয়া পাণ্ডুলিপি থেকে উদ্ধার করে তাঁর সহোদর ভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ 'মাল্যবান' উপন্যাসটি প্রকাশ করেছিলেন, যেমন তিনিই প্রকাশ করেছিলেন 'রূপসী বাংলা'। এই 'মাল্যবান' উপন্যাসটি এক আধুনিক বাঙালী গৃহস্থ নাগরিকের কলকাতা-

কেন্দ্রিক নিত্যদিনের ঝুটঝামেলার মধ্যেই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড নিয়ে চিন্তা-ভাবনার ঝুটঝামেলার কাজ। এতেও মাতৃভূমির স্বাধীনতা এবং বিপ্লবের প্রসঙ্গ এসেছে। তবে এখানেও আধুনিক ইউরোপীয় উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক চেতন-অবচেতনের ব্যাপারটা নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাবটাই যেন প্রাধান্য পেয়েছে। সুতরাং জীবনানন্দ দাশের কাব্য সম্বন্ধে যে ধারণাটা বদ্ধমূল থেকে যাচ্ছিল, সেটাই জোরদার হয় 'মাল্যবান' উপন্যাসের ঘরোয়া ধরনের সহজ সাবলীল গদ্য সত্ত্বেও। এই পরিস্থিতিতে কবিকন্যা মঞ্জুশ্রীর উদ্যোগে প্রকাশিত জীবনানন্দের দুই উপন্যাস 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' বিশেষ করে একালের সাম্যবাদীর উত্থানের প্রত্যয় ও আত্মজিজ্ঞাসাকে এত বড় মাত্রায় সামনে নিয়ে এসেছে যে, তাঁর সমগ্র কাব্য ও নিবন্ধমালাও পেয়ে গিয়েছে শতাব্দীর স্বাধীনতা লোকায়ত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের জন্য অবিরত জনবিপ্লবী উত্থানের অভিনব রসরূপরাগের উপস্থাপনের কৃতিত্ব।

(২)

প্রকৃতপক্ষে শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের পাশাপাশি রাখার মতো বড় কাজ রয়েছে জীবনানন্দের এই দুটি উপন্যাসে। 'পথের দাবী' উপন্যাসকে আবার সামনে নিয়ে আসার তাগিদও দেবে এরা। সাম্যবাদী উত্থানেরই এরা ফসল। সাম্প্রতিক সমাজতন্ত্রের বিপর্যয় মুহূর্তে এটা হবে একটা মহৎ নিদর্শন। সঙ্গে আসবে বিশ তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বাংলা কাব্যে নাটকে উপন্যাসে গল্প এর একটা কারণ এই যে, এই সাম্যবাদী প্রসঙ্গ আশ্রিত হচ্ছে নিজ বাসভূমের অবিরত জনউত্থানে।

দুটি উপন্যাসেই আমরা যে গভীর ও তীব্র তীক্ষ্ণ বাস্তবতাবোধ আধুনিকতম ইতিহাস চিন্তায় এবং ইতিবাচক দৃষ্টিতে স্থাপিত মার্কস লেনিন ও তাঁদের অনুগামী কমিউনিস্টদের নামে বিভিন্ন বক্তব্য পাই, তারা শুধু যে বড় মাপের তা নয়, তারা মার্কসীয় ধ্যানধারণাতে জীবনানন্দের গভীর আগ্রহ ও অভিনিবেশ এবং রাজনৈতিক-সামাজিক-অর্থনৈতিক একাত্মবোধের কথা বলে বিবেচিত হতে পারে। বস্তুতপক্ষে এই উপন্যাস দুটিতেই প্রকাশ পেয়েছে যে, ঐতিহাসিক বস্তুবাদী দর্শন ও অর্থনীতি এবং এদের আবহে স্থাপিত ও নির্মীয়মান সমাজতন্ত্রের পরীক্ষাতেও রাশিয়াকে যাঁরা বিশ তিরিশ ও চল্লিশের দশকে বাংলা কাব্যে ও উপন্যাসে স্বাদেশিক ও লোকায়ত চৈতন্য ও সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত করে নিজ নিজরূপে ও ভঙ্গীতে চিত্রিত করেছেন জীবনানন্দ তাঁদেরই একজন। দৃষ্টান্ত দিয়েই এই কথাটা বলা যায়। বিষ্ণু দে ও সমর সেনের কবিতাতে এবং তারাশঙ্কর মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় ও গোপাল হালদারের উপন্যাসে মার্কসীয় লেনিনীয় চিন্তা ও কর্মধারার বিপ্লবী মর্মবস্তুকে রচয়িতাদের নিজ নিজ অভিপ্রায় ও দূরদর্শিতায় সমন্বিত করা হয়েছে। জীবনানন্দ সেই ধারাতেই কাজ করেছেন আপন অভিপ্রায় ও উপলব্ধির বিশিষ্ট ধাঁচে ও ছাঁচে ফেলে। তবে এ কাজটি তিনি করেছেন কাব্যে কিংবা উপন্যাসে চল্লিশের দশকেই প্রধানত। 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' প্রমাণ করে যে, জীবনানন্দ তাঁর সাম্যবাদী উত্থান সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার প্রস্তুতি চালিয়েছিলেন বিগত তিরিশের দশকেই। প্রস্তুতি বহুদিনের। আমরা আমাদের উপস্থাপনাটির পরিশিষ্টতে দুটি উদ্ধৃতি দাখিল করছি। এরা প্রমাণ করে যে, জীবনানন্দ তাঁর দুটি উপন্যাসেই যে কয়েকজন বিভিন্ন স্তর ও মেজাজের পুরুষ ও নারীকে মুখর ও মুখরা করেছেন, তারা কোথাও আড়ষ্ট নয়। বরং তারা অতিমাত্রায় স্বচ্ছন্দ।

জীবনানন্দের 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' ও সারা শতাব্দীর সারা

পৃথিবীতে মহাদেশে দেশে রক্তে বোনা ধানের মতো ছড়ানো সাম্যবাদী চিন্তা-ভাবনা এইভাবে আশ্রিত। উপন্যাসদুটি তাই আজ ব্যাপক ও গভীর জানাজানি ও অধ্যায়ের দাবীদার। এই দাবীকে সামনে রেখে এখানে খুব সংক্ষেপে দুটি উপন্যাসের একটি সংক্ষিপ্তসার তুলে ধরছি।

(৩)

'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' রচিত হয়েছে ৪৭-৪৮- সালের ধর্মীয় ভিত্তিতে আমাদের উপমহাদেশের বিভাজনের চূড়ান্তভাবে ঘোরালো পরিস্থিতির মধ্যে, এ কথাটি আগেই বলেছি। তবে এই সঙ্গে যে কথাটি খুব জরুরী সেটা হলো এই যে, উপন্যাস-দুটির বিষয়বস্তু ও নায়ক-নায়িকারা এই বিভাজনের পরিস্থিতিকে তার বিস্তারিত বাস্তবতায় ও সম্ভাব্যবতায় সুস্থিরতা রক্ষা করে মহাকাব্যিক মাত্রাতেই ধারণ করেছে। এদিক দিয়ে দেখতে গেলে আমাদের উপমহাদেশের এবং বিশেষ করে বুদ্ধিজীবী ও বুদ্ধিজীবীরা কিভাবে অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার কথা ভেবেছিল এবং কিভাবে উত্তীর্ণ হয়েছিল, তার সত্যসন্ধ উচ্চারণ রয়েছে পরিস্থিতির লোকায়ত বর্ণনায় এবং সহজসরল খোলামেলা সংলাপে। জীবনানন্দ দাশের জীবনের অধিকাংশ সময় পূর্ব বাংলার যে শহরে অতিবাহিত হয় এবং যে মহানগরী কলকাতাও ছিল তাঁর নাড়ির মধ্যে জড়িয়ে বিভিন্নসূত্রে, তাদেরই নাড়িনক্ষত্র দিয়ে তৈরী দুটি উপন্যাসেরই কাহিনীভূমি। তফাৎ শুধু এই যে, 'বাসমতীর উপাখ্যানে'র ঘটনাপরম্পরার সবটাই বিভাগপূর্বকালের পূর্ববাংলার এক নদীআশ্রিত তথাকথিত মফঃস্বল শহর এবং বিশেষ করে তার কলেজ এলাকা। 'জলপাইহাটি' উপন্যাসটিতে বিভাগোত্তর পূর্ববাংলার এক কলেজকেন্দ্রিক শহরের পাশাপাশি এসেছে বিভাগোত্তর কলকাতা মহানগরীর জীবনবৃত্ত।

'বাসমতীর উপাখ্যানে' বাংলা বিভাজনের পূর্বাহ্ণে বৃটিশ শাসনের জোয়াল থেকে আসন্ন মুক্তি ও স্বাধীন রাষ্ট্রগঠনের সম্ভাবনা যখন খুব বড় হয়ে সামনে এসেছে, তখন বাস্তব পরিস্থিতির ভিত্তিতে স্বাধীনতার আদর্শও এবং রাষ্ট্রগঠনের বিভিন্ন বিকল্প নিয়ে বিভিন্ন ধরনের যেসব মতামত বেরিয়ে এসেছে, তাতে জল্পনা কল্পনার ধারা মন্থর ও উগ্রতা বিরহিত। বিতর্ক রয়েছে। তবে সিদ্ধান্তের জন্য তেমন কোন জেদাজেদি নেই। কিন্তু 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে বাংলা ও উপমহাদেশ বিভক্ত হয়েছে। স্বাধীনতা এসেছে ধর্মকে ভিত্তি করে দু'টি রাষ্ট্রে। তখনই বিকল্প রাষ্ট্র কাঠামো গঠনের চিন্তাভাবনার অবকাশ নেই। শরণার্থীদের স্রোত ক্রমেই প্রবল হচ্ছে। সুতরাং এখানে কর্মক্ষেত্র ও মর্মক্ষেত্র বেছে নেবার সিদ্ধান্তের দিকেই ঝোঁক বেশি। জলপাইহাটি উপন্যাসে তাই জেদাজেদি ও উগ্রতার পাশাপাশি মনবিনিময়ের দিকটাতে বাস্তব পরিস্থিতির হিসাবটা খুব বড়। দ্বন্দ্বিক যুক্তি-প্রণালীর বিচার বিবেচনার ধারা এখানেও প্রাধান্য পেয়েছে। এই সূত্রে জীবনানন্দকে এখানে বাংলা উপন্যাসের ধ্রুপদী ও আধুনিক ধারাতে একটি নতুন মাত্রা যোগ করার অধিকারী বলে বৈশিষ্ট্য দেখা যায়। সেটা হচ্ছে, যাবতীয় সমস্য ও প্রশ্নের বিবেচনাকে বিশেষজ্ঞদের মহলকে সাধারণভাবে কৌতূহলী মহলের সঙ্গে সংযুক্ত করা। মার্কসবাদ ও রাশিয়াতে তার বলশেভিক প্রয়োগকে এবং এই সংক্রান্ত ঘটনাবলীকে নিত্যনৈমিত্তিক ভাষ্য দেয়া হয়েছে এই কারণেই। 'বাসমতীর উপাখ্যানে' দেখা যায়, এই কলেজ শহরের এক দামাল ছেলে স্বদেশের সন্ধানে ব্রতী হয়ে ইউরোপে প্রবাসী হয়ে শেষ পর্যন্ত মস্কোতে গিয়ে বলশেভিকদেব সঙ্গে মিলিত হয়েছে। 'জলপাইহাটি'তে দখা যায়, অধ্যাপক নিশীথ সেনের ছেলে হারীত সেন দেশ স্বাধীন করার সংগ্রামে ব্রতী হয়ে জেল খেটেছে। তারপর

জেল থেকে বেরিয়ে এসে কমিউনিস্ট হয়ে গণসংগঠন গড়ায় উৎসাহিত করেছে নিজেকে। অধ্যাপক নিশীথ সেনের ভাষায় সে বিপ্লবের অলাতচক্রে অর্থাৎ জলন্ত কাঠের ঘুণ-চক্রে নিজেকে জুড়ে দিয়েছে। নিশীথ সেন জলপাইহাটির কলেজের অধ্যাপনায় বিরতি দিয়ে কলকাতায় উপস্থিত হয়েছেন আর্থিক সংস্থানের তাগিদে। ছেলে হারীত সেন তার প্রধান কর্মক্ষেত্র কলকাতা থেকে জলপাইহাটিতে এসেছে একই সঙ্গে কিছুদিন বিশ্রাম এবং অসুস্থতাকে দেখাশোনা করার জন্য। পিতাপুত্র উভয়েই অবশ্য একটা নৈতিক দায়বদ্ধতার শরিক। পায়ের তলায় মাটি আছে দুজনেরই।

বাসমতীর উপাখ্যানে রয়েছে জীবনানন্দীয় কাব্যিক ধারায় উদ্ভাসিত পূর্ব বাংলার নৈসর্গিক পরিবেশ, বৃক্ষরাজী, আকাশ, চাঁদ, মেঘ, নদী ও গ্রামীণ ধরনের ঘরবাড়ির বিন্যাসে নায়ক নায়িকাদের চলাফেরা ও চিন্তাভাবনার মধ্যে একটা বিশেষ পূর্ববঙ্গীয় ধারা। তেমনি 'জলপাইহাটি' উপন্যাসেও মেঘ চাঁদ আকাশের এবং বৃক্ষরাজীর কোন ঘাটতি নেই। অপরদিকে কলকাতা মহানগরীর গতি এবং বিশেষ করে তার বিদুষী নারীদের নাগরিকতার ধারা জলপাইহাটি উপন্যাসটিকে খুব বেশি প্রভাবিত করেছে। তবে বাসমতীর উপাখ্যান উপন্যাসেও কলকাতা মহানগরী বিশেষ করে বিশ্ববিদ্যালয়ের সূত্রে জোরালো ছায়াপাত করেছে।

এই সূত্রেই আরেকটি ব্যাপার লক্ষণীয়। জলপাইহাটিতে যেমন অধ্যাপক নিশীথ সেন কেন্দ্রীয় চরিত্র, তেমনি বাসমতীর উপাখ্যানে কেন্দ্রীয় চরিত্র অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সেন। বস্তুতপক্ষে দুটি অধ্যাপক চরিত্রই যেন অধ্যাপক জীবনানন্দের দুই প্রতিরূপ। এই দুই অধ্যাপক চরিত্রের মধ্যে দিয়ে জীবনানন্দ তাঁর অসাম্প্রদায়িক, ধর্মনিরপেক্ষ, বুদ্ধিবাদী ও একই সঙ্গে স্বপ্ন কল্পনার ও রূপরঙ্গী অনুভবের উৎসারণ ঘটিয়েছেন। তবে তিনি কোনোমতেই তাঁর উপন্যাসের ধারাকে আত্ম জৈবনিক করে ফেলেন নি। এই দুই অধ্যাপক ছাড়াও যে বেশ কিছু সংখ্যাক নারী ও পুরুষ চরিত্রের ঘনিষ্ঠ জীবন-যাপনের কথা উপন্যাসদুটিতে, বিস্তারিতভাবেই বেরিয়ে এসেছে, তারা তাদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈচিত্র্য ও অনন্যতা নিয়ে দুই অধ্যাপকের জীবনচর্যায় নিজেদের সহজ ছন্দে যুক্ত করেছে। আর এদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে উদ্ভাসিত হয়েছে দুই বাংলার এবং সমভাবেই আমাদের উপমহাদেশের এক ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের কাণ্ডারী ও পথসন্ধানী জনসাধারণ। এই জনসাধারণকে নিয়ে দুচার কথাই মাত্র বলেছেন লেখক। কিন্তু বিভিন্ন ছোটখাট ঘটনার মধ্য দিয়েও এই জনসাধারণ যখন সামনে এসেছে তখন বুঝতে পারা গিয়েছে যে, এরাই একদিন বিপ্লবী উত্থান ও স্বাধীনতার দায়িত্ব গ্রহণের জন্য। তাছাড়া দুই অধ্যাপকের চরিত্রই যে আত্মকেন্দ্রিক হয়নি, তার মূলে রয়েছে সমসাময়িক টালমাটাল এবং এমনকি মার্কসীয় তত্ত্ব ও বিপ্লবের ক্ষেত্রে কয়েকটি নারী চরিত্রের উদ্যোগ ও ভাবনা চিন্তার সম্ভাবনা। উপন্যাসদুটিতেই আমরা মার্কস লেনিন ও কমিউনিস্টদের পেয়েছি একটা সাধারণ অবস্থানে। রাশিয়াতে সমাজতন্ত্রের ব্যর্থতা নিয়ে যেসব কথা আছে উপন্যাসে, তাতে বর্তমান নব্বই-এর দশকের কথা মনে জাগবে। কিন্তু জীবনানন্দের স্পষ্টভাষী ও স্পষ্টভাষিণীরা যেখানে ব্যর্থ-প্রত্যাশার কথা বলেছে, সেখানেও মার্কস ও লেনিন মানবমুক্তির পথদ্রষ্টা হিসাবে যে ভূমিকায় উত্তীর্ণ, সেখানে নীতি ও আদর্শের ব্যাপারটিকে কখনও খর্ব করার প্রশ্ন ওঠেনি।

সুতরাং 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি'র বিস্তারিতে না গিয়ে এ পর্যন্ত যা পেয়েছি তার ভিত্তিতে এই আশাই ব্যক্ত করবো যে, মার্কসীয়-লেনিনীয় চিন্তার এবং সেই

সঙ্গে সাম্যবাদী উত্থানধারার একটা বৈশিষ্ট্য হলো, ধ্রুপদী ও আধুনিকভাবে উভয়ত এর সভ্যতা ও প্রাণশক্তি বিশ্বের বিভিন্ন ও বিচিত্র পর্যায়ের এগিয়ে আসা বহুজাতির বহুবর্ণের বহুধর্মের লোকশক্তির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে রয়েছে। সমূহ বিপর্যয়কেও ভেদ করে সাম্যবাদী উত্থানের ধারা সমাজতন্ত্র স্বাধীনতা ও লোকায়ত গণতন্ত্রের পুনর্বাসন ও নবনব বিন্যাসের মধ্য দিয়ে ঘটবে, অবশ্যই অসঙ্গতিগুলিকে দূর করে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাম্যবাদী উত্থান পরম্পরার স্পার্টাকাসের দাস-বিদ্রোহ হয়ে ফরাসী বিপ্লব হয়ে অক্টোবর সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হয়ে আফ্রিকা-এশিয়া লাতিন আমেরিকার মহাজাগরণ ও উত্থান হয়ে অসঙ্গতি দূর করে এগিয়ে এসেছে সাম্যবাদী উত্থানের ধারা। জাঁ পল সার্ত্রের ভাষায় ফরাসী বিপ্লবের বুদ্ধি ও যুক্তির মুক্তির ক্ষেত্রে যে অসঙ্গতি দেখা দিয়েছিল, তাকে দূর করেন কাল মার্কস। মার্কসবাদ এই জন্যেই তাঁর দৃষ্টিতে এমন একটি দর্শন যাকে পাশ কাটিয়ে যাবার কোন উপায় নেই সাম্যবাদের পক্ষের যে কোন ব্যক্তি বা সংঘের।

এই জাঁ পল সার্ত্রে ১৯৬৮ সালে পশ্চিম ইউরোপে এক সাংস্কৃতিক বিপ্লবী উত্থানের পুরোভাগে দাঁড়িয়েছিলেন প্রথাসিদ্ধ পথ পরিহার করে। এই বছরেই গণজীবনে মাও সে তুং-এর নেতৃত্বে যে সাংস্কৃতিক বিপ্লব ঘটে, তাকে পাশাপাশি রেখে সার্ত্রে '৬৮ সালের সাংস্কৃতিক বিপ্লবের হিসাব নিকাশ রেখে গিয়েছেন তাঁর 'অস্তিত্ববাদ থেকে মার্কসবাদ' নামের সর্বশেষ গ্রন্থে। এখানে তিনি ইউরোপ ও গণচীনের উত্থানদুটির অসঙ্গতির ব্যাপারটাকে খোলাখুলিভাবে সামনে আনতে দ্বিধা করেননি। তাঁর বক্তব্য, এই অসঙ্গতিকে অবশ্যই দূর করতে হবে সাফল্যে পৌঁছবার জন্যে।

(৪)

আমাদের প্রস্তাবনায় এক জায়গায় বলেছি, জীবনানন্দ দাশের উপন্যাসদুটি থেকে তাঁর অবস্থানকে নিয়ে কিছু দৃষ্টান্ত দেবো। তদনুযায়ী এখানে 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' থেকে একটি করে উদ্ধৃতি দাখিল করছি এখানে।

১) 'বাসমতীব উপাখ্যান' থেকে—এই উপন্যাসের ২৪৫ পৃষ্ঠায় আমরা দেখি, অধ্যাপক সিদ্ধার্থ সেনের দুই তরুণী ছাত্রী নায়িকা রমা আর বনচ্ছবিকে স্বদেশ ও বিশ্বের সমসাময়িক জীবনদর্শন নিয়ে ভাবনা চিন্তায় ব্রতিনী। এখানে তিনি এমনভাবে শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে এই দুটি মেয়েরে করণীয়কে সামনে রেখেছেন যা শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাসের নায়িকা সুমিতা কিংবা রবীন্দ্রনাথের শেষের দিকের কিছু নাটক, কবিতা ও ছোট গল্পের নায়িকাদের উপস্থাপিত বক্তব্যের পাশাপাশি চলতে পারে কিংবা কোথাও কোথাও ছাড়িয়েও যেতে পারে।

'বাসমতী উপখ্যানে'র অন্যতম নায়ক ও স্থানীয় ব্রাহ্মসমাজের অন্যতম পরিচালক এবং পদার্থ বিজ্ঞানের এম. এস. সি. নীরেন মহালনবিশ শুনলো যে বনচ্ছবি এবং আরেকটি মেয়ে বিশাখা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এম. এ. পড়তে চায় শুনে বললো,

"বেশ ভাল কথা। অনেকদিন ধরে ইকনমিক্সে পুরুষেরা ধস্তাধস্তি করে আসছে। তারা শেষে মার্কসে এসে সিদ্ধি পেয়েছে। রাশিয়া সেটাকে প্রাথমিক সাফল্য দিচ্ছে—শুনে ভাল লেগেছিল। কিন্তু হল না কিছু। পুরুষের ধাতে এ শাস্ত্র মনের ভূমিতে বা সমাজভূমিতে খুব সম্ভব সিদ্ধ হবার নয়। ইকনমিকস্ নিছক বিজ্ঞান নয়। কিন্তু এটা কি তাহলে? কোন জিনিস মেয়েরা পারে কিন্তু পুরুষেরা পারে না? আছে কিছু এমন জিনিস? রান্না, সেলাই আলপনা আঁকা পিঠে তৈরী করা? সব জিনিসেই পুরুষদের ভেতর থেকে ওস্তাদ জুড়ি

এসে জুটবে। তবে মেয়েরা সৃষ্টি রক্ষা করছে, কিন্তু তাও ত পুরুষের সঙ্গে মিলে যুগল হয়ে। কিন্তু মেয়েরা, সব মেয়েরা নয় অবিশ্যি নিজেদের পরম ভূমিকায় দাঁড়িয়ে মায়ের মত শুশ্রূষা করতে পারে। কখনো কোন পুরুষের বাবার মতো শুশ্রূষার সঙ্গে তার কোন তুলনা হয় না। আজকের পৃথিবীর এই শুশ্রূষা চাইছে—জ্ঞানের ভিতর দিয়ে। দরকার একটা বিশেষ জ্ঞান ইকনমিক্স। কিন্তু একে এর আধুনিক অবস্থায় ফেলে রাখলে চলবে না। অনেক দূর এগিয়ে নিতে হবে, মানুষের সেবা শুশ্রূষার বড় ব্যাপ্ত প্রাণবল সুর এর ভেতরে ফুটিয়ে তুলে। পুরুষেরা কি তা পারবে?''

২) 'জলপাইহাটি' উপন্যাস থেকে—এই উপন্যাসটির ৩২৩-২৪ পৃষ্ঠায় আমরা দেখি। দুই তরুণী সুলেখা ও জুলেখাদের বাসায় বসে হারীত সুলেখার সঙ্গে নিভৃতে আলাপ করছে :

''ভারী চমৎকার দেখাচ্ছে কিন্তু মেঘগুলোকে। যেন ভেঙে গেছে সূয্যি। রাশি রাশি সাদা মেঘ জ্বলজ্বল করে বেড়াচ্ছে। আমাদের ছেলেবেলায় দেখেছি এরকম। আমাদের মৃত্যু হয়ে গেলেও থাকে ওরা। দেশ থেকে দেশে চলে যায়। কেমন অতিমানবের মত মনে হয় সব। ওদের মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিয়ে আমরাই মিথ্যে হয়ে উড়ে উড়ে যাই। ওরা টিকে থাকে কীরকম স্বচ্ছ আনন্দের অন্তঃশীল আনন্দে।''

সুলেখা ভর্ৎসনার সুরে হেসে উঠে বললে, 'এ কেমন স্ট্যালিনের মত কথা হল?'

'স্ট্যালিন?'

'এ কেমন বুখারিনের মত কথা বললে তুমি হারীত?'—নিজেকে শুধরে নিয়ে সুলেখা বললে।

'বুখারিনের মত? কথাটা বলেছি হোরেস্তের নিজের মত, নিশীথ সেনের মত, লুক্রেশিয়াসের মত। এরা বুখারিনের এলাকার বাইরে। সে যা হোক বুখারিনের কথায় অন্য কথা মনে পড়ে গেল। বিপ্লব করতে গিয়ে লোকটা একটা মাত্র ট্র্যাপের পাকে জড়িয়ে গেল। জড়িয়ে পড়তে হয় বুঝি মানুষকে সব দেশে সব কালেই।'

সুলেখা কথা বলবার আগে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখল এক আধ মুহূর্ত, তারপর ঘুরিয়ে এনে একটু চুপ করে থেকে, পরে বলল, 'সব কালেই সব দেশেই। ভারতবর্ষেও যদি তুমি বিপ্লব কর, সবাই যদি বিপ্লবী হয়ে যায়, তাহলেও ওদের হাতে তোমার, তোমাদের মত লোকদের বিচার হবে। তাতে তুমি টিকে থাকতে পারবে বলে মনে হয় না।'

হারীত আকাশের চিলের ডানার সঙ্গে চোখ বুলিয়ে নিয়ে চোখটাকে স্নিগ্ধ করে আনতে আনতে বললে, 'তা হবে খুব সম্ভব। তা আমি জানি। বুখারিনের ভাগ্যের জন্যে প্রস্তুত আছি আমি।'

(৫)

জীবনানন্দের উপন্যাসের উপরোক্ত দুটি উদ্ধৃতি থেকে লেখক ও তাঁর কুশীলবদের সাম্যবাদী উত্থান নির্মাণ সংক্রান্ত চিন্তাভাবনা ও কর্মধারার একটা দিক খুব স্পষ্ট হয়েই বেরিয়ে আসে। সেটা হলো এই যে, মার্কস এবং বলশেভিক তথা লেনিনের প্রতি অন্ধ আনুগত্যের কোন প্রশ্রয়ই ওঠে না সাম্যবাদী তথা সাম্য মৈত্রী স্বাধীনতার সাধনার প্রস্তাবনায়। কিন্তু সাম্যবাদী উত্থানে মার্কস ও লেনিনের আরব্ধ ধারার সঙ্গে সংযুক্তি ও তার প্রতি দায়বদ্ধতা বা স্বীকৃতিতে কোন দ্বিধারও ছায়া পড়েনি কোন কথায় বা আচরণে!

সাধারণত প্রথাসিদ্ধভাবে দেখার দরুন এখানে এই স্বীকৃতি বা দায়বদ্ধতা মনে ধরার

কথা নয়। ধরেনি আরও অনেকের ক্ষেত্রে। যেমন মেক্সিকোর চিত্রশিল্পী ডিয়েগো রিভেরা, গ্রীসের সঙ্গীতশিল্পী সিবিস থিও ডোরাকিস, ফ্রান্সের দার্শনিক ভাষ্যকার কথাশিল্পী জাঁ পল সার্ত্রে এবং এমন কি 'মায়া ও বাস্তবতা' গ্রন্থপ্রণেতা ক্রিস্টোফার কডওয়েলের অবস্থান ও কাজকে প্রথাসিদ্ধভাবে দেখে এদের একসময়ে মার্কসীয় লেনিনীয় ধারা থেকে খারিজ করা হয়েছে। কিন্তু আজ শতাব্দী শেষের টানাপোড়েনে উত্থান পতন পুনরুত্থানের পালায় জমাখরচের হিসাবে এদের দৃষ্টি ও সৃষ্টির সুকান্তের ভাষায় 'রক্তে বোনা ধান' বলেই গণ্য হচ্ছে। এদের দায়বদ্ধতার দিকটা সাম্যবাদী উত্থানের সামগ্রিক ও অবিরত ধারায় বিচার বিবেচনার ক্ষেত্রে বড় মাত্রায় সম্পদ বলেই ধার্য হচ্ছে।

জীবনানন্দ দাশের অবস্থান আজ সাম্যবাদী উত্থানের নব নব সম্ভাবনার প্রত্যয়কে আত্মজিজ্ঞাসায় নিকষিত করেই উজ্জ্বল থেকে উজ্জ্বলতর হয়ে উঠবে। তাঁর লেখা দুইটি উপন্যাসের পাশাপাশি আজ নিশ্চয় নতুন করে তাঁর সমগ্র কাব্য এবং কবিতার কথা ও ফ্যাসিবিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের চল্লিশের দশকের 'কেন লিখি' সংকলনে তাঁর লেখা সাম্যবাদী উত্থানের শতাব্দীর হিসাবের খাতায় আসবে।

কিছুটা পুনরুক্তি হলেও আমরা স্মরণ করবো যে, 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের প্রস্তুতি শুরু হয়েছিল বিশের দশকেই। তখন বঙ্গবাণী পত্রিকাতে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের প্রয়াণের পরে তাঁকে নিয়ে জীবনানন্দের লেখা দীর্ঘ নির্ঘোষপন্থী কবিতা ছাপা হয়েছিল বঙ্গবাণীতে। এই পত্রিকাটিতেই প্রায় একই সময়ে সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়ের 'লেনিন' নামক কবিতা বেরিয়েছিল লেনিনের মৃত্যুর পরে। সর্বোপরি উল্লেখ্য এই যে, বঙ্গবাণী পত্রিকাতে একই সময়ে ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছিল শরৎচন্দ্রের 'পথের দাবী' উপন্যাস। আমাদের উপমহাদেশের অগ্নিযুগের বিপ্লবীরা যে কল-কারখানার শ্রমিকদের সংগঠিত উত্থানকে স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবের আয়োজনকে পুরোভাগে রেখে চিন্তাভাবনাকে নতুনভাবে বিন্যস্ত করছিলেন বিশের দশকের শুরুতে, তার গভীর ও বিস্তারিত পরিচয় রয়েছে 'পথের দাবী' উপন্যাসের নায়ক ডাক্তারের দীর্ঘ সংলাপে। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করে রাখা যেতে পারে, তদানীন্তন শাসক ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষীয়রা আইনমন্ত্রকের পরামর্শে 'পথের দাবী' উপন্যাসকে নিষিদ্ধ করেছিল। আইনমন্ত্রক বলেছিল, 'পথের দাবী' খোলাখুলি বলশেভিকবাদ ও শ্রমিকবিদ্রোহের ডাক দিয়েছে এবং সরকারের পতন ঘটাতে চেয়েছে। জীবনানন্দ দাশের চিত্তরঞ্জন দাশকে নিয়ে লেখা কবিতা এই সব কিছু জেনে শুনে বুঝেই লেখা। সাম্য স্বাধীনতা গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের চিন্তাভাবনা হয়েছিল তাঁর নিজস্ব পরিবেশেরই ব্যাপার। তিনি যে তাঁর কবিতায় চল্লিশের দশকে লেনিনকে মনুষ্যত্বের ও মানবিকতার ইতিহাসে বুদ্ধ ও সক্রেটিসের পাশে রেখেছেন, এটা তাঁর উপরোক্ত লালনের একটা ইশারা। 'বাসমতীর উপাখ্যান' ও 'জলপাইহাটি' জীবনানন্দ অবশ্যই তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতেই লালিত ও অবিরত নিরীক্ষিত সাম্যবাদী উত্থানঘটিত অবস্থান বিষয়ে বড় মাত্রায় নিয়ে এলেন আমাদের উপমহাদেশের বিভক্ত স্বাধীনতা লাভের সন্ধিক্ষণে। প্রমাণ রেখে গেলেন তিনি সাম্যবাদী উত্থানকে কত গভীর ভাবে রেখেছিলেন তাঁর সৃষ্টি ও দৃষ্টিতে। এই দুটি উপন্যাস প্রমাণ করছে, সাম্যবাদী উত্থানের প্রতি তাঁর এবং গোটা শতাব্দীরই রূপকারদেরই দায়বদ্ধতা কত গভীর। সঙ্গে সঙ্গেই সাম্যবাদী উত্থানের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া যে কত সুদূরপ্রসারী ও প্রবল এবং নিত্য নব সৃষ্টি দৃষ্টির দাবীদার, তার প্রমাণ রয়েছে উপরোক্ত দুটি উপন্যাসে।

জীবনানন্দ দাশ ও তাঁর উপন্যাস

—

রবীন্দ্রনাথের পর জীবনানন্দই যে বাংলা কবিতায় সর্বাপেক্ষা ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছেন এ কথা কবিরাই বলে থাকেন। বিশেষ করে পরবর্তী কবিরা—যাঁরা পঞ্চাশ বা ষাট থেকে কাব্যচর্চা শুরু করেছেন। জীবনানন্দই বোধ হয় একমাত্র কবি যিনি পরবর্তীকালে সর্বশ্রেণীর পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য হয়ে উঠেছেন, যাঁর জনপ্রিয়তা কবি হিসেবেই গত পঁচিশ তিরিশ বছরে অনেক বেড়ে গিয়েছে। কোন গুণে, কী মন্ত্রে তিনি এই কাব্যপাঠে অনিচ্ছুক বাঙালী বৃহত্তর পাঠকসমাজকেও আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছেন সে-প্রসঙ্গ আলোচনার স্থান এটা নয়। আর তাঁর কাব্যালোচনা অন্যে করেছেন, অন্তত বুদ্ধদেব বসু জীবনানন্দের কাব্যের যে আলোচনা করেছেন তার তুলনা নেই।

জীবনানন্দর অল্প কিছু গদ্য রচনা—গল্প ও উপন্যাস আমার আলোচ্য বিষয়। আমরা জানি, যিনি কবি তিনি শুধু কাব্য রচনাই করবেন এমন কোনো সাধারণ নিয়ম নেই। বরং সাহিত্যের ইতিহাসে দেখা যায়, কাব্য রচনা ছাড়াও কবিরা অন্যান্য শিল্পমাধ্যমে নিজেদের প্রকাশ করেছেন। বিদেশে তো বহু, স্বদেশেও আমরা রবীন্দ্রনাথকে পাই যিনি সাহিত্যের সকল মাধ্যমেই তাঁর অবিশ্বাস্য প্রতিভার স্বাক্ষর রেখে গিয়েছেন। তবু এমন মনে হতে পারে, সকলেই গ্যেটে বা রবীন্দ্রনাথ নন, কাজেই প্রতিভার তারতম্য রয়েছে—; সর্বদিকে হাত বাড়াবার চেষ্টা সত্ত্বেও এক একজন এক একটি মাধ্যমকেই আত্মপ্রকাশের সবচেয়ে সার্থক বাহন হিসেবে আবিষ্কার করে নেন।

কোথায় যেন পড়েছিলাম, কবিতাকেই জীবনানন্দের 'প্রথমা' বলা হয়েছে। সম্ভবত প্রথমা কথাটি ব্যবহার করা হয়েছিল, জীবনানন্দের কাব্য বিষয়ে গভীরতম অনুরাগ ও কাব্যে তাঁর স্বাচ্ছন্দ্য বিহার বোঝাতে। এ বিষয়ে তর্ক তুলে লাভ নেই, কেননা জীবনানন্দ কবিতাকেই তাঁর অনুভূতি ও কল্পনাশক্তি প্রকাশের প্রধান মাধ্যম হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তাঁর সৃষ্টি তাঁর মনোজগৎ, তাঁর অভ্যন্তর চেতনা কাব্যে পরিপূর্ণভাবে বিকশিত হয়ে উঠতে পেরেছিল। কিন্তু মনে রাখতে হবে, কবি তাঁর কাব্য রচনার সেই সিদ্ধির যুগেই কিছু কিছু গদ্য রচনায় হাত দিয়েছিলেন। কেন দিয়েছিলেন এ প্রশ্ন সাধারণ লেখকের বেলায় হলে তার একটা সহজ উত্তর থাকত, আমরা বলতে পারতাম, শখ করে। জীবনানন্দের বেলায় সে কথা বলা যায় না, যেমন বলা যায় না পিকাসো কেন একটি নাটক রচনায় হাত দিয়েছিলেন। জীবনানন্দর গল্প উপন্যাস রচনার কারণ হিসেবে ডঃ অমলেন্দু বসু চমৎকার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন ঃ "বহুধা-বিভক্ত আধুনিক চিত্তের জটিলতা এতই অচ্ছেদ্য, এতই দুর্জ্ঞেয় যে মাত্র একটি শিল্প মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করে শিল্পী সন্তোষ বোধ করেন না, তাঁকে ছুটে যেতে হয় নূতন নূতন শিল্পকর্মে, তাঁকে নিরত থাকতে হয় নূতন নূতন শিল্প মাধ্যমের নিরীক্ষায়।.....তাঁর কবিতায় (আমরা) পরিপর্ণ তৃপ্তি লাভ

করি, তবুও মনে হয় তিনি স্বয়ং হয়তো কোথাও সাধ ও সাধ্যের ব্যবধান বোধ করেছিলেন এবং বোধ করেছিলেন বলেই কবিতা ছাড়াও কথাসাহিত্য রচনায় কিছুটা আত্মনিয়োগ করেছিলেন।"

অমলেন্দুবাবুর এই ব্যাখ্যার বাইরে আরও কিছু যোগ করা যায় হয়ত, তিনি নিজেও 'মাল্যবান'-এর ভূমিকায় আরও বিস্তৃত করে কথাটি বোঝাতে পেরেছেন—কিন্তু আপাতত আমরা মেনে নিচ্ছি, কবি কোথাও কোথাও অনুভব করেছিলেন, গল্প উপন্যাস রচনা ছাড়া 'বস্তুনিষ্ঠ সময়চেতন বহির্জগতের অন্তত আংশিক প্রকাশ' ঘটানো সম্ভব নয়।

এই চিন্তা বা দ্বিধার দরুন জীবনানন্দ কয়েকটি গল্প উপন্যাস লেখেন। গল্পের সংখ্যা তিন। ছায়ানট, গ্রাম ও শহরের গল্প, বিলাস। তিনটি গল্পই 'জীবনানন্দ দাশের গল্প' নামক গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত। গল্পগুলি মোটামুটি ত্রিশের দশকেই লেখা। এর পর দীর্ঘকাল জীবনানন্দ কোনো গদ্য রচনা করেছেন কিনা আমি জানি না। তাঁর 'মাল্যবান' উপন্যাসের রচনাকাল জুন ঃ ১৯৪৮ সাল। ধরে নিতে পারি এক যুগ তিনি আর গল্প উপন্যাস রচনায় হাত দেন নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অন্তে, দেশ বিভাগের পর জীবনানন্দ যেন অকস্মাৎ পর পর দুটি উপন্যাস রচনা করেন। প্রথম রচনাটি মে-জুন মাসে ১৯৪৮ সালেই লেখা হয়। নাম 'সুতীর্থ'। দ্বিতীয়টিও জুন মাসে, ওই একই সালে। দ্বিতীয়টির নাম 'মাল্যবান'। এটি পুস্তকাকারে প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৩ সালে। বলা বাহুল্য, কবির প্রথম উপন্যাস 'সুতীর্থ' এতকাল আমাদের অগোচরে ছিল। সম্প্রতি তা দেশ পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে।

কবিভ্রাতা অশোকানন্দ দাশ—যিনি বহু যত্নে এই গ্রন্থটির পাণ্ডুলিপি উদ্ধার করে আমাদের হাতে তুলে দিয়েছেন তাঁর কিছু বক্তব্য এখানে নিবেদন করি। অশোকানন্দ বলেছেন ঃ

"জীবনানন্দ দাশের প্রথম উপন্যাস 'সুতীর্থ' ১৯৪৮-এর মে-জুন-এ লেখা। প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৭৬-এ। এই দীর্ঘকাল তাঁর উপন্যাস অপ্রকাশিত হয়ে থাকার একটা ইতিহাস আছে। জীবনানন্দের মৃত্যুর পরে তাঁর রচনার সমস্ত পাণ্ডুলিপি আমার হাতে আসে। শ্রীবুদ্ধদেব বসুর সম্পাদিত 'কবিতা' ও অন্যান্য কয়েকটি পত্র-পত্রিকায় তাঁর কয়েকটি গল্প ও কবিতা তখন প্রকাশিত হয় এবং সিগনেট প্রেস থেকে 'রূপসী বাংলা' ও পরিবর্ধিত সংস্করণ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' বের হয়।

কিন্তু উপন্যাসগুলো প্রকাশ সম্বন্ধে কী তাঁর কল্পনা-ভাবনা, পরিমার্জনা সম্বন্ধে কিই বা তাঁর চিন্তা ছিল সবই অব্যক্ত থেকে গেছে। তাই এগুলো প্রকাশে আমার কিঞ্চিৎ সংকোচ ছিল। 'সুতীর্থ' উপন্যাসটি শ্রীসঞ্জয় ভট্টাচার্য এবং 'মাল্যবান' উপন্যাসটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন অধ্যাপক শ্রীঅমলেন্দু বসুকে আমি পড়তে দিয়েছিলুম। তাঁরা দুজনেই উপন্যাসগুলি প্রকাশ করবার জন্য আমাকে উৎসাহিত করেন। রচনাগুলি আমার কাছে থাকলেও এগুলি প্রকাশ করবার অধিকার ছিল তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী লাবণ্য দাশের অনুমতিসাপেক্ষ। সাহিত্যিক বা পাঠক সমাজ কবির উপন্যাসগুলি কেমনভাবে গ্রহণ করবেন এ সম্বন্ধে দ্বিধা থাকার দরুনই হোক বা অন্য কোন কারণে হোক তিনি দীর্ঘকাল এই উপন্যাসগুলি প্রকাশ করবার অনুমতি দেননি। ১৯৫১ সালে আমার ভগ্নী শ্রীমতী সুচরিতা দাশের সনির্বন্ধ অনুরোধে তাঁর কাছ থেকে উপন্যাস প্রকাশের অনুমতি লাভ করি। কালবিলম্ব না করে তাঁর ছোট উপন্যাস 'মাল্যবান' প্রকাশিত হয়।

একথা বললে হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে 'মাল্যবানের' প্রচ্ছদপট অঙ্কনের সময় মাল্যবানের প্রুফ পড়ে শ্রীসত্যজিৎ রায় এত মুগ্ধ হন যে তিনি জীবনানন্দের সমস্ত অপ্রকাশিত উপন্যাস প্রকাশের জন্য বারংবার আমাকে অনুরোধ করেন। আমরাও এ বিষয়ে পুনরায় সচেষ্ট হই।

কিন্তু, ছোট ছোট অক্ষরে দ্রুত লিখনের জন্য জীবনানন্দের পাণ্ডুলিপির পাঠোদ্ধার সহজসাধ্য নয়। কোথাও লাইনের নীচে দাগ আছে, কোথাও দুটি শব্দ পাশাপাশি আছে, যে পাঠ আমাদের অধিকতর উপযোগী মনে হয়েছে তাই আমরা গ্রহণ করেছি। জীবনানন্দের উপন্যাস প্রকাশনার দীর্ঘ বিলম্বের জন্য সাহিত্যিক সমাজের কাছে আমার যে কৈফিয়ৎ দেয় ছিল, তা এই।''

অবচেতন উপলব্ধির নীলিমা ঃ গ্রাম ও শহরের গল্প

সুনীলকুমার নন্দী

আধুনিক কবিতার অন্যতম ঐশ্বর্যবান কবি জীবনানন্দ দাশের কয়েকটি গল্প প্রথম আবিষ্কৃত হয় 'অনুক্ত' পত্রিকায়। ১৯৫৬ সালে প্রথম প্রকাশিত এই গল্পটির সঙ্গে সংযুক্ত সম্পাদকীয় মন্তব্য জানিয়ে দেয় গল্পের রচনাকাল ১৯৩৬। স্বভাবতই পাঠকমনে প্রশ্ন জাগে, এতটা দীর্ঘদিনের মধ্যেও কেন এ-গল্প কবি প্রকাশ করেননি। প্রশ্ন আমার মনেও প্রথম জেগেছিল; কিন্তু গল্পের পাণ্ডুলিপি পাঠান্তে প্রশ্নের সমাধান এসে যায়। আশ্চর্য আঙ্গিকে ও উপলব্ধিতে প্রায় কবিতার মতো তাঁর গল্পও যেন বাংলাসাহিত্যে অনন্য—বিপর্যস্ত-পিচ্ছল মনোবিশ্লেষণী বিষয়বস্তুর সঙ্গে গঠন-নৈপুণ্যে যে-সর্বাধুনিক ইঙ্গিতময়তা, বাংলাসাহিত্যে তার পাঠক হয়তো তেমন প্রস্তুত ছিল না;—এ-আশঙ্কা নিতান্ত অমূলক বলা যায় কি? যে ছিল তাঁর প্রথমা সেই কবিতারই অনুরাগীর সংখ্যা, কবির জীবিতকালে, তেমন ছিল কিনা এ-সংশয়ের প্রচুর অবকাশ বিদ্যমান। অথচ প্রকৃত সাহিত্য-পাঠকের কাছে আজ বিন্দুমাত্র অস্পষ্ট থাকা উচিত নয় যে, তাঁর প্রথম ও মধ্যপর্বের কবিতায় আক্রান্ত তিরিশের একাধিক উল্লেখ্য কবি ও চল্লিশের অধিকাংশ, আর উত্তরকাব্যে আচ্ছন্ন পঞ্চাশের বিপুল তারুণ্য—ফ্যর্ম, ডিক্‌শন্, ইডিঅ্যাম্ মাত্র নয়—বস্তুত, রবীন্দ্র-পরবর্তী কবিতার মূল চরিত্রে যে-প্রাণপ্রবাহের তাড়না, সেখানে তিনি প্রধান পুরোহিত। সুতরাং চারিদিকে এই অশিক্ষিত বেদরদীর ভিড়ে দ্বিতীয়ার প্রকাশে কবিমনে অভিমান-মিশ্রিত দ্বিধা আসা বিচিত্র নয়। এবং এই দ্বিধাই প্রবল ভিতর-তাড়িত গল্পের রচনায় বাধা দিতে না-পারলেও, তাদের পাঠকের সামনে আনতে হয়তো প্রতিকূলতা করেছে।

বর্তমান গল্পটি ত্রিকোণাকার—প্রকাশ, তার স্ত্রী শচী, আর তাদের প্রথমযৌবনের বন্ধু সোমেনকে নিয়ে পরিণত মনের তির্যক প্রণয়-বিশ্লেষণ। সোমেন শচীকে একদা ভালোবেসেছিল, কিন্তু পায়নি—পরিবর্তে বন্ধু প্রকাশের সঙ্গে শচীর বিয়ে হ'য়ে যায়। আট-দশ বছরের দীর্ঘ ব্যবধানের পর শচী ও প্রকাশের সঙ্গে সোমেনের অতর্কিত দেখা। এক বর্ষার রাত্রিতে। গল্পটির সূচনা এখানে থেকে।

শচী আজ সোমেনের দৃষ্টিতে 'বৈদগ্ধ্যেভরা—অথচ স্নিগ্ধ—তার শরীর প্রকাশের জন্যে না-জানি কত-কী রোমাঞ্চে উর্বর'। প্রকাশের কাছে 'শচী প্রায়ই ভালো মানুষ, কিন্তু মাঝে মাঝে অত্যন্ত দুঃসাধ্য হ'য়ে ওঠে'; তবে 'শচীর নিকটতম বন্ধু প্রকাশই তো বটে; প্রকাশ সব বোঝে—দরকার মতো নিজেকে স্ত্রীর ব্যবহারের জন্যে রূপান্তরিত ক'রে ফেলতে পারে'। আর শচীর মনে 'সোমেন—জীবন-ব্যবসায়ের প্রতি অবিশ্বাসী—জীবনকে চায় শুধু; খড়্গের মতো কঠিন—চোখা বিচারবোধটাকে কল্পনার রেশমী মাকড়ের জালে জড়িয়ে নিষ্ক্রিয় ক'রে রাখতে ভালোবাসে সে; ভাবপ্রবণতায়—আবেগে—ব্যঙ্গে—নিষ্ক্রিয়তায় নিরর্থক হ'য়ে রইল; অনাবিষ্কৃত খনির সোনার মতো

কোথাও প'ড়ে আছে সে'—আর প্রকাশ 'নিজের অস্তিত্বকে যথাস্থানে ক্ষুণ্ণ ক'রে দিতে রাজী, কাজ হাঁসিল করতে ওস্তাদ, রসিকও, রসবোধ সম্পন্ন, মাত্রাজ্ঞান খুবই আছে, অক্লান্ত, কিছুতেই ঘাবড়ায় না। জয় ক'রে চলেছে। ....রূপোর টাকার মতো জীবনের বাজারের পথে তার সর্বজনপ্রিয় সর্বজয়ী বাজনা বাজিয়ে চলেছে'।

নানা বাঁক ঘুরতে ঘুরতে রাত্রির অন্ধকারে তীরের ফলার মতো একটা আর্ত ইঙ্গিত টেনে গল্পটি শেষ হ'চ্ছে ঃ 'আজকে সে শচীকে পুরোপুরি নিজের যে-কোনো প্রয়োজনে লাগাতে পারে—শচী সে-জন্যে প্রস্তুত, ব্যাকুল,' কিন্তু এই সোফার উপর?—বকমোহানার নদীর ধারে যা একদিন হয়েছিল বনজঙ্গলের আবছায়ায় নক্ষত্রের নীচে জলের গন্ধের কাছে! ভাবতে গেলেও ব্যথা—ভাবতে গেলেও ব্যথা। এই কামরার ভিতর এক মুহূর্তের জন্যেও আর টিকে থাকতে পারছে না সোমেন। একটা হ্যাভানা নিয়ে এক মুহূর্তের ভিতরই রাস্তায় উঠল গিয়ে।'

অবচেতন উপলব্ধির আত্মমগ্ন তীব্রতা ও আঙ্গিকের সুতীক্ষ্ণ সাঙ্কেতিকতা নিয়ে গল্পটি মিলিত হয়েছে সুরিয়্যালিজ্‌ম-এর সুড়ঙ্গ সন্ধানে—যা কিনা '*...the automatic, illogical, uncontrolled fantasies and associations of the mind represent a higher reality than the realistic, deliberately manipulated world of practical life*'; এবং ওই নিমগ্ন চেতনার প্রাকৃতপীড়ন যেন এনেছে অন্তর্লীন জীবনবোধের প্রতীতি ঃ

১. শীতের রাত—শীতের গভীর রাত—বাংলার শীতের গভীর রাত, প্রকাশ তাকে নিয়ে যেন কোনো বাংলার মাঠে আমনের ক্ষেতের পাশে টুপুর-টাপুর শিশিরের ভিতর কোনো মধুমতী কর্ণফুলী আড়িয়াল খাঁ নদীর কিনারে প্রোথিত ক'রে রাখে—হা ভগবান, প্রোথিত ক'রে রাখে যেন।

২. হয়তো চোখের জল ফেলবে, আমাকে জড়িয়ে ধরবে, চুমো দিতে দেবে—কাঁধে মাথা রেখে কাঁদবেও হয়তো—হয়তো আর ফিরেও যেতে চাইবে না—হয়তো ব্যবহার করতে দেবে তোমাকে—কিন্তু সে-সব একটা দুপুরের জন্যে শচী, পাড়াগাঁর মাঠ জঙ্গলের আচ্ছন্ন দুপুর বড় মারাত্মক—কিম্বা একটা সন্ধ্যা—একটা রাতের জন্যে। পরদিন ভোরেই তুমি এক সাঁতারে বারো-চোদ্দো বছরের ওপারে চ'লে যাবে, কে তোমাকে ধরতে পারবে?

বিচিত্র ঘাত-প্রতিঘাতে সময়ের স্বরূপ ঃ যুগমানসের অবসাদ, নৈরাশ্য, অসহায় নিরালম্বতা জীবনানন্দের চেতনাকে ব্যথিত করেছে, বিপন্ন করেছে;—তিনি এই রোগজর্জর সময়ের মুক্তি খুঁজেছেন শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ইত্যাদি জাতীয় হৃদয়নির্ভর মানবীয় সম্পর্কে—যা প্রায়শ, নিরাবয়ব বক্রতায় জটিল—তারই পুনর্মূল্যায়নে, তারই স্বাভাবিক বিকাশ-ক্রমবিকাশে।

এ-গল্পের তলদেশেও অনুরূপ সামাজিক চেতনার অনুভব, অনুভবের প্রতিফলন। গল্পের নামকরণে ও তার তাৎপর্যে সম্ভবত আলোকিত গল্পের উৎস, গল্পের অন্তঃপ্রবাহ। আমাদের সামন্ততান্ত্রিক সম্পত্তি-সচেতন গ্রামীন অর্থনীতির সীমাবদ্ধতা ও আধুনিক শিল্প-বিন্যাসের উৎকেন্দ্রিকতা—উভয়ের ওই ভারসাম্য-বর্জিত মিশ্র ছায়াপাতের ফলশ্রুতিই, আমার মনে হয়, গল্পের বর্ণিত চরিত্র ও তাদের নিমগ্ন চেতনা-প্রবাহ। এবং এই নিমগ্ন চেতনার প্রাকৃতপীড়নে তারা অনিয়ন্ত্রিত, আপাত-দুর্বোধ্য, হয়তো প্রচলিত অর্থে তেমন স্বাভাবিকও নয়।

গল্পের চরিত্র তিনটি একটু আলগা করলে হয়তো প্রসঙ্গটি অধিকতর পরিষ্কার হ'তে পারে। শহরের শিল্প বিন্যস্ত সমাজব্যবস্থার পোশাক চাপালেও, প্রকাশের ভিতর মহলে যেন র'য়ে গেছে সংকীর্ণ সম্পত্তি-সচেতন গ্রাম্যতা। শচী-সম্পর্কে মাঝে মাঝে তার মনে উঁকি দেয় যে-সন্দেহ, তাকে সরিয়ে দেয় কে—ভালোবাসা, না শীলিত নির্লিপ্তি?—না, ও-সব কিছু নয়—এমনকি, সম্মানজনক কোনো বিশ্বাসবোধও নয়—সরিয়ে দেয় যে-মনোভঙ্গি, সে ওই পোশাক-চাপানো 'জীবনের ব্যবসায়ে জিতবার' এক অভিনব স্থূলতা ঃ 'কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই কোনোদিকে গড়ায় না ঃ সবই যায় ধোঁয়া হ'য়ে, শচীর স্বামী হ'য়ে প্রকাশই তো থাকে।' গ্রাম-জীবনের প্রতি শচীর আসক্তি মায়াময় কিন্তু অনির্দিষ্ট—আর্ব্যানিটি-র নিহিত টানে কেমন টালমাটাল, ক্ষণিক উত্তেজনায় শিথিল। প্রথম প্রেমের স্মৃতি-সঙ্গ বকমোহানা—বকমোহানার টান যত গভীরই হোক-না-কেন, নিরাপত্তার প্রশ্নে আয়াসের স্বাচ্ছন্দ্যে প্রকাশ, প্রকাশের আশ্রয়—প্রকাশকে নিয়ে 'কোনোদিন কোনো বেগ পেতে হয়নি তার, এমন পারদর্শী—পরিহাস প্রবল—সুচতুর অক্লান্ত লোক, শচীকে সে ঢের সুখ দিয়েছে। সুস্থিরতা দিয়েছে—'। আর 'খড়্গের মতো কঠিন—চোখাবিচারবোধে'র অধিকারী সোমেন? তাকে ভর-করা গ্রাম-জীবনের বিশ্বস্ত আবেগ, আগ্রাসী রুগ্ন অ্যার্ব্যানিটি-র চাপে অদ্ভুতভাবে বিপর্যস্ত। তার উদ্ভট বাউণ্ডুলেপনা তাই নিছক বোহিমিপনা নয়, এ-হ'লো কর্মকাণ্ডের সূত্র-ছিন্ন পরিবেশের হাতে অনুভূতির অভিজ্ঞান গচ্ছিত রাখতে না-পারার অক্ষমতা। প্রসঙ্গত, শচীর কাছে সোমেনের স্বীকারোক্তি লক্ষণীয় ঃ 'তোমাকে নিয়ে সেই বকফুল বনধুঁধুল কলমীলতা বাঁশবনের ভিতর গেলে আমি তো আর ফিরে আসতে পারবো না'। অথবা 'কলকাতার মেসের জানালার ভিতর থেকে তাকিয়ে যখন দেখি দূরে একটা পাতাশূন্য শিমূলগাছের লাল ফুলগুলো সব ফুটল তখন যে-আক্ষেপ যে-গ্রামলোলুপতা আমাকে পেয়ে বসতে পারতো নতুন জীবনের প্রয়োজনের কাছে সে-সবকে উপহাস্যস্পদ ক'রে তোলাই ঠিক মনে করি—অনেকদিন থেকেই মনে ক'রে আসছি';—কিন্তু পারে কই? কথায়-কথায় সেই বিশ্বস্ত আবেগ মাথা তুলতে, তাই হয়তো 'খানিকটা সময়োপযোগী ভাবপ্রবণ' হ'য়ে-ওঠা শচীর সঙ্গে, বালিগঞ্জের 'এই কামরার ভিতর এক মুহূর্তের জন্যেও আর টিকে থাকতে পারছে না'। আবেগ-তাড়িত হ'য়ে উদ্‌ভ্রান্তের মতো পথে নামে।

এম্নি সব বিপরীত ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় ও অনুভাবনার ভগ্নাংশে আবর্তিত চরিত্রক'টির অন্তর্লোকের চেতন-অবচেতন ও স্বপ্ন-জাগর আলো-অন্ধকারে নিমজ্জিত গল্পটি, মৃদু ঢেউয়ে ঢেউয়ে পরিণত শিল্প-সিদ্ধির শিখরদেশ স্পর্শ করেছে। স্পর্শ করছে তার অমোঘ শব্দে—শব্দের চিত্রে—চিত্রের গন্ধে—গন্ধের টোকায় আমাদের উন্মোচিত বিষাদ-ঘন উপলব্ধি, উপলব্ধির নীলিমা,—যে-নীলিমায় প্রসারিত মানবিক বিবেক-বোধের দিগন্ত।

সুশীলা আর কল্যাণী

আলোক সরকার

সম্প্রতি জীবনানন্দ দাশের অনেক গল্প পড়ার সুযোগ হয়েছে। নানা ধরনের গল্প—অনেক গল্পে সমকালীনতা যেমন সোচ্চার সেইরকম অনেক রচনায় চিরদিনের মানুষের বিষাদ-দুঃখ-বেদনা। কিছু গল্পে এমন মানুষজনের কথাও আছে যা পড়তে পড়তে আমাদের খুব সহজভাবেই বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রাথমিক প্রাকৃত নরনারীদের কথা মনে পড়ে। যেমন 'প্যাঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে' নামের গল্পটি। কল্যাণী যদিও তার চলন-বলনে অনেক মার্জিত, তবু বলা যেতেই পারে আন্তরধর্মে বিভূতিভূষণের 'মৌরীফুল' গল্পের সুশীলার সঙ্গে একাকার; কল্যাণী আর সুশীলার আর্তি আকাঙ্ক্ষার, বস্তুত, কোনো তফাত নেই। কল্যাণীর বেদনা সন্তানহীনতার বেদনা, তার একমাত্র আশ্রয় তার স্বামী—স্বামীর ভালোবাসা আর সেই ভালোবাসার নিবিড়তা বিষয়ে সংশয় কল্যাণীর জীবনকে সর্বতো অস্থিত করে, এগিয়ে দেয় আত্মহননের দিকে। সুশীলাও সন্তানহীন এবং তারও জীবনছন্দ স্বামীর ভালোবাসা কেন্দ্রিক, তার উদ্বেগ তার অস্থিরতা স্বামীর ভালোবাসা হারিয়ে ফেলার অসহায়তা, ভয়। গ্রাম্য বালিকা বধূ সুশীলা, যতই মুখরা, কুঁদলে হোক, মূলত সরল—"তাহার পরে সে একটু আনাড়ি ধরনে হাসিয়া উঠিল—হিঃ হিঃ হিঃ! কেমন সুন্দর কথাটি—মৌরীফুল—মৌরীফুল—মৌরীফুল—তুমি যে হলে গিয়ে আমার নদীর ধারের মৌরীফুল—তোমায় কি ভুলতে পারি?"

"কথা শেষ না করিয়াই সে দুই হাতে সঙ্গিনীর গলা জড়াইয়া ধরিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার কালো চোখ দুটি জলে ভরিয়া গেল।" কল্যাণীও একইরকম—"এইরকম শিশু। মুখখানা দেখলাম শিশুসুলভ আমোদ ও কাতরতায় ভরে উঠেছে।" তবু কল্যাণী ও সুশীলার কথা পাশাপাশি মনে এনে, 'প্যাঁচা ও জোনীকিদের মধ্যে' আর 'মৌরীফুল' দুটি গল্প পাশাপাশি মনে এনে আমরা বুঝতে পারি সুশীলার বেদনা যত ঘন গভীর হয়ে বেজে উঠেছে' কল্যাণীর বেদনা তেমন করে আমাদের স্পর্শ করে না। এমনটি কেন হল প্রশ্ন তুলে মনে হয়েছে সুশীলার গল্পে আমরা সুশীলাকে প্রত্যক্ষত সামনে পেয়েছি, কল্যাণীর গল্পে অনেক দূর অবধি কল্যাণী আর তার স্বামী আমাদের নিকটতায় থাকলেও, একেবার শেষদিকে, সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গায় কল্যাণী আমাদের সান্নিধ্য থেকে স'রে যায়, থাকে কেবল তার স্বামীর মুখে ঘটনার বিবরণ দান, যার সবটাই অনুমানজাত সিদ্ধান্ত। আত্মহননের মুহূর্তে, আত্মহননের আগে, আত্মহননের প্রস্তুতিপর্বে কল্যাণীকে আমরা দেখতেই পেলুম না—তার মনের আকৃতি অসহায়তা অভিমান নিঃস্বতা সবই আড়ালে থেকে গেল। সেইমুহূর্তে কল্যাণীর কী মনে হয়েছিল, তার যুক্তি তর্ক কেমন ছিল, এইসব লেখক নিজের ব্যক্তিগত বিচারকেন্দ্র থেকে আমাদের জানায়। কল্যাণী সামনে আসার অবকাশই পায় না। পাশাপাশি মৃত্যুর কাছাকাছি এসে সুশীলা ভাবছে—"তাহার সেই স্বামী, যে স্বামী পাঁচ

ছয় বৎসর পূর্বে এমন সব রাতে তাহাকে সমস্ত রাত ঘুমাইতে দিত না। সে পান খাইতে খাইতে চাহিত না বলিয়া কত ভুলাইয়া পান মুখে গুঁজিয়া দিত— সেই স্বামী এরূপ করিল? পান খাওয়ানোর কথাটিই সুশীলার বারবার মনে আসিতে লাগিল।''

ছোটগল্প উপস্থাপনধর্মী। কাহিনীর পরিস্থিতির ভাবানুভবের স্পর্শময় সংরাগী এবং অবশ্যই নিরপেক্ষ উপস্থাপনার সীমাতেই তার কর্তব্য চিহ্নিত। বিভূতিভূষণের 'মৌরীফুল' গল্প শেষাবধি এই উপস্থাপনায় ধর্মোনিষ্ঠ, জীবনানন্দর 'প্যাঁচা ও জোনাকিদের মধ্যে' অন্তিমে ভ্রষ্ট। এই উপস্থাপনার ধর্মবিশ্বশিল্পী প্রকৃতির ধর্ম—নির্বিশেষ এবং একই সঙ্গে ধ্বনিসংহত। বিশ্বশিল্পী কেবল যা ঘটছে সেটুকুই বলে, সেখানে মিতভাষণ যেমন নেই, সেইরকম অতিকথনেও তার অনীহা। দেখ, এই আকাশ, এখানে এখন মেঘ ভেসে চলেছে, সকালের আলো পড়েছে মেঘের উপর, মেঘের রঙ সাদা, সকালের আলোর রঙ সোনালী, মেঘের সঙ্গে সঙ্গে সকালের আলো অর্থাৎ একটা সোনালীও ভেসে চলেছে—খুব বড় একটা আকাশ, টুকরো টুকরো সাদা মেঘ, তার সংখ্যাও খুব কম নয়। কেবল এইটুকু, এইটুকুই। অর্থাৎ উপস্থাপনা—যে প্রয়াসে সব শিল্পীই, বিশ্বশিল্পী, সব শিল্পীই একাগ্র, ছোটগল্পের মৌল অভীপ্সা তার বেশি কিছু নয়। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝামাঝি যেটুকু জেগে থাকা অর্থাৎ জীবন, তা যতটা অর্থহীন, সেইরকমই একটা বোবা নিশ্চল অর্থময়তা, বা বাঁচার প্রতিটি পদক্ষেপে, দৃশ্যের প্রতিটি উচ্চারণে নিশ্চয়তা অর্থাৎ অর্থহীন অর্থময়তা; স্ফুরিত নিস্তব্ধ বিশ্বশিল্পী অর্থাৎ প্রকৃতি কত অপ্রয়াস আমাদের তা বোঝাতে চায়। সব শিল্পীই চায়।

এই উপস্থাপনধর্মিতা সব চাইতে প্রত্যক্ষ চিত্রশিল্পে এবং বলাবাহুল্য অনেক অনেক বেশি ভারমুক্ত বন্ধনবিহীন সঙ্গীতে। ছোটগল্পের মৌল প্রবণতাও এইদিকে। সঙ্গীত যা নেই অর্থাৎ ভাবময়তার সাহচর্যে, চিত্রশিল্প যা আছে তারই আঁধার বিন্যাসে, ছোটগল্প যা ঘটেছে ঘটছে মানবজীবনে জীবনপরিস্থিতিতে, তারই প্রাণচিহ্নিত বিবরণ উপস্থাপনায় অর্থহীন অর্থময়তাকে আবহমানের সঙ্গে একাকার করে তুলতে চায়।

তবু ব্যতিক্রম অনেক আছে। অনেক প্রখ্যাত ছোটগল্পের নাম করতেই পারা যাবে যেখানে কাহিনী পরিবেশ পরিস্থিতি মাত্রই একটা অবলম্বন, সবকিছুই নিয়ন্ত্রণ করছেন লেখক অথবা ব্যবহার করছেন তার ব্যক্তিগত মনোনয়ন অমনোনয়নের সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে। সেই ধরনের রচনারও অবশ্য একটা অবস্থান আছে কিন্তু তা আমাদের কখনই সেই স্তব্ধতার সামনে আনে না যা আবহমানের ভাবময়তায়, অর্থহীন অর্থময়তার নিরপেক্ষ। তার মাটি কেবল বর্তমানের সঙ্গেই একান্ত সংশ্লিষ্ট। সেই বর্তমানও ঘটনার শৃঙ্খলে সীমাবদ্ধ। সমগ্র সময়ের অনিঃশেষ তার স্পর্শসাধ্য নয়। মনে পড়ছে কাম্যুর 'অসতী' বা 'অতিথি' গল্প দুটির কথা। খণ্ডিত আলোকউৎসবের মুখোমুখি এক বিগতকোলাহল নিঃস্ব স্তব্ধ নারীর শূন্যময়; সেই অপরাধী, বন্ধন অথবা মুক্তি যার কাছে সমার্থক, মুক্তির দরজার সামনে দাঁড়িয়ে তার বিবশ জড়তা, আস্পৃহা, বিষাদহীন জিজ্ঞাসাহীন উপস্থিতি। মনে পড়ছে 'নদীর ধারে বাড়ি'?

'প্যাঁচা ও জোনাকির মধ্যে' গল্পে জীবনানন্দ শেষদিকে, একেবারে চূড়ান্ত পর্যায়ে এই উপস্থাপনধর্মিতাকে বিস্মৃত হয়েছিলেন। আগাগোড়া, প্রায় সমস্ত গল্প জুড়ে যিনি গল্পের নায়ক, তিনি সহসাই গল্পের লেখক হয়ে উঠলেন। কী ঘটেছিল, ব্যাখ্যাসহ তার বৃত্তান্ত সর্বজ্ঞ লেখকের দৃষ্টিকোণ থেকে তিনি আমাদের জানাতে চাইলেন। তা ঘটার মধ্যে দিয়ে, ঘটনার মধ্য দিয়ে এল না, এল লেখকের অনুমাননির্ভর বিবরণ পেশের মধ্য দিয়ে।

যেমন সমস্ত গল্পে, শেষাংশটুকুও দম্পতির কথোপকথনের মধ্য দিয়ে এলেই, মনে হয়, অনেক বেশি আঁধার বেজে উঠত।

'মৌরীফুল' গল্পের লেখক এই ভুল করেননি।

কেবল ছোটগল্প নয়, সব শিল্পপদ্ধতির একটা সমধর্ম আছে। সব শিল্পপদ্ধতিরই অত্যাবশ্যক কর্মরীতি উপস্থাপনা। সামগ্রিকভাবে সব শিল্প অবশ্যই উপস্থাপনধর্মী। বিষয়ী, অর্থাৎ শিল্পনির্মাতার কাজ বিষয় নির্বাচন, বিষয় রচনা; বিষয়ের উপস্থাপনা বিন্যাসের প্রশ্নে তার ব্যক্তিগত পরিপ্রেক্ষিত নিশ্চয় একটা বড় ভূমিকা নেয় কিন্তু নির্মিত বিষয়াবলীর সাফল্যিক পর্যবেক্ষণের প্রসঙ্গে সে যতদূর সম্ভব নিরপেক্ষই থাকে। বস্তুত শিল্পরচয়িতার প্রথম এবং প্রধান কাজ পাঠকের দর্শকের কল্পনার উজ্জীবন ঘটান, সৃষ্টিশীল গ্রহীতার কল্পনার উজ্জীবন ঘটলে স্বাধিকারের উপর সে কখনই কোনো আধিপত্য করতে তো চায়ই না, পাঠকের কল্পনার উজ্জীবন ঘটানোর কাজে সে যথাসম্ভব সহায়তাই করতে চায়। বিশ্বশিল্পীর আবহমান নিয়ম মেনে সে আমাদের সামনে বর্ণগন্ধলীন একটা সম্পূর্ণ ফুল নিয়ে আসার চেষ্টা করে—সে কখনো একথা বলে দিতে আগ্রহী হয় না যে এই যে পুষ্প এর সবকিছুই একটা ফলের সম্পূর্ণতা পাবার জন্য উৎসর্গীকৃত, সে কখনোই চেঁচিয়ে বলে দিতে চায় না এর বর্ণ-গন্ধের বাস্তব উদ্দেশ্যের কথা—কেবল একটা ফুল, একটা সম্পূর্ণ ফুল, এর গন্ধ যদি কারুকে বিভোর করে, যদি নিয়ে যায় কোনো স্মৃতি-স্বপ্ন ভারাতুর চিত্র সন্ধ্যায়, তা নিক, যদি কোনো দুস্থ হৃদয়ে শান্ত শান্তির হাওয়া আনে তা আনুক। বিশ্বশিল্পীর কাজ কেবল একটি ফুল রচনা করা। বর্ণে-গন্ধে পাপড়ির বিন্যাসে তাকে সম্পূর্ণ করা, অন্তত সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে-যাওয়া। কেবল এইটুকুই। ফুল কল্পনায় রসসিঞ্চিত হবে, অথবা তার বাস্তব ফলনিয়তিই গুরুত্ব পাবে তা গ্রহীতার গ্রহণপ্রবণতার উপরই ছেড়ে দাও।

'প্যাঁচা ও জোনাকির মধ্যে' গল্পে নায়ক তার স্ত্রীর গল্প পাঠের সময় গল্পের বর্ণনার অংশটুকু বাদ দিতে বলেছিল। 'মৌরীফুল' গল্পের সুশীলাও তার স্বামীর কাছে বসে গল্প শুনতে ভালবাসত। বটতলার আরব্য উপন্যাসের গল্প শুনতে শুনতে সুশীলার "গা শিহরিয়া উঠিত"। মনে-মনে সে তরুণ শাহজাদাদের সঙ্গে তার স্বামীকে একাকার করে ফেলত। স্বামীর প্রতি তার প্রথম ভালোবাসা এই গল্পগুলির সাহচর্যেই নিবিড় হয় —"প্রাচীন যুগের তরুণ শাহ্‌জাদাদের কল্পনা করিতে গিয়া অজ্ঞাতসারে সে নিজের স্বামীকে যাত্রার দলের রাজার পোশাক পরাইয়া দূরদেশে বিপদের মুখে পাঠাইত, শাহ্‌জাদাদিগের দুঃখে তাহার নিজের স্বামীর উপর সহানুভূতিতেই তাহার চোখে জল আসিত। এই রকম গল্প শুনিতে শুনিতে অদৃশ্য নায়কনায়িকাদের গুণ দৃশ্যমান গল্পকারের উপর প্রয়োগ করিয়া সে স্বামীকে প্রথম ভালোবাসে।" জীবনানন্দের 'প্যাঁচা ও জোনাকির মধ্যে' গল্পে কল্যাণীও নিজেকে একাত্ম করে ফেলে চঞ্চলকুমারীর সঙ্গে, তার কল্পনাতেও মহারাণা হয়ে ওঠে তার স্বামী। এই রাণার মৃত্যু তার কাছে অসহনীয়, কষ্টটা তার বুকে চেপে বসে। গল্পের নায়কনায়িকার সঙ্গে এইভাবে পাঠকের একাত্ম হয়ে পড়া গল্প-রচয়িতার সার্থকতার একটা বড় প্রমাণ অবশ্যই তবু কল্যাণীর স্বামী গল্প থেকে বর্ণনার অংশগুলো বাদ দিতে বলেন। কল্যাণীর কাছে এটা রসজ্ঞের লক্ষণ নয়, সুরসিক ব্যক্তি হওয়া সত্ত্বেও নায়কের এইরকম আচরণ কল্যাণীকে বিস্মিত করে। জীবনের চলাফেরায় যথেষ্ট রসগ্রাহী নায়ক বইয়ের ভিতর এইধরনের বর্ণনা থাকলে 'কদাচিৎ রস খুঁজে পায়'।

সুশীলা আর কল্যাণী দুজনেই সরলা গ্রাম্য বালিকা, বালিকাবধূ। কল্যাণী কথাবার্তায়

চালচলনে মার্জিত, অভিজাত পরিবারের পরিবেশ শিক্ষা সংস্কৃতি তাকে কিছুটা সাজিয়েছে। তবু সে যতটা আবেগচালিত, প্রশ্নকীর্ণ বাস্তবচালিত কিছুতেই ততটা নয়। সুশীলা কল্যাণী সাকল্যিক সাধারণ। একজন ব্যক্তিমানুষের রসগ্রহণ সৃষ্টিশীল রসগ্রহণ। ব্যক্তিমানুষ যা আছে তাকে নিজের মনোকণিকায় নির্মাণ করে—বাইরে থেকে আসা, উপর থেকে চাপান যাবতীয় তার কাজে বাধা দেয়, সংশ্লিষ্ট করে বহিরাগত আবেগের সঙ্গে, সৃষ্টিমনস্ক চেতনা তাই বর্ণনা, যা অনেক সময় লেখকের দৃষ্টিকোণের ফসল, যা অনেক সময় দৃশ্যকে খণ্ডিত করে দ্রষ্টার আধিপত্য নিশ্চিত করে, তাকে অপছন্দ করে। একই প্রতিক্রিয়ায় চেঁচিয়ে ওঠা ভঙ্গিমা, দৃশ্যকে ছাপিয়ে এগিয়ে আসা ভঙ্গিমাও তার কাছে অস্বস্তিকর মনে হয়। কেবল যা আছে সেটুকু দেখ—পাখিটা গাছের ডালে বসে আছে, গাছের পাতার রঙ সবুজ, যে তিন-চারটে ফুল দেখা যাচ্ছে তার রঙ হলুদ, মাথার উপর আকাশ তার রঙ নীল, এইটুকু। কেবল এইটুকুই। এরপর দ্রষ্টার কাজ শুরু, সেই দ্রষ্টা প্রতিটি পাঠক, বিবিধ তাদের দৃষ্টিকোণ, কল্পনার উন্মীলন, সেই দ্রষ্টার আসনে লেখক নিজে বসে পাঠকদের কল্পনাকে পরিচালনা করতে চাইলেই বিড়ম্বনা। প্রতিটি পাঠক দ্রষ্টা, নির্মাতা; তার নির্মাণের কাছে স্বপ্নচারিতায় লেখকের উপমা, বিশেষণ, অব্যয় অসহনীয় হয়ে উঠতেই পারে কল্যাণীর স্বামীর কাছে। যা আছে কেবল সেইটুকু লেখ, পাঠকের কল্পনার ডানা উন্মুক্ত হোক, সে স্রষ্টা হোক। যাত্রার দলের রাজার পোশাক পরে তরুণ শাহজাদা হয়ে ওঠে সুশীলার স্বামী, মহারাণা হয়ে ওঠে কল্যাণীর স্বামী, যার মৃত্যু কল্যাণীর স্বামীর কল্পিত বিয়োগবেদনার সঙ্গে একাকার হয়ে চেপে বসে তার বুকে। গ্রাম্য বালিকাবধূ সুশীলা অথবা কল্যাণী আবেগচালিত, অন্যের আবেগের ভিতর তাদের আবেগ আশ্রিত হয়, তাদের কল্পনা অনেক সময়েই পরাভূত। কল্যাণীর স্বামীর কল্পনা আত্মবৃত্ত হতে চায়।

সব পাঠকের কল্পনাই আত্মনির্ভর হতে চায়। 'প্যাঁচা ও জোনাকির মধ্যে' গল্পের শেষদিকে এসে গল্পলেখক জীবনানন্দ সে কথা বিস্মৃত হয়েছিলেন। পাঠকের কল্পনাকে স্থবির করে তিনি নিজের কল্পিত সিদ্ধান্ত পাঠকের ওপর চাপিয়ে দেন।

মনে পড়ে জীবনানন্দের 'কারুবাসনা' নামের উপন্যাস—কী ভয়াবহ নিরাসক্তি, নিস্তব্ধতা। কোনো অবসানে না মিশে মূক তীক্ষ্ণ আঁধার প্রবহমানতা। 'কারুবাসনা' উপন্যাসে, যাকে আমরা কাহিনীর পরিসমাপ্তি বলি তেমন কিছুই নেই। কত বড় শিল্পনিপুণতা অসমাপ্তির ভিতর দিয়ে আবহমানের সম্পূর্ণতার ভিতর নিজেকে এইভাবে নিশ্চিত করতে পারে!

'দুরাশা' গল্পে, আমার কতবার মনে হয়েছে, রবীন্দ্রনাথ নবাবকন্যার বেদনার মৌল কেন্দ্র তার মুখ দিয়ে উচ্চারণ করিয়ে আমাদের কল্পনার স্ফূর্তি নির্দিষ্ট করেছেন। "হায় ব্রাহ্মণ, তুমি তো তোমার এক অভ্যাসের পরিবর্তে আর এক অভ্যাস লাভ করিয়াছ, আমি আমার এক যৌবন এক জীবনের পরিবর্তে আর এক জীবন যৌবন কোথায় ফিরিয়া পাইব।" যে বেদনা, যে হতাশা বিশ্বব্যাপ্ত আবহমানের অর্থহীনতার কান্নার সঙ্গে একীভূত হয়ে বেজে উঠতে পারত নবাবনন্দিনীর অভিযোগের পর তা কেবল একজন ব্যক্তির সীমিত বেদনার মধ্যেই স্থির হয়ে গেল। তবু লেখক যথাসম্ভব নিরপেক্ষই থেকেছেন, নবাবকন্যার যন্ত্রণার কথা তিনি নিজের মতো করে বলে দিতে এগিয়ে আসেন নি। তা গল্পের সঙ্গে সঙ্গেই এগিয়ে এসেছে। আর এটাও ঠিক 'দুরাশা' গল্প তত্ত্বমূলক গল্প, তা কোনো প্রেমের কাহিনী নয়; যে ধর্ম কেবল অভ্যাস, সংস্কার, তার অকিঞ্চিৎকরতা, তুচ্ছতার কথাটারই 'দুরাশা' গল্পে লেখক স্পষ্ট করতে চেয়েছেন। আবেগজাত ধর্মান্তরও

যে কত পলকা, ক্ষণভঙ্গুর তাও আমরা নবাবকন্যার দুবার ধর্মপরিবর্তনের ভিতর দিয়ে বুঝতে পারি। এ এক বিশেষ ধারার গল্প। তবু যে নিস্পৃহতায়, নিরপেক্ষতায় লেখক তা উপস্থিত করেছেন তা অন্তরের ধর্ম আর আবেগ-অভ্যাসের ধর্মের আঁধার সেতুটিকে বারবার বহুজনের কাছে নানা প্রতিভাসে বিকীর্ণ করবে নিশ্চয়।

'মৌরীফুল' গল্পে বিভূতিভূষণ প্রায় অনুপস্থিত। 'মৌরীফুল' গল্পে আমরা সরলা মুখরা জেদী ভালোবাসার কাঙাল এক বালিকার ব্যর্থ জীবনের সামনে এসে দাঁড়াই। কেবল এইটুকু। আমাদের কল্পনা নিজের পথ রচনা করে, আমাদের অনুভব অনুভূতির কিরণ্ময় ভূমি, আমরা পথিক হই।

গল্পের শেষে কল্যাণীর অভিমানের, আত্মাহুতির আনুমানিক কারণগুলি আমাদের জানান হয়। 'দুরাশা' গল্পে নবাব কন্যা তার সমস্ত জীবনের ব্যর্থতার ছবিটুকু শুধু বলে না, তার অভিযোগের তলায় যতটা কান্না থাকে ততটাই তীব্র তীক্ষ্ণ তিরস্কার। সুশীলা কেবল তার স্বপ্নছবিটুকু আরো বেশি শ্যামলিমায় সাজায়।

বুদ্ধদেব বসু An Acre of green grass নামের আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের বইতে জীবনানন্দ ও বিভূতিভূষণকে পাশাপাশি রেখেছিলেন। তখন পর্যন্ত জীবনানন্দর কোনো গল্প প্রকাশিত হয় নি। তবু 'প্যাঁচা ও জোনাকির মধ্যে'-র মতো আরো কয়েকটি গল্প পড়বার সময় বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়তেই পারে। বাংলাদেশের গ্রামের বালিকাবধূ, বধূদের নিয়ে বিভূতিভূষণের মতো জীবনানন্দও বেশ কয়েকটি গল্প লিখেছেন। বাঙালী বধূর আর্তি হতাশা অসফল স্বপ্ন বাসনা দুজনকেই স্পর্শ করেছিল। 'প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, দাক্ষিণ্যের তৃষ্ণা' পড়ার সময় আমার মনে পড়ল 'দেবযান'-র যতীন আর আশার কথা। কিন্তু বিভূতিভূষণের নির্লিপ্ততা নিরপেক্ষতা অনেক সময় জীবনানন্দর ছোটগল্পে তেমন করে ধ্বনিস্তব্ধ হয় নি। 'প্রেম, আকাঙ্ক্ষা, দাক্ষিণ্যের তৃষ্ণা' গল্পের শেষদিকে রাজচন্দ্রের ভাবনাকে নিয়ে গড়ে-ওঠা অংশটুকু যত অতিরিক্ত ততটাই অনাবশ্যক।

যে উপস্থাপনধর্মিতা সব শিল্পের মতো ছোট গল্পেরও প্রাণধর্ম, নির্লিপ্ততা নিরপেক্ষতা তার দুটি প্রধান সিঁড়ি। কেবল উপস্থাপন, নির্লিপ্ত নিরপেক্ষ উপস্থাপন। এমনকি কাহিনীর অংশটুকুও গৌণ। জন্ম ও মৃত্যুর মাঝখানে যে জেগে থাকা-তার যে কোনো একটা টুকরো, জীবনখণ্ড, তারই ভিতর অনিঃশেষ। প্রতিমুহূর্তে জীবন কত বিচিত্র হওয়ার দিকে চলেছে হওয়া সম্পূর্ণ হচ্ছে, হচ্ছে না, তারপর আর একটা হওয়ার দিকে চলা। সারা দুপুর অনেক চেষ্টার পর বিকেল শেষ হওয়ার দিকে একটা মাছ ধরা গেল, খুব আনন্দ, সন্ধ্যেবেলা ঘন বৃষ্টির মধ্যে সেই মাছ সবাই মিলে খাওয়া। জীবনখণ্ড, স্বাভাবিক সরল জীবনখণ্ড। এই নিয়েই ছোটগল্প, ছোটগল্পের সম্পূর্ণতা। সেই জীবন সেখানে আলাদীনের কোনো উপস্থিতিই নেই, নেই কোনো শনিদেবতার কোপানল, সেখানে হঠাৎ-পাওয়া, হঠাৎ হয়ে-ওঠা রাজপ্রাসাদ নেই, পোড়া কই মাছ সেখানে ঠিক মুখে তোলার মুহূর্তে লাফিয়ে উঠে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে না। যা হচ্ছে, যা হয়ে-থাকে কেবল ততটুকুই—একটা সকালের পর আবার একটা সকাল, বৃষ্টি নামে, বৃষ্টি আবার থেমেও যায়। জীবনযাপন, সত্য স্বাভাবিক বেঁচে থাকা, সেখানে যা কিছু হয় হওয়ার সম্ভাবনার ভিতর দিয়েই হয়। গরিব মেয়ে, কষ্টের সংসারের মেয়ে, ডাঙায় উঠে-আসা কই মাছ কুড়িয়ে বাড়ি ফিরে এসে দেখে, তার দিদি এসেছে, সে তাকে শহরে পড়াশোনা করতে নিয়ে যাবে। সারারাত উত্তেজনার পর বাপ-ছেলে বহুপথ হেঁটে যাত্রা দেখতে যায়, জনসমুদ্রের একেবারে শেষে দাঁড়িয়ে কিছুই

দেখতে পায না, তবু বহু দূর থেকে আবছা রাংতার ঝলমলানি দেখেই খুশি, ফেরার পথে তাদের আনন্দ গল্প আর শেষ হতে চায় না।

কোথাও অতিরিক্ত নেই। বিশ্বশিল্পী, বিশ্বপ্রকৃতি অতিরিক্ত, বাইরে থেকে আসা অতিরিক্ত পছন্দ করে না। ছোটগল্প কোনো অতিরিক্ত পছন্দ করে না। কেবল উপস্থাপনা—যা আছে, যা হচ্ছে, যা হয়ে থাকে তারই নিরপেক্ষ উপস্থাপনা।

এইভাবেই সব শিল্পী অভাবনীয়ের দরজা খুলে দেয়, এইভাবেই একটি ফুল আবহমানের প্রাণপ্রয়াস শান্ত স্নিগ্ধ উন্মোচন করে, এইভাবেই ছোটগল্প একটি বালির কণায় বিশ্বকে সামনে এনে রাখে, পৌঁছে দেয় তাৎপর্যময় নীরব নম্র জ্যোৎস্নালোকের একান্তে।

ছোটগল্পের কাছে আমরা কোনো কাহিনী শুনতে চাই না, কবিতার কাছে কোনো বাণী। যেমন সব শিল্প, ছোটগল্পও আমাদের শেষপর্যন্ত নিয়ে যায় সেই যোজন-যোজন অসংলগ্ন অনালোকে, সেখানে জীবনের যতটুকু জেগে-থাকা তার ভিতর দিয়ে উঠে গেছে নিরভিমান সিঁড়ি। সিঁড়ি আমাদের স্তব্ধ নিশ্চুপ নিঃঝুম পৌঁছে দিচ্ছে সব অর্থহীনতার কেন্দ্রের চিরদিনের অর্থময় ধ্বনি-সংবেদন।

জীবনানন্দ ঃ গদ্যপ্রতিমা

'গ্রাম ও শহরের গল্প' নামে একটি গল্প লিখেছিলেন জীবনানন্দ। সে-গল্পে শহরে বসে দুটি নারীপুরুষের কথা চলছিল এইরকম ঃ

শচী অনেকক্ষণ পরে বললে, 'চলো না, পাড়াগাঁয় যাই—

'কোন্ পাড়াগাঁয়?'

'যেখানে ছিলাম আমরা—'

'সেই বকমোহানার নদীর ধারে? ভাঁটশ্যাওড়া ময়নাকাঁটার জঙ্গলে?'

শচী মাথা নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ—সেখানেও—'

সোমেন বললে, 'অসম্ভব।'

কথাগুলি শুনতে শুনতে কারো মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের 'রক্তকরবী'। একটু ভিন্ন পরিবেশে, দুটি চরিত্রের প্রায় অনুরূপ কথা শুনেছি আমরা চন্দ্রা আর বিশুর এই সংলাপে ঃ

'এসো না বেয়াই, পালাই আমরা।'

'সেই নীল চাঁদোয়ার নিচে? খোলা মদের আড্ডায়?'

'রাস্তা বন্ধ।'

কিন্তু রাস্তা বন্ধ বলে থেমে যায়নি বিশু। যক্ষপুরীর গলিত পরিবেশের মধ্যে জীবনের একটা পথ খুঁজে নেবার চেষ্টা করে সে, তার শ্রমিকতায়, তার সামাজিক দায়ে। জীবনানন্দের সোমেনরা প্রায়ই তা পারে না। আর পারে না বলেই নিজেকে এবং অন্যকে কেবলই জর্জরিত করে আঘাতে আঘাতে।

'গ্রাম ও শহরের গল্প' জীবনানন্দের একটি গল্পের নাম। কিন্তু বলা যায়, তাঁর সব গদ্যরচনাই, 'ছায়ানট' বা 'বিলাস', 'মাল্যবান' বা 'সুতীর্থ' এই সবেরই ভিতরকার সংঘর্ষ তৈরি করছে গ্রামশহরের বিরোধ। সবকটির জন্যই নির্ধারিত হতে পারত ওই একই নাম ঃ গ্রাম ও শহরের গল্প। তাঁর গদ্যের প্রায় সর্বত্রই জীবনানন্দ দেখান সেই মানুষের ছবি, প্রকৃতির থেকে ছিন্ন হয়ে যে মানুষ যন্ত্রসভ্যতার এক যক্ষপুরীতে এসে দাঁড়িয়েছে, যে মানুষ তার পরিবেশ থেকে কেবলই বিযুক্ত দেখে নিজেকে। যে যোগ তার হতে পারত, আর যে বি-যোগের মধ্যে সে আছে, জীবনানন্দের নায়কেরা কেবলই তার ভিন্ন দুই রণন জাগিয়ে তোলে তাদের ভাবনায় ব্যবহৃত প্রতিমায়।

লেখক যখন বলেন, 'মাল্যবানের অবকল্পনা আছে, অবপ্রতিভাও। চেতনার একটি সূর্যের বদলে অবচেতনার অন্তহীন নক্ষত্র পেয়েছে সে', তখন আমরা বুঝতে পারি যে, এ কেবল মাল্যবানেরই কথা নয়, তার স্রষ্টারও কথা, বহুল প্রতিমায় পুঞ্জ হয়ে উঠছে যাঁর অন্তহীন নক্ষত্র। অবকল্পনা আর অবচেতনায় জীবনানন্দ যখন দেখেন যে 'আমাদের এই

মেট্রোপলিসে, স্ত্রীপুরুষের সম্পর্ক, মানুষে মানুষে সম্পর্ক, মানুষ ও প্রকৃতির সম্বন্ধ সূক্ষ্মতা হারিয়ে ফেলেছে, সফলতাও, সরলতাও', তখন আজকের পৃথিবী তাঁর কাছে দেখা দেয় কোনো এক 'ভোজালি' বা 'চেঙ্গিস খাঁ'র প্রতীকে, কখনো-বা পশুপতঙ্গের এক দমচাপা মিছিলে। তাঁর ছোটো একটি অমোঘ কবিতায় আমরা পড়েছি একদিন ঃ

অদ্ভুত আঁধার এক এসেছে এ পৃথিবীতে আজ
যারা অন্ধ সবচেয়ে বেশি আজ চোখে দ্যাখে তারা
যাদের হৃদয়ে কোনো প্রেম নেই—প্রীতি নেই—
করুণার আলোড়ন নেই
পৃথিবী অচল আজ তাদের সুপরামর্শ ছাড়া
যাদের গভীর আস্থা আছে আজও মানুষের প্রতি
এখনও যাদের কাছে স্বাভাবিক বলে মনে হয়
মহৎ সত্য ও রীতি কিংবা শিল্প অথবা সাধনা
শকুন ও শেয়ালের খাদ্য আজ তাদের হৃদয়।

জীবনানন্দের গদ্য যেন এই কবিতারই বিস্তার। তাঁর গদ্যপ্রতিমাতেও কেবলই তাই পাব শকুন আর শেয়ালদের এক অন্ধকার জগৎ।

শুধু শকুন শেয়ালই নয় অবশ্য, তার চেয়ে একটু বেশি প্রসারিত এর সীমানা। বোর্ডিং-এর জীবনযাপনে মাংসলোলুপ বাসিন্দাদের হিংস্রতা দেখে মাল্যবানের মনে হয়েছিল, 'এ তো স্বাভাবিক। শেয়াল বেড়াল চিতেবাঘ কেঁদোবাঘের মতো মানুষ হিংসাত্মক তো।' সেই স্বাভাবিকতায় মাল্যবান তার পরিজনদের মুখে দেখে 'কচ্ছপের চামড়ার মতো কঠিন একটা ভাব', দেখে 'মাকড়ের ঠ্যাং, ফিঙের ঠ্যাং, কাতলের মুখ, ভেটকির মুখ'। দেখে 'মাকড়শার জালের মতো জড়িত চোখ', তার স্ত্রীর স্বভাবে সে দেখে 'কত যে সজারুর ধাষ্টামো কাকাতুয়ার নষ্টামি ভোঁদরের কাতরতা বেড়ালের ভেঙচি কেউটের ছোবল আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির'।

কেবল মাল্যবানই নয়, সুতীর্থও আসে এমনি সব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে। সেখানেও ঘুরে ঘুরে আসে ছিপছিপে বানরের বাচ্চা গোখরো সাপ আরশোলার শুঁড় হরতেল ঘুঘু বা পাঁকাল গজাল। আর তারই মধ্যে দেখা দিতে থাকে শেয়াল বেড়াল হায়েনার রগড়ে গর্জন করে উঠবার সাধ। ফলে, 'মাল্যবান' উপন্যাসে স্ত্রী আর শিশুকন্যাকে নিয়ে নায়ক যখন ঘুরে বেড়ায় চিড়িয়াখানায়, আর তাই নিয়েই চলে গোটা একটা পরিচ্ছেদ, তখন তা নিছক ঘটনাপ্রবাহ হয়ে থাকে না আর, হয়ে ওঠে প্রতিমাপ্রবাহ। সেখানে পশুপাখি দেখবার প্রতিটি মুহূর্তই গড়িয়ে যায় এক দ্বিস্তর অভিজ্ঞতার দিকে। মনু নামে ছোটো মেয়েটির বাঘসিংহ দেখবার আগ্রহে কান দেয় না তার মা-বাবা। কেননা 'সুতীর্থ' উপন্যাসে তো শুনবই আমরা ঃ 'স্টক এক্সচেঞ্জের চিৎকারে যা আছে তা বাঘের গর্জন সিংহের গর্জনও নয়, যেন শেয়াল হায়েনার হুল্লোড়।' তাই 'মাল্যবান'-এ মেয়েটিকে এড়িয়ে গিয়ে মা উৎপলা দেখতে চায় 'আরশোলা যে-রকম কাঁচপোকা হয়, তেমনি শামকল হয়ে যাচ্ছে ধনেশটা।' তারপর একসময়ে, এই চিড়িয়াখানার মধ্যে ক্লান্ত হয়ে বসে পড়ে তারা। তখন মাল্যবান দেখে উৎপলাকে। দেখে 'একটা হাত তার বুকে আর একটা কোলের ওপর ভাঁটার টানে সমুদ্র সরে গেলে ভিজে ঝিনুক পরগাছা ঠাণ্ডার মতো করুণ হয়ে পড়ে আছে।'

এইখানে হঠাৎ একমুহূর্তের জন্য স্ত্রীপুরুষের সম্পর্কে আর উপমান হয়ে রইল না 'ভাঙা গেলাসের কাঁচ'। এইখানে হঠাৎ দেখা দিল করুণা। দেখা দিল, কী হতে পারত সেই সম্পর্কের গাঢ় এক বিন্যাস। এই বিন্যাস থেকে জীবনানন্দের কাহিনীতে উঠে আসে বিপরীত এক প্রতিমাবলয়, যেখানে বিস্তার নিয়ে জেগে থাকে উদ্ভিদজগৎ, থাকে নক্ষত্রমণ্ডল। তখন এর চরিত্রগুলি শোনে 'সেসব অভিজিৎ চিত্রা সপ্তর্ষির ভাষা'। সেখানে সমস্ত বেদনা 'বনঝাউয়ের মতো শিশিরে পাতায় কেঁপে উঠে অভিজিৎ নক্ষত্রের দিকে উঠে যায়।' দেখা যায় সেখানে 'অন্তহীন কাটাকুটি মেঘডুমুরের পাত সর্যের ঝাঁঝ'। মানুষ সেখানে 'শিলং টিলংএর পাইনগাছদের মতো উঁচু'। আর তার চরিত্রে 'শীতের দেশের দেবদারুর মাংসের মতন দৃঢ়তা'। তার হাসি সেখানে 'সমুদ্রপারের ঘনবুনোনো ফরসা শঙ্খের মতো নিটোল।'

এসব ছবি অবশ্য 'সুতীর্থ' থেকে নেওয়া। কিন্তু কেবল 'সুতীর্থ'ই নয়। নিরাশা-ধিক্কারে ভারাতুর মাল্যবানেরও ওই একই স্বপ্ন। তারও বিষয়ে কখনো শুনব আমরা, 'প্রকৃতির দিগু নির্ণয়ী মন নড়ে ওঠে যেন'। এই মন নিয়ে, প্রকৃতির এই নির্ণয় নিয়ে মাল্যবান খোঁজে তার মুক্তি, 'নীলিমায় নীলিমায় সূর্যে রৌদ্রে আকাশপথের পাখির পালকে।'

সমস্যাটা তাহলে কেবল গ্রাম শহরের দ্বন্দ্বে নয়। এ-দ্বন্দ্ব আছে মন আর শরীরের ছিন্নতায়। মাল্যবান বুঝেছিল একদিন, 'নিজের মনটা তার স্বাতীর শিশির হলেও শরীরটা তার শুক্তি নয়। কিন্তু শামুক গুগলীর মতো ক্লেদাক্ত জিনিস।'

আধুনিক সভ্যতার এই শারীরিক ক্লেদ ঘনদৃষ্টিতে জেনেছিলেন জীবনানন্দ। কবিতায় সেটা ধরা দেয় প্রধানত এক ধূসর পটে, আত্মবিলীনতায়। আর গদ্যে সে ধ্বংসের ছবি আসে এক আক্রমণময় রক্তিম ভাষায়। কিন্তু কবিতায় বা গদ্যে, এর থেকে মুক্তির কি কোনো ইশারাই নেই তাঁর রচনায়? আমাদের মুক্তি কি কেবল অতীতবিলাসে? কোনো ভবিষ্যৎ নেই তার? ত্রাণের জন্য আমাদের কি ভাবতে হবে কেবল সুতীর্থের মতো, 'ত্রৈলোক্যচিন্তামণির মন্দিরে একা বসে আছি খুব রাতে। আমাকে ঘিরে দেবদাসীর নাচ' কিংবা মাল্যবান যেমন ভাবে, 'মানুষ না হয়ে সে যদি সারস হতো'? মনে হয় না তা।

জীবনানন্দের কবিতার পাঠক জানেন, পরিণতির দিকে পৌঁছে এই কবি বলতে পেরেছিলেন যে, যদিও 'এ যুগে কোথাও কোনো আলো—কোনো কান্তিময় আলো/ চোখের সুমুখে নেই যাত্রিকের', কিন্তু তবুও মানুষ আজ 'দুর্দশার থেকে স্নিগ্ধ আঁধারের দিকে / অন্ধকার হতে তার নবীন নগরী গ্রাম উৎসবের' দিকে চলেছে কেবলই। ১৯৪৬-৪৭-এর উদ্‌বেল দিনগুলিতে পৌঁছে মনে হবে তাঁর—

রক্তের নদীর থেকে কল্লোলিত হয়ে
বলে যাবে কাছে এসে, 'ইয়াসিন আমি,
হানিফ মহম্মদ মকবুল করিম আজিজ—

আর অন্যদিকে

গগন বিপিন শশী পাথুরেঘাটার;
মানিকতলার, শ্যামবাজারের, গ্যালিফ স্ট্রিটের, এণ্টালির—'
কোথাকার কে বা জানে ;

সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মনে পড়বে যে 'সুতীর্থ' উপন্যাসও তার মধ্যপর্বে এসে পৌঁছবে নিচের তলার এই মানুষদেরই মধ্যে। সেইখানেই সুতীর্থের মুক্তি। আক্ষরিকভাবে যেন

কবিতারই ওই কথাগুলি শুনি আমরা, যখন সুতীর্থ গিয়ে বসে একেবারে 'অনন্ত আর গোলাম মহম্মদের গা ঘেঁষে আর বলে—হামিদ ইয়াসিন মকবুল বিপিন, শোনো তোমরা—।' শুরু হয় তাদের রাজনৈতিক বিবেচনা।

মৃত্যুর অনেক পরে ছাপা হয়েছে বলে জীবনানন্দের এই গদ্যরচনার কালবিষয়ে খুব নিশ্চিত হতে পারি না আমরা। কিন্তু অভ্যন্তরীণ প্রমাণ হয়তো ধরিয়ে দেয় যে 'মাল্যবান'-এর উত্তরণ আছে 'সুতীর্থ'র মধ্যে। মাল্যবান ভাবত, 'সে কি নিম্নমধ্যশ্রেণীর? না মধ্যম মধ্যশ্রেণীর? খুব সম্ভব নিম্নমধ্যবিভাগের লোক সে। কিন্তু সমস্যাটা সমস্ত মধ্যশ্রেণীতেই দুর্বিষহভাবে পরিব্যাপ্ত হয়ে রয়েছে।'

এই দুর্বিষহতায় ডস্টয়েভ্স্কি বা কাফ্কার উপন্যাসের কীটপতঙ্গের মতো জুগুপ্সাময় হয়ে থাকে মাল্যবানের পৃথিবী। কিন্তু 'সুতীর্থ' উপন্যাসের কর্মভূমি যখন এসে দেখা দেয় ধর্মঘটের শ্রমিকদের কাছে, সামাজিক দায়ে, ঠিক তখন থেকেই আস্তে আস্তে দূরে সরে যায় হাঙর আর কাঁকড়া বা সাপবেজীর দল। শহরের মধ্যে তখন যুক্ত হতে থাকে গ্রাম, অনেকটা মিলিয়ে আসে শরীর-মনের দ্বন্দ্ব। তখন থেকে বড়ো হয়ে উঠতে থাকে সুতীর্থের চোখে দেখা এইসব ছবি 'যারা আগুন বাঁচিয়ে রেখেছে, যারা আগুন, যারা আগুন নয়, বিকেলের নদীর মতো স্নিগ্ধ, যারা আগুন নিবিয়ে ফেলে নক্ষত্রের রাত্রির মতো দিনাত্মা, মানবসত্তার সেইসব আত্মার মতো সূর্য ঐ।'

অধিচেতনের এই ছবিটিতে পৌঁছে দেবেন বলেই জীবনানন্দের গদ্যপ্রতিমায় পশুবলয়ের নিষ্ঠুরতা শেষ পর্যন্ত আমরা সইতে পারি। পরিবেশের গ্লানিকে সম্পূর্ণ চিনিয়ে দিয়ে তার থেকে আমাদের উত্তীর্ণ করে নিতে চান তিনি।

জীবনানন্দের তিনটি গল্প

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

জীবনানন্দের গল্প সম্বন্ধে বলতে গিয়ে কেউ কেউ তাঁর ভাষায় কবিতা-কবিতা গন্ধ পেয়েছেন, কিন্তু গল্পতে গল্প বা স্টোরি লাইন আছে কিনা সে কথা জোরের সঙ্গে বলেন নি। এমন কি কেউ বলেছেন (বীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, 'মাঝি' ঃ জীবনানন্দের গদ্যে)— জীবনানন্দ কাব্যিক ব্যঞ্জনাকে আঙ্গিক কৌশল হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন কারণ সোজাসুজি গল্প লেখা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না কেন না ভাষার ভারসাম্য হারালে গল্পটি অশ্লীল ঠেকত পাঠকের কাছে। জীবনানন্দের 'ছায়ানট' গল্পটি নতুন করে পড়তে গিয়ে আমার এসব মনে হয়নি। বরং মনে হয়েছে বিমল করের 'ছোট গল্প নতুন রীতির' আন্দোলন কবেই শুরু করে দিয়েছিলেন জীবনানন্দ। সেই কাল সেই যুগ সম্পর্কে প্রেমেন্দ্র মিত্রের বক্তব্য এই প্রসঙ্গে স্মরণযোগ্য (মিথুন সমীক্ষণ ঃ ছায়ানট, জীবনানন্দ দাশের গল্প)। তাঁর মতে 'ছায়ানট' গল্পটি প্রকাশিত না হলেও লেখা হয়েছিল তিরিশ দশকের আবহমণ্ডলে যখন 'সবুজপত্র ভাষায় ভাবনায় সজীবতা আনলেও সৃষ্টিশীল সাহিত্যের নতুন ফসল ফলাতে পারেনি—যা পেরেছিল কল্লোল-কালিকলম তাদের রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক-সামাজিক-পারিবারিক সাবেকী-শৃঙ্খলের একটা অনির্দিষ্ট সচেতনতার সাহিত্যমূর্তির মাধ্যমে। তাঁর মতে সেই বলিষ্ঠ অন্বেষণের যুগের বিচারেও বিষয় ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে গল্পটি অভিনব ও দুঃসাহসিক। তিনি অবশ্য বলেছেন এই গল্পের পদক্ষেপ কেমন যেন অনিশ্চিত, (এর) দুর্বলতা ধরা পড়বার ভয়েই যেন ভাষা-সংক্ষেপ।

তাঁর মতে ত্রিশের দশকে মিথুন-সমীক্ষণের এই আঁভা-গার্ডিজম যে গল্পের প্রেরণা তাকে কটি সঙ্কেতবিন্দুর বাইরে ছড়াতে দিলে তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত। তিনি আরো বলেছেন—'ছায়ানট' গল্প হিসেবে অসামান্য এমন দাবী না টিকলেও জীবনানন্দ কবিতার আকাশ থেকে গদ্যকাহিনীর স্থলভাগে বৃথাই নামেননি।

আমি এই শতাব্দীর শেষে এই গল্পটি সম্পর্কে কিছু বক্তব্য পেশ করছি—আমার এতদিনকার নানা গল্পপাঠের অভিজ্ঞতার সুযোগ ত স্বীকার করে নিতেই হবে।

আমি মুখ্যত এর যে একটা স্টোরি লাইন আছে সেই দিকটার প্রতিই জোর দিচ্ছি— না হলে গল্পটি পড়তে পড়তে আমার মতি নন্দীর 'শবদেহ' গল্পটির কথা মনে পড়বে কেন! দুটি গল্পেরই ক্লাইম্যাক্স (সামান্য কিছু হেরফের সত্ত্বেও) স্বামী বা স্বামীকল্পের উপস্থিতিতে অন্যের সঙ্গে নায়িকার ব্যভিচার। জীবনানন্দ কয়েকটি শব্দের আঁচড়ে কেমন তোলপাড় করেছেন ব্যাপারটা ঃ

> রেবা বললে, 'ঘুমিয়ে পড়েছে।'
> মিনিটখানেক সব চুপচাপ।

তারপর চুমোর শব্দ ...
দুজনে উসখুস করছে।
শেষে সব চুপ।
অন্ধকারে একা ঘরটা ঠাণ্ডা মেরে গেছে।
এ বীভৎস না সুন্দর!

রেবা বললে, 'কেন ডাকছিলে?'
খাঁচার পাখি যেন ছাড়া পেয়েছে,—গলার স্বর এন্নি। আমিও
আকাশটাকে ফিরে পেয়েছি।

আমার গায়ের ওপর গড়িয়ে পড়ল একেবারে। কুণ্ঠা
লজ্জা ভয় ঘেন্না—
সমস্ত উৎরে অনেকখানি ওপরে উঠে গেছে সে যেন
সেই বড় নির্ভর, —বাসি মড়াটার ওপরেই

যেন কাফকার 'মেটামরফসিস' পড়ছি। এই গল্পের কোথাও কাব্যিকতা নেই, আছে জীবনযন্ত্রণার ধারাভাষ্য তীক্ষ্ণ গদ্যে। কিছু উদাহরণ দিই—

কপাল টেপাপ সময় নায়ক আরো জোরে কপাল টিপতে বলছে রেবাকে ঃ

১. 'অত আস্তে মাথা টিপলে চলে কি?'

আঙুর মুষড়ে যখন মদের পেয়ালা ভরে নিই—তখনো তো বেশ লাগে, আমার।
কিন্তু আঙুরের!
মাটির থেকে কিছু পেতে হলে মাটির বুকটাই-না আগে চিরে নিতে হয়!

২. যদিও বুকের পাঁজর দিয়ে গড়েছিলুম তবু খাঁচা—যে খাঁচাই

৩. আমার দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে তার ঘেন্না আর ফুরুতে চাইল না যেন! এই বিকৃত শবদেহ নিয়ে মানুষ বলে আপনাকে চালিয়ে দিচ্ছি—

এই গল্পে কোন প্রতীকী ব্যাপার-স্যাপার আছে বলে আমার মনে হয় না। নিছকই এক ক্লীবের মত নায়ক—নিজেকে সে তাই বাসি মড়ার তুল্যমূল্য মনে করে। ক্লীব নায়ক কেন অন্তরঙ্গ হতে পারলো না এ-প্রশ্ন থেকেই যায়—হয়ত দূরসম্পর্কের মাসতুতো বোনের সঙ্গে ইনসেস্টের সম্পর্ক চায়নি সে, কিংবা সে বাইরে বাইরে আকাশের দিকে চেয়ে অনেকদিন কাটিয়েছে এবং ঘরের বাঁধন চায়নি বলেই গভীর সম্পর্কে সম্পর্কিত হতে চায়নি রেবার সঙ্গে—অথবা সে শারীরিক অসুস্থতার জন্যেই সম্পর্ক এড়িয়ে চলেছে রেবার সঙ্গে (ডাক্তার বুঝেছে এই বিকৃত শবদেহ নিয়ে মানুষ বলে আপনাকে চালাচ্ছে নায়ক-নায়কেরই উক্তি অনুযায়ী)। কাজেই 'ছায়ানট' যে একটা নিটোল গল্প সে-বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। কাব্যিক ত নয়ই, বরং এর আবহ মনস্তাত্ত্বিক এবং সিনিক বললে হয়ত সবটা বলা হয়ে ওঠে না।

'গ্রাম ও শহরের গল্পের' দীর্ঘ পরিসরে আপাতদৃষ্টিতে ত্রিকোণ প্রেমের এক আলেখ্য

খুঁজে পেয়েছেন অনেকে। তাছাড়া এর গ্রাম বাংলার রূপচিত্রণ অনেকের মন মজিয়েছে— এলিয়টের সেই কুকুরকে মাংসখণ্ড দিয়ে দৃষ্টিবিভ্রম ঘটানোর উদাহরণটি তুলনীয়। প্রধানত, এটি স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক, স্বামী ও ভূতপূর্ব প্রেমিকের সমান্তরাল বিচার এবং কৈশোরক নস্ট্যালজিয়ারই কাহিনী। নায়িকা শচী বাংলা গদ্যের এক উল্লেখনীয় চরিত্র—তার একপাশে কার অভিজাত স্বামী, আর একপাশে কিশোরকালের প্রেমিক যে এখন বেকার। শচী হল সেইরকম এক নায়িকা যার সম্পর্কে লেখক বলেন ঃ এ-রকম মেয়েমানুষ জীবনের থেকে ঢের গন্ধ-আস্বাদ কুড়িয়ে নিতে পারে ঃ 'জীবনের হাতে আছাড় খেলেও এরা টকটকে রঙীন রবারের বলের মতন লাফিয়ে ওঠে।' গ্রাম ও শহর—স্মৃতি ও বর্তমান এই দুই পটভূমিকায় দোলাচল করছে শচী। একদিকে সে দেখছে ঃ ট্রাম-লাইনগুলো খালি পড়ে আছে—রাস্তার সেই বিরাট হাঙরদের এখন ঘুমোবার সময়। অন্যদিকে হু হু করে দুটো ট্যাক্সি পাল্লা দিয়ে ছুটে চলছে—তাদের কাছে মহিষের গাড়িগুলোর অবসর অসীম, কোন্ বাড়ির আকাশপ্রদীপ এখনও জ্বলছে, হঠাৎ পাড়াগাঁর কুয়াশা, ধানের ক্ষেত, পালংশাক, কপি, বীট, গাজর, শিউলি, বেঁটে খেজুর গাছ, শুঁয়োপোকা প্রজাপতি কাঁচাপোকা জোনাকি—আট-দশ বছর আগের কত-কী মনে পড়ে যাচ্ছে ...। বালিগঞ্জের একটা বাড়ির ডাইনিং রুমে বসে বাংলার নরম নিবিড় প্রকৃতির স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন শচী। তার কাছে 'বাংলা যাদের দেশ—ক্ষেত যাদের আউশধানের বালামের রাইসর্ষের —নিরবচ্ছিন্ন নদীর দেশকে ভালোবাসা তাদের পক্ষে কত সহজ।'

তার স্বামী প্রকাশ প্র্যাকটিক্যাল লোক—নিজের অস্তিত্বকে যথাস্থানে ক্ষুণ্ণ করে দিতে রাজী, কাজ হাসিল করতে ওস্তাদ, রসিকও, রসবোধসম্পন্ন, মাত্রাজ্ঞান খুবই আছে, অক্লান্ত, কিছুতেই ঘাবড়ায় না।

অপরদিকে তার বন্ধু ও নায়িকার কিশোরকালের প্রেমিক সোমেন—জীবন-ব্যবসায়ের প্রতি অবিশ্বাসী-জীবনকে চায় শুধু; খড়্গের মতন কঠিন—চোখা বিচারবোধটাকে কল্পনার রেশমী মাকড়ের জালে জড়িয়ে নিষ্ক্রিয় করে রাখতে ভালোবাসল সে ; ভাবপ্রবণতায়—আবেগে-ব্যঙ্গে-নিষ্ক্রিয়তায় নিরর্থক হয়ে রইল; অনাবিষ্কৃত খনির সোনার মতো কোথাও পড়ে আছে সে—

পড়তে পড়তে মনে হয় শরৎচন্দ্রের অচলা-মহিম-সুরেশ কিংবা রবীন্দ্রনাথের নিখিলেশ-সন্দীপ-বিমলা এই আর্কিটাইপ্যাল ত্রিমুখীনতার নবতর বিন্যাস ঘটিয়েছেন জীবনানন্দ এই গল্পে। নতুন মাত্রা হিসেবে যুক্ত হয়েছে গ্রাম বাংলার সেই পুরনো স্মৃতি যার প্রসঙ্গে সোমেন বলে শচীকে ঃ মনে পড়ে একদিন বকমোহানার নদীর পাড়ে ভাঁটশ্যাওড়া জিউলি ময়নাকাঁটা আলোকলতার জঙ্গলে তোমাকে ছেড়ে দিয়েছিলাম; বাড়ি তোমাদের আধ-কোশ দূরে সেখান থেকে; তুমি ঘাড় নেড়ে বলেছিলে, 'খুব পারব চিনে যেতে—কতবার গিয়েছি'—

সে আরো বলছে ঃ'সে-পাড়াগাঁর জীবন তুমি কোনো দিন ফিরে পাবে না—অন্তত তেমন করে কিছুতেই না—'কিংবা, 'মেয়েরা যখন পরিবর্তিত হয়, কেউ তাদের নাগাল পায় না। আমি নিজেকে রূপান্তরিত করতে পারি—অত্যন্ত স্থায়ীভাবে; তুমি ট্রিপের ফূর্তির জন্যে শুধু।'

এখানেও একটি নিটোল গল্প বলেছেন জীবনানন্দ। যে নায়িকা তার স্বামী প্রকাশের বুকের ভিতর মুখ রেখে সিগারেট চুরুট এলকোহলের একটা কটকটে গন্ধের ভিতর অত্যন্ত ক্ষমার সঙ্গে ঘুমিয়ে পড়েছিল একদিন—সে-ই একদিন স্মৃতিবিহ্বল অবস্থায় বলতে

পেরেছিল সোমেনকে—চল না, পাড়াগাঁয়ে যাই—

'কোন পাড়াগাঁয়?'

'যেখানে ছিলাম আমরা—'

'সেই বকমোহানার নদীর ধারে? ভাঁটশ্যাওড়া ময়নাকাঁটার জঙ্গলে?'

শচী মাথা নেড়ে বললে, 'হ্যাঁ—সেখানেও'—

নায়িকা সেই অতীতে ফিরতে চাইলেও গল্পকার জীবনসত্যকে মেনেই শিল্পের সত্যপ্রতিষ্ঠা করলেন। সোমেন তাই 'এই কামরার ভিতর এক মুহূর্তের জন্যেও আর টিকে থাকতে পারছে না। একটা হ্যাভেনা নিয়ে এক মুহূর্তের ভিতরেই রাস্তায় উঠল গিয়ে।

জীবনানন্দের তৃতীয় গল্প 'বিলাস' একদিক থেকে অনেক বেশি পরিণত। মনে হয় বিদেশী আধুনিক গল্পের ধারাকে তিনি আত্মস্থ করেছেন। নায়ক শান্তিশেখরের সম্বিৎপ্রবাহ (স্ট্রিম অব কনসাসনেস-এর বাংলা করেছেন অমলেন্দু বসু) দিয়ে গল্পের আরম্ভ। কিছু অন্ধকার কিছু আলোর এই আলোছায়াঘেরা মানসিক প্রেক্ষাপটেই নায়কের আগমন ও অগ্রগমন। তার বিলাস তার বই—'টেবিলে চেয়ারে বিছানায় মেঝের ওপরে বইয়ের ডাঁইয়ের অপরিমাণ সব শাঁস ডাকছে তাকে। কাকে ছেড়ে কাকে পড়বে শান্তিশেখর—এক-একটা বইয়ের ভিতর চার মাস ছ'মাসের চিন্তার খোরাক, কোনো-কোনোটাতে সম্বৎসরের, এক-আধটাতে নিরন্তর সময়ের; খবরের কাগজ নেহাৎই আজকের তারিখের উত্তেজনা।... বই পড়তে চায় সে—কিন্তু খবরের কাগজ নিজেকে পড়িয়ে নেয়' (প্রসঙ্গত মনে পড়ে—ষাট দশকের মাঝামাঝি চল্লিশের এক কবির সঙ্গে বু.র.র ২০২ আর. বি. এভিনিউয়ের বাসায় বু.ব.র বসার জায়গার দু'পাশে নতুন নতুন বই দেখে সেই কবি বিস্মিত হলে বু. ব. বলেছিলেন—পড়ি, বা না পড়ি নতুন নতুন বই আমার সব সময় চাই—আসলে সেই তিরিশের দশকের মানস গঠন প্রায় একইরকম বাস্তবে ও কল্পনায়)। শান্তিশেখর জানে—আরো ঢের বড় বইয়ের জগৎ বাইরে পড়ে রয়েছে—কিন্তু এসব না-পড়েই মরে যেতে হবে তাকে।

এইরকমই সম্বিৎপ্রবাহের পরে এক স্বপ্নপরম্পরায় (ড্রিম সিকোয়েন্সে) আবির্ভূত হচ্ছে নায়কের ইস্কুলের হেডমাস্টার অপরেশবাবু যাঁর সঙ্গেও কথোপকথন সেই লাইব্রেরি, বই, মালার্মে ইত্যাদি বিষয় নিয়ে।

অমলেন্দু বসু এই গল্পে সৃজনী চেতনা ও সৃজনী আঙ্গিক লক্ষ করেছেন। আমার মনে হয় এই গল্পের আরম্ভে সম্বিৎপ্রবাহ থাকলেও এটি ক্রমশ জীবনজটিলতার আবর্তে গাঢ়তর হয়ে উঠছে। নায়কের মৃত্যু যেমন একে অ্যান্টিহিরোর (সর্বেনের?) উপস্থাপনের দিকে নিয়ে যায়, তেমনি পরবর্তী অংশে আমেরিকান আপিসে বাঙালী সাহেবদের সঙ্গে শান্তিশেখরের সম্পর্কের মধ্যে আমরা একটা স্বার্থপর ও কুটিল সমাজের রূপ প্রত্যক্ষ করি যেখানে মহিলা কর্মী সুস্মিতার আবির্ভাবে মনে হয় 'লবঙ্গদ্বীপের কথা মনে পড়িয়ে দেবার জন্যে একটা বেড়াল ঢুকে পড়েছে তার (শান্তিশেখরের) ঘরে।'

আপিসের জগতের বিবরণ পড়তে পড়তে এ যুগের গল্পকারদের কথাও স্মরণে আসে। এ বছরের দেশ শারদীয় (১৯৯৭)-তে প্রকাশিত শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্পটির কথা মনে পড়ছিল এই প্রসঙ্গে।

সুস্মিতা তার কাজের ধরণ নিজেই বলেছে : 'আমার অফিস তো সন্ধ্যের সময় চোপরা মিত্তির গাঙ্গুলিকে নিয়ে, আয়েঙ্গার আসে মাঝে-মাঝে, বৈঠকী আর কী! তিনটের শো-তে 'টাইগার'এ গেছলুম মনমোহন সুরকে নিয়ে; এই তো এখুনি এলুম।

'এখানে এসে কী করতে হল?'

'কিচ্ছু না। রোজই আসতে হয়, এই যা। গাড়িতে।

'গাড়িতে?'

'হ্যাঁ, সর্বেনদার পেট্রল।'

শান্তিশেখর কিছু পরে ভেবেছে : সুস্মিতা দেখতে ভালো নয়—সুস্মিতা ঘোষ সাহেবের প্রিয় পাত্রী—না-হলেও হিসেবের পাত্রী। ঘোষেদের অবিশ্যি সবই চলে—মাথায় ফুলেল তেলের গন্ধ থাকলেই হল।

মনুষ্যত্ববিহীন এই সমাজে সুস্মিতা বা তার পৃষ্ঠপোষক সর্বেন ঘোষের কাছে শান্তিশেখরের মৃত্যু তেমন কোনো ভাবান্তর ঘটায় না। এমন কি, আপিস-ছুটি হবে কি হবে না সে-প্রসঙ্গে সুস্মিতা সর্বেন ঘোষকে বলে: 'বলে দেবেন, ছুটি না-দেওয়াই ভালো—একটা বড় অফিশ, কাজ তো ঢের।'... 'মরে গেছে—সে-জায়গায় লোক ভর্তি করে নিলেই হল। দেখতে তো হবে প্রুফ—আমার হাতে লোক আছে।'

পরে আপিস ছুটি হয়ে গেলে এই সুস্মিতাই সর্বেনের গাড়িতে দীর্ঘ ভ্রমণে বেরিয়ে পড়ে।

জীবন এদের কাছে কত সহজ, স্বার্থপর ও মনুষ্যত্ববিহীন তারই প্রকাশ ঘটিয়েছেন লেখক।

এই গল্পটি তার বিচিত্র বিভিন্ন চরিত্র ও সম্বিৎপ্রবাহ, স্বপ্নপরম্পরা, আপিসের জগৎ, নায়কের মৃত্যু এবং তারপরেও জীবনের স্থূল প্রবাহ নিয়ে ক্ষমাহীন নিষ্ঠুর গতিতে এগিয়ে চলেছে—এসব দেখে মনে হয় এই গল্পটি লেখককে উপন্যাস রচনার দিকে প্ররোচিত করেছিল। এর সাব-প্লটগুলির বিন্যাস দেখে মনে হয় তিনি ছোটগল্পের ছোট আবর্ত থেকে বেরিয়ে বড় গল্প বা উপন্যাসের ঘটনাপ্রবাহের দিকে এগিয়ে চলেছিলেন। সন তারিখের সঠিক হিসেব থাকলে হয়ত বলা যেত এটি তাঁর গল্প ও উপন্যাসের মধ্যে সেতুবন্ধ রচনা করেছে কিনা!

জীবনানন্দের গদ্যরীতি

শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায়

জীবনানন্দের একটি উক্তি এখন প্রায় প্রবচনের মতই হয়ে গেছে—সেটি তাঁর এক গদ্যরচনারই একটি অংশ—'সকলেই কবি নয়। কেউ কেউ কবি'। এটি ছাড়া আর কোন বচনই মুখে মুখে ঘোরে না, যদিও এরকম চমক অনেক ক্ষেত্রেই পাওয়া যায়। শেক্সপীয়রের অনেক নাট্য-ও কাব্য-অংশ মুখের ভাষায় চলে গেছে আমরা জানি। জানি কোলরিজের 'বায়োগ্রাফিয়ার' খড়ের বোঝার মধ্যে মাঝে মাঝে কাব্যসমালোচনার গূঢ় বক্তব্যের সূঁচ লুকিয়ে আছে—কিন্তু জীবনানন্দের বেলায় ঐ একটি ক্ষেত্র ছাড়া গদ্যাংশ মুখের ভাষায় প্রচলিত হয়নি। আসল কথা, জীবনানন্দের গদ্য রচনাগুলি তাঁর কবিতার মত অত অভিনিবেশের সঙ্গে পড়া হয়নি। তাঁর গদ্যরীতির বৈশিষ্ট্য আমাদের দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। সেখানে বাস্তবিকই চমকের কিছু নেই।

তিনি থেমে থেমে নিজের পাঠ ও বোধিসঞ্জাত কাব্যমতামত প্রকাশ করেছেন; সেখানে একটি কথাও বাহুল্যদোষে দুষ্ট নয়, কিশোর উচ্ছ্বাসে স্পৃষ্ট নয়, মনে হয় না আমরা কোন বালক বৃদ্ধের রচনা পড়ছি। তাঁর গদ্যরচনা পড়তে পড়তে স্বভাবতই এলিয়টের অন্তরঙ্গ ভাষার কথা মনে পড়ে—এলিয়ট যেমন একটি বক্তব্যকে ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করে নানা দিক থেকে তার ওপর আলোকসম্পাত করেন, জীবনানন্দও তেমনি তাঁর গদ্যরচনায় ধীর স্থির আত্মসমাহিত ভঙ্গিতে নিজের বক্তব্য উপস্থাপিত করেন। কোলরিজের সূঁচ তাঁর রচনায় খোঁজা বিড়ম্বনা, কারণ তাঁর রচনার স্বাদ গ্রহণ পুরো একটি রচনা পাঠেই সম্ভব—সে-ব্যাপারে তাঁকে রবীন্দ্রনাথের কাছাকাছি মনে হয়—কোন পূর্ণ রচনার পাঠ ছাড়া বক্তব্য বোঝা যায় না, পাঠের পেছনে পূর্ণ ব্যক্তিত্বটিকে মনে রাখলে আরো গভীরে প্রবেশ করা সহজ হয়।

জীবনানন্দের গদ্যরচনা আমরা সামান্যই পেয়েছি। তাঁর রচিত উপন্যাস ছাড়া আর সব গদ্যই প্রধানত তাঁর কাব্যের অনুপূরক, এগুলি পড়লে তাঁর কাব্যরসগ্রহণে একটা প্রতিষ্ঠানিক আনন্দ পাওয়া যায়, সর্বোপরি বোঝা যায় তিনি আধুনিক বাংলা গদ্যরীতির এক উপেক্ষিত নায়ক— সে রীতি ইম্প্রেসনিস্টিক হলেও যুক্তি, বোধি ও সহৃদয়তার এক যোগ্য মিশ্রণ। তাঁর গদ্যরচনাগুলিকে আমরা কয়েকটি শ্রেণীতে ভাগ করতে পারি : ১. 'কবিতার কথা'য় সংকলিত ও অন্যত্র (যেমন, 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'র ভূমিকায়) তাঁর কাব্যবিষয়ক মতামত, ২. তাঁর চিঠিপত্র, এবং ৩. তাঁর আত্মজীবনীধর্মী দু-একটি রচনা। আমরা প্রধানত 'কবিতার কথা'র গদ্য নিয়েই আলোচনা করবো, কারণ এখানেই কবি তাঁর শিল্পকর্ম সম্পর্কে প্রামাণ্য জবানবন্দি রেখেছেন, এখানেই গদ্যকে তিনি যথাযথভাবে আর এক শিল্পশৈলী হিসেবে গ্রহণ করেছেন। তাঁর অন্যান্য গদ্যরচনার কথা বিভিন্ন প্রসঙ্গে আসবে।

'কবিতার কথা' গ্রন্থের সব কটি প্রবন্ধই কবিতারচনা, কাব্যরসাস্বাদ ইত্যাদি বিষয় নিয়ে লিখিত। কবিতা সম্পর্কে যে মাত্রাচেতনার কথা জীবনানন্দ বলেছেন তা তাঁর গদ্যরচনাতেও প্রাপ্য। তাঁর উক্তি, 'কবি যখন তাঁর একটি কবিতা লেখা শেষ করেন, তখন হয় তা সফল হল, না হয় হল না। কি তা হল সব চেয়ে আগে কবির নিজেরই কাছে তা ধরা পড়বে। শিল্পীমানসের গঠনের ভিতর এই কঠিন আত্মোপকারপ্রতিজ্ঞা রয়েছে; তিনি অতীত বা আধুনিক, ব্যক্তিকেন্দ্রিক বা নৈর্ব্যক্তিক যাই হন না কেন' ('মাত্রাচেতনা', কবিতার কথা)। এ কথাগুলি জীবনানন্দের গদ্যভঙ্গি সম্পর্কেও খুবই সত্য। তাঁর গদ্য অহেতুক-উচ্ছ্বাসবিহীন যুক্তিনির্ভর ধীর স্থির গতিতে চলে। এদিক থেকে তিনি আমাদের ক্লাসিক লেখক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয় দত্ত প্রমুখদের খানিকটা সগোত্র। তবে যেহেতু তিনি আধুনিক যুগের মানুষ এবং আলোচ্য গ্রন্থের প্রবন্ধগুলি সবই কবিতাবিষয়ক, সে কারণে তাঁর রচনায় হার্দ্যগুণের সঙ্গে মিশেছে একজন সক্রিয় কবির অভিজ্ঞতা, নিজের শিল্পকর্মের অভিজ্ঞতা। তাঁর যুক্তিবাদী বাচনভঙ্গি আমাদের বারবার তাঁর রচনার মধ্যে টেনে নিয়ে গেছে। এরকম কয়েকটি বক্তব্য উপস্থাপিত করছি ঃ

১. প্রত্যেক বিশিষ্ট কবিই তাঁর যুগ ও সমাজ সম্বন্ধে সচেতন থেকে ভাবনাপ্রতিভার আশ্রয়ে যখন কবিতা লিখতে যান, তখন তাঁর কবিতার আঙ্গিক ও ভাষা বিচিত্রভাবে সৃষ্ট হয়—এমন একটা অপরূপ সঙ্গতি পায় যা তাঁর কবিতায়ই সম্ভব—অন্য কারু কবিতায় নয় (রবীন্দ্রনাথ ও আধুনিক বাংলা কবিতা)।

২. মহাবিশ্বলোকের ইশারার থেকে উৎসারিত সময়চেতনা আমার কাব্যে একটি সঙ্গতিসাধক অপরিহার্য সত্যের মতো, কবিতা লিখবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হয়েই এ আমি বুঝেছি, গ্রহণ করেছি। এর থেকে বিচ্যুতির কোনো মানে নেই আমার কাছে। তবে সময় চেতনার নতুন মূল্য আবিষ্কৃত হতে পারে (কবিতা প্রসঙ্গে)।

৩. ... কবিতাসৃষ্টি ও কাব্যপাঠ দুই-ই শেষ পর্যন্ত ব্যক্তি-মনের ব্যাপার; কাজেই পাঠক ও সমালোচকদের উপলব্ধি ও মীমাংসায় এত তারতম্য। একটা সীমারেখা আছে এ-তারতম্যের; সেটা ছাড়িয়ে গেলে বড়ো সমালোচককে অবহিত হ'তে হয় (জীবনানন্দ দাশের শ্রেষ্ঠ কবিতা, ভূমিকা, ১৯৫৪)।

তাঁর গদ্যভঙ্গি দেখলেই বোঝা যায় তিনি যুক্তিনির্ভর। ধীর, স্থির, বাহুল্যবর্জিত পদবিন্যাসের সাহায্যে তিনি নিজের কাব্যোপলব্ধির কথাই বলে চলেছেন। এই ভঙ্গি তাঁর পয়ার-প্রীতির জন্যেই হয়ত এত সুন্দর এবং বাস্তবিকই তাঁর গদ্যভঙ্গি ও কাব্যরীতি যে মূলত একই সেকথা আমরা পরে বলছি।

জীবনানন্দের অন্য গদ্যরচনার মধ্যে আছে তাঁর চিঠিপত্র ; সেই চিঠিগুলিতে তাঁর মার্জিত রুচির পরিচয় মেলে। একটি চিঠির অংশ উদ্ধৃত করি ঃ "আপনার চিঠি ও কবিতা পেয়ে খুশি হয়েছি। এবারও উত্তর দিতে দেরী হয়ে গেল। এজন্য গতবার যে কারণ দেখিয়েছি তা থেকে নিশ্চয়ই আপনার মোটামুটি ধারণা হয়েছে যে আমি আসলে অলস, কিংবা ভালো চিঠি-লিখিয়ে নই এবং এ সব দোষ স্বীকার করবার মত গুণ নেই আমার, কাজেই বড় কথা পেড়ে ছোট জিনিষকে চেপে রাখি। এ ধারণা একেবারে অসত্য নয়। আমি যা লিখেছিলাম, তাও মিথ্যা নয়। সংসারের মোটা লেনদেনের থেকে যে চিঠি যত দূরে সে চিঠি তত—সৎ কি অসৎ বলব না—শুদ্ধতর চৈতন্যের জিনিষ। এসব চিঠির উত্তর দিতে অল্প-বিস্তর দেরি হবেই" (ময়ূখ, জীবনানন্দ স্মৃতি সংখ্যা, পৃঃ ২২৪)। এখানেও আমরা জীবনানন্দের 'শুদ্ধতর চৈতন্যের' প্রতি অনুরাগ দেখতে পাই, এবং ধীরে

সুস্থে একটি পরিমার্জিত বক্তব্যের গভীরতায় তাঁকে পৌঁছোতে দেখি। কিংবা এই পংক্তি কয়টি ঃ "আপনার বাবা ও মার অসুস্থতার কথা শুনে চিন্তিত হয়েছি; আশা করি তাঁরা এখন ভাল আছেন। খুকু হয়তো সপ্তাহখানেকের মধ্যে কলকাতায় যাবে। তমলুকে এবার খুব বন্যা হয়েছে; আরো নানারকম গোলমাল; খুকুর মুখেই শুনতে পাবেন। খুকু আপনার কাছ থেকে যে ক'খানা বই এনেছে তা' পেয়ে আমি খুব খুশি হয়েছি; ইচ্ছে ছিল বইগুলো আরো কয়েকদিন রাখি; কিন্তু খুকুর সঙ্গেই দিয়ে দেব" ইত্যাদি (ঐ পৃঃ ২৩১-৩২)।

চিঠিপত্রে কাব্যালোচনার ক্ষেত্রেও আমরা যেমন জীবনানন্দের পরিশীলিত রুচি ও মার্জিত পদবিন্যাস দেখি, ব্যক্তিগত আলাপনের ক্ষেত্রেও তেমনি তাঁর মার্জিত ও ধীরগতি বিন্যাস দেখতে পাই।

এখন তাঁর আত্মজীবনী ধরনের রচনায় আসা যাক। তাঁর 'আমার মা বাবা' নামক রচনাটির কথাই বলছি। এর এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, "আজকের পৃথিবীর জীবনবেদের তাৎপর্য মা বেশি বুঝেছিলেন, তাঁর গদ্য লেখার, অভিভাষণে সমাজের ও নানা সমিতির কাজকর্মে লোকসমাজের সঙ্গে লেনদেনে নানারকম বই ও চিন্তার ধারার সঙ্গে পরিচয়ের পিপাসায় ভাবনা বিচারের আধুনিকতার মর্ম বুঝে দেখছিলেন যখন—তার কিছু আগেই কবিতা লেখা প্রায় ঘুচিয়ে দিয়েছিলেন তিনি ; ফলে যে মহৎ কবিতা হয় তো তিনি লিখে যেতে পারতেন, তাঁর রচিত কাব্যের ভেতর অনেক জায়গাতেই প্রায় আভাস আছে—কিন্তু কোন জায়গাতেই সম্পূর্ণ সিদ্ধি নেই—মাঝে মাঝে কবিতার ভেতর দু'চারটে বিচ্ছিন্ন সিদ্ধিকে বাদ দিয়ে। গদ্য সন্দর্ভ রচনারও একজন সৎ সাহিত্যিকের উপাদান ছিল তাঁর মধ্যে। বাবা ও পিসেমশায়ের অবর্তমানে তিনি বরিশালের ব্রাহ্মসমাজে আচার্যের কাজ করতেন। আরাধনা উপাসনা আশ্চর্য নির্ঝরের মত ধ্বনিত হয়ে—তবুও ধ্বনির অতীত অর্থগৌরবের দিকে আমাদের মর্ম ফিরিয়ে রাখত ; কোথাও ঠেকতেন না, তাল কেটে যেত না—পুনরুক্তি ছিল না, কিন্তু যে সাহিত্যিক ও কবির গরিমা তাঁর প্রাপ্য ছিল, সেটাকে অন্তর্দমিত করে রাখলেন তিনি—প্রকাশ্য কোনো পুরস্কার নিতে গেলেন না। শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের লেখায় ও নিজের অলিখিত অনুভাবনা, বিতর্ক ও ধ্যানের ভিতর কেমন যেন আত্মনির্বাণ খুঁজে পেলেন আত্মশুদ্ধির জন্য" (উত্তরসূরী, জীবনানন্দ স্মরণে, ১৩৬১, পৃঃ ১২)।

উপর্যুক্ত রচনাংশেও আমরা তাঁর ধীরস্থির পদবিন্যাসের মাধ্যমে তাঁর জননীর একটি রূপ দেখতে পাই। এখানেও জীবনানন্দের পরিশীলিত মানসিকতা স্পষ্ট। জননীর রেখাচিত্র অঙ্কনে তিনি মূল কয়েকটি আঁচড় টেনেছেন। উচ্ছ্বাসের বদলে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে আলোকসম্পাতই সার্থক চরিত্র-চিত্রণে সাহায্য করেছে।

আলোচ্য তিন ধরনের গদ্য রচনাতেই জীবনানন্দের যে বাগ্‌ভঙ্গি আমরা দেখতে পাই তার থেকে তাঁর পরিশীলিত মনন, বুদ্ধি, বোধি তথা হৃদয়ের সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কোথাও বাহুল্য নেই, অনাবশ্যক উচ্ছ্বাস বা অহমিকার প্রকাশ ঘটেনি। একটি বক্তব্যকে নানা দিক থেকে দেখে তিনি তার বিচার বিবেচনা করেছেন এবং যতক্ষণ না সেটি হীরের মত ঝকঝকে হয়ে উঠেছে ততক্ষণ তার ওপর সূক্ষ্ম আঘাত হেনেছেন। বস্তুত যুক্তিবাদী ঝরঝরে ভঙ্গি তাঁর চিন্তার ঋজুতাই প্রমাণ করে, এ ব্যাপারে তিনি আমাদের উনবিংশ শতাব্দীর বিশিষ্ট গদ্যকারদের সগোত্র, সেকথা আগেই বলা হয়েছে। ওয়ার্ড সাহেব বলেছেন, Every writer has a style of some sort, good or bad ; it is the stamp of the writer's mind and personality. Sloppy-minded people will write

sloppy prose; precise clear-minded people will write clear and precise prose, expressing exactly what they mean with simplicity and brevity (A. C. Ward, *Twentieth Century Prose*, ভূমিকা)। জীবনানন্দের ভঙ্গিও ঢিলেঢালা (sloppy) নয়, সেইজন্যে তিনি অল্প লিখলেও যেটুকু গদ্য লিখেছেন তাতে সুমিত মাধুর্যের প্রকাশ ঘটিয়েছেন।

এই পরিমিতিবোধ জীবনানন্দ পেলেন কোথা থেকে? কাব্যে উত্তররৈবিক বাগ্‌ভঙ্গি তাঁর চিত্রকল্পের নবীনত্বে, ইতিহাসচেতনা কিংবা মহাবিশ্ব-অনুভাবনায় প্রকাশ পেলেও গদ্যে রবীন্দ্রনাথের নিতান্ত ব্যক্তিগত, উজ্জ্বল, মুখর ভাষার দীপ্তি এড়িয়ে তিনি সেই ঐতিহ্যাগত সুমিত বাগ্‌ধারা কেন বা কীভাবে গ্রহণ করলেন? এর উত্তর হয়ত আছে আমাদের উপরিউদ্ধৃত আত্মজৈবনিক রচনাংশটিতেই। তিনি যে এক মার্জিত ব্রাহ্ম পরিবারে জন্মেছিলেন, সেখানকার মিতস্বভাব পরিবেশে লালিতপালিত হয়েছিলেন এবং তাঁর কবি-জননীর বিশিষ্ট প্রভাব তাঁর ওপর কাজ করেছে তা আমরা দেখতে পাই। ব্রাহ্মসাধনার যুক্তিবাদিতার মতই তাঁর গদ্যরচনার অনাবশ্যক উচ্ছ্বাসবিহীন যৌক্তিক বিন্যাস।

এই পরিমিতিবোধ তাঁর জীবনের অবদান সন্দেহ নেই, আবার এই গুণ তিনি তাঁর কাব্যভঙ্গি থেকেও পেয়েছিলেন। এই বোধ জীবন থেকে কাব্যের মাধ্যমে তাঁর গদ্যরচনাতেও সঞ্চারিত হয়েছে বললে ভুল হয় না। সে ব্যাপারে কবিতায় তাঁকে সাহায্য করেছে তাঁর প্রিয় পয়ার। বিতর্কের অবকাশ থাকলেও আমরা মনে করি বাংলায় মুখের ভাষার কাছাকাছি হচ্ছে পয়ার ছন্দ, ছড়ার ছন্দ নয়। লিখিত গদ্যের বহু পংক্তিকে আমরা পয়ারের পর্বে ভাগ করতে পারি, যেমন পয়ারে লিখিত অনেক কবিতার পংক্তি আমাদের গদ্য বলে গ্রহণ করতেও কষ্ট হয় না। কয়েকটি উদাহরণ দিচ্ছি:

১. মাঠ থেকে মাঠে-মাঠে—সমস্ত দুপুর ভরে এশিয়ার আকাশে আকাশে
শকুনেরা চরিতেছে ... (শকুন)

২. ঘুমে চোখ চায় না জড়াতে—
বসন্তের রাতে
বিছানায় শুয়ে আছি; (পাখিরা)

৩. দেখেছি সবুজ পাতা অঘ্রাণের অন্ধকারে হয়েছে হলুদ,
হিজলের জানালায় আলো আর বুলবুলি করিয়াছে খেলা, (মৃত্যুর আগে)

৪. সবিতা, মানুষ জন্ম আমরা পেয়েছি
মনে হয় কোনো এক বসন্তের রাতে ... (সবিতা)

এই পয়ার ছন্দ থেকে আর এক পা গেলে তাঁর গদ্যকাব্যভঙ্গি:

১. কচি লেবুপাতার মতো নরম সবুজ আলোয়
পৃথিবী ভ'রে গিয়েছে এই ভোরের বেলা (ঘাস)

২. সারাদিন একটা বিড়ালের সঙ্গে ঘুরে-ফিরে কেবলই আমার দেখা হয়
(বিড়াল)

উল্লিখিত সব কটি কবিতাতেই আমরা বাগ্‌ভঙ্গির মধ্যে গদ্যের কাঠামো খুঁজে পাই—সেই ধীর স্থির পদসঞ্চার, একটি বক্তব্যের দিকে অভিযান। কবিতায় অতিরিক্ত যে সম্পদ তা বিরল চিত্রকল্পের এবং আশ্চর্য একটি সুরের—না হলে তাঁর গদ্য ও কবিতায়

বিচরণ খুবই অনায়াস মনে হয়। বস্তুত জীবনানন্দের ক্ষেত্রে গদ্য-পদ্যের ভেদাভেদ মাত্র একটি পর্দারই আড়াল মনে হয়। তাঁর সম্পর্কেই যেন বলা চলে, 'Prose is the literary medium for thought and meditation, poetry of emotion and sensation' (Ward, ঐ)। এই ভেদাভেদ মুছে দিতে সাহায্য করেছে জীবনানন্দের দীর্ঘপর্বের পয়ার যা তাঁর গদ্যকবিতার অনুপূরক। তাঁর গদ্যভঙ্গি এই উক্তিকেই সমর্থন করে, 'prose is best when it is most truly prosaic, when it dose not encroach upon the realm of verse rhythm and artifice' (G. H. Vallins, Rhythm in Prose and Verse. In *The Best English*, ১৯৫১, পৃঃ ১৩৪)। কবিতায় যেখানে জীবনানন্দ নিজেকে চিত্রে, সুরে, ক্যানভাসের বিস্তৃতিতে ছড়িয়ে দেন, গদ্যে সেখানে তিনি তন্ময় তথা যুক্তিবাদী বাচনে বার বার নিজেকে, নিজের কবিতাকে বিশ্লেষণ করেন—একটি ভঙ্গি স্বভাবতই অন্যটির পরিপূরক। প্রকরণের দিক থেকে পয়ারই এই দুই বাগ্‌ভঙ্গিকে কাছাকাছি এনেছে সন্দেহ নেই, কিন্তু তাঁর যৌক্তিক বিন্যাস তাঁর গদ্যকে এমন এক বৈশিষ্ট্য দিয়েছে যা সহসা আমাদের চোখে পড়ে না—সেটা সম্ভবত আমরা কোন মাধ্যমে সেই মাধ্যমের বৈশিষ্ট্য না খুঁজে অন্য মাধ্যমের গুণাবলীর বাহুল্য দেখে থমকে দাঁড়াই বলেই সম্ভব হয়েছে। জীবনানন্দের গদ্যভঙ্গি নিম্নলিখিত মানদণ্ডে অবশ্যই উত্তীর্ণ এবং মনোযোগী পাঠের প্রত্যাশী ঃ "What is produced by Style or Art in prose may be superficially beautiful in sound and sensation, but it cannot be considered good prose unless it is meaningful, conveying its idea or information intelligibly and in an attention-compelling manner." (Ward, ঐ)।

'অদ্ভুত অপৃথিবী' ঃ জীবনানন্দের উপন্যাস

অশ্রুকুমার সিকদার

জীবনানন্দের 'সুতীর্থ' উপন্যাসের শেষের দিক থেকে ক্ষেমেশের সঙ্গে জয়তীর একটা সংলাপ উদ্ধৃত করছি। জয়তীকে ক্ষেমেশ জিজ্ঞাসা করছে—

> 'এ কেমন ভাষা ব্যবহার করছ তুমি—যা মুখে আসছে তা-ই বলছ। কেমন বাংলা রপ্ত করে নিলে তুমি?
> বাংলা আমার ঠিকই আছে—ওর জন্যে আমি মাথা ঘামাই নে।
> কাদের সঙ্গে মিশছ আজকাল তুমি?
> যারা মানুষের সঙ্গে মেশে তাদের সঙ্গে।
> তারা কি এ রকমভাবে কথা বলে?
> তুমি অনেকদিন কারুর সঙ্গে মেশ নি। ভাষা ও চিন্তা কি রকম দাঁড়াচ্ছে টের পাওনা তুমি।'

জীবনানন্দ টের পেতেন। তীব্র সংবেদনশীল এই মানুষ তাঁর আশ্চর্য শোষণশক্তি দিয়ে আয়ত্ত করে নিয়েছিলেন পরিবর্তমান মুখের ভাষার স্পন্দকে, নাগরিক অপভাষার শাণিত প্রখরতাকে। এই সময়ের কবিতায় যেমন পাই আমরা মরখুটে, টেঁসে যায়, গাড়ল—এই সব শব্দ বা শব্দগুচ্ছ, অথবা 'ভালো করে দেখে নিলে মনে হয় অতীব চতুর দক্ষিণরাঢ়ী/দিব্য মহিলা এক'[১] এই ধরনের চরণ, তেমনি উপন্যাসে পাই অনর্গল নিচের ধরনের বাক্য।

ক. এই হাঙ্গামাটার পর থেকে কলকাতায় এ সব জায়গাজমির ওপর সোনার মাকড়ি কানে এঁটে দিনরাত গিন্নিশকুন লাফাচ্ছে। ('সুতীর্থ')

খ. যাচ্ছিলে কোথায় শীত রাতের লক্ষ্মীপেঁচার মতো; কলকাতার কালপেঁচারা ধাড়ি ইঁদুরের ঘ্যাঁট রেঁধে রেখেছে বুঝি ? লে ঝপাঝপ্ করে দাঁড়িয়ে না পড়লে মূলে হাভাতে করে দেবে?' ('সুতীর্থ')

গ. আঠারো উনিশের অনেক মেয়ে অবিশ্যি ষাট বছরের প্রবীণ পুরুষকেও হাঁচিয়ে ছাড়ে। ('সুতীর্থ')

ঘ. ঘাড়ের রোঁ শাদাটে মেরে গেল, এখনও ন্যালা কুকুরের মতো খুব যে গুঁইগাঁই —খুব যে গুঁইগাঁই। ('মাল্যবান')

ঙ. এমন শীতের দুর্বার রাতে কোথাকার একটা মিকড়ে হারামজাদা জানালার ভেতর দিয়ে অন্ধকার খুপরির ভেতর এটাকে সটকাল। ('মাল্যবান')

চ. যে মদ খেয়ে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে, তার মন তো গোঁসাইকে সাক্ষী রেখে গুরুভাইয়ের ভোগে লাগবার জন্যেই এমন চাপদানির মালপো হয়ে আছে। না হলে এমন গ্যাজ হয়ে পড়ে থাকে ? এটা করি, ওটা করি, যেন ব্রহ্মাণ্ডবোধ স্তর থেকে স্তরে উঠে যাচ্ছে মরিনের। আঃ, সে কী ব্রহ্মাস্বাদ নিশীথ! সারা রাত। ('জলপাইহাটি')

মাল্যবানের আহ্লাদ হয়ে যায় 'বুড়ো ধাড়ির দেইজিপনা', মেসের ঝি গয়মতী 'খিচে সিগারেট টানে।'

জয়ন্তীর কথা ধার নিয়ে বলা যায়, চিন্তা বদলে যাচ্ছে, আর তাই বদলে যাচ্ছে ভাষা। চিন্তা বদলে যাচ্ছে, যেহেতু বদলে যাচ্ছে সমাজ, জীবনযাপন। রূপসী বাংলার ধ্যানে যে নির্জনতার কবি একদিন তন্ময় ছিলেন, তিনিই কলকাতার নাগরিক জীবনের সংসর্গে এসে সেই পরিবর্তমান জীবনযাপনের তীব্র অভিজ্ঞতার অভিঘাতে আকুল হয়েছিল। সেই অভিঘাতের ফলে লেখা হয়েছে তাঁর তৃতীয় পর্যায়ের কবিতা—দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গার পটভূমিতে লেখা কবিতা। সে-সব কবিতায় তিনি দেখেছিলেন মূল্যবোধের অবক্ষয়, 'গভীর অসূয়া'।[১] 'সংক্ষুব্ধ বিবমিষা'র[৩] দ্বারা প্রাণিত সেই সব কবিতায় আছে বীভৎসক্লেদতাময় ছবি, বিশ্বসংসারের প্রতি বিরূপ বিতৃষ্ণা। মনে হয়েছিল সভ্যতাসংসার 'প্রমত্ত কালো গণিকার উল্লোল সঙ্গীতে মুখর।'[৪] সেই বীভৎসতাবোধ থেকেই রচিত হয়েছে তাঁর 'সুতীর্থ' আর 'মাল্যবান' উপন্যাস দুটি, এমন কি, 'জলপাইহাটি'ও। 'মাল্যবান' উপন্যাসের রচনাকাল দেওয়া আছে জুন ১৯৪৮, 'সুতীর্থে'র দেওয়া নেই। তবে মনে হয় 'মাল্যবানে'রই সমকালে, ঈষৎ আগে-পরে 'সুতীর্থ' রচিত হয়েছিল। 'জলপাইহাটি'র রচনা ১৯৪৮। বলা হচ্ছে 'উনিশ শো ছেচল্লিশ তো এখন'; উপন্যাসে দাঙ্গা, দুর্ভিক্ষের উল্লেখ পাচ্ছি, সোদপুরে গান্ধিজীর কথা পাচ্ছি। যুদ্ধ শেষ হয়ে আসছে, স্বাধীনতা আসছে। সময়প্রবাহ সম্পর্কে তীব্রভাবে সচেতন ছিলেন জীবনানন্দ। সেই কালচেতনার প্রমাণ আছে তাঁর কবিতায়, এই উপন্যাসগুলিতে। সময়ের নিরবচ্ছিন্ন বহতার কথা ভাবে মাল্যবান—'সচ্ছল সকল সময় ব্যথা, বাচালতা, সরসতা, নষ্টামি, ভয়, রক্ত, রিরংসা, অনাথ অন্ধকার ও গভীরতার ভেতর মৃত্যু নয়, শূন্য নয়, ব্যক্তিজীবন নয়, অফুরন্ত অনির্বচনীয় সময়,—সময় শুধু'। আমরা যে সময়ের মধ্যেই থাকি সে বিষয়ে সুতীর্থও সজ্ঞান—'একই তো সময়, একই প্রবাহ; রয়ে গেছে—রইছে; আমরাও আছি সমস্ত সময়ের সঙ্গে চিৎ হয়ে, কাৎ হয়ে, তেরছা কান্নিক মেরে।' এই সময়চেতনা থেকেই এসেছে নিজের কাল সম্বন্ধে তীব্র সংবেদনশীলতা, জীবনানন্দের রচনায়। উপন্যাস দুটির পটভূমি, কেমন সেই সময়? সুতীর্থর প্রাক্তন সহপাঠী, বর্তমানে ক্ষৌরকার মধুমঙ্গল বলে, 'মন্বন্তর দাঙ্গাহাঙ্গামা দুটো যুদ্ধ কালোবাজার মিলিটারিরা সেঁটে চিবিয়ে খেয়ে গেছে সব; হাড়গোড় ছিবড়ে শুঁকতে আরশোলারা ঠ্যাং নাড়ছে, তাদের ঠ্যাং ফড়ফড় করছে। চান সেই ঠ্যাং? দিতে তবে পারি। সে ঠ্যাং তো আপনার নিজেরি। কার রক্তমাংস চাইছেন আপনি? কার কাছে? কে দেবে আপনাকে?'

দুটো উপন্যাসেই সাকার হয়েছে এক অতি তীব্র বিবমিষা। এমন এক প্রতিকূল ক্লিন্ন বহির্জগতের সংস্রবে যেন তিনি এসেছিলেন এই সময়ে যে তিনি শত শত শূকরের চিৎকার ও শত শত শূকরীর প্রসব বেদনার যন্ত্রণার আর্তনাদে মুখর কবিতা লিখেও তাঁর অদম্য ঘৃণাকে চূড়ান্ত প্রকাশ করে উঠতে পারেননি, তাই তাঁর দরকার হয়েছিল বিস্তৃততর মাধ্যম—উপন্যাসের বিস্তার। গল্প কয়টিতে হাত পাকিয়ে শেষে জীবনানন্দ সমাজ ও সময়কে বিস্তীর্ণ পটভূমিতে ধারণ করার জন্যে উপন্যাসও লিখেছিলেন। সুতীর্থ লেখক, যদিও ইদানীং লেখে না। সে ভাবে এতদিন 'যা লিখেছে সে তো আত্মরতি, কুঁড়ে গরুর গল্প।' জীবনানন্দও কি সেই আত্মরতি থেকে বেরোতে চাইছিলেন? ব্যক্তিগত দৃষ্টিকেই দিতে চাইছিলেন একটা নৈর্ব্যক্তিক পরিপ্রেক্ষিত? হয়তো তাই এই সব উপন্যাস তিনি গোপনে সন্তর্পণে লিখেছিলেন, না লিখে উপায় ছিল না বলে। '১৯৪৬-৪৭' কবিতায়

তিনি লিখেছেন,

> মানুষ মেরেছি আমি—তার রক্তে আমার শরীর
> ভরে গেছে; পৃথিবীর পথে এই নিহত ভ্রাতার
> ভাই আমি... ।

সুতীর্থ মণিকাকে বলে 'সমাজ নষ্ট, রাষ্ট্র পঙ্গু, মানুষের হাতে মানুষ শেষ হয়ে যাচ্ছে, বোন মরছে ভাইয়ের হাতে।' 'মাল্যবান' উপন্যাসে বারে-বারে পড়ি—

ক. মানুষের পৃথিবী আজ পাগলা গারদ—সেখানে মানুষের শিশু আর বেড়ালের ছানার একই অবস্থা।

খ. মানুষের চেয়ে বড় শয়তান কে আছে এই সৃষ্টির ভেতর! শয়তান! শয়তান!

মাল্যবানের ঘর পাখি নোংরা করেছে দেখে উৎপলা বলে 'পাখিরা আর কদ্দুর করবে; মানুষেরা পাখিদের চেয়ে শয়তান; না হলে পৃথিবীটা এ রকম পৃথিবী হয়।' মানুষের শয়তানির পরিণাম আমরা জেনে যাই যখন ধর্মঘটী মজুরদের আমরা বলাবলি করতে শুনি, 'মাকড়সার জাল ছাড়া আর কি আমরা? মানুষ তো নয়—মানুষের পিত্তি। শরীরের পিত্ত কফ বায়ু ঠিকরে যে আঁশ বেরিয়ে আসে তার ফ্যাকড়া তুমি আমি অনন্তরাম, ঘনশ্যাম—।' কবিতায় দেখেছি এই তীব্র বিবমিষাকে অবয়বত্ব দিতে গিয়ে জীবনানন্দ সেই সব জীবজন্তুর প্রসঙ্গ আনেন যারা কুশ্রী অসুন্দর—বানরবানরী, ব্যাং, ইঁদুর, শেয়াল, শকুন, প্যাঁচা। এই সব, এবং আরো অন্য জুগুপ্সিত প্রাণীর সমাবেশ উপন্যাসেও। ভবতোষ ঘনবর্ষার কুমড়ো খেতের কাঁকড়ার মতো গাঢ় চোখে তাকিয়ে কথা বলে, পকেটমার ছোকরাকে মনে হয় লিকলিকে ছিপছিপে বানরের বাচ্চা, ধর্মঘটীরা 'পাড়াগাঁর বিশ্রী বিদ্‌ঘুটে বর্ষায় খালুয়ের ভেতর ল্যাটামাছের মতোন', সদ্যোজাত শিশু যেন মগরাহাটার কুচো চিংড়ির মতো, মেসের ছি গয়মতী 'মাকরের ঠ্যাং, ফিঙের ঠ্যাং, কাতলের মুখ, ভেটকীর মুখের মতো', অমরেশকে মনে হয় আট ঠ্যাংওয়ালা মাকড়সা, মাল্যবান নিজে উৎপলা সম্পর্কে ভাবে 'কতো যে সজারুর ধাষ্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদড়ের কাতরতা, বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির'। সব কিছু ঘৃণ্য, কারণ মানুষের সংসারের সব কিছুর মধ্যে মাল্যবান দেখে 'মূল্য বিশৃঙ্খলা'। জীবনানন্দের 'অদ্ভুত আঁধার এক' কবিতায় আছে শেয়াল আর শকুনের কথা। তাঁর উপন্যাসে যেহেতু আধুনিক সংসারের অদ্ভুত আঁধার রূপায়িত 'তাঁর গদ্যপ্রতিমাতেও কেবলই তাই পাব শকুন আর শেয়ালের এক অন্ধকার জগৎ।'[৫]

মূল্যবোধের ভয়ংকর বিপর্যয় ঘটে গেছে যুদ্ধ-মন্বন্তর-দাঙ্গায় বিধ্বস্ত বাংলাদেশে, জীবনানন্দের পৃথিবীতে ; তাই তিনি ভয়ংকর বিবমিষায় পীড়িত হয়েছিলেন। সুতীর্থ ভাবে 'কেমন একটা অন্ধকার যুগে আছি আমরা।' মূর্খ ও বেকুবদের সঙ্গে দিনরাত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে জীবনযাপন করতে হয়। গলদঘর্ম ভিড়ে হন্তদন্ত সুতীর্থের বাসযাত্রার যে বর্ণনা পাই তার মধ্যেই মনুষ্যবিরোধী বিতৃষ্ণাকে আমরা সাকার হয়ে উঠতে দেখি। কোনো সহযাত্রীর মুখে সদ্য বসন্তের দাগ, খোসা উড়ছে, কোনো লোকের মুখে দুর্গন্ধ, 'ডানদিকের মানুষটার' গরমির রোগ, কারো কালো পুরু ঠোঁট জুগুপ্সা জাগায়। আধুনিক সভ্যতার প্রতি জীবনানন্দের বিবমিষা প্রকাশ পায় দাম্পত্য-সম্পর্কের যৌন বিরূপতার মধ্য দিয়ে। 'কারুবাসনা'র নায়কের সঙ্গে কল্যাণীর তিন বছর বিয়ে হয়েছে, কিন্তু 'এ তিন বছরের ভিতর প্রেমিকের পুলক একদিনও বোধ' করেনি সে। অন্যদিকে 'হিসেব-নিকেশ' গল্পের

অবনীশের বিবাহিত জীবন ত্রিশ বছরের, অবনীশের সমস্ত গায়ের থেকে মজে যাওয়া বিবাহের ঘ্রাণ ছড়িয়ে পড়ছে যেন; এক এক সময় সেটাকে কেমন দুর্গন্ধের মতো মনে হয়।' 'মেয়েমানুষ' গল্পে দ্বিজেনের প্রতি তার স্ত্রী নীলার অপরিমিত বিতৃষ্ণা। নিশীথের স্ত্রী সুমনার শরীর বাতিল তীব্র রক্তশূন্যতায়। 'হাড়ের ভিতর দিয়ে চিঁ চিঁ করে যে শব্দ বেরোয়, নিশীথের মতো মানুষের মনের খোরাক মেটাতে গিয়ে জাউয়ের মতো কাজ করে তা, ভুসির মতো ভুর হয়ে পড়ে থাকে।' 'জীবনপ্রণালী' গল্পের নায়ক যে ইংরেজি কবিতা পড়ছে তার একটি চরণ, 'But we were badly mated'। জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের স্বামী-স্ত্রী বেশির ভাগ সময় 'badly mated'। 'সুতীর্থ' উপন্যাসের বিরূপাক্ষ-জয়তীর দাম্পত্য জীবনের মধ্যে সেই বিরূপতা সংহতভাবে প্রকাশ পেয়েছে। জয়তীকে বিয়ে করেছিল অশিক্ষিত রুচিহীন হঠাৎ-বড়লোক বিরূপাক্ষ টাকার জোরে—'তোমাকে স্ত্রী হিসেবে পাবার সৌভাগ্য হয়েছিল টাকার জোরে, আমার জোরে নয়।' জয়তীর প্রাক্তন অনুরাগীদের সে পরমাই বলে; তার কোনো প্রেম ছিল না, সে শুধু খোকার বাপ হতে চেয়েছিল। জয়তীও বিরূপাক্ষের লক্ষ-লক্ষ টাকার লোভে বিয়ে করেছিল, আন্তরিক ঘৃণা অবদমিত করে। ক্ষেমেশের বাড়িতে জয়তী থাকতে চাইলে ক্ষেমেশ জিজ্ঞাসা করে, 'তোমার বাবুর মত আছে তো?' যেন জয়তী বিরূপাক্ষর স্ত্রী নয়, রক্ষিতা। একটি ছোটগল্পের নায়িকা, শচীর যেমন মনে হত, 'বারবিলাসিনী' সে। বিরূপাক্ষ-জয়তীর দাম্পত্য জীবনের কদর্যতারই বহুগুণিত রূপ যেন অন্য উপন্যাসে মাল্যবান-উৎপলার দাম্পত্য জীবনে। মাল্যবানের স্ত্রী উৎপলা, এই নারীকে ভালোবেসে 'নিখিল বিষ'[৬] মধুর হয় না, এই নারী দিব্যকল্পনার 'স্বর্গীয় শিখার মতো'[৭] নয়। মাল্যবান-উৎপলার সেই শ্রীহীন দাম্পত্যজীবনের জুগুপ্সাময় বর্ণনার মধ্যেই যেন প্রকাশিত হয়েছে বিশ্বসংসার সম্বন্ধে জীবনানন্দের বিরূপ বিতৃষ্ণা। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে 'অনুভূতির সমতা নেই'। দুটি প্রাণী, উপর নিচ দুই ঘরে আলাদা থাকে। নিচে মাল্যবানের ঘরে প্রায় কখনোই আসে না উৎপলা, বাড়ির গৃহিণীর স্পৃহার সম্পূর্ণ অভাবে, তার বরটা হতচ্ছাড়া। উপরের বাথরুমেও স্বামীকে স্নান করতে দিতে চায় না উৎপলা। মাল্যবানকে ফুটপাতে শুতে যেতে বলতেও কুণ্ঠিত হয় না। মেজদা-মেজবৌঠান এলে বাস্তবিকই মাল্যবানকে চলে যেতে হয় মেসে। 'অপ্রেমই শিখিয়েছে উৎপলাকে' মাল্যবানের প্রতি এমন তীব্র দুর্ব্যবহার করতে। স্বামী-স্ত্রীর সংলাপ মানেই বিবাদ, মাল্যবানের ভাষায় চমৎকার 'কবিয়ালী লড়াই'। রাত্রে দোতলায় স্ত্রীর সঙ্গে কথা বলতে গেলে রেগে যায় উৎপলা—'রাত দুপুরে ন্যাকড়া করতে এলো গায়েন।' উৎপলার চাই শাড়িগয়না খাওয়াদাওয়া আরামবিলাস—'পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ ঘুচিয়েছে বটে উৎপলা, কিন্তু তাই বলে শরীরের স্বাদের সঙ্গে নয়।' মাল্যবানের স্বভাব বিপরীত। মেয়েকে চিড়িয়াখানা দেখাতে নিয়ে গিয়ে দুজন সারাক্ষণ ঝগড়াই করে। মেয়ের ইচ্ছে-অনিচ্ছের দিকে নজর দেবার সময় পায় না—'রাজযোটকে যাদের বিয়ে হয়েছিল, সেই বাপ-মা এই মেয়েটির কোনো কথা খেয়ালের ভেতর আনল না।' তাদের অনুভূতির যে সমতা নেই তা আরো প্রমাণ হয়ে যায়, যখন চিড়িয়াখানায় হাতি দেখে মাল্যবানের মনে হয় চীনের বা ভারতের জ্ঞানবিষ্ণুদের মতো, তখন উৎপলা হাতির বুড়ো দিদিমার মতো মুখ দেখে কৌতুক, অসাধ ও নিরেট অস্বস্তি বোধ করে। এই দাম্পত্য পরিস্থিতির মধ্যে কেন যে সে বাবা হয়েছিল তা সে ভাবতেই পারে না—কেন হীন কুৎসিত উচ্চুণ্ডে জীবনবীজ ছড়িয়েছিল তা ভাবতে মাল্যবানের মাথা গরম হয়ে যায়। মেয়ে যে দিনে-দিনে শীর্ণ হয়ে যাচ্ছে সে দিকে উৎপলারও খেয়াল থাকে না। স্বামীর প্রতি

অবজ্ঞায় বিদ্রূপতায় উৎপলা ভাবে সে যদি জনৈক অনুপম মহলানবীশের স্ত্রী হতে পারতো। এখন কখনো সে শ্রীরঙ্গের সঙ্গে কখনো 'শিশ্নোদরতন্ত্রী' অমরেশ, যার সর্বশরীর থেকে 'সুলভ আত্মতুষ্টি চুইয়ে পড়ছে', তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে নিভৃতে সময় কাটায়। উৎপলা সাধারণ হিন্দুঘরের মেয়েদের মতো বিশ্বাস করতে রাজি নয় যে, মাল্যবানের সঙ্গে বিয়েই তার বিধিনির্ধারিত ছিল। আজ মনে হয়, বিয়ে না হলেই সে সুখী হত। চিড়িয়াখানায় অবিবাহিত কয়েকটি মেয়েকে দেখে সে ভাবে 'যারা বিয়ে করে নি, তাদেরই রগড়।' সে অবিবাহিত কুমারী মেয়ে সাজতে চায়, 'ভেবেছিলাম আজ কপালে সিঁদুরের টিপ পরে আসবো না।' উৎপলা চায় মাল্যবান হ্যাট-টাই পরুক, তার পদক্ষেপে সৌন্দর্য মাত্রা দৃঢ়তা আসুক। অন্যদের ঈর্ষা জাগানোর জন্যে এই নারী সিনেমায় বক্সে বসতে চায়, অন্যেরা ঈর্ষায় না পড়লে 'রগড় ফলাও হয় কী করে?' সিনেমায় গিয়ে সে পাশের সীটের অ্যাংলো-ইণ্ডিয়ান মেয়েদের সম্বন্ধে অশ্লীল মন্তব্য করে অনর্গল, আধ-ঘুমন্ত মনুকে গাঁট্টা মেরে জাগিয়ে দেয়। একবার মাল্যবান অসুস্থ হয়ে বমি করলে, মানুষটাকে খানিকটা নির্যাতন-নিষ্পেষণ করার জন্যেই তার দুটো দামি ধোয়া ধুতি দিয়ে নোংরা জায়গাটা নিকিয়ে নেয় উৎপলা। অথচ একেবারেই যে হৃদয়হীন উৎপলা তা নয়; তীব্র বকাবকির শেষে সে প্রতিবেশিনী মেয়েকে ক্ষীর খেতে দেয়, লোনার মাকে তার কুষ্ঠরোগগ্রস্ত ছেলের জন্যে রোজ ভাত-ডাল-মাছ নিয়ে যেতে বলে, তার সমস্ত হৃদয়হীনতা মাল্যবানের প্রতি। মাল্যবান ভাবে, 'কী হবে এই বাতাস ঘরদোর নিয়ে। এই নারী নিয়ে কী করবে সে।' বাঘের মাসি বেড়ালকে মেরে মাল্যবান ঘরের ভিতরের নারী-সোনালিব্যাঘ্রের হিংস্রতাকে হত্যার একটা নিগূঢ় তৃপ্তি পায়—এইটুকুই সে করতে পারে। উৎপলাকে নিয়ে তার চলবে না, তবু আজীবন চালাতে হবে। যে সব স্বামী-স্ত্রী দাম্পত্যনিষ্ফলতার জীবনযাপন করে, 'একটা ভাঙা গেলাসের কাচগুলো জড়ো করে জোড়াতাড়া দিয়ে প্রত্যেকবারই জল খেতে হয় তাদের...ভাঙবেই, জল খেতে হবেই...।' নিজেদের যৌনজীবন নিয়ে ভেবে মাল্যবান বিষণ্ণ শ্লেষে হেসে ওঠে, মজন্তালি সরকারের মতো হেসে পেট ফেটে যায় তার। সে ভাবে তাকে, 'নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে, অপ্রেমে কামনার টানে, বেশি লালসা রিরংসায় উৎপলার মতোন একজন ভালো বংশের সুন্দর শরীরের নিচু কাণ্ডজ্ঞানের নিরেস মেয়েমানুষের কাছে ঘুরে ফিরে আসতে হবে নিজের মৃত্যু পর্যন্ত কী নিদারুণভাবে...।'

কিন্তু কেন এই নির্মম হৃদয়হীনতা? পাশের বাড়ির সদ্যোজাত শিশুটি আঁতুড়ে মারা গেলে স্বামী-স্ত্রীর কথার মধ্যেই মাল্যবান ভাবে, হয়তো উৎপলা বহু সন্তানের মা হতে চেয়েছিল, হয়নি, হয়তো তাই 'সেই সব নিহিত তেজ উৎপলার আপাতমূর্খতায় অতৃপ্তিতে ঝরে পড়ছে।' ভাবে, তার বদলে অন্য কোনো দশাসই পুরুষের স্ত্রী হলে আটটি-দশটি সন্তানের মা হয়ে সুখী হতো উৎপলা। যৌন-অতৃপ্তিই তার হৃদয়হীনতার কারণ হয়তো। কারণ যাই হোক, তার জীবনে 'নম্রবশা ঘরজোড়া স্নিগ্ধতা হলো না, খড়খড়ে আগুনখড়ের চমৎকার অগ্নি-ডাইনীর মতো মাল্যবানের বিয়ে আর বৌ আর বিবাহিত জীবন।' দুঃস্বপ্নময় সভ্যতার প্রতীক যেন এই সব দুঃস্বপ্নময় দাম্পত্যজীবন—মূল্যবিপর্যয়ের প্রতীক। বিবাহিত জীবনে আর নয়, বরং হয়তো অবিবাহিত নরনারীর সম্পর্কের মধ্যে সেই স্নিগ্ধতা দেখা দিলেও দিতে পারে। যেমন সুতীর্থ-মণিকার রহস্যময় সম্পর্কের মধ্যে। মণিকা সুতীর্থের বাড়িউলী; উপরতলায় স্থায়ীভাবে অসুস্থ স্বামী ও মেয়ে অমলাকে নিয়ে থাকে। মাসের পর মাস সুতীর্থের ভাড়া বাকি পড়ে থাকে। কর্তব্য হিসাবে ভাড়ার তাগাদা দেয় বটে মণিকা, কিন্তু আসলে তার যেন তাগিদ নেই। প্রায়ই সুতীর্থ মণিকার কাছে খায়।

তার সব দায়দায়িত্বই যেন মণিকার। 'চেহারা অনির্বচনীয় তবু, যেন চল্লিশ ফিরে যাচ্ছে ত্রিশে, ত্রিশ ঠেকছে গিয়ে কুড়িপঁচিশে। অথচ সত্যিই বয়স হয়েছে; তেমনি মর্যাদা ...।' মণিকার শরীরে রূপ আছে, রূপের অহঙ্কার আছে, স্তাবক পুরুষের সামনে সে ছাড়া অন্য কেউ 'নারীসত্তমা' আছে তা সে ভাবতে পারে না। এই নারীর সঙ্গে সুতীর্থর রাত্রিকালীন সংলাপ উপন্যাসের এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে। বিরূপাক্ষ আর মণিকা ঘুমের মধ্যে জড়িয়ে বসে আছে দেখে সুতীর্থর ভালো লাগে না, মণিকাও সেই আচরণের কারণ বারে-বারেই ব্যাখ্যা করতে থাকে সুতীর্থর কাছে। তারা কি পরস্পরকে ভালোবাসে? বাস্তবিকই রহস্যময় তাদের সম্পর্ক। একটা ইঙ্গিত আছে লেখকের দুটি বাক্যে, পরপুরুষের প্রতি প্রেমের 'সে সব ধাক্কা আসে না অবিশ্যি আমাদের দেশের এই সব ঘরানা মহিলাদের জীবনে। এলেও তা নিয়ে আড়ালে ভাপে রান্না তৈরি হয়—মৃত্যুঞ্জয় সূর্যে কোনো শস্য ফলায় না।' সুতীর্থ-মণিকা কি সেই রকম 'আড়ালে ভাপে রান্না তৈরি' করছে। আজ বিবাহিত জীবনের 'নম্র বশ্য ঘরজোড়া স্নিগ্ধতা' অতীতের ঘটনা—স্মৃতিচারণের বিষয় প্রায়।

তাই মাল্যবান-উৎপলার বিবাহিত বিষাক্ততার পাশে বৈপরীত্য রচনার জন্যে আমরা পেয়ে যাই এ উপন্যাসে উৎপলার মেজদা-মেজোবৌঠানের এবং বিপিন ঘোষের বিবাহিত জীবনের কথা। মেজদা-মেজ-বৌঠানের প্রত্যেক কথার ভিতর দিয়ে যৌন-সম্বন্ধের মিছরি-মাখানো ভালোবাসার মর্ম ফুটে ওঠে। আর বিপিন ঘোষ এত বেশি স্ত্রীনির্ভর ছিল যে স্ত্রীর মৃত্যুর পর সে দিশেহারা হয়ে যায়; জনে-জনে ডেকে সে দাম্পত্যসৌভাগ্যের স্মৃতি রোমন্থন করে। বিপিন ঘোষের বিবাহিত তৃপ্তির খবর মাল্যবান উৎপলাকে জানালে, উৎপলা তাকে খুব সংক্ষেপে বলে 'উল্লুক'। মেজদা-মেজবৌঠান, বিপিন ঘোষের দাম্পত্য-প্রণয় যেন অতীত থেকে ছিটকে এসে পড়েছে বর্তমানে। তা অতীত; আর কোনো দিন ঘটবে না। বর্তমানের এই দুঃস্বপ্নময় তটভূমিতে দাঁড়িয়ে নায়কেরা অতীতের স্মৃতিচারণ করে। যেন তৃতীয় পর্যায়ের জীবনানন্দ 'রূপসী বাংলা'র অতীত সুষমার দিকে শেষবারের মতো ফিরে তাকান। 'গ্রাম ও সহরের গল্পে'র শচী বালিগঞ্জের ড্রইংরুমে বসে ভাবে 'বাংলার পাড়াগাঁর উচ্ছন্ন-যাওয়া ভিটের ওপরেও যে-অন্ধকার নেমে আসে, যে-ঘেটুফুল ফণিমনসা বাসা বাঁধে তা কি নরম,—নিবিড়।' স্বামীর যাওয়ার সময় সে ভিনেগারের শিশি সরিয়ে বরং আর একটু কাসুন্দি ঢালে। সোফার উপর বসে ভাবে, 'চকমোহনার নদীর ধারে যা একদিন হয়েছিল বনজঙ্গলের আবছায়ায় নক্ষত্রের নিচে জলের গন্ধের কাছে।' ত্রিশের দশকের দুনিয়াব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দার দিনে উপনিবেশের এক রাজধানীতে দাঁড়িয়ে শিক্ষিত সংবেদনশীল যুবক 'নিরুপমযাত্রা'র প্রভাত কবিত্ব করে আর বুলবুলির গান শুনে দিন কাটায় না। সেও যখন 'আর্থিক অধঃপতনের অপরাধে আত্মিক জীবনের অমর্যাদা ও গ্লানি' সহ্য করে পথে-পথে সারাদিন ধাক্কা খায় তখন গ্রামের ফেলে-আসা দিনগুলোর কথা ভাবে—'চৈত্র-বৈশাখের নির্জন দুপুরবেলা—জামরুল পাতার মর্মর শব্দ, বোলতার গুন্‌গুন্ নারকোল গাছে কাঠঠোকরার ঠোকর, কামিনী গাছের ডালপালার ভিতর টুনটুনিগুলোর কিচিরমিচির—মাথার উপর কড়া রৌদ্রে মাছরাঙার ডাক—বাতাসে নিদ্রালু মাঠপ্রান্তরের নিস্তব্ধতা ও স্বপ্নের হাহাকার।' 'জলপাইহাটি'র নিশীথও এই রকম ঘরকাতুরে মনোভাবে আচ্ছন্ন হয়। 'কলকাতার চেয়ে মফস্বলের প্রকৃতিলোক ঢের ভালো লাগে তার। সেইসব মানুষদেরও ভালো লাগে—মফস্বলের গ্রামপ্রান্তর থেকে উপচে পড়ে যে-সব মানুষ—কার্তিকের বিকেলের রোদে, চোত-

বোশেখের শেষ রাতের ফটিক জলের মতো জ্যোৎস্নায়।' মণিকাকেও সুতীর্থ বলে, 'আমি নিজেও তো হেঁটে চলে যেতাম এক সময় মাঠ, ঘাট, ঝিল, জঙ্গল, তেপান্তর থেকে।' আজ 'নিভে গেছে সব'[৮], আজকের নষ্টভ্রষ্ট সভ্যতার তুলনায় বাংলার মুখ রমণীয় ছিল একদিন।

বাংলার লক্ষ গ্রামরাত্রি একদিন
আল্পনার পটের ছবির মতো সুহাস্যা পটলচেরা চোখের মানুষী
হতে পেরেছিল প্রায়...।[৯]

আগের পৃথিবীও ঢের ভালো ছিল—লাওৎ-সে, কনফুচ, মিঙযুগের চীন, খ্রীজ্ঞানের ভারত, থিসিয়ুস পেরিক্লিসের গ্রীস। প্রায় যেন ক্লসট্রোফোবিয়া-পীড়িত নাগরিক অবরুদ্ধতার মধ্যে বাস করে মাল্যবানকে উন্মথিত করে পুরনো স্মৃতি, শীতের শেষ রাতে হিজলবনের ওপার থেকে অন্ধকারের মধ্যে বাউলের গানের সুর ভেসে আসা, কালিজিরা ধানশালি রূপশালি ক্ষেতের আলপথ দিয়ে বাড়ি ফেরা। অঘ্রাণের বিশই জন্মদিনের তারিখে তার মনে পড়ে যায় বেয়াল্লিশ বছর আগে কলকাতা থেকে দেড়শো মাইল দূরে পাড়াগাঁয় সে জন্মেছিল—সেখানে ছিল খেজুরের জাঙ্গাল, সুপুরির বন, শীতের রাতে ধানক্ষেতের শূন্যতা, উদাস রাতে ফেউয়ের ডাক। সেই হারানো পাড়াগাঁই যেন তাঁর মৃত মা। মেসের বিছানায় শুয়ে-শুয়ে তার 'পাড়াগাঁর কথা মনে পড়ে—মার কথা।' যেন উৎপলা আর শহর একাকার। উৎপলাও মা হয়েছে—'নিজের মায়ের সঙ্গে এই মাকে মিলিয়ে ফেলে বৃষ্টির ছিপছিপে ছটফটে জল যেন পুকুরের সমাহিত সঞ্চিত জলের শান্ত স্বরূপের ভেতর মিশে যায়, তেমনি একটা অব্যাহত মাতৃত্বের সদাত্মাকে চাচ্ছিল যেন সে।' ভিন্ন পরিবেশে সেই সদাত্মাকে চায়, কিন্তু আজ আর পায় না। শুধু ভাবে 'কোথায় গেল সে-সব।' সুতীর্থর সহপাঠী মধুমঙ্গল দীর্ঘশ্বাস ফেলে ভাবে, কোথায় গেল পঁচিশ ত্রিশ বছর আগের পৃথিবী?...সেদিনকার সমাজ-সংসার দিনক্ষণ রূপযৌবন এ রকম পচে ছিবড়ে হয়ে গেল।'

সমাজসংসার কেন এমন পচে ছিবড়ে হয়ে গেল? 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে শুনি, 'মানুষের ভেতরের আলো ঘিরে মাছি অনেক, হারীত। আজকাল ঢের বেশি মাছি পড়ছে—'। 'মাল্যবান' উপন্যাসে একটা বাক্য—'আজকের পৃথিবীটা কলকাতার বাণিজ্যশক্তির গোলকধাঁধা নিয়ে এমনি অদ্ভুত অপৃথিবী।' এই আঁধার-ঘেরা পৃথিবী যে অপৃথিবী হয়ে উঠেছে সেজন্য কলকাতার বাণিজ্যশক্তি, অর্থাৎ নাগরিক বণিকসভ্যতার অর্থের অনর্থই দায়ী। 'মাল্যবানে' সভ্যতার অসুখের কারণ স্পষ্টভাবে নির্ণীত হয়নি। সেই কারণকে পৌনঃপুনিকভাবে নগ্নভাবে উদ্‌ঘাটিত করেছেন জীবনানন্দ 'সুতীর্থ' উপন্যাসে। উপন্যাসের শেষে ক্ষেমেশ বলে, 'মানুষের বিদ্যা বাড়ছে কিন্তু জ্ঞান নেই।' সে কবিতার শব্দগুচ্ছ ব্যবহার করে আরো বলতে পারতো, 'জ্ঞান নেই আজ এই পৃথিবীতে; জ্ঞানের বিহনে প্রেম নেই।'[১০] কেন নেই? নেই, কারণ আজকের সভ্যতার উপাস্য দেবতা টাকা এবং 'এই দেবতাই ব্যাধি।' 'আজকালকার পৃথিবীতে বোলতা, পিঁপড়ে, মৌমাছি সকলেই প্রমিসরি নোট খায়, চেক খায়, চিনি মিশ্রি খেতে চায় না...।' সুতীর্থর এক বন্ধু বিজনও জানায়, সে এক বাটিতে চিনি, অন্য বাটিতে টাকা রেখে দেখেছে পিঁপড়েগুলো চিনি ফেলে টাকা খাচ্ছে। 'টাকা দিয়ে বকনার দুধও পাওয়া যায়'—মণিকাকে এই খবর দেয় তার অসুস্থ, সন্দেহবাতিকগ্রস্ত স্বামী অংশুবাবু। যে-টাকার বীজাণুর এমন ভয়ঙ্কর, বৈনাশিক শক্তি তারই যেন মনুষ্যমূর্তি বিরূপাক্ষ। এই বিরূপাক্ষর টাকা ভদ্র-অভদ্র সব বাঁট থেকে টেনে আদায় করা। সে তার স্থূল অকপট ভঙ্গিতে পূর্ববঙ্গীয় ভাষায় বলে, 'আমিত্তির নাহান

প্যাঁচে প্যাঁচে রস সেই জিনিসের হেইয়ার নাম ট্যাহা।' সেই নিবিড় রাত্রে মণিকা এই বিরূপাক্ষ সম্বন্ধে মনে মনে ভাবে 'ও বড়জাতের মানুষ নয়—কোনো স্বাভাবিক মহত্ত্বই নেই—ওর হালচাল; ধাষ্টামো আছে ; শরীরের তাগদ—তেল যাকে বলে—হেঁড়ে—বেল্লিকপনা এই সব আছে; এই সবের থেকেই টাকার উৎপত্তি হয়, আমাদের ব্যাঙ্কগুলো বেঁচে থাকে।' সেই সময়েই আবার মনে মনে ভাবছে বিরূপাক্ষ—মণিকার মতো নারীদের চেনে সে, নিরবচ্ছিন্ন ভান ও ভাঁড়ামোয় প্রায় কোনো পুরুষের কাছেই এরা শিং ভাঙে না, 'কিন্তু সে-বেটাচ্ছেলের টাকাটা টাকার মতো হলে বেশ এলিয়ে আগ বাড়িয়ে থাকে।' কলকাতার সব অলিগলিতে, সব দেবী-পিশাচীর মুখেই সে একটা কথাই শুনতে পায়—'টাকার বড় দরকার।' পঞ্চাশ হাজার টাকার বেয়ারার চেক জয়তীর হাতে দিয়ে জয়তীকে আজ রাত তার ঘরে শুতে বলে বিরূপাক্ষ সপ্রতিভ আত্মবিশ্বাসে। সে ভাবে, 'মাঝে-মাঝে ধনবৈজ্ঞানিক উৎকর্ষ না দেখালে মানুষ কি করে স্ত্রীধন পায়।' 'বিলাস' গল্পের শান্তিশেখরও বলেছিল, 'নানা মেয়ের মুখ চেয়ে চলতে হলে ষাঁড়ের মতো শরীর চাই, ধর্মের ট্যাঁকের মতো টাকা...।'

> পৃথিবীতে সুদ খাটে ঃ সকলের জন্যে নয়।
> অনির্বচনীয় হুন্ডি একজন দুজনের হাতে।
> পৃথিবীর এই সব উঁচু লোকেদের দাবি এসে
> সবই নেয়, নারীকেও নিয়ে যায়।'[১১]

শুধু যে নারীকেই নিয়ে যায় তাই নয়। 'যার তিনটে বাড়ি আছে—দুটো গাড়ি, চেম্বাব অব কমার্সের চাঁই, মাথায় খদ্দরের টুপি, হাতে হুন্ডি, তার টাকায় যে খায়, মুখ মোছে, তারই আজ সত্য অসত্য সম্বন্ধে মতামত দেবার অধিকার।' সুতীর্থ বুঝে যায় অদ্ভুত আঁধার পৃথিবীতে আসবেই, মানবসম্পর্ক দূষিত-বিষাক্ত হবেই, সাহিত্য-জ্ঞান-জিজ্ঞাসা-নিরীক্ষা যা হবার হয়ে গেছে, আর কোনোদিন হবে না। 'এখন থেকে টাকা হবে শুধু।'

এই পরিবেশের সঙ্গে জীবনানন্দের নায়কেরা, যাদের নামে উপন্যাস দুটির নামকরণ, তারা এই মুদ্রাকেন্দ্রিক বুর্জোয়া সমাজের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে পারে না। ফলে তারা আত্মমগ্ন বিচ্ছিন্ন, একাকিত্ববোধে আচ্ছন্ন। পশ্চিমী সাহিত্যে ডস্টয়েভস্কি থেকে এই ধরনের অনিকেত মানুষের মিছিল শুরু হয়েছিল। আধুনিক উপন্যাসের একটা লক্ষণই হয়ে দাঁড়িয়েছে এই জাতীয় নায়ক চরিত্র। যে মানুষ প্রতিকূল পরিবেশে 'on the verge of breakdown'[১২] তার যন্ত্রণাবোধ আধুনিক উপন্যাসের মতো এই উপন্যাস দুটিতেও বিধৃত। 'দিবারাত্রির কাব্যে'র হেরম্ব? 'পুতুলনাচের ইতিকথা'র শশীর মধ্যে আমরা এই অনুভূতিকে রূপায়িত হতে দেখেছিলাম, 'চতুষ্কোণে'র রাজকুমারের মধ্যে—যে রাজকুমার সারাদিন নিজের ঘরে 'একাই সে অনেক হইয়া নিজের জগৎ ভরিয়া রাখে।' জীবনানন্দ নিজেই এই অনুভূতির কাব্যরূপ দিয়েছিলেন 'বোধ' এবং 'আটবছর আগের একদিন' কবিতায়। 'কারুবাসনা'র নায়কের 'আকাঙ্ক্ষা ও উদ্যমের অকুতোভয় স্বাভাবিকতা ও অমিততেজা সাংসারিকতা' নেই। 'বিলাস' গল্পের শান্তিশেখরও এই রকম অনিশ্চিত মানুষ। মধ্যবয়সী, কিছুতেই স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করে না, উদ্যম নেই তার। শরীর ভারি খারাপ লাগে তার। হাতঘড়িটা সে মামার টাকায়, না খুড়োর টাকায়, না অন্য কারো টাকায় কিনেছিল তা মনে করতে পারে না। যেমন কাম্যুর নায়ক মনে করতে পারে না, মা আজ মারা গেছে না গতকাল।

সুতীর্থকে হীরো না বলে অ্যান্টি-হীরো বলাই ভালো। লিখতো, ইদানীং লেখে না। সে

গালে হাত দিয়ে বসে থাকে, ছোটখাট সিদ্ধান্ত নিতেও এক আধ মুহূর্ত ইতস্তত করে। সে বলে বেড়ায় তার শ্বশুরবাড়ি পাশগাঁয়ে, ছেলেমেয়েবৌ আছে—কিন্তু সবই বানানো গল্প। 'লোকটা অন্যমনস্ক'—একটা শূন্যতা আধোশূন্যতায় মগ্ন হয়ে থাকে তার মন। সুতীর্থ তার ম্যানেজিং ডাইরেক্টরকে বলে, 'আমি একজন নিতান্তই বাইরের মানুষ।' বাস্তবিকই সে বাইরের মানুষ, কোথাও যেন তার শিকড় নেই। তার প্রতি সহানুভূতিশীল একজন ধর্মঘটী তাকে 'ত্রিশঙ্কু' বলে। মণিকার মতে সে 'কাচাছাড়া ভাবের মানুষ।' সে হিজলী ক্যাম্পেও ছিল, অনার্স পরীক্ষাও দিয়েছে; রিভলবার জুগিয়েছে, এম.-এও দিয়েছে—অথচ রিভলবার বা বিশ্ববিদ্যালয় কোনটাতেই তার আস্থা ছিল না। বামপন্থী রাজনীতিতেও সে বিশ্বাস করতে পারে না, আবার মোহনদাস করমচাঁদকেও সারাৎসার মনে করতে পারে না। দ্বিতীয় নায়ক মাল্যবানের বিয়াল্লিশ বছর বয়স। 'বেয়াল্লিশটা বছর চলে গেল জীবনে। সুবাতাস আর কুবাতাসের কত কাটাকাটি হল। কাটাকাটি এখনো চলছে—চলবে, যে পর্যন্ত না মাটিতে মাথা রাখি।' মধ্যশ্রেণীর মানুষ মাল্যবান, ভালো মাইনে পায়, কিন্তু সংসারে তার কোনো মর্যাদা নেই। স্ত্রী উৎপলা মেয়ে মনুকে নিয়ে দোতলায় চমৎকার থাকে, নিচের তলায় অবজ্ঞাত জীবন মাল্যবানের। স্ত্রীর সঙ্গে মর্মান্তিক বিরূপতার সম্পর্ক তার, অথচ 'স্ত্রীকে ঘুচিয়ে দিয়ে একা চলবার কোনো শক্তিই তার নেই।' কোনো সহজ স্বাদ নেই জীবনে তার, প্রায়ই তার চোখে ঘুম আসে, বড়ো একঘেয়ে লাগে তার সব কিছু—কী করবে সে কিছুই ঠিক পায় না। 'শান্তি ভালোবাসে; নিজের সুখ-সুবিধা খানিকটা ছেড়ে দিয়েও।' 'নিজেকে অবিচারিত—অভালোবাসিত—বিড়ম্বিত মানুষ বলে খতিয়ে নিতে নিতে মনটা লঘু হয়ে ওঠে তার।' সে নিঃসঙ্গ একা মানুষ, সে 'আলতো জীবন যাপন করে।' তীক্ষ্ণ বিদ্রূপের সঙ্গে—উৎপলা বলে, মাল্যবানের কোথাও ডাক নেই, কেউ পোঁছে না...কোনো মানুষই আসে না—ডাকলেও আসে না।...সেই বিয়ের পর থেকেই দেখছি কেরানীবাবুর নিচের তলার ঘরটিতে দুটো চেয়ার; একটাতে তিনি নিজে বসেন, আর একটাতেও তিনি নিজে বসেন।' সে খায়দায়, সংসারের বেনেগিরি করে বটে, কিন্তু সে ভাবে 'মাটির নিচে গেঁড় আর কন্দ খাওয়া শূয়োরের মতো অফিসগিরিই তার সব নয় এ-সবের চেয়ে সে আলাদা।' সে পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন হতে পারবে না ভেবে বিষণ্ণ হয়। নিবিষ্ট পাঠকের মনে পড়বে 'রূপসী-বাংলা'য় দেশবন্ধুর কথা আছে, ইয়েটসের কবিতায় পার্নেলের কথা। পার্নেল বা চিত্তরঞ্জন হতে পারবে না, বটমলি বিগল্যাণ্ড ব্রাদার্সের চাকরির চেয়ে বড় কিছু তার পক্ষে সম্ভব নয়, স্ত্রী-মেয়ে এবং কলেজ স্ট্রিটের তিনখানি ঘরই তার চরম প্রাপ্তি—এ-সব জেনেও তার 'মহৎ কাজের ফেনশীর্ষে' আরোহণের ইচ্ছে হয়, কেরানীর ডেস্ক ও উৎপলার স্বামিত্ব থেকে ঘুচিয়ে সে গোলদীঘিতে ঘুরতে ঘুরতে সর্বভারতীয় রাজনীতিতে বাঙালির দুরবস্থায় উত্তেজিত হয়। মাথা ঠাণ্ডা হলে অবশেষে 'একটা বিড়ি জ্বালায়'। সে নানা কল্পনা করে—সমাজসেবা করবে, দেশের স্বাধীনতার চেষ্টা করবে, বিপ্লবের তাড়নায় তাড়িত হবে। নিজের মেয়ে মনুকে যদিও বেশি পছন্দ করে না মাল্যবান তবু মাঝে মাঝে তাকে ইতিহাস-ভূগোল পড়াতে বসে এবং সেই সঙ্গে 'মানুষের জীবনের মানে—প্রথম মানে—মাঝারি মানে... বিশেষ করে অন্তিম অর্থ' শেখাতে চায়। প্রতিবেশিনী বধূ রমার মৃত্যুর পর প্রায়ই সে মৃত্যুর স্বপ্ন দেখে আর ভাবে 'স্বপ্ন হচ্ছে অন্তিম জিনিস'। বিরুদ্ধ পরিবেশের নির্মমতা স্বার্থপরতার মধ্যেও জীবনের সে অন্তিম অর্থ খোঁজে বলেই সে আলাদা নিজভূমে পরবাসী মানুষ। নিজেকে পরিবেশের সঙ্গে মানাতে পারে না বলেই সে ক্রমে ক্রমে বস্তুজগৎ থেকে নিজের সত্তাকে সরিয়ে নিয়ে

অন্তিম জিনিস স্বপ্নের মধ্যে আত্মস্থ হয়।

'মাল্যবান' উপন্যাসের শেষে প্রতিধ্বনিমুখর কয়েকটি বাক্য গানের ধূয়ার মতো বারে বারে ফিরে আসে ঃ

> শীতের রাত ফুরুবে না কোনোদিন?
> না।
> কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?
> না, না, ফুরুবে না। ...
> কোনোদিন ফুরুবে না শীত, রাত, আমাদের ঘুম?
> ফুরুবে না। ফুরুবে না। কোনোদিন—

মাল্যবান-উৎপলার এই কবিতার মতো সংলাপের সামান্য আগে উৎপলা বলেছিল 'ভোর হবে না আর', আর মাল্যবান ভেবেছিল, 'কোনদিনও যে জেগে উঠতে হবে না আর'। মনে পড়ে যায়, জীবনানন্দ কবিতায় অন্ধকারের স্তনের ভিতর যোনির ভিতর অনন্ত মৃত্যুর মতো মিশে থাকতে চেয়েছিলেন, কারণ অস্তিত্বের ভয়াবহতা জেনে তাঁর সমস্ত হৃদয় ঘৃণায় বেদনায় আক্রোশে ভরে গিয়েছিল; বারবার তিনি বলেছিলেন, 'কোনোদিন জাগবো না আমি—কোনোদিন জাগবো না আর—।'[১৩]

> যে মানুষ একগাছা দড়ি হাতে অশ্বত্থের কাছে গিয়েছিল, সেও
> রক্তফেনামাখা মুখে মড়কের ইঁদুরের মতো ঘাড় গুঁজি
> আঁধার ঘুঁজির বুকে ঘুমায় এবার
> কোনোদিন জাগিবে না আর।[১৪]

জীবনানন্দকে ২২ অগ্রহায়ণ ১৩২২ তারিখে রবীন্দ্রনাথ যে চিঠি লিখেছিলেন তাতে 'বড়ো জাতের রচনার মধ্যে যে শান্তি আছে'[১৫] তার ব্যাঘাত ঘটেছে জীবনানন্দের লেখায় এমন ইঙ্গিত দিয়েছিলেন। সেই শান্তির ব্যাঘাতের জন্যেই তার স্থায়িত্ব সম্বন্ধে তিনি সন্দিহান। মনে হয় তারই উত্তরে জীবনানন্দ রবীন্দ্রনাথকে এক দীর্ঘ চিঠি লেখেন—তারই উত্তরে মনে হয়, কারণ সেখানে এই প্রশ্নেরই বিস্তৃত আলোচনা আছে। জীবনানন্দ লিখেছেন, 'অনেক উঁচু জাতের রচনার ভেতর দুঃখ বা আনন্দের একটা তুমুল তাড়না দেখতে পাই। কবি কখনো আকাশের সপ্তর্ষিকে আলিঙ্গন করার আগ্রহে উন্মুখ হয়ে ওঠেন,—পাতালের অন্ধকারে বিষজর্জর হয়ে কখনো তিনি ঘুরতে থাকেন। কিন্তু এই বিষ বা অন্ধকারের মধ্যে কিংবা এই জ্যোতির্লোকের উৎসের ভেতরেও প্রশান্তি যে খুব পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে তা তো মনে হয় না। প্রাচীন গ্রীকেরা Serenity জিনিসটার খুব পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের কাব্যের মধ্যেও এই সুর অনেক জায়গায় বেশ ফুটে উঠেছে। কিন্তু যে জায়গায় অন্য ধরনের সুর আছে সেখানে কাব্য অক্ষুন্ন (ক্ষুণ্ণ?) হয়েছে বলে মনে হয় না। দান্তের Divine Comedy-র ভেতর কিংবা শেলীর ভেতর Serenity বিশেষ নেই। কিন্তু স্থায়ী কাব্যের অভাব এঁদের রচনার ভেতর আছে বলে মনে হয় না।...Mood-এর প্রক্রিয়ায় রচনার ভেতর এই যে সুরের আগুন জ্বলে ওঠে তাতে Serenity অনেক সময়েই থাকে না—কিন্তু তাই বলে তা সুন্দর ও স্থায়ী হয়ে উঠতে পারবে না কেন বুঝতে পারছি না।... আমার তাই মনে হয় রচনার ভেতর যদি সত্যিকার সৃষ্টির মর্যাদা থাকে তা হলে তার ভেতরকার বিশিষ্ট সুরের প্রশ্নটি হয়তো অবহেলাও করা যেতে পারে। শান্তি বা Serenity-র সুরে কবিতা বেঁধেও সত্যিকারের সৃষ্টিপ্রেরণার অভাব থাকলে হয়তো তাই নিষ্ফল হয়ে যায়। বীঠোফেনের কোনো কোনো Symphony বা Sonata-র ভেতর

অশান্তি রয়েছে, আগুন ছড়িয়ে পড়ছে,—কিন্তু আজও তো টিঁকে আছে—চিরকালই থাকবে টিঁকে, তাতে সত্যিকার সৃষ্টির প্রেরণা ও মর্যাদা ছিল বলে।'[১৬]

জীবনানন্দের এই চিঠির অধিকাংশটাই উদ্ধৃত করলাম, কারণ তার আলোয় উপন্যাস দুটির স্বরূপ বুঝে নিতে সুবিধা হবে। 'মাল্যবান' বা 'সুতীর্থ' কোনো উপন্যাসেই শান্তি নেই, বরং যে-অশান্তি আঘাত করে তা-ই এই উপন্যাস দুটির সৃষ্টিপ্রেরণা। আর সেই সৃষ্টিপ্রেরণার অকৃত্রিমতা সন্দেহাতীত। বানানো নয়,—আভ্যন্তরীণ কোনো মর্মভেদী যন্ত্রণায় তাদের জন্ম, তাঁর এই সময়ের অনেক কবিতার মতোই। আনন্দের নয়, দুঃখের তুমুল আবেগে এরা রচিত। এখানে তিনি পাতালের বিষজর্জর অন্ধকারে অবতরণ করেছেন—তাই নারকীয় পরিবেশ সম্বন্ধে এমন ঘৃণা, এত জুগুপ্সা। দান্তের ডিভাইন কমেডির উল্লেখ করেছেন জীবনানন্দ; বাস্তবিক দান্তের ইনফের্ণোর এক আধুনিক প্রতিরূপ তিনি গড়ে তুলেছেন শহর-কলকাতার পটভূমিতে লেখা এই দুই উপন্যাসে। 'নরক শ্মশান হলো সব'[১৭] এই মর্মান্তিক অনুভূতির দ্বারা এই দুই উপন্যাস প্রাণিত। আগুন জ্বলে উঠেছে তাদের মধ্যে, প্রতিটি বাক্যের মধ্যে সংহত হয়ে আছে বিস্ফোরণ। অবশ্য কবিজীবনের শেষ পর্যায়ে, আকস্মিক মৃত্যুর কিছু আগে থেকে, জীবনানন্দ যে তিমিরবিনাশী হয়ে উঠতে চেয়েছিলেন কবিতায়, সেই জ্যোতির্ময়তার আভাস উপন্যাসেও ঈষৎ আছে। তিনি কবিতায় 'নব-নব মৃত্যুশব্দ রক্তশব্দ ভীতিশব্দ জয় করে' 'অলখ অরুণোদয়, জয়'[১৮] উচ্চারণ করেছিলেন। আর একটা কবিতায় লিখেছেন,[১৯]

> সিন্ধুশব্দ বায়ুশব্দ রৌদ্রশব্দ রক্তশব্দ মৃত্যুশব্দ এসে
> ভয়াবহ ডাইনীর মতো নাচে—ভয় পাই—গুহায় লুকাই;
> লীন হতে চাই—লীন—ব্রহ্মশব্দে লীন হয়ে যেতে
> চাই।

উপন্যাসের শেষে 'ডৎপলার অট্টহাসি, সমুদ্রশব্দ, রক্তশব্দ, মৃত্যুশব্দ' শুনতে শুনতে জেগে ওঠে মাল্যবান। আবার ঘুমিয়ে পড়ে। মেজদা মেজবৌঠানের ছেলেমেয়েকে, মনুকে ঘুমন্ত অবস্থায় দেখে মাল্যবানের মনে জাগে 'একটা সর্বাত্মক করুণা', 'একটা নির্জন অন্তর্ভেদী সমভিব্যাপী দয়ার উজ্জ্বলতা'—মরা বেড়ালছানা, মনু, বিপিন ঘোষের স্ত্রী, এমনকি মাল্যবানের নিজের স্ত্রীর জন্যেও তার মন করুণায় অভিষিক্ত হয়; স্নিগ্ধতা হৃদয়ে জাগে। সুতীর্থ দেখে 'চারিদিকে মাঘনীলিমার সমস্ত পরিমণ্ডলের নীল ঝরে পড়ছে—শূন্যে শূন্যে—কন্যা পৃথিবীর কোলে—আলোর নির্ঝরে।' মাঝে প্রীত, খানিকটা উদ্‌গত ও সমাহিতভাবে সে অন্তরে নীলনদের শীতের রৌদ্রের নীলিমা অনুভব করে। জয়তীর প্রতি ক্ষেমেশের কথার মধ্য দিয়ে জীবনানন্দ নিজেই যেন বলেন, 'মানুষ সভ্যতা গড়ছে ভাঙছে, ক্রমেই বেশি ভাঙার দিকে তার রোখ, অশান্তির দিকেই ঝুঁকে পড়েছে বেশি। তবু উৎরে যাবে...জীবনেই; ভালো সত্য শান্ত স্নিগ্ধ জীবনে।' সেই ভাঙার দিকে রোখকেই, অশান্তির কথাই জীবনানন্দ উপন্যাসে বিধৃত করেছেন। দূর পরিপ্রেক্ষিতে তাকিয়ে যে আলো স্নিগ্ধতার কথা তিনি বলেছেন, তা কি বিশ্বাস্য, সেই অস্বস্তিকর প্রশ্ন থেকেই যায়। তিনি ইনফের্ণোকে যেমন বিশ্বাস্য করেছেন, অকালে আকস্মিক মৃত্যু না হলে, তেমনি হয়তো পারাদিজোকেও বিশ্বাস্য করে তুলতে পারতেন। কিন্তু এজরা পাউণ্ড খাঁটি কথা বলেছিলেন, "It is difficult to write a paradise when all the superficial indications are that you ought to write an apocalypse. It is obviously much easier to find inhabitants for an inferno, or even a purgatorio."[২০]

জীবনানন্দের কথাসাহিত্য সেই শেয়াল-শকুনে ভরা নরকের বিবরণ। কিন্তু সে কথা থাক। দূরের দিকে তাকিয়ে যেমন ভেবেছিলেন 'উৎরে যাবে', তেমনি সঙ্গে-সঙ্গে জীবনানন্দ বলেছেন 'আমরা থাকতে ও-সব হবে না কিছু'। যা হয়েছে তারই রূপায়ণ, হয়তো অভিপ্রেতভাবেই আপাত-শিথিল, সৃষ্টিপ্রেরণায় অকৃত্রিম এই দুই অন্ধকার উপন্যাসে। যে দুটি, কবিতার ভাষ্য হিসেবে শুধু নয়, নিজেদের মর্যাদাতেই পরম মূল্যবান।

জীবনানন্দ দাশের গল্প

বিজয়কুমার দত্ত

জীবনের শেষ পর্বে রবীন্দ্রনাথ 'বড়ো গল্প' এবং 'ছোট গল্প' সম্পর্কে কিছু বক্তব্য* রেখেছিলেন। জীবনানন্দের জীবিতকালে অপ্রকাশিত এবং তাঁর মৃত্যুর পরবর্তীকালে প্রকাশিত গল্প সম্পর্কে আলোচনায় সেই বক্তব্য আমাদের স্মরণযোগ্য বলে আমাদের বিনীত ধারণা।

রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "সাহিত্যে বড়োগল্প বলে যে সব প্রগলভ বাণীবাহন দেখা যায় তারা প্রাকভৃত্তিক যুগের প্রাণীদের মতো—তাদের প্রাণের পরিমাণ যত, দেহের পরিমাণ তার চারগুণ, তাদের লেজটা কলেবরের অত্যুক্তি।"

বড়ো গল্প সম্পর্কে বিরূপ রবীন্দ্রনাথ, তার পরেই বলেছেন, "অতি পরিমাণ ঘাস পাতা খেয়ে যাদের পেট মোটা তারা ভারবাহী জীব, স্তূপাকার মালের বস্তা টানা তাদের অদৃষ্টে। বড়ো গল্প সেই জাতের, মাল বোঝাইওলা।" এই প্রসঙ্গে তিনি ছোটো গল্পের চরিত্র এবং বড়ো গল্পের সঙ্গে তার মেরুপ্রতিম পার্থক্য বর্ণনা করেছেন ঃ "মানুষের জীবনটা বিপুল একটা বনস্পতির মতো। তার আয়তন তার আকৃতি সুঠাম নয়। দিনে দিনে চলছে তার মধ্যে এলোমেলো ডালাপালার পুনরাবৃত্তি। এই স্তূপাকার একঘেয়েমির মধ্যে হঠাৎ একটা ফল ফলে ওঠে, সে নিটোল, সে সুডোল, বাইরে তার রঙ রাঙা কিংবা কালো, ভিতরে তার রস তীব্র কিংবা মধুর। সে সংক্ষিপ্ত, সে অনিবার্য, সে দৈবলব্ধ, সে ছোটো গল্প"।

সন্দেহ নেই, শেষ জীবনে ছোটগল্প সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের ধ্যান-ধারণার মধ্যে বিবর্তন ঘটেছিল। "জগতের শত শত অসমাপ্ত কথা", কিংবা অকালের বিচ্ছিন্ন মুকুল" জাতীয় বর্ণনার ছন্দুটাহীন কাহিনী থেকে, সংক্ষিপ্ত—অনিবার্য—দৈবলব্ধ প্রভৃতি ধারালো বিশেষণে ছোটগল্পের চরিত্রের এই উপলব্ধি তাঁর শেষ জীবনে অবশ্যই বিপ্লবাত্মক। এ যুগের সাহিত্য-সমালোচক, ভাষাতাত্ত্বিক, গবেষক ইত্যাদি সাহিত্য-বোদ্ধাদের, এ সম্পর্কে কী মতামত হতে পারে, সেই বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে আমি নিস্পৃহ। জীবনানন্দের অপ্রকাশিত বড়ো গল্প-এর প্রেক্ষিত হিসেবে আমরা রবীন্দ্রনাথের মতামতকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করব—কেননা রবীন্দ্রনাথের ধারণা এবং জীবনানন্দের অপ্রকাশিত গল্পগুলির রচনা (অন্ততঃ কয়েকটি গল্প তো বটেই) দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পূর্ববর্তী। এবং একথা আরো মনে রাখা বিধেয় যে, গল্প সম্পর্কে লেখক—সমালোচক—ভাষাতাত্ত্বিকদের যে বিপ্লবাত্মক মতামত গড়ে উঠেছে তা মূলত দ্বিতীয় মহাযুদ্ধোত্তর তথা এ শতকের অতিক্রান্ত দ্বিতীয়ার্ধের বেশ কিছু পরে।

---

* রবীন্দ্র রচনাবলী : পশ্চিমবঙ্গ সরকার, পরিশিষ্ট : তিনসঙ্গী : পৃষ্ঠা ৭৯১ রচনাকাল ৪/১০/৩৯

প্রতিভাবান কবির হাতে গল্পের কাঠামো, বিষয়-নির্বাচন এবং গল্প বলার পদ্ধতি যে স্বতন্ত্র ও প্রথাবিরোধী হয়ে উঠতে পারে, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু এই স্বাতন্ত্র অর্জনে জীবনানন্দ বাংলা গল্পে যে কোনো নতুন মাত্রা এনেছেন, সে কথা বলা চলে না। যদি একথা মনে করা যায় যে তাঁর গল্পের রচনাকাল দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ-পূর্ববর্তী, অথবা সমসাময়িক—তাহলে বলা যেতে পারে, তাঁর গল্পের রচনাকাল, তাঁর দ্বিতীয় কাব্যগ্রন্থ 'ধূসর পাণ্ডুলিপি' প্রকাশের (১৯৩৬) সময়। এবং সেই গ্রন্থের কবিতাগুলিতে রোমান্টিক চেতনার বিরোধী মনোভাব এত স্পষ্ট উচ্চারণে উচ্চারিত যে,—যে কোনো সচেতন মানুষ তার স্বরূপ উন্মোচনে দ্বিধাগ্রস্থ হবেন না। তবু সেই গ্রন্থে অন্তর্ভুক্ত কবিতাগুলির ভাষা ও শব্দব্যবহার অবশ্যই শ্রুতিসুভগ ও চেতনায় অনুরণন তোলে। কিন্তু তাঁর গল্পগুলির ভাষায়, চরিত্র চিত্রণে, দৃষ্টিভঙ্গীতে তার রেশ পাওয়া দুরূহ। সমসাময়িক কবিতাবলী ও গল্পগুলি মিলিয়ে পড়লে—সে দুটি যে একই লেখকের রচনা—তা বিশ্বাস করা কঠিন হবে। গল্পগুলির মধ্যে পরিবেশ রচনায় কোথাও কোথাও কবিত্বের ছোঁয়াচ আছে, বিশেষ করে প্রকৃতির খুঁটিনাটি বিবরণের চিত্র—মনোযোগী পাঠককে বিভূতিভূষণের কথা মনে পড়াবে।

'প্রতিক্ষণ' পত্রিকার বিভিন্ন বছরের শারদ সংখ্যায় প্রকাশিত মোট ছয়টি গল্প এই আলোচনার বিষয়। তার মধ্যে তিনটি গল্প—"নষ্টপ্রেমের কথা" (শারদ ১৪০১), "মেয়েমানুষের রক্তমাংস" ও "একঘেয়ে জীবন" (শারদ ১৪০১), অপ্রকাশিত বড় গল্প বলে ঘোষণা করা হয়েছে। এ গল্পগুলির উৎস, ও সম্ভাব্য রচনাকাল সম্পর্কে কোনো উল্লেখ করা হয়নি। বাকি তিনটি গল্প 'বাসর ও বিচ্ছেদ' এই শিরোনামে শারদ ১৩৯৫তে প্রকাশিত। এই তিনটি গল্প ১, ২ ও ৩ এই অংশে বিভক্ত। এ গল্পগুলির রচনাকাল অবশ্য নির্দেশ করা হয়েছে এই মন্তব্যে ঃ "১৯৩২-এর এপ্রিল থেকে 'বাসর ও বিচ্ছেদ' নিয়ে পরপর কয়েকটি গল্প লিখেছিলেন জীবনানন্দ। আমরা সেই গল্প থেকে তিনটি গল্প এখানে সাজিয়ে দিলাম।" এই গল্পগুলিতে ছোটগল্পের একটি সাধারণ লক্ষণ দেখা যায়, কারণ একটি নির্দিষ্ট বিষয় অর্থাৎ বিবাহিত জীবনের বিড়ম্বনা তার মূল বক্তব্য—যদিও একথা স্বীকার করা ভালো, জীবনানন্দের সব গল্পেই দাম্পত্য জীবনের নিষ্ফল ব্যর্থতা কোথাও উগ্রভাবে, আবার কোথাও উদাসীন ও নির্মমভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। এবং প্রায় প্রতিটি গল্পেই নারী চরিত্রটি জেদী-অহঙ্কারী-অনমনীয় এবং সামাজিক সম্পর্কে বিচিত্রভাবে উদাসীন ও আত্মকেন্দ্রিক। এ যুগের নারীবাদীদের দ্বারা ঘোষিত নিষ্ঠুর-অত্যাচারী-শোষক পুরুষ চরিত্র জীবনানন্দের এই সব গল্পে খুঁজে পাওয়া যায়নি।

এহো বাহ্য। 'বাসর ও বিচ্ছেদ' শীর্ষক গল্প তিনটির বৈশিষ্ট্য হল,—'বাসর ও বিচ্ছেদ প্রায় হাত ধরাধরি করে এসেছে। তার মধ্যে তৃতীয় গল্পটিতে দৈর্ঘ্যে ও বর্ণনার জটিলতায় বড়ো গল্পের আভাস পাওয়া যায়। আমাদের বিনীত ধারণায় জীবনানন্দের প্রায় সব গল্পগুলি রবীন্দ্রনাথ নির্দেশিত বড়ো গল্প বা ছোটো গল্পের কোনোটিরই বিধান বা সংজ্ঞা মেনে চলেনি; বরং তৃতীয় কোনো শ্রেণীবিভাগের বৈশিষ্ট্য নিয়ে বাংলা সাহিত্যে প্রবেশ করেছে। আমাদের উদ্দিষ্ট তারই একটা সংক্ষিপ্ত রূপ মেলে ধরা।

প্রথম গল্পটিতে দেখা যায় যে বৌভাতের দিন, নতুন বৌ অমলার সাজ-সজ্জা নিয়ে চূড়ান্ত অসন্তোষ—কোনো শাড়িই তার পছন্দ নয়; এবং শাশুড়ি ও ননদদের ভাবনা-চিন্তা সম্পর্কে তার অবজ্ঞার দুর্বিনীত প্রকাশ। প্রথা-অনুযায়ী নিমন্ত্রিত অতিথিদের পরিবেষণ করার কথা তাকে জানালে সে বলে, ওসব সে জন্মেও করেনি, করবেও না। স্বামী প্রসাদ,

তার কাকা-কাকিমা সবার অনুরোধ সে আগ্রহ্য করে—যে ধরনের ঘটনা মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রায় দুর্লভ—একথা বলা যায়। তার আচরণ যে অস্বাভাবিক ও ব্যতিক্রমী ব্যবহারের দৃষ্টান্ত, তা নিরুপায় প্রসাদের ভাবনায় স্পষ্ট : "যে নমনীয়তা নিয়ে তার মাকে বরাবর সে চলতে দেখেছে, তার বোনেদের যে নম্র-মাধুর্যতার এত ভাল লাগল—মেয়েমানুষের জীবনের ভিতর সবচেয়ে বেশি করে যে জিনিশটা খুঁজেছে সে, আর তাকে তা পেতে হবে না"। গল্পের এই প্রারম্ভিক দৃশ্যপট অনুযায়ী তথাকথিত ফুলশয্যার রাত যে নিষ্ফল ও নিরর্থক হয়ে উঠল, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অন্ধকারে অমলার ঘুমনোর অভ্যেস নেই; তাই সেই গভীর রাতে ইলেকট্রিক আলো জ্বালতে হল হতভম্ব প্রসাদকে।

নতুন বর-বধূর প্রেমালাপের বদলে, অমলার তাচ্ছিল্যসহকারে শ্বশুরবাড়ির প্রতিটি কাজের বিরূপ সমালোচনা শুনতে হল প্রসাদকে। অমলার ব্যবহারে যেহেতু পরে তার কাছে কেউ আসেনি তাদের মনের মতো শাড়ি পরেনি বলে, সুতরাং সে বলে ওঠে—"একা মেয়েমানুষ পেয়েছে কি না! কিন্তু আমার সাথে লাগতে আসা? কাকে সে বুঝিয়েছে? "তোমার মাকে, বোনগুলোকে, খুড়োকে, খুড়িমাকে...." অর্থাৎ বাড়ির সবাইকেই। শ্বশুরবাড়ির সবাইকেই তার অপছন্দ। তাই ফুলশয্যার রাতেই সে প্রসাদকে বলে, "একটা আলাদা বাড়িভাড়া করতে পার তুমি? সেখানে তুমি? তুমি ছাড়া আর কেউ থাকবে না—তোমার মা খুড়িমা কেউ না, বুঝলে?" নিরিবিলিতে ঘুমোতে চেয়ে অমলা বলল 'ছাদে শোও গে যাও।" সে রাতে প্রসাদ ছাদে চলে গেল। বাসর ঘরের মাধুর্য ছিল কি না—এ গল্পে তার ইঙ্গিত নেই। কিন্তু ফুলশয্যার রাতেই বিচ্ছেদ হল অনিবার্য। সুতরাং এ গল্পে বিচ্ছেদের তীব্রতা বড় উগ্রভাবে উন্মোচিত করা হয়েছে।

দ্বিতীয় গল্পটিতে বধূ নীহারের উদাসীন নীরবতার একটা নেপথ্য ইতিহাস আছে—এবং সে ইতিহাস আর কিছুই নয়, প্রাক-বিবাহপর্বের প্রণয়-অধ্যায়, যা নিতান্ত স্বাভাবিক কি সে যুগে, কি এযুগে। কিন্তু এ গল্পটিতে জীবনানন্দ তাঁর বর্ণিত কাহিনীর এক মনোজ্ঞ পটভূমি রচনা করেছেন প্রকৃতির আলোছায়াময় জগতের সৌন্দর্য কর্ণনায় : "অনেক রাতে একটু ম্লান জ্যোৎস্না উঠেছে।....কিন্তু এই মধুর বিমর্ষতাকে ভালো লাগছে দেবব্রতর। হয়তো কৃষ্ণাদশমীর চাঁদ; নদীর পাড়ের আমবনের অন্ধকার একটুও ঘুচল না। ...কবিমন দেবব্রতর। কিন্তু তার নবপরিণীতা বধূ বাসরঘরেই তার প্রতি বিমুখ, নীরব, উদাসীন।"

বাসররাতেই দেবব্রতর কানে আসে, বাইরে জ্যোৎস্না-প্লুত নদীর কিনারে বেজে ওঠা বাঁশির শব্দ দেবব্রতর ভাবনায়—"এই মেয়েটির জীবনের মনে হয়তো কোনো গাঁয়ের ছোকরার প্রণয় জড়িয়ে রয়েছে। সেও হয়তো বাঁশের ঝাড়ের ওপারে নদীর কিনারে থেকে বাজাচ্ছে। এসব জিনিস বাস্তবিকই সত্য? এমন অসত্য মনে হয়—এমন নরম জ্যোৎস্না, সেই বাঁশি, এই কিশোরীর এই ছেলেটি।... নীহারের কান্নার খানিকটা মানে বোঝা যায়।" তাই বাসর রাতটা তার বিশ্রীভাবেই কাটে।

শেষ পর্যন্ত দেবব্রতর বাড়িতে, ওই নেপথ্য গ্রাম্য-প্রণয়পর্বের ইতিহাস একটু একটু করে উন্মোচিত হয়—ক্রমিক ও পারস্পরিক শব্দবিনিময়ের পর, যেহেতু "এখন তো আমি পরের স্ত্রী"—সুতরাং সে সব পর্ব এখন অতীত। কিন্তু তবুও তার এই স্বীকারোক্তি বিশেষ তাৎপর্যময় ; কারণ সে দেবব্রতকে বলছে না, "এখন আমি তোমার স্ত্রী"। কেননা

ফুলশয্যার রাতেও সে দেবব্রতর কাছে সবকিছু স্বীকারের নীতি মেনে বলে, "তোমাকে সত্য কথাই বলছি। বিয়ের রাত অবদি এই ছটা বছর আমি চারুকে ভাইয়ের মতো ভালোবেসেছি।.... যখনই চারু আমাকে আদর করে জড়িয়ে ধরে চুমো খেতে যেত তখনই আমি তাকে বলেছি ঃ আমি না তোমার ছোট বোন?" যদিও চারু তাকে চুমো খায়নি (?), তবু সেই অস্পর্শ চুম্বনের রেশ নীহারের মন থেকে মিলিয়ে যায়নি। কিন্তু ঘটনা হল চারুকে বিয়ে করা ছিল অসম্ভব কাণ্ড ; নীহারের কথায়, "এ রাম! চারুদের সেই খোড়ো ঘর আর একটা ধিঙ্গি ধ্যাড় ধেড়ে মাগী দিনরাত হাঁড়ি ঠেলে—সে হত আমার শাশুড়ি।" এই পরিবেশ তার কল্পনাতেও অসহ্য, এবং তার কাঁচা শরীরের সৌন্দর্য সম্বন্ধে সে এতই সচেতন যে তার পক্ষে রান্না করা অসম্ভব ঃ "সুন্দর ভোগা-ভোগা শরীরও চাই—আবার রান্নাবাড়ি চাই—তা কি কখনো হয়?"

সুতরাং এই না-হওয়া পরিবেশই ভবিতব্য হয়ে ওঠে দেবব্রতর দাম্পত্য-জীবনে।

'বাসর ও বিচ্ছেদ' শীর্ষক গল্পগুলির মধ্যে তৃতীয় গল্পটিতে অবশ্য বাসরেই বিচ্ছেদপর্ব ধ্বনিত হয়নি, কিন্তু গল্পের শুরুতেই তার স্পষ্ট পরিচয় দেওয়া হয়েছে—"তিন বছর ধরে বিয়ে হয়েছে—কিন্তু এর মধ্যেই যেন সব শেষ হয়ে গেছে।" এই শেষ হয়ে যাওয়া দাম্পত্যজীবনের মনস্তাত্ত্বিক টানাপোড়েন-ই এই গল্পের বিষয়বস্তু। সতের বছরের হেমলতা, তিরিশ বছরের সুবোধকে, সামান্য শখের প্রসঙ্গে বলে "আমাদের কি আর সে বয়স আছে!" সতের বছর বয়সেই যার শখের আয়ু ফুরিয়ে যায়, তার কাছে যৌবনের সাধ-উল্লাস না থাকারই কথা। বিশ শতকের অন্তিমে, এই ভোগবাদী যুগের তরুণ-তরুণীরা অবশ্যই এই মেয়েটিকে গ্রহান্তরের জীব অথবা প্রাচীন পৃথিবীর হোমো স্যাপিয়েনস বলে মনে করবে। সুতরাং হেমলতার সংস্পর্শে সুবোধের "স্থবিরতা আরো প্রতিষ্ঠিত" হয়ে ওঠে। এবং সঙ্গত কারণেই, বাস্তবজীবনের অসহায়তা থেকে মুক্তি পাবার জন্য সুবোধ অতীতের স্মৃতি থেকে তার প্রাক্তন প্রেমিকা সরোজিনীর কথা ভাবে, এবং গৃহকর্মে আটকে থাকা হেমলতার ব্যস্ততার সময়,—নিভৃত অবকাশে, সে ছোট ক্যাশ বাক্সে রাখা সরোজিনীর চিঠি পড়ে। "কিন্তু সরোজিনী এখন অবিনাশের স্ত্রী। চার-পাঁচটি ছেলেমেয়ের মা, এই কথা ভাবতে গিয়েই সুবোধ কেমন একটা মৃদু মোচড় খেয়ে থমকে গেল। চিঠিগুলোর ভেতর থেকে একটা নারীর নরম স্পৃহা বড় কোমল অনুভব দিয়ে যে একটু মধুর জন্য সে জগৎকে গড়ে তুলেছিল, তা কোথাও নেই আর।" অতএব সে সব এখন তার জীবনে মিথ্যা হয়ে গেছে। সরোজিনীব জন্য সুবোধের কোনো আবেগ নেই আজ। কিন্তু তার জীবনে যে সত্য অস্ফুট কুঁড়ির আকারে গোপন হৃদয়ে জ্বলে ওঠে মাঝে মাঝে—তা হল শান্ত শীতলভাবে তার জন্য ভাবনা—"এই সরোজিনী বেঁচে ওকে এই পৃথিবীকে কি আরো বেশি সবুজ করেছে, আকাশকে আরো নীল?" ক্লান্ত ও ব্যর্থ প্রেমিক সুবোধের ধারণায়, "তা করেনি"। ফলে প্রেমসম্পর্কে তার বীতস্পৃহ মনোভাব এক অদ্ভুত কঠিনতার রূপ নেয়। মাসিক পত্রিকায় প্রেমের গল্প সে পড়তে পারে না। সুবোধের প্রেমঐশ্বর্যহীন জীবন নিষ্ফল হয়ে আসে। পাশের বাড়ির কেরাণী বুড়ো শঙ্কর তার তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে নিয়ে কেমন সুখে-স্বচ্ছন্দে থাকে"—অতএব সুবোধের ধারণায় (লেখকের ধারণায়?) "এই শঙ্কর তার চেয়ে ঢের বেশি জীবনকে উপলব্ধি করতে পেরেছে।"

সুবোধের ধারণায় তার স্ত্রী নিতান্তই শীতল, উত্তাপহীন এক জীব—যার "মুখের সমস্ত পরিধির ভিতর কোথাও একটু প্রসন্নতা বা কৃতজ্ঞতা নেই; কৌতূহল নেই সাধ নেই; আরো কী নেই যেন!" তাই বিবাহ তাকে নিষ্ফলতা দিয়েছে শুধু। সুতরাং তার কল্পনাপ্রবণ

মন "নতুন কোন্ এক বাসর ঘরে" ঢুকতে চায়, সমস্ত পুরনোকে তার ভুলে যেতে ইচ্ছে করে।

এই গল্পটিতে রবীন্দ্রনাথ কথিত বড়ো গল্পের ভার আছে—তার "প্রাণের পরিমাণ যত দেহের পরিমাণ তার চার গুণ"। দৈর্ঘ্যে ও পটভূমির ব্যাপকতায় অবশ্যই এটি বড়ো গল্পের চরিত্রকে প্রতিফলিত করেছে। গল্পের মধ্যে এসেছে একাধিক 'এপিসোড', বিশেষ করে সুবোধের কোন অনুপমার প্রণয়কাহিনীর বর্ণনা দেওয়া হয়েছে একটি চিঠির মাধ্যমে; সে চিঠিটি অনুপমা লিখেছে হেমলতাকে,—সুবোধকে নয়। স্ত্রী ও বোন—কেউই তার কাছের মানুষ নয়। সুবোধের দুঃসহ একাকিত্বকে আরো নির্মম করে তোলার জন্য এই এপিসোডের কার্যকারণ স্বীকার করলেও, গল্পের আর্টের ক্ষেত্রে এই ঘটনার বিস্তৃতিকে তথা অনাবশ্যক অভিক্ষেপকে, অনিবার্য বলে, পাঠক হিসেবে আমাদের মনে হয়নি।

* * * *

আমরা আগেই জানিয়েছি যে এই আলোচনায় জীবনানন্দের ছয়টি বড় গল্পের কথা। প্রতিটি গল্প সম্পর্কে ব্যাপক আলোচনা এই প্রবন্ধে সম্ভবপর নয়। তাই তিনটি বড়ো গল্প সম্পর্কে আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখতে ইচ্ছুক।

এই তিনটি গল্প হল "নষ্ট প্রেমের কথা", "মেয়েমানুষের রক্তমাংস" এবং "একঘেয়ে জীবন।"

"নষ্ট প্রেমের কথা" গল্পটির শিরোনাম—এক হিসেবে "নষ্ট জীবনের কথা"-ও হতে পারত। নায়কের নাম মোহিত; কিন্তু কারোকে মোহিত করার গুণ সে অর্জন করেনি; তার প্রথম প্রেমের ব্যর্থতার উল্লেখ আছে, কিন্তু তার কার্যকারণ লেখক বর্ণনা করেন নি। সম্ভবত সেই নিষ্ফল ভালোবাসার জ্বালা মোহিতের জীবনের একটা চালচিত্র মাত্র; কিন্তু সে চালচিত্রও জীর্ণ-বিধ্বস্ত-ভগ্নপ্রায়। লেখকের ভাষায়—"অনেক যুবকেরও যেমন মনে হয়, অনেক দিন থেকে মনের মধ্যে একটা নিষ্ফল ভালোবাসার ঘা পুষে মোহিতের জীবনের প্রতি অরুচি ধরে গিয়েছিল"। কিন্তু ধীরে ধীরে সে অবস্থা বিপর্যয়কে মেনে নিয়েছে—কারণ প্রেম তাকে ব্যথা দিয়ে ঢের শিখিয়েছে। এই শিক্ষায় সে বুঝেছে "এ পৃথিবী কেমন বৈদগ্ধ্যবতী, এই পৃথিবীতেই থাকতে হয়, এইখানে ওঁকে ভালোবেসে নিষ্ফল হয়ে নষ্ট প্রেমের কথা এমন একটা অপরিসীম চেতনার রস বুকের ভেতর জেগে ওঠে..."। এই চেতনার রস ও রূঢ়-রুক্ষ বাস্তবের দ্বন্দ্ব-ই এ গল্পটির উপজীব্য।

গঠনভঙ্গিমা, বিষয়-সম্প্রসারণ ও চরিত্রচিত্রণের যে আঙ্গিক এই গল্পটির প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত প্রসারিত, তার মধ্যে এমন কঠিন নির্লিপ্ততা আছে যে নিছক গল্পপিপাসু পাঠকদের তা আকর্ষণ করবে না। নাটকীয় ঘটনাবর্ত জীবনানন্দের গল্পে সুলভ নয়—একথা বলা-ই বাহুল্য। কিন্তু লেখকের গল্প কথনের ভঙ্গিতে আত্মপ্রত্যয়ের চিহ্ন বেশ স্পষ্ট—মধ্যবিত্ত জীবনের টুকরো টুকরো অধ্যায়ে তার পরিচয় মেলে রাখা আছে।

এই গল্পটিতে, তাঁর অন্যান্য গল্পের মতো, 'সিনিসিজম'-এর পরিচয় খুব স্পষ্ট। ১৯৫৪ সালে জীবনানন্দ মারা গেছেন—'সে সময় বিভক্ত বাংলা তথা সমগ্র ভারতে পরিবার-পরিকল্পনা সম্পর্কে খুব একটা আলোড়ন হয়নি, অন্ততঃ বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবেশে কোনো পরিবারে অধিক সন্তানের জন্ম সম্পর্কে কোনো অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্যের প্রকাশ উগ্রভাবে স্পষ্ট ছিল না বলেই আমাদের ধারণা। কিন্তু জীবনানন্দের ব্যর্থ-প্রেম নায়কের বিবাহ-পরবর্তী অভিজ্ঞতার মধ্যে যে অসহায় দুর্বলতা স্পষ্ট, এবং বিশেষ করে তাঁর সদ্যবিবাহিতা পত্নীর স্বামীগৃহে প্রবেশের প্রতিমুহূর্ত থেকে সব কিছুকেই অবজ্ঞার প্রকাশে

অগ্রাহ্য করার যে মনোভাব—তাতে লেখকের সিনিক দৃষ্টিভঙ্গি একটু বেশি মাত্রায় বর্ণিত। অথচ সেই সুরূপা নামক নববধূটি লেখকের ভাষায়—"সাধারণ গৃহস্থ ঘরের থেকে সুলক্ষণা লাবণ্যযুক্তা বধূ আনল সে। সকলে তৃপ্তি পেল।"

এই তৃপ্তি যে কত অসার ও হাস্যকরভাবে নিরর্থক—সুরূপা তার কথাবার্তায়, ভাবেভঙ্গিতে, অনমনীয় জেদের মাধ্যমে স্পষ্ট করেছে: "বাবা, জংলি পায়রার বাচ্চা দিয়ে ঘরদোর যেন ভরে ফেলেছে একেবারে,"....মোহিত বলল, "ওর বাড় একটু কম, এখনো কথা বলতে পারে না..."।

"সুরূপা বলল, তোমার জেঠিমার মেয়ে বুঝি?

'হ্যাঁ'

"তোমার জ্যাঠামশাইটির বয়স সত্তরের কম হয়নি, মরতে মরতেও কি শখ দেখ!"

স্পষ্ট-সহজ-স্বচ্ছ উচ্চারণ, এবং এই ভঙ্গিতেই সুরূপার চরিত্রটি এই গল্পের কাঠিন্যকে অনমনীয় গতি দান করেছে। গল্পটি বারবার পড়ার পর যে কোনো মনোযোগী পাঠকের মনে এই জিজ্ঞাসা জাগতে পারে "সাধারণ গৃহস্থ ঘরের সুলক্ষণা" মেয়ের পক্ষে বিয়ের দু-এক দিন পরেই এমন অশালীন ব্যবহার সেদিনের বাঙালি মধ্যবিত্ত পরিবারে সম্ভব ছিল কিনা—এবং থাকলেও তা বিনা প্রতিবাদে সবাই মেনে নেবে, এমন উদার পরিবেশ সেদিন সম্ভব ছিল কিনা। কিন্তু জীবনানন্দের গল্পের কাঠামোতে সেই ছবিই এমন উদাসীন নির্মমতায় আঁকা হয়েছে যে সেদিনের (অর্থাৎ আজ থেকে অর্ধ শতাব্দী আগে) বাঙালী একান্নবর্তী পরিবারের তথাকথিত সুখ ও শান্তির ফানুসটি তিনি ততোধিক নির্মমতায় ফুটো করে দিয়েছেন। এ গল্পের এই বৈশিষ্ট্যই চোখে পড়ার মতো—যদিও গল্পের চিরকালীন আবেদন ও তার পদ্ধতিগত রূপ সম্পর্কে (অর্থাৎ শুরু-মধ্যভাগ-অন্তিম পরিণতির ত্রয়ী শৃঙ্খল) লেখকের কোনো আসক্তি লক্ষ্য করা যায়নি। অন্য ধরনের গল্পের মুখর প্রবক্তারা এই শ্রেণীর গল্পকে শিরোপা দিতে পারেন—কিন্তু দ্বিধাহীনভাবেই বলা যায়, শিল্পকর্ম হিসেবে এ গল্পটি সার্থক হয়েছে, এ কথা বলা যায় না।

'মেয়েমানুষের রক্তমাংস' গল্পটি দাম্পত্যজীবনের কাহিনী। লেখকের অন্যান্য গল্পের মতো এই গল্পটিতে কোনো চমক বা 'সাসপেন্‌স' কিংবা চরিত্র-চিত্রণের কোনো মহিমা নেই। অজিত ও লীলার নিরুপায় ও নিষ্ফল জীবনযাত্রার একটি অকরুণ এবং বলতে বাধা কি—ক্লান্তিকর দিনযাপনের বর্ণনা। রবীন্দ্রনাথের কবিতার ভাষায়—"শুধু দিন যাপনের গ্লানি শরমের ডালি/নিশি নিশি রুদ্ধ ঘরে ক্ষুদ্রশিখা স্তিমিত দীপের/ধূমাঙ্কিত কালি/লাভ ক্ষতি টানাটানি/ অতি ক্ষুদ্র ভগ্ন অংশ ভাগ/কলহ সংশয়—সহেনা সহেনা আর জীবনেরে খণ্ড খণ্ড করি/দণ্ডে দণ্ডে ক্ষয়।"

গল্পটিতে নরনারীর বিবাহ-পূর্ব রোমান্স-এর ধারণা ও বিবাহ-পরবর্তী রূঢ় বাস্তবতার দ্বন্দ্ব যেমন ফুটিয়ে তোলা হয়েছে, তেমনি স্ত্রী লীলার নষ্টালজিক ভাবনা ও স্বামী অজিত-এর সে সম্পর্কে উদাসীন অনাসক্তির মুখোমুখি হয়ে পাঠক দাম্পত্যপ্রেমের একটা কানাগলির ছবি দেখতে পাবেন। গল্পটি থেকে কয়েকটি উদ্ধৃতি দিলে বিষয়টি স্পষ্ট হবে। তাতে বিবাহ সম্পর্কে অজিতের ক্লান্তি ও লীলার বজরায় চেপে নদীতে জ্যোৎস্না রাতে ভ্রমণের প্রবল আকাঙ্ক্ষার একটা ধারণা মেলে।

লীলার কথা: (১) 'যাব তো তুমি আর আমি, এমন বড় নদী কিছু নয়...এমন ঝড়-বৃষ্টির রাত কিছু নয়...কিন্তু তবুও বজরায় না গেলে মন ওঠেনা, রাজরাণীরা সেকালে যেমন যেতেন স্বামীদের নিয়ে...আজও তো নৌকাবিলাস করে, করে না?"

(২) সংসারে তোমার বই ছাড়া আর কিছু নেই নাকি?

অজিতের ভাবনা ঃ (১) "বাস্তবিক কি গভীর অবসাদ এই মেয়েটির জীবনে। অজিত বইয়ের পাতায় চোখ রেখে ভাবছিল, এই মেয়েটির প্রাণ একটা একাকী কুকুরের মতো যেন শুকনো পাতার পেছনে ছোটে, প্রজাপতি দেখে ঘেউ ঘেউ করে, আকাশের নিস্তব্ধ চাঁদের দিকে তাকিয়ে বিড়ম্বিত হয়ে ফেরে।"

(২) "অজিতকে বিয়ে করেছে বলেই লীলা যেন বিশ্বগ্রাসী হয়ে উঠেছে, অত্যন্ত অন্যায়ভাবে আটকে রেখেছে অজিতকে। বিবাহের এই যুক্তিহীন অত্যাচারকে সহ্য করবে কেন সে? মনে মনে বিবাহকে তো সে মানেই না, স্ত্রীকে স্ত্রী বলে স্বীকার করেনা, তবু মাসের পর মাস একি অসহ্য ভার বহন করতে হচ্ছে তাকে..."

লীলার ধারণায় অজিত হৃদয়হীন। সে বুঝতে পারে যে, স্বামীর জগৎ থেকে সে অনেক দূরে—বিচ্ছিন্ন, প্রায় নির্বাসিত। এই পারস্পরিক প্রেমহীনতার প্রেক্ষিতে, অজিতের প্রণয়িনী স্ত্রী যে অপ্রেমের মানে বোঝে না—এবং তাইতেই অজিতের জীবনে গভীর সার্থকতা এবং অপরিসীম তৃপ্তি—গল্পের নায়কের এই সান্ত্বনাসুলভ মনোভাবে একধরনের নিশ্চেষ্টতা ও উপায়হীন দৃষ্টিভঙ্গি আছে; এবং এই দৃষ্টিভঙ্গি জীবনযাপনে যেমন নিরর্থক ও অবাস্তব মনোবিলাস, শিল্পের প্রেক্ষিতেও তা উত্তরণের ক্ষেত্রে পথভ্রষ্ট হয়েছে।

'একঘেয়ে জীবন' শীর্ষক গল্পটির প্রধান বিষয়টি দুটি চরিত্রের কথোপকথনে বেরিয়ে এসেছে। প্রথমজন ভাদুড়ি সফল ব্যবসায়ী; খুব সাধারণ অবস্থা থেকে লক্ষপতি ও দ্বিতীয়জন সমরেশ পৈতৃক সূত্রে অগাধ সম্পত্তির মালিক, কিন্তু একটার পর একটা ব্যবসায়ে ব্যর্থ, বিধ্বস্ত। এক জায়গায় অবশ্য তাদের মধ্যে মিল আছে ঃ ব্যবসা সম্পর্কে দুজনেই বীতস্পৃহ: ভাদুড়ি তার প্রায় সব কোলিয়ারী বেচে দিয়ে ব্যবসা গুটিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর, এবং সমরেশ ব্যবসা না করে, অন্য কিছু করার জন্য ভাবনা চিন্তা করতে চায়।

ভাদুড়ি চরিত্রের বক্তব্য হল, ব্যবসার নেশা কিছু মানুষের কাছে, এমন "পেয়ে বসে টাকার থেকে ব্যবসাকে পৃথক করে ফেলে, ব্যবসা যেন ভগবানের মতো একটা কিছু। ওতে হেরে যেতে হয়, এমন করে অনেক কারবার নিলেমে চড়ল।" ব্যবসা ছাড়া ভাদুড়ির জীবনদর্শন স্পষ্ট ঃ "জীবনেই কোনো মেয়ের সঙ্গে একদিনের জন্যও একটু বে-আব্রু ব্যবহার করে নি সে। সর্ববাদীসম্মত সমস্ত জীবন ধরে নীতির পথে চলেছে সে।" আবার সমরেশ-এর কথায় ঃ "একে একে আট-নটা ব্যবসা করে দেখলাম, সব গেল ফেল মেরে।" ভাদুড়ি যখন তাকে ব্যবসা ছেড়ে দিতে বলে এবং মন্তব্য করে "ওদিকে তোমার রুচি নেই, হাতযশ নেই"—তখন আহত অভিমানে সমরেশ ভাবে, "...এই ভাদুড়ি একদিন কলকাতার পথে পথে খুচরো চা বিক্রি করত শুধু, পুঁইশাকের চচ্চড়ি খাবার পয়সাও জুটত না, এখন সে সাত আট লাখটাকা কামাই করে ফিরছে।"

মেয়েমানুষ সম্পর্কে দুজনেরই তথাকথিত কোনো মোহ নেই—দুজনের জীবনও তাই একঘেয়ে—রূপসী বউ পেয়েও রূপের প্রতি বীতশ্রদ্ধ সমরেশ, এবং স্ত্রী সম্পর্কে ভাদুড়ির ধারণা "ও মানুষটার কোনো মূল্য নেই আমার কাছে"। বিবাহিত জীবনের প্রতি উভয়েই নিরাসক্ত। "মৃত্যু পর্যন্তই এমন একঘেয়ে জীবন আমাদের কাটিয়ে যেতে হবে"। অন্য কোনো মেয়ের প্রতিও প্রকৃতিগত কারণে তারা আসক্ত হতে পারে না। অথচ সমরেশের স্ত্রী প্রমদা বহির্মুখিনী—"প্রমদা তো এই দু ঘণ্টা বাইরে কাটিয়ে এল হয়তো সমস্ত পথ সেও ভেবেছে এই দুঘণ্টার ইতিহাসটা স্বামী যদি জানত?"

জীবনের সঙ্গে কেউই বোঝাপড়া করতে না চাওয়ায় উভয়পক্ষেরই ভদ্রতার মুখোস পরে এই একঘেয়েমি ও দাঁতকপাটি মেরে সহ্য করে যেতে হবে—"এরই ভেতর চরিত্র, নীতি, ন্যায়, ধর্ম সমাজ ভগবান সমস্ত?"

বাস্তব অভিজ্ঞতায় অধিকাংশ মানুষের যাপিত জীবন অবশ্যই একঘেয়ে, বৈচিত্রহীন—কিন্তু সে জীবন শিল্পের প্রতিফলনে একঘেয়ে হবে কেন? এই জীবনকে শিল্পের ক্যানভাসে বিচিত্ররঙীন করে তোলাই তো মহৎ সাহিত্যের অন্যতম সর্ত। জীবনানন্দ গল্পের আঙ্গিকে সেই মহত্ত্বে পৌঁছতে পারেননি, এবং বলা উচিত,—পৌঁছতে চাননি।

এই গল্পটিতেও জীবনানন্দ গল্পের গঠনভঙ্গিমায় আদি-মধ্য-অন্ত—এই প্রথাগত পর্ববিভাগের কোনো পরিচয় রাখেননি। এ সম্পর্কে সমালোচকদের নানা মতবাদ থাকতে পারে; কিন্তু তৎসত্ত্বেও একথা বলা বিধেয় যে, সাধারণ পাঠক এ ধরনের গল্পে কোনো আকর্ষণ অনুভব করবেন না।

* * * *

জীবনানন্দের মোট ছ'টি গল্প পর্যালোচনার পর, মনস্ক পাঠক গল্পগুলির একটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য অবশ্যই লক্ষ্য করবেন, এবং তা হল নরনারীর দাম্পত্য-প্রেম সম্পর্কে তাঁর বিতৃষ্ণা ও বিমুখ দৃষ্টিভঙ্গি। এই বিতৃষ্ণার উৎস তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার অভিক্ষেপের ফল কি না—তা অবশ্য গবেষকদের বিস্তৃত আলোচনার বিষয় হতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রায় প্রতিটি গল্পেই দেখা যায় স্ত্রী-চরিত্রটি জেদী, অনমনীয় ও জীবনচর্যায় কোনোরকম বোঝাপড়া করতে অনিচ্ছুক; এবং এই সামঞ্জস্যহীন মানবীয় সম্পর্কে, পুরুষ চরিত্রগুলি প্রায়ই অসহায় দর্শক কিংবা অবস্থা বিপর্যয়ে নিজেকে মানিয়ে নিতে উৎসুক। জীবন সম্পর্কে তাদের একটা দার্শনিকসুলভ নিস্পৃহতা আছে। প্রাক বিবাহপর্বে তাদের যে ভূমিকাই থাক না কেন, বিবাহ-পরবর্তী জীবনে কেউই দু-দণ্ড শান্তির অন্বেষণে কোনো 'বনলতা সেন'-এর নিবিড় সান্নিধ্যের জন্য উদ্বেল হয়নি। যাপিত জীবন যে বৈচিত্র্যহীন-নীরস-নিরর্থক— প্রত্যেকেই কোনো না কোনো সময়ে তা অনুভব করেছে, কিন্তু নির্দিষ্ট ও সদর্থক পথ খোঁজার জন্য কোনো দ্বন্দ্ব বা সংঘাতে লিপ্ত হয়নি। গল্পপিপাসু যে সব পাঠক গল্পে নাটকীয়তা বা উদগ্রীব অনিশ্চয়তা কিংবা চরিত্রচিত্রণে মানবীয় মহিমার দীপ্তির প্রকাশ আশা করেন—তাঁদের অবশ্য আশাভঙ্গ হবার কারণ আছে। আনুমানিক দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে রচিত, এই গল্পগুলি সে সময় প্রকাশিত হলে তার কী প্রতিক্রিয়া হতে পারত—তা আজ বলা কঠিন, কিন্তু ভাষাতত্ত্বের ক্যানভাস গত পঁচিশ-তিরিশ বছর অনেক ব্যাপক হওয়ার ফলে, এই গল্পগুলি যে সমালোচকদের বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ আলোচনার বিষয় হবে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

কারুবাসনা ও জীবনানন্দর গদ্য

অরূপরতন বসু

'কারুবাসনা আমাকে নষ্ট ক'রে দিয়েছে...কারুকর্মীর এই জন্মগত অভিশাপ আমার সমস্ত সামাজিক সফলতা নষ্ট ক'রে দিয়েছে। আমার সংসারকে ভ'রে দিয়েছে ছাই কালি ধূলির শূন্যতায়। যে উদ্যম ও আকাঙ্ক্ষার নিঃসঙ্কোচ সাংসারিকতা ও স্বাভাবিকতা স্বরাজ পার্টি গঠন করতে পারত, কিংবা কংগ্রেস, অথবা একটা মোটরকার, কিংবা একটা নামজাদা বই, বা চায়ের দোকান, অথবা একজন অক্লান্ত কর্মী চেয়ারম্যানকে তৈরি করতে পারে, অসীম অধ্যবসায়ী উকিলকে, কিংবা সচ্চরিত্র হেডমাস্টারকে, মুচিকে, মিস্ত্রিকে (সেই) আকাঙ্ক্ষা—উদ্যম নেই আমার' (কারুবাসনা)।

এই হচ্ছে বাঙলাসাহিত্যের প্রথম আধুনিক গদ্য, অথবা বলা যায় আধুনিক বাঙলা গদ্যের প্রথম নিদর্শন, যা রবীন্দ্রপরবর্তী বাঙলা গদ্যকে প্রায় দু-ভাগ করে দিয়েছে। ভাবলে অবাক হতে হয় ১৯৩৩ সালে লেখা এই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পড়েছিল প্রায় ১৯৮৬ সাল পর্যন্ত গ্রন্থাকারে ছাপা হয়ে বেরোনোর জন্য। এই ৫৩ বছরে মানুষ প্রায় বুড়ো হয়, অথচ দেখতে পাচ্ছি এই লেখাটি যেন ক্রমশ নবীন, ক্রমশ আরো উজ্জ্বল, গভীর ও অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। সোজা কথায় বলতে গেলে, যেমন কবিতায়, তেমনই গদ্যে, জীবনানন্দই হচ্ছেন, বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার জনক।

উপন্যাসটি শুরু হচ্ছে এইভাবে :

'আষাঢ় শেষ হয়ে গেছে, শ্রাবণ চলছিল। এই বর্ষায় বইয়ের বড় ক্ষতি হয়। কয়েকদিন আগে স্টেশনের বইগুলো দেখেছিলাম—স্টলের সমস্ত বইগুলোই প্রায় পুরোনো। ছেঁড়াখোঁড়া মালিকের সঙ্গবিহীন গ্রন্থিহীন জীবনের জর্জরতার অপরাধ এদের চোখেমুখে। নতুন বইও কয়েকখানা আছে।'

এর পর বই কেনা সম্পর্কে কিছু কথা :

'গতবছর কলকাতায় যখন পঁচিশ টাকা ট্যুইশনি করি, ট্রাম—সিনেমা ও চায়ের পথ এড়িয়ে, খুব একটা সাদাসিধে মেসের জীবন্মৃত অবস্থার ভিতরে থেকে কয়েকখানা বই কিনতে পেরেছিলাম : ইংরেজি কবিতার বই দুটো, একখানা আমেরিকান উপন্যাস গত শতাব্দীর একখানা নভেল এবং আরো-দু-তিনখানা বই। ক্যাটেলগ দেখে কিনিনি; কারো পরামর্শ নিয়েও নয়, ইংরেজি পত্রিকাগুলোর সমালোচনা ও খবরাখবর আমি অনেকদিন ধরে দেখিনি; বই ক'খানা কিনেছিলাম নিজের মনের কর্তৃত্বে আমি।'

এবার বলা হবে বই পাড়ার কথা :

'টিনের সুটকেসে ক'রে বইগুলো দেশে নিয়ে এলাম, খড়ের ঘরের জানলার কাছে বসে পড়লাম, বাইরে বিকেলের আলোয় সন্ধ্যার অন্ধকারে কখনো শরৎ কখনো হেমন্তকে দেখেছি : শালিখ ঘাসে-ঘাসে পোকা খুঁটে খেয়েছে, ফড়িং উড়েছে, পাতা খসেছে,

দাঁড়কাকের দল গভীর কীর্তির অব্যর্থতায় ঘরের দিকে উড়ে গেছে তাদের, সন্ধ্যামণির পাপড়ির মত লাল মেঘে আকাশ গেছে ছেয়ে।' লক্ষ করার বিষয় হচ্ছে বইয়ে কী ছিল সে সম্পর্কে কিছুই বলা নেই। শুধু কীভাবে বই পড়া হয়েছিল তার বর্ণনা আছে।

এরপর আসছে উইপোকার কথা ঃ

'আমাদের এ ঘরে উইয়ের অত্যাচার বড় বেশি। মেঝেটা মাটির—বড্ড স্যাঁতসেঁতে; বর্ষাকালে উইয়ের হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্য নানারকম চেষ্টা চলে বটে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা যায় আমাদের জীবনের নিয়ন্ত্রণ নির্জীব নয়, খুব সতেজ ও পরিহাসপ্রিয়। মিশরে যিনি একদিন পঙ্গপাল ছেড়ে দিয়ে মজা দেখেছিলেন, আমাদের কুঁড়েঘরে তিনি উই ছড়িয়ে দিয়ে তামাশা দেখেন। নানারকম কষ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিসের ছিবড়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে তারপর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি; তার গভীর শক্তিকে নমস্কার জানাই।'

এরপর ফের বইপড়া সম্পর্কে আরো দু-চার কথা বলি। ''কল্যাণীকে বললাম—'আমি চলে গেলে এই বইগুলো মাঝে মাঝে দেখো।' কল্যাণী সেলাই করছিল। কোনো জবাব দিল না। বইগুলো মুছতে মুছতে—'মাঝে মাঝে রোদে দিও এগুলো।'

কল্যাণী কোনো কথা বললে না।

সে আমার উপর বিরক্ত; দেশে এসে বলেছিলাম ছ-সাত দিন থাকব; থাকতে থাকতে তিনমাস হয়ে গেল। প্রায় একমাস থেকে বলছি, চাকরির চেষ্টায় কলকাতায় আজকালই যাব। কিন্তু আজও গড়িমসি করে দেশের বাড়িতেই কাটাচ্ছি। এত অপরাধ ও বেদনার জন্য তার জীবন প্রস্তুত ছিল না।''

এইবার ঘটনা বলতে যদি কিছু থাকে, তাহলে তা শুরু হল। কিন্তু স্বামী-স্ত্রীর এই মর্মান্তিক সম্পর্ক বোঝানোর জন্য কোনো ঘটনার ঘনঘটা, মারপ্যাঁচ, নানান প্লট, চরিত্রচিত্রণ এসব কিছুই নেই। কোনো গল্প নেই। আছে আন্তরিক আত্মকথন আন্তরিক কথোপকথন। প্রশ্ন উঠতে পারে, এই কি আধুনিক উপন্যাস? আধুনিক গদ্য? এর উত্তরে 'হ্যাঁ' বলা ছাড়া কোনো উপায় নেই। আগেই বলেছি রবীন্দ্র পরবর্তী বাঙলা সাহিত্যকে দু-ভাগে ভাগ করা যায় অন্তত জীবনানন্দর কবিতা ও গদ্যচর্চা তাই করেছে। এর একভাগে রয়েছে জীবনানন্দ প্রবর্তিত সাহিত্যরীতির সঙ্গে যার আত্মীয়তা নেই, যার মধ্যে কল্লোল, পরিচয় ও দেশ আনন্দবাজার গোষ্ঠীর বিপুল গদ্য সাহিত্য কর্ম—যাঁদের অনাধুনিক বলা ছাড়া উপায় নেই। অন্যদিকে রয়েছে জীবনানন্দ প্রবর্তিত সাহিত্যরীতির সঙ্গে যাঁদের আত্মীয়তা আছে। বিভূতিভূষণ, সতীনাথ ভাদুড়ি, কমলকুমার মজুমদার, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী, অমিয়ভূষণ। বলা যেতে পারে বাঙলা সাহিত্যে আধুনিক গদ্যকার এঁরাই। তুলনায় ক্ষীণকায় ও স্বল্পপরিচিত হলেও এটিই হচ্ছে আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের অন্তঃশীল প্রবাহ। 'আধুনিক' ও 'অনাধুনিক' এই শব্দ দুটি নিয়ে এবার তর্ক উঠতে পারে। কাজেই প্রথমেই বলে নেয়া ভাল যে অনাধুনিক হলেই তিনি মহৎ গদ্যকার হবেন না এমন কথা নেই, কেননা শরৎচন্দ্র, মাণিকবাবু, তারাশঙ্কর এবং স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ আধুনিক সাহিত্যের স্রষ্টা নন, কিংবা আধুনিক গদ্যরীতির অনুসারী নন, কিন্তু এঁদের সাহিত্যকীর্তির মহত্ত্ব সম্পর্কে কে সন্দেহ করবে? উল্টোদিকে 'আধুনিক' শব্দটি এক্ষেত্রে একটি বিশেষ অর্থ নিয়ে এসেছে, যেখানে সাহিত্যকর্মের মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে চৈতন্যের এমন একটি স্তরকে ছোঁওয়ার আকাঙ্ক্ষা যা সমাজ-সংস্কার, ধর্ম-প্রচার লোকশিক্ষা, ইতিহাস-চেতনা, রাজনৈতিক প্রচার এসব কিছুই নয়, যা সৃষ্টির রহস্য তথা এক কালহীন অনন্ত সত্যের গূঢ় শৃংখলার সঙ্গে

সম্পৃক্ত। এইদিকে থেকে দেখতে গেলে আধুনিক গদ্য সাহিত্য, আধুনিক কবিতার অনেক কাছাকাছি চলে আসে। স্মার্ট, ঝরঝরে, চালাক, রাগী কিংবা আক্রমণাত্মক গদ্য নয়। বরং সম্পূর্ণ উল্টোটাই হচ্ছে এই গদ্যরীতির ভাষা, আর এসবই হচ্ছে সেই মানুষের কথা, যার সামাজিক সফলতা নষ্ট হয়ে গেছে। যার 'সংসার ভরে গেছে ছাই কালি ধূলির শূন্যতায়।'

এইজন্যই আমি গোড়া থেকে দীর্ঘ উদ্ধৃতির সাহায্য নিয়েছি। চোখের সামনে, হাতের কাছে, লেখার মধ্যে যদি তাঁর নিজের লেখার একটি নিদর্শন থাকে, তাহলে পাঠকের বুঝতে সুবিধে হবে প্রচলিত অনাধুনিক গদ্যের তুলনায় কোথায় জীবনানন্দর গদ্য আলাদা, কেননা জীবনানন্দর দৃষ্টান্ত তিনি নিজেই, আর আধুনিক বাঙলা গদ্যের দৃষ্টান্ত তিনিই।

এইবার একটি জিনিস লক্ষ করার মতো যে, তাঁর এই উপন্যাস প্রায় ৫০ বছর বাক্সবন্দী হয়ে পড়েছিল। তাঁর বিচ্ছিন্ন কিছু গদ্যের ইতস্তত নমুনা যে আমরা আগেই হাতে পাইনি তা নয়, কিন্তু তবুও তাঁর গদ্যের ব্যাপ্তি ও গভীরতা সম্পর্কে আমাদের ধারণা অসম্পূর্ণই থাকত যদি না তাঁর উপন্যাসগুলি আমাদের হাতে এসে পৌঁছত। মানতেই হয় যে তাঁর প্রধান উপন্যাসগুলি পড়ার পর স্বভাবতই মনে প্রশ্ন আসে, বাঙলা গদ্য সাহিত্য কি এই ঘটনার পর আমূলই পাল্টে যাওয়ার কথা নয়? জীবনানন্দর পূর্ববর্তী বা এমনকি সমসাময়িক লেখকদের কথা যদি আমরা বাদ দিই, (কেননা ৮০র দশকে তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি বেরিয়েছে) যদি শুধু আমরা তাঁর পরবর্তী লেখক ও পাঠক সম্প্রদায়ের কথা ভাবি যাঁরা তাঁর উপন্যাসের সংস্রবে এসেছেন, তাঁরা কীভাবে আবার পুরোনো পাঠাভ্যাসে ফিরে যেতে পারেন, কীভাবেই বা পুরোনো রীতিতে সাহিত্য রচনায় ফিরে যেতে পারেন তাঁরা? যেমন ধরুন কুমুদরঞ্জন মল্লিকের কায়দায় এমনকি কোনো ইস্কুলের ছেলেও এখন কবিতা লেখে না, তেমন ভাবেই কি জীবনানন্দ-পূর্ব গদ্যরীতি প্রায় বাতিল হয়ে যাচ্ছে না জীবনানন্দর এই গল্প উপন্যাসগুলি বেরোনোর পর?

এবার অবশ্যই আমাদের কয়েকটি জিনিস ভাবতে হবে, দেখে নিতে হবে এই আধুনিক গদ্যরীতির চরিত্র-লক্ষণ কী অথবা এর মূল বৈশিষ্ট্য কী। এই গদ্যরীতি, মূলত বিষয়-নির্ভর নয়, অর্থাৎ অবজেকটিভ নয়, যুক্তিবিরোধী নয়; কিন্তু যুক্তিবাদী কিংবা যুক্তি-নির্ভর নয়। এটা মেনে নিলে অবশ্যই একটা বিচিত্র ব্যাপার ঘটবে, দেখা যাবে রবীন্দ্রনাথ, যাঁকে আমরা 'অনাধুনিক' বলছি, তাঁর গদ্যরীতির মধ্যেই আছে জীবনানন্দ প্রবর্তিত গদ্যরীতির বীজ, অর্থাৎ, আধুনিক গদ্যসাহিত্যের বীজ। যদি চতুরঙ্গের গদ্যভাষার কথা কারও মনে থাকে, মনে থাকে চার অধ্যায়, শেষের কবিতা, ল্যাবরেটরি কিংবা রবিবারের কথা তাহলেই তিনি বুঝতে পারবেন আমি কী বলতে চাইছি। সবসময় যদি নাও হয়, অন্তত অধিকাংশ সময় আমরা লক্ষ করব, রবীন্দ্রগদ্যভাবনায় গৌণ হয়ে পড়ছে বাইরের ঘটনা, বারে বারেই আত্মার ভেতরের ঘটনাগুলিই তৈরি করছে উপন্যাসের আকার, উপন্যাসের বিষয়। কোনো 'নির্লিপ্ত' সমাজবিজ্ঞানী বা 'বৈজ্ঞানিক'-এর মতো বাইরে থেকে কোনো ঘটনাকে লক্ষ করা নয়, বরঞ্চ চৈতন্যের এক সূক্ষ্ম স্তরকে দেখে 'সমগ্র' সত্যের মূলভূমিকে ছুঁয়ে দেখার চেষ্টা। চতুরঙ্গে শচীশের অন্তর্ভ্রমণ, তার চৈতন্যের ঝড় ও তুমুল বিক্ষেপ যদি না-থাকত, যদি থাকত শুধুই শ্রীবিলাস ও দামিনীর প্রণয় পরিণাম, তাহলে তা হতো নেহাতই মেঠো গল্প, যতই শেষ পর্যন্ত শ্রীবিলাসকে দামিনী স্বামী হিসেবে গ্রহণ করুক না কেন। অর্থাৎ যদি কেউ মনে করেন শেষ পর্যন্ত নির্বিরোধ গার্হস্থ্য জীবনেই আছে প্রেমের সম্পূর্ণতা, এরকম একটি ইঙ্গিত রবীন্দ্রসাহিত্যভাবনায় পাওয়া যাচ্ছে, তাহলে তিনি

অবশ্যই নীতিগল্পের সুসমাচার সাহিত্যে খুঁজছেন, যা পাওয়া শক্ত। এবার আরেকটু লক্ষ করলে দেখা যাবে শচীশ-দামিনী সম্পর্কের মধ্যে যে দূরত্ব, যে ভাবনা ও জীবনযাপনের ব্যবধান রয়েছে, প্রায় তারই কাছাকাছি—অন্তত অনুরূপ না-হলেও—একটি দূরত্ব রয়েছে জীবনানন্দর তিনটি উপন্যাসের স্বামী-স্ত্রী চরিত্রে, যথাক্রমে 'মাল্যবান', 'জীবনপ্রণালী' ও 'কারুবাসনা'য়।

কারুবাসনার কথা যদি ধরা যায় তাহলে দেখা যাবে, জীবনানন্দ স্পষ্ট ভাষায় বলছেন : 'সমস্ত কারুতান্ত্রিকই কি সংসারের স্ত্রীর প্রতি এমন বিরাটভাবে উদাসীন? তা ঠিক নয়; শিল্পযাত্রীও শেষ পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষ হিসেবেই রক্তমাংসের সুখ-সুবিধা সুব্যবস্থা চায় বই কি, কিন্তু তার জীবনের মধ্যে প্রেরণার ভিতর নিরবয়বকে [উপলব্ধি] করে আনন্দ, ও অবয়ব সম্পৃক্ত নিষ্ফলতা, আবহমান কাল থেকে এই মধুর মারাত্মক বীজ রয়ে গেছে।

একখানা গল্পের বইয়ের সাংসারিক দাম যে তেমন কিছু নয়, একখানা কবিতার বইয়ের দাম যে আরো ঢের কম তা তাকে বারবার চোখে আঙুল দিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে সংসার; কিন্তু তবুও সমস্ত কবিতা ও শিল্পসৃষ্টির প্রেরণা বাতাসে উড়িয়ে দিয়ে সংসারের ছককাটা উন্নতির পথে পরিপূর্ণ অন্তর্দান করবার মতো স্বাভাবিকতা কোনোদিনই সে অর্জন করতে পারে না। এমনই অস্বাভাবিক অবৈধ মানুষ সে, এই আর্টিস্ট।... শিল্পের সাহিত্যের আর্টের ইতিহাসে এমন অনেক নাম রয়ে গেছে যারা না-খেতে পেয়ে মরেছে, কিংবা যক্ষ্মায়, কিংবা লাঞ্ছিত হয়ে, কিংবা দুর্দিনের তিমিরে স্বল্পতায়।

কিন্তু তবুও শিল্পীর জীবনের নিদারুণ ভবিতব্যতার পথ থেকে সংসারের বক্ষের শান্তিনিকেতনে পালিয়ে যেতে চায় নি, যেতে পারে নি, কেউ কোনোদিনও পারে নি। কোনোদিনও পারবে না।'

এরপরই লিখছেন : 'চারদিকে ছায়া জমে গেছে; বিকেলের ছায়ার সঙ্গে মিশেছে মেঘের গভীর অন্ধকার।'

আর এই অন্ধকার, মেঘের রাজ্য থেকে গভীর স্মৃতির অন্ধকার থেকে উঠে আসে তাঁর চিরদিনের প্রেমিকা, বনলতার মুখচ্ছবি :

'কিশোরবেলায় যে-কালো মেয়েটিকে ভালবেসেছিলাম কোনো এক বসন্তের ভোরে, বিশ বছর আগে যে আমাদেরই নিকটবর্তিনী ছিল, বহুদিন যাকে হারিয়েছি—...নক্ষত্রমাখা রাত্রির কালদিঘির জলে চিতল হরিণীর প্রতিবিম্বের মতো রূপ তার—প্রিয় পরিত্যক্ত মৌনমুখী মেরীর মতো অপরূপ রূপ। মিষ্টি, ক্লান্ত অশ্রুমাখা চোখ, নগ্নশীতল নিরাবরণ দুখানা হাত ম্লান ঠোঁট। পৃথিবীর নবীন জীবন ও নরলোকের হাতে প্রেম বিচ্ছেদ ও বেদনার সেই পুরোনো পল্লীর দিনগুলো সমর্পণ করে কোন দূর নিঃস্বাদ নিঃসূর্য অভিমানহীন মৃত্যুর উদ্দেশ্যে তার যাত্রা। সেই বনলতা—আমাদের পাশের বাড়িতে থাকত সে।'

এরপর আরো কিছুকাল জুড়ে এক মর্মান্তিক স্মৃতিচারণ, যার অন্তত বেশ কিছুটা তুলে দেওয়ার লোভ সামলাতে পারছি না, কেননা এখানেই গদ্য ও কবিতার সেই মিলনবিন্দু, যার আলো-আঁধারি জুড়ে বনলতার মুখচ্ছবি বারবার ভেসে ওঠে, যা আধুনিক গদ্যরীতিরও এক দিকনির্দেশ, যেহেতু বাইরের আর্থ-সামাজিক ঘটনা নয়, আত্মার এক বিশেষ অবস্থা, চৈতন্যের এক গভীর ও সূক্ষ্ম স্তরকে ছুঁয়ে যাওয়াই হচ্ছে আবহমান আধুনিকতা যা কিনা বিষয়গত বা অবজেকটিভ পদ্ধতির দ্বারা অসম্ভব।

তাহলে আবার আমরা ফিরে যাচ্ছি বনলতার কাছে :

'...কত শীতের ভোরের কুয়াশা ও রোদের সঙ্গে জড়িত সেই খড়ের ঘরখানাও নেই তাদের আজ; বছর পনের আগে দেখেছি মানুষজন নেই, থমথমে দৃশ্য,লেবু ফুল ফোটে, ঝরে যায়, হোগলার বেড়াগুলো উইয়ে খেয়ে ফেলেছে। চালের উপর হেমন্তের বিকেলে শালিখ আর দাঁড়কাক এসে উদ্দেশ্যহীন করলব করে। গভীর রাতে জ্যোৎস্নায় লক্ষ্মীপেঁচা ঝুপ করে উড়ে আসে। খানিকটা খড় আর ধুলো ছড়িয়ে যায়। উঠানের ধূসর মুখ জ্যোৎস্নার ভিতর দু-তিন মুহূর্ত ছটফট করে। তার পরেই বনধুঁধুল, মাকাল বঁইচি ও হাতিশুঁড়ার অবগুণ্ঠনের ভিতর নিজেকে হারিয়ে ফেলে। বছর আষ্টেক আগে বনলতা একবার এসেছিল। দক্ষিণের ঘরের বারান্দায় দাঁড়িয়ে চালের বাতায় হাত দিয়ে মা ও পিসিমার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললে সে। তারপর আঁচলে ঠোঁট ঢেকে আমার ঘরের দিকেই আসছিল। কিন্তু কেন যেন অন্যমনস্ক নতমুখে মাঝপথে গেল থেমে। তারপর খিড়কির পুকুরের কিনারা দিয়ে, শামুক গুগলি পায়ে মাড়িয়ে, বাঁশের জঙ্গলের ছায়ার ভিতর দিয়ে চলে গেল সে। নিবিড় জামরুল গাছটার নীচে একবার দাঁড়াল, তারপর পৌষের অন্ধকারের ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।

তারপর তাকে আর আমি দেখিনি।

অনেকদিন পর আজ আবার সে এল; মনোপবনের নৌকায় চড়ে, নীলাম্বরী শাড়ি পরে, চিকন চুল ঝাড়তে-ঝাড়তে আবার সে এসে দাঁড়িয়েছে; মিষ্টি অশ্রুমাখা চোখ, ঠাণ্ডা, নির্জন দুখানা হাত, ম্লান ঠোঁট, শাড়ির ম্লানিমা। সময় থেকে সময়ান্তর, নিরবচ্ছিন্ন, হায় প্রকৃতি, অন্ধকারে তার যাত্রা—।'

এই দীর্ঘ মর্মন্তিক স্মৃতিচারণার পরই শুরু হচ্ছে দীর্ঘ সংলাপ, প্রায় ১০ পাতা জুড়ে পিতা ও পুত্রের মধ্যে। তারপর আরো আরো সংলাপ কখনো স্বামী-স্ত্রী, কখনো বাবা ও বাচ্চা মেয়ে কখনো মা ও অলস বেকার কারুবাসনাতাড়িত ছেলের মধ্যে, কখনো বা মা স্তব্ধ, ছেলেই শুধু অবিরাম অনর্গল কথা বলে চলেছে আপন মনে, বলা যায় একের পর এক দীর্ঘ মনোলগ—এক অদ্ভুত, বিচিত্র ব্যাপার। অবশ্য জীবনানন্দর অধিকাংশ উপন্যাসে সংলাপের প্রাধান্য থাকলেও তার এতটা প্রাচুর্য বড় একটা দেখা যায় না, তবু আবেগ ও যুক্তিতাড়িত সংলাপের প্রায় বিদীর্ণ হয়ে ওঠা চেহারা দেখে ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে সংলাপের ব্যবহার মনে পড়া স্বাভাবিক, আরো মনে পড়া স্বাভাবিক এইজন্যই যে এইসব সংলাপ ও কথোপকথনের মধ্য দিয়েই লেখক তাঁর শিল্পভাবনা, দর্শন এমনকি গল্পের নাটক বা ঘটনা একটানা প্রায় ক্লান্তিহীন বলে চলেছেন নিছকই কথা বলার মেজাজে,—আর এই সবকিছু থেকে একটি সিদ্ধান্ত অনিবার্যভাবেই উঠে আসে, তা হল উপন্যাস কোনো বিনোদনসংখ্যার সম্ভার নয়, উপন্যাস হচ্ছে অমোঘভাবে লেখকের অন্তর্জীবনের এক পরিচয়, উন্মোচন, যা নিছক আত্মজীবনী নয়, স্বীকারোক্তি নয়, স্মৃতিচারণ নয়, অথচ যার মধ্যে এই সমস্ত উপাদানই আছে মিলে-মিশে। এবার আধুনিক গদ্যের কয়েকটি চরিত্রলক্ষণ আমরা দেখতে পাচ্ছি, যার জন্য আগের দীর্ঘ উদ্ধৃতিগুলির প্রয়োজন ছিল। এইসব লক্ষণগুলিকে যদি আমরা একজায়গায় জড়ো করে কাছ থেকে লক্ষ করতে চাই তাহলে দেখতে পাব :

১। এতে সাধারণভাবে ডিটেকটিভ গল্পের মতো কোনো খুনের কিনারা করার জন্য কিংবা আততায়ীকে গ্রেপ্তার করার জন্য একের পর এক সূত্র সাজিয়ে, অর্থাৎ প্লট ব্যবহার করে কোনো একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর তেমন তাড়া নেই।

২। এমনকি যদি কোনো খুনের গল্পও আধুনিক রীতিতে লেখা যায় (যেমন

ডস্টয়েভস্কির উপন্যাসে) তাহলেও খুনী কে, অথবা খুনী কীভাবে ধরা পড়ল সেটা বড় কথা নয়, বড় কথা হচ্ছে খুনের পেছনে কী মানসিকতা ছিল, চৈতন্যের কোন আবহাওয়ায় মানুষ হত্যার দিকে যায়, অর্থাৎ পাপকর্মের চৈতন্যের নানান রহস্যময় স্তর, নানান ভাঁজ খুলে লেখক তারও অতীত অপর কোনো চৈতন্যের স্বরূপ সন্ধানের দিকে যান।

৩। স্মৃতিচারণ, কল্পনার বিস্তার ও প্রায় কবিতায় কাছাকাছি যেতে পারে এমন আবেগ-স্পন্দন তৈরি করার জন্য এমন ভাষা ও শব্দের ব্যবহার যা সাংবাদিক শব্দ ব্যবহারের বিরোধী, অর্থাৎ যা নিছক খবর সম্প্রচার, কিংবা তার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের ভাষা নয়।

৪। সংলাপ এখানে নেহাতই কথোপকথন নয়, বরং কথোপকথনের মাঝখানে সুযোগ পেলেই, কথোপকথনের এলাকা পেরিয়ে চলে যায় অনেকটা শেকসপিরীয় নাটকের মনোলগের দিকে, যার মারফৎ ব্যক্তি তার অন্তর্জীবনের বিক্ষোভ, অনুসন্ধান, প্রকৃতি এ-সবেরই আভাস দিতে পারে অপর ব্যক্তিকে।

৫। আর এর কোনোকিছুই সম্ভব নয় যদি আমরা বিষয়গত রীতি বা অবজেকটিভ রীতি এক্ষেত্রে ব্যবহার করি। অবজেকটিভ রীতি হচ্ছে দুর্মরভাবে আধুনিকতার বিরোধী। এই সত্যটি আমরা ব্যবসায়িক গল্প-উপন্যাসের দিকে তাকালেই উপলব্ধি করব। সেখানে দেখা যাবে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে একটা 'গল্প' বলে যাওয়ার ধুম পড়েছে। এখানে লেখক সবসময়ই ঘটনাগুলিকে বাইরে থেকে দেখেন ও দেখান। এমনকি নিজের জীবনের ঘটনাকেও তিনি দেখেন ও দেখান বাইরে থেকে। ফলে লেখকের ভূমিকা এখানে অনেকটা সর্বশক্তিমান নিউটনীয় খ্রিস্টান ঈশ্বরের মতো, যিনি বিশ্বজগৎকে বাইরে থেকে একটি অতিকায় ঘড়ি হিসেবে দেখছেন—অর্থাৎ যিনি জগৎকে 'অবজেকটিভলি' দেখছেন। ফলে এই জগতে 'ভবিষ্যদ্বাণী' সম্ভব, এখানে পরমাণুর মতোই চেতনার অবস্থান বা ব্যক্তিমানুষের অবস্থান জানলে তার পরিণাম বলে দেওয়া সম্ভব। অর্থাৎ ব্যক্তিমানুষ ও তার চেতনা এই সবকিছুই এঁদের হিসেবের খাতায় ঠিকঠাক ধরা আছে, কোনো অনিশ্চয়তার জায়গা এখানে নেই। এঁদের ভাষাও এইজন্য খুবই ঝরঝরে, 'স্মার্ট'। যেমন বিশ্বজগৎ তেমনি মানবচৈতন্যকেও এঁরা পুরোপুরি হিসেবের খাতায় ধরে নিয়ন্ত্রণ করতে পারেন। আর এ ব্যাপারে দক্ষিণ ও বামপ্রতিষ্ঠানের মধ্যে তেমন কোনো ফারাক নেই।

আধুনিক সাহিত্য অবশ্যই এই নিয়ন্ত্রণমূলক সাহিত্যের বিরুদ্ধে। তার মানে অবশ্য এ-ও নয় যে আধুনিক সাহিত্য চূড়ান্ত বিচারে বিষয়ীগত তথা সাবজেকটিভ; কেননা তা যদি হত তাহলে সেন্ট অগাস্টাইন বা রুশোর মতো একের পর এক স্বীকারোক্তি লিখে গেলেই তা সাহিত্য হত, যদিও অগাস্টাইন বা রুশোর স্বীকারোক্তি যথার্থ সাহিত্য না-হলেও সাহিত্য পদবাচ্য।

এবার অবশ্য একটি অভিযোগ উঠতে পারে, যে পরমাণু এবং চেতনার আচরণকে তথা বস্তু ও চেতনাকে আমি একাকার করে দেখছি। চারপাশে অনেক সময়ই শোনা যায় যে সাহিত্যকে 'বিজ্ঞানসম্মত' হতে হবে, কিংবা সাহিত্যিককে হতে হবে বৈজ্ঞানিকের মতো নির্লিপ্ত। বিশেষত মাণিকবাবুর সাহিত্যসমালোচনার ক্ষেত্রে তো হামেশাই একথা শোনা যায়। এরকম চালু ধারণা অবশ্য এখন প্রায় বরবাদ হয়ে যেতে বসেছে, কেননা 'বিজ্ঞান' বা 'বিজ্ঞানসম্মত' বলতে আগে যা বোঝা যেত এখন আর তা বোঝায় না। উনিশ শতক পর্যন্ত প্রচলিত নিউটনীয় বৈজ্ঞানিক ধ্যানধারণার কাঠামো অনুযায়ী অনেকেই বুঝতেন 'বিজ্ঞানসম্মত' মানে একটি কঠোর-কঠিন নিশ্চিত 'অবজেকটিভ' বা বিষয়গত পদ্ধতি, যা বিশ শতকের আধুনিক বিজ্ঞানের কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রায় নাকচ করে দিয়েছে।

কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অন্যতম পথিকৃৎ হাইজেনবার্গ একটি যুগান্তকারী আবিষ্কারের মধ্য দিয়ে প্রমাণ করেন যে পরমাণুর জগতে নিশ্চয়তা নেই, সেখানে কাজ করছে 'অনিশ্চয়তা বিধি' (বা principle of uncertainty) যার ফলে পর্যবেক্ষণ না-করা পর্যন্ত বলা যাবে না পরমাণু আছে না নেই। পর্যবেক্ষণের আগে পর্যন্ত পরমাণু থাকছে একটি সম্ভাবনার তরঙ্গের মধ্যে (probability wave) এবং তার অবস্থান জানলে আমরা বলতে পারব না তার ভর বা গতিবেগ কী, তার ভর বা গতিবেগ জানলে আমরা বলতে পারব না তার অবস্থান কোথায়, অর্থাৎ সোজা ভাষায় বলতে গেলে পরমাণুর জগতে কোনো নিশ্চিত ভবিষ্যদ্বাণী সম্ভব নয়, এবং তার থাকা না-থাকা নির্ভর করছে পর্যবেক্ষক বা দ্রষ্টার উপর। পরমাণুর বর্ণনা-প্রসঙ্গে হাইজেনবার্গের মত ঃ But then one sees that not even the quality of being (if that may be called a 'quality') belongs to what is described. It is a probability for being or a tendency for a being' অর্থাৎ বলা যেতে পারে পরমাণু হচ্ছে 'হওয়া'র সম্ভাবনা বা 'হয়ে ওঠা'র ঝোঁক।

এর চেয়ে ভিন্ন মতামত হচ্ছে বিশিষ্ট পদার্থবিজ্ঞানী ও অধ্যাত্মবাদী ডেভিড বম-এর, যিনি মনে করেন বস্তুকণিকার 'বিষয়গত বাস্তবতা' আছে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হচ্ছে এক বহুমাত্রবিশিষ্ট গূঢ় শৃঙ্খলার (implicate order) ত্রিমাত্রিক প্রক্ষেপ (projection)। বলা যেতে পারে চলচ্চিত্রের ছবি যেমন দ্বিমাত্রিক পর্দায় এক ত্রিমাত্রিক বাস্তবতার প্রক্ষেপ, বস্তুকণাও তেমনই এক বহুমাত্রিক গূঢ় বাস্তবতার ত্রিমাত্রিক প্রক্ষেপ, চলচ্চিত্রের প্রক্ষেপ যতটা বাস্তব, বস্তুকণিকাও ততটাই। বস্তুকণিকার জগতে অনিশ্চয়তা আছে যেহেতু আমরা এখনো পর্যন্ত ঐ গূঢ় বা নিহিত শৃঙ্খলা সম্পর্কে কিছুই জানি না, হয়ত বা কোনোদিনই জানতে পারব না। এক্ষেত্রেও বিষয়গত বাস্তবতাকে পুরোপুরি মানা হচ্ছে না, আবার একেবারে নাকচ করাও হচ্ছে না।

সাহিত্য তথা আধুনিক সাহিত্যের দিক থেকে দেখতে গেলে এই দুটি মতই জরুরি, কেননা পরমাণু বা বস্তুকণিকার বাস্তব অস্তিত্ব থাক বা না-থাক, বিষয়গত বাস্তবতার যে একটি কঠিন নির্লিপ্ত চেহারা ছিল তা ধসে গেছে, যে মুহূর্তে কোয়ান্টাম বলবিদ্যা প্রমাণ করেছে যে এই মহাবিশ্বেরই একটি অংশ হচ্ছে মানবচৈতন্য এবং বাস্তুজগৎকে আমরা দেখি বস্তুজগতের ভিতর থেকে তার অংশ হিসেবেই, আরো সহজ ভাষায় বলতে গেলে মহাবিশ্ব হচ্ছে একটি 'সমগ্র', এবং এই সমগ্র থেকে আমরা বিচ্ছিন্ন নই। এইজন্যই অস্তিত্ববাদীরা একসময় যে ভজিয়েছিলেন মানুষকে প্রকৃতি বা বস্তুজগতের মধ্যে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হয়েছে, সেটা আর সঠিক বলে মনে হয় না। মনে হয় না কেননা মহাবিশ্বে বিভিন্ন শক্তির পারস্পরিক হার এমনই সূক্ষ্ম হিসেবে কাজ করে চলেছে যা দেখে মনে হওয়া স্বাভাবিক মানুষের আবির্ভাব সম্ভব করে তোলার পেছনে একটি পরিকল্পনা আছে। উল্টোদিকে মহাবিশ্ব, মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন এ কথা তখনই বলা সম্ভব যখন বস্তুজগৎ বা মহাবিশ্ব থেকে আমরা নিজেদের বা মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে দেখব। অবশ্য একসময় কোনো কোনো জীববিজ্ঞানী, যেমন মনো (Monod) ভজিয়েছিলেন যে মানুষের আবির্ভাব নেহাতই দুর্ঘটনা বা 'আকস্মিক' আর এই বিশাল মহাবিশ্ব তার অস্তিত্ব সম্পর্কে উদাসীন। এখন অবশ্য অনেক বিজ্ঞানীই তা আর ভাবতে পারছেন না। এঁদের মধ্যে আছেন খ্যাতনামা রসায়নবিদ ইলিয়া প্রিগোজিন, যিনি লক্ষ করেছেন বস্তুর নিজের মধ্যেই আছে 'আত্মসংগঠনের ক্ষমতা' (self organizing capacity) তথা চেতন-প্রক্রিয়ার গূঢ়াভাস, যেহেতু 'আত্মসংগঠন' একটি সচেতন প্রক্রিয়া ও শুধু স্থানীয়ভাবে নয়,

দূরবর্তীভাবেও তাৎক্ষণিক যোগাযোগ হচ্ছে এর সরবরাহ ব্যবস্থার একটি বৈশিষ্ট্য। মহাবিশ্বের অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আছে 'উন্মুক্ত ব্যবস্থা' (open system) আর এদের মধ্যেই ঘটে চলেছে নব নব রূপ ও বিন্যাসের বিবর্তন। সেইসব ব্যবস্থাকেই আমরা 'উন্মুক্ত ব্যবস্থা' বলব, যা ভিতরের ক্ষয় বাইরের পরিবেশে পাঠিয়ে, পরিবেশ থেকে নতুন শক্তি আহরণ করতে পারে ভিতরে। এইজন্য দরকার অবিরাম বাহির ও ভিতরের মধ্যে অবাধ স্বচ্ছন্দ যোগাযোগ। বদ্ধ ব্যবস্থায় এটা ঘটে না, যেমন ধরা যাক থার্মো ফ্লাস্ক। ফ্লাস্কের ভিতর গরম জল কিছুদিনের মধ্যেই ঠান্ডা হয়ে যায়, শক্তির সাম্যাবস্থার জন্য। এখানে কোনো পরিবর্তন ঘটে না। কিন্তু মানবশরীর বা শহর হচ্ছে উন্মুক্ত ব্যবস্থার উদাহরণ, যেখানে অবিরাম বাহির ও ভিতরের যোগাযোগ ও আদানপ্রদান ঘটে চলেছে। যেখানেই স্পন্দন, পরিবর্তন ও নব নব রূপের বিকাশ, সেখানেই লক্ষ করব সাম্যাবস্থা (equilibrium) থেকে দূরে চলে যাওয়া এক অস্থির চঞ্চলতা, কিংবা ওঠা-নামা (Fluctuation)। এই অস্থিরতা একটি সঙ্কটজনক চৌকাঠ পেরুনোর পরই ঘটতে থাকে দ্বিভাজন বা বিভাজন প্রক্রিয়া, যখন নব নব রূপের আবির্ভাব। এই নব রূপের বিকাশ অনিশ্চিত, অনিশ্চিত বলেই বিচিত্র বা বৈচিত্র্যময়, তবু তা যেন এক নিহিত বহুমাত্রিক শৃঙ্খলার প্রক্ষেপ বা প্রতিফলন—এমন কথাও আমরা ভাবতে পারি। শিল্প-সাহিত্য তথা আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেন এ-কথা আরো বিশেষভাবে সত্য, যদি শিল্প-সাহিত্যকে আমরা একটি 'উন্মুক্ত ব্যবস্থা' হিসেবে দেখি। আধুনিক সাহিত্য এইজন্যই নিছক সমাজবাস্তবতামূলক কিংবা ঐতিহাসিক সাহিত্য নয়, নিছক সামাজিক নয়, এতে সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে পর্যটনের বিবরণ থাকে। মহাবিশ্ব ও মানবচেতনা যেন এখানে একসূত্রে গাঁথা, বস্তুকণিকার অনিশ্চিত আচরণের সঙ্গে মানবচেতনার অনিশ্চয়তাকেও তাই এখানে মেলানো যায়।

এখানে অতিপরমাণু সম্পর্কে স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের একটি ভাবনাকে, তাঁর বিশ্বপরিচয় গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারছি না : 'যাকে পরমাণু বলা হয়েছে তাকেও ভাঙতে ভাঙতে ভিতরে পাওয়া গেল অতিপরমাণু, সে এক অপরূপ জিনিস, তাকে জিনিস বলতেও মুখে বাধে।'

ব্যাপারটা সত্যিই তাই, অতিপরমাণুকে 'জিনিস' বলতে সত্যিই 'মুখে বাধে' অথচ তা জিনিসও বটে। এবার লেখার ব্যাপারে আবার ফেরা যাক। তবে তার আগে অতি-পরমাণুর সঙ্গে চেতনার আরেকটি বৈশিষ্ট্যের মিল নিয়ে সামান্য একটু আলোচনা করে নেব, যা আমাদের সাহিত্যভাবনার পক্ষে কাজে লাগতে পারে। এখানে একটি কথা বলে নেয়া দরকার। এই রচনার লেখক বিজ্ঞানের ছাত্র নন, অথচ যেকোনো সাহিত্য শিক্ষার্থীর মতোই তাঁরও বস্তুর চরিত্র কিংবা বস্তু ও চেতনার সম্পর্ক ব্যাপারে জানার আগ্রহ আছে আর এইজন্যই আধুনিক পদার্থবিজ্ঞানের সাম্প্রতিক অনুসন্ধানগুলির দ্বারস্থ হওয়া ছাড়া উপায় নেই। তবে পদার্থবিজ্ঞানের দুরূহ গাণিতিক ভাষ্য জানা কেবলমাত্র বিজ্ঞানের ছাত্রের পক্ষেই স্বাভাবিক ও সম্ভব, এটা যেমন ঠিক, তেমনই গাণিতিক ভাষ্য ছাড়াও বিজ্ঞানের সাধারণ সিদ্ধান্ত, অনুসন্ধান বা পর্যবেক্ষণগুলি বিশিষ্ট বিজ্ঞানীরাই যেহেতু সাধারণের বোধগম্য ভাষায় লিখে থাকেন, সেইহেতু এগুলি একেবারেই সাধারণের অগম্য কিংবা অনধিকার চর্চা এমনও নয়। তবু আমার ভাবনা ও তথ্যে অসম্পূর্ণতা কিংবা ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক, কাজেই সে বিষয়ে যদি কেউ আমার ভুল সংশোধন করে দেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকব। এখন আগের কথায় ফের আসা যাক। আমি আগেই বলেছি অতিপরমাণুর

সঙ্গে চেতনার আরেকটি বিশিষ্ট মিলের কথা। মিলটি হচ্ছে পরমাণুর মতোই চেতনাও মুহূর্তের মধ্যে স্থান ও কালগত ব্যবধান পেরিয়ে যেতে পারে। ব্যাপারটা শুধু খুলে বলা দরকার। কোয়ান্টাম বলবিদ্যার একটি প্রচ্ছন্ন সিদ্ধান্ত হচ্ছে দুটি কণিকার মধ্যে এমনকি আলোকবর্ষের ব্যবধান থাকলেও তারা পরস্পরের মধ্যে আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে যোগাযোগ ঘটাতে পারে। যেহেতু পর্যবেক্ষণের আগে পর্যন্ত অতি-পরমাণুর গতিপ্রকৃতি, এমনকি অস্তিত্ব পর্যন্ত অনিশ্চিত, অতএব ধরে নেয়া যেতে পারে পর্যবেক্ষণের সময় কণিকাটির কাছে কোনো না কোনোভাবে আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে খবর পৌঁছোচ্ছে। অথচ অপেক্ষবাদের সূত্র অনুযায়ী আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে কেউ সঙ্কেত পাঠাতে পারে না। তাহলে ধরে নিতে হয় এই ব্যাপারটা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে পর্যবেক্ষণের সময়ই কোনো স্থানীয় গূঢ় বা নিহিত নিয়ন্ত্রক থেকে। অথচ কোয়ান্টাম বলবিদ্যা কোনো স্থানীয় গূঢ় নিয়ন্ত্রককে বিশ্বাস করে না। তাহলে অবশ্যই মানতে হয় কোয়ান্টাম বলবিদ্যা অসম্পূর্ণ। এটিই ছিল কোয়ান্টাম বলবিদ্যা সম্পর্কে আইনস্টাইনের অভিযোগ। এই আপত্তি অবশ্য নীলস্ বোর বা হাইজেনবার্গ মানেননি, তাঁদের মতে যেহেতু দ্রষ্টা ও দ্রষ্টব্য অতিপরমাণু একই সমগ্রের অংশ, অতএব দুটি স্বতন্ত্র এলাকার মধ্যে যোগাযোগ হচ্ছে না, হচ্ছে একই সমগ্রর দুটি অংশের মধ্যে। আধুনিক বিজ্ঞানের দুটি প্রধান তত্ত্বের এই বিরোধ দীর্ঘদিন বজায় ছিল বা আছে। [বিশিষ্ট গণিতবিদ ফন নয়মান একদা গণিতের সাহায্যেই প্রমাণ করেন যে কোনো স্থানীয় গূঢ় নিয়ন্ত্রক বা গূঢ় চলরাশির (hidden variables) অস্তিত্বই নেই।] তবু এই বিরোধ, আধুনিক বিজ্ঞানের অগ্রগতির পক্ষে অনেকেই মনে করেন বিশেষ একটি বাধাস্বরূপ, বিশেষত যাঁরা আপেক্ষিকতাবাদ ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মিলগুলিকে একত্রে গেঁথে মহাবিশ্বসৃষ্টির রহস্যকে বুঝতে চান, যেহেতু তাঁদের মতে, এই রহস্যকে বুঝতে গেলে ঐ দুটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের মিলন না-ঘটিয়ে কোনো উপায় নেই।

এঁদের মধ্যেই অন্যতম হচ্ছেন ডেভিড বম, যিনি ফন নয়মানের গাণিতিক প্রমাণকে নাকচ করে গাণিতিকভাবেই প্রমাণ করেন গূঢ় নিয়ন্ত্রক বা গূঢ় চলরাশির অস্তিত্ব, কিন্তু যা স্থানীয়ভাবে নয়, অস্থানিকভাবে তথা দূরবর্তীভাবে (non local) দুটি পরমাণুর মধ্যে যোগাযোগ ঘটাচ্ছে। এই প্রসঙ্গে বম একটি সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়েছেন ঃ ধরা যাক, একটি জলভরা কাচের পাত্র তথা অ্যাকোরিয়ামের মধ্যে কয়েকটি মাছ আছে। আর তার দুদিকে যথাক্রমে পাশে ও সামনে আছে দুটি ভিডিও ক্যামেরা। এবার অন্য একটি ঘরে দুটি টেলিভিশন পর্দায়, দুদিকের ঐ দুটি আলাদা ক্যামেরা থেকে পাঠানো ছবি দেখলে মনে হতে পারে বুঝি একটি পর্দার ছবির সঙ্গে অন্য পর্দার ছবিটির কোনো দূরবর্তী যোগাযোগ ঘটে চলেছে কিন্তু আসলে ব্যাপার হচ্ছে ঐ একই মাছের ছবি দুদিক থেকে দুটি ভিডিও ক্যামেরায় তোলা হচ্ছে ও একটি পর্দায় একটি মাছ পাশ থেকে নড়লে, অন্য পর্দায় সেই একই মাছ সামনে থেকে নড়বে অর্থাৎ ত্রিমাত্রিক একটি বস্তুর দ্বিমাত্রিক চলচ্চিত্র বা প্রক্ষেপ দেখছি আমরা। দুটি কণিকাও এরকমই। এক বহুমাত্রিক নিহিত বা গূঢ় শৃঙ্খলা থেকে পাঠানো একই কণার দুই স্বতন্ত্র প্রক্ষেপ দেখে আমরা ভাবছি দুটি স্বতন্ত্র ও সুদূর বস্তুকণিকার মধ্যে যোগাযোগ ঘটছে। কিন্তু ব্যাপারটি ঠিক তা নয়।

যদিও অধ্যাপক বম্-এর এই তত্ত্ব বিতর্ক বহির্ভূত নয়, তবু যাঁরা তাঁর তত্ত্বের বিরোধী এমনকি তাঁরাও তাঁর তত্ত্বের পেছনের গাণিতিক ভাষ্যটিকে উড়িয়ে দিতে পারেন না। বস্তুতপক্ষে যাঁরাই আইনস্টাইন ও কোয়ান্টাম বলবিদ্যার মধ্যে মিলন ঘটাতে চান, যেমন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী রোজার পেনরোজ যিনি স্টিফেন হকিং-এর সঙ্গে একত্রে ব্ল্যাকহোল বা

কালো গর্তের গাণিতিক সূত্র প্রদান করেন,—তাঁদের কাছে ফন নয়মান বিরোধী বম্‌-এর গাণিতিক ভাষ্যটি বিশেষ মূল্যবান।

একটু আগেই চেতনার স্থান ও কালগত ব্যবধান পেরুনোর যে বৈশিষ্ট্যর কথা হচ্ছিল এবার তার কথা মনে পড়া স্বাভাবিক। স্মৃতি, বিশেষত দূর অতীত ও দূরবর্তী স্থানের কোনো স্মৃতি যখন আমাদের মনে মুহূর্তের মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, ও প্রায় এক মুহূর্তের মধ্যে মানসচক্ষুতে যখন আমরা ফেলে আসা বহু ঘটনাকে একত্রে স্মরণ করতে পারি, তখন বস্তুকণিকার অস্থানিক যোগাযোগের (non local connection) সঙ্গে তার বেশ মিল পাওয়া যায়। এছাড়াও আরেকটি ব্যাপারেও এই দুয়ের মিল আছে। ত-হলে নতুন কোনো শিল্পসৃষ্টির প্রেরণায় যখন এক ঝলকের মধ্যে শিল্পী বা সঙ্গীতকার দেখতে পান তাঁর গোটা সৃষ্টির চেহারাকে। পেনরোজ চেতনার ক্ষেত্রে কোয়ান্টাম বলবিদ্যার অস্থানিক যোগাযোগের ঘটনাটিকে এইভাবেই ঘটতে দেখেছেন। তিনি ইয়োরোপীয় ধ্রুপদী সঙ্গীতকার মোৎজার্ট ও বাখ্‌-এর দুটি সঙ্গীত রচনার দৃষ্টান্ত উল্লেখ করেছেন, যেখানে মোৎজার্ট ও বাখ্‌ মুহূর্তের মধ্যে তাঁদের দুটি বিশিষ্ট সঙ্গীতের পুরো আয়তনটিকে এক মুহূর্তে একত্রে দেখতে পান। বিশিষ্ট গণিতবিদ আঁরি পোয়াঁকারের একটি গাণিতিক সিদ্ধান্তের ব্যাপারেও একই ঘটনা ঘটে, এমনকি পেনরোজের নিজের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার ঘটে যখন তিনি 'কালো গর্ত' বা ব্ল্যাকহোলের গাণিতিক ভাষ্যের পুরোটি লেখার আগেই তার আভাসটিকে আগেই দেখতে পান তাঁর এক বন্ধুর সঙ্গে রাস্তায় হাঁটতে হাঁটতে গল্প করার সময়। পেনরোজের প্রসঙ্গ এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য, কেননা যন্ত্রমানবের কৃত্রিম বুদ্ধি আদৌ কোনো 'চেতনা' কিনা অথবা যান্ত্রিক বুদ্ধির পেছনে যে গাণিতিক ছক থাকে তা মানবিক চেতনার মূলে কাজ করে কিনা অথবা মানবিক চেতনার প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে 'যান্ত্রিক চেতনা'র আবির্ভাব কোনোদিন আদৌ সম্ভব কিনা এ বিষয়ে পেনরোজ একটি মূল্যবান গবেষণায় ব্যাপৃত আছেন। পেনরোজের বক্তব্য হচ্ছে যেহেতু যান্ত্রিক বুদ্ধির মূলে আছে গাণিতিক ছক, (algorithm) কিন্তু মানবিক চেতনার মূলে তা নেই, যা আছে তা হচ্ছে স্থান-কালের অতীত এক সত্যের মুহূর্ত-উদ্ভাস, সেইহেতু কোনোদিনই মানুষের চেতনার জায়গা যান্ত্রিক বুদ্ধি নিতে পারে না। তাছাড়া মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে অতিপরমাণুর স্তরে এক অবিরাম অস্থানিক যোগাযোগ ঘটে চলেছে, যার ফলে মস্তিষ্ক কোষ তথা নিউরনগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থায় ও রাসায়নিক পরিবেশেও আলোর চেয়ে দ্রুতবেগে এক অবিরাম অবিশ্বাস্য পরিবর্তন ঘটে চলেছে যার চরিত্র সামগ্রিকভাবে (Globally) নিয়ন্ত্রিত, যা সরলরেখায় ঘটে না, যা অনেকটা মোৎজার্ট ও বাখের শিল্পপ্রেরণায় এক মুহূর্তের সামগ্রিক উদ্ভাসের মতো।

এরপর মানবমস্তিষ্কের গঠনবিন্যাসের সঙ্গে সাহিত্যের একটি যোগাযোগও আমরা লক্ষ করতে পারি। সম্প্রতি কালে মস্তিষ্কোষবিদ্যার (neurology) একজন বিশিষ্ট গবেষক পল ম্যাকলিন লক্ষ করেছেন মানুষের মস্তিষ্কে পরপর তিনটি স্তর আছে অথবা এ-ও বলা যায় যে বস্তুতপক্ষে, আমাদের একটি মাথার মধ্যেই আছে তিনটি মস্তিষ্ক। এর সবচেয়ে উপরেরটি হচ্ছে সবচেয়ে নতুন মস্তিষ্ক যাকে বলা হচ্ছে নিও-করটেক্স যার দৌলতে আমাদের homo sapiens বা 'প্রাজ্ঞ মানুষ' বলা হয়। এর নিচের ধাপে আছে স্তন্যপায়ী-মস্তিষ্ক ও একেবারে নিচে আছে সবচেয়ে আদিম সরীসৃপ-মস্তিষ্ক। নিও-করটেক্স হচ্ছে যুক্তি, অনুভব, শিল্পসাহিত্য, অধ্যাত্মচিন্তা, গণিত, জ্যামিতি, বিজ্ঞান ইত্যাদির আধার, স্তন্যপায়ী মস্তিষ্কে আছে তীব্র আবেগ, স্মৃতি, উন্মাদনা, ভয়, উৎকণ্ঠা, পরার্থপরতা ইত্যাদি।

এই মস্তিষ্ককে Limbc-system-ও বলা হয়। এর নিচে অর্থাৎ সর্বশেষে আছে সবচেয়ে আদিম তথা সরীসৃপ-মস্তিষ্ক যাকে ম্যাকলিন বলছেন Reptile-complex বা সংক্ষেপে R-complex এতেই আছে আদিম পশুর পাশবিক ঈর্ষা, রাগ, হিংস্রতা, অবাধ যৌন পিপাসা, দমন-পীড়নের ইচ্ছা, ধর্ষকাম, রিরংসা। অর্থাৎ সোজা কথায় বিবর্তনের যে তিনটি প্রধান ধাপ আমরা পেরিয়ে এসেছি, সেই স্তন্যপায়ী ও সরীসৃপ যুগের দুটি মস্তিষ্ককে আমাদের মাথা থেকে প্রকৃতিদেবী বাদ দেননি, বরঞ্চ ঐ দুই মাথার ওপরেই সংযোজন করেছেন নব্যমস্তিষ্ক তথা নিও-করটেক্স। ফলে মানুষের চেতনায় ও কাজে যে পাশবিক প্রবৃত্তি আমরা লক্ষ করি, তার ইতিহাস জুড়ে যে বারবার নৃশংস অত্যাচার, দমন-পীড়ন, রক্তলোলুপতা, ধর্ষকাম আর হত্যাস্পৃহা লক্ষ করি, সেসবই আমাদের ঐ সরীসৃপ-মস্তিষ্কের উত্তরাধিকার। ব্যবসায়িক ফিল্ম বা সাহিত্যেরও যে দুটি প্রধান অবলম্বন আমরা দেখি, তা হল উগ্র যৌনপিপাসা ও হিংস্রতা তথা হত্যাস্পৃহা। উগ্র রাজনৈতিক সাহিত্যেরও অবলম্বন হচ্ছে হিংস্রতা তথা দমন, নিয়ন্ত্রণ ও সন্ত্রাস। সাধারণ পাঠকের আদিমতম প্রবৃত্তি যা সরীসৃপ-মস্তিষ্কের অবদান তাকেই নানানভাবে উসকে দেয়া হচ্ছে নিয়ন্ত্রণমূলক ব্যবসায়ী বা রাজনৈতিক সাহিত্যের লক্ষ্য। যখনই কোনো পাঠক গো-গ্রাসে হিংস্রতা, ধর্ষকাম, যৌনক্ষুধা কিংবা উপর্যুপরি যৌন কর্মকাণ্ডের বিবরণ পড়ে রোমাঞ্চিত হন, তখনই বলা যায় তিনি তাঁর সরীসৃপ-মস্তিষ্ক দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছেন, শারীরিক অবস্থার দিক থেকে দেখলে তখন তিনি এক ভয়ঙ্কর মৃগী রোগের শিকার, যা বস্তুতপক্ষে হচ্ছে মস্তিষ্কবিবর্তনের দিক থেকে কয়েককোটি বছর পিছিয়ে যাওয়া। একটি বিশেষ মৃগী রোগ, যেমন (Grand mal epilepsy-র ক্ষেত্রে এটি হচ্ছে সাময়িক পশ্চাদ্‌ভ্রমণ (regression)। যখন নব্য-মস্তিষ্কের নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলে চেতনা সরীসৃপ-মস্তিষ্কের দিকে পেছিয়ে যায় সমাজ বা সাহিত্যের ক্ষেত্রে এটা আর নিছক মৃগী রোগ থাকে না, এটা হয়ে যায় ফ্যাসিবাদের মতোই এক ভয়ংকর সামাজিক ব্যাধি যার প্রতিক্রিয়া ব্যাপক ও দীর্ঘস্থায়ী। এবার বলা যায় গণতন্ত্রী বা সাম্যবাদী যে ব্যবস্থাই হোক না কেন, যেখানেই দেখা যাবে মানুষের আদিম প্রবৃত্তিকে উসকে দেয়ার চেষ্টা, তথা রিরংসা, ধর্ষকাম ও হিংস্রতাকে ব্যবসায়িক বা রাজনৈতিক স্বার্থে কাজে লাগানোর চেষ্টা সেখানেই সরীসৃপ-মস্তিষ্কের কাছে আত্মসমর্পণ করা হচ্ছে, বুঝে নিতে হবে।

অতএব আধুনিক সাহিত্য অবশ্যই এর বিরুদ্ধে। এইজন্যই আধুনিক সাহিত্য, কবিতা, সঙ্গীতধর্মী শব্দব্যঞ্জনা ও চিত্ররূপময় চিত্রকল্পের ব্যবহার, যা একটি অতীন্দ্রিয় চেতনা বা কালহীন সত্যের মূলভূমি খুঁজে দেখতে চায়, যাকে অধ্যাপক ডেভিড বম্-এর ভাষায় এক গূঢ় শৃঙ্খলাও (implicate order) বলা যেতে পারে।

আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রেও আমরা প্রায় একই ব্যাপার দেখব। দেখব এখানে সরল রেখায় কোনো ঘটনা ঘটে না, প্লটের পর প্লট এখানে নেই, বরঞ্চ এখানে এক মুহূর্তে স্মৃতির উদ্ভাসের মতোই গোটা রচনার বিন্যাসে আছে এক সমগ্র স্মৃতিচারণ।

তাহলে একটি ব্যাপারে আমরা পরিষ্কার হতে পারছি আর তা হচ্ছে লেখক এক্ষেত্রে যেমন আত্মজীবনী লেখেন না, স্বীকারোক্তি লেখেন না, তেমনই ডাক্তারের মতো অপরের চিকিৎসা করেন না, লাশ কাটেন না টেবিলে, উকিলের মতো অন্যের মামলা লড়েন না। তার ইচ্ছা বা কাজ অনেকটা জীবনানন্দর কারুবাসনার নায়কের ভাষায় বলা যায় ঃ

'...এই সৃষ্টির রহস্যের ভিতর নিজের রহস্যময় হৃদয়ের সঙ্গে আলো অন্ধকারের পথে অবিরাম চলতে ইচ্ছা করে।' (পৃ. ৫)

সৃষ্টির রহস্যের সঙ্গে নিজের হৃদয়ের রহস্যকে এইভাবে একাত্ম করতে গিয়ে, অথবা অন্যভাবেও বলা যায় নিজের হৃদয়ের রহস্যের ভিতর সৃষ্টির রহস্যকে অনুভব করতে গিয়ে লেখক আলো অন্ধকারের পথে অন্তর্ভ্রমণ শুরু করেন। সমস্ত মানবিক সম্পর্ক, সমস্ত মানবিক ঘটনাকে ভিতর থেকে দেখতে চান তিনি, তাই ঘটনা এখানে গৌণ, ঘটনার পেছনে যে মানবিক সম্পর্কের অবিরাম ক্ষয়, প্রায় দুশ্চিকিৎস্য যে অনিশ্চয়তা রয়েছে মানবচরিত্রের তথা মানবচিত্তের গোপনে; যে অকথ্য বিকার রয়েছে, অপচয় রয়েছে মানবস্বভাবের গোপনে—যার হাত থেকে কোনো রাজনৈতিক ব্যবস্থা, কোনো আর্থ-সামাজিক বিন্যাসের নিস্তার নেই,—একথাই নানানভাবে ধরা পড়ে তাঁর কাছে। অবিরাম যেমন তিনি নিজেকে প্রশ্ন করেন, তেমনি অপরকে; তেমনি অপরলোকও তাঁকে প্রশ্ন করে—আর এভাবেই চলে সংলাপের পর সংলাপ, আর এইজন্যই এই ধরনের গদ্যে থাকে সংলাপের এক বিস্ফোরণোন্মুখ প্রাচুর্য যাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে হতে পারে। একটা দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে, যদিও এটা কোনো আদর্শ দৃষ্টান্ত নয়। এখানে কথা হচ্ছে হেম অর্থাৎ উপন্যাসের তরুণ নায়ক ও তার মার মধ্যে ঃ

—'কিন্তু তবুও আমার আত্মহত্যা করতে ইচ্ছা করে। (হেম)

—কার? তোমার? কেন? (মা)

—চৌকাঠের সঙ্গে দড়ি ঝুলিয়ে কিংবা বিষ খেয়ে যে মরণ, সেরকম মৃত্যু নয়, আউটরাম ঘাটে বেড়াতে গিয়ে সন্ধ্যার সোনালি মেঘের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যেতে ইচ্ছা করে; মনে হয় আর যেন পৃথিবীতে ফিরে না-আসি।

—ও এইরকম? কিন্তু এ তো কোনো সম্ভবপর কিছু কথা নয়। আউটরাম ঘাট কোথায়?

—গঙ্গার একটা ঘাট।

—কোন দিকে বলো তো?

—তুমি দেখোনি।'

...

—'গৈরিক পরে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়ে গেলে কেমন হয় মা?

—কেন সন্ন্যাসী হবার ইচ্ছা কেন?

—কিংবা খুন করে জেলে গেলে?

—স্ত্রী সন্তান আছে। মিছিমিছি জেলে গিয়ে কী লাভ?

—জেলের বাইরে থেকেই বা কী করতে পারি?

—বাইরে থেকে চেষ্টা তো করতে পারবে।'

মাথা নেড়ে—'হৃদয়ে যদি বিশ্বাস থাকত, তাহলে অনেক আগেই জেলে চলে যেতাম।'

—'কী সে বিশ্বাস?'

—'যে বিশ্বাসে মানুষ জেলে যায়। সংসার ছেড়ে উদাসীন হয়ে ঘুরে বেড়াতেও ঢের বিশ্বাস লাগে, তাও নেই।'

এবার আমরা লক্ষ করব, উপরের দুটি উদ্ধৃতিতে আত্মহননের ইচ্ছা ও চূড়ান্ত বিশ্বাসহীনতার কথা বলা হয়েছে যা বলা যেতে পারে আমাদের সময়ের একটি সাধারণ লক্ষণ। এই রচনার শুরুতেও যেখানে বই কেনার উল্লেখ আছে তার পরেই আছে উইপোকার কথা। আরেক জায়গাতেও আছে কবিতার খাতা উইপোকায় কেটে দেওয়ার

উল্লেখ। কিছু পুরোনো চিঠিও গেছে উইয়ের পেটে। 'চিঠিগুলো উইয়ের পেটের ভিতর গিয়ে তাদের শরীরের মাংস ও রস জোগাচ্ছে, নীড় বাঁধতে সহায়তা করছে তাদের, তাদের ডিম ও সন্তান-সন্ততির কাজে লাগছে।' এই সবকিছু মিলিয়ে দেখলে মানবজীবনের অবিরাম ক্ষয়, অপচয়, ধ্বংসের দিকে তার অবিরাম এগিয়ে চলা, তার নশ্বরতার কথা যেমন মনে পড়বে, তেমনি আরেকদিকে আমরা দেখব : 'নানারকম কষ্টার্জিত বইয়ের, প্রিয় জিনিসের ছিবড়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে, তারপর আগুন জ্বালি ও চিন্তা করি; তার গভীর শক্তিকে নমস্কার জানাই।' অর্থাৎ মানুষের মেধা, মনীষা ও কল্পনাশক্তি তথা সৃষ্টিশীলতা যাকে জীবনানন্দ বলবেন, 'কারুতন্ত্র' বা 'কারুবাসনা' তারও অনিবার্য উত্থান বলা যেতে পারে তারই অমোঘ টানে, একজন অবৈধ, অস্বাভাবিক মানুষ এগিয়ে চলেন, (যিনি সামাজিক দিক থেকে সর্বৈব ব্যর্থ। ব্যর্থ কিন্তু পরাজিত নন)। ইতিহাস থেকে ইতিহাসের বাইরের দিকে, কেননা ইতিহাসের বাইরেই আছে সৃষ্টির রহস্য, যা কোনোদিনই হয়ত বোঝা যাবে না, অন্তত বৈজ্ঞানিক দিক থেকে নয়। আগেকার দিনে অনেকেই সবকিছু 'বিজ্ঞানসম্মত করতে চাইতেন, তাঁদর ধারণা ছিল বিজ্ঞানই এই মহাবিশ্বের সমস্ত জটিল রহস্য উদ্ঘাটন করতে পারে, সৃষ্টির রহস্য উদ্ধারের চাবি, ঠিকই, বিজ্ঞান একদিন জোগাড় করে ফেলবে। এখন দেখা যাচ্ছে বিশ শতকের আধুনিক বিজ্ঞান আগের তুলানায় অনেক বেশি বিনয়ী, এই বিজ্ঞান মানবিক জ্ঞানের সীমা স্বীকার করে, এবং মেনেও নেয় যে সৃষ্টির অনেক কিছুই আলো অন্ধকারে ঢাকা, অসীম রহস্যময়। তবু দুরাকাঙ্ক্ষা মানুষের আছে, থাকা স্বাভাবিক। তবে সাহিত্য মানেই হচ্ছে সমাজসমগ্র তথা লোকসমগ্রর পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ বা সমাজপ্রগতির মূল ধারা বা মূল ঝোঁকটিকে সাহিত্যে প্রতিফলিত, প্রতিষ্ঠিত কিংবা 'শিল্পায়িত' করে তোলা এমন ধারণাকে যদিও এখনো কেউ কেউ মোটাভাবে আবার কেউ কেউ সূক্ষ্মভাবে প্রশ্রয় দিয়ে থাকেন, তবুও এটা ক্রমশই পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে যে লোকসমগ্রই শেষ কথা নয়, কেননা মানবসমাজকে যদি বেঁচে থাকতে হয় তাহলে তাকে সমগ্রসৃষ্টির একটি শৃঙ্খলে গাঁথা হয়ে থাকতে হবে, অন্তত আধুনিক যুগে পরিবেশ রক্ষার আন্দোলন তাকে এই শিক্ষাই দিচ্ছে। ফলে অরণ্য-নদী-পর্বত সংরক্ষণ তার এখন জরুরি কাজ, বন্যপ্রাণী কীটপতঙ্গ পাখি ফুল যা কিনা আগেকার দিনে তথাকথিত বাস্তববাদী বা বস্তুবাদী রাজনৈতিক লেখকদের কাছে হাসিঠাট্টার খোরাক ছিল, তা এখন হয়ে দাঁড়িয়েছে মানবিক অস্তিত্বরক্ষার পক্ষে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বিষয়। তাই কেবলই মানবসমাজ নয়, মানুষের ঐতিহাসিক সত্তার কথা নয়, ইতিহাস নয়, তার প্রাকৃতিক সত্তার কথাও ভাবতে হচ্ছে খুব জোর দিয়ে। এই দিক দিয়ে দেখতে গেলে জীবনানন্দর লেখায় পাড়াগাঁর গাছগাছালি নদী পাখি রাত্রি রাত্রির আকাশের অন্ধকার আগের চেয়ে আরো ঢের অর্থপূর্ণ হয়ে উঠেছে। (এরই পশ্চাৎপটে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখাও আমাদের কাছে সমানই অর্থপূর্ণ হয়ে ওঠে)।

তবু ১৯৩৩-এ লেখা এই উপন্যাস 'কারুবাসনা' পাঠ করে কেউ কেউ হতচকিত হয়ে যেতে পারেন এই ভেবে যে যখন দুনিয়াজোড়া মন্দা, জর্মনিতে নাৎসিবাদের আবির্ভাব রাশিয়ায় জবরদস্ত মার্কসবাদের জয়জয়কার, ইয়োরোপে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের প্রস্তুতি, ভারতে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিপুল অস্থিরতা, সেই সময় পূর্ববাঙলার এক পাড়াগাঁর গাছগাছালির ভীড়ে অন্ধকার বর্ষার রাতে এক কাব্যবিলাসী তরুণের একী আত্মকথন! কোনো রাজনৈতিক সংগ্রামচেতনা নেই, ইতিহাসচেতনা নেই বরঞ্চ তার পরিবর্তে আত্মহননের ইচ্ছা, আত্মবিলাপ, প্রেম আর ব্যর্থ প্রেম! জীবনানন্দর কাছে তখনই যদি

ইতিহাসের ধূসর মূর্তি আরো ধূলিধূসর হয়ে যায় তাহলে কে তাঁকে দোষ দেবে, যখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বীভৎস ইহুদী হত্যা, রাশিয়ায় গণশ্রম শিবিরের খতম কাহিনী, ভিয়েতনামে দানবিক ও নৃশংস মার্কিনী কার্যকলাপ, বুদাপেস্তে রুশ আক্রমণ তিয়েনআন-মেনে ছাত্রহত্যা এসব পরবর্তী কালে একের পর এক ঘটে গেল। বরঞ্চ বলা যায় যে মৌলিক মানবিক বিকার ও অপ্রেম থেকে এসব ঘটনা ঘটে, তারই দৈনন্দিন চেহারা আমরা সাদামাটা ভাবে রোজই দেখি চারপাশের সফল ও সাফল্যসন্ধানী লোকদের ভিড়ে, আর তাদেরই প্রত্যাখ্যান করে যে 'অবৈধ ও অস্বাভাবিক লোকটি' ছাইধুলো ও কালিতে ভরে ফেরে নিজের সংসার, তাকেই কবি অর্থাৎ দ্রষ্টা বলি আমরা অর্থাৎ সেই হচ্ছে কারুবাসনার নায়ক। কিন্তু শুধু তাই নয়, ইতিহাস থেকে বেরিয়ে যাওয়ার তাগিদও আছে। কেন আছে? এবার সেটা বই থেকে শোনা যাক ঃ

—'দেখো, কেমন লেবুগাছের পাতা জানলার ভিতর দিয়ে এসে ঘরের ভিতর ঢুকেছে, লেবু ফুলের গন্ধ পাচ্ছ, বাবা?'

বাবা একটু চুপ থেকে—'হ্যাঁ, অন্ধকারে কেমন একটু হালকা গন্ধ।'

একটা নিঃশ্বাস ফেলে—'এমনি পাড়াগাঁ-র এইসব রাত তোমার খুব ভালো লাগে বুঝি?'

মনে মনে ভাবছিলাম, অলস নিষ্কর্মা লোক, সংসারের পথ থেকে যে ভয় পেয়ে ফিরে এসেছে, এ রাতগুলো তার পক্ষে কী যে পরম সুন্দর আশ্রয়ের জিনিস। জেগে থেকে স্বপ্ন দেখা যায়। যা পাওয়ার জন্য সারাজীবন মিছিমিছি পথে ঘুরেছি, হাতের কাছে কুড়িয়ে পাই—বেঁচে থেকে বিছানায় শুয়ে, গড়িয়ে উদ্দেশ্যহীন বিড়ম্বনাহীন রহস্যের আস্বাদ ভোগ করি—কী যে অপরূপ।

হেসে বললাম—'যতই বয়স বাড়ছে, এই আটচালা ঘরখানাকে ততই ভাল লাগছে আমার; চারদিকে এই আম-জাম-কাঁঠাল-লেবুর বন জঙ্গল-মাঠ-নিস্তব্ধতা, বিশেষ করে, এই আষাঢ়-শ্রাবণের রাতে, এর মায়া কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারা যায় না যেন।'

বলা যেতে পারে জীবনানন্দর লেখায় সক্রিয়, সচেতন অথবা সংগ্রামী রাজনীতিহীনতার কিংবা আর্থ-সামাজিক চেতনার অভাবের অভিযোগের উত্তর হচ্ছে উপরের ওই ক'টি লাইন। আধুনিক গদ্যের শিল্পভাবনায় যদি ওই একই ঘাটতির নালিশ কেউ তোলেন, তাহলে তার উত্তর ওই একই।

কিন্তু আগে বলেছি, আত্মহননের ইচ্ছা, বিশ্বাসহীনতা, অপচয়, ক্ষয় এসব হচ্ছে আমাদের সময়ের সামান্য লক্ষণ। কিন্তু একটু ভেবে দেখলে বোঝা যাবে এটি শুধু আমাদের সময়ের সঙ্কট নয়, এটি হচ্ছে মানবচিত্তের একটি মূল সঙ্কট, যেহেতু মনের একটি দানবিক কারখানা আমরা বানিয়েছি অষ্টাদশ শতকের ইয়োরোপীয় যুক্তিবাদের সাহায্য নিয়ে এই উদ্দেশ্যে যে যুক্তির সাহায্যে আমরা মস্তিষ্কের কার্যকলাপ থেকে শুরু করে, পরমাণুর আচরণ তথা মহাবিশ্বের সৃষ্টিরহস্য এ সবকিছুকেই একটি ফর্মুলায় বা কার্যক্রমে বেঁধে আনতে পারব। এখন অনেক গণিতবিদ ও বিজ্ঞানী বলছেন তা সম্ভব নয়। যেমন অতিপরমাণুর ক্ষেত্রে তেমনই চেতনার ক্ষেত্রে রয়েছে সুদূর এক গূঢ় কেন্দ্র থেকে নিয়ন্ত্রিত এক অনিশ্চয়তার খেলা যদিও তার মধ্যে একটি সম্ভাব্য পরিণামের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঝোঁক রয়েছে।

আধুনিক গদ্যসাহিত্য হচ্ছে এই সুদূর এক গূঢ় রহস্যকেন্দ্র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত অনিশ্চয়তার সাহিত্য, নায়ক এখানে নিশ্চিত সাফল্যের পথ ছেড়ে অনিশ্চিত রাস্তায় হাঁটতে থাকে,

কেননা সে অনুভব করে তার বাড়ি এখানে নয়, অন্য কোথাও, যাকে আপাতদৃষ্টিতে বলা যায় 'ব্যর্থতা', কিন্তু বস্তুতপক্ষে সাফল্য ও ব্যর্থতার বাইরের এক অবস্থান, যেখানে তিনি নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃস্ব করে দিয়ে, সমস্ত আকাঙ্ক্ষাকে স্তব্ধ করে দিয়ে লেবুফুলের গন্ধে ভরপুর বর্ষার রাতের অন্ধকার নিবিড় স্তব্ধতায় এক অনাস্বাদিত রহস্যের আস্বাদ পান—যা ইতিহাস নয়, যা তার বাইরের কোনো দূর রহস্যালোকের ইঙ্গিত।

এবার শেষ করার আগে একটি কথা সবিনয়ে নিবেদন করতে চাই! এই লেখায় আধুনিক গদ্যের আধুনিকতা সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা এই রচনাকারের ব্যক্তিগত অভিমত। এর চেয়ে ভিন্ন, উৎকৃষ্ট ও সঠিক মতামত থাকা শুধু সম্ভব তা-ই নয়, থাকা স্বাভাবিক। অতএব বর্তমান রচনাটিকে একটি ব্যক্তিগত রচনা বলাই ভাল।

উপন্যাসের ভাষা, প্রসঙ্গ 'মাল্যবান'

অতীন্দ্রিয় পাঠক

মাল্যবান নামে এক যুবক, তার বালক ও কিশোর বয়স এবং যৌবনের প্রথম দিক কেটেছে শহর থেকে দূরে, প্রকৃতির বিস্তারে, প্রকৃতির চেতনার ভেতরে আত্মস্থ যেন তার মগ্নচেতনা। সেখানে ছিল বাউলের গান, ক্ষেতের আলপথ দিয়ে বাড়ি ফেরা, আকাশে নক্ষত্রগুঁড়ি, ছায়া অন্ধকার, গাছপালা, ফুলফল ইত্যাদি। এরপর সে শহরে এসেছে, স্ত্রী কন্যাকে নিয়ে তার সংসার, দাম্পত্য জীবনেরও কেটে গেছে বারোটা বছর। এতদিন পরে বিশ্লেষণে আবিষ্কৃত তার ব্যর্থতা—ব্যক্তি জীবনে, সমাজ জীবনে, এমনকি দাম্পত্য জীবনেও। চাকরি তার বোধে খিদমদগারি, এমন কি নিজের সংসারেও তার কোনো মর্যাদা নেই। স্ত্রী তাকে অবহেলা করে, নির্বান্ধব জীবন তার, বাইরের জগত থেকে নির্বাসিত, যেন পরিত্যক্ত, নিজের ঘরেই বন্দী এই মাল্যবান নামে মানুষটি।

কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর উপন্যাস 'মাল্যবান' এই পটভূমিতেই শুরু করেছেন। মাল্যবানের এই সংসারে এক সময় তার স্ত্রী উৎপলার মেজদা সপরিবারে এলেন। স্ত্রীর নির্দেশে মাল্যবানকে মেসে উঠতে হয়। মেসের জীবন অসহ্য তবু নিরুপায়, তাকে থাকতে হয় সেখানে, মাঝে মাঝে বাড়িতে এসে মেজদার সুখী দাম্পত্য জীবন দেখে যায়। কিন্তু তার তৃষ্ণার্ত কামনা উৎপলার কাছে দ্বিগুণ অবহেলায় প্রতিহত হয়ে ফিরে আসে। অথচ এই যে ব্যর্থ দাম্পত্যজীবন, উৎপলার এতে কোনো ক্ষোভ নেই। বহু পুরুষ সংসর্গে তার অন্য তৃপ্তি। এসব দেখে শুনে মাল্যবান ভেতরে-ভেতরে ক্ষুব্ধ হলেও উৎপলাকে নিবৃত্ত করার ইচ্ছে বা সাধ্য কোনোটাই তার নেই। অবশেষে অমরেশ নামে একটি লোকের সঙ্গে উৎপলার সম্পর্ক এবং তার ধরণ শান্ত মাল্যবানকে এমনই উত্তেজিত করে, এর বিহিত করার জন্যে উদ্যোগী হয় কিন্তু শেষ পর্যন্ত এ ব্যাপারেও উৎপলা তাকে কোনো গ্রাহ্যের মধ্যেই আনল না।

'মাল্যবান' উপন্যাসে কাহিনীর যদি কিছু অস্তিত্ব তা এটুকু। আপাত চোখে এই বিষয় এমন কিছু গুরুত্বপূর্ণ নয় যে বিশেষভাবে আলোচ্য হতে পারে। এ সত্ত্বেও বাংলা সাহিত্যে এই উপন্যাসটির অনন্যতা, উপন্যাসের ইতিহাসে এর অনিবার্য সংযোজন, পাঠক ও সমালোচকের দৃষ্টি আর্কষণ করার, আলোচিত তথা গবেষিত হবার পক্ষে এর যথাযোগ্যতা। এসবের বিশ্লেষণে প্রধানত দুটো সূত্র উল্লেখযোগ্য মনে হয়— (১) প্রতিটি চরিত্রের দুর্বোধ্যতা, জটিলতা ও রহস্যময়তা যা অনুসন্ধানী পাঠক, আলোচক ও গবেষককে আদ্যোপান্ত সচল রাখতে সক্ষম, (২) শিল্প ব্যবহার তথা উপন্যাসের যে ভাষার ব্যবহার, যা অনেক স্তরে বিভক্ত রয়েছে এবং এই বিভিন্ন স্তরে বিচিত্র স্রোতের সমাবেশ।

উপন্যাসটি সম্পূর্ণ বিধৃত হয়ে আছে যে কেন্দ্রবিন্দুটিতে যা মাল্যবান চরিত্র। আত্মবিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে মাল্যবান উদ্‌ঘাটিত করতে চেয়েছে নিজের স্বরূপ এবং একই

সঙ্গে নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে, বিশ্লেষণে পারিপার্শ্বিক অন্য চরিত্রগুলি সে গড়ে তুলেছে। অবশ্য একথা বলা ঠিক নয় যে অন্য চরিত্রগুলি সর্বত্রই বিশ্বাসযোগ্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে, কেন না মাল্যবানকেই লেখক এ বিষয়ে বেশি প্রশ্রয় দিয়েছেন। অন্য চরিত্রেরা কথা বলেছে মতামত প্রকাশ করেছে কিন্তু মাল্যবানের রুচি-অরুচিতে তাদের মান নির্দিষ্ট হয়েছে, পাঠক যা প্রত্যক্ষ করতে বাধ্য হয়। উপন্যাসের কথক যদিও লেখক নিজে তবু পাঠক জেনে যায় যে একমাত্র মাল্যবানের মানের গলিঘুঁজির খবর তিনি রাখেন এবং অন্যান্য চরিত্রের ততটাই যতটুকু বাইরে থেকে দ্যাখা যায় ও আন্দাজ করা যায়। এই কারণে এটি আত্মজীবনমূলক উপন্যাস হতে পারত, সেক্ষেত্রে অবশ্য মাল্যবানকে প্রশ্রয় দেওয়া যুক্তি-সঙ্গতই হোত এবং কেউ কেউ এমন ধারণা করতেও পারেন জীবনানন্দের জীবন সম্পর্কে দু একটা সূত্র অবলম্বন করে। কিন্তু যেহেতু জীবনানন্দের প্রামান্য জীবনী আমরা আজো পাই নি তাই এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া কোনোমতেই উচিত মনে করি না। আপাতদৃষ্টিতে এমন হয়ত মনে হয় তবু মাল্যবানের প্রতি পক্ষপাতিত্বের অভিযোগও সরাসরি আনা যায় না কেননা নিজের সম্পর্কে এবং নিজের অসহায়তার পক্ষে কৈফিয়ত দেবার চেষ্টা থাকলেও এদের পাশাপাশি প্রতি পর্বে নিজের ত্রুটি স্বীকারে তার নির্দ্বিধা ছিল। লেখক অন্যান্য চরিত্রের আচরণ স্পষ্ট করতে গিয়ে যেমন, মাল্যবানের ক্ষেত্রেও অনেক সময় রূপকাশ্রয়ে এমনভাবে প্রকাশ করেছেন যেন বাইরে থেকেই কেউ দেখছে ওকে, যা আত্মজীবনীমূলক উপন্যাসের ক্ষেত্রে ঘটে না। বিশ্লেষণ করতে গিয়েও মাল্যবান সর্বত্র নিজের সম্পর্কে নিস্পৃহতা বজায় রেখেছে। যৌনসর্বস্বতার জন্যে আত্মধিক্কার, স্ত্রীর প্রতি অধিকার স্থাপনে অক্ষমতার পক্ষে সমর্থকযুক্তি, নিজের ক্লীবতার অকপট স্বীকার, এসব যেমন সে করেছে, তেমনি আরো বড় পটভূমিতে নিজেকে নিয়ে গিয়ে এই অক্ষমতাকে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছে, ক্লীবতাকে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করেছে। একে পলায়নী মনোবৃত্তি বলা যায় আবার দার্শনিকতাও বলা যেতে পারে। এ বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্ত করা সম্ভব নয়। পৃথিবী তথা পারিপার্শ্বিক অসমঞ্জস হলে, নিজের অস্তিত্ব বিপন্ন বোধ হলে মানুষ মুক্তি খোঁজে তা পলায়নে হতে পারে, দার্শনিক প্রস্তাবে হতে পারে। কোনো দৃষ্টিভঙ্গি তে এই দুটো শব্দ ভিন্নার্থক, আবার কোনো দৃষ্টিভঙ্গিতে সমার্থক।

২.

সমস্ত পারিপার্শ্বিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মাল্যবান যখন উপস্থিত তাকে চিনে নিতে আমাদের সুবিধে হয় না। কবি জীবনানন্দের কাব্য যেন মূর্ত সেখানে—কাব্যের যে অংশে গাছপালা, ফুল, ফল, ইতিহাস চেতনা, মহাসময় নক্ষত্র ও সমুদ্রের বিস্তার এবং এদের সঙ্গে সমসূত্রে প্রথিত কাব্যমানসিকতা। কিন্তু যখনই সমাজ ও সংসারে এই মাল্যবান স্থাপিত হয়েছে তাকে দেখি বন্দী হয়ে আছে। প্রতি পদক্ষেপে প্রতিরোধ, বিস্তৃত হতে না পারা, বন্দী পাখির ঝটপটানিতে সে অসহায়, আন্তর ক্ষোভে উদ্গার হয়ে আছে যাবতীয় ক্লেদ—ক্লীবতা, অক্ষমতা, নীচতা, অন্য চরিত্র বিশ্লেষণের সূত্রে বিকৃত হয়ে যাওয়া, তারপরই মাল্যবান শান্ত হয়ে যায়, হয়ত বাধ্য হয় অক্ষমতার কারণে। শারীরিকভাবে না পারলেও মানসিকভাবে বিস্তৃত হতে চেষ্টা করে, হয়ত বিস্তৃতি পায় তবু নৈরাশ্যের ক্লেদ থাকে শরীরময়।

মাল্যবানের সংসারে আমরা এই রকম দেখি—'কেরানীবাবুর নিচের তলার ঘরটিতে

দুটো চেয়ার; একটাতে তিনি বসেন, আর একটাতেও তিনি নিজে বসেন।...বিছানায় ছারপোকা আছে—কিন্তু ঘুমের ব্যাঘাত ছারপোকার জন্যে নয়; এর চেয়ে ঢের বেশী আরশোলা ইঁদুর মশা পিসুর ঘাঁটিতে লম্বা নির্বিবাদ চৌকশ ঘুমে কত রাত কাটিয়ে দিয়েছে।...নোংরা হলদে কাগজের স্তূপ চারদিকে, জানালার ভেতর দিয়ে ক্রমাগত রাস্তার ধুলো, ধোঁয়া, অঝোর গোলপায়রার বাসা, মেঝের চারদিকে চুরুটের টুকরো থ্যাতলানো চুরুট তামাকপাতা ছাই দেশলাইয়ের কাঠি, পাখির পালক বিষ্ঠা, পুরনো বাতিল লণ্ঠনের টুকরো টাকরা, ভাঙা চিমনির কাচের রাশ; তেল, এ্যাসিড, ওষুধের নোংরা শিশি বোতলের জাঙ্গাল, হাঁড়িকুড়ি কলসি, বস্তা ও ঝুড়ি একগাদা, অষ্টদশজোড়া ছেঁড়া থ্যাবড়া প্যানেলা আর ক্যাম্বিসের জুতো, ময়লা জামা মশারির নুড়ি—আশ্চর্য দৈববলে কোনো শব্দ হচ্ছে না, কোনো কিছুকে নড়তেও দ্যাখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু সমস্ত ঘরের ভেতর সুটকি বুড়ি ডাইনি বুড়ি খুপী বুড়িদের কান্নাকাটি হামলা বলাৎকার চলছে যেন দিনরাত,... যারা যাওয়া আসা করে এ বাড়িতে...সটান দোতলায় উৎপলার কাছে চলে যায় প্রায় সকলেই তারা; মাল্যবান নিচের ঘরে বসে খবরের কাগজ পড়ছে, চুরুট টানছে, ...কেউ কেউ এ-ও জানে যে এ-মানুষটিকে এর স্ত্রী একেবারেই গ্রাহ্য করে না।...সে যে একজন প্রাণী নিচের ঘরে রয়েছে—এ বাড়িটাও যে তার সেটা কোনো কথা নয়—'

এই রকম বন্দী মাল্যবান, যদিও বাড়িটা তার, তারই টাকায় সংসার চলে, তবু অসহায়ের মতো মেনে নেয় দোতলার ঘরে উৎপলার একার অধিকার। অথচ দোতলার সেই ঘর মাল্যবানের মানসিকতায় প্রকৃত সামঞ্জস্য আনে, কেননা 'দোতলার ঘরটা একতলার ঘরের চেয়ে ঢের বড়ো—আলো বাতাস রৌদ্র নীল আকাশের আনাচ-কানাচ কিনারা, মূল আকাশেরো বড়ো নীলিমায় বেশ মুখোমুখি প্রকৃতির সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে; একতলার পাশেই প্রকাণ্ড ছাদের একটা আশ্চর্য প্রসৃতি রয়েছে, সিঁড়িটার দু'ধাপ মাত্র গেলেই একতলার সমস্ত ছাদটা আকাশ রোদ কলকাতার শহরটাই তোমার; যদি ভেবে নিতে পারো তাহলে পৃথিবীর নগর নাগরের ইতিহাস বারানবত বেবিলনও তোমার চোখে ফুটে উঠছে।' মাল্যবানকে এ-ও মেনে নিতে হয়, অন্য পুরুষেরা 'কি রকম অনিমেষ বিদ্যায় ওপরে চলে যাচ্ছে' উৎপলার কাছে অথচ নিজের স্ত্রীর কাছে তার বাসনা তিক্ত প্রতিহত ফিরে আসে বারবার ব্যর্থতায়। সব মিলিয়ে এক অসহায় ক্ষোভ তাকে চূড়ান্ত তিক্ত করে; তার মনে হয়, 'এই বারোটা বছর উৎপলার অনিচ্ছা অরুচির বঁইচি-কাটা চাঁদা-কাটা বেত-কাটার ঠাসবুনোনো জঙ্গলে নিজের কাজকামনাকে অন্ধ পাখির মতো নাকে দমে উড়িয়েছে' সে।

সমাজ সংসারে এই রকম বন্দী মাল্যবান, তার নাগালের ভেতরেই সবকিছু তবু যেন নাগালের বাইরে। যৌনকামনার প্রতি, শারীরিক ভোগ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি অসম্ভব লোলুপ এই মাল্যবানের কাছে একটি প্রসৃতি আশ্চর্য বোধ হয়, তাকে বিপুল বিস্তারে নিয়ে যেতে পারে। তার এই অসামর্থ্য, এই আশ্চর্য বিপরীত, মাল্যবান চরিত্রকে দুর্বোধ্য করে তুলেছে। বিভিন্ন পর্বে মাল্যবান নিজেকে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এই দুর্বোধ্যকে আরো জটিল করে তুলেছে মাত্র। কখনো দোষ দিয়েছে উৎপলার ব্যবহারকে, কখনো শিশ্নোদরতন্ত্রী সমাজকে, কখনো নিজের ক্লীবতাকে, আবার কখনো নিজের মহত্ত্বকে এর অবলম্বন করতে চেয়েছে। এইসব বিশ্লেষণ পাঠককে কখনো স্বস্তি দেয় না, জটিলতা বেড়েছে শুধু। সমস্ত উপন্যাস জুড়েই মাল্যবান তার অসঙ্গতার পক্ষে নানা ধারণা ও সিদ্ধান্তের কথা বলে গেছে কিন্তু পাঠক সেই সিদ্ধান্তের বা ধারণার অনুসারী হয়ে থাকতে পারে না। কী যেন একটা তবু

বাকি থেকেই যায়। শেষ পর্যন্ত চরিত্রটি রহস্যময় হয়ে যায় যখন মুক্তি খুঁজতে গিয়ে মাল্যবান সময়ের বিস্তার ঘটিয়ে দেয়—কুড়িটা বছর পার করে দেয় নিমেষে, এইসব রঙের গোলামরা যখন কেউ থাকবে না, এমন কি মনুও চলে যাবে বাপের বাড়ি, শুধু উৎপলা আর মাল্যবান, তাদের শারীর সম্পর্ক, যৌন সম্পর্ক। অক্ষমতা থেকে উত্তরণ চাইতে গিয়ে এটি যদি মাল্যবানের কল্পনার বিস্তার বলে ধরে নেওয়া যায় তবু উপন্যাসের শেষে স্বপ্নের ভেতরে যেখানে শুধু উৎপলা আর মাল্যবান, প্রার্থিত ঘনিষ্ঠতায় ওরা শীতের রাতে যা কোনোদিন ফুরোবে না এবং এরপর স্বপ্ন ভেঙে মাল্যবান যখন দ্যাখে উৎপলা ওকে টেবিলে ঘুমিয়ে পড়তে দেখেও মশারী ফেলে ঘুমোতে চলে গেছে, মাল্যবানের অবস্থা অলৌকিক হয়ে যায় তখন, তীব্র নয় কিন্তু মৃদু ক্ষোভে, নৈরাশ্যও নয়, দুঃখও নয়, আর যেন কিছু করার নেই, অতীত নেই, বর্তমান নেই, ভবিষ্যত নেই, এক অনির্বচনীয় বোধ সহসা পাঠকের বোধে সঞ্চারিত হয়ে মাল্যবান চরিত্রকে নির্বিশেষ রহস্যময় করে তোলে। উপন্যাসের শেষে এই আশ্চর্য ঘটনাটি লেখকের নিজস্ব শিল্প ব্যবস্থাতেই ঘটতে পেরেছে। এখানে সময় নিজের স্বাভাবিক মাত্রা বদলে দিয়ে রহস্যময় ভূমিকা নিয়েছে—মাল্যবানের সার্বিক দুঃখ বেদনা ও ব্যর্থতাকে যেন সেই মুহূর্তে কেন্দ্রীভূত করে দিয়ে, পাঠককে পূর্বাপর সমস্ত ঘটনা চরিত্র অতিক্রম করে শুধুমাত্র সেই বোধে তখন সঞ্চালিত করতে থাকে।

মাল্যবান চরিত্র কেন্দ্র বিন্দুতে স্থাপিত হলেও উপন্যাসটিকে আকর্ষণীয় দীপ্তি দান করেছে উৎপলা চরিত্র। তীব্র আকর্ষণে জর্জরিত অথবা ব্যর্থতায় ক্ষোভে উৎক্ষিপ্ত মাল্যবান তার বিচিত্রগামী বিশ্লেষণের মাধ্যমে চরিত্রটির এই আশ্চর্য রূপদান করেছে। উৎপলার তাই কখনো ভয়ঙ্কর রূপ, মাল্যবানের ঘৃণায় অসহিষ্ণুতার উৎক্ষিপ্ত, আবার কখনো আকর্ষণীয়, মাল্যবানের তীব্র কামনায় দীপ্ত। এমন স্বার্থপর বদমেজাজী, উন্নাসিক, নির্লজ্জ, বহু পুরুষে আসক্ত অথচ একই সঙ্গে রুচিশীল ও তীব্র আকর্ষণীয় স্ত্রী চরিত্র বাংলা উপন্যাসে এর আগে আমরা বিশেষ একটা পাইনি।

মাল্যবানের ভাবনায় উৎপলা দেখতে বেশ সুস্থ। রুচি ও বুদ্ধির ধার আছে। গান বাজনা নিয়ে থাকে, সেসব 'তার আলোর জিনিস।' উৎপলাকে কখনো মনে হয় শঙ্খিনী, কখনো চিত্রিণী, আবার কখনো বৃহন্নলা, সীতা সরমা দ্রৌপদী চিত্রসেনীর মতো অপরূপা অথচ তার বারো বছর দাম্পত্য জীবনের অভিজ্ঞতায় সব মিলিয়ে উৎপলার ব্যবহার তার কাছে এই রকম—কত যে সজারুর ধাষ্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদড়ের কাতরতা, বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল আর বাঘিনীর থাবা এই নারীটির। কিন্তু সে-থাবার সামনে হরিণ বা বনগোরু না হয়ে রায় বাঘের মতো রুখে দাঁড়ালে ময়ূরীর মতো উড়ে যায় ডাল থেকে ডালে অদৃশ্য লোকের ঘনপাতার ভেতর কোনো এক জাদুর জঙ্গলে এই মেয়েটি, না হলে ময়নার মতো পায়ের কাছে মরে পড়ে থাকে—হলুদ ঠ্যাং দুটো আকাশের দিকে।

তবু উৎপলাকে ঘুচিয়ে দিয়ে তার চলবার শক্তি নেই, মাল্যবান একথা স্বীকার করে। 'উৎপলার জীবনের বিতিকিচ্ছি নিষ্ফলতা, দেখে মাল্যবানের কখনো যেন করুণা হয়। কিন্তু নিষ্ফলতা কোথায় এবং কেন এ ব্যাপারটা কোথাও স্পষ্ট করেন নি, লেখক এবং মাল্যবান কেউ-ই। মাত্র এক জায়গায় যখন উৎপলার কাছে অমরেশের যাতায়াত নিয়ে মাল্যবান আপত্তি তুলেছে তখন উৎপলা যেন মাল্যবানকে উসকে দিতে, জেগে উঠবার জন্যে তার পৌরুষে আঘাত করার উদ্দেশ্যে বলল, 'ওকে এ বাড়িতে আসতে নিষেধ করে

দিতে পারবে তুমি?...তুমি না হয় ওপরে এসে কাল একটা বিহিত করে যেয়ো।' কিন্তু মাল্যবান সাড়া দিতে পারে না, উৎপলাকেই বিহিত করতে বলে। যেন ব্যর্থ উৎপলা বলে, কোনো ব্যবস্থা নেবার নেই। মাত্র এটুকু ইঙ্গিত সমস্ত উপন্যাসে আমরা পাই, উৎপলার অদ্ভুত আচরণের পক্ষে। উৎপলার এই প্রচ্ছন্ন অভিযোগের উত্তরে মাল্যবানের কৈফিয়ত অবশ্য আমরা এর পরেই পেয়ে যাই, যখন ভাবনায় সে স্বগতোক্তি করে,—'অন্ধকার রাতে পাঁচিল ডিঙিয়ে নিজের গাছেরও ফল চুরি করা বা কে চুরি করেছে তাকে ঠ্যাঙানো তার ধাতে নেই...'। কিন্তু উপন্যাসেরই অন্য জায়গায় যখন প্রশ্নের ভঙ্গিতেই মাল্যবান উৎপলাকে বলে, 'খুব ভালো শাঁখার ব্যবসায়ী ছিলাম আমি, তোমার হাতও ননীর মতো নরম ছিল, কিন্তু কোনো শাঁখাই পরাতে পারালাম না কেন?' উৎপলাকে এর উত্তরে কৈফিয়তের ভেতরে যেতে দেখি না, 'ওরকম গোপনীয়তার ছায়া মাড়াতে চাইল না সে।' উপন্যাসের আরো এক জায়গায় লেখক, মাল্যবান সম্পর্কে উৎপলার মনোভাব জানিয়েছেন, যা সবচেয়ে বেশী তীব্র, যেখানে উৎপলাকে ক্ষিপ্ত হয়ে বলে উঠতে দেখি, 'এক বেশ্যার সঙ্গেও যদি সমানভাগে তোমার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারতাম, তা হলে এতটা দম আটকে আসতে না আমার'—এতটাই একঘেয়ে এবং বিরক্ত উৎপলা, মাল্যবানের সঙ্গে তার সম্পর্কে, দায়িত্বে। অথচ এই কথাগুলির সূত্রে আছে কোনো ব্যাপারে উৎপলার স্বার্থ চরিতার্থতা না হওয়া। ফলে উৎপলার এই অতিমাত্রিক আচরণ পাঠককে মাল্যবানের প্রতিই সহানুভূতিশীল করে তোলে। প্রকৃতপক্ষে উৎপলাকে স্পষ্ট করে বোঝবার সামান্যই সুযোগ দিয়েছেন লেখক অথচ উৎপলার অদ্ভুত আচরণ, মাল্যবানের প্রতি পদক্ষেপে অপমানিত হওয়া এর প্রতিবাদে অক্ষমতা, ভেতরে ভেতরে তার গুমরে থাকা, এসব সত্ত্বেও তীব্র আকর্ষণ বোধে মাল্যবানের জর্জরিত থাকা—উৎপলা এবং তাদের দাম্পত্য জীবনের এই চিত্রই পাঠক মন আচ্ছন্ন করে। এইভাবে সামগ্রিকতায় উৎপলা চরিত্র দুর্বোধ্য, জটিল ও রহস্যময় হয়ে উঠেছে এবং এই কারণেই উৎপলা চরিত্রটি পাঠককে সবচেয়ে বেশী সচল রাখে, বিমূঢ় করে, আশ্চর্য করে এবং তাদের সংস্কারে আঘাত করে।

মাল্যবান ও উৎপলার পাশে মনু অর্থাৎ তাদের একমাত্র সন্তান মেয়ে একটি গৌণ চরিত্র বা মায়ের বিষম সম্পর্কের ভেতরে শুধু সাক্ষীর ভূমিকায় থেকেছে মেয়েটি। খাওয়ার টেবিলে অথবা চিড়িয়াখানায় সিনেমা হলে ওকে আমরা কেবলই ঘুমিয়ে পড়তে দেখি। উৎপলার মতে ও বাপের মতো মনের রোগের মানুষ। ওর প্রতি মাল্যবানের তীব্র আকর্ষণ আছে তা নয় তবু মমতা অনুভব করে ওর জন্যে, হয়ত নিজের ব্যর্থতার ভেতরে কোথাও ওর প্রতিফলন দেখতে পেয়ে। মাল্যবানের ভাবনায় মনু এই রকম স্পষ্ট হয়, 'রাজযোটকে যাদের বিয়ে হয়েছিল সেই বাপ-মা এই মেয়েটির কোনো কথা খেয়ালের ভেতর' আনে না।

উৎপলার মেজদা ও মেজবৌদি, তাদের সন্তানসহ একটি সুখী পরিবার। মাল্যবান উৎপলার বিষম দাম্পত্যজীবনের পাশাপাশি একটি সুষম দাম্পত্যজীবন কিছুদিনের জন্য স্থাপন করে পাঠকের প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করা সম্ভবত লেখকের লক্ষ্য ছিল। মেজদা মেজবৌদি চরিত্র হিসেবে উৎপলার মতোই আত্মপর। মাল্যবানের মেসে যাওয়ার ব্যাপারে ওদের তরফে কোনো অস্বস্তি লক্ষ্য করা যায়নি। মাল্যবানের নোংরা ঘর দেখে মেজবৌদি উৎপলাকে কোনো দোষারোপ তো করেই নি। বরং বলেছে, 'ঘরটাকে শালগ্রামটি মেসের কামরার মতোই করে রেখেছে দেখছি।' মাল্যবান লক্ষ্য করে, ওদের 'প্রত্যেক কথার

ভেতর দিয়েই যৌনসম্বন্ধের মিছরি মাখানো ভালবাসার মর্ম ফুটে উঠছে।' কিন্তু মাল্যবান উৎপলার দাম্পত্যজীবন নিয়ে ওদের কোনো কৌতূহল নেই, নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত। কিছু কিছু সংলাপের মধ্য দিয়ে ওদের সম্পর্কে মাল্যবানের মনোভাব অস্পষ্ট থাকে না এবং ওদের স্বার্থপর বলে ভেবে নিতে পাঠককে প্ররোচিত করে।

উৎপলার ঘরে যাতায়াত করে এমন অনেক পুরুষের উল্লেখ আছে কিন্তু মাত্র দুটো চরিত্রকে স্পষ্ট করা হয়েছে—শ্রীরঙ্গ ও অমরেশ। শ্রীরঙ্গ মেয়েলি স্বভাবের। মাল্যবানের সামনেই উৎপলার সঙ্গে ওর মেয়েলি রসিকতা যা উৎপলা বেশ উপভোগ করে এবং মাল্যবানকে তা বাধ্য হয়ে সহ্য করতে হয়। অমরেশ পুরুষালি হলেও চূড়ান্ত শিশ্নোদরপরায়ণ এবং উৎপলা ওর প্রতি একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠ। প্রতিদিন উৎপলার কাছে অমরেশ আসে, অনেক রাত পর্যন্ত থাকে, মাল্যবানের ঘরে কোনো অনুমতি ছাড়া সাইকেল রেখে যায়। মাঝরাতে এসে মাল্যবানের কাছে অনর্থক বিষয় নিয়ে একপেশে গল্প করে। মাল্যবানের মনে হয় 'কথা বলতে বলতে জিভে দাঁতে থুতু জমে যায়' যেন অমরেশের। ওর সম্পর্কে ধারণা হয়, 'যেন দুটো ঠ্যাঙের বদলে আটটা ঠ্যাঙ অমরেশের, মাকড়সার মতো, কেমন ল্যাং ল্যাং ল্যাং ল্যাং করছে সব সময়েই; কখনো গাঢ় সবুজ কখনো গাঢ় লাল মাকড়সানীদের দেখছে বলে—সমস্ত জীবন ধরে।' সম্পূর্ণই মাল্যবানের বিশ্লেষণে অমরেশের চরিত্র স্থাপন হলেও যে-কয়েকটি সংলাপ উপন্যাসে রাখা হয়েছে তাতে পাঠক মাল্যবানের সঙ্গেই সম্ভবত একমত হয়ে যাবেন। অমরেশকে আরো বিস্তৃত হবার সুযোগ লেখক দিতে চাননি এই উপন্যাসে।

৩.

উপন্যাসের বিষয় এই কয়েকটি চরিত্র স্থাপনের মধ্য দিয়ে গড়ে উঠেছে। ঘটনা অর্থে বা কাহিনী অর্থে আমরা যা বুঝি তেমন উল্লেখযোগ্য কিছু এখানে আমরা পাই না। কোনো চরিত্র পরিণতির দিকে এগোয় নি, এরা নানা প্রক্রিয়ায় উন্মোচিত হয়েছে মাত্র। জন্মদিনের রাত্রে স্ত্রী কন্যাকে চুপি চুপি দেখতে যাওয়া, সিনেমায় যাওয়া, চিড়িয়াখানায় বেড়ানো, উৎপলার মেজদা মেজবৌদির বেড়াতে আসা বা অমরেশ প্রসঙ্গ, এইসব ঘটনাগুলির চরিত্রদের হাত পা ছড়ানোর অবকাশ দিয়েছে মাত্র। ঘটনাগত কোনো সঙ্ঘাত নেই, যা কিছু সঙ্ঘাত চরিত্রদের মানসিক বৈষম্যের দরুণ, যে দ্বন্দ্বের ভেতর দিয়ে এরা কোনো সিদ্ধান্ত নয়, স্পষ্টতায় এসেছে মাত্র।

চরিত্রগুলি স্পষ্ট থেকে স্পষ্টতর করার জন্যে জীবনানন্দ একেবারেই নিজস্ব যে শিল্প পদ্ধতি ব্যবহার করেছেন অর্থাৎ উপন্যাসে যে ভাষা তিনি ব্যবহার করেছেন, উপন্যাস পাঠের প্রথম থেকেই এর অভিনবত্ব লক্ষ্য করার মতো। এর অনিবার্যতাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন। বিষয়ের প্রয়োজনে এর বিচিত্র স্তর বিশ্লেষণে এই ভাষা বিভিন্ন স্তরে সংগঠিত। প্রথম স্তরে দেখতে পাই একটি পদ্ধতি বা বিশেষ একটি ছক যা অবলম্বন করে উপন্যাসটি গড়ে উঠেছে। এর মাধ্যমে চরিত্রেরা পাঠকের কাছে ক্রমশ স্পষ্ট হয়েছে। এই পদ্ধতির রূপায়ণে ভাষার দ্বিতীয় স্তরে তিনি ব্যাপকভাবে অবলম্বন করেছেন অসংখ্য প্রতীক ও উপমা, যা বিষয়কে যেন একটি খোলসে মুড়ে রেখেছে। এই খোলস দেখে তির্যগে বিষয় গ্রহণ করতে হয় পাঠককে। ফলে এই উপন্যাস পাঠে পাঠককে নিজের অনুভবশৈলী ব্যবহার করতে হবে। ভাষা ব্যবহারের তৃতীয় স্তরে আছে আশ্চর্য নানা শব্দ ব্যবহার। এই

শব্দের উপন্যাসকে একই সঙ্গে তার দ্যুতিতে উজ্জ্বল এবং আপাত অর্থহীনতায় নিকষ করে তুলেছে। অথচ এই রুদ্ধতা থেকেও পাঠকের মুখ ফিরিয়ে নেবার উপায় নেই, এই শব্দেরা তাকে গভীরে যেতে প্ররোচিত করবে। উপন্যাসটির বহুপঠনে প্রবৃত্ত করবে।

প্রচলিত উপন্যাসে সাধারণত অনেক ঘটনার অবতারণা করা হয় এবং সেখানে নানা সংঘাতে চরিত্রের পরিণতি অথবা উন্মোচন ঘটানো হয়, কিন্তু এখানে চরিত্রগুলোর কোনো পরিণতি ঘটানো হয় নি। এদের দুর্বোধ্যতা, জটিলতা ও রহস্যময়তাই বিষয় এবং তা শেষ পর্যন্ত একই অবস্থায় থেকেছে। চরিত্রদের পারস্পরিক সংলাপ বিনিময়, মাল্যবানের আত্মবিশ্লেষণ ও স্মৃতিচারণ এসবের মধ্য দিয়ে চরিত্ররা স্পষ্ট হয়েছে। অন্য সব চরিত্রের মুখোমুখি মাল্যবান একা প্রতিযোগী যদিও কোনো কোনো ঘটনায় সংঘাত সৃষ্টি হবার সম্ভাবনা ছিল কিন্তু মাল্যবান কখনই সংঘাতের মধ্যে যেতে চায় নি, নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। সে শুধু তাঁর সংলাপে যা অনেক সময় প্রায় পরোক্ষ উচ্চারণের মতো এবং বিশ্লেষণে চরিত্রগুলিকে রূপদান করে গেছে। এই প্রবন্ধে চরিত্রদের ওপর আলোকপাত করতে গিয়েও জীবনানন্দের ভাষার সাহায্য নিতে হয়েছে, তাদের মুখের সংলাপ যা প্রায় দর্পণের মতো নিখুঁত প্রতিফলিত করে, তার উল্লেখ করতে হয়েছে। উদ্ধৃতিগুলি লক্ষ্য করলে বোঝা যাবে অন্য কোনোভাবে তাদের ঠিক পরিচয় দেওয়া অসম্ভব ছিল, একটাই অনিবার্য জীবনানন্দের ব্যবহৃত পদ্ধতিটি।

উপন্যাসের বিভিন্ন পর্বে একটি বিশেষ ছক অবলম্বন করে এই পদ্ধতির ব্যবহার হয়েছে। মাল্যবান চরিত্রের উপাদান প্রকৃতির বিপুল বিস্তার থেকে সংগ্রহ করা হলেও তার শারীরতৃষ্ণা প্রবল। সংসারে তার ব্যক্তিগত স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব, স্ত্রী সহযোগ থেকে বঞ্চিত অথচ তারই উপার্জনে স্ত্রীর বেশ স্বাচ্ছন্দ্য, সব অর্থেই। এসব তাকে মাঝে মাঝে পীড়িত করে, তখন বিদ্রোহের ভান করে স্ত্রীর কাছে চলে আসে দাবী জানাতে কিন্তু উৎপলা তাকে গ্রাহ্য করে না। এই অগ্রাহ্য করা মাল্যবানের প্রতি প্রায় আক্রমণের পর্যায়ে পড়ে কিন্তু এই আক্রমণ প্রতিরোধ করা বা দাবী আদায় করে নেবার কোন ক্ষমতা তার নেই। এই পরিস্থিতিতে তার অক্ষমতা, হেরে যাওয়া, অন্য উত্তরণে, অন্য বিস্তারে নিজেকে অতিক্রান্ত করে যেন স্বস্তি পেতে চায়। এই বিশেষ ছকটিই উপন্যাসের আগাগোড়া আমরা লক্ষ্য করি। জন্মদিনের রাত্রে উৎপলা মনুকে একবার দেখে নেবার, উৎপলার ঘরে একটু বসার ইচ্ছে উৎপলার কাছে যখন বিশ্রীভাবে প্রতিহত হলো, এ অবস্থা থেকে উত্তরণের চেষ্টায় অবশেষে সর্বজনীনতায় পৌঁছে বিষণ্ণ শ্লেষে হেসে উঠে মাল্যবান ভাবে, 'বাঙালী স্বামী স্ত্রীদের প্রেম ও যৌন জীবনে সুখ আছে শান্তি আছে শতকরা একশোজনেরই তো।' দোতলার ঘরের লাগাও বাথরুমে মাল্যবানকে স্নান করতে দেওয়া হয় না, নিচে খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে চৌবাচ্চার জলে স্নান করতে হয়। এ নিয়ে অনেক কথা কাটাকাটির পরও ব্যর্থ মাল্যবান নিজেকে স্বস্তিতে আনতে ভাবে, "পুরুষ মানুষ" হয়ে এসব মেয়েদের কাছে জীবনের বড়ো বড়ো হড়ামদড়াম কথা ছাড়া কোনো মিহি কথা বলতে যাওয়া ভুল।" তারপরই যেন আক্ষেপের সুর দোলা দেয়। 'খাওয়া দাওয়া শোয়া ঘুমানোর স্থূল স্বাদগুলোও সূক্ষ্ম হতে চেয়ে গোলমাল করে ফেলল।' 'পুরুষ মানুষ' শব্দটিকে উদ্ধৃতি চিহ্নের ভেতরে ব্যবহার করেছেন লেখক, এটাও তাৎপর্যপূর্ণ। এটি ব্যঙ্গাত্মক সন্দেহ নেই কিন্তু তা নিজের প্রতি কিংবা সেই সব লোক যারা হড়ামদড়াম কথা বলে তাদের প্রতি, এটা লেখক স্পষ্ট করেন নি, পাঠককেই তা অনুমান করে নিতে হয়। অন্য একদিন নিজের

ঘরটা গুছিয়ে দিতে বললে উৎপলা তার 'আতলস্পষ্ট বেকুবির দিকে তাকিয়ে কোনো কথাই বলল না' যখন, কোনো রকম গ্রাহ্য না করেই উৎপলা চলে গেলে মাল্যবানের মনে হতে থাকে, 'বড় বেশী আত্মপ্রেম হয়ে পড়েছে তো আমার; যেন একটি ব্যক্তি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই, যেন ব্যক্তি সমুদ্র নিয়ে যে মানুষের ও সময়ের ইতিহাস তৈরি হচ্ছে সেটা কিছু নয়।' উপন্যাসের শেষ দিকে অমরেশ প্রসঙ্গে উৎপলার কাছে প্রতিবাদ জানাতে গিয়ে মাল্যবান যখন একেবারেই নিরাশ হয়ে পড়ল, জীবনানন্দের ভাষা তখন যেন চূড়ান্ত অনির্বচনীয়তায় পৌঁছে যায়। স্বপ্ন, তারপরই স্বপ্নভঙ্গ। সে সময়ে নৈরাশ্য যেন মাল্যবানকে যথাসময়ে স্থাপিত করল যা প্রকাশ পেল একটি মাত্র হতাশ স্বগতোক্তিতে—উৎপলা 'বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়ে পড়ল;—কিন্তু মাল্যবানকে জাগিয়ে দেওয়াও উচিত মনে করল না?'

উপন্যাসে ব্যবহৃত ভাষায় দ্বিতীয় স্তরটি অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও অভূতপূর্ব। চরিত্রগুলির মনোভাব ও গতিপ্রকৃতি প্রকাশ করতে অনেক প্রতীক ও উপমার বিস্তার ঘটানো হয়েছে। এখানে ভূমিকা রেখেছে ইতিহাসের, রামায়ণ মহাভারতের অনেক চরিত্র, অসংখ্য পশুপাখি, প্রকৃতির ফুলফল। কোনো প্রকাশ সরাসরি ঘটানো হয় নি, তির্যগে, এদের আচরণের গতি-প্রকৃতির প্রতীকে চরিত্রের রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এই উপমা ও প্রতীক ব্যবহারের ভাষায় আপাত লঘুতা লক্ষ্য হলেও এর ভেতরের তিক্ততা পাঠকের বোধে যথাযথ সঞ্চারিত হয়।

এই ভাষা আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে মাল্যবান ও উৎপলার সংলাপ বিনিময়ে। স্বামী-স্ত্রীর এই রকম সংলাপ বিনিময়, যেন তারা স্বাভাবিক কথাবার্তা বলতে অভ্যস্তই নয়, তির্যগে, অন্য কোনো প্রতীকের মাধ্যমে কথা সেরে নিতে চায়, যেন খুব মজাই করতে চাইছে ওরা অথচ এর ভেতর দিয়েই ওদের মনোভাব যা খুবই তিক্ত প্রকাশ হয়ে পড়েছে।

এই ভাষার উদাহরণ দিতে গেলে এই স্বল্প পরিসরে সম্ভব নয়। এই চেষ্টারও কোনো মানে হয় না কেননা সমস্ত উপন্যাসটাই এই ভাষায় গঠিত। তবু দু একটা সূত্র দেয়া যেতে পারে। যেমন প্রতীক হিসেবে মাল্যবান শামকল পাখি বা ধনেশ পাখি, মনু শামকলের বাচ্চা। উৎপলার মেজদা সুখী মানুষ পদ্মার ইলিশের মতো, 'সূর্যের একটা ঝিলিক দেখলেই লাট খেয়ে পড়ে।' শ্রীরঙ্গ অমায়িক হলুদ পাখি, অমরেশ মাকড়সার মতো। মাল্যবানকে বিরক্তিতে, আকর্ষণে, অবহেলায় সমস্ত উপন্যাস জুড়ে ক্রমাগত উত্তেজিত করে একমাত্র উৎপলাই অসংখ্য প্রতীকে প্রতিবিম্বিত হয়েছে। পশুপাখির মনোভাব এবং তার স্বরূপ বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়। তবু মানুষের নানা আচরণ ওদের আচরণের সঙ্গে মিলে গেলে সাধারণত সেই ধরনের পশুপাখির চরিত্রে তাদের চিহ্নিত করি। এখানে চরিত্র চিহ্নিত করণে লেখক এর ব্যাপক প্রয়োগ করেছেন। মাল্যবান ভেতরে ভেতরে উত্তেজিত হয়ে উঠলেও প্রতিবাদ জানাতে অসমর্থ, এটা চমৎকার প্রকাশ করেছেন লেখক তাঁর ভাষায়—'মাল্যবান চিতাবাঘের মতো মুখ খিঁচোতে গিয়ে গৃহবলিভূতের মতো ক্লান্তক্লিষ্ট চোখে' অথবা 'আচ্ছন্ন সারস বকের মতো নিজের বুকের পালকে মুখ গুঁজে সমাধান খুঁজছিল মাল্যবান,' কিংবা 'মাল্যবান বেড়ালের থেকে চিতেবাঘ, চিতেবাঘ থেকে বেড়াল সত্তায় যাওয়া আসা করতে করতে বলল' ইত্যাদি।

মাল্যবান উৎপলার বহুপুরুষসঙ্গ প্রতিবাদ করতে না পারলেও পছন্দ করে না এবং উৎপলা মাল্যবানকেই সেজন্যে দায়ী করতে চায়, ভিন্ন সময়ে কয়েকটি সংলাপে

জীবনানন্দের ভাষা এইভাবে মূর্ত হয় :

মাল্যবান —'কত লোকজনের সোরগোল তোমার ঘরে দিনরাত। তুমি নরকে বসলেও আশেপাশে একশোটা নষ্টচন্দ্র।'

মাল্যবান—'হাতি হয়ে সত্যেন কলাগাছ খাবে, বলছিলে তো তুমি ; কামিনী হয়ে হাতিকেই খাবে তো তুমি। বাঃ, কেমন কামিনীর মতো পদ্মের ওপর দাঁড়িয়ে আছে উৎপলা।'

উৎপলা—'ধনেশ পাখি ঠোঁট কেলিয়ে বসে থাকবে—মাড়োয়ারী কবে তার তেল নিতে আসবে, সেই জন্যে—চন্দনা নিজের পাটে উড়ে যাবে।'

ভাষার তৃতীয় স্তরে যে আশ্চর্য শব্দ ব্যবহার, যা একই সঙ্গে উজ্জ্বল এবং নিকষ, তার প্রাথমিক রুদ্ধতা বস্তুত পাঠককে দ্রুতপঠনে বাধা দেয় কিন্তু ক্রমশ গভীর স্তরে যেতে প্ররোচিত করে। কোনো কোনো শব্দ সহসাই পাঠককে বিস্মিত করে দিয়ে যেন ক্যানভাসে বড় কোনো দৃশ্যের মুখোমুখি করে, কখনো বা বিস্তৃত ভাবনার সংহত রূপ হয়ে একটি শব্দে বা বাক্যে, যা প্রকাশ করতে অনেক শব্দ বন্ধের প্রয়োজন ছিল। যেমন 'এক এক সময় মনে হয়, অফিসের কাজ ছেড়ে নিজের জীবনটাকে সে কোনো মহৎ কাজের ফেনশীর্ষে নিয়ে ফেলুক', অথবা 'বিপ্লবের থেকে বিপ্লবে,—ফ্রান্স, স্পেন, রুশ, চীন, সমস্ত বিপ্লবের—ইয়ে—স্তনাগ্রচূড়ায় নতুন দুধের উল্লাসে', এই দুটি বাক্য। লেখকের আশ্চর্য নিয়ন্ত্রণ-ক্ষমতায় আমরা লক্ষ্য করি, 'ফেনশীর্ষে' 'স্তনাগ্রচূড়ায় নতুন দুধের উল্লাসে' এই শব্দ বন্ধে শব্দময়তা, ভাবনাময়তা কী আশ্চর্য ও দীর্ঘ ব্যাপকতা লাভ করে।

বসন্তবউরি ও শামকল এই পাখি দুটি আমরা অনেকেই হয়ত দেখি নি কিন্তু শব্দ দুটির উচ্চারণে, ধ্বনিতে পাঠকের মনে একটা ধারণা তৈরী করে যা চরিত্রগুলি সম্পর্কে বোধ জাগিয়ে তোলে। হয়ত বিভিন্ন মানসিকতায় পাঠকের মধ্যে ভিন্ন-ভিন্ন বোধ জন্মাবে তবু পাঠক নিজের মতো করে চরিত্রটির অনুবর্তী হতে পারে। কিছু শব্দ এমনও ব্যবহার হয়েছে যার অর্থ পাঠকের মধ্যে তৎক্ষণাৎ হয়ত বহন করে না কিন্তু ভাবিয়ে তোলে, বাক্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা বোধ জাগিয়ে দিতে থাকে, যেমন, 'ফলিকাত হয়ে শুয়ে', 'লবেজান আওয়াজ', 'মজন্তালি সরকার' 'পুরুষচিল তীক্ষ্ণ চোখে', 'বিলকি ছিলকি স্বপ্ন', এবং এই রকম আরো অনেক শব্দ নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। কিছু চলতি শব্দ বা প্রাথমিকভাবে অসঙ্গত মনে হতে পারে, যেমন 'দাঁত কেলিয়ে', 'ফিচেল', 'তড়পানিতে', 'লাট মারতে', 'হিসসো করে', 'হসকে গেছে চোখ না পাঁজলাতেই' ইত্যাদি কিন্তু তা সুপ্রযুক্ত কেননা বক্তার তখনকার মনোভাবই ঐ শব্দ ব্যবহারে প্ররোচিত করেছে।

এই বিস্তর ভাষার মধ্যেও বিভিন্ন স্রোতের সমাবেশ উল্লেখযোগ্য। এই ভাষা কখনো অবলম্বন করেছে প্রকৃতি চেতনাকে, কখনো সময় চেতনা কখনো ইতিহাসচেতনাকে। রূঢ় গদ্য যেমন আছে তেমনি প্রয়োজনে আছে কাব্যময় গদ্যও। মাল্যবান অসুস্থ হলে উৎপলা কিছুক্ষণ অনিচ্ছায় বসে থেকে 'মশা কামড়াচ্ছে' বলে চলে গেলে অসহায় মাল্যবানকে বিষণ্ণ কাব্যময়তা যেন আচ্ছন্ন করে, 'শেষরাতের একটা বসন্তবউরি পাখির মতো একরাশ নক্ষত্র ও অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আবার ঘুমিয়ে পড়বার আগে একটু চলকে উঠে হেসে জেগে উঠবার বেঁচে থাকবার ইচ্ছে অনিচ্ছেকে অতিক্রম করে কে যেন উৎক্রান্ত হয়ে গেল। সে কি উৎপলা?' উপন্যাসের শেষ দিকে উৎপলার কাছে চূড়ান্ত ব্যর্থ প্রতিহত মাল্যবান নিরুপায় স্বপ্নের ভেতরে চলে গিয়ে কাব্যময়তায় সম্পূর্ণ গ্রস্ত হয়ে যায়—'কোনোদিন শেষ হবে না রাতের....শীতের রাত ফুরুবে না কোনো দিন।'

উপন্যাসটি পড়ার পর প্রাথমিক এই প্রতীতি হয় যে ভাষা ব্যবহারের তীব্র প্রত্যক্ষতায় বিষয় কিছুটা পরোক্ষ দূরবর্তী হয়ে পড়ে, ফলে একবার পড়ে তার সম্যক উপলব্ধি হয় না। ভাষার প্রত্যক্ষতা দৃশ্যময় হলোও এর অনুধাবন বার-বার অনুবর্তনের দাবী করে। এই প্রবন্ধের লেখককে অন্তত কুড়ি একুশবার পড়তে হয়েছে তবু এর সম্পূর্ণ উপলব্ধি হয়েছে এমন দাবী করা যাচ্ছে না। উপমা ব্যবহারে, প্রতীকি ভাবনায় পাঠকের সামনে স্থাপিত হয় অন্য এক জগত যা একেবারেই কবি জীবনানন্দের নিজস্ব এবং পাঠককে সেই জগতে পৌঁছে বিষয় আবিষ্কার করে নিতে হবে। আপাত লঘু সংলাপ, বিচ্ছিন্ন ভাবনা সকল লক্ষ্য করে একজন দ্রুতগামী পাঠক দ্রুত পঠনের পর হয়ত হালকা মন্তব্যে একে গৌণ বলে সরিয়ে রাখতে পারেন কিন্তু এটি এমন এক উপন্যাস যা প্রকৃত পাঠকের গভীর অভিনিবেশ দাবী করে। সবচেয়ে আশ্চর্যের, প্রায় প্রতি মুহূর্তেই প্রতীক ও উপমা এসেছে অথচ কোথাও একঘেয়ে হয়ে ওঠে নি, এটা জীবনানন্দের বিশাল অভিজ্ঞতা ও গভীর বোধের সমন্বয়ের কথাই স্বীকার করে। তাঁর শিল্পশৈলী এতই শক্তিশালী যে পাঠককে তৎক্ষণাৎ তাঁর গড়ে তোলা সেই নিজস্ব জগতে পৌঁছে দিতে সক্ষম।

দুটি মুখ্য চরিত্র, মাল্যবান ও উৎপলা খুব যত্নে এখানে স্থাপিত। যখন শারীরি স্বাচ্ছন্দে ও যৌনকামনায় জর্জরিত, অথবা যখন প্রকৃতির ভেতরেই উৎপন্ন আর এক প্রকৃতি, যখন কূটভাবে অভ্যন্তরে উদ্ভাসিত অথচ সরলতায় তা প্রকাশিত কিংবা ক্লীবতায়, এবং যখন এই ক্ষুদ্রতা ব্যর্থতাকে অতিক্রম করে মহাপ্রকৃতি মহাসময়কে আহ্বান করে পৌঁছে যেতে চায় অন্যতর বোধে, এই সবের মধ্য দিয়েই মাল্যবান চরিত্রের সামগ্রিকতা আমরা পেয়ে যাই। যদিও কিছু একপেশে তবু উৎপলা চরিত্র এমন বৈচিত্র্যে ও তীব্রভাবে উপস্থাপিত পাঠককে মাঝে মাঝেই চমকে নড়ে বসতে হয়, মাল্যবানের মতো পাঠকও চরিত্রটির প্রতি কখনো বিরক্তি কখনো আকর্ষণ অনুভব করেন।

এটিকে আত্মজীবনীমূলক উপন্যাস বলা কেন সঙ্গত নয়, একথা আগেই বিস্তৃত করা হয়েছে। তবু এটা দৃষ্টি এড়ায় না যে মাল্যবানের মনোভাব সম্পর্কে লেখক যতটা ওয়াকিবহাল উৎপলা সম্পর্কে ততটা নয়। পাঠকের মনে হতেই পারে, উৎপলাকে সুযোগ দেয়া হয় নি, ওর নিজেরও কিছু বলার থাকতে পারতো। অবশ্য দু একবার উৎপলার মনোভাব প্রকাশ পায় নি তা নয়, মেজদার কাছেই আর একটা পলিসি করানোর কথা মাল্যবানকে বললে সেয়ানার মতো তার এড়িয়ে যাওয়া উৎপলা ধরতে পেরেছিল ঠিকই। আর এক জায়গায়, অমরেশ চলে যাবার পর ওপরে এসে ওর ঢিলেঢালা কাপড়ের প্রতি মাল্যবানের নজর পড়াতে 'মাজার কাপড় আঁট-সাঁট করে নিতে নিতে উৎপলার মনে হলো : মানুষটা তো ঘোরেল কম নয়, আমার দিকে নজর পড়েছে তার; কিন্তু আমি কি করেছি! আমি তো কিছু করি নি।' তবু এটা মাল্যবানের মনোভাব যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনায় এত সামান্য যে উৎপলাকে একপেশে করে স্থাপন করা হয়েছেই বলতে হবে। হয়ত মাল্যবান চরিত্রটির উন্মোচনের জন্যে জীবনানন্দের পরিকল্পনাই ছিল উৎপলা চরিত্রের ঐ রকম একপেশে ব্যবহার এবং পরিকল্পনা সার্থক হয় নি এটা বলা চলে না।

জীবনানন্দ দাশ মূলত একজন কবি। রবীন্দ্রনাথের পর তিনিই সেই কবি যে সম্পূর্ণ নিজস্ব একটি জগত যা অননুকরণীয়, পাঠকের কাছে উপস্থিত করেছেন। এটি যে জীবনানন্দেরই উপন্যাস এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না এই কারণে যে এখানেও তাঁর সেই জগত উপস্থিত। যে জগতে কখনো তিনি প্রকৃতির কাছাকাছি নিমজ্জমান যেন নগ্ন আর এক প্রকৃতি, আবার কখনো ধূসরতায় কুয়াশায় তার সামনে আচ্ছন্ন থাকে পৃথিবী। সেই জগতের উপস্থিতি সত্ত্বেও কিন্তু উপন্যাসটির ভাষাশৈলী অনেক বেশী তীব্র ও গদ্যময়। কার্যকারণের হদিস কখনো পায়নি মাল্যবান এবং এটা তার ভাষা ব্যবহারের পদ্ধতি যা প্রথম স্তরে বিধৃত হয়ে আছে। কোথাও কোথাও তিক্ত, কৌতুক ও অদ্ভুত রসের, এমন সমন্বয় ঘটেছে। বাংলা সাহিত্যে এর আগে অন্য কোনো উপন্যাসে পেয়েছি বলে মনে হয় না। এই সব কারণে উত্তরাধিকার বিহীন এই উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের উপন্যাসের ইতিহাসে অনন্য হয়েই সংযোজিত থাকবে। এটা যে পাঠকের হাতে তেমনভাবে পৌঁছতে পারল না আজো এবং সমালোচকরা যে এর মর্মার্থ গ্রহণে এখনো অক্ষম এটা তাদেরই দুর্ভাগ্য। ভবিষ্যতের পাঠক এই অনন্য উপন্যাসটির জন্যে জীবনানন্দের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে। যেহেতু উপন্যাসটি একটি অন্য জগতের নির্মাণ যা জীবনানন্দের একান্ত নিজস্ব, এই কারণে এর উত্তরাধিকার থেকেও পরবর্তীদের বঞ্চিত করে রাখবে।

এই উপন্যাস প্রসঙ্গে অনেক প্রশ্নই উঠতে পারে। যেমন মূল প্রশ্নটি, মাল্যবান যে ধরনের ক্লীব চরিত্রের তাতে উৎপলার মতো মেয়ের পক্ষে ঐরকম ব্যবহার অসঙ্গত নয় অথচ তাকে অন্যভাবে চিত্রিত করা হলো। আরো প্রশ্ন যেমন, উপন্যাসটি একঘেয়ে, তির্যগ, অবাস্তব, এবং অনর্থক কাব্যময়তায় ভারাক্রান্ত। এর উত্তর চরিত্র স্থাপনের বিশ্লেষণে ও ভাষা ব্যবহারের ত্রিস্তর বিশ্লেষণে আগেই দেওয়া হয়েছে। বরং যে দুটি প্রশ্ন আজো রহস্যময় হয়ে জড়িয়ে আছে তাঁর সৃষ্টিকর্মের সঙ্গে ; এক, কেন তাঁর কাব্যে আমরা দেখি একদিকে প্রকৃতির প্রতি নিগূঢ় একাত্মতা ও আকর্ষণ বোধ এবং আর একদিকে পৃথিবী সম্পর্কে ধূসর ও বিষণ্ণ বোধ; দুই, কাব্যে এমন সিদ্ধ কবি কী কারণে উপন্যাস তথা গদ্যের জগতে এলেন,—আমরা হয়ত এই 'মাল্যবান' উপন্যাসের মধ্যেই এর উত্তর পেয়ে যেতে পারি।

মাল্যবানের মৌলিক উপাদান যা প্রকৃতি ও মহাসময়ের যৌথ সমন্বয়ে গঠিত তাঁর নিখুঁত প্রতিফলন দেখি কাব্যের এক অংশে যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে কবির নিবিড় আত্মীয়তাবোধ। সেই মাল্যবানকে সমাজে সংসারে স্থাপন করতে গিয়ে বিবর্তিত হতে-হতে ব্যর্থতায় অসফলতায় তিনি পেলেন অন্য অভিজ্ঞতা। এই অভিজ্ঞতাই কাব্যের অন্য অংশে আমরা লক্ষ্য করি যেখানে পৃথিবী ক্লিষ্ট ধূসরতায় ক্ষোভে অন্যতর বোধে লিপ্ত হয়ে আছে। পৃথিবী তথা মানুষ সম্পর্কে তাঁর এই অভিজ্ঞতা, এর যা কিছু কারণই থাক, হয়ত কবিতার চেয়ে গদ্যে আরো তীক্ষ্ণ কঠিন ও তিক্ত গদ্যময় প্রকাশ চেয়েই এই 'মাল্যবান' উপন্যাস লেখার কথা ভেবেছিলেন। এইসব আমরা তাঁর কবিতা ও উপন্যাস পড়ে আন্দাজ করতে পারি মাত্র। জীবনানন্দ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্য আমরা খুবই কম জানি, যা এর একমাত্র নির্ভরযোগ্য যুক্তি হতে পারত।

জীবনানন্দের উপন্যাসে আঙ্গিক ঃ ছোট ও বড় সময়

সাধন চট্টোপাধ্যায়

'নিউস্ক্রিপ্ট' সংস্করণ-এর 'মাল্যবান' উপন্যাসটির ভূমিকায় অমলেন্দু বসু মহাশয় উল্লেখ করেছিলেন "মনে হয় না যে এই গল্প ও উপন্যাস পাঠের ভিত্তিতে কোনো সাহিত্যপ্রেমী এমন দাবী করবেন যে জীবনানন্দ গল্পকার ও উপন্যাস রচয়িতা হিসাবে ততই মহৎ ও অবিস্মরণীয়, যতটা কবি হিসাবে। তবুও মনে হয় যে জীবনানন্দের কাব্যপাঠে যাঁদের চিত্ত অনুরণিত হয়েছে—এমন পাঠক উভয় বাঙলায় হাজার হাজার—তাঁরা এই গল্প ও উপন্যাসকে জীবনানন্দর কথা-সাহিত্যিকে, তাঁর সম্পূর্ণ অমেয় সৃজনী কর্মের অচ্ছেদ্য অংশ বলেই গণ্য করবেন।"

উপরোক্ত মন্তব্যের পর প্রায় বিশ বছরের কালখণ্ড অতিক্রান্ত, 'মাল্যবান' ছাড়া 'জলপাইহাটি', 'কারুবাসনা' এবং 'সুতীর্থ'—আরও তিনটি উপন্যাসের মধ্য দিয়ে উভয় বাঙলার কিছু অনুরণিত চিত্তের পাঠক সুযোগ পেলেন ভিন্নমাত্রায়, গভীরতর বোধবৃত্তে প্রিয় কবিকে অনুভব করতে; তাঁর ভাবনা, রুচি ও ব্যক্তি মানুষের সামাজিক ও একান্ত আত্মময়তার দ্বন্দ্বমুখর সময়-কাল পর্যন্ত। লেখক আরও বিশ বা তিরিশ বছর অতিরিক্ত বেঁচে থাকলে এ সুযোগ ঘটত না বোধহয়; উনি আরও বহুকাল পাণ্ডুলিপি প্রখর পাহারার বাক্সবন্দী করে রাখতেন, সম্ভবত। এগুলো প্রকাশের প্রত্যয়লাভ কেন করেন নি লেখক? প্রশ্ন জাগে। কবি তাঁর সময় ও সম্পর্কের সমস্ত জটিলতা শুধু কাব্যের শরীরে ধারণ করিয়ে দেয়ার ভরসা না পেয়ে পদ্য পদ্যের বিভাজনসীমা ভেঙ্গে স্বতন্ত্র আঙ্গিক আবিষ্কার করেছিলেন, যা সম্পূর্ণ তাঁর আপন ঘরানার। ইতিপূর্বে কোন গদ্য শিল্পীর কলমে নতুন আঙ্গিকটির শরীর ও শরীরের মর্মবস্তু নিয়ে গল্প উপন্যাসের ফর্ম সৃষ্টি হয় নি। তাই কি জীবনানন্দ দ্বিধা বিজড়িত ছিলেন? বিশিষ্ট কবি-ব্যক্তিত্ব হয়েও গদ্য কর্মগুলোর প্রকাশ উদ্যোগ নেননি কেন তা হলে! আজ, তাঁর সময় পেরিয়ে প্রায় অর্ধশতক অতিক্রান্ত কালের মঞ্চে দাঁড়িয়ে, আমাদের মনে অনুমানের একটি ঝোঁক সৃষ্টি হয় যে দ্বিধার পেছনে কবির মনে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল কালানুবর্তিতা এবং বিশেষ ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট। অর্থাৎ চার-এর দশকের বাংলা সাহিত্যের মূল গদ্য স্রোতের বিশেষত্ব। উপরোক্ত দুটি কারণের জন্যই বোধহয় অমন সূক্ষ্ম ও সংবেদনশীল শিল্পী দ্বন্দ্বক্ষত অবস্থায় পাণ্ডুলিপি রেখেছিলেন পাঠক চক্ষুর অন্তরালে।

কালাতিপাত দুষ্টতা যেমন সৃষ্টিকে খাটো করে দেয়, কালাগ্রসরতার লক্ষণও সৃষ্টিকে তার আপন সময় থেকে নির্বাসিত করে দেয়। কেউ ছাপিয়েও নির্বাসিত থাকেন, কেউ প্রকাশনা করেই মহাকালের জন্য অপেক্ষা করেন, দ্বিধায়। জীবনানন্দ ব্যক্তিজীবনে খুবই নিরাপত্তাহীনতায় ভুগতেন; তাই আদৌ না ছাপিয়ে পাণ্ডুলিপি লুকিয়ে রেখেছিলেন মহাকালের ভরসায়।

পৃথিবীর মহৎ শিল্পী জীবন বিব্রত হয় ছোট ও বড় সময়ের দ্বন্দ্বমুখর সংঘাতে। ছোট সময় ক্রমশ পেছনে চলে গিয়ে বড় সময়ের মধ্যে হারিয়ে যাবে যখন, ছোট সময়ের ফসলগুলো লুপ্ত হবে! তাইতো লেখকরা টিকে থাকবার জন্য চেষ্টা করেন তাঁদের সৃষ্টিতে বড় সময়কে স্থান করে দেয়ার। অথচ ছোট সময়ের সূত্র ধরেই তো বড় সময়ে পৌঁছতে হয়। তাই, আপন সময়ের প্রতি লেখক কি ভাবে উদাসীন থাকবেন? রাষ্ট্র, ব্যক্তি, সমাজ ব্যক্তি—সম্পর্কের নানা সংঘাত নিয়েই তো ছোট ছোট সময়। সাহিত্যে তাদের আসতেই হবে। এদের বাদ দিয়ে বড় সময় আসবে কি ভাবে? আবার ঐ ছোট গণ্ডির অনুগামিতায়, বড় সময় অবহেলিত থাকলে, তাৎক্ষণিকতাব বেদনা। দুই সময়ের মধ্য দিয়েই বড় মাপের কবি-সাহিত্যিকদের অনায়াস গমন-নির্গমন দরকার।

রাষ্ট্রতন্ত্রের পীড়ন অনাচারে কোন জাতির জীবনে ছোট সময় যখন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে শিল্প-সাহিত্যকে কিছুটা দায় বহন করতে হয়। ঐতিহাসিক ভাবেই, সাহিত্যকে কিছুটা গাদাবোটের ভূমিকা পালন করতে হয়। চল্লিশের দশকে বাংলা সাহিত্য ছিল অনেকটা সেই ভূমিকায়। তখন দৈনন্দিন চাক্ষুষ বাস্তবতা ও সাহিত্য বাস্তবতার ব্যবধান বা ফারাক প্রায় ঘুচিয়েই ফেলতে হয়। আক্ষরিক অর্থেই সামাজিক জীবনের দর্পণ বনে যেতে হয় সাহিত্যকে। পাঁচ ইন্দ্রিয়ের লজিক দিয়েই সাহিত্য বাস্তবতার চোখ-কান-নাক তৈরি করতে হয়। নইলে, 'সমাজ সচেতন' হচ্ছে না যথেষ্ট—এমন সহজ ও তাৎক্ষণিক অপবাদ জুটবার সম্ভাবনা প্রবল। মানিক-তারাশঙ্কর-বিভূতি থেকে প্রেমেন্দ্র-অচিন্ত্য-বুদ্ধদেব, চল্লিশের সমস্ত প্রধান গদ্যকারদের কেউই ইতিহাসের দায়িত্ব এড়ান নি। ছোট সময়ের দর্পণ করেছেন সাহিত্যকে যথার্থ নিপুণতায়। এতে শিল্পের নৈপুণ্যে ঘাটতি পড়লেও ক্ষতি নেই। যুদ্ধ, মন্বন্তর, দাঙ্গা, আজাদির লড়াই এবং দেশ ভাগ--বাঙালির জীবনে চল্লিশের দশক গুরুত্বপূর্ণ। সেই পর্বের সাহিত্য এই সবগুলোই ধারণ করেছিল। করেছিল দৈনন্দিন বাস্তবতার লজিক মেনেই। বলছিল না, সেই সমস্ত সাহিত্য তাৎক্ষণিক। বরঞ্চ স্বর্ণযুগ বলেই তো জানি ঐ পর্বকে। পৃথিবীর সাহিত্যেও ক্ষুব্ধ সময়কে ধারণ করে উপন্যাস মহত্ত্বের দরজায় পৌঁছে গেছে। নইলে পাভেল, ডন-কসাক বা যুদ্ধ ও গৃহবিপ্লবেব কথা বড় সময়েও মিশে যায় কি ভাবে? হয়ত জীবনানন্দর কুণ্ঠা ছিল এখানেই। দৈনন্দিন বাস্তবতার লজিকে তার সাহিত্য-বাস্তবতার লজিক গ্রস্ত হয়নি। পারেন না কিছুতেই। অথচ বেঁচে থাকার পর্বে, ছোট সময়ের চাপ অবশ্য অনুভব করেছিলেন। নইলে কবিতার ফর্মকেই যথেষ্ট না ভেবে, নতুন আঙ্গিকের সন্ধান করলেন কেন? গদ্য ও কাব্যের পণ্ডিতিবিভাজন তুলে দিয়ে, উভয়ের এমন সহমর্মিতা বুনট করে তুললেন, যা ঐ ছোট সময়ের চাপ অনেক বেশি ও মজবুতভাবে ধাবণ করবে বলে, তাঁর ধারণা। কিন্তু পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার লজিক এবং সাহিত্যবাস্তবতার লজিক শুধু ভিন্নই রাখলেন এমন নয়, দুয়ের মধ্যে বহুতালিক এমন ব্যবধান গড়ে দিলেন, যার মধ্য দিয়ে কল্পনা, অনুভূতি ও সূক্ষ্ম বোধ ছাড়া মাটির বাস্তবকে নিছক পাঁচটি ইন্দ্রিয়ে অনুভব করা যাবে না। দ্বিধার দ্বিতীয় একটি কারণও ছিল, সম্ভবত। তৎকালীন মেজর লেখক, সমালোচক বা পাঠকবৃন্দ যে নন্দনতাত্ত্বিক দৃষ্টিতে শিল্পকর্মকে বিচার করতেন, তা ছিল সম্পূর্ণ পাশ্চাত্যের। এতে, সে যুগের কমিউনিস্ট বা কমিউনিস্ট বিরোধী লেখকদের মধ্যে, অন্য বিভেদ থাকলেও, অদ্ভুত সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। দুই গোষ্ঠীই বিতর্কের আয়ুধ হিসেবে পাশ্চাত্যের নন্দনতত্ত্ব ব্যবহার করতেন। অথচ, মধ্যযুগে চৈতন্যের প্রভাবে ও ইরানীয় বুদ্ধিবাদের মিশ্রণে যে নান্দনিকতা গড়ে উঠেছিল বাঙালিজাতিব আপন বৈশিষ্ট্যে—তা কিন্তু কিছুটা

ব্রাত্যই থেকে গেল। যে দুজন মেজর লেখক—(কালের দাপটে মেজর হয়ে উঠেছেন) আমাদের ঐতিহ্যময় নন্দনতত্ত্বের দৃষ্টি লালন করেছিলেন, ছোট সময়ের কলরোলে তখন ছিলেন অসম্ভব মাইনরটি। একজন পথের পাঁচালীর 'অপু', দ্বিতীয়ব্যক্তি জলপাইহাটির 'নিশীথ'।

'কারুবাসনা' 'মাল্যবান' বা 'সুতীর্থ' উপন্যাসের প্রধান আঙ্গিকী কৃতিত্ব চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহ। একে স্ট্রিম অব কনশাস্‌নেস আখ্যা দিয়ে বিচার করা যাবে না বা বলা যাবে না জয়েস ও ভার্জিনিয়া উলফের অনুকরণ দুষ্ট। ধূর্জটি প্রসাদের 'অন্তশীলা' বা গোপাল হালদারের 'একদা' সম্পর্কে সে-ইঙ্গিত কিছুটা করা যেতে পারে।

জীবনানন্দ হয়ত উপন্যাসের কিছু প্রতিষ্ঠিত সংজ্ঞা—প্লট কেন্দ্র করে—লঙঘন করে গেছেন, চরিত্রকে দাঁড় করিয়েছেন আইডিয়াবহনকারী প্রোফাইলে, তবু যে সুচারু ভঙ্গিতে কাব্যকে সম্প্রসারিত করতে করতে ভাবগত অনুষঙ্গের গুণগত রূপান্তর ঘটিয়েছেন—হয়ে উঠেছে সিন্থেটিক গদ্যকর্ম, তা সময়ের চাপ অনেক বেশি বেশি বহনক্ষম। এই মনস্তাত্ত্বিক প্রবাহে অনেক বেশি পরিমাণে শক্তি নিঃসারিত হচ্ছে। আজকাল যখন সাহিত্যের কোন বিশেষ ফর্ম—মূলত উপন্যাস—আপন সঞ্জার বাধা ভেঙেচুরে, কবিতা, সঙ্গীত, পেন্টিংস, ভাস্কর্য—সব কিছুর মর্ম-মজ্জা নিয়ে সমুদ্রোত্থিত নতুন দ্বীপের মত সাড়া জাগাচ্ছে, ভাবতে ভালো লাগে দেশজ নান্দনিকতায় লালিত জীবনানন্দ কি বিপুল পরিমাণে স্ব-কালযাত্রা থেকে এগিয়ে ছিলেন! তবুও, উপরোক্ত তিনটি উপন্যাসের সীমিতিও কম নয়। এ সীমিতি, লজিকের স্ববিরোধিতা। লেখক তাঁর সাহিত্যবাস্তবতাকে যে লজিকের ভূমিতে দাঁড় করিয়েছেন, সেখানেই মাঝে মাঝে সূত্র ছিন্ন হয়েছে। কিন্তু তীব্র অনুভূতি, ঐতিহ্যগত নান্দনিকবোধ উপন্যাসগুলিকে ভাবের একটি বিশেষ বিন্দুতে দাঁড় করিয়েছেন, যা থেকে জন্ম নেয় আইডিয়ার। তাই এগুলোকে কাব্যোপন্যাসও বলা যেতে পারে।

'জলপাইহাটি' একটি সার্থক উপন্যাস। যে কোন ভাষায় শ্লাঘার সম্পদ। এবং পাণ্ডুলিপির সময় থেকে (১৯৪৮) উপন্যাসটি ৫০ বছর এগিয়ে আছে। বিশেষত ফর্মে। সুতরাং কালাগ্রসরতায় আক্রান্ত হবার ভয় খুবই খাঁটি ও সত্য ছিল লেখকের কাছে। অফসেটে ছাপা, প্রায় ৪০০ পাতায় উপন্যাসটি (প্রতিক্ষণ পাবলিকেশন) চারটি অক্ষ ধরে আবর্তিত হয়েছে। মূলবিন্দু নিশীথ। একটি অক্ষ গেছে দাশগুপ্ত, নমিতা, বালিগঞ্জ, পার্ক সার্কাস ধরে কলকাতা ফুঁড়ে, দ্বিতীয়টি অর্চনা, হারিত, সুমনাকে গেঁথেছে, তৃতীয়টি জলপাইহাটির কলেজ কর্তৃপক্ষ। চতুর্থ অক্ষটি কিছুটা প্রচ্ছন্ন। এই অক্ষে নিশীথই মূলবিন্দু যদিও এবং রাণু, ভানু থেকে শুরু করে ভিন্ন ভিন্ন অক্ষের প্রায় সব চরিত্রই বর্তমান—তবু ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়জাত এই চতুর্থ অক্ষটি সম্পূর্ণ নৈর্ব্যক্তিক, এবং যে অক্ষ ধরে সংবেদনশীল পাঠক অতিসহজেই বড় সময়ে পৌছে যেতে পারেন। উপন্যাসের চতুর্থ মাত্রাটিকে লেখক সচেতন ভাবেই গড়ে তুলেছেন, বোধ হয়।

এ উপন্যাসে, দ্বিতীয় লক্ষণীয় যে, প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়, তিনটি তলে বিভক্ত কাহিনীকে যে লজিকে গেঁথেছেন লেখক, তাও চরিত্রগত ভাবে তিন প্রকারের। চাক্ষুষ বাস্তবের লজিক এখানে খাটবে না। সাহিত্যবাস্তবতার লজিকও তিনটি ভিন্ন মাত্রার। নমিতা-নিশীথ বা অর্চনা-নিশীথ কিংবা নিশীথ-কলেজ কর্তৃপক্ষ তিন কাহিনীতল ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বুনটলাভ করেছে লজিকের চরিত্র ভিন্নতায়। বাস্তবের কার্যকারণ বা সময়ের যা ভূমিকা—এখানে তা সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। অথচ এ কাহিনী মাটির পৃথিবীর নয় বলে উড়িয়ে

দিতে পারি না আমরা। গভীর ভাবে এই সমাজের কাহিনী, ছোট ছোট সময়কে ধারণ করে খুব বড় সময়ের মধ্যে যার শিকড় গ্রথিত।

আর আছে সমস্ত উপন্যাস জুড়ে বিভিন্ন সঙ্গীতের প্রয়োগ। শব্দ দিয়ে ছবি আঁকছেন; দেখতে-দেখতে ছবি অদৃশ্য, রূপান্তরিত হচ্ছে সঙ্গীতে এবং রণন দীর্ঘস্থায়ী বাজছে হৃদয়ের অতলান্ত কোন বিন্দুতে। "প্রকৃতিতে এসে পড়ত রৌদ্রের ফোয়ারা, নীল উজ্জ্বল চক্রবাল, আকাশে হরিয়াল, ফিঙে, বক, বড়-বড় সুন্দর ওয়াক পাখি, কলেজের ময়দান পেরিয়ে খানিকটা দূরে গেঁয়ো রাস্তা ঘেঁষে টি টি (ধূ ধূ নয়)। তেপান্তর, ঝিল, কানসোনা, মধুকূপী পরথুপি ঘাস, শরের বন, শনের হোগলার ক্ষেত, অপরিমেয় কাশ, হঠাৎ এক-আধটি নিখুঁত মুখসৌষ্ঠব, স্ত্রী লোকেরই, আরো দূরে বুনো হাসের জলা মাঠ, স্নাইপ, সকালের উড়িসুড়ি নিস্তব্ধতা তখন ভাল লাগত নিশীথের..."। এখানে শব্দগুলো দিয়ে জীবনানন্দ যে ছবি এঁকে তুললেন, তা রসঘন হল ছবি মুছে গিয়ে সৃষ্টির মধ্যে। শব্দগুলো কল্পবক্ষে ছবি তৈরি করেই যেন শরীরের নানা সূক্ষ্মবৃন্তে এমন সমমেল সৃষ্টি করতে থাকল, জন্ম নিল সঙ্গীতের। শ্রাব্য যে কোন রাগের চাইতে সহস্র গুণ ক্ষমতাসম্পন্ন।

আবার কলকাতায় নমিতা-নিশীথ অঙ্কে যখন তিনি ছবি ও সঙ্গীতের এমন পারস্পরিক উপরিপাত ঘটাচ্ছেন, সেই রাগ-রাগিনীর চরিত্র বা শব্দ ভিন্ন।

মধ্য রাতে নিশীথের ঘর দিয়ে, বন্ধুপত্নী নমিতা স্নানস্ত হেঁটে চলে গেল। এইটুকুই বাস্তব ছবি। জীবনানন্দ সাহিত্যবাস্তবতায়, কি ভাবে ছবি এঁকে সঙ্গীত সৃষ্টি করছেন লক্ষ্য করা যাক—

· "সমস্ত শরীরটাই জল; বাথরুমের থেকে নাইতে-নাইতে জলের ভিতর থেকেই উঠে এসেছে সে। গা মোছা তো দূরের কথা, তোয়ালেটা অব্দি নিংড়ে নেয় নি। একেবারে ভিজিয়ে তিতিয়ে এসেছে 'নিশীথের ঘরটাকে, নিশীথ যদি জেগে ওঠে —ভিজে ঘর-দোর, ভিজে বই-কাগজপত্র দেখে কোনো জলজিনী নারীর কথা ভাববে কি সে-ঢাকুরিয়া হ্রদ থেকে উঠে এসে রাতে হানা দিয়েছিল, নাকি ছাদ চুঁইয়ে বৃষ্টি পড়েছিল—জানালা দিয়ে জলদেয়াসিনী ঢুকেছিল ঘরের ভিতর পঁচিশটা জল পায়রা উড়িয়ে? এইসব মিলিয়ে যা হয়, নমিতা একাই সেই জল, জলপায়রা, জলদেয়াসিনী, জলবৃষ্টি, হ্রদের জল।"

দেহ, জল, জলের দাগ, ভিজে তোয়ালে সমস্ত ছবির কোলাজ ফোকাসচ্যুত হয়ে বেজে উঠল মনের গভীরে সঙ্গীত। মিয়া কি মল্লার নাকি মিয়া কি মল্লারের সঙ্গে রাগ বসন্ত-এর অদ্ভুত পাঞ্চ? অদ্ভুত পেলব ভুবনের মধ্য দিয়ে আমরা পৌঁছই, মস্ত বড় সময়ের মধ্যে।

তাই বলে 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে লেখক ছোট সময়ের দাবিকে কখনই খাটো ভাবে নথিভুক্ত করেন নি। চতুর্মাত্রিক কাহিনীর শরীরে,—দেয়ালে প্ল্যাস্টারের মত— ইতিহাস, সমাজ, দেশভাগ, লীগ, কম্যুনিস্ট, গান্ধী ইত্যাদি তথ্যগুলো বসিয়ে গেছেন। সেদিকে বিচার করলে, দেশভাগে বাঙালি জাতির ট্র্যাজেডির কিছু টুকরো ছবি—অথচ তীব্রতা নিয়ে—ফুটে উঠেছে জুলেখা, কিংবা অবনী জোয়ারদার বা হারিত, অর্চনা ও নিশীথবিহীন জলপাইহাটির মধ্যে। এখানে লেখক পারিপার্শ্বিক বাস্তবতার যুক্তিতেই বাক্য, শব্দ গড়ে তুলেছেন। "কিন্তু উনিশ শ আটত্রিশ উনচল্লিশ থেকে ইতিহাস যে-মোড় ধরেছে চল্লিশ-একচল্লিশ-বেয়াল্লিশ-তেতাল্লিশ-ছেচল্লিশে এসে কেমন যেন অস্বাভাবিক দ্রুততায় পুরনো পৃথিবীও স্বভাব শেষ করে দিল সব।"

সেদিনের মাস্টারদের না-ঘরকা, না-ঘাটকা বিপন্নতাকে নিয়ে রাজনৈতিক দলগুলোর উদাসীনতা সম্পর্কে নিশীথ বলছে "যারা ধর্মঘট চালিয়ে গরীব মানুষের খাওয়া-পরা-

মাইনের সুবিধা করে দিতে চায় তাদের নজর ফ্যাক্টরির মজুর, কিসানদের দিকে। খুব ভাল জিনিস। কিন্তু একজন ওস্তাদ বাবুর্চি বা মোটর ড্রাইভার যে টাকা পায়, ইউনিভার্সিটির একজন লেকচারার যদি তার চেয়ে কম পায়, তাহলে সাধারণ স্কুল কলেজের মাস্টাররা কী পায়, কী খায়, সেদিকে কি নজর পড়বে না মার্ক্সিস্ট বা কংগ্রেসী বিপ্লবীদের কিংবা, যেখানে বসেই হোক না কেন, দেশের মানুষের মঙ্গল চিন্তা যাঁরা করেন সেই সব তুচ্ছ অনুধ্যায়ীদের?

উপন্যাসের বিভিন্ন পর্যায়ে নিশীথ-নমিতা, নিশীথ-হারিত বা অধ্যাপক ঘোষ-নিশীথের বিতর্কের মধ্যে ফুটে উঠেছে মার্কসবাদ, কংগ্রেস, লীগ রাজনীতি থেকে শুরু করে আর্থ-সামাজিক বিভিন্ন প্রসঙ্গ। এমন কি উপন্যাসের মধ্যপর্বে, নিশীথ-এর কলেজে পড়ার চকিত আভাসে, কিছু ঐতিহাসিক দলিল—তথ্যও ফুটে উঠছে নানা প্রসঙ্গে। "সুরেন বাঁড়ুয্যে, বিপিন পাল, অ্যানি বেসান্ত, তিলক, গোখলের বক্তৃতা, পলিটিক্স, রবীন্দ্রনাথের আলো, আলোকত্তর হিরণ আনন্ত্য, সত্যেন দত্তের নিরবচ্ছিন্ন নিজের টাল সামলানো,...সন্ধ্যার সময়েই শোভনলাল ভটচাজের সঙ্গে বেরিয়ে পড়ত নিশীথ, তারাসুন্দরীর অভিনয় দেখবার জন্য। স্টারেই তো। বাংলার স্টেজে তখন গিরিশ ঘোষের আত্মাই কথা বলছে। শিশির ভাদুড়ী আসেন নি তখনো। সিনেমা বলে বিশেষ কোনো একটা জিনিসই ছিল না তখন। সিনেমা আজ থিয়েটারকে কোথায় যে ঠেসে রেখেছে।"

কলকাতার এই সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ছবি সম্ভবত বিংশ শতাব্দীর সূচনা বা প্রথম দশকে। কারণ দ্বিতীয় দশকের শুরু—শুরুতেই সত্যেন দত্ত প্রয়াত হচ্ছেন। যাই হোক, যে উপন্যাসের চারটি তলই আবর্তিত ঐ বড় সময়ের দিকে, সেখানে ছোট সময়কেও লেখক নানাভাবে চিত্রিত করেছেন, কখনও নিছক ডকুমেনটেশনের মধ্য দিয়ে।

সময়ের এতটা অগ্রবর্তী একটি আঙ্গিক কি ভাবে জীবনানন্দ ৪৮-এ সৃষ্টি করেছিলেন ভাবলে অবাক হতে হয়। আজ, সারা বিশ্বে, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায় মিথ, ফ্যান্টাসি, পরাবাস্তবতা স্বীকৃত এবং নন্দনীয় ফর্ম। নিছক বাস্তবতার ইন্দ্রিয়গ্রাহ্যতার শিকলমুক্ত হয়ে রুচি অন্য দিকে মুখ ফিরিয়েছে ইদানীং বাঙলাভাষার পাঠকদেরও। এর অর্থ নয় যে, এই সুযোগে কলাকৈবল্যবাদীরা বগল চাপড়াতে থাকবেন। সে গুড়ে বালি। ঐ পরাবাস্তবতা ফ্যান্টাসি বা বড় সময়ের মধ্যে থেকেও, দৈনিক বাস্তব মুছে যাবে না, যাবে না রাষ্ট্রতন্ত্র এবং মানবতন্ত্রের সংঘাত। তাহলে রুশদির ফ্যান্টাসি-কাহিনী এমন বেকায়দায় ফেলত না ধর্মের প্রাতিষ্ঠানিকতাকে।

পরিসমাপ্তির আগে একটি কথা বলা দরকার। উপন্যাসগুলোর আঙ্গিক ও বিষয়ের পরাম্পরায় ভিন্নতর হলেও সব ক'টি উপন্যাসের গুরুত্ব এইখানে যে জীবনানন্দের সমস্ত কাব্য-সৃষ্টির পরিপূরক। এগুলো পাঠের মধ্য দিয়ে লেখকের সময়, দর্শন ও ব্যক্তিত্ব স্পষ্টতর হয়ে ওঠে। 'কারুবাসনা'য় বনলতা সেন একটি চরিত্র। নায়কের বাড়ির সামনেই যারা থাকত। যে ছবি উপন্যাসের ঐ কাহিনীপর্বে উঠে এসেছে, রূপসী বাংলাকে উপলব্ধি করবার নতুন মাত্রা সৃষ্টি হয় তাতে। এটা তো পরম প্রাপ্তি। আশা করব, বাঙলার ভাবী ঔপন্যাসিকরা জীবনানন্দর কাছে গভীর ঋণে আবদ্ধ থাকবেন—বিশেষত আঙ্গিক ও শিল্পের সমস্ত ফর্মের সার্থক মহামিলনের জন্য।

জীবনানন্দ এবং তাঁর গল্প-উপন্যাস

সুমিতা চক্রবর্তী

বহু ভাষাশিল্পীকেই একাধিক সাহিত্য-রূপের মধ্যে নিজেকে বিস্তৃত করতে দেখা গেছে। কখনো তা বৈচিত্র্যের সন্ধানে, কখনো প্রকাশের আনন্দে, আবার কখনো গভীরতর কোনো আত্মবীক্ষণের তাড়নায়। জীবনানন্দও গল্প-উপন্যাস লিখেছিলেন কিন্তু প্রকাশ করেননি। খ্যাতির বহুল বিস্তার মৃত্যুর পরে ঘটলেও কবি হিসেবে তিনি যথেষ্ট পরিচিতি এবং সুনির্দিষ্ট একটি পাঠকগোষ্ঠী লাভ করেছিলেন জীবৎকালেই। তা সত্ত্বেও গদ্য-সাহিত্য লিখলেন কিন্তু পাঠকদের সামনে সেগুলি আনলেন না। কেন লিখলেন এবং কেন প্রকাশ করলেন না—এই দুটি প্রশ্ন সামনে রেখে শুরু করা যেতে পারে।

কবিপত্নী লাবণ্য দাশ এ-বিষয়ে কিছু তথ্য দিয়েছেন : 'কাব্য জগতে চলতে চলতে দুর্যোগের ঘনঘটা বহুবার তাঁর জীবনকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে—ঘনিয়ে এসেছে অন্ধকার। সেই অন্ধকারে দিশেহারা হয়ে তাঁর মনে হয়েছে হয়তো ভুল পথে চলেছেন—রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হয়ে কবিতায় তাঁর যে অন্বেষণ, তাতে নাম করা সহজসাধ্য নয়। তখনই তাঁর মন গল্প লেখার দিকে ঝুঁকে পড়েছে। কিন্তু বলতে শুনেছি, কবিতা যদি আমাকে পথের সন্ধান দিতে পারে তবে এগুলো সকলের দৃষ্টিপথের আড়ালেই বোধহয় থেকে যাবে। তাঁর এ মনোভাব বেশি করে উপলব্ধি করেছি দেশভাগের সময়—বরিশালের বাড়ির নিশ্চিন্ততায় ফাটল ধরল যখন।' (কবির গল্প, লাবণ্য দাশ, জীবনানন্দ দাশের গল্প, দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি, ১৯৫১)।

বিবৃতিটি কিছু প্রশ্ন জাগায়। প্রথমত, 'রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত' হয়ে 'কবিতার অন্বেষণে' 'নাম করা'র দিকেই কি লক্ষ্য ছিলো জীবনানন্দের? তাঁর কবিতা লেখা খ্যাতির প্রত্যাশায়? কবিতার আসরে যথেষ্ট খ্যাতিমান না হতে পারার আশঙ্কায় যশোলাভের জন্যই কি তাঁর গদ্যচারণা? দ্বিতীয়ত, কাব্যজগতে 'দুর্যোগের ঘনঘটা' কি হতে পারে? কবিতার ক্ষেত্রে তাঁর শত্রুতাসাধন করেছিলো কি কেউ? তাঁর জীবনীতথ্য এ ব্যাপারে বিমিশ্র উপকরণ সরবরাহ করে। একান্ত অভিনব ও যথেষ্ট দুরূহ কবিতা লিখতেন তিনি। কিন্তু প্রথম থেকেই বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্য ছিলেন তাঁর গুণগ্রাহী। কবিতা, পরিচয়, পূর্বাশা, চতুরঙ্গ, দেশ-এর মতো অভিজাত পত্রিকাগুলিতে নিয়মিত কবিতা প্রকাশিত হতো তাঁর। 'বনলতা সেন'-এর প্রকাশ যথেষ্ট খ্যাতি দিয়েছিলো তাঁকে। 'শনিবারের চিঠি-র দল অবশ্য নিজস্ব স্বভাবে তাঁকে প্রতিনিয়ত বিদ্রূপে বিদ্ধ করে গেছেন, কিন্তু সে তো তাঁরা বহুজনকেই করতেন। তা নিয়ে তিনি খুব বেশি বিচলিত ছিলেন বলে মনে হয় না। বাণী রায় জানিয়েছেন, জীবনানন্দ কৌতূহলের সঙ্গে শনিবারের চিঠি পড়তেন। (নিঃসঙ্গ বিহঙ্গ, বাণী রায়, ১৯৫৮।) যদিও তাঁর শেষের দিকের কবিতার রসগ্রহণে কুণ্ঠিত ছিলেন বুদ্ধদেব বসু, সঞ্জয় ভট্টাচার্যের মতে শেষের দিকেই তাঁর কবিতা লাভ করেছিলো প্রাজ্ঞ পরিণতি।

তবুও কিন্তু নিজের কবিতার স্থায়িত্ব ও পাঠকচিত্তে তা গৃহীত হবার সম্ভাবনা সম্পর্কে তাঁর সংশয় ছিলো, যেহেতু তাঁর স্বভাবেই ছিলো একটি গভীর-প্রোথিত দ্বিধাময়তা। তাঁর প্রবন্ধ ও পত্রাবলীর নানা জায়গায় এই সংশয়ের প্রকাশ আছে। কাজেই 'দুর্যোগের ঘনঘটা' বলতে কবি হিসেবে প্রতিষ্ঠ হওয়া বিষয়ে তাঁর হতাশাবোধ বোঝাতেও পারে। এবং অবশ্যই তার সঙ্গে যুক্ত ছিলো আর্থিক অনটনের চাপ। চিরকালই তাঁকে পীড়িত করেছে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যের অভাব। বেসরকারি কলেজে শিক্ষকতার পারিশ্রমিক ছিলো খুবই কম। তার ওপর কোথাও স্থায়ী হতে পারতেন না। শিক্ষকতার আনুষঙ্গিক যে কাজগুলি টাকা এনে দেয়—ছাত্র পড়ানো, নোট লেখা—তাতেও ছিলেন অপারগ। লিখতেন কিন্তু সে লেখায় ব্যবসায়িক সাফল্য ছিলো না। টাকা উপার্জনের জন্য ব্যবসা করতে নেমেছিলেন, এজেন্সি নিয়েছিলেন লাইফ্ ইন্‌সিওরেন্সের। দুটিতেই ব্যর্থ হয়েছিলেন বলাবাহুল্য। তাঁর চরিত্রই এসব কাজের অনুপযুক্ত ছিলো। আর্থিক অসাচ্ছল্যের কারণে নিজের সংসারেও মানসিক পীড়ন সহ্য করতে হতো তাঁকে। এই অবস্থায় সমকালের উপন্যাস-লেখকদের খ্যাতি ও অর্থপ্রাপ্তি দেখে কখনো তাঁর উপন্যাস লেখার কথা মনে হয়েছে। বন্ধু ও পূর্বাশা-সম্পাদক সঞ্জয় ভট্টাচার্যকে একবার টাকা চেয়ে লিখেছেন ঃ 'আপনার এই টাকা আমি কবিতা গল্প অথবা উপন্যাস লিখে শোধ করে দেব। একটি উপন্যাস লিখব ঠিক করেছি। জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী, সংকলক দীপেনকুমার রায়, ১৯৫১, পৃ. ৩২।) ১৯৪৬-এ লেখা এই চিঠির পরে ১৯৫০-এ জীবনানন্দ তাঁকে আবার লিখেছেন ঃ 'এক্ষুনি চার পাঁচশো টাকা দরকার, দয়া করে ব্যবস্থা করুন।....আমার একটি উপন্যাস (আমার নিজের নামে নয় ছদ্মনামে) পূর্বাশায় ছাপতে পারেন।' (কবি জীবনানন্দ, গদ্যরচনার ভূমিকা, প্রভাতকুমার দাস, মাঝি, অগাস্ট ১৯৫১, পৃ. ৩১।) কাজেই 'দুর্যোগের ঘনঘটা' বলতে আর্থিক দারিদ্র্যও বোঝাতে পারে। কিন্তু জীবনানন্দের মতো একজন আপোষহীন শিল্পী—মনোরঞ্জন নয়, নিজেকে জানা আর ব্যক্ত করার তাগিদে যাঁর সৃষ্টি—শুধুই খ্যাতিলাভ বা অর্থিক সাফল্যের কথা মনে রেখে তিনি গল্প-উপন্যাস লিখবেন—একথা সর্বাঙ্গ সত্য হতে পারে না। বরং তাঁরই একটি অন্য উক্তি মনে পড়ে ঃ 'ছেলেবেলা থেকেই গল্প উপন্যাস—স্বদেশী ও বিদেশী—নেহাৎ কম পড়িনি। ঔপন্যাসিক হবার ইচ্ছা ছিল, এখনও তা ঘোচেনি।' (জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী, সংকলক দীপেনকুমার রায়, ১৯৭৮, পৃ. ২৪।)

কবিতা রচনা শুরু করার বছর পাঁচেকের মধ্যেই তিনি গদ্যরচনায় হাত দিয়েছিলেন। ১৯৩১-৩২ থেকেই পত্র-পত্রিকায় তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে শুরু করে—সেগুলি প্রকাশ করতে তাঁর দ্বিধা ছিলো না। কিন্তু প্রথম ছোটগল্পটি লিখতে শুরু করেন ১৯৩১ সাল নাগাদ, ১৯৩৬-৩৭-এর মধ্যে বেশ কয়েকটি গল্প লিখেও কোনো দিনই প্রকাশ করলেন না। গল্প লেখার পাট শেষই করে দিলেন একরকম। এই সময়ের মধ্যে কিছু উপন্যাসেরও খসড়া করেছিলেন। আবার উপন্যাসে হাত দিলেন এক দশক পরে। তখন ভারত সবেমাত্র স্বাধীন, বাংলা বিভক্ত, বরিশাল বিদেশ। কলকাতায় ভাড়া বাড়ি, মনোমতো থাকার জায়গা নেই। চাকরিও নেই। চারিদিক থেকে চেপে ধরছে অর্থকষ্ট। তার মধ্যেই দ্রুত লিখে ফেললেন তিনটি উপন্যাস—কিন্তু সেগুলিও প্রকাশ করলেন না। সম্পাদকেরা কি ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর লেখা? সঞ্জয় ভট্টাচার্য, অজিত দত্তকে উপন্যাসের কথা বললেও সত্যিই যে তিনি তাঁদের হাতে উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পৌঁছে দিয়েছিলেন—এমন প্রমাণ নেই। ১৯৫০-এর পর কলকাতায় কিছুটা স্থিত হয়েছিলেন তিনি। তখন চেষ্টা করলে 'বনলতা

সেন'-এর কবি উপন্যাস প্রকাশের কোনো পথ পেতেন না—একথা মেনে নেওয়া একটু শক্ত। তেমনভাবে চেষ্টাই করেননি। একটা কারণ নিশ্চয়ই এই—সময়াভাবে লেখাগুলির যথাযোগ্য পরিমার্জনা করতে পারেননি; দ্বিতীয় কারণ—মনে হয়, সেই দ্বিধা। কবিতা বিষয়েই যখন তাঁর সংশয় সম্পূর্ণ কাটেনি তখন গল্প-উপন্যাসে প্রতিষ্ঠা পাবেন কিনা—এ ভাবনা তাঁকে অগ্রিম চিন্তিত করে থাকবে। কারণ প্রতিবাদ কখনো না করলেও, সমালোচনায় ও বিদ্রূপে তিনি আহত হতেন, গুটিয়ে যেতেন নিজের মধ্যে—একথা তাঁর সম্পর্কে বহুজনেই বলেছেন। এই দুটি কারণই যথার্থ কিন্তু হয়তো আংশিক। গভীরতর আরো একটি কারণের অস্তিত্ব অনুমান করতে পারি আমরা লাবণ্য দাশের ঐ বিবৃতির একটি বাক্যে : 'কিন্তু বলতে শুনেছি কবিতা যদি আমাকে পথের সন্ধান দিতে পারে তবে এগুলো সকলের দৃষ্টিপথের আড়ালেই বোধহয় থেকে যাবে।' কী সেই পথ? সে কি যশের অথবা অর্থাগমের? বোধহয় না। আমাদের অনুভূতি আমাদের বলে দেয়, নতুন যুগের ভিন্নতর উপলব্ধি প্রকাশের পথ খুঁজছিলেন জীবনানন্দ। যুদ্ধোত্তর সভ্যতার স্বরূপ বুঝে নেওয়া এই সাহিত্যিক নিজের কাল, সমাজ ও মানবাত্মাকে যেমন জেনেছিলেন তেমনি জানাতে চাইছিলেন। অতীব জটিল ছিলো সেই আত্মবোধের জগৎ। কঠিন থেকে কঠিনতর জীবনজিজ্ঞাসা বৃত্তের পর বৃত্তে ঘিরে ফেলেছিলো তাঁকে। প্রাথমিক স্তরে ব্যক্তিসত্তার যন্ত্রণা—একটু স্বস্তিতে বাঁচতে হবে, লেখার জন্য নিভৃত একটি ঘর চাই, স্বাদ নিতে হবে বিশ্বসাহিত্যের—তার সময় চাই; এদিকে টাকার দরকার—সংসারের দাবি আছে, আছে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার প্রয়োজন মিটিয়ে দেবার দায়িত্ব—তার ওপর আছে এই পৃথিবীকে শরীরের প্রতিটি কোষ, মনের প্রতিটি বিন্দু দিয়ে ভোগ করবার সাধ। এই শেষের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। জীবনানন্দের মধ্যে ভোগবাসনার একটি তীব্রতা ছিলো মনে হয়—যা তাঁর জীবনে পূর্ণ তৃপ্ত হতে পারেনি। সেই ভোগবাসনা টাকার বিনিময়ে পাওয়া সম্পদের জন্য নয়; কিন্তু শান্ত অবসর, ভিড়বর্জিত প্রিয়সঙ্গ, প্রকৃতির ইন্দ্রিয়স্পর্শী নৈকট্য এবং সবরকম শরীরী অনুভবের রম্যতার জন্য তৃষ্ণার্ত ছিলেন তিনি। এই চাওয়ার কষ্ট ও ঠিকমতো না-পাওয়ার কষ্টে তিনি ব্যথিত ও বিমর্ষ ছিলেন—তাঁর উপন্যাসের আলোচনা একথা হয়তো প্রমাণ করবে।

দ্বিতীয় স্তরে দেশের রাজনৈতিক সমস্যা ও সমাজ-সংকট তাঁকে চেতনার মূল পর্যন্ত বিচলিত করেছিলো। দেশবিভাগ, সাম্প্রদায়িক জটিলতা, রাজনৈতিক দলগুলির কার্যাবলী, দারিদ্র্য ও বেকার সমস্যা, সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থান ও সংঘাত, অর্থনৈতিক বৈষম্য, শিক্ষাপদ্ধতির অব্যবস্থা, রক্ষণশীলতা ও প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব—এসব নিয়েই তিনি চিন্তিত, বিচলিত ও বিপর্যস্ত ছিলেন। 'বনলতা সেন', 'রূপসী বাংলা'র নিরিখে তাঁকে সমাজ-জীবন থেকে সরে থাকা নির্জনতার কবি মনে করেছেন—এমন সমালোচক অজস্র। প্রতিনিধি হিসেবে কবি মণীন্দ্র রায়কে বেছে নেওয়া যাক। 'স্বদেশ ও স্ব-সমাজের যে ঘটনাবলীর প্লাবন নজরুল কিংবা প্রেমেন্দ্র মিত্রকে ঢেউয়ের চূড়ায় টেনে নেয় তারই প্রভাবে হয়তো জীবনানন্দ পান ঢেউ গুনে সময় কাটাবার কর্মবিমুখতা।' (কবি জীবনানন্দ দাশ, মণীন্দ্র রায়, জীবনানন্দ স্মৃতি, দেবকুমার বসু সম্পাদিত, করুণা প্রকাশনী, ১৯৫১।) কিন্তু 'আমরা গড়িব নূতন করিয়া ধুলায় তাজমহল' জাতীয় উচ্ছ্বসিত উক্তি না করলেও—'সাতটি তারার তিমির' ও 'বেলা অবেলা কালবেলা'র কবিতাগুলিতে জীবনানন্দের যে আত্মপ্রকাশ ঘটেছিলো তাকে 'কর্মবিমুখতা' বলা সম্ভবত অনুচিত। সাহিত্যসৃষ্টিই লেখকের কাজ। তাঁর কবিতায় জীবনের 'ক্ষুধা, প্রেম, আগুনের সেঁক' আর 'হাঙরের ঢেউয়ে' মথিত হবার চিহ্ন

এতই স্পষ্ট যে তিনি ঢেউ গুনে সময় কাটিয়েছিলেন বলাটা কিছু একদেশদর্শিতার মতো লাগে।*

স্বকাল ও স্বসমাজের সঙ্গে ব্যক্তিত্বের অবিরাম সংঘাতের এই আবর্ত থেকে বেঁচে থাকার যে দর্শনটি তিনি গড়ে তুলতে চাইছিলেন তা কবিতায় প্রকাশ করা সহজ ছিলো না। বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের বিশ্বাসের পৃথিবী এত মোহন মহিমায় তাঁর অজস্র রচনায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে যাবার পর। আর সত্যিই আস্তিক বিশ্বাসের একটি জগৎ ছাড়া স্রষ্টা হয়ে ওঠাও একান্তই কঠিন। আধুনিক কবিদের জগৎ থেকে সৌন্দর্য, প্রেম, মানবিকতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস—কোনোটিই তেমন দূরবর্তী নয়। সংশয় ও নৈরাশ্যকে অবলম্বন করে পৃথিবীতে যে ক'জন শিল্পী হয়ে উঠতে পেরেছেন জীবনানন্দ তাঁদের মধ্যে প্রধান একজন। সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে কবিতায় একটি জগৎ সৃষ্টি করতে চাইছিলেন জীবনানন্দ—তাকেই লাবণ্য দাশ বলেছেন—'রবীন্দ্র-প্রভাবমুক্ত হয়ে কবিতায় তাঁর যে অন্বেষণ।' তারপর লাবণ্য দাশের উক্তি অনুসারে জীবনানন্দ ভেবেছিলেন—সেই প্রচেষ্টায় 'নাম করা হয়তো সহজসাধ্য নয়'। এখানে 'নাম করা' শব্দ দুটি হয়তো ঠিক সুপ্রযুক্ত হয়নি। খ্যাতির কথা নয়, জীবনানন্দ আসলে ভেবেছিলেন—রবীন্দ্র-প্রতিষ্ঠিত এই প্রত্যয়-উজ্জ্বল জগৎ-বিশ্বাসের বিপরীত অনুভবকে কবিতায় কি ঠিকমতো প্রকাশ করা যাবে? ভেবেছিলেন, কবিতায় না পারলে চেষ্টা করবেন গদ্যে—কারণ বলার কথাটা বলে যেতেই হবে—এই রহস্যময় আত্মতাড়না থেকে প্রতিভার পরিত্রাণ নেই। তাই বেশি করে গদ্য লেখার মানসিক চাপ অনুভব করেছিলেন দেশভাগের সময়ে। প্রাণের আকাঙ্ক্ষা আর পরিবেশের বিরূপতা সেই সময়েই তীব্রভাবে মুখোমুখি। ১৯৪৮-এ তিনটি উপন্যাস অস্থিরভাবে দ্রুত লিখে ফেললেন তিনি। কিন্তু তারপর হয়তো কবিতাতেই ক্রমশ নিজেকে প্রকাশ করতে পারছেন বলে মনে হয়েছিলো তাঁর। 'সাতটি তারার তিমির'-এর প্রথম প্রকাশ ১৯৪৮-এ। ১৯২৮ থেকে ১৯৪৩ পর্যন্ত লেখা অনেক কবিতাই শেষ পর্যন্ত গ্রন্থভুক্ত হলো ১৯৪৮-এ প্রথম। 'বেলা অবেলা কালবেলা' কবির জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি কিন্তু তার কবিতাগুলিও ১৯৪৪-এর মধ্যেই লেখা। আর তাঁর সর্বশেষ প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ 'আলো পৃথিবী'তে একেবারে ১৯৫৪ পর্যন্ত রচিত কবিতাই স্থান পেয়েছে, যদিও সব নয়। আমরা জানি 'বনলতা সেন'-এর কাল থেকেই তাঁর কবিতার চরিত্র বদলে গিয়েছিলো। তখন থেকেই কবিতায় তিনি মানুষের পৃথিবীর ও মানুষের জীবনের একটি অন্য চেহারা ধরবার চেষ্টা করে আসছিলেন। সেই চেষ্টা প্রায় দুই দশক ধরেই গদ্যে ও কবিতায় বিস্তৃত হয়েছিলো। ১৯৪৮-এ উপন্যাসে তিনটি লেখার বছরে গদ্যকেই আঁকড়ে ধরেছিলেন বেশি। কিন্তু তারপর সম্ভবত তাঁর মনে হলো—বলার কথাটা কবিতাতেই বলা যাচ্ছে। লাবণ্য দাশকে বলেছিলেন—'কবিতা যদি আমাকে পথের সন্ধান দিতে পারে তবে এগুলো সকলের দৃষ্টিপথের আড়ালেই বোধহয় থেকে যাবে।'—তাই হলো। কবিতাকেই প্রকাশ মাধ্যম হিসেবে বেছে নিলেন। গদ্যরচনাগুলিকে আর মার্জনা করলেন না, প্রকাশের চেষ্টাও করলেন না।

তাঁর সময়াভাব, অর্থাভাব, দ্বিধা—কোনোটিই তাঁর উপন্যাস প্রকাশের প্রধান বাধা বলে মনে হয় না। বারো বছর ধরে পরিমার্জনার সময় পাননি—একথা পুরোটা মেনে

, নেওয়া যায় না। উপন্যাস প্রকাশে অর্থাভাবের কিছু সমাধান হতেও পারতো। প্রতিষ্ঠা বিষয়ে খুব আত্মবিশ্বাসী না হলেও কবিতা প্রকাশে কখনো দ্বিধা করেননি তিনি, প্রবন্ধ প্রকাশে ছিলেন দ্বিধাহীন। শুধু গল্প-উপন্যাসের ক্ষেত্রেই তাঁর দ্বিধা প্রবল হলো কেন? মনে হয়—যে নতুন কথাটি তিনি গদ্যে বলবার চেষ্টা করছিলেন তা কবিতায় আরো সঠিকভাবে বলতে পেরেছেন মনে করেই তিনি বিরত রইলেন গল্প ও উপন্যাসের প্রকাশ বিষয়ক চিন্তা থেকে। কিন্তু সেই নতুন কথাটি সত্যিই কি কবিতায় আরো ভালো করে বলা গিয়েছিলো?

২

এযাবৎ প্রকাশিত জীবনানন্দের কয়েকটি ছোটগল্প ও উপন্যাস থেকে তাঁর গদ্যচারণার যে মানস-পরিসর মেপে নেওয়া যায় তা খুব বিস্তৃত নয়—সংকীর্ণই এক অর্থে। লেখাগুলি সবই ছিলো পাণ্ডুলিপিতে। তাঁর জীবৎকালে প্রকাশিত হয়নি একটিও। দুটি উপন্যাস—সুতীর্থ ও মাল্যবান—প্রেসে দেবার মতো করে কপি করা ছিলো মাত্র। এছাড়াও পঞ্চাশের কাছাকাছি গদ্যরচনা এখনো প্রকাশের অপেক্ষায়। কিন্তু তাঁর লেখাগুলিতে বৈচিত্র্য কম। সেগুলিতে পুনরুক্তি অজস্র, তিনটি কি চারটি চরিত্রই ঘুরে ফিরে আসে, সব মিলিয়ে তিনটি কি চারটি বিষয়ের প্রকাশেই তাঁর মনোভাবনা সংহত। অন্যান্য বাংলা গল্প-উপন্যাসের সঙ্গে সাদৃশ্য বেশি না থাকলেও পরস্পরের সঙ্গে তাদের এতই মিল যে এককথায় তাদের একঘেয়ে বলে দেওয়া যায়। অনেক ঔপন্যাসিক জীবনকে তার বিচিত্র বিকাশের নানা রূপে বর্ণে দেখেন। সেই সজীবতার স্বাদ নেওয়া ও পাঠককে দেওয়া তাঁদের কাজ—সেই কাজেই তাঁদের স্রষ্টার আনন্দ। কিন্তু জীবনানন্দের সে-জাতীয় একান্ত নান্দনিক কোনো লক্ষ্য ছিলো না। জীবন সম্পর্কে তাঁর জটিল কিছু চিন্তা—যা তিনি কবিতায় ধরতে পারছিলেন না বলে মনে হয়েছিলো তাঁর—তিনি গদ্যে প্রকাশ করতে চাইছিলেন বারবার। একারণেই একই কথা বারবার বলা হয় তাঁর গল্প-উপন্যাসে। উপন্যাসগুলিকে গল্পের বড় সংস্করণ মনে হয়। একই ধরনের চিন্তা-পদ্ধতি, সংলাপ, ঘটনাসংস্থান বারবার আসে। তাঁর গল্প-উপন্যাস ঠিক জীবনরসে রসময় নয়, তত্ত্বভাবনায় জটিল। তাঁর শেষ পর্বের প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলিতেও এই তত্ত্বময়তা বিস্তৃত। তবু কবিতায় যেন অনুভব করা যায়, সংশয়-যন্ত্রণা বিবাদের সঙ্গে সঙ্গেই বেঁচে থাকার একটি সার্থকতার বোধও রয়েছে। ইতিহাসের দিকে তাকিয়ে সময়ের প্রশান্তির গভীরতায় নিবিড় হয়ে যান তিনি। অপ্রাপ্য এক উজ্জ্বল পৃথিবীর আকাঙ্ক্ষায় মানুষের অন্তহীন কর্মযাত্রার কথা সেখানে তিনি কখনো কখনো বলেন। বোধহয় কবিতাতেই সৃষ্টির আনন্দ অনুভব করতেন বলে জীবনের নীল-শ্যামল মুহূর্তগুলি তাঁর কবিতাতেই ধরা পড়েছে। উপন্যাসকে শিল্পসৃষ্টির আনন্দের সঙ্গে মিশিয়ে নিতে পারেননি বলে প্লট বা চরিত্র নির্মাণে তিনি সর্বাঙ্গীণ যত্ন নেননা হয়তো। প্লট শিথিল থাকে, স্বাভাবিক বস্তুবোধের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে চরিত্রগুলিকে মনে হয় অদ্ভুত, তাদের কাজকর্মকে মনে হয় প্রায় অসম্ভব। এসব সত্ত্বেও তাঁর গল্প-উপন্যাস অসার্থক বা দুর্বল নয় এবং চিন্তাশীল পাঠকের কাছে অতীব সুপাঠ্য।

জীবনানন্দের উপন্যাসে পরিবেশ-সংকটের কথা আছে। কিন্তু মানুষের আত্মিক সংকটের কথাটাই প্রধান। এটাই তাঁর জীবন-জিজ্ঞাসার তৃতীয় স্তর এবং জটিলতম অধ্যায়। এখানেই তিনি বেঁচে থাকা বিষয়ে কিছু নতুন কথা বলেছেন। কথাগুলি সবই নতুন নয় কিন্তু বাংলা উপন্যাসে তা এভাবে কেউ বলেননি তাঁর আগে বা তাঁর পরে।

পরিবেশ-সংকট নিয়ে উপন্যাস সবসময়েই লেখা হয়। মানুষের বেড়ে ওঠার সঙ্গে সেখানে পারিপার্শ্বিকের সংঘাত। কিন্তু মানুষের মনে নিজের কামনা ও কর্তব্যের মধ্যে যে নিরন্তর ঘর্ষণ, বেঁচে থাকার অর্থ ও সার্থকতা বিষয়ে মানুষের যে কণ্টকময় আত্মজিজ্ঞাসা—শুধু তাকেই প্রকাশ করে এমন অন্তর্মুখ উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে বেশি নেই। জগদীশ গুপ্তের লেখায় কিছু উপকরণ ছিলো কিন্তু নিজেকে তিনি সাবধানে সরিয়ে রেখেছিলেন তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে মিশে যাওয়া থেকে। তাঁর বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখায় এই জাতীয় অস্তিত্ব-জিজ্ঞাসা মাঝে মাঝে ছায়া ফেললেও শেষ পর্যন্ত তা সমাজ-বিশ্লেষণ ও নানাজনের উপখ্যান হয়ে দাঁড়ায়। সেখানে লেখকের আত্ম-প্রক্ষেপ থাকে কিন্তু তা তাঁর আত্মার দর্শন হয়ে ওঠে না। সতীনাথ ভাদুড়ীর 'সংকট' বা 'দিগ্‌ভ্রান্ত' উপন্যাসে কিছুটা এই ধরনটি দেখা গেছে, তার আগে রবীন্দ্রনাথের 'চতুরঙ্গ' উপন্যাসেও কিছুটা। একটি আত্মিক প্রশ্নকে অনুসরণ করে সেখানে উপন্যাসের গতি। কিন্তু সেখানেও আছে একটি 'গল্প' বলার ইচ্ছে, আরো পাঁচটা দিক তুলে ধরার চেষ্টা। কিন্তু জীবনানন্দের উপন্যাসে শুধু নিজের মনের প্রশ্নগুলিই সারাক্ষণ কাঁটার মতো উঁচিয়ে থাকে—আমি কী? আমি এমন কেন? আমার কী হওয়া উচিত? আমি কি আর কিছু হতে পারি? আত্মসত্তার মুখোমুখি এই প্রশ্নগুলি নিয়ে এসে দাঁড়ানোই তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলির মূল কথা—প্রায় একমাত্র কথা। প্লট সাজানোর বা বাস্তব বর্ণনার কোনো দায় তিনি স্বীকার করেননি।

আর কোনো বাঙালি ঔপন্যাসিক এমন করে নিজেকে খুলে ধরেননি লেখায়। আলব্যের কামু তাঁর উপন্যাসে নৈরাশ্যপীড়াকে উপস্থিত করেছেন, কাফ্‌কার লেখায় এই আত্মযন্ত্রণা অ-সুস্থতার পর্যায়ে পৌঁছেছে, বেঁচে থাকার অর্থহীনতা কখনো বিবমিষার বোধ জাগিয়েছে সার্ত্র-র রচনায়, মৃত্যুবোধস্পর্শী এক সুগভীর ঔদাস্য অনুভব করা যায় ভার্জিনিয়া উল্‌ফ-এর উপন্যাসে—এঁদের রচনা এঁদের আত্মদর্পণ। বাংলা উপন্যাসে জীবনানন্দই বোধহয় একমাত্র নাম। জীবনানন্দের লেখা অবশ্য ঠিক চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির নয়। কিন্তু এই রীতির মূল কথাটা হলো আত্মসত্তার অবাধ উন্মোচন—জীবনানন্দের রচনায় তা আছে বলেই চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির সঙ্গে তাঁর রচনাপদ্ধতির কিছু মিলও আছে। রীতির প্রসঙ্গে পরে যাবো। অস্তিত্ববাদী দর্শনকে উপন্যাসে ফলিয়ে তুলতে গেলে ব্যক্তির অস্তিত্বের জিজ্ঞাসা ও সংঘাতই হয় তার উপকরণ। জীবনানন্দের উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে এই বোধেরও সবচেয়ে কাছাকাছি। এইসব কারণে কাহিনী-রম্যতার দিকে তিনি কোনো সময়েই দৃষ্টি দেননি, চরিত্রগুলির একান্ত উদ্ভট ধরনের সংলাপ ও আচরণ বিবৃত করেছেন অনায়াসে, উপন্যাস শেষও করেছেন আপাত খাপছাড়াভাবে। সেজন্য তাঁর উপন্যাসে স্বাভাবিক বাস্তবতা থাকে না অনেক সময়ে। কিন্তু মগ্নচেতনার স্পর্শ মেশানো মনের ভেতরকার নিরাবরণ ও অমার্জিত চেহারাটিতে বাস্তবতার তলশায়ী নিবিড়তর এক বাস্তবতার অনুভব পাই তাঁর গল্প-উপন্যাসে। তাকে কি সুররিয়ালিজম্ বলবো? হয়তো একথাও বলা যায়, বাংলা উপন্যাসে একমাত্র তাঁরই লেখায় পাই সুররিয়ালিজমের ছোঁয়া।

৩

আমাদের পরবর্তী প্রশ্ন—জীবনানন্দের এই আত্মদর্শনের স্বরূপ কি-রকম। তাকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দেওয়া যাবে কি? যাবে। কারণ বলার কথাগুলি অতীব স্পষ্টতায় তিনি নিজেই প্রায় হাতুড়ি ঠুকে বসিয়ে দিয়ে গেছেন তাঁর গল্প-উপন্যাসে। বুঝতে কোনোই অসুবিধে

নেই। সাকুল্যে তাঁর বক্তব্য তিনটি। এক, তাঁর মতো মানুষের জীবনে প্রবল একটি সমস্যা হলো সপরিবার স্বচ্ছন্দে বাঁচার ও বাস করার মতো টাকার সংস্থান করা। এখনকার সমাজে লোভ, স্বার্থপরতা, ব্যবসাবৃত্তির কূটবুদ্ধি ও চক্ষুলজ্জাহীন পরশ্রীকাতরতার কামড় নিয়ে পরস্পরের প্রতি আক্রমণে উদ্যত মানুষ। ন্যায়বোধহীন, নীতিবোধহীন ধনার্জনস্পৃহা ও ধনগর্বের অধীন এই সমাজে তাঁর মতো অন্যায়ে ও অশোভনতায় অক্ষম, অর্ন্তমুখ ব্যক্তির জায়গা হবে কিভাবে? এই প্রশ্নটি ব্যক্তিজীবনেও তাঁকে তাড়া করে ফিরেছিলো আমৃত্যু। তাঁর উপন্যাসের নায়কেরা সকলেই এই সমস্যাটির দ্বারা জর্জরিত। তারা সকলেই ধনমদমত্ত সমাজব্যবস্থার সঙ্গে এক অসম শক্তিপরীক্ষায় টাকা উপার্জনের চেষ্টা করে এবং ব্যর্থ হয়।

দুই, মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার বৃহত্তম টান হলো যৌনকামনা মিশ্রিত ভালোবাসা। মানুষ ও মানুষীর প্রধান যে সম্পর্কটি তাঁর উপন্যাসগুলিতে নির্ণীত হয়েছে তা তীব্র এক শরীরভোগের সম্পর্ক। যৌনসুখ ছাড়াও তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য ইন্দ্রিয়জ সুখ—রুচিকর খাওয়া, তৃপ্তিকর ঘুম, শীতে উষ্ণতা, গরমে শীতলতার একান্ত শারীর উপভোগ্যতা। তাঁর উপন্যাসে যৌনতার দিকে মানুষের দুর্মর প্রবণতা, যৌনসুখের আকাঙ্ক্ষা ও তৃপ্তি সবকিছুর ওপরে। যৌন চরিতার্থতার বোধ সাধারণ মানুষকে দিচ্ছে একটি প্রশান্ত পূর্ণতার জ্যোতি। এই চরিতার্থতার অভাবে সূক্ষ্মরুচির বোধবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ ব্যর্থ ও নিষ্ফল-অস্তিত্ব হয়ে যাচ্ছে। তাঁর উপন্যাসগুলির ভাষায় ও ভাবনায় প্রবল, অনাবরণ, অ-মধুর, জান্তব যৌনচেতনার অভিঘাত পাঠককে প্রায় বিমূঢ় ও বিপর্যস্ত করে ফেলে। এ-জাতীয় লেখার পেছনে যদি অসম্ভব একটি জোর, আমূল মথিত একটি আত্মিক যন্ত্রণা অনুভব না করা যেতো তাহলে নিশ্চয়ই তাঁর উপন্যাসগুলিকে বলতে পারতাম অশ্লীল।

তিন, জৈব আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে যুদ্ধরত মানবআত্মার প্রচেষ্টার কথাও তাঁর উপন্যাসে পাচ্ছি। ১৯৪৮-এ লেখা তিনটি উপন্যাসের একটিতে এই সংগ্রামে পরাজিত হয় মানুষ, একটিতে নিঃসংশয়ে জয়ী আর তৃতীয়টিতে এই আকর্ষণ থেকেই চেতনার এক রহস্যময় অবস্থানে সে চলে যায়। ছোটগল্পগুলিতেও একই তত্ত্বের প্রকাশ। ১৯৩৩-এ রচিত প্রথম উপন্যাসটিতেও দুর্বলভাবে এই কথাগুলিই বলা হয়েছে। সেখানে অবশ্য যৌনতাবোধের সেই কর্কশ ও জ্বালা ধরানো প্রাবল্য নেই। রোমান্টিকতার ঈষৎ অস্পষ্ট আবছায়া জড়ানো সেই প্রচেষ্টা।

আগে বলেছি, ১৯৪৮-এর পর কবিতাতেই বক্তব্য সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে মনে করে হয়তো জীবনানন্দ উপন্যাসগুলি প্রকাশে বিরত থেকেছিলেন। কিন্তু উপন্যাসগুলি পড়লে পাঠকমাত্রেরই মনে হবে—পরিস্থিতির যে নির্মম কাঠিন্য, মানুষের যে অমেয় ক্ষুদ্রতা, যৌনবাসনার যে প্রধূমিত দাহ সেখানে প্রকাশিত—কবিতায় কিছুতেই তা করা সম্ভব নয়। কবিতার রূপকল্পনার মধ্যেই মন্ময়তার, শ্রেয়োচেতনার, সৌন্দর্যোপাসনার একটা ঝোঁক রয়ে গেছে যেন। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কবিতায় যতখানি মঙ্গলপ্রত্যয়সিদ্ধ, গদ্যরচনায় কি তাই? কবিতার কোথায় বিনোদিনীর জ্বলন্ত বাসনা, মধুসূদনের কুৎসিত অধিকারবোধ, সন্দীপের আত্মসম্মোহনের আড়ালে লুকোনো কুটিল ভীরুতা? এমন কি 'শেষের কবিতা'র মতো কাব্যিক উপন্যাসেও ব্যঙ্গের ছুরিটি যতটা শাণিত তা কোনো কবিতায় সম্ভব ছিলো না। আশাবাদী কবি প্রেমেন্দ্র মিত্র আর সৌন্দর্যবাদী কবি অচিন্ত্যকুমার তাঁদের গল্পে বাস্তবতার নির্মমতর চিত্রকর। গানে-কবিতায় প্রকৃতির প্রতিটি কণায় ঐশী মহিমার অমৃতস্বাদ ঝরিয়ে দেন যে রবীন্দ্রনাথ, তিনিই 'জীবিত ও মৃত' বা

'সম্পত্তি সমর্পণ'-এর মতো গল্পে প্রকৃতির নির্মম ও প্রায় মানববিরোধী ভূমিকা আঁকেন। সব শিল্পেরই ভেতরের কথাটি অনেকাংশে যেমন এক, তেমনি প্রতিটি শিল্পমাধ্যমের একান্ত নিজস্ব কিছু গুণগত পার্থক্য থাকে—খুব সূক্ষ্ম হলেও। জীবনানন্দও যে-কথা উপন্যাসে বলেছেন তা বোধহয় সেভাবে কবিতায় বলেননি। উপন্যাসগুলিতে তাঁর মনের ও জীবনের এক অস্বস্তিকর ও রূঢ় সত্য-পরিচয় উদ্ভাসিত হয়। বাংলা সাহিত্যে তাঁর উপন্যাসের বক্তব্য ও ভাষা দুটিই অভিনব এবং কবি-গদ্যকার হিসেবে নয়, ঔপন্যাসিক হিসেবেই বাংলা সাহিত্যে তাঁর স্থায়ী আসন পাবার সম্ভাবনা আছে। শিল্পরূপের দিক থেকে যদি কোনো সমালোচকের এগুলিকে দুর্বল মনেও হয়, তাতেও উপন্যাসগুলির বক্তব্যের ও লেখকের মনোভঙ্গির অদ্ভুত জোরটা কমে যায় না।

৪

জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের সাল-তারিখের ব্যাপারটা খুব স্পষ্ট নয়। ছাপার অক্ষরে তাঁর প্রথম প্রকাশিত গল্পটির নাম 'গ্রাম ও শহরের গল্প'। অনুক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত হবার সময়ে পত্রিকা-সম্পাদক সুনীলকুমার নন্দী জানিয়েছিলেন—রচনাকাল ১৯৩৬। ১৯৫১-র শারদ সংখ্যা 'প্রতিক্ষণ'-এ প্রকাশিত 'প্রেতিনীর রূপকথা' নামক উপন্যাসের পাণ্ডুলিপির প্রথম পৃষ্ঠায় লেখা ছিলো—August-September 1933। প্রেমেন্দ্র মিত্র ১৯৫১ বঙ্গাব্দে 'ছায়ানট' গল্পটি সম্পর্কে লিখেছিলেন—'লেখা হয়েছিল প্রায় চল্লিশ বছর আগে। সম্ভবত জীবনানন্দ এই রচনাটি দিয়েই গল্প-সাহিত্যে পা বাড়িয়েছিলেন।' (জীবনানন্দ দাশের গল্প, দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি, ১৯৫১।) এ থেকে গল্পটির রচনাকাল দাঁড়ায় ১৩৩৯ বঙ্গাব্দ বা ১৯৩২ খ্রীস্টাব্দ। জাতীয় গ্রন্থাগারে রক্ষিত আরো বেশ কিছু অসমাপ্ত গল্প-উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি থেকে মনে হয় ১৯৩১-৩২ থেকেই তিনি গদ্যরচনায় হাত দিয়েছিলেন। 'ছায়ানট'-গল্পটিতে এবং 'প্রেতিনীর রূপকথা' উপন্যাসটিতে প্রথম চেষ্টার ছাপ আছে। সহজেই এগুলিকে খসড়া-জাতীয় লেখা বলে চেনা যায়। তারপর ১৯৩৬ ও তার কাছাকাছি সময়ে আরো কিছু ছোটগল্প লিখে সাময়িকভাবে বোধহয় গদ্য লেখা বন্ধ করেন তিনি। যদিও পাণ্ডুলিপিগুলি সুস্পষ্টভাবে পাঠকদের সামনে আসার আগে এ-সম্পর্কে জোর করে কিছু বলা যাচ্ছে না। তবু অনুমান করা যায় ১৯৩৭ থেকে ১৯৪৭ খ্রীস্টাব্দ পর্যন্ত মূলত কবিতাই লিখেছিলেন। তারপরেই ১৯৪৮-এ তিনটি উপন্যাস। মে-জুন মাসের মধ্যে 'সুতীর্থ', জুন-এ 'মাল্যবান'। ১৯৫১-র জুলাই-এ 'শিলাদিত্য' পত্রিকায় 'জলপাইহাটি'র প্রথম কিস্তি বার হবার সময়ে অশোকানন্দ দাশ প্রাক্‌কথনে বলেছেন—'এখন তৃতীয় উপন্যাস 'জলপাইহাটি' প্রকাশিত হচ্ছে 'শিলাদিত্য' পত্রিকায়। এই তিনটি উপন্যাসই খুব অল্প সময়ের মধ্যে লিখিত।...১৯৪৮ সালে লিখিত এই রচনাটি তাঁর আকস্মিক মৃত্যুর জন্য পরিমার্জনা করে যেতে পারেন নি।' এই উক্তি থেকে মনে হতে পারে জলপাইহাটি উপন্যাসটিই তিনটির মধ্যে সবশেষে লেখা। কিন্তু প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনস থেকে প্রকাশিত জীবনানন্দ সমগ্র-এর প্রথম খণ্ডে (১৯৫১) সম্পাদক দেবেশ রায়ের নির্দেশিকায় জানা যায় উপন্যাসটি রচিত হয় এপ্রিল ও মে মাসের মধ্যে। কাজেই তিনটির মধ্যে এটিই প্রথমে লেখা।

জীবনানন্দের অপ্রকাশিত গল্প ও উপন্যাস-সমূহ প্রতিক্ষণ পাবলিকেশনসের পক্ষ থেকে 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় ও 'জীবনানন্দ সমগ্র' গ্রন্থাবলীতে প্রকাশিত হতে শুরু করেছে। এই প্রবন্ধে দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি প্রকাশিত 'জীবনানন্দের গল্প'-এর তিনটি গল্প এবং

উল্লিখিত চারটি উপন্যাসের আলোচনা করা হবে।

গদ্যসাহিত্যে জীবনানন্দ-মানসের বির্বতন ও বিশ্লেষণে যাবার আগে আরো দুটি তথ্য উল্লেখযোগ্য। ১৯৩১ থেকে ১৯৩৬ পর্যন্ত সময়ে তিনি ছিলেন বরিশালে। ১৯৪৭-এ তিনি কলকাতায় বাস করছেন কিন্তু গুছিয়ে বসতে পারেননি। দ্বিতীয়ত, ১৯৩০-এর পর পাঁচ বছর এবং ১৯৪৭-এর পর আড়াই-তিন বছর তিনি অত্যন্ত আর্থিক অনটনের মধ্যে ছিলেন। তথ্যটি খুবই মূল্যবান। মানুষের বেঁচে থাকার পক্ষে টাকা যে একটা প্রবল শক্তি—এই উপলব্ধি সেই সময়ে তীব্র হয়ে দেখা দিয়েছিলো তাঁর মনে। ১৯৪৮-এর উপন্যাস তিনটিতে মানুষ ও টাকার সম্পর্ক মানব-অস্তিত্বের একটি আদি সূত্ররূপে প্রদর্শিত হয়েছে। বিষয়টিকে খুব নতুনভাবে ভেবেছেন তিনি। মননচালনার যে-সব পথে পশুপাখির ওপর মানুষ আধিপত্য বিস্তার করেছে তার মধ্যে প্রধান হলো ধনবিজ্ঞান-সচেতনতা। যখন মুদ্রার সৃষ্টি হয়নি তখনো ছিলো নানারকম বিনিময়-ব্যবস্থা। এই উৎপাদন ও বণ্টন-সচেতনতা মানুষের নিজস্ব সভ্যতা, নিজের অস্তিত্বের সঙ্গে অচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। তাই অর্থোপার্জন সমস্যা মানুষকে কি পরিমাণ পরিচালিত করে, বিপর্যস্ত করে, পৌঁছতে পারে অস্তিত্বের মূল পর্যন্ত তা আমরা প্রত্যক্ষ করি তাঁর উপন্যাসে।

'ছায়ানট' গল্পটি ও 'প্রেতিনীর রূপকথা' উপন্যাসটির রচনাকাল প্রায় সমসাময়িক। গল্পটি তুলনায় সুসম্পূর্ণ ও সু-লিখিত। প্রথম রচনা হিসেবে কেউ কেউ এটির লেখনরীতি কিছু আড়ষ্ট বলে মনে করেছেন, কিন্তু এ-বিষয়ে মতভেদ থাকতেই পারে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় জীবনানন্দের গল্প সংকলনটির আলোচনা করতে গিয়ে বলেছেন—'সবকটি গল্পেরই বিষয় প্রণয় এবং শরীর লিপ্সা।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ পৌষ ১৯৫১।) মন্তব্যটি 'ছায়ানট'-এর ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ সত্য। এই গল্পটির মর্মকথা বোঝাতে গিয়ে অনবদ্য একটি শব্দবন্ধ চয়ন করেছেন প্রেমেন্দ্র মিত্র—'মিথুন-সমীক্ষণ' (জীবনানন্দ দাশের গল্প)। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় ঐ আলোচনায় এরপর বলেছেন ঃ 'গল্প হিসেবে কোনোটাই বিশেষ কিছু নয়। এলোমেলো বর্ণনা, একটু পাগল পাগল কথাবার্তা, কোনো গল্পেরই ঠিক শুরুও নেই শেষও নেই—কিন্তু পড়তে চমৎকার লাগে।' (আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ পৌষ ১৯৫১)। কেন পড়তে চমৎকার লাগে? কারণ, গল্পগুলি যেভাবে লেখা উচিত ঠিক সেইভাবেই লেখা হয়েছে। আগ্রহ জাগানো শুরু আর নিটোল পরিসমাপ্তি ছোটগল্পের মূল লক্ষণ নয়। ঐ 'এলোমেলো বর্ণনা'-ই 'ছায়ানট' গল্পটির যথার্থ-স্টাইল। প্রেমেন্দ্র মিত্র সঠিকভাবেই নির্দেশ করেছেন 'মিথুন-সমীক্ষণ যে গল্পের প্রেরণা তাকে কটি সঙ্কেত বিন্দুর বাইরে ছড়াতে দিলে তার উদ্দেশ্যই ব্যর্থ হয়ে যেত না কি?' (জীবনানন্দ দাশের গল্প) আরো বলেছেন—'বিষয় ও আঙ্গিকের দিক দিয়ে গল্পটি অভিনব ও দুঃসাহসিক।' প্রেমেন্দ্র মিত্রের সঙ্গে একমত হয়ে গল্পটিকে একটু বিশ্লেষণ করা যাক। নায়ক ও নায়িকা রেবা বিবাহিত নয় কিন্তু একত্রে বাস করে। নায়ক অসুস্থশরীর, ক্ষীণদৃষ্টি। পারস্পরিক আন্তরিকতায় ভাঁটা পড়ছে তাদের, এসে যাচ্ছে যান্ত্রিকতা। মাথা টিপতে টিপতে উঠে যেতে বললে রেবা স্বস্তি পায়, না ডাকলে কাছে আসে না। এই রমণীকে পূর্ণভাবে না পাওয়ায় নায়ক অতৃপ্ত ও ক্ষুব্ধ। প্রকৃত পূর্ণতায় দেহমনসহ নারীকে একান্ত করে পাবার আকাঙ্ক্ষা জীবনানন্দের পরবর্তী উপন্যাসের নায়ক মাল্যবানের অন্যতম তৃষ্ণা ও চারিত্র্য। কিন্তু একদিন রেবা একটি ভিখিরি ছেলেকে ভাত-তরকারি দিচ্ছে দেখে সে মুগ্ধ হয়। তার মনে হয়—'এই মেয়েটাকে মুক্তি দেওয়া যায় না এর খাঁচার বাসা থেকে?....তবুও খাঁচার

শিকগুলো যে আমারই বুকের পাঁজর দিয়ে গড়া।' অ-প্রেমের ঘর থেকে মুক্ত হবার জন্য নারীর যে গোপন বাসনা থাকে তা এখানে অনুভব করে নায়ক কিন্তু তুলে নিতে পারে না নিজের বাসনার জাল। ক্রমশ রেবার কাছে আসে অন্য লোক। প্রথমে এক কবি। তারপর এক ডাক্তার—তরুণ, ধণী, সুবেশ। রেবা তার শারীরিক নৈকট্যে আসে। তারপর রেবাকে দেখে নায়কের মনে হয়—'সেদিন যে সে শালপাতায় করে ভিখিরিকে ফ্যান্‌সা ভাত দিয়েছিল সেদিনও তো তার মুখখানা এমন চমৎকার দেখিনি।...না—না—এ বীভৎস হতেই পারে না। এ সুন্দর,—এ পরম সুন্দর।' এই সৌন্দর্য কিসের? সমাজবন্ধনের বাইরে ইন্দ্রিয়জ মনকে মুক্তি দিয়ে মনোমতো শারীর তৃপ্তির সুখ-স্পর্শে যে সৌন্দর্য ফুটে ওঠে প্রাণিজগতে—এ সেই সৌন্দর্য। যৌনতাহীন ভালোবাসা কখনো জায়গা পায়নি গদ্যকার জীবনানন্দের মনে। বরং ভালোবাসাহীন যৌনতার সম্পর্ক জায়গা পেয়েছে ব্যাপকভাবে। সেখানে শরীরের সুখস্বাদই ভালোবাসা। সেখান থেকেই অস্তিত্বের সার্থকতার বোধে উত্তীর্ণ হয় মানুষ। 'মাল্যবান' উপন্যাসের মাল্যবান ও উৎপলা 'ছায়ানট' গল্পের নায়ক-নায়িকার পূর্ণায়ত রূপ। 'সুতীর্থ' ও 'জলপাইহাটি' উপন্যাসে সম্পর্ক নির্বিশেষে নারী ও পুরুষ সমস্থানবর্তী হলেই কোনো না কোনো ভাবে যৌনবোধ সচেতন হয়ে উঠেছে। কখনো প্রকাশ্য ভাষায়, স্পষ্ট ভাবনায় এর উৎসারণ, কখনো মগ্নচেতনার তল থেকে ভেসে আসা কোনো উপমায় এর হঠাৎ-চমক। সেদিক দিয়ে 'ছায়ানট' গল্পটিতে জীবনানন্দের উপন্যাসগুলির একটি মূল লক্ষণ প্রথম ধরা পড়েছে।

জীবনানন্দের কবিতাতেও কিন্তু প্রকৃতির রূপময়তা, মৃত্যুবোধের বিষণ্ণতা, ইতিহাসের দূরত্ব, সময়বোধ ও সমাজবোধ, পরাবাস্তব অস্পষ্টতা সব কিছুর আড়ালে একটি প্রখর শরীর-চেতনা ও তীব্র যৌনতাবোধ বহমান। তাঁর কবিতার প্রতিটি পঙ্‌ক্তিতেই অনেকগুলি সুতোর ঘন বুনোট থাকে। যৌনতাবোধের সূত্রটিও সেখানে খুবই সুপ্রত্যক্ষ।

১৯৩৩-এ রচিত 'প্রেতিনীর রূপকথা'র আকস্মিক পরিসমাপ্তি থেকে জোর করে বলা যায় না যে, লেখাটি শেষ হয়নি। তাঁর উপন্যাস কখনই প্রচলিত অর্থে শেষ হয় না। একমাত্র 'মাল্যবান'-এই শুরু, শেষ ও মধ্যবর্তী গতিপথের একটা সুসামঞ্জস্য আছে, রচনারীতিতে আছে কার্য-কারণ-শৃঙ্খলা। বক্তব্য বিষয়টিকে একটি অ-শিথিল উপসংহার-বিন্দু তিনি দিতে পেরেছেন। অন্য তিনটি উপন্যাসে কিছু শিথিলতাই তাঁর রীতি। সূত্রপাত ও সমাপ্তির মধ্যে বিশেষ কোনো পরিকল্পনা নেই। গল্পাংশের সমস্যাটি বা চরিত্রগুলি মধ্যপথে থেকে যায়। 'জলপাইহাটি'তে এই খাপছাড়া ভাবটা শেষের দিকে চরমে উঠেছে। কিন্তু ভাবলে দেখা যাবে—কাহিনীর শুরু বা শেষ—কোনোটিই উপন্যাসের প্রতিপাদ্য তত্ত্বের প্রাসঙ্গিকতা থেকে বিচ্যুত হয়নি।

'প্রেতিনীর রূপকথা'ও উত্তম পুরুষে লেখা। আরম্ভটি বস্তুধর্মী উপন্যাসের মতো। বেকার নায়ক সুকুমার রোজগারের আশায় কলকাতা যাবে বলে তৈরি হচ্ছে। প্রথমে স্ত্রী মালতীর সঙ্গে সংলাপ, তারপর মায়ের সঙ্গে। এই কথোপকথন থেকে জানা যায়—সুকুমারদের সংসারে আর্থিক অভাব; সে ইংরেজিতে এম. এ. এবং পড়তে ভালবাসে বৈষ্ণবকবিতা, শেক্সপীয়র, এড্‌গার অ্যালান্ পো, হুইট্‌ম্যান। সে বলে—'কিন্তু এইসব করেই সাংসারিক জীবনটা খোয়া গেল আমার, ইলেকট্রিক মিস্ত্রি হলেও ভালো হতো। কিন্তু পাশ করলাম ইংরেজি লিটারেচারে এম.এ।' ক্রমে বোঝা যায়, স্ত্রীর সঙ্গে তার ভালোবাসা নেই, উপার্জনে অক্ষম স্বামীকে মালতী একটুও মূল্য দেয় না। যাবার সময়ে সুকুমার চাইলেও মালতী একটু মশলা, একটা সেফটিপিন বা একটা হাতপাখার মতো তুচ্ছ

জিনিসও এনে দেয় না। মা কিছুই বুঝবেন না জেনেও সুকুমার টমাস হার্ডি, টি. এস. এলিয়ট, টমাস মান, আনাতোল ফ্রাঁসের কথা মাকেই শোনায়। তবু পথে বেরিয়ে সুকুমার ভাবে—'একটা জীর্ণ শীর্ণ দাঁড়কাক অমাবস্যার অন্ধ স্রোতের মধ্যে তার অনেক দূরের নিঃসহায় শিশুদের জন্য যেমন অনুভব করে আমিও কি তেমন অনুভব করি না মা,—তোমার জন্য; তোমার জন্য মালতী।'—কিন্তু এই যে কলকাতা যাত্রা করে সুকুমার—তারপর তার বাড়ির কথা, মা আর মালতীর কথা, উপন্যাসটিতে আর ফিরে আসেনি। সেই যাত্রাপথে বিনতা নামে একটি মেয়ের স্মৃতিচারণ করতে করতে লেখাটি শেষ হয়ে যায়। তিনটি পর্যায়ে সাজানো উপন্যাসটিতে শুরু থেকে সুকুমার স্টেশনে পৌঁছনো পর্যন্ত প্রথম পর্যায়ের মধ্যেই লেখককে উপন্যাসের নায়ক বলে নিঃসংশয়ে চিনে নেওয়া যায়। এবং এই অন্তর্মুখ স্বভাব, সাহিত্যমনস্কতা, অধিক অর্থ উপার্জনে নিরুৎসাহ ও স্ত্রীর সঙ্গে মানসিক দূরত্ব তাঁর সব ক'টি উপন্যাসে প্রধান পুরুষ চরিত্রের সাধারণ লক্ষণ। গ্রাম থেকে শহরে যাত্রাও সকলের মধ্যেই দেখা যায়।

যথার্থ আত্মজৈবনিক উপন্যাসও বাংলায় তেমন লেখা হয়নি। আধুনিক উপন্যাসের আত্মজৈবনিকতার লক্ষণ বিষয়ে, জীবনানন্দের একটি সুচিন্তিত মত ছিলো। 'The Bengali Novel Today' নামে একটি প্রবন্ধে (Hindusthan Standard, 3 September, 1950) তিনি বলেছিলেন যে, এযুগে জীবনের বিস্তার ও জটিলতার অমেয় বৃদ্ধির ফলে কোনো একজনের অভিজ্ঞতায় কোনো অর্থেই আর সমগ্রতাকে পাওয়া সম্ভব হচ্ছে না। তার ফলে—'Each Novelist's individual experience appears to shrink and become more and more specialized as the extent and complexity of the total human experience augment all around.' তারপর তিনি বলেছেন—আধুনিক উপন্যাসের সার্থকতা খুঁজতে হবে জীবনের বিচিত্র বিস্তারের বোধে নয়, ব্যক্তিহৃদয়ের অন্তরতম প্রদেশ তীক্ষ্ণভাবে বিদ্ধ হবার লক্ষণে। এজনাই ব্যক্তির আভ্যন্তর মনকে অনুপুঙ্খে দেখাবার প্রবণতা আজকের উপন্যাসে। আর মনের ভেতরের চেহারা শুধু একজনেরই দেখানো সম্ভব—নিজের। অতএব আধুনিক উপন্যাস সম্পর্কে তাঁর শেষ বক্তব্য—'It is not the extent of experience that will tend to make a novel great, but the requisite vision and intellect of the novelist even though his experience is somewhat restricted and material at his command scarcely anything more than diversified autobiography.' এই অভিমত পুরোপুরি স্বীকার যদি না-ও করি—জীবনানন্দের প্রতিটি উপন্যাস যে 'diversified autobiography' থেকে গেছে—তাতে সন্দেহ নেই। প্রথম উপন্যাসটি থেকেই এই প্রবণতা স্পষ্ট। মায়ের চরিত্র এই উপন্যাসের পর তাঁর লেখায় আর দেখা দেয়নি। 'মাল্যবান' ও 'জলপাইহাটি'তে যদিও মা ও সন্তানের একত্রে উপস্থিতি আছে—সেখানে মানবিক মাতৃভাব নেই। বাংলা উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের প্রতিষ্ঠিত যে মাতৃমূর্তিটিকে মানিক, জগদীশ, সতীনাথ, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্তও প্রায় অবিকৃত রেখেছিলেন, যে ধারার উল্লেখযোগ্য কোনো ব্যতিক্রম একালের উপন্যাসেও দেখি না—জীবনানন্দই তাঁকে অস্বীকার করেছিলেন প্রবলভাবে। তাঁর উপন্যাসে জননী যে সন্তানকে বিকৃতি, ক্রোধ বা বিরাগের চোখে দেখে তা-ও নয়। সে-ও একরকমের টান হতো। জননী সন্তানকে দেখেই না। গর্ভস্থ সন্তান বড় হয়েগেলে পশু-পাখির প্রবৃত্তিময় জৈব জগতে তার যেমন প্রায় অস্তিত্বই থাকে না জননীর কাছে, জীবনানন্দের উপন্যাসের

মায়েরাও যেন সেইরকমই। শুধু 'প্রেতিনীর রূপকথা' ব্যতিক্রম। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে তাঁর মায়ের যে স্থান ছিলো তারই প্রতিফলন এই উপন্যাসে।

তাঁর উপন্যাসের নায়কদের সঙ্গে তাঁর মনোগঠনের সাদৃশ্য অ-বিতর্কিত। সমকালীন কন্টিনেন্ট্যাল উপন্যাসের প্রতি তাঁর ঝোঁক ছিলো। টমাস মানকে মহৎ সাহিত্যিক বলে মানতেন। বিমলচন্দ্র ঘোষ একটি লেখায় তাঁর মানসিকতা সম্পর্কে বলেছিলেন : 'এ মন ও বুদ্ধি প্রথম ইউরোপীয় উত্তরসামরিক সংস্কৃতি বিকারের ভয়াবহ উন্মত্ততার মধ্যে জন্মেছিল।' (জীবনানন্দের জীবনদর্শন, জীবনানন্দ স্মৃতি, দেবকুমার বসু সম্পাদিত, ১৯৫১।) জীবনানন্দ নিজে টমাস মান-এর 'ডক্টর ফস্টাস' নামক উপন্যাসটির সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন : 'মানের লেফেরকুনকে শিকার করে মেরে ফেলেছে আধুনিক কালের বিকার ও এই বিশৃঙ্খলায় লালিত বড় সুকুমার শিল্পীমনের নিঃসঙ্গতা—অসাধ।' (চতুরঙ্গ, মাঘ-চৈত্র, ১৩৫৬।) জীবনানন্দের নায়কেরা সকলেই এমনি। শরীর-মনের আকাঙ্ক্ষা, সমাজের সঙ্গে সংঘাত, অর্থ ও ক্ষমতালিপ্সার টানাপোড়েন তাদের জর্জরিত করে। পূর্বোক্ত উদ্ধৃতির 'শিকার' শব্দটি তাঁর কবিতায় বহুব্যবহৃত। 'ওই মৃত মৃগদের মতো আমরা সবাই'—এ তাঁরই অন্তরের কথা। তাঁর উপন্যাসগুলি তাঁর জীবন ও জীবনতত্ত্বের গভীরখোদিত স্বাক্ষর।

উপন্যাসটির দ্বিতীয় পর্যায়ে স্টীমার যাত্রা। স্টীমার ছাড়ার সঙ্গে সঙ্গে ঘিরে ধরে গ্রাম ছেড়ে যাবার অনুভূতি। তাঁর প্রকৃতিবোধের সঙ্গে অস্পষ্ট ছমছমে একটা প্রেতলোকের ইশারা প্রায়ই জড়ানো থাকে। সেখানে 'কিশোরী ও পুরলক্ষ্মীদের নিরপরাধ নরম ডৌলের নিবিড় মুখ'—কিন্তু তারা মৃত। সেখানে, 'আশশ্যাওড়ার জঙ্গলে জোনাকি', 'খোড়ো বনের ভিতর থেকে পাড়াগাঁর দুঃখিনী রূপমতীর উনুনের ধোঁয়া'—সেই সঙ্গেই 'আনাচে কানাচে যুগান্তরে প্রেতিনীদের নিরবচ্ছিন্ন রূপকথা'। তাঁর উপন্যাসের এই মায়াময় গ্রামমোহের কথা অনেকেই বলেছেন। কিন্তু এই গ্রামময়তা অনেকটাই পটরেখা হয়ে থেকে যায়। নাগরিক নায়ক পুরোপুরি গ্রামের দিকে ফেরে না কখনই। সুতীর্থ, মাল্যবান ও নিশীথ সেনের শহরবাসের ইতিকথা শোনান তিনি আমাদের। সুতীর্থ গ্রামের মানুষের মধ্যে কাজ করতে চলে যায়, সংগ্রামক্ষয়িত নিশীথও জলপাইহাটিতে ফেরে—কিন্তু কোনো ফেরা-ই কোনো ঘরের দিকে নয়। 'রূপসী বাংলা'র পল্লীপ্রেম এখানে নেই। বস্তুত 'রূপসী বাংলা'র প্রেমঘনতাও এত গভীর মৃত্যুবিষাদ জড়ানো যে বিভূতিভূষণের তৃপ্ত, স্নিগ্ধ, আধ্যাত্মিকতানিষিক্ত গ্রামমানসিকতার সঙ্গে তাঁর মূল অবস্থানটাতেই প্রভেদ আছে—তা স্পষ্টই বোঝা যায়। জীবনানন্দ গ্রাম ও প্রকৃতির অসামান্য রূপকার কিন্তু বড় শহরের প্রাণ-কল্লোলিত মনন-আবর্তময় জটিলতা যে তাঁর বৌদ্ধিক চিদ্‌বৃত্তিকে উদ্বেজিত করত তাও আমরা জানি। বরিশাল থেকে বুদ্ধদেব বসুকে লিখেছিলেন—'কলকাতার অলিগলি মানুষের শ্বাসরোধ করে বটে, কিন্তু কলকাতার ব্যবহারিক জীবনে একটা প্রান্তরের মত মুক্তি পাওয়া যায়, এখন যখন জীবনে কর্মবহুলতার ঢের প্রয়োজন, কলকাতার এই স্বচ্ছন্দ পটভূমির থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থাকা চলে না।' (জীবনানন্দ দাশের পত্রাবলী, ১৯৫১, ভূমিকা।)

ক্রমে স্টীমার যাত্রার বস্তুগত দিকগুলি আসতে থাকে। ক্রমেই আমরা বুঝতে পারি—প্রেম-প্রকৃতি-ইতিহাস-মৃত্যু ইত্যাদি নিয়ে জীবনের বিস্তীর্ণতার অনুভবে অথবা 'উত্তরসামরিক সংস্কৃতি বিকারের' বৃহৎ ক্ষেত্রেই শুধু তাঁর মানস-সঞ্চরণ ছিলো না, প্রাত্যহিক জীবনের অসুন্দর কদর্যতা তাঁকে প্রতিমুহূর্তেই বিদ্ধ করতো। আমরা চারিদিকের

ভিড়, নোংরা, কুৎসিত আচরণ ও অশালীন ভাষা অনেকটাই দেখেও দেখি না, শুনেও শুনি না। জীবনানন্দ কোনোদিনই এতে অভ্যস্ত হতে পারেননি। তাই যখন তিনি পারিপার্শ্বিক বাস্তবের বিবরণ দিতে বসেন, তাঁর বর্ণনায় মনের অসহনীয় অবস্থায় চাপ এসে যুক্ত হয়। ভাষা ও ভঙ্গি হয়ে ওঠে এত তীক্ষ্ণ যে প্রায় অশ্লীলতার ধার ঘেঁষে চলে যায় সময়ে সময়ে—যা হয়তো আমাদের মনে হতে পারে কিছুটা বাড়াবাড়ি। ডেকের যাত্রী, হাঁসমুরগীর খাঁচা, বয়লারে কয়লা দেওয়া, মাটির থালায় খালাসীদের সালুন খাওয়ার বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'যেখানে খুশি থুতু ছিটিয়ে ফেলা' 'পেচ্ছাপের গন্ধের' কথা বারবারই বলেন। কবিতাতেও যেমন একটি কথা ঘুরে ঘুরে বলা তাঁর স্বভাব। কিছুতেই কথাটা ভুলে যেতে পারেন না বলে, ঘটনাটা তাঁকে খুব কষ্ট দেয় বলেই বলেন। স্টীমারে বনবিহারী নামে এক পরিচিত ব্যক্তির সঙ্গে দেখা হয় সুকুমারের। তার কাছে সে শোনে যে, তার বাল্যসঙ্গিনী চারুলতা প্রসবকালীন রোগে মৃত্যুপথগামী (চারুলতা নামটির সঙ্গে বনলতার মিল একটু আনমনা করে আমাদের।) এইখানে বনবিহারীর একটি সংলাপ নেওয়া যাক—'অস্থিচর্মসার যা পেত্নী হয়ে দাঁড়িয়েছে চারু! ফটিকের লাঙলে তো মরচে পড়ে গেল; কিন্তু বেচারা যেদিকে তাকায় সেদিকেই বিছুটি, বিড়াল আঁচড়ার জঙ্গল.... পুরুষ মানুষের শরীর—বেশিদিন এসব সইবে না—দেবে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে শাঁকচুন্নির গর্তে ঠেলে! অনেকদিন পরে দুই ব্যক্তির দেখা হলে স্বাভাবিক পরিবেশে স্টীমারে যেতে যেতে এমন ভাষায় তারা কথা বলে কিনা, এ প্রশ্ন এখানে অবান্তর। সংলাপের বাস্তবতা বিষয়ে জীবনানন্দের ধারণা একটু অন্যরকম ছিলো। বক্তার মনের মধ্যে যে ভাবটি আছে তাকেই তিনি ভাষারূপ দেবার চেষ্টা করেন সংলাপে। প্রায় সর্বত্রই। এ কারণে তাঁর সংলাপের ভাষা বস্তুবিচারে অস্বাভাবিক। কিন্তু যা লোকে বাইরে বলে না, অথচ মনে মনে বলে— সেই ভেতরের বাস্তবতাকে প্রকটিতে করবার চেষ্টা করেন তিনি সংলাপ রচনায়। 'মাল্যবান' উপন্যাসে কোনো এক শীতের রাতে স্বামীকে তার শোবার ঘরে আসতে দেখে স্ত্রী বলে, 'রাত দুপুরে ন্যাকরা করতে এল গায়েন। হাত পা পেটে সেঁধিয়ে কম্বল জড়িয়ে এ কোন ঢঙের বলির কুমড়ো সেজে বসেছে দেখ! ও মা,—ও মা!—ও মা! বেরোও বলছি।' মনে রাখতে হবে মাল্যবানের স্ত্রী উৎপলা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে, কলেজে পড়েছিলো এবং প্রাক্‌বিবাহ যুগে টেররিস্ট্‌ দলের সঙ্গে যোগ ছিলো তার। এবং এই সংলাপের আগে কোনো মনোমালিন্য ইত্যাদি হয়নি। যে বিরাগ-সম্পর্কের মধ্যে তারা নিয়ত বাস করে তারই প্রকাশ এই উক্তিতে। মাল্যবানের প্রতি উৎপলার যাবতীয় উক্তি—সবই এই সুরে বাঁধা। এ তার ভাষার সত্যরূপ নয় কিন্তু মনের সত্যরূপ। প্রথম উপন্যাসেই তিনি সংলাপ রচনার এই রীতিটি গ্রহণ করেছেন।

বনবিহারীর ব্যবহৃত বাক্যটির ভাবগত বিষয়টি হলো—পুরুষের অতৃপ্ত যৌনকামনা। মানুষের জীবনে এই বোধ শরীরোত্তীর্ণ একটি অনুভবের সঙ্গে মিলতে চায়। শরীরে চাওয়া ও মনের চাওয়া—এই দুইয়ের একটি সুন্দর মিলন কখনই তাঁর গল্প-উপন্যাসে ঘটেনি। শরীর-বৃত্তি ও মনন-বৃত্তির নানারকম বিচিত্র সংযোগ তিনি ঘটিয়েছেন 'জলপাইহাটি'তে; 'সুতীর্থ'র মূল তত্ত্ব অন্য কথা হলেও এই ব্যাপারটি সেখানেও যথেষ্ট জায়গা নেয়। প্রথম উপন্যাসটিতে এভাবেই উঁকি দিয়েছে এই বোধ—যা ১৯৪৮-এ হয়ে উঠবে যৌনতাবোধ-সম্পর্কিত গভীরতর ভাবনা।

উপন্যাসটির তৃতীয় পর্যায়ের নায়িকা বিনতা—বলা যাক, সুকুমারের মনে বিনতার স্মৃতি। স্মৃতিধৃত এই প্রেম কিন্তু নারী-পুরুষের দেহমন-সমন্বিত সুস্থ ও স্বাভাবিক রূপ

উন্মোচিত করেছে। কলেজে পড়া তরুণের উপর যখন না-দেখা দুটি মেয়েকে পৌঁছে দেবার ভার পড়লো তখন 'নারীর সম্বন্ধে বিশেষ কোনো কৌতূহল ছিল না জীবনে...মন বিরসতা ও অনিচ্ছায় উঠেছিল ভরে'—কিন্তু তাদেরই একজন—বিনতাকে যখন তার ভালো লাগলো তখন সে শুধুই একটি আবেগমধুর অনুভূতিরূপে ঘটনাটিকে নিলো না। তার ভাবনা পৌঁছলো আরো গভীরে—'জীবন যে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসের পথে চলেছিল একদিন একটি কুমারীর সংস্পর্শে এসে আবার তা সাধারণ বাজারের পথে ফিরে এল, বিশ্বাসকে অশ্রদ্ধা করতে শিখল, দেহকে জীবনের পরমসুন্দর পুরস্কার বলে মনে করে নিল—হৃদয়কে প্রত্যাশী ভিখারির মত সরিয়ে রাখবার আয়োজনে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।' বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণের অনিবার্যতা এবং মানুষের শুভবোধের সঙ্গে তার দ্বন্দ্বের কথাই এখানে জীবনানন্দকে ভাবতে দেখা যাচ্ছে। এই আকর্ষণ ও সংঘাতের প্রবলতর ও দুর্বোধ্যতর স্তরগুলি পরবর্তী লেখাগুলিতে আসবে। এই সংঘাত প্রতিষ্ঠিত হবে মানবজীবনের একটি প্রধান চালিকাবৃত্তিরূপে।

বিনতার প্রতি সুকুমারের আকর্ষণ শরীরসর্বস্ব ছিলো না। বিনতার অস্ফুট অনুরাগের ইঙ্গিত লাভ করেছিলো সে। শুধু এই উপন্যাসেই পারস্পরিক হয়েছে প্রেমের অনুভব। বিনতা অবিবাহিতা থাকে। চাকরি করে। দেখা হয় না কখনই, যদিও কেন তাদের বিয়ে হলো না, পরেও বা কেন দেখা হয় না—এসব তথ্য পাঠককে মোটেই দেবার চেষ্টা করেন না লেখক। সুকুমারের স্মৃতিতে শুধু থেকে যায়—'হাতীর দাঁতের মত হলুদ, ম্লান, পথক্লান্ত মুখখানা দেখেছিলাম...' আর তার শেষ প্রার্থনায় রচিত হয় উপন্যাসের অন্তিম ছত্রটি—'যদি কোনো ভবিষ্যৎ জন্ম থাকে—এই নক্ষত্রেই ফিরে আসতে যদি হয় আবার—ইছামতীর পারে, কোনো একটা নিশুতি বটগাছের পাশে গেরুয়া রঙের ইটের একখানা বাড়ির ভিতর বিনতাকে নিয়ে আমাকে একটা জীবন কাটিয়ে দিতে দিও বিধাতা।' এই বোধ অবশ্যই যৌনকামনা ছাড়ানো সূক্ষ্ম-রুচি প্রেম কিন্তু দেহ-মনসংলগ্ন কোনো প্রফুল্ল মিলন একে বলা যায় না। বস্তুত এ প্রেম শুধুই স্মৃতি—ছায়া। বিনতার প্রতিভাস 'রূপসী বাংলা'র ম্লান কিশোরীর রূপে ও বনলতা সেনের কল্প-প্রতিমায়। ঐ কবিতাগুলি এই সময়ের কাছাকাছিই লেখা হয়েছিল। এরপরে কাব্যগ্রন্থেও ঘটে ভূমিবদল—উপন্যাসেও অধরা মানসীর দেখা পাওয়া যায় না আর। গতানুগতিক ধরনের রোমান্টিকতাবোধের টান এই পর্বের পর কাটিয়ে উঠেছিলেন জীবনানন্দ।

৫

এ পর্যন্ত গদ্যশিল্পী জীবনানন্দের রচনায় যে প্রবণতাগুলির সন্ধান পাওয়া গেছে তা হলো—প্রেম ও যৌনতা, পারিবারিক জীবনের অ-তৃপ্তি এবং সংসারের কদর্যতার প্রতি বিরাগ। সেই সঙ্গে মুগ্ধ অতীতচারণ, প্রকৃতির রূপরহস্যময় বাতাবরণ সম্পর্কে একটি ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়ের বোধ। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে এই নকশার মধ্যে ঢুকে পড়ে একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব এবং নকশাটির বদল ঘটে। মানুষের জীবনে অর্থের প্রয়োজনবোধ এবং সেই প্রয়োজনবোধ অনুসারে প্রতিটি মানুষের জীবনের গড়ন নির্ণীত হচ্ছে—এই গভীর সত্যটি সম্পর্কে আর্ত সচেতনতা তাঁর লেখায় ধ্বনিত হতে থাকে এর পর থেকেই। আগের দুটি লেখায় উল্লেখ আছে। 'ছায়ানট' গল্পের ডাক্তার দামী স্যুট পরে এবং নায়কের ঘরের জীর্ণতা দেখে কুণ্ঠিত হয়—এইটুকু উল্লেখেই কিন্তু ইঙ্গিতটি ধরা যায়—ধনী ব্যক্তিটি জীবনের জোরালো স্বাদ ছিনিয়ে নেয় দরিদ্র নায়কের কাছে থেকে। 'প্রেতিনীর রূপকথা'র

প্রথম দিকে সমস্যাটিকে স্পর্শ করেন জীবনানন্দ। পুরোনো একটি পরিবার ভেঙে পড়ছে দারিদ্র্যে। টাকার অভাবে স্ত্রী অসন্তুষ্ট ও অতৃপ্ত। নায়ক রোজগারের আশায় কলকাতা যাচ্ছে কিন্তু স্পষ্টতই উপার্জন-মানসিকতার লোক সে নয়। কাজে লাগবে না জেনেও সে প্রিয় বইগুলি সঙ্গে নিয়ে বোঝা বাড়ায়। এমনকি কলকাতায় গিয়ে 'একমাস ভালোভাবে' থাকবে বলে মায়ের হাতের অনন্তজোড়া বিক্রি করে দিতে চায়। এবং মা সেটি দিয়েও দেন। আসলে টাকার সূত্রটি কার জীবনে কিভাবে এবং কি কারণে কাজ করছে সে সম্পর্কে অস্পষ্ট চিন্তা ঘোরাফেরা করছে লেখকের মনে—এইসব লেখার সময়ে। কিন্তু স্টীমার যাত্রা শুরু হবার পর থেকেই সুকুমারের জীবনে অর্থের মূল্যবোধের উল্লেখ আর করা হয় না। বিনতার স্মৃতিচারণই হয়ে ওঠে একমাত্র।

তিন-চার বছরের ব্যবধানে ১৯৩৬-৩৭-এ রচিত যে দুটি ছোটগল্প আমরা পাচ্ছি তাতে কিন্তু প্রবলভাবে এই টাকা-মানুষ সম্পর্ক ভাবনাটি এসে যাচ্ছে এবং সুনির্দিষ্ট হয়ে যাচ্ছে পরবর্তী উপন্যাসগুলির কাঠামো। খুব সংক্ষেপে তা এইরকম,—পৃথিবীতে দু'-জাতের বিপরীতকক্ষবাসী মানুষ আছে। একদল বস্তুসাফল্যকে করায়ত্ত করতে চায়। পারেও। এ ব্যাপারে তাদের দ্বিধা নেই, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপ্রসাদ আছে। অন্যজাতের মানুষেরা একধরনের সূক্ষ্ম অনুভূতির অধিকারী। তারা সেই অনুভূতি ও মননের তৃপ্তি চায়। মানুষের জগতে সামান্যতম তৃপ্তি বিধানের মূলেও টাকার ব্যবহার থাকেই—যতই অল্প হোক না কেন। কিন্তু 'টাকা করার' প্রক্রিয়ার সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না বলে সেই অন্যজাতীয়রা সমাজে উপেক্ষিত থাকে। তাদের শরীর ও মনের কোনো চাহিদাই মেটে না। ফলে তারা থেকে যায় অতৃপ্ত, আত্মপ্রসাদহীন, অন্তর্মুখ ও একক। অথচ যে চরিত্রবলে এ-জাতীয় ব্যক্তি গৌরবান্বিত হয়ে ওঠে সেই মানসিক শক্তি সুতীর্থর মধ্যে কিছুটা আছে, মাল্যবান ও নিশীথের মধ্যে নেই। এই দুই মেরুবিন্দু স্পর্শ করে থাকে নারীচরিত্রগুলি। দুই পক্ষের সঙ্গেই তাদের বিচিত্র সংযোগ দেখা যায়।

এই ছকটি স্পষ্টভাবে পেতে দেওয়া হয়েছে 'গ্রাম ও শহরের গল্প'-তে। এখানে তিনটিই চরিত্র। তিনজনেই প্রধান। সুনিপুণ চরিত্রাঙ্কন প্রকাশের—যে আর্থিক সাফল্যের জন্য—'নিজের অস্তিত্বকে যথাস্থানে ক্ষুন্ন করে দিতে রাজী, কাজ হাঁসিল করতে ওস্তাদ, রসিকও, রসবোধসম্পন্ন, মাত্রাজ্ঞান খুবই আছে, অক্লান্ত, কিছুতেই ঘাবড়ায় না। জয় করে চলেছে।...রূপোর টাকার মতো জীবনের বাজারের পথে প্রকাশ তার সর্বজনপ্রিয় সর্বজয়ী বাজনা বাজিয়ে চলেছে।' প্রকাশ সাহেবি পোশাক পরে, হুইস্কি ও হ্যাভেনা চুরুট খায়, নিজের বাড়ির ডিনার টেবিলে ফাউলরোস্ট তার প্রাত্যহিক খাদ্য। একই সঙ্গে মোটা মাইনের চাকরি ও স্ত্রীর মর্জি সামাল দিতে পেরে সে নিজেকে 'প্রখর আর্টিস্টের মতো' মনে করে। এমনকি—নিজের অফিসে একটি ষাট টাকা মাইনের চাকরি স্ত্রীর একদা প্রেমিক, বেকার বন্ধুর জন্য আন্তরিকভাবে করে দেবার চেষ্টা করে। সে খুব ভালো করেই জানে, তার আসন টলিয়ে দিতে পারবে না বিত্তহীন সোমেন। এই গল্পে প্রকাশের মতো ব্যক্তিদের প্রতি কোনো বিরাগ নিক্ষিপ্ত হয়নি। তাকে তিনি—'রসবিচার সঙ্কুল রক্তমাংসের একটি পরিতৃপ্ত আশাসম্পন্ন জীব' বলে নির্দেশ করেছেন। সে দায়িত্ববান, নির্ভরযোগ্য, বন্ধুবৎসল, স্ত্রী শচীর জন্য সর্বদা প্রস্তুত। সে বিবেচক ও বুদ্ধিমান। কিন্তু যে-পৃথিবী টাকার নিয়মে চলে সে সেই পৃথিবীর অধিবাসী। সোমেনের সঙ্গে এখানেই তার তফাত। জীবনানন্দের মতো মানুষদের সঙ্গে উপার্জনজীবী সফল ব্যক্তিদের পার্থক্যও এখানেই। প্রকাশের সমজাতীয় চরিত্র পরবর্তী প্রতিটি লেখায় রয়েছে; 'বিলাস'-এর সর্বেন ঘোষ,

'সুতীর্থ'তে বিরূপাক্ষ ও মিঃ মল্লিক, 'মাল্যবান'-এ উৎপলার মেজদা ও অমরেশ, 'জলপাইহাটি'তে জিতেন ও আরো অনেকেই।

এই গল্পের অপর পুরুষ চরিত্র সোমেন। সে অনেক টাকা উপার্জন করতে চায় না। —'জীবন-ব্যবসায়ের প্রতি অবিশ্বাসী—জীবনকে চায় শুধু,...' কিন্তু সোমেন সম্পর্কে এই গভীরধ্বনিময় উক্তিটি এই গল্পে খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়ে ওঠে না। আমরা দেখি, চাকরির জন্য বন্ধুর কাছে সে উমেদারি করে, বন্ধুর পয়সায় আট-দশটা চিংড়ির কাটলেট 'লেজশুদ্ধ' চিবিয়ে খেয়ে নেয় এবং প্রকাশের দামি হ্যাভেনা চুরুট একটার পর একটা খেয়ে যায়। মনে হতে পারে—সে জীবনকে পেতে চায় যে-ভাবে তা কিন্তু ঐ জীবন-ব্যবসায়-লব্ধ অর্থের দ্বারাই সম্ভব। অথচ সেই অর্থোপার্জন-ক্ষমতায় সে অপারগ। সোমেন যদি লেখকের সত্তার ছায়া হয় তাহলে তার সম্পর্কে এই উক্তি হয়তো লেখকেরই আত্মসমালোচনা—'ভাবপ্রবণতায়, আবেগে-ব্যঙ্গে-নিষ্ক্রিয়তায় নিরর্থক হয়ে রইল।' গল্পটিতে একটি মহূর্ত আসে যখন প্রকাশের স্ত্রী এবং সোমেনের একদা-সঙ্গিনী শচীর মনের ওপর থেকে সচ্ছল সংসারের হিসেবি ঢাকনাটি সরিয়ে 'নদী-নক্ষত্র', 'ভিজে বালির চর'-এর স্মৃতি জাগিয়ে তুলতে পারে সে, কিন্তু এই বৈলক্ষণ্য সাময়িক বুঝে শচীর উন্মুখতাকে প্রত্যাখ্যান করে সোমেন চলে যায়। তবুও তখনও তার জয় সম্পূর্ণ হতে চায় না। কারণ প্রায় কিছু না ভেবেই তার হাত প্রকাশের একটি দামি হ্যাভেনা তুলে নিয়ে যায়। অর্থক্রীত স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে 'জীবনকে চাওয়া'র বৃহৎ বাসনা আত্মমর্যাদাকে ক্ষুণ্ন করে। আসলে জীবনানন্দের প্রতিপাদ্য বিষয়টি ভিন্ন। ত্যাগের মহত্ত্ব বা দারিদ্র্যের গৌরব জাতীয় কোনো আদর্শবাদী কথা তিনি বলতে চান না এসব লেখায়। তিনি দেখাতে চান—সকলেরই মনে আছে জীবনকে নিজের মতো করে পাবার বাসনা। স্থূল ভোগবাসনার মানুষেরা সক্রিয় উদ্যমে প্রায়ই জীবন থেকে রস নিঙড়ে নেয়, কিন্তু সূক্ষ্ম মনোবাসনার মানুষেরা সেই ধরনের কর্মপ্রেরণাকে আয়ত্ত করতে পারে না বলে বহন করে বেড়ায় এক অনির্বাণ আত্মদহন। তার ফলে 'বিলাস' গল্পের শান্তিশেখর মারা যায়; মাল্যবান তলিয়ে যায় মৃত্যুঘোরের মতো হিমশীতল এক নিদ্রায়, নিশীথ সেন দাঁড়িয়ে থাকে অন্তরাশ্রয়হীন, গন্তব্যহীন ত্রিশঙ্কুর মতো। এরা সংগ্রাম করেনি—তাও নয়। সকলের সংগ্রাম বাহ্যজগতে দৃশ্যমান হয় না। অন্তর্গূঢ়-স্বভাব ব্যক্তির সক্রিয়তা তাদের কাজে নয়, ভাবনায়। তাদের মনের মধ্যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম কারণে অন্তহীন কম্পনস্রোত প্রবাহিত হয়। সেই আলোড়নের আঘাতে আঘাতে তাদের মন হয়ে পড়ে অবসন্ন। সেই মনোসচলতাই তাদের সক্রিয়তা। একালের বহু উপন্যাসেরই নায়ক এই চরিত্রের। জীবনানন্দের সব নায়কেরাই এমন। এদের মধ্যে একমাত্র সুতীর্থ কিছুটা কর্মী ধরনের মানুষ। সে নিজের আদর্শের পথে কিছু একটা করবার চেষ্টা করে। বাকিরা সকলেই লেখক বা অধ্যাপক। অফিসে চাকরি করলেও চাকরিতে নিবেদিত প্রাণ নয়।

তাঁর উপন্যাসগুলির হেরে যাওয়া নায়ক ও পরিণামী হতাশার কথা মনে করে কেউ কেউ বলেন যে, জীবন-সংগ্রাম থেকে তাঁর লেখক-স্বভাব ছিলো পলাতক। ঘটনাটি সত্য যে, তাঁর লেখায় নৈরাশ্য, মৃত্যু, পরাজয়ের কথা যতটা, উত্তরণের বা জয়ের কথা ততটা নেই। কিন্তু সিদ্ধান্তটি হয়তো নির্ভুল নয় যে, তিনি জীবন থেকে পালিয়েছিলেন। একদল মানুষ আছেন যাঁরা সত্যিই এই টাকার বাজনা বাজানো পৃথিবীতে একটু একপাশে সরে থাকেন। পণ্যভিত্তিক সভ্যতার রীতিনীতির সঙ্গে একা লড়াই করে তাঁরা জিততে পারেন না। কোনো আত্মসান্ত্বনাতেই আশ্রয় পান না তাঁরা। জীবনানন্দ নিজে এরকমই একজন

মানুষ ছিলেন। তাঁর নায়কেরা হেরে গেছে ঠিকই কিন্তু হেরে যাওয়ার মানে তো ঠিক পালিয়ে যাওয়া নয়। তারা সকলেই নিজের মতো করে সংগ্রাম চালিয়ে গেছে সমাজের সঙ্গে, পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সঙ্গে। যদিও তাদের কোনো দল ছিলো না বা 'দিন আসছে—আসবে' জাতীয় কোনো সরল বিশ্বাসও ছিলো না—তবু তারা সকলেই ছিলো সচেতন সৈনিক।

'গ্রাম ও শহরের গল্প'-এর নায়িকা শচী। তার জীবন-ধারণা প্রকাশের মতো বস্তুসর্বস্ব নয়, সোমেনের মতো আবেগপ্রবণও নয়। নগর তাকে সম্পূর্ণ যান্ত্রিক করেনি—গ্রামের সৌন্দর্য, বাংলার প্রাণরসের জন্য তার মনে জায়গা আছে. কিন্তু ঐ-টুকুই—তার জন্য একবিন্দুও ত্যাগ স্বীকার করে না সে। প্রকাশের টাকা নিশ্চিন্তে ভোগ করে, ইচ্ছেমতো রেকর্ড কেনে, মধু দিয়ে ক্ষীর খায়। সোমেন 'মাত্র' ষাট টাকার চাকরির প্রত্যাশী জেনে তার 'অন্তরাত্মা শুদ্ধ সিঁটকে ওঠে।' অথচ সে স্বাধীন চিন্তা করতে পারে, স্টেট্‌সম্যান-এ চিঠি লেখে আর সাময়িক হলেও সোমেনের সাহচর্যে গ্রাম-প্রকৃতির অমলিন শুদ্ধতার জন্য ব্যাকুল হয। আজকের সভ্যতার অসংখ্য মানুষের মনের মধ্যে এই দ্বন্দ্বটিআছে। অস্তিত্বের এক নির্মলতার প্রতি টান আর টাকায় কেনা ভোগ-বিলাস উপেক্ষা করার অক্ষমতার মধ্যে দ্বন্দ্ব। এবং পৃথিবীর নির্মোহ সত্য এই—শুদ্ধতার আকাঙ্ক্ষাই দুর্বলতর প্রমাণিত হয় প্রতিমূহূর্তে।

জীবনানন্দের নারী চরিত্রেরা সকলেই শরীরী ভোগবাসনা, হিসেবি সাংসারিকতা আর বুদ্ধির সমন্বয়ে গড়া। তাদের মধ্যে একধরনের প্রখর ইন্‌টেলেক্‌ট্-এর সন্ধান পাওয়া যায়। হৃদয়াবেগ তাদের আছে কিন্তু তার প্রাবল্যে নিজেদের ভোগসুখসর্বস্ব জগৎটিকে কিছুতেই তারা বিচলিত হতে দেয় না। সম্ভবত জীবনানন্দ নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় নারীকে সংসারে এমনই দেখেছিলেন। নারীকে স্নেহময়ী ও প্রেমময়ী করে দেখবার যে ধারাটি ভারতীয় মানসিকতায় প্রধানত দেখা যায় জীবনানন্দ তার ব্যতিক্রম। তাবৎ বাঙালি ঔপন্যাসিকের সঙ্গে এখানে তাঁর অমিল। রহস্যময়ী এক প্রেমিকা তাঁর সাহিত্যে মাঝে মাঝে দেখা দেয় কিন্তু উপন্যাসে স্বপ্নচারিণী বিনতাই শুধু তার উদাহরণ। কবিতার বনলতা, শঙ্খমালাদের বা উপন্যাসের বিনতাকে স্থাপন করা হয়নি বাস্তব সংসারে। তারা শুধুই প্রেমিকের মনোজগতে, স্মৃতির দূরত্ব নিয়ে কল্পনায় দেখা দেয়। তাঁর উপন্যাসের আবেগ ও গার্হস্থ্য-সংস্কার বর্জিত এই রমণীদের একটি আত্মিক অন্বেষণও আছে। তাদেরও আছে অস্তিত্বের মূল্যবোধ সম্পর্কে নিজস্ব জিজ্ঞাসা তাদের কেউ কেউ বুদ্ধিচালিত একটি স্বাধীন পথ খুঁজে পেয়েছে। আত্মবৃত্ত মননচর্চার একটি নিজস্ব ঘরে তাবা তৃপ্তি পায়। এই ঘরের দেয়াল স্বচ্ছ, কঠিন দূরদৃষ্টিসম্পন্ন ও নিরাবেগ—কিন্তু তা দেয়ালই। এই গল্পের শচী, 'সুতীর্থ'র জয়তী, 'জলপাইহাটি'র নমিতা বা সুলেখা ও জুলেখা এই জাতীয় রমণী চরিত্র। আবার কেউ কেউ নিখাদ শরীর লিপ্সার পথেই অস্তিত্বের সেই পূর্ণতাবোধকে স্পর্শ করে। জীবজগতের যাবতীয় প্রাণময় সত্তা যে পথে বেঁচে থাকার অদম্য তৃষ্ণা মিটিয়ে চরিতার্থ হয়। এই ধারাটি রূপ নিয়েছে 'মাল্যবান'-এর উৎপলার মধ্যে।

পরবর্তী গল্প 'বিলাস'। অর্থোপার্জন প্রতিযোগিতায় নিরাসক্ত, অন্তর্লীন ব্যক্তির আত্মজগতে বিচরণ করবার প্রিয় অভ্যাসকেই জীবনানন্দ বলেছেন 'বিলাস'। এ গল্পের নায়ক শান্তিশেখরের মনের চেহারাটি লেখকের কয়েকটি উদ্ধৃতি সাজিয়ে ফুটিয়ে তোলা যেতে পারে। এই ব্যক্তিটির হৃদয় বড় যত্নে খুলে দেখিয়েছেন জীবনানন্দ।

'যে রকম ঘরদোর পারিপার্শ্বিক টাকাকড়ির স্বাধীন সচ্ছলতা সে চেয়েছিল, কোথায়

সে সব?'

'আরো ঢের বড় বইয়ের জগৎ বাইরে পড়ে রয়েছে—কিন্তু এসব না পড়েই মরে যেতে হবে তাকে। তাছাড়া নারীকে না ভালোবেসেই চলে যেতে হবে। কোথায়ই বা সেই নারী?'

'ক্যাজা শরীরটা তার একজায়গায় স্থির হয়ে বসে থাকবারও উপযুক্ত নয়—অথচ সারা দিন তাকে লাফিয়ে নেচে রণপায়ে ছুটে ঝকমারী করতে হবে।'

'কিন্তু সেই রাতেই নিজের বিছানায়—শীতের রাতের গভীরতার ভিতর কী করে যে তার মৃত্যু হল, ডাক্তার কোন পরিষ্কার হিসেব দিতে পারল না।'

এই হলো শান্তিশেখরের জীবন-মৃত্যুর গল্প। অফিসে তার ওপরওয়ালা সর্বেন ঘোষ—টাকা ও ক্ষমতা দিয়ে সে মানুষকে মাপে আর শান্তিশেখর সম্পর্কে ভাবে—'...বিলাস মানে খুব সম্ভব বিষয়-আশয়ের মায়া কাটিয়ে ন্যালা-ভোলা জিনিস নিয়ে ভোম হয়ে থাকা।' অমলেন্দু বসু সঠিকভাবেই নির্দেশ করেছেন যে, বিলাস ও শান্তিশেখরের চারিত্রিক বৈপরীত্য 'জীবন সম্বন্ধেই দুই বিপরীত ধারণার ফল'। তিনি আরো বলেছেন—'এই বৈপরীত্যের চিত্রণে জীবনানন্দ পঁচিশ বছর আগেকার মধ্যবিত্ত বাঙালী সমাজের এক তীক্ষ্ণ মূল্যায়ন করেছেন।' (জীবনানন্দ দাশের গল্প, দাশগুপ্ত এণ্ড কোম্পানি, ১৩৭৯।) কিন্তু এই বৈপরীত্য সম্ভবত সর্বদেশে এবং সর্বকালে নিয়তবহমান দুই জীবন-ধারণা। গল্পটিকে আলাদা করে বাঙালি সমাজের বিশেষ কোনো চিহ্ন বহন করতে দেখা য়ায় না। গাছ-ফুল-পাখি বা খাদ্যবস্তুর নাম ইত্যাদি অবশ্যই কিছু কিছু বাংলার কিন্তু গল্পের মূল কথাটি বিশেষভাবেই সর্বজাগতিক। বরং তাঁর পরবর্তী উপন্যাসগুলিতে বাংলা তথা ভারতবর্ষের মানুষ-সমাজ-রাজনীতি আলাদা করে ব্যবহৃত হয়েছে।

সুস্মিতা—অফিসের সহকর্মিণী—সর্বেন ঘোষের অনুগৃহীতা—একদিন এসে দাঁড়ায় শান্তিশেখরের কাছে। কিন্তু শান্তিশেখরের কল্পনার নারীটি রূপহীনা সুস্মিতার মধ্যে না থাকায় তাকে প্রত্যাখ্যান করে সে এবং নিঃসঙ্গ থেকেই সে মারা যায়। তার মৃত্যু কাউকেই বিচলিত করে না, শুধু সুস্মিতাকে করে। তার পরও সে সর্বেন ঘোষের মোটর-যাত্রার সঙ্গিনী হয়, উচ্ছ্বসিতভাবে হাসেও কিন্তু তার চোখ জলে ভরে যায় বার বার। সুস্মিতাকে দিয়েই গল্পটি শেষ হয়—'হাসতে হাসতে শরীর-মন অন্ধকার হয়ে যাচ্ছিল সুস্মিতার'। সুস্মিতার মনোসংবেদন শচীর চেয়ে কোমল। শচীর কোনো সত্যিকারের বেদনা নেই। সুস্মিতার আছে। তবু পণ্য-পৃথিবীর অর্থ-শাসন মেনেই নেয় সে, অভ্যন্তর-সংগ্রাম তার এত বেশি নয় যে শান্তিশেখরের মতো লোপ পেয়ে যাবে অসম প্রতিরোধ গড়ে তুলতে গিয়ে।

এই গল্পদু'টির নির্মাণ-দক্ষতা সম্পূর্ণ বিষয়ানুগত ও সুপরিণত। কোথাও কোনো বাহুল্য নেই। মানুষের জটিল ও সূক্ষ্ম অন্তঃকরণকে এক অলিখিতপূর্ব ভাষায় আশ্চর্য এক কোমল-কর্কশ পরিপূর্ণতা তিনি দিয়েছেন। রচনা-রীতি প্রসঙ্গ পরে আলোচিত হবে।

৬

চরিত্র-বিন্যাসের এই পরিকল্পনা ১৯৪৮-এ রচিত উপন্যাস তিনটিতে প্রায় অক্ষুণ্ণই রেখেছিলেন জীবনানন্দ। অবশ্যই গল্পের চেয়ে উপন্যাসের বিস্তার বেশি হওয়ায় বিন্যাসটি গল্পদু'টির মতো সরলরেখাঙ্কিত নয়। তিনটি উপন্যাসেই অস্তিত্বের সমস্যা ও জিজ্ঞাসা মূল বিষয় হলেও সেই ভাবনার এক একটি দিক এক একটি উপন্যাসে প্রাধান্য পেয়েছে।

প্রকাশিত উপন্যাসমালার মধ্যে সর্বপ্রথম রচিত উপন্যাস 'জলপাইহাটি'। রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজতত্ত্ব বিষয়ে এখানে তীক্ষ্ণ চিন্তাভাবনার সমাবেশ ঘটেছে। সমাজ-ভাবনামূলক একটি বিস্তৃত পটভূমিকার উপন্যাস যেন লিখতে চাইছেন জীবনানন্দ। উজ্জ্বলকুমার মজুমদার বলেছেন ঃ 'যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশের বিচিত্র অবক্ষয়ের একটি বড় প্রেক্ষাপটে উপন্যাসটি লেখা।' (পাঠকের চিঠি, শিলাদিত্য, জুন, ১৯৫১।)

ঘটনাংশ এরকম—বেসরকারি কলেজের অতি অল্প মাইনের অধ্যাপক নিশীথ সেন প্রিন্সিপাল ও গভর্নিং বডির নানা পক্ষপাত ও অমর্যাদায় বীতশ্রদ্ধ হয়ে জলপাইহাটি ছেড়ে, রুগ্ন স্ত্রীকে রেখে কলকাতায় চলে আসে। কলকাতায় তার ধনী ব্যবসায়ী বন্ধু জিতেনের বাড়িতে গিয়ে ওঠে। প্রসঙ্গত, বেসরকারি কলেজে নিজে দীর্ঘদিন পড়িয়েছিলেন জীবনানন্দ এবং নানা জায়গায় শিক্ষাব্যবস্থাবিষয়ক নানা প্রবন্ধও লিখেছিলেন। (দ্র. দেশ, ১৪ই ভাদ্র, ১৩৫৯; মাসিক বসুমতী, কার্তিক, ১৩৫৫; শারদীয় বসুমতী, ১৩৬০।) সেইসব প্রবন্ধের চিন্তামূলক উক্তি আর নিশীথের কলেজের ব্যবস্থা-বিষয়ক বিবরণ অনেকক্ষেত্রেই একই ভাষায় রচিত। কিন্তু অন্য কোনো চাকরির ব্যবস্থা তার হয় না—প্রবলভাবে সচেষ্ট হতেও দেখা যায় না তাকে। নানা জনের সঙ্গে তার নানা কথাবার্তা হয়—জিতেনের স্ত্রী নমিতা; একদা সহপাঠী ,বড়লোক বন্ধু রবিশংকর; প্রফেসর ঘোষ; প্রিন্সিপাল কুলদাপ্রসাদ; একটি কলেজের প্রধান পৃষ্ঠপোষক জয়নাথ। সেইসব কথাবার্তার টুকরো গেঁথে সম্পূর্ণ চালচিত্রটি নির্মিত—যার মধ্যে ধরা পড়েছে ক্যাপিটালিজ্‌ম্‌, সোশ্যালিজ্‌ম্‌, কমিউনিজ্‌ম্‌-এর টানাপোড়েনের মধ্যে দিয়ে একটি সুস্থ সভ্যতার পথ সন্ধানের আকাঙ্ক্ষা। সেখানে মূল কথাটি সেই ধনিকতন্ত্রের অধীন পৃথিবীতে দুর্বলের শোষিত হবার কাহিনী।

নিশীথের অনুপস্থিতিতে জলপাইহাটিতে যায় তার ছেলে হারীত যে বামপন্থী দলে যোগ দিয়ে ঘর ছেড়েছিলো। সেখানে তার বাক্যালাপ চলে মা সুমনা, প্রতিবেশিনী অর্চনা, কলেজের ছাত্রী সুলেখা ও জুলেখার সঙ্গে। সেইসব আলোচনাও সমাজব্যবস্থার নানা মুখের ওপর আলোকপাত করে।

উপন্যাসের অন্যদিকটি হলো নারী-পুরুষ সম্পর্কের আকর্ষণ। এই উপন্যাসের অন্যতম বৈশিষ্ট্য—এই সম্পর্কগুলির জলপ্রবাহের মতো সচলতা। প্রতিবেশিনী অর্চনার সঙ্গে নিশীথের সম্পর্কটি সূক্ষ্মভাবে কামনাময়; জিতেনের স্ত্রী নমিতার সমস্ত ভাবনা ও আচরণের মধ্যে যৌনরহস্যের দুর্বোধ্যতা; আবার হারীত ও অর্চনার সাধারণ কথার মধ্যেও কাম-সম্পর্কের বিদ্যুৎস্পর্শ ঠিকরে ওঠে; হারীত ও জুলেখার সান্নিধ্যের মুহূর্তগুলি সেই আকর্ষণেরই রহস্যে ভরা। উপন্যাসের পরিসমাপ্তির জায়গাটি অদ্ভুত। সুলেখা যে মুহূর্তে ওয়াজেদ আলি সাহেবকে বিয়ে করবে বলে কথা দেয়, সেই মুহূর্তেই কন্যার মৃত্যুসংবাদ নিয়ে ফিরে এসে নিশীথ দেখে তাঁর স্ত্রীও মারা গেছে। এবং সেই মুহূর্তেই তার ও সুলেখার মধ্যে একটি মনঃসংযোগ নির্মিত হয়। দুজনের অস্তিত্ব দুজনকে টানে। নিশীথ সুলেখাকে বিয়ে করার কথা ভাবে, সুলেখা নিশীথের সান্নিধ্য ছেড়ে যায় না। উপস্থিত সকলেই যেন অবাস্তব এক পরীরাজ্যে পা রেখে দাঁড়িয়ে থাকে—আর, এখানেই লেখাটি শেষ হয়ে যায়।

উপন্যাসটির পরিকল্পনায় সমাজচিত্রণমূলক বাস্তবতার একটি দিক আছে—আবার চরিত্রগুলির পারস্পরিক আচরণের একান্ত অ-স্বাভাবিক একটি প্রতীকী স্তর আছে। কিন্তু একটিকে অপরটির সঙ্গে ঠিকমতো মেশানো হয়নি—ফলে দু'টি দৃষ্টিকোণই ঈষৎ অগোছালো থেকে যায় যেন, কোনোটিই সুপ্রতিষ্ঠিত হয় না। পরবর্তী উপন্যাস-দু'টির মতো একটি সুরেখ নক্‌শা নির্মিত হয়নি এখানে—পরিসমাপ্তির মধ্যে সেই অভ্রান্ততা

সঞ্চারিত হয়নি। হয়তো এটাই বলতে চেয়েছেন যে—সমাজকে মানুষ যেভাবেই সাজাক তার ব্যক্তি-অস্তিত্বের মূলে একটি ব্যাখ্যাতীত যৌনবাসনাই অন্যতম প্রবর্তক চেতনারূপে কাজ করে যায়। বলার কথাটি সুবোধ্য পরিচ্ছন্নতা লাভ করলো কিনা—'জলপাইহাটি' প্রসঙ্গে এ সংশয় অসঙ্গত নয় হয়তো। যদিও মনে রাখবো—কোনোরকম পরিমার্জনাই তিনি করেননি। 'জলপাইহাটি' উপন্যাসের এই আপাতশিথিল গড়নই লেখকের উদ্দেশ্য ছিলো—এমন হতেও পারে। তা যদি হয় তাহলে বিশেষভাবে এই উপন্যাসটি দাবি করবে পৃথক ও অনুপুঙ্খসহ আলোচনা। কিন্তু পরের উপন্যাস-দু'টির কিছুটা পরিমার্জিত যে প্রেস-কপি তিনি প্রস্তুত করেছিলেন তাতে মনে হয় উপন্যাসকে খুব বেশি আলগা হতে দেওয়া তাঁর অভিপ্রেত ছিলো না। কবিতাতেও তিনি শিথিলতার ভাবটি সচেতনভাবেই নিয়ে আসেন মনে হয়। দ্বিতীয় উপন্যাস 'সুতীর্থ'তে রচয়িতার ব্যক্তিত্ব ও রচিত-চরিত্রের মধ্যে অনুভব করা যায় কিছুটা শৈল্পিক দূরত্ব। কিন্তু 'মাল্যবান' ও 'জলপাইহাটি'তে একেবারে নিজের মানসচিত্র মেলে ধরেছেন জীবনানন্দ। তাঁর ব্যক্তিরূপ প্রতি পদেই পাঠকের সামনে এসে দাঁড়ায়। কবিপত্নী লাবণ্য দাশ তাঁর জীবৎকালে উপন্যাসগুলি অনেকদিন প্রকাশের অনুমতি দিতে চাননি কেন তা সহজেই বোঝা যায়। হয়তো ভালোই করেছিলেন। সাধারণ পাঠকের কাছে কল্পিত ঘটনাগুলি বড় হয়ে উঠে ঢেকে ফেলতে পারতো শিল্পীর ভিতর-মনের স্পন্দনগুলি। সবটাই 'ব্যক্তিগত জীবন' মনে করে তাঁর আসল কষ্টটা দেখতে পেতাম না আমরা, একটু সময়-দূরত্ব থাকা বোধহয় ভালোই।

উপন্যাসের নায়ক সুতীর্থ। চাকরি করে, ভাড়া বাড়িতে থাকে। একা। একসময়ে লিখতো কিন্তু সৎ-লেখকের পক্ষে প্রয়োজনীয় সময় না থাকায় লেখা ছেড়ে দিয়েছে। 'অর্থের সচ্ছলতা নেই। এই নিরেট পৃথিবীতে টাকা রোজগার করতে গিয়ে মূর্খ ও বেকুবদের সঙ্গে দিন-রাত গা ঘেঁষাঘেঁষি করে মনের শান্তিসমতা যায় নষ্ট হয়ে...'। টাকা রোজগারী ব্যক্তিদের সম্বন্ধে এই তিনটি উপন্যাসেই লেখকের একটি বিরাগ প্রকাশ পেয়েছে। এই সুতীর্থ নিঃসঙ্গ ও নিরর্থক জীবন কাটায় আর সার্থকতার সন্ধান করে। তার এই সন্ধানের একটি বিবরণ তুলে দিচ্ছি—এ-জাতীয় দ্বিতীয় একটি দৃষ্টান্ত বাংলা উপন্যাসে পাওয়া কঠিন। পথে পথে ঘুরে বেড়ায় সুতীর্থ। দেখে পৃথিবীতে অকপটতা বলে কিছু নেই আর এমন সময়ে একটি 'লিকলিকে বানরবাচ্চার' মতো পকেটমার শিশুকে সে ধরে ফেলে। ছেলেটি মুক্তি চায় নিজের বারো আনা সম্বলের বিনিময়ে। সমস্ত হৃদয়ের আকূতি উজাড় করে দিয়ে বলে—'এই বারো আনা তোমাকে দেব বাবু?' প্রশ্নটির অকৃত্রিম আবেগ বিচলিত করে সুতীর্থকে—'কোনো নারী বা শিশুর কাছ থেকে এরকম আশ্চর্য, অকপট তলদেশ থেকে আবেদন এসেছিল কি সুতীর্থের কাছে? 'এসেছিল একবার—একটা ইঁদুরকে কলে আটকে যখন সে নদীর জলে ডুবিয়ে মারতে গিয়েছিল; একটি শিশু তাকে বাধা দিয়েছিল, একটি নারী পথ আগলে দাঁড়িয়েছিল, ইঁদুরটা নিজেও শেষ পর্যন্ত আপ্রাণ চেষ্টা করেছিল।' শেষ ছত্রটি পড়ে মনে হয়—প্রাণে বাঁচার আকূতি থেকেই শুধু অকপটতার মহূর্ত আসতে পারে জীবনে—এমনও ভেবেছিলেন জীবনানন্দ। সুতীর্থের শুদ্ধ পৃথিবীর সন্ধান অব্যাহত থাকে। বাল্যবন্ধু মধুমঙ্গলের কাছে যখন সে ফেলে আসা গ্রামের সুন্দর স্মৃতির ছবি তুলে ধরে তখন মধুমঙ্গল তার স্বপ্ন ভেঙে দিয়ে বলে—'লোকের মাথা পাতার জায়গা নেই। মন্বন্তর, দাঙ্গাহাঙ্গামা, দুটো যুদ্ধ, কালোবাজার, মিলিটারিরা সেঁটে চিবিয়ে খেয়ে গেছে সব...'। অতএব গ্রামে এখন আর কোনো আশ্রয় নেই। তারপর সে একটি কারখানার ধর্মঘটী শ্রমিকদের সঙ্গে মিলে ধর্মঘট সফল করবার চেষ্টা করে।

ধর্মঘটের বিবরণে এসে স্পষ্ট বোঝা যায় ১৯৪৮-এর সামাজিক পরিস্থিতি বিষয়ে তিনি কতটা সচেতন ছিলেন। ধর্মঘট বিষয়ে শ্রমিকদের কিছু বোঝা কিছু না-বোঝা আচরণ, অন্তর্ঘাত, দু-তিনটি রাজনৈতিক দলের প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা ; মালিক পক্ষের চক্রান্ত—ইত্যাদি বিষয় অনায়াস ইঙ্গিতের সাহায্যে প্রকৃত সত্যের আলোয় উদ্ভাসিত করে তুলেছেন তিনি। সুতীর্থের এবং 'জলপাইহাটি'র নিশীথের ভাবনায় ১৯৪৮-এর দেশের সদ্যোপ্রাপ্ত স্বাধীনতা ও দেশ-বিভাগের পটভূমিকায় বিশ্বরাজনীতি বিষয়ে বহু প্রসঙ্গ এসেছে। বোঝা যায়, সেই মুহূর্তে জীবনানন্দ পৃথিবীর কোথাও কোনো সুস্থ নীতি খুঁজে পাচ্ছেন না। বাগাড়ম্বরের নিহিত ফাঁকি প্রকট হয়ে গেছে তাঁর কাছে। তাঁর কবিতাতেও একই মানসিকতার প্রতিফলন ঘটেছিলো। তবু সুতীর্থ সেই বিশ্বাসহীন অন্ধকারের মধ্যেও মানুষকে সেবা করার পথ অবলম্বন করেছে। জীবনানন্দও যেমন 'সুচেতনা' কবিতায় বলেছেন : 'পৃথিবীর গভীর গভীরতর অসুখ এখন; মানুষ তবুও ঋণী পৃথিবীরই কাছে।' 'সুচেতনা' কবিতাটিকে বস্তুত 'সুতীর্থ' উপন্যাসের 'সিনপ্‌সিস্‌' বলা যেতে পারে। সুতীর্থের আত্মকথার একটি অংশ এবং 'সুচেতনা' কবিতার একটি স্তবক পাশাপাশি রাখছি :

সুতীর্থ : 'কাজ করা ছাড়া পথও নেই এযুগে; নিজের সত্তা যুক্তিতর্কের চিন্তা অনুশীলনের প্রভাবে অপরদের যতদূর সম্ভব পরিচ্ছন্ন শুদ্ধ করে নেবার চেষ্টা করে [ব্যর্থ সে চেষ্টা] নিদারুণ অপরিচ্ছন্ন অন্ধকার বলয়ের ভেতর কাজ করা ছাড়া উপায় নেই—উপায় নেই এযুগে।'

সুচেতনা : 'পৃথিবীর মানুষকে মানুষের মতো ভালোবাসা দিতে গিয়ে তবু, দেখছি আমারি হাতে হয়তো নিহত ভাই বোন বন্ধু পরিজন পড়ে আছে;...তবু চারিদিকে রক্তক্লান্ত কাজের আহ্বান।'

তাই শেষপর্যন্ত সুতীর্থ অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্য, নারীসঙ্গ ও নগর-সভ্যতার সব আকর্ষণ ছাড়িয়ে, শূন্যহাতে গ্রামের মানুষের সঙ্গে কাজ করতে চলে যায়। তখন সূর্যের মতো সমুজ্জ্বল তার রূপ।—'সুতীর্থ চলেছে—সূর্য জ্বলে।' 'সুচেতনা'র শেষ পঙ্‌ক্তি : 'শাশ্বত রাত্রির বুকে সকলি অনন্ত সূর্যোদয়।' সুতীর্থ জীবনানন্দের নায়কদের মধ্যে একটু ব্যতিক্রম। 'মানুষের ভালো হবে'—এমন কোনো দৃঢ় বিশ্বাস না থাকলেও 'এভাবেই বাঁচতে হবে'—এই বোধ তার মধ্যে কাজ করে। জীবনানন্দের মধ্যেও এই বোধ কাজ করতো। অলডাস হাক্সলী-র 'গিওকোন্দা স্মাইল' নামক গল্পের নাট্যরূপের সমালোচনা প্রসঙ্গে নিজের মনের এই ভাবনাটি মেলে ধরেছিলেন তিনি : '...পৃথিবী কোনোরকম আশ্রম ঠিক নয়। হতে পারেনি এখনও; কোনোদিন ছককাটা আশ্রম হবে বলে মনে হয় না। হবে? চেষ্টা থামতে চায় না মানুষের;—...সুদিন আসবে—সকলের জন্যে—আশা করে মানুষ; কাজ করে,...'। (চতুরঙ্গ, শ্রাবণ, ১৩৫৬।) পরবর্তী দু'টি উপন্যাসে হতাশার কথা একটু বেশি—পৃথিবীর কূটস্বার্থময় রূপ, যৌনকামনার তীব্রতা-ব্যথিত রূপ প্রকটতর কিন্তু তা সত্ত্বেও জীবনানন্দের এই নিজস্ব জীবনদর্শনটি—রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলা যাক মানুষের এই 'জয়হীন চেষ্টার সঙ্গীত, আশাহীন কর্মের উদ্যম'—সর্বত্র প্রতিফলিত। তাঁর জীবনের মধ্যপর্ব থেকে শেষপর্বে লিখিত কবিতা, গল্প, উপন্যাস, প্রবন্ধ, সমালোচনা সর্বত্রই কম-বেশি এই একই কথা। এই মানুষটিকে যখন কেউ কেউ 'মনুষ্যময়ী পৃথিবীকে এড়িয়ে চলার অত্যদ্ভুত অহংকারে অবরুদ্ধ' (বিমলচন্দ্র ঘোষ, জীবনানন্দ স্মৃতি, ১৯৫১) বলে মত প্রকাশ করেন তখন মনে হয়, সত্যিই তাঁকে সঠিকভাবে বোঝা সমকালে খুবই কঠিন

ছিলো। এখনও তাঁকে ঠিকমতো বোঝা যাচ্ছে না হয়তো।

সুতীর্থের মতো 'কর্মক্লান্ত কাজের আহ্বান' ডাক দেয়নি মাল্যবান ও নিশীথ সেনকে।' এই একটি উপন্যাসেই শুভবাদী নায়ক পরিবেশের সঙ্গে প্রাণপণে লড়ে যায়, বদলাতে চেষ্টা করে পরিবেশকে। অন্য দু'টি উপন্যাসে পরিবেশের শক্তির তুলনায় নায়কদের প্রতিরোধ অত্যন্ত দুর্বল। তাই তাদের সংগ্রামী রূপের চেয়ে পরাজিত রূপটিই চোখে পড়ে বেশি।

'সুতীর্থ' উপন্যাসের কাহিনী অগ্রসর হয়েছে দু'টি সমান্তরাল ধারায়। তার একটি নায়ক সুতীর্থ, অপরটির বিরূপাক্ষ। আগের দুটি গল্পের প্রকাশ ও সর্বেন ঘোষের সরলীকৃত চরিত্রায়ণ বিরূপাক্ষের মধ্যে পূর্ণতর মানবিক জটিলতায় স্ফুটিত হয়েছে। বিরূপাক্ষ ওস্তাদ অর্ডার-সাপ্লায়ার। যোগান দেয় লোহালক্কড় থেকে সম্পাদকীয় লেখা পর্যন্ত। তার অনেক টাকা, একাধিক বাড়ি ও গাড়ি। সে মনে করে টাকার জোরেই লাভ করবে কাম্য রমণীকে। জয়তী নামে অভিজাত পরিবারের শিক্ষিতা ও সুন্দরী একটি মেয়েকে অনেক টাকার চেক দেয় সে এবং সরাসরি তার শরীর চায়। জয়তী অনভিজাত বিরূপাক্ষকে মনে মনে উপেক্ষা করলেও তার টাকা দেখে তাকে বিয়ে করে। কিন্তু পঁচিশ লাখ টাকা ছাড়া বিরূপাক্ষ সম্পর্কে তার কোনো চেতনা নেই। সুতীর্থের প্রতি তার আকর্ষণ আছে কিন্তু সুতীর্থ যখন শূন্যহাতে তাকে কর্মযাত্রার সঙ্গিনী হতে বলে তখন জয়তী টাকা ছেড়ে যেতে পারে না। নিজের সম্পত্তিসহ সে ক্ষেমেশ নামে অপর এক বন্ধুর বাড়িতে গিয়ে থাকে। 'টাকা'র অনিবার আকর্ষণ ও দুর্জয় শক্তির দিকটা জয়তীর মধ্যে পুরোটা ও বিরূপাক্ষের মধ্যেও অনেকটা দেখিয়েছেন জীবনানন্দ। কিন্তু বিরূপাক্ষের 'মেটিরিয়ালিষ্টিক মন' হঠাৎ একটি পরশমণির ছোঁওয়া পেয়ে মেখে নেয় স্বর্ণরেণুর কণা। সে মণিকা। জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসের মধ্যে এই একটিই নারীচরিত্র আছে যার মধ্যে আছে নারীত্বের একটি মহিমা। এই তথ্যটি উল্লেখ্য যে, অন্যান্য চরিত্রগুলির ক্ষেত্রে তিনি ক্রিয়াপদের সম্মানার্থক চেহারা ব্যবহার করেন না, অথচ কেবলমাত্র মণিকার ক্ষেত্রেই 'করে' 'বলে' না বলে 'করেন', 'বলেন' ইত্যাদি ব্যবহার করেন। এই প্রয়োগ সচেতন কিনা তা আর এখন জানা যাবে না। মণিকার বাড়ির নিচের তলা ভাড়া নিয়ে থাকে সুতীর্থ। রুগ্ন স্বামী ও অনূঢ়া কন্যাসহ সংসার চালাবার প্রয়োজনে বাড়ি ভাড়া দেন তিনি, ভাড়া বাকি ফেলার জন্য তাগাদাও দেন কিন্তু সত্যিই তাকে তাড়িয়ে দেন না। সুতীর্থদের প্রতি মমত্ববোধ আছে তাঁর কিন্তু সীমা কখনো লঙ্ঘন করেন না। তবু মণিকা সুতীর্থের কিছুটা খোঁজখবর নেন। না ফিরলে কারণ জিজ্ঞাসা করেন। সুতীর্থের খোঁজে এসে মণিকাকে দেখে মুগ্ধ হয় বিরূপাক্ষ। নারীর রূপে ও ব্যক্তিত্বে যে মোহ ও আকর্ষণ আছে তা যে নিছক শারীরিকতা ছাড়ানো অপরূপ এক মায়ারহস্যের দীপ্তি—তা প্রথম অনুভব করে সে। অর্থগৃধ্নু জয়তী তাকে কখনো সে অনুভূতি দেয়নি।—'কী অপরূপই দেখাচ্ছে মণিকাকে; ভাবছিল বিরূপাক্ষ; যেন ভরা নদীর তীরে জঙ্গলের অন্ধকারে রাতের বাঘিনী সহসা অনির্বাণ মানুষী হয়ে দাঁড়িয়েছে—অথচ বাঘিনীও বটে সে, তেমনি সাহসিকা, সুদৃঢ়া, মহিয়সী।' টাকার অভাবে মণিকাকে চিন্তিত দেখে সে অনেক টাকার চেক্ কেটে দেয়। কিন্তু কিছুতেই তাঁকে স্পর্শ করতে পারে না। পরে সে বারবার আসে, নানা ভাবে লোভ দেখায় মণিকাকে। টাকা ছাড়া আর কিছুই তার দেখাবার নেই। সব কিছু বুঝেও সেই টাকা গ্রহণ করেও আত্মস্বাতন্ত্র্যের সিংহাসনে অবিচল থাকেন মণিকা; বিরূপাক্ষের সমতলে কিছুতেই নেমে আসেন না—'মনে হল যেন বিরূপাক্ষের কয়েক হাজারের ধার শোধ হয়ে

গেল তাঁর। মণিকা দেবী তিনি। তেতলা থেকে দোতলায় নেমে বিরূপাক্ষের মতন একজন লোককে নিজের মুখে শীতরাতের পরম আশ্চর্য, নবময়ূরী কথা ও মরালী রলরোল কথিকা শুনিয়েছেন তিনি।' কিন্তু এই মণিকার চোখেই বিরূপাক্ষের অন্তরবাসী তৃষ্ণার্ত ও অসহায় পুরুষটি ধরা পড়েছে—'বিরূপাক্ষকে মণিকা ঘৃণা করেন না, বিষাক্ত ব্যবসায়ী হলেও ওর হৃদয় হয়তো ঠিক সে অনুপাতে কঠিন নয়, মনটা সর্দার, কিন্তু সমীচীন নয়—স্থির নয়, এখনও রাধাচক্রে ঘুরছে।'

এই উপন্যাসটিতে জয়তী-বিরূপাক্ষ, মণিকা-বিরূপাক্ষ, জয়তী-ক্ষেমেশ ইত্যাদি সম্পর্কগুলিতে এবং অন্যান্য প্রসঙ্গে যৌনতার শক্তির কথা উল্লেখিত হলেও যৌনতা এই উপন্যাসের মূল বিষয় নয়। সুতীর্থ, বিরূপাক্ষ, মণিকা বা জয়তী কেউই যৌনচেতনার অধীন হয়ে পড়েনি। সুতীর্থের শুভবোধ-মূল জীবন-অন্বেষা আর বিরূপাক্ষের অর্থক্রীত জগতে আবর্তিত হওয়া—এই দু'টি মনোভাবেরই নানারকম চেহারা দেখিয়ে দু'টিকেই নিয়ে উপন্যাসটি একসময়ে শেষ হয়ে যায়। নিটোল কোনো উপাখ্যান নেই, পরিকল্পিত কোনো পরিসমাপ্তিও নেই। সমাজের রক্ষণশীলতাজনিত সমস্যাগুলির দিকে লেখক কোনো ভ্রূক্ষেপই করেননি। যেমন, জয়তী বিনা ভূমিকায় হঠাৎ একদিন এসে ক্ষেমেশের বাড়িতে বাস করতে থাকে—ক্ষেমেশকে কিছু বলে না। ক্ষেমেশও কিছু জিজ্ঞাসা করে না। মধ্যবিত্ত সমাজ-পরিবেশকে শরৎচন্দ্রীয় রীতিতে দেখাবার কথা জীবনানন্দ আদৌ ভাবেননি। প্রকৃত তত্ত্বমূলক উপন্যাসের জাতটাই সামাজিক উপন্যাসের থেকে আলাদা। জীবনানন্দ আগাগোড়াই এই আলাদা জাতের উপন্যাস লিখে গেছেন।

১৯৪৮ সালের তৃতীয় উপন্যাস 'মাল্যবান' বিষয় ও উপস্থাপনার দিক থেকে সবচেয়ে অভিনব, সাহসী ও সুসংবদ্ধ মনে হয়। উপন্যাসের প্রতিপাদ্য—অস্তিত্বের চেতন-মূলে যৌনবাসনার দুর্মর উপস্থিতি এবং অস্তিত্বের পূর্ণতাবোধের বৃত্তে যৌনতৃপ্তির যথার্থ স্থানটিকে নির্দেশ করা। এই বিষয়টির সঙ্গে মিশে আছে বণিক্-বৃত্তিমুগ্ধ এই পৃথিবীতে টাকা যাদের নিঃশেষে কিনে নিতে পারেনি সেই মননবিন্দুনিবদ্ধ অন্তর্মুখ মানুষদের বেঁচে থাকার ট্র্যাজেডি। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় 'মাল্যবান' সম্পর্কে লঘুভাবে মন্তব্য করেছিলেন : 'একজন মহাকবি উপন্যাস লিখবার সময় একি বিষয় নির্বাচিত করেছেন? পাঠকের পক্ষে কল্পনা করাই অসম্ভব এই উপন্যাসের বিষয়টি। স্বামী-স্ত্রীর ঝগড়া' (সাহিত্য সংবাদ, কবির উপন্যাস, সনাতন পাঠক, দেশ, ২৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯৫১)। ঝগড়া ঠিকই কিন্তু এই ঝগড়া একত্রে বাস করতে বাধ্য হওয়া দুই ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গির ব্যক্তির মধ্যে নিয়তসংঘাতের প্রতীক। মহাকবি হওয়ার সঙ্গে বিষয়টি নির্বাচনের কোনো বিরোধ নেই। অমলেন্দু বসু বলেছেন : এই উপন্যাসের আছে 'সংহত জীবনচক্র' (মাল্যবান, ভূমিকা, প্রথম সংস্করণ, নিউস্ক্রিপট, ১৯৫১)। লেখক-সমালোচক অতীন্দ্রিয় পাঠক অনুভব করেছেন : 'এই স্থূল বিষয়টি উপস্থাপনার জন্যে ভেতরে ভেতরে একটা পরিকল্পনা কাজ করছে' (জিজ্ঞাসা, শ্রাবণ-আশ্বিন, ১৯৫১)।

বিয়াল্লিশ বছর বয়স্ক মাল্যবান পাঁচ বছর ধরে একশো পঁচানব্বই টাকা তেচন পাবার পর গত মাস থেকে পাচ্ছে আড়াইশো। এর চেয়ে বড় কিছু করা তার সাধ্যাতীত। সে মেনে নেওয়া, ছেড়ে দেওয়া, নির্বিবোধ স্বভাবের মানুষ। স্ত্রী-কন্যাকে ভালোবাসে, স্বাচ্ছন্দ্যে রাখতে চায়। প্রীতিময় পারিবারিক জীবনের ঘনিষ্ঠ স্বাদের জন্য সতৃষ্ণ, কিন্তু তার সাধ মেটে না—কারণ স্ত্রী উৎপলা পুরোপুরি আত্মস্বার্থপরায়ণ। সে উপরের ভালো ঘরে মেয়েকে নিয়ে থাকে, মাল্যবান থাকে নিচের ঘরে একা ও অনাদৃত। মাল্যবানের

কোনোরকম যত্নই সে নেয় না। মাল্যবানের ক্ষীণ প্রতিরোধ ও উপরোধসমূহ সে অবহেলায় উপেক্ষা করে।

কিন্তু মাল্যবানের চিন্তার জগৎ বিস্তৃত এবং সূক্ষ্ম। ফেলে আসা গ্রাম, বাঙালির সম্মান, সমজবিপ্লব, জীবনের সার্থকতা, সভ্যতার মানদণ্ড ও সভ্যতার ফাঁকি নিয়ে সে গভীরভাবে ভাবনা-চিন্তা করে। এই অন্তর্মুখ, অবহেলিত, সীমিত-সাধ্য, মধ্যবিত্ত মাল্যবানকে লেখক অন্য একটি দিক থেকেও আমাদের দেখিয়েছেন। আলো-হাওয়ার মতো পরিব্যাপ্ত যৌন-সংবেদনার একটি প্রবল স্রোত তার মধ্যে প্রবহমান। যে যৌনতার একটি অলক্ষ্য অনিবার প্রবণতা প্রতিটি সপ্রাণ অস্তিত্বের প্রতিটি কোষ-কণিকায় ক্রিয়াশীল—সেই যৌনচেতনার টান তার এবং উৎপলার চরিত্রের নিয়ামক শক্তি। মানুষের মননচর্যা ও কামবৃত্তির সংঘাত, সমস্যা, সংযোগ ইত্যাদি যাবতীয় দিক তিনি এই উপন্যাসে দেখাবার চেষ্টা করেছেন। মানুষের যৌনতৃষ্ণার তীব্র সুখ ও তীব্রতর যন্ত্রণা এই উপন্যাসের উপজীব্য। উপন্যাসের প্রথমেই একা শুয়ে থাকা মাল্যবানের চিন্তার একটি অংশ : 'খানিকটা দূরে একটা বাড়ির ভেতর মহলে—হয়তো কলকাতায়, ভাঁড়ার ঘরে, গুদোমে দুটো বেড়াল মরিয়া হয়ে ঝগড়া করছে অনেকক্ষণ ধরে; তাদের একটি নর ও একটি মাদী নিশ্চয়ই; ... হলো আর মেনির এই অত্যদ্ভুত রক্তোচ্ছ্বাস কাম নিয়ে জীবনের যৌনধাতুর; যৌন আগুনের এই প্রাণান্তকর, দৌরাত্ম্যে—মাল্যবান দাঁত ফাঁক করে ভাবছিল,... সমস্ত ইতর প্রাণীকে বিশ্লেষণ করে যে মহৎ সংশ্লেষে উপস্থিত হওয়া যায় তারি আশ্চর্য সন্তাপ, উচ্ছ্বাস ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ইতরতাকে ভাঙিয়ে, চারিয়ে, জ্বালিয়ে, নাচিয়েই মানুষ তো হয়েছে মানুষ।'

সপ্রাণ জগৎকে বিশ্লেষণ করে পাওয়া এই মহৎ সংশ্লেষী শক্তি অর্থাৎ যৌনতার শক্তিকে জীবনের এক অকপট সত্য ও চালিকাবৃত্তি বলে জেনেছিলেন জীবনানন্দ। তাঁর কবিতায় প্রকৃতির দুর্বার বিস্তৃতি এই কারণেই। শারীরিক অস্তিত্বই প্রকৃতির একমাত্র অস্তিত্ব। মানুষের মননদক্ষতা নিজের অস্তিত্বে সঞ্চার করেছে সূক্ষ্মতর বৈচিত্র্য, এনেছে ভিন্নতর মাত্রা কিন্তু মূল শারীরিক প্রবণতাটিও প্রবলভাবেই আছে। জীবনানন্দের প্রকৃতিচেতনা সবটাই নয়, কিন্তু অনেকটাই এই যৌনচেতনারই অন্য প্রকাশ। নাহলে প্রকৃতিকে সব সময়েই নারী-অঙ্গের উপমায় কেন দেখেন তিনি? প্রকৃতির অনুষঙ্গে স্তন, যোনি, জরায়ু, বিয়োনো ইত্যাদি শব্দ কেন বারবার প্রযুক্ত হয়? 'ডিম' শব্দটির এত গুরুত্ব কেন তাঁর লেখায়? জীবনের গভীর আকর্ষণকে 'ঘাইমৃগী'র উপমায় দেখার কথা আর কে ভাবতে পেরেছে? বনলতা সেনের চোখের উপমায় 'নীড়' শব্দটিতে যৌনতৃপ্তির কথাও কি নেই? পাখির নীড় বাৎসরান্তিক যৌনমিলনের ফল ধারণের জন্য গড়া সাময়িক আধার ছাড়া আর কি? যৌনচেতনার এই বিস্তার ও অনিবার্যতার কথাই 'মাল্যবান' উপন্যাসে বলতে চেয়েছেন তিনি। এই তৃপ্তির অভাবেই মাল্যবানের চোখে নেমে আসে অবসাদময়, মৃত্যু-তুলনা ঘুম। মাল্যবান থেকে যায় সর্ব অর্থে অসার্থক। এই তৃপ্তির আকাঙ্ক্ষাতেই বারবার অপমানিত মাল্যবান আবার সেই বিমুখ রমণীর শরীরের স্বাদ প্রার্থনা করে—'আমি মাটির মানুষ তো—মাটি ছাড়া টাল সামলাতে পারব না—হাওয়ার চেয়ে সোনার শরীর ভালো, তার চেয়ে মাটির শরীর; চালে গুড়ে, নারকোলের ঝাঁঝে, কন্দুরে ফোঁপড়ায় নবান্নের গন্ধে নবান্নের মতো তুমি আর আমি; তোমার কাছে এসেছি তাই; বসেছি তাই। দাও। দেবে না?' এই অনুপম, অভ্রান্ত শব্দপ্রয়োগে মাল্যবানের আর্তি প্রতিধ্বনিত হতে থাকে আমাদের বোধে, বেদনায় ও চেতনায়। কিন্তু উৎপলা দেয় না। সেই সূত্রে মধ্যবিত্ত বাঙালির জীবনে যৌনতৃপ্তির অসম্ভব সংকুচিত সুযোগের কথা

ভেবেছেন জীবনানন্দ। 'বাংলা দেশের শতকরা নব্বইজন স্বামী স্ত্রীর জীবনেই এই নিষ্ফলতা।...একটা ভাঙা গেলাসের কাচগুলোকে জড়ো করে জোড়াতাড়া দিয়ে প্রত্যেকবারই জল খেতে হয় তাদের; ...জল খেতে হবেই, একটার বেশি গেলাস কাউকে দেওয়া হবে না; সে যদি তা জোর করে বা চুরি করে নেয় সেটা অসামাজিক হল।'—এই সমস্যাই হলো মাল্যবান চরিত্রের নির্যাস।

উৎপলার বিরাগ মাল্যবানের প্রতি স্পষ্ট। যৌন আকর্ষণের সঙ্গে পশুজগতেও কখনো কখনো একটি রুচি জড়িয়ে থাকে। মাল্যবানে উৎপলার রুচি উন্মুখ নয়। উৎপলা ভোগবিলাসে, সাজসজ্জায় নাতিসূক্ষ্ম সামাজিক মেলামেশায় তৃপ্ত হয়। শাড়ি নোংরা হবে বলে সে ঘাসে পা রেখে চলে না, সিনেমাহলের দামী আসনে বসতে চায় কেবল অপরকে ঈর্ষিত করবার জন্যই, চিড়িয়াখানায় গিয়ে পাখি না দেখে সাজগোজ করা মেয়ে দেখতে ভালবাসে—'কেমন এক বিঘৎ পেট বার করে শাড়ি পরেছে, কেমন কানের পাশে জুলপি ঝোলাবার কায়দাটুকু। নিশ্চয়ই আইবুড়ো এরা সব। বাস্তবিক, যারা বিয়ে করেনি, তাদেরই রগড়'—এই হলো উৎপলার মনের একটা দিক। কিন্তু উপন্যাসে তাকে হীনভাবে চিত্রিত করা হয়নি। তার চরিত্রের নিঃসঙ্গতা, অ-সুখীভাবে একটি সংসার বহন করে চলার নিরুপায় বিরাগ এবং সে-সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনা সুস্পষ্টভাবে করার ক্ষমতা তাকে যথেষ্ট গভীরতা দিয়েছে। মাল্যবানের আবৃত, নির্বিবোধ স্বভাবে হাঁপিয়ে ওঠে সে—'কোথাও ডাক নেই, কেউ পৌঁছে না, হৈ-হল্লা নেই, ঘরে আড্ডা-মজলিশ নেই—কোনো মানুষই আসে না—ডাকলেও আসে না।' তারপরেই সে একটি অদ্ভুত কথা বলে—'একজন বেশ্যার সঙ্গেও যদি সমানভাবে তোমার সম্পর্কে আমার দায়িত্ব ভাগ করে নিতে পারতাম, তাহলে এতটা দম আটকে আসত না আমার'—উৎপলার চরিত্রের এই সঠিক জায়গাটিতে অবলীলাক্রমে লেখক পৌছতে পারেন। আপাত অন্যমনস্ক এই লেখকের অনুভবশক্তির সূক্ষ্মতা আমরা বুঝতে পারি। দেখা যাচ্ছে মাল্যবান ও উৎপলা—উভয়ের ক্ষেত্রেই বিবাহিত জীবনের অপূর্ণতার বোধ কাজ করেছে। স্বামী-স্ত্রীর একনিষ্ঠ থাকার যে একটি সমাজশাসিত নির্দেশ আছে তার মধ্যে প্রায়ই এসে যায় একটি অস্বাস্থ্যকর বদ্ধতা—সাহসের সঙ্গে, দায়িত্ববোধের সঙ্গে বিষয়টিকে উপস্থিত করেছেন তিনি।

এরপর অমরেশ নামক এক স্থূলরুচি, ভোগসর্বস্ব ব্যক্তির সঙ্গে শারীরিক সম্পর্কে লিপ্ত হয় উৎপলা—প্রকাশ্যে এবং নির্দ্বিধায়! মাল্যবান ঈর্ষান্বিত হলেও তাকে অপসারিত করতে পারে না। চকচকে পোশাক ও চকচকে সাইকেলওয়ালা লোকটির কাছে সে হেরে গেছে—উৎপলাকে তৃপ্ত করেছে অমরেশ। মাল্যবানেরই সূক্ষ্মতা-সংবাহক মনে সবচেয়ে সুন্দরভাবে ধরা পড়ে উৎপলার ছবিটি—'একটা পারুল ফুলের মতো প্রকৃতির থেকেই যেন উৎপন্ন জমিনের তাঁতের শাড়ি সে পরেছিল—চওড়া লাল পাড়ের, আশাতিরিক্তভাবে পরিতৃপ্ত একজন সীতা সরমা দ্রৌপদী চিত্রসেনীর মতো অপরূপ দেখাচ্ছিল তাকে।' অমরেশের স্পর্শেই উৎপলার মধ্যে 'সরমা-সরসতা' জেগে উঠতে দেখে মাল্যবান ভেবেছে 'এখনকারটাই তো ভালো মনে হচ্ছে।' প্রাণিজগতে এই পরাজয় নির্মম ও করুণ, মানুষের জগতে নানারকম মানুবিক বিধিনিষেধের আরোপে এর বাইরের ভাঙনটা অনেক সময়ে আড়াল করা যায়, কিন্তু অন্তরে এই পরাজয় মানুষের জীবনে করুণতর, যেহেতু সে ভাবতে পারে। তৃপ্ত উৎপলা তাকিয়েও দেখে না মাল্যবানের দিকে। নব পরাক্রমে যূথ জয় করে নেওয়া নবীন দলপতির সঙ্গে যেমন নির্দ্বিধায় চলে যায় হস্তী, মহিষ অথবা সিংহরমণী তেমনি ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যায় সে। অশক্ত, বৃদ্ধ পশুর মতো

অবহেলিত পড়ে থাকে মাল্যবান।—'উৎপলা তারপর এঁটো পরিষ্কার করল; মশারী ফেলল; বিছানায় শুয়ে ঘুমিয়েও পড়ল; কিন্তু মাল্যবানকে জাগিয়ে দেওয়াও উচিত মনে করল না?'

অস্তিত্বের মূল্য নির্ণয়ে যৌনাকাঙ্ক্ষা এবং তজ্জনিত তৃপ্তি ও অতৃপ্তির বোধই উপন্যাসটির অন্যতম বিষয়বস্তু। সেজন্য লেখাটির প্রতিটি অংশে—গঠন-পরিকল্পনার সঙ্গে মিশে আছে এই যৌনচেতনার বোধ। এই উপন্যাসের প্রায় প্রত্যেকটি ঘটনা, সংলাপ ও বিবরণ এই তত্ত্বটির উপস্থাপনায় ব্যবহৃত হয়েছে। চুয়ান্ন বছর বয়সেও বড়বৌদির সন্তানসম্ভাবনায় উচ্ছ্বসিত হয় উৎপলা, গভীরভাবে ভাবিত হয় মাল্যবান। উৎপলার মেজদা ও মেজবৌদির প্রৌঢ় বয়সের দাম্পত্য ঘনিষ্ঠতায় যৌনতার আপক্ক স্বাদ ধরা পড়ে বারবার। পরিণত শস্যভারনম্র হেমন্ত ঋতুর প্রতি জীবনানন্দের টান কিছুটা এই কারণেও হয়তো। প্রতিবেশীর বাড়িতে শিশুর জন্মসংবাদ ও নবজাতকের মৃত্যুসংবাদ গভীর প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে উৎপলার মনে। যৌনতা, জৈবতা, জীবজন্ম প্রসঙ্গ বারবার আপাত-অশালীন স্পষ্টতায় আলোচিত হয় তাদের মধ্যে। নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে 'একটি কুড়ি একুশ বছরের মেয়েমানুষের'—যে 'বেশ সোমত্ত' ছিলো—মৃতদেহ কবর খুঁড়ে বার করবার ঘটনা। মৃত্যুর পরও তার 'গতরের পুষ্টতা' বিস্মিত করে তাদের। এবং সেই শিশুটির মৃত্যু-রাতে দেহের রক্তকণাগুলি উতরোল হয় উৎপলার। সমস্ত উপন্যাসটিতে দু-বার মাত্র স্বেচ্ছায় মাল্যবানকে গ্রহণ করেছে সে। এই একবার, আর অমরেশ চলে যাবার পর আর একবার একদিন। মাল্যবান কিছুদিন মেসে গিয়ে থাকে। সেখানে মেসের ঠাকুর, চাকর, ঝি এবং অন্যান্য সদস্যদের আচরণে কদর্য শারীরিকতার প্রলেপ মাখানো সর্বত্র। শিষ্টরুচির মধ্যবিত্ত পাঠক এসব জায়গায় একটু সঙ্কুচিতও হয়ে পড়বেন হয়তো। একটি প্রবন্ধে এলিয়টের সঙ্গে জীবনানন্দের গদ্যরীতির তুলনা করে শংকরানন্দ মুখোপাধ্যায় বলেছেন : 'দুজনেই যুগযন্ত্রণায় পীড়িত, অথচ আশ্চর্য শালীনতা তাঁদের রচনায় পরিব্যাপ্ত। একজনকে সেই শালীনতা জুগিয়েছে ব্রাহ্মধর্মের সদাচারী শিক্ষা আর একজনকে ক্যাথলিক ঐতিহ্যপ্রিয়তা' (গদ্য, কবির গদ্য ও কয়েকজন কবি, বাঙলা গদ্য জিজ্ঞাসা, সমতট প্রকাশনী, ১৯৫১)। এই উক্তি তাঁর গল্প-উপন্যাসের ভাষ্য বিষয়ে একেবারেই খাটে না। লেখক অবশ্য শুধু প্রবন্ধের কথাই ভেবেছিলেন মনে হয়। পারিবারিক ব্রাহ্মধর্মের 'সদাচারী শিক্ষা' জীবনানন্দের ক্ষেত্রে বিপরীত প্রতিক্রিয়ারই সৃষ্টি করেছিলো হয়তো। সাতমাস পরে মেস থেকে ফিরে আসে মাল্যবান। এরপর লেখক দেখান এই উপন্যাসের নিষ্ঠুরতম দিকটি। উৎপলা ও মাল্যবান—দুজনেই নিজেদের শরীরমনের সমস্যা নিয়ে ব্যাপৃত থাকে আর তাদের ক্ষীণজীবী সাত বছরের মেয়ে মনু মা-বাবার অবহেলায় ও চিকিৎসার অভাবে ক্রমে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যেতে থাকে। বালিকা মেয়েটির কথা কেউই ভাবছে না—এই ইঙ্গিত প্রথম থেকে বারবার দেওয়া হয়েছে। এমনকি মাল্যবানও মেয়ের চিন্তাকে মনে করে 'দয়া'। অমরেশ-উৎপলার সম্পর্ক বিশ্লেষণই তার কাছে জরুরি মনে হয়—'মনুর কথা ভুলে যায় সে। দয়া অকিঞ্চিৎকর লাগে। মেসের বিবমিষা উদ্রেককারী বিবরণ পার হবার পর মানুষের মনের এই চেহারাটা যখন তুলে ধরেন জীবনানন্দ তখন সমস্ত মানবজীবনকে হঠাৎ খুব অসুস্থ, রোগগ্রস্ত, ভীতিকর লাগতে পারে। যদিও যৌনতাকে বাৎসল্যের উপরে প্রাধান্য দেবার প্রবণতা মানুষের সমাজে আদৌ দুর্লক্ষ্য নয়, তবু বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার মধ্যে একটি মানানসই মনোবিভাজন আছে—জীবনানন্দ এ ব্যাপারে একটা দিকই শুধু দেখিয়েছেন—সেজন্যই

তা ঠিক স্বাভাবিক লাগে না। এখানেই জীবনানন্দের মানসিকতায় যৌনচেতনাকেন্দ্রিক একটি অবসেশ্‌ন ধরা পড়ে—মর্বিডিটির ধার ঘেঁষে গেছে কিছুটা এই মনোভাব।

এ যুগের বহু চিন্তাবিদ্‌ই অস্তিত্বের মূল্যসন্ধানে মগ্ন হতে গিয়ে অসুস্থতাবোধে আক্রান্ত হয়েছিলেন। পৃথিবীকে এইভাবে দেখার প্রবণতা বিশ্বসাহিত্যে স্থায়িত্ব পেয়েছে অনেকদিনই। জগদীশ গুপ্ত, মানিক, সতীনাথ কোথাও কিছুটা স্পর্শ করেছিলেন এই চেতনাকে। কিন্তু সব ক'টি লেখার মধ্যে এই চেষ্টার আবর্তে ঘুরে বেড়িয়েছেন জীবনানন্দ। কাফ্‌কা বা সার্ত্রর সম-মানসিকতার লেখক বাংলা সাহিত্যে সম্ভবত এই একজনই।

কিন্তু এই জন্তু-বৃত্তির চাকা থেকে মানুষের মুক্তিও আছে কোনো কোনো অনুভবে। মর্বিড মনোভাবের সাহিত্যও আছে মানুষের যন্ত্রণায় শিল্পীর বেদনাবোধের মধ্যে একটি হার্দ্য উত্তরণের জগৎ। এগ্‌জিস্‌টেনশিয়ালিস্টরা সকলেই—কেউ মানুষের কর্মপ্রণোদনায়, কেউ ব্যক্তি-ইচ্ছার স্বাধীনতায়, কেউ প্রকৃতির নির্মলতায়, ক্বচিৎ ঈশ্বরেও কেউ বা, অথবা সাময়িকভাবে গণশক্তির উজ্জীবনে মুক্তিপথ খুঁজেছেন। জীবনানন্দও একাধিক পথে এই সুড়ঙ্গের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে এসেছেন তাঁর উপন্যাসে। 'সুতীর্থ'তে দেখেছি ব্যক্তি-ইচ্ছা ও কর্মপ্রাণনার পথ, প্রেমের শুদ্ধতারও কিছু স্পর্শ। 'মাল্যবান'-এ আছে তিনটি খোলা রাস্তা। প্রথমটি হলো মানুষের জন্য মানুষের ভাবনায়। মনুর জন্য মাল্যবানের চিন্তার মধ্যে এবং স্রষ্টা জীবনানন্দের করুণ পলকপাতে এই নির্মল মানবিকতার বোধ প্রবাহিত হয়ে যায়। উৎপলার জন্যও মাল্যবানের মনে একটি প্রীতির, সমবেদনার ও সম্মানের জায়গা আছে। উৎপলার নিষ্ফলতা সে বোঝে। উৎপলার নিজস্ব বিকাশ তাকে বিরূপ করে না শেষ মুহূর্তেও। যৌনতাবোধের পেষণ থেকে দ্বিতীয় মুক্তিপথটি হলো রমণীর অস্তিত্বশায়ী অলৌকিকত্বের বোধে। রমণী যে পুরুষকে আকর্ষণ করে—শুধু যৌন আকর্ষণ তা নয়। উৎপলার মধ্যে সে একটি গোপন রহস্যময় গূঢ়তা দেখতে পায়। উৎপলাকে কমলে-কামিনীর উপমায়—সেই সমুদ্রবাসিনী, পদ্মাসনা, অলৌকিক সুন্দরীর রূপে কল্পনা করেছেন জীবনানন্দ। মাল্যবান কখনো ভেবেছে 'সমুদ্রশঙ্খের মতো কান তার'। উৎপলা সম্পর্কে মাল্যবানের একটি চিন্তা বহু-উদ্ধৃত যেখানে সে উৎপলার মধ্যে—'সজারুর ধাষ্টামো, কাকাতুয়ার নষ্টামি, ভোঁদড়ের কাতরতা, বেড়ালের ভেংচি, কেউটের ছোবল' ইত্যাদি অনুভব করে। কিন্তু এর পরেও কখনো কখনো 'নবময়ূরীর মতো' ভেবেছে সে উৎপলাকে, ভেবেছে—'উৎপলা সেইরকম মেয়েমানুষ পুরুষের তিলোত্তমা পেলে যে মেয়েমানুষকে মহারাণীর মতো দেখায়।' যৌনসম্পর্কের সঙ্গে এই আশ্চর্য চন্দ্রালোকমায়ার মিশ্রণ ঘটিয়েই মানুষ অস্তিত্বমূলে সেই রহস্যবিন্দুটির আভাস পায়, পশু পায় না। অস্তিত্বের ভাঁজ খুলে খুলে অবাক হবার ক্ষমতা শুধু মানুষই রাখে। আর এই গভীর বিষাদময়তা থেকে নিষ্ক্রমণের তৃতীয় পথটি—জীবনানন্দের দীর্ঘদিনের সঙ্গী সেই সময়চেতনার বোধ। অনেকবারই অবসাদের অতল খাদের ধারে দাঁড়িয়ে শেষ পদক্ষেপের মুহূর্তে মাল্যবানের মনে হয়—'সচ্ছল সফল সময়, ব্যথা, বাচালতা, সরসতা, নষ্টামি, ভয়, রক্ত, রিরংসা, অনাথ অন্ধকার ও গভীরতার ভেতর মৃত্যু নয়, শূন্য নয়, ব্যক্তি জীবন নয়, অফুরন্ত অনির্বচনীয় সময়—সময় শুধু।' এক এক সময়ে নিজের আকাঙ্ক্ষায় পীড়িত হতে হতেও সে ভাবে—'বড় বেশি আত্মপ্রেম হয়ে পড়েছে তো আমার ঃ যেন একটি ব্যক্তি ছাড়া পৃথিবীতে আর কেউ নেই, যেন ব্যক্তি সমুদ্র নিয়ে যে মানুষের ও সময়ের ইতিহাস তৈরি হচ্ছে সেটা কিছু নয়।...আস্তে আস্তে সময়ের আশ্চর্য

সমগ্রতার কাছে আত্মসমর্পণ করে স্থির হয়ে উঠতে থাকল তার মন।'

কিন্তু পূর্বোক্ত তিনটি দিক একত্রে মিলেও উপন্যাসটিতে প্রধান হয়ে ওঠেনি; সুস্থিরভাবে প্রতিষ্ঠিত হতে পারেনি যৌন-সংবেদনপ্রবাহের কোনো বিপরীত স্রোত, অন্যতর কোনো বিশ্বাস। মূল তত্ত্বটির প্রতিষ্ঠায় লেখক আশাতিরিক্ত ভাবে সফল। আত্মজীবনী ও আত্মভাবনার উপাদানকে ব্যবহার করেছেন তিনি। বিস্তৃতি তার সীমিত কিন্তু সুগভীর তার .গহ্বর-পথ। 'মাল্যবান' তাঁর ব্যক্তিজীবনের কাহিনী—এ-জাতীয় কোনো সরলীকৃত উক্তি এখানে ভ্রান্ত অর্থ বহন করবে—'মাল্যবান' উপন্যাসটি 'সংসারে বেঁচে থাকা' বিষয়ে তাঁর অভিজ্ঞতা ও ভাবনার সারাৎসার।

জীবনানন্দের আরো কয়েকটি অপ্রকাশিত উপন্যাস আছে, ক্রমশ যা পাঠকের লক্ষ্যগোচর হবে। রচনাগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিমার্জিত নয়। তবু উপন্যাসের সমগ্র আলোচনায় সেগুলিও ভবিষ্যতে স্থান পাবে। কিন্তু, মনে হয়, এই চারটি উপন্যাসে লেখকের যে বিশিষ্টতাগুলি ফুটে উঠেছে তার চেয়ে খুব নতুনরকম কিছু সেগুলিতে পাওয়া যাবে না।

সৃষ্টিরহস্যের মতো শিল্পবোধও স্রষ্টার নিজস্ব প্রতিভার প্রকাশ। প্রতিটি লেখার জন্য একটি পৃথক রূপবন্ধ লেখকের মনের ভেতর থেকে জন্ম নেয়। সর্বত্রই হয় এমন নয়, কিন্তু যখন হয় তখনই সেই রচনার মধ্যে দেখা দেয় একটি নিজস্ব শক্তি যার জোরে কখনই সে-লেখা চিরকালের সাহিত্যস্রোত থেকে স্খলিত হয় না। বিভূতিভূষণের ঢিলেঢালা সরল বিবৃতি তাঁর অনেক লেখাকেই সাধারণ স্তরে রেখে দেয় কিন্তু সেই ভঙ্গিতেই প্রাণ পেয়ে গেছে—'পথের পাঁচালী', 'আরণ্যক', 'ইছামতী'। কমলকুমারের ভাষারীতিটি অতি-সচেতনতার চাপে কখনো ক্লান্তিকর কিন্তু 'অন্তর্জলী যাত্রা'র সেই নির্মম-করুণ পুরোনো কালের পটটির জন্য ঐ ভাষার বাঁধনগুলিই বিকল্পহীন—এ কথা অস্বীকার করবার উপায় কি? জীবনানন্দ রূপবন্ধ সম্পর্কে খুবই সজাগ ছিলেন। যথেষ্ট পরিমার্জনার সময় না পাওয়াও তাঁর গল্প-উপন্যাসগুলি প্রকাশিত না হওয়ার একটা কারণ—তা আমরা জেনেছি। কিন্তু এখানে আমরা তাঁর গল্প-উপন্যাসের যে অঙ্গবিন্যাস সম্পর্কে আলোচনা করবো তা লেখকের বিশিষ্ট শিল্পস্বভাবেরই অংশ। পরিমার্জনায় তার মৌলিক কোনো পরিবর্তন সম্ভবত হতো না।

কোনো প্লটকে অনুসরণ করে না তাঁর রচনাগুলি। আখ্যানটির শুরু-শেষ-গতি-বিবর্তন নিয়ে তিনি ভাবিত নন কখনই। কিন্তু উদ্দিষ্ট তত্ত্বটিকে ঠিকমতো বোঝা আর বোঝানোর ব্যাপারে একটি তীক্ষ্ণ সচেতনতা নিরন্তর সচেষ্ট থাকে তাঁর লেখনকর্মে। দেখা যায়, সুনির্দিষ্ট কিছু পদ্ধতি জীবনানন্দ প্লট নির্মাণের কাজে ব্যবহার করেন।

গল্প আর উপন্যাস পৃথক দু'টি শিল্পরূপ কিন্তু এই পার্থক্য জীবনানন্দের ক্ষেত্রে খুব বড় হয়ে উঠবে না। একই ভাবনা তিনি উপস্থিত করেন প্রায় একইরকম রীতিতে দু'টি ক্ষেত্রেই। গল্পগুলিতে সময়ের পরিসর কম আর চরিত্রগুলি স্থিরভাবে দাঁড়িয়ে থেকে নিজেদের মনোগ্রন্থিগুলিকে উন্মোচিত করে। উপন্যাসে তাদের বিচরণভূমি ও অবস্থানকাল আরো একটু প্রসারিত। চরিত্রগুলির জীবনে কিছু একটা ঘটে উঠতে দেখা যায়—একটা গতি আছে—যদিও তা মন্থর, সূক্ষ্ম এবং অনেকক্ষেত্রেই তা সরল অগ্রগতি নয়—অনালোকিত সুড়ঙ্গপথে বৃত্তাকার আবর্তন। এটুকু বাদ দিলে তাঁর গল্প ও উপন্যাসের রচনা-পদ্ধতি একইরকম।

জীবনানন্দের প্লট নির্মাণের প্রধান কৌশল হলো দুটি বিপরীত মনোধর্মের চরিত্রকে

সমান্তরালভাবে উপস্থিত করে পর্যায়ক্রমে পাঠককে তাদের চিন্তাস্রোতের নাগাল ধরিয়ে দেওয়া। প্রকাশ ও সোমেন, সর্বেন ঘোষ ও শান্তিশেখর, বিরূপাক্ষ ও সুতীর্থ। মাল্যবানের ক্ষেত্রে উৎপলা ও অমরেশ যুগ্মভাবে এই বিপরীত ধর্ম প্রকাশ করে, নিশীথের ক্ষেত্রে জিতেন থেকে জয়নাথ পর্যন্ত একাধিক ব্যক্তি মিলিতভাবে নায়কের বিপরীতে উপস্থিত। জীবনানন্দের নায়ক চরিত্রগুলির আলোচনা বিস্তৃতভাবে আগে করা হয়েছে। এদের মধ্যে সুতীর্থ একটু অন্যকরম। সে পৃথিবীর কাছে কিছু আশা করে না, তবু মানুষের জন্য কাজ করাতেই বেঁচে থাকার পথ খুঁজে নেয়। তার টাকা নেই, তবু বিত্তহীনতার অভিশাপ তাকে পিষ্ট করে না যেমন করে নিশীথ সেনকে। প্রেমহীনতার চাপেও সে ম্রিয়মাণ নয় মাল্যবানের মতো। অস্তিত্বের নিরর্থকতার উপলব্ধিতে যেখানে সোমেন পলাতক, শান্তিশেখর আত্মঘাতী, মাল্যবান মৃতকল্প ও নিশীথ সেন অব্যবস্থিত, সেখানে সুতীর্থের মধ্যে জয়ী হয় মননপ্রসারী এক কর্মী পুরুষ। সুতীর্থ জীবনানন্দীয় নায়কদের মধ্যে এক ব্যতিক্রম।

বিপরীতধর্মী চরিত্রগুলি মেটিরিয়ালিস্টিক পণ্যবৃত্তি-মনস্ক ব্যক্তি। জীবন ও মননের অন্যতম উপলব্ধির তৃষ্ণাও তাদের মধ্যে কখনো কখনো দেখেন জীবনানন্দ। প্রকাশ ও জিতেনের মধ্যে তার চকিত উদ্ভাস। বিরূপাক্ষের মধ্যে তা আর একটু বিস্তৃত। কখনো তাদের একপেশে স্থূলরুচি ব্যক্তি হিসেবেই দেখেছেন তিনি। যেমন—সর্বেন ঘোষ, সুতীর্থের ওপরওয়ালা বিজনহরি মল্লিক, অমরেশ, কুলদাপ্রসাদ বা জয়নাথ।

এই দুই পক্ষের মধ্যে নানাভাবে চলাফেরা করে রমণী চরিত্রগুলি। তারা মননধর্মের স্পর্শবঞ্চিত নয়, নিরর্থক জীবনের গ্লানিও তারা জানে কিন্তু বস্তুজগতের নিরাপত্তা ও স্বাচ্ছন্দ্যের জগৎই তাদের নিজস্ব জগৎ। শচী প্রকাশের সঙ্গে থাকে, সুস্মিতা সর্বেন ঘোষকে মেনে নেয়, মণিকা নিয়ে নেয় বিরূপাক্ষের দেওয়া টাকা, জয়তী সুতীর্থকে বুঝেও বিরূপাক্ষের টাকার লোভ ছাড়তে পারে না। উৎপলা নারীচরিত্রগুলির মধ্যে একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এবং সুদৃঢ়ভাবে নির্মিত। চেতনামূল থেকে উঠে আসা এক জোরালো ভোগবাসনা তার চরিত্রকে একটি অভিরাম গড়ন দিয়েছে। সে টাকায় কেনা সবরকম স্বাচ্ছন্দ্য চায়—সবরকম শরীর-সুখ। তার আত্মপরতা অতীব একান্ত। নিজের জমি জিতে নেবার জন্য সে অবিচল সংগ্রাম চালিয়ে যায় এবং পৌঁছেও যায় এক নিজস্ব চরিতার্থতার জগতে। তার দ্বিধা নেই, গ্লানি নেই, শূন্যতাবোধ নেই। উপন্যাসের শেষে উৎপলার ভোগতৃপ্ত দ্বন্দ্বলেশহীন মূর্তি বাংলা সাহিত্যের এক অভিনবসুন্দর চরিত্রায়ণ। তুলনায় 'জলপাইহাটি'র নারীচরিত্রগুলি মূর্ততা পায়নি। তাদের চিন্তা ও কথার সঙ্গেই শুধু পরিচয় ঘটে আমাদের। জিতেনের স্ত্রী নমিতা ছাড়া—সুমনা, অর্চনা, মোহিতা, ললিতা, সুলেখা সকলেই একজায়গায় দাঁড়িয়ে কথা বলে যায়। কথাগুলি অবশ্যই ভাবার মতো—তারা জীবনানন্দেরই ভাবনা। কিন্তু চরিত্রগুলির মধ্যে সেইসব ভাবনার সত্যতা বা সংশয় প্রতিষ্ঠিত হয়নি।

যতই আবছা বা শিথিল হোক, কাহিনীর একটা আধার উপন্যাসে থাকবেই। জীবনানন্দের কাহিনীগুলির সেই আধারের নির্দিষ্ট গড়নটি দেখলাম। কাহিনীর গতিও থাকে একটা। ছোটগল্পে সেটা তত জরুরি নয় তবু একটু সচলতা থাকেই যেহেতু অস্তিত্বের একটি অচ্ছেদ্য দিকই হলো গতি। জীবনানন্দের গল্প-উপন্যাসে সেই গতিময়তা ঘটনায় নয় বা চরিত্রের পরিবর্তনেও নয়। ভাবনার নানামুখ ঘাত-প্রতিঘাতেই এই গতির স্পন্দন অনুভূত। তবুও 'সুতীর্থ' ও 'মাল্যবান'—এই দু'টি উপন্যাসে কাহিনীর সংবদ্ধতার সঙ্গে,

চরিত্র ও ঘটনার ধারাবাহিকতার দিকেও নজর রেখেছিলেন জীবনানন্দ। বিশেষত, 'মাল্যবান'-এ ঘটনার পর ঘটনায় নায়কের হৃদয়ের রক্তক্ষরণ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। ঘটনাগুলি সামান্যই—কিন্তু মাল্যবানের ব্যবহারে, চিড়িয়াখানা ও সিনেমা দেখার বিবরণে মাল্যবানের সঙ্গে উৎপলার মানসিক দূরত্ব প্রতিষ্ঠিত। তারপর উৎপলার দাদা আসায় বাড়ি ছেড়ে যেতে হয় মাল্যবানকে। মেসের কদর্য পরিবেশ তাকে প্রায় শ্বাসরুদ্ধ করে ফেলে। নিরাশ্রয়তার বোধ ব্যাপ্ত হয়ে যায় নিজের সংসার ছাড়িয়ে বহির্বিশ্বেও। অবশেষে বাড়ি ফিরে যখন সে অমরেশের সঙ্গতৃপ্ত উৎপলাকে, প্রকৃতির যৌন প্রত্যঙ্গ যে ফুল—তারই মতো সৌন্দর্যসরসতায় ফুটে উঠতে দেখে তখন এই কামকাঞ্চনময় পৃথিবীর সর্বস্তরেই তার পরাজয়ের পাত্রটি সম্পূর্ণ হয়। 'মাল্যবান' সত্যিই বিশ্ব-সাহিত্যের একটি বিরল উপন্যাস যেখানে তত্ত্ববস্তু প্রতিষ্ঠিত হয় অসংশয়ে, আবার সুবলয়িত কাহিনীটিও সুপূর্ণ একটি ফলের মতো নিটোল ও সরস থাকে।

'জলপাইহাটি' কিন্তু বিচ্ছিন্ন চিত্রমালার মতো। নিশীথ সেনের সঙ্গে দেখা হয়েছে নানাজনের। প্রত্যেকেই আলাদা মানুষ কিন্তু তাদের সঙ্গে নিশীথের দেখা হওয়ার দৃশ্যগুলি একইরকম। প্রত্যেকেই দেশ-কাল-মানবজীবন নিয়ে নির্ধারিত কয়েকটি কথা বলার জন্য আসে এবং নিজের নিজের ভাষণ দান করে মঞ্চ থেকে নেমে যায়। অনুভূতির আনন্দ-বেদনা বা বিশ্বাস-সংশয় স্পন্দিত হয় না তাদের চরিত্রে। এই লেখাটিকে সেজন্যই উপন্যাস হিসেবে খুব সফল বোধহয় বলা যাবে না। সমাজচিন্তামূলক কিছু প্রবন্ধ এবং প্রাণরহস্য বিষয়ক কিছু দার্শনিক ভাবনাই উপন্যাসের সাজ পরে এসেছে—পুরোপুরি উপন্যাস হয়ে ওঠেনি।

উপন্যাসগুলির চিন্তনরীতি চেতনাপ্রবাহমূলক কিছুটা। সত্তার নিহিত রূপ ও সমস্যাকে যাঁরা ধরতে চেয়েছেন তাঁদের কলমে সর্বত্রই এই রীতির ছাপ আছে। আজ চেতনাপ্রবাহমূলক রীতি পুরোনো হয়ে গেছে কিন্তু এই রচনারীতিটি পরবর্তীযুগের গল্প-উপন্যাসে রেখে গেছে একটা স্থায়ী ছাপ—রয়ে গেছে সংস্কারবাহিত ঐতিহ্যের মতো। বাংলা সাহিত্যেও এ-জাতীয় একটা ধারা ক্ষীণ হলেও প্রবহমান ছিলোই। 'বাংলা উপন্যাসে বুদ্ধদেব-ধূর্জটিপ্রসাদ-গোপাল হালদার যে চিন্তা-চৈতন্যমুখী ধারা এনেছিলেন, এই 'জলপাইহাটি' উপন্যাস লেখার বছর দুয়েক আগে সতীনাথ ভাদুড়ী যে চিন্তা-চৈতন্যের অন্তর্লীন ভঙ্গিটিকে স্পষ্ট দেশ-কাল-সমস্যার পটে বেঁধেছিলেন, 'জলপাইহাটি' সেই পথেই এক ধাপ এগিয়েছে।' (উজ্জ্বলকুমার মজুমদার, শিলাদিত্য, জুন, ১৯৫১)। কথাটি তাঁর সব লেখার প্রসঙ্গেই সত্য। এই আত্মবেদী চৈতনামগ্ন অন্তর্ভাষণ—শুধু নায়কের বেলাতেই নয়, উপন্যাসের অপরাপর ব্যক্তিদের ক্ষেত্রেও ব্যবহৃত। জীবনানন্দের গদ্য কবিত্বময়—এ কথা বলেছেন অনেকেই। জীবনানন্দ কবি ছিলেন বলেই তাঁর গল্প-উপন্যাস কবির কলমে লেখা—এমন সিদ্ধান্ত অসঙ্গত নয়। কিন্তু কথাটিকে একটু অন্যভাবেও বলা যেতে পারে—আত্ম-উদ্ঘাটনের ভাষাটি জীবনানন্দ নিজেরই মনের প্রতিচ্ছবি ধরার জন্য গড়ে নিয়েছিলেন নিজের মতো করে তাই তাঁর গল্প-উপন্যাসের ও কবিতার একই ভাষা। তাই তাঁর সব চরিত্রই প্রায় একই ভঙ্গিতে চিন্তা করে ও কথা বলে। জীবনানন্দের ভাষাকে 'কর্কশ' বলেছেন কেউ কেউ। সংসারের ক্লেদাক্ত-ভূমি থেকে, ধনিকতন্ত্রী প্রতিযোগিতার দন্তুর ঘর্ষণ ও যৌন-বাসনার অলজ্জ সংক্রমণ নিয়ে উঠে আসে বলেই তার কর্কশতা এত যথাযথ। তাঁর কবিতার ভাষাও প্রয়োজনে একইরকম কর্কশ—'থ্যাঁতা ইঁদুরের মতো রক্তমাখা ঠোঁটে', 'তাজা ন্যাকড়ার ফালি সহসা ঢুকেছে নালি ঘায়ে' ইত্যাদি। তবুও তাঁর

গদ্যভাষার কাব্যময়তা স্বীকার্য। তিনি কবি ছিলেন বলে নয়—চিত্তগহনকে বাইরে আনতে চাইছিলেন বলে। এ কাজের ভাষা কবিত্বময় হবেই। চেতনাপ্রবাহমূলক গদ্য সবসময়েই কবিতার ধার ঘেঁষে চলে।

কিন্তু চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাস বলতে যা বোঝায় জীবনানন্দের উপন্যাসগুলি সেই গোষ্ঠীর নয়। প্রথম কারণ, সাধারণত চেতনাপ্রবাহমূলক উপন্যাসের উপজীব্য হয় নিরবলম্ব এক বিষাদবোধ। সেখানে থাকে ক্লান্তি আর নিঃসঙ্গতা। বুদ্ধিজীবী সভ্যতার চাপে সমাজে ও ঈশ্বরে আস্থা হারানো যে অব্যক্ত নিরাশ্রয়তার বোধ এ-যুগে গড়ে উঠেছে—তাঁরই ছবি। সে কারণে এইজাতীয় উপন্যাসে বাস্তবের সঙ্গে মনের সংঘর্ষের দিকটা প্রধান হয় না। খুব বেশি গুরুত্ব পায় না বাস্তব সংসারের উচ্চাবচতা। কিন্তু জীবনানন্দের উপন্যাসগুলিতে একদিকে বাস্তবের সঙ্গে ব্যক্তিমনের যন্ত্রণাময় সংঘাত, অন্যদিকে প্রবল সমাজসচেতনতার ছবি যথেষ্ট পরিমাণে বস্তুনিষ্ঠ উপন্যাসের স্বাদ দেয়। সুতীর্থ কিংবা নিশীথের চিন্তাভাবনার মতোই তাদের চারিদিকে ছড়ানো কলকাতা, ভারতবর্ষ ও আন্তর্জাতিক বিশ্বসমস্যাও উপন্যাসগুলিতে খুবই জরুরি। মাল্যবানকে বোঝার জন্য তার সংসারের খুঁটিনাটি জানা দরকার। এই দ্বন্দ্বটিকে লেখক দেখাতে চান—দেখান। চেতনাপ্রবাহী উপন্যাসে চরিত্রগুলি স্রোতে ভাসমান, জীবনানন্দের উপন্যাসে চরিত্রগুলি কুটো ধরে বাঁচবার লড়াই চালিয়ে যায়। শেষমুহূর্তে তীরে ওঠে সুতীর্থ, মুঠি খুলে গিয়ে তলিয়ে যায় মাল্যবান। ফ্রিজ শট-এর মতো এক অসমাপ্তির বিন্দুতে চিরন্তন অনিশ্চয়তার সামনে থামিয়ে দেওয়া হয় 'জলপাইহাটি'র চরিত্রগুলিকে।

সেজন্য চেতনাপ্রবাহ লিপিবদ্ধতার পদ্ধতির উপর পুরোপুরি নির্ভরও করেননি জীবনানন্দ। জীবনের কাছে মানুষের প্রত্যাশা ও বিফলতার যে শিল্পরূপ তিনি গড়েছেন তাতে যেমন আছে অন্তর্জগৎ তেমনি আছে বহির্জগৎও। মানুষের সঙ্গে তার এই বাসভূমির সম্পর্কটি যেমন গভীরভাবে অন্তঃস্রোতময় তেমনিই তা প্রবলভাবে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। জীবনের সঙ্গে মানুষের যে টান-ভালোবাসার সম্পর্ক তিনি দেখিয়েছেন তার মধ্যে জড়িয়ে আছে আর্থিক অভাবের বোধ ও যৌনতৃপ্তির আকাঙ্ক্ষা। এই দু'টি অনুভূতিই মানুষের ইন্দ্রিয়ময় বহিশ্শরীরকে গভীরভাবে স্বীকার করে। মানুষের জীবনে পূর্ণতার যে স্বাদ ও আকাঙ্ক্ষা তা একই সঙ্গে মনোতৃপ্তি ও শরীর-তৃপ্তির মিলিত রাস্তা পেলে তবেই পূর্ণতা পেতে পারে। এই কথাটি বোঝাবার জন্য তিনি একটি কারু-কৌশল অবলম্বন করেছেন। বারবার তাঁর চরিত্রগুলির সঙ্গে তিনি খাওয়া ও শোওয়ার বিলাসী বর্ণনা যুক্ত করে দেন। তাদের শরীরমনস্কতা উদ্‌ঘাটিত করে দেন এই উপায়ে। যে সোমেন প্রকাশের 'জীবনব্যবসায়-কে ঘৃণা করে—জীবনকে চায় শুধু'—সে কিন্তু প্রকাশেরই পয়সায় অনেকগুলো চিংড়ি-কাটলেট 'শুয়োরের মতো' লেজশুদ্ধ গিলে ফেলে। শচী ও প্রকাশের টেবিলে বসে ডিনার খাবার দৃশ্য তিনি খুব যত্নের সঙ্গে বর্ণনা করেন। আধাসিদ্ধ বীট, সিদ্ধ আলু, মাস্টার্ড, কাঁচা পেঁয়াজ, ভিনেগার, টমেটোর টক সহযোগে ঝকঝকে ছুরি ও কাঁটা দিয়ে ফাউল রোস্ট খাবার ছবি জীবন-যাপনের একটা প্রতীক হয়ে উঠেছে। অল্প উপার্জন মাল্যবানের। উৎপলা তার যত্নও নেয় না। তবু খাবার সময়ে পঞ্চব্যঞ্জনের প্রাচুর্য। শুধু তাই নয়, খাবার সময়ে সে মন দিয়ে কাসুন্দি ঢেলে নেয় সব কিছুর উপর 'পাতের কিনারে কাঁচালঙ্কাটা ফেঁড়ে ঘষে ঘষে ডালের স্বাদ বাড়াবার চেষ্টা করে।' বড়লোক জিতেনের বাড়িতে মানসিক অবসাদ ও দুর্ভাবনার মধ্যেও বিলাসী খাওয়া-দাওয়া চলতে থাকে নিশীথের এবং প্রতিটি খাবারের আলাদা আলাদা স্বাদ পায় সে—প্রয়োজনমতো ব্যবহার

করে ভিনেগার ও সস্। তৃপ্তি পায় বরফকুচি মেশানো জল খেয়ে। স্টেট এক্সপ্রেস, হাভানা আর গোল্ডফ্লেকের টিন ছড়িয়ে থাকে সর্বত্র। এজন্যই সোমেন যখন যাবার সময়ে প্রকাশের একটি দামী চুরুট টেবিল থেকে তুলে নিয়ে যায় তা নিরর্থক মনে হয় না। জীবনের অকপটতার সন্ধানে উন্মুখ হয়ে আছে যে সোমেন সে-ও একটি সুস্বাদ চুরুটের বাসনার কাছে আত্মসমর্পণ করে, অর্থ-স্বাচ্ছন্দ্যের কাছে মনের একটি টুকরোকে পরাস্ত হতে দেয়। বোঝা যায় শরীরবাসনার বন্ধন থেকে কিছুতেই মানুষের মুক্তি নেই—এটাই মানুষের ট্রাজেডি। শোবার বর্ণনাও অনেকটা একইরকম। বকের পালকের মতো সাদা চাদর ও নেটের মশারি প্রায় সর্বত্র। শীতরাত্রে বিছানার আরামপ্রদ উষ্ণতার স্বাদ পেয়ে তৃপ্ত হয় মাল্যবান তার অতৃপ্তকাম রিক্ততম মুহূর্তেও। 'গভীর রাতে বিছানায় শরীরই তো স্বাদ। শরীরটাই তো সব দেয় মানুষকে। মন কী? মন কে? মন কিছু নয়। বেশ নিবিড় শীতের রাতে চমৎকার শরীরের স্বাদ পাচ্ছিল মাল্যবান।' উৎপলার ক্ষেত্রে বারংবার উল্লেখিত হয়েছে যে সে সবকিছুর বিনিময়েও রাতের ঘুমটি অবিক্ষিপ্ত ও নিটোল রাখতে চায়। জীবনানন্দের চেতনায় ইন্দ্রিয়ঘনতার যে পরিব্যাপ্তির সঙ্গে আমরা পরিচিত—প্রকৃতির বর্ণনাতেই শুধু নয়—এই খাওয়া-শোওয়ার বর্ণনাতেও তা পাওয়া যায়।

যে কোনো বর্ণনায়, যে কোনো সংলাপেই জীবনানন্দ যৌনচেতনার একটি সূত্র প্রবেশ করিয়ে দেন। তাঁর গল্প-উপন্যাস-কবিতায় যৌনচেতনা-গর্ভ বাক্যনির্মাণের অসংখ্য উদাহরণ আছে। তার অনেকগুলিই অসামান্য। যেখানে নরনারীসম্পর্কের প্রসঙ্গ সেখানে তো আছেই—সম্পূর্ণ ভিন্নতর প্রসঙ্গেও তিনি এই যৌনবোধের ছোঁওয়া মেশানো ভাষা ব্যবহার করেন। সুতীর্থকে বিরূপাক্ষ বলে—কত টাকা চাই। উত্তরে সুতীর্থ বলে—'তা চাই বেশ কিছু, বেশ ধবধবে ভাগলপুরী চাই—একবার বিইয়েছে।' মাল্যবানের মননচিন্তার কথা বলতে গিয়ে জীবনানন্দ লেখেন—'বাঙালীর মান সম্মান ফিরিয়ে আনবার জন্যে বড়ো নয়াল আগুনের মতো দাউ দাউ করে উঠতে ইচ্ছা করে তার বিপ্লবের থেকে বিপ্লবে ফ্রান্স-রুশ-স্পেন-চীন সমস্ত বিপ্লবের ইয়ে—স্তনাগ্রচূড়ায় নতুন দুগ্ধের উল্লাসে নবীন পৃথিবীর জন্যে।' সচেতনভাবেই তিনি এমন করেছিলেন। যৌনচেতনা মানুষের একটি কঠিন লাগাম—এটাই তাঁর চিন্তার একটা প্রধান জায়গা বলে গল্প-উপন্যাসগুলির সমগ্র আবহের মধ্যে তিনি সঞ্চারিত করে দিয়েছেন এই বোধটি।

জীবনানন্দের অপর একটি কৌশল হলো—আপাত-অবাস্তব সংলাপ নির্মাণ। বাস্তব ঢঙের সংলাপ রচনা করতে গিয়ে তিনি ব্যর্থ হয়েছেন—এমন নয়। বিশেষ কারণেই একটি অবাস্তব সংলাপরীতি গ্রহণ করেছিলেন মনে হয়। আগে দু'টি উদাহরণ নেওয়া যাক—অফিসের ম্যানেজিং ডিরেক্টরের সঙ্গে সুতীর্থের কথোপকথন কোনো একটি নির্লজ্জ ও অসৎ ব্যক্তির প্রসঙ্গে :

'ওর সঙ্গে যোগসাজসে কাজ না করলে যার পেট ফুলে ওঠে তার কটা কান কাটা সুতীর্থবাবু?'

'দুটো কান।'

'আর তার যদি গণেশের মতো ছটা মুখ থাকত তাহলে কটা কান কাটা হত সুতীর্থবাবু?'

'বারোটা। রাবণের মতো দশটা মুখ থাকত যদি তার তাহলে কটা কান কাটা হত?'

এই সংলাপ-বিনিময় অফিসের বস্ ও অধস্তন অফিসারের মধ্যে কিছুতেই অফিসে

বসে সম্ভব নয়। 'মাল্যবান' উপন্যাসে উৎপলা ও শ্রীরঙ্গ নামে এক ব্যক্তির কথাবার্তা ঃ
শ্রীরঙ্গ—'তোমার মতন এমন হাতি খেতে কাউকে তো দেখলুম না। সেই অনেক দূরের সমুদ্রে শ্রীমন্ত সদাগর যেমন দেখেছিলেন।'

'তুমি বুঝি শ্রীমন্ত সদাগর?'

'আর তুমি দাঁড়িয়ে আছ পথের ওপরে, কিন্তু হাতি খাচ্ছ কেন বলো তো কামিনী?'

আরো বেশ কয়েকবার অপ্রাসঙ্গিকভাবেই শ্রীরঙ্গ ও মাল্যবান দুজনেই প্রশ্ন করে—উৎপলা হাতি খাচ্ছে কেন। কোনো পরিহাসের ইঙ্গিত নেই। কোনো ব্যাখ্যাও নেই। অজস্র ছড়ানো এমন উদাহরণ। নিশ্চয়ই এগুলি অবাস্তব ও উদ্ভট। কিন্তু তিনি সম্ভবত চাইছিলেন বাস্তবের আকার নয়, বাস্তবের অন্তরকে স্পর্শ করতে। প্রথমটিতে নির্লজ্জতার সীমাহীনতা আর দ্বিতীয় সংলাপের টুকরোটিতে পুরুষের চোখে নারীর রহস্যময় আগ্রাসন-শক্তির প্রতীক নির্মাণের চেষ্টা দেখা যায়। বাস্তবে এভাবে কথা বলা হয় না, কিন্তু বলবার এক ভিতর-বাসনা থেকে যায় মনের মধ্যে। চেতনার নিমজ্জিত স্তরগুলিতে আলোড়িত হতে থাকে যে অব্যক্ত ভাবনাগুলি তাকে যদি ভাষা দিতে হয় তার সর্বতোময় বৈভবে তাহলে তার ভাষারূপ সম্ভবত এমনই হবে। ছবিতে যেমন রূপারোপিত হয়ে দেখা দেয় মানুষ, পশুপাখি, প্রকৃতি—তেমনি স্টাইলাইজ্‌ড হয়ে দেখা দিয়েছে এখানে সংলাপ। বস্তুরূপের আকারগত সত্যতার আবরণ ভেদ করে অস্তিত্বের অন্তরতর সত্যতাকে বিদ্ধ করবার আকাঙ্ক্ষাই এনেছিলো শিল্পে সুররিয়ালিজ্‌ম। ছবিতে সর্বাধিক এবং কবিতায় কিছুটা ছড়ানো এই আন্দোলনের ছাপ, উপন্যাসে সবচেয়ে কম। কারণ প্রথাসিদ্ধ অর্থে বাস্তবধর্মী হবার একটা দাবি উপন্যাসের উৎসকাল থেকেই তার সঙ্গে লেগে আছে। সেজন্যই সুররিয়ালিজ্‌ম-এর অন্যতম প্রবক্তা আঁদ্রে ব্রেত বলেছিলেন—'I have a disdainful prejudice against the novel.') Manifesto of Surrealism, 1924; Tr. by J. H. Mathews, Surrealism and the Novel. The University of Michigan Press. 1924)। নিখুঁত বাস্তব হবার চেষ্টাকে তিনি বলেছিলেন 'pointlessly particular'। এই আন্দোলনের প্রভাব বাংলা সাহিত্যে কণিকামাত্র। জীবনানন্দই পরাবাস্তব মনোময়তার অনুলেখনে সৃষ্টি করে গেছেন একাধিক কবিতা। উপন্যাসে সম্ভবত তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যাঁর কলমে কখনো কখনো এই ব্যাপারটা ঘটে গেছে। সুররিয়ালিজ্‌ম কিছু ব্যাখ্যা করে না, কেবলমাত্র অনতিস্পষ্ট দৃশ্য-প্রতীকেই আধারিত হতে পারে। জীবনানন্দও এই সংলাপ-অন্তর্গত অবাস্তবকে ব্যাখ্যা করার কোনো দায় স্বীকার করেননি। পরিবর্তে দৃশ্য-আভাস রচনা করেই ছেড়ে দিয়েছেন। সুররিয়ালিজ্‌ম-এর ভাষা অনেকটাই হয় স্বয়ংক্রিয়ানির্মিত—এমন দাবি করেন পরাবাস্তববাদী শিল্পীরা। স্বয়ংক্রিয়তার একটা অনুভূতি জীবনানন্দের ভাষাতেও যেন পাওয়া যায়। জমির দাম বেড়ে গেছে—এই কথাটি বোঝাতে গিয়ে বিরূপাক্ষ যখন বলে—'কলকাতায় এসব জায়গা জমির ওপর সোনার মাকড়ি এঁটে দিনরাত গিন্নী শকুন লাফাচ্ছে।'—তখন বস্তুতই মনে হয়—আপনা থেকে মনে ভেসে না এলে এমন সব ভাবদৃশ্য রচনা করা সম্পূর্ণ যুক্তিনিষ্ঠ মনের পক্ষে সম্ভব কি?

উপন্যাসের প্রাণ-প্রতিষ্ঠায় তৃতীয় যে উপায়টি গ্রহণ করেছেন জীবনানন্দ সেক্ষেত্রে তাঁর প্রতিভা প্রবাদ হয়ে গেছে। উপমা। বোঝাবার ভাষা যেখানে শেষ হয় সেখানেই কথা বলে উপমা। প্রায় সর্বত্রই প্রাণিজগতের সঙ্গে মানুষের উপমা দিয়েছেন তিনি। মানুষের সাধনা শরীরোত্তীর্ণতায় পৌঁছবার, কিন্তু তার সত্তা নানাভাবে খণ্ডিত ও কৃত্রিম। পশুসত্তা

নির্মনন কিন্তু অখণ্ডিত, নির্মল। মানুষের অনেকখানিই পশুবৃত্তির নিয়মের অধীন। সে কারণেই সম্ভবত এজাতীয় উপমাই প্রধান স্থান জুড়ে আছে। যৌনতাবোধের সংস্পর্শ যেখানে—সেখানে সবসময়েই পশু-পাখি-পতঙ্গের উপমা। বিরূপাক্ষের সামনে মর্যাদাময়ী মণিকা—'যেন ভরা নদীর তীরে জঙ্গলের অন্ধকারে রাতের বাঘিনী সহসা অনির্বাণ মানুষী হয়ে দাঁড়িয়েছে'। যৌনকামনালোলুপ অমরেশ—'যেন দুটো ঠ্যাঙের বদলে আটটা ঠ্যাং অমরেশের মাকড়শার মতো, কেমন ল্যাং ল্যাং ল্যাং ল্যাং করছে সব সময়েই; কখনো গাঢ় লাল কখনো গাঢ় সবুজ মাকড়সানীদের দেখছে বলে'— 'জলপাইহাটি'তে এরকম স্পষ্ট উপমার প্রয়োগ কম। অর্থগর্ভ আবহ রচনায় মন দিয়েছেন বেশি। অনেক চিত্রকল্পে তাই একটি ভিন্নমাত্রা সৃজিত হয়েছে এখানে। যেন মানবোপাখ্যানের পাশাপাশি গড়ে উঠেছে প্রকৃতিনির্ভর চিত্রকল্পের একটি অন্য জগৎ। কোনো কিছুই এখানে স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দেওয়া নেই। কিন্তু বহু পাঠকের জন্য আছে বহুরকম ইঙ্গিত। আকাশ ও নক্ষত্রলোক, বৃক্ষলতা-পাখি-ফড়িং-ভোমরা সহ পূর্ববাংলার নিসর্গ, কলকাতার অসুন্দর পথঘাট—সবই চিত্রকল্পের উপকরণ হয়েছে এই উপন্যাসটিতে। তাঁর উপন্যাসের পাখির উপমায় একটি সুবোধ্য নিয়ম লক্ষ্য করা যায়। শ্বাসরোধকারী, সংকীর্ণ জীবন থেকে মুক্তির প্রসঙ্গে ময়ূর, মরাল, তিতির, চন্দনা, অনামা হলুদ ও সবুজ পাখিরা। অভিসন্ধি লুকোনো আপাত গাম্ভীর্য বোঝাতে ধনেশ, শামকল, কাকাতুয়া, পেঁচা। প্রকৃতি থেকে নেওয়া উপমার অপূর্বত্বও মুগ্ধ করে দেয়। প্রাণের অন্তরঙ্গ ভালোবাসার কথার উপমা—'আতার ক্ষীরের মতো' প্রাণের গভীর—গভীর এক তৃষ্ণার কথা বলতে গিয়ে 'জলপাইহাটি'র এক জায়গায় একটি দৃশ্য নির্মাণ করেছেন জীবনানন্দ। ওয়াটার-কুলারের জলভর্তি কাচের কুঁজো, রেফ্রিজারেটরে নানারকম পানীয় আর স্কোয়াশ, বরফকুচি ফেলা ঠাণ্ডা কাচের গ্লাস এইসব সামনে রেখে নিশীথ বলে—'আমি নির্ঝরের জল ভালবাসি।' বারবার আবৃত্ত হয় শব্দটি—নির্ঝর—নির্ঝর—নির্ঝরের জল। সেই সৌন্দর্য ধরে দেবার সাধ্য নেই কোনো ব্যাখ্যার।

প্রধানত প্রাণিজগৎ থেকে তিনি উপমা এনেছেন নানারকম চিত্তপ্রচ্ছায় বোঝাবার জন্য। প্রায়ই সেগুলি একতম উপমা, অর্থাৎ এ উপমাটি ছাড়া ঐ অনুভব কিছুতেই ধরা দেবে না। স্থূলস্বভাব বিরূপাক্ষ ও সূক্ষ্মমননী জয়তীর বাক্যালাপ—'যেন হোঁদড়ে হরিণীতে শীতসকালের কথিকা তৈরী হচ্ছে নদীর এপার ওপার থেকে'। জয়তী সাগ্রহে সুতীর্থের সঙ্গে কথা বলে—যেন 'বিবিছাড় ঝগড়ার পুলক ঝুঁটিয়াল বুলবুলের সঙ্গে'। আর বিরূপাক্ষের সঙ্গে শীতলভাবে কথা বলে—'বর্ষাকালের লাউক্ষেতের কাঁকড়ানীর মতো'। মণিকার রূপ—দেবাংশে উজ্জ্বল চিতল মাছের মতো'। মাল্যবানের চোখে অন্ধকার—'কালো কালো রাশি রাশি বেড়ালের ছোটাছুটির মতো'। উৎপলা প্রসঙ্গে অমরেশকে প্রশ্ন করার সময়ে মাল্যবান 'বেড়ালের থেকে চিতেবাঘ, চিতেবাঘ থেকে বেড়াল সত্তায় আসা-যাওয়া করতে করতে বললে'। এমন অজস্র।

'সুতীর্থ' ও 'মাল্যবান' উপন্যাস দু'টিতে বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে নানারকম সাপের উপমা। মানুষের মন ও সত্তাকে সাপের সঙ্গে তুলনা করেছেন তিনি। যে সমালোচকগোষ্ঠী উপমা-গুচ্ছের সাহায্যে লেখকমনের ব্যাখ্যায় পৌঁছতে চান তাঁদের কাছে বিষয়টি হয়তো কৌতূহলোদ্দীপক হবে। বাঙালি মনের সুচিরকালবাহী ঐতিহ্যে সাপের অবস্থান। সাপের সঙ্গে লগ্ন যৌনচেতনার ইঙ্গিত, কুটিলতা, বিষাক্ততা, দেবমহিমা। ঘৃণা, ভয়, আকর্ষণ ও কামনা জাগানো শীতলরক্ত, মণিভূষণ এই জীবটি আমাদের সাহিত্যে, পুরাণে, লোককথায় চিরস্থায়ী। ব্যবহারিক জীবনেও বহু রহস্য কাহিনীর নায়ক এই সাপ। মানবজীবনের অপার

বিচিত্র রহস্যময়তা ও মনের কুটিল গ্রন্থিগুলির কথা মনে রেখেই হয়তো এই উপমা। 'সুতীর্থ' উপন্যাস থেকে সর্প-উপমার কিছু উদাহরণ—

১. বহুদিন পরে দেখা হওয়া বন্ধুকে—'আমাকে চিনলে কি করে—চেহারার কোনো বিষটিষ মরেনি তো? এখনও বেশ লেজে দাঁড়ায়?'

২. লোভে পড়ে চলে যাওয়া বোনের প্রসঙ্গে বালক হারাণ—'গোখরো সাপের মত বাড়ি মাথায় মনুবাবুর সঙ্গে চলে গেল বোন মেদিনীপুর।'

৩. হারানো শৈশব প্রসঙ্গে—'মধুমঙ্গল তো নিজের যৌবন-কৈশোরকে কালনাগের দাঁতে কেটে ফেলে ভেলায় করে পাঠিয়ে দিয়েছে ত্রিস্রোতায়—'

৪. নিজের সম্পর্কে সুতীর্থ—'যে আফিং খায় তাকে খেলে কালনাগ 'নীল' হয়ে যায়।'

৫. মানুষের রোগের কথায়—'ওটা বুঝি বাস্তু সাপ, ঘরে ঘরেই আছে?'

৬. প্রতিযোগিতামূলক জীবন সম্পর্কে—'কে আগে ওপরে ওঠে—মোটা না রোগা, ঢেমনা না লাউ-ডগা,.......'

৭. বিরূপাক্ষের কামনা ও মণিকার ব্যক্তিত্বের বর্ণনায়—'মানুষটার দিকে তাকিয়ে টের পেলেন মণিকা যে এর ভেতর আবছা অজগর মোচড় দিয়ে উঠেছে। সেটাকে মুহূর্তেই পাটের দড়িতে বদলে ফেলতে ফেলতে মণিকা বললেন—'

৮. বিরূপাক্ষ সম্পর্কে মণিকা—'ও জাত সাপও নয়...সেটা বুঝেই ঢুঁটো বাস্তু সাপের মতো ওকে আসতে দেখে ছেড়ে দিচ্ছি আমি....'—এমন আরো অনেক আছে। 'মাল্যবান'-এ কমে গেছে উপমাটির প্রয়োগ। তবুও একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে কামনাতপ্ত অমরেশকে বলা হয়েছে—'আঁশটে দুধরাজের মতো ঝিকিয়ে উঠেছে।' উৎপলার মিলনাকাঙ্ক্ষামেদুর রূপের বর্ণনা—'অপরূপ চিত্রিণী যেন আজ শঙ্খিনী হয়ে উঠেছে—খাচ্ছে না কিছু উৎপলা।' কামশাস্ত্র থেকে শব্দ দু'টি নেওয়া হলেও প্রয়োগবিশিষ্টতায় সাপের ইঙ্গিতও আছে। এই দু'টি উপন্যাসে সাপ ছাড়াও শামুক, গুগলি, কাঁকড়া, চিংড়ি, মাকড়সা, টিকটিকি, ইঁদুর মানুষের কামশরীর ও যৌন-ইচ্ছা প্রসঙ্গে বারবার ব্যবহৃত। ভিন্নতর অনুভূতি প্রকাশের জন্যও এদের ব্যবহার আছে—তবে কম। 'জলপাইহাটি'তে কিন্তু—বোধহয় বাস্তবজীবনের সংগ্রামের চেয়ে মননজীবন ও তত্ত্বভাবনা বেশি প্রাধান্য পেয়েছে বলেই—চিত্রকল্পলোকে পশু-সরীসৃপ-কীটের তুলনায় পাখি-মৌমাছি-ভ্রমর-জিন-পরি-জলপরি হয়েছে প্রধান উপকরণ-সম্ভার। আর, গ্রহতারকাময় নক্ষত্রলোক সেখানে একটি প্রধান চিত্রকল্প।

জীবনানন্দের ভাষালক্ষণ এত বিচিত্র ও বিশাল—সে সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে কিছু বলা এখানে অসম্ভব। তবু, দু'একটি কথা মনে হয়। আগে বলেছি তাঁর কবিতা ও গল্প-উপন্যাসের ভাষা একই। তবু বিষয়ের কারণে সাধারণত—যাকে কর্কশ বা অশালীন বলা হয়—সেরকম শব্দাবলীর প্রয়োগ গল্প-উপন্যাসে বেশি। মন্তব্যটি যদিও যথেষ্ট অ-গভীর হলো কারণ এককভাবে সব শব্দই নির্গুণ। অন্য শব্দের সাযুজ্যে শব্দ ভাবাত্মক হয়ে ওঠে। কোনো একক শব্দকেই 'কর্কশ' বা 'অশালীন' বলা উচিত কিনা তা খুবই তর্কের বিষয়। দেশজ শব্দ ও বাংলার প্রবাদ-প্রবচন ব্যবহারে জীবনানন্দের প্রবণতা ও দক্ষতার কথা সব সমালোচকই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু তৎসম শব্দের প্রয়োগেও ছিলো তাঁর অসামান্যকুশলতা। দেশজ ও তৎসম শব্দ পাশাপাশি রেখে ভাষাকে তিনি একই সঙ্গে দিয়েছেন অপরূপ স্থাপত্য এবং নিরাবরণ শরীরী গন্ধ। যে কোনো লেখা থেকেই কথাটির অসংখ্য প্রমাণ পাওয়া যাবে। জীবনানন্দের ভাষার বিশেষণ প্রয়োগের অভিনবত্বের কথা

অনেকেই বলেছেন। তাঁর ব্যবহৃত বিশেষণগুলি বিশেষ্য শব্দটিকে শুধু বর্ণনা করে না—বিশেষ একটি তাৎপর্যের সঙ্গে, অভিপ্রায়ের সঙ্গে যুক্ত করে। উপমাপ্রয়োগে তাঁর যে কুশলতার কথা আমরা জানি—সেই শিল্পদক্ষতাই মূর্ত হয় প্রতিটি শব্দের সঙ্গে যুক্ত প্রতিটি বিশেষণে। মনে হয় প্রত্যেকটি বিশেষণের কথা তিনি পৃথকভাবে ও গভীরভাবে ভাবেন। লবেজান অন্ধকার, দেবাংশী মাছ, অন্ধকারের তিব্বতী পবিত্রতা, অনির্বাণ মানুষী, বাজপেয়ে সভা, রাখালী ঘুম, সত্তমা রাত্রী, উড়িসুড়ি নিস্তব্ধতা, সমীচীন কচ্ছপ, নিশীথঠুটি পাখি ইত্যাদি বিশেষণ জীবনানন্দের ভাষার নিবিড় মনন-নির্ভর উপমারই আর একটি রূপ।

আর পাই, ধ্বন্যাত্মক শব্দের কিছু আশ্চর্য ব্যবহার। এই জিনিসটা তাঁর কবিতার ভাষায় কম। গদ্যরচনাগুলিতে তির্যক বিশ্লেষণের দৃষ্টি অধিকতর প্রসারিত বলেই বোধহয় এমন হয়েছে। কবিতায় বিশ্লেষণের খরতার চেয়ে মনোলীনতার আবেগ স্বভাবতই বেশি। উদাহরণ দিই—

১. মাল্যবানের প্রতি বিদ্রূপে—'ফির ফির ফুর ফুর ফিঃ ফিঃ ফুঃ ফুঃ করে হেসে উঠল উৎপলা।'

২. জয়তীর প্রতি কামনায়—'নিজের স্নায়ু শিরায় রক্তের তিরতির ঝিরঝির তিরতির ঝিরঝির স্রোত অনুভব' করে বিরূপাক্ষ।

৩. একটি বিশেষ মুহূর্তে হারীতের সামনে সুলেখা—'গ্লিব গ্লিব গ্লিব্‌ল্ গ্লিব্‌ল্ খি খি ক্রি খি করে হাসতে লাগল।'—এই হাস্যধ্বনির মধ্যে আছে কিছুটা মতলব, কিছুটা মতলব ধরা পড়ে যাওয়ার অপ্রতিভতা, কিছুটা নিরর্থকতা ও কিছুটা পুরুষকে লুব্ধ ও মুগ্ধ করার রমণী-ইন্সটিংক্ট। ইংরেজি ভাষায় গল্প-উপন্যাসে হাস্যধ্বনির প্রতিরূপ মাঝে মাঝে এইজাতীয় ধ্বনির সাহায্যে রচিত হয়। সে প্রভাবও থাকতে পারে।

তবে জীবনানন্দের বাক্যগঠন সরল। মাঝে মাঝে আপাত-অপ্রাসঙ্গিক দু'একটি শব্দ বাক্যের মধ্যে চেতনাপ্রবাহ বা দূরান্বয় রীতির অনুসরণে ঢুকে পড়লেও সর্বাতিশায়ী কোনো কৃত্রিমতা তাঁর ভাষার গতিকে বক্র করে না। তাঁর গদ্যের ভাষা একই সঙ্গে ভাবময়, গতিময় ও মনোময়।

গল্প-উপন্যাসের রচয়িতা জীবনানন্দের মনোভূমি সম্পর্কে সবশেষে আমরা যে সিদ্ধান্তে আসতে পারি তা হয়তো তাঁর রচনা-পদ্ধতিকেও কিছুটা ব্যাখ্যা করবে। পাশ্চাত্য দেশের নৈরাশ্যবাদী, অস্তিত্ববাদী ও চেতনাপ্রবাহমূলক রীতির উপন্যাসসমূহে প্রায়ই খ্রীস্টীয় নীতিবোধের একটি সুদৃঢ় মানদণ্ড যেন স্পর্শ করা যায়। ফলে, কোনো একক ব্যক্তির বিষাদ সেখানে সর্বাত্মক হলেও মানব-অস্তিত্বের কোনো না কোনো বিন্দুতে থেকেই যায় কোনো এক অবিচল আশ্রয়। যৌনতাকে যাঁরা উপন্যাসের উপজীব্য করেছেন তাঁরাও এই অনুভূতিকে জীবনের একটি অত্যর্থক ধর্মে রূপান্তরিত করেছেন। তাঁদের উপন্যাসের চরিত্রগুলি 'মাল্যবান' ও 'জলপাইহাটি'র চরিত্রগুলির মতো নিঃশেষিত বা স্তম্ভীকৃত হয় না প্রায়শই। কোনো একটি আত্মিক উপলব্ধিতে পা রেখে তারা দাঁড়ায়, দাঁড়াতে পারে হতাশার মধ্যেও। কিন্তু হিন্দুধর্মের সেরকম কোনো কেন্দ্রমুখী, দৃঢ় ও গোষ্ঠীগত রূপ নেই। নানাবিধ মত, বহু বিপরীত বিশ্বাস এবং বহুরকম গ্রহণশীল অভ্যাসের ফলে তার সুনির্দিষ্ট একটি পরিসরসীমার অভাব। বিক্ষিপ্ত প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার ও আচারপালনেই হিন্দু ধর্মবিশ্বাস বেঁচে আছে দীর্ঘদিন যাবৎ। যুদ্ধোত্তর বিশ শতকে এই প্রতিষ্ঠাননির্ভর আস্থা ও সংস্কারপালনের নিষ্ঠাসমূহ বিচলিত হওয়ায় কোনো কোনো লেখকের মধ্যে একটি

কেন্দ্রচ্যুতির ভাব লক্ষ্য করা যায়। উনিশ শতকেও মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্রের রচনায় এই সমস্যার ছাপ দুর্লক্ষ্য নয়। বিশ শতকে সমস্যাটি ঝুঁকে পড়েছে সর্বাবয়ব হতাশার দিকে। একা রবীন্দ্রনাথ ছিলেন অদ্ভুতভাবে এই সমস্যা থেকে মুক্ত। তাঁর অনন্যসাধারণ প্রতিভার একটা প্রকাশ এই ভাবনায়। ভারতবর্ষ তথা বিশ্বের প্রধান ধর্মচিন্তাগুলি তাঁর চিত্তে সংশ্লেষিত হয়ে এক ঐশী-মানবিক ধর্মবোধের সৃষ্টি করেছিলো। তাকে হিন্দুধর্ম না বলে 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম' বলাই ভালো। তাই বলাও হয়। রবীন্দ্র-পরবর্তীকালের আধুনিক বাঙালি লেখকেরা গ্রহণ করেছিলেন ঐ 'রবীন্দ্রনাথের ধর্ম'কেই—জেনে বা না-জেনে। কিন্তু জীবনানন্দ ঐ ঐশীবোধটিকে বাদ দিয়ে কেবল মানবধর্মকেই মননে, জৈবতায় ও সময়চেতনায় ধারণ করবার চেষ্টা করেছিলেন তাঁর গল্প-উপনাসে। কাজটি সহজ ছিলো না। তাঁর চেষ্টা সার্থক হয়েছে কি হয়নি—এ নিয়ে নিশ্চয়ই আরো অনেক বিতর্ক হবে। কিন্তু আধুনিক মানুষের ধর্মবোধহীন মানবনীতির অস্তিত্বের এই সমস্যাটি তাঁর গল্প-উপন্যাস থেকে ক্ষুব্ধ ফণা তুলে দাঁড়ায়, মাঝে-মাঝেই দংশন করে অভ্রান্ত লক্ষ্যে। এখানেই তাঁর এই রচনাগুলির অতুলনীয়তা।